প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সংগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

আনন্দ

ISBN 978-81-7756-771-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

মেজদা-কে

ভূমিকা

ভূতের গল্প যেমন ভূতেদের জন্যে নয়, ঠিক তেমনি কল্পবিজ্ঞানও বৈজ্ঞানিকদের জন্যে নয়— এই আপ্তবাক্যটা মাথার মধ্যে রেখেই কল্পবিজ্ঞান রচনায় একনিষ্ঠ হয়েছিলাম ১৯৬৩ সাল থেকে, ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা 'আশ্চর্য!' বের করার সময়ে। সায়েন্স-ফিকশনের প্রতিশব্দ কল্পবিজ্ঞান শব্দটাও সৃষ্টি করেছিলাম তখনই। ছোটদের মন জয় করতে গেলে, সুগারকোটেড ট্যাবলেটের মতন তেঁতো ওষুধ খাইয়ে দিতে গেলে, হাসিঠাট্টা কৌতুক পরিহাসের মোড়কে বৈজ্ঞানিকি অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক হিসেবে খাড়া করেছিলাম শ্রীহীন এক আধবুড়ো ফোকলা একেবারে বাঙালিকে— যার নামকরণ করেছিলাম এমনভাবে যাতে ছেলেমানুষরা নাম শুনলেই বুঝতে পারে মানুষটা কী নিয়ে যত্তোসব উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া ব্যাপারের গবেষণা করে। বাঙালি বৈজ্ঞানিক যে ফ্যালনা নয়, এইটা বোঝানোর সুড়সুড়ি ছিল মনের মধ্যে। একই সঙ্গে বাঙালি ছেলে যে কতখানি ডানপিটে গাছে-চড়া হতে পারে, সে ব্যাপারটাও তুলে ধরার জন্যে দরকার ছিল বোম্বেটে টাইপের মারকুটে দুঃসাহসী একজনকে আনা।

ফলে এসেছে প্রনাবচ আর দীনানা ওরফে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আর দীননাথ নাথ।

লিখে মজা পেয়েছি, মজা দিয়েছি, সেইটাই আমার পরম পাওয়া— এই সাতাত্তরে পা দিয়ে। ছোটরা হাসুক, হাসতে হাসতে জানুক। জানতে জানতে সেই ছোটদের অনেকেই আজ বড় হয়ে গিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রতিষ্ঠিত— কল্পবিজ্ঞান লেখায় উদ্‌বুদ্ধ— আর কী চাই? ইচ্ছে ছিল, কোন গল্পটা কোন পত্রিকার কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার খুঁটিনাটি দেওয়ার। কিন্তু এই জীবনটার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাওয়ায় সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। অনেক গল্প-উপন্যাস হারিয়ে গেছে। কিছু থেকে গেলেও সাল-তারিখ লেখবার কথা খেয়াল ছিল না। যতটা পেরেছি রচনাপরিচয় অংশে দিয়েছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিশ্চয় উপলব্ধি করবেন আমার কষ্টটা কোথায়।

অদ্রীশ বর্ধন

সূচি

কালোছায়ার করাল কাহিনি ১
টেক্কা দিলেন প্রফেসর ৩৬
কালো চাকতি ৫৫
আটলান্টিস-এর সন্ধানে ৮২
ক্রিস্টাল পুঁথির কাহিনি ১৩৫
কালো থাম ১৫৩
মনের মেশিন ১৮৬
কসমিক কুয়াশা ১৯৫
আটলান্টিক-লেমুরিয়ার রহস্য ২০০
প্রজাপতি, ম্যমি ও সংকেত ২০৫
পাইন বনের প্রহেলিকা ২১৫
সাগর দানব ২২৫
ঈশ্বর আছেন ২৩২
ব্ল্যাক হোল-এর ব্ল্যাক ম্যাজিক ২৩৬
ওনারা ২৪১
বেলুন-পাহাড়ের বিচিত্র কাহিনি ২৪৬
রঙিন কাচের জঙ্গল ২৫৬
ভয়ংকর কাচ ২৬৫
সাগর বিভীষিকা সাঙ্কোপাঞ্জা ২৭০
নস্যি আর ডক্টর মাথামোটা ২৭৫
দাঁতালো ২৮০
গাইয়ে গাছ ৩০১
চাঁড়ালচন্দ্রের ফুঁ ৩০৫
বজ্রদন্তী বিভীষিকা ৩১৬
হত্যার হাতিয়ার হরমোন ৩৪৫
অ্যানড্রয়েড আতঙ্ক ৩৫২
পরগাছা ৩৫৭
কংকালের টংকার ৩৯৮

বৈজ্ঞানিক কুমারটুলি ৪০৬
মলিকিউল মানুষ ৪১৯
সোনা ৪২৬
ত্রিভুজ রহস্য ৪৪৫
প্রাচীন আতঙ্ক ৪৫৫
ধুরন্ধর ধরের ধড়িবাজি ৪৯৮
ম্যাটারহর্ন ৫০৪
রক্তের মধ্যে বিষ ৫১৮
লালাভিচ লাড়ুকং ৫৩৬
মানুষ না, যক্ষ? ৫৫৮
অণিমা-মানুষ ৫৮১
অমর আরক ৬০৪
ক্রিস্টাল কটেজ ৬১০
ডক্টর ফুটুনি ৬১৮
মারণ মেশিন ৬২১
জীবন্ত পাথর ৬৩০
ডার্ক এনার্জি ৬৩৭
স্ট্রিং ৬৪৬
ভূত সাম্রাজ্য ৬৫২
স্ট্রিং-ভূত ৬৫৬
অদৃশ্য অবতার ৬৬০
চাঁদু মানে চাঁদের জীব ৬৬৮
সময়-সিন্দুক ৬৭১
নব কলেবরে নাটবল্টু ৬৭৯
ভয়ংকর ভুডু ৬৮৪
রুদ্ররোষ ৬৮৯
অ্যাকুইলার আস্পর্ধা ৭৪৭
সোনা আর চুনির শহর ৭৫০
গাছ ৭৫৯
ঘাস ৭৭১
ত্রিভুজ রহস্য ৮০৩
হলুদ পাহাড় ৮১৩
পুষ্পকের পরিণতি ৮২১

রচনাপরিচয় ৮২৭

কালোছায়ার করাল কাহিনি

চোখের পাতা না-ফেলে, সোনালি চোখে, প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের দিকে চেয়ে রইল রানি ধূমাবতী।

বললে, 'ধূমাবতীর আইনকানুন তোমার অজানা নয়। আমি আইন বানাই, মানুষ তা মেনে চলে, এই ফয়সালা হয়েছে চার হাজার বছর আগে, আজও সেই ব্যবস্থা চলে আসছে গোটা পৃথিবী জুড়ে। ধূমাবতী সংবিধান ছাড়া পৃথিবীর উন্নতি হবে না— মানুষ তা মেনে নিয়েছে। মাথায় ঢুকেছে?'

প্রফেসরও পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন ধূমাবতীর দিকে। এই সেই অমানবিকী ভিন্নগ্রহিনী চার হাজার বছর ধরে কবজায় রেখেছে পৃথিবীকে। এই নিষ্ঠুরা রমণীর পায়ের আঙুল প্যাড দিয়ে ঢাকা— প্যাড না-থাকলে না-জানি কী কদাকার আঙুল দেখতে হত। আঙুল যখন দেখা যাচ্ছে না, পা দেখা যাক। পাকানো দড়ির মতো পা। দুই কিস্তূত পায়ের ওপর চোঙার মতো গোল গোল সোনালি ধড়— সেই ধড় থেকে বেরিয়েছে চার-চারটে হাত।

কুঞ্চন জাগল না প্রফেসরের ইস্পাত-শক্ত ঠোঁটে। অনড় রইল নির্ভীক চাহনি।

মণিরত্নখচিত সিংহাসনে বসেও যেন একটু টলে গেল রানি ধূমাবতী। কণ্ঠস্বরে ঢেলে দিল গরল।

বললে, 'আমরা মানুষ নই, মানুষের মতোও নই। আমরা ভিনজাতি, ভিনগ্রহী। আমরা শাসন করার জাত, তাঁবেদার হওয়ার জীব নই। আমার অধীনে যে ক'জন রানি এই পৃথিবী শাসন করছে, তাদের শাসন মানতেই হবে। মানুষ আমাদের গোলাম। আমরা পৃথিবী জয় করবার আগেও চলেছিল এই ব্যবস্থা। মুষ্টিমেয় মানুষ কবজায় রেখেছিল পৃথিবীকে ছলেবলে কৌশলে। আমরা এসে তোমাদের উদ্ধার করেছি তাদের খপ্পর থেকে। তখনও তোমাদের স্বাধীনতা ছিল না— এখনও থাকবে না। আমরা প্রভু হতেই এসেছি, প্রভু হয়েই থাকব। নইলেই মারব মানুষকে।'

এই প্রথম মুখ খুললেন প্রফেসর। গুরুগম্ভীর কাটা কাটা স্বরে বললেন, 'চার হাজার বছর আগে আপনারা দলবল সমেত নেমেছিলেন পৃথিবীতে। দেশে দেশে নেতাদের খতম করেছিলেন, নির্বিচারে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ মেরেছিলেন বাকি মানুষদের গোলাম

বানিয়ে রক্তাক্ত পৃথিবীতে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। সেইসব মানুষ যাদের মগজে বুদ্ধির ছিটেফোঁটাও ছিল না— গতর খাটানোর জন্যে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শুধু তাদের। মানুষের সংখ্যা কমিয়ে এনেছিলেন কাতারে কাতারে মানুষ মেরে। বাঁচিয়ে যাদের রেখেছিলেন তারা সংখ্যায় এতই নগণ্য যে খাবারের জোগান পেয়েছে প্রয়োজনের বেশি, পেয়েছে চোখ ধাঁধানো বিলাস সামগ্রী আপনাদের অ্যাটমিক এনার্জির দৌলতে। অটোমেটিক মেশিন বানিয়ে দিয়ে গেছে অঢেল সিন্থেটিক খাবার। তাই তাদের মঙ্গল করেছেন অনেক— মেহনত করে বেঁচে থাকতে হয়নি।'

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। বৃদ্ধ অথচ শক্ত বাঁশের মতো বডিখানা সিধে হয়েই রইল। পৃথিবীর আতঙ্ক, পৃথিবীর অধীশ্বরী রানি ধূমাবতীর রক্ত-হিম-করা কায়ার সামনে তিলমাত্র কেঁপে গেলেন না— চোখের পাতাও কাঁপালেন না।

তিনি যে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, পৃথিবীর ত্রাতা, অতীতে বহুবার বহু লন্ডভন্ড কাণ্ড থেকে সসাগরা পৃথিবীকে বাঁচিয়েছেন, আবার এসেছেন বাঁচাতে।

পলকহীন ধূমাবতী নির্নিমেষে দেখে যাচ্ছে বৃদ্ধ মানুষটাকে।

বলে গেলেন প্রফেসর তিলমাত্র স্বরকম্পন না-ঘটিয়ে, 'এই পৃথিবীতে আসবার আগে আপনারা ছিলেন নারীশাসিত জাত। এখনও তাই। চিরকাল তাই থাকবেন। কারণ, জন্ম জন্ম ধরে আপনাদের মধ্যে মেয়েরাই বেশি জন্মেছে— ছেলেরা কম। পাঁচজন নারী পিছু একজন পুরুষ। শরীরের সাইজের দিক দিয়েও আপনারা নারী আর পুরুষ আলাদা। আপনারা মেয়েরা লম্বায় সাত ফুট, ছেলেরা লম্বায় মোটে চার ফুট। চার ফুট হাইট নিয়েও গাট্টাগোট্টা কেউই নয়— কাহিল প্রত্যেকেই, আপনাদের সব পুরুষরা। ফুঁ দিলে উড়ে যায়— টিকিয়ে রেখেছেন তাদের ওইভাবেই। কারণ, আপনারা মেয়েরা, শাসনে থাকতে চান। ছেলেদের পায়ের তলায় রাখতে চান। অদ্ভুত। কিন্তু বলার কিছু নেই। আপনাদের জাতটাই যে গড়ে উঠেছে এইভাবে।

'আপনাদের সঙ্গে আমাদের মূল গরমিলটা নারী আর পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে। আমরা, মানব মানবীরা, সংখ্যায় প্রায় সমান সমান— আপনারা, অমানব অমানবীরা, তা নন। বিরাট এই ব্যতিক্রম সত্ত্বেও নেহাতই ঘটনাচক্রে আপনাদের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য থেকে গেছে কিছু কিছু জায়গায়— শারীরিক ক্ষেত্রে। দুটো চোখ, দুটো কান, গোল মাথা— আপনাদের যা, আমাদেরও তা। আপনাদের নাকের ফুটো দুটোই— কিন্তু মস্ত ফুটো। চ্যাটালো হাত আপনাদেরও আছে। কিন্তু আমাদের হাত মোটে দুটো— আপনাদের হাত চারটে। আর, এই চার হাতের দৌলতেই বেদ-বিশ্বাসীদের প্রাণে আপনারা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা বেদ-এর বহু দেব-দেবীর চারটে করে হাত আছে। গণেশ, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, যম, কুবের, শিব, ভদ্রকালী, মৎস্য, ব্রহ্মা, নটরাজ, কূর্ম, বরাহ, অগ্নির আছে আট হাত, দুর্গার দশ। সুতরাং, চার হাজার বছর আগে আপনাদের চার হাত দেখে, মানুষ ভয় পেয়েছিল, ভক্তি করেছিল— ভেবেছিল, আপনারা স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন।'

দম নিতে একটু থামলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

রানি ধূমাবতী সোনা-চোখ মেলে ঠায় চেয়ে আছে বৃদ্ধ কিন্তু ভয়ডরহীন মানুষটার দিকে।

গত চার হাজার বছর নির্মম শাসন চালিয়ে গেছে, মানুষগুলো কেন তা মেনে নিয়েছে, এখন তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই অদ্ভুত মানুষটাকে তো এত দিন... এত বছর দেখা যায়নি। রহস্যটা এইখানেই।

সুবর্ণ নয়নে বিপুল কৌতূহল ভাসিয়ে রানি ধূমাবতী তাই নিষ্পলক নিরীক্ষণ করে যাচ্ছে রোগা লম্বা মানুষটাকে।

দম নেওয়া সাঙ্গ করে চালিয়ে গেলেন প্রফেসর, 'বাইরের চেহারায় দেব-দেবীর ছাপ থাকলেও, আপনাদের শরীরের ভেতরটা কিন্তু মানুষদের মতো নয়। আপনাদের কোনও হাড় তিন ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। আপনাদের হাত আর পা মানুষের শিরদাঁড়ার মতো অনেক হাড়ের সমষ্টি। ছোট ছোট হাড়। আপনাদের প্রিয় খাদ্য তামা— আমাদের কাছে যা মারণ-বিষ। আপনাদের চুল দেখলে মনে হয় বটে মানুষের চুল— কিন্তু তা নয়। আপনাদের চুলের নাম স্ট্রথ— আসলে এক-একটা সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়, যে-ইন্দ্রিয় রেডিয়ো তরঙ্গ সচেতন, রেডিয়ো তরঙ্গ বিকিরক-ও বটে। সব দিক বিচার করলে, আপনাদের জাত আর আমাদের জাত একেবারেই ভিন্ন— আমূল প্রভেদ রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের।'

সুবর্ণ চোখের ওপর চাহনি নিবদ্ধ রেখে বলে গেলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র— 'আপনারা নারীশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত। সেই ব্যবস্থা চাপিয়ে এসেছেন আমাদের ওপর— এখনও তাই চান। মেয়েরাই আপনাদের সরকার চালায়, পুরুষদের ভেড়া... ইয়ে... হুকুমের চাকর বানিয়ে রাখেন। আর এই কারণেই... মূলত এই কারণেই... আপনারা চান পুরুষানুক্রমে যেন মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যায়, পুরুষদের সংখ্যা কমে যায়।

'রানি ধূমাবতী, আপনাদের জাতে যা স্বাভাবিক, আমাদের জাতে... এই মানুষ জাতটায়... তা অস্বাভাবিক... একটা অপরাধ... প্রকৃতিবিরুদ্ধ একটা ক্রাইম। আপনাদের খাদ্য যেন আমাদের খাবারের চাইতে ভাল হয়, এইটাই তো একটা ক্রাইম। ঘুরিয়ে আপনারা আমাদের... এই মানুষ জাতটাকে শেষ করে দিতে চান... দুর্বল হয়ে থাকা মানেও তো শেষ হয়ে যাওয়া... নয় কি?

'রানি ধূমাবতী, আপনাদের এই নৃশংস নীতি কোনও জাতের পক্ষেই শুভ নয়— আপনাদের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের ক্ষেত্রে নয়।'

রানি ধূমাবতীর ভাবলেশহীন সুবর্ণ চোখে এইবার দেখা দিল উত্তাপের রোশনাই।

বললে দ্রিমিদ্রিমি গলায়, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, রানি ধূমাবতীর মনের কথা মুখে টেনে আনতে চাও মনে হচ্ছে? লম্বা একখানা ভাষণ ঝেড়ে গেলে। এতক্ষণ ধরে শুনে গেলাম। অনেক ধৈর্য দেখিয়েছি। আর নয়। মানুষদের ভোটে তোমাকে নির্বাচন করিয়েছিলাম। আমিই কলকাঠি নেড়ে তোমাকে ইলেকশনে জিতিয়েছিলাম। সাতদিনের মধ্যে তোমাকে সরিয়ে আর একজনকে নিয়ে আসব— এবার আর ইলেকশনের মাধ্যমে নয়, প্রযোজ্য হবে ধূমাবতীর কানুন। আমার অর্ডার।'

চোখের পাতা না-কাঁপিয়ে রানি ধূমাবতীর কিম্ভূতকিমাকার অবয়বের দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। বিস্ময় পুরুষ প্রফেসর নাটবল্টু চক্র— অদ্ভুতকর্মা প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

তারপর ফেললেন ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস।

বললেন মৃদু বচনে, 'মানুষ জাতটার প্রাচীন পাওয়ার-এর কোনও খবর রাখে না আপনাদের জাত।'

কড়কড়ে কণ্ঠস্বরে বজ্রের টংকার জাগিয়ে বললে রানি ধূমাবতী, 'প্রাচীন জ্ঞান? মানুষের?'

সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলে গেলেন প্রফেসর, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রাচীন জ্ঞান। আপনাদের জাত জানে অ্যাটমিক জেনারেটরের ক্ষমতা, পারমাণবিক বিস্ফোরণের শক্তি। রানি ধূমাবতী, মনের শক্তি তার চাইতেও বেশি।'

'মনের শক্তি!' ঈষৎ প্রখর হল রানির লোহিত চক্ষু।

'আজ্ঞে। মনের শক্তি। আপনারা এই ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার দশ হাজার বছর আগে মানুষ চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে গেছিল। চিন্তা... দেখা যায় না... কিন্তু অকল্পনীয় শক্তিময়। তাদের সম্মিলিত চিন্তাশক্তিই অদৃশ্য শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে গেছে। কিন্তু সভ্যতায় বিক্ষিপ্ততা দেখা দিয়েছিল। চিন্তার জগতে অষ্টপ্রহর বিরাজ করলে বস্তুজগতে অবহেলা দেখালে যা হতে বাধ্য। আপনারা সেই সুযোগ নিয়েছিলেন। মাত্র সাতদিনে এলোমেলো সভ্যতাসমূহকে ধ্বংস করেছিলেন। আপনাদের সুসংহত পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন মাত্র সাতদিনে।'

কঠোর চতুর হাসি ভেসে গেল রানি ধূমাবতীর মুখবিবরের ওপর দিয়ে। ওষ্ঠ আর অধর নামে দুটো প্রত্যঙ্গ আছে বটে সেখানে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মানুষের অধরোষ্ঠের কোনও মিল নেই।

প্রফেসরের গলা ভারী হয়ে এসেছে, 'এত আচমকা সাম্রাজ্যের সাঁড়াশি টিপে বসিয়ে দিয়েছিলেন যে, চিন্তা-সমন্বয়ের সুযোগ আর দেননি। তারপর, একটু একটু করে, চিন্তা দানা বেঁধেছে। টিকে যাওয়া অসহায় মানুষগুলো উপলব্ধি দিয়ে বুঝে নিয়েছে, পরিস্থিতির সামাল দেওয়া খুব একটা অসম্ভব নয়। তাই, সুকৌশলে নিজেদের রক্ষে করে গেছে— আপনাদের নারকীয় অত্যাচারে যেন মুছে যেতে না-হয় পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে, খরবুদ্ধি প্রয়োগ করে সেদিকে সজাগ থেকেছে।'

এই পর্যন্ত বলে, নতুন নতুন কথার মালা মনের মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে, ফের মুখ খুললেন প্রফেসর, 'তারপর, চার হাজার বছর ধরে, চিন্তার ক্রিস্টাল বানিয়ে গেছে বিরামবিহীনভাবে। চিন্তা দানা বেঁধেছে, একটু একটু করে শক্তি সঞ্চয় করে নিজেদের শক্তিমান করে তুলেছে। একতা বজায় রেখেছে। পাঁচ কোটি মানুষের মন তিন হাজার প্রজন্ম ধরে মন খাটিয়ে শক্তির আধার গড়ে তুলেছে... পাওয়ার রিজার্ভার... তাই টিকিয়ে রাখতে পেরেছে নিজেদের আপনাদের শত সহস্র অমানবিক অত্যাচার সহ্য করে গিয়ে।"

একটু থেমে, রানি ধূমাবতীর হিমশীতল চোখে চোখ রেখে বলে গেলেন প্রফেসর, 'কিন্তু একতা জাগাতে পারেনি নিজেদের মধ্যে— এলোমেলোভাবে চিন্তাশক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে যাওয়ার ফলে। চিন্তার একমুখিতা অর্জন করতে পারেনি আপনাদের সুনিপুণ শাসন আর নৃশংস অত্যাচারের ফলে। কিন্তু চার হাজার বছরের বিক্ষিপ্ত চিন্তাতরঙ্গ নিজস্ব নিয়মে তলায় তলায় জাগ্রত করেছিল এক মহাশক্তিকে... এক চিন্তাএকক-কে... মানুষ জাতটার সুপ্ত প্রাচীন

জ্ঞানের ঘুম ভাঙছিল একটু একটু করে... পাঁচ কোটি চিন্তা-সমগ্র একসূত্রে গেঁথেছে এক মহাচিন্তাকে... দুর্জয় দুর্মদ দুর্দান্ত অজেয় সেই মহাশক্তির নাম ঈশ্বর। সে এসেছে। মহাশূন্যের মতোই সে কৃষ্ণকায়, কিন্তু সে এসেছে... সে এসেছে... সে এসেছে!'

রানি ধূমাবতীর বিকট মুখবিবর থেকে ছিটকে এল শুধু একটা স্বগতোক্তি, 'ঈশ্বর!'

যেন শুনতেই পেলেন না প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'আমরা, মানুষরা, একেবারেই ভিন্ন একটা জাত। আপনাদের আছে চুলের মতো দেখতে স্ট্রথ— রেডিল সেন্সিটিভ স্ট্রথ। আমাদের আছে তার চাইতেও বেশি সেন্সিটিভ একটা জিনিস, আরও সূক্ষ্ম সেন্স, প্রতিটি চিন্তার আরক যা... তাই। চিন্তাকে ক্রিয়মান রাখে এই সত্তা... এই সেন্স... এই অনুভূতি... সোজা সাপটা কথায় যাকে বলা যায় মন... মন... যাকে দেখা যায় না স্ট্রথ-এর মতো... যা অদৃশ্য... অথচ সদা ক্রিয়মান... এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলে যে মন... সেই মন বিরাজমান প্রতিটি মানুষের মধ্যে। রানি ধূমাবতী, আমাদের মানুষ নামকরণ হয়েছে এই কারণেই— আমরা যে মনোময় সৃষ্টি... মন আছে বলেই আমরা মানুষ... আপনাদের আছে স্ট্রথ... যা শুধু রেডিয়ো তরঙ্গ ধরতেই সক্ষম... মন তরঙ্গ ধরতে অক্ষম।'

পলকহীন চোখে বৃদ্ধ প্রফেসর চেয়ে রইলেন ধূমাবতীর পলকহীন চোখের দিকে। লড়াইটা যেন চোখে চোখেই হয়ে যাচ্ছে।

বললেন তারপরে শীতল কঠিন স্বরে, 'হাজার হাজার বছর ধরে মন-চর্চার ফলে, মনের ব্যায়ামের ফলে, মানুষের মন এখন অনেক... অনেক... উন্নত... মন দিয়ে আমরা ছুঁতে পারি.. মনের কথা অন্য মনে চালান করে দিতে পারি... আপনারা যেটা করেন স্ট্রথ-এর মাধ্যমে... রেডিয়ো তরঙ্গর মাধ্যমে। স্ট্রথ আপনাদের এক করে রেখেছে... কিন্তু মানুষকে এক করে রেখেছে মানুষের মন... যা শুভংকর হতে পারে, প্রয়োজনে প্রলয়ংকরও হতে পারে।'

তেউড়ে গেল রানি ধূমাবতীর অধরোষ্ঠ, 'ঈশ্বর! মন প্রভু ঈশ্বর! মহাশক্তি ঈশ্বর! তোমার গালগপ্পে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। কথা না-বাড়িয়ে আনো তাকে আমার সামনে... তোমার ঈশ্বরকে। মাথা নুইয়ে যাক আমার সামনে!'

বিশাল দরবারকক্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশে আনতমস্তকে ঝিমোচ্ছিল আখাম্বা এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। তার গায়ে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা আলখাল্লার বুকে আর পিঠে আঁকা এঁকাবেঁকা বিদ্যুৎ রেখা। এই অশনি চিহ্নই বুঝিয়ে দিচ্ছে পেশায় সে বিদ্যুৎ-শ্রমিক।

'ঈশ্বর' শব্দটা আচমকা আছড়ে পড়েছিল তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে। কশাঘাতের চেয়েও জ্বালাময় সেই আঘাত— বজ্রাঘাত বললেও চলে। বাজ পড়েছিল যেন ইলেকট্রিক-টেকনিশিয়ানের মগজে।

ঈশ্বর! শুধু একটা শব্দ— ঈশ্বর! কিন্তু ঈশ্বর তো তার নাম নয়। নগণ্য মানুষ সে, তাকে তলব করাই বা হবে কেন? রানি ধূমাবতী ডাকছেন তাকে? অসম্ভব! রানি তার মতো হেঁজিপেঁজিদের সঙ্গে কথা বলবেন কেন?

অথচ, তার দেড় কেজি মগজের প্রতিটি কোষে নিনাদিত হয়েছে সেই আহ্বান— ঈশ্বর! আনো তাকে আমার সামনে... তোমার ঈশ্বরকে।

কে যেন তার মাথার মধ্যে থেকে বজ্রকঠিন স্বরে হুকুম দিয়ে গেল এইমাত্র— ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর! শূন্যগর্ভ বাতাসের মধ্যে থেকে এল সেই আদেশ। ঝিমুনি কেটে গেছিল ইলেকট্রিশিয়ানের, সবিস্ময়ে বলেছিল নিজেকে, 'রানি ধূমাবতীর সামনে আমি যাব কেন? কে আমি? আমার তলব পড়তেই পারে না। ঝিমোচ্ছিলাম— ভুল শুনেছি।'

সত্যিই তো, দুশো ফুট দূরে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র দাঁড়িয়ে আছেন রানি ধূমাবতীর সোনা আর হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি রত্নখচিত কেল্লায় সিংহাসনের সামনে। কুচকুচে কালো ব্যাসাল্ট পাথর চকচক করছে মেঝেতে— দুশো ফুট জুড়ে। এতদূর থেকে কেউ তাকে ডাকেনি। মন ঘূর্ণিপাক রচনা করেছে ব্রেনের মধ্যে— আচমকা 'ঈশ্বর' ডাক ডেকে তার ঝিমুনি ছুটিয়ে দিয়েছে।

কল্পনা! স্রেফ কল্পনা। মনের কারসাজি!

সোনালি চোখে নিঃসীম ব্যঙ্গ বিছিয়ে প্রফেসরের মুখপানে চেয়ে রইল রানি ধূমাবতী। এখন সেই চাহনির মধ্যে প্রকট হয়েছে অপরিসীম তাচ্ছিল্য।

প্রফেসর লোকটা তা হলে পয়লা নম্বর হামবাগ! কই, ঈশ্বর নামধারী মহাশক্তিকে তো আনতে পারেনি তার সামনে।

ব্যঙ্গ-কঠিন কণ্ঠে তাই বলেছিল প্রফেসরকে, 'বিদেয় হও। মনে রেখো ধূমাবতীর কানুন— এই পৃথিবীতে পাঁচজন মেয়ে পিছু থাকবে একজন ছেলে। যাও।'

খুব আস্তে প্রথমে পিছু হটে গেলেন প্রফেসর। অভিবাদন করার নিয়ম একটা আছে— মহারানিকে সম্মান না-জানিয়ে এই দরবার থেকে কেউ যেতে পারে না। তাই যন্ত্রচালিতের মতো ডান হাতটা ছুঁয়ে গেছিল নিজের কপাল, নিষ্প্রাণ সম্মান প্রদর্শন।

শরীর কিন্তু সিধে। অনেক পেছনে লগুড়ের মতো সটান দেহে দাঁড়িয়ে ছিল ছ'জন শাগরেদ। ছ'জন মানুষ। চলমান স্ট্যাচুর মতো তারা পেছন নিল প্রফেসরের। সেই সঙ্গে ইলেকট্রিশিয়ান। আটজনের মিছিল বেরিয়ে এল ঝকমকে ব্রোঞ্জের বিরাট প্রবেশপথ দিয়ে। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচের ঘাম-ছাওয়া লনে।

এইবার দ্রুত পদক্ষেপে ছ'জনের একজন এগিয়ে এল প্রফেসরের পাশে। বললে চাপা উদ্‌বিগ্ন গলায়, 'সত্যিই কি অর্ডার দিতে চলেছে মহারানি? পাঁচজন মেয়ে পিছু একজন ছেলে— এই হবে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর নরনারীর অনুপাত সংখ্যা?'

প্রফেসর নিশ্চুপ। ভাবগম্ভীর। কিন্তু ভয়ার্ত নন। ভয় তাঁর ধাতে নেই।

ব্যাকুল কণ্ঠে ফের শুধোয় প্রশ্নকর্তা, 'মনের শক্তিতে একদম বিশ্বাস নেই ডাইনি রানির!'

'কারণ,' বললেন প্রফেসর, 'ওদের জাতে এ-ধরনের উপকথা কেউ শোনেনি।'

প্রশ্নকর্তার নাম ধ্রুবক। ফের বললে, 'কিন্তু ও যে পাষাণী! প্রাণে মেরে পুরুষ-সংখ্যা কমাবে নিশ্চয়।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন প্রফেসর, 'তা করতে পারে। চলো, বাড়ি ফেরা যাক। তারপর বসা যাবে আলোচনায়। মহারানি মিছে ভয় দেখায় না। আইন খাটিয়ে তুলেও নেবে না। পুরুষ সংখ্যা কমাবেই এই পৃথিবীতে।'

নীরবে হেঁটে গেল আটজন সবুজ লনের ওপর দিয়ে। গাছে গাছে পড়ন্ত রোদ নেচে

চলেছে। মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ধেয়ে যাচ্ছে উড়ুক্কু যান— যাদের ডানা নেই পাখির মতো।

একটু একটু করে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল মহারানির রত্ন প্রাসাদ। লাখো লাখো হিরে গেঁথে তৈরি প্রাসাদ। সূর্যের আলো অতি-অদ্ভুত রোশনাই বিতরণ করে চলেছে বিচিত্র সুন্দর প্রাসাদ থেকে।

চওড়া পথ সহসা শেষ হয়েছে পাথর-বাঁধাই রাস্তায়। এতক্ষণ যে রাস্তা মাড়িয়ে এল এই ক'জন, সে-রাস্তা এমনই এক সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো যা রাত্রে জ্বলে, আলো ছিটিয়ে যায়— অন্ধকারের ছোঁয়া পেলেই।

পাথর-বাঁধাই পথের শেষে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট বাড়ি। শুরু হল মানুষের বসতি— পেছনে রয়ে গেল মহারানির এলাকা।

বিশেষ এই মানুষ-এলাকা নির্মিত হয়েছে মহারানির মহা-অভিযানের পর— পৃথিবীর সব ক'টা শহরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর।

পরমাণু বোমার প্রলয়ংকর লীলা সেদিন যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছিল পৃথিবীর মানুষ, সেভাবে কখনও করেনি। একটা-দুটো বোমা ফাটিয়ে শক্তির মহড়া চলছিল— পৃথিবী জুড়ে একসঙ্গে বৃষ্টির মতো মহারানির বোমা পড়ার আগে পর্যন্ত। শক্তিমত্ত রাষ্ট্রনায়কদের লম্ফঝম্প স্তব্ধ হয়ে গেছিল একদিনেই— পলকের মধ্যে। ধূলিসাৎ এইসব শহরে এখন অরণ্য মাথা চাড়া দিয়েছে— তাও মহারানির দৌলতে। সবুজ পৃথিবী যেন সবুজই থাকে। মণিরত্নখচিত সোনা আর হাতির দাঁতের সিংহাসনে বসে পড়ন্ত রোদ দেখেছিল রানি ধূমাবতী। দেখছে এখনও। বহু প্রজন্ম পেরিয়ে এল পৃথিবীর মানুষ। ধূমাবতী সেই ধূমাবতী। তার মরণ নেই।

লতা-ছাওয়া এক সাইজের বাড়িগুলোর পাশে পাশে গলি। সব গলিই শেষ হয়েছে একটা মস্ত চৌকোনা মাঠে। মাঠে খেলা করছে মানুষের ছেলেমেয়ে। স্কোয়ার ঘিরে সারি সারি দোকান। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষেরা চালিয়ে এসেছে এইসব দোকানপাট। এক কোণে পেল্লায় চেহারার এক সান্ত্রি দাঁড়িয়ে। সে মানব-সন্তান, কিন্তু তার বুকে আঁকা একটা দাঁড়িপাল্লা। ধূমাবতীর রানি-প্রতীক। এই চিহ্ন দেখলেই ভয়ে কুঁকড়ে যায় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ। সীমাহীন নিষ্ঠুরতার প্রতীক এই চিহ্ন। যাবতীয় পার্থিব পাশবিকতা আর বর্বরতাকে ম্লান করে দিতে পারে চিহ্নধারী এই সান্ত্রিরা।

শক্ত চোখে সে তাকিয়ে আছে সামনে। যেন দেখতেও পায়নি আটজন মানুষকে।

ধ্রুবক চাপা গলায় বললে প্রফেসরকে, 'হারামজাদা নজর রেখেছে আমাদের ওপর।'

স্বাভাবিক গলায় শুধোলেন প্রফেসর, 'পুলিশ মনে হচ্ছে? কী নাম?'

'হিটলার।'

মুচকি হাসলেন প্রফেসর. 'এ নাম কেন?'

'এইটাই তো এ-যুগের রেওয়াজ। হিটলার আর কেটলার, ফ্রাঙ্কেন্সটাইন নামও পাবেন। পাবেন অতিকায় আর প্রতিকায়, অন্ধক আর গন্ধক, উতঙ্ক আর আতঙ্ক, কালযবন আর কালভৈরব—'

'সব নামের মধ্যেই যে বিভীষিকা?'

'নইলে পুলিশের মতো পুলিশ হবে কী করে?'

শেষ হল স্কোয়ার। সরু গলির পর গলি পেরিয়ে একই সাইজের কালজীর্ণ, বহু শতাব্দীর ছাপ মারা বাড়ির পর বাড়ি পেরিয়ে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল ছোট্ট দল। এই বাড়িটাতেই প্রফেসরের আস্তানা আর অফিস।

বাড়িটার বয়স নির্ণয় করা কঠিন। নতুন করে তৈরি হয়েছে যুগে যুগে। প্রথম পত্তন ঘটেছিল চার হাজার বছর আগে— গড়ে দিয়েছিল মহারানি ধূমাবতী। মানুষ-নেতা দিয়ে মানুষদের নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্যে। এই মহাদেশের হেডকোয়ার্টার এইটা। এইরকম হেডকোয়ার্টার আছে প্রতিটি মহাদেশে— গড়ে দিয়েছে সেই সব মহাদেশের রানিরা।

কিন্তু এই হেডকোয়ার্টারের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, এই সদর দপ্তর মহারানির প্রাসাদ থেকে অনতিদূরে। তার ইচ্ছা রূপ পায় এই সদর-দপ্তর থেকেই, পৃথিবীর অন্য সব মহাদেশের সদর-দপ্তর মুখ উঁচিয়ে থাকে এখানকার হুকুম শোনবার জন্যে।

যে হুকুম স্বয়ং মহারানির হুকুম। মানুষকে দিয়ে মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখার সবসেরা পন্থা।

চার হাজার বছর ধরে চলছে একই প্রক্রিয়া। অতর্কিত আক্রমণে নিকেশ হয়েছিল পৃথিবীর চার-পঞ্চমাংশ মানুষ। আস্ত থাকেনি কোনও শহর। বাকি মানুষদের টিকিয়ে রাখা হয়েছে স্রেফ স্বার্থের জন্যে। পৃথিবীকে ভোগ করতে হলে গোলাম দরকার। সেই কারণে, স্রেফ খিদমতগার।

তাদের মধ্যেই ইলেকশন করিয়ে নেতা-নির্বাচন করিয়েছে মহারানি। সেই নির্বাচিতদের অনেক কিছু দিয়েছে। ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি। যার অপর নাম বকলশ। বকলশ পরিয়ে, চেন হাতে রেখে, পৃথিবীকে পায়ের তলায় রেখেছে মহারানি। চার হাজার বছরেও বিদ্রোহ-বিক্ষোভের তিলমাত্র দেখা যায়নি।

কারণ, মানুষ জেনে এসেছে, চার হাজার বছর ধরে জেনে এসেছে, মহারানি ধূমাবতী অমানবী তো বটেই, অমানবিকতায় অপ্রতিম।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে ইলেকশনে জিতিয়ে মহারানিই নিয়ে এসেছে সদর-দপ্তরে।

কিন্তু খটমট সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তারপর থেকেই। কবজায় রাখা যাচ্ছে না এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে।

আজকেই তার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এসেছে প্রফেসর— মহারানির সামনেই।

পেল্লায় বাড়িটার অগুন্তি সুড়ঙ্গের একটা সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে হেঁটে মস্ত একটা ঘরে পৌঁছেছিল আটজনের দল। ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট মেহগনি কাঠের টেবিল— টেবিলের ওপরের কাঠটাই চার ইঞ্চি পুরু। টেবিল ঘিরে সাতখানা পেল্লায় পিঠ-উঁচু চেয়ার।

মূল সদর-দপ্তরের মিটিংঘর। একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। অন্যান্যরা একে একে দখল করল এক-একটা চেয়ার। মূক প্রত্যেকেই। ভারাক্রান্ত মন প্রত্যেকেরই।

নড়বড়ে চেহারার শ্রীহীন পোশাক পরা আখাম্বা বিদ্যুৎ-কর্মী সবশেষে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেল এককোণে। তন্ময় হয়ে নাড়াচাড়া করে গেল হাতের যন্ত্র-বাক্সের যন্ত্রপাতি।

ঘরে বিরাজ করছে থমথমে আবহাওয়া।

প্রথম মুখ খুললেন প্রফেসর। বললেন মৃদু স্বরে, 'মহারানি বাজিয়ে নিল আমাকে। আমার ওপর বিশ্বাস আর নেই। নামেই নির্বাচিত নেতা— আসলে পুতুল। কিন্তু আমি যে তা নই, তা বুঝিয়ে দিলাম।'

একটু থামলেন প্রফেসর। বললেন তারপর, 'অসীম আয়ু এই ধূমাবতীর। পৃথিবীর হিসেবে অন্য রানিদের আয়ু দশহাজার বছর পর্যন্ত, কিন্তু মরণ নেই মহারানির। এই গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করেই নিজেদের গ্রহ ছেড়েছে মহারানি— দাসী বানিয়ে রেখেছে অন্য সব রানিদের। কিন্তু আজ তাকে চিন্তায় ফেলে এলাম মানুষের মনের শক্তির ক্ষমতাটা জানিয়ে।'

'ঈশ্বর!' বিড়বিড় করে বললে ধ্রুবক, 'মানুষের মনের শক্তির সংহত রূপ— তছনছ করে দিতে পারে মহারানির সমস্ত ভেলকিবাজি।'

ইলেকট্রিশিয়ানের দিকে মুখ ফেরালেন প্রফেসর, 'আমাদের কথা কি মহারানির কানে পৌঁছোচ্ছে?'

কুলুঙ্গিতে জ্বলছে একটা পরমাণু-প্রদীপ। সেইদিকে আঙুল তুলে ইলেকট্রিশিয়ান বললে, 'ওকে কন্ট্রোলে রেখেছি।'

'কীভাবে?' প্রফেসরের প্রশ্ন।

দেঁতো হেসে বললে টেকনিশিয়ান, 'আমরা যেমন শব্দ শুনি, মহারানি তেমনি বেতার তরঙ্গ শুনতে পায়। রানিরাও শোনে। তাদের শোনানোর জন্যেই ছোট্ট একটা রেডিয়ো ট্রান্সমিটার থেকে খুব নিচু খাদে হামিং ঠিকরে যায়— প্রোজেক্টরের অ্যাটমিক পাওয়ার চালু রাখে ট্রান্সমিটার। আমরা যখন কথা বলি, কথার স্বর-তরঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে ছোট্ট একটা ক্রিস্টাল— যাতে তা শোনবার উপযুক্ত হয়ে গিয়ে পৌঁছোয় রানিদের কানে। আমি বসিয়ে রেখেছি একটা খুদে এরিয়েল— ক্রিস্টালের কাজ কেটে দিচ্ছে, যা যাচ্ছে রানিদের কানে তা শ্রুতিগ্রাহ্য নয়। এরিয়েল সরিয়ে নিলেই সব শুনতে পাবে। নেব কি?'

খেপে গেল ধ্রুবক, 'ননসেন্স। তুমি একটা ট্রান্সমিটারে এরিয়েল বসিয়েছ— আরও অনেক ট্রান্সমিটার লুকিয়ে রাখা হয়নি তো?'

'ওই একটাতেই কাজ হয়ে যাচ্ছে' অভয় দেয় টেকনিশিয়ান, 'এ-ঘরের কোনও কথাই রানিদের মাথায় পৌঁছোচ্ছে না।'

'তা হলে তো মিটেই গেল,' প্রফেসরের দিকে মুখ ফেরায় ধ্রুবক, 'আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাল মহারানি, অথচ আপনি ঈশ্বরকে মূর্ত করলেন না। কেন?'

'কারণ সে জানে, আমি ভয় দেখাচ্ছি— আসলে, করব না কিছুই। করার সাহস নেই বলে আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই সাহস দেখায়নি— মহারানি তা দেখে এসেছে গত চার হাজার বছর ধরে। মানুষের আয়ু সীমিত— কিন্তু মহারানি পৃথিবীতে আসবার আগে কত হাজার বছর বেঁচে ছিল তা শুধু সে জানে— বাঁচবে কত বছর তাও সে জানে। আয়ু যাদের এত কম, তাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কেন মহারানি? ফুঁ দিলেই তো মিলিয়ে যাবে?'

গুম হয়ে গেল ধ্রুবক। সত্য চিরকাল অপ্রিয় হয়।

বলে গেলেন প্রফেসর, 'এই যে তোমার মাথায় রুপো আর এনামেলের ব্যাজ এঁটেছ, কেন এঁটেছ? সেরা মানুষের পদক, তাই তো? আসলে গোলামির শিরোপা। এক সময়ে বাংলার বণিকদের ঝালরওয়ালা পালকি চড়ার অনুমতি দিত দিল্লির বাদশা। এই একই কারণে। আমি খুলে রেখেছি, সব্বাই খুলে রেখেছে— তুমি ভুলে গেছ।'

মাথা হেঁট হয়ে গেল ধ্রুবকের।

অভয় দিলেন প্রফেসর, 'তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না, রানিরও কোনও লাভ হচ্ছে না। কেননা, তোমার ওই ব্যাজের প্রতীক আমি ফোঁপরা করে ওর ভেতর থেকে আসল যন্ত্রটা বের করে নিয়েছি। এখানে যারা আছে, প্রত্যেকের মাথার শিরোপা আসল কাজ আর করছে না। তোমার মগজ-কোষের কম্পন তাই ধরতে পারেনি রানি। কিন্তু ঘাবড়ে গেছে আমার মনের শক্তির খবরটা শুনে। এই প্রাচীন বিজ্ঞান সুদূর অতীতের মানুষদের অজানা ছিল না। তাদের উজবুক বংশধররা অতি-জ্ঞানের অহংকারে অতীত জ্ঞানকে থুৎকার দিয়েছিল। রানি কিন্তু মানব মনের এই ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করে, মানুষেরই ভুলে যাওয়া পুঁথি ঘেঁটে, টেলিপ্যাথি ইন্সট্রুমেন্ট বানানোর চেষ্টা করে চলেছে। আজও পারেনি। শত্রুকে ছোট করে দেখতে নেই।' মাথা হেঁট করে রইল ধ্রুবক। প্রফেসরকে তখন বক্তৃতারোগে পেয়েছে, 'কিন্তু আমার ব্রেনের নাগাল ধরতে পারেনি— ধোঁকায় রয়েছে, ভয় পেয়েছে এই কারণেই। কারণ, সে বুঝেছে, আমি আমার টেলিপ্যাথি খাটিয়ে চলেছি তার মনেব ওপর।'

মিচেল বললে, 'বুঝলাম। কিন্তু পাঁচজন মেয়ে আর একজন মাত্র ছেলে— এই অর্ডার চালু হলে তো বিদ্রোহের আগুন আরও বেশি জ্বলবে।'

প্রফেসর বললেন, 'অর্ডার চালু করতে হলে কী করতে হবে রানিকে?'

'প্রতি পাঁচজন ছেলের মধ্যে চারজনকে মেরে ফেলতে হবে। সেই চারজনের আত্মীয়রা নিশ্চয় চুপ করে বসে থাকবে না। পৃথিবী জুড়ে অশান্তি আসবেই।'

প্রফেসর হাসলেন, 'রানি এত বোকা নয়। পুরুষে পুরুষে দাঙ্গা বাধাবে রানির কুত্তা-পুলিশরা। তারপর দেখবে, ওই পুলিশই দাঙ্গা থামাবে। রানির জয়-জয়কার শুরু হবে, পৃথিবী হালকা হবে। রানি কিন্তু বেঁচে থাকবে— তার মরণ নেই। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি চালিয়ে আজও সে পৃথিবীর অধীশ্বরী।'

ধ্রুবক বললে, 'মহারানির উদ্দেশ্য কিন্তু মেয়েদের দিয়ে পৃথিবীকে শাসন করা, ছেলেদের গোলাম বানিয়ে—'

হেসে বললেন প্রফেসর, 'আমার তা অজানা নয়। অনেক চাতুরিই সে খেলে এসেছে চার হাজার বছর ধরে— এইবার ঘটবে অবসান।'

ঘরে এখন ইলেকট্রিশিয়ান আর প্রফেসর ছাড়া কেউ নেই। প্রফেসর বললেন, 'তুমিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। যন্ত্র মুঠোয় তো? ঈশ্বরকে মূর্ত করতে পারবে?'

ইলেকট্রিশিয়ান হাসে, 'এতক্ষণ খুটখাট করছিলাম সেইটাই দেখতে। মানুষ খেপেছে— গোটা পৃথিবীতে। মনের শক্তি এক করে দিচ্ছে এই মেশিন। আরও লাখ লাখ মেশিন।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার সমস্ত কেরামতি সেইসব মেশিন আর এই মেশিনে— অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি।'

'এই মিটিং ঘরে তুমি আর আসবে না। সাধারণ মিস্ত্রি তুমি, তফাতে থাকো। হিটলার তোমাকে শেষ করে দেবে।'

হিটলার সেই মুহূর্তে হাজির হয়েছে চিন্তাচ্ছন্ন মহারানির সামনে, 'ওরা দল বেঁধে তো মিটিং করতে গেল। খবর আসছে?'

ধূমাবতীর সোনালি চোখে দুশ্চিন্তা, 'একেবারেই না। আমার রিসিভার পর্যন্ত কাজ করছে না।'

'তা হলে আমাকে কাজ করতে দিন। হাতিয়ার দিন।'

'হাতিয়ার তৈরি। ক্রিস্টাল ক্রাউন আর গ্লো বিম।'

'তাদের কাজ?'

'ক্রিস্টাল ক্রাউন মাথায় পরে থাকলে শত্রুর মারাত্মক রশ্মিও ঘায়েল করতে পারবে না। গ্লো বিম-এর আভা যা ছোঁবে, তা শূন্যে বিলীন করে দেবে।'

বিনীত গলায় হিটলার বললে, 'কিন্তু আপনি তো ক্রিস্টাল ক্রাউন মাথায় পরেননি।'

ঝিলিক খেলে গেল মহারানির সোনালি চোখে, 'কারণ, আমার মন বলছে, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যে মন-দানব বানিয়েছে মানুষের মনের শক্তি দিয়ে, ক্রিস্টাল ক্রাউন তাকে রুখতে পারবে না।'

প্রফেসর মেয়েদের সভা ডেকেছেন।

তাদের নায়িকার নাম চন্দ্রাবতী। খুব লম্বা নয়, খুব বেঁটেও নয়। সে বললে, 'এ কী শুনছি? মহারানি ছেলেদের মারবে? আমরা তা হতে দেব না। এই পৃথিবীতে ছেলে-মেয়ে প্রায় সমান সমান— চিরকাল যা ছিল, তাই থাকবে।'

প্রফেসর বললেন, 'কিন্তু ধূমাবতী যে-গ্রহ থেকে এসেছে, সে-গ্রহে যে ছেলেরা সংখ্যায় খুবই কম—'

'আমরা মানুষ। অন্য গ্রহের কিম্ভূতকিমাকার নই। আমাদের ছেলেদের বাঁচান।'

একটা কাচের ছোট বয়েম ছিল প্রফেসরের সামনের টেবিলে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'জ্যোৎস্না রাতে এই ক্রিম সারা গায়ে মেখে চাঁদের আলোয় গিয়ে দাঁড়াবে।'

'কী হবে তখন?'

'চাঁদের আলো তোমাদের ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে।'

'মানে?'

'তোমাদের আর দেখা যাবে না। অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

'মুন ক্রিম? ভ্যানিশিং ক্রিম?'

'হ্যাঁ। ক্রিম মেখে ছায়ায় যখন দাঁড়াবে, তখন তোমাদের আবছাভাবে দেখা যাবে।'

'কায়াহীন মনে হবে? প্রেত-প্রেতিনীদের অবয়ব যেমন হয়?'

'হ্যাঁ।'

এর পরের ঘটনা ঘটাতে সময় বেশি লাগেনি। মুন ক্রিমের ট্রায়াল দেওয়া হয়েছিল ধূমাবতীর নিজস্ব শহরে। পূর্ণিমার রাতে টহল দিতে বেরিয়ে মহারানির তকমা আঁটা পুলিশ-পুঙ্গবরা দেখেছিল গাছের তলায় আঁধারে নড়ছে ছায়ামূর্তি। থমকে দাঁড়িয়ে গেছিল পুলিশ। হেঁকে বলেছিল, 'কে ওখানে?' জবাব পায়নি। নিক্ষেপ করেছিল গ্লো বিম— আভারশ্মি ছায়ামূর্তিদের ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছিল। ছায়াময় অবয়বীরা বিলীন হয়নি। তারপরেই তারা সটান বেরিয়ে এসেছিল চাঁদের আলোয়— মিলিয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ!

আতঙ্কে চেঁচাতে চেঁচাতে পুলিশ-পুঙ্গবরা দৌড়ে গেছিল মহারানির সামনে...

স্থির হয়ে গেছিল ধূমাবতীর সোনালি চোখ। দু'দিন দু'রাত সে ঘুমোয়নি প্রফেসরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে। পাতাল-গবেষণাগারে তন্ময় হয়ে থেকেছে মন-দানবকে টক্কর দেওয়ার গবেষণায়...

কিন্তু তা রইল আধা-খ্যাঁচড়া অবস্থায়। মন-দানবকে এখনও দেখা যায়নি— কিন্তু দেখা দিয়েছে ছায়া-দানবরা! এখন উপায়?

দক্ষিণ আমেরিকার এক দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে হাজির হয়েছে রানি ধূমাবতী। একা। কারণ, এ-জায়গা সে নিজে আবিষ্কার করেছে তার বৈজ্ঞানিক কারিগরি দিয়ে। হাজার হাজার বছর আগে এখানে ছিল সোনার খনি আর সোনার গুঁড়ো মেশানো সোনার নদী। চারদিকে উঁচু উঁচু অতি দুর্গম পাহাড়ে ঢাকা। এমনই খোঁচা খোঁচা থামের মতো সেই পাহাড় যেন পাথরের বৃক্ষ অরণ্য— যা ভেদ করে এখানকার আদিম অধিবাসী মায়া প্রজাতির সাধারণ মানুষরাও সেখানে যেতে পারেনি।

কিন্তু রহস্যময় মায়া-মানুষরা এই পৃথিবীর অনেক প্রহেলিকার সমাধান ঘটিয়ে একদা দুর্দান্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের স্বর্ণভাণ্ডার ছিল ঈর্ষণীয়। তাদের প্রভাব ছিল কিংবদন্তিসম। তারা ছিল দুর্জয়, দুর্ধর্ষ, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে শক্তিমান।

তাদের এই কল্পনাতীত সোনার পাহাড়, যা ছিল সোনার নদী দিয়ে ঘেরা— তাকে সুরক্ষিত করে রেখেছিল উঁচু উঁচু মিনার বানিয়ে। আলগা আলগা পাথরের চাঁইয়ের পর চাঁই বসিয়ে। আশ্চর্য হিসেবি আর স্থাপত্যবিদ্যায় অবিশ্বাস্যভাবে অগ্রণী এই মায়া-বৈজ্ঞানিকরা পাথরের ওপর পাথর চাপিয়ে, মিনারের পর মিনার প্রাচীর গড়ে, চাঁই চাঁই সোনার পাথর দিয়ে, প্রকৃতির হাতে গড়া সোনার পাহাড়কে সুরক্ষিত করেছিল এমনই একটা সূক্ষ্ম হিসেবের ভিত্তিতে— যে হিসেবে একচুল গরমিল ঘটলেই পাথরের ভিতে কাঁপন জাগবে, চাঁই চাঁই পাথর স্থানচ্যুত হবে, মিনার ধসে পড়বে, প্রাচীর ধূলিসাৎ হবে, গুহাপথ অবরুদ্ধ হবে, পথ নিশ্চিহ্ন হবে, সোনার নদী পথ হারিয়ে ফল্গু নদী হয়েই ছিল সোনা এলাকার বাইরে— ভূকম্পন ঘটলে তা চিরতরে পাতালে তলিয়ে যাবে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে সোনার পাহাড়কে চাঁই চাঁই সোনা সমেত, বিশাল বিশাল সোনার বোল্ডার সমেত। মা ধরিত্রী তার স্বর্ণালংকার টেনে নেবে নিজস্ব নিকেতনের স্বর্ণভাণ্ডারে।

তাই হয়েছিল মহারানির পৃথিবী দখলের আগে। লোলুপ সোনা অভিযাত্রীরা নিষিদ্ধ সেই

অঞ্চলে ঘোড়া ছুটিয়ে হানাহানি রক্তারক্তি বন্দুকবাজির মহড়া দিয়ে গেছিল। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির মুহুর্মুহু নির্ঘোষে ঘনঘন প্রকম্পিত হয়েছিল আলগা আলগা পাথরের ওপর পাথর চাপানো সুউচ্চ মিনারসমূহ— কম্পনসীমা অতিক্রম করলেই যা খসে পড়বে ভেঙে ফেলবে গোটা সোনার পাহাড়টাকে— মা ধরিত্রীর সোনার মুকুটকে। টেনে নিয়ে যাবে ধরণীর গভীর গোপন তোশাগারে।

নিমেষে কেঁপে গেছিল গোটা তল্লাটটা। সূক্ষ্ম হিসেবে গড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছিল আপনা হতেই। লহরীর পর লহরী জাগিয়েছিল অশ্বক্ষুরধ্বনি সম্মিলিতভাবে— কেঁপে কেঁপে উঠেছিল প্রতিটি পাথর, প্রতিটি সুড়ঙ্গ, প্রতিটি মিনার, প্রতিটি প্রাচীর।

পরিণাম? পাহাড়ি পথ তলিয়ে গেছিল পাতালে, মিনার আর প্রাচীর ধেয়ে গেছিল পেছন পেছন। সবশেষে আস্ত সোনার পাহাড়টা সোনার নদী সমেত চিরতরে প্রস্থান করেছিল ধরিত্রীর গোপনতম কন্দরে যে কন্দরের ঠিকানা আর পায়নি পরের যুগের মানুষরা।

তাদের শুধু মনে ছিল, পলাতক লোভী অভিযাত্রীদের মুখের বর্ণনা... লোমহর্ষক বর্ণনা... বহু মাইল দূর থেকেও দেখা গেছিল সোনার ধুলো মেঘের আকারে ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে নীল আকাশের দিকে— সোনার পাহাড়ের পাতাল প্রবেশের পরিণামে...

এই কাহিনি কিংবদন্তি আকারে মুখে মুখে ফিরেছে গোটা আমেরিকায়। অবিশ্বাস্য সেই কাহিনি নিয়ে পরে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে— ভুবনবিখ্যাত সেই ছায়াছবি 'ম্যাকেনাস গোল্ড' নিরুদ্ধ নিশ্বাসে রেখে দিয়েছিল দুনিয়ার দর্শককে।

মহারানি ধূমাবতী ধরিত্রী লুঠ করার প্রারম্ভে অতুলনীয় এই স্বর্ণভাণ্ডারে পুনঃপ্রবেশের পথ আবিষ্কার করে নিয়েছিল নিজের বুদ্ধিমত্তা আর জ্ঞান-ঐশ্বর্য দিয়ে— যা পারেনি তার আগেকার কোনও মানুষ স্যাটেলাইট থেকে মেট্যাল নিরীক্ষণের কোনও যন্ত্রপাতি দিয়েও।

তারপর, এই পাতাল ভাণ্ডারে গড়ে তুলেছিল নিজের বীক্ষণাগার— সুবিশাল ল্যাবরেটরি, মানুষেরই অতীত জ্ঞান-ঐশ্বর্যের পুঁথি আর প্রস্তর ফলকে ঠাসা লাইব্রেরি... সে গ্রন্থাগারে মন-রহস্য নিয়ে খোদাই করা প্রস্তর-ফলক আছে বিস্তর। বেশির ভাগই ভারতীয় যোগীদের কীর্তি— সংস্কৃত ভাষায়।

নিথর নিস্তব্ধ এই পাতাল-স্বর্ণপুরীতে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে মহারানি ধূমাবতীকে তার নিজের গ্রহে। যে-নামে নামডাক করেছিল পৃথিবী গ্রহে এসে সে নাম চেপে গেছে এই করাল-কন্যা।

পাতালপুরীর নির্জন নিস্তব্ধ সুবিশাল রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুবিস্তৃত গবেষণা চলেছে সম্পূর্ণ অটোমেটিক পন্থায়। কুটিলা এই কামিনী কাউকেই বিশ্বাস করে না। এমনকী যে আটজন ভিনগ্রহী রানিকে নিয়ে নৃশংসতম নারকীয় বোম্বেটেগিরি চালিয়ে পৃথিবীর শহরের পর শহর চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে উড়িয়ে দিয়েছিল বৃষ্টিধারার মতো অ্যাটম বোমা বর্ষণ করে, তাদেরকেও ঢুকতে দেয় না এই মহাগবেষণাগারে। তার মন্ত্রগুপ্তির উদ্ভাবন এইভাবে— যেখানে ওপরে সোনা, পাশে সোনা, নীচে সোনা।

সোনার একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। সেকালের মানুষ-গুপ্তবিজ্ঞানীরা সে সংবাদ রাখত। এখনকার মানুষ তা বিস্মৃত। অণু-পরমাণুর মধ্যে বিস্মৃত ব্রহ্মাণ্ড-কাঁপানো সেই মহাশক্তির

সন্ধান পেয়েছে মহারানি। এখন এসেছে নিভৃত আলয়ে সেই শক্তির কাছে ভিক্ষা চাইতে...

ভিক্ষা একটাই। প্রফেসর নামক মনুষ্যটি যে মনদানবের হুমকি দিয়ে গেল প্রকাশ্য সভায়, তা কি স্বর্ণশক্তির দৌলতে সৃষ্ট? সোনার গ্রহ এই পৃথিবীতে কি সৃষ্টির শুরু থেকেই এই শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে মানুষের মনের মধ্যে? সমস্ত শুভ কাজে তাই কি সোনার বিধান দিয়ে গেছিল পৃথিবীর প্রথম গুহাবিজ্ঞানীরা?

বিকটাকার ধূমাবতী যখন তার জটিল যন্ত্রপাতি আর রাশিরাশি পুঁথিপত্র নিয়ে এই ধ্যানে নিমগ্ন, ঠিক তখনই তার সামনে... ঠিক তার সামনে... একটু একটু করে কায়াগ্রহণ করে চলেছিল মন নামক বিপুল শক্তি...

ভিনগ্রহী সেই রমণী, বয়সের যার গাছপাথর নেই, সে তখন বসে ছিল তার চোখধাঁধানো সিংহাসনে— যে-সিংহাসনে মণিরত্নের আশেপাশে ফিট করা ছিল বিবিধ অস্ত্র যা মহাভারতে বর্ণিত অস্ত্রশস্ত্রকেও লজ্জা দিতে পারে। বিশাল গুহামন্দিরে জ্বলছিল সারবন্দি অ্যাটম শিখা। সদ্য সূর্যালোকের মতো আলোকিত হয়েছিল পাতালপ্রদেশ।

অত্যুজ্জ্বল সেই দ্যুতির মাঝে সহসা আবির্ভূত হয়েছিল একটা আবছা, অগুস্তি রন্ধ্রময় বস্তু। সঞ্চরমান কায়া। নিরতিসীম তমিস্রায় গড়া। মেঝের ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে যাচ্ছিল চলমান যে প্রত্যঙ্গ দুটির ওপর ভর দিয়ে, সে দুটিকে মনুষ্য-পদ বলা যেতে পারে অনেক ঠাহর করার পর— যদিও নর-চরণের সঙ্গে তাদের প্রভেদ আছে বিস্তর।

বিপুলকায় সেই ছায়া-কায়া অগ্রসর হয়েছিল মন্দগতি পদক্ষেপে— কিন্তু ধরণীতল প্রকম্পিত করে। শব্দ জেগেছিল ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ! যতই অগ্রসর হয়েছে ততই ঘনীভূত হয়েছে তার ছায়া-অবয়ব, ততই গর্জমান হয়েছে তার প্রতিটি পদক্ষেপ... নিছক ছায়া দিয়ে গড়া নিরেট তমিস্রা এইভাবে ধরণী কাঁপায় কী করে, সেই গবেষণা নিয়ে মস্তিষ্ক আলোড়িত করতে পারেনি ভিনগ্রহী নিঠুরা সেই রমণী।

কোটর থেকে চক্ষু তখন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে সুরক্ষিত এই পাতাল প্রদেশে এহেন বিভীষিকার অকস্মাৎ আবির্ভাব দেখে। সে আসছে, সে আসছে, আসছে। তার বিশাল মুণ্ডে কোনও প্রত্যঙ্গ সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু মুণ্ড ঘিরে লেলিহ অনেকগুলো জেট-ফ্রেম— যেন, নরকাগ্নি। তার মুখাবয়বে সুস্পষ্ট নয় কোনও প্রত্যঙ্গ— চোখ, নাক, কান, মুখবিবর— কোনওটাই নিরেট বা স্পষ্ট নয়। মুহুর্মুহু জেগে উঠেই যেন মিলিয়ে যাচ্ছে গলন্ত ছায়া আর মায়ার মধ্যে। সে আসছে, সে আসছে, সে আসছে। পদহীন পদক্ষেপ যেখানে যেখানে ঘটিয়ে যাচ্ছে, সেই সেই জায়গায় ঝরে ঝরে পড়ছে তুষারকণা... কালো অন্ধকারে ঝিকিয়ে উঠছে সাদা বরফকুচি... তুষার-পুষ্প!

ধীরে, অতি ধীরে, সে আসছে... এগিয়ে আসছে... তাড়াহুড়ো নেই বিন্দুমাত্র...

টলছে... তবুও আসছে... সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে বাতাসের ফিসফিসানি... বাতাস যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে উঠছে তার কৃষ্ণকালো অপার্থিব অবয়ব ঘিরে... এহেন কায়া-কে বুঝি বরদাস্ত করতে পারছে না— তাকে ভেদ করেও যেতে পারছে না... তাই প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে ফিসফিসিয়ে... গুঙিয়ে গুঙিয়ে।

সিংহাসনে আসীন ভিনগ্রহী রমণী মণিময় ছোট্ট একটা বোতাম স্পর্শ করেছিল কম্পিত আঙুলে...

ঝট করে খুলে গেছিল বহু ঊর্ধ্বে একটা বাতায়ন— উন্মুক্ত হয়েছিল পর্বত-ছিদ্র— সকালের সূর্যরশ্মি বিপুল তেজে রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে আছড়ে পড়েছিল ছায়া-দানবের ওপর।

অদৃশ্য হয়ে গেছিল ছায়া-গাত্র স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে। তমিস্রা-কায়া বুঝি নিঃশেষে পান করে নিয়েছিল আলোক-স্রোত। তনুবর ছিল যে তমিস্রায়, রয়ে গেল সেই তমিস্রায়।

ফিসফিসানি জাগ্রত হয়েছিল ভিনগ্রহী রমণীর অপার্থিব অধরোষ্ঠে, 'ঈশ্বর!'

ঠিক তিরিশ ফুট তফাতে, সিংহাসন থেকে তিরিশ ফুট ব্যবধানে, স্তব্ধ হয়ে ছিল বিশালকায় তমিস্রা-দানব। বিপুল বাহু দুলে দুলে গেছিল মস্ত কলেবরের দু'পাশে। সম্মোহিতপ্রায় মহারানি একটু নড়তে গেছিল— সভয়ে স্থাণু হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ অজানা আতঙ্কে। গলা চিরে বেরিয়ে এসেছিল ক্ষীণ আর্তধ্বনি— বিপুল প্রয়াসে সেই ধ্বনির কণ্ঠরোধ করেছিল বি-পৃথিবীনি।

মগজ দিয়ে শুনেছিল প্রায় বিশফুট লম্বা ছায়া-দানবের শীতল হুমকি, 'বিদেশিনী, ভিনগ্রহবাসিনী, এই পৃথিবীতে শাসন কায়েম করার কোনও অধিকার তোমার নেই। তোমরা আর এই পৃথিবীর মানুষেরা একেবারেই ভিন্ন বস্তুতে গড়া। শাসন করা চলবে না এই পৃথিবীকে।'

নিরুত্তরে থাকলেও আর নিষ্ক্রিয় রইল না ভিনগ্রহী রমণী। আঙুল সরে গেল বিদ্যুৎগতিতে— যেন তর্জনীর ছোবল বসল সিংহাসনের একটা মণিময় বোতামে।

আতীব্র ঝলকে একটা রশ্মিরেখা ধেয়ে গেল সিংহাসনে খোদিত একটা হাঙর-মুখ থেকে— সটান সেই ছায়া-দানবের দিকে— তার বক্ষদেশ লক্ষ্য করে। বাতাস বুঝি গুঙিয়ে উঠল ঝলক বেগে। সরু পেনসিলের মতো কল্পনাতীত এনার্জির স্রোত কিন্তু গুঙিয়ে উঠেছিল আঁধার-মূর্তির বক্ষ-পিঞ্জর স্পর্শ করেই— শতধাচূর্ণ হয়ে ঠিকরে গেছিল দিকে দিকে। বিচূর্ণ আলোককণার বিপুল ফুলঝুরি ঝরিয়ে। নিরস্ত হয়নি মহারানি। একই মণিময় বোতামে চাপ দিয়ে গেছিল মুহুর্মুহু। অগুন্তি মারণ-রশ্মি ছুটে ছুটে গিয়ে লেলিহ হয়েছিল ছায়া-দানবকে ঘিরে—

কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। সব তেজ-রশ্মি নিস্তেজ হয়ে গেছিল কল্পনাতীত ওই কায়ার সামনে গিয়েই।

তবুও হাল ছাড়েনি মহারানি। অমিততেজা সেই রমণী— বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপে পটিয়সী সেই হৃদয়হীনা রমণী— উপর্যুপরি বোতাম টিপে গেছিল সিংহাসনের নানান জায়গায়। ঝলকে ঝলকে রকমারি মারণ রশ্মি তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়েছিল বিপুলকায় সেই আঁধার অতিকায়কে ঘিরে। কিন্তু স্পর্শ করতে পারেনি, সূচ্যগ্র দহনও জাগাতে পারেনি— বিধ্বংসী ক্রিয়া তো দূরের কথা। পেনসিলের মতো সরু কিন্তু আতীব্র রশ্মিরা ছুটে ছুটে গিয়ে ছিটকে ছিটকে মিলিয়ে গেছে শব্দহীন আর্তনাদে— কল্পনাতীত সেই কায়ার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি।

সগর্জনে ধেয়ে গেছে পারমাণবিক প্রচণ্ডতা, মূর্তিমান ধ্বংস— কিন্তু বারে বারে প্রতিহত হয়ে ঠিকরে গেছে পাশ দিয়ে... কালো ছায়া করাল রূপেই বিরাজ করে গেছে মহারানির সামনে... অক্ষত অব্যয়... নিশ্ছিদ্র!

বিধ্বংসী রশ্মিদের তাণ্ডবলীলা তো ঘটছেই না, উপরন্তু প্রতিটি রশ্মিরেখা যেন এঁকেবেঁকে পলাতক হয়ে বিলীন হচ্ছে... বর্ণনাহীন এই কালান্তক কালো কায়াকে স্পর্শও করতে চাইছে না!

সগর্জনে ধেয়ে যাওয়া রশ্মিসমূহের তাণ্ডব নৃত্য একসময়ে স্তব্ধ হয়েছিল— হিসহিসানির ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি পাতালপুরীতে এক সময়ে মরে গেছিল। তারপর মুখর হয়েছিল কৃষ্ণকায় বিভীষিকা...

শব্দহীন কণ্ঠস্বর... যেন একটা মহা-অর্গানের রুদ্র-সংগীত... অথচ, সে সংগীতে নেই তিলমাত্র স্বরমাধুর্য!

সে বলেছিল, 'আমি বস্তু নয়, বস্তু শক্তিও নই— তোমার ওই গাদা গাদা শক্তি বিচ্ছুরণের মতো... আমাকে তাই ওরা ছুঁতে পারেনি... ধ্বংস করা তো দূরের কথা। তোমার জ্ঞান, যে-গ্রহ থেকে তোমার আবির্ভাব, সেই গ্রহের জ্ঞানের খামোকা অপচয় ঘটিয়ে চলেছ আমার ওপর। তুমি একা, আর তোমার আট সঙ্গিনী, আর আমি এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মন। বহু শতাব্দী, বহু প্রজন্ম পেরিয়ে এসে মানুষ যে মনের শক্তি অর্জন করেছে, আমি-ই সেই সমগ্র শক্তির সংহত রূপ— দানা বাঁধা মনের শক্তি... ইচ্ছাশক্তির ক্রিস্টাল... স্বপ্নে যা দেখা যায়— তার রূপায়ণ। আমিই মানবতা... মূর্ত মনুষ্যত্ব... তাদের ইচ্ছাশক্তির অস্ফুট অবয়ব। কোনও শক্তি, কোনও রশ্মি, কোনও বস্তু আমাকে স্পর্শ করতেও অক্ষম!'

অগণন স্বর্ণময় পাতাল গহ্বরের প্রতিটি পরমাণু বুঝি নিনাদিত হয়েছিল আতঙ্ক জাগানো সেই করাল কণ্ঠস্বরে। সে দুলছে... মহাকায় বিভীষিকা দুলছে, এবং... ক্রমশই বুঝি আরও নিরেট হয়ে যাচ্ছে তার প্রহেলিকা-বপু...

সে বলে যাচ্ছে... অথবা তার বক্তব্য বাতাসে শব্দের রূপ নিয়ে উপর্যুপরি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে...

'এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস মহাকাশ ইথার ছেয়ে রয়েছে মৃত্যুহীন এনার্জিতে— মানুষের ভাবনা চিন্তার শক্তিতে... অবর্ণনীয় সেই শক্তির ঠিকানা... সেই এনার্জির স্বরূপ তোমার অজানা। মানুষ মরেছে, তাদের ইতিহাস কিন্তু সুপ্ত শক্তি হয়ে রয়ে গেছে সূক্ষ্ম জগতে... প্রাচীন বিজ্ঞানীরা... সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা অকল্পনীয় এই এনার্জির সন্ধান জানতেন... তাঁরা আরও জানতেন... ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে রয়েছে যে এনার্জি... যে এনার্জির নাম ফোহাত... সেই এনার্জিই মানব-মনের বিপুল ইচ্ছাশক্তির ধারক, বাহক, সঞ্চালক, ভিনগ্রহী বোম্বেটে রানি, আমিই কায়াহীন কল্পনাতীত কিংবদন্তির করাল রূপ... আমি স্রষ্টা অথচ বিধ্বংসী... আমি গড়ি আবার ভাঙি... সেই আমার খেলা... আমি যে মানবমনের ঐক্যরূপ... আমার বিনাশ নেই... আমার অন্ত নেই... আমার বিশেষ কোনও রূপ নেই... অথচ আমি আছি... যুগে যুগে আমি আসি মানুষের উদ্ধারকল্পে... তখন আমি অবতার... তখন আমি গণদেবতা, নানা মুখে নানা নামে অভিহিত হই... যেমন, এখন আমার নাম ঈশ্বর। আসলে আমি সমস্ত

মানবমনের সংহত ইচ্ছাশক্তি— কায়ারূপ প্রচণ্ডতা... যে নামেই ডাকা হোক না কেন আমাকে, আমার অসাধ্য কিছু নেই... যেমন অসাধ্য কিছু নেই মানব-মনের। দুর্জয়... দুর্মদ...দুর্দান্ত মানবমনের প্রতিভূ আমি... আমি অজেয়... ভিনগ্রহী রমণী... পালাও... পৃথিবী ছেড়ে পালাও।'

ধূমাবতী সম্পূর্ণ নিথর। কিন্তু অতিশয় উৎকর্ণ।

ছায়ামায়ায় ঘেরা গণদেব বলে যাচ্ছে দ্রিমিদ্রিমি স্বরে... কথা তার মুখে ফুটছে না... বায়ুস্তরে কথার আকারে প্রকম্পিত হচ্ছে :

'কোটি কোটি মানুষ মেরেছ তুমি আর তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা— তাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আকাশিক স্তরে জীবন্ত রয়েছে... আমি সেই প্রলয়ংকর হনন-ইচ্ছার মূর্ত আকৃতি। মানুষের দেহ যায়, কিন্তু মন থেকে যায়। মহারানি ধূমাবতী, তোমার কদাকার মগজে সে ধারণার উদয় ঘটবে না কোনওদিনই। কেননা, এই পৃথিবীর পঞ্চভূত দিয়ে গড়া নও তুমি।

'মানুষ বিচারপ্রার্থী। সুবিচার চায়। তোমরা বিচার ব্যবস্থার নামে শোষণ ব্যবস্থা চালু করেছ। তোমরা কতিপয় রমণী— আমার এক ফুৎকারে তোমরা বিলীন হয়ে যাবে। যদি এখনও সতর্ক না-হও... চম্পট না-দাও।'

ঠিক এই মুহূর্তে নিথরমূর্তি মহারানির তর্জনী স্পর্শ করেছিল মণিময় সুবর্ণ গজদন্ত নির্মিত সিংহাসনের আর একটি বোতাম।

তৎক্ষণাৎ পাগলাঘণ্টি বেজে উঠেছিল পাতাল প্রদেশের সর্বত্র। বিশাল গবেষণাগারের দিকে দিকে দেওয়াল যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছিল। পঙ্গপালের মতো ধেয়ে এসেছিল রক্ষীবাহিনী।

মানুষ-প্রহরী। অসুরসম চেহারা প্রত্যেকের। সশস্ত্র প্রত্যেকেই। ধূমাবতীর নিমক খায় তার নিত্য-রক্ষী প্রত্যেকেই। এবং অতিশয় নৃশংস। তাদের মন ঘুমন্ত। তারা নির্মম।

তারা একযোগে গ্লো বিম তাগ করেছিল বর্ণনানীত ছায়া-দানবের দিকে... ঝলকে ঝলকে প্রভা-রশ্মি ছুটে এসে ঘিরে ধরেছিল তাকে... কয়েক সেকেন্ড শুধু প্রভা-নৃত্য ছাড়া কিছু দেখা যায়নি— মারণ কিরণ যেন বিলীন করেছে তাকে পঞ্চভূতে...

কিন্তু সে পঞ্চভূতে গড়া নয়... পঞ্চভূত থেকে তার আবির্ভাব নয়— পঞ্চভূতেও সে প্রস্থান করেনি...। ব্রহ্মাণ্ড বিস্ময় ফোহাত এনার্জি দিয়ে গড়া মন-কায়া সে, যে-মনের বিনাশ নেই।

তাই ঝলকিত কিরণ বিস্ফোরণ অপসৃত হতেই দেখা গেছিল সে অটল অক্ষত এবং দুলন্ত...

দুলছে... দুলছে... তারপর লাট্টুর মতো শুধু ঘুরে গেল একবার... তার ললাটে জাগ্রত হল যেন একটা ত্রি-নয়ন... মন-বল্লম ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে গিয়ে নিমেষে নিমেষে নিহত করল সান্ত্রিদের প্রত্যেককে এবং কী ভয়ানক! প্রত্যেকেই বরফ-মূর্তিতে পরিণত হল নিমেষে! ফের রানির দিকে মুখ ফিরিয়েছে কৃষ্ণকালো বিভীষিকা... সে মুখে চোখ নেই, কোনও প্রত্যঙ্গ নেই... অথচ ঠিকরে আসছে মারণ হিল্লোল।

নিজেকে নিস্তেজ বোধ করেছিল পৃথিবীর অধীশ্বরী। যার কায়া নেই। যার ছায়া পড়ে না, সেই মানব মনের সঙ্গে লড়া যায় না।

বলেছিল নিস্তেজ স্বরে, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তোমাকে পাঠিয়েছে। তাকে গিয়ে বলো, এই পৃথিবীতে ছেলে আর মেয়ে সমান সমান থাকবে— আমার আগের আদেশ প্রত্যাহার করে নিলাম।'

প্রফেসর তাঁর নিভৃত কন্দরে বসে শুনলেন মহারানির আদেশ। ধ্বনিত হল ইলেকট্রিশিয়ানের বাক্সের কিম্ভূত যন্তরে।

হেসে বললেন প্রফেসর, 'শাবাস! ভ্যানিশ!'

মহারানির সামনের করাল ছায়া-দানব আচমকা নিঃশব্দে বিস্ফোরিত হয়ে বিলীন হয়ে গেল শূন্যে। সান্ত্রিদের মৃতদেহ ছাড়া আর কেউ নেই ঘরে।

মাথা হেঁট করেছিল মহারানি।

প্রফেসর বললেন ইলেকট্রিশিয়ানকে, 'ক্রিস্টালটা কাজে লাগল তা হলে?'

ইলেকট্রিশিয়ান বললে, 'হিমালয়ের ক্রিস্টাল। ঘন-পাথর এরই নাম?'

'হ্যাঁ, দীননাথ।'

হ্যাঁ, ছদ্মবেশী এই ইলেকট্রিশিয়ানই প্রফেসরের নিত্যসহচর— দীননাথ নাথ।

মহারানি ধূমাবতী এই মুহূর্তে বিলক্ষণ উদ্‌বেগে ভুগছে। তার মুখের গড়ন প্রায় মানুষের মুখের মতো। সাইজে ছোট। চিন্তাকুটিল হওয়ার ফলে সে মুখ এখন প্রায় মর্কট-মুখ হয়ে উঠেছে। তার ওপর পড়েছে ক্লান্তির ছাপ। একটানা চল্লিশ ঘণ্টা জেগে থাকার পরিণাম— ঘুম নেই চোখে। নতুন আপদ এই প্রফেসরটাকে কিছুতেই তো বাগে আনা যাচ্ছে না।

গোদের ওপর বিষফোড়া স্বরূপ নতুন উদ্‌বেগ জাগিয়েছে আটটা শহরের রানি। তাদের নিয়ে কনফারেন্স হলে বসেছে উত্তেজনা-ঠাসা সভা। তারা কেউই মহারানির ওপর সমবেদনা জানাতে আসেনি।

এদের কাছে পৃথিবীর মানুষ নিছক গোলাম ছাড়া কিছুই নয়— বিনা বেতনের ক্রীতদাস। মারো, খাটাও— আমৃত্যু। মানুষের দাম কানাকড়িও নয় তাদের কাছে। মানুষকে তারা সংখ্যায় বাড়ায় স্রেফ খাটিয়ে নেওয়ার জন্যে— মানুষ যেমন গোরু ঘোড়া মুরগি ছাগল গাধা পোষে স্রেফ নিজ স্বার্থে— মানুষের দাম এই রানিদের কাছে তার বেশি নয়। চার হাজার বছর আগে পৃথিবী গ্রহকে দখলে এনেছিল মহারানি— এই আটজন সহচরী নিয়ে ছিল মোট উনত্রিশ জন, হানাদার উনত্রিশ— সংঘাতে সংঘর্ষে কৃত্রিম উপগ্রহদের আক্রমণে তাদের বিশজন নিহত হয়েছে।

পৃথিবীকে জয় করা ইস্তক এই ক'জনের মধ্যে মানুষ সম্বন্ধে যে ধারণাটা গড়ে উঠেছে, তা পালটানো যাবে না। এরা সুদীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করে এসে পৃথিবীর মানুষকে পোকার মতো তাচ্ছিল্য করতে শিখেছে।

কিন্তু মহারানি ধূমাবতী এদের সঙ্গে একটা পার্থক্য বজায় রাখে। এদের প্রত্যেকের গড় আয়ু দশ হাজার বছর, কিন্তু মহারনির আয়ু সীমাহীন। মহারানি মৃত্যুহীন। মহারানি অমর।

যে-গ্রহ থেকে এই মেয়ে-বোম্বেটেদের আবির্ভাব, সে গ্রহের প্রকৃতির নিয়মেই এহেন দীর্ঘ আয়ু লাভ করেছিল সেখনকার গ্রহীরা। নারীশাসিত সেই গ্রহে পুরুষের সংখ্যা ছিল এক-পঞ্চমাংশ। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছিল সেই কালান্তক গ্রহের— যেখানে নারী বাঁচে দশ হাজার বছর, পুরুষ বাঁচে হাজার বছর— তাও জীবন দিতে হয় গৃহভৃত্য হয়ে। .

প্রহেলিকা গ্রহ প্রহেলিকাময় হয়ে উঠেছিল দুর্জ্ঞেয় প্রাকৃতিক প্রসাদে। পরমায়ুকে প্রলম্বিত করার বিস্তর মন্ত্রগুপ্তি নিহিত ছিল সেখানকার জল হাওয়া মাটি খনিজ সম্পদে। গ্রহের নাম ছিল আহু।

পৃথিবী জয়ের পর আহু নামটার সমার্থক নাম এই গ্রহেই পেয়েছিল মহারানি। আয়ু। সে গ্রহে আহু নামটার নাম আয়ু— দীর্ঘ আয়ু ছিল আহুগ্রহের বৈশিষ্ট্য, পরম সম্পদ। তাই তার নামকরণ হয়েছিল আহু। নামের দিক দিয়ে আর একটা অদ্ভুত মিল নজরে এনেছিল মহারানি। আহু গ্রহে তার নাম ছিল অদৃশ্যন্তী। আহু গ্রহেরই বিশেষ পাথরের আর খনিজের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিশেষ আরক প্রস্তুত করে নিজেকে অদৃশ্য করে তোলার পন্থা আবিষ্কার করেছিল রানি ধূমাবতী— তাই তার নাম হয়ে গেছিল অদৃশ্যন্তী।

কী আশ্চর্য! এই পৃথিবীর পুরাণে এই অদৃশ্যন্তী নামটাই খুঁজে পেয়েছিল জ্ঞান-সন্ধানী ধূমাবতী।

কিন্তু হায়! অদৃশ্যন্তীর বিশেষ ক্ষমতা সে হারিয়েছিল পৃথিবীর বিশেষ নিয়মে। ইচ্ছেমতো অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা আর ফিরে পায়নি।

কিন্তু থেকে গেছিল অনন্ত পরমায়ুর প্রসাদ। আহু গ্রহের খনিজ সম্পদ নিয়ে গুপ্ত গবেষণায় মৃত্যুহীন জীবন যাপন করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল অদৃশ্যন্তী।

তার পরেই প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ফুরিয়ে এল আহু গ্রহেরই নিজের পরমায়ু। বিস্ফোরিত হয়ে শূন্যে বিলীন হওয়ার আগেই আটাশজন সঙ্গিনীকে নিয়ে অদৃশ্যন্তী পাড়ি জমিয়েছিল মহাশূন্যে— ঊনত্রিশটা মহাকাশপোত একযোগে আক্রমণ করেছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সবুজ গ্রহ পৃথিবীকে। শিলাবৃষ্টির মতো ঝরিয়ে গেছিল পরমাণু বোমা। মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল শহরের পর শহর। পলাতক যারা অরণ্যে আর গিরিকন্দরে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বেঁচেছিল— তাদের নিয়েই উইপোকা, ঘুণপোকা, মানুষ পোকাদের নিয়ে সাম্রাজ্য পেতেছিল অদৃশ্যন্তী। মহাসমরে ঊনত্রিশটা মহাকাশপোতের কুড়িটা বিচূর্ণ হয়েছিল মানুষের রকেট বোমায়। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল অদৃশ্যন্তী সমরনীতির নিয়মে। কখন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ফলভোগ করতে হয়, কুশলী অদৃশ্যন্তীর তা অজানা ছিল না।

তাই, নিজের চেয়ে কম বুদ্ধি আট রণরঙ্গিণীকে বসিয়ে দিয়েছিল আট রাজধানীতে— পৃথিবী গোলকের আট দিকে— মহাদেশ অথবা মহাদেশের কাছাকাছি যায় এমন অঞ্চলে নিজে গ্যাঁট হয়ে বসেছিল নিজস্ব শহরে, স্বর্ণস্তূপের অনতিদূরে।

কিন্তু বিশেষ বুদ্ধি আর বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা দিয়ে কবজায় রাখতে হয়েছে এই আটজনকে সুদীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে— বিদ্রোহিনী এরা। প্রথম থেকেই কিন্তু সাহসে কুলোয়নি অদৃশ্যন্তীর বিরুদ্ধে যাওয়ার।

কারণ, অদৃশ্যন্তীর মৃত্যু নেই।

কারণ, অদৃশ্যন্তী প্রখর-বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক।

কারণ, দুর্ধর্ষ মানুষ জাতটাকে হীনবীর্য করার কৌশল জানে শুধু অদৃশ্যন্তী।

কারণ, অদৃশ্যন্তী ইচ্ছে করলে, নিজের সিংহাসনে বসেই, দূর প্রক্ষেপণ-শক্তির দৌলতে আটজনকেই শূন্যে বিলীন করে দিতে পারে।

সেই অদৃশ্যন্তীই নাম পালটে এখন ধূমাবতী। মানুষ তাকে ভয় পায়। অমানবী এই আট সহচরীও তাকে ভয় পায়।

কিন্তু মনে মনে ঘৃণা করে।

ধূমাবতী তা জানে।

ধূমাবতী জানে, আট আহুবাসিনী তাকে সমঝে চলে শুধু তার একটা বিদ্যার জন্যে। সিক্রেট সায়ান্স। গুপ্ত বিজ্ঞানে ধূমাবতীর বিশেষ দখল আছে বলে।

এ ছাড়াও ধূমাবতীর রক্ষাকবচ আছে আর একটা। আট আহুবাসিনীই ঈর্ষা করে পরস্পরকে— একজন আর একজনের সম্পদ আর ক্ষমতা সইতে পারে না।

এইসব চিন্তা কুরে কুরে খেয়ে চলছে মহারানিকে। চিন্তা চিতার সমান। মানসিক দ্বন্দ্ব কেড়ে নিয়েছে চোখের ঘুম। তৎসহ, প্রবল উদ্‌বেগ ঘটিয়ে চলেছে এই প্রফেসর লোকটা। দেখতে সাদাসিধে কিন্তু ভেতরে জিলিপির প্যাঁচ। পৃথিবী জুড়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি-পর্ব গড়ে তুলেছে এই একটা লোক। কিন্তু আট রানি তা মানতে চায় না। সুদীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে তারা মানুষ জাতটাকে পায়ের তলায় রেখে পিষে পিষে মেরেছে— মানুষ জীবটা তাদের কাছে কীটাণুকীট ছাড়া কিছুই নয়। সেই নগণ্য হীনবীর্য মানুষের সহসা উত্থান আর বিদ্রোহের মশাল জ্বলন তারা বিশ্বাসই করেনি। ভ্রান্তিবিলাস ঘুচিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে নিকট। তাই, মহাসভায় আট রানিকে তলব করেছে আহু গ্রহের অদৃশ্যন্তী।

কুচুটে, ছুঁচোলো, মর্কট মুখে ক্লান্ত হাসির স্বাগতম জানিয়ে ভাষণ শুরু করেছিল ধূমাবতী— অপরিসীম ক্লান্তি বেসুরো করে তুলেছিল কণ্ঠস্বরকে।

সে বলেছিল, 'ভগ্নীগণ, আহুগ্রহের কন্যাগণ, তোমাদের ডেকে এনেছি গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে বলে। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র লোকটার নাম কানে এসেছে?'

হিমালয় অঞ্চলের রানি তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, 'গুজব একটা শুনেছি বটে। আপনার অর্ডার সে ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ। অর্ডার দিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছি। কেননা, আমরা পৃথিবী জয় করার অনেক... অনেক আগে... এই পৃথিবী যে মহাশক্তির সন্ধান জানত, এই প্রফেসর হারামজাদা সেই শক্তি আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল। সেই মহাশক্তির কাছে আমি হেরে গেছি।'

'খুব আশ্চর্যের কথা'— হিমালয়-রানির কণ্ঠস্বর [illegible] ব্যঙ্গকঠিন।

শ্লেষ এড়িয়ে গিয়ে বললে ধূমাবতী, 'প্রফেসরের কতিপয় স্যাঙাৎ সংঘবদ্ধ হয়েছে। বিদ্রোহের মশাল জ্বালাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ সে খবর রাখে না। সেইটাই

আমাদের সুযোগ। সংখ্যায় যারা বেশি, তাদের কবজায় এনে লেলিয়ে দিতে হবে এই প্রফেসর ঘুঘুটার পেছনে।'

হিমালয় কন্যা বললে, 'অত ঘোর প্যাঁচের দরকার কী? প্রফেসরটাকেই নিকেশ করে দিলে তো হয়। ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। ছোঃ!'

অদৃশ্যন্তী ওরফে ধূমারতী কনকনে চোখে তাকাতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। এই বখাটে বকমবাজ মেয়েটা চার হাজার বছর ধরে মুখে মুখে তর্ক করে এসেছে। কিন্তু তাকে ঘাঁটায়নি ইচ্ছে করেই। কারণ সুবিস্তৃত হিমালয় অঞ্চলের গহন অঞ্চলে বহু গুপ্ত শক্তি লতাপাতা ক্রিস্টালের আকারে রয়েছে প্রকৃতির অন্দরে কন্দরে। একদা এই পৃথিবীর বোকা মানুষগুলো অসাধারণ অত্যাশ্চর্য সেই সব শক্তিসমূহকে বলত দিব্যশক্তি। তিব্বত জায়গাটায়, কামাখ্যা অঞ্চলে, কিন্নরদের পাহাড়ে আজও গোপন অনুসন্ধান চালাচ্ছে মহারানি এই ডেঁপো মেয়েটাকে দিয়ে। সঞ্জীবনী শেকড়, অদৃশ্যকরণী লতা, ত্রিনয়ন আর, দিব্যকর্ণের পাথর— নিশ্চয় রয়েছে এইসব অঞ্চলে। যিশুখ্রিস্ট নামে এক ধর্মপ্রচারক এই তল্লাটে পা দিয়েছিলেন কেন? স্বামী অভেদানন্দ নামে আর এক সন্ন্যাসী সেই মানুষটার কথা লিখে গেছিলেন কেন? তিব্বত মঠে সেই গবেষণার ইতিবৃত্ত পাওয়া গেছে। আরও পাওয়া যাবে তল্লাসি চালালে। সুতরাং এই বাচাল আহুতনয়াকে এখন ঘাঁটাতে চায় না মহারানি। হাজার হোক, আহু গ্রহের মেয়ে তো। গ্রহভগ্নী!

তাই, লোচনযুগল শীতল রেখেই কৃপাণ-কঠিন গলায় বলে গেছিল অদৃশ্যন্তী ওরফে ধূমাবতী, 'হার মেনেছি যার কাছে, যে সত্তাটার কাছে, তার নাম শুনলাম— ঈশ্বর। ঈশ্বর মানে তো ভগবান— এই পৃথিবী পুঙ্গবদের কাছে। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালক, ধ্বংসকর্তা। এতদিন ভেবেছিলাম উজবুক মানুষদের উদ্ভট কল্পনা এই ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরকে তো দেখা যায় না। নানা রূপে অবশ্য ঈশ্বর নামক এক এবং আদি শক্তি দেখা দেয় যুগে যুগে— অত্যাচারীদের সর্বনাশ করার জন্যে। মানুষদের কাছে আমরাই তো অত্যাচারী। তা হলে কি সেই ঈশ্বর সেদিন দেখা দিয়ে গেল আমাকে? প্রফেসর লোকটা মহা ঘোড়েল। সে অবশ্য বললে, সমস্ত মানুষের মনের শক্তি... মনের তেজ... এক হয়ে সৃষ্টি করেছে এই কালান্তক সত্তাকে...'

লম্বা বক্তৃতায় ছটফটিয়ে উঠে বলে উঠল মুখফোঁড় হিমালয়-রানি, 'ঈশ্বরকে দেখতে কীরকম?'

'নিরেট তমসা।'

'মানে?'

'জমাট অন্ধকার। এক কথায়, তামস দানব। ত্রিমাত্রিক ছায়া।'

'ছায়া?'

'মাথায় আমার চাইতে তেরো ফুট ঢ্যাঙা, প্রায় বিশ ফুট। মানুষদের চেয়ে লম্বা অথচ আকৃতি মানুষের মতো। কালো ছায়া দিয়ে গড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তেমন সুস্পষ্ট নয়। যেন, ছায়া ঘন হচ্ছে ঘনঘন। যেমন, হাতের আর পায়ের আঙুল কতগুলো— তা দেখা যায়নি। কান ক'খানা, তাও বোঝা যায়নি। তার কথায়, সে নাকি বস্তু দিয়ে নির্মিত নয়—'

'ছায়া দিয়ে?'

'মানুষের মনের ইচ্ছে দিয়ে গড়া তার শরীর। যে মানুষরা এখন চাইছে স্বাধীন হতে—সেই মানুষদের আত্যন্তিক ইচ্ছারূপ এই ঈশ্বর।'

'মুখ নেড়ে বলে গেল?'

'না, না না। মুখ তার নড়েনি, হাওয়ায় কোনও শব্দ ভাসেনি, আমার কান কোনও বায়ুস্পন্দন শোনেনি। সে কথা বলেছে টেলিপ্যাথি দিয়ে।'

'টেলিপ্যাথি! মন দিয়ে মনে কথা পৌঁছে দিয়েছে? কিন্তু সে শক্তি তো হাজার হাজার বছর আগে হারিয়েছে পৃথিবীর মানুষ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হাজার হাজার বছর আগে মনের এই সম্পদ... এই মহাশক্তি অনায়াস-দখলে রেখেছিল এই পৃথিবীরই মানুষ... মহাশক্তি সেই টেলিপ্যাথি প্রয়োগ করে গেল অন্ধকারের দানব বিপুল বেগে আমার ব্রেনের ওপর। আমি স্থাণু হয়ে গেলাম। স্তম্ভিত হয়ে শুনে গেলাম।'

'মন দিয়ে?'

'হ্যাঁ। মন নিথর হয়ে গেছিল তার মহাশক্তির ধাক্কায়। সে যে ভয়ানক শক্তির আধার, টেলিপ্যাথির প্রথম ধাক্কা দিয়েই আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমরা, আহু গ্রহের সন্তানরা, এই টেলিপ্যাথিতে অভ্যস্ত নই। ঈশ্বর নামধারী আতঙ্ক তা জানে। তাই, ওই টেকনিক প্রয়োগ করে গেছে আমার ওপর।"

'এবং, কুপোকাত করে গেছে!' ব্যঙ্গ বিছিয়ে বলে গেল হিমালয়-রানি।

বিদ্রূপ গায়ে না-মেখে বলে গেল অদৃশ্যন্তী ওরফে ধূমাবতী, 'ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ-প্রহরী ছুটে এসেছিল তাকে নিকেশ করতে... তাদের গ্লো-বিম ব্যর্থ হয়েছে... মরেছে ঝাঁকে ঝাঁকে ঈশ্বরের মন-বল্লমের খোঁচায়! আমি ব্যর্থ হয়েছি তাকে মারণ রশ্মি দিয়ে মারতে। সে অমর, অজেয়—'

'অক্ষয়!' হিমালয়-রানির কণ্ঠস্বর এখন সুতীক্ষ্ণ।

'অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি। তার ছায়া-শরীরের মধ্যে নিহিত ছিল এমনই এক অব্যাখ্যাত শক্তি... বুদ্ধি দিয়ে আর বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা চলে না যে শক্তির... সেই শক্তি... কপালের তৃতীয় চোখ থেকে ধেয়ে গেছিল সেই শক্তি... যার নাম দিয়েছি আমি— শৈত্য-শক্তি...'

'শৈত্য-শক্তি আবার কী শক্তি? জীবনে শুনিনি।'

'কিন্তু আমি দেখলাম। চোখের পলকে সব ক'টা মড়া... রক্তমাংসের মড়া... বরফের মূর্তি হয়ে গেল।'

ধক করে উঠল হিমালয়-রানির চোখ, 'বরফ-মড়া!'

শীতল স্বরে বলে গেল অদৃশ্যন্তী, 'প্রফেসর বদমাশকে তাই ছেড়ে দিলাম, নইলে আমিও বরফ হয়ে যেতাম। অর্ডার ঘুরিয়ে নিলাম।'

নাছোড়বান্দা হিমালয়-রানি এত শোনবার পরেও জেরা করে গেল মহারানিকে, 'অ্যাটমিক ব্লাস্ট দেগেছিলেন?'

'পারমাণবিক তোপ দেগেও তাকে অ্যাটম বানাতে পারিনি। সবচেয়ে জোরালো তোপ।

যে তোপ মিনিটে এক ঘন মাইল বস্তুকে পরমাণু বানিয়ে দেয়। কিছু হয়নি। পারমাণবিক শিখা ছুড়েছিলাম। যে শিখা সেকেন্ডে বাইস টন স্টিলকে গলিয়ে দেয়। কিসসু হয়নি। সে সব শক্তির বাইরে এক মহাশক্তি—'

'তাই তাকে নমস্কার জানালেন?'

এইবার ব্যঙ্গ-বঙ্কিম তির্যক হাসি ফুটল অদৃশ্যন্তীর তেড়াবেঁকা ঠোঁটে। বললে মজা-মজা গলায়, 'কয়েকটা অমোঘ অস্ত্রের কথা নিশ্চয় মনে আছে তোমার? তেরোশো বছর আগে সেই অস্ত্রগুলোর একবারই ট্রায়াল দিয়েছিলাম— 'আমারই এক বিদ্রোহিনী ভগ্নীর ওপর— এখন যাকে বসিয়েছি সাহারার সিংহাসনে— আর, সাহারার সিংহাসন থেকে এনে যাকে বসিয়েছি হিমালয়ের সিংহাসনে। মনে পড়ে?'

কাঠ হয়ে গেল দুই আহু-তনয়া। সাহারা আর হিমালয় অঞ্চলের দুই রানি। প্রলয়ংকর সেই অস্ত্রগুলোর দুঃস্বপ্নময় স্মৃতি জ্বলজ্বল করে উঠেছিল দু'জনেরই মানস-পটে। একজনকে ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিয়েছিল মহারানি, আর-একজনকে দিয়েছিল প্রোমোশন। তারপর থেকে, এই তেরোশো বছরে ট্যাঁ-ফুঁ করবার সাহস হয়নি কোনও রানিরই।

এই প্রথম বিদ্রোহ-বহ্নির ঝিলিক তুলতে গেছিল হিমালয়-রানি। নিভে গেল নিমেষ-মধ্যে।

অদৃশ্যন্তী ওরফে ধূমাবতী তখনও মুচকি হাসি হেসে চলেছে। মিঠে মিঠে গলায় বলে গেল, 'সাহারার রানির শখ হয়েছিল আমার সঙ্গে টক্কর নেবে। আমাকে অ্যাটাক করবে। অনেক অনুপম অস্ত্রের উদ্ভাবনও ঘটিয়েছিল। কিন্তু হায় রে, অদৃশ্যন্তীর সঙ্গে শক্তির মহড়া দিতে গিয়ে সাহারার বালি হয়ে উড়ে যাচ্ছিল আর একটু হলেই— নেহাতই গ্রহবোন তাই প্রাণে মারিনি। মনে পড়ে?'

সভা নিস্তব্ধ।

তারপর মুখ খুলল সাগর-রানি, 'কিন্তু আপনি যে স্পেশাল জেনারেটরটা বানিয়ে রেখেছেন ভবিষ্যতের রানি-বিদ্রোহের মোকাবিলা করার জন্যে, সেটাকে কাজে লাগিয়েছেন? ছায়া-দানবের মুরোদটা দেখে নিতে পারতেন।'

মুখ লাল হয়ে গেল অদৃশ্যন্তীর। স্পেশাল এই জেনারেটর অতি গোপনে নির্মিত হয়েছিল তার গোপন গিরি-গহ্বরে। খবরটা ফাঁস হয়ে গেছে তা হলে!

চকিতে সামলে নিয়ে বললে ঈষৎ স্খলিত স্বরে, 'সে জেনারেটর নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল ছায়া-দানব-ঈশ্বর! বোতাম টিপেও জেনারেটর চালু করতে পারিনি। হার মেনেছে আমার হাজার হাজার বছরের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। ছায়া-শরীরের একটা পরমাণুকেও স্পর্শ করতে পারেনি— জেনারেটরই চালু হয়নি।'

'গর্ব খর্ব করেছে?' সাহারা-রানি বললে নিরীহ স্বরে। কিন্তু সেইটাই তো শ্লেষ!

হজম করে নিল অদৃশ্যন্তী। বাক্যযুদ্ধ করবার সময় এখন নয়। এদেরকে টাইট মারা যাবে যথাসময়ে— এখন নয়।

'করেছে। যে-জেনারেটর চালু হলে প্রতিটা পরমাণু অযুত তরঙ্গে ভেঙে যেত— সেই জেনারেটরই বিকল করে দিয়েছে ঈশ্বর।'

'এখন উপায়?' এই প্রথম মুখ খুলল মেরু অঞ্চলের রানি। মেরুর বরফ গলিয়ে দিয়ে, সাগরের জল বাড়িয়ে দিয়ে, মানুষগুলোকে তা হলে আর ডুবিয়ে মারা যাবে না?'

শীতল কণ্ঠে বললে অদৃশ্যন্তী, 'সূর্য থেকে যে প্লাজমা ঠিকরে বেরিয়ে ঠান্ডা হয়ে রয়েছে সূর্যের গা ঘেঁষে, সেইটাকে টেনে এনে পৃথিবী ধ্বংস করে দেওয়া যায়— কিন্তু সেটা করলে আমরাও যে শেষ হয়ে যাব।'

চুপ মেরে গেল আহু-তনয়ারা। অদৃশ্যন্তী গুপ্ত বিজ্ঞানে অনেক এগিয়েছে। সৌরজগতেও ওলটপালট করার কথা ভাবছে। এমন রমণীকে না-ঘাঁটানোই ভাল।

ভালমানুষের মতো মুখ করে হিমালয়-রানি বললে, 'পৃথিবীর যে ক'টা স্যাটেলাইট ছিল, আমরা এসে সব ক'টা ধ্বংস করেছি। এখন পৃথিবীকে পাক দিচ্ছে আমাদের স্যাটেলাইট-সারি। রোবট উপগ্রহ। তাদেরকে দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষ মেরে দিন।'

ফিকে হেসে বললে অদৃশ্যন্তী, 'সে চেষ্টাও করেছিলাম। রোবট-স্যাটেলাইটদের রে-গানগুলো নকল হিরে দিয়ে তৈরি। আমার কারখানায় গড়া নকল হিরে— স্ট্রাকচারে যা আসল হিরের সমান— কিন্তু এখন আর নয়।'

'কেন? কেন? কেন?'

'ছায়া-দানব মনের শক্তি দিয়ে সব ক'টা হিরে-কামানকে কাচ-কামান বানিয়ে দিয়েছে।'

'আমরা তা হলে নিরস্ত্র?'

'একেবারেই। তাই তো ডেকেছি এই মিটিং।'

'এত খবর সে রাখছে কী করে?'

'ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে পেরে। আমার ব্রেনের প্রত্যেকটা মেমারি ক্যাপসুল সে টেলিপ্যাথি দিয়ে ঘেঁটেছে, জেনেছে।... টেলিপ্যাথি! মানুষের আদিম অমোঘ অস্ত্র— টেলিপ্যাথি। যা আমাদের নেই।'

হতাশ এবং বিলক্ষণ বিষণ্ণ মহারানি এই মুহূর্তে। সভা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। এই হিরণ্যকক্ষে আড়ি পাতবার মতো কোনও ব্যবস্থা নেই বলেই এতদিন সবাই জানত। দীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে কত সমস্যা এসেছে, ধুরন্ধর অদৃশ্যন্তী এই হিরণ্য মন্ত্রণাকক্ষে বসে সব সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু আজ সেই খলিফা মহারানি নিজেই বেকুব।

সাহারার রানি সব রানিদের মধ্যে বুদ্ধি ধরে বেশি। তাই তার রাজধানী সাহারার ঠিক মাঝখানে। আশ্চর্য এক বালি-পাথর বানিয়ে গড়ে দিয়েছিল এই অদৃশ্যন্তী— বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অতুলনীয় ক্ষমতা দেখিয়ে।

কেননা, দিনের সূর্য সেই বালিপাথর থেকে শৈত্য ঠিকরে দেয়, রাতের মরু-শৈত্য একই বালিপাথর থেকে মোলায়েম উষ্ণতা বিকিরণ করে।

সাহারার সেই রানি তাই মনে মনে চায়, অদৃশ্যন্তী আরও অযুতকাল ধরে পৃথিবী শাসন করে যাক। কারণ, তার মৃত্যু নেই। কারণ, সে বিজ্ঞানে আশ্চর্য দখল রাখে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষমতা হাতে আনছে, আনবে।

তাই, ধীর স্থির স্বরে বলেছিল সাহারার রানি 'মানুষদের এই অকল্পনীয় ক্ষমতা তো আগেও ছিল। কিন্তু আমরা যখন হানা দিলাম চার হাজার বছর আগে, তখন তো দেখিনি?'

'সংগত প্রশ্ন। শুনলাম এতক্ষণে।' অন্যান্য রানিদের আচরণ যে অসংগত, তা পরোক্ষে বুঝিয়ে দিয়ে বললে অদৃশ্যন্তী, 'আমি তিব্বতের হিমীশ মঠের রেকর্ড ঘেঁটে সে তত্ত্বও উদ্ধার করেছি। এই পৃথিবীতেই অনেক সভ্যতা জ্ঞানবিজ্ঞানের শিখরে উঠেও তলিয়ে গেছে মানুষেরই দোষে। পৃথিবীজোড়া প্রলয় সৃষ্টি করেছে এই মানুষই বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে হাতে রাখতে না-পেরে। মনের ক্ষমতা ছিল তখন যোগীদের কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা। আমরা যখন হানা দিলাম আমাদের স্পেসশিপ নিয়ে, তখন কিন্তু বস্তুবিজ্ঞানে বড় বাড়াবাড়ি করে চলেছিল পৃথিবীর মানুষ। তাদের কলকারখানা স্পেসশিপ স্যাটেলাইট তার নিদর্শন। আমরা সব ধ্বংস করেছিলাম। নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলাম। মনের ক্ষমতা জিনিসটা তখন ওদের কাছে ছিল হাসির খোরাক— ব্যঙ্গের বস্তু। তাই আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু এই প্রফেসর মানুষটা সেই গুপ্তজ্ঞান দিয়ে খেদিয়ে দিতে চলেছে আমাদের—'

'খেদিয়ে দেবে! পৃথিবী থেকে?'

'তা ছাড়া আর কী? মন নিয়ে গবেষণা করবার সময় তো পাচ্ছি না। ওই ঈশ্বর আপদটা—'

সাহারার রানি বললে, 'দরকার কী এই আপদের সঙ্গে থেকে? আমরা তো সৌরজগতের অন্য গ্রহ-উপগ্রহেও চলে যেতে পারি? ভেনাস, মার্কারি, ট্রাইটন, জুপিটার, স্যাটার্ন— সৌর পরিবারের সমস্ত আপনার নখদর্পণে—'

অনেকক্ষণ পরে হেসে ফেলল অদৃশ্যন্তী, 'তা ঠিক। স্বভাবে আমরা যাযাবর। এক জায়গায় বেশিদিন মন টেকে না বলেই সৌরজগতের সব গ্রহ উপগ্রহে অভিযান চালিয়ে দেখেছি— আমাদের থাকার জায়গার অভাব নেই। ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর চাইতেও ভাল থাকার জায়গা যখন আছে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সাহারার রানি বললে, 'সেখানে চলে গেলেই হয়। তার আগে—'

দাঁতে দাঁত পিষে বললে অদৃশ্যন্তী, 'পৃথিবীটাকে নিষ্প্রাণ করে দিয়ে যাব। যেমন একবার ডাইনোসর পর্যন্ত শেষ হয়েছিল— সেই মড়ক লাগাব।'

প্রফেসর সিধে হয়ে বসেছিলেন। তাঁর সামনে দুলছে অতিকায় ছায়া— ঈশ্বর।

প্রফেসর বললে, 'ধূমাবতী প্যাঁচ আঁটছে?'

ছায়া বললে, 'হ্যাঁ।' একটু থেমে, 'আট রানিকে নিয়ে সম্মেলন শেষ হল এখুনি।'

'নবগ্রহ সম্মেলন', হেসে বললেন প্রফেসর, 'কী ফিকির আঁটা হল?'

'পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। তার আগে পৃথিবীটাকে নিষ্প্রাণ করে দিয়ে যাবে।'

প্রফেসরের ভুরু কুঁচকে গেল। ভাবনার কথা বটে। পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপে তিলমাত্র বিলম্ব করে না এই ভিনগ্রহী ডাইনিরা। ডাইনি যদিও এরা নয়, কিন্তু ডাইনি ছাড়া এদের আর কী-ই বা বলা যায়।

প্রফেসরের পাশে ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে ছিল সেই ইলেকট্রিশিয়ান— যে নাকি বৃদ্ধ

বৈজ্ঞানিকের নিত্যসহচর। তালঢ্যাঙা বপু, মারকাটারি চেহারা, দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্যে হাত-পা যেন নিশপিশ করছে অনুক্ষণ।

আশ্চর্য এই কাহিনি যখন এতখানি এগিয়েছে, তখন তার প্রকৃত পরিচয়টা এবার দিয়ে ফেলা যাক সুধী পাঠক এবং পাঠিকাদের।

এই সেই দীননাথ নাথ। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের ল্যাংবোট। মাথায় ঘিলু কম, কিন্তু ঝাড়পিট করতে ভালবাসে। ভালবাসে সাহিত্য নামক রসকষহীন বস্তুটা। সেই ব্যাপারে দীননাথকে সরস পুরুষ বলা যায়। কেননা, ছায়া-দানবের কথা শুনে আর প্রফেসরের মাথায় 'ডাইন' শব্দটা ঘুরপাক খেতেই সে হাজার হাজার বছর আগেকার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবিঠাকুরের একটা কবিতা গড়গড় করে বলে গেল:

জলার সাপের মাংস নিয়ে
সিদ্ধ করো কড়ায় দিয়ে।
গিরগিটি-চোক ব্যাঙের পা,
টিকটিকি-ঠ্যাং পেঁচার ছা।
কুত্তোর জিব, বাদুড় রোঁয়া,
সাপের জিব আর শুয়োর শোঁয়া।
শক্ত ওষুধ করতে হবে
টগবগিয়ে ফোটাই তবে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই ছুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলবে আগুন
ওঠ রে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।

এই পর্যন্ত শুনেই গভীর গম্ভীর গলায় বলে উঠল ছায়া-দানব:

মকরের আঁশ; বাঘের দাঁত,
ডাইনি মড়া, হাঙ্গর ব্যাঁৎ,
ইষের শিকড় তুলেছি রাতে,
নেড়ের পিলে মেশাই তাতে
পাঁঠার পিত্তি, শেওড়া ডাল
গেরন কালে কেটেছি কাল,
তাতারের ঠোঁট, তুর্কি নাক,
তাহার সাথে মিশিয়ে রাখ।
আন গে রে সেই ভ্রূণ-মরা,
খানায় ফেলে খুন-করা,
তারি একটা আঙুল নিয়ে

সিদ্ধ করো কড়ায় দিয়ে।
বাঘের নাড়ি ফেলে তাতে
ঘন করো আগুন-তাতে।

দীননাথ ধুয়ো ধরল তৎক্ষণাৎ—

দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল রে আগুন
ওঠ রে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।

ছায়া-দানব বললে দেওয়াল-কাঁপানো গলায়—

বাঁদর ছানার রক্তে তবে
ওষুধ ঠান্ডা করতে হবে—
তবেই ওষুধ শক্ত হবে।

এইবার চটে গেলেন প্রফেসর।

বললেন, 'এই কি ছড়া কাটার সময়?'

ছায়া-দানব বললে, 'আজ্ঞে না, আপনার এই চেলার ব্রেনে একটা বদবুদ্ধি এসেছে! সেইটাকেই আমি প্রাঞ্জল করে দিলাম। রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোক রাজর্ষি ছিলেন তো, দূরদ্রষ্টা ঋষি। যদিও তাঁর নোবেল প্রাইজ লোপাট হয়ে গেছিল— কিন্তু আজকের এই পৃথিবীর আপদের সুরাহা তিনি হাজার হাজার বছর আগে লিখে গেছিলেন। যদিও ম্যাকবেথ-নাটকের অনুবাদ— তা হলেও একটা মন্ত্র।'

প্রফেসর সত্যি সত্যিই কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'মন্ত্র! মরছি নিজের জ্বালায়, এখন মন্ত্র শুনে কী হবে?'

ছায়া-দানব বললে, 'আজ্ঞে, বিজ্ঞানে যা হয় না, মন্ত্রশক্তিতে তা হয়। ম্যাজিক। ইচ্ছাশক্তিটাও তো একটা ম্যাজিক।'

প্রফেসর মাথা চুলকে বললেন, 'তা বটে। ম্যাজিকও তো একটা পাওয়ার। একটা অমোঘ শক্তি।'

ছায়া-দানব বললে, 'আজ্ঞে। আপনারা আমাকে গড়েছেন, ছায়াজগতের সুলুক সন্ধান তাই জেনে ফেলেছি—'

উদার কণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'আমি কি একা গড়েছি। আমি শুধু আইডিয়া দিয়েছি। মেহনতটা করেছে এই দীননাথ।'

দীননাথ বললে, 'তা করেছি। মোটা মাথায় যা হয় না, মোটা গতরে তা হয়— মানছেন তা হলে।'

গুরুশিষ্যের এই কথাকাটাকাটি থামিয়ে দিয়ে বললে, ছায়া-দানব, 'এই পৃথিবীটা তো

আর ছোট নয়। মানুষ এখনও অনেক। ঘরে ঘরে ইচ্ছাশক্তি জড়ো করার মেশিন না-পৌঁছে দিলে, আমি তো তৈরিই হতাম না।'

'টেলিপ্যাথি যন্ত্র,' বিড়বিড় করে গেলেন প্রফেসর, 'ইচ্ছাশক্তি সব মানুষেরই আছে। তাকে ফোকাস করাটাই আসল কাজ। টেলিপ্যাথি মেশিন আমার আবিষ্কার—'

'কিন্তু ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার বাহাদুরি আমার।' বুক ফুলিয়ে বললে দীননাথ, 'লক্ষ লক্ষ ইচ্ছাশক্তির ফোকাস ঘটেছে, তবেই না—'

ছায়া-দানব বললে, 'আমার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যা বলছিলাম। ছায়া দুনিয়ার অনেক খবরও যে জেনে ফেলেছি।'

'যথা?' শুধোলেন প্রফেসর।

'ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে যা বোঝায়। ছায়া-মায়ার জগৎ। ভারচুয়াল রিয়ালিটি।'

'এলিমেন্টাল।' বিড়বিড় করে বললেন প্রফেসর।

আজ্ঞে, 'সবিনয় বললে ছায়া-দানব, 'ছায়ার চাইতেও সূক্ষ্ম দেহে যে অস্তিত্বরা এই ভূমণ্ডলের সর্বত্র বিরাজ করছে অনাদি কাল থেকে, তাদের সাহায্য নিন।'

চমকে উঠলেন প্রফেসর, 'বটেই তো। বটেই তো। তুমি সূক্ষ্মশরীরীদের কথা বলছ।'

'আজ্ঞে।' অ্যানি বেসান্ত, লেডবিটার, ব্লাভাটস্কি— এঁরা তো হাজার হাজার বছর, আগে এই সূক্ষ্মদেহীদের কথা বলে গেছেন।'

এই প্রথম মাথা চুলকোতে দেখা গেল প্রফেসরকে, 'তা... হ্যাঁ... ওঁরা তো প্রাচীন শাস্ত্র থেকেই এসব তত্ত্ব জেনেছিলেন—'

'প্রত্যক্ষ করেছিলেন অতীন্দ্রিয় নয়ন দিয়ে। সাদা চোখে যাদের দেখা যায় না দিব্য চোখে তাদের দেখা যায়।' ছায়া-দানবের কণ্ঠস্বর এখন বিলক্ষণ সিরিয়াস।

আমতা আমতা করে প্রফেসর বললেন, 'কি' কিন্তু আ-আমি যে বস্তুবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করি—'

ছায়া-দানব বললে, 'তাতে কী? বস্তু থেকেই তো অবস্তু... অবস্তু থেকেই বস্তু। কোয়ান্টাম মেকানিক্স তো অনেক আগেই স্ট্রিং থিয়োরি কপচে গেছে। সেই আদি ভাইব্রেশন থেকে সব পরমাণুর সৃষ্টি হয়েছে। সেই আদি ভাইব্রেশন সূক্ষ্ম-লোকের— অদেখা লোকের পরমাণুও তো সৃষ্টি করেছে... তারাই তো সূক্ষ্মদেহী... ভারচুয়াল রিয়ালিটি... অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব। ম্যাটার থেকে এনার্জি, এনার্জি থেকে ম্যাটার।'

প্রফেসর বললেন, 'টমাস আলভা এডিসন অবশ্য এরকম একটা মেশিন বানিয়েছিলেন বলে শোনা যায়—'

'সে মেশিন আর পাওয়া যায়নি, এই তো?' ফট করে বলে উঠল দীননাথ।

কটমট করে তাকালেন প্রফেসর, 'তাই তো শুনেছি।'

সবিনয় দীননাথ বললে, 'শ্রদ্ধেয় স্যার, আমি কিন্তু অন্যরকম শুনেছি। এডিসন রকমারি ফিলজফি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যেতেন। ছুৎমার্গ তাঁর মধ্যে ছিল না। থাকা উচিত নয়। যেখানে রহস্য সেখানেই নতুন কিছু।'

প্রফেসর বললেন, 'আইনস্টাইন নিজেই অবশ্য একদা বলেছিলেন, আমাদের সব

অনুভূতির মধ্যে সুন্দরতম হল বিস্ময়। সেই আদি অনুভূতি থেকেই জন্ম নিয়েছে প্রকৃত শিল্প আর প্রকৃত বিজ্ঞান।'

দীননাথ বললে, 'তা হলেই দেখুন, এডিসন ভূত নিয়ে গবেষণা করে কিছু অন্যায় করেননি, নিজে যদিও পুরো নাস্তিক ছিলেন—'

'আমিও তাই,' বিড়বিড় করে গেলেন প্রফেসর। 'আমি অজ্ঞেয়বাদী। তবে... ইয়ে... এই সবের পেছনে যে একটা কিছু আছে... একটা সত্যি কিছু... তা তো উড়িয়ে দিতে পারি না।'

কথাটা লুফে নিল দীননাথ, 'এগজ্যাক্টলি। যা রটে, তার কিছু বটে। এডিসন বিশ্বাস করতেন ব্রহ্মাণ্ডময় বিরাজ করছে একটা ইনটেলিজেন্স— কিন্তু নেই ব্যক্তিত্ব। ইনটেলিজেন্স রয়েছে প্রতিটি প্রাণী, প্রতিটি উদ্ভিদের মধ্যে—'

'জ্ঞান দিয়ো না,' রেগে যাচ্ছেন প্রফেসর।

তোয়াক্কা না-করে বলে যাচ্ছে দীননাথ, 'উনি বিশ্বাস করতেন, ইনটেলিজেন্স একটা এনার্জি— তার বিনাশ নেই। একটা মস্ত রিজার্ভারে যেন সেই এনার্জি ফিরে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা কোষ ইনটেলিজেন্ট। কোনও কোষ বেশি ইনটেলিজেন্ট— সেই কোষ যা করতে পারে, অন্য কোষ তা পারে না। গাছের কোনও কোষ মাটি থেকে জল পাম্প করে পাতায় পৌঁছে দিতে পারে, কোনও কোনও কোষ পাতার মধ্যে জটিল ক্রিয়া চালিয়ে পাতার মেটাবলিজম, ইয়ে, বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে যায়। আমার পাকস্থলি জানে কীভাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বানাতে হয়— আমি তা জানি না।'

রেগে গেলেন প্রফেসর, 'এসব লেকচার আমার জানা আছে।'

গোঁয়ার গোবিন্দ দীননাথকে তখন বক্তৃতা রোগে পেয়েছে। ঝড়ের বেগে বলে যাচ্ছে, 'এডিসন বলেছিলেন, মানুষ যখন মরে, তার বডি থেকে সব ইনটেলিজেন্স উবে যায়, বডি পচে যায়। ইনটেলিজেন্স চলে যায় এক ধরনের অবহেলিত জায়গায় যেখানে তার আর কোনও দরকার নেই। কোনও প্রয়োজনে লাগবে না—'

গর্জে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'জ্ঞান দিচ্ছ?'

'আজ্ঞে না। আপনার কথাই আপনাকে বলছি। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। প্রফেসর, গোটা পৃথিবীটা ছাইয়ের গাদা হতে চলেছে। তাই বাঁচবার চেষ্টা করছি।'

একটু নরম হলেন প্রফেসর। দীননাথের মতো আকাট মূর্খ তিনি নন। যা জানি না, তা নেই— এহেন সবজান্তা মনোভাব তিনি দেখান না। আর এই একটা কারণেই তিনি বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক হয়ে আছেন— তাঁকে টেক্কা দিতে কস্মিনকালেও কেউ ছিল না। এখনও নেই।

তাই ভাবলেন, বোকা চ্যালা বচন ঝাড়ছে যখন, তখন একটু শুনেই যাওয়া যাক।

বললেন ঈষৎ সদয় স্বরে, 'কী বলতে চাও?'

দীননাথ ভরসা পেল। বললে, 'এডিসন বলতেন, মানুষ মারা গেলে তার ইনটেলিজেন্স কোনও একটা জায়গায় থেকে য়ায়— আর একটা বডি পাকড়াও করার আগে পর্যন্ত। আমি বলতে চাই... আমি বলতে চাই—'

গর্জে উঠলেন প্রফেসর 'ভূতপ্রেতের জগৎটাই সেই দেহহীন ইনটেলিজেন্সের জগৎ, এই তো?'

'আজ্ঞে। আর একটা বডিতে ঢোকবার আগে পর্যন্ত ভূত-দুনিয়ায় থেকে যায়।'

খ্যাঁক করে উঠলেন প্রফেসর, 'দ্যাখো ছোকরা, মেমারি আমার সাংঘাতিক শার্প। হাজার হাজার বছর আগে কী পড়েছি, ভাসছে চোখের সামনে। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে একটা আর্টিকল বেরিয়েছিল আমেরিকান ম্যাগাজিন পত্রিকায়—'

বাকি কথাটা গড়গড় করে বলে গেল দীননাথ, 'প্রবন্ধটার নাম ছিল, এডিসন পরলোকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে চেষ্টা করছেন। আর্টিকলটা লিখেছিলেন বি. সি. ফোর্বস— পরে যিনি 'ফোর্বস' ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

থ হয়ে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। ছোকরার এলেম আছে বটে। গুরুকে টেক্কা মারছে!

দীননাথের স্মৃতি-কপাট তখন দু'হাট— 'এক মাস পরে 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' ম্যাগাজিনে বেরোয় এডিসনের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার— যে সাক্ষাৎকারে এডিসন প্রেত-জগৎ আর মৃত্যুর পরেও সব শেষ হয়ে যায় না— এই মনোবিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন। থেকে যায় ব্যক্তিত্ব আর ধীশক্তি— আর, থেকেই যদি যায়, তা হলে বেঁচে যারা আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও চলতে থাকে। তাই যদি হয়, তা হলে প্রেত মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করার একটা যন্ত্র বানাব ঠিক করছি।'

হুঁ হুঁ করে ঘাড় নেড়ে নেড়ে প্রফেসর বললেন, 'জানি হে জানি, উনি মেশিন একটা বানিয়েছিলেন। বিখ্যাত প্রেতচক্রী জোসেফ ডানিঙ্গার-কে দেখিয়েও ছিলেন।'

দীননাথ বললে, 'তার আগে স্বনামধন্য ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম ক্রুকস-এর সঙ্গে বিস্তর আলোচনাও করেছিলেন—'

'কারণ, স্যার ক্রুকস নিজেই যে ভূতেদের ছবি তুলেছিলেন—'

'যা দেখে এডিসন বলেছিলেন, যাদের ফটো ক্যামেরায় এসে যায়, তাদের সঙ্গে মেশিন মারফত কথা বলা যাবে না কেন? মেশিন মারফত ভূতেরা শরীরী হতে পারবে না কেন?'

চিন্তিত মুখে বললেন প্রফেসর, 'কিন্তু তাই নিয়ে বিস্তর ব্যঙ্গ চিত্রও তো ছাপা হয়েছিল ফরাসি নিউজপেপারে।'

'কিন্তু', বললে দীননাথ, 'মরেও তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ রেখে গেছিলেন এডিসন। ১৯৩১ সালের অক্টোবরে মারা যান রাত তিনটে বেজে চব্বিশ মিনিটে, তাঁর তিন সহকারীর ঘড়িও বন্ধ হয়ে গেছিল ঠিক ওই সময়ে।...'

'কিন্তু মেশিনটা? পাওয়া যায়নি, কেমন? মেশিন তৈরির নকশা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি,' প্রফেসর এখন যেন আত্মকথনের মুডে, 'আজও তা রহস্যে ঢাকা।'

বলা শেষ করে গুম মেরে গেলেন প্রফেসর। ছায়া-দানব দুলে দুলে এতক্ষণ ধরে শুনে যাচ্ছিল গুরু আর চ্যালার কথাকাটাকাটি।

এখন বললে মার্জিত হেঁড়ে গলায়, 'বলছিলাম কী, এডিসন যা পেরেছিলেন, আপনি তো তা পারবেনই। উনি ভূত হয়ে গিয়ে বিরক্ত হতে চাননি বলেই মেশিন আর নকশা ভ্যানিশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন যে ওঁকেই দরকার... ইয়ে... ওঁর ভূতকে দরকার।'

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'আম্বা দেখে আর বাঁচি না। ভূতকে আমি পাব কোথায়?'

সবিনয়ে বললে ছায়া-দানব, 'আজ্ঞে, আপনার হুকুম পেলেই সে চেষ্টা করতে পারি। ভূতলোকের মধ্যে দিয়েই তো আমার আনাগোনা। ছায়া দিয়ে গড়া যে।'

কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে রইলেন প্রফেসর।

তারপর বললেন, 'দ্যাখো চেষ্টা করে। এই বেটি ধূমাবতীকে তাড়াতে হলে ডাইনি মন্ত্রে কাজ হবে না— ভূত পেতনি দরকার।'

'পৃথিবীটা নিষ্প্রাণ হওয়ার আগে,' বললে দীননাথ।

একটু পরেই শূন্যের মধ্যে গলে গলে ভ্যানিশ হয়ে গেল ছায়া-দানব।

সে জায়গায় যেন বাতাস জমাট হয়ে গড়ে দিল সাদা রঙের এক প্রেতচ্ছায়াকে, একটা সাহেব!

নাকি সুরে গর্জন ছেড়ে সাহেব বললেন, 'হোয়াট ননসেন্স! আমাকে ডিসটার্ব করা হচ্ছে কেন?'

সবিনয়ে প্রফেসর বললেন, 'দেখুন মশায় এডিসন, আপনিও বৈজ্ঞনিক; আমিও বৈজ্ঞানিক। আমরা তো চাই পৃথিবীটার যেন মঙ্গল হয়।'

নাকি হুংকার ছেড়ে এডিসন বললেন, 'অনেক উপকার করেছি। এবার বিশ্রাম দরকার।'

প্রফেসর টিটকিরি ছাড়লেন, 'সে কী কথা! বৈজ্ঞানিকরা কখনও বিশ্রাম নেয় না। আপনি তো খাঁটি বৈজ্ঞানিক বলেই ভুবনবিখ্যাত—'

'সে ছিলাম চার হাজার বছর আগে। ইলেকট্রিক বাল্‌ব আবিষ্কার করে নিজেই ফাঁপরে পড়েছি। মরেও জ্বলছি। এত আলোয় টেকা যায়? সাংঘাতিক ভাইব্রেশন। অসহ্য!'

'ভূত হয়ে নিশ্চয় আপনার ব্রেন আরও খুলেছে?' প্রফেসর যেন বিনয়ের অবতার।

সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন এডিসন, 'এ প্রশ্ন কেন?'

'আপনার খাসা ব্রেনটার খেল দরকার।'

'খোশামুদ আমি হেট করি।'

'তা হলে সোজা কথায় আসা যাক। এই পৃথিবীটা ভিনগ্রহী মেয়েছেলেদের খপ্পরে চলে গেছে, তা তো জানেন।'

'হাড়ে হাড়ে বুঝছি। এত অ্যাটমিক মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে গোটা পৃথিবী জুড়ে, টিকতে পারছি না।'

'তা হলে আছেন কোথায়?'

'ভাগাড়ে, জঙ্গলে, শ্মশানে, কবরখানায়— যেখানে যেখানে মশাল জ্বলে না।'

'তা হলে তো বেশ নিরিবিলি অঞ্চলেই আছেন! মরছি যে আমরা।'

'মরুক, মরুক, সবই মরুক, সংখ্যা বাড়ুক প্রেতমহলে।'

'কিন্তু হঠাৎ একসঙ্গে সব্বাই পটল তুললে জায়গা দিতে পারবেন না যে।'

'ধুস! একসঙ্গে মরতে যাবেন কেন? আস্তে আস্তে মরুন।'

'আপনি তা হলে কিছুই জানেন না।'

'যত কম জানা যায়, তত ভাল। মরে সেটা বুঝেছি। সবজান্তা, মন্ত্রী আর পুলিশ— এদের

ভূতেরা পছন্দ করে না। অজ্ঞানের অন্ধকারের মতো খাসা জায়গা আর নেই। প্রেতদুনিয়ায় সেটা আছে।'

প্রফেসর এবার একটু রেগে গেলেন, 'ভূতেরা এত বাজে বকে জানতাম না। আমরা ভূত হতে চাই না। আমাদের বাঁচান।'

এবার একটু উৎসুক দেখা গেল এডিসন সাহেবের প্রেতচ্ছায়াকে। বললেন, 'হয়েছেটা কী?'

'ভিনগ্রহী মেয়েছেলেগুলো গোটা পৃথিবীটাকে শ্মশান বানিয়ে দিতে চায়।'

'পশু-টশু সমেত?'

'আজ্ঞে।'

'তা হলে তো খুব মুশকিল। পশু-ভূতের সঙ্গে মানুষ-ভূত— সে এক ঝকমারি।'

'তা হলে হেল্প করুন।'

'ঝেড়ে কাশলেই তো হয়। কী করতে হবে?'

'এই ন'টা ভিনগ্রহিণীকে এমন ভয় দেখান যেন অক্কা পায়।'

'ধুস। সে আর এক মুশকিল। আমরা সব কুলীন ভূত, মানে পৃথিবীর খাঁটি ভূত। অন্য গ্রহের ভূত, ইয়ে, পেতনি ঢুকে পড়লে অশান্তি বাড়বে।'

প্রফেসর একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'কথাটা ঠিক। এরা হাড়বজ্জাত, তার ওপর চারখানা করে হাত। দেখতে অতি বিটকেল। ভূতেরাও ভিরমি খাবে— '

'উপরন্তু অতিশয় ফিচেল। তাই না?'

'সেইজন্যেই ওদের খপ্পর থেকে বাঁচতে চাই। ওদের মাথা খারাপ করে দিলে হয় না? খুব ভয় দেখিয়ে?'

এডিসন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'সে আর এক ঝকমারি হবে। পাগলি ভিনগ্রহিণী সব তছনছ করে ছাড়বে।'

'তা হলে?' প্রফেসর বিলক্ষণ চিন্তিত।

চিন্তিত এডিসন সাহেবের ভূত-ও। তবে, ব্রেন তো খাসা। মতলব এসে গেল মাথায়। বললেন, 'একটা কাজ করা যেতে পারে। অর্ধচন্দ্র দেওয় যাক।'

'পেঁদানি?'

'এগজাক্টলি। ধোলাই দেওয়ার মতো ওষুধ আর হয় না। বিশেষ করে ভূতের হাতে মার। পাঁই পাঁই করে পালাবে। তাড়িয়ে নিয়ে যাব স্পেসশিপের দিকে— অবশ্যই অদৃশ্য অবস্থায়— যাতে দেখতে না পায়।'

'তারপর? আকাশে উঠেই তো মারণ-গ্যাস ছড়িয়ে দেবে।'

'ননসেন্স,' বললেন এডিসন-ভূত, 'এই যে একে টেলিপ্যাথি মেশিন দিয়ে বানিয়েছেন,' ছায়াদানবকে দেখিয়ে, 'এ তো মনের শক্তি দিয়ে পাথরও গুঁড়িয়ে দিতে পারে। বিগড়ে দিক মারণ গ্যাসের সমস্ত মেশিন।'

'ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া,' লাফিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'তারপর যাতে জীবন নিয়ে আর ফিরে আসতে না-পারে, সেই ব্যবস্থাটা করতে হবে।'

'সেটা কী?' জুলজুল করে তাকালেন এডিসন সাহেবের প্রেতমূর্তি।

'স্পেসশিপের স্টিয়ারিং গিয়ার যেন লক্‌ড হয়ে গিয়ে গোঁৎ মারে সূর্যের দিকে।'

খনখন করে হেসে বললেন এডিসন প্রেতমূর্তি, 'খাসা আইডিয়া! নিরাপদ থাকুক গোটা সৌরজগতের প্রেতজগৎ। কিন্তু... কিন্তু', বলে একটু মিইয়ে গেলেন ভদ্র... ইয়ে... প্রেতমূর্তি।

'কীসের কিন্তু?' প্রফেসর খরখরে চোখে তাকালেন।

'ইয়ে... মানে... 'মরা' শব্দটাকে উলটো করে কেউ যদি আওড়ায়, তা হলে তো আমরা ফক্কা হয়ে যাবে।'

অভয় দিলেন প্রফেসর, 'ডোন্ট ফিয়ার। ওই ভদ্রলোকের রাজত্ব যখন আর নেই, তখন আমরা আর শব্দটাকে উচ্চারণই করব না।'

এর পরের ব্যাপারটায় ইচ্ছে করেই একটু নাটক জুড়ে দিয়েছিল ছায়া-দানব। সব কেরামতি এডিসন সাহেব নিয়ে নেবেন। তা তার সহ্য হয়নি। একটু নাটক করেছিল— ওঁর কাছে সামান্য— কিন্তু ফলটা হয়েছিল দেখবার মতো। এইবার আসা যাক সেই কাহিনিতে।

নয় অবতারনি শেষ শলাপরামর্শ করবার জন্যে জড়ো হয়েছিল যে পাতাল হলঘরে— যে ঘরে ঢোকবার একটামাত্র পথ বন্ধ করা ছিল পাথরের কপাট দিয়ে— আচমকা তা ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ঢুকে পড়ে নয় আহুকন্যার সামনে নয়-ছয় নাচ শুরু করেছিল ছায়া-দানব। কোথায় লাগে নটরাজের প্রলয়নাচন...

তারপরেই ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছিল একটার পর একটা অ্যাটম মশাল— যাতে ভূতপেতনিদের আসতে অসুবিধা না হয়।

নয় রানির চক্ষু যখন চড়কগাছ, ঠিক তখন নেচে নেচে হলঘরে ঢুকে পড়েছিল কিম্ভূতকিমাকার ভূতপেতনির দল। প্রত্যেকের চোখ জ্বলছে ধকধকে ভাঁটার মতো... গা থেকে ঠিকরে যাচ্ছে যেন লকলকে আগুন...

আসলে সবটাই ভূত-ম্যাজিক। জাদুসম্রাট ভূতানন্দের কারসাজি— জীবদ্দশায় তিনি ম্যাজিক বিজ্ঞানে মস্ত বৈজ্ঞানিক ছিলেন... পরলোকে গিয়ে এলিমেন্টাল সায়ান্স, মানে, ভৌত পদার্থসমূহের গবেষণায় বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখিয়ে ভূত-বিজ্ঞান অথবা ভৌত বিজ্ঞানকে নোবেল প্রাইজ নেওয়ার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ চুরি যাওয়ার পর থেকে নোবেলে অরুচি এসে গেছে ভূত লোকেও।

নয় আহু-শয়তানি এইরকম সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানা চার হাজার বছরেও দেখেনি। এলিমেন্টাল সায়েন্সের নামই কখনও শোনেনি— তা নিয়ে গবেষণা করার আইডিয়াও মাথায় আসেনি।

ফলে, আতঙ্কে আত্মারাম খাঁচাছাড়া অবস্থায় চার হাত শূন্যে ছুড়তে ছুড়তে তারা পবনবেগে দৌড়ে গেছিল তাদের স্পেসশিপের দিকে। পৃথিবী আক্রমণ করেছিল উনত্রিশখানা স্পেসশিপ নিয়ে। পৃথিবীর ডাকাবুকোগুলো বহুত লড়াই করে, কুড়িটাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, নিজেরাও অবশ্য খতম হয়ে গেছিল।

কিন্তু এখনও ন'খানা তো আছে। নিয়মিত সার্ভিস করে সেগুলোকে চালু রাখাও হয়েছে। ট্রাইটন-এর অ্যাকটিভ উষ্ণ প্রস্রবণে মাঝে মাঝে স্নান করতে যায়, দূর থেকে সূর্য-র ঠিকরে ঠিকরে আগুন শিখা ছুটে যাওয়া দেখতে যায়— ঠিক যেন আতসবাজির খেলা, শুক্রগ্রহে বেড়াতেও যায়— সেখানকার মেঘে ঢাকা আকাশ ভেদ করে চারশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াসে গা গরম করে নেয়, সজীব আগ্নেয়গিরিগুলোকে তুবড়ির মতো জ্বলতে দেখে বিলক্ষণ আমোদ পায়, বুধগ্রহের সেকেন্ডে পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিবেগে ৮৮ দিনে সূর্য প্রদক্ষিণ দেখে বেশ মজা পায়— ঠিক যেন পৃথিবীর একটা চাঁদ। যদিও চাঁদের চেয়ে শতকরা চল্লিশ ভাগ বড় আর অনেক ঘন, বুধের ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে বিলক্ষণ গবেষণা করে, কেননা, বুধের লৌহকেন্দ্র আর চৌম্বকক্ষেত্র পৃথিবীর প্রায় অনুরূপ বলে এই গ্রহে আর একটা উপনিবেশ গড়া যায় কিনা ভাবে; বৃহস্পতি গ্রহের বৃহত্তম চাঁদ ট্রাইটন-এর অ্যাকটিভ উষ্ণপ্রস্রবণ দেখে মোহিত হয়— অথচ ট্রাইটন পৃষ্ঠ ভয়ানক ঠান্ডা— সৌরজগতের কোনও গ্রহ-উপগ্রহের পিঠ এত ঠান্ডা নয় মাইনাস ২৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস— প্রায় সবটাই নাইট্রোজেন বরফে ঢাকা থাকে; বৃহস্পতি গ্রহের ৬১টা চাঁদে পিকনিক করে নেচে নেচে; পৃথিবীর চেয়ে ৭৫৫ গুণ বড় যেন গাণিতিক ছকে গড়া পেল্লায় শনিগ্রহের আংটি দেখে তাজ্জব হয় আর ভাবে এমন একটা খাসা জায়গায় দুর্গ বানিয়ে কিছু আহু-তনয়াকে বসিয়ে রাখলেই তো গোটা সৌরজগৎটাকে পাহারা দেওয়া যায়— দুর্গ থাকবে শনির আংটির ওপর— অন্য কোনও ভিনগ্রহী এদিকে ঘেঁষলেই তাড়িয়ে দেবে তৎক্ষণাৎ।

এই শনিগ্রহের দিকেই চম্পট দেওয়ার মনস্কামনা নিয়ে অবশিষ্ট ন'খানা স্পেসশিপের দিকে পাঁই পাঁই করে দৌড়েছিল নয় শয়তানি...

তাথৈ তাথৈ নৃত্য দেখিয়ে ঠিক সেই দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে গণদেব ঈশ্বর— সমস্ত মানুষের ইচ্ছাশক্তির সুবৃহৎ ক্রিস্ট্যাল— হার মেনে যায় নটরাজের প্রলয়নাচন। সেই উদ্দাম রক্ত-জমানো নাচের সামনে বিকট বীভৎস কিম্ভূতকিমাকার ভূত আর পেতনিরা নানারকম অভাবনীয় এবং পিলে চমকানো কায়া পরিগ্রহ করে উদ্দাম নাচ নেচে নেচে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ন'খানা স্পেসশিপের দিকে... ঢুকিয়ে দিয়েছে ভেতরে।

আর তারপরেই, গণদেব ঈশ্বরের ছায়াশক্তি ন'ভাগ হয়ে গিয়ে ন'খানা স্পেসশিপে ঢুকে গিয়ে বিগড়ে দিয়েছে মারণ গ্যাসের মেশিন...

ত্রাহি ত্রাহি অবস্থায় নয় আহু-তনয়া যখন নিজের নিজের স্পেসশিপে গ্যাঁট হয়ে বসে পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে উঠে গেছে, ঠিক তখনই শেষ চালটা দিয়েছিল ছায়া-দানব— সমস্ত মানবমনের সংহত ইচ্ছাশক্তি...

ন'টা স্পেসশিপই গোঁৎ খেয়েছিল সূর্যরূপ জ্বলন্ত কটাহের দিকে— যে সৌর-উনুন থেকে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে জ্বলন্ত প্লাজমা— রক্তরস— ঠিকরে গিয়েই ঠান্ডা হয়ে ঘন হয়ে ভাসছে সূর্যর আলোক-মণ্ডলে...

ন'খানা পেল্লায় ভিনগ্রহী মহাকাশ পোত গোঁৎ খেয়ে ঢুকে গেল সেই আগুনের কড়ার মধ্যে...

তারপর?
ওঁ শান্তি... ওঁ শান্তি... ওঁ শান্তি...

লেখাটা শেষ করে এবং প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে শুনিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কীরকম লিখলাম?'

প্রফেসর বললেন, 'পাঠক বলবে, উৎকৃষ্ট গাঁজার দম।'

সম্ভাবনা-সাহিত্য এইরকমই হয়। প্রফেসর যদি না-বোঝেন, বয়ে গেল। পাঠিয়ে তো দিই সম্পাদকের কাছে— তিনি সমঝদার...

তা ছাড়া, 'সময়-গাড়ি'টাই তো প্রমাণ রয়েছে প্রফেসরের বিজ্ঞান মন্দিরের পাতাল ঘরে।

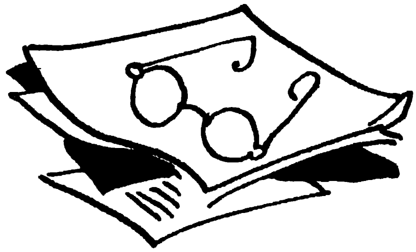

টেক্কা দিলেন প্রফেসর

গল্পের আগের গল্প

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বিস্তর কিমাশ্চর্যমতঃপরম কাণ্ড ঘটিয়ে গেছেন। গল্পখোর পাঠক-পাঠিকা সেসব কাহিনি পড়ে কখনও চোখ কপালে তুলে, কখনও গালে হাত দিয়ে ভেবে ভেবে রক্তচাপ বাড়িয়ে ফেলেছে। বেশির ভাগ পাঠক-পাঠিকা আমার মুণ্ডপাত করেছে, অথবা, চোখা-চোখা ভাষায় লম্বা লম্বা চিঠি লিখেছে। সব পত্রেরই মোটামুটি মর্ম একটাই : দীননাথ নাথ নামক ধাপ্পাবাজের ডাইরিটা এখুনি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হোক। দীননাথ নাকি গঞ্জিকা সেবন করে, বানিয়ে বানিয়ে উদ্ভট যত কাহিনি মগজের খুপরি থেকে বের করে।

এসব বচন আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে অনেক কিম্ভূত কাণ্ডই তো ঘটে গেছে দুনিয়াময়। চক্ষু চড়কগাছ করার মতো ঘটনা। সে সবের কিনারা কি আজও হয়েছে? কখনও কি হবে?

যাক গে, আজ আমি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত। যে কাহিনি লিখতে বসেছি, তা এমনই চুল-খাড়া-করা কাণ্ড যে পাঠক সাধারণ অবশ্যই আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়েও সংশয় পোষণ করতে পারে এবং প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কিমাকার কাণ্ডকারখানা নিয়েও হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়ে।

এইবার আসা যাক চুল খাড়া-করা সেই কাহিনিতে।

গল্প হল শুরু

রেডিয়ো যখন ঘরে ঘরে পৌঁছোয়নি, তখন রেডিয়ো জিনিসটার বিপুল আদর ছিল। এখন আর তেমন নেই। রেডিয়োকে হঠিয়ে দিয়ে টেলিভিশন এখন ঘরে ঘরে। তবে টিভি পরদার বিকিরণে মস্তিষ্ক নাকি তেমন সুস্থ থাকে না, এই দুঃসংবাদ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে, রেডিয়োর প্রত্যাবর্তন ঘটছে নতুন করে।

চাঁদনি চকের বাজারে গেলেই বুঝতে পারা যায়, রেডিয়ো আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কী নিদারুণ কাণ্ডকারখানা চলছে সেখানে।

এমনি একটা দোকানেই এই কাহিনির শুরু।

দোকানটার নাম 'ক্যালকাটা রেডিয়ো'। মালিকের নাম আকবর আজাদ। একসময় নিজে রেডিয়ো বানিয়েছে আর বেচেছে। এখন একপাল মেকানিক রেখেছে। তাদের হাতে-কলমে শিখিয়ে নিয়েছে। উদয়াস্ত তারা রেডিয়ো বানাচ্ছে। শোরুম থেকে খদ্দেরদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে রকমারি ক্যাবিনেটের আর মডেলের সেইসব রেডিয়ো।

আকবর আজাদও তাই চায়। কোনও শ্রমিককেই বেশিদিন টিকিয়ে রাখেনি। হায়ার অ্যান্ড ফায়ার— এই তত্ত্বে বিশ্বাসী আকবর আজাদ।

তাই একটু অবাক হয়েছিল ঢিলেঢালা জামা গায়ে হেঁড়ে-মাথা বেঁটে লোকটাকে স্টোররুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। একটু শক্ত গলায় বলেছিল, 'কারখানা খুলেছে আধঘণ্টা আগে। যাও, বসে পড়ো। নতুন এসেছ?'

'নতুন?' অস্ফুট স্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে তিন অক্ষরের শব্দটা উচ্চারণ করে লোকটা।

চোখ পাকিয়ে বেঁটে বিটলের আপাদমস্তক দেখে নিল আকবর আজাদ। অদ্ভুত চেহারা। মাথায় চকচকে টাক। মুখ রক্তহীন। চামড়া কুঁচকে গেছে। বুড়োটে নয়, অথচ মাথায় চুল নেই।

আকবর আজাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল একটু একটু করে। মাথায় গোলমাল আছে মনে হচ্ছে। কারখানার জ্যাকেট যখন গায়ে রয়েছে, কারখানারই লোক।

কলার খামচে ধরে, এক ধাক্কায় অ্যাসেম্বলি রুমে বেঁটে মর্কটকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল আকবর আজাদ, 'যাও, বসে পড়ো, কী করতে হবে, জানা আছে?'

'আমি তো বানাই। নিজে বানাই। আমি ওস্তাদ। কেউ যা পারে না, আমি তা পারি।'

'তা হলে তাই করো।'

বেঁটে মর্কট লোকটা বিহ্বলভাবে হাত বুলিয়ে নিয়েছিল তেলা মাথায়। এতক্ষণে নজর গেছিল গায়ের জ্যাকেটে, চোখ গোল গোল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গেছিল নীলবসন। বিষম বিস্মিত। বাচ্চা ছেলে নতুন জামা পরলে যেমন অবাক হয়। এ-জামা গায়ে এল কীভাবে?

মনে পড়েছে— যে-ঘরে ফুটে বেরিয়েছিল একটু আগে... সর্বপ্রথম... বিদ্‌ঘুটে এই জামাটা ঝুলছিল সেই ঘরে।

কিন্তু গায়ে দিতে গেল কেন?

মনে পড়েছে... মহাযাত্রার সময়ে নিজের বসন তো উড়ে গেছিল... বিলীন হয়ে গেছিল।

মহাযাত্রা?... কীসের মহাযাত্রা?

স্মৃতিভ্রংশ রোগে পেয়েছে মনে হচ্ছে! সব ভুলে মেরে দিয়েছে। এইরকমটই হয়। এ যে নিছক যাত্রা নয় বলা যায়— হ্যাঁ... হ্যাঁ... মহাপতন! কিন্তু কোত্থেকে?

নাঃ! কিচ্ছু মনে করা যাচ্ছে না। আবছা মনে পড়ছে পতনের বেগ যখন কমে আসছিল, যখন একেবারে থেমে গেছিল, তখন বিষম ঘোর লেগেছিল। ঘোর কেটে যেতে দেখেছিল

মস্ত একটা ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। কত রকমের কলকবজা রয়েছে সেখানে। বিদঘুটে যন্ত্রপাতি।

তখন হাজারো চেষ্টা করেও কিসসু মনে করতে পারেনি। এখানে কেন? কীভাবে? কোত্থেকে?

তার পরেই মনের পরদায় ভেসে উঠছিল আবছা আবছা... টুকরো টুকরো স্মৃতির কণা!

সে ছিল হাতের কাজে পোক্ত। জিনিস-টিনিস বানাতে মহা ওস্তাদ। কিন্তু এখন রয়েছে যেখানে, এ-জায়গাটা কস্মিন কালেও দেখেনি।... জিনিসপত্তরগুলোও বিলকুল অচেনা।

এদিকে-সেদিকে কাজ করছে অনেক মানুষ। অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস বানিয়ে চলেছে। কিন্তু সাদাসিধে। মামুলি রেডিয়ো থেকে এটা-সেটা। এইসব ছেলেখেলার জায়গা তো তার জন্যে নয়। দুম করে এসে পড়েছে বটে, কিন্তু সে-যে অন্য কাজে এক্সপার্ট— রঙ্ক বানানোয় দক্ষ।

কিন্তু এই মানুষ-ফানুষগুলো বানাচ্ছে অন্য জিনিস। রঙ্ক বলা চলে না কিছুতেই। তার মতো রঙ্ক বানানোর জাদুকর কারিগর হাত নোংরা করে না এইসব খেলনা বানিয়ে।

রঙ্ক বানানো যাক।

নিরিবিলি একটা কোণে গিয়ে বসে পড়েন রঙ্ক-এক্সপার্ট। শুরু হল আজব মেশিন প্রস্তুতি। রঙ্ক তার নাম। এমন রঙ্ক ব্রহ্মাণ্ডে কেউ কখনও দেখেনি।

কর্মশালা বন্ধ হওয়ার হুইস্‌ল বাজল যথাসময়ে। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে একাকার স্রষ্টার চেতনায় তা সাড়া জাগাল না। বিচিত্র অবয়বের প্রলয়ংকর এক রঙ্ক তার সৃষ্টিতে। মানব দর্শনে যা নিছক একটা যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।

যন্ত্রদের ভিড়ে আর এক যন্ত্রের অবস্থান তাই নজর এড়িয়ে গেছিল অন্য কর্মীদের। ছুটির হুইস্‌ল শুনেই উচাটন মন নিয়ে তারা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেছিল কর্মশালা থেকে।

আর ঠিক সেইসময় কাজ শেষ হয়েছিল রঙ্ক নির্মাতার। আর এক কোটিং প্লাস্টিক ভার্নিশ দিলে হয়তো ভাল হত।

থাক। ফিনিশিং টাচ দেওয়ার আর দরকার নেই।

টলতে টলতে রঙ্ককে স্টক রুমে চালান করে দিল রঙ্ক নির্মাতা। মিলিয়ে মিলিয়ে দেখল অন্য যন্ত্রগুলোর সঙ্গে। আধুনিকতম মডেলের পায়াওলা বেশ কয়েকটা কায়দা-করা মডেলের সঙ্গে মানিয়ে যাচ্ছে!

ফিরে গেল কর্মশালায়। বিস্মৃতির যে কুয়াশা চেপে ছিল মনের ওপর... সামান্য কিছু... এবার মিলিয়ে গেল সেটুকুও।

বিষম উল্লাসে থরহরি কম্প জেগেছিল বিস্ময়কর বিশ্বকর্মার অনু-পরমাণুতে।

বটে! বটে! বটে! ঘোরের মধ্যে ছিলাম এতক্ষণ।

চমকিত চাহনি মেলেছিল আশেপাশে। দৌড়ে ঢুকে গেছিল স্টোররুমে— যে রুম থেকে বেরিয়েছিল সর্বপ্রথম। গায়ের আলখাল্লা খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল হুকে। তারপর গেছিল এক কোণে। হাতড়ে হাতড়ে বুঝে নিয়েছিল আশপাশের বাতাস কীরকম। ভালই। মনখুশ মেজাজে বসে পড়েছিল শূন্যে— মেঝে থেকে তিনফুট ওপরে। অদৃশ্য হয়ে গেছিল পরক্ষণেই।

তারপর যা ঘটেছে

'সময় হল গিয়ে একটা বক্র ব্যাপার।' সুশান্ত বললে তার স্ত্রীকে, 'যেখান থেকে শুরু, পরিশেষে ফিরে আসে সেখানেই।'

বলে, সামনের সোফায় দু'পা তুলে দিয়ে বসল আয়েশ করে। এখন তার বৈকালিক আহারের সময়। মেজাজ দিলখুশ।

পাশের রান্নাঘর থেকে টুং-টাং খট-খট ঝন-ঝন আওয়াজ ভেসে আসছে। রান্নায় ব্যস্ত সুশান্ত-গৃহিণী অমলা। জবাব না-দিয়ে চালিয়ে গেল রন্ধন প্রক্রিয়া।

পা নাচাতে নাচাতে বকে গেল সুশান্ত, 'গতকাল ঠিক এইসময়ে একখানা ডিমের ওমলেট খেয়েছিলাম, ডবল ডিম ভাজা খাব আজ। কথাগুলো কানে ঢুকছে?'

অমলা বললে, 'আমি এখন দুধ ফোটাচ্ছি।'

নিরাশ সুশান্ত কী আর করে। হেঁশেল যখন হাতে নয়, তখন ওই একখানা ডিমভাজাই পেটে চালান করা যাক। তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে চেয়ে রইল সদ্য-কেনা নতুনতম মডেলের রেডিয়োটার দিকে। কন্ট্রোল প্যানেলটা দেখবার মতো। ব্রেন আছে বটে মডেল মেকারের।

সন্ধে ঘনাচ্ছে। তেপায়া ইলেকট্রিক লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিল সুশান্ত। যন্ত্রটাকে এবার চালানো দরকার। দাম ভালই নিয়েছে। নিশ্চয় বিস্তর দমবাজি ঠাসা আছে ভেতরে। ইলেকট্রনিক যুগ চলছে যে।

এটাকে বুঝতে গেলে একেও আগে খাওয়াতে হবে। এর খাদ্য তো ইলেকট্রিক কারেন্ট। ব্যাটারি নয়। চেয়ে চেয়ে দেখল সুশান্ত। নিশ্চয় ট্রানজিস্টরের জটিল জটাজাল আছে ভেতরে। হেঁট হয়ে দেখল নীচে। প্লাগ লাগাবার ফুটো রয়েছে বটে একটা প্যানেলে। দেওয়ালের সকেট থেকে কর্ড টেনে এনে ঢুকিয়ে দিল ফুটোয়।

তারপর, দু'পাশে সরিয়ে দিল রোলিংশাটার। ডায়ালখানা দেখবার মতো। এ-যন্ত্র যে বানিয়েছে, নিঃসন্দেহে সে বড়দরের শিল্পী।

আচমকা প্রদীপ্ত হল ডায়াল। একটা নীলচে রশ্মি ঠিকরে এসে আছড়ে পড়ল সুশান্তর চোখে। সঙ্গে সঙ্গে খুট খাট, ক্লিক ক্লিক চিঁ চিঁ আওয়াজ শোনা গেল রেডিয়ো বপুর ভেতরে। খুব আস্তে। হিসেব করে করে যেন আওয়াজ হয়ে চলেছে।

থেমে গেল হঠাৎ।

সুশান্ত তো থ। এ আবার কী। নিজেই জ্বলছে, নিজেই চেঁচাচ্ছে, নিজেই থেমে যাচ্ছে।

চোখ পিটপিটিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ডায়ালের সুইচ-টুইচগুলো টেপাটেপি করেছিল সুশান্ত।

অমনি ভেতর থেকে ভেসে এসেছিল মন্দ্রমন্থর কণ্ঠস্বর। যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা ড্রিমি ড্রিমি গলাবাজি, 'সাইকোলজি প্যাটার্ন চেক করা হল, রেকর্ড করা হয়ে গেল।'

চমকে উঠেছিল সুশান্ত। কণ্ঠস্বরটা যেন কীরকম-কীরকম। যান্ত্রিক তো বটেই, কিন্তু যেন অপার্থিব।

ক্যাটালগ বইটা হাতড়ানো যাক। উঠে গেছিল বুক র‍্যাকের সামনে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে দেশলাই তুলে নিয়েছিল নিচু টেবিল থেকে। একটা কাঠি জ্বালিয়ে নিয়ে সিগারেটের ডগায় লাগানোর আগেই নিভে গেল। আর একটা কাঠি বের করতে যাচ্ছে, একটা আওয়াজ শুনল পেছনে।

স্ট্যাচু হয়ে গেল ঘাড় ফিরিয়েই...

রেডিয়ো এগিয়ে আসছে সুশান্তর দিকে!

ব্যাপার তো অতি সৃষ্টিছাড়া। রেডিয়ো মহাশয় তো ছিল ঘরের একদম ওদিকের দেওয়াল ঘেঁষে। আচমকা তিনি চলমান হয়েছেন কেন?

চলন্ত রেডিয়ো থমকে গেল সুশান্তর ঠিক সামনে, অবয়বের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা শুঁড়। শুঁড়ের মাঝখান দিয়ে পাকিয়ে দেশলাই কেড়ে নিল সুশান্তর শিথিল মুষ্টি থেকে। শুঁড়ের ডগা দিয়ে একটা কাঠি টেনে নিয়ে খস করে ঘষল বারুদ মাখানো জায়গায়। জ্বলন্ত কাঠি এগিয়ে দিল সুশান্তর ঠোঁটে ধরা সিগারেটের ডগায়।

যতই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হোক না কেন সুশান্ত, সিগারেটের ডগায় শিখা থাকলে টান তো মারবেই। একটু জোরেই টেনেছিল। অটোমেটিক রিফ্লেক্স, খকখক কাশি এসেছিল গলায়। গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে গেছিল নাক মুখ দিয়ে। দৃষ্টিহীন হয়ে গেছিল বুঝি মুহূর্ত কয়েকের জন্যে।

দর্শনশক্তি যখন ফিরে এসেছিল, তখন দেখেছিল। রেডিয়ো গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেওয়ালের গা-ঘেঁষে— যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানে।

সেকেন্ড কয়েক মুহ্যমান দৃষ্টি মেলে থাকার পর হেঁকে ডেকেছিল বউকে, 'শুনছ!'

রান্নাঘর থেকে ভেসে এসেছিল স্ত্রীর কাংস কণ্ঠ, 'এখন মাংস চলছে।'

সুশান্ত পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল রেডিয়োর সামনে। চেয়ে রইল দ্বিধাজড়ানো চোখে। পা কোথায় ক্যাবিনেটের? রেডিয়ো সাঁ করে যখন চলে এসেছিল, তখন পা নিশ্চয় আছে।

কিন্তু নেই। মসৃণ দারুময় ক্যাবিনেট বলেই তো মনে হচ্ছে।

'খাবার রেডি।' অমলার হাঁক ভেসে এল রান্নাঘর থেকে।

অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে ধীর চরণে কিচেন-কাম-ডাইনিং রুমে প্রবেশ করেছিল সুশান্ত।

অমলাকে আজ রাতের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে হবে। বোনের বাড়িতে যে বোনপোর অন্নপ্রাশন।

ঘাড় হেঁট করে নাকে মুখে গুঁজে নিয়ে সেই কর্তব্যই করেছিল সুশান্ত। সুটকেস সমেত অমলাকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে ফিরে এসেছিল বাড়িতে।

অমলা বলে গেছিল, 'এঁটো বাসনগুলো সিঙ্কে রেখে গেলাম। ধুয়ে রেখো।

সুতরাং সেই কাজ করতেই রান্নাঘরে প্রবেশ করেছিল সুশান্ত।

ঢোকবার আগে আড়চোখে দেখে নিয়েছিল রেডিয়ো মহাশয়কে। এখন তো সে প্রশান্ত। নিশ্চুপ। যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না।

সিঙ্কের কল খুলে দিয়ে ঝটপট হাত চালিয়ে যখন এঁটো বাসন সাফ করছে, টেলিফোন

বেজে উঠল বসবার ঘরে। হাত মুছতে মুছতে দৌড়ে এল সুশান্ত।

ফোন করছে ধরণী দাশগুপ্ত। সাইকোলজি পড়ায় কলেজে। সুশান্ত পড়ায় অন্য সাবজেক্ট।

ধরনী বলছে, 'একা আছিস?'

সুশান্ত বললে, 'হ্যাঁ।'

'চলে আয়। আড্ডা মারা যাক।'

ঠিক এই সময়ে টুং-টাং, ঝন ঝন আওয়াজ ভেসে এল কিচেন থেকে!

চমকে উঠে সুশান্ত বলেছিল ধরণীকে, 'হোল্ড অন।' বলেই রিসিভার টেবিলে রেখে, দৌড়েছিল কিচেনের দিকে।

থমকে গেছিল দোরগোড়ায়। চক্ষু বিস্ফারিত। থালাবাসন ধুয়ে রাখছে রেডিয়ো।

চেয়ে চেয়ে সেই অসম্ভব দৃশ্য দেখবার পর ফিরে এসে তুলে নিয়েছিল রিসিভার।

ধরণীর প্রশ্ন, 'কী হল?'

সুশান্ত বললে, 'থালাবাসন মেজে দিচ্ছে আমার রেডিয়ো।'

খুক খুক করে হেসে ধরণী বললে, 'বটে!'

সুশান্ত বললে, 'রিংব্যাক করব একটু পরে। এখন রাখছি।'

রিসিভার রেখে কিচেনের চৌকাঠে এসে থমকে দাঁড়াল সুশান্ত। রেডিয়ো এখন ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লিকলিকে কয়েকটা শুঁড় দিয়ে ঝটপট থালা বাটি মেজে নিয়ে পাশের স্টিল র‍্যাকে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখছে। ভিজে অবস্থায় নয়, ন্যাকড়া দিয়ে মুছে মুছে। শুঁড়গুলো চলছে চাবুকের মতো। ঠ্যাং গজিয়েছে মনে তো হচ্ছে নিরেট।

'হচ্ছেটা কী?' বলেছিল সুশান্ত।

জবাব আসেনি।

পা টিপে টিপে চৌকাঠ পেরিয়ে কাছ থেকে দেখেছিল রেডিয়োকে। ডায়ালের তলায় একটা ফুটো থেকে বেরিয়ে এসেছে একগোছা শুঁড়। ইলেকট্রিক কর্ড ঝুলছে পাশে। ব্যাটারি নেই তো চলছে কী শক্তিতে?

পা টিপে টিপে বসবার ঘরে এসে যখন সিগারেট খুঁজছে সুশান্ত, গ্যাস স্টোভের পাশ থেকে দেশলাইয়ের বাক্স তুলে নিয়ে সাঁ করে ওর সামনে চলে এল রেডিয়ো।

ধরণীকে ফের ফোন করল সুশান্ত, 'চোখের রোগ আমার নেই। মাথার রোগও নেই। রেডিয়োটা এইমাত্র আমার সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে গেল।'

ধরণী বললে, 'হ্যালিউশিনেশন বলেই তো মনে হচ্ছে।'

সুশান্ত বললে, 'কথা বাড়িয়ে লাভ কী? আমার হাঁটু কাঁপছে। মনস্তত্ত্ব তোমার বিষয়। ঝাঁ করে এসে ঝট করে দেখে যাও আমার হাঁটুর ঠকঠকানি।'

ধরণী বললে, 'আসছি দশ মিনিটের মধ্যে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে সুশান্ত দেখে নিল রেডিয়ো ব্যাটাচ্ছেলে এখন কী করছে।

বাসন মাজা শেষ করে কিচেন থেকে বেরিয়ে টুকুস টুকুস করে হেঁটে বসবার ঘরে ফিরে দাঁড়িয়ে গেল আগের জায়গায়।

রোলিংশাটার টেনে সুশান্ত দেখে নিল ভেতরের বোতাম-টোতাম কলকবজা। অস্বাভাবিক কিছু তো চোখে পড়ছে না।

দেখা যাক রেডিয়ো চলে কি না।

চলছে। লোক্যাল স্টেশন। আওয়াজও চমৎকার।

এবার দেখা যাক অডিয়ো ক্যাসেট চলে কি না।

ঢোকাল ক্যাসেট। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত 'আজি মর্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে।'

কিন্তু জাগল না কোনও ধ্বনিই।

কেন? ডালা খুলে দেখে নিল সুশান্ত। টেপ ঘুরছে ঠিকই, কিন্তু শব্দ বেরোচ্ছে না।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! ক্যাসেট বের করে নিতেই বেজে উঠল দরজার কলিং বেল।

দরজা খুলতেই লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকেই ধরণী বললে, 'কোথায় তোর বিটকেল বেতারযন্ত্র?'

'ওই তো।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে, ধরণী বললে, 'বাসন মেজেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আর কী করেছে?'

'ক্যাসেটের গান চেপে দিয়েছে।'

'কোত্থেকে কিনলি?'

'চাঁদনি মার্কেট থেকে।'

'বোগাস। ক্যাবিনেটখানা অবশ্য বানিয়েছে জব্বর। ইনফো-সিস্টেমস নাকি?'

'আরে না। ওর মধ্যে টেলিভিশন, ডিভিডি, এমপি-থ্রি প্লেয়ার, খেলার ব্যবস্থা, ওয়েভ ব্রাউজিং, ভিডিয়ো রেকর্ডিং ব্যবস্থা, মাইক্রোসফট খেলা, কয়েকশো গান, ডজনখানেক সিনেমা— কিসসু নেই। স্রেফ রেডিয়ো আর টেপরেকর্ড প্লেয়ার।'

'সুশান্ত, তুই ভয়ানক ব্যাকডেটেড। তাই একখানা নাম্বারওয়ান রদ্দি মার্কা মেশিন কিনে পস্তাচ্ছিস। ফেলনা জিনিসের খেলনা কিনে মরেছিস।'

'ওটা খেলনা নয়। খেলনাকে চালাতে হয়। ও নিজে থেকে চলে।'

ধরণী ইচ্ছে করেই বকিয়ে যাচ্ছিল সুশান্তকে। প্রলাপ বকছে কিনা লক্ষ করছিল। ব্রেন ঠিক আছে তো? গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'তোর গা তো গরম নয়। তবে মাথাটা গরম হয়েছে। মাথা গরম করিসনি, কেস যখন হাতে নিয়েছি, তদন্ত করে যেতে হচ্ছে সবদিক থেকে। এইমুহূর্তে তোর ব্রেন খুব একটা বিগড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। এবার তদন্ত হোক হারামজাদা রেডিয়োকে নিয়ে।' রেডিয়োকে অন্তর্ভেদী চোখে দেখতে দেখতে বলে গেল ধরণী, 'হে রেডিয়ো এবার তোমার পালা। তোমাকে নিশ্চয় ভূতে পেয়েছে। বেতার ভূত। যেহেতু তোমাকে দর্শন করতে এতটা পথ দৌড়ে এসেছি, সুতরাং অতিথি আপ্যায়নে যেন ত্রুটি না হয়। একখানা গান শোনাও।'

বলতে বলতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের ক্যাসেট খুলে নিয়ে ব্রেকড্যান্সের একটা ক্যাসেট ঢুকিয়ে দিল ধরণী।

ঢোকাতে-না-ঢোকাতে শুরু হয়ে গেল জগঝম্প বেতাল বাজনা। যে বাজনা নাচিয়ে ছাড়ে।

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল সুশান্তর। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পরে বলেছিল, 'ফক্কর রেডিয়ো। আমার সঙ্গে ন্যাকরামি! ধরণীর কাছে টাইট খেয়েছে!'

হৃষ্টস্বরে একটু নেচে নিয়ে ধরণী বললে, 'মানুষ চেনে এই রেডিয়ো— যেমন জহুরি চেনে জহর।'

এইবার তেলেবেগুনে জ্বলে গিয়ে সুশান্ত বললে, 'ওরকম বেতালবাজনা সব মিঞাই বাজাতে পারে। বাজাক দেখি বিসমিল্লার সানাই। হুঁ হুঁ বাবা, রাগ-রাগিনীর বাজনা— দেখি মুরোদখানা।'

রসিক রেডিয়ো শুনিয়ে গেল তিন তালের আলাপ।

ধীরে সুস্থে সোফায় বসল ধরণী। পলকহীন চোখে চেয়ে রইল কিম্ভূত রেডিয়োর দিকে।

পাশেই ধপ করে বসে পড়ল সুশান্ত। খপ করে সিগারেটের কেস টেনে নিয়ে একটা সাদা কাঠি ঝুলিয়ে নিল দুই ঠোঁটের ফাঁকে।

রেডিয়ো চলমান হল তৎক্ষণাৎ। গোটা ঘর পেরিয়ে এল। নিচু টেবিল থেকে দেশলাই তুলে নিল। সুশান্তর সিগারেটের সামনে একটা কাঠি জ্বালিয়ে, সিগারেটে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, ফিরে গেল নিজের জায়গায়— দেওয়ালের গা ঘেঁষে।

একটা কথাও না-বলে চেয়ে চেয়ে দেখল ধরণী। তারপর, নিজেই একটা সিগারেট লাগাল ওষ্ঠপ্রান্তে।

রেডিয়ো রইল নিস্পন্দ।

সুশান্ত বললে, 'কী বুঝলি?'

ধরণী বললে, 'রোবট। লেটেস্ট গ্যাঁড়াকলের। নিছক কলের পুতুল নয়, ব্রেন আছে। কার তৈরি?'

'জানব কী করে? রেডিয়ো যারা বানিয়েছে দিন কয়েক আগে ফুল পেমেন্ট করেছি। ডেলিভারি দিয়ে গেল আজ বিকেলে।'

'পেমেন্ট যখন করেছিলি, রেডিয়ো তখন এইসব খেলা দেখিয়েছিল?'

'না।'

ধরণী চিন্তা-তন্ময়, 'রেডিয়ো নয়, নতুন ধরনের রোবট। কেউ এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছে তোর ওপর দিয়ে। কাল চলে যা দোকানে, হামলা কর।'

'তার আগে ক্যাবিনেট খুলে দেখা যাক কী আছে ভেতরে।'

কিন্তু ক্যাবিনেট খোলা গেল না। স্ক্রু দিয়ে সাঁটা নিশ্চয়, কিন্তু সেসব স্ক্রু কোথাও চোখে পড়ল না। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে মসৃণ কঠিন ক্যাবিনেট-গাত্রে এতটুকু আঁচড়ও ফেলা গেল না। প্যানেল খোলা তো দূরের কথা।

সুশান্ত বললে, 'আমার গা-ছমছম করছে। এই ভুতুড়ে রেডিয়োর সঙ্গে একবাড়িতে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়।'

ধরণী বললে, 'ধুস! আমি তো আঁতকে উঠিনি। মজা পাচ্ছি। ব্রেন আছে বটে রেডিয়ো-রোবটের— সরেস ব্রেন।'

ধরণী চম্পট দিয়েছে নিজ আবাসে। উতলা অবস্থায়।

একই অবস্থায় সুশান্ত একখানা গরম গরম গোয়েন্দা উপন্যাস নিয়ে বিছানায় লম্বমান হতে-না-হতেই দেখল, রেডিয়ো এসে ঢুকছে শোবার ঘরে। জমজমাট বইখানা খুব আস্তে আস্তে টেনে নিল হাত থেকে।

চমকে গিয়ে সুশান্ত বলেছিল, 'এটা আবার কী ইয়ারকি!'

রেডিয়ো ফিরে গেল বসবার ঘরে। সুশান্ত গেল পেছন পেছন। দেখল, বই রাখা হল বইয়ের তাকে— যেখানে ছিল, সেখানে।

ক্ষণেক দাঁড়িয়ে থেকে শয়নকক্ষে ফিরে এল সুশান্ত। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে খাটে লম্বমান হল বটে, কিন্তু পাতলা ঘুম ঘুমোতে হল ভোর পর্যন্ত।

ভোরে বসবার ঘরে ঢুকে দেখল, রেডিয়ো দাঁড়িয়ে রেডিয়োর জায়গায়। এক সেন্টিমিটারও নড়েছে বলে তো মনে হয় না।

স্বস্তিহীন অবস্থায় যাচ্ছেতাই টোস্ট আর ওমলেট বানাল সুশান্ত। তারপর বানিয়ে নিল এককাপ কফি। এককাপই বরাদ্দ করেছেন ডাক্তার। মাত্রা যেন না-ছাড়ায়। যা হিড়িক উঠেছে হার্টের রোগের।

কিন্তু শরীর যে টিস টিস করছে। আর এক কাপ খাওয়া যাক।

গার্জেন হয়ে গেল রেডিয়ো— কাল রাত থেকেই হয়েছে। এখন একটু বাড়াবাড়ি করে গেল। হাত থেকে খুব আলতোভাবে টেনে নিল দ্বিতীয় প্রস্থ কফি।

আর তো সহ্য হয় না। প্যান্ট-শার্ট পরে বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সুশান্ত। কাজের ফাঁকে চাঁদনির রেডিয়ো কোম্পানিকে একটা ফোনও করেছিল। সেলসম্যান বলেছিল, স্ট্যান্ডার্ড মডেল— লেটেস্ট কম্বিনেশন তো থাকবেই। খদ্দের যে চায়। জ্বালাচ্ছে? কিন্তু সেলসম্যানের কিচ্ছু করার নেই।

সুশান্ত বলেছিল, 'বুঝলাম... কিন্তু জানতে চাই বানিয়েছিল কে এই মর্কটটাকে?'

ঘাবড়ে গিয়ে সেলসম্যান বলেছিল, 'স্যার, এক মিনিট... লেজার দেখে বলছি... বানিয়েছিল মজিদ।'

'মজিদকে দিন।'

মজিদ কিন্তু খুব একটা আলোকপাত করতে পারল না বিটকেল বেতার নির্মাণের ক্ষেত্রে। ভাসা ভাসা জবাব। পার্টসগুলো এনে রেখেছিল স্টকরুমে। না না, সিরিয়াল নম্বর বসানোর রেওয়াজ এখানে নেই... ছোট কারখানা তো!

দুপুরে খাওয়ার সময়ে ধরণী এল সুশান্তর অফিসে।

'রোবট সম্বন্ধে নতুন কোনও সমাচার আছে?'

নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুশান্ত বললে, 'না। এই যে ধূমপান করছি উইদাউট বাগড়া, এটাই এখন সমাচার। ব্যাটাচ্ছেলের গারজেনি এখানে নেই।... ফোন করেছিলাম রেডিয়ো হারামজাদাদের। নো আলোকপাত। সিরিয়াল নাম্বার পর্যন্ত দেয় না। অ্যাসেম্বল করেছে কোন রাসকেল, সেটা জেনে বলবে।'

'ইন্টারেস্টিং। এনিথিং মোর?'

বই আর কফি সম্পর্কিত ঘটনাদ্বয় নিবেদন করে গেল সুশান্ত।

ধরণী বললে, 'তোর ব্রেনের যা অবস্থা, গোয়েন্দা গল্পের টেনশন তোর সহ্য হবে না। বই টেনে নিয়েছে ওই জন্যেই। কিন্তু সেটা বোঝবার মতো ইনটেলিজেন্স এল কী করে রোবট রেডিয়োর মধ্যে?'

সুশান্ত বললে, 'অর্ডিনারি রোবট নয় বলে।'

'কিন্তু তুই তো ছিলিস শোবার ঘরে। রেডিয়ো ছিল বসবার ঘরে। জানল কী করে তুই রহস্য সাসপেন্স নিয়ে পড়ছিস?'

'এক্স-রে দৃষ্টির মতো কিছু প্রয়োগ করে। সুপারফাস্ট স্ক্যানিং আর সব কিছুর অতিদ্রুত যোগফল দিয়ে।'

'অমানবিক ব্রেন?'

'আমার আন্দাজ তাই।'

'সুশান্ত, ব্রেন নিয়ে এইমাত্র একটা লেকচার শুনে এলাম।'

'তুই নিজেই তো একটা ব্রেন-বিশেষজ্ঞ। তোকে লেকচার দিল কে?'

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বললেন, 'ধরণী, এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, সেকেন্ডে সেকেন্ডে তার বিচার বিশ্লেষণ করে যাচ্ছে ব্রেনের একটা অংশ তোমার ভাবাবেগ দিয়ে। কথার প্রসেসিং ঘটছে ব্রেনের সামনের ছোট্ট অংশে। ভাবাবেগ ছড়িয়ে দিচ্ছে রাশি রাশি কেমিক্যাল। দুটো সিস্টেম কাজ করছে ভিন্ন স্পিডে। কথা প্রসেসিং চলছে মিলি সেকেন্ডে, অন্যান্য অংশ নিজের নিজের স্পিডে। সার কথা এই, ধরণী, ব্রেন একখানা একক 'চিন্তাশীল যন্ত্র' নয়।'

প্রফেসর মনের মতো ছাত্র পেয়ে আপনভোলা মহেশ্বরের মতো বকে গেলেন।— 'ধরণী, ব্রেনবিজ্ঞান নিয়ে ইদানীং মাথা ঘামাতেই হচ্ছে— যদি মামুলি ব্রেনকে অতি-ব্রেন করে তোলা যায় এই মতলবে। কিন্তু তুমি যে কেসটা নিয়ে এলে, তাতে তো মনে হয়, অতি-ব্রেন ঘরেই এসে হাজির হয়েছে। রিসার্চ করার ব্রেন হাতের নাগালের মধ্যেই। আগন্তুকের ব্রেনের জটিলতার জট যদি খোলা যেত।'

'আপনার নতুন সফটওয়্যার প্রোগ্রাম দিয়ে?'

জুলজুল করে একটু তাকিয়ে থেকে প্রফেসর বললেন, 'হাঁড়ির খবরটা জানলে কী করে? টপসিক্রেট যে! হ্যাঁ, প্রোগ্রামটার নাম দিয়েছি কমপ্রিহেনসিভ অ্যাটেনশন ব্যাটারি। একটা ব্রেনের ক্ষমতার দৌড় কতদূর, তা মাপবার মেশিন।'

সাততাড়াতাড়ি বললে ধরণী, 'এই রেডিয়োটার ব্রেন মাপা যাবে— যদি ব্রেন থাকে?'

ভাবুক চোখে বলেছিলেন প্রফেসর, 'যদি থাকে ব্রেন! মূল প্রশ্নটা ওইখানেই। থাকলেও মনের ক্ষমতা মাপা যাবে কি?'

'মন!' থতিয়ে গেছিল ধরণী, 'ব্রেন চালাচ্ছে ব্রেনকে। মন কি একটা অদৃশ্য অর্গ্যান? দেহযন্ত্র?'

'আমি তো বলব, মন হয়তো একটা প্রাণবীজ— যে শক্তি চালাচ্ছে ব্রেন নামক যন্ত্রকে।'

তর্কের মধ্যে না-গিয়ে ধরণী বলেছিল, 'আর এই ব্রেনের মাত্র দশ পার্সেন্ট খাটিয়েই মানুষ এত উঁচুতে এসেছে। এখন প্রশ্ন একটাই— এই রেডিয়ো ব্যাটাছেলের আদৌ যদি কোনও ব্রেন থাকে, তার কত পার্সেন্টেজ খাটছে? ফুল পার্সেন্টেজ খাটলে কী হতে পারে?'

'ব্রেনটার নিউরো-কেমিস্ট্রি জানা দরকার। তোমার ব্রেনের মধ্যে রয়েছে ডজন ডজন যন্ত্র। খাটছে অতি সামান্য। রেডিয়ো ব্রেনের, যদি থাকে ব্রেন— ক'খানা যন্ত্র আছে যদি জানা যায়—।'

'তা হলে ভেতরের উপাখ্যান জানা যাবে।' ধরণী বলেছিল প্রফেসরের চোখে চোখ রেখে, 'নিউরোকেমিক্যাল সেরোটানিন আদৌ আছে কি না। আপনি কি স্যার, নিউরোসায়ান্স আর ব্রেন ইমেজিং টেকনোলজি নিয়ে নতুন কিছু ভেবেছেন?'

মাথা নেড়ে নেড়ে প্রফেসর বলে গেছিলেন, বৎস ধরণী, তা হলে তত্ত্বকথাই বলে যাই। তোমার ব্রেন, আমার ব্রেন, এই দীননাথের ব্রেন খুবই জটিল, খুবই ঠাসবুনট সন্দেহ নেই— কিন্তু অতিশয় ধীরগতি— স্লো। ধরা যাক, একটা ইনসুলেটেড বস্তুর মধ্যে ঠেসে ঠেসে মাল্টিমিলিয়ন রেডিয়ো অ্যাটম ইউনিট দিয়ে একটা গ্যাজেট তৈরি করা গেল— রেজাল্ট দাঁড়াবে একটা ব্রেন। সেই ব্রেনের অসংখ্য ইউনিট পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাবে আলোর গতিবেগে। তত্ত্বগতভাবে, যে ব্রেনের কথা আমি বললাম, সেই ব্রেন— রেডিয়ো অ্যাটমিক ব্রেন— এক এক মিলিসেকেন্ডে বিষয় বুঝে নেবে, বিশ্লেষণ করে নেবে, প্রতিক্রিয়া দেখাবে, মানিয়ে নেবে।'

'যখন যেমন তখন তেমন হবে, এই তো?' ধরণীর চোখে ভেসে গেছিল চাপা উত্তেজনা।

'ইয়েস, ইয়েস, মাই বয়।' উত্তেজনা এখন প্রফেসরের চোখেও, 'এ হেন কল্পতত্ত্বের ভিত্তিতেই আমার জানা দরকার।'

বলে, থেমে গেছিলেন প্রফেসর।

সটান প্রশ্ন বর্ষণ করেছিল ধরণী, 'কী জানা দরকার?'

'রেডিয়োটা এসেছে কোত্থেকে?'

গালে হাত দিয়ে এই পর্যন্ত শোনবার পরেই টেলিফোন এল সুশান্তর নামে। রিসিভার তুলে অপর দিকের কথা শুনে নিয়ে রিসিভার নমিয়ে রেখে সুশান্ত বললে, 'চাঁদনির কোনও কারখানায় রেডিয়োটা তৈরি হয়েছিল দু'হপ্তা আগে। কিন্তু অ্যাসেম্বল করেছে কে, তা কোত্থাও লেখা নেই। আমাকে বলল, ক্যাবিনেট খুলে দেখতে।'

একটু গুম মেরে ধরণী বললে, 'বোগাস। চাঁদনি গুল মেরেছে। ও রেডিয়োকে দু'মাস আগে অ্যাসেম্বল করা হয়নি।'

'কেন হয়নি?'

'রেডিয়োঅ্যাটমিক ব্রেনকে ট্রেনিং দিতে হয়। যেমন, তোর সিগারেট ধরিয়ে দেওয়া।'

'দেখেছে কী করে ধরাই সিগারেট।'

'অনুকরণ করেছে তারপরেই। বন্ধু হে, কোনও গ্যাজেট যখন শিক্ষাগ্রহণের এহেন

ক্ষমতা লাভ করে, তখন তাকে বলা উচিত অতি-আশ্চর্য এক রোবট। তবে হ্যাঁ, এরকম রোবট বানানোর আইডিয়া আজ পর্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিকের মাথায় আসেনি।'

অধ্যাপনা শেষ করে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না সুশান্তর। বসে রইল কলেজের সামনের মাঠে। আনমনে চেয়ে রইল ফুচকাওয়ালার দিকে। খুব ভিড় সেখানে। সবই কলেজের ছেলেমেয়ে।

দেখছে আর ভাবছে, এক জঘন্য ফ্যাশনের হাওয়া বইছে কলকাতায়। নেশা করা। মনে ফুর্তি আনা। ব্রেন আর বডির সর্বনাশ করা।

বুদ্ধিটা মাথায় এল আচম্বিতে। ওর মনে তো এখন ফুর্তিই দরকার। বীভৎস একটা রেডিয়ো-রোবটের সামনে যেতে গেলে মনটাকে গড়ের মাঠ করে যেতে হবে।

অতএব, সেই অপকর্মটি করে, হেলতে দুলতে ট্যাক্সি থেকে বাড়ির সামনে নামল সুশান্ত।

দরজা খুলতেই এগিয়ে এল বসবার ঘরের সৃষ্টিছাড়া রেডিয়ো।

সরু সরু শুঁড় বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল সর্বাঙ্গে খুবই আলতোভাবে— যেন সুগভীর মমতা সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে শুঁড়ের স্পর্শে। সরু বটে, হিলহিলে, লিকলিকে— কিন্তু ধাতব বস্তুর মতো সুকঠিন। নিশ্চল হয়ে যেতে হল সুশান্তকে। টুঁ শব্দটিও বেরোয়নি গলা দিয়ে।

রেডিয়ো প্যানেল থেকে ঠিকরে এল একটা হলুদ আলোকরশ্মি— চোখ ধাঁধিয়ে গেল সুশান্তর। চোখ থেকে রশ্মি নেমে এল ওর বুকের ওপর। আচমকা অদ্ভুত একটা স্বাদ জাগ্রত হল জিভের সর্বত্র।

মিনিট খানেক পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল অত্যুজ্জ্বল রশ্মিরেখা। কিলবিলে শুঁড়গুলো সটাসট অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। রেডিয়ো ফিরে গেল দেওয়ালের গায়ে— আগের জায়গায়।

শিথিল শরীরকে টলতে টলতে, দুর্বল চরণে, সোফার সামনে গিয়ে ছেড়ে দিল নরম গদির ওপর। অবসাদ অদৃশ্য হয়েছে। মন প্রশান্ত। নেশা চম্পট দিয়েছে।

রোবট চাইছে সুশান্ত সুস্থ থাকুক। শিরা উপশিরার অশান্ত নৃত্য শান্ত করে দিয়ে গেল নিমেষে। রোবট এইমুহূর্তে ওর পার্শ্বচর, ওর গার্জেন, ওর শুভানুধ্যায়ী।

সোফা ত্যাগ করে বইয়ের তাকের সামনে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল সুশান্ত। চোখের কোণ দিয়ে রোবট মহাশয়কে দেখতে দেখতে তাক থেকে নামিয়ে আনল 'অসহ্য সাসপেন্স'।

বিফলে গেল না প্রত্যাশা। গতরাতের কাণ্ড ঘটল ফের। আলতোভাবে বই টেনে নিয়ে তাকে রেখে দিল রোবট।

ঘড়ির দিকে নজর রেখেছিল সুশান্ত। দেখে নিয়েছে, শুভাকাঙ্ক্ষী রোবট মহাশয়ের প্রতিক্রিয়ার সময় ঠিক চার সেকেন্ড!

এবার তাক থেকে নামিয়ে আনল এক খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী।

রেডিয়ো রোবট বিলক্ষণ অনড়।

কিন্তু 'সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস' বইটা টেনে নামাতেই আলতোভাবে সেই বই টেনে নিয়ে তাকে রেখে দিল অপার্থিব রেডিয়ো।

প্রতিক্রিয়ার সময় ছ'সেকেন্ড।

মাই গড! রেডিয়ো-রোবট তা হলে গোটা বইখানা পড়ে নিচ্ছে ওইটুকু সময়ের মধ্যে। তার মানে, মহাশয়ের শ্রীমগজে রয়েছে এক্স-রে দৃষ্টি আর অতিদ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা। মানুষের নার্ভকে ফেল করিয়ে দেওয়ার মতো সুব্যবস্থা।

কিছুক্ষণ আকাশ-পাতাল চিন্তা করবার পর খেয়াল হল সুশান্তর, কালকের কলেজে যে বিষয়ের ওপর লেকচার দিতে হবে, তার নোটস ঝালাই করে নেওয়া হয়নি এখনও।

নিয়ে এল নোটস লেখা নোটবই। চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুঝল, কয়েকটা ব্যাপার যাচাই করে নেওয়া দরকার। উঠে গিয়ে রেফারেন্স বইটা নামিয়ে নিতেই রোবট মহাপ্রভু নিঃশব্দে চলমান হয়ে হাত থেকে কেড়ে নিল কেতাবখানা।

ঠোঁট কামড়ে মেজাজ সামলে নিল সুশান্ত। এমনিতেই ওর রগচটা বদনাম আছে। কিন্তু এই রেডিয়ো অথবা রোবটের সামনে তিরিক্ষে মেজাজ দেখাতে গেলে কী কাণ্ড ঘটে বসতে পারে, তা যখন আঁচ করা যাচ্ছে না, তখন ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যাওয়া যাক।

ঠোঁট কামড়ে বসে রইল সুশান্ত। রেডিয়ো এখন মাস্টারি শুরু করেছে। পাঠ্য-অপাঠ্য ব্যাপারে নাক গলিয়েছে। অসহ্য!

আস্তে আস্তে সোফা ছেড়ে উঠে, একলাফে বইয়ের সেলফের সামনে গিয়ে, রেফারেন্স বইখানা ঝপ করে নামিয়েই, ঘর থেকে সাঁ করে উধাও হয়ে গেছিল সুশান্ত— রেডিয়ো স্পন্দিত হওয়ার আগেই!

পরক্ষণেই রেডিয়ো এসেছিল পেছন পেছন। পেছন না-ফিরেই সুশান্ত শুনেছিল খুব মৃদু থপথপ পদধ্বনি।

সবেগে শোবার ঘরে প্রবেশ করেই পাল্লা বন্ধ করে দিয়েছিল। দু'কপাট এক করে দিয়ে ছিটকিনি তুলে দিয়েছিল সুশান্ত।

কিন্তু রেহাই পায়নি। রোবটের সূক্ষ্ম শুঁড়, তারের মতো সরু শুঁড়, দুই কপাটের ফাঁক দিয়ে মোচড় মেরে মেরে ভেতরে ঢুকে ছিটকিনি জড়িয়ে ধরে, ঘুরিয়ে, নামিয়ে দিল নীচে।

পাল্লা ঠেলে ঘরে ঢুকল ক্যাবিনেট। এগিয়ে এল সুশান্তর দিকে। এবার কিন্তু আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেছিল সুশান্ত। কাছে আসতে দেয়নি রেডিয়োকে। ছুড়ে দিয়েছিল বইখানা।

নিপুণ কায়দায় দক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো সেই বই 'ক্যাচ' করে নিয়ে, রবার রবার পা ফেলে ফিরে গিয়ে, যথাস্থানে বই রেখে দিয়েছিল রেডিয়ো। যত আক্রোশ ওই বইয়ের ওপর, বন্ধু অথবা অভিভাবকসুলভ আচরণ শুধু সুশান্তর সঙ্গে!

ফোন এল ধরণীর, 'খবর কী?'

খবর পেশ করল সুশান্ত।

ধরণী বললে, 'তুই যে-বিষয়ে পণ্ডিত, পাণ্ডিত্য ফলাচ্ছে সেই বিষয়ে? তার ওপর তোর নেশা ছুটিয়ে দিয়েছে?

'আলোক রশ্মি বুলিয়ে। আলোয় এ-গুণ থাকে?'

'সাধারণ আলোয় থাকে না। কিন্তু সূর্যের আলো শুভংকর... সূর্যরশ্মির মধ্যে থাকে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি। মানুষের শরীরে ভিটামিন ডি বানিয়ে দেয়। তাই তো এই ভিটামিনের

নাম সৌর ভিটামিন। এইভাবেই নতুন কোনও রশ্মির ভাইব্রেশন শরীরকে প্রশান্ত করতে পারবে না কেন?'

'ধ্বংস তো করতে পারে! সায়েন্স-ফিকশনের রশ্মি বন্দুকের মতো।'

'উদ্ভট চিন্তা ছাড়, সুশান্ত। রেডিয়োরশ্মি তোর পড়াশুনো সেনসর করে যাচ্ছে। গোটা বইটাই যেন পড়ে নিচ্ছে সুপরফাস্ট রি-অ্যাকশন দিয়ে। তাই বলব, এই গ্যাজেট, নিছক রোবট নয়। অতি-প্রাকৃত বিজ্ঞানের অবদান।'

খেপে গেল সুশান্ত, 'জুরাসিক পার্ক' বইটা তো পড়েছিস? দিম ডাইনোসর নবীন চেহারায় এসেছিল। তেমনি এই রেডিয়ো আতঙ্ক—।'

কথা ঘুরিয়ে দিল ধরণী, 'আজ রাতটা আমার বাড়িতে থাকবি?

'না... হ্যাঁ... তার আগে কাটারি দিয়ে কাটব রেডিয়ো হারামজাদাকে, নইলে যাবে পেছন পেছন।'

কথা কেটে দিল ধরণী। সুশান্ত বেফাঁস কথা বলতে শুরু করেছে।

পরের দিন কলেজ ক্যান্টিনে গিয়ে ধরণীকে গতরাতের রিপোর্ট দিল সুশান্ত। 'সভ্যতার উত্থান পতনের ইতিহাস' বইখানা হাত থেকে ছিনতাই হয়েছে শুনে ধরণী বললে, 'কেন ছিনতাই হয়েছে বলে তোর মনে হয়?'

সুশান্ত বললে, 'বইটার মুখপত্রতেই একটা দামি কথা বলা হয়েছে। সভ্যতা সৃষ্টির মূলে থাকে বহু ব্যক্তিত্বের প্রভাব। বুঝলি?'

মাথা চুলকে ধরণী বললে, 'না।'

চটে গেল সুশান্ত, 'আজ সকালে কলেজে এসেই গেছিলাম লাইব্রেরিতে। বইটা আনিয়ে এই বিষয়টা বারবার পড়েছি। একবর্ণও মাথায় ঢোকেনি। তাৎপর্যটা ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে।'

বলে, সেই বই ধরণীর হাতে দিল সুশান্ত। মুখপত্রের পৃষ্ঠা খুলে বললে, 'তুই পড়।'

ধরণী চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'পড়লাম।'

'বুঝলি?'

অবাক হল ধরণী, 'না বোঝার কী আছে?'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'মানে?'

'চোখ পড়ে যাচ্ছে, অর্থটা আবছা হয়ে রয়েছে ব্রেনে। কতবার পড়লাম একই ব্যাপার।

স্থির দৃষ্টিতে সুশান্তর দিকে সেকেন্ড কয়েক তাকিয়ে থেকে ধরণী বললে, 'সেম্যানটিক ব্লক।'

'সেটা কী-রে?'

'তোর ব্রেনে সেই বোঝার জায়গাটা ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনা শুনলাম এই প্রথম। আর ক্লাস আছে? নেই? চল, তোর বাড়ি যাওয়া যাক।'

আধঘণ্টা পরে দুই বন্ধুকে দেখা গেল রেডিয়োর সামনে। নিরীহ দর্শন ক্যাবিনেট। একখানা

প্যানেল খোলবার চেষ্টা করেছিল ধরণী। কিন্তু বৃথাই। ভেতরে কী আছে, তা জানা গেল না।

অগত্যা কাগজ কলম নিয়ে বসল সুশান্তর সামনে। প্রশ্ন করে গেল পরপর— সঙ্গে সঙ্গে সুশান্তর জবাব। একটু পরে বললে, 'তুই তো এ-কথাটা আগে বলিসনি?'

'ভুলে গেছিলাম।'

'রেডিয়ো তোর চোখে আলোর ঝলক মেরেছিল? কথা বলেছিল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ... আচমকা আলো এসে গেছিল ডায়ালে... একটা নীলচে রশ্মি ঠিকরে এসে পড়েছিল চোখের ওপর... তারপর... তারপর... শুনলাম।'

দু'হাতে দু'রগ টিপে ধরে থেমে থেমে বলে গেল সুশান্ত, 'সাইকোলজি প্যাটার্ন চেক করা হল, রেকর্ড করা হয়ে গেল।'

'যান্ত্রিক স্বর? মানুষের গলা নয়?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, না-না!'

'অপার্থিব?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, জড়ানো... টেনে-টেনে কথা বলা... যান্ত্রিক।'

একটু ভেবে নিয়ে ধরণী বললে, 'নেমোসাইন-এর নাম তো শুনেছিস। মেমারির গ্রিক দেবী। নেমোনিক একটা পদ্ধতি— মেমারিকে সাহায্য করার পন্থা। কৃত্রিম নেমোনিক নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়ে গেছে। তোর এই রেডিয়োর মধ্যে নকল মেমারি আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। শেখানো বুলি কপচায়নি— নিজের কথা নিজে বলেছে।'

'কী করে?'

'অন্য এক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত আছে বলে।'

'অন্য সংস্কৃতি বলতে?'

'যা নয় এই পৃথিবীর।'

'ননসেন্স।'

'কিন্তু এলেম আছে তোর মেমারি ব্লক করে দেওয়ার। তোর মন এখন তোর নয়— ওই রেডিয়োর অথবা, রেডিয়ো গাইডেড—'

আনমনে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল সুশান্ত। অমনি ঘরের ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্তে চলে এল রেডিয়ো। খস করে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল সিগারেট।

সভয়ে চেয়ে রইল দুই দোস্ত।

তারপর বললে ধরণী, 'আজ আমার বাড়িতে গেস্ট হয়ে থাক।'

অমনি সুশান্তর মাথার মধ্যে ঝমঝমিয়ে উত্তরটা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, 'না।'

রেডিয়ো নির্দেশিত উত্তর!

পরের দিন কলেজ ক্যান্টিনে এল না সুশান্ত। বাড়িতে টেলিফোন করল ধরণী। রিসিভার ধরল সুশান্তর স্ত্রী অমলা। সম্পর্কে সে ধরণীর ছোট বোন। বিষম উদ্‌বিগ্ন গলায় বললে, 'দাদা, কী হয়েছে তোমার বন্ধুর?'

কথা ঘুরিয়ে দিল ধরণী, 'এলি কবে?'

'কালকে। তুমি এসো... তাড়াতাড়ি।'

দরজা খুলে দিয়েছিল অমলা। বোনের উদ্‌বিগ্ন চোখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে হনহন করে বসবার ঘরে ঢুকে গেছিল ধরণী। আগে দেখে নিয়েছিল রেডিয়ো। তারপর দেখেছিল সুশান্তকে। থুম হয়ে বসে রয়েছে সোফায়। চাহনি শূন্য। চক্ষুতারকা বিস্ফারিত। ধরণীকে চিনতে একটু যেন সময় নিল। ধরণী বললে, 'আছিস কীরকম?'

সুশান্ত বললে জড়ানো স্বরে, 'আছি...'

অমলা বললে টেনশন জড়ানো গলায়, 'দাদা, ডাক্তার ডাকব?'

ধরণী আগে বসল। তারপর বললে, 'রেডিয়োটা ঠিক আছে তো? বেয়াড়া কিছু দেখেছিস?'

'না, তো। কেন দাদা?'

খুলে বলল ধরণী। শুনতে শুনতে অবিশ্বাস আর উৎকণ্ঠা যুগপৎ ফেটে পড়ল অমলার চোখে।

ধরণী বললে, 'বিশ্বাস হল না? বিশ্বাস করাচ্ছি। সুশান্তর ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে দে। রেডিয়ো এসে ধরিয়ে দেবে।'

হল ঠিক তাই।

অমলা বললে, 'রেডিয়ো, না, ভূত?'

'রোবট। তার চাইতেও বেশি। সুশান্তকে ঢেলে গড়ছে। ওর সাইকোলজি প্যাটার্ন চেক করেছি। পালটে গেছে। নিজে থেকে কিছু করার প্রবণতা চলে গেছে। সহজাত বলতে যা বোঝায়— তা নেই। রেডিয়ো যা ভাবাবে তাই ভাববে... যা করাবে, তাই করবে। 'এ-রেডিয়ো মানুষের জ্ঞানের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে। মূর্খ মানুষকে তাই একটু একটু করে নিজের জগতের মতো বানিয়ে নিচ্ছে। রেডিয়ো রূপ আসলে ছদ্মবেশ।'

'ছদ্মবেশ!'

'হ্যাঁ, অমলা। অতি উন্নত এক সভ্যতার পদক্ষেপ ঘটছে পৃথিবীতে ধীরে ধীরে... মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছোবে। মানুষ যে যে জিনিস চেনে, সেই-সেই জিনিসের চেহারা নিয়ে। গ্যাজেটময় বিশ্বকে কন্ট্রোল করবে গ্যাজেটরূপী ধীশক্তি। পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা ধীশক্তি... অতি উন্নত।'

'মনিটরিং করে?'

'হ্যাঁ।'

'গুঁড়িয়ে দাও। দাদা, গুঁড়িয়ে ভেঙে শেষ করে দাও।'

ধরণী একটু দ্বিধা করেছিল। বলেছিল, 'এমন একটা সৃষ্টি নষ্ট করব? কিন্তু তুই যখন বলছিস—।'

কথা আটকে গেছিল ধরণীর। রেডিয়ো এগিয়ে আসছে তার দিকে। মসৃণ গতিবেগ। দাঁড়িয়ে গেল সামনে। ছিটকে সরে যেতে চেয়েছিল ধরণী। পারেনি। চাবুকের মতো লিকলিকে শুঁড় নিমেষে জড়িয়ে ধরেছিল পা থেকে বাহু পর্যন্ত।

পরক্ষণেই ফিকে রশ্মি এসে পড়েছিল ধরণীর দু'চোখে।

মিলিয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ। শুঁড় ঢুকে গেছিল ক্যাবিনেটের ভেতরে। রেডিয়ো ফিরে গেছিল আগের জায়গায়।

নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধরণী।

অমলা এসে সামনে, 'দাদা।'

ধরণী বললে, 'কী রে?'

'রেডিয়ো কেন আলো মেরে গেল তোমার চোখে?'

'আলো!' ধরণী অবাক, 'না তো!'

দাদার দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে অমলা বললে, 'হল কী তোমার?'

গভীর চোখে অমলাকে দেখে গেল ধরণী। মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

ঘড়ি দেখে নিল। ক্লাস নিতে হবে। কলেজে গিয়ে শেখাতে হবে অনেক কিছু। অনেক নতুন ব্যাপার। বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

পলকহীন চোখে রেডিয়োকে দেখছে অমলা।

কী সব বলে গেল দাদা? অতি উন্নত এক সভ্যতার পদক্ষেপ ঘটছে পৃথিবীতে— গ্যাজেটের চেহারায়?

ঘোচাচ্ছি কেরদানি! বিনা পারমিশনে প্রবেশের শাস্তি দেওয়া যাক।

ধাঁ করে চপার নিয়ে এল কিচেন থেকে। মাথার ওপর তুলে কোপ মারতে যাচ্ছে ক্যাবিনেটে— তীব্র আলোক রশ্মি ঠিকরে এল রেডিয়োর ভেতর থেকে। বাতাসে মিলিয়ে গেল অমলা। চপার ঠিকরে গেল মেঝেতে।

সোফায় বসে সেই দৃশ্য দেখল সুশান্ত।

রেডিয়ো বললে জড়ানো গলায়, 'মারণ আক্রমণ আটকানো হল। ধ্বংস শুরু হল।'

তীব্র ঝাঁকুনি লেগেছে সুশান্তর ব্রেনে। ঘোর কাটছে। টলতে টলতে গিয়ে চপার তুলে নিয়ে রেডিয়োকে টার্গেট করতেই আবার ঝলক দিল আলোকরশ্মি। শূন্যে বিলীন হয়ে গেল সুশান্ত। চপার ধক করে পড়ল মেঝেতে।

স্বস্থানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে রেডিয়ো। ক্লিক ক্লিক আওয়াজ হচ্ছে তার রেডিয়ো অ্যাটমিক ব্রেনে।

কথাটা শোনা গেল তারপরে। শ্লথ জড়িত স্বর, 'বাজে পদার্থ। নিকেশ করা হল। ক্লিক! পরের পদার্থর জন্যে প্রস্তুত। ক্লিক!'

প্রফেসর বললেন, 'দীননাথ, ধরণীর খবর নিয়েছ?'

'না।' বললাম ওঁর বৈঠকখানায় বসে।

এমন সময়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ধরণী ঢুকল ঘরে। যান্ত্রিক পদক্ষেপ আর নিষ্প্রাণ চাহনি দেখে মনে হল যেন একটা জোম্বি ঢুকছে ঘরে। হাওয়াই দ্বীপের সেই সব জোম্বি অথবা দানো, যাদের কবর থেকে তুলে এনে হুকুমের চাকর করে রাখা হয়। জীবন্ত মড়া।

খরচক্ষু প্রফেসরেরও নজর এড়ায়নি সেই প্রাণহীন, মানবতাবিহীন চাহনি, চলমান মেশিনের মতো পদক্ষেপ। পরক্ষণেই ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বরে প্রফেসরকে সম্বোধন, 'স্যার, আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম।'

প্রফেসর ভয়ানক ধড়িবাজ। তিনি অমায়িক হেসে বললেন, 'বসো, ধরণী। তোমার কথাই

এখুনি হচ্ছিল। তোমার বন্ধু সুশান্ত আর সেই আশ্চর্য রেডিয়োর খবর জানবার জন্যে উৎসুক আমি।'

ধরণী না-বসে দাঁড়িয়ে থেকে ডাইনে বাঁয়ে দুলতে দুলতে ভাবলেশহীন গলায় বললে, 'আর আশ্চর্য হতে হবে না। সব স্বাভাবিক। সুশান্ত আর তার বউকে বিলীন করা হয়েছে। রেডিয়ো এখন সুপ্রিম কম্যান্ডার।'

'রেডিয়ো?'

'হ্যাঁ। ভিন্ন কালচার, উন্নত বিজ্ঞান, সুপার ইনটেলিজেন্ট গ্যাজেট... এই পৃথিবীতে দরকার। পৃথিবীর কম্পিউটার, মোবাইল, রেডিয়ো আরও অনেক কিছুকে নিজের মতো করে সচল রাখছে। অচল করবে স্যাটেলাইটকে।'

'এই বাণী তোমার মাথায় এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

এতকথা ধরণী যখন বলে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে থেকে, ডাইনে বাঁয়ে দুলতে দুলতে, একঘেয়ে মেশিন মেশিন গলায়, প্রফেসর তখন একবার আমার দিকে চেয়েছিলেন। ওঁর চোখ এক এক সময়ে এক-এক রকম কথা বলে। চোখের মধ্যে দিয়ে কথা ছিটকে আসে। সেই কথা আমার ব্রেনে আছড়ে পড়ে।

সেই মুহূর্তে প্রফেসরের যে নিঃশব্দ হুকুমটা আমার ব্রেনে আছড়ে পড়েছিল, তা এত সুস্পষ্ট যে আমি আমার কাষ্ঠাসন ছেড়ে সবেগে ছিটকে গিয়ে আমার বলীবর্দ বাহুশক্তি দিয়ে সবলে জাপটে ধরে ধরণীকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম অরগন বক্সে।

কিন্তু কী এই অরগন বাক্স?

বারান্তরে, এই বাক্স প্রহেলিকা নিয়ে বিস্তারিত বলব, এখন শুধু এইটুকুই বলে রাখি, কসমিক এনার্জি দিয়ে ঠাসা এই বাক্সবন্দি হলে যে-কোনও জীবের সত্তাকে পালটে দিতে পারেন প্রফেসর।

দিলেন আধঘণ্টা পর। অরগন বাক্স থেকে বেরিয়ে এল একটা হনুমান— আমি বাক্স খুলে দেওয়ার পর।

জোড়হস্তে মনুষ্যকণ্ঠে জড়তাহীন সুস্পষ্টস্বরে হনুমান-তথা-ধরণী বললে, 'কী হুকুম?'

প্রফেসর বললেন, 'হুকুম দেওয়ার আগে তোমাকে একটা লেকচার দিতে চাই। এই দীননাথ মহাপ্রভুকে কিছুদিন আগেও বলছিলাম, গুপ্তবিজ্ঞান নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ চিন্তা করছি। এই বিজ্ঞানেরই নগণ্য শাখা ছিল এককালের কিমিয়া বিজ্ঞান অথবা অ্যালকেমি— যা পরশমণির সন্ধান করে গেছে। সিসে থেকে সোনা তৈরির গুহ্য প্রক্রিয়া নিয়ে কত কাণ্ডই না করেছে। এইচ রাইডার হ্যাগার্ড তাঁর একটা উপন্যাসে দেখিয়ে দিয়েছেন, আগ্নেয় পাহাড়ের গুপ্ত গুহায় কীভাবে মন মন সোনা বানিয়ে গেছেন 'শী' নামস সেই মহিলা, যিনি ছিলেন অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী এবং সেই ক্ষমতা রাখতেন।'

একনাগাড়ে দমাদম বাক্যবুলেট চালিয়ে গিয়ে দম নিতে যেই থামলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, ফট করে বলে বসলাম, 'লোকে যে বলবে গঞ্জিকার দমবাজি।'

'বলুক। টিভি, স্যাটেলাইট, রেডিয়ো, কম্পিউটারও ছিল একদিন গঞ্জিকার দমবাজি। আজ

তা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া সায়ান্স। বাগড়া দিয়ো না, দীননাথ, ওহে ধরণী, ইয়ে, হনুমান, লঙ্কা দহন করেছিল কে? লম্বা ল্যাজে আগুন ধরিয়ে হনুমান। এটা কি সম্ভব? বৎস ধরণী, আমি যদি বলি, অতি পুরাকালে এক ধূমকেতুর পুচ্ছকেই হনুমানের ল্যাজ বলে কল্পনা করা হয়েছে, তা হলে কি অবাক হবে? এমনই এক ধূমকেতু যার লম্বমান ল্যাজ লঙ্কাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে কসমিক ইলেকট্রিসিটি দিয়ে—।'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, 'প্রফেসর, ইলেকট্রিসিটি কি কসমস-এ থাকে?'

'আছে, মূর্খ, আছে। ইলেকট্রিসিটি বস্তুটাই তো আজও অব্যাখ্যাত। ভাঙাগড়ার খেলায় এই ইলেকট্রিসিটির লীলা আজও অব্যাহত। এক কথায় তা বুঝবে না দীননাথ। ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির 'সিক্রেট ডকট্রিন' বইটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ো। গবেষকরা আজকে বলছেন, 'ডার্ক ম্যাটার', পথ বানিয়ে চলেছে এই পৃথিবীর ওপর দিয়ে। ওই যে রেডিয়ো শয়তান, ওরও আবির্ভাব নিশ্চয় ডার্ক ম্যাটার থেকে। কসমিক ধুলো থেকে অজানা শক্তি জেগেছে কসমিক বিদ্যুতের দৌলতে। আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই কসমিক ধুলোর মধ্যেই— কসমিক বিদ্যুৎ দিয়ে— হনুমানের পুচ্ছে থাকবে সেই বিদ্যুৎ— পুরাণে যা আগুন।'

আমি সাততাড়াতাড়ি বললাম, 'ধরণীকে হনুমান করলেন কেন, সেইটা আগে বলুন।

'যে কসমিক কারখানায় রেডিয়ো রোবটের জন্ম, সেই কসমিক কারখানায় ওকে ফিরিয়ে দেব বলে। প্রাচীন শাস্ত্রে যাকে 'লয়' বলা হয়েছে, সেই জিরো পয়েন্টে ওকে ফিরিয়ে দেব বলে। আদিম অণু বানিয়ে দেব বলে। সাত লয় কেন্দ্রের অন্যতম হনুমানরূপী কসমিক বিদ্যুৎস্রোতের কল্পনাতীত শক্তি প্রয়োগ করে। যাও, ধরণী যাও, নাশ করে এসো এই পৃথিবীর নবতম সংহার-রাক্ষসকে মহাজাগতিক বিদ্যুৎবহ্নির প্রলয়লীলা ঘটিয়ে— তবেই ফিরিয়ে দেব তোমার মানব রূপ।'

পরবর্তী কাহিনি গুপ্তই ছিল এতদিন। সম্পাদকের হুড়ো খেয়ে ফাঁস করে দিচ্ছি— প্রফেসর তেড়ে উঠবেন জেনেও।

সল্টলেকের একটা একতলা বাড়ি ঘিরে অকস্মাৎ অজানা রশ্মিনৃত্য দেখা গেছিল নিশুতি রাতে— অমাবস্যার রাতে। এদিক সেদিকের বাড়ি থেকে আবছাভাবে দেখা গেছিল বাড়ির ওপরে একটা জ্বলন্ত অগ্নিগোলক। ঠিক গোলক অবশ্য নয়— যেন একটা লম্বমান জ্বলন্ত ল্যাজের মতো কিছু একটা। লম্বাটে অগ্নি ঝুলছিল যেন একটা হনুমান আকৃতির উড়ুক্কু যান থেকে। বাড়িটা ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

পরের দিন কাগজে কাগজে, টিভিতে, রেডিয়োতে বেরিয়ে গেছিল চটপটাশ সাংবাদিকতার গরম গরম বাহাদুরি, কলকাতায় উফো-হাঙ্গামা। নতুন জতুগৃহ!

ধরণী ফিরে পেয়েছে ধরণীর চেহারা। তার কিছু মনে নেই। অরগন বাক্স রয়েছে প্রফেসরের ল্যাবে। যদি কারও কাহিনিটা বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে হয়, খোদ সম্পাদকের মন জোগাতে হবে।

শুনেছি উনি খুব কড়া এবং বিচক্ষণ, আরও হনুমান বানিয়ে রাজনৈতিক দাবানল উসকে দেবেন না।

কালো চাকতি

কিছু কৌতূহল, কিছু কল্পনা

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা, ম্যাটার আর অ্যান্টি-ম্যাটারে যদি সংঘাত লাগে, তা হলে কী হতে পারে?'

'কলিশন? বস্তু আর প্রতিবস্তুতে? অনন্ত মহাবিশ্বের বুকে?'

'হ্যাঁ। যেখানে অগুন্তি নক্ষত্র কুচি কুচি আলোককণার মতো অন্তহীন।'

'প্রথমে দেখা যাবে একটা স্ফুলিঙ্গ। জাগ্রত হবে কণিকা পরিমাণ আলোকদ্যুতি। তারপরেই, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। অতি তীব্র, অতি উগ্র, অতি দীপ্যমান। বর্ণালির সপ্তরং ধরা পড়বে মানুষের চোখে, অধরা থেকে যাবে বর্ণালির বাইরের অদৃশ্য বিকিরণ রশ্মিরা।'

'মানুষ নামক দ্বিপদ জীবের সীমিত দৃষ্টিক্ষমতায় তারা ধরা দেয় না বলে?'

'হ্যাঁ, দীননাথ। গামা-রে, এক্স-রে, ইনফ্রারেড আর রেডিয়ো ওয়েভ ধরা দেবে না।'

'মানুষ কতটুকুই বা দু'চোখ মেলে দেখতে পায়! তবু কত বড়াই এই চোখ নিয়ে।'

জুলজুল করে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর বলেছিলেন কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের স্বরে, 'কত কল্পনা, কত কবিতা, কত গল্প।'

বুঝলাম, টিটকিরি দিলেন আমাকে। আমি গল্প-টল্প লিখলে ওঁর গা যেন জ্বলে যায়। আশ্চর্য!

দমবন্ধ করে পড়ে যাওয়ার মতো এই যে কাহিনিটা আমি এখন লিখতে বসেছি, আমার তো মনে হয় সেই অতি অদ্ভুত ঘটনামালার সূচনায় ঘটেছিল এইরকমই একটা ব্যাপার। ম্যাটার আর অ্যান্টি-ম্যাটারের কলিশন। তারপরেই নিশ্চয় অজস্র অজানা বিকিরণ ধেয়ে গেছিল দিকে দিকে। সৃষ্টি করে গেছিল পরমাণু-সমান কালো চাকতিদের।

সৌরজগতের নাগালের বহুদূরে এসে নিশ্চয় অ্যাটমে-অ্যাটমে জুড়ে গেছিল। সৌরজগতের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ে পাশ কাটিয়ে গেছিল নেপচুন, ইউরেনাস, স্যাটার্ন আর জুপিটারকে। মঙ্গলের কাছাকাছি এসে কমিয়ে এনেছিল গতিবেগ।

কল্পনার চোখ দিয়ে এখন আমি দেখছি। বস্তুটা তখন যেন একটা স্পেসশিপ হয়ে গেছিল।

এক ছায়াপথ থেকে আর এক ছায়াপথে ছুটে যাওয়ার মতো তার গড়ন। পালিশ করা অনিক্স-পাথরের মতো ঝকমকে। কিন্তু মসৃণগাত্র নয়। সারা গায়ে যেন অজস্র আঁচিল। কিম্ভূত সেই মহাকাশযানের গায়ে কোনও পোর্টহোল নেই, গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার ছেঁদা নেই, অ্যান্টেনা নেই।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঢুকে পড়তেই নিশ্চয় হু-হু করে বেড়ে গেছিল কিম্ভূত স্পেসশিপের বডি- টেম্পারেচার। অগ্নিপুচ্ছ দেখা দিয়েছিল পেছন দিকে। রাতের আকাশ আলো হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ। উত্তাপে বিদগ্ধ আবহমণ্ডলের পরমাণুরা প্রতিবাদমুখর হয়ে নিক্ষেপ করেছিল অগুন্তি ফোটন।

অবশ্যই স্পিড আর আবর্তন কমে এসেছিল তার পরেই। তখন অনেক নীচে দেখা গেছিল নিঃশঙ্ক এক শহরের জোনাকিসম অগুন্তি আলোক কণিকা...

বিশেষ কাজ নিয়েই ধেয়ে এসেছিল এই স্পেসশিপ। তাই এড়িয়ে গেছিল নীচের শহর। আছড়ে পড়ে পিছলে গেছিল বহুদূরের বরফ জমা প্রান্তরের ওপর দিয়ে। ঠিকরে ঠিকরে গেছিল বরফের চাঁই, বিষম উত্তাপে বাষ্প হয়ে গেছিল তলার বরফ।

তারপর, পিছলে যাওয়া গতিকে রুখে দিয়ে নিথর নিশ্চল হয়েছিল মহাকাশযান— যদিও নিশ্চয় অর্ধেক ঢুকে গেছিল তুষার সাগরে। শূন্যপথে ঠিকরে যাওয়া বরফের চাঁই আছড়ে আছড়ে পড়েছিল আজব যানের গায়ে... পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্প ঘিরে ধরেছিল।

আস্তে আস্তে কমে এসেছিল বাইরের টেম্পারেচার। দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে আসতেই একটা খাড়াই রেখা আবির্ভূত হয়েছিল একপাশে। যেন একটা কাটা দাগ। মলিকিউলরা নিজেরাই নিজেদের সাজিয়ে নিয়েছিল সেইখানে। এই আবরণে ছিল না কোনও ছেঁদা, কোনও ফাঁক, কোনও জোড়— মহাশূন্যে ধেয়ে যাওয়ার সময়ে।

মলিকিউলরা নতুন প্যাটার্নে নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে রচনা করে গেছিল বাইরে যাওয়ার পথ। ফাঁক দিয়ে ফুস ফুস করে বেরিয়ে এসেছিল বাষ্প। ভেতরের শৈত্য বাইরের ঈষৎ উষ্ণ পরিবেশে এসেই বাষ্প হয়ে গেছিল। ভেতরটা বরফ-ঠান্ডা ছিল এতক্ষণ— যেখানে চালু ছিল সারি সারি কম্পিউটার অটোমেটিক ছন্দ পরম্পরায়। পৃথিবীর বাতাস শুষে নেওয়া হয়েছিল বিশ্লেষণের জন্য। স্বয়ংক্রিয় পন্থায় ব্যাকটিরিয়ার বিশ্লেষণ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়ে গেছিল প্রায় চক্ষের নিমেষে। ডি-এন-এ বিচারে দেখা গেছিল, পৌঁছোনো গেছে সঠিক জায়গায়। যে কাজ করার জন্য আসা, এবার তা শুরু করা যেতে পারে।

রাতের আকাশে উঠে গেছিল একটা অ্যান্টেনা। কোয়াজার ফ্রিকোয়েন্সি মারফত খবর চলে গেছিল যাত্রা শুরুর জায়গায়।

পৌঁছোনো গেছে পৃথিবীতে।

বিচিত্র ঘটনা পরম্পরা

আর ঠিক এই সময়ে অনেকগুলো বিস্ময়কর বিপর্যয় ঘটে গেল কাছাকাছি অনেকগুলো শহরে।

গাড়ি চালাতে চালাতে চালক দেখেছিল; যেন একটা তারা খসে পড়ল আকাশের একদিক থেকে আর একদিকে। এত বড় উল্কাপাত তো সচরাচর দেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে ফুলঝুরির মতো স্পার্ক ঠিকরে এসেছিল গাড়ির রেডিয়ো থেকে— যেন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি ঘটে গেল। চালক নেমে এসেছিল বাইরে, বিষম ভয়ে। দেখেছিল, আরও অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে আশেপাশে। ধোঁয়া উঠছে প্রতিটি গাড়ির রেডিয়ো থেকে। আর কালো হয়ে গেছে অ্যান্টেনার ডগা।

ভিসিআর চালু করে দিয়ে যাঁরা মারদাঙ্গা-ছবি তুলে রাখছিলেন টিভি থেকে পরে দেখবেন বলে, স্পার্ক ঠিকরে এসেছিল তাঁদের ভিসিআর থেকে। একটানে কেব্‌ল খুলে দেওয়ার পরেও গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে এসেছিল সারা গা থেকে।

টেলিভিশনের পর টেলিভিশন জ্বলে গেছিল ঠিক একই সময়ে একই ভাবে, দুম করে ফেটে গেছিল পিকচার টিউব।

কম্পিউটার চালু ছিল যেখানে যেখানে, সেইসব ঘরেও ঘটেছে এই ঘটনা। বিস্ফোরিত হয়েছে গণকযন্ত্র।

এতগুলো কাণ্ড কিন্তু ঘটেছে বিশেষ একটা শহরে যা হিমালয়ের সেই তুহিন তেপান্তর থেকে সবচেয়ে কাছের বৃহত্তম শহর। নতুন করে গড়া হচ্ছে ভারতকে। পৃথিবীর পয়লা সারির আধুনিকতম শহরের আদলে তৈরি হয়েছে এই শহর— মস্ত একটা মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিকে কেন্দ্র করে। গজিয়ে উঠেছে আকাশচুম্বী ইমারতের পর ইমারত। নিজস্ব এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আছে এই অত্যাধুনিক মেগাসিটি শহরে। ডাক্তারি পড়তে গেলে ট্যাঁকের জোর থাকা চাই। বিশেষ করে এই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে। তাই এখানকার ছাত্রাবাসে যারা থাকে, তারা রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছে। তারা হস্টেল ঘরে কম্পিউটার, টিভি ইত্যাদি সবই রাখে। এমনকী নিজেদের গাড়ি রাখার অনুমতিও তাদের আছে। কড়া নিয়মকানুনের মধ্যেও তারা বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারী। এই কাহিনির মূল চরিত্র নিখিলের জীবনবেদ থেকেই তা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তার গাড়ি তো ছিলই, কিন্তু সে-কাহিনি পরে।

মহাকাশের আগন্তুক আকাশযান ওই শহরের ওপর দিয়ে ধেয়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল তুহিন তেপান্তরে। রাত তখন দশটা বেজে পঁচিশ মিনিট। লন্ডভন্ড কাণ্ডগুলো ঘটেছিল এই ইউনিভার্সিটি শহরে।

পরের দিন সকালবেলা ঘটনা মোড় নিয়েছিল আর একদিকে।

অভয় আর নিখিল হস্টেলের বাসিন্দা। দু'জনেই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। দু'জনেই থাকে একই ঘরে। দু'জনেই লোহা-পেটাই শরীরের অধিকারী নিয়মিত ব্যায়ামচর্চার ফলে। তফাতের মধ্যে নিখিল কুচকুচে কালো, যেন ব্ল্যাক-স্টোন। আর অভয় ধবধবে ফরসা, যেন হোয়াইট-মার্বেল।

গাড়িপাগল দু'জনেই। গাড়িটা অবশ্য নিখিলের। আগেই বলেছি, এই হস্টেলের বহু বোর্ডার নিজস্ব গাড়ি রাখে। হস্টেল চত্বরে কারপার্কে তাদের গাড়ি থাকে।

উল্কাপতনের পরের দিন সকালে দুই বন্ধু গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল হাওয়া খেতে, শহর থেকে অনেক দূরে। জলযোগ সেরে নিয়েছিল মাঠে বসে, তারপর যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, দেখেছিল কালো চাকতিটাকে। পড়ে আছে ব্যাকডোরের সামনে। ধুলোর ওপর। ওপর দিকটা গোলগাল। সেখানে রবারসোল জুতোর ধূলিময় ছাপ।

অভয় বলেছিল, 'আমি মাড়িয়ে গেছি নামবার সময়ে। পা-হড়কেছিল ওইজন্যেই।'

নিখিল বলেছিল, 'অদ্ভুত দেখতে তো।' বলেই হেঁট হয়েছিল। চাকতির ওপর থেকে ধুলো সাফ করতে গিয়ে পুঁচকে পুঁচকে গম্বুজগুলো দেখেছিল। রয়েছে কালো চাকতির কিনারা বরাবর। মাড়িয়ে যাওয়ার ফলে ধুলোর মধ্যে চেপে বসে গেছিল কালো চাকতি—যার ব্যাস মাত্র দেড় ইঞ্চি। নখ দিয়ে খুঁটে তুলে নিয়ে রেখেছিল হাতের চেটোয়। উলটেপালটে দেখেছিল, চাকতির তলার দিকটা চ্যাপটা। ওপর দিকটা গম্বুজের মতো। সব মিলিয়ে কিন্তু এক সেন্টিমিটারের বেশি পুরু নয়। তবে বেশ ভারী।

ইচ্ছে ছিল, ছুড়ে দেবে শূন্যে, চাকতি ছোঁড়ার কায়দায়, খোলামকুচি ছোড়ার মতো। তাই তর্জনি দিয়ে কিনারা ঘিরে ধরতে গিয়েই ককিয়ে উঠেছিল যন্ত্রণায়।

কালো চাকতি হুল ফুটিয়েছে আঙুলে! এক ফোঁটা রক্তও দেখা দিল দংশনের জায়গায়। তর্জনির ডগায়।

অভয় তখন চাকতি ছিনিয়ে নিয়েছিল নিখিলের হাত থেকে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চোখ চালিয়েছিল কিনারায়, কিন্তু হুল দেখতে পায়নি। দিব্যি মসৃণ, ফুটোফাটা কিসসু নেই। হেঁট হয়ে দেখেছিল, চাকতি যেখানে চেপে বসেছিল ধুলোর মধ্যে, সেখানে চকচক করছে এক টুকরো কাচ।

বলেছিল নিখিলকে, 'এই কাচটাই হয়তো ফুটেছে তোর আঙুলে।'

অভয়ের হাত থেকে চাকতি কেড়ে নিয়ে পকেটে চালান করেছিল নিখিল। স্টার্ট দিয়েছিল গাড়িতে।

কালো চাকতির কেরামতি

গাড়ি হাঁকিয়েই চলে গেছিল ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল ক্লাসে। কাশির দমক শুরু হয়েছিল তখনই। সাইনাসের সর্দি নেমে এসেছিল গলায়। কাশি তো পাবেই, গা-গরমও হয়েছিল।

অত কাশলে কি ক্লাস হয়? প্রফেসর বিরক্ত হলেন, ডাক্তার এলেন। ছোঁয়াচে ফ্লু যাতে না-ছড়ায়, তাই তক্ষুনি নিখিলকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতাল কেবিনে শুইয়ে দিলেন। জামাকাপড় পালটে দিয়ে, পকেটের জিনিসপত্র ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলেন।

সেই সবের মধ্যে রইল কালো চাকতি। মেটাল বক্সে।

শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল নিখিল, মড়ার মতো। তখন আর কাশেনি। কিন্তু সারা

গা থেকে দ্যুতি বেরিয়ে এসেছিল। যেন ফসফরাস প্রভা।

আর ঠিক তখনই, ড্রয়ারের মধ্যে প্রদীপ্ত হয়েছিল কালো চাকতির আটখানা গম্বুজের একটা গম্বুজ-শীর্ষ। চাকতি ভেসে উঠেছিল শূন্যে। প্রদীপ্ত গম্বুজের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সরু সুতোর মতো রশ্মি। সেইসঙ্গে হিসহিস আওয়াজ। মেটাল বক্সের গা-ফুঁড়ে, ড্রয়ার ফুটো করে সেই রশ্মি ঠিকরে বেরিয়ে এসে থমকে গেছিল নিখিলের ডান চোখের পাতার ওপর। তারপর উজ্জ্বলতর হয়েছিল একটু একটু করে। আলোকচ্ছটা যেন ধাক্কার পর ধাক্কা মেরে যাচ্ছে ডান চোখের বন্ধ পাতায়— খোলো দ্বার, খোলো দ্বার, বার্তা আনিয়াছি অজানার।

খুলে গেছিল চোখের পাতা— শুধু ডান চোখের পাতা।

রশ্মিরেখা প্রবেশ করেছিল খোলা চোখের মণিতে। এক মিনিট... দু'মিনিট... তিন মিনিট... ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের পাল্‌স দমকে দমকে ঢুকছে ডান চোখে... দৃশ্যমান আলোর ওয়েভলেনথ-এ।

যেন এক কম্পিউটার তথ্য পাচার করে দিচ্ছে আর এক কম্পিউটারে।

রশ্মি ফিরে গেল ড্রয়ারে। বন্ধ হয়ে গেল চোখের পাতা। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল নিখিল। শিশুর মতো।

ডাক্তার এলেন যথাসময়ে। তিনি শুধু অ্যাসপিরিন খাইয়ে গেছিলেন। এখন দেখলেন, তাইতেই কাজ হয়েছে চমৎকার। নিখিল এখন তরতাজা। শরীর ঝরঝরে। আগের চাইতেও।

ডাক্তারের সঙ্গে এসেছিল অভয়। বলেছিল, 'ব্ল্যাকস্ট্যাচু, শরীর ঠিক?'

নিখিল বলেছিল, 'একেবারে। বেশি ঠিক। আগের চাইতেও। যেন নতুন মানুষ।'

রক্ত পরীক্ষা হয়েছিল নিখিলের। শ্বেত কণিকা একটু বেড়েছে।

এর পরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাটা হল সেই মানুষটার, কেবিন পরিষ্কার করা যার কাজ। একজন পেশেন্ট ঘর ছেড়ে গেলে তাড়াহুড়োয় অনেক কিছুই নিতে ভুলে যায়। এই ছেলেটি খুঁজে খুঁজে বের করে গুছিয়ে রাখে— অফিসে জমা দেয়। নাম নটবর।

নিখিল নতুন মানুষ হয়ে নেচে নেচে অভয়ের সঙ্গে চলে যেতেই নটবর এসেছিল কেবিন সাফ করতে। থমকে গেছিল ড্রয়ার খুলতে গিয়ে।

ফাঁক দিয়ে তীব্র জ্যোতি ঠিকরে আসছে কেন? খুবই তীব্র হলকা লাগছে চোখেমুখে।

ইচ্ছে হয়েছিল চম্পট দেয়। কিন্তু থমকে গেছিল আর এক প্রহেলিকা দেখে। ড্রয়ারের ফাঁক দিয়ে ফুলকি ঠিকরে আসছে বাইরে, আর শোনা যাচ্ছে একটা হিস হিস শব্দ। ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই ভেতরের মেটালবক্স কেটে, কাঠের ড্রয়ার ছেঁদা করে, উড়ে এসেছিল সেকালের রুপোর টাকা সাইজের একটা কালো চাকতি।

নটবর থ। কিন্তু কৌতূহলী। বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে কালো চাকতি ওর একহাত দূর দিয়ে উড়ে গেছিল খোলা জানলার দিকে। গোবরাটের ওপর থমকে গেছিল। যেন, মুগ্ধ হয়ে দেখছে রাতের আকাশ।

ঘুরন্ত কালো চাকতি থেকে এতক্ষণ ঠিকরে আসছিল লাল দ্যুতি, এখন লাল রঙের জায়গায় ঠিকরে এল ঝকঝকে সাদা আলো— যেন, জ্যোতির্বলয়।

শূন্যে ভাসছে কালো চাকতি। ওপরে বা নীচে অদৃশ্য কিছু আছে কিনা দেখবার জন্যে ওপরে নীচে হাত চালিয়েছিল নটবর নিছক কৌতূহলে— ছেলেমানুষি ইচ্ছে।

কিন্তু ফলটা হল ভয়ানক। কালো চাকতি থেকে ঠিকরে এল সরু সুতোর মতো ঝকঝকে সাদা রশ্মি রেখা। বেরিয়ে গেল নটবরের হাতের চেটো ফুটো করে দিয়ে। নিমেষে বাষ্প হয়ে গেল চামড়া, হাড়, পেশিবন্ধনী, স্নায়ু আর রক্তবহ।

আর ঠিক তখনই, কালো চাকতি ঘিরে জ্যোতির্বলয়ের ব্যাস বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল প্রায় এক ফুটের কাছাকাছি।

পালাতে গেছিল নটবর। পারেনি। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সারা শরীর। নিষ্প্রাণ হয়েছিল পরক্ষণেই।

ছাত্রাবাসের তিনতলার একটা ঘরে পাশাপাশি বেডে থাকত নিখিল আর অভয়। ব্ল্যাক-স্টোন আর হোয়াইট-মার্বেল। মানিকজোড়ের এহেন নামকরণ করেছিল সতীর্থরা।

দু'জনেই ধনীসন্তান। অভিভাবকদের ইচ্ছে, তারা যেন কৃচ্ছ্রসাধন না-করে সেকালের গুরুগৃহে থাকা শিষ্যদের মতো। ঘরের আসবাবপত্র হাল ফ্যাশনের— কলেজ কর্তৃপক্ষের দেওয়া। মডার্ন গ্যাজেট-ট্যাজেটগুলো বাড়ি থেকে আনা।

সারাদিনের ধকলের পর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল দুই বন্ধু। বিশেষ করে নিখিল, সে চিত হয়ে শুয়ে আছে। একদম নড়ছে না। এপাশ-ওপাশ করছে অভয়, যা তার স্বভাব।

রাত ঠিক দুটো বেজে দশ মিনিটের সময়ে আচমকা জ্যোতি ঠিকরে এল নিখিলের বন্ধ দু'চোখের পাতা থেকে। সেকেলে রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ির মতো।

খুলে গেল চোখের পাতা। দুটো চোখই ঈষৎ স্ফীত, যেমন হয়েছিল শুধু ডান চোখটা আজই বিকেলে। দুটো চোখ থেকেই আলো ঠিকরে আসছে। সেই আলোর উৎস রয়েছে যেন চোখের মণির ভিতরে।

আস্তে আস্তে কমে এল চোখের দ্যুতি। চোখের তারা ফিরে এল স্বাভাবিক অবস্থায়। বারকয়েক চোখ পিটপিট করার পর নিখিল বুঝে গেল, ঘুম তার চক্ষু থেকে পলায়ন করেছে।

উঠে বসল আস্তে আস্তে। মনে হল, সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থাটাই হয়েছিল কলেজ হাসপাতালে। ঘরময় চোখ বুলিয়ে বুঝে নিল, রয়েছে কোথায়। দু'হাত চোখের সামনে তুলে নেড়ে নেড়ে দেখে নিল দশটা আঙুল। স্পষ্ট মনে হল, এই আঙুল আর এই হাত আগের মতো আর নেই। অন্যরকম। কীরকম তা বোঝা মুশকিল। শুধু হাত আর আঙুল তো নয়, গোটা শরীরটাই যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। কেন এমন মনে হচ্ছে তা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না।

খাট থেকে নেমে ঠেলে তুলল অভয়কে।

'শরীর খারাপ নাকি?' অভয়ের প্রশ্ন।

'শরীর ফাইন।'

'কাশি-টাশি?'

'একদম নেই। গলাটাও অন্যরকম। সুপার ফাইন।'

'আমাকে ঠেলে তুললি কেন?'

'দেখানোর জন্যে।'

অভয়কে বারান্দায় টেনে নিয়ে গেল নিখিল। অভয় বলেছিল, 'এত রাতে কী দেখাবি?'

'আকাশ।'

'আকাশ তো পরিষ্কার। মেঘ নেই, চাঁদও নেই।'

'কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডল।' উত্তর আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলেছিল নিখিল।

'এখন কি অ্যাস্ট্রনমি শেখবার সময়? এত খবর তুই-ই বা কী করে জানলি?'

'দেখে যা।'

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘপুচ্ছ এক ঝাঁক উল্কাপাত দেখা গেল আকাশের ঠিক সেইদিকে। যেন, আকাশজোড়া আতসবাজির খেলা।

চমকে উঠেছিল অভয়। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়েছিল আকাশের দিকে।

'অপূর্ব! এরই নাম উল্কাপাত?'

'হয়তো।'

'আরও হবে নাকি?'

'না, যা হওয়ার, তা হয়ে গেল।'

দু'জনেই ফিরে এল ঘরে।

'তুই জানলি কী করে?' অভয়ের প্রশ্ন।

'ঠিক মনে পড়ছে না। কোথায় যেন শুনেছিলাম।'

'কাগজে পড়েছিলি?'

'না। কিছু মনে নেই।'

'ঘুমটা ভাঙল কেন? ঠিক এই সময়ে?'

'তাও তো জানি না।'

'শরীর ঠিক আছে তো?' চোখে চোখে তাকিয়ে বলেছিল অভয়।

চোখে চোখ রেখেই জবাব দিয়েছিল নিখিল, 'ফাইন। সুপার ফাইন। গ্রেট।'

নিখিলের পরিবর্তন

সেদিনের নির্মেঘ আকাশটা ছিল বড় মনছোঁয়া। টাটকা বাতাস ফুসফুসে গিয়ে বুঝি তরতাজা করে দিচ্ছে সমস্ত শরীরটাকে। দূর-দূরান্তের পাহাড়গুলো পর্যন্ত অতিশয় স্পষ্ট। ঘাসে জমে শিশিরকণা ঝিকিমিকি হীরক কণার মতো।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমনই একটা জায়গা বেছে নিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীদের মনের

আকাশে মুক্তির হাওয়া খেলিয়ে দেওয়ার জন্যে। এ যেন রবি ঠাকুরের আর এক শান্তিনিকেতন। কিন্তু পৃথিবীময় অকল্পনীয় উৎপাতের শুরু হয়ে গেল শান্তির নীড় এই অঞ্চল থেকেই।

রাত দুটো দশ মিনিটে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে উত্তর আকাশের কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডল দেখতে বারান্দায় এসেছিল নিখিল। তাগিদটা আচমকা এসেছিল ভেতর থেকে।

সেই নিখিলই এখন অত ভোরে উঠে নির্মেঘ আকাশের শোভা দেখতে দেখতে, পোশাক পালটে নিয়ে, একা একা চলে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে, দূরের পাথুরে প্রান্তরে। যা খুঁজতে এসেছিল, তা পেয়ে গেল সেখানেই। এল যেন চুম্বকের টানে, অদৃশ্য অথচ অমোঘ নির্দেশে।

তিনটে কালো চাকতি। আগে যে চাকতি পেয়েছিল, হুবহু সেইরকম। পকেটে রাখল তিন চাকতিকে।

কাজ শেষ। ফিরে এল ঘরে। অভয় তখনও ঘুমোচ্ছে। নিখিলও ঘুমোয় বেলা পর্যন্ত। ব্যতিক্রম ঘটেছে আজ। আজ থেকে সে যন্ত্রচালিত। হুকুম মানা হয়ে গেছে। এখন অন্য কাজ।

সেই কাজ নিয়েই নিখিল যখন তন্ময়, আচমকা ঘুম ভেঙে গেছিল অভয়ের।

দেখেছিল, রঙিন মাছের অ্যাকুয়ারিয়ামের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিখিল। যেন মাছ দেখছে। তারপর ডানহাতের তর্জনী তুলে ডগা ঠেকাল মৎস্যাধারের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে দ্যুতি দেখা গেল তর্জনীর ডগায়।

মাছেরা চলে এল সেইখানে, দল বেঁধে, যেখানে ঠেকে রয়েছে নিখিলের দ্যুতিময় তর্জনীর ডগা। আঙুল সরিয়ে নিয়ে গেল নিখিল, আজ্ঞাবহ মৎস্যরা সরে সরে গেল ডগায় ডগায়।

সচমকে বলে ফেলেছিল অভয়, 'হচ্ছেটা কী?'

চমকে উঠে আঙুল সরিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল নিখিল। সঙ্গে সঙ্গে মেসমেরিজম-এর ঘোর কেটে গেছিল মাছেদের। ছড়িয়ে পড়েছিল মৎস্যাধারের এদিকে-সেদিকে।

সবিস্ময়ে বলেছিল অভয়, 'মাছেরা তোর হুকুমে চলতে শিখল কবে থেকে?'

নিবিড় চোখে তাকিয়ে থেকে নিখিল বলেছিল, 'আজ থেকে।'

অভয় দেখেছিল, নিখিলের কালো চোখ আগের চাইতেও কালো— যেন, কষ্টিপাথর। ভাবলেশহীন।

নটবরের মড়া নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেছিল ডাক্তারদের।

হাতের চেটোয় একটা অদ্ভুত ছেঁদা, রক্ত নেই একটুও। চোখের তারায় ঘন ছানি। অথচ ছানি নিয়ে কখনও চোখের ডাক্তারদের কাছে যায়নি নটবর। আকাশের বাজ তালু ফুটো করে বেরিয়ে গেলে হয়তো এরকম নিরক্ত ছেঁদা আর ছানিপড়া চোখ হলেও হতে পারে। কিন্তু বাজ পড়ার আওয়াজ তো কেউ শোনেনি।

আরও আছে। যে-ঘরে নটবরের আশ্চর্য-মড়া পাওয়া গেছে, সে-ঘরের চেহারাও যে

কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে। স্টিল-খাটের মাথা গলে গেছে যেন তীব্র উত্তাপে। খাট সরে গেছে জানলার দিকে। ঘরের অন্য স্টিল ফার্নিচারগুলোও দুমড়ে-মুচড়ে বিকট রূপ ধারণ করে রয়েছে। জানলার কাচের সার্সি গলে গিয়ে সরু সরু সুতোর মতো জমাট হয়ে ঝালর আকারে ঝুলছে।

এমন কাণ্ড হল কী করে? হতভম্ব প্রত্যেকেই। বজ্রপাত যখন ঘটেনি, তখন লেসার রশ্মি হয়তো তালু ছেঁদা করেছে নটবরের। হাসপাতালে লেসার আছে ঠিকই, কিন্তু তা দিয়ে এমন ছেঁদা তো বানানো যায় না। তা ছাড়া, জানলায় দাঁড়িয়ে লেসার-রে ছুড়তে যাবে কে? আসবাবপত্র আর জানলার কাচের এমন হাল করে গেল কেন?

গোটা হাসপাতাল যখন নটবর-রহস্য নিয়ে চনমনে, তখন আর একটা কেস এল আউটডোরে। মা নিয়ে এল ছোট্ট মেয়েকে। সকালে তাকে নাকি একটা পোকা কামড়েছে। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে হাঁচি আর জ্বর। ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দেখতে কীবকম পোকাটাকে?'

'কালো কুচকুচে। ঠিক যেন একটা মাকড়সা।'

'মাকড়সা?'

'কালো পাথরের মাকড়সা। গোলমতো, আটদিকে আটখানা পা। প্যাঁট করে কামড়ে দিল।'

নিখিল যেন হাওয়ায় খবর পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। চক্ষুতারকা স্থির। নিশ্চল। কালো পাথরের মতো। শুধু যা আটটা গম্বুজ নেই সেখানে।

কেস এল আর একটা। এক প্রৌঢ়া কুড়িয়ে নিতে গেছিল একটা কালো পাথর, কষ্টিপাথর মনে করে। কিন্তু সেটা যে একটা বিদঘুটে কাঁকড়া, তা বুঝবে কী করে? এমন কামড় দিয়েছে, প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

গেলও শেষপর্যন্ত। ডায়াবেটিসের রুগি তো, হার্ট অ্যাটাক আটকাতে পারল না।

সে-খবরও কানে এল নিখিলের। সে কিন্তু ভাবলেশহীন। দুই চোখের তারায় যেন বিচরণ করছে দুটো সজীব কষ্টিপাথর।

কালো কাঁকড়া অবশ্য নয়। তার চাইতেও বিভীষণ।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, নটবরের চেটোর ওই ছেঁদা। পুলিশ এসেছে, ময়না তদন্ত হয়ে গেছে। নিবিড়তর হয়েছে ছিদ্র-রহস্য।

ছেঁদাটা অমন পরিষ্কার বৃত্তাকারে হল কী করে, এই নিয়ে অনেক তর্কবিতর্কও হয়ে গেছে। একজন বলেছিল, আলোর গতিবেগে যদি ধেয়ে যায় একটা বুলেট, আর সেই বুলেট যদি সূর্যের জঠরের মতো গরম হয়, তা হলে এমন পরিষ্কার ছেঁদা করে যেতে পারে চেটোতে। ফুটোর কিনারা তো দিব্বি জুড়ে গেছে। মাঝের হাড় আর টিস্যু গেল কোথায়? রক্তও দেখা যায়নি। তা হলে?

এক ডাক্তার বলেছিলেন, তেতে লাল প্লুটোনিয়ামের গুলি চেটো ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলে এমনটা হতে পারে।

আর এক ডাক্তার তক্ষুনি বলেছিলেন, তা হলে তো ডেডবডিতে রেডিয়ো অ্যাকটিভিটি পাওয়া যেত। তা নেই।

সুতরাং, বাতিল হয়ে গেছিল প্লুটোনিয়াম থিয়োরি। আরও নিবিড় হয়েছিল নটবরের মৃত্যু-রহস্য।

এত কাণ্ড ঘটে গেল কিন্তু সকাল আটটার আগেই। ঘটনা পরম্পরার শুরু নিখিল যখন মাটি থেকে কালো চাকতি কুড়িয়ে নিয়েছিল, তখন থেকে। তারপর ঘটে চলেছে অব্যাখ্যাত রহস্যের পর রহস্য।

সকাল আটটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে সিটিমার্কেটে আড্ডা দিতে গেছিল অভয়। ইউনিভার্সিটি যখন গড়ে ওঠে, তখন এ-জায়গায় তেমন জনবসতি ছিল না। কিছু ঝানু ব্যবসাদার আধুনিক কেতায় দোকানপাট-রেস্তোরাঁ সাজিয়ে ফেলতেই অঞ্চল এখন সরগরম। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের দৌলতে। তাদের পকেটে টাকা কামড়ায়। এখানে উড়োতে আসে।

সকালের দিকে আসে রসনার তৃপ্তির জন্য। দক্ষিণী, পাঞ্জাবি, চৈনিক— সবই মিলে যায় এই ঝলমলে মল-মার্কেটে।

অভয়ের সঙ্গে এসেছিল নিখিলও। এসে বসে গেল অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায়। তখনই দু'জনেরই কানে এল নটবরের অদ্ভুত মরণ বৃত্তান্ত আর তার ঘরের সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানার ইতিবৃত্ত। আর এইখানেই এক নিভৃত খাবার টেবিলে দেখা গেল, নিখিল চুপিচুপি কথা বলছে অন্য তিন ছেলের সঙ্গে। এই ইউনিভার্সিটির ছাত্র তিনজনেই।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এই মুহূর্তে চারজনেরই চোখের তারা কালো কষ্টিপাথরের মতো। নির্ভাষ, অচঞ্চল এবং যেন নিষ্প্রাণ।

যুক্তি-পরামর্শ হয়ে গেল চাপা গলায়।

মড়া উধাও

রাত ঠিক আড়াইটের সময়ে কী ঘটেছিল, তা মহাকাল পটে আঁকা হয়ে আছে। পাঠক আর পাঠিকার মনের চোখের সামনে উন্মোচিত হোক সেই দৃশ্য।

নিখিল আর তার সেই দোস্তদের দেখা যাচ্ছে গাড়ির মধ্যে, মেডিকেল-মর্গের সামনে— যেখানে থাকে মড়া, আরও কাটা-ছেঁড়া করার জন্যে।

নিখিল বলছে, 'পাহারায় কেউ নেই তো?'

এক দোস্তের জবাব, 'এখন সবাই ওপর তলায়।'

নিখিল, 'তা হলে আমিও যাব তোর সঙ্গে।'

দরজার সামনে গিয়ে তিন বন্ধুর একজন চাবি বের করল পকেট থেকে। দরজা খুলে সদলবলে ঢুকে গেল ভেতরে। দাঁড়াল একটা বিশেষ কম্পার্টমেন্টের সামনে। আবার চাবি ঢুকল ফোকরে। স্টেনলেস স্টিল-ট্রে-র ওপর রাখা নটবরের প্লাস্টিক মোড়া ডেডবডি বেরিয়ে এল ড্রয়ার টানতেই।

ডেডবডি এখন গাড়ির পেছনের বুটিতে।

কিছুক্ষণ পর গাড়ি এসে দাঁড়াল পাথুরে প্রান্তরে। চারজনে ধরাধরি করে ডেডবডি নিয়ে গিয়ে রাখল একটু দূরে নুড়িপাথর ছড়ানো একটা জায়গায়। এখানে বালিপাথর বেশি।

আকাশে চাঁদ নেই। আছে লক্ষ-কোটি নক্ষত্র। নিষ্পলক চাহনি মেলে দেখছে নীচের কীর্তি।

ভোরের দিকে কুড়িয়ে পাওয়া কালো চাকতিদের একটাকে ডেডবডির ওপর রাখল নিখিল। রাখতে-না-রাখতেই প্রদীপ্ত হল চাকতি। দ্যুতি ঠিকরে যাচ্ছে গা থেকে। বেড়েই চলেছে প্রখরতা। চোখ মেলে আর তাকানো যায় না।

চার বন্ধু সরে গেল বেশ তফাতে। ততক্ষণে কালো চাকতি ঘিরে আবির্ভূত হয়েছে একটা জ্যোতির্বলয়। কালো চাকতি টকটকে লাল হয়ে গিয়ে অত্যুজ্জ্বল সাদা হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

সোঁ-সোঁ শব্দটা শোনা গেল তারপরেই। তীব্র জ্যোতি ঘিরে ধরেছে গোটা ডেডবডিকে— বডি আর দেখা যাচ্ছে না।

বেড়ে চলেছে সোঁ-সোঁ শব্দটা। সেইসঙ্গে বাতাস ছুটে যাচ্ছে সেইদিকে। উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ছোটখাটো নুড়িপাথর আর বালি। আওয়াজ এখন অতি তীব্র, কানে তালা লাগিয়ে দেওয়ার মতো। যেন একটা অতিকায় জেট-ইঞ্জিন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে আস্ত একটা বিমানকে। আচমকা স্তব্ধ হল কানে তালা লাগিয়ে দেওয়ার মতো শব্দলহরী।

কালো চাকতি আর নেই। সেইসঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়েছে ডেডবডি, আশপাশের পাথর আর বালি। সে জায়গাটা এখন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে রয়েছে ওপর দিকে। যেন, একটা স্প্রিং।

নিখিল বলছে তৃপ্ত স্বরে, 'এই নিয়ে এখন ভাবুক সবাই।'

নিখিলের আচার-আচরণের পরিবর্তন কিন্তু খটকা লাগিয়ে গেছিল অনেকেরই মনের মধ্যে। পরিবর্তনটা প্রথমে ছিল সূক্ষ্ম, চোখে না-পড়ার মতো। কিন্তু একটু একটু করে প্রকট হতে প্রকটতর হয়েছে।

গাড়ি হাঁকিয়ে অকারণে টহল দিচ্ছিল শহরময়। আর দেখছিল পরিবর্তন একটা এসেছে প্রতিটি মানুষের মধ্যে। ফুসফুসে জীবাণু সংক্রমণ ঘটলে যা হয়, সেই কষ্ট দেখা যাচ্ছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে। হাঁচছে কাশছে, বুক যেন ফেটে যাচ্ছে হাঁচি-কাশির দমকে।

খুশি হয়েছিল নিখিল। শিস দিয়েছে আর গাড়ি চালিয়েছে। দেখে গেছে, সর্দি-কাশির ছোঁয়াচে রোগটা শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে অকস্মাৎ। সেইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে আর একটা লক্ষণ। বহুজনেরই মুখাবয়ব অতিশয় বিবর্ণ।

নিখিলকে এরপর দেখা গেছে সেই-ঘরে— যে-ঘরে অসুস্থ হয়ে তাকে থাকতে হয়েছে, নটবরের মড়া যেখানে পাওয়া গেছে।

কিন্তু ঘরের ভেতর তো এখন ঢোকা যাচ্ছে না। লোকজন সেখান থেকে বয়ে আনছে দোমড়ানো-মোচড়ানো স্টিল-ফার্নিচার।

তদারকে ছিল হাসপাতালের এক পুরুষ স্টাফ। নিখিল তাকেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'এমন কাণ্ড ঘটল কী করে, জানা গেছে?'

'না।'

'ময়না তদন্তের রিপোর্ট?'

'রেডিয়েশন ঝলক, চকিতের জন্যে। কিন্তু ঘরের দেওয়াল-ফার্নিচারে রেডিয়েশনের কোনও চিহ্ন নেই। অথচ গলে গেছে।'

তা তো গেছেই। টিভি তেউড়ে গেছে, খাটের মাথা দুমড়ে-মুচড়ে অস্বাভাবিক রূপ নিয়েছে।

সরে এসেছিল নিখিল। শীতল দুই চক্ষু পুরো নির্ভাষ নয়, সেখানে ভাসছে পরিতৃপ্তি।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স।

অফিসারের টেবিলে এসেছে ময়না তদন্তের রিপোর্ট। কিন্তু মাথামুণ্ড কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তারের অভিমত, মৃত্যু ঘটেছে বিকিরণ বিষের জন্যে। কিন্তু বিকিরণের উৎস তো ছিল না ঘরের মধ্যে। থাকবেই বা কেন?

রিপোর্টের সঙ্গে লাগানো রয়েছে নটবরের ফটোগ্রাফ। দেখা যাচ্ছে হাতের তালুর ছবি। তালুতে একটা ফুটো। অদ্ভুত ফুটো। এমন ফুটো এই পৃথিবীতে কক্ষনও দেখা যায়নি মানুষের চেটোয়।

এইসঙ্গে আর একটা অদ্ভুত রিপোর্ট এসেছে পুলিশের কাছে। ঘরের সমস্ত ধাতু চুম্বক হয়ে গেছে! এক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বাজ পড়লে এমন হতে পারে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে বজ্রপাত! তাই কি হয়? আওয়াজ গেল না কারুর কানে?

অফিসার ঘর্মাক্ত-কলেবর আর একটা রিপোর্ট পড়ে। যে-দু'জন পুলিশ অফিসার নটবরের লাশ আনতে গেছিল হাসপাতালে, তারা দু'জনেই বেদম হাঁচি-কাশিতে ভুগছে। মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা!

জীবাণু কি ছড়িয়ে পড়েছে? এমনই এক জীবাণু যার টিকি ধরতে পারছেন না কোনও বৈজ্ঞানিক?

ঠিক তখনই একটা কালো চাকতি দেখা গেছিল পুলিশ-সদর দপ্তরের বাগানে। অফিসারের জানলার ঠিক বাইরে। টহলদার সান্ত্রি সেটা তুলে নিতে গেছিল। ছোবল খেয়েছিল তৎক্ষণাৎ। কালো চাকতির ছোবল। যন্ত্রণার চিৎকার ঠিকরে এসেছিল সান্ত্রির গলা চিরে। অফিসার উঁকি মেরে দেখেছিলেন। কালো চাকতিকে নিজের টেবিলে আনিয়েছিলেন। নিজেও ছোবল খেয়েছিলেন। খাইয়েছিলেন সব পুলিশকে।

এই সময়েই নটবরের মড়া নিরুদ্দেশের খবরটা এসেছিল পুলিশ অফিসারের কাছে। হাড়ের মজ্জার নমুনা নিয়ে বিশ্লেষণের মতলব এঁটেছিল এক গবেষক। নিজেই গেছিলেন। দেখেছেন, মড়া নেই।

লাশ উধাও? মর্গ থেকে? কেন? ডেডবডি চুরি করে লাভ কী?

মজ্জা-গবেষক দিয়েছিলেন জিজ্ঞাসার জবাব, 'আমি আরও কিছু জানবার প্ল্যান করেছিলাম, মজ্জা বিশ্লেষণ করতাম। হাড়ের ভেতর দিয়ে কী ধরনের বিকিরণ-বিষ মজ্জায় ঢুকেছে, তা জেনে ফেলতাম। কিন্তু সে সুযোগ আমাকে দেওয়া হল না।'

ইতিমধ্যে যেন মড়ক লেগেছে শহরে। অজানিত এই ভাইরাস সুস্থ মানুষকে কাবু করছে,

অসুস্থদের নিকেশ করে দিচ্ছে। ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, রক্তের রোগে যারা ভুগছিল, তারা ফ্লু আক্রান্ত হয়েই পটাপট মরে যাচ্ছে। যেন, জঞ্জাল সাফ হয়ে যাচ্ছে। আর যারা তরতাজা, তাদের চোখমুখ-চেহারা-চলন পালটে যাচ্ছে ফ্লু-ভাইরাসের থাপ্পড় খাওয়ার পর। এবং সেটা লক্ষ করা যাচ্ছে তাদের গা-হিম করা চাহনির মধ্যে।

অমানবিক এই চাহনি বেশি মাত্রায় এসেছে নিখিলের মধ্যে। কালো চাকতি প্রথম বিষ উগরেছে তার মধ্যেই। তার চাল-চলনও এখন অন্যরকম। ক্লাসে যায় না। কোথায় যে টো-টো করে, কাউকে বলে না।

ফাঁকা ঘরে একা অভয় খাটে বসে ছিল গুম হয়ে, আনমনে চেয়ে ছিল নিখিলের কম্পিউটারের দিকে।

কম্পিউটার চলছে। অদ্ভুত-কিম্ভূত প্রোগ্রাম দেখিয়ে চলেছে। মনিটরে টেক্সট আর গ্রাফিক্স দ্রুত আসছে আর যাচ্ছে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো স্পিডে। তারপরেই চোখ গেছিল আর একটা বস্তুর দিকে। ফ্রারেড পোর্টের সামনেই রয়েছে সেই অদ্ভূত কালো বস্তুটা— দিন কয়েক আগে কুড়িয়ে পেয়েছিল নিখিল।

নিখিল ঘরে ঢুকেছিল ঠিক এই সময়ে। অভয় বলেছিল, 'তোর পিসি কি বিগড়েছে?'

'ডাউনলোড করছে ইন্টারনেটের বেশ কিছু ডাটা।' বলতে বলতে মনিটরের সুইচ অফ করে দিয়েছিল নিখিল, কিন্তু চালু রেখেছিল হার্ড-ড্রাইভ। কালো চাকতি রেখেছিল সামনে।

অপার্থিব সম্মেলন

রাত আড়াইটের সময়ে খাট থেকে আস্তে আস্তে নেমে এসেছিল নিখিল। অভয় তখন ঘুমোচ্ছে। বাইরে বেরোবার জামাকাপড় পরে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কম্পিউটারের সামনে। একটা লাল আলো জ্বলে উঠেছিল হার্ড-ড্রাইভে। পিটপিটানি থামিয়ে নিভে যেতেই কালো চাকতিটা তুলে নিয়ে পকেটে রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল রহস্যময় নিখিল। বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল গাড়ি পার্কিং-এর জায়গায়।

মাথার ওপর ঝকঝক করছে রাতের আকাশ। গোটা ছায়াপথ অতি সুস্পষ্ট। খিলেনের মতো। চাঁদ নেই তাই তারাগুলো আরও ঝকঝকে।

গাড়ি-টাড়ি যেখানে নেই, সেইরকম একটা জায়গায় গিয়ে পকেট থেকে কালো চাকতি বের করেছিল নিখিল। রেখেছিল পিচমোড়া রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্ত হয়েছিল কৃষ্ণচক্র— নিজে থেকেই। পঞ্চাশ ফুট দূরে সরে এসেছিল নিখিল। ততক্ষণে কালো চাকতি ঘিরে রচিত হয়ে গেছে এক বর্ণচ্ছটা। যেন জ্যোতির্বলয়। প্রথম দিকে ছিল লোহিত, আস্তে আস্তে হয়ে গেল তপ্ত শ্বেত।

অভয় নিপাট নিদ্রা দিতে পারেনি চাপা উৎকণ্ঠায়। এত কাণ্ডের মূলে যে ওই কালো চাকতি, এইরকম একটা গা-ছমছমে অনুভূতি মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল বলেই বস্তুটাকে নাগালের মধ্যে পেয়েও স্পর্শ করেনি। ঘুমিয়ে কাদা হতেও পারেনি। চিত হয়ে শুয়ে থেকেই

চোখ খুলেছিল হঠাৎ। দেখেছিল কড়িকাঠ আলোকিত হচ্ছে একটু একটু করে— জানলা দিয়ে আসা অদ্ভুত এক প্রভায়।

খাট থেকে নামতে গিয়ে দেখেছিল নিখিল নেই বিছানায়। ফের নিশাচর হয়েছে। হয়েছিল গত রাতেও।

জানলার সামনে গিয়ে দেখেছিল অদ্ভুত প্রভার উৎস। গাড়ি রাখার জায়গায় একটু একটু করে পরিধি বাড়িয়ে চলেছে একটা আলোর গোলক। সেই আলোই জানলা দিয়ে এসে আলোকিত করে রেখেছে কড়িকাঠকে।

আচমকা নিভে গেল আলোর গোলক। এই ছিল, এই নেই। অথবা যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল। একটা জোরালো হু-উ-উ-শ শব্দ শোনা গেল। আচমকা তাও থেমে গেল।

তখন দেখা গেল নিখিলকে। এদিক-ওদিকের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে অনেক মানুষ। যেন ছায়াশরীরী। প্রায় তিরিশজন। জড়ো হল এক জায়গায়। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, চুপিসারে মিটিং।

আচমকা জানলার দিকে চোখ ঘুরে গেল নিখিলের। সোজা চেয়ে আছে অভয়ের দিকে। এই প্রথম একটা ব্যাপার জানল অভয়।

নিখিলের চোখ জ্বলছে, বেড়ালের চোখের মতো। একই সঙ্গে জমায়েত মানুষদের জোড়া-জোড়া চোখও ঘুরে গেছে জানলার দিকে। তাদের চোখেও সেই অমানবিক আলো।

ছিটকে সরে এল অভয় জানলার সামনে থেকে— সটান বিছানায়। একটু পরেই নিঃশব্দে ঘরে এল নিখিল। বললে খুব আস্তে, 'কী দেখলে অভয়?'

'মিটিং।'

নিশীথ রাতের মিটিংবাজ নিখিল সকাল হতেই ছুটেছিল কোথায়?

সাইফার সফটওয়্যারের সদর দপ্তরে। বিল গেটস-এর সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে চলেছে তরুণ বাঙালি নিতু বোসের এই সংস্থা। পৃথিবী-গোলকটাকে টহল দিয়ে আসে যখন তখন। বাঙালি নাকি ব্যাবসা জানে না? নিতু বোস মরাগাঙে জোয়ার এনেছে। ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকার ব্যাবসা করে যাচ্ছে ভূগোলক জুড়ে। ভেলকি দেখাচ্ছে বেঙ্গল ব্রেন।

নিতু বোস এই শহরের ছেলে। হেডঅফিস এখানেই। গ্র্যানাইট দিয়ে গড়া তার পেল্লায় অফিস ভবনের জানলা দিয়ে দূরের পাহাড় দেখা যায়।

নিউইয়র্ক-অফিসের সঙ্গে টেলিফোনে কথা সেরে নিয়ে রিসিভার নামিয়ে রিসেপশনিস্টকে হুকুম পাঠাতেই লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকল নিখিল।

সপ্রশংস চোখে তার কৃষ্ণকালো পেশিবহুল বডির দিকে তাকিয়ে থেকে নিতু বোস বললে, 'কী ব্যাপার, নিখিল? উদয় কেন সাতসকালে?'

দু'জনেই পূর্বপরিচিত। এই ইউনিভার্সিটির যাবতীয় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক নিতু বোস করে দিয়েছে। আলাপ আর ঘনিষ্ঠতা তখন থেকেই।

নিখিল বললে কালো পাথর-মুখে সাদা দাঁতের মনোরম হাসির ঝিলিক তুলে, 'সাইফার সফটওয়্যার দরকার।'

কম্পিউটার দুনিয়ায় ঝড় তুলেছে নিতু বোসের যে-সফটওয়্যার, নিখিল চাইছে, সেই তাজ্জব বস্তু।

চোখে চোখে চেয়ে নিতু বোস বললে, 'কেন হে, তুমি তো এখনও ইউনিভার্সিটির গণ্ডি পেরোওনি?'

নিখিল বললে, 'বিদ্যা যে-কেউ চাইতে পারে।'

যুগপৎ চোখে-ঠোঁটে কৌতুক বিছিয়ে নিতু বোস বললে, 'কী প্রয়োজনে?'

'অদ্ভুত ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎস সন্ধান করার জন্যে।'

নিতু বোস অতিশয় স্মার্ট। দু'চোখের হিরে-চাহনিতে ঝলক দেখা গেল এই কথায়। বললে, 'শহর জুড়ে উৎপাত শুরু হয়েছে শুনলাম। ফ্লু সারছে, কিন্তু পার্সন্যালিটি পালটে যাচ্ছে। মানুষটা যেন অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক শুনেছি?'

থেমে থেমে চোখে চোখে চেয়ে নিখিল বললে, 'হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক শুনেছ। ব্যক্তিত্ব পালটে যাচ্ছে। মানুষটা যেন অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছে। বেটার হয়ে যাচ্ছে। সুপার হয়ে যাচ্ছে। সুপারম্যানও বলতে পারো।'

'কিন্তু সফটওয়্যার দিয়ে ভাইরাস শিকার— রূপকথার গল্প হয়ে যাচ্ছে না? এ-যুগে যা সায়েন্স ফিকশন? যদিও আগামী যুগে বিজ্ঞান?'

'এগজ্যাক্টলি। এই যে কালো চাকতিটা, এটাই তো একটা অজানা সায়েন্স। মানে সায়েন্স-ফিকশন। এর রহস্য ভেদ করতে হলে সাইফার সফটওয়্যার দরকার।'

পকেট থেকে কালো চাকতি বের করে টেবিলের ওপর এগিয়ে দিল নিখিল। সে দাঁড়িয়ে ছিল, দাঁড়িয়েই রইল।

কালো চাকতি রইল টেবিলে। নিতু বোস চেয়ে আছে নিমেষহীন নয়নে। বললে থেমে থেমে, 'শুনলাম, শহর নাকি ছেয়ে গেছে কালো চাকতিতে? মাঠেঘাটে-পথে-পার্কে পড়ে আছে?'

'সেটাই তো রহস্য। কে ছড়িয়ে দিল? কেন? ফ্লু এসেছে কালো চাকতির আবির্ভাবের পর থেকেই। দুইয়ের মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কি?' কথার মধ্যে যেন সম্মোহনী সুর। মন্ত্রমুগ্ধের মতোই কালো চাকতি হাতে তুলে নিয়েছিল নিতু বোস। হুল ফুটেছিল তৎক্ষণাৎ। এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এসেছিল তর্জনীর ডগা দিয়ে।

সেইসঙ্গে একটা প্রভা। তর্জনী ঘিরে একটা নীলচে আলোক বলয়। কালো চাকতি এই দংশনে বিশেষ তেজ ঢেলেছে— বিশেষ কাজের জন্যে। ওই প্রভা তার সংকেত।

নিতু বোস যখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে সেই দিকে, নিখিলের কঠোর ঠোঁটে তখন দেখা যাচ্ছে আরও কাঠিন্য।

পাঠক-পাঠিকার অজানা নেই, কালো চাকতির দংশনের পর ফ্লু হয়েছিল নিখিলের। হয়েছে অনেকের। তারা এখন যেন এক গুপ্ত সংঘের সদস্য। তাদের প্রত্যেকের চোখে জ্বলে আলো। তারা এককাট্টা তাদের গুপ্ত রহস্য গোপন রাখার ব্যাপারে।

ব্রিলিয়ান্ট ব্রেন নিতু বোস এখন সদস্য হতে চলেছে এই গুপ্ত সংঘের।

অভয় চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো ঘটনার পর ঘটনা ঘটে চলেছে। চোখের সামনে প্রাণপ্রিয় সুহৃদ নিখিল এক্কেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছে। ইদানীং কলেজেও যাচ্ছে না। এর একটা বিহিত করা দরকার।

সব উদ্ভট কাণ্ডকারখানার মূলে রয়েছে এই কালো চাকতি। মাত্র দেড় ইঞ্চি ব্যাসের কালো চাকতি। নিরেট। কোথাও জোড় নেই। ফুটো নেই। অথচ হুল ফোটায়। সে হুল বেরোয় কোত্থেকে? গবেষণা দরকার।

আরও আছে। গভীরভাবে চিন্তা করে রেখেছে অভয়। গাড়ির বাইরে পড়ে থাকা কালো চাকতি হাতে তুলে নিয়ে ছোবল খেয়েছিল নিখিল। সেইদিন থেকে সে পালটে গেছে। এক্কেবারে অন্য মানুষ। এমনিতে সে সুদেহী। শক্তিমান। কিন্তু কালো চাকতির কামড় খাওয়ার পর থেকে যেন অন্য এক শক্তি ভর করেছে তার ওপর। সেই অমিত শক্তির বিচ্ছুরণ দেখা যায় তার অনিমেষ চক্ষু তারকায়। আবেগ-উচ্ছ্বাস যেন বিদায় নিয়েছে নিখিলের ভেতর থেকে।

ভাবতে হচ্ছে অভয়কে আরও অনেক ব্যাপারে। বিশেষ করে এই কালো চাকতির ব্যাপারে। সহসা এই বস্তুটাকে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যাচ্ছে শহরের সর্বত্র। এবং অদ্ভুত ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎপত্তির মূল অবশ্যই এই কালো চাকতি। কেননা, খোদ নিখিল আক্রান্ত হয়েছিল ফ্লু-তে— চাকতির কামড় খাওয়ার পর। পুলিশ অফিসের বাগানে একটা কালো চাকতি দেখা গেছিল। তারপর থেকেই পুলিশ মহল যেন অ-মানুষ হয়ে গেছে। যন্ত্রবৎ প্রত্যেকেই। তাদের মদতেই এখন রাত-বিরেতে, আর দিনের বেলা, কালো চাকতি হাতে মানুষজনের সমাবেশ ঘটছে। গুপ্ত সংঘে যেমন চলে। মিটিং চলছে চাপা গলায়। তখন তাদের আর মানুষ বলে মনে হয় না। মানুষের চোখে কি আলো জ্বলে?

সবচেয়ে ভাবনার বিষয়, সহসা এই কালো চাকতিরা এমন বিপুল সংখ্যায় শহর ছেয়ে ফেলল কেমন করে? বাজারে গিয়ে অভয় দেখেছে সব দোকানেই শোকেসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কম করেও খানছয়েক কালো চাকতি। দাম মাত্র এক টাকা। বিক্রি হচ্ছে দেদার। বিক্রি যারা করছে, সেই দোকানদাররাও আর স্বাভাবিক নয়। চাহনি পর্যন্ত অন্যরকম, কষ্টিপাথরের চোখে যেন পাথুরে চাহনি। খোঁজ নিয়ে জেনেছে অভয়, এরা প্রত্যেকেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগেছে দিন তিনেক। তারপর থেকে এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা দেখিয়ে চলেছে।

ভাবনার কথা বই কী। যে-বাড়িতে বাবা-মা ফ্লু-তে ভুগে উঠেছে, তারা বাড়ির ছেলেমেয়েদের কালো চাকতি কিনে দিচ্ছে। তার পরেই তাদেরও ফ্লু হচ্ছে। ভুগে উঠে তারাও পালটে যাচ্ছে।

হাসপাতাল উপচে পড়ছে কালো চাকতির কামড় খাওয়া ফ্লু রোগীতে। এর মধ্যে একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে গেছে। এক রোগীর পকেটে পাওয়া গেছিল একটা কালো চাকতি। সদ্য কামড় খেয়ে জ্বর গায়ে ছুটে এসেছিল আউটডোরে। বড় ডাক্তারকে বোঝাচ্ছিল, অজানা ভাইরাস রয়েছে এই চাকতির মধ্যে। এর কামড়েই সবাই জ্বরে পড়ছে, কিন্তু মরছে কদাচিৎ।

গবেষণা করা হোক এই চাকতি নিয়ে। তা হলেই পাওয়া যাবে বিষের বিষঘ্ন।

এই কথাগুলো সে বলে যাচ্ছিল কালো চাকতিকে মুঠোর মধ্যে ধরে রেখে। আচমকা চেঁচিয়ে উঠেছিল বিকৃত গলায়। কালো চাকতিটা তাকে হুল ফুটিয়েছে পরপর তিনবার।

চাকতি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। বস্তুটা কিন্তু ঠিকরে যায়নি। আস্তে আস্তে ভেসে গিয়ে, উলটো অবস্থা থেকে সিধে হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল মেঝেতে।

আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল লোকটার। সবুজ গ্যাঁজলা গড়িয়ে পড়েছিল চোখ বেয়ে। মারা গেছিল হেঁচকি তুলতে তুলতে তিন মিনিটের মধ্যেই।

আরও একটা ব্যাপারে খটকা লেগেছে অভয়ের। রাত দুটো বেজে দশ মিনিটের সময়ে অভয়কে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডল দেখিয়েছিল নিখিল। ঠিক সেই সময়ে দীর্ঘপুচ্ছ এক ঝাঁক উল্কাপাত দেখা গেছিল আকাশের ঠিক সেই দিকে। কিন্তু সেটা আদৌ উল্কাপাত কিনা, অভয়ের এই প্রশ্নের জবাবে হেঁয়ালি করে নিখিল বলেছিল, হয়তো।

সেই ঘটনার কিছুদিন পর থেকেই ফ্লু-আক্রান্ত হয়েছিল পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ। হয়তো তা কাকতালীয়, তাই আগ বাড়িয়ে আর প্রশ্ন করেনি অভয়। কিন্তু সেই রাতে নিখিলের অদ্ভুত আচরণ, চাহনি আর কথা থেকে অভয়ের মনে হয়েছিল, সে সব জানে। ·আগে থেকেই জানতে পারে।

যত সর্বনাশের মূল এই কালো চাকতি যেন নিখিলের আত্মা। রেখে দেয় কম্পিউটারের সামনে। বাইরে বেরুলে সস্নেহে নিয়ে যায় পকেটের মধ্যে। সাইফার সফটওয়্যারের সন্ধানে গেছে কেন? কী মতলবে? রাতের মিটিং-এ কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে কালো চাকতি সংঘ?

অনেক ভেবে একটা মস্ত কাজ করেছিল অভয়। কালো চাকতির বিষ-রস সংগ্রহ করেছিল। দোকান থেকে কিনে আনা একটা চাকতিকে রেখেছিল ব্লটিং-পেপারের ওপর। লম্বা সন্না দিয়ে এক টুকরো মাংস রেখেছিল চাকতির কিনারায়। যেখানে নেই কোনও জোড় বা ফুটো। মসৃণ গা। শুধু কয়েকটা উঁচু-উঁচু গম্বুজ।

সুপার ইনটেলিজেন্ট কালো চাকতি তখন নিশ্চয় দৌড় দেখতে চেয়েছিল অভয়ের।

আচমকা একটা ছোট্ট ছুঁচ বেরিয়ে এসেছিল কিনারা থেকে। টপ করে খসে পড়েছিল এক ফোঁটা হলুদ তরল। পরক্ষণেই ছুঁচ অদৃশ্য হয়েছিল কালো চাকতির ভেতরে।

সব নিয়ে অভয় দৌড়েছিল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কাছে।

যাওয়ার আগে শুনে গেছিল আরও একটা পিলে-চমকানো সংবাদ। সাইফার সফটওয়্যারের বিশ্ববন্দিত কর্ণধার নিতু বোস শহরের সমস্ত ফ্লু রোগে ভুগে ওঠা আর অন্য মানুষ হয়ে যাওয়া অ-মানুষদের ডেকে ঘোষণা করেছে : আজ থেকে প্রতিষ্ঠিত হল 'নতুন মানুষ সংঘ'। তার ভাষণে ছিল আরও একটা কথা : পৃথিবীর সব জায়গাতেই কালো চাকতি পৌঁছে গেছে— মানুষ পালটে যাচ্ছে— একই কলেবরে নতুন মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে। বন্ধুগণ, সুদিন আসছে— এই পৃথিবী মহাবিশ্বের অধীশ্বর হতে চলেছে— আমাদের শক্তির জোরে—

সভায় উপস্থিত ছিল নিখিল। যে-নিখিলের কানের পেছনের চামড়া পালটে গেছে। লোমশ হয়ে গেছে।

মিউটেশন ঘটেছে। শরীরের জিনদের প্রকৃতিতে বদল ঘটছে।

হ্যাঁ, আমি শ্রীহীন দীননাথ নাথ অত্যাশ্চর্য এই ঘটনামালার শেষ পর্ব বর্ণনা করার ভার নিলাম।

হন্তদন্ত হয়ে অভয় এসে প্রথমেই প্রফেসরকে বলেছিল, 'যত অনিষ্টের মূল যখন এই কালো চাকতি, তখন আগে ভেদ করা যাক জিনিসটার নির্মাণ রহস্য।'

'কী করতে চাও?' গম্ভীর বদনে প্রশ্ন করেছিলেন প্রফেসর।

'কালো চাকতিকে যদি গ্যাস করে দেওয়া যায়, তখন সেই গ্যাস বিশ্লেষণ করলেই তো জানা যাবে তার জন্ম কোন চুলোয়, আর কী দিয়ে গড়া তার নিবাত কবচ বপু।'

'নিবাত কবচ!... নিবাত কবচ!' বিড়বিড় করে বলেছিলেন প্রফেসর, 'দীননাথ, নিবাত কবচ বলে তো সায়েন্সে কিছু নেই? তুমি জানো?'

মওকা পেয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান বর্ষণ করেছিলাম আমি, 'অভেদ্য কবচ যারা ধারণ করে—দৈত্যগণ বিশেষ। মহাভারত অনুসারে এরা সংখ্যায় ৩০,০০০,০০০। বাস করত সমুদ্রের নীচে। অর্জুন এদের ধ্বংস করেছিল।'

'তাই নাকি? তাই নাকি? এক্ষেত্রে তা হলে আমাকেই অর্জুন হতে হবে? দেখা যাক।'

কিন্তু হার মেনেছিলেন প্রফেসর। হাই এনার্জি লেসাররশ্মি দিয়ে কালো চাকতির একখানা মলিকিউলকেও ভেঙে আনতে পারেননি।

তখন চালিয়েছিলেন হিরের উকো। ডায়মন্ড ড্রিল। অক্ষত থেকেছে কালো চাকতি। হার মেনেছে হিরে!

প্রফেসর যখন গুম মেরে গেছেন, আমি তখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অভয়ের পেট থেকে আরও কথা টেনে বের করছিলাম। অভয় আমার পূর্ব পরিচিত। কথাটা আগে বলা হয়নি? সরি! এখন বললাম। সেইজন্যেই তো দিশেহারা হয়ে ছুটে এসেছিল অগতির গতি এই দীননাথের কাছে।

আমি জিগ্যেস করেছিলাম, 'হ্যাঁরে, তুই বললি নিখিলের কানের পেছনের চামড়া পালটে গেছে। আর কারও ক্ষেত্রে এরকম কিছু দেখা গেছে?'

'আরও ভয়ানক ব্যাপার দেখা গেছে।'

'যেমন?'

'সদ্য-ভূমিষ্ঠ এক শিশুর চোখেও দেখা গেছে আশ্চর্য আলো। তার বাবা-মা ভুগে উঠেছিল এই ইনফ্লুয়েঞ্জায়।'

'মাই গড! নতুন মানুষ আসছে পরবর্তী প্রজন্মে!'

'তারা না-মানুষ।'

'আর কিছু?'

'ফ্লু রোগে যারা ভুগে উঠছে, তাদের হাসি পর্যন্ত কেমন যেন পালটে গেছে। প্লাস্টিক হাসি। যান্ত্রিক। কাষ্ঠহাসি নয়, কিন্তু গা-শিরশির করে।'

'নিষ্প্রাণ?'

'বলা যায়।'

'পুলিশরাও পালটে গেছে?'

'ধরে ধরে ফ্লু করাচ্ছে।'

প্রফেসর গুম মেরে থাকলেও কান-খাড়া করে ছিলেন। এখন বললেন, 'কালো চাকতি তো সাধারণ বস্তু দিয়ে গড়া নয়। পলিমার জাতীয় কিছু। অথবা পোড়ামাটি টাইপের কিছু একটা। যেমন চিনেমাটির বাসনকোসন। কিন্তু খাঁটি সেরামিক নয়। ধাতুর মিশেল আছে। হিরে দিয়েও যখন কাটা যাচ্ছে না, হিরেও থাকতে পারে।'

মওকা পেয়ে আমি আমার জ্ঞান দেখিয়ে ফেলেছিলাম, 'হিরে, সিলিকন, আর কোনও একটা ধাতুর মিশেল— যা আমাদের পৃথিবীতে আজও তৈরি হয়নি।'

খরখরে চোখে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর বলেছিলেন, 'পৃথিবীর বাইরে তৈরি?'

অভয় বলেছিল, 'যে-ভাইরাসটা ফ্লু ঘটাচ্ছে, সেটারও আবির্ভাব তা হলে পৃথিবীর বাইরে থেকে?'

প্রফেসর বলেছিলেন, 'এমনও তো হতে পারে, ভাইরাসটা কালো চাকতির মধ্যে দিয়ে আসেনি?'

'তবে?'

'ছিল এবং আছে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর জিন-সত্তার মধ্যে।'

'তবে ফ্লু হচ্ছে কেন কালো চাকতির কামড় খেলেই?'

'কামড়ে ঢালছে এমন একটা প্রোটিন যা ভাইরাস ডিএনএ-র ঘুম ভাঙাচ্ছে।'

আমি আর অভয় দু'জনেই হাঁ হয়ে গেলাম।

প্রফেসর বললেন, 'অভয়, কামড় খাওয়ার পরেই কি রক্তে লিমফোকাইন বেড়ে যাচ্ছে?'

অভয় বলল, 'লিমফোকাইন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো শুনে এলাম।'

আবার প্রশ্ন, 'লিমফোকাইন কী জিনিস রে?'

জবাবটা দিলেন প্রফেসর, 'শরীর রক্ষার জন্যে লড়াই ব্যবস্থা।'

বলে একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু এই ভাইরাস শুধু একটা কোষের মধ্যে নিজেকে আটকে না-রেখে গোটা শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বিশেষ করে ব্রেনকে রাখছে কবজায়।'

আমি দেখিয়েছিলাম আমার পাণ্ডিত্য, 'তা হলে তাকে বলা উচিত মেগা-ভাইরাস। আপনি বলতে চান, পৃথিবীতে মানুষ আসবার আগে এসেছিল এই মেগা-ভাইরাস?'

'অপেক্ষায় ছিল।' প্রফেসরের গম্ভীর জবাব।

সিঁটিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, 'আমার মধ্যেও আছে নাকি?'

'আছে। ছদ্মরূপে— যা প্রকাশ পায় ক্যান্সার হয়ে। আমাদের ডিএনএ-র মধ্যে যে অনেক ভাইরাস আছে টুকরোটাকরা অবস্থায়, এখন তো তা বৈজ্ঞানিক সত্য।'

ফের একটু জ্ঞান দেখিয়েছিলাম, 'এই যে মেগা-ভাইরাস, এরাই তা হলে পালটে দেয় মানুষের বংশগতি। তাই নিখিলের কানের পেছনের চামড়া পালটে যাচ্ছে— অমানবিক হয়ে যাচ্ছে। ঠিক বলছি?'

প্রফেসর বললেন, 'বিলকুল ঠিক।'

সেই রাতেই ছাদে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন প্রফেসর, দু'পাশে আমি আর অভয়। দৃশ্যটা দেখা গেছিল তখনই।

নক্ষত্রমালায় ঝকঝক করছিল আকাশ, বিশেষ করে ছায়াপথের দিকে। আচমকা একঝাঁক উল্কা খসে পড়েছিল সেদিক থেকে। হাজার হাজার রকেটের ধেয়ে আসার মতো।

বিড়বিড় করে বলেছিলেন প্রফেসর, 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে। দীননাথ, অভয়, পৃথিবীকে পালটে দেওয়ার অভিযান হয়তো এবার শেষ পর্বে।'

আমি আঁতকে উঠেছিলাম, 'আপনি চুপচাপ দেখে যাচ্ছেন?'

'মূর্খ! ওদের দৌড় দেখছি।'

কালো চাকতি আর ব্ল্যাক-হোল

ব্লটিং-পেপারে কালো চাকতির বিষ নিয়ে এসেছিল অভয়। প্রফেসর তার মধ্যে নির্ণয় করলেন এমন একটা প্রোটিন, প্রিয়ন জাতীয় প্রোটিন, যা ডিএনএ-র মধ্যে বিশেষ অংশের ঘুম ভাঙাতে পারে। উনি তার নাম দিলেন, প্রোমোটার।

কালো চাকতির কাণ্ডকারখানা কিন্তু গোটা দুনিয়া জেনে গেছিল টিভি-রেডিয়ো- দৈনিকের দৌলতে। এমন গুজবও শোনা গেছিল, সাইফার সফটওয়্যার-এর স্বত্বাধিকারী নিতু বোস যে 'নতুন মানুষ সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছে, চিঠি গেছে সেখান থেকে রাষ্ট্রসংঘে— প্যাকেটে একটা কালো চাকতি: পৃথিবী এবার বদলে যাবে। সুপ্ত শক্তি জাগছে মানুষের মধ্যে। এই নব জাগরণের শরিক যদি না-হয় রাষ্ট্রসংঘ, তা হলে শুরু হবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম...!

সাজ সাজ রব পড়ে গেছিল দুনিয়া জুড়ে। 'নতুন মানুষ সংঘ' ঘাঁটি গেড়েছে যে-শহরে, ইউনিভার্সিটির শহরে, সেখানকার এয়ারপোর্টে রাষ্ট্রসংঘ সামরিক সম্ভার নামাতে গিয়ে কালো চাকতিদের আর এক সংহার রূপ দেখেছে।

কালো চাকতি তখন উড়ে এসেছে উড়ন চাকতির মতো। লক্ষ্যবস্তুকে তাক করে রশ্মিবর্ষণ করেনি, কিন্তু সামরিক সম্ভার সমেত অত বড় আকাশযান বিলীন হয়েছে নিমেষে। বিদারণ না-ঘটিয়ে যেন পাঠিয়ে দিচ্ছেন অন্য বিশ্বে।

মিনি ব্ল্যাক-হোল সৃষ্টি করতে সক্ষম ব্ল্যাক ডিস্ক!

গুজবটা শোনা গেল তার পরেই। তটস্থ হয়ে গেল পৃথিবীর মানুষ।

দেশে দেশে রাষ্ট্রনায়কদের কাছে পাঠানো কালো চাকতিরা তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। ক্ষমতা যাঁদের হাতে, তাঁরা এখন 'নতুন মানুষ সংঘ'-র সদস্য!

পাঠক এবং পাঠিকা, এবার দেখে আসা যাক যাক নিখিল কী করছে।

সে বসে আছে প্রায় খান চল্লিশ মনিটরের সামনে। এক-এক দেশের এক-এক রাষ্ট্রনায়ক ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন। অভয়বাণী শোনাচ্ছেন। ভয় নেই, ভয় নেই। সব ঠিক আছে। কালো

চাকতি নিয়ে রটনা একটা নিছক গুজব! গুজবে কেউ কান দেবেন না। নব বলে বলীয়ান হতে চলেছে মানুষ উন্নততর বিজ্ঞানের শক্তিতে। ভয় কী? কালো চাকতি তো এই নতুন শক্তির মহৎ দূত।

বলতে বলতে, ক্ষণেকের জন্যে হলেও, আলোর স্ফুরণ ঘটেছে প্রত্যেকের চোখে।

অস্বাভাবিক সেই দ্যুতি দেখা যাচ্ছে নিখিলের চোখেও। সে হাসছে। বলছে পাশে বসা নিতু বোসকে, 'শাবাশ! পৃথিবী এখন কবজায়! শুধু একটা কাজ বাকি।'

নিতু বোস, 'সেটা কী?'

নিখিল, 'অভয় কোথায়? তাকে চাই।'

নিতু বোস. 'সে নিপাত্তা।'

নিখিল, 'তাকে চাই। সে অনেক জানে। অনেক দেখেছে! অনেক কিছু করতে পারে।'

পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় এখন বিস্ময়বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রয়েছে নিখিলের দশ আঙুলের দিকে। কারণ আঙুল দশটা এখন আর মানুষের আঙুল নয়— সাপের মতো কিলবিলে!

নিতু বোস এলাহি কাণ্ড চালিয়েছে তার 'নতুন মানুষ সংঘে'র গোপন ল্যাবরেটরিতে। চালু রয়েছে সারবন্দি কম্পিউটার। ইন্টারনেটে নিউজ লেটার যাচ্ছে-আসছে। বিশাল ল্যাব তৈরি হয়েছে পাহাড়ি উপত্যকায়। টাকা ঢেলে গেছে অকাতরে।

সুখবর! বিশ্বের শতকরা ষাটজন মানবান্তরিত হয়ে গেছে। আর, পালে পালে মারা যাচ্ছে তারা, যাদের আছে দুরারোগ্য ডায়াবিটিস, ক্যান্সার আর রক্তের রোগ। নতুন ভাইরাস জঞ্জাল সাফ করে দিচ্ছে নতুন পৃথিবীতে। পিঁপড়েরা যেমন সংঘবদ্ধ, নতুন মানুষরা এখন সংঘবদ্ধ সেইভাবে, একতাই তাদের শক্তি। এক এবং অভিন্ন চৈতন্যশক্তিতে আচ্ছন্ন প্রত্যেকে। হুকুম আসছে সেই উৎস থেকে। একের ভাবনা চলে যাচ্ছে অন্যের মধ্যে। মনে মনে নিবিড় সংযোগ।

অবশেষে, হানাহানি লোপ পেতে চলেছে পৃথিবীতে। আসছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

অশান্ত কিন্তু নিখিল, অভয় তার প্রিয় বান্ধব। আবেগ যাচ্ছে না মন থেকে। অভয়কে চাই-ই চাই। কিন্তু নিরুদ্দেশ। গা-ঢাকা দিয়ে আছে কোথায়?

অভয়-নিখিলের বাঁধানো ছবি ঘুসি মেরে ভাঙছে নিখিল। তার হাত এখন হাতির শুঁড়ের মতো। আঙুল আরও কিলবিলে, আরও সর্পিল। ভাঙা কাচে হাত কেটেছে! রক্তের বদলে বেরিয়ে আসছে সবুজ ফেনা!

ভাঙা ছবির দিকে তাকিয়ে আছে নিতু বোস। তার চোখেও এখন আলো। যেন দূর গ্যালাক্সির অগণিত তারকার আভা। ঠোঁটের কোণে হাসি—এ-হাসি এখন মানবান্তরিত প্রতিটি মানুষের ঠোঁটের কোণে। নিষ্প্রাণ অচঞ্চল হাসি। বলছে ততোধিক প্রাণহীন স্বরে, ছবি কী দোষ করেছে নিখিল?

নিখিল বলছে, দোষ ছবির নয়, দোষ আমার। ভাবাবেগ যাচ্ছে না মন থেকে। ইমোশন! এই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানবান্তরিত প্রাণী আমি। অথচ এই ইমোশন, যা দেখা যায় না ছায়াপথের কোথাও, সেই ইমোশনকে আমি কবজায় আনতে পারছি না। বন্ধুপ্রীতি যাচ্ছে না।

অভয় আমার প্রিয় সহচর। তাকে মানবান্তরিত না-করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

প্লাস্টিক হাসি এক মিলিমিটারও সম্প্রসারিত না-করে নিতু বোস বলছে, আমার নেটওয়ার্কের জটাজাল যখন মুড়ে রয়েছে পৃথিবীকে, অভয়কে এনে দেব তোমার সামনে।

কথা দিচ্ছ?

নিখিলের কবজায় অভয়

পাঠক-পাঠিকার চোখের সামনে এবার উন্মোচিত হোক সেই দৃশ্য পরম্পরা।

দীননাথকে নিয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পেটপুজোর উপকরণ কিনতে গিয়ে নিতু বোসের চরবাহিনীর চোখে ধরা পড়ে গেছিল অভয়। মুহূর্তের মধ্যে খবর লেনদেনও হয়ে গেছিল।

অভয়ের ফটো চলে এসেছিল নিতু বোসের মনিটরে। নিখিলের অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার চলে গেছিল কালো চাকতি বাহিনীর কাছে। দীননাথ যখন পেট ভরানোর সামগ্রী কিনছে এক জায়গায়, বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের আর একদিক থেকে নিঃশব্দে কিডন্যাপড্ হয়ে গেল অভয়।

চতুর দীননাথ পাঁকাল মাছের মতো পিছলে গিয়ে হাওয়া হয়ে গেল নিমেষে। গেল কোথায়, হন্যে হয়ে খুঁজেও সে-ঠিকানার হদিশ পেল না নিতু বোসের স্যাঙাতরা।

পাহাড়ি উপত্যকায় 'নতুন মানুষ সংঘের্'র সদর দপ্তরে অভয়কে এনে ফেলেছিল নিতু বোস। বিরাট অঞ্চল নিয়ে যে বিপুল কর্মকাণ্ড চলছে, সংক্ষেপে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং নিরস্ত থাকা যাক।

এইখানে নিখিলের সামনে আনা হয়েছে অভয়কে। অভয় শিহরিত তার প্রিয় বন্ধুর অমানবিক আকৃতি দেখে। কানের পেছনে যে বিদঘুটে চামড়াটা আগে দেখা গেছিল, এখন তা ছড়িয়ে গেছে। কানের তলা দিয়ে এসে, গালের ওপর শুঁড় মেলে মেলে, অনেকখানি এগিয়েছে। সর্পিল আকারে ছেয়ে ফেলেছে গলা আর ঘাড়। মাথার চুল জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে, ভিনগ্রহী চামড়া দেখা যাচ্ছে। ঠোঁট হাস্যময়, কিন্তু পাতলা চামড়ায় গড়া। দাঁত ঢুকে গেছে ভেতরদিকে, হলদেটে হয়ে গেছে। চোখ দুটো যেন কৃষ্ণগহ্বর... ব্ল্যাক-হোল... মণি নেই... পিটপিট করে যাচ্ছে অবিরাম। চোখের ওপরের পাতা স্থির, উঠছে নামছে নীচের পাতা।

শিউরে উঠেছিল অভয়। এ কী ভয়ানককে দেখছে সে?

হাসবার চেষ্টা করে বলেছিল নিখিল, 'অভয়, নবমানবের ডিএনএ আমাকে ছেয়ে ফেলেছে, কিন্তু আদি মানবের প্রচ্ছায়া যাচ্ছে না কিছুতেই। মানবিক ভাবাবেগ সেই প্রচ্ছায়া। গোটা গ্যালাক্সিতে যা নেই। বন্ধুপ্রীতি থেকে মুক্ত হতে পারছি না। অভয়, তুমি আমাদের একজন হও—স্ব-ইচ্ছায়।'

'না।'

'অভয়, আমিই প্রথম নব-মানব। যে অসুস্থ জিন গঠন নিয়ে চলেছে পৃথিবীর মানুষ, তা নেই আমাদের মধ্যে। আমরা ত্রুটিমুক্ত সম্পূর্ণ মানব। আমরা এক, আমরা অভিন্ন। মানুষের শরীরের সমস্ত কোষ যেমন ব্রেনের কাছে দায়বদ্ধ, আমরা এই নব-মানবরা তেমনি এক মহাব্রেনের কাছে দায়বদ্ধ— সেই মহামগজ রয়েছে ছায়াপথে। বহুরূপে আমরা এক... অভিন্ন। এসো অভয়, আমাদের মধ্যে এসো।'

'না।'

উপত্যকায় সূর্য ততক্ষণে অনেকটা উঠেছে আকাশে। পৃথিবীর নানান অঞ্চল থেকে কাতারে কাতারে নব-মানব আসছে।

পিছন থেকে বললে নিখিল, 'আশ্চর্য এক পরিবেশ গড়ছি এইখানে— এই উপত্যকায়। এখান থেকেই ছড়িয়ে যাবে গোটা পৃথিবীতে।'

অভয় বললে, 'পুরনো পৃথিবীই ভাল আমার কাছে।'

'একদিক দিয়ে কথাটা ঠিক, অভয়। গ্যালাক্সিতে গ্রহ আছে অনেক, কিন্তু পৃথিবীর মতো আশ্চর্য গ্রহ নেই একটাও। স্নিগ্ধ, উষ্ণ, আর্দ্র, মিঠে।'

'প্রথম কবে ভাইরাসরা এসেছিল এই পৃথিবীতে?'

'পৃথিবীর তিন বিলিয়ন বছর আগে। ফিরে এসেছিল আর একবার— প্রাণের প্রসার যখন দ্রুত ঘটছে। অভিযাত্রী স্পেসশিপ থেকে ভিরিয়ন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আদিম সাগরে, বিবর্তিত ডিএনএ-র সঙ্গে খাপ খাইয়ে।'

'অভিযাত্রী মহাকাশ জাহাজের আবির্ভাব সেই প্রথম?'

'আরে না। প্রতি একশো মিলিয়ন পার্থিব বছরে অভিযাত্রী জাহাজ ফিরে এসে ভাইরাসদের জাগাতে চেয়েছে, দেখতে চেয়েছে প্রাণের বিকাশ যাচ্ছে কোনদিকে।'

'ভাইরাস তখন সচেতন ছিল না?'

'না, জাগ্রত ভাইরাস ধারণ করার অবস্থায় পৌঁছোয়নি জীবকুল। চৈতন্য ধারণের অনুপযুক্ত। তাই জিন গঠনের দিকে মন দেওয়া হয়েছিল, নতুন জিন নির্মাণ করা হয়েছিল, যাতে নিম্নস্তরের জীব মুছে যায়, নতুন প্রাণী আসে।'

'মানুষের মতো?'

'হ্যাঁ, মানুষের শরীর, মানুষের মগজের তুলনা হয় না— ভাবাবেগ বাদে। যত নষ্টের মূল এই ইমোশন— আঁকড়ে রয়েছে আমাকে।'

হেসে ফেলেছিল অভয়। ভাবাবেগ এত নাছোড়বান্দা এই গ্যালাক্সি মহাপ্রভুদের কাছে? হেরে যাচ্ছে ইমোশনের প্রতাপে? তোবা! তোবা!

নিখিল বললে, 'মানছি এই ইমোশন আছে বলেই মানুষ অনেক কিছু করতে পেরেছে। কিন্তু শান্তিও পাচ্ছে না, লড়াই নিয়ে মেতে আছে।'

অন্য প্রশ্নে চলে এল অভয়, 'গ্যালাক্সির আর ক'টা প্রজাতিকে কবজায় এনেছে এই ভাইরাস?'

'হাজার হাজার প্রজাতিদের। যেখানে মোড়ক মন্দ নয়, ভাইরাস সেখানে সেঁধোয়।'

'তুমি এসেছ কোত্থেকে?'

'জানা নেই। কোন গ্রহে আমার আসল বাড়ি... না, অভয়, জানি না। এ-প্রশ্নও কেউ করেনি, কেউ ভাবেওনি।'

'সচেতন প্রাণীকে অপার্থিব ভাইরাস দিয়ে কবজায় আনা কি ক্রাইম নয়?'

'না... যখন আরও ভাল কিছু দিতে যাচ্ছি।' একটু থেমে বললে নিখিল, 'অভয়, এসো নীচে, দেখাই একটা জিনিস।'

জিনিসটা একটা মহাকায় চোঙার মতো। সারা গায়ে অনেক তন্তু, অনেক চোঙা, অনেক খোঁচা। বর্ণনায় আনা যায় না, এমন কিম্ভূতকিমাকার।

বিমূঢ় অভয় বলেছিল, 'এই চোঙা তোমাদের নিয়ে যাবে ভিনগ্রহীদের কাছে?'

'তারা আসবে আমাদের কাছে— এই চোঙার মধ্যে।'

বুক টিপটিপ করেছিল অভয়ের। অসংখ্য ভিনগ্রহী পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে ভাবতেও রক্ত জল হয়ে যেতে বসেছিল। চারদিকের বিপুল কর্মকাণ্ড তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। অভয় জ্ঞান হারিয়েছিল।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখেছিল, ডান হাত শক্তভাবে মুঠো করে রেখেছে। মুঠোর মধ্যে রয়েছে একটা নিরেট শীতল বস্তু। ছুড়ে ফেলে দিতে গেছিল তৎক্ষণাৎ, কিন্তু মুঠো খুলতে দেয়নি নিখিল। বলেছিল, 'রহো অভয়, রহো। আশ্চর্যতর মানুষ হতে যাচ্ছ তুমি, আশ্চর্যতম হবে দু'দিনেই। তোমার মধ্যে বস্তু আছে। তোমাকে আমাদের চাই।'

কড়ে আঙুলে ছুঁচ ফুটেছিল সেই মুহূর্তে। কালো চাকতি সবলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু রক্ত গড়িয়ে নেমেছিল আঙুলের ডগা থেকে, জ্ঞান হারিয়েছিল।

জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল দোতলার একটা ঘরে। সে-ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। একটা মাত্র জানলায় গরাদ নেই ঠিকই, কিন্তু এত উঁচু থেকে লাফিয়ে নামবার সাহসও নেই। পা ভাঙবেই। সাত-আট হাত দূরে একটা গাছের ডাল চলে গেছে। মোটা ডাল, তবে এতটা দূরত্বে লাফিয়ে যেতে পারে শুধু পবনকুমারেরা, অর্থাৎ হনুমান সম্প্রদায়।

কালো চাকতির ছোবল যে কতখানি বিপজ্জনক, তা জানা ছিল বলেই মনে চোট পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল অভয়। কিন্তু জ্ঞান ফিরে পেয়েও যখন দেখল, জ্বর এখনও আসেনি, তবে জিভটা একটু শুকনো শুকনো লাগছে, গলাটাও একটু ব্যথা ব্যথা করছে, তখন ঠিক করেছিল ঝুঁকি নেবে।

সে নিখিলের মতো জোয়ান না-হলেও স্পোর্টসম্যান। লংজাম্প হাইজাম্পে প্রাইজ পেয়েছে। সুতরাং মনের জোরে কেন পারবে না, জানলা থেকে লাফ দিয়ে সাত-আট হাত দূরের ডাল পাকড়াও করতে? বিশেষ করে যখন সে মরিয়া?

তাই করেছিল অভয়।

গাছ থেকে নেমে এসে, ঠোঁটে প্লাস্টিক হাসি ভাসিয়ে, অন্যান্যদের ভিড়ে মিশে গেছিল। কেউ যেন না-বোঝে, সে এখনও দলছাড়া। কাতারে কাতারে পরিত্যক্ত গাড়ির একটা চালিয়ে এসেছিল উপত্যকার বাইরের শহরে। যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেছিল একটু ঘুরঘুর করতেই।

পরিত্যক্ত একটা কম্পিউটার শপ, মোডেমসহ। শুরু হয়েছিল মেসেজ পাঠানো দীননাথের কাছে। টাইপ করে গেছিল ঝড়ের বেগে।

ওস্তাদের মার শেষ রাতে

শ্রীহীন দীননাথ নাথের কলমেই শিহরন জাগানো এই কাহিনির সমাপ্তি ঘটানো যাক।

আমার কম্পিউটারে অভয়ের মেসেজ আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি পালটা মেসেজ টাইপ করে গেছিলাম, অভয়, তুমি এখন কোথায়?

ঠিকানাটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী কাণ্ড করে তাকে এনে প্রফেসরের পাতাল বীক্ষণাগারে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, সেই বিবরণে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন এই কারণে যে পাঠক এবং পাঠিকার শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের এই আন্ডারগ্রাউন্ড ল্যাবরেটরি সংবাদ অগোচর নয় তাদের কাছে, যারা সময়-পর্যটনের ভয়ানক অ্যাডভেঞ্চারে একদা গা-ভাসিয়ে দিয়েছিল। সময়-গাড়ি তো আছে এইখানেই।

কালো চাকতিদের কেরামতি ফাঁস করবার জন্যে গোঁয়ার প্রফেসর আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন এই বিবর বীক্ষণাগারে। অভয়কে আমি তুলে এনে ফেললাম সেখানে।

এলেমদার প্রফেসর ততক্ষণে ব্লটিং-পেপারের মধ্যে শুষে নেওয়া কালো চাকতির বিষ বিশ্লেষণ করে ফেলেছেন। বিষঘ্ন প্রস্তুত করে ফেলেছেন। সোজা কথায়, ভাইরাস হারামজাদাদের ঘায়েল করার মোক্ষম ভ্যাকসিন বানিয়ে ফেলেছেন। সবই করলেন প্রিয়ন জাতীয় সেই প্রোটিন থেকে, যা ডিএনএ-র মধ্যে বিশেষ অংশের ঘুম ভাঙাতে পারে, যার নাম দিয়েছিলেন, প্রোমোটার।

অভয়কে এনে ফেলতেই, উনি সেই বিষঘ্ন ফুঁড়ে দিলেন তার রক্তে।

তিনদিনের মধ্যে মিলিয়ে গেল অভয়ের জ্বর আর কাশি— বিষ শরীর থেকে বেরিয়ে গেল কিন্তু বিচ্ছিরিভাবে— সবুজ গ্যাঁজলা হয়ে— চোখ-নাক-মুখ দিয়ে।

ঝরঝরে শরীর নিয়ে অভয় বলেছিল মলিন বদনে, 'স্যার, আমাকে তো বাঁচালেন, কিন্তু দুনিয়া জুড়ে যারা অ-মানব, ইয়ে, নতুন মানুষ হয়ে গেছে, তাদের এবার বাঁচান।'

সেই ব্যাপারটাই ভাবছিলেন প্রফেসর। অভয়ের কাতর প্রার্থনায় চমকে উঠে বলেছিলেন, 'বৎস, যারা পুরো অ, ইয়ে, নতুন মানুষ হয়ে গেছে, তারা অক্কা পাবে।'

'সে কী!'

'উপায় নেই। কিন্তু যারা সবে ইনফেক্টেড হয়েছে, জল বেশিদূর গড়ায়নি, ডিএনএ-র সুপ্ত ভাইরাসদের মহানিদ্রা পুরো ভাঙেনি, ভিরিয়নরা এখনও ঘুমোচ্ছে, তাদের ফিরিয়ে আনা যাবে আকাশে-বাতাসে ভ্যাকসিন ছড়িয়ে দিয়ে।'

আঁতকে উঠে আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু ছড়াবেটা কে? পৃথিবীর শতকরা ষাট ভাগ মানুষই তো ইনফেক্টেড? রাষ্ট্রনায়করা একধারসে নতুন মানুষ।'

তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রফেসর বলেছিলেন, 'মূর্খ! সন্ত্রাসবাদ বিরোধীরা তামাম দুনিয়া জুড়ে জাল পেতে এমন সব গোপন কন্দরে তাদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে, যে সেসবের ঠিকানা রাষ্ট্রনায়করাও জানেন না।'

'কিন্তু অ্যান্টি-সন্ত্রাসবাদীরা, ইয়ে অ্যান্টি-টেররিস্টরাও তো ইনফেক্টেড?'

'সবাই নিশ্চয় নয়। খোঁজ নিচ্ছি।'

এলেমদার প্রফেসর তখন ইন্টারনেটের নিপুণ জাল ব্যবহার করে বের করলেন পবনগমন পুততুণ্ডকে। লোকটা ডেঞ্জারাস। বাঙালি তো, বিটকেল ব্রেনের অধিকারী। হিরের কারবারে কুবের হওয়ার পর গোটা ভূগোলক জুড়ে পাণ্ডববর্জিত জায়গাগুলোয় এমন সব রকেট যান লুকিয়ে রেখেছিল, যে একটা মাত্র বোতাম টিপলেই সাঁ-করে উড়ে গিয়ে পৃথিবীটাকে চরকিপাক দিতে দিতে ছড়িয়ে দেবে এমন একটা গ্যাস— প্রফেসরের তৈরি গ্যাস— যা অনেকটা লাফিং-গ্যাসের মতো। নাকে ঢুকলেই হাসি আসবে। আর হাসলেই মনের বিষ কেটে যাবে, শরীরের বিষ ঝরে যাবে, অমৃতময় মানুষে পৃথিবী ভরে যাবে।

প্রফেসর তাঁর পরমভক্ত এই পবনগমন পুততুণ্ডকে ডেকে বললেন, 'বাপু হে, আগে আমার এই ভ্যাকসিন ছড়াও পৃথিবীর প্রতি বর্গ ইঞ্চি মাটিতে— নিজে যদি বাঁচতে চাও।'

নিজে বাঁচতে চায় সব মিঞাই। সুতরাং কম্পিউটার চালিত কলকবজা নিমেষে ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশযান উড়িয়ে দিয়েছিল আকাশে। তাদের গঠন অনেকটা কল্পবিজ্ঞানের ফ্লাইং-সসারের মতো। বাতাস ছেয়ে গেছিল ভ্যাকসিনে। পালে পালে মানুষ মরেছিল চোখ-নাক-মুখ দিয়ে সবুজ গ্যাঁজলা বের করে দিয়ে। বেঁচেও গেছিল অনেকে।

অবশেষে দূষণমুক্ত হয়েছিল পৃথিবী।

প্রফেসরের নজর ছিল দূর মহাকাশে। যেখান দিয়ে তেড়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কাপুঞ্জ। তিন বিলিয়ন বছর আগে যে ভিনগ্রহী ভাইরাসরা এসেছিল পৃথিবীতে ভিরিয়ন ছড়াতে, নিশ্চয় তারা অক্সিজেনে বাঁচে না— তিন বিলিয়ন বছর আগে তো অক্সিজেনই ছিল না পৃথিবীতে। আজও এমন জীবাণু বিস্তর রয়েছে পৃথিবীতে অক্সিজেন যাদের কাছে বিষ।

উনি ঝানু সমর-নেতার মতোই এক অভিনব সমর-কৌশল অবলম্বন করলেন। পৃথিবীময় ছড়ানো কালো চাকতিদের যতগুলো সম্ভব জড়ো করে লিকুইড অক্সিজেনে ফেলে দিলেন।

অন্তঃস্ফোরণ ঘটেছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে— যা বিস্ফোরণের বিপরীত, এক্সপ্লোশন নয়, ইমপ্লোশন। কালো চাকতিরা যে এক-একটা মিনি ব্ল্যাক হোল, তা তো জেনেছিলেন। বিষে-বিষক্ষয় ঘটালেন। অন্তঃস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা বিলীন হয়ে গেল পৃথিবী থেকে।

কালো চাকতিরা যখন আর নেই, তখন কালো চাকতিদের বিষে বলিয়ান, সংক্রামিত আর রূপান্তরিত মানুষগুলোর মধ্যেও নিঃশব্দ অন্তঃস্ফোরণ ঘটে গেল নিমেষে। পৃথিবীর ষাট ভাগ সংক্রামিত মানুষ বায়ুতে বিলীন হতেই পৃথিবীর ওপর থেকে ওজন কমে গেল অনেকটা— সেই সঙ্গে অনেক সমস্যা।

আরও একটা মস্ত উপকার হয়েছে। সেটা অবশ্য কেউ মুখে বলছে না। বললেও, আড়ালে-আবডালে বলছে। রাষ্ট্রনায়কগুলো অন্তঃস্ফোরণের ফলে বিলীন হওয়ায় সাধারণ

মানুষ, যাদেরকে বোকা বলেই সবাই জানে, তারা খুব খুশি হয়েছে।

আর হ্যাঁ, অ্যান্ড্রোমেডা অথবা ওইরকম কোনও দূর নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে যারা এক ঝাঁক ভাইরাস পাঠিয়েছিল উল্কারূপে অবতীর্ণ হয়ে কালো চাকতিদের মাধ্যমে পৃথিবীকে কবজায় এনে মানুষের রূপান্তর ঘটাবে বলে, তারা উচিত শিক্ষা পেয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, কয়েকশো মিলিয়ন বছরেও আর পৃথিবীমুখো হবে না।

খুব সহজে এই কাজটা হয়ে গেছে। প্রফেসরকে আর কলকাঠি নাড়তে হয়নি। পিঁপড়েদের মতো এক মস্ত মগজ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল তো সংক্রামিত আর রূপান্তরিত মানুষগুলো— এদের মগজ থেকেই মেসেজ চলে গেছিল ধেয়ে-আসা উল্কাপুঞ্জে... পালাও! পালাও! পৃথিবীর চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকলেই অন্তঃস্ফোরণ ঘটবে... খেপেছেন নাটবল্টু চক্র নামে এক পাগলা প্রফেসর!

কিন্তু চম্পট দেওয়ার সময় আর পায়নি উল্কাপুঞ্জ। পবনগমন পুততুণ্ডর রকেট বাহিনী ঝাঁকে ঝাঁকে তেড়ে গিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা লাগিয়ে এমন বিষগ্যাস ছড়িয়ে দিয়েছিল যে নিমেষে অন্তঃস্ফোরণ ঘটেছিল তাদের মধ্যে। পলায়নের পথ আর পায়নি।

এই দৃশ্য আমি দেখেছিলাম প্রফেসরের যন্ত্রপাতির দৌলতে। একটু ফোড়নও কেটেছিলাম, 'পালের গোদার এখন অবস্থাটা কী?'

'সে কে?' প্রফেসর ঈষৎ উত্তপ্ত হয়েছিলেন।

'নিখিল। যে কিনা প্রথম রূপান্তরিত নতুন মানুষ।'

'সে কি আর আছে এতক্ষণে। বিটকেল দানব হয়ে যাচ্ছিল— ভিনগ্রহী ভাইরাসরা অক্কা যখন পেয়েছে, তারও নিশ্চয় অন্তঃস্ফোরণ ঘটেছে।'

কথাটা ঠিক। নিতু বোসের সাধের 'নুতন মানুষ সংঘে'-র মহা ল্যাবরেটরিটাই তো অন্তঃস্ফোরণের কৃপায় ভ্যানিশড হয়ে গেছে— টুকরো টাকরা কিচ্ছু ছিটকে যায়নি।

নিখিলের দেহাবশেষও পাওয়া যায়নি।

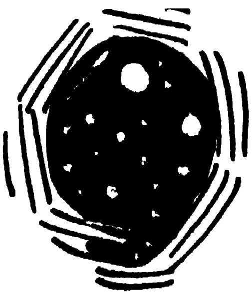

আটলান্টিস-এর সন্ধানে

সুদূর অতীতে এক মহাসাম্রাজ্য দাপিয়ে গেছিল ধরণীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। শহর রক্ষার জন্যে নির্মিত সুবিশাল গড়-প্রাসাদে নিবাস রচনা করেছিল সাম্রাজ্য অধিপতিরা। সমুদ্রের সঙ্গে টক্কর দিয়ে। ছিল এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাওয়ার উপযুক্ত সরু সরু ভূখণ্ডের সুবিশাল জটাজাল। ধরণীর কোনও কোণে এমন বিচিত্র ভূখণ্ডের সমাহার দেখা যায়নি। অসমসাহসিক বৃষযোদ্ধা অকপট মানুষরা অসাধারণ শিল্পসামগ্রী রচনা করে গিয়েছিল সোনা আর হাতির দাঁতের সমাহার ঘটিয়ে। কিন্তু সমুদ্র-দেবতা পোসিডন-এর বিরাগভাজন হওয়ায় অতি দর্পে হত লঙ্কার মতোই নিমেষ মধ্যে এ-হেন মহাসাম্রাজ্য তলিয়ে যায় সাগরের অতলে— প্রবল জলোচ্ছ্বাস আর ভূস্তরের তাণ্ডব নৃত্য পরম্পরার পরিণামে— আর দেখা যায়নি পরমাশ্চর্য সেই মহাদেশকে।

আটলান্টিস! আটলান্টিস! হারিয়ে যাওয়া সেই মহাদেশের নাম আটলান্টিস!

বিস্ময় জাগানো এই কাহিনি সেই লস্ট আটলান্টিস পুনরুদ্ধারের উপাখ্যান। আজও যা রয়েছে অতল সাগরের নিতল রহস্য হয়ে। মহামতি প্লেটো গল্পচ্ছলে সত্যি কাহিনিকে পরিবেশন করে গেছিলেন— যাকে বলা যায় বিশ্বের প্রথম কল্পবিজ্ঞান। মিথ্যে যে নয়, তা প্রমাণ করার জন্যে এক সমুদ্র অভিযানের আয়োজন চলছে আমেরিকার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচের ঝুঁকি নিয়ে। তার আগেই কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার সামনে হাজির করা হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক এই কল্পকাহিনি... আটলান্টিস আজও আছে! আজও আছে!

(১) প্যাপিরাস পুঁথির টুকরো

আমি, দীননাথ নাথ, গাঁজা গল্প লিখি বলে দুর্নাম কুড়িয়েছি। কুলোকে যাই বলুক না কেন, আমার কলম প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের পিলে চমকানো অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি-টাহিনি লিখে যাবেই। কেননা, আমি নিজে যে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। বুকের পাটা আছে বলেই প্রাণের মায়া না-রেখে প্রফেসরের চ্যালাগিরি করে যাচ্ছি।

এই যে কাহিনিটা বলব বলে কলম পাকিয়ে লিখতে বসেছি, এই কাহিনিকে অনায়াসেই প্রফেসরের সেরা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি বলা যেতে পারে। ওঁর 'সময় গাড়ি' অভিযান

উপাখ্যান পড়ে যারা চমৎকৃত হয়েছে, তারা যেন ধৈর্য নিয়ে এই কাহিনির ছত্রে ছত্রে যৎকিঞ্চিৎ নিবিষ্ট থাকে। আক্কেল গুড়ুম তো হবেই, জানাও যাবে এমন অনেক বৃত্তান্ত, যা টনক নড়িয়ে এসেছে দু'হাজার বছর ধরে বহু পণ্ডিতদের।

এইবার আসা যাক গল্প শুরুর শুরুতে।

গদাই গম্ভীর আমার বাল্যবন্ধু। ওর এহেন আজব নামকরণ কেন যে হয়েছিল, সেই ব্যাপারটাই তো একটা বিস্ময়। কেননা, গদাই গম্ভীর মোটেই গদাইলশকরি চালে হাঁটে না, গম্ভীরও নয়। আকৃতিতে সে গদার মতো নয়, স্বভাবেও গম্ভীর নয়। মাথায় পাক্কা ছ'ফুট, এক মিলিমিটারও এদিক ওদিক নয়। রগড় করতেও পারে বটে। হাসিয়ে পেটের খিল খুলে দিতে পারে। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, একালের গোমড়ামুখো বেঁটে বকমবাজ বাঙালিদের কাছে গদাই একটা পরমাশ্চর্য প্রাণী।

গদাই অতিশয় অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। আমার চাইতেও। ছেলেবেলায় আমাদের দু'জনের জুটি প্রতিবেশীদের হাড় জ্বালিয়ে ছেড়েছিল, তারপর গদাই ওর এলেম দেখিয়ে দেশে দেশে টহল দিয়ে দেদার কামিয়ে যেতে লাগল, আমি অকর্মার ঢেঁকি বলে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের মতো খ্যাপাটে বৈজ্ঞানিকের চ্যালাগিরি করে গেলাম। লিখিটিখি তো ওই কারণেই। যাদের দ্বারা এই সংসারে কিচ্ছু হয় না, তারা তিনটে কাজ করে যায়; এক, গল্প লেখা; দুই, ইনশিয়োরেন্সের দালালি; তিন, উকিলি করা।

আমি বেছে নিয়েছি প্রথমটা। রসদের তো অভাব নেই। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের সরেস ব্রেনের দৌলতে গল্পের খোরাক পেয়ে যাই এন্তার।

কিন্তু এই যে সত্যি গল্পটা লিখতে বসেছি, এর মূলে আছে, খোদ গদাই। তাই তাকে নিয়ে একটু ভনিতা করে নিলাম আগে।

গদাই যে ইল্লিদিল্লি করে বেড়ায়, শুরুতেই সেটা জানিয়ে দিয়েছি। পয়সা কামায়— সৎপথে। ফুর্তি করে— নির্দোষ পন্থায়। রোজগারের পয়সা পকেটে না-রেখে অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গা দেখে বেড়ায়। পয়সা উড়িয়েই ওর আনন্দ।

এই গদাই একদিন এসে আমাকে বললে, 'দীননাথ, কীসব ছাইপাঁশ লিখছিস। আমাকে নিয়ে লেখ। একটা জব্বর জিনিস হাতে এসেছে। জিনিসটার মানে বুঝতে পারছি না। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল চোরাকারবারিরা, অথবা বোম্বেটেরা, যারা ইন্টারন্যাশনাল সাগর এলাকায় গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়, তারা আমার পেছনে লেগেছিল। আমি হাওয়া হয়ে গিয়ে চলে এসেছি তোর কাছে। তোর ব্রেনের দৌড় আমার জানা আছে। তবে কী জানিস, তোর ওই বুড়ো গুরু, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র... অদ্ভুত একটা নাম দিয়েছিস বটে... হয়তো জিনিসটার মানে বুঝতে পারবে।'

গদাই আমার বাল্যবন্ধু, আগেই বলেছি। তাই টিটকিরি দেওয়ার অধিকার তার থাকে। তাই তার খোঁচা গায়ে না-মেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'জিনিসটা কী?'

'একটা প্যাপিরাস পুঁথির টুকরো।'

(২) মরা সাগরের মৃত্যু

গদাই বললে, 'দীনু, তুই তো দেখেছিস, ছেলেবেলায় একটা জ্ঞানের কেতাবের পাতা উলটে উলটে প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।'

আমি বললাম, 'গদাই, মেমারি আমার খুব শার্প। যতই টিটকিরি দিস না কেন, ওই ব্যাপারে তোকে আমি টেক্কা মারতে পারি। বইটার নাম 'ওয়ান্ডার বুক অফ নলেজ'।'

মুচকি হেসে গদাই বললে, 'নামটাই শুধু মনে রেখেছিস। একটা পাতা উলটেও তো কক্ষনও দেখিসনি।'

'ঝেড়ে কাশ, গদাই। এতদিন পরে ওই বইয়ের খোঁচা দিচ্ছিস কেন?'

'কারণ, বইটায় একটা অদ্ভুত ছবি দেখেছিলাম। মরা সাগরে চিত হয়ে শুয়ে চুরুট ফুঁকছে একটা লোক।'

'ডুবে যাচ্ছে না?'

'আজ্ঞে না। সেই থেকেই আমার মনে মনে ইচ্ছে ছিল, যদি কখনও চান্স পাই, মরা সাগরে চিত হয়ে শুয়ে, ডুবে না-গিয়ে, চুরুট ফুঁকব।'

'উদ্ভট অ্যামবিশন।'

'তুই নিজেই তো একখানা উদ্ভট চিড়িয়া। নইলে এমন মাখোমাখো বন্ধুত্ব টিকে থাকে কী করে?'

'মানলাম। কিন্তু মরা সাগরের ব্যাপারটা যদি একটু ব্যাখ্যা করিস—'

'ডেড সি—ডেড সি— 'হোলি ল্যান্ড'-এর ম্যাজিক্যাল সাগর... কৃষ্ণসাগর।'

'কালো সাগর?'

'আজ্ঞে। সেখানকার জলে এত বেশি নুন যে মোটা জল মানুষকে ভাসিয়ে রেখে দেয়, ডুবতে দেয় না। চোখ যে ছানাবড়া করে ফেললি!'

আমি একটু স্তিমিত নয়ন হওয়ার চেষ্টা করে বলেছিলাম, 'তুই তা হলে মরা সাগরে মড়ার মতো ভেসে এসেছিস?'

'এগজ্যাক্টলি তাই করেছি। দীনু, কী বলব তোকে সে এক স্ট্রেঞ্জ এক্সপিরিয়েন্স। না-ভাসলে পেত্যয় হবে না।'

'যেতে হয় কোত্থেকে?'

'জেরুজালেম থেকে। খাড়াই পাহাড়ের গা কেটে তৈরি রাস্তায় গাড়ি হাঁকিয়ে গেছিলাম আমিও। দেখেছিলাম আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। রোদ্দুর ঝলসে দিচ্ছে পাথরকে। তারই মাঝে ঝিলমিল করছে পবিত্র দেশের বিশাল লেক— উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় সত্তর কিলোমিটার জায়গা নিয়ে। ইজরায়েল আর জর্ডানের মাঝামাঝি জায়গায়, যেখানকার মরুভূমির পাহাড়-টাহাড় লাল, কমলা আর বাদামি হয়ে যায় সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ে।'

'ব্রিলিয়ান্ট বর্ণনা। কিন্তু পয়েন্টে চলে আয়। মরা সাগর নামটা হল কেন?'

'মরে যাচ্ছে বলে, আবার কেন? এমন প্রশ্ন করিস! এইজন্যেই সবাই তোকে গবেট বলে। আরে বাবা, মরা সাগর রয়েছে আর পাঁচটা সাধারণ সাগরের লেভেলের ৪১৭ মিটার নীচে।'

'সে কী!'

'আজ্ঞে। মরে যাচ্ছে বলেই মরা সাগর। ডেড সি। ক্লিয়ার?'

'ভেরি মাচ। জল শুকিয়ে যাচ্ছে, এই তো? বেশি নোনতাও নিশ্চয় হচ্ছে?'

'এই তো ব্রেন খুলেছে। ভূমধ্যসাগরের জলের চেয়ে দশগুণ বেশি নোনতা এই মরা সাগরের জল। হাজার হাজার বছর আগে মরা সাগর ছিল মস্ত উপত্যকার অনেকখানি জায়গা নিয়ে। এখন সেখানে জল জুগিয়ে যাচ্ছে খানকয়েক পাহাড়ি ঝরনা আর জর্ডান নদী, যে-নদীর নিজের চেহারাটাও রোগা প্যাঁকাটি। কৃষ্ণসাগরের মরণ হচ্ছে এই কারণেই।'

যেহেতু আমি গবেট, তাই জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎস দেখলেই ঝুঁকে পড়ি। বিশেষ করে বাল্যবন্ধুর কাছে আবার লজ্জা কীসের? তাই অকপটে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'লেকের জল বেরিয়ে যাচ্ছে না?'

'যাচ্ছে না বলেই তো সূর্য তার কেরামতি দেখিয়ে জল উঠিয়ে দিয়ে জল ঘন করে দিচ্ছে। নুন আর খনিজ জিনিস-টিনিস আরও বেশি ঘন হচ্ছে।'

'সুপার ঘন হচ্ছে!'

'আজ্ঞে।'

'সরোবর বলে কথা। মানুষ-টানুস এক সময়ে নিশ্চয় ডেরা বেঁধেছিল পাড়ে পাড়ে?'

'দীনু, তোর এই কমন সেন্সটার জন্যেই তোকে এত ভাল লাগে। ওই জিনিসটা যার আছে, তার সব আছে।'

'খোশামোদ ছাড়, গদাই। এসেছিস তো একটা মতলব নিয়ে।'

চুপসে গেল গদাই। তার পরেই একটু মুচকি হেসে বললে, 'তা তো বটেই। তবে বড্ড কাট কাট কথা বলিস। অভ্যেসটা এখনও যায়নি। কী বলছিলাম? ও হ্যাঁ, কৃষ্ণসাগরের, পাড়ে পাড়ে মানুষ একদা কৃষ্টি আর সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছে। এখন কিছু নেই। ধুধু করছে চারদিক। অথচ একদা এই কৃষ্ণ সাগরকে কেন্দ্র করেই মাথা চাড়া দিয়েছিল ইহুদিদের ধর্মমত, খ্রিস্টতত্ত্ব, ইসলাম। এখানকারই এক উঁচু চুড়োয় দাঁড়িয়ে ইহুদিদের ধর্মগুরু মোজেস মুক্তিপথের শেষে ঈশ্বর নির্দিষ্ট নতুন দেশের সন্ধান পেয়েছিলেন। এখানকারই নদীর পাড়ে দীক্ষা নিয়েছিলেন যিশুখ্রিস্ট। আর এখানকার পাহাড়ের গুহার মধ্যেই পাওয়া গেছিল গোল করে পাকানো পুঁথি। এখানকারই পাহাড় চুড়োর মাসাদা দুর্গে প্রায় ৯৬০ জন ইহুদিকে আটকে রেখেছিল রোমান সৈন্যরা ৭৩ খ্রিস্টাব্দে— তারা প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু দাসত্ব স্বীকার করেনি। এই পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন শহর রয়েছে এই অঞ্চলেই— দশ হাজার বছর ধরে।'

'দশ হাজার বছরের পুরনো টাউন?'

'আজ্ঞে।'

'বুঝলাম,' গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে গদাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম' ডেসক্রিপশন দিলি ভালই। কিন্তু এমন সুন্দর জায়গায় কী এমন বিপদের সংকেত তোর মতো ডেয়ার ডেভিলকে নাড়িয়ে দিল, সে ব্যাপারে যদি ঝেড়ে কাশিস—'.

'বিপদের সংকেতই বটে। ডেঞ্জারাস সাইন। আসছি সে ব্যাপারে।'

(৩) বিপদের সংকেত

পৃথিবীর দেশে দেশে হরদম হানা দিয়ে দিয়ে জিভখানাকে রীতিমতো শানিয়ে নিয়ে কথার ধোকড় হয়ে গেছিল মহাডানপিটে গদাই গম্ভীর। কথার ভঙ্গিমায় এসে গেছিল জাদুকরি টান। একবার কান খাড়া করে শুনতে আরম্ভ করলে বুঁদ হয়ে যেতে হত ঝমঝমাঝম বাক্যবর্ষণে। সেদিন আমার অবস্থাও তাই হয়েছিল। অসহ্য সাসপেন্সে আমাকে স্ট্যাচু বানিয়ে দিয়েছিল গদাই।

'দীননাথ, কৃষ্ণসাগরে শোলার মতো ভেসে থাকব, এই ইচ্ছে পুরণের জন্য যখন তেড়েমেড়ে যাচ্ছি, ঠিক তখনই দেখা দিয়েছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা সমস্যা। দেখলাম, রাস্তার ঠিক নীচে সাগর সৈকতের ধার বরাবর টানা বেড়া দিয়ে আমার মতো স্নানপাগলদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তি খাটিয়ে... হুঁশিয়ার পথিক! এখানে ওত পেতে আছে অনেক বিপদ!!

'যাচ্চলে! এত কাঠখড় পুড়িয়ে এতদূর এলাম, আর এখন দেখছি নোটিশের পর নোটিশের ভড়কি! বিপদটা কোথায়? তবে হ্যাঁ, কৃষ্ণসাগরের সৈকতে বালি নেই, আছে নুন-কাদা, সৈকতও বেশ চওড়া, এত চওড়া যে কাদাটে জলার ওপর দিয়ে চোখ চালিয়ে জল দেখতে গেলে চোখ টাটিয়ে যায়। দেখলে মনে হয়, মরা সাগরের তলার ছিপি কেউ যেন খুলে দিয়ে জল বের করে দিয়েছে। তা না-হলে চারদিক উঁচু পাড় দিয়ে ঘেরা সাগরের জল গেল কোথায়? সৈকত বলতে যা বোঝায়, সেটাই বা কোথায়?

'তখনই জানলাম, মরা সাগর শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর এক মিটার জল নেমে যাচ্ছে। ফলে, অগভীর জায়গাগুলো শুকনো খটখটে হয়ে যাচ্ছে। জলের ধারে যাওয়ার জন্য রাস্তা বানিয়ে দিতে হয়েছে। কাদার ওপর দিয়ে। বছর বছর রাস্তাকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে জলের ধার পর্যন্ত, বছর বছর জল সরে যাচ্ছে আরও দূরে। আমাকেই হেঁটে যেতে হয়েছিল প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা, পার্কের ফটক থেকে, তারপর যেই সাগরের দিকে পা বাড়িয়েছি, হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছিল চটচটে আঠালো সাদা কাদায়।'

'সাদা কাদা?' চোখ কপালে তুলে বলেছিলাম আমি।

গদাই বেশ খানিকটা অনুকম্পা বর্ষণ করে গেছিল আমার দিকে ওর চাহনির মধ্যে দিয়ে। বলেছিল, 'নুন কাদা তো সাদা হয়, পলিমাটির কাদা হয় কালো।'

'তা বটে।'

'তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আর অবাক হয়ে রইলাম। মরা সাগরের জল যত নেমেছে, গাছপালাগুলো তত বেশি শুকনো খটখটে চেহারা নিয়ে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। ঝরনা শুকিয়ে যাচ্ছে। নরম কাদা যেখানে যেখানে শুকোচ্ছে, সেখানে সেখানে পাথর উঁকি দিচ্ছে। আর সেইসব পাথরের বুকে গুহা দেখা যাচ্ছে।'

'গুহা!'

'আজ্ঞে। প্রায় হাজারখানেক গর্ত দেখা দিয়েছে মরা সাগর ঘিরে। তাদের অনেকগুলো গুহার মুখ। দীনু, সে এক গোলকধাঁধা। আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম,

রাস্তার তলার কাদা বসে যাওয়ায় একটা মস্ত গুহার মুখ সদ্য দেখা দিয়েছে। পার্কের ম্যানেজারের চোখে পড়েনি রাতারাতি কাদা বসে যাওয়ার মস্ত গুহা। রাস্তা থেকে আট মিটার নীচে। মুখটা চোদ্দো মিটার চওড়া।'

'মরণ কূপ!' বলে ফেলেছিলাম আমি।

'মরণকে ভয় পাই না বলেই ঢুকে গেছিলাম গুহার মধ্যে,' গদাইয়ের গলা আর পরিহাস তরল নয়, বেশ গম্ভীর, 'টর্চ জ্বালতে হয়েছিল আরও গভীরে। মস্ত সেই গুহা এক সময়ে নোনা জলে ভরে ছিল, এখন সেখানে সাদা কাদা শুকিয়ে শক্ত হয়ে রয়েছে বলে হাঁটতে কষ্ট হয়নি। মাটির তলা দিয়ে সেই গুহা একটু একটু করে উঁচু হতে হতে যেদিকে গেছে, সেদিকটায় আছে মিশর।'

'মিশর! ঈজিপ্ট!'

'ইয়েস, ইয়েস! একদিকে লোহিত সাগর, আর একদিকে কৃষ্ণসাগর। এদের মাঝে রয়েছে তিনটে দেশ— ইজরায়েল, ঈজিপ্ট আর জর্ডান। আমি কম্পাস দেখে বুঝেছিলাম যাচ্ছি ঈজিপ্টের দিকে, মিশরের দিকে, পাতাল সুড়ঙ্গ দিয়ে, একটু একটু করে সেই সুড়ঙ্গ উঁচু হতে হতে গিয়ে শেষ হয়েছিল বিশাল একটা হলঘরের মতো পাতাল গহ্বরে। চারদিকে পাথরের গা কেটে সারি সারি তাক তৈরি করে রেখেছে প্রকৃতি নিজেই। তার ওপর মানুষ হাত চালিয়েছিল এক সময়ে। পাথুরে তাক তাই অত মসৃণ। মস্ত গুহাগহ্বরের ওদিকের প্রান্ত থেকে আর একটা সুড়ঙ্গ বেরিয়ে উঠে গেছে আরও ওপরদিকে। আর যেতে সাহস হয়নি। আরও একটা কারণে থেমে গেছিলাম! দীননাথ, পাথরের মস্ত কলসিগুলো দেখেছিলাম এই পাতাল গহ্বরের তাকে। এক সময়ে সারবন্দি ছিল। এখন তা গড়াগড়ি যাচ্ছে। ভেতরের জিনিসগুলো বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে।'

'কী জিনিস?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, 'হিরে? জহরত? সোনাদানা?'

'না,' অদ্ভুত চোখে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল আমার ডাকসাইটে বন্ধু, 'প্যাপিরাসের পুঁথি।'

(৪) প্যাপিরাসের পুঁথি

গদাইয়ের গলার মধ্যে যেন একটা ম্যাগনেট বসানো ছিল। কথার সুরে ছিল চুম্বকের টান। শেষ কথাটা শুনেই তাই আমি ঝুঁকে পড়েছিলাম। বলেছিলাম, 'প্যাপিরাসের পুঁথি?'

'মিউজিয়ামে দেখেছিলাম, তাই চিনতে পেরেছিলাম,' বলে গেছিল গদাই আবিষ্ট গলায়, 'কিন্তু একসঙ্গে এত প্যাপিরাস তো কখনও দেখিনি। তবে কী জানিস, আস্ত অবস্থায় পেয়েছিলাম এক চিলতে, একটুখানি। তুলে নিয়ে রেখেছিলাম আমার চুরুটের বাক্সের মধ্যে।'

'মাত্র এক চিলতে? কলসি কলসি প্যাপিরাস পুঁথির মধ্যে থেকে মাত্র এক চিলতে? ভাল করে দেখেছিলি? না, ভয়ের চোটে পিঠটান দিয়েছিলি?'

আমার খোঁচা গায়ে না-মেখে গোল গোল চোখে গদাই বলেছিল, 'ভূমিকম্প তো ও অঞ্চলে লেগেই থাকে। পাতালগুহার তাক থেকে তাই গড়িয়ে ভেঙে খানখান হয়ে গেছিল লম্বাটে কলসিদের প্রত্যেকটা। গুঁড়িয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মেঝের নুন-কাদায়।'

'আরে গবেট! আরও এগিয়ে গেলি না কেন সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে।'

'সাহস পাইনি। ভূমিকম্পর জন্যেই নিশ্চয় সুড়ঙ্গ ভেঙে পড়ে মুখ বন্ধ করে এনেছিল। পাথর-টাথর সরিয়ে হয়তো ঢুকতে পারতাম, কিন্তু...'

'কিন্তু কীসের?'

'গা ছমছম করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, এই কলসিদের পাহারা দেওয়ার জন্যে নিশ্চয় মড়া মমিরা শুয়ে আছে লাইন দিয়ে। মিশরের দিকে যে সুড়ঙ্গ গেছে, পাতাল দিয়ে সেই সুড়ঙ্গ মিশর পর্যন্ত গেছে কিনা জানবার জন্য হঠকারিতা না করে তোর কাছে আসা যাক। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের শরণ নেওয়া যাক।'

'তাই চলে এলি কালো সাগর থেকে?'

'সোজা।'

'প্যাপিরাসটা?'

'সঙ্গে এনেছি।'

প্রসঙ্গটা প্রফেসরের সামনে নিয়ে যেতেই তিনি শিরদাঁড়া সিধে করে ফেলেছিলেন। তাচ্ছিল্য অপসৃত হয়েছিল দুই চক্ষু থেকে। আমার ব্রেন পাওয়ার সম্বন্ধে ওঁর ধারণা ভাল নয় কোনওকালেই। কিন্তু সেইদিন কালো সাগর, পাতাল সুড়ঙ্গ, লম্বাটে কলসি আর এক চিলতে পুঁথির কথা শুনেই দুই চোখে চমক দেখিয়ে ফেলেছিলেন। গদাই সামনেই ছিল বিনয় বিনীত চেহারায়। আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ছোট্ট করে বলেছিলেন, 'কোথাই সেই এক চিলতে প্যাপিরাস?'

পকেট থেকে চুরুটের বাক্স বের করেছিল গদাই। রুপোর বাক্স। রাসকেলের শখ আছে বটে। চুরুটের জন্যে রুপোর বাক্স!

প্রফেসর বাক্স দেখে চোখ শক্ত করে বলেছিলেন, 'চুরুটের সঙ্গে প্যাপিরাসের পুঁথি! হোয়াট আ ননসেন্স!'

ধমক খেয়ে গদাইয়ের মতো চালিয়াত চন্দরও চুপসে গিয়ে বলেছিল, 'চুরুট তো স্যার ফেলে দিয়েছিলাম।'

খুশি হলেন প্রফেসর, 'এই তো চাই। নেশা করা খুব খারাপ। চুরুট যাক, পুঁথি থাক।'

এই বলে রুপোর বাক্সটার ডালা খুললেন।

* * *

এই ফাঁকে একটা কথা জানিয়ে রাখি। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বিশ্বের তাবড় পণ্ডিতদের সামনে বিনয়ের অবতার হয়ে থাকলেও লুপ্ত আর গুপ্ত অনেক ভাষা নিয়ে চর্চা করতেন।

আমি ওঁর কাছের লোক বলেই জানতাম, এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিশরীয় ভাষাবিদ বলা যায় ওঁকে। কারণ আছে। প্রাচীন জ্ঞান যে আসল জ্ঞানের খনি, সেই বিশ্বাস ওঁর ভেতরে বদ্ধমূল। আজকের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেক্যানিকস পর্যন্ত এগিয়েছে, চমকের পর চমক দেখিয়ে যাচ্ছে আনুমানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে, প্রফেসর কিন্তু বিশ্বাস করেন, প্রাচীন জ্ঞান হাতড়ালে ব্ল্যাক-হোলের রহস্য পর্যন্ত চিচিংফাঁক হয়ে যাবে। সেকালের মানুষরা অনেক বেশি জানত। সেই জ্ঞান আহরণ করার জন্যেই ঈজিপ্টলজি নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করে গেছেন। এক চিলতে প্যাপিরাস পুঁথি তাই ওঁকে টলিয়ে দিতে পেরেছিল প্রসঙ্গটা তুলতে না তুলতেই।

রুপোর চুরুটের বাক্স হাতে তক্ষুনি খুলে ফেলেননি। যেন কুবেরের ধন হাতে পেয়েছেন, এইরকম একটা তন্ময় চাহনি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে ছিলেন কৌটোর দিকে। তারপর বলেছিলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে আসবার সময়ে একটা মজার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বুড়ো থুড়থুড়ে ঋষির মতো একটা লোক তাঁকে বলছে, 'তোমরা এসো, আমাদের পুনরুদ্ধার করো। আমরা হচ্ছি থেরাপুত্ত সম্প্রদায়— ভারতের ঋষিদের ভাব নিয়ে যা গড়ে উঠেছে। খ্রিস্টানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব আর সত্যগুলোকেই যিশু প্রকাশ করেছেন বলে চালিয়ে যাচ্ছে। নইলে যিশু নামে বাস্তবিক কোনও ব্যক্তি ছিল না। এই ব্যাপারের অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে এই জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি চালালে।' স্বামীজি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোথায় খুঁড়লে প্রমাণ-ট্রমাণ পাওয়া যাবে?' বৃদ্ধ বলেছিলেন, 'এই তো এখানে।' বলে, দেখিয়ে দিয়েছিলেন টার্কির কাছের একটা জায়গা। তার পরেই ঘুম ভেঙে গেছিল স্বামীজির। ওপরে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'জাহাজ এখন কোথায়?' ক্যাপ্টেন বলেছিলেন, 'ওই তো সামনেই দেখা যাচ্ছে টার্কি আর ক্রীট দ্বীপ। দীননাথ, গদাই, তোমাদের জ্ঞান খুব কম বলেই জানো না, ওইসব অঞ্চলে, ওই কৃষ্ণসাগর তল্লাটে, কত জিনিস আজও রয়েছে লোকের চোখের আড়ালে। দেখা যাক কী পাওয়া গেল প্যাপিরাস চিরকুটে।'

আমি চমকে গেছিলাম প্রফেসরের জ্ঞানের বহর দেখে। উনি বিবেকানন্দের বইও পড়েন? মুখস্থ রাখেন? আশ্চর্য মানুষ বটে।

ক্রীট দ্বীপ, টার্কি, কৃষ্ণসাগর রহস্যে ঘেরা অঞ্চল। অতীত জ্ঞানের খনি। দেখা যাক, সেই খনি থেকে কী নিয়ে এসেছে আমাদের গদাই গম্ভীর।

(৪) হলোভিশন

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বিস্তর বিদ্যের আধার— সে-কথা নতুন করে বলবার দরকার নেই। প্যাপিরাস পুঁথির ছেঁড়া টুকরোটার দিকে শুধু চোখে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর ম্যাগনিফাইং গ্লাসের শরণ নিয়েছিলেন। নিবিষ্ট হয়েছিলেন মিনিটখানেক।

তারপর যখন চোখ তুললেন, দেখলাম উত্তেজনার রোশনাই দুই চক্ষুকে প্রদীপ্ত করে তুলেছে।

খুব আস্তে বলেছিলেন, 'এটা একটা গোপন সংকেতলিপির ছেঁড়া টুকরো। গদাই, তুমি যদি আরও খানিকটা টুকরো পেতে, পৃথিবীর অনেক অবিশ্বাসীর টনক নড়িয়ে দেওয়া যেত।'

প্রফেসরকে এরকম প্রদীপ্ত চক্ষু হতে অনেকদিন দেখিনি। দারুণ একটা ব্যাপার যখন আঁচ করেছেন, আমার জন্যেও দারুণ একখানা অ্যাডভেঞ্চার নিশ্চয় প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাই অধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'পেলেন কী প্যাপিরাসে?'

উনি বললেন, 'একটা নাম।'

'কী নাম?'

'আটলান্টিস।'

শুনেই পিলে চমকে গেছিল আমার। আটলান্টিসের নাম কে না শুনেছে? হারানো এক মহাদ্বীপের রহস্য আজও মাতিয়ে রেখেছে বিশ্বের তাবড় তাবড় রহস্য সন্ধানীদের। তর্ক-বিতর্কেরও শেষ নেই। কেউ বলে, প্লেটো গল্প লিখেছিলেন, আটলান্টিস নেই; কেউ বলে, আটলান্টিস নিশ্চয় আছে। প্লেটো লঘু মস্তিষ্কের ব্যক্তি ছিলেন না। পাছে কেউ মশকরা করে, তাই গল্পচ্ছলে বলে গেছেন, বুড়ি ছুঁয়ে গেছেন— আভাসটুকু দিয়েই লেখনী সংযত করেছেন।

আমি যখন এইসব সাতপাঁচ ভাবছি, প্রফেসর তখন একদৃষ্টে ছিন্ন প্যাপিরাস খণ্ডের দিকে চেয়ে ছিলেন। তারপর গদাইয়ের দিকে চোখ তুললেন। বললেন, 'তুমি কম্পাস দেখে আঁচ করেছিলে, কালো সাগরের তলার সুড়ঙ্গ মিশরের দিকে গেছে?'

'আজ্ঞে,' গদাই বিনয়ের অবতার হয়ে গেছিল, 'অ্যাটলাস আমার চোখের সামনে ভাসছে।'

'তা ভাসুক। কিন্তু বৎস, ব্ল্যাক সি থেকে ঈজিপ্ট অনেক দূরে নয় কি? মাঝে সাগর-টাগর তো রয়েছে।'

'আজ্ঞে, তা বটে।'

'তা হলে কি ধরে নেওয়া যায় না, সুড়ঙ্গ মিশর পর্যন্ত যায়নি। মিশর থেকে কেউ এসে কৃষ্ণসাগরের পাতাল গহ্বরে লুকিয়ে রেখেছিল আশ্চর্য এক দেশের উপাখ্যান?'

'আজ্ঞে, তা হতে পারে।'

'অত আজ্ঞে আজ্ঞে কোরো না। ভাল্লাগে না। আমার মনে হচ্ছে— আমার বিশ্বাস... ইচ্ছে করেই কেউ... সুদূর অতীতের এক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি... এই পুঁথি লুকিয়ে রেখেছিল মিশর থেকে অনেক দূরে কৃষ্ণসাগরের গহ্বরে... যাতে আটলান্টিস-সন্ধানীরা মিশর তছনছ করে ফেললেও আটলান্টিসের সন্ধান না-পায়।'

'আজ্ঞে... ইয়ে... তা হতে পারে।'

প্রফেসর অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আমরা দুই বন্ধু ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। শিবনেত্র হয়ে কী যেন ভেবে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে উনি বললেন, 'দীননাথ, 'সময় গাড়ি' অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারটা নিশ্চয় ভুলে যাওনি।'

আমি আর একটু হলেই লাফিয়ে উঠতাম চেয়ার থেকে। বলেছিলাম সোল্লাসে, "টাইম মেশিন! টাইম মেশিন! কী আশ্চর্য! টাইম মেশিনে চেপে কৃষ্ণসাগরের পাতাল গুহায় গিয়ে

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে পেছিয়ে গেলেই তো কেল্লা মেরে দেওয়া যায়।'

'সে অনেক ঝঞ্ঝাট, দীননাথ। গুদোম ঘরে রয়েছে বটে টাইম মেশিন, কিন্তু তাকে সাফসুতরো করা দরকার। নইলে বিভ্রাট ঘটে যেতে পারে—।'

চুপসে গেলাম আমি, 'অতীতে গিয়ে আটকে যেতে পারি, মেশিন বিগড়ে গেলে?'

'একজ্যাক্টলি তাই। তা ছাড়া তুমি তো জানো, আমার করোটির খুপরির মধ্যে আইডিয়ার কারখানা বসানো আছে।'

সিধে করে ফেললাম শিরদাঁড়া, 'নতুন কোনও মেশিনের আইডিয়া?'

'আরে না। ন্যানো মেশিনের যুগ চলে এসেছে, মহা মহা বিজ্ঞানীরা ন্যানো নিয়ে ছোট থেকেও আরও ছোট রহস্যের তল্লাসে বুঁদ হয়ে রয়েছে। আমি চাই তাদের টেক্কা দিতে।'

'কীভাবে? কীভাবে?'

'অত জোরে লাফিয়ো না, কড়িকাঠে মাথা ঠুকে যাবে। আমি চাই অতীতকে একেবারে সামনে এনে ফেলতে।'

'অতীতে নিজে না গিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'তাই কি হয়?'

'হয়।'

'কীভাবে?'

'হলোস্কোপ দিয়ে।'

'হ... হ... হলোস্কোপ?'

'দেখো বাছা, দমটা না আটকে যায়। হলোগ্রাম কী জিনিস, তা তুমি জানো। দ্বি-মাত্রিক বস্তু; কিন্তু সঠিক আলোর অবস্থা এনে দিলে ত্রিমাত্রিক হয়ে যায়। তখন টেলিভিশনের পরদায় যা দেখেছ তা আসল চেহারা নিয়ে চোখের সামনে এসে যায়... আমি এনেছি আমার ল্যাবোরেটরিতে। টিভির পাট চুকিয়ে দেবে যদি পেটেন্ট করে বাজারে ছাড়ি। ঘরে ঘরে তখন হিরো হিরোইনরা ছবিময় মূর্তি হয়ে নাচগান করবে।'

রুদ্ধশ্বাসে বলেছিলাম, 'এতদিন বলেননি?'

'বলিনি, তার কারণ আমি অতীতকে আমার হলোস্কোপের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে টেনে আনতে চাই বলে।'

'হলোভিশন! টেলিভিশন প্লাস হলোগ্রাম!'

"হ্যাঁ। নতুন ফিজিক্স থিয়োরি অনুযায়ী, গোটা ব্রহ্মাণ্ডই যদি একটা হলোগ্রাম হয়... হলোগ্রাফিক ইউনিভার্স হয়... তা হলে আমার টাইম মেশিনের উপাদান দিয়ে অতীতকে টেনে আনতে পারব না কেন বর্তমানে?'

'কপোলকল্পনা হয়ে যাচ্ছে না?'

'বড্ড তর্ক করো, দীননাথ। কলিন উইলসনের বইখানা পড়ে নিয়ো— ওই তাকে রয়েছে। থিয়সফি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করো। ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির 'সিক্রেট ডকট্রিন' বই দু'খানা আইনস্টাইন অকারণে বইয়ের তাকে রেখে দিতেন না। এই আইনস্টাইনই তো

বলেছিলেন— ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।'

আমি কথা বলতে গিয়ে খাবি খাচ্ছি দেখে নরম হয়ে গেলেন প্রফেসর। বললেন, 'থিয়সফি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বলছে, সবই আকাশিক ছবি হয়ে রয়েছে। যা ঘটছে, যা ঘটেছে— সব ইথারে ভিডিও হয়ে রয়েছে। টেনে আনার এলেম আছে সাধুসন্তদের। যখন তাঁরা দিব্যচক্ষুর অধিকারী হন, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান প্রত্যক্ষ করেন... করেছিলেন এই ভারতের মহামানবরা... আমি করতে চাই আমার হলোভিশন দিয়ে।'

আস্তে আস্তে বলেছিলাম, 'মেশিন তৈরি হয়ে গেছে?'

'গেছে।'

(৫) টাইম DVD

প্রফেসর আরও অনেক কথা সেদিন উচ্ছ্বাসের মাথায় বলে গেছিলেন। আমার মাথায় সব ঢোকেনি। গদাই চোখ দুটোকে ছানাবড়া করে তাকিয়ে ছিল। কাল কণিকা, টাইম ক্যাপসুল, স্ট্রিং থিয়োরি, কোয়ান্টাম মেক্যানিক্স— এত ব্যাপার শুনতে শুনতে মাথা যখন ভোঁ ভোঁ করছে, উনি তখন সদয় হলেন। মহা পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা তাঁদের উদ্ভট তত্ত্বকথা গবেটদের সামনে পেলে বলে যান বিষম উৎসাহ নিয়ে। কেননা, গবেটরা তর্ক করে না। শুধু শোনে আর হাঁ হয়ে যায়। পণ্ডিতরা তাতে খুশি হন।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও আমাদের স্তম্ভিত মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করে নিয়ে গেলেন পাতাল ঘরের লাবোরেটরিতে। এককোণে দেখলাম হেলায় পড়ে আছে টাইম মেশিনটা। 'সময় গাড়ি' অভিযানে এই মেশিনের বুক কাঁপানো অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লিখেছি। সেবার মেশিনে চেপে অতীতে টহল দিয়েছিলাম। এবার অতীত মেশিনের মধ্যে দিয়ে চলে আসবে চোখের সামনে। ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়েছিল সেই মুহূর্তে।

প্রফেসর আমাদের নিয়ে বসলেন তিনখানা চেয়ারে। সামনে দেখলাম একটা মস্ত মঞ্চ। পেল্লায় স্টেজের চারদিকে, ওপরে নীচে পাশে অনেকগুলো কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্র... যেগুলোকে পেরিস্কোপ টেলিস্কোপ মাইক্রোসকোপ থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু বলা যায়। এরাই যখন পরমাশ্চর্য বায়োস্কোপ ফুটিয়ে তুলল মহামঞ্চের ওপর, তখন আমরা দুই বন্ধু থ হয়ে গেছিলাম। সে বায়োস্কোপ পরদার ওপরকার চলমান ছবি নয়, মঞ্চের ওপর মূর্তিমান দৃশ্য। অবিশ্বাস্য। কিন্তু অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসের মধ্যে এনে ফেলেছেন যিনি, বাংলার সেই বুড়ো প্রফেসরের নামে আজও ভুবন কেঁপে ওঠে। আমরা দেখলাম...

পেল্লায় সাইজের একটা মন্দিরের সামনে পা টেনে টেনে হাঁটছে এক থুত্থুরে বুড়ো। মাথা তুলে চেয়ে রয়েছে মহাকাশ মন্দিরের দিকে। দুই চক্ষু তারকায় বিষম বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এমন বিশাল দেবালয় দর্শন করছে জীবনে এই প্রথম।

এইখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার না-লিখে পারছি না। প্রফেসর দেখাচ্ছিলেন টাইম

ভিডিও। দেখছিল চক্ষু, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে ভেসে আসছিল বহু শব্দ, বহু বর্ণনা, এমনকী যাকে দেখছি তার মনের কথা পর্যন্ত। বিজ্ঞানময় এই রূপকথা কী ভাষায় লিখব আমি বুঝতে পারছি না। ভাষায় আমি তেমন সড়গড় নই। তবুও চেষ্টা করছি— যা দেখেছি, যা শুনেছি, মনের মধ্যে যা বুঝেছি— সব হুবহু লিখে যাচ্ছি... বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে রেখে পাঠক এবং পাঠিকা যেন শেষ পর্যন্ত ধৈর্য রাখে—

যা বলছিলাম, পা টেনে টেনে চলেছে থুখুরে বুড়ো। তার বাড়ি এথেন্সে। জীবনে এমন মন্দির দেখেনি স্বদেশে। মনুমেন্টের মতো উঁচু তোরণ দেখে বিহ্বল হয়েছে। যেন গোটা আকাশটার ভার বহন করে চলেছে পেল্লায় সেই দ্বারপথ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের থামের ছায়া ছড়িয়ে রয়েছে মরুভূমির অনেক দূর পর্যন্ত। সামনে দেখা যাচ্ছে অগুন্তি প্রস্তর কক্ষ। গায়ে খোদাই করা চিত্রাক্ষরের পর চিত্রাক্ষর। ছবি কথা দিয়ে বোঝাই মস্ত মন্দিরের প্রতিটি দেওয়াল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর পাঠ করে যাচ্ছে প্রতিটি ছবি হরফ... কত কথা... কত বিস্ময়... সব অর্থ বোঝা যাচ্ছে না— শিহরিত হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে মন্দিরের ভেতর থেকে ভেসে আসা ধূপধুনোর গুগ্‌গুলের সুবাসে... কখনও তা উৎকট... কখনও মদির... পাতাল রন্ধ্রের কবরখানায় যে গন্ধ পাওয়া যায়, বিকট সেই গন্ধও মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ছে নাসিকারন্ধ্রে... দার্শনিকতা চম্পট দিতে চাইছে মনের মধ্যে থেকে... অজানার আতঙ্ক মুহুর্মুহু পদসঞ্চার ঘটিয়ে চলেছে মগজের অন্দর কন্দরে... এ বিভীষিকা দেবতাদের শক্তিসঞ্জাত... পা অসাড় করে দেয়, মগজকে অবশ করে...

তোরণ পথের পাহারাদার হাতের মশাল জ্বালিয়ে নিল প্রকাণ্ড ধুনুচির মধ্যে চেপে ধরতেই। সুগম্ভীর স্বরে আহ্বান জানাল থুখুরে বৃদ্ধকে, 'আসুন গ্রীক ভেতরে আসুন।' মশালের আলোয় এবার দেখা যাচ্ছে দীর্ঘকায় কিন্তু ন্যুব্জ এক বৃদ্ধকে। পরনে শুধু নেংটি। হাতছানি দিয়ে অতিথিকে বরণ করে নিয়ে যাচ্ছে মন্দিরের মধ্যে। থমকে দাঁড়িয়েছে তিন মানুষ সমান উঁচু একটা বেদির সামনে।

তিনমূর্তি পরপর ঢুকে গেল বেদির মধ্যে নির্মিত মস্ত ঘরে। রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার জোনাকির আলোর মতো আলোক-কণা ঠিকরে আসছে দেওয়াল ঘেঁষে বসানো অজস্র লম্বা লম্বা কলসি থেকে। মুখে ঢাকনা নেই। উঠে রয়েছে গোল করে পাকানো প্যাপিরাসের পুঁথি।

বিহ্বল চক্ষু বৃদ্ধ এগিয়ে যাচ্ছে মশালধারী প্রহরী আর নেংটি পরা কুঁজো বুড়োর পেছন পেছন। এসে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি খাড়া দুটো থামের সামনে। থামের শীর্ষে বসে রয়েছে দুটো পাথরের ঈগলপাখি। মাঝে দেখা যাচ্ছে একটা পেল্লায় ব্রোঞ্জের দরজা।

পাল্লা খুলে দিয়েছে প্রহরী। উঁচিয়ে উঁচিয়ে ধরছে মশাল। দু'পাশে লাইন দিয়ে বসে নেংটি-পরা বহু বৃদ্ধ। প্রত্যেকের সামনে একটা ডেস্ক। প্যাপিরাস পুঁথির ওপর কলম চালিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকেই। কী লিখতে হবে, তা মুখে মুখে বলে যাচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কালো আলখাল্লাপরা পুরুত মশায়রা। কথা বলছে গলা নামিয়ে। কিন্তু এতজনের কথা মিলেমিশে গিয়ে গমগমিয়ে তুলছে গোটা ঘরটাকে। যেন স্তোত্রপাঠ চলছে সম্মিলিত স্বরে।

মহাকায় মন্দিরের এই হল লেখ্যস্থান। পুঁথি প্রণয়নের দপ্তর। জ্ঞানমন্দির। প্রজ্ঞাপ্রকোষ্ঠ।

পিরামিড নির্মাণের বহু আগে থেকে পুরুতদের মুখে যে জ্ঞান চলে এসেছে পুরুষানুক্রমে, তা লিপিবদ্ধ হয়ে চলেছে এই মন্দির-দপ্তরে। লেখ্যাগারে। ইতিহাসের ঊষাকাল থেকে যা কিছু ঘটেছে, তার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়ে চলেছে প্যাপিরাস পুঁথিদের পাতায় পাতায়।

মশালধারী দাঁড়িয়ে গেছে দোরগোড়ায়। নিষিদ্ধ এই লেখ্যাগারে তার প্রবেশাধিকার নেই।

বিস্ফারিত চোখে পুঁথি প্রণয়ণ দেখে যাচ্ছে অতিথি বৃদ্ধ। এই তার শেষ রাত এই মন্দিরে। বহু রহস্যের আধার নিকেতন কেন্দ্রে প্রথম আর শেষ পরিদর্শন।

সারবন্দি পুঁথিকারদের মাঝখান দিয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে আর একটা খাটো দরজার সামনে। ভেতরে আধো অন্ধকারে মাদুরের সামনে বসে এক বৃদ্ধ।

মন্দ্রমন্থর কণ্ঠে সে আহ্বান জানাচ্ছে অতিথিকে, 'এসো গ্রীক। এতদিন বলিনি, কে আমি। এখন শোনো— আমিই আমেনহোতেপ, প্রধান পুরোহিত, আইন প্রণেতা। তুমি চাও জ্ঞান। এসেছ সেই ইচ্ছা নিয়ে। দিচ্ছি সেই জ্ঞান— যে জ্ঞানে অধিকার শুধু দেবতাদের।'

অতিথি দেখছে বক্তাকে। আধো অন্ধকারে মনে হচ্ছে যেন এক মমি পিঠখাড়া করে বসে রয়েছে মেঝেতে। চামড়া শুকনো, পার্চমেন্ট কাগজের মতো। চক্ষু কোটরাগত, কিন্তু স্ফুলিঙ্গময়। অতিথির নাম সোলন। সে জানে, আমেনহোতেপ-এর জন্ম তার জন্মের আগে। বয়সের গাছপাথর নেই। হোমার দেখা করে গেছে এহেন মানুষটার সঙ্গে— সোলনের প্রপিতামহের আমলে। এসেছে আরও অনেকে— কেউ নেই আর ধরাধামে।

আমেনহোতেপ বলছে, 'সোলন, গতকাল যা বলেছিলাম, তা লেখা হয়েছে?'

বসে পড়েছে সোলন। হাতের প্যাপিরাস পুঁথি মেলে ধরে পড়ে যাচ্ছে ঘেঁষাঘেঁষি লেখা। লিখেছে মিশরীয় ভাষায়। যে ভাষা শিখেছে এখানে এসে।

'এই পৃথিবীর বেশির ভাগ জুড়ে একদা রাজত্ব করে গেছে এক মহা সাম্রাজ্য। শাসকরা নিবাস রচনা করেছিলেন সুবিশাল কেল্লা-প্রাসাদে। সমুদ্রের ধারে। ভূখণ্ড-করিডর দিয়ে জোড়া ছিল একটার পর একটা দেশ। এমন ভূখণ্ড সমাবেশ অতীতে কখনও দেখা যায়নি। তারা ছিল নির্ভীক বৃষযোদ্ধা, ছিল সোনা আর হাতির দাঁতের অতুলনীয় কারিগর। কিন্তু তাচ্ছিল্য করেছিল সমুদ্রদেবতা পোসিডনকে। তাই প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্রে তলিয়ে যায় সেই মহাদেশ— আর দেখা যায়নি।'

এইখানে থেমে বললে গ্রীক সোনল, 'গতকাল বলেছিলেন এই পর্যন্ত।'

অনেকক্ষণ নীরব থাকবার পর মৃদুকণ্ঠে বললে মমিসম বৃদ্ধ, 'হারানো সেই দেশের নাম আটলান্টিস।'

তার পরেও অনেক কথা বলে গেছিল বয়সের গাছপাথরহীন বৃদ্ধ। বেশ কয়েকঘণ্টা পরে স্তব্ধ হয়েছিল সোলন-এর লেখনী। আমেনহোতপ নীরব হয়েছে। বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। দেবতা টথ-এর উৎসব শুরু হবে আগামীকাল। মন্দির সাজানো শুরু হবে তখন থেকেই। ভোরের আগেই সে-কাজ সাঙ্গ করবে মন্দির পুরোহিতরা।

শেষ কথাটা খুবই মৃদুস্বরে বলে গেল আমেনহোতেপ, 'আইন প্রণেতা গ্রীক, যা বলে গেলাম, তা আমি ছাড়া কেউ জানে না। এই মগজে যা আছে, তা থাকবে এই মন্দিরেই। প্রাচীন কানুন তাই। মন্দির ছেড়ে আমরা, পুরোহিতরা, বাইরে যেতে পারি না। যে প্রজ্ঞার

কিছু আভাস তোমাকে দিলাম তোমার জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা দেখে, সে প্রজ্ঞা, সেই সুপ্রাচীন জ্ঞান থেকে যাবে এই মন্দির গর্ভে। আর কোথাও না, কোথাও না। তোমাকে দিলাম কিঞ্চিৎ, দেবতা অসিরিস-এর আদেশে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের অঙ্কের নির্দেশে। সেই নির্দেশ ছিল বলেই প্রবেশ করতে পেরেছ সাধারণের কাছে নিষিদ্ধ এই মহামন্দিরে। গ্রীক, এবার যাও, আর এসো না।'

নতমুখে উঠে দাঁড়িয়েছে গ্রীক, নাম যার সোলন, ধীরপদে বেরিয়ে আসছে লেখ্যাগার-এর মধ্যে দিয়ে। এখন সে স্থান শূন্য। বিদায় নিয়েছে পুঁথি প্রণেতারা। মশালধারী তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে মন্দিরের বাইরে। উষার আলো দেখা দিয়েছে পুব গগনে। নীলনদের বুকে এখনও ঝিলমিলিয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার শেষ আভা। বিশাল বিশাল পাথরের থাম পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে বেরিয়ে আসবার সময়ে শেষবারের মতো পবিত্র সরোবরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে সোলন। সরোবরের পাড়ে পাড়ে খাড়া শিবলিঙ্গ আকৃতির অনেক উঁচু থাম, মানুষমুখো স্ফিংক্স, অতিকায় ফারাও স্ট্যাচুদের ওপর শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। নেমে এসেছে ধূলিধূসরিত পথে, পরিপূর্ণ অন্তরে। এগিয়ে চলেছে কাদায় গড়া গ্রামের দিকে, তার থাকবার জায়গায়। প্যাপিরাসের গোল করে পাকানো পুঁথি শক্ত করে ধরে রেখেছে হাতে। পিঠে ঝুলছে সোনার বাট ভরা থলি। কাল সকালে দেবী নীথ-কে অর্ঘ্য দেবে এই সোনা দিয়ে। কথা দিয়ে এসেছে আমেনহোতেপ-কে। অতি-অতিবৃদ্ধ মুখ খুলেছিল তো এই একটা শর্তেই! কাঞ্চন বিনিময়ে জ্ঞান দেবে নইলে নয়।

বৃদ্ধ সোলন জ্ঞানভারে কিন্তু এতই অভিভূত যে খেয়াল করেনি, দূর থেকে তাকে অনুসরণ করছে দুটি কৃশকায় মূর্তি। সোলন যখন ভাবছে ফারাওদের কথা, তাদের সামনে গড়ে ওঠা কল্পনাতীত ঐশ্বর্যময় এক মানুষ জাতের কথা— যারা একাধারে আয়ত্তে এনেছে বিবিধ শিল্প, আগুন, পাথর আর ধাতুর অজস্র গুপ্তরহস্য। অথচ এরা নিছক মানুষ ছাড়া কিছু নয়। দৈত্য নয়, দানব নয়। অ্যাক্রোপলিস-এর সুপ্রাচীন প্রাচীর যারা নির্মাণ করেছিল, একচক্ষু সেই সাইক্লোপ দানব নয়। অলিম্পাস পাহাড়ে তাদের নির্মিত কেল্লা-প্রাসাদ আজও সূর্যের আলোয় ঝলমল করে বটে, কিন্তু তারা আর নেই। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ধরাধাম থেকে দেবতার কোপে।

চলে গিয়েও তারা থেকে গেছে প্রাচীন প্রজ্ঞার মধ্যে দিয়ে। সেই জ্ঞান ভাণ্ডারই বহন করে নিয়ে চলেছে সোলন— নিজের দেশে।

কিন্তু সে ইচ্ছা ছিল না বিধাতার। তাই পেছনের দুই দীর্ঘকায় আততায়ী অকস্মাৎ লাফিয়ে পড়েছিল তার ওপর। একজন ছিনিয়ে নিয়েছিল সোনা-ভরা থলি, অপরজন ডাণ্ডা হাঁকিয়ে চূর্ণ করে দিয়েছে তার করোটি।

সোলন ধরাশায়ী। আততায়ীরা অদৃশ্য।

দৃশ্য পালটে গেল হলোস্কোপের ছবি পরম্পরায়।

প্রাচীন প্রজ্ঞা লেখা পুঁথি বিনষ্ট করার অধিকার নেই মর্তের মানবের। তাই মৃত সোলনকে মমিতে পরিণত করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কৃষ্ণসাগরের পাতাল সুড়ঙ্গের সমাধি গুহায়। বিদেশিদের মড়া থাকুক এখানে, মিশর দেশের বাইরে, মিশর থেকে অনেক দূরে। আরও

অনেক বিদেশির মমিমড়াদের সঙ্গে— মিশর যাদের একদা টেনে এনেছিল বিপুল জ্ঞানের আকর্ষণ দিয়ে, কিন্তু কল্পনাতীত জ্ঞান নিয়ে ফিরে যেতে দেয়নি স্বদেশে। গুপ্তজ্ঞান গুপ্ত থাকুক দূরে, অনেক দূরে।

প্রফেসরের কলকাঠি টেপার জন্যেই হোক, কি হলোস্কোপের নিজের নিয়মেই হোক, সহসা দেখা গেল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মরা সাগরের পাতাল গহ্বরে ঢুকছে গদাই গম্ভীর। পাতাল গোরস্থানের অনেকটাই পাতালে প্রবেশ করেছে মিশরের মহাজ্ঞান সমেত। একটি মাত্র পুঁথির এক চিলতে প্যাপিরাস তুলে নিচ্ছে গদাই গম্ভীর...

(৬) সাগর তলে সোনার বাট

হলোস্কোপের আশ্চর্য কাহিনি লিখতে লিখতে আজ আমার কলম কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। যন্ত্র যখন কসমিক ফোর্স নিয়ে জাগ্রত হয়, তখন সেই যন্ত্রকে আর বাগে রাখা যায় না।

প্রফেসরের হলোস্কোপও ছিল না তাঁর কম্যান্ডে। অব্যাখ্যাত ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যেই মরাসাগর থেকে অন্য এক সাগরের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছিল ত্রিমাত্রিক দৃশ্য পরম্পরায়। বিহ্বল চক্ষু মেলে আমরা দেখেছিলাম, সাগরতলে ডুবে যাওয়া একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে রাশি রাশি সোনার পাত বের করে আনছে ডুবুরিরা। অদ্ভুত দর্শন সোনার বাট। পশু চামড়া শুকিয়ে মেলে ধরলে যেমন চার কোণে ছুঁচলো হয়ে বেরিয়ে থাকে, সেইরকম। এইরকম অজস্র সোনার বাট নিয়ে সেকালের কাষ্ঠ জাহাজ একদা যাচ্ছিল এক দেশ থেকে আর এক দেশে। জাহাজ ডুবেছে। সাগর তার বিপুল ধনাগারে সোনার বাটদের এতকাল রেখে দিয়েছিল। হলোস্কোপে দেখা যাচ্ছে, পুনরুদ্ধারের দৃশ্য। একজন ডুবুরি সোল্লাসে তুলে ধরেছে প্রকাণ্ড একটা সোনার চাকতি...

হলোস্কোপ থেমে গেল ঠিক এইখানেই।

টেলিফোনটা এল তারপরেই। ডাক পড়েছে প্রফেসরের। সাগরতলের সোনার চাকতিতে পাওয়া গেছে মিশরীয় লিপি।

তর্জমা করতে হবে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে।

হলোস্কোপের প্রহেলিকা এখন থাকুক। সৃষ্টি যখন স্রষ্টার কেরদানি দেখিয়ে যায়, তখন স্রষ্টার মুখচ্ছবি কী রকম হয়, সে বর্ণনাও এখানে দিতে চাই না। ডক্টর ফ্রাঙ্কেস্টাইন মানব গড়তে গিয়ে দানব গড়ে ফেলেছিলেন। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র হলোস্কোপ বানিয়ে দেখলেন, যন্ত্র চলছে মহাজাগতিক নির্দেশে— সুদূর অতীতে গুপ্ত মহারহস্যের উদ্ঘাটনে সহসা কোমর বেঁধে লেগেছে। প্রফেসর বেচারার তখন যে মুখের চেহারা দেখেছিলাম, তা ক্যামেরায় তুলে রাখতাম, যদি হাতে থাকত ক্যামেরা। তুলে রাখতাম হলোস্কোপ যে গোলক কক্ষে নির্মাণ করেছিলেন প্রফেসর আমাকে কিছুমাত্র না-জানিয়ে, আশ্চর্য সেই ঘরের ছবি। ঘর বলছি বটে, আসলে এটা যেন একটা গ্লোব। গ্লোবের মধ্যে, ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে চারখানা

স্প্রিংব্যাক গদিচেয়ার। হলোস্কোপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ফুটিয়ে তুলছে গোলকের ভেতরের গায়ে। আস্তে আস্তে ঘুরছে। আমরা দেখছি অনন্ত মহাশূন্যকে। দেখেছি অজস্র ছায়াপথ, তারকা, ধূমকেতু, ব্ল্যাকহোল আর নক্ষত্রের বিস্ফোরণ। অসীমের মাঝে হারিয়ে গেছিলাম অত্যাশ্চর্য সেই হলোস্কোপ গোলকের ভেতরের কেন্দ্রে। মুহ্যমান যখন প্রত্যেকেই, মহাজাগতির নিয়মের নিগড়ে বাঁধা যন্ত্রশক্তি সহসা স্বয়ংচালিত পন্থায় ফুটিয়ে তুলেছিল প্রকাণ্ড সেই সোনার চাকতিটাকে... সাগরতলে... চাকতির গায়ে প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় খোদাই করা দুর্বোধ্য এক লিপি...

প্রফেসরের প্রয়োজন হবে বলেই স্বচালিত হলোস্কোপ কসমিক কম্যান্ডে এই দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে না তুলতেই তলব পড়েছিল প্রফেসরের। সোনার চাকতির গায়ে উৎকীর্ণ চিত্র-অক্ষরের মর্মোদ্ধার করতে হবে যে তাঁকেই।

এবং তিনি তা করেছিলেন।

তখনই জানা গেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন কসমিক কম্যান্ডে তা কতখানি সত্য।

(৭) ক্রীট দ্বীপ

গ্রীকভাষায় ক্রীট-এর নাম কৃতী বা ক্রীটি। কৃতবিদ্য মানুষদের একদা বসবাস রচিত হয়েছিল সেখানে। ভূমধ্যসাগরের চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপ এই ক্রীট। সেখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে একদা দাপিয়ে গেছিল বিশাল পাদপ সাম্রাজ্য, এখন সেইসব পাহাড় ন্যাড়া হয়ে গেছে আধুনিক সভ্যতার গোগ্রাসে। একসময়ে মিনোয়ান সভ্যতার কেন্দ্র ছিল এই ক্রীটি— বিশ্বের যে ক'টি সুপ্রাচীন সভ্যতার কাহিনি জানা গেছে তাদের অন্যতম। খ্রিস্ট জন্মের ১১০০ থেকে ৩৪০০ বছর আগে বিস্ময়কর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে। ফেনোমস প্রাসাদে আজও থেকে গেছে বিস্তর অমূল্য তথ্য। গ্রীক ইতিহাসে একদা অসীম প্রতাপ বর্ষণ করে গেছে এই ক্রীট দ্বীপ। তারপর এই দ্বীপ একে একে দখল করে রোম, বাইজেনটিয়ান, মুসলিম, ভেনেসিয়ান আর তুর্ক। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে জার্মান দখলে যায় আকাশ থেকে বোমা বর্ষণের পর।

এই ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে দ্বীপের আত্মা যেন এসেছিল স্বামীজির স্বপ্নের মধ্যে, অতি বৃদ্ধ এক মানুষের রূপ নিয়ে। দ্বীপের রহস্য উদ্ধারে আকুল আহ্বান জানিয়েছিল তাঁকে।

স্বামীজি এর বেশি কিছু আর লিখে যাননি। কিন্তু বিশ্বের তাবড় তাবড় অতীতের রহস্যসন্ধানীরা ক্রীট দ্বীপের কীর্তি উদ্ধার করার জন্যেই ডুবুরি নামিয়েছিল একটা ডুবে যাওয়া আগ্নেয়গিরির শীর্ষে। এলসিডি স্প্রিন আর অ্যাকটিভেটেড ভিডিও স্ক্রিনে ফুটে উঠেছিল চক্ষু বিহ্বল করা দৃশ্য পরম্পরা। জলতল আলোকিত হয়ে রয়েছে পাওয়ারফুল ফ্লাডলাইটে। জলপৃষ্ঠ থেকে প্রায় একশো মিটার নীচে। দু'জন ডুবুরি উবু হয়ে বসে রয়েছে কাদা আর পাঁকের মধ্যে। সমুদ্রতলের কাদা উঠে আসছে ভ্যাকুয়া টিউবের মধ্যে দিয়ে।

জমির ওপর প্রত্নবিদ যেমন কোদাল চালিয়ে মাটি চাঁচে, ঠিক সেইভাবে একজন ডুবুরি ধরেছে সাকশন পাইপ, আর একজন নলের মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জলতলের পুরু পাঁকের ওপর দিয়ে। ধাতুর চাঁইগুলো দেখা গেছিল তখনই, যা পাথরের চাঁই নয় মোটেই।

জাহাজের ওপর সেই দৃশ্য দেখে বিষম বিস্ময়ে বিচলিত এক অভিযাত্রী বলছে, 'এ যে দেখছি অক্সাইড ধাতুর চাঁই। শয়ে শয়ে। ঝোপঝাড় আর নোংরায় ঢাকা— ঠিক যেমনটা লিখে গেছেন হোমার অডিসিয়াস জাহাজের ধ্বংসাবশেষে।'

চক্ষুস্থির প্রত্যেকেরই। প্রতিটা চাঁই লম্বায় এক মিটার, চার কোণ ঠেলে বেরিয়ে আছে গোরুর চামড়া শুকিয়ে নিলে যে রকম দেখায়, সেইরকমভাবে। ব্রোঞ্জযুগেই এইভাবে নির্মিত হত তামার চাঁই। সে তো প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের ব্যাপার।

একজন বলেছিল সোল্লাসে, 'খ্রিস্ট জন্মের ১৬০০ বছর আগেকার জিনিস মনে হচ্ছে?'

'নিঃসন্দেহে,' সায় দিয়েছিল আর একজন, এর চাইতে প্রাচীন জাহাজ আজ পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি।'

ক্যামেরা ঘুরছে জলতলে। ধাতুর চাঁই আর ডুবুরিদের মাঝখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে তিনটে প্রকাণ্ড কলসি। মানুষ সমান লম্বা। নাদা পেট চওড়ায় এক মিটার। ক্রীট-এর জাদুঘরে হুবহু এইরকম কলসি দেখে এসেছে অভিযাত্রীরা। গায়ে আঁকা অক্টোপাসের ছবি। সে ছবি আতঙ্ক জাগায় না— আঁকার মুনশিয়ানায়।

না, কোনও সন্দেহই নেই। এ-কলসি নির্মাণ করেছিল সুপ্রাচীন মিনোয়ান মানুষরা। মিনোয়ান... মিনোয়ান... পরমাশ্চর্য সেই দ্বীপে সভ্যতা তুঙ্গে উঠেছিল মিশরীয় আমলে। তার পরেই সহসা বিলীন হয়ে যায় খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ সালে। সেখানকার মিনোটর রন্ধ্রময় গোলকধাঁধা আজ উপকথায় পর্যবসিত হয়েছে। ট্রয় শহরকে খুঁজে বের করবার পর ইংরেজ প্রত্নবিদ আর্থার ইভান্স প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, ট্রয় যুদ্ধ যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি এনেন-এর যুবরাজ থিসিয়াস-এর কাহিনি। মিনোটর-এর সঙ্গে যুবরাজের লড়াইয়ের কাহিনি যে কপোলকল্পনা নয়, বিস্তর রন্ধ্রময় পথ আর প্রাসাদ তার প্রমাণ হয়ে রয়েছে।

কিন্তু সাগরতলের এই কলসি আবিষ্কার যে হার মানিয়ে দেবে তুতানখামেন-এর মমি আবিষ্কারকেও!

স্তূপীকৃত ধাতুর চাঁইয়ের পরেই দেখা গেল পাথরের নোঙর যেমনটা হত সেকালে।

ধাতুর চাঁইগুলো যে সোনার চাঁই, তা জানা গেছিল এর পরেই। রত্নাকর সমুদ্র এতদিন যে ধনভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছিল নোংরা আর জল ঝোপ দিয়ে, আজ তা বেরিয়ে এসেছে ডুবুরিদের সাহসে। শুধু সোনা নয়, জলতলে ডুবেছে ব্রোঞ্জ আমলের রাশি রাশি নিদর্শন।

রোমান জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল এতদিনে! প্রমাণিত হয়ে গেল, সব গল্প মিথ্যে নয়। সত্যিকে দানা বানিয়ে গল্প তৈরি হয়ে এসেছে এতকাল।

সোনার চাকতিটাকে ডুবুরিরা তুলে এনেছিল সবশেষে। নিরেট সোনা, খাঁটি সোনা। চওড়ায় হাতের মাপে এক বিঘৎ। খাদ নেই এতটুকু। ওজনে কয়েক কিলোগ্রাম। সূর্যের আলো ঠিকরে যাচ্ছে গা থেকে। যেন এনার্জির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে হাজার হাজার বছর পরেও।

কিন্তু এত আঁকিবুঁকি কেন সোনার চাকতির গায়ে? আতসকাচের মতো দু'পিঠ ফুলে থাকা চাকতির দুটো দিকেই অজস্র ছবি লিখন।

একটা অক্ষর অদ্ভুত। যেন একটা মস্ত হেঁয়ালি! দু'পাশের খাড়াই দুটো দাঁড়িকে জুড়ে রেখেছে যে সমান্তরাল লাইনটা, তা থেকে নেমে এসেছে ছোট্ট একটা লাইন। দু'পাশের খাড়াই দুটো দাঁড়ির গায়ে তিনটে করে বৃত্ত— একটা ঢুকে রয়েছে আর একটার মধ্যে, সব মিলিয়ে বানিয়েছে কুড়িটা খুপরি। প্রত্যেকটা খুপরির মধ্যে রয়েছে আলাদা আলাদা একটা করে সাংকেতিক চিহ্ন। ঠিক যেন একটা পিকটোগ্রাম— ছবি দিয়ে আঁকা লিখনপদ্ধতি। হঠাৎ দেখলে দেখা যাচ্ছে মানুষের একটা মাথা, একজন হাঁটিয়ে মানুষ, একটা দাঁড়, একটা নৌকো, একটা শস্যদানা। ভেতরের খুপরিগুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা চিহ্ন, কিন্তু যেন সংগতি রেখে চলেছে বাইরের চিহ্নগুলোর সঙ্গে। রেখাচিহ্ন। প্রত্যেকটা আলাদা। একটার সঙ্গে একটার মিল নেই।

ছবি নয় বলেই তো মনে হচ্ছে। ঠিক যেন হরফদের আত্মকথা।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে মনে পড়েছিল তখনই। বুড়ো বিজ্ঞানীকেই এখন দরকার। আর দরকার তাঁর চ্যালা ওই দীননাথ নাথকে। যে রুখে দাঁড়াতে পারবে সাগরের বোম্বেটেদের সঙ্গে। এযুগের বোম্বেটেদের কারবার তো প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসের বেচাকেনায়। সে সবের মূল্য নির্ভর করে সংগ্রাহকের শখের ওপর। আন্তর্জাতিক সমুদ্রে সমুদ্রে এরা টহল দিয়ে বেড়ায়। রিমোট-অপারেটেড ডুবো মেশিন দিয়ে রত্নাকরের রত্নাগারের সন্ধান খুঁজে বের করে— ঠিক এই পন্থার দৌলতেই তো ডুবে যাওয়া 'টাইটানিক' জাহাজকে খুঁজে পাওয়া গেছিল একদা।

কিন্তু ইতিহাসের মূল্য নিয়ে মাথাব্যথা নেই রত্নাকর স্মাগলারদের। ইতিহাস ধ্বংস হয় হোক, তাদের চাই টাকা। অপরাধ দুনিয়ায় অর্থ লেনদেনের মস্ত কারেন্সি হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী— টাকার হিসেবে সে সবের পরিমাপ হয় না।

টনক নড়েছিল বলেই শরণ নেওয়া হয়েছিল প্রফেসরের— এতটুকু দেরি না করে।

কসমিক নির্দেশ যেন প্রচ্ছন্ন ছিল এই ব্যাপারে।

সময় হয়েছে নিকট। এখন...

উন্মোচিত হোক আটলান্টিস-এর অবগুণ্ঠন।

(৮) সাগর থেকে সাহারা

দীর্ঘ কাহিনিকে ছোট করে আনা যাক। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সোনার চাকতিতে উৎকীর্ণ ছবি দিয়ে আঁকা বর্ণমালা থেকে জেনেছিলেন, মিশরের মূল রহস্য যদি জানতে হয়, তা হলে ওঁকে যেতে হবে সাহারা মরুভূমির বালির তলায়— যে মরুভূমি থেকে মিশর, সল্টলেক, ভূমধ্যসাগর, লোহিতসাগর বেশি দূরে নয়। ধুধু এই মরু অঞ্চলেই প্রাচীন মিশরের বহু বিস্ময় আজও লুকিয়ে আছে, এমনকী বহু বিস্ময়ের কিংবদন্তী আটলান্টিস শহরের কথাও চাপা পড়ে আছে সেখানকার বালির তলায়।

আশ্চর্য নয় কি? আটলান্টিস তো একটা কিংবদন্তী কাহিনি। প্লেটো তো গল্প লিখে গেছিলেন। সত্যিই অমন সোনায় মোড়া দেশ কি আদৌ ছিল হাজার হাজার বছর আগে?

আটলান্টিস উৎসাহীদের মদতে মরুভূমির তলায় পাওয়া গেছিল সুবিশাল এক লেখ্যাগার। মিশরের মস্ত মন্দিরের লেখ্যাগারে রচিত বিস্তর পুঁথি সঞ্চিত ছিল সেখানে। মরুভূমির শুষ্ক তপ্ত আবহাওয়া নষ্ট করেনি কিছুই।

একটা প্যাপিরাস পুঁথির প্রসঙ্গেই আসা যাক। হলোস্কোপ আমাদের যে পুঁথি দেখিয়েছিল কসমিক কম্যান্ডে, সেই পুঁথি। যে-পুঁথি প্রণয়ন করা হয়েছিল মিশরের এক মহামন্দিরে মূল পুরোহিতের বচন লিপিবদ্ধ করে, এ সেই পুঁথি। হলোস্কোপ আমাদের দেখিয়েছিল, গ্রীক সোলন মাতৃভাষা গ্রীকভাষায় লিখে গেছিল পুঁথি— এ সেই প্যাপিরাস পুঁথি। হয়তো... হয়তো কেন... নিশ্চয় প্রধান পুরোহিত আমেনহোতেপ-এর হুকুমেই গ্রীক সোলনকে হত্যা করে তার মড়াকে মমি বানিয়ে চালান করে দেওয়া হয়েছিল কৃষ্ণসাগরের পাতাল সুড়ঙ্গে— গ্রীকভাষায় লেখা প্যাপিরাস পুঁথি সযত্নে রক্ষা করেছিল সাহারার অজানা এক পাতাল সমাধির গুপ্তকক্ষে— যাতে প্রাচীন ইতিহাস হারিয়ে না-যায়— কিন্তু যেন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে।

প্রফেসর বলেছিলেন আমাকে আর গদাইকে, 'মিশরের জ্ঞানী পুরুষদের বাতিক ছিল প্রাচীন জ্ঞান লিখে রাখা— প্যাপিরাসের পুঁথিতে। মিশরীয় ছবি অক্ষরে। কিন্তু এই প্রথম একটা পুঁথি পাওয়া গেল যাতে রয়েছে প্রাচীন গ্রীক ভাষা।'

দুনিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদরা সচকিত হয়েছিলেন প্রফেসরের এই আবিষ্কারের খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে যাওয়ায়। গ্রীক ভাষায় লেখা মিশরীয় প্যাপিরাস! কিমাশ্চর্যম! নিশ্চয় এক গ্রীক পণ্ডিত লিখেছিলেন মিশরে বসে। কিন্তু কেন? কী আছে সেই পুঁথিতে?

মুখে চাবি দিয়েছিলেন প্রফেসর। ওঁর এই একটা দোষ। বয়সের ভারে মাঝে মাঝে বেশি কথা বলে ফেলেন। ঠেলা সামলাতে হয় আমাকে।

এই ক্ষেত্রেও কোমর বেঁধে লাগতে হয়েছিল আমাকেই। সঙ্গে ছিল অবশ্য গদাই।

প্রত্ন ডাকাতরা পেছন নিয়েছিল প্রফেসরের!

বিশ্বের তাবড় মিশরবিদরা কিন্তু ছেঁকে ধরেছিল প্রফেসরকে। গ্রীকভাষায় লেখা মিশরীয় প্যাপিরাস তাঁদের টনক নড়িয়েছিল। প্রত্ন ডাকাতরা যখন পুঁথির জন্যে খুঁজে চলেছিল প্রফেসরকে, মিশরবিদরা তখন প্রাচীন জ্ঞানের জন্যে পাকড়াও করে ফেলেছিল প্রফেসরকে।

প্রফেসর বেফাঁস কথা বলেননি শত চাপেও। তাঁর নয়া আবিষ্কার হলোস্কোপ মেশিনের কথাও বলেননি।

শুধু বলেছিলেন, 'আজ যা অবিশ্বাস্য, কাল তা সত্যি। কিন্তু অবিশ্বাস্যকে যদি ইতিহাসের ছাঁদে লেখা হয়, তা হলে লোক টিটকিরি দিতে পারে। তাই গল্পচ্ছলে লেখাই সংগত। এ-যুগের কল্পবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে এই কেরামতি থেকেই। আমার ন্যাওটা এই দীননাথ নাথ নাকি হাত পাকিয়েছে কল্পবিজ্ঞানে। কিন্তু ওকে শিশু বললেই চলে মহামতি প্লেটোর কাছে। সুদুর অতীতে ছিল এক পিলে চমকানো মহাদেশ— আটলান্টিস। উনি গ্রীক পণ্ডিতদের

মিশরে পাঠিয়ে, অথবা গ্রীক পণ্ডিতদের মুখের কথা শুনে নিয়ে তা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু অবিশ্বাস্যকে ইতিহাস আকারে না-লিখে গল্পচ্ছলে লিখে গেছিলেন দুটো কেতাবে। একটার নাম তিমোয়াম, আর একটার নাম ক্রিটিয়াস। দু'হাজার বছর ধরে এই দুই কেতাবের কাল্পনিক সংলাপ মুন্ডু ঘুরিয়ে ছেড়েছে তাবড় তাবড় ঐতিহাসিকদের। সত্যিই কি এমন দেশ ছিল এই ধরাধামে যেখানে রাজত্ব করে গেছে দানবসম মানুষরা, বানিয়েছে সোনা আর গজদন্ত প্রাসাদ? বন্ধুগণ, গ্রীক ভাষায় লেখা এই মিশরীয় প্যাপিরাসে রয়েছে 'লস্ট আটলান্টিস'-এর ঠিকানা।'

প্রফেসরের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া চক্কর মেরে একটা ব্যাপার জানা হয়ে গেছিল আমার। তাঁর বেঙ্গলি ব্রেনের দাপটে ঈর্ষাকাতর অনেকেই। গুণমুগ্ধ বৈজ্ঞানিক যেমন আছেন, ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছেন, এমন বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যাও কম নয়। ঈর্ষা বড় পাজি জিনিস। মানুষকে অনেক নীচে নামায়।

এই নরাধমদেরই একজন বাংলার ব্রেনকে কোণঠাসা করবার ফিকিরে তেঁতো গলায় বলেছিলেন, 'দেখুন মশায়, প্লেটো মহাবিদ্বান হতে পারেন, কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ নিশ্চয় ছিলেন না। কিন্তু জনপ্রিয় হওয়ার সাধ ছিল। তাই চুটিয়ে গাঁজার দম মেরে গেছেন। আর আপনি, মাই ডিয়ার প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, সেই গাঁজার কলকেটা হাতে পেয়ে গুলপট্টির আসর জমাচ্ছেন। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবী-কাঁপানো সভ্যদেশ আটলান্টিস সত্যিই যদি থাকত, এতদিনে তার হদিশ পাওয়া যেত স্যাটেলাইট গোয়েন্দাগিরির দৌলতে। তাই বলি, মশায় নাটবল্টু চক্র, গুল মারবেন না, বসে পড়ুন।'

রেগে টং প্রফেসর তখন যা যা বলেছিলেন, হুবহু তাই লিখে যাচ্ছি।

'ন'হাজার বছর আগে আটলান্টিক মহাসাগরে মাথা তুলেছিল দুর্ধর্ষ একটা জাত... তাদের শক্তি, তাদের জ্ঞানের কণামাত্রও নেই আপনার মগজে... প্লেটো কাহিনির ঢঙে বলে গেছেন, সেই তারা— সেই সব মহামানুষরা... যারা আপনার মতো খড়কে কাঠি মানুষ নয়... তারা ছিল নাকি সমুদ্র দেবতা পোসিডন-এর বংশধর... এই পর্যন্ত গল্প... তারপরেও সুলেখক প্লেটো... আপনার মতো কুলেখক যিনি নন... তিনি বর্ণনার ছলে জানিয়ে গেছিলেন, ঠিক কোন জায়গাটায় ছিল মস্ত এই মহাদেশ। মহাশয় অতি-অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক বন্ধু, আপনার মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে সেই বর্ণনা শুনিয়ে যাচ্ছি। কান খাড়া করে শুনে যান।

'মহাশয় অবিশ্বাসী, কানখাড়া করে শুনুন, গল্প বলার ছলে ক্রিটিয়ার্স বলেছিলেন সক্রেটিসকে, আটলান্টিক মহাসাগরে উত্থান ঘটেছিল মহাশক্তিধর, এক সাম্রাজ্যের। ন'হাজার বছর আগে। আটলান্টিস মহাদেশের মানুষরা ছিল সমুদ্রদেবতা পোসিডন-এর বংশধর। যে জায়গাটাকে বলা হয় হারকিউলিসের থাম, পিলার্স অফ হারকিউলিস, সেইখানে ছিল বিশাল এক দ্বীপ— লিবিয়া আর এশিয়া একসঙ্গে যত বড়, তার চাইতেও বড় দ্বীপ। আটলান্টিস দ্বীপ বলা হয়েছে বিশাল এই ভূখণ্ডকে। অসাধারণ শক্তিশালী এক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটেছিল এইখানে। যাদের শাসন জেঁকে বসেছিল গোটা ভূখণ্ডে, ছড়িয়ে গেছিল ঈজিপ্ট-ইউরোপেও।·লিবিয়া এসে গেছিল শাসনের আওতায়।'

প্রফেসর সচরাচর রাগেন না। কিন্তু সেদিন তাঁর অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। কথার খই ফুটে যাচ্ছিল মুখে— 'আপনি শুধু নন, আপনার মতো অনেক আহাম্মক প্লেটোর কাহিনিকে গল্পকথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।'

মিনমিন করে বলেছিলেন দাবড়ানি খাওয়া মার্কিন বৈজ্ঞানিক, 'লিবিয়া আর এশিয়া একসঙ্গে জুড়লে যত বড়, তত বড় মহাদেশ ছিল হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস?'

'আজ্ঞে,' ব্যঙ্গের সুরে বলে গেছিলেন প্রফেসর, 'আফ্রিকার প্রাচীন নাম লিবিয়া। তা হলে বুঝে দেখুন কত বড় ভূখণ্ড ছিল আটলান্টিস। এশিয়া আর আফ্রিকা একসঙ্গে কত বড় হয় মশায়?'

মার্কিন বৈজ্ঞানিক বোবা মেরে গেছিলেন।

প্রফেসরের সেদিনকার রুদ্রমূর্তি আমি কোনওদিনই ভুলব না। রেগে টং হলে ওঁর কথায় যেন ছুরি চলে— আটলান্টিস আজ একটা কিংবদন্তি। কিন্তু কিংবদন্তি গড়ে ওঠে ঘটনাকে ঘিরে। একদিনের ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাত এত বড় একটা মহাদেশকে টেনে নামিয়ে নেয় সাগরতলে— আর সে-দেশ দেখা যায়নি।'

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সবচেয়ে হামবড়া বলে খ্যাত পুসকিন ফট করে বলেছিলেন, 'আরে মশায়, আটলান্টিস আসলে একটা রাজনৈতিক উপকথা। খেয়ালি রূপকথা। জোনাথন সুইফট যেমন 'গালিভার্স ট্র্যাভেলস' উপন্যাসে খুদে মানুষ আর দৈত্য মানুষদের গল্প বলেছিলেন, প্লেটোর গল্পও তাই।'

আর যায় কোথা! টেবিল চাপড়ে বলেছিলেন প্রফেসর, 'মিউটেশন যে খুদে মানুষ আর দৈত্য মানুষ বানিয়েছিল এই পৃথিবীতে, তা কি মহাশয়ের অজানা?'

চুপ মেরে গেছিলেন পুসকিন। সত্যিই তো, মর্কট মানুষ আর দানব মানুষদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বহু দ্বীপে। সুইফট গল্প বলার ঢঙে শুধু যা অতিরঞ্জন করেছেন।

'তাই যদি হয়, প্লেটো যা বলেছিলেন, তাও তো সত্যি। স্বামী বিবেকানন্দ ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা তাঁর যোগদৃষ্টির জন্যেই দেখেছিলেন। তাও সত্যি।'

মিনমিন করে পুসকিন অবশ্য বলেছিলেন, 'প্রফেসর চক্র, ইয়ে, নাটবল্টু চক্র, আপনি কি তা হলে বলতে চান আটলান্টিক মহাসাগরের নামকরণ আটলান্টিস মহাদেশের নাম থেকেই হয়েছে?'

'আজ্ঞে না,' তীব্র স্বরে জবাবখানা ছেড়েছিলেন প্রফেসর, 'সমুদ্রদেবতা পোসিডন-এর ছেলের নাম ছিল অ্যাটলাস। পেশিময় অ্যাটলাস। যে নাকি আকাশকে কাঁধে ধরে রাখত। এই অ্যাটলাস-এর সমুদ্র ছিল আটলান্টিক— আটলান্টিসের নয়।'

'আটলান্টিক নামটা তা হলে প্রথম কে দিয়েছিলেন?'

'হেরোডোটাস। প্লেটোর আমলে।'

'আটলান্টিসের কল্পনা তা হলে প্লেটোর মাথায় এসেছিল এই আটলান্টিক নাম থেকেই?'

'সোনার চাকতি আর প্যাপিরাসের পুঁথি থেকে— যে-পুঁথি পাওয়া গেছে সাহারার নীচের কবরখানায়— জানা গেছে জাহাজে কেফিটু দেশের মানুষ আসত আফ্রিকায়। আমি

বলব, কেফিটু নয়, তারা আসত আটলান্টিস থেকে। যে-প্যাপিরাস পাওয়া গেছে, তার বয়স কিন্তু প্লেটোর আগের আমলের। সুতরাং, মহাশয় পুসকিন, প্লেটোর কপোলকল্পনা নয় আটলান্টিস মহাদেশ। নামটা তাঁর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে গজায়নি।'

'ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে এক মহান সভ্যতার সম্পর্ক ছিল। এমন স্বপ্ন স্বামী বিবেকানন্দ দেখতে গেলেন কেন?' পুসকিন নাছোড়বান্দা। সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ।

আর যায় কোথা! তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন প্রফেসর, 'মহাশয় পুসকিন, আটলান্টিস থেকে অনেক দ্বীপেই যাওয়া যেত— লেখা রয়েছে প্যাপিরাসের পুঁথিতে। সেইসব দ্বীপ থেকে যাওয়া যেত আরও আরও মহাদেশে। ঈজিপ্ট থেকে ক্রীট দ্বীপের অবস্থান ঠিক এইরকমই একটা জায়গায়। সমুদ্রের দিকে আটলান্টিস ছিল পাহাড়সমান উঁচু, পাহাড় দিয়ে ঘেরা, ক্রীট দ্বীপের দক্ষিণ উপকূল কিন্তু হুবহু এইরকম। সুতরাং, মাই ডিয়ার পুসকিন, স্বামী বিবেকানন্দের যোগ স্বপ্ন মিথ্যে নয়।'

নিভে গেছিলেন পুসকিন প্রফেসরের দাবড়ানিতে।

কিন্তু থেমে যাননি প্রফেসর, 'আটলান্টিসের বাসিন্দাদের নিখুঁত বর্ণনাও তো রয়েছে প্যাপিরাসের পুঁথিতে। অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল আটলান্টিসে— কিন্তু মাথার ওপর ছিল এক বিরাট শহরের শাসন। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মিনোয়ান ক্রীট সম্বন্ধে ঠিক এমন কথাই বলে গেছেন। স্বয়ংশাসিত ডজন খানেক প্রাসাদ-শাসন ছিল সেখানে এক সময়ে। সমুদ্রের উপকূল থেকে একটু দূরেই ছিল তাদের বিরাট শহর, ছিল ড্রেন সিস্টেম, এক্সেলেন্ট হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার ছিল মিনোয়ানরা— ঠিক এইরকম ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষমতা তো ছিল আটলান্টিসের মানুষদের। সিসটার্ন, গরম জলের ব্যবস্থা, রাজাদের স্নানঘর, ঘোড়া আর গৃহপালিত পশু রাখবার আলাদা আলাদা ব্যবস্থা।'

পুসকিন কিন্তু নাছোড়বান্দা, 'এমন একখানা মহাদেশ জলের তলায় আচমকা তলিয়ে গেল, বিশ্বাসযোগ্য কি?'

'নয় কেন? একটা তো জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে ঈজিয়ান-এ। পৃথিবীর বৃহত্তম ভলক্যানোদের অন্যতম। খ্রিস্টজন্মের দু'মিলেনিয়াম আগে কোনও একসময়ে চুড়ো উড়ে গেছিল এই ভলক্যানোর। ক্রীট-এর ওপর, ভূমধ্যসাগরের পুবদিকে এসে পড়েছিল ছাই আর পাথর। আকাশ অন্ধকার হয়েছিল অনেকদিন। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল গোটা মিশর।'

পুসকিন এতক্ষণে সায় দিলেন, 'তা বটে, তা বটে। ওল্ড টেস্টামেন্টে এমন কথা লেখা আছে। তিন দিন অন্ধকার হয়ে ছিল গোটা মিশর।'

চালিয়ে গেলেন প্রফেসর, 'কার্পেটের মতো ছাই জমেছিল ক্রীট-এ। চাষ-আবাদ করা যায়নি কয়েক পুরুষ। জলোচ্ছ্বাস আর সুনামি ধ্বংস করে দিয়েছিল উত্তর উপকূল, গুঁড়িয়ে গেছিল প্রাসাদের পর প্রাসাদ। প্রচণ্ড ভূমিকম্প ঝুঁটি ধরে নাড়িয়েছিল গোটা ক্রীটকে। ভয়ানক আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল মিশর দেশের সমস্ত মানুষ। অন্ধকার হয়ে গেছিল আকাশ। দেখা দিয়েছিল বিপুল জলোচ্ছ্বাস। আটলান্টিস পুরোপুরি তলিয়ে না-গেলেও মুছে গেছিল মিশরীয় দুনিয়া থেকে।'

'হার মানলাম,' পুসকিনের পরাভব স্বীকার বেশ নাটকীয়।

প্যাপিরাসের কথা, সোনার চাকতির সাংকেতিক লিপি তা হলে মিথ্যে নয়। আটলান্টিস ছিল। সোনায় মোড়া সেই শহর আজও আছে— জলের তলায়।

যোগ স্বপ্নে এই নিশানাই পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

(৯) আটলান্টিস! আটলান্টিস!

পুসকিন বিলক্ষণ মিইয়ে গেছেন দেখে বিলক্ষণ প্রীত হয়েছিলেন প্রফেসর। উনি সচরাচর হাঁকডাক করেন না। যখন করেন, তখন এমনই ফেটে পড়েন যে শ্রোতারা থতমত খেয়ে যায়। এইটাই ওঁর পার্সোনালিটি, ওঁর ব্যক্তিত্ব।

বৈজ্ঞানিকদের আসরে আমার মতো গবেটের হাজির থাকার কথা নয়। কিন্তু থাকতে হয়েছিল জেদ ধরায়। প্রফেসরকে শামাল দেওয়ার জন্যে। ফলে, দেখতে পেয়েছিলাম অনেক কিছু।

আরও একটা কথা বলা হয়নি। গুপ্ত প্যাপিরাস আর সাগরতলের সোনার চাকতি নিয়ে তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকদের সম্মেলন ডাকা হয়েছিল কেন, সে কথাটা লিখতে খেয়াল করিনি। এটা আমার স্বভাব। আমার মস্ত দোষ। আগের কথা পরে, পরের কথা আগে বলে ফেলি।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র এলাকায় প্রত্নবোম্বেটের কথা কিন্তু আগে ছুঁয়ে গেছি। এঁরা যদি সাগরতলের সোনার শহর আটলান্টিসের ঠিকানা পেয়ে যায়, তা হলে কল্পনাতীত কাণ্ডকারখানা শুরু হয়ে যেতে পারে। তাই আটঘাট বেঁধে এগোচ্ছিলেন প্রফেসর। হলোস্কোপ ওঁকে দেখিয়েছিল সাগরের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে সোনার বাট। সোনার চাকতি দেখেছিলেন তার পরেই। প্যাপিরাসের টুকরো পেয়েছিলেন গদাইয়ের কাছে। দুটো থেকে যে গুপ্ত তথ্য পেয়েছিলেন তা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ডাকতেই হয়েছিল। ডেকেছিল তারাই যারা ডুবুরি নামিয়ে তুলে এনেছিল সোনার চাকতি— যে চাকতির এপিঠে ওপিঠে খোদাই করা ছিল সাংকেতিক লিপি। গূঢ় অর্থ বোঝবার জন্যে প্রফেসরের শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সাহারার তলায় পাওয়া প্যাপিরাস পুঁথির মানেও তো ছাই বোঝা যাচ্ছিল না। সে ভাষা যে প্রাচীন গ্রীক ভাষা। যে ভাষায় সোলন লিখেছিলেন আটলান্টিস কাহিনি আমেনহোতেপের মুখে শুনে।

তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকদের সামনে ডিজিট্যাল প্রজেক্টর চালাতে হয়েছিল আমাকেই। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় ভরে গেছিল গোটা স্ক্রিন। গুঞ্জন উঠেছিল শ্রোতাদের তরফ থেকে। থমথমে হয়ে গেছিল ঘরের পরিবেশ। টেবিলের ওপর ছেঁড়া প্যাপিরাস মেলে ধরে ঠিক ওপরে ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর। সুপ্রাচীন লিপি সুস্পষ্ট হয়ে গেছিল চোখের সামনে।

জ্ঞান দিয়ে গেছিলেন প্রফেসর এইভাবে, 'খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে প্যাপিরাস প্রায় উধাও হয়ে গেছিল মিশর থেকে। চাষবাস তুঙ্গে ওঠার ফলে নীলনদের ধারে প্যাপিরাস চাষে

টলেমি এসেছিল। প্রথম যে প্যাপিরাস পুঁথি আজকের দুনিয়ার চোখের সামনে এসেছে, তার বয়স খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর। এখন যে প্যাপিরাস পুঁথি চোখের সামনে দেখছেন, এই পুঁথি লেখা হয়েছিল তারও ১০০০ বছর আগে। এবার দেখুন সাহারার তলায় পাওয়া প্যাপিরাস পুঁথি। এর বয়স খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক— যে সময়ে অ্যাপ্রিস ছিলেন মিশরের ফারাও। চমকে ওঠার খবরটা শুনুন এখন। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের আগে লেখা কোনও গ্রীক পাণ্ডুলিপি প্রত্নবিদ্‌রা জোটাতে পারেননি। কিন্তু খ্রিস্টজন্মের পাঁচশো বছর আগেকার গ্রীকভাষায় লেখা এই প্যাপিরাস পুঁথি মিশরে গেল কী করে? আলেকজান্ডার তো মিশর জয় করেছিলেন তারও দু'হাজার বছর পরে।'

বিস্ময়ধ্বনি শোনা গেছিল সমবেত বৈজ্ঞানিকদের কণ্ঠে। প্রশ্নের জবাব নিজেই দিলেন প্রফেসর, 'গ্রীক সোলন মিশরে গেছিল বলে। প্রধান পুরুতের মুখ থেকে লস্ট আটলান্টিসের কাহিনি টুকে নেওয়ার পর আর দেশে ফিরতে পারেনি। মৃতদেহ মমি হয়ে চলে গেছে কৃষ্ণসাগরে, পুঁথি চলে গেছে মিশর পুরোহিতের হাতে। সেই আমলে প্যাপিরাস পুঁথিতে লেখা রেকর্ড নষ্ট হতে দিত না মিশরীয়রা। তাই আটলান্টিস কাহিনি থেকে গেছে সাহারার বালির তলায়।'

গুঞ্জন যখন বিস্ময় বিস্ফোরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রফেসর তখন মুচকি মুচকি হাসছেন। হেসে হেসেই বলে গেলেন, 'গ্রীক সোলনকে খতম করে দেওয়ার পর তার কাছে থাকা পুঁথি কেন নষ্ট করে দেওয়া হল না, এ-প্রশ্ন নিশ্চয় মাথার মধ্যে এসে যায়। জবাবটা এই: মিশরীয়দের কাছে ছবি-হরফ দিয়ে লিখে রাখা ব্যাপারটা ছিল দৈব ব্যাপার। দেবতা টথ এ ক্ষমতা না-দিলে লেখা ব্যাপারটাই থাকত না। দেবতার কোপ এসে যেতে পারে প্যাপিরাস পুঁথি নষ্ট করে দিলে। তাই পুঁথি নষ্ট হয়নি। ঈশ্বরের বাণী ধ্বংস করা যায় না।'

পুসকিন মিনমিন করে বলেছিল, 'তা হলে আমেনহোতেপ গ্রীক সোলনকে দিয়ে লেখাতে গেল কেন?'

'কিছুটা সোনার লোভে। সব দেবমন্দিরেই এই প্রতারণা আছে— সেবায়েত যারা, পূজারি যারা, তারা দেবদেবীর নাম করে সম্পদ বানিয়ে যায়। এটা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে হাজার হাজার বছরের অভ্যেসে।'

'বাকি কিছুটা?'

'জ্ঞান দেওয়ার বাসনা কার নেই? এই যেমন আমার রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, তেমনি নিশ্চয় ছিল অতি বৃদ্ধ আমেনহোতেপেরও। কিন্তু সতর্ক ছিল সে জ্ঞান যাতে বিদেশে পাচার না হয়ে যায়। সোলনকে হত্যা করা হয়েছিল এই কারণেই।'

পুসকিন পুলকিত স্বরে বললে, 'প্রফেসরকে তা হলে আমিও একটা জ্ঞান দিয়ে রাখি। গ্রীকরা ব্যাবসা বুঝত সেকালে। মিশরীয়দের ঠকিয়েছে তাদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে। আটলান্টিস নিয়ে যে বাণিজ্য করতে পারে ব্যাবসাদার গ্রীকরা, আমেনহোতেপ নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছিল বলেই সোলনকে ঠকিয়েছে অন্যভাবে। জ্ঞান দিয়েও কেড়ে নিয়েছে, সোনা নিয়েছে, প্রাণে মেরেছে। টিট ফর ট্যাট।'

মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন প্রফেসর, 'রাইট। গ্রীক সোলনের কাছে অত সোনা ছিল

ব্যাবসাদার বলেই। আক্কেল সেলামি দিতে হয়েছে প্রাণ খুইয়ে।'

'কিন্তু আটলান্টিস রহস্য থেকে গেছে প্যাপিরাস পুঁথিতে।' পুসকিনের গম্ভীর সিদ্ধান্ত— 'তবে ধুরন্ধর বলতে হবে এই আমেনহোতেপ পুরুতমশায়কে।'

গম্ভীর গলায় বললেন প্রফেসর, 'মহাশয়ের যদি ইচ্ছে থাকে, তবে তাকে দেখে আসতে পারেন।'

'তার মড়াকে? মমি?'

'তার স্ট্যাচুকে— আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, মরণকালে যার বয়স ছিল একশো বছরেরও বেশি।'

চক্ষুনৃত্য দেখিয়ে টিপ্পনী কেটেছিল পুসকিন, 'আপনার মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর সেই স্ট্যাচু দেখাতে পারবে না?'

খোঁচাটা প্রকারান্তরে মারা হয়েছিল আমাকেই। সুতরাং কেরামতি দেখিয়েছিলাম তৎক্ষণাৎ। পরদায় দেখা গেছিল অতি বৃদ্ধ আমেনহোতেপ পুরুতমশায়কে। মুখভাবে প্রোজ্জ্বল কিন্তু আশ্চর্য তারুণ্য। জ্ঞানের ছটায় আলোকিত। প্রজ্ঞা এমনই জিনিস— বয়সকে ছাপ ফেলতে দেয় না।

প্রশ্ন রেখেছিল পুসকিন 'এবার কি দেখতে পারি গ্রীক সোলনের টুকে নেওয়া জ্ঞানের তর্জমা?'

ল্যাপটপ ছিল কোলের ওপর, যার সঙ্গে জোড়া রয়েছে মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর। আঙুল ছুঁইয়ে পরদায় ফুটিয়ে তুলেছিলাম সোলন যা লিখে নিয়ে গিয়েছিল, তার শেষ কয়েক পঙ্‌ক্তির তর্জমা:

'শহরে শহরে টহল দিয়ে বেড়াত মহাকায় ষাঁড়, অলিতে গলিতে, চওড়া রাস্তাতেও দেখা যেত তাদের। মানুষ নেচে নেচে যেত বৃষদের সঙ্গে। তারপর, ফারাও তুতমিস-এর সময়ে, দেবতাদের রোষে কেঁপে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছিল শহর, আকাশসমান উঁচু তরঙ্গ নিক্ষেপ করেছিল সমুদ্রদেবতা পোসিডন, ধুয়ে উড়ে গেছিল সবকিছু। কেফতিউ দ্বীপদেশ মুছে গেছিল এইভাবেই। তার পরেই সমুদ্রে তলিয়েছিল আর একটা মহাসাম্রাজ্য--- আজও যা ডুবে রয়েছে সাগরতলে-— তার নাম আটলান্টিস।'

প্রফেসর বললেন তার পরেই, 'এবার দেখুন প্যাপিরাস পুঁথির দ্বিতীয় পর্বের তর্জমা।'

কলের পুতুলের মতো আমি চাপ দিলাম ল্যাপটপের একটা বোতামে। পরদায় প্রথমে দেখা গেল একটা জীর্ণ প্যাপিরাস পুঁথি। তার পরেই ফুটে উঠলো তর্জমা।

প্রফেসর কিন্তু স্কুল মাস্টারের মতো বকেই চলেছেন, 'খেয়াল রাখবেন, সোলন মিশরীয় ভাষা কানে শুনেছে, লিখে গেছে গ্রীকভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে নিয়ে। কাজেই তর্জমা একটু ছন্নছাড়া। সমস্যাটা সেইখানেই।'

পরদায় দেখা যাচ্ছে মূল লেখা। প্যাপিরাস কিনারার দিকে ছিঁড়ে যাওয়ায় লেখা অস্পষ্ট। প্রাচীন গ্রীক ভাষার তর্জমা রয়েছে তলায় তলায়। ইংরেজিতে অবশ্যই। আমি লিখে যাচ্ছি ইংরেজির বাংলা অনুবাদ। ভুলভ্রান্তি হলে যেন আমাকে ক্ষমাঘেন্না করা হয়। কারণটা আপনারা জানেন। লেখাপড়ায় আমি মাগঙ্গা।

একটা শব্দ নিয়ে তুমুল গুঞ্জনধ্বনি উঠেছিল ঘরময়। শব্দটার মানে, ষাঁড়ের শিং। জলোচ্ছ্বাস নাকি আছড়ে পড়েছিল ষাঁড়ের বেঁকা শিঙের আকারে।

পুসকিন বলেছিল সোল্লাসে, 'এ আবার কী! প্রাগৈতিহাসিক আমলে ষাঁড়ের শিঙের প্রতীক দেখা গেছে এই পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই। দেখা গেছে নবপ্রস্তর যুগের বেদিতে, ব্রোঞ্জযুগের প্রাসাদে, রোমান যুগের শেষের দিকেও অপূর্ব শিল্প নিদর্শন হিসেবে।'

প্রফেসর ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিয়ে ইশারা করলেন আমাকে। আমি সুবোধ বালকের মতো টিপে দিলাম সঠিক বোতাম। পরদা ভেসে গেল প্যাপিরাসের তলার দিকের লেখায়— তর্জমা সহ :

'শহরে পৌঁছাবে তারপরে। দেখবে বিশাল এক সোনালি প্রান্তর, যতদূর চোখ যায়, ততদূর; দেখবে মস্ত নদীর অববাহিকা, জল-ভরা গর্ত, পাঁকে-ভরা উপত্যকা। দুশো প্রজন্ম আগে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিলেন দেবতা পোসিডন আটলান্টিসবাসীদের ধ্বংস করে দিয়ে— তারা যে পাল্লা দিতে গেছিল তাঁর সঙ্গে— চালচলনে হতে গেছিল খোদ দেবতার মতো। তাই আছড়ে পড়েছিল জলপ্রপাতের পর জলপ্রপাত, বিরাট শহরের সোনার তোরণ বন্ধ হয়ে গেছিল চিরকালের মতো, আটলান্টিস তলিয়ে গেছিল জলের তলায়।'

ঘর নিস্তব্ধ। প্রফেসর বললেন, 'এবারে দেখবেন পুঁথিতে লেখা আটলান্টিস শহরের নিখুঁত বর্ণনা। কিছু লেখা নষ্ট হয়ে গেছে অবশ্য। কিন্তু যেটুকু উদ্ধার করা গেছে, তার থেকে জানা যায়, শহরের বাড়িগুলো ছিল সোনা দিয়ে তৈরি, পাঁচিল পর্যন্ত তৈরি হত সোনা দিয়ে। একটা জায়গায় ওই দেখুন, গ্রীক অক্ষরে 'পিরামিড' শব্দটা লেখা হয়েছে। পুরো কথাটার মানে এই . বিস্তীর্ণ প্রস্তর পিরামিড। শেষের দিকে লেখাগুলোর মানে শুনলে চমকে যাবেন: ভগবানদের বাড়ি— হলঘর— বৃষ প্রতীক। লেখা শেষ এখানেই।'

ঘর নিস্তব্ধ।

মন্দ্রমন্থর স্বরে নৈঃশব্দ্য ভাঙলেন প্রফেসর, 'টনক নড়ে এইখানেই। আমার বিশ্বাস কেফতিউ দেশটার সমাপ্তির সঙ্গে শেষ কথাগুলোর সম্পর্ক টানা হয়েছে ইচ্ছে করেই। পোসিডন বদলা নিয়েছিলেন নশ্বর মানুষের স্পর্ধা দেখে— এই আইডিয়াটা পুরোহিত মশায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত। আসলে, সমুদ্র গিলে নিয়েছিল আস্ত একটা দেশ। প্যাপিরাসের পরের অংশে যা লেখা হয়েছে, পরদার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তা আটলান্টিস শহরের বর্ণনা— বেশ খুঁটিয়ে। কতকগুলো শব্দ সুস্পষ্ট নয়, তাই বর্ণনার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। এই দেখুন দুটো শব্দ— 'সোনালি বাড়ি,' আবার— 'সোনালি পাঁচিল'। তারপরেই গ্রীকভাষায় পরিষ্কারভাবে লেখা 'পিরামিড' শব্দ। পুরো কথাটার তর্জমা এই : প্রকাণ্ড প্রস্তর পিরামিড।'

বৈজ্ঞানিকদের দমবন্ধ করা মূর্তিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে চালিয়ে গেলেন প্রফেসর, 'এই দেখুন পরিষ্কার : 'ভগবানদের বাড়ি, ভগবানদের হলঘর, বৃষ প্রতীকের নীচে। প্যাপিরাস শেষ এইখানেই।'

কিছুক্ষণের দম আটকানো নৈঃশব্দ্য ভেঙে প্রথম কথাটা বললেন পুসকিন, 'এমন একটা জায়গা যেখানকার দ্বীপময় দেশ অঞ্চলে সমুদ্র অতিশয় সংকীর্ণ। এমন জায়গা রয়েছে তো

মিশরের পশ্চিমে, সিসিলি থেকে জিব্রালটার অন্তরীপ পর্যন্ত। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, আটলান্টিস তা হলে ছিল আটলান্টিক মহাসাগরেই।'

মুখ খুলেছিলেন সবজান্তা মার্কিন বৈজ্ঞানিক, 'জলোচ্ছ্বাস তা হলে পাচ্ছেন কোথায়? জিব্রালটার জায়গাটায় জলের মাতামাতি তো দেখা যায় না। সোনালি প্রান্তরই বা কোন চুলোয়? আটলান্টিক মহাসাগরে শুধু একদিকে সমুদ্র, আর একদিকে হয় উঁচু পাহাড়, নয় মরুভূমি, অথবা অন্য কিছু।'

ধুয়ো ধরেছিলেন পুসকিন, 'আটলান্টিস তো ভূমধ্যসাগরেও থাকতে পারে? পশ্চিম সাহারায় একদা আকাশছোঁয়া সৌধ ছিল, এমন কথা আমি অন্তত মানতে পারছি না।'

প্রফেসর বললেন, 'ব্রোঞ্জ যুগের ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে প্লেটোর আটলান্টিসের সম্পর্ক আছে, এমন কথা যাঁরা ভাবছেন, তাঁদের অবগতির জন্যে জানাই, পুঁথির প্রথম দিকে যা লেখা আছে, তার ইঙ্গিত থেকে ধরে নিতে হবে থেরা আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়েছিল কোনও এক সময়ে। কিন্তু সমস্যাটা যে রয়ে যাচ্ছে ক্রীট দ্বীপকে নিয়ে। ক্রীট কস্মিনকালেও আটলান্টিস ছিল না।'

পুসকিন বললেন, 'তাই যদি বলেন, তা হলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, প্লেটো যা লিখেছেন, তার মানে দু'রকমের হয়। ধোঁয়াটে।'

বিতর্ক বেশ জমে ওঠায় আমি তেতে উঠছিলাম একটু একটু করে। প্রফেসর উসকে দিলেন গরম গরম কথা কাটাকাটি, 'তা তো বটেই। দুটো বিভিন্ন ইতিহাসের খণ্ডচিত্র পাচ্ছি প্যাপিরাস থেকে। একটা বলছে ব্রোঞ্জ আমলের ক্রীট-এর পতন কাহিনি; যেখানে থেকে গেছে কেফতিউ মানবজাতি। আর একটায় পাচ্ছি আরও প্রাচীন এক সভ্যতার কাহিনি— সে সভ্যতা ছিল আটলান্টিস মহাদেশ।'

পুসকিনের মন্তব্য, 'সময়ের তফাতটা কিন্তু কম নয়— এর ৫০০০ বছর আগের কথা— যা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৫৬০০ সাল। সময়ের ফারাকটা যখন এতটা, ষাঁড়ের প্রতীক দু'জায়গাতেই আসছে কী করে?'

রসিয়ে রসিয়ে জবাবটা দিলেন প্রফেসর, 'ষাঁড় তো একটা প্রতীক, শুধু মিনোয়ানদের নয়, নব্য প্রস্তর যুগ থেকেই ষাঁড় শক্তির প্রতীক, সার্বভৌমতার প্রতীক, শক্তি আর বীর্যের প্রতীক। সব চাষির কাছেই বলদ ছিল অপরিহার্য। চাষবাস যারা করেছে, বৃষ প্রতীক তারাই কাজে লাগিয়েছে। এ নিয়ে এত ধুন্ধুমার বিতর্কের প্রয়োজন তো দেখি না।'

'সোনার লোভে,' ফিক করে হেসে বলেছিল পুসকিন, 'সোনা এমনই জিনিস— আবহমান কাল মানুষকে টলিয়েছে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী আমেনহোতেপও সোনার টোপ গিলে একটু একটু করে উগরেছে আটলান্টিস কাহিনি। রোজ ডিকটেশন ঝেড়েছে, রোজ সোনা লুঠেছে। পুরুত জাতটাই এইরকম। এই কারণেই আমরা কার্ল মার্ক্স-এর বাণী—'

কথা ঘুরিয়ে দিলেন প্রফেসর, 'এমনও তো হতে পারে, আটলান্টিস-এর কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই হুঁশিয়ার হয়ে গেছিল পুরুত আমেনহোতেপ? জ্ঞান বর্ষণে যতি টেনেছিল সেই দিনই? আটলান্টিস যে সোনার শহর— বলে ফেলাটা ঠিক হয়নি বুঝেই খতম করে দিয়েছিল গ্রীক সোলনকে?'

সমস্বরে বলেছিলেন সমবেত বৈজ্ঞানিকরা, 'ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন, বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরেছিল আমেনহোতেপের। পাছে গ্রীকরা আটলান্টিসের সন্ধান পেয়ে যায়—'

'খুন করেছিল সোলনকে,' শেষ করলেন প্রফেসর।

(১০) ভলক্যানো উপকারও করে

এই যে আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারটা আমি লিখতে বসেছি, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ যদি লিখতে যাই, তা হলে তা এত লম্বা হয়ে যাবে যে পাঠক এবং পাঠিকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। এই যুগটা যে 'মিনি' যুগ, 'ম্যাক্সি'দের দিন ফুরিয়েছে।

তাই আমি কাটছাঁট করে যাচ্ছি।

বিজ্ঞানসভা-টভাগুলো আসলে আমার কাছে নাটুকেপনা ছাড়া কিচ্ছু নয়। আরে বাবা, অত কথার কচকচি না-ফলিয়ে অকুস্থলে গিয়ে একটু অ্যাডভেঞ্চার করলেই তো চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যায়।

আমি আর প্রফেসর তাই উড়ে গেছিলাম হেলিকপ্টারে চেপে। এসব ব্যাপারে বুড়োর উৎসাহ খুব বেশি। একেবারে আমার মনের মতো মানুষ। কেটিয়া নামে একটা রাশিয়ান মেয়েকে উনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। আমার মতোই কেটিয়া প্রফেসরের পরম ভক্ত। 'লস্ট আটলান্টিস' নিয়ে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেছে, পড়াশুনোও করেছে। আমার মতো বিদ্যের বহরে সে জিরো পাওয়ার নয়।

হেলিকপ্টার চালাচ্ছিলাম কিন্তু আমিই। স্থির হয়ে ভাসছিলাম শূন্যে। মাথার ওপর শুধু ঘরঘর করে যাচ্ছিল রোটর। পাশের পোর্টদরজা দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে ছিলেন প্রফেসর আর কেটিয়া।

এক হাজার মিটার নীচে দেখা যাচ্ছিল থেরা। আগ্নেয়দ্বীপ থেরা। ক্রীট দ্বীপের উত্তরে ঈজিয়ান সাগরের এই আগ্নেয়গিরি উচ্চতায় নেহাত কম নয়— ১৮৬০ ফুট। ধোঁয়া উঠছে আগুন পাহাড়ের মুখ থেকে। পাতাল দেবতার গরম নিশ্বাসের মতো। সাগরের জল থইথই করছে চারদিকে। সেই সঙ্গে খোঁচা খোঁচা পাহাড়ের চূড়ো— বাকি অংশ জলের তলায়। মাঝের ভলক্যানো ফের মাথা চাড়া দিয়েছে জলতল থেকে। ষাঁড় গুঁতিয়ে দেওয়ার আগে যেরকম পোজ নেয়, এই আগ্নেয়পাহাড়ও সেই ওয়ার্নিং পাঠাচ্ছে ভলকে ভলকে ধোঁয়া ছিটকে দিয়ে।

ইন্টারকমের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে কেটিয়া, 'ভয়ংকর! সত্যিই বড় ভয়ানক। আফ্রিকান আর ইউরেসিয়ান প্লেট যখন ঠোকাঠুকি লাগায়, তখন এই রকমটাই ঘটে। আরও ভূমিকম্প, আরও আগ্নেয়গিরি। পৃথিবীর অন্য কোনও জায়গায় এমনটা দেখা যায় না। গ্রীকদের দেবতাদের এইজন্যেই এইরকম অগ্নিশর্মা ভেবে নেওয়া হয়েছে। এমন জায়গায় সভ্যতা গড়ে ওঠে কেন, সেটাই একটা প্রশ্ন।'

'কারণ আছে, বলে, জবাব দিলেম প্রফেসর, 'ভলক্যানো শুধু ধ্বংস করে না, উপকারও

তো করে। প্লেট টেকটোনিক না-থাকলে চুনাপাথর কখনওই মারবেল পাথর হতে পারত না। এরই নাম ষাঁড়ের গুঁতো। মারবেল না-থাকলে মন্দির গড়ে উঠত না, স্থপতিরা কারুকাজ ফুটিয়ে ভেলকি দেখাতে পারত না। ভলক্যানোর ছাই আর চুনাপাথর মিশিয়ে পাথরের গাঁথনি বানাতে পারত না— আজকের যুগের সিমেন্টও হার মেনে যায়। এ আবিষ্কার রোমানদের।'

ধুয়ো ধরে চালিয়ে গেল কেটিয়া, 'ছাই শুধু বাড়ি ঘরদোরের গাঁথনিতেই কাজে লাগে না, জমিকেও উর্বরা করে দেয়। ফসল ফলায় দেদার। প্রাচীন দুনিয়ার এটনা আর ভিসুভিয়াস আগ্নেয়পাহাড়ের চারপাশের জমি জায়গা এই কারণেই এন্তার খাবার জুগিয়ে গেছে সেকালের মানুষদের।'

জ্ঞানের ফুলঝুরি যেখানে ঝরছে, সেখানে আমিই বা বাদ যাই কেন? গম্ভীর চালে বলেছিলাম, 'আজকের কাগজেই তো পড়লাম, দারুণ একটা ভূমিকম্প কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে গ্রীস দেশটাকে। মধ্য প্রাচ্য পর্যন্ত। ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে দক্ষিণ গ্রীস অঞ্চলে। ক্রীট দ্বীপে মারা গেছেন তিনজন। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র রয়েছে সাগরের তলায়, এথেন্স থেকে দুশো কিলোমিটার দক্ষিণে।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল কেটিয়া, 'মাই ডিয়ার দীননাথ, খবরটা আমিও পড়েছি। গোটা গ্রীস কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে এই ভূমিকম্প।'

প্রফেসর আনমনা চোখে চেয়ে ছিলেন ভূমধ্যসাগরের দিকে। গাঢ় নীল জল কালচে মেরে গেছে একটা জায়গায়। যেন মেঘে ঢাকা পড়েছে।

কেটিয়া দেখেছিল সেই দৃশ্য। বলেছিল সোল্লাসে, 'ডোবা আগ্নেয়গিরি! ডোবা আগ্নেয়গিরি! চুড়োটা ঠেলে উঠতে চাইছে জলের মধ্যে থেকে।'

প্রফেসর বলেছিলেন, 'এখনও তো প্রায় তিরিশ মিটার জলের তলায়। তাইতেই কালি মেরে গেছে মাথার ওপরকার জল।'

আমি ফুটুনি কেটেছিলাম, 'ভলক্যানো বলে কথা! আগুন পাহাড়ের মাথায় জল থাকলে এইরকমই তো দেখাবে।'

কথা না-বাড়িয়ে ধমক দিয়েছিলেন প্রফেসর, 'এবার ল্যান্ডিং করা হোক। 'সিকোয়েস্ট' জাহাজকে দেখা যাচ্ছে ঝাপসাভাবে দিগন্তের দিকে। আমরা এসেছি ওই জাহাজে নামব বলে। সাগরের তলায় অতীতের ডুবে যাওয়া জাহাজ দেখতে যাব তারপরে। অ্যাডভেঞ্চার চলবে জলের তলায়। আমি বিচক্ষণ চঞ্চল সেই কারণেই। প্রফেসরও যে দেখছি মেতে গেছেন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়।

অ্যাডভেঞ্চার এমনই জিনিস। এর মাদকতা যে পেয়েছে, সেই শুধু জানে, দুঃসাহসিকতার মাদকতা।

হেলিকপ্টার নেমে এল জাহাজের হেলিপ্যাডে। ডেকে নামবার আগে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল রাশিয়ান মেয়ে কেটিয়া, 'মাই ডিয়ার দীননাথ (ওর উচ্চারণে অবশ্য দীননাথ হয়ে গেছিল ডিনোন্যাট), খেয়াল রাখবেন, যিশুখ্রিস্ট জন্মাবার ১৬০০ বছর আগে যে জাহাজ ডুবেছিল সাগরের তলায়, আপনি পা দিতে চলেছেন সেই জাহাজে।'

'থেরা আগ্নেয়গিরির উৎপাতের জন্যে নিশ্চয়?' আমার প্রশ্ন।

'অবশ্যই। নইলে আস্ত একটা জাহাজ তলিয়ে যাবে কেন?'

'দীননাথ,' আস্তে বলেছিলেন প্রফেসর, 'কেটিয়া ঠিকই আঁচ করেছে। ডুবেছে আগ্নেয়গিরির উৎপাতে, তাই প্রায় আস্ত অবস্থায় ডুবে রয়েছে আজও— এত বছর পরেও। নিশ্চয় আচমকা জলোচ্ছ্বাস সামলাতে পারেনি। সুনামির তেজ যে কী ভয়ানক, তা তো এই সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সুমাত্রা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত সব্বাই। কেটিয়া, জলের কতটা নীচে রয়েছে সেকালের জাহাজটা?'

'প্রায় সত্তর মিটার। সিধে ডুবে গেছে। পাহাড় চুড়োর গা দিয়ে।'

প্রফেসর বললেন, 'আস্ত অবস্থায় যখন ডুবেছে, তখন ভলক্যানো ফেটে পড়ার আগেই ডুবেছে। নিশ্চয় ভয়ানক ভূমিকম্প জল তোলপাড় করেছিল, সুনামির ঢেউ তেড়ে এসেছিল, গিলে খেয়েছে গোটা জাহাজটাকে।'

কেটিয়া বললে, "আপনি, স্যার, ধরে ফেলেছেন। ভলক্যানো যদি ফেটে পড়ত, আশপাশের মাইলের পর মাইল ধ্বংস হয়ে যেত— জাহাজ ছাতু হয়ে যেত। কয়েকশো সুনামির ধাক্কা কম নয়। প্রথমটার ধাক্কাতেই জাহাজ ডুবেছে।'

'সিকোয়েস্ট' জাহাজটা মামুলি জাহাজ নয়— ডুবোজাহাজ। সাগরের তলায় অভিযান চালানোর উপযোগী করে বানানো। সাগরতলে নেমে গিয়ে যাতে দুলে দুলে না-যায়, তাই ব্যালান্স ট্যাঙ্ক থেকে অটোমেটিক পন্থায় জল বেরিয়ে গিয়ে সাবমেরিনকে সিধে রেখে দেয়।

ডুবোজাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে নিজেকে যখন বেশ রোমাঞ্চিত বোধ করছি, ঠিক তখনই প্রফেসর আমার কাঁধে হাত রেখেছিলেন।

বলেছিলেন, 'ওরা খবর পেয়ে গেছে।'

'কারা?'

'প্রত্নসম্পদ বোম্বেটেরা।'

'কী করে বুঝলেন?'

প্রফেসর মুখে কথা না-বলে আঙুল তুলে দিগন্ত দেখালেন। কয়েক কিলোমিটার দূরে পৈশাচিক আকৃতির একটা জাহাজ স্থির হয়ে ভাসছে।

এত গোপনে অভিযানে বেরিয়েও খবর বেরিয়ে গেল? এসে গেল এ-যুগের বোম্বেটেরা? এত তাড়াতাড়ি?

আশ্চর্য নয়। স্যাটেলাইটের যুগে খবর চালাচালি হয় নিমেষে নিমেষে। চার হাজার কিলোমিটার ওপরের কক্ষপথ থেকে দেখা হয়ে গেছে জাহাজ ডুবে রয়েছে ঠিক কোন জায়গাটায়।

চলে এসেছে ভূমধ্যসাগরে। দেখেছে 'সিকোয়েস্ট' ডুবোজাহাজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিনের পর দিন— একই জায়গায়।

উদ্দেশ্যটা কী তা আঁচ করে নিয়েছে।

প্রফেসরের মুখে এই প্রথম দুশ্চিন্তার রেখা দেখলাম।

বোম্বেটে বিভীষিকা এমনই জিনিস।

(১১) বোম্বেটে জাহাজ 'শকুনি'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র ভীরু নন, কিন্তু বিচক্ষণ। আন্তর্জাতিক সমুদ্রে খুনে জাহাজ মানেই উৎপাত। প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি। তার চাইতেও বড় কথা, জলের তলায় ডুবে থাকা জাহাজটাই যে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। হারিয়ে যাওয়া দ্বীপ দেশ আটলান্টিস-এর প্রত্নসম্পদ চলে তো যাবেই বোম্বেটের হাতে, যেতে পারে নিজেদের প্রাণগুলোও।

তাই তিনি হঠকারিতার মধ্যে গেলেন না। বোম্বেটে হোক কি ফোম্বেটে হোক, বাছাধনদের বজ্জাতি ছুটিয়ে দেওয়ার জন্যে লম্ফঝম্প শুরু করেছিলাম। এক দাবড়ানি দিয়ে প্রফেসর আমাকে নিভিয়ে দিলেন।

সোজা চলে গেলেন 'সিকোয়েস্ট' ডুবোজাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে। তাঁকে ক্যাপ্টেনই বলা যাক। এই অভিযানের ভারপ্রাপ্ত নায়ক তিনি। যেতে যেতে দেখলাম কামান-টামান সাজানো হচ্ছে জাহাজের ডেকে। ডুবোজাহাজের ওপর যা দেখা যায় না। কিন্তু যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাবমেরিন এখন হয়ে যাচ্ছে লড়াকু জাহাজ। বোম্বেটে জাহাজের সঙ্গে টক্কর দিতে গেলে যা যা দরকার, সব দেখলাম ডেকে।

ঢুকলাম ক্যাপ্টেনের ঘরে। তিনি গুম হয়ে বসে ছিলেন একটা আশ্চর্য সুন্দর পাথরের ষাঁড়-মূর্তির সামনে।

পরিচয় পর্ব সাঙ্গ হতে না হতেই প্রফেসর চলে এলেন বৃষ বৃত্তান্তে। জিজ্ঞেস করে জানলেন, জলতলে ডুবে থাকা জাহাজ থেকে তুলে আনা হয়েছে পাথরের এই ষাঁড় মহাশয়কে। দেখলে ভক্তি হয়, ভয় হয়, সেই সঙ্গে চোখ ঠিকরে যায়। কেননা, তার বপু নির্মিত হয়েছে মিশরের কালো পাথর দিয়ে, চোখে বসানো আফগানিস্তানের মণিপাথর, শিং খাঁটি সোনার— তাতে ভারতীয় পান্না চুনির কারুকাজ। এমন জিনিস দেখলে থ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়।

আমিও গেছিলাম। কেটিয়া মেয়েটাও দেখলাম গোল গোল চোখে তাকিয়ে আছে সোনা আর জহর দিয়ে খোদাই করা মিশকালো ষণ্ড মহাশয়ের দিকে। মেয়েদের যা স্বভাব। যতই আপটুডেট হোক না কেন, সোনা মণিমানিক দেখলে ঝুঁকে পড়বেই।

তবে হ্যাঁ, তারিফ করার মতো একটা শিল্পসামগ্রী বটে। হাজার হাজার বছর তলিয়ে ছিল সাগরতলে, এখনও তার চাকচিক্য আর চোখ ধাঁধানো দ্যুতি অম্লান।

প্রফেসর কিন্তু বিলক্ষণ বেরসিক এই ব্যাপারে। বৈজ্ঞানিকরা এই রকমই হয়। নীরস। কাঠখোট্টা। আশপাশে ছড়ানো ডজনখানেক প্রত্নসম্পদের দিকেও চেয়ে দেখলেন না। পরে শুনেছিলাম, গত দু'দিন ধরে জলে লোক নামিয়ে এদের তুলে আনা হয়েছে সলিল সমাধি থেকে। মিনোয়ান জাহাজে অন্দরে কন্দরে এখনও রয়ে গেছে বিপুল প্রত্ন সামগ্রী। কিন্তু মিটার খানেক উঁচু এই মিশকালো ষণ্ড মহাশয় যেন তাদের টেক্কা মেরে দেবে একাই।

'পিকাসো যদি বেঁচে থাকতেন। চমকে উঠতেন,' আপন মনে বলে গেছিল কেটিয়া, 'বিউটিফুল।'

আমার মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেছিল জাহাজময় থমথমে অবস্থা দেখে। এমন একটা

জিনিস, সেই সঙ্গে আরও অনেক চোখ ধাঁধানো প্রত্নসামগ্রী আর শিল্প নিদর্শন শেষকালে কিনা লুঠে নিয়ে যাবে সাগর ডাকাতরা! এ-যুগের সাগর বোম্বেটেরা অত্যাধুনিক অস্ত্রচালনায় পোক্ত। ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে মারবে দূর থেকে, লেসার নিয়ন্ত্রিত মিসাইল চক্ষের পলকে উড়িয়ে দেবে এই সাবমেরিন।

অরাজকতা তো এখন শুধু জমিতে জমিতে সীমিত নয়, নেমে এসেছে সাগরের জলেও। নতুন ধরনের এই বোম্বেটেগিরি কাঁপিয়ে যাচ্ছে গোটা দুনিয়াকে।

আমরা এসে পড়েছি এদেরই খপ্পরে— নাগালের মধ্যে। অকুতোভয় প্রফেসর সটান গিয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেনের সামনে।

কাঠ কাঠ গলায় বললেন, 'আপনিই ক্যাপ্টেন টম ইয়র্ক?'

'আজ্ঞে।'

'বোম্বেটে ব্যাটাচ্ছেলের নাম কী?'

'আসলান।'

এইবার চমকে উঠতে দেখলাম কেটিয়াকে। এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে ছিল মণিমানিক সোনা বসানো কালো পাথরের ষাঁড়ের দিকে। আচমকা ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেনের দিকে— 'আসলান?'

পরে জেনেছিলাম, ক্যাপ্টেন লোকটা খাঁটি ইংরেজ। জবরদস্ত পুরুষ। কিন্তু এতক্ষণ যেন ভয়ে কেঁচো হয়ে বসে ছিলেন একটা দুদিকে কথা চালাচালি করার রেডিয়ো সামনে নিয়ে। কেটিয়ার চমকে ওঠা দেখেই পাংশু মুখ তুলে বললেন, 'চেনেন নাকি?'

শক্ত মুখে বললে কেটিয়া, 'চিনি। আসলান মানে কী জানেন? সিংহ। আসলান তাই যুদ্ধবাজ। দাঙ্গাবাজ। আরও জঘন্য।'

টেবিলের ওপর দিয়ে একটা ফটো এগিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'অতীতের ক্যাপ্টেন কিড বলতে পারেন। এই তার ছবি। কাজাকস্তানে জন্ম।'

'এ ছবি পেলেন কোত্থেকে?' কেটিয়ার প্রশ্ন।

'লন্ডনের একটা প্রেস এজেন্সি কয়েক মিনিট আগেই পাঠিয়েছে আই এম ইউ করে।'

ছবিতে দেখা যাচ্ছে আরবি পোশাক পরা বেশ কয়েকটা জোয়ান ভিড় করে রয়েছে একটা পাহাড়ি জায়গায়। খাদের মধ্যে। হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র— যার নাম কালাশনিকভ। সামনে স্তূপাকারে রয়েছে সোভিয়েত আমলের বিস্তর অস্ত্র— হেভি ক্যালিবার মেশিনগান থেকে আরম্ভ করে অত্যাধুনিক কামান— যার নাম আর পি জি লঞ্চার।

আফগানিস্তানে যখন মুজাহিদিন হাঙ্গামা আরম্ভ হয়েছিল, এইসব অস্ত্র তখন সেখানে কেরামতি দেখিয়েছে। অস্ত্র স্তূপ তাই নজর কাড়ছে না। চোখ টানছে যে মূর্তিটার দিকে, সে বসে রয়েছে এই সবের সামনে। বিশালাকার মূর্তি, দেখলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দু'হাতে হাঁটু পাকড়ে ধরে থাকায় কনুই দুটো ঠেলে রয়েছে বাইরের দিকে। বেপরোয়া ভঙ্গি, মায় দুনিয়ার কাউকে পরোয়া না-করার পোজ দিয়ে। পরনে খাকি ড্রেস। তার ওপর চাপিয়েছে সাদা বেদুইন আলখাল্লা। মাথায় টাইট টুপি। পাকানো গোঁফের প্রান্ত দেখা যাচ্ছে মুখের দু'পাশে মোষের শিঙের মতো, মুখমণ্ডলে সৌষ্ঠব ছিল একদা— এখন সেখানে ফুটে

উঠেছে পৈশাচিক নির্মমতা। নাক গরুড় পাখির ঠোঁটের মতো বেঁকানো। হনু উঁচু— মধ্য এশিয়ায় যাযাবরদের মুখে যেমনটা দেখা যায়। কোটরে ঢোকানো চোখ দুটো কালো কুচকুচে আর মর্মভেদী। সব মিলিয়ে একটা মূর্তিমান বর্বরতা, শিহরন জাগানো আকৃতি।

খুব আস্তে বললেন ক্যাপ্টেন, 'আসলানার আসল নাম পিয়েত্রে আলেকজান্দ্রোভিচ নাজারবেটভ। বাবা মঙ্গোলিয়ান, মা কিরখিস্তান-এর মেয়ে। ঘাঁটি কাজাকস্তান-এ— কিন্তু দখল রেখেছে ব্ল্যাক সি'র আবকাজিয়া-য় যে দেশটা বেরিয়ে এসেছে জর্জিয়ান রিপাবলিক থেকে। আগে ছিলেন সোভিয়েতের এক বিদ্বান ব্যক্তি, বিশকেক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর— সাবজেক্ট, শিল্প ইতিহাস। বিশ্বাস করতে মন চায় না, তাই না? এখন জলদস্যু। অদ্ভুত।'

কেটিয়া যে এই ব্যাপারটায় সবজান্তা, আমার তা জানা ছিল না। প্রফেসর কেন ওকে দলে টেনেছেন, একটু একটু করে তা বুঝছি। ক্যাপ্টেনের আত্মগত বকুনি শেষ হতে না হতেই বলে গেল কেটিয়া চোস্ত ইংরেজিতে, 'পৃথিবীর এই জায়গাটায় ক্রাইম চালিয়ে গেলে প্রফিট যখন অনেক বেশি, তখন বিদ্বান বদমাশরা আসবে না কেন? বিশেষ করে আসবে শিল্পসামগ্রীর ইতিহাস যাদের নখদর্পণে। তারা।

'কাজাকস্তানের অবস্থা তো ভাল নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ধসে পড়ার পর স্বাধীন হয়েছে কাজাকস্তান। কিন্তু সরকার চালাচ্ছে আগেকার কমুনিস্ট কর্তা। গণতন্ত্র সেখানে একটা প্রহসন, দুর্নীতি চূড়ান্ত। তেল আছে প্রচুর, বিদেশি বিনিয়োগও অনেক, তা সত্ত্বেও গোল্লায় গেছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। গণবিক্ষোভ দেখা দিতেই ঢুকে পড়েছিল রাশিয়ান আর্মি, রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। জাতীয় শক্তি দুর্বল, গোটা মুলুক জুড়ে অরাজকতা।'

কেটিয়া এত জানে! আমি যখন অবাক, ক্যাপ্টেন তখন সপ্রশংস চোখে শুধু বললেন, 'যুদ্ধবাজদের পোয়াবারো সেই কারণেই।'

চালিয়ে গেল কেটিয়া, 'স্বাভাবিক। একদা যারা লড়ে গেছিল রাশিয়ানদের সঙ্গে, এখন তারা লড়ে মরছে নিজেদের মধ্যে। লড়াই, লড়াই, লড়াই। ভ্যাকুয়াম কি থাকে? আগে ছিল আদর্শবাদী, এখন এসেছে ঠগ আর তারা— যারা ধর্ম নিয়ে উন্মাদ। দেশ জুড়ে চলছে নিষ্ঠুর খুনোখুনি আর লুঠপাট। প্রত্যেকের এলাকা আলাদা— মধ্যযুগের ব্যারনদের মতো। পুষছে নিজের নিজের সৈন্যবাহিনী, ফুলে লাল হচ্ছে ড্রাগ আর অস্ত্রপাচারের কারবারে।'

ক্যাপ্টেনের চোয়াল ঝুলে পড়েছিল ছিপছিপে একটা মেয়ের লেকচার শুনে। ঢোঁক গিলে বললেন, 'আফিং আর হিরোইন উৎপাদনে এখন নাকি এক নম্বর দেশ এই কাজাকস্তান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। যে লোকটার ছবি সামনে নিয়ে বসে আছেন সে এই কারবারের এক নম্বর চাঁই। শিক্ষাদীক্ষা আছে বলে সাংবাদিকদের তোয়াজ করতে জানে, শিল্পসামগ্রী জোগাড় করতে জানে, চড়া দামে বিক্রি করতেও জানে। তার চেয়েও বড় কথা কী জানেন?' সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বললে কেটিয়া, 'আসলান মানুষ খুন করে বড় মজা পায়। মার্ডারাস সাইকোপ্যাথ। সেইসঙ্গে, ফান্ড সাপ্লাই করে টেররিস্টদের।'

মুখ খুললেন প্রফেসর, 'এ তল্লাটে এল কবে?'

'আপনাদের খবর দেওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা আগে,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন।

বুঝলাম। পাঁকে পড়েছে বলেই শরণ নেওয়া হয়েছে প্রফেসরের।

কেটিয়া বললে, 'তারপর থেকে কি একই জায়গায় সাবমেরিন রেখেছেন? ডোবা জাহাজের ওপরে?'

চোখা প্রশ্ন। থমকে গেলেন ক্যাপ্টেন।

বললেন, 'না। দু'মাইল তফাতে চলে এসেছি।'

ক্যাপ্টেন বলেছিলেন নটিক্যাল মাইল। অর্থাৎ, নৌ-মাইল। বাঙালি পাঠকের বোঝবার সুবিধের জন্য সংলাপ সড়গড় রেখেছিলাম।

কেটিয়া কপাল কুঁচকে বললে, 'ডোবা জাহাজে চোখ রাখার ব্যবস্থা রেখেছেন তো? তফাতে এসেও?'

এই প্রথম তারিফ লক্ষ করলাম ক্যাপ্টেন মহাশয়ের চোখে। কেটিয়া মেয়ে বলে এতক্ষণ পাত্তা দেননি। এবার মুখের ভাব পালটে গেল।

বললেন, 'রেখেছি। বাব্‌ল-মাইন দিয়ে। মানে জানেন?'

ঠোক্করটার জবাব ঠোক্কর দিয়েই দিয়ে গেল কেটিয়া, 'পিঙপঙ বলের মতো খুদে খুদে ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর। ডুবুরি আর ডুবে থাকা কিছুর মধ্যে তফাতটা ধরে দেয়।'

পয়েন্টে চলে এলেন প্রফেসর, 'এখন কী করবেন ঠিক করেছেন?'

মুখ কালো করে জবাবটা দিলেন ক্যাপ্টেন, 'হুমকি এসেছে একটু আগেই। ই-মেলের। 'ভালচার' এর হুকুম— সময় বেঁধে দিয়েছে। তার মধ্যেই সরে পড়তে হবে। নইলে সাবমেরিন উড়িয়ে দেবে।'

মুখের কথা শেষ হতে না হতেই একটা শনশন শব্দ কানে ভেসে এল। যেন একটা জেট প্লেন উড়ে গেল বাতাস ফাটিয়ে দিয়ে। পরক্ষণেই সাগরের জল উথলে উঠে ভাসিয়ে দিয়ে গেল সাবমেরিনের ডেক।

বুঝলাম। এ যুগের কামানের গোলা, অথবা মর্ডান মিসাইল থেকে, এক চুলের জন্যে বেঁচে গেল সাবমেরিন।

সঙ্গে সঙ্গে মুখর হল রেডিয়ো— যে-রেডিয়ো কথা পাঠায়, কথা এনে দেয়। ক্যাপ্টেন বললেন তিরিক্ষে গলায়, 'সিকোয়েস্ট থেকে ক্যাপ্টেন টম ইয়র্ক বলছি। আপনার মতলবটা কী?'

জবাবটা এল তৎক্ষণাৎ— 'ভালচার বলছি। গুড আফটার নুন, ক্যাপ্টেন। হুঁশিয়ার করলাম।'

রেডিয়ো বন্ধ করে দিলেন ক্যাপ্টেন। মুখ থমথমে।

প্রফেসর নির্বিকার, 'লড়বেন, না, পালাবেন?'

'লড়ব। আমি ইংরেজের বাচ্চা। পালাই না।'

তাই বটে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতা দেখা গেল জাহাজময়। ছিল গবেষণা জাহাজ, হয়ে গেল যুদ্ধজাহাজ। ডেক হাউসে বেরিয়ে এল বিমান বিধ্বংসী কামান। ফ্লাইং সসারের মতো দেখতে অদ্ভুত একটা উড়োজাহাজের মধ্যে তুলে দেওয়া হল কালো পাথরের সেই ষাঁড়, সেই সঙ্গে জলের তলা থেকে তুলে আনা আরও প্রত্নসামগ্রী—

প্রত্যেকটাই এক-একটা রত্ন— বোঝনদারদের কাছে। ক্যাপ্টেন লোকটা দেখলাম বেশ চৌখস। লড়াইয়ের জন্যে তৈরি, কিন্তু হুঁশিয়ার।

প্রফেসর এহেন যুদ্ধকালীন তৎপরতার মধ্যে আস্তে করে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইংরেজ ক্যাপ্টেনকে, 'সত্যিই লড়ে যাবেন নাকি?'

'কাছে এলে লড়ে যাব। তৈরি সে জন্যে। কিন্তু ওরা কাছে আসবে না।'

'কেন?'

'রাজনৈতিক কারণে। জাহাজ রয়েছে বিতর্কিত এলাকায়। জায়গাটা যে আদতে কার দখলে থাকা উচিত, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। এটা ডাঙা নয়, সমুদ্র। কার জল, কে মালিক? মাইল কয়েক পুবে রয়েছে কয়েকটা দ্বীপ। গ্রীক আর তুর্কি— এদের মধ্যে মন কষাকষি চলছে মালিকানা নিয়ে। যুদ্ধ লাগে লাগে অবস্থা। তুর্কিদের জানিয়ে দিয়েছি বোম্বেটে জাহাজ হানা দিয়েছে। কিন্তু পলিটিক্যাল কারণে কেউ মাথা ঘামাতে চাইছে না।'

'গরজ তা হলে আমাদেরই?' বলেছিলেন প্রফেসর।

'অবশ্যই। আমি ক্যাপ্টেন। আমার জাহাজের নিরাপত্তা দেখতে হবে আমাকেই।'

'আলাপ আলোচনা চালালেই তো হয়— গোলাগুলির দরকার কী?'

'বৃথা চেষ্টা। এরা স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। শত্রুনিপাত এদের একমাত্র লক্ষ্য।'

মুখ খুলল কেটিয়া, 'দূত পাঠিয়ে কথা বলা যেতে পারে।'

'যে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে শেকলে বাঁধবে। তারপর দর কষাকষি করবে। আমার কোনও লোককে যমের মুখে পাঠাব না।'

'আমাকে পাঠাতে পারেন।'

দুই চোখ ছোট করে ফেললেন ক্যাপ্টেন, 'আপনি?'

'মেয়ে বলে তাচ্ছিল্য করছেন?'

'না... ইয়ে— আসলান যে কতখানি নিষ্ঠুর, আপনি জানেন না।'

'আপনার চাইতে বেশি জানি,' কেটিয়ার মুখ যেন বুলেট বর্ষণ করে গেল, 'কিন্তু আমি কোনও দলে নেই। নিরপেক্ষ। আমি রাশিয়ার মেয়ে। আমাকে খাঁচায় পুরে টর্চার চালালে আসলানকে জবাবদিহি করতে হবে রাশিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে। তা ছাড়া, একটু থেমে গলা শক্ত করে বলে গেল কেটিয়া, 'এরা বদলোক হতে পারে, কিন্তু মেয়েদের সম্মান দেয়। তা ছাড়া, আমি যে ফ্যামিলির মেয়ে, সেই ফ্যামিলির নামডাক আছে, নানা মহলে চাপ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। কয়েকটা নাম বললেই আসলানের মুখ শুকিয়ে যাবে।'

ইংরেজ ক্যাপ্টেনকে মিষ্টি মিষ্টি জুতিয়ে গিয়ে দুই চোখে কৌতুক বিছিয়ে শুধু চেয়ে রইল কেটিয়া। ক্যাপ্টেনের মুখে কথাট ফুটল না বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর বললেন, 'তা হলে যান।'

(১২) টেররিস্ট সম্রাটের সামনে কেটিয়া

দূরবিনের মধ্যে দিয়ে দুশমন আসলান-এর জাহাজের দিকে তাকিয়ে আমার মতো ডানপিটেরও মুখ শুকিয়ে গেছিল। জাহাজের গায়ে ইংরেজিতে লেখা 'ভালচারা', আমি তার বাংলা নাম করেছি শকুনি। শকুনিই বটে। সাত সাগরে ছোঁ মেরে বেড়ায়। জাহাজ লুঠ করে। তারপর ডুবিয়ে দেয়। কেটিয়ার কাছেই পরে শুনেছিলাম, আসলান টাকার কুমির হয়েও নিজে তা ভোগ করে না। দুনিয়া জুড়ে এই যে টেররিস্ট আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, নিউইয়র্কের বাড়ি ভেঙে পড়ছে, দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে— এদের টাকাপয়সার বেশির ভাগটাই জুটিয়ে যাচ্ছে তেলের দেশের ধনকুবেররা। আসলানও মেতেছে এই কাজে। পাপের পথে টাকা কামিয়ে পাপের কাজে ঢেলে দিচ্ছে। আসলান তাই মূর্তিমান আতঙ্ক। সাগরের তলায় সোনার শহর আটলান্টিস দখলের জন্যে সে জান দিয়ে লড়ে যাবে। তারপর কল্পনাতীত সোনা ছড়িয়ে যাবে দেশে দেশে— সন্ত্রাস চরমে উঠবে। খলনায়ক এহেন আসলানের খপ্পরে পড়তে চলেছে কেটিয়া চোখের পাতা একটুও না-কাঁপিয়ে। এ-মেয়ে যদি ইন্ডিয়ায় জন্মাত, তা হলে এর নামকরণ হত চিত্রাঙ্গদা।

আমি ওকে সেই নাম দিয়েছিলাম পরে। অবিশ্বাস্য এই কাহিনির সমাপ্তি ঘটে গেলে। কিন্তু... আবার সেই দোষ... পরের কথা আগে বলে ফেলছি। ঝানু লেখক তো নই।

কেটিয়া ফিরে আসবার আগেই দেখেছিলাম দূরবিনের মধ্যে দিয়ে শকুনি জাহাজ চলমান হয়েছে। দিগন্তের কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

তারপর হাসিমুখে লম্বা চুল দুলিয়ে কেটিয়া উঠে এসেছিল আমাদের ডুবোজাহাজের ডেকে। বড় বড় চোখে ইংরেজ ক্যাপ্টেন যখন চেয়েছিলেন বাকরহিত অবস্থায়, আমার অবস্থাও হয়েছিল তথৈবচ, তখন প্রফেসর তাকে স্বাগতম জানিয়ে হাসিমুখে শুধু বলেছিলেন, 'কেটিয়া জিন্দাবাদ।'

আমিও বলেছিলাম, 'জিন্দাবাদ।' তারপর অবশ্য বলেছিলাম, 'কেটিয়া, তুমি কী মন্ত্র ছেড়ে এলে?'

'ভয়ের মন্ত্র,' চোখ নাচিয়ে হেসেছিল রাশিয়ান মেয়ে।

আপদ তাড়িয়ে দেওয়ার পরেই তোড়জোড় শুরু হয়েছিল এই জাহাজে। এই সময়ে একখানা ম্যাপ বের করেছিলেন প্রফেসর।

আটলান্টিসের ম্যাপ।

দশ লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবীর ম্যাপ।

ইংরেজ ক্যাপ্টেন টম ইয়র্ক যখন কেটিয়াকে খাতির করে চলেছেন, তখন আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রফেসর বলেছিলেন, 'দীননাথ, আসলান অকারণে আসেনি, সে একেবারে চম্পট দিয়েছে, এমনটাও ভেবো না। সোনার শহর আটলান্টিস যে এখানেই জলের তলায় রয়েছে, এ-খবর যখন সে পেয়েছে, তখন এত সহজে হাল ছাড়বে না, তক্কে তক্কে থাকবে। তার ডুবোজাহাজ নেই। আমাদের আছে। আমরা আটলান্টিসকে খুঁজে বের

করব, ও তা লুটে নেবে। প্রত্নসামগ্রী দরে অনেক, তার চেয়েও অনেক দামি আটলান্টিসের সোনা। ঘুঘু আসলান তাই তক্কে তক্কে আছে। বিশেষ করে আমি এসেছি, কেটিয়ার মুখে জানতে পেরে। তুমি তো জানো, আমি যেখানে যাই, সেখান থেকে জিতে ফিরি। তোমার অখাদ্য অনেক লেখায় সেসব কথা কিছু কিছু লিখেছ। এবার লিখো আটলান্টিসের কাহিনি। আটলান্টিস সত্যি ছিল। আমার হলোস্কোপ সে প্রমাণ আমাকে দিয়েছে।'

একটানা এতক্ষণ কথা বলে উনি হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আমি কিন্তু থ হয়ে গেছিলাম। বলছেন কী উনি? আটলান্টিসের ম্যাপ? মিনমিন করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কত বছর আগে ছিল আটলান্টিস?'

'দশ লক্ষ বছর আগে।'

'বলেন কী!'

'অন্নদাশঙ্কর রায় রামায়ণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, সত্যযুগে রাম যদি সত্যিই থাকতেন, তা হলে সেটা তো ন'লক্ষ বছর আগেকার কথা। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। আমি তখন আটলান্টিস সত্যিই ছিল কিনা জানবার জন্যে একখানা বই পড়েছিলাম। থিয়সফিস্ট ডব্লিউ স্কট-ইলিয়টের লেখা বই। নাম, 'দ্য স্টোরি অফ আটলান্টিস'। সেই বইতেই দেখলাম, দশ লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবীর একটা ম্যাপ। তখন যে সব ডাঙা ছিল জলের ওপর, এখন সেসব জলের তলায়।'

বলে, পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা ম্যাপ খুলে দেখালেন প্রফেসর।

ম্যাপ দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল। বলেছিলাম, 'বিশ্বাস হয়নি বলেই আপনার হরোস্কোপ দিয়ে যাচাই করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। অতীতকে তুলে ধরেছিল হরোস্কোপ, জিনিস একখানা বানিয়েছিলাম বটে। ম্যাপখানা বর্ণে বর্ণে সত্যি। আটলান্টিস রয়েছে আমাদেব পায়ের তলায়।'

আমি আর কথা বলতে পারিনি।

(১৩) গুপ্তধনের নকশা

আমি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়েছিলাম আশ্চর্য মানচিত্রের দিকে। ধরণী যখন তরুণী ছিল, তখনকার ম্যাপ। উদ্দাম নৃত্য নেচে নেচে গিয়ে জলভাগ আর স্থলভাগকে সরিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। ডাঙা তলিয়ে গেছে। সমুদ্র সেখানে ফুঁসে উঠেছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূলেও অনেকটা এখন জলের তলায়। বহুকাল আগে ছিল জলের ওপর। আটলান্টিসও ছিল যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে, সেখানেও চলেছে ভাঙাগড়ার খেলা। আমি দাঁড়িয়ে আছি কিংবদন্তির স্বর্ণশহর আটলান্টিসের ওপর। ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। রাবণের লঙ্কা নাকি একটা সেই আটলান্টিসের একটা ভাঙা টুকরো।

প্রফেসর আমার মুখের অবস্থা দেখছিলেন। নিশ্চয় মজা পাচ্ছিলেন। আমাকে নিয়ে মজা করে উনি আনন্দ পান, আমার তা অজানা নয়। তাই আমি যখন ঢোক গিলে বলেছিলাম,

'দশ লাখ বছর আগেকার ম্যাপ। বিজ্ঞান যে মানবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে উনি খেপে গেলেন।

বললেন, 'বৎস দীননাথ। বিজ্ঞান এখন কপাল ঠুকে যাচ্ছে অতীন্দ্রিয়বাদের চৌকাঠে। তোমরা যাকে মিসটিসিজম বলো, বিজ্ঞান সেখানে হন্যে হয়ে ঘুরছে আরও কিছু জানবার মতলবে। গভীর গবেষণা চলছে এই নিয়ে। আইনস্টাইন কি সাধে বলেছিলেন, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম হয় না, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান হয় না। অতীন্দ্রিয়বাদ, মিসটিসিজম একটা বিজ্ঞান। দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে আমি হলোস্কোপ বানাতে পেরেছি বলেই পেয়েছি দশ লাখ বছর আগেকার পৃথিবীর মানচিত্র। পেয়েছি আটলাখ বছর আগেকারও একখানা ম্যাপ।'

বিষম চমকে বলেছিলাম, 'আর একটা ম্যাপ?'

'আট লাখ বছর আগেকার। এই দ্যাখো। আটলান্টিসের অনেকখানি তলিয়ে গেছে— দর্পচূর্ণ করার জন্যেই যেন এই ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরির প্রলয়... বেশি বাড়লেই এই অবস্থা হয়।'

আমি যখন চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছি আট লাখ বছর আগেকার ম্যাপের দিকে, কেটিয়া ঢুকেছিল ঘরে। ম্যাপ দু'খানার দিকে তন্ময় হয়ে চেয়েছিল ততক্ষণ, যতক্ষণ প্রফেসর জ্ঞান দিয়ে গেছিলেন তার কানের গোড়ায়। আমি আকাট মূর্খ বলে চোখ ছানাবড়া করে ফেলেছিলাম, কেটিয়া কিন্তু তারিফজাগা চোখে ম্যাপ দেখতে দেখতে আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করে প্রফেসরের পেট থেকে হলোস্কোপ-এর গুপ্তরহস্য সব বের করে নিয়েছিল।

তারপর অবশ্য বলেছিল, 'হরস্কোপ যেমন জ্যোতিষীদের বাকতাল্লা বলে উড়িয়ে দেয় এ-যুগের অল্পজ্ঞানী স্থূলবিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরা, সূক্ষ্মবিজ্ঞানের বিন্দুবিসর্গ বোঝে না বলে, বোঝার ক্ষমতা নেই বলে, আপনার এই হলোস্কোপও তাদের কাছে তেমনি একটা গাঁজা গুলপট্টি ছাড়া কিছু মনে হবে না। সুতরাং ব্যাপারটা আর পাঁচকান করবেন না। যা রটে, তা কিছু বটে। আটলান্টিস ছিল, আজও আছে— তবে জলের তলায়। প্লেটো আহাম্মক ছিলেন না। মহাজ্ঞানী বলেই আহাম্মকদের কাছে পাছে হাস্যাস্পদ হতে হয়, তাই গল্প হলেও সত্যি ধাঁচে অতীতকে লিপিবদ্ধ করে ছেড়ে দিয়েছেন। আপনার মুখেই শুনেছি, স্বামী বিবেকানন্দ ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে স্বপ্নে অতীতের জ্ঞানের আভাস পেয়েছিলেন।'

বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল কেটিয়া। ডাকাবুকো হলেও বড় ভাবালু মেয়ে। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে সাগরের দিকে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। প্রফেসর মুখে চাবি দিয়েছিলেন। আমি একটু বেশি কথা বলি বলে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম, 'কেটিয়া, হঠাৎ এই ভাবান্তর কেন জানতে পারি?'

কেটিয়া বলেছিল, 'ক্রীট দ্বীপের অতীত যে জ্ঞানসমৃদ্ধ, স্বামীজি স্বপ্নের মধ্যে সেই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। বাস্তবিকই তাই। ব্রোঞ্জ যুগের ক্রীট ভাষায় কথা বলে গেছে প্রথম নবপ্রস্তর যুগের মানুষ— অনেক আগেই। দ্বীপে আসবার পর। যাক সেকথা। আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছিলাম। একটা সোনার চাকতি দেখে এলাম অ্যামফোরা কলসির মধ্যে। জলে ডোবা জাহাজ থেকে তুলে এনেছে ডুবুরিয়া।'

'সোনার চাকতি? গায়ে কিছু খোদাই করা আছে?'

‘একটা অদ্ভুত প্যাটার্নের ইংরেজি অক্ষরের মতো নকশা।’

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন প্রফেসর, ‘আটলান্টিসের প্রতীক।’

‘ঠিক তাই। আটলান্টিস রয়েছে পায়ের তলায়।’

‘চাকতিটা কোথায়?’

‘আসুন আমার সঙ্গে। রয়েছে ক্যাপ্টেনের হেপাজতে। উনি হাতছাড়া করছেন না। কিন্তু আপনাকে দেখাবেন।’

আমরা তিনজনে হানা দিয়েছিলাম ক্যাপ্টেনের কেবিনে। জলে ডোবা ভাঙা জাহাজ থেকে তোলা একটা অ্যামফোরা, মানে লম্বাটে কলসির পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় এক হাতের একটা সোনার চাকতি উনি কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে সাফ করছিলেন।

প্রফেসর ঘরে ঢুকতেই মুখে কোনও কথা না-বলে আলোর তলায় মেলে ধরলেন বস্তুটা। আলো ঠিকরে গেল খাঁটি সোনা থেকে। নকশাটার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মিশরীয় ভাষাবিদ প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। স্ফুলিঙ্গ দেখলাম তাঁর দুই চক্ষু তারকায়।

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আমি আস্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘কী লেখা আছে চাকতিতে?’

উনি তন্ময় চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর পড়ে গেলেন নকশা ভাষা, ‘ষাঁড় প্রতীকের নীচে আছে ডানা মেলা ঈগল। তার পায়ের কাছে আছে সোনার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আটলান্টিস। পেল্লায় তোরণ। সোনার। মেলে থাকা ডানার দুই ডগা দিকনির্দেশ করছে সূর্য যেদিক দিয়ে ওঠে, আর যেদিক দিয়ে নামে। সূর্য যেদিক দিয়ে ওঠে, সেদিকে আগুন পাহাড়, ধাতুর পাহাড়। প্রধান পুরুতদের আস্তানা এইখানেই। শ্রোতাদের হলঘর এইখানেই। ওপরে আছে আটলান্টিস। দেবতাদের আস্তানা। জ্ঞানের খনি।’

আমি ওঁর আত্মগত বকুনির মাথা মুণ্ডু বুঝতে না-পেরে ফট করে বলে ফেলেছিলাম, ‘কীসের হেঁয়ালি, প্রফেসর?’

‘গুপ্তধন।’

(১৪) জলে ডোবা প্রাচীন শহর

প্রফেসরের সঙ্গে অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছি আমি, কিন্তু এভাবে চমকে চমকে উঠিনি কক্ষনও। অম্লানবদনে উনি যখন ‘গুপ্তধন’ শব্দটা মুখ দিয়ে বের করেছিলেন, তখন আমার পিলে পর্যন্ত চমকে উঠেছিল নিশ্চয়। কেটিয়া ফিক করে হেসে ফেলেছিল আমার মুখের চেহারা দেখে।

তাতে আমি যতটা না অপ্রস্তুত হয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি রেগে গেছিলাম। রাগটা আমার নিজের ওপর। এক ফোঁটা একটা মেয়ের সামনে এভাবে কখনও হাসির খোরাক হইনি।

কেটিয়া তা বুঝেছিল। বলেছিল, ‘মাই ডিয়ার দীননাথ, গুপ্তধনের নাম শুনেই যখন এই

অবস্থা আপনার, তখন জলের তলার দৃশ্য দেখলে তো ভিরমি খাবেন।'

আমি বীর বিক্রমে বলেছিলাম, 'আমার লাইফটা অ্যাডভেঞ্চারে ঠাসা। জলতলটা শুধু বাকি আছে।'

মুচকি হেসে প্রফেসর বলেছিলেন, 'তা বটে। কিন্তু কেটিয়া, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আরও খোশখবর আছে? সোনার চাকতি সব নয়?'

'নিশ্চয় নয়। ক্যাপ্টেন সাহেব আপনাদের নেমন্তন্ন জানিয়েছেন। সেটা জানাতেই এসেছি।'

'নেমন্তন্ন?'

'জলতলের দৃশ্য দেখার। এই জাহাজে বসে।'

এরপর যা-যা ঘটেছিল, আমি তা ছোট করে লিখে যাচ্ছি। কলমে বারবার কালি ফুরিয়ে যাচ্ছে লিখতে কষ্ট হচ্ছে।

আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটা বিশেষ ঘরে। একটা সাবমেরিনের মধ্যে এত গোলকধাঁধা থাকতে পারে আমার জানা ছিল না। এই ঘরটা কম্পিউটার যন্ত্রে ঠাসা। একটা দেওয়াল জুড়ে রয়েছে একটা মস্ত স্ক্রিন। তাতে দেখা যাচ্ছে জলের তলার দৃশ্য।

ক্যাপ্টেন আমার ছানাবড়া চোখ দেখেই বোধহয় একটু মুচকি হেসেছিলেন। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেছিলেন প্রফেসরের মুখচ্ছবি দেখে। উনি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন বিরাট স্ক্রিনে ফুটে ওঠা গভীর জলের দৃশ্যের দিকে। সে দৃশ্য স্থির নয়। সরে সরে যাচ্ছে। আকাশপথে বিমানযানে বসে যেমনটা দেখা যায় অনেক নীচের জমি বাড়িঘরদোরের সামনে থেকে এসে পেছনে মিলিয়ে যাওয়া— ঠিক সেইরকম। দেখা যাচ্ছে দূরবিস্তৃত টানা পাঁচিল, উঁচু উঁচু অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, পাহাড়— আরও অনেক কিছু। সমুদ্রতলের শ্যাওলা আর পাঁক পুরু হয়ে জমে থাকায় ওপর দিকগুলোই কেবল দেখা যাচ্ছে। এ কাদা আগ্নেয়ভস্মের, পরে জেনেছিলাম।

প্রফেসর মোটেই অবাক হননি। একঝলক তাকিয়ে নিয়েই বলেছিলেন ক্যাপ্টেনকে, 'গভীর সমুদ্রের রিসার্চ বোট-ও এনেছেন?'

ক্যাপ্টেন গোঁফে তা দিয়ে বলেছিলেন, 'নইলে এত অ্যামফোরা, ওই সোনার চাকতি পেলাম কী করে? নিছক ডুবুরি দিয়ে সব কাজ হয় না।'

'তা বটে' পলকহীন চোখে পরদার দিকে চেয়ে থেকে বললেন প্রফেসর, 'নীচে যা দেখছি, তার আন্দাজ বয়স?'

'সাগরতলের বয়সটা বলতে পারি। পঞ্চান্ন লক্ষ বছর।'

'মাই গড! ভূমধ্যসাগর যখন উবে যায়নি?'

'ইউ আর কারেক্ট। মেরু অঞ্চলের বরফ তখন ছেয়ে ছিল পৃথিবীর বেশিরভাগ সমুদ্র অঞ্চল। সমুদ্রতল ছিল অনেক নীচে। তারপর ভূমধ্যসাগর উবে যেতে শুরু করেছে। কাদা আর জলভূমি দেখা দিয়েছে।'

'কৃষ্ণসাগরের মতো?'

'তার চাইতেও বেশি। জল বেশি নোনতা হয়ে যাওয়ায় প্রাণের চিহ্ন মুছে গেছে। জীবাশ্ম

সংখ্যা এই কারণেই এত কম। মরুভূমি জেগেছে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে।'

'তারপর তো ফের জলে ভরেছে?'

'দু'লক্ষ বছর পরে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলবার পর। আটলান্টিকে তখন যে জল নেমেছিল জলপ্রপাতের মতো, তা ছিল নায়গ্রা জলপ্রপাতের একশোগুণ বেশি। জিব্রাল্টার অন্তরীপ কাটছাঁট হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল আজকের অবস্থায়।'

'কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে তার সম্পর্ক?'

'আটলান্টিকের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের যে সম্পর্ক, ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে কৃষ্ণসাগরের সেইরকমই সম্পর্ক। ভূমধ্যসাগরের জল নেমে যাওয়ায় যে ডাঙা সেতু জেগে উঠেছিল, কৃষ্ণসাগরকে আলাদা করে দিয়ে, তার ওপর দিয়েই আজকের মানুষ জাতটার পূর্বপুরুষরা গেছিল এশিয়া থেকে ইউরোপে।'

'কৃষ্ণসাগর কিন্তু অতটা শুকিয়ে যায়নি তিনটে নদীর জল এসে পড়ায়।' প্রফেসরের বক্তব্য।

'ঠিক। তাই টাটকা জলের বিরাট লেক হতে পেরেছিল কৃষ্ণসাগর। উর্বর হয়েছিল পুরো পুবদিক। জেগেছিল নতুন সভ্যতা।'

'আমিও তা বলি,' সায় দিয়ে গেলেন প্রফেসর, 'কৃষ্ণসাগরের জলে প্রত্নবিদ্‌রা যদি যান, অনেক বিস্ময় দেখতে পাবেন।'

বলতে বলতে থেমে গেলেন প্রফেসর। চোখের পাতা না-ফেলে চেয়ে রইলেন পরদার দিকে।

দেখা যাচ্ছে জলতলের নিচু নিচু বাড়ি— সারবন্দি। একটার ছাদ লেগে রয়েছে আর একটার ছাদে। ওপরের ঘর আর নীচের ঘরের মাঝে রয়েছে সিঁড়ি। দেওয়ালে দেওয়ালে কারুকাজ, সিংহ আর বাঘের মূর্তি। আগ্নেয় ছাইতে প্রায় ঢেকে যাওয়া অবস্থায়।

একদিকে দেখা যাচ্ছে মোষের শিঙের মতো একটা গড়ন— একটা বাড়ির ছাদে।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'যা দেখছেন, তা নবপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকের দৃশ্য। বাড়িতে বেদি রয়েছে। সেন্ট্রাল তুর্কিতে এরকম স্থাপত্য দেখা গেছে এখান থেকে প্রায় চারশো কিলোমিটার দক্ষিণে— খুব সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম শহর।'

(১৫) ডুবুরি নৌকোয় অভিযান

অ্যাকুয়াপড মানে যে ডুবুরি নৌকো, তা জেনেছিলাম ক্যাপ্টেন সাহেবের দৌলতে। বিজ্ঞান যে কতদূর এগিয়েছে, সেদিন তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। প্রফেসর তো অকুতোভয়। কেটিয়া নির্বিকার। আমার কিন্তু গা ছমছম করেছিল। ডাঙায় মস্তানি চলে, জলের তলায় চলে না। ডাঙার মানুষ জলে গেলে খাবি খায় চিরকাল। সেই জলতলেই শুরু হয়েছিল আমাদের পিলে চমকানো এই অ্যাডভেঞ্চার। সত্যি কথা বলতে লজ্জা নেই। রোমাঞ্চিত কলেবরে লিখে যাচ্ছি সেদিন অ্যাকুয়াবোট আমাদের যা-যা দেখিয়েছিল।

দু'পাশে যমজ ফ্লাডলাইটের আলোয় দিনের আলোয় দেখার মতোই দেখতে পাচ্ছিলাম সব কিছু। সাগরের তলার নিঃসীম আঁধারে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যা ছিল গুপ্ত, ছিল অজ্ঞাত রহস্যের ঘোমটায় ঢাকা, সেদিন ফ্লাডলাইটের তীব্র আলো তাদের প্রকট করে তুলেছিল আমাদের চোখের সামনে। সে আলো এতই জোরালো যে পাঁচ মিটার নীচে পর্যন্ত, প্রায় পনেরো ফুট নীচে যা কিছু আছে, সবই সুস্পষ্ট করে ধরেছিল চোখের সামনে। বিহ্বল বিস্ময়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখে গেছিলাম হেথায় সেথায় মাথা উঁচু পাহাড়। বাঁদিকে জলতল ঢালু হয়ে নেমে গেছে অতলস্পর্শী খাদের মধ্যে। জলের তলাতেও খাদ— পাহাড়ের পাশে পাশে। এমন দৃশ্য যে দেখতে হবে, আগে কখনও ভাবিনি। মনে মনে তোবা তোবা বলেছিলাম, আর বড় বড় চোখে ফ্যালফ্যাল করে দেখে যাচ্ছিলাম। খাদ এত গভীর যে জোরালো ফ্লাডলাইটের আলো পর্যন্ত কিছুদূর গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। সাগর, তোমাকে প্রণাম।

জলতলের ডুবুরি নৌকোকে কিন্তু নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন জলের ওপরকার জাহাজের ইংরেজ ক্যাপ্টেন। ইন্টারকম ফ্র্যাক ফ্র্যাক আওয়াজ ছেড়ে যাচ্ছে, ওঁর গাঁকগাঁক গলাবাজি ভেসে আসছে। সাগরতলের নিথর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সেই হাঁকডাক যেন মানাচ্ছে না। এখানকার লাখো লাখো বছরের নীরবতা বুঝি তিতিবিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ জীবটার উৎপাত তাতে কমছে না।

'সিকোয়েস্ট' ডুবোজাহাজ এই দ্বীপ পর্যন্ত এসেছিল সকালের দিকে। দূর থেকে পৌরাণিক প্রেতের মতো মনে হচ্ছিল পর্বতময় দ্বীপটাকে। এসে পৌঁছোনোর ঠিক আগে সাগর হঠাৎ মড়ার মতো নিথর হয়ে গেছিল। আমাদের উৎপাত যেন ভাল চোখে দেখেনি। ভৌতিক কুয়াশার মতো জলবাষ্প গাঢ় হয়ে ভাসছিল গোটা দ্বীপটাকে ঘিরে।

তারপরেই তেড়ে এসেছিল জোর হাওয়া। বুঝি ভৌতিক ফুৎকার। সরে গেছিল কুয়াশা। দেখেছিলাম ন্যাড়া দ্বীপটার আগাগোড়া। এ যেন এক লস্ট ওয়ার্ল্ড— হারিয়ে যাওয়া দুনিয়া। গা শিরশির করে উঠেছিল আমার মতো অকুতোভয় মানুষের। মুখে যতই তড়পাই না কেন, ভয় জিনিসটা যে আমার মনের অন্দরে কন্দরে বাসা বেঁধে অনড় হয়ে রয়েছে, সেদিন তা অস্থি মজ্জা দিয়ে অনুভব করেছিলাম।

দ্বীপটাকে একখানা পাহাড়ি কঙ্কাল বললেই চলে। গাছপালা ঘাসটাস কিছু নেই। অথচ এইখানেই, সুদূর অতীতে, একদা মানুষ নামক জীব নেচেগেয়ে হেসেখেলে গেছে। এখন কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। মহাকাল সবই গ্রাস করেছে। ছায়াটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই।

এই দ্বীপেরই দু' নৌ-মাইল পশ্চিমে এসে দাঁড়িয়েছিল 'সিকোয়েস্ট' ডুবোজাহাজ। অ্যাকুয়াপড ডুবুরি নৌকোয় ঢুকে জলতলের অ্যাডভেঞ্চারে এসেছিল তারপরেই। প্লেক্সিগ্লাস গম্বুজে বসে আছি চোখ বড় বড় করে। দেখে যাচ্ছি গহন গভীর সাগরতলের নিঃসীম বিস্ময়।

একটু পরেই কুয়াশা অস্পষ্টতার মধ্যে দিয়ে দেখা গেছিল প্রেতচ্ছায়ার মতো অনেক কিছু। স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল নবপ্রস্তর যুগের একটা গ্রামাঞ্চল— আট হাজার বছর আগে যা তলিয়ে গেছিল জলের তলায়।

ডুবুরি নৌকো থেকে তোড়ে জল বের করে সাগরতলানি ঘুলিয়ে সরিয়ে দেওয়ার পর

আচমকা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলাম একজোড়া লম্বাটে মাটির কলসি। খাড়া অবস্থায় ঢুকে রয়েছে একটা খাটো পাঁচিলের পাশে। তারপরেই দেখেছিলাম আরও দুটো লম্বাটে কলসি— ডুবুরি নৌকো পিচকিরি দিয়ে কাদা আর তলানি উড়িয়ে উড়িয়ে দেওয়ায় দেখেছিলাম সারবন্দি কলসি। যতদূর দু'চোখ যায়, ততদূর পর্যন্ত।

'গুদোমঘর।' বিড়বিড় করে বলেছিলেন প্রফেসর, 'খুব সম্ভব শস্য মজুদের ঘোলাঘর— বয়সটা তবে অনেক— চার হাজার বছর তো বটেই।'

তার পরেই, আচম্বিতে আরও বৃহদাকৃতি কিছু একটা এসে গেছিল আলোর আওতায়। দৃষ্টিপথ অবরোধ করে রয়েছে। জগতের কিনারায় এসে গেছি বলে মনে হচ্ছে।

খাদ এখান থেকে খাড়াই পাহাড় হয়ে উঠে গেছে অনেক ওপরে— আলোক এলাকার বাইরে। দু'দিকে বিস্তৃত পাহাড়ি প্রাচীর। পরক্ষণেই দেখতে পেলাম পেল্লায় অদ্ভুত আকৃতির আয়তাকার পাথরের পর পাথর। কিছুদূর অন্তর অন্তর— বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিসীমার বাইরে।

চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তারপর থেকেই। সারবন্দি প্রাচীর আর সমতল ছাদ। অগুন্তি। দেওয়ালের গায়ে জানলা আর দরজা। পাঁক লেপটে রয়েছে ওপরে। নবপ্রস্তর আমলের বলেই মনে হয়েছিল। তবে ছোটখাটো নয়, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। গ্রাম বলতে যা বোঝায়, তাও ঠিক নয়। প্রতিটি বাড়ি বেশ বড় সাইজের। চারতলা, অথবা পাঁচতলা, সিঁড়ি রয়েছে একতলা থেকে ওপর তলা পর্যন্ত।

অ্যাকুয়াপড থামিয়ে দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই চোখ বড় বড় করে দেখে গেছিলাম দূর অতীতের বাড়িঘরদোর।

আপন মনে বলে গেছিলেন প্রফেসর, 'যৌথ পরিবার ছিল নিশ্চয়। সংসারে লোক বেড়েছে, ওপরতলায় গাঁথনি বেড়েছে।'

আরও নীচে নেমেছিল অ্যাকুয়াপড। দেখেছিলাম গলিঘুঁজি আর কাটাকুটি রাস্তা। যেন মধ্যপ্রাচ্যের বাজার অঞ্চল।

কেটিয়া বলে গেছিল আত্মগতভাবে, 'শুধু চাষবাস নয়, হাতের কাজেও পোক্ত ছিল কুমোর, ছুতোর স্যাকরা— সবাই ছিল মনে হচ্ছে।'

'সোনার চাকতির সৃষ্টি এইখানেই,' প্রফেসরের অস্ফুট মন্তব্য।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভেসে গেলাম উঁচুতলা বাড়িগুলোর ছাদের ওপর দিয়ে। তমিস্রাময় গবাক্ষগুলো অন্ধ চক্ষু মেলে চেয়ে রইল আমাদের দিকে।

প্রায় পাঁচশো মিটার পুবে যাওয়ার পর আচমকা শেষ হয়ে গেল গুদোমঘর শ্রেণির। বাড়িঘরদোরের জটলাও আর দেখা গেল না। ঘোলাটে আলো আঁধারির মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম আর একটা বাড়িঘরদোর গুদোম জটলা— বিশ মিটার তফাতে। তারপরেই শুরু হয়েছে প্রশস্ত পথ— গলি ঘুঁজির মতো নয়।

ডুবুরি নৌকা অগ্রসর হয়েছিল এই পথ ধরে। রাস্তা একটু একটু করে উঠে গেছে অপরদিকে। কাটাকুটি করে গেছে আর একটা রাস্তা। পুব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। আমরা গেলাম পুবের দিকে। বিশ মিটার ওপর দিয়ে ধেয়ে গেল অ্যাকুয়াপড— যাতে দু'পাশের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর সংঘর্ষ না লাগে।

চমকপ্রদ দৃশ্য। নকশা অনুযায়ী সাজানো শহর। চারপাশে রাস্তা। মাঝের অংশে এক গুচ্ছ বাড়ি। হাজার হাজার বছর আগে তৈরি।

আপনমনে বলেছিলেন প্রফেসর, 'ব্লুপ্রিন্ট এঁকে তবে তৈরি করা শহর। তুতেনখামেনের কবর, ট্রয় নগরকেও ম্লান করে দেওয়ার মতো স্থপতি বিদ্যা। ব্রিলিয়ান্ট!' কেটিয়া আমার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে বলেছিল, 'মাই ডিয়ার দীননাথ, এই সেই আটলান্টিস— যে শহরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বিশ্বের তাবড় পণ্ডিতরা।'

বিল্ডিং গুচ্ছ শেষ হয়ে গেল হঠাৎ। জলের তলানি ছাড়া কিছু নেই। শহর কি এইখানেই শেষ?

পিঠ সিধে করে প্রায় দমবন্ধ গলায় বলেছিলেন প্রফেসর, এগিয়ে চলো; এগিয়ে চলো— স্থপতিদের নকশা আমি বুঝে গেছি আসল আশ্চর্য আছে এর পরেই।'

বিশ মিনিট পরেই দেখা গেছিল একটা ডোবা প্রাঙ্গণ। লম্বায় প্রায় এক কিলোমিটার, চওড়ার আধ কিলোমিটার। তার পরেই ফের শুরু হয়েছে কাটাকুটি রাস্তা আর ছকে বাঁধা বাড়িঘরদোর— যেমনটা দেখা গেছিল এই ফাঁকা মাঠের একদিকে।

বললেন প্রফেসর, 'স্টেডিয়াম পেরিয়ে এলাম। ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ। ক্রীট দ্বীপে একদা ছিল এইরকম স্টেডিয়াম— যেখানে হত ষাঁড়ের লড়াই, বলিদান পর্ব, আরও অনেক পুজো-টুজো।'

'কলকাতার গড়ের মাঠের মতো!' বোকার মতো বলে ফেলেছিলাম আমি, মেলা আর সভা করার ফাঁকা মাঠ।'

কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বলেছিলেন, 'স্টুপিড।'

কেন যে স্টুপিড বললেন, বুঝলাম না। তাই তেড়ে উঠেছিলাম।

আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান বর্ষণ করেছিলাম সেকালের সব শহরেই এরকম ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছিল। তবে এটা পেল্লায়।'

সায় দিয়েছিল কেটিয়া, 'তা বটে। মিনোয়ান প্রাঙ্গণ ছিল এর চাইতে অনেক ছোট। রোম শহরের কলোসিয়াম লম্বায় আর চওড়ায় ছিল মোটে আশি মিটার। এখানে যা দেখে এলাম, তাকে গড়ের মাঠ বলা যায়।'

'দেখা আছে নাকি গড়ের মাঠ?' আমার সকৌতুক প্রশ্ন।

'বইমেলার সময়ে যেতে হয়— ফি বছর।'

কলকাতার বইমেলা বেঁচে থাকুক কলকাতার গড়ের মাঠে। দেশে দেশে নইলে নামটা ছড়াবে কী করে?

প্রফেসর বললেন, 'আটলান্টিস একটা আজব দেশ। এখানে এসে এইসব উলটোপালটা বকলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়—' বলেই থেমে গেলেন।

প্রান্তরের শেষে দেখা যাচ্ছে একটা মস্ত পাথর। জল কাদা আর পাঁক সরিয়ে দেওয়ার ফলে তা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে আতীব্র আলোর সামনে। প্রায় দু'মিটার উঁচু আর পাঁচ মিটার চওড়া একটা পাথর। জলের জেট দিয়ে একটু একটু করে কাদা আর পাঁক সরিয়ে দেওয়ার পর স্পষ্টতর হয়ে উঠল বস্তুটা।

'মাই গড' বললে কেটিয়া।

'সিংহের থাবা', প্রফেসরের গলায় বিপুল উল্লাস।' স্ট্যাচুটা তা হলে কত উঁচু কল্পনা করে নেওয়া যায়। তিরিশ মিটার তো বটেই। লম্বায় কমসেকম একশো মিটার।'

'দানব সিংহ' অস্ফুটস্বরে বলেছিলাম আবার। 'কিন্তু এতবড় পাথরের সিংহ কেন?'

এইবার কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ অনুকম্পা বর্ষণ করলেন প্রফেসর, 'দীননাথ, মিশরে তো তুমি স্ফিংক্স দেখেছ। এটা তারই দানবিক উৎস।'

'আইডিয়াটা তা হলে আটলান্টিস থেকে গেছে ঈজিপ্টে?'

'আরে হ্যাঁ।'

ডুবুরি নৌকো দানবিক থাবার গা বেয়ে বেয়ে উঠে গেল তিরিশ মিটার উঁচুতে। সিংহমূর্তি এখন জোরালো আলোয় স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। আলোক বন্যায় দেখা যাচ্ছে গোটা মূর্তিটা।

প্রকাণ্ড একটা ষাঁড়ের মুণ্ড ঝলমল করছে জোরালো আলোয়। পা দুটো সিংহের থাবা। শরীরটাও সিংহের। মুণ্ডটা শুধু ষাঁড়ের।

শক্তির প্রতীক। ষাঁড় আর সিংহের সম্মিলন।

আমি হাঁ হয়ে গেছিলাম। প্রফেসর বলে গেছিলেন, 'এ মূর্তি যারা গড়েছে তাদের শক্তিটাও অনুমান করা যায়। আস্ত একটা ব্যাসাল্ট পাথর খুদে গড়া।'

'ব্যাসাল্ট! আগ্নেয়শিলা!'

'আরে হ্যাঁ। একটা গোটা পাহাড় খুদে গড়া ষাঁড়-সিংহ। শিং দুটোর মাঝের ফাঁকই তো তিরিশ ফুট।'

'আগ্নেয়শিলাই যদি হয়,' আস্তে বলেছিল কেটিয়া 'তা হলে এই শিলা ঠেলে বেরিয়েছিল সাগরের দিকে আগুন পাহাড়ের গা থেকে?'

'সাগরের দিকে নয়, কেটিয়া,' প্রফেসরের গলায় ধমকের সুর, 'চোখ থাকতে অন্ধ কেন? দেখছ না, খোদ ভলক্যানোর দিকেই মুখ ফিরিয়ে রয়েছে সিংহ-ষাঁড়?'

বিষম আবেগে গলা বুজে এসেছিল আমার, 'আটলান্টিস তা হলে সত্যিই ছিল?'

নরম গলায় বলেছিলেন প্রফেসর, 'চাক্ষুষ প্রমাণ তোমার চোখের সামনেই।'

(১৬) সোনার শহরের দোরগোড়ায়

পাঁচিলের পাশ দিয়ে একটু একটু করে ওপর দিকে উঠে এসেছিল ডুবুরি নৌকো। তোড়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছিল জল-জেট থেকে। ফলে ঘুলিয়ে গিয়ে সরে যাচ্ছিল পঙ্কিল আস্তরণ প্রাঙ্গণের ওপর থেকে। ঘোলাটে জলের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছিল দানবিক সিংহ-ষাঁড়ের বাকি অংশ। দক্ষিণ-পুবদিকে দেখা যাচ্ছিল পেল্লায় একটা সোপান শ্রেণি।

সোল্লাসে বলেছিলেন প্রফেসর, 'প্রাঙ্গণে প্রবেশের সিঁড়ি!'

ডুবুরি নৌকো সিঁড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে না-গিয়ে সটান উঠে গেছিল ওপরে জল ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে দিয়ে। সেখানে দেখা গেছিল খুবই চওড়া একটা পথ। দেখে মনে হয়েছিল মারবেল পাথর দিয়ে বাঁধানো।

মারবেল ছাওয়া রাজপথ।

প্রফেসর তো বলেই ফেললেন, 'নজর ছিল বটে। পাহাড় কেটে মারবেল নিয়ে এসেছিল। প্রস্তর যুগের শিকারি মানুষ পাথর কাটত অস্ত্র বানানোর জন্যে। এরা কেটেছিল রাস্তা বানাতে বাড়ি তুলতে।'

গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে কেটিয়া বলেছিল, 'অদ্ভুত! আমার ধারণা ছিল, পাহাড় থেকে পাথর কাটার বিদ্যেটা সর্বপ্রথম রপ্ত করেছিল মিশরদেশের মানুষ। এখন দেখছি, তা নয়। বিদ্যেটা গেছিল এখান থেকে মিশর দেশে।'

মন্তব্য প্রকাশ করার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না আমার। বিমূঢ় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম পুরাকালের মহামানবদের মহাকীর্তি। জোরালো আলোয় জল ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে গিয়েও যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে। মারবেল বাঁধাই রাজপথ সিংহ-ষণ্ডের ভয়ালদর্শন মূর্তির দিক থেকে সটান চলে গেছে আগ্নেয়গিরির দিকে। কটমট করে সিংহ-ষাঁড় চেয়ে রয়েছে সেইদিকেই। ডানদিকে দেখা যাচ্ছে সারি সারি থামের গোড়া আর আস্ত আস্ত থাম— গোলাকার নয়, চতুষ্কোণ, ওপর দিকে ছুঁচোলো, প্রায় দু'মিটার অন্তর অন্তর খাড়া। লাইনবন্দি স্তম্ভদের সারি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। মেহনতি মানুষ ছিল আটলান্টিসের অধিবাসীরা। ছ'ফুট বাদে বাদে পাথরের থাম গেঁথে গেছে তো গেছেই— নিশ্চয় দূরের ওই ভলক্যানো পর্যন্ত। প্রবেশ পথ অনেক দেখেছি। এমনটা কখনও দেখিনি।

কেটিয়া মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, "ঈজিপ্টে দেখেছি এইরকম স্তম্ভশ্রেণি লাক্সর আর কারনাকয়ে।" আমার কিন্তু গা ছমছম করছিল থামের পাশে পাশে রাখা ভুতুড়ে অবয়বগুলো দেখে। বিদঘুটে কিম্ভূত কিমাকার আকৃতি এক-একটা প্রস্তর মূর্তির। ঘোলাটে জলের মধ্যে দিয়ে সারবন্দি প্রস্তর প্রেতেরা যেন মূক ভর্ৎসনা করে চলেছে আমাদের অনধিকার প্রবেশ দেখে। প্রতিটি মূর্তি বিদঘুটে এই কারণে যে তাদের মুণ্ডুগুলো মানুষের, ধড় পশুদের। অজস্র জানোয়ার মূর্তিও রয়েছে মাঝে মাঝে। প্রস্তর কারিগর তাদের গড়নে এনে দিয়েছে বিদ্যুৎগতি ক্ষিপ্রতা। ঘুরে দাঁড়িয়ে তেড়ে আসতে গিয়েই যেন থমকে গেছে আচমকা। এমন প্রস্তর কারিগর এ-যুগেও বড় একটা দেখা যায় না।'

আমার গা ছমছম করছিল এদের দেখে। নিথর নিশ্চল অবয়ব নিয়েও এরা যেন হুমকি দিয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে— আর যেয়ো না... আর যেয়ো না... সামনে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

রাজপথ তো নয়, যেন নরকের পথ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বেশ ছিল নিরালায়— এই মূর্তিরা এই বিকট দেহীরা তাদের নিষিদ্ধ আলয়ে আমাদের অতর্কিত প্রবেশ ভাল চোখে দেখছে না কেউই। যেন রয়েছে অলৌকিক নির্দেশের প্রতীক্ষায়, হুকুম পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ার— সাবাড় করবে চক্ষের নিমেষে।

ডুবুরি নৌকোর মধ্যে কথা নেই কারও মুখে। নিশ্চয় হৃৎকম্প ঘটছে প্রত্যেকেরই বুকের খাঁচায়— আমার মতোই।

আচমকা শেষ হয়ে গেল স্তম্ভ আর বিদঘুটে জানোয়ারদের সারিবদ্ধতা। সামনে দেখলাম, জল ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৌকোনা পাথরের চাঁইয়ের আশপাশ দিয়ে।

প্রশান্ত স্বরে বললেন প্রফেসর, 'বটে। পাথর কাটা হত এইখানেই।' এরপরেই যা দেখলাম, তা চক্ষু চড়কগাছ করার পক্ষে যথেষ্ট।

সুবিশাল এক স্থাপত্য। প্রাচীন মিশরের পিরামিডও হার মেনে যায় সেই বিশালতার কাছে। চাঁই চাঁই পাথর এনে রাখা হয়েছিল পাহাড় প্রতিম এই স্থাপত্য নির্মাণের জন্যেই। কিন্তু মিশরের পিরামিডের মতো দেখতে নয় মোটেই। পিরামিডের পাশের দিকে হয় ঢালু। এই স্থাপত্যের পার্শ্বদেশ সটান উঠে গেছে ওপর দিকে খাড়া অবস্থায়।

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে আমি যখন চেয়ে আছি খাড়াই দেওয়ালের দিকে, ডুবুরি নৌকো তখন দেওয়ালের গা বেয়ে বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। তাই দেখতে পেয়েছিলাম প্রায় তিরিশ ফুট ওপরে রয়েছে একটা প্ল্যাটফর্ম। তার মাঝখান থেকে আবার খাড়াই দেওয়াল উঠে গেছে ওপর দিকে। তিরিশ ফুট ওঠবার পর দেখেছিলাম আবার একটা চত্বর। চত্বরের মাঝখান থেকে আবার একটা চৌকোনা স্থাপত্য খাড়াভাবে উঠে গেছে ওপর দিকে।

আমার হতভম্ব চাহনি দেখে কৃপা হয়েছিল প্রফেসরের। কানের কাছে মুখ এনে বলেছিলেন, 'মিশরের পিরামিডের মতো নয়, তাই না?'

আমি বলেছিলাম, 'একেবারেই না। মিশরের পিরামিডের গা হয় ঢালু। এ তো দেখছি খাড়াই— ধাপে ধাপে উঠছে।'

'দীননাথ, যিশুখ্রিস্ট জন্মাবার তিন হাজার বছর আগে তৈরি স্টেপ্‌ড পিরামিড তো তুমি দেখেছ?"

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই পিরামিডেরই আদি পুরুষ এই পিরামিড?'

'ঠিক তাই। তবে সাইজে অনেক বড়। গিজার গ্রেট পিরামিডের চাইতেও বড়। অবিশ্বাস্য, তাই না?'

'পৃথিবীর প্রাচীনতম স্থাপত্য?'

'হ্যাঁ। পাশের দিকেও একটু তাকাও। চোখ যে ঠেলে বেরিয়ে আসছে।' আসছিল নিশ্চয়। নইলে প্রফেসর টিপ্পনী কাটবেন কেন। তাকিয়ে দেখলাম, অবিকল ওইরকম আর একটা থাকে থাকে গড়া পিরামিড। পাশাপাশি একজোড়া পিরামিডের মাঝে ভাসছে আমাদের ডুবুরি নৌকো। তোড়ে জল বের করে পাঁক সরাচ্ছে, তীব্র আলোর ফোকাস মারছে, আর অসম্ভব দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখিয়ে যাচ্ছে।

আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখাবস্থা তারিয়ে তারিয়ে দেখতে দেখতে প্রফেসর বলে গেলেন, 'পথের শেষ যে এইখানেই, সেটা বোঝানোর জন্যেই গড়া হয়েছিল পিরামিড তোরণ। দেখতেই পাচ্ছ, মার্বেল পথ আর নেই। আস্ত আগ্নেয়গিরির গোড়ায় এসে গেছি।'

ঠিক এই সময়ে ডুবুরি নৌকোর জোরালো আলো ঠিকরে গেছিল।

পিচকিরি দিয়ে ঘুলিয়ে সরিয়ে দেওয়া পাঁক মাটির মধ্যে দিয়ে সামনের দিকে এতক্ষণ যা দেখা যায়নি পাঁকে ঢেকে থাকায়, এখন তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জোরালো আলোর ফোকাসে।

পিরামিড সমান উঁচু একটা প্রকাণ্ড চাকতি খাড়া অবস্থায় রয়েছে সামনেই। জলের তোড়ে চেকনাই ঠিকরে যাচ্ছে গা থেকে।

পিচকিরির ফোর্স আরও কাদাপাঁক সরিয়ে দিচ্ছে। একটু একটু করে পিরামিড সমান

পেল্লায় চাকতিটা স্পষ্ট হয় উঠল। আশ্চর্য নিপুণতায় জিনিসটা খাড়া থালার মতো বসানো রয়েছে দুই পিরামিডের শেষের দিকে। পথের শেষে সেইখানেই অথবা পথের শুরু সেইখান থেকেই।

কেননা, মস্ত চাকতির গায়ে খোদাই করা রয়েছে একটা সাংকেতিক চিহ্ন। দেখতে ইংরেজি H অক্ষরের মতো। যে রকমটা দেখেছি সোনার চাকতিতে জাহাজে বসে। যে অক্ষরের তর্জমা করে দিয়েছিলেন প্রফেসর।

আটলান্টিস! নগর তোরণের সামনেই ভাসছে আমাদের ডুবুরি নৌকো।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সহজে চমকে ওঠেন না। কিন্তু সেদিন তাঁর মতো মানুষের চোখ দুটোও স্থির হয়ে গেছিল অতিকায় চাকতির দিকে চেয়ে থাকবার সময়ে।

পিচকিরি তখনও চাকতির গা সাফ করে চলেছে। চেকনাই দেখা যাচ্ছে। জোরালো আলো ঠিকরে যাচ্ছে ধাতু থেকে।

ধাতু দিয়ে তৈরি চাকতি।

এবং সে ধাতু সোনা!

খুব আস্তে বলেছিলেন প্রফেসর, 'সোনার চাকতি দেখেছিলে জাহাজে— এই চাকতির খুদে সংস্করণ। সেখানে যা লেখা ছিল, এখানেও তাই লেখা আছে। কেটিয়া, দীননাথ, আমরা সোনার আটলান্টিসের তোরণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।'

কেটিয়া কথা বলছিল না। কেন বলছিল না, দেখবার জন্যে পাশ ফিরে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম ও নির্নিমেষে চেয়ে আছে, পিরামিডের পেছন দিকে— যেখান থেকে আগ্নেয়গিরি উঠে গেছে ওপরদিকে।

থইথই কাদা, পাঁক, ঘোলাটে জলের মধ্যে দিয়ে পেল্লায় লম্বাটে কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। আটকে রয়েছে পেছনের ভলক্যানো আর তার সামনের খাড়াই পিরামিডের ফাঁকে। আড়াআড়ি ভাবে।

'কী ওটা?' প্রফেসরের প্রশ্ন।

'রাশিয়ার পারমাণবিক সাবমেরিন' কেটিয়ার সংক্ষিপ্ত জবাব।

(১৭) মারণ মেশিনের মৃত্যু

কেটিয়া মেয়েটা বাস্তবিকই একটা তথ্য আর সংবাদের জীবন্ত জাহাজ। মেয়েদের মগজ নাকি ছেলেদের মগজের চেয়ে ওজনে কম হয়? তাই যদি হয় তো এ ব্যাপার ও মগজে ঢোকায় কী করে? ঠিক যেন একটা সিডি মেমারি। যখন যে তথ্যটা দরকার, তক্ষুনি সেটাকে সটান হাজির করছে হাঁ করার আগেই।

কালো ছায়ার মতো লম্বাটে বস্তুর দিকে আমরা চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই টপাস করে তাই বলে দিয়েছিল, 'রাশিয়ার পারমাণবিক সাবমেরিন।'

তার পরেই বলেছিল, 'ওর নাম আকুলা— রাশিয়ার ভাষায় যার মানে হাঙর।'

ছোট ছোট করে প্রফেসর জিজ্ঞেস করেছিলেন, জানলে কী করে?'

'ডক্টরেট নেওয়ার আগে সোভিয়েত নৌবাহিনীতে শিক্ষানবিশ হয়ে থাকতে হয়েছিল বলে।'

চেয়ে রইলেন প্রফেসর।

বলে গেল কেটিয়া, 'আকুলা হঠাৎ নিখোঁজ হয়। এখন দেখছি এখানে এসে আটকে গেছে।'

ফট করে বলে ফেলেছিলাম, 'আটলান্টিসের খোঁজে এসেছিল নিশ্চয়। আটকে দিয়েছে আটলান্টিসের ভূতপ্রেত।'

বিতৃষ্ণার চোখে এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন প্রফেসর যে ঠিক করেছিলাম আর কথাই বলব না। চাণক্য না কে যেন বলেছিলেন, মূর্খরা সভামধ্যে ততক্ষণই শোভা পায় যতক্ষণ বোবা হয়ে থাকে। আমিও এখন থেকে মূক হয়ে থাকব।

ভিডিও মনিটর চালু হয়ে গেছে। ডুবোজাহাজ থেকে দেখা সব দৃশ্যই মেশিন কন্দরে জমা হয়ে যাচ্ছিল। প্রফেসর রিমোট কন্ট্রোল তাক করে ধরে ঝাঁ ঝাঁ করে আগেকার দেখা দৃশ্যগুলোকে ফুটিয়ে নিয়ে গেলেন স্ক্রিনের ওপর দিয়ে। ষাঁড়-স্ফিংক্স থেকে পিরামিড দর্শন পর্যন্ত। তার পরের দৃশ্যগুলো তেমন স্পষ্ট নয়। ভিডিও থমকে গেল যেখানে তলানির জটলা সবচেয়ে বেশি।

কেটিয়ার মুখে কিন্তু আর লাগাম নেই। গড়গড় করে বলে গেল, 'পেছনের দিকের ধ্বংসাবশেষ। সাতখানা ব্লেড আস্ত আছে, কিন্তু ভেঙে বেরিয়ে এসেছে ডান্ডা থেকে।'

'ধাক্কাটা লেগেছিল জোরেই,' না-বলে পারলাম না।

কেটিয়ার মন্তব্য, 'তলানিতে চাপা থাকা পাথরের মূর্তি টুর্তিগুলো নিশ্চয় দেখতে পায়নি। পিরামিডদের পাশ কাটাতে গিয়ে পেছন দিকটা আছড়ে পড়েছে পাথরের মূর্তিতে— তলানি চাপা মূর্তিরা বদলা নিয়েছে সাবমেরিনের ল্যাজ ভেঙে দিয়ে। ঘুরে গেছে সাবমেরিন। আটকে গেছে পিরামিড আর ভলক্যানোর ফাঁকে।'

'কিন্তু, বললেন প্রফেসর কপাল কুঁচকে, 'সামনে নিরেট ভলক্যানো দেখেও এত হাইস্পিডে চালাতে গেল কেন? নিছক পাগলামি নয় কি?'

'কিছু একটা ঘটেছিল,' বিজ্ঞের মতো বলেছিলাম আমি, ভৌতিক ব্যাপার ট্যাপার হওয়া আশ্চর্য নয়।'

চোখ কটমটিয়ে আমার দিকে প্রফেসর তাকিয়েছিলেন। আমি পুরনো সিদ্ধান্তে ফিরে গেছিলাম। বোবা থাকাই ভাল।

কেটিয়া কিন্তু আলগা করে দিয়েছিল মুখের লাগাম, 'নিশ্চয় আটলান্টিস সন্ধানে এসেছিল— পাঁচকান না করে— তাই কবরে যেতে হয়েছে আটলান্টিসের সামনেই। ভলক্যানো আর পিরামিডের ফাঁকে।'

'প্রেতাত্মাদের প্রতিশোধ' আবার আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছিল মন্তব্য।

এইবার কিন্তু আমার হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল কেটিয়া, 'একরকম তাই বটে। শহরে ঢোকবার তোরণ বন্ধ করে শুয়ে রয়েছে সাবমেরিন।'

কেটিয়া যে সাবমেরিন বৃত্তান্তে এত পোক্ত, তা জেনেছিলাম এর পরের অ্যাডভেঞ্চারের পর অ্যাডভেঞ্চারে। কীভাবে সাবমেরিনের ভেতরে ঢুকে আর একদিকের দরজা কেটে বের করে নিয়ে আটলান্টিস শহরে ঢুকেছিলাম, সুদীর্ঘ সেই কচকচানি পড়তে গেলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে পাঠকের। সুতরাং কাটছাঁট করে চলে আসছি মূল অ্যাডভেঞ্চার পর্বে। হ্যাঁ, আমরা ঢুকেছিলাম আটলান্টিস শহরে। দেখেও এসেছি সোনার শহরকে। একালের এই মিনি গল্পের যুগে বড় গল্পের মধ্যে না-যাওয়াই ভাল। তাই সংক্ষিপ্ত করছি উপসংহার।

সাবমেরিনের শেষের দিকের একটা দরজা উড়িয়ে দিয়েছিল কেটিয়া। আমাদের প্রত্যেকের পরনে তখন ডুবুরি পোশাক। ঢুকেছিলাম নিরেট সোনার পুরু দরজা পেরিয়ে আগ্নেয়গিরির গহ্বরে। সাবমেরিনের গুঁতোয় দরজা ভেঙে পড়েছিল অনেক আগেই। সামনের দিকটা গহ্বরের ভেতরে ঢুকেছিল। আমরা তাই সহজেই ঢুকে গেছিলাম প্রকাণ্ড গহ্বরের ঠিক মধ্যিখানে। চারপাশের দেওয়ালে পাথর খোদাই করা অজস্র দেবদেবীর মূর্তি। তাদের আকৃতি কখনও পাশবিক, কখনও মানবিক, কখনও পশু মানবের সমাহার। কিন্তু প্রস্তর মূর্তিদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সোনার পাতের ওপর। দশ মিটার চওড়া আর দশ মিটার লম্বা চৌকোনা হলঘরের মেঝে, ছাদ, দেওয়ালে বসানো সোনার পুরু পাত। নিরেট সোনা। খাঁটি সোনা। সোনা যেন সিসের মতো সস্তা ছিল সেখানে। অথবা তার চাইতেও সস্তা আর সহজপ্রাপ্য। তাই সোনার এত অযথা ছড়াছড়ি। আগ্নেয়শিলা দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

চতুষ্কোণ ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা পাথরের বেদি। গোলাকার। পুজোটুজো করার জায়গা নিশ্চয়। কিন্তু সোনা দিয়ে বাঁধানো। যে আগ্নেয়শিলা দিয়ে মূর্তি নির্মিত হয়েছে, সে পাথরও নয়। তাই বেদির গা থেকে, ওপর থেকে অজস্র রঙের ঝিকিমিকি ঠিকরে ঠিকরে আসছিল আমাদের হাতের আলো পড়তে না পড়তেই।

ডুবুরি পোশাক পরেই কষ্টেসৃষ্টে হেঁট হয়ে প্রস্তর পরীক্ষা সমাপন করেছিলেন প্রফেসর। বলেছিলেন গম্ভীর গলায়, 'উল্কা পাথর। যে জিনিসের মধ্যে দেবত্ব আছে বলে আজও অনেকের বিশ্বাস।'

'আকাশ থেকে যা নামে, তা দেবতা তো বটেই,' আমার মন্তব্য।

ডুবুরি পোশাকের হেলমেটের মধ্যে দিয়েই আমার দিকে শুধু কটমট করে চেয়েছিলেন প্রফেসর। কমেন্ট করেননি। মহিলার সামনে যে সেটা উপাদেয় হত না, তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন।

চতুষ্কোণ ঘরের একদিকে ছিল একটা লম্বাটে গলিপথ। আমরা তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে পৌঁছেছিলাম আর একটা হলঘরের মতো বড় ঘরে। এ-ঘরের মাঝেও রয়েছে গোলাকার একটা বেদি— বলা বাহুল্য, একই রকম উল্কা পাথর কেটে তৈরি। প্রাগৈতিহাসিক আমলে যার আদর ছিল সবচেয়ে বেশি।

বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর, ব্রোঞ্জ যুগের ক্রীট দ্বীপেও ছিল উল্কা পাথরের আদর। ছিল প্রাচীন গ্রীস দেশে। আজও উল্কা পাথরের পুজো হয় ভারতবর্ষে, তার আশেপাশে।'

বলে তন্ময় হয়ে চেয়েছিলেন উল্কাপাথরের বেদিব দিকে। কেটিয়া কিন্তু দেখলাম বেশ

চনমনে। এগিয়ে গেছিল দেওয়ালের দিকে। জোরালো আলো ফেলে ফেলে দেখে যাচ্ছিল দেওয়াল। আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম পাশে। আঙুল তুলে দেওয়ালের ওপর লাগানো সোনার পাতে খোদাই করা ইকড়ি মিকড়ি আঁকিবুকি দেখিয়ে বলেছিল কেটিয়া, 'কী বলুন তো?'

আমি আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম তৎক্ষণাৎ।

বুঝিয়ে দিয়েছিল কেটিয়া। ইকড়িমিকড়ি নয়— প্রতীকের পর প্রতীক। আটলান্টিস বাসিন্দাদের ভাষা। তিনটে দেওয়াল জুড়ে আটলান্টিসবাসীরা অনেক কিছু লিখেছিল। কাদায় প্রলিপ্ত হয়েও এখন কথা বলতে চাইছে।

চতুর্থ দেওয়ালটায় লেখা হয়েছে আধাখ্যাঁচড়াভাবে।

কারণটা বুঝিয়ে দিয়েছিল সবজান্তা কেটিয়া, 'আটলান্টিস ধ্বংস হয়েছিল লেখা এই পর্যন্ত এগোতেই।'

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর। গুম হয়ে, আমি বুঝেছিলাম কারণটা। এ ভাষার অর্থ উনি ধরতে পারছেন না। যদি পারতেন, আটলান্টিস ধ্বংসের মুখে কীভাবে এগিয়ে চলেছিল একটু একটু করে, তা বুঝতে পারতেন। জ্ঞানী মানুষের এই এক যন্ত্রণা। রহস্য করায়ত্ত না-হলেই মন খারাপ করে ফেলেন।

ছটফট করছিল কিন্তু কেটিয়া। এদিকের দেওয়াল থেকে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল আর একদিকের দেওয়ালের সামনে। সেখানেও সোনার পাতে উৎকীর্ণ রয়েছে ইকড়িমিকড়ি হরফ অথবা ছবি-কথা। হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল প্রফেসরকে। আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, লেখা আচমকা থেমে গেছে এক জায়গায়। যেন অকস্মাৎ বাজ পড়েছিল, বিপদ নেমেছিল, লেখনী স্তব্ধ হয়েছিল, আর লেখা হয়নি।

এই লেখাটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার পরেই উজ্জ্বল হয়েছিল প্রফেসরের মুখাবয়ব। বলেছিলেন, 'যুগ যুগ ধরে ইতিহাস লেখা হয়েছে। সোনার পাতায়। আগের অক্ষরগুলো বুঝতে পারিনি। এটা বুঝছি একটু একটু। কেটিয়া, আটলান্টিসের ইতিহাস আরও অনেক ঘরে এইভাবেই লেখা হয়েছে। খুঁজলেই পাবে। কিন্তু আচমকা শেষ হয়েছে এইখানেই— এই ঘরে। কেন, তার আভাস রয়েছে লেখার মধ্যে।'

'কীসের আভাস?' আমার প্রশ্ন।

'বিপর্যয়ের।'

'যথা?'

'যা লেখা আছে, তা পড়ে যাচ্ছি। এই ভাষারই ছায়া গিয়ে পড়েছিল প্রাচীন মিশরের প্যাপিরাস পুঁথির ভাষায়।'

'পড়ুন... পড়ুন।'

'তৃতীয় দিবসের প্রভাতে শুরু হল বজ্রপাত। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমক। পাহাড়ের মাথায় ঘন কালো মেঘ। যেন ঢাক বাজছিল খুব জোরে। কাড়ানাকাড়া মাদল বাজনা একসঙ্গে বাজলে যে রকম হয়। কানে তালা লেগে গেছিল। মাটি কাঁপছিল। তার পরেই...'

'লেখা শেষ এইখানেই।' অন্ধকার মুখে বললেন প্রফেসর।

'শেষের শুরুও এইখান থেকে। চলুন যাই পাশের ঘরে,' প্রফেসরকে প্রায় টানতে টানতে সুড়ঙ্গপথে কেটিয়া গেছিল আর একটা পাথর-ঘরে। এ ঘরের মাঝেও রয়েছে উল্কা পাথরের বেদি। বেদির ওপরে দাঁড়িয়ে এক দেবীমূর্তি, দু'পাশে দুটো ষাঁড়।

দেখেই আমার মনে পড়ে গেছিল বাংলাদেশের সিংহবাহিনী দেবীদের। কোনও কোনও দেবীর বাহন বাঘ। আটলান্টিসের দেবীমূর্তির বাহন দেখছি ষাঁড়। শক্তি আর ক্রোধের প্রতীক। ষাঁড় খেপে গেলে যে কী কাণ্ড করে, তা যে দেখেছে, সে জানে।

এ তো গেল বেদির ওপর দাঁড়ানো মূর্তির কথা। দেওয়ালে দেওয়ালে উৎকীর্ণ যাদের মূর্তি দেখেছিলাম, তারা নিছক কল্পনা, না, সত্যি— তা গবেষণার ব্যাপার। বরফযুগে এইরকম মূর্তি হয়তো গড়া হয়েছিল উৎকট কল্পনা থেকে। অথবা হয়তো ভিনগ্রহের প্রাণী নিজেরাই খুদে দিয়ে গেছে নিজেদের আকৃতি। মাঝে মাঝেই এসেছে দেখা দিয়ে গেছে আটলান্টিস বাসিন্দাদের। প্রতিটাই তো অপার্থিব আকৃতির। মাথা গোল বলের মতো, শরীর গাজরের মতো, শুঁড়ের মতো হাত কিলবিল করছে দু'পাশে, এঁকিয়ে বেঁকিয়ে রয়েছে ল্যাগবেগে পা। হাত আর পায়ের আঙুলের সংখ্যা কখনও দশ, কখনও বারো। চোখ ড্যাবডেবে, ঠেলে রয়েছে বাইরের দিকে, কিনারা কালো কুচকুচে— সুপ্রাচীন মিশরীয় প্রতিকৃতিতে দেখা যায় এহেন কাজল চিহ্ন। আর দেখা যায় বাংলার মেয়েদের চোখে।

'প্রাগৈতিহাসিক ছবি তো বটেই,' বিড়বিড় করে বলেছিলেন প্রফেসর, 'কিন্তু বরফ যুগেও এমন ছবি কেউ খোদাই করেনি পাথরের বুকে। নিজেদের জাহির করার জন্যে নিশ্চয় করেছিল। হয়তো আটলান্টিসের মানুষরা ভলক্যানোর গুহায় ঢোকবার আগেও খোদাই করা হয়েছিল এদের। নিজেদের আকৃতি ফুটিয়ে রেখে গেছিল পাথরের বুকে।'

কেটিয়া চুপ করে শুনছিল এতক্ষণ। এবার বললে খুব আস্তে, 'প্লেটো কি এই আটলান্টিসের কথা বলেছিলেন?'

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন প্রফেসর। কেটিয়ার কথা যেন তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে।

বললেন তারপরে, 'আমার মনে হয়— না। প্লেটো বলেছিলেন নয়া আটলান্টিস— ক্রীট দ্বীপের কাহিনি। আমরা দেখেছি দশ লক্ষ বছর আগেকার আটলান্টিস। তারপর আটলান্টিক গ্রাস করে অনেকটা। আট লক্ষ বছর আগেকার আটলান্টিসের রাজত্ব বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে হয়নি— জলে ডুবে গেছিল। টিকেছিল যেটুকু ক্রীট দ্বীপে। প্লেটো তার আভাস দিয়ে গেছেন।'

একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ এই কারণেই স্বপ্নটা দেখেছিলেন ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে।'

'সিকোয়েন্স' ডুবোজাহাজের ক্যাপ্টেনের কথা কানে ভেসে এল প্রফেসরের কথা শেষ হতে না হতেই—! 'বেরিয়ে আসুন। 'শকুনি' ফিরে এসেছে।'

বজ্রগর্জন ভেসে এল পাথরের মধ্যে দিয়ে। প্রথমে একটা প্রলয়ংকর শব্দ। কান যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল সেই আওয়াজে। তারপরেই থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা পাতালপ্রদেশ!

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বলেছিলেন প্রফেসর, 'আটলান্টিস ফাঁস করছে সিক্রেট। জাগছে আগ্নেয়গিরি। পালাও।'

আমরা পালিয়ে এসেছিলাম। 'সিকোয়েন্স' জাহাজে ফিরে এসে শুনেছিলাম আসলানের কাণ্ড। সে হুমকি দিয়েছিল ক্যাপ্টেনকে এই বলে, 'আমার রত্নভাণ্ডার আমি নিতে এসেছি। তক্কে তক্কে ছিলাম। সব খবর 'ট্যাপ' করেছি। সোনার আটলান্টিস এবার আমার দখলে।'

বলেই, হেলিকপ্টার উড়িয়ে দিয়েছিল আগ্নেয়গিরির মাথায়। বোমা বর্ষণও করেছিল। ডেপথ চার্জ। জলের তলায় গিয়ে ফাটে। ফেটেও ছিল।

তাতেই চটে যায় ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। শুরু হয় প্রলয়ংকর সুনামি। রাগে থরথর করে কাঁপলে যা হয়।

আটলান্টিকের আশেপাশের দেশগুলোয় সমুদ্র ঢুকে পড়েছিল কতখানি, সে-খবর কারও অজানা নয়।

যা জানা ছিল না, আমার এই কাহিনিতে তা ফাঁস করে দিলাম।

আসলান মরেছে। তার 'শকুনি' জাহাজ ডুবেছে।

আটলান্টিস আর একবার রুদ্রমূর্তি দেখিয়ে, সংহার রূপ দেখিয়েছে। আটলান্টিসের বাসিন্দারা যখন বড় বাড় বেড়েছিল, অহংকারে মদমত্ত হয়েছিল, তখন দেখিয়েছিল একবার। অথবা হয়তো পরপর অনেকবার।

এত লক্ষ বছর পরে দেখাল আর একবার— সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে।

পৃথিবী এখন নিরাপদ।

আমার কাহিনিও শেষ।

ক্রিস্টাল পুঁথির কাহিনি

কলম আমাকে কামড়াচ্ছে এই কাহিনিটা লিখে ফেলবার জন্যে। কত কী ভাবছি, কত দিকে মন ঘোরানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু কৃস্টাল পুঁথির কথাগুলো মাথার মধ্যে এমন কটাস কটাস কামড় দিয়ে যাচ্ছে যে কলম পর্যন্ত সেই দলে ভিড়েছে।

লিখব না ঠিক করেছিলাম। এত আজগুবি বাপার না-লেখাই ভাল। লোকে টিটকিরি দেয়। কিন্তু লিখতে আমাকে হবেই। না-লেখা পর্যন্ত ঘুমোতে পারব না।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের পাল্লায় পড়ে অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। সবই নিদারুণ অবিশ্বাস্য।কিন্তু এখন এই যে ব্যাপারটা আমি না-লিখে পারছি না, এর কাছে সেসব কিছুই নয়। নস্যি বললেও চলে।

তিব্বত দেশে নাকি চৈনিক সৈনিকরা অনেক মঠমন্দির ধ্বংস করে দিচ্ছে। অনেক প্রাচীন জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইরকম একটা খবর কানে আসতেই প্রফেসর নড়ে বসেছিলেন। দুনিয়ায় যত অদ্ভুত কিম্ভূত বিকট বিদঘুটে, এইসব নিয়েই তো ওঁর মাথাব্যথা। মাথার মধ্যে পোকা নড়ে ওঠে। কুটুস কুটুস করে কামড়ে চলে। কোমর বেঁধে দৌড়ে যান, সঙ্গে লেজুড় হিসেবে আমাকে থাকতেই হয়। নইলে ওঁকে সামলাবে কে?

ব্যাপারটার শুরু এক তালঢ্যাঙা তিব্বতি ওঁর শরণ নেওয়ার পর থেকেই। দালাই লামার আশ্রয়ে বেশ ছিল লোকটা। রোজ পঁচিশ-তিরিশ কাপ চিনি ছাড়া চা খেয়ে ছ'ফুট চার ইঞ্চি শরীরটাকে এমন মজবুত রেখেছে কী করে, সেটাও একটা বিস্ময়। তিব্বত দেশটাই বিস্ময়ের দেশ। আজব কাণ্ডকারখানার দেশ।

এই তিব্বত থেকে পলাতক বিশালবপু মানুষটাই একদিন ধরনা দিয়েছিল প্রফেসরের কাছে। আমি তখন সেখানে ছিলাম। সে ঘরে ঢুকেই নিজের পরিচয় দিয়েছিল এইভাবে, 'গুরু, আমি আসছি রহস্যময় সেই হিমালয়ের দেশ থেকে, যেখানে আজও ইয়েতি ঘুরে বেড়ায়।'

ইন্টারেস্টিং ভূমিকা। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রর কলমে লেখা ইয়েতি নিয়ে গল্পটা। ওঁর অনবদ্য স্টাইলে গল্পের শেষে যা লিখেছিলেন, তা সত্যিই চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। ইয়েতিদের নাকি দেখাই যায় না। প্রকৃতির এক রহস্যময় কানুনে তৈরি তাদের দেহ এমনই এক উপকরণ দিয়ে নির্মিত, যা এতই স্বচ্ছ যে আলো তার মধ্যে দিয়ে

চলে যায়,—তাই তারা অদৃশ্যই থেকে যায় যতদিন ধড়ে প্রাণটা রেখে দেয়। মরে গেলে শরীরের অণু-পরমাণুদের স্বচ্ছতা চলে যায়। তখন তাদের দেখা যায়।

ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে ইয়েতিদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার ইচ্ছেটা সেই থেকেই চম্পট দিয়েছিল মন থেকে। যাদের দেখা যায় না বেঁচে যতক্ষণ থাকে, তাদের ধারেকাছে না-যাওয়াই ভাল।

তালঢ্যাঙা তিব্বতি লোকটা এসেই সেই প্রসঙ্গ দিয়ে আলাপ জমাতেই তাই আমি ভেতরে ভেতরে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলেই আমার এইরকম অবস্থা হয়। এটা একটা রোগ।

প্রফেসর তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার প্রবলেমটা কী?'

সে তখন খাপছাড়াভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধানাই-পানাই করে গেছিল।

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে খবরের কাগজে ছাপা একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ আগে শুনিয়েছিল। হিটলারের সৈন্যবাহিনী নাকি সর্বপ্রথম বেলুন টেলুন ব্যবহার করেছিল যুদ্ধের সময়ে। মিলিটারি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এরকম একটা ব্যোমযানকে মাটিতে নামতে দেখা গেছিল বটে, কিন্তু খুঁজতে গিয়ে তাকে আর দেখা যায়নি। আর্মির কেষ্টবিষ্টুরা খবরটা পড়েই নড়ে বসেছিল। ওই পর্যন্ত। তারপর পুরো ব্যাপারটা চেপে যায়।

তালঢ্যাঙা তিব্বতির এই প্রলাপের মতো ভূমিকা প্রফেসর কিন্তু কানখাড়া করে শুনছিলেন।

আমার কিন্তু পরিষ্কার মনে হয়েছিল লোকটার মাথায় ছিট আছে। কেননা, ব্যোমযান ভূমিকার অবতারণার পরেই সে বলেছিল, 'আমার নাম জানতে চাইবেন না। কিন্তু আমি যার কথা বলছি, সে ছিল অঙ্কে পণ্ডিত। আমি নিজেও অঙ্ক বিশারদ। ডক্টরেট হওয়ার জন্যে একটা লেখা লিখেছিলাম। তাকে দেখিয়েছিলাম। পঁচিশ বছর আগে, তখন সে ছিল একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। তার নাম টং। লোকে বলত, খোদ আইনস্টাইনকেও নাকি টেক্কা দিতে পারে টং ওর ব্রেনের ক্ষমতা দিয়ে। আমার তা বিশ্বাস হয়নি। আইনস্টাইনকে টেক্কা দেওয়ার মতো মানুষ পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। তখন কি জানতাম, টং এই পৃথিবীর মানুষই নয়।'

এই পর্যন্ত শুনেই প্রফেসর পিঠখাড়া করে বলেছিলেন, 'টং এখন কোথায়?'

তালঢ্যাঙা তিব্বতি বলেছিল, 'আগে সব শুনুন। তারপর কথাটা জিজ্ঞেস করবেন। আমার লেখাটা তাকে দেখাতে গেছিলাম। পাতা উলটে উলটে দেখেই গেল— না-পড়ে। তারপর বললে, 'তত্ত্বটা বিদঘুটে।'

'আমার মাথা গরম হয়ে গেছিল না-পড়েই মন্তব্য করায়। তখন কি জানতাম ওর মনের ক্ষমতা মানুষের মগজ দিয়ে মাপা যায় না।

'পরের দিন টং আমাকে ওর গ্রুপে টেনে নিয়েছিল। বলেছিল, উদ্ভট বিষয় নিয়ে এমন অঙ্ক যে কষতে পারে, তাকে তার দরকার। অর্থাৎ আমাকে তার দরকার। তারপরেই টিপে টিপে বলেছিল, আমার সঙ্গে কাজ করতে গেলে কিন্তু নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতে হবে। আমি একটা অমানুষ—মনে থাকে যেন।

'অমানুষ তো বটেই। কেননা, যে-মঠে আমি পড়তে গেছিলাম, সেখানে অঙ্ককে ভগবান হিসেবে দেখা হত। টং ছিল সেখানকার অধিকর্তা। গণিত দেবতা বললেই চলে। ছাত্রদের খাটিয়ে মারত। খাওয়ার সময় পর্যন্ত দিত না। হপ্তাশেষে আড্ডা মারার সময় পর্যন্ত পেতাম না। নাকে দড়ি পরানো যাকে বলে, ঠিক তাই। তখন থেকেই আমরা ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম, 'টং মানুষ নয়, অমানুষ?'

'অনেকেই পালিয়েছে মঠ থেকে এত চাপ সইতে না-পেরে। আমি পালাইনি। দুটো বছর সাধনা করে গেছি তার পায়ের কাছে বসে। তারপরেই আচমকা মারা গেছিল টং।

'আমরা অবাক হইনি। এত ধকল কোনও মানুষ সইতে পারে? খাবারের মধ্যে থাকত শুধু মূল—যা মাটির তলায় জন্মায়—বরফ পাহাড়ের আনাচে-কানাচে। বিশেষ একটা মূল। যার নাম জিনসেঙ। চিনেম্যানদের কাছে যা সব রোগের ওষুধ। টং খেত শুধু এই জিনসেঙ। ভাঁড়ার ঘরে জিনসেঙ ছাড়া আর কিচ্ছু থাকত না। একটা মানুষের একশো বছরের খোরাক বললেই চলে। কোত্থেকে যে এত জিনসেঙ জোটাত, সেটাও একটা রহস্য। হিমালয়ের আনাচে-কানাচে যা বরফের মধ্যে গজায়, সেই জিনসেঙের সন্ধান পেত কী করে? ডাক্তারি ভাষায় জিনসেঙ-এর নাম প্যানাক্স, অথবা অ্যারালিয়া। টং তো ডাক্তার ছিল না। অথচ, জিনসেঙ ছিল তার একমাত্র খাদ্য। তাও যেখান সেখান থেকে জোগাড় করা জিনসেঙ নয়। জোগাড় করত হিমালয়ের পাহাড় পর্বত থেকে— যার চেয়ে ভাল জিনসেঙ আর হয় না।

'আমরা, ছাত্ররা, হাসাহাসি করতাম টং-এর জিনসেঙ খাওয়া নিয়ে। জিনসেঙ নাকি ইয়েতিদের খাবার। তুষারমানব ইয়েতিরা ঠিক খুঁজেপেতে নেয় জিনসেঙ। সর্বরোগহর বলেই চৈনিক বদ্যিদের কাছে জিনসেঙের এত আদর।

'প্রথম তুষারমানবকে তো দেখা গেছিল হিমালয়ের এভারেস্ট পাহাড়ে। টং-ও নিশ্চয় তুষারমানব— হাসাহাসি করতাম আমরা। আমি কিন্তু হাসতাম না। কেন জানেন? টং-কে বাচ্চা অবস্থায় পাওয়া গেছিল এই এভারেস্ট অঞ্চলেই। পাহাড়ে যারা চড়ে, হয় তারা পেয়েছিল, নয়তো ভূতত্ত্ববিদরা পেয়েছিল। দেখতে মানুষের মতো, কিন্তু খালি পায়ে ছুটোছুটি করছিল বরফের ওপর। তুষার মানবদের পায়ের ছাপ দেখেছেন? তুষারের ওপর হেঁটে গিয়ে পায়ের যে ছাপ রেখে যায়, সেই ছাপ? বিদঘুটে? টং-এর পা ছিল প্রায় সেইরকম। পায়ের পাতা যতখানি লম্বা, তার অর্ধেক লম্বা ছিল শুধু বুড়ো আঙুলটা। বড়মাপের জুতো পরত এই কারণেই। আমরা হাসতাম টং-এর জুতো দেখে।

'আমরা তাকে তুষারমানব বলতাম— আড়ালে। সামনে বলা হত টং, আড়ালে তুষারমানব।

'যুক্তি ছিল বই কী এহেন নামকরণে। টেম্পারেচার যখন মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, শুধু একটা নাইলন রেনকোট গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরোত টং, মাথায় টুপি পর্যন্ত দিত না। উলঙ্গ হয়ে যেত মাঝে-মধ্যে রাস্তার মধ্যেই। ঠান্ডায় কাবু হত না কক্ষনও।

'আমরা বলতাম, এই সহনশীলতাটা নিশ্চয় বংশগত কারণে পেয়েছে টং। পূর্বপুরুষেরা ছিল ইয়েতি— তুষারমানব। সেই রক্ত শরীরে নিয়ে জন্মেছে বলেই সাংঘাতিক ঠান্ডাও ওর কাছে আরামের ব্যাপার।

'আরও একটা ব্যাপারে টং ছিল সৃষ্টিছাড়া। বয়স বাড়ার কোনও লক্ষণ দেখা যেত না শরীরে। যে সহপাঠীর সঙ্গে কলেজ থেকে বেরিয়েছিল টং বিশ বছর আগে, সেই কলেজবন্ধু যখন কুমড়োর মতো চেহারা বানিয়েছে, টং তখন শশার মতো চেহারা রেখে দিয়েছে। বয়স যেন তিরিশ ছাড়ায়নি। বয়স বাড়লে সব মানুষেরই শরীর একটু-আধটু করে বুড়োটে হতে থাকে। চুলে পাক ধরে। চামড়া শিথিল হয়। কপালে রেখা দেখা দেয়। টং কিন্তু বয়সটাকে যেন তিরিশে ধরে রেখে দিয়েছিল। কুচকুচে কালো চুল, টান টান চামড়া— এক্কেবারে যুবক। অমৃত খেলে নাকি এমন দিব্য শরীরে, এমন তরতাজা থাকা যায়।

'আশ্চর্য এই তারুণ্য কিন্তু আমাদের ভয় পাইয়ে দিত। ঠাট্টা করে কেউ কেউ বলেও ফেলত, 'যৌবন-ঝরনায় চান করে এলে নাকি? নাকি, শয়তানের কাছে আত্মা বিকিয়ে বসে আছ?' টং কিন্তু এই ধরনের ঠাট্টাতামাশা বুঝতেই পারত না। অথবা, বুঝলেও জবাব দিত না। মুখের একটা রেখাও কাঁপত না। মুখ থাকত শক্ত পাথরের মতো।

'একঘেয়ে এই জাতীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া থেকে রেহাই পেয়েছিল একটা সময়ে। রঙ্গরস যার মধ্যে ছিটেফোঁটাও নেই, খামোকা তার সঙ্গে এই জাতীয় হালকা হাসির কথা বলতেও কেউ যেত না। আর ঠিক এইরকম সময়েই টং-এর সান্নিধ্যে আমি এসেছিলাম। ভাবসাব দেখে মনে হয়েছিল, নিজেকে খুব উঁচু জায়গার মানুষ বলে মনে করে।

'এইরকম যার ব্যক্তিত্ব, তাকে নিয়ে গুজব তো রটবেই। টং নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। তিব্বত অঞ্চলে মারামারি-কাটাকাটি নতুন কিছু নয়। এইরকম একটা লড়াই শেষে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল বড়মাপের এক সোলজার। ছেলের মতো মানুষ করেছিল টং-কে। পুরো নামটা আগে ছিল বেশ লম্বা— বাপের পদবি সমেত। উচ্চারণে অসুবিধে হত। কাটছাঁট হতে হতে শেষকালে নাম দাঁড়ায় শুধু টং। লড়াইয়ের মাঠে কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চা, বাপ-মায়ের নাম ঠিকানাও জানা যায়নি। তাই সে অনাথ। লড়াই-টড়াই চুকেবুকে গেলে বাপ-মায়ের খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা একটু হয়েছিল,কিন্তু ফল হয়নি। কেউ এগিয়ে আসেনি।

'সুতরাং তার জন্ম কোথায়, কোন পরিবারে, তা জানা যায়নি। তবে একটা ব্যাপারে খটকা লেগেছিল প্রত্যেকেরই। অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিল টং ছেলেবেলা থেকেই। মেমারিটা নির্ভর করত কিন্তু বিষয়ের ওপর। অতীতের কিছুই মনে করতে পারত না। বাড়ির কথা, কোন জায়গায় জন্ম, সেখানকার ঠিকানা— এসব স্মৃতিতে ছিল না এক্কেবারে। ভাষাটাও শিখতে হয়েছিল নতুন করে। কিন্তু স্কুল আর কলেজের পাট চুকিয়ে দিয়েছিল এক বছরের মধ্যে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই নিয়েছিল অঙ্কের ডক্টরেট ডিগ্রি।'

এই পর্যন্ত শুনেই প্রফেসর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হাসপাতালে গেছিল কেন?'

'পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। ডাক্তারদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল বলে। এমন অসাধারণ স্মৃতিশক্তি যার, সে অতীতকে ভুলে মেরে দেয় কী করে? অসম্ভব। আরও অসম্ভব তার শিক্ষার স্পিড। হরফ চেনা থেকে শুরু করে ডক্টরেট ডিগ্রি নিতে লেগেছিল মাত্র দু'বছর।'

'সে কী!' এই প্রথম চমকে উঠতে দেখলাম প্রফেসরকে।

'আজ্ঞে। অসম্ভবকে সম্ভব করে ছেড়েছিল টং। লড়াই দেখেশুনে মাথা বিগড়োয়নি—

কিন্তু ব্রেনের ক্ষমতা বেড়ে গেছিল অবিশ্বাস্যভাবে।'

'মেডিকেল রিপোর্টের কথা, না, বানানো কথা?'

'মেডিক্যাল রিপোর্টের কথা। এত কষ্ট করে আপনাকে যা বলতে এসেছি, তার মধ্যে মনগড়া কথা একটাও নেই। দয়া করে শুনুন।'

'শুনছি।' অম্লানবদনে বলে গেছিলেন প্রফেসর, 'তিব্বতির কথার খোঁচা গায়ে না-মেখে, ব্রেনের অণু-পরমাণু নতুন করে নিজেদের সাজিয়ে নিয়েছিল নিশ্চয়?'

'একেবারে নতুনভাবে, ধরেছেন ঠিক! মগজের মধ্যেকার সংকেত চালাচালি পর্যন্ত অন্যরকম হয়ে গেছিল।'

'অদ্ভুত এই মগজ-ক্ষমতা কি জন্মসূত্রে এসেছিল?'

'এ-প্রশ্ন করা হয়েছিল টং-কে জবাবটা দিয়েছিল বেঁকিয়ে।'

'বেঁকিয়ে! মানে?'

'বলেছিল, আমার শৈশব শুরু হয়েছিল হাসপাতালে— সাতাশ থেকে তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে।'

'সাতাশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে?' প্রফেসর কপাল কুঁচকে ছিলেন।

'আজ্ঞে। সাতাশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে কারও শৈশব শুরু হয়েছে বললে লোকে যে হাসবে। টং বলেছিল, জ্ঞান যাদের কম, তারাই হাসবে। কিন্তু প্যাঁচালো জবাবটার মানে ভাবিয়ে তুলেছিল স্নায়ুবিজ্ঞানী আর চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের। মগজের স্নায়ুকোষের কাজকর্মে নজর রাখবার মতো কোনও যন্ত্রপাতি তো নেই। ন্যানো মাপের যন্ত্র তৈরির চেষ্টা চলছে বটে, কিন্তু এখনও তা গবেষণার পর্যায়ে। কী, ঠিক বলছি?'

প্রফেসর তিব্বতির তেরচা চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'তা বটে। ধোঁকায় রয়েছেন তাবড় ব্রেন বৈজ্ঞানিকরা।'

তিব্বতি বলেছিল, 'তা ছাড়া, যুদ্ধের গোলাবারুদ টং-এর ব্রেন জখম করেছিল কতটা, তা নিয়েও কোনও গবেষণা হয়নি। জখম নিশ্চয় হয়েছিল, নইলে অমন চিড়িয়া হয়ে যাবে কেন? সমাজে কারও সঙ্গে মেলামেশা করত না। আড্ডা-টাড্ডার ধার দিয়েও যেত না। শুধু বলত, সময় কম, কাজ অনেক। বাস্তবিকই তাই করে চলেছিল টং। শুধু কাজ, কাজ, কাজ। যখন বরফ পড়েছে বাইরে, তখনও গায়ে পাতলা কিছু একটা চাপিয়ে বরফপ্রান্তরে টো-টো করেছে। এই নিয়ে একদিন একজন ঠাট্টা করে বলেছিল, টং, তুমি কি তুষারমানব? টং কথাটা লুফে নিয়ে অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল, একেবারে তাই।'

গালে হাত দিয়ে বসলেন প্রফেসর। এইরকম ভঙ্গিমায় তাঁকে বসতে দেখলাম এই প্রথম। তাজ্জব কাহিনি শুনে চঞ্চল হয়েছেন বিলক্ষণ।

তিব্বতি বললে, 'এরপরেই একদিন শোনা গেল খবরটা— টং মারা গেছে।'

প্রফেসর একটুও চমকালেন না। শুধু বললেন, 'কীভাবে?'

'বরফের ওপর যথারীতি অভিযানে বেরিয়েছিল। বরফ ছিল ওর বন্ধু। ওর প্রাণ। বুকখোলা একটা শার্ট পরে মরে পড়ে ছিল বরফপ্রান্তরে। মুখে তৃপ্তির হাসি। বিকারের লক্ষণ নেই।'

'ডাক্তারের নিদানে মৃত্যুর কারণ জানা গেছিল?'

'না। রহস্যটা সেইখানেই। হার্ট ফেল করার কারণ তো কখনও দেখা যায়নি। স্বাস্থ্য ছিল উত্তম, রোগবালাই কাছে ঘেঁষত না। এমনকী ফ্লু জাতীয় জ্বর পর্যন্ত কখনও হয়নি। নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে দুম করে একদিন হাসতে হাসতে মরণকে বরণ করা আশ্চর্য নয় কি?'

'খুবই আশ্চর্য!' বলেছিলেন প্রফেসর। আশ্চর্য যে হয়েছেন, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। বললেন, 'কার্ডিওগ্রাম হয়েছিল কখনও? হার্ট পরীক্ষা?'

'হয়েছিল। হার্ট ছিল জোরালো।'

'করোনার-এর রিপোর্ট?'

'সেটাও তো অদ্ভুত। স্নায়ুজনিত হৃদরোগ, মগজে হঠাৎ রক্তক্ষরণ। এক কথায়, স্ট্রোক। যেন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু স্বাভাবিক যে নয়, সেটা নিশ্চয় ময়নাতদন্তে জানা গেছিল—কিন্তু গোপনে রাখা হয়েছিল সেই রিপোর্ট। ব্রেনটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্নায়ুবিশেষজ্ঞদের ল্যাবরেটরিতে। গবেষণার রিপোর্টও চেপে যাওয়া হয়েছিল।'

'তারপর?' প্রফেসর এবার বেশ উৎসুক।

তিব্বতি চালিয়ে গেল একই রকম একঘেয়ে স্বরে, গলার আওয়াজে তিলমাত্র উত্থানপতন না-ঘটিয়ে, 'বছর কয়েক আগে একটু আভাস পেলাম এক ডাক্তারের মুখে। টং-এর স্নায়ু নিয়ে কাটাছেঁড়া যারা করেছিল, উনিও ছিলেন তাদের মধ্যে। বললেন, টং-এর বয়স বাড়েনি মনে হত বটে বাইরে থেকে, ভেতরে ভেতরে কিন্তু একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছিল। হার্ট ঠিকমতো চললেও রক্তবহগুলো ঠুনকো আর পুরু হয়ে গেছিল। বিপাকক্রিয়া সঠিক থাকলেও শুকিয়ে গেছিল অনেকগুলো গ্রন্থি।'

'অদ্ভুত!' বললেন প্রফেসর, 'তারপর?'

'টং-এর মৃত্যুর দিনকয়েক পরে ডাকে পেলাম একটা পার্সেল। পাঁচখানা নোটবই ছিল তার মধ্যে। ডায়েরির ধাঁচে লেখা চারটে নোটবই। পঞ্চমটায় ছিল বেশ কয়েকটা অঙ্কের ফরমুলা।'

'ফরমুলা!' এই প্রথম চমকে উঠলেন প্রফেসর।

'ইয়েস স্যার! ফরমুলা। আর দিনপঞ্জী। পার্সেল পেয়েই বুঝেছিলাম, টং যে মরতে চলেছে, তা নিজেই জানত। বৈজ্ঞানিক হিসেবে কর্তব্য করে গেছে নোটবই লিখে।'

প্রফেসর বিলক্ষণ উৎসুক, 'কী লিখে গেছিল টং?'

'অঙ্কের মাধ্যমে অনেক আবিষ্কারের বৃত্তান্ত। কী-কী আবিষ্কার, সে সবের মধ্যে যাচ্ছি না। কেননা, পৃথিবীর মানুষ আজও তা শোনেনি। শুধু গণিত নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাইবারনেটিক্স, ফিজিক্স— সব কিছুকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো রকমারি ভাবনাচিন্তা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নতুন এক গাণিতিক মডেল, সাব-স্পেস আর সুপার-স্পেসের পরিমাত্রা, সবশেষে সময় সমীকরণের শাখাপ্রশাখা আর ঘূর্ণিপাক।'

'মাই গড!' যেন স্বগতোক্তি করলেন প্রফেসর, 'এই যে এত আবিষ্কার, এসব নিয়ে লেখালেখি করেনি কেন? কিছু লিখেছে ডাইরিতে এই প্রসঙ্গে?'

'না। ভেবেছে অনেক দিন ধরেই, লিখেওছে একটু-একটু করে, কিন্তু ছাপায়নি একটাও।

মৃত্যুর একদিন আগে শুধু লিখেছে আমাকে উদ্দেশ করে— সব পাঠিয়ে দিলাম। পৃথিবীর মঙ্গল হোক। আমাকে নিয়ে ভেবে ভেবে যারা মাথার চুল খাড়া করে ফেলেছে, এই ডাইরি তাদের বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিতে পারবে। আর একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে— কেন আমি আমিষ খাই না।'

কথা থামিয়ে পিটপিট করে প্রফেসরের দিকে চেয়ে রইল রহস্যময় তিব্বতি। প্রফেসর চোখে চোখে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। যেন চোখে চোখে কথা হয়ে গেল।

তারপর খুব আস্তে বললেন প্রফেসর, 'প্রথম ডাইরি চারখানায় টং কী কী লিখে গেছে, তার কিছু কিছু শুনতে পারি?'

'সবটাই পারেন। শোনাতেই তো এসেছি।'

'মুখস্থ করে রাখা হয়েছে?'

'অক্ষরে অক্ষরে।'

'তা হলে শুরু হোক ডাইরির কথা।'

শুরু হল ডাইরি কাহিনি— তিব্বতির মুখে। আশ্চর্য স্মৃতিধর। খটকা লেগেছিল তখনই।

টং-এর প্রথম ডাইরি

মাতৃভূমি বলতে কী বোঝায়? যাকে বলা যায় স্বদেশ, সেটার অর্থ কী? মনের মধ্যে ভাসে একটা ছবি...জননী জন্মভূমি... আরও তলিয়ে যদি দেখা যায়— প্রাণের শুরু কোথায়? ঝলক দিয়ে পলকের মধ্যে একটা ছবি ভেসে ওঠে মনের মধ্যে— প্রথম প্রশ্নের জবাবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে দেখা যায় একটা মুখ— ঝুঁকে রয়েছে দোলনার ওপরে। প্রথম মানবিক কান্নার রেশ যেন কানের মধ্যে দিয়ে মগজে এসে থমকে যায়।

এরই নাম স্বদেশ। এরই নাম মা।

আমার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ঘটেছে দু'বার। প্রথমবার আমার শৈশবে— কিন্তু তার কিছুই মনে পড়ে না। কিন্তু দ্বিতীয় জন্মের বৃত্তান্ত জ্বলজ্বল করছে মনের মধ্যে। স্মৃতির সিন্দুক একেবারে শূন্য, একথা বলা সমীচীন নয়। বংশগতি স্মৃতি তো আছে। সে স্মৃতি যাওয়ার নয়। ধরা থাকে প্রতিটি বংশাণুর মধ্যে। জানোয়ারদের ক্ষেত্রেও থাকে। থাকে বলেই জানে, বোঝে, কোথায় গেলে খাবার পাওয়া যাবে, কীভাবে বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

আমার যা মনে পড়ে, তা এই: সাদা পোশাক এক মহিলা আমার গায়ে কম্বল দিতে এগিয়ে আসছে— যে-কম্বল আমি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তার পরের স্মৃতি, কালো চা কাপে করে আমার ঠোঁটের সামনে ধরা হচ্ছে— তখনও জানতাম না, জিনিসটার নাম চা; যাতে করে আনা হয়েছে, তার নাম কাপ; ছায়াছবির মতো এই স্মৃতি দিয়েই শুরু হয়েছে আমার জীবন।

কানে ভেসে এসেছে অনেক জনের কথাবার্তা। একটা সাদা রঙের ঘর দেখতে পেয়েছিলাম। তিনখানা খাট রয়েছে ঘরে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তুষার ঝরছে আকাশ

থেকে। পাশের খাটে শুয়ে কাতরাচ্ছে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা একটা লোক। ধূসর পোশাকপরা গোঁফওয়ালা আর একটা লোককে দেখেছিলাম ঘরের মধ্যে। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করছিল মাঝে-মধ্যেই। যে-কোনও কারণেই হোক, এই লোকটাকে আমার ভাল লেগেছিল। যদিও এসব কী, কেন, কবে, কোথায়— কিচ্ছু জানতাম না। এই যে শব্দগুলো লিখলাম, এগুলোও জানা ছিল না, বুঝতে পারছিলাম শুধু রকমারি শব্দের ফারাক। প্রথম বোধ এইভাবেই এসেছিল আমার মধ্যে। হাবভাবের ভাষা বুঝেছিলাম জেগে ওঠার প্রথম মুহূর্ত থেকেই।

তেষ্টা পেয়েছিল। সাদা কোট পরা, মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা নার্সকে জল আর চা আনতে দেখেছিলাম। ঠোঁটের কাছে একটা খালি গেলাস তুলে, ঠোঁটে ঠেকিয়ে, চোখে চোখে চেয়ে ইশারা করেছিলাম।

'তেষ্টা?' মোলায়েম গলায় বলেছিল নার্স।

'তেষ্টা' শব্দটা সঙ্গে সঙ্গে আউড়ে গেছিলাম— শুনে শুনে। বলতে বেগ পাইনি একটুও।

নার্স চা নিয়ে এসেছিল। আমি কাপ ধরেই হাত টেনে নিয়েছিলাম।

'গরম?' বলেছিল গোঁফওয়ালা লোকটা।

'গরম।' বলেছিলাম আমি।

'জল আনো, গেলাসে।' বলেছিল গোঁফওলা।

সাদা পোশাকপরা নার্স এনেছিল জল। গেলাসে। ছুঁয়ে বুঝেছিলাম বেশ ঠান্ডা। আগের মতো গরম নয়। খেয়ে নিয়েছিলাম।

'জল!' বলেছিল গোঁফওলা লোকটা।

'জল,' আমি আউড়ে গেছিলাম হুবহু একইভাবে।

'শেখাতে বেশি ধকল হবে না।' নার্সকে বলেছিল গোঁফওলা। কিন্তু এতগুলো শব্দ একসঙ্গে আওড়াতে পারিনি।

'খামোকা চেষ্টা।' ব্যঙ্গের সুরে বলেছিল নার্স। ব্যঙ্গ জিনিসটা কী, তখন আমার তা জানা ছিল না। মন দিয়ে আর চোখ দিয়ে দেখছিলাম দু'জনের কথাবার্তা, হাবভাব।

'হাল ছাড়বার পাত্র আমি নই।' বলেছিল গুঁফো। নার্সকে দেখিয়ে বলেছিল, 'নার্স।' নিজেকে দেখিয়ে বলেছিল, 'ডাক্তার।'

আমি আউড়ে গেছিলাম এক্কেবারে একইভাবে, 'নার্স। ডাক্তার।'

আমার দিকে আঙুল তুলে ডাক্তার বলেছিল, 'টং।'

আমি প্রতিধ্বনি করেছিলাম, 'টং।'

ঘরের সবকিছুর নাম শিখিয়ে দিয়েছিল ডাক্তার। জানলা, কাচ, গেলাস, কাপ, খাট— এইভাবেই শেখানো চলেছিল বেশ কিছুক্ষণ। বারেবারে বলছিল, আমি একবারেই বলে যাচ্ছিলাম। তারপর জানলার দিকে আঙুল তুলে বলেছিল, 'ওটা কী?'

আমি বলেছিলাম, 'ওটা কী?'

ধমকে উঠেছিল ডাক্তার, 'আরে মাথামোটা, ওটা একটা প্রশ্ন। জিজ্ঞেস করছি, জবাব দিতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করব, ওটা কী? তুমি বলবে, জানলা।'

তারপর থেকেই ঝটপট সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছিলাম। বুঝে গেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। জানলা, কাপ, খাট, চা। তখনও বুঝিনি আমার অসামান্য স্মৃতিশক্তি কতখানি। ডাক্তার কিন্তু হতভম্ব হয়েছিল। বড় ডাক্তারকে ডাকতে গেছিল। আধঘণ্টার মধ্যেই যে এতকিছু শিখে নিতে পারে, তাকে দেখানো দরকার।

এসেছিল বড় ডাক্তার—দৌড়োতে দৌড়োতে। নামেই বড়, বয়েসে আমার সমান। দু'চোখে দেখেছিলাম সন্দেহ আর ঔৎসুক্য।

বলেছিল, 'অদ্ভুত! অদ্ভুত! অ্যামনেসিয়া। এত তাড়াতাড়ি যায় না।'

পরে জেনেছিলাম, অ্যামনেসিয়া একটা ডাক্তারি নাম। মানে, অস্মার। স্মৃতিভ্রংশ।

'জিজ্ঞেস করুন, যা খুশি।' বলেছিল ছোট ডাক্তার।

বড় ডাক্তার আমাকে বলেছিল, 'কথা বলতে শিখলে তা হলে? লাগছে কেমন?'

জবাব দিইনি। মানে আর শব্দ বুঝিনি বলে।

'কিছু চাই?'

'না।' আমি বলেছিলাম।

'চাই' শব্দটার মানে আমার জানা হয়ে গেছিল। 'হ্যাঁ' আর 'না'-এর তফাত জেনে গেছিলাম।

'কী নাম তোমার?'

'টং।'

'এর নাম কী?' ডাক্তারকে দেখিয়ে প্রশ্ন।

'ডাক্তার।'

'আমি কে?'

'বড় ডাক্তার।'

চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল প্রায় আমার সমবয়সি বড় ডাক্তারের। বলেছিল, 'কী কী দেখছ এই ঘরে?'

হুবহু বলে গেছিলাম যা-যা শিখেছি এইটুকু সময়ের মধ্যে।

একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছিল বড় ডাক্তার। বলেছিল, 'কী দেখছ জানলার বাইরে?'

বরফ কাকে বলে, ছোট ডাক্তার আমাকে তো শেখায়নি। কিন্তু এতক্ষণ যে সব কথাবার্তা মনের মধ্যে ঢুকিয়েছিলাম, মন খাটিয়ে সেই সবের মধ্যে থেকে একটা শব্দ বের করে এনেছিলাম। বলেছিলাম, 'বরফ।'

'আশ্চর্য!' বিষম বিস্ময়ে ফেটে পড়েছিল বড় ডাক্তার, 'ব্রেনে ধাক্কা লাগবার আগে নিশ্চয় সবই জানত। এখন মনে পড়ছে। টং মানে কী জানা আছে?'

সেই মুহূর্তে বলতে পারিনি 'টং' মানে কী। পরে জেনেছিলাম— বোমাপড়া গর্ত থেকে আমাকে যখন টেনে তোলা হচ্ছিল, তখন আমার মুখ দিয়ে শুধু 'টং' আওয়াজটা বেরিয়েছিল। আমি কিন্তু জবাবটা দিতে পারিনি। একটাই কারণে। অতীত মুছে গেছিল স্মৃতির পরদা থেকে।

তা সত্ত্বেও, বিরাম ঘটানো হয়নি শেখানো পর্বে। সে এক মজায় মেতে উঠেছিল গোটা

হাসপাতাল। ঘনঘন প্রশ্ন, সঙ্গে সঙ্গে জবাব। যেমন, 'বরফে হাঁটতে গেলে পায়ে জুতো পরতে হয়। তুমি পরোনি কেন?' আমি বলেছিলাম, 'জুতো কী জিনিস?' ওরা বলেছিল, 'পায়ে থাকে। তোমার পায়ে ছিল না। মনে পড়েছে? আমি বলেছিলাম, না।'

এইভাবেই যা শুনছিলাম, যা দেখছিলাম— শিখে নিচ্ছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। গেঁথে যাচ্ছিল মনের মধ্যে। শিক্ষাপর্ব ঝটপট না-এগোনোর কারণ, একটাই: আমার অনভিজ্ঞতা। তবে হ্যাঁ। বিদেশি ভাষা শিখে নেওয়া যায় শব্দের মানে না-বুঝেই। মাতৃভাষা সাহায্য করে ভেতর থেকে। আমার ক্ষেত্রে চুপচাপ থেকেছে আমার মাতৃভাষা।

অনেকে হাসাহাসি হয়েছিল আমাকে নিয়ে। ছড়া শুনিয়েছিল অনেকে। কিন্তু হুবহু আবৃত্তি করতে পারিনি, মানে বুঝিনি বলে। কী করে বুঝব? অজস্র শব্দ একসঙ্গে শুনলে যে জড়িয়ে-মড়িয়ে যাচ্ছিল। ছড়া কী জিনিস, তা জেনেছিলাম অনেক পরে।

দু'মাসে ভাষা আয়ত্ত করেছিলাম। তারপর পড়তে শিখেছিলাম। অভিধান আর বিশ্বকোষ কণ্ঠস্থ হয়ে গেছিল কয়েক দিনেই। তখন বেরিয়ে এসেছি ছোট হাসপাতাল থেকে— লড়াই যেখানে চলছিল, এই ক্যাম্প হাসপাতাল ছিল সেখানে। এলাম বড় হাসপাতালে। মাথায় চোট লাগার চিকিৎসার জন্যে। তখন মিনিটে মিনিটে মাথা খারাপ হয়ে যেত। এই ভাল আছি, তার পরেই মাথায় গোলমাল দেখা দিচ্ছে, অজ্ঞান হয়ে যেতাম ঠিক তার পরেই। যখন জ্ঞান ফিরে আসত, সব গুলিয়ে ফেলতাম। মাথার বিশেষ একটা জায়গায় চোট লাগার পরিণাম।

ডাক্তাররা উঠে পড়ে লেগেছিল আমাকে নিয়ে। নতুন নতুন ডাক্তারি পরীক্ষা চালিয়ে গেছে। বই পড়তে শিখে গেছিলাম, দাবা খেলতাম। শিখে নিয়েই হারিয়ে দিতাম জবর জবর খেলোয়াড়দের। তারপরেই দাবা খেলা ছেড়ে দিলাম। একেবারে! কারণটা বলব পরে। ভাগ্য আমাকে এনে দিয়েছিল আর একটা উপহার! বিশেষ একটা ক্ষমতা।

সবচেয়ে বড় যে ক্ষমতাটা অর্জন করেছিলাম, অথবা যা আমার কপালে লেখা ছিল, সেটা আমার স্মৃতিশক্তি। নজিরবিহীন এহেন স্মৃতিশক্তির দৌলতেই দুনিয়ার সবকিছুই আত্মসাৎ করছিলাম নিমেষে। প্রথম প্রথম বিশেষ কোনও বিস্ময় আমার স্মৃতিশক্তিকে জাগ্রত করতে পারেনি। অসুখের আগে কী কী ঘটে গেছিল, স্মৃতির পরদায় সেসব আছড়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। আমার স্মৃতির বিস্ফোরণ ঘটে গেছিল অসুখের পর থেকে।

অসাধারণ এই স্মৃতি প্রথমেই যাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল দাবা খেলায় সে ছিল তুখোড়। প্রথম প্রথম তার কাছে গোহারান হেরেছিলাম। কিন্তু প্রত্যেকটা চাল মনে রেখেছিলাম। তারপর তার চালেই তাকে যখন কিস্তিমাত করে যাচ্ছিলাম পরপর, আমাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল দু'চোখ কপালে তুলে, পরের চাল কী হবে, আগে থেকে আঁচ করছি কী করে? তখন আমি গড়গড় করে বলে গেছিলাম আগের আগের খেলার ধারাবাহিকতা। চক্ষুস্থির করে ছেড়েছিলাম।

তার পরের পরীক্ষাটা দিয়ে গেছিলাম এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে। শুধু চোখ বুলিয়ে যেতাম পাতায় পাতায়।

আমি কি তা হলে সুপারম্যান হয়ে গেছি বোমার ধাক্কায় ছিটকে পড়ার সময়ে ব্রেনে চোট

পেয়ে? মগজের কোষেরা নতুন করে সাজিয়ে নিয়েছে নিজেদের? বোমার চোট যে এতখানি উপকার করতে পারে ব্রেনের, তা আগে জানা ছিল না হাসপাতালের ডাক্তারদের।

গণিতবিদ্যায় কাঁচা ছিলাম প্রথম দিকে। কিন্তু তারপরে অঙ্ক আমার কাছে জলভাত হয়ে গেছিল। গণিতবিদদের চক্ষুস্থির করে ছেড়েছিলাম।

এর পরেই স্নাতক হয়েছিলাম বলতে গেলে চক্ষের নিমেষে। তার পরেই ডক্টরেট। যিনি আমার হাত ধরে এতদূর নিয়ে এসেছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে তিনি মারা যান। মৃত্যু জিনিসটা কী, সেই প্রথম জানলাম। আমার মনের ভেতর পর্যন্ত নড়ে গেল। আর একটা দরজা খুলে গেল ব্রেনের ভেতরে। বলা যায়, আমি জাতিস্মর হয়ে যাচ্ছিলাম। একটু একটু করে।

এই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান পলকে পলকে মগজের কোষে কোষে ঠুসে নেওয়ার পর আমি আসলে কে, সেটার আভাস একটু একটু করে দেখা দিচ্ছিল। তাই আমি মেয়েদের সান্নিধ্য পছন্দ করতাম না। ঠান্ডায় কাতর হতাম না। মাংস দেখলে বমি পেত। আমাকে নিয়ে যারা কৌতূহলে ফেটে পড়ছিল, তাদের এড়িয়ে চলতাম। আমি যে কী হয়ে যাচ্ছি, অথবা কী ছিলাম— সে-রহস্য কারও কাছে ভাঙতাম না। গুপ্তরহস্য ফাঁস করার জায়গা নয় এই পৃথিবী। দাবা খেলোয়াড় চোখ কপালে তুলে ফেলেছিল, যখন গড়গড় করে বলে দিয়েছিলাম তার পরপর চোদ্দোটা দান কী হবে। ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চেয়েছিল দাবা-গুরু। আর কখনও খেলতে বসেনি আমার সঙ্গে।

ব্রেন জখম হয়েছিল বটে, কিন্তু কখনও ঘোরে পড়িনি। তবে, ভর হওয়ার মতো একটা ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটত। অন্য একটা সত্তা হঠাৎ হঠাৎ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। অন্য বললাম বটে, কিন্তু আদৌ অন্য নয়। আমারই সত্তা। মাঝে মাঝে তার ঘুম ভেঙে যেত। আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যেত। আমি অন্য রকম হয়ে যেতাম। অন্য মানুষ। এই অন্য মানুষ হয়ে যাওয়াটা, এটা ঘটত তখনই, যখন আমি একা থাকতাম। হয়তো একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি লোকজন থেকে অনেক দূরে, বইপত্তর ধারে কাছে নেই, টহল দিচ্ছি এমন-এমন জঙ্গলের মধ্যে যেসব জঙ্গল লোকালয় থেকে অনেক দূরে, মানুষের পায়ের ছাপ যেখানে কস্মিনকালেও পড়েনি। সেইসব অরণ্যের মধ্যে সহসা জাগ্রত হত আমার অন্য এক সত্তা— চিন্তা করতে পারতাম সঠিকভাবে। গরমের মধ্যে ভাবনাচিন্তা মাথায় খেলত না। এখনও খেলে না। কনকনে ঠান্ডায় আমার মাথা খুলে যায়। কাউকে তা বলিনি। বললেই তো বলবে, মাথার ব্যামোর জন্যে এমনটা হচ্ছে। শৈত্য আমার চিন্তার গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। আচমকা মনে হয়, ধারে কাছে সামনে পেছনে যা কিছু দেখছি, সবই আমার অচেনা। চেনাজানা ঝোপঝাড়কেও মনে হয় অদ্ভুত, যেন এই প্রথম দেখছি। সবই বুঝি পরদেশি, আমি এখানকার কেউ নই। চোখ ঘোলাটে হয়ে যায়। অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমক যেমন চোখ ঝলসে দিয়ে যায়, আমার অবস্থা হয় হুবহু সেইরকম। সঠিক কীরকম, তা বোঝানোর ভাষা আমার নেই।

তা সত্ত্বেও ধড়ে প্রাণ থাকে। এহেন মুহ্যমান অবস্থায় কতক্ষণ যে থাকি, সে হিসেবও হারিয়ে ফেলি। পনেরো বছর আগেকার একটা ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ

আচ্ছন্ন হয়ে গেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল দু'জন। আমার এই আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াটা এক মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়নি। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই আমি দেখেছিলাম কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল যেন একটা বিদ্যুৎ।

চমক-স্মৃতি আমাকে মনে করিয়ে দিত, আমি যেখানে থাকতাম, সে জায়গা বরফ ঠান্ডার জায়গা, সেখানকার জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার নেই, তাই মাংস আহারের ব্যবস্থা চালু ছিল না, সেখানকার শৈত্য অতিশয় আরামদায়ক বলেই ঠান্ডায় কেউ কাবু হত না।

একদিনের চমক-স্মৃতির কথা বলি। হাঁটছিলাম এক বিরাট সরোবরের পাশে। একা-একা। আচমকা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল খাড়াই পাথর। অথচ সেখানে লম্বা লম্বা গাছ ছাড়া কিছু ছিল না। গাছের পাশে ছিল জল।

একবার একটা ভোজসভায় আমার পাতে জেলি খেতে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ন হয়ে গেছিলাম। মনে হয়েছিল, এই জাতীয় খাবার আগে কোথাও খেয়েছি। ঘোর কেটে গেছিল পরক্ষণেই। পাশে বসেছিলেন এক ডাক্তার। তিনি আমার হঠাৎ আচ্ছন্ন অবস্থা দেখেছিলেন। পরে বলেছিলেন, 'আবার ঘোর লেগেছিল মনে হল। অতীতে ফিরে এসেছিল?'

আমি শুধু বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।'

অতীত আমাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল বলেই বর্তমান আমাকে মারতে পারেনি। এই ব্যাপারটা ঘনঘন ঘটছে গত কয়েক বছর ধরে। আগমন সব সময়েই আচমকা। গত বছর একটা পার্কে বসে ছিলাম। ছেলেমেয়েরা হুটোপুটি করছিল সামনে। আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম আচমকা। জনসংখ্যা বেড়ে গেলে যে কী প্রলয়ংকর সমস্যার সূচনা ঘটায়, সেই আতঙ্কে কাঠ হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কীসের সঙ্গে কীসের সম্পর্ক! অতীতে কি এই সমস্যা আমাকে জর্জর করেছিল? নইলে প্রায় অচেতন হওয়ার অবস্থাটা আসবে কেন? কেন দেখতে পাব একজন পুরুষ মানুষের পিঠের দিকে? সে কথা বলছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক নারীর সঙ্গে। যে ভাষায় কথাটা শুনলাম, সে ভাষা আমার অজানা, কিন্তু মানে বুঝতে বেগ পেলাম না। নিমেষে বুঝলাম, আর একবার অতীত সুস্পষ্ট হয়েই মিলিয়ে গেল পলকের মধ্যে।

এরপর থেকেই কানে শোনা বেড়ে গেল চোখে দেখার চেয়ে। বিভ্রম দুটোই। কিন্তু দৃষ্টি বিভ্রমের জায়গায় এল শ্রুতিবিভ্রম। চোখে কিছু দেখতাম না। শুধু কানে শুনতাম। হরেকরকম কথাবার্তা। অন্য ভাষায়। কিন্তু অর্থ বুঝতাম। কখনও শুনতাম, খুব কাছেই দু'জন কথা বলে যাচ্ছে। একজনের গলা খুব চেনা। সে পুরুষ।

'কী হবে এত শিখিয়ে?'

'শেখাতে তো হবেই।'

'পশুশ্রম হচ্ছে।'

'কেন?'

'দেখছ না দরকারের বেশি আঙুল গজাচ্ছে— হাতে, পায়ে?'

'মেরে ফেলতে চাও?'

'হ্যাঁ। বিজ্ঞানের খাতিরে। সমাজকে সুস্থ রাখতে।'

'বিজ্ঞান আগে, না, জীবন আগে?'

শব্দগুলো কিন্তু নিঃশব্দ। অথচ সুস্পষ্ট আমার কাছে। অদ্ভুত। এ কোন দূরজগতের বাক্যালাপ শুনছি আমি? সে-জগৎ যে বসবাসের উপযুক্ত হচ্ছে না, তাও বুঝছি। তাইতেই আমার ভয় বেড়েছে। আমি সেই জগতের বাসিন্দা আর নই বলেই ভয়ে কাবু হয়ে যাচ্ছি না। অতীত ঝলক দিয়ে গেলেও আমি তো এখন বর্তমানে। বর্তমানে থেকেও অন্য কারও মতো আমি নই। একদম আলাদা। মাঝে মাঝেই তাই একটা প্রশ্ন হাতুড়ি মেরে গেছে মাথার মধ্যে: কে আমি?

টং-এর দ্বিতীয় ডাইরি

'বাচ্চা অবস্থায় ওরা আমাকে নিয়ে এসেছিল এই নীলগ্রহে। পাইলট বলেছিল, বাজে গ্রহ। স্পেসশিপ নামাব না। মারামারি চলছে নীচে। এত হানাহানি আমাদের সয় না।'

তা সত্ত্বেও বরফপ্রান্তরে নেমেছিল ব্যোমযান। আমি বরফপ্রান্তর দেখে একা বেরিয়ে পড়েছিলাম। কাউকে না-বলে। বোমা ফাটল, কাছেই। ছিটকে পড়লাম। জ্ঞান ছিল না।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম, অনেকের উদ্‌বিগ্ন মুখ।

স্পেসশিপ পালিয়েছে, আমাকে ফেলে। শুনলাম, কামান ছোড়া হয়েছিল বিচিত্র মহাকাশযানকে লক্ষ্য করে— নতুন ধরনের বিমান ভেবে।

আমাকে ভেবেছে ইয়েতির বাচ্চা। ভাবুক।

টং-এর তৃতীয় ডাইরি

ঘোরে পড়েছি মাঝে মাঝেই। বর্তমানের বিলুপ্তি ঘনঘন ঘটেছে, আচমকা আচমকা। আমি জেনেছি, যে-গ্রহের বাসিন্দা আমি ছিলাম, সেখানে ঘাস-পাতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। অতি উন্নত এক সভ্যতা শীর্ষে উঠেছিল একদা, তারপর শুরু হয়েছিল পতন। শুরু হয়েছিল মিউটেশন— অঙ্গ বিকৃতি। আমিষ খাওয়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সেই কারণেই। উদ্ভিদকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছিল সেই গ্রহের মানুষ। আমিষ থেকে এসেছিল বিষ। আমি তাই নিরামিষ পছন্দ করি। কিন্তু আমার মতো বিকৃতঅঙ্গ মানুষকে সেই গ্রহে আর রাখতে চায়নি সেখানকার বৈজ্ঞানিকরা। মহাকাশযানে চাপিয়ে নামিয়ে দিয়ে গেছিল এই পৃথিবীতে, যেখানে আমার মতো বিকৃত শরীরের মানুষ রাজত্ব করছে। আমি তাই অ-মানব এক তুষার মানব— এই পৃথিবীর মানুষদের কাছে। আমার ব্রেন কিন্তু এই পৃথিবীর সব মানুষের ব্রেনকে টেক্কা দিয়ে যেতে পারে। আমার মেমারি প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছে একটু একটু করে। ধোঁকায় পড়েছে এখানকার বৈজ্ঞানিকরা। ওরা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু

করেছে। কে আমি? আমিষ খাই না, কারও সঙ্গে মিশি না, অসাধারণ স্মৃতির অধিকারী, এই পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান ব্রেনের মধ্যে টেনে নিয়েছি অতি অল্প সময়ের মধ্যে, মাঝে মাঝে ঘোরের মধ্যে দেখি আর এক জগৎকে— যারা মানুষের চেয়ে উন্নত সভ্যতায় পৌঁছেও বিলীন হয়ে যেতে বসেছিল বলে আমার মতো বিকৃতঅঙ্গ অনেক আঙুলওলাকে ছেড়ে দিয়ে গেছিল পৃথিবীর মাটিতে...ইয়েতিদের দেশে...এক্সপেরিমেন্ট-এর জন্যে।

ব্রেনে চোট লাগার পর সেই স্মৃতি মুছে গেছিল সাময়িকভাবে...আবার ফিরে আসছে ঝলকে-পলকে। বারেবারে একটাই প্রশ্ন জাগ্রত করে দিয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে— আমি যদি এই পৃথিবীর সন্তান না-হই, তা হলে আমার করণীয় কিছুই নেই এখানে। তা হলে কেন থাকব এখানে? এখানকার সব জ্ঞান আহরণ করা হয়ে গেছে। তা হলে কেন এই নিম্ন শ্রেণির মানুষদের মধ্যে পড়ে থাকব? এরা তো আমাকে ইয়েতির বংশধর ভাবে। অবজ্ঞাও করে অনেকে, অথবা দেখে সন্দেহের চোখে। অবশ্য ইয়েতিদের সঙ্গে মিল আছে আমার।

একটা প্রশ্নের সমাধান আমাকে করতেই হবে— হিমালয়ের ইয়েতিদের কি এইভাবেই আমার জন্মভূমি গ্রহ থেকে অনেক আগে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল পৃথিবীতে? ওরা নাকি অদৃশ্য...ওদের শরীর সূক্ষ্ম পদার্থ দিয়ে গড়া...মানুষের চোখ তাই ওদের দেখতে পায় না...আমার চোখ কি দেখতে পাবে?

আমি কি আর এক ইয়েতি? আরও উন্নত? অসাধারণ মগজের অধিকারী?

টং-এর চতুর্থ ডাইরি

গাছেরা কি কথা বলে?

স্যার জগদীশ নামে এক বাঙালি বৈজ্ঞানিক অনেক রিসার্চ-টিসার্চ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, গাছেদেরও একটা গুপ্ত প্রাণ আছে। সেই ভদ্রলোক যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে আমাকে দেখেই ল্যাবরেটরিতে ঢুকিয়ে প্রমাণ করে দিতেন আমি আসলে কে?

এখানকার বুদ্ধু বৈজ্ঞানিকদের সেই এলেম নেই। তাই এদের আমি কৃপার চোখে দেখি। আমাকে এরা একটা জীবন্ত হেঁয়ালি মনে করে। একটা সৃষ্টিছাড়া জীব। এরা কল্পনাও করতে পারবে না, আমি যে গ্রহের জীব, সে গ্রহ অতি প্রাচীন বলেই সৃষ্টিকর্তার অমোঘ নিয়মে গাছ আর প্রাণীর সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হয়েছিল।

আমি সেই জীব। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতেই পৃথিবীর মানুষের নিরিখে আমি বালক-আকার নিয়েছিলাম। আমার জন্মভূমি গ্রহের কেউই অল্পায়ু নয়। শুনেছি, সত্যযুগে এই পৃথিবীতে দীর্ঘ আয়ু ছিল অনেকের। বিশেষ করে মুনিঋষিদের। তারা নাকি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী ছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করত। কে জানে, তারাও আমার আদিগ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসে দেবভাষা সংস্কৃতে অনেক সত্য রচনা করে গেছিল কিনা।

একথা কেন বললাম? কেননা, সংস্কৃত আমার মাতৃভাষা। আমার জন্মভূমি নীলগ্রহের ভাষা। ঘোরের-পর-ঘোর এসে আমার কাছে অনেক ব্যাপার স্পষ্টতর করে তুলেছে। আমার

আদিগ্রহে বয়সের হিসেব, শরীরের আকৃতি নিরূপিত হয় সেই গ্রহপিতা নক্ষত্র নিয়মে। তাই যখন আমি এই পৃথিবীতে নির্বাসিত হয়েছিলাম, আমাকে ক্ষুদ্রকায় বালক বলেই মনে হয়েছিল। আমাকে ইয়েতি সন্তান ভাবা হয়েছিল। নির্বোধ... নির্বোধ... এই পৃথিবীর মানুষরা।

ইদানীং ঘোর আসছে ঘনঘন। তাই এতকথা লিখতে পারছি, অনেক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি বলে, অনেক কথা মাথার মধ্যে জেগে উঠছে বলে। অতীত সবেগে প্রবেশ করছে বর্তমানে। ব্যাখ্যা জুগিয়ে যাচ্ছে যাবতীয় রহস্যের। ততই আমি সাধারণের থেকে তফাতে সরে যাচ্ছি, অসাধারণ হয়ে যাচ্ছি। পিথিকানথ্রপাস মানব একদা নরমাংস খেয়েছে। তাদের বংশধর বর্তমান পৃথিবীর মানুষ তাই আজও মাংস আহার ছাড়তে পারেনি। যারা নিরামিষাশী তাদের নিয়ে একদা যথেষ্ট ঠাট্টা তামাশা করা হয়েছে। এখন বিশ্ববিজ্ঞানীদের চোখ খুলছে। আহার আর ওষুধ— দুটোই রয়েছে গাছপালার মধ্যে।

আমার আদিগ্রহে এই চেতনা নতুন নয়। এই পৃথিবীর ভারতীয় মুনিঋষিদের মতো। হিমালয়ের ঠান্ডা তাই তাদের কাছে সহনীয় ছিল। মূল খেয়ে শীত নিবারণ করত। ইয়েতিদের সঙ্গেও তাদের যে যোগাযোগ ছিল, আমি এখন তা ঘোরের মধ্যে এসে জানতে পেরেছি। অদৃশ্যদেহী এই ইয়েতিদের রহস্যভেদ আজও ঘটেনি। আমি ঘটিয়ে দিচ্ছি।

আমরাই সেই ইয়েতি। আমাদের গ্রহের ধীমানদের পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এই গ্রহকে বসবাসের উপযুক্ত করার জন্যে। হিমালয় যখন সমুদ্র থেকে ঠেলে উঠেছে— তখন। তারপর কত প্রলয় ঘটেছে। আটলান্টিস ছিল দশ লক্ষ বছর আগে। গরিমা হারিয়ে তলিয়ে গেছে আটলান্টিকে। এই হিমালয়ও ফের তলিয়ে যাবে। অগ্নিতপ্ত পৃথিবীর জঠর এমনি অনেক প্রলয় ডেকে আনবে।

আমার আঙুল অনেক গজিয়ে যাচ্ছিল বলে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই হিমালয়ে— সে-কথা আগেই লিখেছি। আমি কিন্তু অদ্ভুত আকার নিয়েই যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলাম, তা থ করে দিয়েছিল আমার মাতৃভূমি গ্রহের বড় বড় মাথাওয়ালাদের।

কিছুদিন আগে এই পৃথিবীর মস্ত মস্ত বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলাম। যোগাযোগের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। যাকে বলে ইনফরমেটিক্স। ঠিক সেই সময়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় চলে গেছিলাম। দেখেছিলাম, আমার আদি গ্রহ এ-ব্যাপারে অনেক বেশি এগিয়ে গেছিল। বহুদূরের ছায়াপথদের নাড়িনক্ষত্র জেনে ফেলেছিল। নিজেদের গ্রহের ব্যাপার-স্যাপারও জেনে ফেলেছিল। ভাবতেও ভাল লাগছে, আমি সেই গ্রহ থেকে এসেছি। আমার আয়ু, আমার পরমায়ু এই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা হাজারও ইনফরমেটিক্স দিয়েও হিসেবের মধ্যে আনতে পারবে না। অমরত্ব ধারণাটা ভারতের মুনি-বৈজ্ঞানিকদের মাথায় অকারণে আসেনি। পৌরাণিকী উপকথা বলে এতদিন অবজ্ঞা করা হয়েছে। আমি এসেছি এদের চোখ খুলতে। আমি...শীতলগ্রহের তুহিনমানব...এসেছি জ্ঞানের খনিজ ছড়িয়ে দিতে।

চিরহিমায়িত আত্মিক অবস্থা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমি একটা বাণী দিয়ে যেতে চাই এই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের কাছে। গণিত নিয়ে নতুনতর গবেষণা যেন বন্ধ করা হয়। কেননা, পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে— যা ভাবনায় আনা যায় না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। নিরীহ মানুষ রাদারফোর্ড পরমাণুর গুপ্তরহস্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন। পরিণামে

পরমাণু বোমা প্রলয় সৃষ্টি করেছিল হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে। যে প্রলয়ের ইঙ্গিত ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ অথবা স্বয়ং ব্রহ্ম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। গীতায় তার বর্ণনা দেওয়া আছে। মূর্খ মানুষ-বৈজ্ঞানিকরা এখনও বোঝেনি, অনেক ব্রহ্মাণ্ড রহস্য অনাবিষ্কৃত থাকাই মঙ্গলদায়ক; ভেদ করতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে। যেমন, ব্ল্যাকহোল। সব টেনে নিচ্ছে। তারপর? কী আছে অপরপ্রান্তে? হোয়াইট হোল? আইনস্টাইন তাঁর E=mc2 সমীকরণে দেখিয়েছেন বস্তু অবিনশ্বর। বস্তু ভাঙলে যে তেজঃপুঞ্জ সৃষ্টি হতে পারে, তা অ্যাটমবোমা দেখিয়েছে। এখন তো ন্যানোবিজ্ঞান ক্ষুদ্রত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চলেছে। পরিণাম ভাল হবে না। আমি সতর্ক করে দিচ্ছি অপরিণামদর্শীদের। যে-কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে গেলেই এমন-এমন বিপদ ডেকে আনতে পারে যা থেকে পরিত্রাণ নেই।

এই পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক চেতনা নেই। যাদের আছে, তাদের অবজ্ঞা করা হয়। গালে হাত দিয়ে তাই ভাবি, ঠিক এমন অবস্থার মধ্যে দিয়েই কি গেছিল আমি যে গ্রহে জন্মেছি সেই গ্রহের মানুষ? ঘোরের মধ্যে জবাব পাই অনেক হেঁয়ালির, পাইনি এই হেঁয়ালিটার। ইনটেলেকচুয়াল সুইসাইড বন্ধ হোক এই দুনিয়ায়, এই আমার কামনা।

একদিন শুয়ে শুয়ে আচমকা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়ে আমার জন্মগ্রহের আরও অনেক স্মৃতি মনের পরদায় ভেসে এল। অতীতের নিখুঁত মডেল।

...আমার বয়স ছিল তিরিশ, সেই গ্রহের বিচারে। মহাকাশ অভিযানের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিলাম। পৃথিবীর হিসেবে গত তিনশো বছরে মহাকাশ অভিযান বন্ধ করা হয়েছিল। শেষে স্পেসশিপ মহাকাশে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি বলে নতুন স্পেসশিপও আর তৈরি হয়নি। মহাবিশ্ব নিয়ে তদন্তে যতি টানা হয়েছিল তখন থেকেই। মানমন্দির পর্যন্ত চুলোর দোরে চলে গেছিল। অস্থির অবস্থায় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। টিকে ছিল কয়েকটা পুরনো কৃস্টাল পুঁথি। তাতেই তো রেকর্ড করা আছে অতীতের মহাশূন্য পরিক্রমা কাহিনি।

আমি ছিলাম সেই অ্যামেচারদের অন্যতম। তার পরেই তলব পড়েছিল আমার। নতুন অভিযানে আমার মতো আনাড়ি আর অকেজোর যাওয়া উচিত। গিনিপিগের মতো। আমার নাকি অনেক আঙুল। মগজ বিদঘুটে। সেই গ্রহের উপযুক্ত নই।

আমি কিন্তু উল্লসিত হয়েছিলাম। জন্মগ্রহে এত অবজ্ঞা কুড়িয়েছি যে মন বিষিয়ে গেছিল।

বিদঘুটে আকৃতি নিয়ে জন্মালেও আমাকে ভালবাসে তো অনেকে। তারাই বলেছিল, আমার মধ্যে নাকি অ্যাটাভিজম আছে— পৃথিবীর মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা যায় পূর্বাণুকৃতি। অতীতের দুঃসাহসিকদের বংশানু মাথা চাড়া দিয়েছে আমার মধ্যে। মহাকাশ অভিযানে বেরিয়ে কেউ ফেরে না। অনেকে যায় ব্ল্যাক হোলের খপ্পরে, বাদবাকিরা মরে অজানা গ্রহের বিপদে। আমিও নাকি মরব।

মরি মরব। অনেক আঙুল নিয়ে জন্মেছি বলে যখন এত অনাদর, তখন গিনিপিগ হয়েই থাকব।

তাই এলাম পৃথিবীতে।

এলাম আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে। আর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি নিয়ে। শেলশক আমার ব্রেনে চোট দিয়ে সব ঘোলাটে করে দিয়েছিল সাময়িকভাবে। তারপর সেই আচ্ছন্ন অবস্থা কেটে গেছে। এখন আমার চোখের সামনে ভাসছে আমার জন্মগ্রহ। মগজে থাকে-থাকে সাজানো রয়েছে সেই গ্রহের সমস্ত জ্ঞান— যা লিখে রাখা হয়েছিল ক্রিস্টাল পুঁথিতে।

সেই পুঁথি পড়েই আমি জেনেছিলাম, আমার জন্মগ্রহের আয়ু আর বেশি নয়। সৃষ্টি আর সংহার সেই গ্রহে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে চলেছে। গড় আয়ু কমে এসে দাঁড়িয়েছে খুব জোর চল্লিশ বছর। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের শক্তি, কমতির দিকে। স্পন্দনই এই বিশ্বের গূঢ় রহস্য। আমরা একদা জ্বলে উঠেছিলাম। সেই আমরাই এখন নিভে যেতে বসেছি— মহাকালের অমোঘ নিয়মে।

তাই ক্রিস্টাল পুঁথি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই পুঁথি পড়েই জেনেছিলাম, আমার পূর্বপুরুষরা একদা একটা অপূর্ব সুন্দর নীলগ্রহ আবিষ্কার করে সেখানে প্রাণের বীজ ছড়িয়ে এসেছিল। সেই প্রাণ নিশ্চয় অঙ্কুরিত হয়েছে। মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সেখানেই যাই না কেন মুমূর্ষু এই গ্রহ ছেড়ে দিয়ে। চল্লিশে তো মরতেই হবে, আমি যখন পৌঁছেছি তিরিশে— তখন দেখাই যাক না কেন নীলগ্রহে অভিযান চালিয়ে— জন্মগ্রহ মরে গেলে আমরাই উপনিবেশ স্থাপন করব অপূর্ব সুন্দর সেই গ্রহে। সোজা কথায়, দখলে আনব নীলগ্রহকে।

তাই এসেছিলাম স্পেসশিপ নিয়ে। সাবস্পেস দিয়ে চক্ষের নিমেষে চলে এসেছিলাম নীলগ্রহ পৃথিবীতে। সবুজে সবুজ গ্রহটাকে চক্কর দিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এখানকার পণ্ডিতদের ব্রেনের মধ্যে থেকে জ্ঞান শুষে নিয়েছিলাম। জেনেছিলাম, এরা মহাকাশ অভিযানে এখনও কাঁচা। সাবস্পেস কাকে বলে জানে না। স্পেস-এর মধ্যে স্পেস— বহুমাত্রিক এই বিশ্বের বহু রহস্যই এখনও এদের অজানা। এরা মত্ত ক্ষমতার লড়াই নিয়ে। হানাহানি করে মরছে নিজেরাই। যে উচ্চ চিন্তা আমাকে টেনে এনেছিল সুন্দর এই গ্রহে, দেখলাম সেই আধ্যাত্মিক চিন্তা এদের অনেকের মধ্যেই নেই। মরতে চলেছে নিজেদের মধ্যে বৃথা সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করে।

তাই পৃথিবীর মাটি ছুঁয়েই পলায়ন করেছিল আমাদের মহাকাশযান— আমাকে ফেলে।

আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল সূক্ষ্ম অনুভূতি অথবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, দীর্ঘকাল। তবে উপকৃত হয়েছি একটা ব্যাপারে। বয়সের ব্যাপারে। এ-গ্রহে প্রায় সকলেই শতায়ু। পৃথিবীর আবহমণ্ডলের প্রসাদে তাই আমি তিরিশ বছরে এসেও চল্লিশ বছরে মরিনি। মগজ যখন পূর্ণ মাত্রায় সচল হয়েছে, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে দেওয়ার কথা ভেবে গণিতের মাধ্যমে অনেক আবিষ্কারের কথা লিখে রেখে যাচ্ছি আর একটা নোট বইয়ে। সেই ফরমুলা যেদিন ফাঁস হবে, আমার লেখা আর একটা ক্রিস্টাল পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাবে হিমালয়ের এক গুহায়। সেইদিন পৃথিবীর মানুষ অতিমানুষ হয়ে যাবে।

তিব্বতি এই পর্যন্ত বলে অনিমেষে চেয়েছিল প্রফেসরের দিকে। প্রফেসর চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন, 'আপনার নাম এখনও বলেননি।'

'না-বললেও আপনি বুঝেছেন। আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব প্রবল। মন দিয়ে মনের কথা বুঝতে আপনি পারেন।'

'হ্যাঁ। প্রফেসর ঝুঁকে বসেছিলেন, 'টেলিপ্যাথি আমি জানি। জানি বলেই জানতে পেরেছি, আপনিই সেই টং।'

'তা বটে।'

'চার নম্বর নোটবই আর ক্রিস্টাল পুঁথি কোথায় পাব?'

'খুঁজে নিন। আমার মন থেকে। টেলিপ্যাথি দিয়ে।'

বলে, আমাদের দু'জনের চোখের সামনেই বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছিল তিব্বতি।

প্রফেসর সেই থেকে গুম হয়ে গেছেন।

আমি একদিন মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম, 'চার নম্বর নোটবইয়ের ফরমুলাগুলো আপনি জানেন?'

'জানি।'

'ফাঁস করছেন না কেন?'

'পৃথিবী গ্রহটাই এক ফুঁয়ে উড়ে যাক, তুমি কি তা চাও?'

শিউরে উঠেছিলাম। মিনমিন করে বলেছিলাম, 'ক্রিস্টাল পুঁথি?'

আমার চোখে চোখে চেয়ে প্রফেসর বলেছিলেন, 'আছে এক গুম্ফায়। চিনেদের নাগালের বাইরে। একদিন যাব, তোমাকে নিয়ে।'

আমি আছি সেইদিনের প্রতীক্ষায়।

কালো থাম

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের অনেক গল্প তোমরা শুনেছ। এই গল্পটা বাদে। তবে হ্যাঁ, ভূপদার্থ বিজ্ঞান যারা পড়ছে, তারা কিন্তু একটা নামের সঙ্গে পরিচিত, 'প্রফেসর নাবচ বলয়'। পুরো একটা অধ্যায় লেখা হয়েছে বিষয়টা নিয়ে, একটা সময় গেছে, যখন পৃথিবীর সমস্ত খবরের কাগজেও এই নাম ছাপা হয়েছে।

নামের সঙ্গে প্রফেসরের ছবিও ছাপা হয়েছিল। ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধ বাঙালি বৈজ্ঞানিকের ছবি। অনেকে তাঁকে আজও বলে খেপা বৈজ্ঞানিক। যারা একটু বেশি বোঝে, তারা বলে, প্রতিভা যাদের থাকে, তারা একটু খেপাটে হয়। নইলে, গ্রেট শর্ট সার্কিট-এর সময়ে ওঁর মাথায় অমন অভিনব আইডিয়াটা এল কীভাবে? পৃথিবীকে বাঁচালেন কী করে?

সুতরাং তিনি খেপা-হিরো।

কাগজে কাগজে এই খেপা হিরো-র যে কীর্তি ছাপা হয়েছিল, তার মাইক্রোফটোগ্রাফ তোলা আছে। এই কাহিনি সেই সবেরই চুম্বক-বৃত্তান্ত। বিশদ যারা জানতে চাও, তারা মাইক্রো নম্বর পি-এন-বি ২৬৮১২০৫৯ দেখে নিয়ো।

পৃথিবী এক সময়ে ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছিল গ্রেট শর্ট সার্কিট নামক বিপদ থেকে। কীভাবে প্রফেসর নাবচ তৃতীয় গ্রহকে আস্ত রেখে দিলেন, সেই বৃত্তান্ত নিয়েই এই কাহিনি।

প্রাচীন মানুষেরা প্রশান্ত মহাসাগরের কেন এমন নাম দিয়েছিলেন, তার নিশ্চয় একটা সংগত কারণ আছে।

প্রশান্ত বলেই ইন্টারন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার যে একটা অতি গভীর ফুটো করা হয়েছিল এই মহাসাগরের তলায়।

উদ্দেশ্য? পৃথিবী কী কী উপাদানে নির্মিত, তা যাচাই করা।

পৃথিবীর সব দেশ খরচ জুগিয়ে বানিয়েছিল একটা ভাসমান ঘাঁটি। সমুদ্র সেখানে প্রায় দশ কিলোমিটার গভীর। ছেঁদা করতে হবে চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত, দশ কিলোমিটার জলের মধ্যে দিয়ে ড্রিল নেমে গিয়ে ছেঁদা করবে সমুদ্র-স্তরের চল্লিশ কিলোমিটার। অর্থাৎ, পৃথিবীর বুকে চল্লিশ কিলোমিটার ফুটো বানিয়ে দেখা হবে, কী কী উপাদান দিয়ে গড়া হয়েছে এই তৃতীয় গ্রহ।

ব্যাপারটা হাসি ঠাট্টার খোরাক জুগিয়েছিল এক সময়ে। তারপর মড়াকান্না আরম্ভ হয়েছিল পৃথিবী জুড়ে।

পৃথিবীকে মুড়ে রেখে দিয়েছে যে খোলসটা, রহস্যময় সেই খোলসে ছেঁদা করা হবে সবার আগে। এই খোলস রয়েছে সমুদ্রের তলায়। জলপৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটার নীচে। ভূস্তরের মূল চেহারা বদল যেখানে বেশি প্রকট।

বিশেষ সংকর-ধাতু দিয়ে তৈরি কেসিং-এর মধ্যে দিয়ে ড্রিল নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই স্তরে— সাগরের বুকে ছেঁদা বানিয়েছিল কয়েক কিলোমিটার। ড্রিলিং-এর সময়ে থার্মোপ্লাজমিক পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল। পাথর গলে গিয়ে নিরেট লিক-প্রুফ পাথর হয়ে গেছিল। গর্ত ধসে পড়ার সম্ভাবনা আর ছিল না। এর ঠিক ওপরে বসানো ছিল ধাতু দিয়ে গড়া কুয়ো— ড্রিল নেমেছিল যার মধ্যে দিয়ে।

ধাতুর কুয়োয় টুকরো টুকরো অংশ নামিয়ে চিরাচরিত পন্থায় ক্ল্যাম্প করে আটকানো হয়নি। একটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি অটোমেটিক ওয়েল্ডার একটার পর একটা টুকরোকে জুড়ে দিয়ে অখণ্ড বানিয়ে তুলেছিল। জল থেকে তোলবার পর সেই ধাতুর কুয়োকে অটোমেটিক প্লাজমা কাটার দিয়ে কাটতে হয়েছিল।

নিছক কুয়ো তৈরি মূল উদ্দেশ্য থাকলে বেশি সময় লাগত না। কিন্তু প্রতিটি স্তর থেকে পাথরের নমুনা তুলে আনতে হয়েছে সেকেলে পন্থায়, হিরের দাঁত লাগালো ড্রিল দিয়ে। কাদাটে তরল নিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে গেছেন।

এই যে রোটারি ড্রিলিং ড্রিল ঘোরার সময়ে কাদাটে ভূস্তরের উঠে আসা আর তার পরীক্ষা নিরীক্ষা— এই সবই হয়েছিল একটা ভাসমান জেটিতে। নমুনা পরীক্ষার ল্যাবোরেটরিও ছিল প্রকাণ্ড এই জেটিতে।

বহুবার ড্রিল তুলেও আনা হয়েছে ওপরে। ভূস্তর প্রহেলিকা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন বৈজ্ঞানিকরা। বহু হেঁয়ালির সমাধান ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর গা ফুঁড়ে এইভাবে ভেতরে ঢোকা. পৃথিবী আদতে কী দিয়ে তৈরি তার চুলচেরা হিসেব এইভাবে এর আগে কখনও হয়নি। সে এক মার্ভেলাস কাহিনি। তন্ময় হয়ে ছিলেন বৈজ্ঞানিকরা।

কিন্তু ড্রিলিং আচমকা হল্ট করেছিল বিয়াল্লিশ কিলোমিটার নীচে। ফুটন্ত থেকেছে এক লক্ষ ডিগ্রির প্লাজমা-ইলেকট্রন-নিউক্লিয়ার গ্যাস— যন্ত্রপাতির কাঁটা ঘুরে গেছে একদম ডান দিকে— কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। কোনও বাধার সম্মুখীন না-হয়ে তরতরিয়ে নেমে যাচ্ছিল যে প্লাজমা-ড্রিল-হেড— আচমকা তা আটকে গেছে দুর্ভেদ্য এক বাধায়।

ড্রিল টেনে তুলে, তার ডগা দেখবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সম্ভব হয়নি। 'একটা কিছু' ড্রিলকে চেপে ধরে রেখে দিয়েছে কুয়ো পাইপের মধ্যে।

একজন রুশ কর্মচারীর কৌতুক-টিপ্পনীটাও ছেপে বের করে দেওয়া হয়েছিল কাগজে— এ যে দেখছি কারাবাঘ গাধা! এগোতেও চায় না, পেছোতেও চায় না।

হাল ছাড়বার পাত্র ছিলেন না ড্রিলাররা। চেষ্টা চালিয়ে গেছিলেন কয়েক সপ্তাহ ধরে। দানবিক ড্রিলকে পাথর যেন কামড়ে ধরে রয়েছে, এই রহস্যের মীমাংসা করা যায়নি। ভাসমান দ্বীপে বসে তুমুল তর্ক আর শাস্ত্রীয় আলোচনা করেছেন বিশ্বের সেরা

ভূবিজ্ঞানীরা— কিন্তু ধারণাতীত নীচে ঢুকে যাওয়া ফুটো তার সিক্রেট ফাঁস করেনি কারও কাছে।

ভাসমান গোল মঞ্চ ছেড়ে তখন চম্পট দিয়েছিল প্রত্যেকেই। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল রাশি রাশি নমুনা। আরও বিশ্লেষণের জন্য।

নিস্তব্ধ মঞ্চকে কিন্তু নজরে রাখা হয়েছিল। প্রথমে ছিল দু'দল ড্রিলিং ওয়ার্কার। তারপর ছিল মাত্র দু'জন ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ার।

এইভাবেই গেছে ছ'টা বছর।

প্রতিদিন সকালে উইঞ্চ চালু করেছে ইঞ্জিনিয়াররা পাইপ টেনে তোলবার জন্য। প্রতিদিন সকালে পরখ করা হয়েছে কেব্‌ল টান টান অবস্থায় রয়েছে কিনা। প্রতিদিনই রিপোর্ট লেখা হয়েছে একই ভাষায়। যার সাদা বাংলা— নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু।

'গোঁয়ার গর্দভ কারাবাথ' প্রকৃতই কাণ্ডজ্ঞানহীন।

অনেক কথাই এই সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। বারো কিলোমিটার নীচের জল টগবগে ফুটন্ত। আঠারো কিলোমিটার নীচে পাওয়া গেছে কালো বালি। বড় ত্যাঁদোড় বালি, ড্রিলকে এগোতে দেয়নি—হিরের ফলাকে খেয়ে নিয়েছে দু'ঘণ্টার মধ্যে। একজন ভূবিজ্ঞানী নাকি গজরাতে গজরাতে বলেছিলেন, অন্তত আট টন কালো বালি টেনে না তুললে ড্রিল আর নীচে নামবে না!

কালো বালির এত জোর? কুরুনির মতো হিরে কুরে খায়!

আরও কিছু অদ্ভুত কথা শোনা গেছিল। সাঁইত্রিশ কিলোমিটার নীচে মিথেন-সমৃদ্ধ অঞ্চলে অত্যাশ্চর্য এক জাতের ব্যাকটিরিয়া থুকথুক করছে। সেই সঙ্গে রয়েছে সাংঘাতিক গ্যাস। আর আগুন—যা নেভাতে কালঘাম ছুটে গেছে।

সাতাশ কিলোমিটার নীচে একটা তারের রশি ছিঁড়ে গেছিল কেন সে ব্যাখ্যা আর পাওয়া যায়নি, ছিঁড়েছে কীভাবে, তা দেখবার জন্য নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটা ক্যামেরা। রেডিও অ্যাক্টিভিটি-তে যাতে ফিল্ম নষ্ট না-হয়ে যায়, সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও দেখা গেছে বারোটা বেজে গেছে ফিল্মের।

ড্রিল রড যেখানে ভেঙেছে, সেখানে এক তাল সিসে-ও নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল— ভাঙনের জায়গাটার ছাঁচ তুলে আনবার জন্য— সিসের তাল উঠেও এসেছিল।

কিন্তু তাতে কোনও ফ্র্যাকচারের ছাপ ওঠেনি।

এর পরের দিন দেখা গেছিল আর এক আশ্চর্য কাণ্ড। উইঞ্চ চালু করে যে-পাইপ টেনে তোলা যায়নি, সেই পাইপ আপনা থেকেই উঠে এসেছিল বিশ ইঞ্চির মতো। ধরিত্রী যেন জঠর থেকে ঠেলে তুলে দিচ্ছে পাইপকে। মানুষকে টেনে তুলতে দিচ্ছে না!

অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়ে গেল পরের চব্বিশ ঘণ্টায়! নিজে থেকেই কেসিং উঠে এল দেড় মিটার!

ফলে, যন্ত্রপাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছিল উঠন্ত পাইপকে। কেটে দিয়েছিল হাইড্রলিক কন্ট্রোল টিউব।

তার চাইতেও আশ্চর্য যে ব্যাপারটা হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল বৈজ্ঞানিকদের, তা এই, সব পাইপই নিজে থেকে উঠে আসছে শম্বুকগতিতে...অসম্ভব...কিন্তু হচ্ছে।

অথচ...

কেসিং-এর তলার দিকটা আটকে রয়েছে মাটিতে। কিন্তু তাও একটু একটু করে উঠছে ওপর দিকে!

এ আবার কী? মাটিতে সেঁটে থেকেও কেসিং-এর তলদেশ উর্ধ্বগামী হচ্ছে কী করে? তাও অতিশয় ধীরস্থির ভাবে— যেন তাড়াহুড়ো নেই একটুও!

ন'মিটার পাইপ যখন জলের ওপর ঠেলে উঠেছিল, তখন ড্রিল চালিয়ে কাটা হয়েছিল আট মিটার অংশ। প্লাজমা-কাটার চেপে বসেছিল পাইপের গায়ে, টাংসটেন নজল দিয়ে তেড়ে গেছিল ইলেকট্রন-নিউক্লিয়ার গ্যাস— কাটা পাইপকে সন্তর্পণে তুলে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল এমনভাবে যেন শোয়ানো হচ্ছে মোমবাতি, অথবা টেস্টটিউব র‍্যাকে রাখা হচ্ছে টেস্টটিউব।

যে আঁকশি দিয়ে কাটা পাইপকে ঝুলিয়ে এনে রাখা হয়েছিল ভাসমান মঞ্চে, তাকে বলা যায় একটা দানবিক মাকড়সা। অটোমেটিক থাবা আলগা করে, কাটা পাইপকে ডেকে শুইয়ে দিয়েই, ফের গুঁই গুঁই করে এগিয়ে গেছিল জল থেকে এক মিটার উঠে থাকা ড্রিল রডের দিকে। খামচেও ধরেছিল, কিন্তু টেনে তুলতে পারেনি একটুও।

পৃথিবীর ভেতরটা তা হলে এতই অজানা? যেন কাগজ দিয়ে মোড়া একটা বর্তুল? ভেতরকার রহস্য আজও জানা নেই?

তা হলে, সমুদ্র-তল নিজে থেকেই ওপরে উঠছে? থরথর করে কাঁপছে? পাইপ ঠেলে তুলে দিচ্ছে?

ম্যাগনেটোমিটার নিয়ে ব্যস্ত এক বৈজ্ঞানিক তখন বলেছিলেন, 'তাই যদি হয়, তা হলে পাইপ ম্যাগনেটাইজড হয়ে গেল কী করে?'

সত্যিই তো। কাটা পাইপ যে চুম্বক হয়ে গেছে!

গাল চুলকে বলেছিলেন ম্যাগনেট-বিশেষজ্ঞ, 'অদ্ভুত ব্যাপারটা তা হলে বলি। যে সংকর-ধাতু দিয়ে এই পাইপ তৈরি হয়েছে, তাকে কিন্তু চুম্বক করা যায় না।'

কথাটা নিখাদ সত্যি। তা সত্ত্বেও গত দু'মাসের ম্যাগনেটোমিটার গ্রাফে দেখা যাচ্ছে, পাইপ অল্প অল্প করে ম্যাগনেটাইজড হতে হতে গেছে, তারপরে, গত পনেরো দিনে চুম্বক হয়ে যাওয়ার স্পিড বেশ বেড়েছে এবং বেড়ে চলেছে প্রতিদিন।

যদিও মাত্রা খুব কম। কিন্তু অগ্রাহ্য করা চলে না।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের তলব পড়েছিল ঠিক এই পর্যায়ে, হেঁয়ালির সমাধান করার জন্যে। সঙ্গে ছিলাম আমি।

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেছিল দু'জনেরই হুংকারে। তখনও তেমন আলো ফোটেনি, রাতের আঁধার পুরো বিদায় নেয়নি।

গাঁ গাঁ করে বাতাস ঢুকে এসেছিল খোলা পোর্টহোল দিয়ে— কেবিনের মধ্যে। আছড়ে

আছড়ে পড়েছিল দরজার পরদা, খসখস করে উড়ে গেছিল কাগজপত্র আর ম্যাগাজিন।

বাইরে গিয়ে দেখেছিলাম ঝড় আসছে। অন্ধকার আকাশে চাঁদ অথবা তারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মেট্যাল গার্ডারে আছড়ে আছড়ে পড়ছে দমকা বাতাস।

দেখেছিলাম সেই অবাক কাণ্ড। আটকোনা রোটারি টেবিলের মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছে কলকবজা। পাইপের কেসিং সমেত।

ফ্যানট্যাস্টিক সেই দৃশ্য দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল আমার।

ব্যাপারটা কী? হঠাৎ গ্যাস উঠছে নাকি? তেড়েফুঁড়ে বেরোচ্ছে পৃথিবীর পেট থেকে?

কেটে কেটে নামানো শুরু হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় অংশ কেটে নেওয়া হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে— কিন্তু সব নীচের কেসিং অকস্মাৎ রহস্যময় এক শক্তির ঠেলায় ঠিকরে গেছিল ওপর দিকে।

এক্কেবারে চল্লিশ মিটার ওপরে।

কী আশ্চর্য কাণ্ড! উদ্ভটও বটে। অটোমেটিক প্লাজমা কাটার দিয়ে কাটা যায় শুধু আট ইঞ্চি পাইপ— বিশ ইঞ্চি কেসিং কাটবার ক্ষমতা তো তার নেই।

এখন উপায়?

বলেছিলেন প্রফেসার, 'হাতে সময় বেশি নেই। স্পিড তো সেকেন্ডে সেকেন্ডে বেড়ে চলেছে। কাটবার সময় নেই। ভাঙো পাইপ।'

এমার্জেন্সি ডিসিশন। আগে তারের রশি টানা যাক— যাতে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে যায় নীচে কোথাও— তারপর, ঝাঁ-ঝাঁ করে তার টেনে বের করে নিয়ে কেটে ফেলা যাক অটোমেটিক কাটার দিয়ে। তারপর কেসিং নিয়ে ভাবা যাবে।

তাই করা হয়েছিল। কন্ট্রোলে বোতাম টিপতেই গুঙিয়ে উঠেছিল মূল ইঞ্জিন, গাঁ-গাঁ করেছিল গিয়ারের পর গিয়ার, নাকি স্বরে আর্ত চিৎকার ছেড়েছিল টান টান হয়ে যাওয়া কেবল— যেন ভয়াবহ চাপ আর সইতে পারছে না, টাইট রশির গায়ে দামাল বাতাস আছড়ে পড়ায় যেন বোম্বেটে গানে মুখরিত হয়েছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ।

আচমকা খুব ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে এসেছিল পাইপের গা বেয়ে— পয়েন্টারের কাঁটা হেলে পড়েছিল বাঁ দিকে।

আঁকশিতে ঝুলছে এখন মাত্র ন'হাজার তিনশো মিটার পাইপ।

সদম্ভে বলেছিলেন প্রফেসর, 'ভেঙেছি...ভেঙেছি... পাইপ ভেঙে দিয়েছি! এবার চালু হোক কাটার!'

আঁকশি টেনে টেনে বের করে এনেছিল স্টিল রশি। কাটার খণ্ড খণ্ড করে কেটে গেছিল পাইপ, টেনে এনে শোয়ানো হয়েছিল গাদায়— যেন মোমবাতির ওপর মোমবাতি রাখা হচ্ছে। কাটার কাজ চালিয়ে গেছে ওপরে নীচে... ওপরে নিচে... বিরামবিহীনভাবে।

ততক্ষণে দিনের আলো বেশ ফুটেছে। বৃষ্টিও থেমেছে— হাওয়া যদিও ভিজে। সমুদ্রের প্রায় ওপরে নেমে এসেছে ঝড়ো মেঘ।

কেসিং ততক্ষণে এত ওপরে উঠে গেছে যে অটোমেটিক কাটিং দিয়ে কাটা আর সম্ভব হচ্ছে না। চোখের ইঙ্গিত করেছিলেন প্রফেসর। বুঝে নিয়ে আমি অটোমেটিক ব্র্যাকেট থেকে প্লাজমা

কাটার তুলে নিয়ে নিজেই কেসিং-এর গোড়া থেকে কাটতে শুরু করেছিলাম। কেটেও দিয়েছিলাম। অটোমেটিক ব্যাকেট নিজে থেকেই ওঠানামা শুরু করেছিল তারপর থেকেই।

সন্ধে নাগাদ কাটা পাইপের পাহাড় জমে গেছিল ডেকে।

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন প্রফেসর। ওঁকে কেবিনে শুইয়ে দিয়ে সারারাত ধরে খণ্ড খণ্ড করে কেটেছিলাম কেসিং।

ভোরের দিকে প্রফেসরের গলা শুনেছিলাম পেছনে, 'স্পিড কত?'

চমকে উঠেছিলাম, 'কীসের স্পিড?'

'কেসিং কাটবার স্পিড।'

'মিনিটে চার মিটার।'

'এবার একটু জিরেন নাও। ভার দাও আর কাউকে।'

তাই করেছিলাম। শরীর নেতিয়ে পড়েছিল। পরে শুনেছিলাম স্পিড আরও তুলে পাইপ কাটা হয়েছে— কেননা, ফুটো দিয়ে পাইপ ঠেলে উঠেছে আগের থেকে বেশি স্পিডে।

আট ইঞ্চি 'মাকড়সা'র জায়গায় লাগাতে হয়েছে একুশ ইঞ্চি 'মাকড়সা'। একশো কুড়ি মিটার পাইপ আছড়ে পড়েছে ডেকে।

জল থেকে মাথা উঁচিয়েছিল মাত্র তিন মিটার পাইপ। যেন, কাটা গাছের গুঁড়ি।

এর কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেছিল একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

কাটার আর কাজ করছে না। কেসিং-এর কাছে নিয়ে গেলেই হাই-টেম্পারেচার প্লাজমার অতি তীব্র নীলচে শিখা পালটে যাচ্ছে, তখন তা ম্যাড়মেড়ে ধোঁয়াটে চ্যাপটা শিখা— সেই সূচিতীক্ষ্ণতা আর নেই।

কিন্তু পাঁচ পা পেছিয়ে এলেই ফের দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক প্লাজমা শিখা।

হতভম্ব মুখে চেয়েছিলাম প্রফেসরের দিকে।

উনি বলেছিলেন, 'কাটার-এর সুইচ বন্ধ করে দাও। ওতে আর কাজ হবে না।'

'কেন?'

'পাইপ ঠেলে বেরিয়ে আসছে আরও হাই স্পিডে। চারধারের ম্যাগনেটিক ফিল্ডও বেড়ে গেছে। ফলে, একে অপরের শক্তি খর্ব করে দিচ্ছে।'

'এখন উপায়?'

'গ্যাস কাটার। গ্যাস বার্নার। স্টোর রুমে গ্যাস সিলিন্ডার আছে।'

তাই করা হয়েছিল। মিনিটে সাত মিটার পাইপ ঠেলে উঠেছে— গ্যাস কাটার দিয়ে তা কাটা হয়েছে।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সি-প্লেন নেমে এসেছিল ভাসমান মঞ্চের পাশে এর ঠিক পরেই।

পরের দিন পৃথিবীর সব ক'টা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় হেডলাইন নিউজ বেরিয়ে গেল এইভাবে:

'প্রশান্ত সংবাদ: ১,২০,০০০ ফুট ফুটো পরিত্যক্ত,' (নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন)

'রহস্যময় প্রাকৃতিক কাণ্ড, অতি-গভীর ফুটো থেকে ড্রিল পাইপ ঠেলে বের করে দিয়েছে পৃথিবী,' (দ্য টাইমস)

'ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের বিস্ময়কর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব— প্রশান্তে অশান্তি,' (ডেলি সোভিয়েট)

'ড্রিলার দীননাথ নাথ-এর বিপুল সাহস' (অস্ট্রেলিয়া নিউজ)

'সমুদ্র-শয়তানের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর মহাবীরেরা,' (নেদারল্যান্ডস নিউজ)

'যাই ঘটুক, আরব থাকবে নীরব,' (আরেবিয়ান ক্রনিকল)

'ধরিত্রীর জঠরে ছেঁদা করায় মহেশ্বরের কোপ,' (দৈনিক ভারত)

'আমরা উদ্‌বিগ্ন, আবার আসছে মহাপ্রলায়,' (দ্য হিন্দু)।

মিনিটে দশ মিটার হিসেবে কেসিং ঠেলে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরোটাই বেরিয়ে আসবে।

জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। পনেরো মিনিট পরেই ক্রেন ঝুলিয়ে নিয়ে গেল একটা দোলনা-কেসিং-এর পাশে।

ধূসরদেহী পাইপের দিকে বন্দুকের মতো তাগ করে ধরলাম গ্যাস-কাটার। ঠিকরে গেল অগ্নিশিখা।

সন্ধ্যা সাতটায় কনফারেন্স শুরু হল মেসরুমে।

মিটিং-এর রিপোর্ট সংক্ষেপে এই:

কেসিং এখন ঠেলে উঠছে মিনিটে এগারো মিটার। এই স্পিডে উঠতে থাকলে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে পুরোটাই ঠিকরে আসবে পৃথিবীর পেট থেকে।

তলার দিকটা কিন্তু ভাসমান থাকবে না আটকে থাকবে সমুদ্রের তলায়— কেননা, এই দিকটাই তো ঠেলে তুলছে গোটা কেসিং-কে।

সমুদ্র গভীরে যেখানে কেসিং ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সাত হাজার মিটার নীচে, সেখানকার ভাঙা অংশ নিশ্চয় এখনও আপনা থেকেই ঠেলে উঠছে।

সমুদ্র-তলে যে ফুটো করা হয়েছিল ড্রিল ঢোকানোর সময়ে, সেই ফুটোর চারপাশে পাথর গলে গিয়ে নিশ্চয় কৃত্রিম কেসিং তৈরি হয়ে গেছে। সেই কৃত্রিম কেসিং এখন নিজে থেকেই উঠে আসছে।

মস্কোর এক বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, 'তা হলে ফটোকোয়ান্টাম ছুরি আনাই মস্কো থেকে— যত শক্ত জিনিসই হোক না কেন, নিমেষে কেটে দেবে।'

প্রফেসর বলেছিলেন, 'ভূস্তরের অজানা কোনও ফাটলে আমাদের তৈরি ফুটো ঢুকে যাওয়ার ফলেই এই বিপত্তি। এমন কিছু বস্তু সেখানে রয়েছে যা প্রচণ্ড চাপ মেরে কেসিং ঠেলে বের করে দিচ্ছে।'

'সেই অজানা বস্তুটা কী?' সমস্বরে জানতে চেয়েছিলেন অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা।

প্রফেসর তখন দাবড়ানি দিয়েছিলেন, 'আগে থেকে সেটা জানবার চেষ্টা করা হয়নি

কেন? কেন টেলিভিশন ক্যামেরা নামিয়ে দেওয়া হয়নি? সমুদ্রের গভীরে কী কাণ্ড চলছে, ডেকে বসেই তো দেখা যেত।'

আমতা আমতা করে বলেছিলেন সেই আমেরিকান বৈজ্ঞানিক যিনি এই কর্মকাণ্ডের হোতা— 'হ্যাঁ, ভুলটা করেছি গোড়ায়। এখনকার কথা এখন বলা যাক। যে বস্তু পাইপ ঠেলে বের করে দিচ্ছে, তার ম্যাগনেটিক প্রপার্টি রয়েছে। পাইপগুলোই ম্যাগনেট হয়ে গেছে। অথচ সব পাইপই নন-ম্যাগনেটিক ধাতুমিশ্রণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার শুধু এইটাই নয়, প্লাজমা-কাটার যন্ত্রকেও বিকল করে দিচ্ছে অদ্ভুত এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড।'

প্রফেসর বলেছিলেন, 'পৃথিবীর পেট খুঁচিয়ে কী কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন, তা এখন বোঝা যাচ্ছে না। কেসিং ঠিকরে বেরিয়ে আসবার পর ভয়ানক ভূকম্প ঘটতে পারে।'

কনফারেন্সে আমি যাইনি। দোলনায় বসে গ্যাস কাটার দিয়ে কেসিং কাটছিলাম। দু'মিটার লম্বা একটা কেসিং টুকরো ডেকে শুইয়ে দিয়ে ছুটে এসেছিলাম প্রফেসরের কাছে।

প্রফেসরের প্রশ্ন ছিল এই: 'দীননাথ, তোমার আঙুল কাঁপছে কেন?'

আমি বলেছিলাম: 'পাইপ আমাকে টানছে বলে।'

'কী বলতে চাও?'

'আমি যেন একটা লোহা, পাইপ যেন একটা চুম্বক। টানছিল... পালিয়ে এসেছি।'

প্রফেসর ফতোয়া দিয়েছিলেন কনফারেন্সকে— টেলি-ক্যামেরা নামানো হোক, এক্ষুনি।

প্রশান্তের কালো জলে নেমে গেছিল টেলি-ক্যামেরা— কেব্‌ল ঘুরে গেছিল পুলির ওপর।

তিন ঘণ্টা ধরে ক্যামেরা নামছে তো নামছেই। পুরো ব্যাপারটাই অটোমেটিক। তাড়াহুড়ো করলেও কিছু হবে না।

সমুদ্র এখানে বেশ গভীর। আরও আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে টেলিভিশন কেবিনে।

মঞ্চ ভরে গেছে কাটা পাইপের স্তূপে। যেখানে সেখানে জড়ো করা হয়েছে। চারদিকে থইথই করছে কালো জল, মাথার ওপর কালো আকাশ।

পাইপ-স্তূপের ওপর দিয়ে টপাটপ লাফ দিয়ে পৌঁছেছিলাম নিথর মূর্তি প্রফেসরের সামনে।

বলেছিলাম, 'শুনছেন?'

প্রফেসর বলেছিলেন, 'শুনছি।'

পায়ের তলায় গোটা মঞ্চ কাঁপছে... গুমগুম শব্দ করে চলেছে। ভাইব্রেশন... সাগর-কম্পন মঞ্চকেও কাঁপাচ্ছে।

কিন্তু সাগর কাঁপছে কেন? প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বের করার আগেই প্রফেসর বলেছিলেন, 'জল ফুটছে একশো চার ডিগ্রি ফারেনহিটে।'

'এসব কী ঘটছে, প্রফেসর?'

'দীননাথ, তুমি তো আমার সঙ্গে স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডে গেছিলে। সেখানে একটা গিরিখাতে তোমাকে নিয়ে গেছিলাম।'

'প্যাডি ব্ল্যাক?' বলেছিলাম আমি।

'মধুর প্রতিধ্বনি ফিরে আসে সেখানকার পাহাড় থেকে— কথা বললেই জবাব দেয় প্যাডি ব্ল্যাক। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, আছ কেমন, প্যাডি ব্লাক? কী জবাব পেয়েছিলে?'

'চমৎকার! ধন্যবাদ।'

'পাহাড়ের প্রতিধ্বনি যদি এমন পিলে চমকানো হয়, সমুদ্র তার কেরামতি দেখাবে না কেন?'

'একথা কেন বলছেন, প্রফেসর?'

'দীননাথ, বিচিত্র বিশ্বের সব রহস্য এখনও কেউ জানেনি। জানবে যথাসময়ে। মঞ্চ এত নিস্তব্ধ হয়ে গেল কেন?'

দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে কারণটা দেখে এলাম।

কেসিং আর নড়ছে না।

কেসিং আর ওপরে উঠছে না!

'দম ফুরিয়ে গেল নাকি?' বলেছিলেন প্রফেসর।

কথা শেষ হতে না হতেই ঝাঁকুনি মেরে সটান ওপর দিকে উঠে গেছিল কেসিং— উঠে গিয়েই দড়াম করে নেমে এসে ঠেকে রইল আগের জায়গায়।

না, না, আগের চাইতেও নীচের জায়গায়।

এদিকে গোটা ভাসমান মঞ্চ কাঁপছে থরথর করে। সব কটা নাট বল্টুতে যা ঝাঁকুনি পড়ছে— আলগা হয়ে না যায়।

চোখের সামনেই আবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই ফের সড়াত করে নেমে এসেছিল কেসিং। এবার কিন্তু অব্যাহত থেকেছে কেসিং-নৃত্য! নেচেই চলেছে!

খুব ঠান্ডা গলায় প্রফেসর বলেছিলেন, 'শুধু কেসিং তো নয়, সমুদ্রের জমিও তো তাথৈ তাথৈ নাচ জুড়েছে!'

স্ক্রিনে সেই দৃশ্যই দেখা যাচ্ছে এখন। উঠছে আর নামছে একটা ধূসর বস্তু। ন্যাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ নাচন জুড়েছে আপন তালে! খুব আস্তে আস্তে ফুলে উঠছে... ঢিবি গজাচ্ছে... আশপাশ দিয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। খুব আস্তে... যেন ইচ্ছে নেই... তবু যেতে হচ্ছে।

স্ক্রিনে এবার আচমকা দেখা গেল কেসিং-পাইপ তলদেশ। ঠিক যেন একটা খড়। সমুদ্রতলের আবর্জনার তাণ্ডব নৃত্যের ওপরে ভাসছে।

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল স্ক্রিন।

আর ঠিক তখনই ভাসমান মঞ্চ যেন বজ্রমুষ্টি প্রহারে এমনই কেঁপে উঠল যে চেয়ার থেকে দড়াম করে পড়ে গেলাম আমি।

বিড়বিড় করে বললেন প্রফেসর, 'যা ভয় করেছিলাম। ফুটো থেকে কেসিংকে ঠেলে বের করে দেওয়া হল। কেসিং-এর নীচের দিকটাই শুধু দেখতে পাচ্ছি— নেচে চলেছে জঞ্জালের ওপর। এরপর কী ঘটবে, বলা যাচ্ছে না।'

স্বগতোক্তি করেছিলাম আমি, 'ডেঞ্জারাস কিছু ঘটবে।'

গনগনে চোখে আমার দিকে চেয়ে প্রফেসর বলেছিলেন, 'কাওয়ার্ড! যাও, কেসিং টেনে তোলার ব্যবস্থা করো।'

সেই ব্যবস্থাই যখন করা হচ্ছে, পায়ের তলায় মঞ্চ থরথর করে কেঁপেই চলেছে। যেন জ্বরে কাঁপছে।

কেসিং তুলে, কেটে কেটে ফেলা হল ভাসমান মঞ্চে। দমাস দমাস করে একটার পর একটা কেসিং পড়ছে গ্যাংওয়ে-তে। বেশ কিছুটা তুলে আনবার পর হঠাৎ থেমে গেল মঞ্চের কাঁপুনি।

তখন সুনীল প্রভাতের আবির্ভাব ঘটেছে পুবে।

রহস্যময় শক্তি কিন্তু ঠেলে তুলে দিল ড্রিল পাইপকে। সাগরের তলার কুয়োর ভেতর থেকে— মানুষের হাতে গড়া কুয়োর মধ্যে রইল না। বেগ কিন্তু বেড়ে গেল হঠাৎ। অটোমেটিক কাটার সেই উত্থান-বেগের তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না।

সূর্য যখন মধ্য গগনে, তখনও তেড়েফুঁড়ে বিবর থেকে ঠেলে উঠছে পাইপ হাই স্পিডে, অটোমেটিক কাটার ফেলে দিয়ে দোলনায় বসে গ্যাস কাটার চালানো হচ্ছে।

পর্বত প্রমাণ কাটা পাইপ জমে গেছে ডেকে।

ভোরের দিকে এসে পৌঁছোল সি-প্লেন। ধরাধরি করে নামানো হল অনেকগুলো প্যাকিং কেস— যাদের মধ্যে রয়েছে ফটোকোয়ান্টাম অ্যাপারেটাস।

এ-যন্ত্র এসেছে রাশিয়া থেকে। সঙ্গে এসেছেন একজন রুশ টেকনিশিয়ান। বিশেষ এই মেশিন চালানোয় বিশেষজ্ঞ।

কিন্তু এলেন বড় দেরিতে।

সমুদ্র গর্ভে এখনও রয়েছে দুশো মিটার ড্রিল-পাইপ... তারপর রইল দেড়শো মিটার...

সরিয়ে আনা হল দোলনা। পাইপ যখন হুহু করে ঠেলে উঠছে, তখন সেখানে ঝুলন্ত কিছু রাখা বিপজ্জনক।

একশো কুড়ি... আশি...

পুবের আকাশে তখন ভোরের আগুন। কিন্তু কারও নজর নেই সেদিকে, ফ্লাডলাইটের প্রখর আলো এখনও জ্বলছে ভাসমান মঞ্চে। ওজন তোলবার যন্ত্র যেখানে রয়েছে, মঞ্চের ঠিক মাঝখানে গোল করে কাটা জায়গায়— যেখান দিয়ে ঠেলে উঠছে পাইপ রহস্যময় গুঁতো খেয়ে, তার পাশেই এসে দাঁড়াল একটা জিপ গাড়ি। খোলা জিপ, অতর্কিতে কিছু ঘটে গেলেই যেন টেকনিশিয়ানদের নিয়ে ভাসমান মঞ্চের কিনারায় চলে যেতে পারে।

ফুটোর কাছে রয়েছে চারজন।

ষাট মিটার...

থরথর করে কেঁপে উঠল ভাসমান মঞ্চ। যেন নীচ থেকে কাঁধের ঠেলা দিয়ে মঞ্চকে কেউ ওপরে তুলতে চাইছে...

'আর নয়! জিপে ওঠো!' চিৎকার ছেড়েছিলেন প্রফেসর।

নিজে কিন্তু দৌড়ে গিয়ে ঝুঁকে দেখছিলেন ব্যাদিত গহ্বরের দিকে। আবার থরহরি কম্প

দেখা গেছিল গোটা ভাসমান মঞ্চে। বিশাল এই মঞ্চ যেন জলতলের ভয়ানক শক্তির কাছে কিছুই নয়। মঞ্চের মাঝখানকার যে ফুটো দিয়ে ড্রিল-পাইপ নামানো হয়েছিল, মড়মড় করে ভাঙছে সেখানকার কিনারা। দড়াম করে আছড়ে পড়েছিল পাইপের শেষ অংশটুকু—কিন্তু সে আওয়াজে কান নেই কারও। চোখ মাঝের ফাঁকের দিকে— না-জানি কী বিভীষিকা এবার মাথা চাড়া দেবে সেখানকার জল থেকে।

প্রফেসর বুঝি প্রস্তরমূর্তি হয়ে গেছেন।

আওয়াজ একটু কমে গেল। এখন আর কানে তালা লাগছে না। কয়েক সেকেন্ডের সাসপেন্স... ছানাবড়া চোখ প্রত্যেকেরই। যে-জিনিসটা সমুদ্র-তল কামড়ে ধরে ড্রিল ঢুকিয়ে ফুটো করা চালিয়ে যাচ্ছিল... সেই বস্তুটাই জল থেকে উঠে এসে হেলে পড়ল একদিকে। দড়াম করে আছড়ে পড়তেই বেঁকে তেউড়ে গেল ইস্পাতের ফ্রেম— আঁকশি-পা-গুলো আকাশমুখো হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

ভারী যন্ত্র নামানোর ডেরিক-এর নীচে ডেক যেন ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে। ফুলে ফুলে উঠছে। মেঘের আকারে বাষ্প জমছে এখানে সেখানে— গায়ে লাগছে হলকা— গরম বাতাসের ঝাপটা।

ফুটো যে জায়গায় করা হয়েছিল, সেইখান দিয়ে গোলমতো কালচে একটা বস্তু মাথা চাড়া দিচ্ছে একটু একটু করে। গোল গম্বুজের চুড়ো। আর একটু মাথাচাড়া দিতেই গম্বুজের গায়ের ধাক্কায় মড়মড় করে ভেঙে গেল মেঝে। এখন তা একটা অর্ধ-বর্তুল। মিনিট কয়েক পরেই দেখা গেল, জল থেকে উঠে আসছে একটা বিশাল থাম।

গম্বুজের গা ঠেকে গেল যন্ত্রপাতি নামানোর গোলাকার মঞ্চে...ভাঙল মড়মড় করে, ভাসমান মঞ্চ থেকে ডেরিক-এর ঠ্যাং উপড়ে এনে সবসুদ্ধ উঠে গেল ওপর দিকে।

কানে তালা লাগানো শব্দে ভেঙে গেল ইস্পাতের সব কটা ঠ্যাং।

কালো থাম উঠে গেল আরও ওপরে— গম্বুজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে গেল দেড়শো মিটারের ডেরিক।

মঞ্চের ঠিক মাঝখান ফুঁড়ে দানব-থাম এখন উঠে গেছে আকাশের দিকে— যেন একটা অতিকায় মোমবাতি।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রফেসরকে, 'কেটে ফেললে হয় না?'

চোখে বাইনাকুলার এঁটে থাম দেখছিলেন প্রফেসর। বললেন, 'কাটা যাবে না।'

থামের ব্যাস ততক্ষণে দাঁড়িয়েছে পনেরো মিটারে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফুট। এত মোটা থাম কাটা চাট্টিখানি কথা নয়। ফ্লাডলাইটের আলোর চেকনাই দিচ্ছে কালো কুচকুচে গা। কোন অতল থেকে এর উত্থান, কী পদার্থ দিয়ে গড়া— তা জানা নেই। খনিজ পদার্থ গলে গিয়ে কী গড়েছে? কে জানে?

আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু কিছু তো একটা করা দরকার।'

'কিচ্ছু করার নেই,' বলেছিলেন প্রফেসর, 'আসছে আরও বড় বিপদ। তৈরি হও তার জন্যে।'

আমি রেগে গেছিলাম, 'আর আশকারা দিলে আকাশে গিয়ে ঠেকবে যে। আমি বৈজ্ঞানিক নই— মেহনতি মানুষ। ড্রিল চালিয়ে কেটে তবে ছাড়ব।'

রুশ টেকনিশিয়ান সায় দিয়েছিল, 'ভাল জাতের লোহা। কেটে নামালে কাজে লাগবে। ফটো কোয়ান্টাম অ্যাপারেটাস যখন এসে গেছে, গা চেঁচে একটু স্যাম্পেল তুলে নেওয়া যাক। জিনিসটার বিশ্লেষণ দরকার।'

প্রফেসর গুম হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'কাচের ড্রেস পরে নিন। জাপানি জাহাজের আসবার কথা, এখনও এল না কেন? খবর নিন। যে-কোনও মুহূর্তে এই ডেক ছেড়ে পালাতে হবে। তৈরি থাকুন।'

হিট রেসিস্ট্যান্ট সুট পরে পাঁচজন আস্তে আস্তে এগিয়ে গেছিল মঞ্চের মাঝের দিকে। কাচের শক্ত সুট টিনের পোশাকের মতো টং-টং ঝন ঝন শব্দ সৃষ্টি করে গেছিল।

আমি ছিলাম এই পাঁচজনের একজন। এয়ার টাইট হেলমেটের কাচের ভেতর দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলাম কালো থামের দিকে।

কত টেম্পারেচার হবে? তিনশো? পাঁচশো। বেশিও হতে পারে। জল ঠেলে ওঠবার সময়ে একটু ঠান্ডা মেরেছে।

মঞ্চ ভাঙছে মড়মড় শব্দে— গোল কিনারা ঘেঁসে ভাঙতে ভাঙতে থাম উঠছে ওপর দিকে।

থাম ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছিলাম পাঁচজনে। রুশ টেকনিশিয়ানের হাতে ছিল রে-গান যার রুবি নলচে থেকে ঠিকরে যাবে প্রচণ্ড পুঞ্জীভূত শক্তি— অদৃশ্য কিরণ ধারায়।

শুরু হয়েছিল রশ্মিবর্ষণ।

কিন্তু কালো থামের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। শুধু আরও মেঘ জমেছিল থাম ঘিরে।

কালো থাম যেন অদৃশ্য রশ্মিকে তারিয়ে তারিয়ে গিলে নিচ্ছে। যেন বড় সুখাদ্য পেয়েছে।

ঠিক সেই সময়ে একটা অতীব আশ্চর্য ব্যাপার হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম পাঁচজনেই।

কালো থাম যেন আমাদের টানছে। আকর্ষণ করছে।

আমরা যেন লোহা— থাম যেন একটা মহাকায় চুম্বক।

থামের চুড়ো ঢুকে গেল মেঘের মধ্যে।

আমি বলেছিলাম, 'এ কী রে বাবা, টিউব থেকে টুথপেস্ট বেরুচ্ছে নাকি!'

প্রফেসর বলেছিলেন, 'জীবনে অনেক ভলক্যানো দেখেছি, এমনটা কখনও দেখিনি।'

আমি বলেছিলাম, 'থাম কিন্তু হেলে পড়ছে।'

দূরবিন দিয়ে দেখতে দেখতে প্রফেসর সায় দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, হেলে পড়ছে।'

'উপায়?' আমার প্রশ্ন।

'অ্যাটম বোমা,' প্রফেসরের জবাব।

'আনতে আনতেই তো চাঁদে গিয়ে ঠেকবে,' আমার মন্তব্য।

রুশ টেকনিশিয়ান তখন গল্প জুড়েছিল, কবে কোন সাগরে আধ মাইল লম্বা একটা সমুদ্র-সাপ দেখেছিল— সেই গল্প।

প্রফেসর আধবোজা চোখে চেয়েছিলেন কালো থামের দিকে।

মাঝরাত নাগাদ এল জাপানি জাহাজ। দাঁড়াল মঞ্চ থেকে এক মাইল দূরে— সাংঘাতিক আঁচ থেকে গা বাঁচিয়ে। একটা সাদা লঞ্চ চলে এল জেটিতে। প্রথম দু'বারে গেল তিপ্পান্নজন— জেটিতে যারা ছিল। তৃতীয়বারে সমস্ত মালপত্র।

প্রেস ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা যখন ফ্ল্যাশ মেরে চলেছে, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তখন গুম মেরে চেয়ে রয়েছেন এক মাইল দূরের দানব-থামের দিকে।

আরও একটু বেঁকেছে... একটু হেলেছে থাম! কেন?

ঘুম ভাঙবার পর পোর্টহোল দিয়ে দেখেছিলাম নীল আকাশ, নীল সমুদ্র আর গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ, বহু দূর দিগন্তে। ভাসমান মঞ্চ দেখা যাচ্ছে— ঠিক যেন একটা খুদে বাক্স, টিনের বাক্স, ওপরে সাদা বাষ্প দিয়ে গড়া টুপি। আকাশ বুঝি জ্বলছে। সমুদ্র থেকে যেন একটা সরু সুতো উঠে গিয়ে আকাশে ঠেকেছে।

রহস্যময় সেই কালো থাম। এখন মেঘে ঢুকেছে। বিশাল ধরিত্রীর গায়ের একটা লোম বললেই চলে, অথবা, পৃথিবীর ল্যাজ।

এই জাপানি জাহাজটার নাম 'ফুকুওকা'। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেছিলাম নীচে ভাসছে সাদা লঞ্চটা।

প্রফেসর ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন কালো থামের দিকে। আমি গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম।

আস্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এখন হাইট কত?'

'তিরিশ কিলোমিটার, রাডারের হিসেবে।'

'বাড়ছে কী স্পিডে?'

'ঘণ্টায় প্রায় আটশো মিটার স্পিডে।'

পেছনে জড়ো হয়েছিল কয়েকজন জার্নালিস্ট। খবর যেখানে, ওরা সেখানে। তাদেরই একজন চমকে উঠে বলেছিল, 'তি-রি-শ কিলোমিটার!'

জনাকয়েক জাপানি যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে গেল লঞ্চে। লঞ্চ এগিয়ে গেল ভাসমান মঞ্চের দিকে। দেখলাম, সব কিছু নামানো হল লঞ্চে।

থার্মোমিটার ছিল তার মধ্যে। সেই যন্ত্রেই দেখা গেছিল, মঞ্চ এখন তেতে লাল হয়ে রয়েছে— আগুনের ওপর যেন কড়া বসানো রয়েছে। যারা নেমেছে মঞ্চে, তারা প্রত্যেকেই কাচের কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাক পরে নিয়েছে।

যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেটোগ্রাফ— কতখানি চুম্বক হয়েছে কালো থাম, তা দেখবার জন্যে। রয়েছে রেডিও-অ্যাকটিভিটি মাপবার যন্ত্র।

মাপ নিয়ে দেখা গেল, কালো থাম এখন লম্বায় দুশো পঁচিশ মিটার।

কিন্তু চুম্বক থাম মানুষ টানে কতদূর থেকে?

রেডিয়োতে প্রশ্ন এল আমার কাছে। জবাব দিলাম আমি, 'ঠিক বারো গজ দূরে থাকলে।'

আর ঠিক এই সময়ে থরহরি কম্প শুরু হয়ে গেছিল ডেকে। থাম ঘিরে ভুসভুস করে ঠেলে উঠেছিল পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ধোঁয়া— মঞ্চ ঢেকে গেছিল ধোঁয়ায়।

কাঁপুনি থেমে গেছিল একটু পরেই। অবাক বিস্ময়ে সবাই চেয়েছিল প্রকৃতির রুদ্র লীলার দিকে।

থামের বৃদ্ধির স্পিড বেড়ে গেল অকস্মাৎ।

ঘন মেঘে ছেয়ে গেল থামের শীর্ষদেশ। সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে, আগুনের মতো কমলা হয়ে গেল পশ্চিমের আকাশ।

এ যেন পৃথিবী নয়, অন্য এক গ্রহ।

আর ঠিক এই সময়ে কালো থাম টেনে ধরেছিল মঞ্চে দাঁড় করা ট্রাককে। রহস্যময় শক্তি যন্ত্রপাতি সমেত ট্রাককে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে অদৃশ্য করে দিয়েছিল বাষ্প-মেঘের মধ্যে।

তারপরেই দেখা গেল ট্রাক-কে। লেগে রয়েছে থামের গায়ে। বিশ মিটার উঁচুতে। হুহু করে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল মেঘের মধ্যে।

যাত্রা শেষ হবে বোধহয় চাঁদে গিয়ে!

গোটা পৃথিবী থেকে বাঘা বাঘা সাংবাদিকরা জড়ো হয়েছে লণ্ডনে। শুরু হল প্রেস কনফারেন্স।

বললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন, আজকের এই মহা সাংবাদিক সম্মেলন উদ্‌বোধন করার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে আমার ওপর। কিন্তু প্রাথমিক কিছু তথ্য আর কয়েকটা অনুমিতি ছাড়া আর কিছু আপনাদের দিতে পারব না। হয়তো তা প্রকৃত সত্যের ধারে কাছেও না-আসতে পারে।

'ছ'বছর আগে সমুদ্রের বিয়াল্লিশ কিলোমিটার নীচে একটা অতি-গভীর ফুটো করা শুরু হয়েছিল। ড্রিল আটকে গেছিল পাথরে। অব্যাখ্যাত কারণে, ড্রিলপাইপকে টেনে তোলাও যায়নি। সেই সময়ে অনেকে অনেক অদ্ভুত মন্তব্য করেছিলেন। আপনাদের তা অজানা নয়। ছ'বছর পরে ঘটনা নতুন দিকে মোড় নিয়েছে।

'ড্রিলিং শুরু হয়েছিল একটা সুগভীর ট্রেঞ্চের তলার দিকে। আমাদের হিসেব অনুযায়ী, ভূস্তর সেখানে খুব পুরু নয়। তা হলে কি ড্রিল কোনও ফাটলে গিয়ে ঢুকেছে? নীচের স্তরে কোনও ঝামেলা পাকিয়েছে প্লাজমা ড্রিলিং? জবাব আমাদের জানা নেই।

'ধরে নেওয়া যেতে পারে সুগভীর কোনও স্তরের উপাদান দিয়ে তৈরি এই কালো থাম। প্রচণ্ড চাপের ফলে তা নমনীয়। যে-কোনও আকার ধারণে সক্ষম। ড্রিলিং-এর ফুটোর সন্ধান পেয়ে তার মধ্যে দিয়ে ঠেলে উঠেছে পৃথিবীর খোসা ভেদ করে। ফুটোর মধ্যে দিয়ে উঠেছে আস্তে আস্তে, একটু একটু করে গতিবেগ বেড়েছে। ঠিক যেন টিউব থেকে বেরোচ্ছে টুথপেস্ট। পাইপ থেকে বেরিয়ে আসবার পর এই থাম ছড়িয়ে পড়ার জায়গা পেয়ে থামের

আকার নিয়েছে— একটু পশ্চিমে হেলে পড়েছে। থামের রাসায়নিক উপাদান আর প্রাকৃতিক গঠন সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। আপনারা জানেন, বহু বৈজ্ঞানিক মনে করেন, মেন্ডেলতত্ত্ব সাধারণ তাপমাত্রা আর চাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অতি-গভীর অঞ্চলে, যেখানে চাপ এবং তাপমাত্রা অত্যধিক, সেখানে পরমাণুর আকার বা গড়ন আর খোলক বা বেষ্টনী পালটে যায়। ইলেকট্রনের পরমাণু-কক্ষ ঘাড়ে চেপে বসে। আরও অতি-গভীরে ইলেকট্রনের কক্ষগুলো মিলেমিশে যায়। কাক্ষিক-ইলেকট্রনেরা তখন সমবায় অথবা যৌথ পদ্ধতিতে চলে। তখন নতুন ধর্ম নেয় মৌলিক পদার্থরা। তখন সেখানে নেই কোনও লোহা, ফসফরাস, ইউরেনিয়াম, আয়োডিন, অথবা কোনও মৌলিক পদার্থ। আছে শুধু ধাতব চরিত্রের সনাতন পদার্থ—যা সর্বগত, সার্বিক ইউনিভার্সাল।

'আমাদের মতবাদ হল এই— এখুনি যা বললাম। আপনারা জানেন, থামের নমুনা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলাম— ব্যর্থ হয়েছি। একটা বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই: বস্তুটার ধর্ম অসাধারণ।'

শুরু হল প্রশ্নোত্তর। আমেরিকার সাংবাদিক: কালো থাম কি আমেরিকার ঘাড়ে গিয়ে পড়বে?

প্রফেসর: এখনই তা বলা যাচ্ছে না।

বাগদাদের জার্নালিস্ট: 'গড' কি রেগেছেন?

প্রফেসর: 'গড'-এর অস্তিত্বের উপযুক্ত প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি।

জাপানের জার্নালিস্ট: গোটা পৃথিবীটা কি এখন হিরোশিমা হয়ে যাবে?

প্রফেসর: এনার্জি আসছে কোত্থেকে? আইনস্টাইন তাঁর যুগান্তকারী 'আপেক্ষিকতা বাদ' তথ্যে পদার্থ আর শক্তির অভিন্নতা প্রতিপাদন করেছেন। E=mc2। এনার্জির সঙ্গে বস্তু আর আলোর গতিবেগের সমন্বয় দেখিয়েছেন। এই হিসেবে, এক গ্রাম বস্তুর ভেতরে নিহিত রয়েছে যে এনার্জি, তা টোয়েন্টি টোয়েন্টি মিলিয়ন ক্যালোরি। কতরকম ভাবে এই এনার্জি ঠিকরে যেতে পারে, তার হিসেব নেই! হিরোশিমায় এই বিচ্ছুরণের একটা প্রকাশ দেখা গেছে।

ইংল্যান্ডের জার্নালিস্ট: সিঙ্গল ফিল্ড-এর থিয়োরি নিয়ে কিছু বলবেন?

প্রফেসর: জগৎ জুড়ে রয়েছে একটাই শক্তিক্ষেত্র? এই তো? সেটা ম্যাগনেটিজম হতে পারে, অভিকর্ষ হতে পারে— নানা মুনির নানা মত। অথবা স্বয়ংব্রহ্ম—উপনিষদের মতে। কিন্তু কালো থামকে ঘিরে রয়েছে যে অজানা শক্তিক্ষেত্র— তার কাজ শুধু অনুভূমিকভাবে— হোরাইজেনটাল ভাবে।

ভারত-এর জার্নালিস্ট: ইথার থিয়োরি?

প্রফেসর: থাম যদি আয়ন মণ্ডলে পৌঁছোয়, তখন বলা যাবে। যে ফুটো খুঁড়েছি, তা ভূকেন্দ্র থেকে শতকরা এক ভাগ পথও পেরোতে পারেনি। অথচ দেখা যাচ্ছে অতীব আশ্চর্য শক্তির প্রকাশ।

পাকিস্তানের জার্নালিস্ট: শেষ কোথায়?

প্রফেসর: এই তো সবে শুরু।

ঘুম ভেঙেছিল যেন কামান গর্জনের মতো আওয়াজে, দৌড়ে গেছিলাম পোর্টহোলের সামনে। আকাশ কালো হয়ে রয়েছে ঝড়ো মেঘে। বিদ্যুৎ লকলকিয়ে যাচ্ছে। আর একবার শোনা গেল গুরুগম্ভীর মেঘগর্জন। কেবিনের আলগা জিনিসপত্র ঝনঝন করে উঠল সেই শব্দ ধাক্কায়।

কোনওরকমে গায়ে জামা গলিয়ে ছুটে গেছিলাম ডেকে। ভিড় জমেছে ভাসমান মঞ্চের পাশে। চেঁচিয়ে কথা বলছে বটে, কিন্তু মুহুর্মুহু মেঘের চিৎকার তা ডুবিয়ে দিচ্ছে।

এখন ভোরের সময়। আকাশ নীল থাকে। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মাঝরাত। বুঝি গোটা পৃথিবীর মেঘ জড়ো হয়েছে কালো থামের কাছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। আছড়ে আছড়ে পড়ছে শুধু কালো থামের ওপর...

শুধু কালো থামের ওপর।

গুরুগুরু নিনাদ বয়ে চলেছে মেঘের রাশির মধ্যে দিয়ে।

ফ্যানট্যাস্টিক দৃশ্য! বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে উঠছে সমুদ্র। জলের ওপরে বিদ্যুতের ছোরা-খেলা চলছে তো চলছেই। ডুয়েল চলছে কিন্তু স্টিম পরিবৃত কালো থাম ঘিরে।

তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল তার পরেই।

সেই সঙ্গে ঝড়। এরকম প্রলয়ংকর ঝড় এর আগে কখনও দেখিনি। মোচার খোলার মতো জাহাজ দুলছে ডাইনে বাঁয়ে, বাঁয়ে ডাইনে। উলটে না যায়। শক্ত মুঠোয় রেলিং ধরে রেখেছি। ফুঁসছে নীচের সমুদ্র। বিদ্যুৎ খেলছে মেঘে... যেন ফ্ল্যাশ বাল্‌ব জ্বলছে আর নিভছে... চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সেদিকে চেয়ে থাকলে, বাতাসে পাচ্ছি ওজোন-এর গন্ধ।

হুড়হুড় করে জল উঠে এল ডেকে। ঢুকে গেল রাডার রুমে। কে যেন একজন বললে, 'বিদ্যুতে ভরে গেছে বাতাস... ইলেকট্রিসিটি থইথই নাচ নেচে চলেছে বাতাসে।'

জাপানি জাহাজ সরে গেল আরও দূরে। থেমে রইল সেখানেই। ঝড়ের হুংকার চলল মাথার ওপর দিয়ে। অসংখ্য আংটির মতো সাদা বিদ্যুৎ কালো থাম ঘিরে লকলক করে চলল বিরামবিহীন ভাবে। চারদিক থেকেই ধেয়ে আসছে বিদ্যুতের তির— লক্ষ্য ওই কালো থাম। এই সময়ে দেখা গেল একটা আগুনের গোলা—পুঞ্জীভূত এনার্জি, ঢেউয়ের ওপর দিয়ে সাঁ করে ছুটে গেল স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে।

সকাল ন'টার একটু পরেই একটা লঞ্চ রওনা হল জাহাজ থেকে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সমেত। যদিও কাজটা বিপজ্জনক— কিন্তু কত দেরি আর করা যাবে? ঝড় তো ঝট করে থামবে না।

তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকরা এন্তার শলাপরামর্শ করে চলেছেন নিজেদের মধ্যে। জার্নালিস্টদের যন্ত্রপাতির কেবিনে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা কিন্তু গন্ধ শুঁকে খবর টের পায়। বুঝে নিয়েছে, এমন কিছু একটা ঘটতে চলেছে যা নিছক চাঞ্চল্যকর নয়, কখনও যা ঘটেনি— তাই ঘটতে চলেছে। যে-যার খবরের কাগজে ঝড়ের রুদ্র বর্ণনা পাঠানোর চেষ্টাও করেছিল কয়েকজন— কিন্তু টেকনিশিয়ানরা বেঁকে বসায় হতাশ হয়েছে।

গরম তাজা খবরের জোরেই খবরের কাগজ কাটতি বাড়ে। অথচ প্রশান্তর বুকে এমন

ভয়াল ঝড় আর বিদ্যুতের নাচন সহ আগুন গোলা আর ইলেকট্রিসিটিতে ছেয়ে থাকা বায়ুমণ্ডলের খবর তারা পাঠাতে পারছে না। কালো থামের এমন করাল রূপের ফটোগ্রাফ পর্যন্ত ক্যামেরাবন্দি হয়েই থাকছে, যাচ্ছে না বিশ্বের বড় বড় সংবাদপত্রগুলোয়।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কিন্তু যোগাযোগ রেখে চলেছেন ইন্টারন্যাশনাল জিও-ফিজিক্যাল সেন্টারের সঙ্গে। বিশ্ব বৈজ্ঞানিকরা নির্ভর করে আছেন এই একটি মানুষের ওপর।

এদিকে ঝড়ের গতি বেড়েই চলেছে। ম্যাগনেটিক কম্পাস পাগলা হয়ে গেছে। কাঁটা যেদিকে ঘুরে থাকার কথা, সেদিকে মুখ করে নেই।

ম্যাগনেটিক ফিল্ডও তা হলে পালটে গেছে।

সাংবাদিকরা জটলায় ব্যস্ত যেখানে, সেখানে হঠাৎ এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর। চিরকাল দেখছি, ওঁর মনে আর ব্রেনে যখন টাইফুন আনাগোনা করে, মুখখানা তখন চিনেম্যানের মতো ভাবলেশহীন করে রাখেন।

এখনই তেমনি বিকারবিহীন প্রশান্ত বদনে সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন, একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আপনাদের ঝুলিতে ভরে দেওয়ার ভার পড়েছে আমার ওপর। আপনাদের একটা ছাপা সংবাদ দেওয়া হবে। তার একটি অক্ষরও অদলবদল না-করে আপনাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠিয়ে দিন। কিছু বাদ দেবেন না, কিছু জুড়তে যাবেন না। এই একই সংবাদ এইমাত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রসংঘে আর কয়েকটা আন্তর্জাতিক সংস্থায়।'

কোরাস কণ্ঠে শোনা গেল একটাই প্রশ্ন, 'হয়েছেটা কী?'

প্রফেসর যেন ওজন করে করে একটার পর একটা শব্দ আউড়ে গেলেন, 'রাডার-এর মাপে দেখা যাচ্ছে, কালো থাম আরও বেশি স্পিডে বেড়ে চলেছে— যত বাড়ছে— বাড়ার স্পিড ততই বাড়ছে। চুড়ো এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আট কিলোমিটার উঁচুতে পৌঁছে গেছে। পৃথিবী নিজেই ঘুরপাক খাচ্ছে বলে, কালো থাম একটু পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আপনারা জানেন, ভূপৃষ্ঠের বাতাসে ইলেকট্রিসিটি আদৌ থাকে না। কিন্তু আট কিলোমিটার ওপরে তা বেড়ে গেছে— সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরকার ইলেকট্রিসিটির সমান হয়ে গেছে। কালো থাম ইলেকট্রিসিটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে এই অতিক্ষমতা অর্জন করেছে। তুলনাবিহীন ঝড়বিদ্যুৎ দেখা দিয়েছে। বায়ুমণ্ডলের প্রচণ্ড ইলেকট্রিসিটির মুল কারণ এইটাই।'

থামলেন প্রফেসর। কিঞ্চিৎ দম নিলেন।

তারপর বললেন, 'মোস্ট ইমপরট্যান্ট পয়েন্টে এবার আসছি। আজ সন্ধে নাগাদ অ্যাটমসফিয়ারের আয়োনাইজড স্তরে পৌঁছোবে কালো থাম। আপনারা জানেন, আয়নমণ্ডল, আই মানে, আয়োনোসফিয়ার, নিদারুণভাবে ইলেকট্রিসিটি ঠাসা। পৃথিবীর ওপরকার ইলেকট্রিসিটির তুলনায় সে অঞ্চলের ইলেকট্রিসিটি এখন দু'লক্ষ ভোল্ট। কালো থাম এই বিপুল বিদ্যুৎ প্রবাহকে বহন করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। নিজের চারদিকে বিশেষ একটা তড়িৎক্ষেত্র গড়ে নিয়েছে। কালো থাম যখন আয়নমণ্ডলে পৌঁছোবে, আচমকা বেড়ে যাবে এই তড়িৎ-ক্ষেত্র। তখন শুরু হবে বিচিত্র এক বিনিময়। শর্ট-সার্কিটেড হয়ে যাবে পৃথিবী নিজের আয়নমণ্ডলেই।

'পৃথিবী কিন্তু নিজস্ব ইলেকট্রিসিটি চার্জ হারাবে না। স্পেস থেকে বিরামবিহীনভাবে যে হাই-এনার্জি বস্তুকণার প্রবাহ পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে, তা বন্ধ হবে না। বহু বৈজ্ঞানিকের মতানুসারে, এই বস্তুকণাদের ফাঁদে ফেলে ধরে নিচ্ছে পৃথিবীর নিজস্ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড। কিন্তু শর্ট-সার্কিটিং হয়ে যাওয়ার ফলে ম্যাগনেটিক ফাঁদের ধর্ম পালটে যাবে। প্রপার্টি অন্য রকম হয়ে যাবে। জটিল এই পরিস্থিতির সবার ওপরে, কালো থাম ঘিরে যে ক্ষেত্র রচিত হবে তার স্বধর্ম এখনও আমাদের জানা নেই বলে, এই গ্রহের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মূল গঠন প্রকৃতি একদম পালটে যাবে। যে ভয়টা আমরা করছি, তা এই: সমস্ত পারমানেন্ট ম্যাগনেট ম্যাগনেটিজম হারাবে।'

'কেন হারাবে?' এক সাংবাদিকের প্রশ্ন।

সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হল আর এক সাংবাদিক, 'তাপ অথবা চোট— এই দুই শক্তি ম্যাগনেটকে ডিম্যাগনেটাইজ করতে পারে। কিন্তু এই দুইয়ের কোনওটাই এখানে নেই।'

প্রফেসর কাটছাঁট জবাব দিলেন, 'বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত যা জেনেছে, আপনি তা বললেন। আর আমি বললাম, বিজ্ঞান এখনও যা জানেনি তা ঘটতে চলেছে। পৃথিবী গ্রহের সমস্ত ম্যাগনেট হারাবে চৌম্বক ধর্ম। পরিণাম? ইলেকট্রিক কারেন্ট আর বইবে না। কোনও জেনারেটর থেকে সেই কারেন্টের উৎপাদন আর ঘটবে না।'

নৈঃশব্দ্য। বেশ কিছুক্ষণ। তার পরেই বুরবক বনে যাওয়ার অট্ট অট্ট মন্তব্য ফেটে ফেটে পড়ল কনফারেন্স কক্ষে।

'ইলেকট্রিসিটি ছাড়া টিকব কীভাবে?'

'বৈজ্ঞানিকরা কবে বন্ধ করবেন এই শয়তানি এক্সপেরিমেন্ট?'

'নারকীয় এই থামের বাড় আপনারা বন্ধ করতে পারছেন না কেন?'

প্রশ্ন-ঝড় স্তিমিত না-হওয়া পর্যন্ত নীরব রইলেন প্রফেসর।

মুখ খুললেন তারপর, 'থামের বাড় বন্ধ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন বিশ্বের সব বৈজ্ঞানিক। থাম কিন্তু আমাদের টেক্কা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে হুহু করে। যদ্দিন না থামকে কবজায় আনা যাচ্ছে তদ্দিন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টেকনোলজি ছাড়াই আমাদের বাঁচতে হবে।'

'কীভাবে?'

'স্টিম ইঞ্জিনের দৌলতে।'

সন্ধে নাগাদ প্রতাপ বাড়ল ঝড়ের। হাজার হাজার জলপ্রপাতের জল ঝরতে লাগল যেন আকাশ থেকে। বেশ কয়েকটা আগুনের গোলা সাঁ-সাঁ করে উড়ে গেল জাপানি জাহাজের মাথার ওপর দিয়ে। যেন নজরদারি চালিয়ে গেল জাহাজের কলকবজা আর কীর্তি কলাপের ওপর, তারপরেই সটান ধেয়ে গেল কালো থামের দিকে।

বিদ্যুৎ মহাপ্রভুদের এহেন বিরামবিহীন নৃত্য এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ, বিপুল অসহায়তা আর দুর্বোধ্য এবং করাল ঘটনাপুঞ্জের একত্র সমাবেশ আমার ভেতরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

ভাবছিলাম, আর একটু পরেই পৃথিবী জুড়ে শুরু হবে কী ধরনের উৎপাত।

পেট্রল ইঞ্জিন চলবে নিশ্চয়। তাতে কারেন্ট লাগে না।

কিন্তু তা কী করে হবে? ইলেকট্রিক স্পার্ক ছাড়া ইগনিশন তো সম্ভব নয়!

তা হলে কেরোসিনের যুগে ফিরে যাচ্ছি।

উদাস চোখে আকাশ প্রলয় দেখতে দেখতে বললে এক সোভিয়েত সাংবাদিক, 'ভূবিজ্ঞানী নোভরুজভ এইভাবে একদিন পাতালে তলিয়ে গেছিলেন।'

উৎসুক হয়েছিলাম, 'কীভাবে?'

'একটা কুয়ো খুঁড়েছিলেন। পছন্দসই জায়গায়। দু'হাজার মিটার গভীরে কুয়ো পৌঁছেছিল। তারপর একদিন নিজেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন জমির ওপর থেকে!'

'জমির ওপর থেকে?'

'মাটির মধ্যে তলিয়ে গেলেন। এখন সেখানে রয়েছে শুধু জল—একটা লেক।'

'ধুস! তাই কি হয়? পাতালে কেউ তলিয়ে যায় নিরেট জমির ওপর থেকে?'

'উনি গেছিলেন। আমার চোখের সামনেই। যে পাটাতনে দাঁড়িয়ে পাম্প চালিয়ে ড্রিল ঢোকাচ্ছিলেন পাতালে, আচমকা সেই পাটাতনটাই ওঁকে নিয়ে কলকবজা সমেত, হুস করে ঢুকে গেল মাটির মধ্যে।'

'ভূবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা কী?'

'বোঝা ভার। নানা মুনির নানা মত। কেউ বললেন, ভূস্তর কাহিল হয়ে গেছিল, কেউ বললেন ভূস্তরে গোড়া থেকেই দোষ ছিল, কেউ বললেন এখানকার ভূস্তর অন্য ধর্মের ছিল— গঠন প্রকৃতি ছিল আজব। মাটির নীচে কী কাণ্ড চলছে, সে খবর কে রাখে? পৃথিবী নাকি এখনও অজানা। 'ডেরিক' কাগজে পুরো খবরটা আমিই তো ছাপিয়ে দিয়েছিলাম।'

আমি বলেছিলাম, 'কালো থাম গুঁড়িয়ে উড়িয়ে ধুলো বানিয়ে দিলেই তো সব ঝক্কি সব ঝামেলা মিটে যায়।'

কানের কাছে শুনলাম প্রফেসরের গলা, 'সেটা সম্ভব শুধু অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে।'

জবাব দেওয়ার আগেই জাহাজের কর্মচারী মোমবাতি রেখে গেল সামনে। শুধু বললে, 'ক্যাপ্টেনের হুকুম।'

ঠিক সেই সময়ে দপ দপ করে উঠল সিলিং-এর আলো। নিভু নিভু হয়ে নিভে গেল একেবারেই।

'বিদায় বিদ্যুৎ,' বললেন প্রফেসর, 'এই সময়ে এসপাবানতো ভাষাটা শেখা দরকার। গোটা পৃথিবীর একটাই ভাষা— এসপারানতো।'

কারণ বিড়বিড় করে বলেছিলাম আমি, 'একই দ'য়ে পড়েছি যে সকলেই— পৃথিবীর সক্কলে।'

পিলেচমকানো ব্যাপারটা একই সঙ্গে পৃথিবীর সব্বাই টের পায়নি।

চুম্বকের ধর্ম প্রথমে লোপ পেয়েছিল কালো থামের আশেপাশে। তারপর একটু একটু করে আশ্চর্য ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা পৃথিবীগ্রহে।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম টিকে ছিল অনেকটা সময় কালো থাম যেখানে রয়েছে, তার

একদম বিপরীত বিন্দুতে। পৃথিবীর সেই দিকে আটলান্টিকে কোনওরকমে নাম বজায় রেখে চলেছিল অতিশয় খুদে একটা দ্বীপ, নাম, অ্যাসেনশন আয়ল্যান্ড। ইলেকট্রিক লাইট সেখানে নিভেছিল ঠিক এগারো দিন পরে।

গ্রহের জীবনধারা যেন মস্ত এক লাফ মেরে পেছিয়ে গেছিল ফেলে আসা শতাব্দীতে।

বড় বড় বাঁধের জল বৃথাই ঝরে গেছিল, পাওয়ার স্টেশনগুলোয় বিদ্যুৎ আর তৈরি হয়নি। ম্যাগনেটিক ফোর্স, লাইন না-থাকলে জেনারেটর চলবে কী করে?

অ্যাটমিক পাইল দিয়ে জল গরম করা হয়েছিল শুধুমুধু, স্টিম অহেতুক ঘুরিয়ে গেছিল রোটর-দের— কারেন্ট তৈরি হয়নি।

ইলেকট্রন-প্রবাহ এই গ্রহের প্রাণ বললেই চলে। তারের জটাজাল দিয়ে মোড়া রয়েছে গোটা পৃথিবী। কলকারখানা, বাড়ি, ট্রাম, লিফট, ট্রেন, ইত্যাদি ইত্যাদি সবই চালু রয়েছে জীবনদায়ী ইলেকট্রন-প্রবাহ, মানে, ইলেকট্রিসিটির দৌলতে।

ইলেকট্রনের স্রোত আর বয়ে গেল না তারের মধ্যে দিয়ে। পরিণাম? আলো পাওয়া গেল না, ঘর গরম করা আর ঘর ঠান্ডা করাও গেল না, ফ্যাক্টরিগুলো নিষ্প্রাণ হয়ে গেল নিমেষে।

ইলেকট্রিসিটি, পৃথিবীগ্রহের প্রাণ বললেই চলে যে ইলেকট্রিসিটিকে— কালো থামের এক ফুৎকারে তা অন্তর্হিত হল এত বড় গ্রহের সর্বত্র!

অভাবনীয়! কিন্তু যা ঘটনা, তা আমাকে লিখতেই হবে।

ও হ্যাঁ, ইলেকট্রিক কারেন্ট এক্কেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছিল বললে একটু ভুল বলা হবে। কেমিক্যাল পন্থায় যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয়েছিল বই কী, যেমন, ব্যাটারি দিয়ে পকেট টর্চে। বড় ব্যাটারিগুচ্ছও এইভাবে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেছে কিছুদিন— তারপর ভেঙে পড়েছিল সেই ব্যবস্থাও। রিচার্জ করবার কোনও পদ্ধতি তো আর নেই। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফ্রিকশন মেশিন, থার্মোইলেকট্রিসিটি আর সোলার ব্যাটারি ইত্যাদির লম্ফঝম্ফ দেখা গেছিল দিন কয়েক। এইসব দিয়ে জেনারেটর চালু করবার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু বৃথা... বৃথা... কারেন্ট বয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু কৃত্রিম ম্যাগেনেটিক ফিল্ড আর বানানো যায়নি।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম এর ওপরেই তো দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর যাবতীয় পাওয়ারফুল ইন্ডাষ্ট্রি— বন্ধ হয়ে গেছিল সব কিছুই। রাস্তাঘাট অন্ধকারে ডুবে গেছিল রাত্রে, সব শহরই তখন নিষ্প্রদীপ অবস্থায়। ট্রলি-বাস, লেদ মেশিন, বহুতল বাড়ির লিফট, ওয়াশিং মেশিন, টেপরেকর্ডার, কপিকল— সব দাঁড়িয়ে গেল একে-একে। ইলেকট্রিক স্পার্ক পেলে যে সব ইঞ্জিন চালু হয়, ইন্টারন্যাল কমবাশন ইঞ্জিন, তারা হল স্তব্ধ। রেডিয়ো হল নীরব। টেলিফোন হল বোবা।

এক শতাব্দী আগে মানুষ যেমন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল, ফিরে গেল সেই অবস্থায়।

জাহাজ-চালনা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ম্যাগনেটিক কম্পাস অসহায়ভাবে ঘুরে গেল কাচের ডায়ালের নীচে— কিন্তু দিক নির্দেশ করতে পারল না সঠিকভাবে। বিমূঢ় হল নাবিকরা।

এহেন অকস্মাৎ দুর্দৈব শুধু মানুষকেই হতভম্ব করেনি, মৎস্যকুলও দিশেহারা হয়ে

গেছিল রহস্যময় সমুদ্র স্রোতের ইলেকট্রিক তিরোহিত হওয়ায়। আচমকা এমন কাণ্ড ঘটায় বেচারারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছিল অকূল দরিয়ায়।

একই অবস্থা ঘটেছিল যাযাবর পাখিদের ক্ষেত্রে। চেনাজানা পথের সন্ধান আর পায়নি।

মেরুজ্যোতি সরে গেছিল নিরক্ষরেখার দিকে, দাঁড়িয়ে গেছিল সেখানেই—জ্যোতির্বলয় রূপে পাক দিয়ে গেছে পৃথিবী গ্রহকে।

ছড়িয়ে পড়েছিল আতঙ্কের গুজব। মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক অবস্থা ফিরে আসছে... উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে... আবহমণ্ডলের নীচের দিকে রোজই তা টের পাওয়া যাচ্ছে একটু একটু করে বেশিমাত্রায়। নীচের স্তর এতদিন ক্ষতিকর এই কসমিক র‍্যাডিয়েশনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল, এখন আর পারছে না। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ বাড়ি ফেলে নেমে এল উপত্যকায়। বিভিন্ন মানমন্দিরে মানুষ মরছে রহস্যজনক ভাবে। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল সেই খবর!

রাষ্ট্রসংঘে গঠিত হল একটা 'কালো থাম কমিটি'। বিশ্বের তাবড়-তাবড় বৈজ্ঞানিকরা রইলেন সেই কমিটিতে। তাঁরা যখন মাথা চুলকে ভাবছেন, কীভাবে উৎকট আপদ কালো থামকে ধ্বংস করা যায়, গোটা পৃথিবীটা তখন পালটে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে একটু একটু করে।

পৃথিবী কিন্তু আর সংঘবদ্ধ রইল না। ঐক্য বিলীন হল এক ফুৎকারে— কালো থামের অমোঘ দাপটে।

ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি চোখ উলটোতেই সেখানকার খেটে খাওয়া মানুষরা কাজের ধান্দায় চলে গেল অন্যান্য কলকারখানায়— বিশেষ করে যে সব ফ্যাক্টরিতে তেল আর কয়লা পুড়িয়ে স্টিম বানানো হয়।

মেহনতি মানুষরা এইভাবে সামলে নিল নিজেদের। কিন্তু পুঁজিবাদ যাদের কাছে পাঁজি, তারা পড়ল মুশকিলে। শুরু হল সরকার দখলের লড়াই। গণতন্ত্র গেল গোল্লায়— মাথা চাড়া দিল দুর্বৃত্ততন্ত্র। কয়লা আর তেলের শেয়ার দর চড়চড় করে উঠে গেল ওপরে। মুখ থুবড়ে পড়ল ইলেকট্রিসিটি কোম্পানিদের শেয়ারের দাম। প্যানিক দেখা দিল শেয়ার মার্কেটে। হুহু করে দাম চড়ে গেল জিনিসপত্রের— বেড়ে গেল খাজনা। আবও ট্যাক্স... আরও... আরও... জনগণ দেবে কী করে, সে-কথা ভাববার দরকার নেই— নিংড়ে নাও, চালাও সরকার, দেশের যারা হর্তাকর্তা ভরাও তাদের পকেট।

মন্বন্তরে যে অবস্থা দেখা যায়, তার চতুর্গুণ দুরবস্থা দেখা গেল গোটা পৃথিবী জুড়ে।

মূলে শুধু একটা কালো থাম!

কাগজে কাগজে হেডলাইন সৃষ্টির হিড়িক পড়ে গেল। মোদ্দা মানে একটাই: মানব সভ্যতার শেষ দিন এসে গেছে!

গুজব বানানোর জন্য টাকা ছড়িয়ে গেল একদল গুজব কারবারি। কাগজওলাদের মোটা ঘুষ দিয়ে গোটা মার্কিন মুলুকে ছড়িয়ে দেওয়া হল অতিভয়ানক একটা মিথ্যে:

কসমিক রে আগে আছড়ে পড়বে পৃথিবীর সর্বত্র— সবশেষে নৃত্য জুড়বে অ্যাসেনশন আয়ল্যান্ডে।

গুজব বড় শক্তিধর বস্তু। মুখে মুখে যখন প্যানিক ছড়ায়, তখন তা মানুষের হিতাহিত জ্ঞান এক্কেবারে লোপ করে দেয়। অ্যাসেনশন দ্বীপে সবশেষে মারণ রশ্মি পৌঁছোবে শুনে ধনকুবেররা দলে দলে রওনা হল খুদে দ্বীপ অভিমুখে।

দারুণ গরমে সে-দ্বীপে টেকা দায়, জলের সরবরাহ নেই বললেই চলে, সুগভীর আটলান্টিকের তলদেশ থেকে যেন একটা শঙ্কু মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে জলের ওপর।

এই তো দ্বীপ। আহামরি তো নয়ই, প্রাণ টিকিয়ে রাখাও কষ্টকর। জনবসতি সেখানে শুধু একটা জায়গাতেই। একটা শহরে। সে-শহরের নাম জর্জটাউন। শ'দুয়েক মানুষের বাস। বেশির ভাগই বন্দরকর্মী।

আমেরিকার বড়লোকেরা নিজেদের জাহাজ নিয়ে দল বেঁধে চলে এল এই জর্জটাউনে। সঙ্গে এল বিস্তর খাবার, বাড়ি তৈরির জিনিসপত্র, খাবার জল। পাহাড়ের সানুদেশে প্রতি বর্গফুট জায়গার জন্য যে দাম ধরে দিল, তা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। যদিও সে জায়গা বিলকুল পাথুরে— কিন্তু পাথরই সই, বাঁচতে তো হবে। বাড়িও বানাতে হবে।

ফলে, অচিরেই দেখা গেল পাথুরে অঞ্চলও আর পড়ে নেই— সব বিকিয়ে গেছে। জিনিসপত্তরের দামও চড়চড় করে গেল বেড়ে যাকে বলে অগ্নিমূল্য— আমেরিকান ডলারের কৃপা দৃষ্টি পড়লে যা হয়।

এরপরেও যেটা আরম্ভ হয়ে গেল, সেটা ডলার যেখানে ওড়ে, সেখানে দেখা যায়।

মারপিট। খুনোখুনি। দাঙ্গা। রক্তারক্তি ব্যাপার। নিজে আগে বাঁচো— এবং মেরে বাঁচো!

কাঁহাতক এই রাহাজানি আর জুলুম সইবে ব্রিটিশ সরকার? এ দ্বীপের মালিকানা তো তাদেরই। কড়া প্রতিবাদ পাঠাল আমেরিকান সরকারকে। ওয়াশিংটন তোপের মুখে উড়িয়ে দিল সেই প্রতিবাদ। যুক্তি তাদের অনবদ্য: অ্যাসেনশন আয়ল্যান্ড দখল করেছে তো প্রাইভেট ব্যক্তিরা। সুতরাং তাদের কার্যকলাপের জন্যে আমেরিকান সরকার দায়ী হতে যাবে কেন?

তোবা! তোবা! একেই বলে জোর যার, মুল্লুক তার!

ব্রিটিশ জাতটা লড়ে বেঁচে থাকে। কথা কাটাকাটির মধ্যে না-গিয়ে পাঠিয়ে দিল যুদ্ধ জাহাজ। শুধু অ্যাসেনশন আয়ল্যান্ডেই নয়— পাশের সেন্ট হেলেনা দ্বীপেও। দেশত্যাগীদের দল তো হানা দিয়েছিল সেখানেও।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এদের সবার গালেই দেখা গেল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ব্লেড আর ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামানোর অভ্যাস তো কোনকালে ভুলে মেরে দিয়েছে। ইলেকট্রিক ক্ষুর ছাড়া তাদের চলে না। ইলেকট্রিসিটি বিদায় নিতেই দাড়ি কুটকুটুনির জ্বালায় অস্থির হয়ে তারা গগনবিদারী হল্লাবাজি আরম্ভ করেছিল, 'এসেছে! এসেছে! পৃথিবীর শেষদিন এসে গেছে!' ভারতের গোঁড়া হিন্দুরা তারস্বরে বলে গেল, 'বেদ কখনও মিথ্যে বলে না। এসেছে আর এক অবতার। ধ্বংসের অবতার। এবার তার রূপ কালো থাম! দশ অবতারের পর একাদশ অবতার!'

সুতরাং, ভারত জুড়ে কালো থাম বানানোর হিড়িক আরম্ভ হয়ে গেল। ঘরে ঘরে চলল পুজো— কালো থাম উপাসনা।

পুরুতরা যখন পয়সা লুটে যাচ্ছে উদয়াস্ত পুজোর কারবারে, বারোমাসের দোকানদার কারবারিরা তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। তারা ঝাল ঝেড়ে যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের ওপর—অনর্থ বাধিয়েছে তো তারাই। সুতরাং মারো বৈজ্ঞানিকদের। পেটাও বৈজ্ঞানিকদের।

বাঙালি বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকরা এই মত্ততায় একটা নতুন শব্দও ঢুকিয়ে দিলে শব্দ অভিধানে। বৈজ্ঞানিক-এর বিপরীত শব্দ— অজ্ঞানিক অথবা ঐজ্ঞানিক। বাজারে খেয়ে গেল নতুন নামকরণ। 'ঐজ্ঞানিকের ইন্দ্রজাল' উপন্যাস লিখে, তড়িঘড়ি তার ইংরেজি তর্জমা করে, বাংলার বঙ্কুবিলাস বাগ বাগিয়ে আনল আর একখানা নোবেল প্রাইজ— রবীন্দ্রনাথের পরেই সাহিত্যে দ্বিতীয়! তাও কল্পবিজ্ঞানে।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে তখন কিন্তু মার মার কাট কাট কাণ্ড চলছে। ঘোড়ায় চেপে কাতারে কাতারে জোয়ান নিউজার্সির প্রিন্সটাউনে ঢুকে পড়ে তছনছ করে দিচ্ছে ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং। ছাত্রছাত্রী আর লেকচারারদের বেধড়ক পিটোচ্ছে, অথবা দমাদম গুলি চালিয়ে খতম করে দিচ্ছে। কলকাতায় বড় বড় পোস্টার দেখা গেল রাতারাতি: বিজ্ঞানের খাঁচায় আগুন। পরের দিনই সায়েন্স কলেজ আর সায়েন্স সিটিতে লাগল আগুন। যেখানে যত ল্যাবরেটরি আছে, হানা দেওয়া হল সর্বত্র। কলকাতায় ময়দানে একটা প্রকাণ্ড যজ্ঞকুণ্ড বানিয়ে শহরের সমস্ত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তাতে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হোম করে কালো থাম অবতারকে ঠান্ডা করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হল। জনগণেশকে প্রশ্রয় দিয়ে গেল কলকাতার পুলিশ।

বিলেতে আর এক ডিগ্রি বেশি উন্মাদনা দেখা গেল। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন যেখানে গবেষণা করেছেন, সেই জায়গাকে মিশিয়ে দেওয়া হল মাটির সঙ্গে। প্রফেসরদের হিড়হিড় করে টেনে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ফাঁসির দড়িতে।

প্রিন্সটনের বৈজ্ঞানিকরা শেষকালে রুখে দাঁড়িয়েছিল। মার্কিন মুলুকে স্কুলের ছেলেমেয়েদের কোমরেও রিভলভার থাকে। সুতরাং চলেছিল গুলি বিনিময়। ঝাঁঝরা হয়ে গেছিল উভয় পক্ষই। পরপর ছ'দিন বিরামবিহীন বুলেট চলার পর প্রিন্সটাউনে এসে গেছিল সেনাবাহিনী।

হুজুগে মানুষের পাশে পাশে তো ঠান্ডা মাথার মানুষও আছে পৃথিবীতে। তারা বুদ্ধিমান। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। বৈজ্ঞানিকরা যে গ্যাঁড়াকল বানিয়েছে, বৈজ্ঞানিকদের দিয়েই তার সমাধান বের করা দরকার।

সুতরাং প্রথম দিন কয়েকের স্তম্ভিত বিহ্বলতা কেটে যাওয়ার পর গোটা পৃথিবী নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার নানান ফিকিরে মেতে গেল। এ হচ্ছে টিকে থাকার লড়াই। মহাপ্রলয় কি আগে হয়নি পৃথিবীতে? মানুষ তার পরেও আছে। এখনও থাকবে।

সুতরাং শুরু হল পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার রকমারি ব্যবস্থা। পরিবহন চালু রাখতেই হবে। বিদ্যুৎ বিদায় নিয়েছে তো বয়ে গেল, ফিরে আসুক স্টিম বয়লার। কেরোসিন আর অ্যাসিটিলিন লম্ফ জ্বালিয়ে রেললাইন কাঁপিয়ে ছুটল স্টিম লোকোমোটিভ— সেই আগের দিনের মতো। বন্দরে বন্দরে এসে গেল বাষ্পচালিত জাহাজ

স্টিমশিপ। চোঙা এল স্পিকারের বদলে, টেলিফোনের জায়গায় পোস্টকার্ড আর পাইপ।

রাস্তা মুখরিত হল অশ্বখুর ধ্বনিতে, সেই সঙ্গে ফিরে এল গোরুর গাড়ি। ঘোড়ার পিঠে চড়তে যারা জানে না, অথচ চালিয়াতি আর বাবুয়ানি বহাল রাখতে চায়, তারা দু'চাকার আর চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি দিয়ে ভরিয়ে ফেলল রাস্তাঘাট।

কিম্ভূত সংকর-যন্ত্র পর্যন্ত এসে গেল: স্টিম স্টার্টার দিয়ে ডিজেল ইঞ্জিন চালু করার ব্যবস্থার চাহিদা বেড়ে গেল।

এর পরেই একটা চমকপ্রদ আবিষ্কার চমকে দিল গোটা দুনিয়াটাকে। আবিষ্কারটা কলকাতার এক স্কুল বালকের। সিগারেট লাইটার যেভাবে স্ফুলিঙ্গ বানায়, সেই একই পদ্ধতিতে চালু করে দিল মোটর গাড়ির ইগনিশন ব্যবস্থা। ফলে, কাতারে কাতারে গাড়ি ফের রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটল শহরে। মাঝখান থেকে আগুন দামে সিগারেট লাইটার বেচে লাল হয়ে গেল বেশ কিছু ধান্দাবাজ।

উৎপাদন বেড়ে গেল কয়লা আর তেলের। প্যারাফিন লম্ফ আর মোমবাতির চাহিদা মেটাতে গিয়ে গজিয়ে উঠল হাজার হাজার কারখানা। বেকার সমস্যার সমাধান ঘটে গেল রাতারাতি। বড় বড় বাড়িতে জ্বলতে লাগল কারবাইডের জোর আলো, হ্যাজাক— ছোট গেরস্তদের ঘর আলো করে ফিরে এল হ্যারিকেন।

কিন্তু...

বিশ্বের কোনও খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় আবির্ভূত হল না কালো থামের ফটোগ্রাফ।

তবে কাগজ মাতিয়ে রাখল খবর-ব্যবসায়ীরা এমন জবর একটা মওকা পেয়ে। কালো থামের চেহারা না-দেখিয়েই কাগজের কাটতি বাড়িয়ে গেল ঝপাঝপ করে। এক এক শহরে এক এক রকম হেডলাইন: শর্ট সার্কিট বিদায় নেবে শিগগিরই (ইজভেসটিকা), কয়লার শেয়ার দর এখন আকাশ ছোঁয়া (ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল), সেন্ট হেলেনা-য় বিশাল বাড়ি নির্মাণের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। নেপোলিয়নের মনুমেন্ট মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে জায়গায় রকফেলার-এর রক্তধারীদের জন্য ভিলা বানানো হচ্ছে। লন্ডন হুমকি-পত্র পাঠাচ্ছে ওয়াশিংটনকে। ব্রিটিশ তৃতীয় নৌবহর রওনা হয়েছে ত্রিস্তান দ্য কুনহা দ্বীপে আগলানোর জন্য (ডেলি টেলিগ্রাফ); স্বয়ং-জ্বলন্ত কেরোসিনের চাহিদা মেটাতে উঠে পড়ে লেগেছে তেল-রিফাইনাররা (দ্য বাকু ওয়ার্কার); কয়লাখনির জাতীয়করণ আর চলবে না; খনি ফিরিয়ে দেওয়া হোক যথার্থ মালিকদের— তবেই বাঁচবে পশ্চিমবঙ্গ (দৈনিক জনগণমন); প্রিন্সটন-এর পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে— ফ্যাসিস্টরা নিপাত যাক (দৈনিক শ্রমিকবার্তা); 'কালো থাম' শেয়ারের দাম এখন আকাশ ছোঁয়া— রোজ দর চড়ছে (ফিলাডেলফিয়া নিউজ), কালো থাম নাকি মহাশূন্যে নাক গলিয়েছে (দৈনিক গল্প-পত্রিকা); হেঁশেল-কর্ত্রীদের দাবি; ফিরিয়ে দাও বিদ্যুৎ (আজকের নারী); মোমবাতির চাহিদা বাড়ায় গির্জেতে কেউ মোমবাতি জ্বালাচ্ছে না (খ্রিস্টান ক্রনিকল); এই ঋতুতে তুষার-মানব খুঁজতে কেউ যাচ্ছে না হিমালয়ে (কাটমান্ডু উইকলি); 'কালো থাম' ড্রেস এখন মেয়েদের লেটেস্ট ফ্যাশন (নারী জাগরণ)।

ফায়ারবল! ফায়ারবল! নীচে যান! ফায়ারবল! মেগাফোনে তারস্বরে এই চিৎকার শোনা গেল 'ফুকুওকা মারু' জাহাজে। আগুনের গোলা দেখবার জন্যে একজন তো অষ্টপ্রহর খাড়া চোঙা হাতে নিয়ে।

নিমেষে জনশূন্য হয়ে গেছিল ওপরের ডেক— শুধু একজন নাবিক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আপৎকালীন ব্যবস্থার জন্যে।

এই হুকুমজারি করেছে বৈজ্ঞানিক কর্মীরা। আগুনের গোলা দর্শন দান করলেই যেন তৎক্ষণাৎ চম্পট দেওয়া হয় ওপরের ডেক থেকে— ঠাঁই নিতে হবে নীচের তলায়। বন্ধ করে দিতে হবে সমস্ত পোর্টহোল, হ্যাচ আর যা কিছু খোলা অবস্থায় আছে— সমস্ত।

এ হেন সাবধানতার কারণ একটা ঘটেছে বই কী। একদিন ঝাঁ করে একটা ফায়ারবল ঢুকে গেছিল হাচ-এর মধ্যে দিয়ে। জাহাজের ওয়ার্কশপ যেখানে— সেইখানে। লাফিয়ে লাফিয়ে আগুনের গোলা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সব কিছুতে। তছনছ করে দিয়েছিল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই। অতি কষ্টে সেই আগুনের গোলাকে নিভোনোর পর থেকেই এমার্জেন্সি দমকল মোতায়েন করতে হয়েছে জাহাজে। আগে নিশ্ছিদ্র করা হোক জাহাজকে, লড়াই তো তারপর।

হুকুম শুনে নীচে নেমে গেছিলাম আমিও। বেশ কয়েকজন অপরিচিত মানুষকে দেখলাম লাউঞ্জে। ইদানীং জেট প্লেনে চেপে অনেক আগন্তুক হানা দিচ্ছে জাহাজে। জার্নালিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার—পাঠাচ্ছে রাষ্ট্রসংঘ। একদল বিদায় নিচ্ছে তো আর একদল আসছে। তাদের চুরুটের ধোঁয়ায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে।

কালো থাম কিন্তু বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার ছাড়িয়ে চাঁদের দিকে এগিয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে চাঁদের যা দূরত্ব, তার তিন ভাগের এক ভাগ পথে পাড়ি জমিয়েছে। সেই সঙ্গে পৃথিবী গ্রহকে বেষ্টন করে রাখতে চাইছে। আগের মতোই কৃষ্ণ স্তম্ভ-কে ঘিরে রেখেছে তাল তাল মেঘ— শেষ নেই... শেষ নেই তাদের। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে— এঁকাবেঁকা বিদ্যুতের ভোজালি মেরে যাচ্ছে কালো থামের গায়ে। ঝড়ের তাণ্ডবও থামবে বলে মনে হচ্ছে না।

রিমোট-কন্ট্রোল যন্ত্রপাতির বারোটা বেজে গেছে। জ্বালানির চালান নেই। ভেসে ভেসে ভাসমান মঞ্চের কাছে গিয়েই ফের দূরে সরে আসছে ফুকুওকা মারু।

উদ্‌বেগ ফেটে পড়ছে গোটা জাহাজে। আমার তা সয়ে গেছে। সইতে পারছি না শুধু আলসেমি। বাধ্য হয়ে কুঁড়ে হতে হয়েছে। বেশ বুঝছি, তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকরা হালে পাচ্ছেন না। প্রত্যেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কালো থাম ঘিরে যে প্রহেলিকা বিদ্যমান, তার সমাধান করতে গিয়ে চুল পেকে গেল অনেকেরই। ইচ্ছে হচ্ছিল, সটান গিয়ে জিজ্ঞেস করি প্রফেসরকে, দেরি করছেন কেন? টুঁ মারুন কালো থামকে। লড়ে যান, লড়তে দিন, বেটা যে দিনে দিনে তাগড়াই হচ্ছে!

কিন্তু প্রফেসরের মুখাবয়ব দেখে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছি না। মুখ তো নয়, যেন তোলা হাঁড়ি। এরকম ঘ্যাঁচাকলে জীবনে যে পড়েননি। অ্যাটম বোমা দেগে থাম উড়িয়ে দেওয়ার কথা একবারই বলেছেন, অথচ সাহসে কুলোচ্ছে না। কেন রে বাবা? কালো থাম কি অ্যাটম

বোমাকে কোঁত করে গিলে ফেলবে? তারপর সেই শক্তিপুঞ্জকে কল্পনাতীত প্রলয়াকারে ফিরিয়ে দেবে?

সাতপাঁচ ভেবেই মুখে চাবি দিয়ে রেখেছি। তবে নজরে নজরে রেখেছি মানুষটাকে। অনেক অসাধ্যসাধন করেছেন। ফের কিছু একটা করে ছাড়বেন।

এই সময় একটা গুজব কানে এল।

জ্বালানি-জাহাজ আসছে। 'ফুকুওকা-মারু'র সমস্ত আমেরিকান গায়ের জোরে দখল করবে সেই জাহাজ— চম্পট দেবে আমেরিকায়!

বিপদ যখন কালো থাবা মারে, তখন মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারায় এইভাবেই।

কিন্তু মাথা স্থির রেখে চলতে হচ্ছে আমাকে। ভয় যখন মনকে দিশেহারা করে দেয়, তখন গল্পে মাতিয়ে রাখতে হয় আশপাশের সবাইকে। এই কৌশলটা আমি শিখেছিলাম আমার ঠাকুমার কাছে। ভয় কাটিয়ে দেওয়ার মহামন্ত্র শিখে গেছিলাম। তাই আজ আমার মনে ভয় ডরের লেশমাত্র নেই।

ঠাকুমার সেই টেকনিক কাজে লাগালাম আতঙ্ক-পঙ্গু সঙ্গীদের ওপর।

গল্পের আসর জমালাম। আমরা বাঙালিরা এই একটা বিষয়ে বিষম পোক্ত। বানিয়ে বানিয়ে আগডুম বাগডুম অনেক কথা বলে যেতে পারি। আমার গল্পগাছার মধ্যে অবশ্য একটু আধটু সার পদার্থ থাকে— প্রফেসরের সান্নিধ্যে থাকলে আকাট মূর্খও পরমজ্ঞানী হতে পারে। পরম না-হলেও আমি যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানী হতে পেরেছিলাম।

শুষ্কবদন সঙ্গীদের আড্ডায় তাই একদিন গাঁজা গল্পের আসর বসালাম। বললাম, 'ওহে রামগড়ুরের ছানারা, তোমাদের একটু হাসিঠাট্টা করা দরকার।'

ওদের একজন বললে, 'রামগড়ুরের ছানা মানে?'

'হাসতে যাদের মানা, তারা হল রামগড়ুরের ছানা। বলেছেন সুকুমার রায়। বাংলার উদ্ভট রসের কবি। আমাকেও বলতে পারো। উদ্ভট রসের গল্পকার। আগুনে কচ্ছপের গল্প কখনও শুনেছ?'

'আগুনে কচ্ছপ! সেটা আবার কী?' বলেছিল পাংশুবদন এক চিনেম্যান।

'তারাই তো পাতালের আসল বাজা। ইচ্ছে আছে তাদের নিয়ে জমিয়ে লিখব একটা গল্প। দলে দলে তারা উঠে আসবে পাতালের রাজ্য ছেড়ে, পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে মর্তলোক।'

'মন্দ গাঁজা নয়,' বললে সেই গোমড়ামুখো চিনেম্যান, 'তারা কি এই কালো থাম খেয়ে ফেলতে পারবে?'

একজন জার্মান জার্নালিস্ট বললে, 'ননসেন্স। তা হলে ফের একটা শর্ট সার্কিট দেখা দেবে।'

বললে একজন সোভিয়েত টেকনিশিয়ান, 'আপনিই থেমে যাবে। প্লাস্টিক প্রেশার থামকে আর বাড়তে না-দিয়ে গুটিয়ে নেবে যেখান থেকে এসেছে, সেখানে— পৃথিবীর পেটে।'

শুনেই ঝাঁ করে মাথায় চলে এসেছিল আর একটা গল্প। হেসে বলেছিলাম, 'বন্ধুগণ, আপনারা কি পৃথিবী-প্রসারণ অনুমিতির কথা জানেন?'

হইহই করে বললে সেই সোভিয়েত টেকনিশিয়ান, 'ব্রহ্মাণ্ডর প্রসারণ ঘটছে, এমন একটা থিয়োরি শুনেছি বটে। পৃথিবীর প্রসারণ আবার হতে পারে নাকি? যত্ত সব গাঁজা থিয়োরি।'

'থিয়োরি অফ এক্সপ্যানডিং আর্থ,' গম্ভীর বদনে বললে লর্ড ক্লাইভের দেশের এক বৈজ্ঞানিক সাংবাদিক, 'পৃথিবী একটু একটু করে ফুলে উঠেছে, এই তো? ইন্টারেস্টিং! মাই ডিয়ার ডিনোন্যাট—'

'দীননাথ,' শুধরে দিলাম আমি।

'ফুলছে কী করে? এই পৃথিবী? পেটে গ্যাস জমেছে নাকি?'

'আজ্ঞে না। পুরাজীবীয় কল্পে পৃথিবীর ডায়ামিটার, মানে, ব্যাস, নাকি এখনকার ডায়ামিটারের তিন ভাগের এক ভাগ ছিল—' মুখখানা হাঁ করে ফেলেছিল সোভিয়েত টেকনিশিয়ান, 'তিনভাগের একভাগ! এত ছোট!'

'গাঁজার দম!' ফট করে বললে চৈনিক সাংবাদিক। নোটবুকে কিন্তু খসখস করে লিখেও নিল আজব তত্ত্বটা।

'খুব একটা গাঁজা নয়,' বললে সোভিয়েত টেকনিশিয়ান, 'এরকম একটা অনুমিতি আমার কানেও এসেছে বটে। পৃথিবীর মাঝখানটা নাকি ভীষণ নিরেট। নক্ষত্র থেকে ছিটকে আসার সময়ে ওইরকম নিরেট পদার্থ নিয়েই এসেছিল। সেই নিরেট বর্তুলকে একটু একটু করে ফাঁপিয়ে পৃথিবী হয়েছে তিনগুণ। মাঝখানের অতি নিরেটত্বর পাতলা হয়ে আসা কিন্তু এখনও কমেনি। পৃথিবী এখনও তাই ফুলে চলেছে। মাঝখানকার বস্তুকণা একটু একটু করে উঠে আসছে ওপরের স্তরে... কিন্তু ভীষণ... ভীষণ আস্তে... হাজার হাজার লাখ লাখ বছর ধরে!'

আমি চিবুক চুলকোতে চুলকোতে পরম বিজ্ঞের মতো বললাম, 'জানেন দেখছি। এবার আমি যা জেনেছি, তা বলে ফেলি। প্রোটন আর নিউট্রন এরা হল গিয়ে ভারী বস্তুকণা, হেভি পার্টিকলস— এরা ক্রমাগত জন্ম নিয়ে চলেছে পৃথিবীর জঠরে। ভারী করে তুলছে পৃথিবীকে, বাড়িয়েও দিচ্ছে পৃথিবীকে। প্রশ্নটা সেইখানেই: নতুন বস্তুকণা আসছে কোত্থেকে?'

'বিরাট প্রশ্ন,' বললে সোভিয়েত টেকনিশিয়ান। 'আমি যা শুনেছি, এবার তা বলে ফেলি। ক্ষেত্র আর বস্তু-ফিল্ড আর সাবসট্যান্স— এই দুটোর পারস্পরিক অবস্থান্তর অর্থাৎ পরিবর্তন ঘটেছে বলেই বস্তু নতুন অবস্থায় জন্ম নিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জন্ম নিচ্ছে নতুন এক পদার্থ।'

ভুরু কুঁচকে বলেছিলাম, 'আর একটু প্রাঞ্জল করলে ভাল হয়।'

'আরও প্রাঞ্জল করতে হবে? তৈরি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে... নতুন নতুন পদার্থ এই পৃথিবীর পেটেই তৈরি হয়ে চলেছে। ছোট্ট করে বলা যায় মহাকর্ষক্ষেত্র, তড়িৎ চুম্বকী ক্ষেত্র, এ ছাড়াও আরও কয়েকটা ক্ষেত্র, আজও যা অজানা— এরাই মিলেমিশে এই মহাকাণ্ড করে চলেছে মানুষের চোখের আড়ালে। কিন্তু খামোকা বাক্যব্যয় করে লাভ আছে কি? দরকার মাথা খাটানোর। মাথা খাটিয়ে এমন একটা ক্ষেত্রকে উদ্ভাবন করতে হবে... শুধু মিলেমিশে রয়েছে যে জনক ফিল্ডের মধ্যে— তা হলে তা চোখ খুলে দেবে মূঢ় মানবের।'

ভুরু কুঁচকে বলেছিল চৈনিক সাংবাদিক কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের গরল ঢেলে দিয়ে, 'মহাশয়

কি তা হলে বলতে চান, প্রাণপ্রিয় এই কালো থাম গড়ে উঠেছে প্রোটন জাতীয় অথবা নিউট্রন জাতীয় বস্তু দিয়ে?'

থমকে গেছিল সোভিয়েত টেকনিশিয়ান, 'সঠিক বলার হিম্মত আমার নেই। মাইডিয়ার ডিনোন্যাট কী বলেন?'

আমি বললাম, 'অনুগ্রহ করে আমার নামটা সঠিক উচ্চারণ করবেন। আমি দীননাথ... দীননাথ... ডিনোন্যাট নই। এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর। সব্বাই তো দুষছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে, বিশেষ এই ক্ষেত্র নাকি তার ধর্ম পালটে নিয়েছে। দুষছে মহাকর্ষক্ষেত্রকেও। যত দোষ এই দুই নন্দ ঘোষের।'

চৈনিক সাংবাদিক বললে তেড়েমেড়ে, 'মহাকর্ষ... মহাকর্ষ... মহাকর্ষ! আগে তো জানতামই না শব্দটার নাম... এখন তাকেই দেখি রোজ রাতের স্বপ্নে।'

'দেখতে কী রকম?' আলতো টিপ্পনী নেদারল্যান্ডের এক সাংবাদিকের যার পূর্বপুরুষ ছিল ওলন্দাজ বোম্বেটে... একদা ছারখার করে গেছে ভারতবর্ষের উপকূল।

আমি বললাম, 'অন্তত আপনার মতো নয়। তবে হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে এই গল্পের আসরে।'

'কী প্রশ্ন?' উন্মুখ হয়েছে চৈনিক সাংবাদিক।

'মহাকর্ষ কি একটা শক্তি, না একটা ওজন?'

'এই পৃথিবীটাকে ছেঁদা করতে গিয়ে টের পেয়েছি, ভেতরে ঠাসা রয়েছে প্রচুর শক্তি।'

'তা নিয়ে তো তর্ক নেই। হ্যাঁ, পৃথিবীটা শক্তি ঠাসা একটা উড়ন্ত গোলা। এই প্রসঙ্গে একটা চৈনিক উপকথা শোনাতে পারি।'

'হোক, হোক, আজব গল্প হোক,' সমস্বরে বললে সব্বাই।

চিনেম্যান সাংবাদিক জমায়েতি ঢঙে বলে গেল সেই উদ্ভট গল্প। প্রাচীনকালের কাহিনি। লর্ড বুদ্ধের এক চেলা জঙ্গলে বসে ধ্যান করছিলেন। এক রাজপুরুষ অশ্বারোহী টগবগিয়ে এসে তাঁর সামনে থামতেই ঘোড়া শিরপা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে। পিঠ থেকে খসে পড়েছিল একটা ভারী থলে বুদ্ধের চেলার সামনে। দাম্ভিক অশ্বারোহী গলা ফাটিয়ে ধ্যাননিরত মানুষটার ধ্যান ভাঙিয়েছিল, থলি তুলে দেওয়ার হুকুম দিয়েছিল। সদ্য ধ্যান ভাঙা মানুষটা রাগ করেনি। উঠে গিয়ে থলি তুলতে গেছিল, কিন্তু নড়াতেই পারেনি। দাম্ভিক অশ্বারোহী টিটকিরি দিতে দিতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে নিজেই থলি তুলতে গেছিল— কিন্তু একচুলও সরাতে বা নড়াতে পারেনি। সে যখন হতভম্ব, বুদ্ধের চেলা তখন বলেছিল, 'পৃথিবী যাকে টেনে রেখে দিয়েছে, তাকে কি মানুষ টেনে তুলতে পারে?'

স্কটল্যান্ডের এক সাংবাদিক হাততালি দিতে দিতে বললে, 'বিউটিফুল স্টোরি।'

আমি বললাম, 'লোকে বলে, বিউটি একটা মুখোশ— ভয়ংকর রূপকে ঢেকে দেওয়ার মুখোশ। এই গল্পের আড়ালেও রয়েছে এক ভয়ংকর শক্তির অস্তিত্বের কথা—বুদ্ধর ভক্ত তা ঘুরিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছিল দাম্ভিক ঘোড়সওয়ারকে। পৃথিবীর টান... যাকে বলা যায় মাধ্যাকর্ষণ... এই শক্তির অস্তিত্ব জানতেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। জানতেন কল্পবিজ্ঞানী লেখক এইচ জি ওয়েলস সাহেবও। তাঁর বিখ্যাত Cavorita মনে দাগ রেখে গেছে এই

কারণেই। এরকম গল্প আরও আছে। আজারবাইজানিয়ান গল্পকথায় শোনা যায়, পুরাকালের এক রুস্তম বাহাদুর নাকি হাঁটলেই পা ঢুকিয়ে ফেলত মাটির মধ্যে।'

'ওজন বেশি বলে?' চৈনিক সাংবাদিকের প্রশ্ন।

'একদম না। সাধারণ ওজন। কিন্তু মাটিতে পা ফেললেই পা ঢুকে যেত দেড় ফুট গভীরে। মহাজ্বালা। রুস্তম একদিন গেল খোদ শয়তানের কাছে। বললে, 'নাও আমার অর্ধেক শক্তি। বুড়ো যখন হব, তখন ফিরিয়ে দিয়ো।'

এই পর্যন্ত বলে গল্পের আসরে উপসংহার টেনেছিলাম এইভাবে, 'কালো থাম নিজের শক্তি খাটিয়ে নিজেই যদি ফের পৃথিবীর পেটে ঢুকে যায়, তা হলেই গোল চুকে যায়।'

এই আইডিয়াটাই প্রফেসরকে দিতে গেছিলাম।

উনি তখন ছিলেন বৈজ্ঞানিকদের কনফারেন্সে। দরজা বন্ধ বটে, কিন্তু সার্সির কাচ ভেদ করে ছুটে আসছিল বাগবিতণ্ডার হট্টগোল। চুরুট আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরে যেন মেঘ জমেছে।

এত পণ্ডিতদের সামনে আমার মতো এক আনাড়ি গিয়ে কি বলতে পারবে, কালো থাম নিজের শক্তি খাটিয়ে নিজেই পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে যাক?

ঠিক এই সময়ে মুখখানা তোলা হাঁড়ির মতো করে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। আমাকে দেখে যেন হালে পানি পেলেন। বললে, 'দীননাথ, একটা কাজ করে দিতে হবে।'

আমি তো কাজ করতেই চাই। কাঁহাতক চুপচাপ বসে থাকা যায়।

তাই বলেছিলাম, 'কী কাজ?'

'একটা সার্কুলার প্যাসেজ বানিয়ে দিতে হবে ভাসমান মঞ্চ ঘিরে। ছ'মিটার চওড়া আর সাড়ে চার মিটার উঁচু।'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। ভাসমান মঞ্চ ফুঁড়েই তো কালো থাম গজিয়েছে। আবার তাকে বেড় দিয়ে প্যাসেজ তৈরি করে কী হবে?

অ্যাটম বোমা দাগার তোড়জোড় হচ্ছে নাকি?

আমি চুপ করে আছি দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন প্রফেসর, 'পারবে কিনা বলো।'

'আলবত পারব।'

'তা হলে বানাও।'

বলেই, ঢুকে গেলেন কনফারেন্স রুমে।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। মগজ আমার মোটা মানছি, কিন্তু প্রফেসর এই মগজটাতেই তো অনেক বিষয় ঢুকিয়ে ছেড়েছেন। এই একটি ব্যাপারে উনি সত্যিই গুরুদেব। যার মগজ যেভাবে নিতে পারে, সেইভাবে কঠিন তত্ত্বকে সরস তরল করে দিতে পারেন।

সুতরাং সার্কুলার প্যাসেজ বানানোর আগে আমি ছিনে জোঁকের মতো তাঁর পেছনে লেগে ছিলাম। তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেও আমি হাসি হাসি মুখে শুধু জানতে চেয়েছিলাম, 'কেন গড়ব সার্কুলার করিডর?'

অগত্যা উনি বলেছিলেন, 'অপারেশন ব্ল্যাক পিলার শুরু করার জন্যে।'

'ব্ল্যাক পিলারের শক্তিকে বুমেরাং করে দেওয়ার জন্যে? ঘুরিয়ে দিয়ে ব্ল্যাক পিলার খতম করার জন্য?'

উনি জুলজুল করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর বলেছিলেন, 'দীননাথ, তোমাকে হেঁড়ে মাথা বলি বটে, কিন্তু এখন দেখছি তোমার মাথাটা খুব হেঁড়ে নয়।'

'প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু পেলাম না,' প্রফেসরের কথার কেরামতিতে ভোলবার পাত্র আমি নই।

অনেক চেঁচামেচির পর ব্যাজার মুখে উনি বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। জানাজানি যেন না হয়।'

'হবে না।'

'কালো থামের রহস্য আমরা ভেদ করেছি। সংক্ষেপে জানাই, ব্ল্যাক পিলার যাতে আর বাড়তে না-পারে, সেই মতো একটা অ্যাপারেটাস আমরা মাথা খাটিয়ে বের করেছি।'

'শক্তিকে বড় শক্তি দিয়ে খর্ব করা? বড় শক্তিটা কী?'

'বড় ট্যাঁটা তো!'

'বলতেই হবে।'

'অনেকগুলো পাওয়ারপুল ফিল্ডকে মিলিয়ে মিশিয়ে একসঙ্গে ব্ল্যাক পিলারের ওপর প্রয়োগ করা।'

'এমনভাবে বললেন যেন অনেকগুলো পাওয়ারফুল কীটনাশক মিশিয়ে উইপোকা মারতে চান।'

'স্টুপিড। যদিও প্রায় ঠিকই বলেছ। পাওয়ারফুল ফিল্ডগুলো যদি একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালো থামের পাওয়ারের ওপর, বাধা পাবেই, থাম আর বাড়বে না— ওপরে ঠেলে ওঠার শখ মিটে যাবে।'

আমি বলেছিলাম, 'আমার বুদ্ধি কম। তবুও একটা প্রশ্ন করছি। আপনাদের এই অ্যাপারেটাস চালু থাকবে নিশ্চয় ইলেকট্রিসিটির জোরে? কিন্তু ইলেকট্রিসিটিই নেই পৃথিবীতে।'

চকচকে চোখে প্রফেসর সেকেন্ড কয়েক আমার দিকে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, 'সত্যিই দীননাথ, মাঝে মাঝে তোমার ব্রেন থেকে এমন স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে আসে... অথচ আসল স্ফুলিঙ্গটা বেরোয় না— যেটা জোগাবে প্রব্লেমের সলিউশন।'

'অ্যাপারেটাস চালু হবে কী করে?' আমি লেগে রইলাম আমার পয়েন্টে।

উনি বললেন, 'ইলেকট্রিসিটি দিয়ে।'

'সে ইলেকট্রিসিটি আসবে কোত্থেকে?'

'কালো থামের গা থেকে। স্টুপিড দীননাথ, কালো থাম নিজেই তো এখন লাইটনিং কনডাক্টর!'

আস্তে আস্তে মুখটা হাঁ করে ফেলেছিলাম। সত্যিই তো। তড়িৎ প্রবাহ তো কালো থামের গায়ে রয়েছে। ওখান থেকে 'ট্যাপ' করলেই ইলেকট্রিক অ্যাপারেটাস চালু হয়ে যাবে। যদিও

সেটা বিদ্যুৎ চুরি— কিন্তু প্রাকৃতিক তড়িৎ চুরি করলে জেলে যেতে হবে না, জরিমানাও দিতে হবে না।

তখন একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে গেছিলাম, 'তারপর কি কালো থাম কাটবেন?'

প্রফেসর আর জবাব দেননি।

শুরু হয়ে গেছিল 'অপারেশন ব্ল্যাক পিলার'। এলাহি কাণ্ড। ভাসমান মঞ্চ ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছিল যেন একটা নৌবহর। ভাসমান বিমানবন্দরে গোঁ-গোঁ করে নেমেছিল ক্ষিপ্ত বিমানের পর বিমান। সেই সঙ্গে এসেছিল কাতারে কাতারে স্টিম লঞ্চ।

এদের পাঠিয়েছিল পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো— বাঁচবার তাগিদে। ম্যানেজমেন্ট ছিল কিন্তু এই শর্মার ওপর প্রফেসরের হুকুমে। এক অজানা শক্তিকে ঘায়েল করতে গেলে শুধু উপাদান আর উপকরণ যথেষ্ট নয়— দরকার বেপরোয়া মনোভাব। যা আছে এই বঙ্গসন্তান দীননাথ নাথের অন্তত প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তা মনে করেন।

ফলে, হাই স্পিডে কাজ করে গেছে পৃথিবীর সব ক'টা বড় বড় কারখানা— সার্কুলার প্যাসেজের রকমারি অংশ বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে আকাশপথে আর জলপথে। সেই সব যন্ত্রাংশের সাইজ আর নকশা এমনই বিদঘুটে যে মাথামুণ্ড বোঝা দায়।

দিবারাত্র মেহনত করে গেছে পঙ্গপালের মতো মানুষ। জিরেন নেই এক মিনিটের জন্যেও। মানে এক দল ঘুমিয়েছে তো আর এক দল কাজে লেগেছে। কাজ থামেনি ক্ষণেকের জন্যেও।

হ্যাঁ, প্রত্যেকের গায়ে থেকেছে রক্ষাকবচের মতো বিশেষ পোশাক, কেননা, আর কেউ না-জানলেও বৈজ্ঞানিকরা জানতেন আবহমণ্ডলের নীচের দিকে হুহু করে ঢুকছে মারণ মহাজাগতিক রশ্মি।

ইতিমধ্যে কালান্তক কালো থাম বেড়েই চলেছে বিদ্যুৎ বেগে। তার গায়ে বইছে তড়িৎ প্রবাহ, তাকে ঘিরে রয়েছে নিবিড় মেঘপুঞ্জ। মেঘলোক ফুঁড়ে উঠে গিয়ে মহাশূন্যে রওনা করে চলেছে একটা প্রকাণ্ড বলয়— পৃথিবীকে ঘিরে।

অ্যাসিটিলিন ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিনরাত সমানে কাজ চলেছিল। ভারা বাঁধা হয়েছিল কালো থাম ঘিরে।

সব নীচে ছিল পরমাণু বোমার উপকরণ। অতিশয় গোপনে।

যে মুহূর্তে কেটে ফেলা হবে কালো থাম, তৎক্ষণাৎ ম্যাগনেট ফের ম্যাগনেট হয়ে যাবে। অ্যাটমিক পাইলের টার্বোডেনারেটর উৎপাদন করে যাবে ইলেকট্রিক কারেন্ট।

অ্যাটম বোমা আনা হয়েছে...

তার নাম দেওয়া হয়েছে 'জোনাকি'। অ্যাটমবোমার নাম 'জোনাকি'। তাকে খাড়া করে বসানো হয়নি, শুইয়ে রাখা হয়েছে— সোজা গিয়ে টুঁ মারবে কালো থামকে।

জোনাকিকে উড়িয়ে দেওয়ার ভার পড়েছিল আমার ওপর। এত কর্মকাণ্ড আমার নখদর্পণে বলে। কিন্তু আমি একজন আমেরিকানকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। তার নাম পার্কো। গাঁট্টাগোট্টা মস্তান চেহারা।

আমরা দু'জনেই ধূসর-নীল রঙের রশ্মি নিরোধক বিশেষ পোশাক পরে নিয়েছিলাম। মাথা পর্যন্ত হেলমেটে ঢাকা। হাঁটলে কড়মড় কড়মড় আওয়াজ করে এই কাচ-পোশাক।

জাপানি জাহাজ থেকে লঞ্চে চেপে রওনা হয়েছিলাম ভাসমান মঞ্চের দিকে। সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছিল বলে মনে হচ্ছিল গোটা মঞ্চটা, সার্কুলার করিডর সমেত জল থেকে ঠেলে উঠছে, আবার জলে ডুবে যাচ্ছে। লঞ্চ গিয়ে ভিড়েছিল মঞ্চের পাশে, ইলেকট্রিসিটি নেই বলে লিফট বন্ধ। তাই লঞ্চ থেকে মঞ্চের ওপরে যেতে তিরিশ মিটার পথ সিঁড়ি ভেঙে অতিকষ্টে উঠতে হয়েছিল। কড়মড়ে পোশাক পরে সিঁড়ি ভাঙা সোজা ব্যাপার নয়। হিমসিম খেয়ে গেছিলাম।

একদম ওপরের ডেকে পৌঁছে দেখেছিলাম, কালো থামের ওপর বিরামবিহীন ভাবে বিদ্যুৎ আছড়ে পড়ছে। মঞ্চের ঠিক ওপরে। যত বিদ্যুতের টার্গেট ওইখানেই।

একটু পরেই 'জোনাকি' ধেয়ে গিয়ে ঢুঁ মারবে যেখানে।

কালো থামের রহস্যজনক শক্তিক্ষেত্র কি বৃদ্ধি পাচ্ছে? কালো থাম কি ভবিষ্য দৃষ্টি দিয়ে অন্তিম মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করে আরও শক্তিধর হয়ে উঠছে? মহাপ্রলয়ের আদি পর্ব রচনা করে চলেছে?

যে মহাপ্রভু প্রলয়ের সূচনা করবে, সেই 'জোনাকি' কিন্তু শুয়ে ছিল প্ল্যাটফমে। ঠিক যেন একটা অতিকায় টর্পেডো।

'জোনাকি'কে উড়িয়ে নিয়ে যাবে একটা রকেট। নিরেট জ্বালানি চালিত রকেট।

মহড়া দেওয়া হয়েছিল আগের দিন। রকেটের বদলে একটা স্টিল চাঁইকে ইঞ্জিন চালিত গাড়ি টেনে নিয়ে গেছিল কালো থামের দিকে।

বোমা নয়, একটা ইস্পাতের ব্লককে।

কালো থাম গাড়িসুদ্ধ স্টিল ব্লককে নিমেষে টেনে নিয়ে, বুকে চেপে ধরে, সাঁ-সাঁ করে ওপরে উঠে গেছিল প্যাসেঞ্জার প্লেনের স্পিডে।

গায়ে কাঁটা দিয়েছিল সেই রিহার্সাল দেখে। কালো থাম যেন সত্যিই জীবন্ত। হাই স্পিডে সে গজিয়ে চলেছে। অত ভারী ইস্পাতের চাঁইকে ঝটকান টান মেরে বুকে চেপে ধরে হাইস্পিডেই উঠে গেছে ওপর দিকে।

ঠিক এইভাবেই 'জোনাকি' নামক অ্যাটম বোমাকে নিয়ে এখুনি উঠে যাবে ওপর দিকে। ঠিক সাত মিনিটে উঠে যাবে ষাট কিলোমিটার ওপরে।

তারপর ফাটবে 'জোনাকি'।

টাইম-ফিউজ ফাটাবে বোমাকে।

তার আগে, আমরা সময় পাব চার ঘণ্টা। কালো থাম বোমাকে বুকে টেনে নেওয়ার আগে চার ঘণ্টা। অটোমেটিক যন্ত্র চালু করে দিয়ে ফিরে আসব লঞ্চে। লঞ্চ ফিরবে জাহাজে। জাহাজ পালাবে এই তল্লাট ছেড়ে। চার ঘণ্টা কম সময় নয়। অনেক দূরে চলে যাব।

তারপর চালু হবে আর একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। বোমাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে ঠেকিয়ে দেবে কালো থামের গায়ে...

অথবা, কালো থাম বোমাকে টেনে নিয়ে সাঁ-সাঁ করে উঠে যাবে ষাট কিলোমিটার ওপরে...

ঠিক সাত মিনিট পরে টাইম্ ফিউজ ফাটিয়ে দেবে জোনাকিকে!

অত উঁচুতে বিস্ফোরণের ফলে কালো থাম দু'টুকরো হবেই। এখনই সে বলায়াকারে বেষ্টন করে রয়েছে পৃথিবীকে। আংটি মহাশূন্যেই থেকে যাবে পৃথিবীকে ঘিরে। নীচের অংশ ধ্বংস হয়ে তলিয়ে যাবে সাগরে।

তাই হয়েছিল। পৃথিবীর সব্বাই জানে, আচমকা আলো ফিরে এসেছিল পৃথিবী জুড়ে।

শুধু নতুন সেই বলয় আজও পাক দিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে ঘিরে।

মনের মেশিন

অদ্ভুতকর্মা প্রফেসর নাটবল্টু চক্র অনেক অনেক অবিশ্বাস্য এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। তাঁর ব্রেন থাকতে পারে, কিন্তু মানুষটা তো রোগাপটকা। অ্যাডভেঞ্চারের ঝক্কি কি কম? তখন দরকার হয় এই দীননাথকে। প্রফেসরের টিটকিরি ভাষায়— মগজে ঘিলুর ওজন খুব কম, কিন্তু আখাম্বা বডিটা তো আছে?

বলা বাহুল্য, কথাগুলো খুব একটা মধুর নয় আমার কাছে। কিন্তু একটু লিখিটিখি বলে প্রফেসরের পিছনে লেগে থাকি। আমার বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস বললে কম বলা হবে, আমার বদ্ধ ধারণা, ওরকম একখানা ব্রেন মহাবিশ্বে আজও গজায়নি।

আমার আর প্রফেসরের সময় পর্যটন অভিযান তার প্রমাণ। কী কাণ্ডই না করেছিলেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই মূর্খ চ্যালাটাকে নিয়ে।

তার পরের অনেক অনেক কাণ্ড করেছেন। সে সবের কিছু কিছু আমার এই ভাঙা কলম দিয়ে লেখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মনের মেশিন নিয়ে যে বিপুল ব্যাপারটা করে ফেললেন, তা এককথায় অনবদ্য। এবং যারা ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গ জানে না, তাদের কাছে একেবারেই অবিশ্বাস্য।

কিন্তু গুলপট্টির গল্প যে এটা নয়, তার জ্যান্ত প্রমাণ ডক্টর ব্রহ্মবিদ। প্রাণ নিয়ে টানাটানির এই এক্সপেমেরিন্টের আইডিয়াটা তো ওই বুড়োই প্রফেসরের মাথায় প্রথম ঢুকিয়েছিলেন।

মানুষটাকে হঠাৎ দেখলে অবশ্য মনে হবে, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। অতিশয় নিরীহ চেহারা সাদাসাপটা বেঙ্গলি জেন্টেলম্যান। ভুরুর চুলগুলো পর্যন্ত পাকিয়ে সাদা ধবধবে করে ফেলেছেন। আচমকা দেখলে প্রৌঢ় কি বৃদ্ধ বলা মুশকিল। পোশাকের দিকে তিলমাত্র নজর নেই। আমি তো দেখেছি, কখনও কখনও উলটো গেঞ্জিও পরে থাকেন।

কিন্তু চাহনি অন্তর্ভেদী, ছুঁচের মতো। কারও দিকে যখন তাকিয়ে থাকেন, তখন মনে হয়, চোখের মধ্যে লণ্ঠন জ্বলছে।

আর ঠিক তখনই তিনি মনের চেহারা দেখতে পান।

দুই বুড়ো যখন গল্পে জমেছেন, আমি তখন ছুঁকছুঁক করছিলাম আশেপাশে। শুনেছিলাম এই পাগলাটে বুড়োটা নাকি আদিম এনার্জি নিয়ে গবেষণা করছেন। যে-শক্তি আদিতে ছিল,

এখনও আছে, পরেও থাকবে। সবকিছুরই শুরু এই এনার্জি থেকে, ইংরেজিতে যাকে বলে প্রাইমর্ডিয়্যাল এনার্জি। এবং, এই এনার্জির কথা-ব্যবহারে আজকের এই অপোগণ্ড মানুষগুলোকে অতিমানুষ বানিয়ে ফেলা খুব একটা কঠিন নয়।

যা নিয়ে পিলে চমকানো এই কাহিনীর শুরু, এবার তা বলা যাক।

ডক্টর ব্রহ্মবিদ বললেন, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, আপনাকে আমি সমীহ করি।'

প্রফেসর বললেন, 'নতুন কিছু বললেন না। ওটা অনেকেই করে, যাদের মগজে কিছু আছে।'

ট্যারা কথাটা মানিয়ে নিলেন ডক্টর ব্রহ্মবিদ। বললেন, 'শুধু মগজ থাকলেই হয় না। তারমধ্যে থাকা চাই ডিভাইন-স্পার্ক। এই স্পার্ক থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। এই স্পার্ক থেকেই মানুষের মগজে নতুন নতুন আইডিয়ার আবির্ভাব।'

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'যেমন এই দীননাথের ব্রেনে উদ্ভট গুল্প জন্মায় বিটকেল স্পার্ক থেকে!'

আমার ব্রেন নিয়ে এইরকম খোঁটা বাইরের লোকের সামনে না-দিলেই পারতেন প্রফেসর, কিন্তু আমি সহ্য করে গেলাম। কারণ একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম— আসন্ন আশ্চর্য এক অভিযানের গন্ধ।

ডক্টর ব্রহ্মবিদ আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলেন ওঁর সেই প্রদীপ্ত লণ্ঠন-চোখ দিয়ে।

আমার গা-শিরশির করে উঠেছিল বটে, উনি কিন্তু রেশমমসৃণ স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে দিয়েই চলবে।'

কী চলবে? আমি কাঠ হয়ে গেলাম। প্রফেসর আমাকে গিনিপিগের মতো ব্যবহার করেছেন বহুবার, কিন্তু সে সবের ফলে বিজ্ঞান দুনিয়ার বিস্তর উপকারই হয়েছে, আমার গায়ে আঁচড়টুকু লাগেনি। কিন্তু এই বুড়োর মতলবটা তো সুবিধের মনে হচ্ছে না! হাড়িকাঠে ফেলার আগে বলির পাঁঠার দিকে অনেকে যেমন খুশি-খুশি চোখে তাকিয়ে থাকে, উনিও যেন সেইভাবে আমার আপাদমস্তক লেহন করে নিলেন। তারপর প্রীতস্বরে বললেন, 'আমি জি. জি. এস. নিয়ে ভাবছি।'

প্রফেসর উৎসুক হয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ, 'গাইডেড-জেনেটিক-সিস্টেম?'

'আজ্ঞে! পরীক্ষাটা চালাতে চাই মানুষের ওপর দিয়ে।'

অপাঙ্গে আমাকে দেখে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'এই তো সেই মানুষ।'

শুনে আমি শক্ত হয়ে গেলাম। গাইডেড-জেনেটিক-সিস্টেম আবার কী পদার্থ?

ডক্টর ব্রহ্মবিদ নিশ্চয় টেলিপ্যাথি বিদ্যায় পোক্ত— সরল বাংলায় যাকে বলা যায় মনপঠন বিদ্যা। সেকালের যোগীরা নাকি এ-বিদ্যা এমনই রপ্ত করতেন যে তাঁদের সামনে দাঁড়ালে মনের কথা গোপনে রাখা যেত না। ছবির মতো তাঁরা দেখতে পেতেন অন্তস্তলের ছায়াছবি।

কিন্তু এই ডক্টর ব্রহ্মবিদ মানুষটা যেন কেমনতর। গায়ের ফুলহাতা শার্ট মালকোঁচা মারা

ধুতির মধ্যে গোঁজা। এরকম ড্রেস পরতেন আমাদের ঠাকুরদা টাকুরদারা— যদিও তাঁদের মধ্যে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী দেখা গেছে।

ডক্টর ব্রহ্মবিদ ভদ্রলোকও নিশ্চয় বড় বিজ্ঞানী। নইলে গাইডেড-জেনেটিক-সিস্টেম নিয়ে কথা শুরু করবেন কেন? শুনে প্রফেসরই বা অমন চমক খাবেন কেন?

দুই বুড়োর মধ্যে তখন যে টেকনিক্যাল ডিসকাশন হয়েছিল, সেসব আমি গুছিয়ে লিখতে পারব না। সে এলেম আমার নেই। তবে, ভাসাভাসাভাবে বুঝেছিলাম, ডক্টর ব্রহ্মবিদ বহুবছর ধরেই জি. জি. এস. নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। দেদার এক্সপেরিমেন্ট করেছেন ইঁদুরটিদুর নিয়ে। সাকসেসফুল হয়েছেন। এবার অভিযান চালাতে চান... কোথায়?

শুকতারায়!

শুনে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। শুকতারা, মানে, শুক্রগ্রহ যে কী ভয়ানক গ্রহ, তা তো জানি। এই বৃদ্ধ সেই আগুন-গ্রহে আমাকে নামিয়ে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে চান? কভি নেহি!

আমার মুখাবয়ব অবলোকন করেই দুই বৃদ্ধ বুঝে ফেলেছিলেন, আমি বেঁকে বসেছি। অথচ আমাকে না হলে নাকি যুগান্তকারী এই এক্সপেরিমেন্ট করাই যাবে না।

তাই আমার মগজধোলাই শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ, আমাকে জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, গাইডেড-জেনেটিক-সিস্টেম ব্যাপারটা কী?

'হ্যাঁ, ঝুঁকি আছে এই এক্সপেরিমেন্টে— বিশেষ করে আস্ত একটা মানুষকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে গেলে বুক ঢিপঢিপ তো করবেই।'

বৃদ্ধ ডক্টর ব্রহ্মবিদ কিন্তু অকুতোভয়। কেননা, ইঁদুরের ওপর তিনি ব্যাপারটাকে যাচাই করে নিয়েছেন। এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল। এবার হোক আস্ত একটা মানুষের ওপর।

ডক্টর ব্রহ্মবিদ কিন্তু দুই চোখে স্নেহের ক্ষীর ঝরিয়ে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে করতে বলেছিলেন, 'দ্যাখো বাবা দীননাথ, জি. জি. এস. নামটা শুনে এত সিঁটিয়ে যেয়ো না। জি. জি. এস. একটা বিরাট ব্যাপার, একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার, এই পৃথিবীর মানুষগুলোকে অতিমানুষ বানিয়ে ফেলার ব্যাপার। আরে! আরে! অত উসখুস করছ কেন? 'হাল্ক' সিনেমাটা নিশ্চয় দেখেছ? সাদাসিদে একটা মানুষ বিজ্ঞানের কৃপায় দানব... ইয়ে... অতিমানুষ হয়ে গিয়ে কী কাণ্ডই না করেছিল। লম্বা লম্বা লাফ মেরে পাহাড়-মরুভূমি টপকে গেছে। কমিক সিরিয়ালে অমন করতে হয়, নইলে বাচ্চারা দেখবে কেন? কিন্তু তুমি একজন মস্ত বৈজ্ঞানিকের ছাত্র!'

সবিনয়ে লিখছি, আমাকে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের মতো কিংবদন্তীসম বৈজ্ঞানিকের ছাত্র বলায় আমি গলে গেছিলাম।

আমার নরম নরম চাহনি দেখে উৎসাহ বেড়ে গেছিল বৃদ্ধ জিনিয়াসের, 'গ্রেট গ্রেট, এই গাইডেড-জেনেটিক-সিস্টেম। ওপেনহাইমার, আইনস্টাইনকে টেক্কা মেরে যাব আমরা— হেলপার হবে তুমি। তার আগে লেকচারটা শেষ করি। গাইডেড ক্রোমোজোম নিয়ে তো দেদার কাজ হয়ে গেল দুনিয়াজোড়া গবেষণাগারগুলোয়। এখনও হয়ে চলেছে। ক্রোমোজোম কাকে বলে, তা তোমার অজানা নয়—'

এই বলে, ক্রোমোজোম কী জিনিস, তাই নিয়ে ঝাড়া একঘণ্টা জ্ঞান দিয়ে গেছিলেন ডক্টর ব্রহ্মবিদ। আরে বাবা, আমি কি এতই গোমূর্খ? আমি কি জানি না, জীবের দেহকোষের কেন্দ্রতে রয়েছে খুব ছোট্ট আর সুতোর মতো আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থ? বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহকোষে বিভিন্ন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। একই জাতের জীবের আর উদ্ভিদের প্রত্যেকটি কোষের ক্রোমোজোম গোনাগুন্তি। তাদের সংখ্যা আর গঠনের ওপরেই জীব আর উদ্ভিদের স্বাভাবিক প্রকৃতি, দোষ-গুণ— এইসব নির্ভর করে। এই সহজ ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে খোঁচা মারার দরকারটা কী?

আমার মুখ দেখেই বৃদ্ধ ব্রহ্মবিদ বুঝে ফেলেছিলেন, আমার গোঁসা হয়েছে। অমনি, মুখখানাকে হাসি হাসি করে ফেলেছিলেন, 'কী বলছিলাম? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাইডেড ক্রোমোজোম। কিছু কিছু বিজ্ঞানের কথা ইংরেজিতে বললে ভাল বোঝানো যায়— তাই না? বাংলা করতে গেলে সে আর এক ঘ্যাঁচাকল। তাই মলিকিউলার জেনেটিক্সই বলব— বুঝলে? এতদিন তো ইঁদুরটিদুর নিয়ে করলাম...'

'এবার মানুষ ধরতে হবে।' বলেছিলাম আমি নিরীহ গলায়।

প্রচ্ছন্ন টিটকিরিটা যেন গায়েই মাখলেন না গোবেচারা চেহারার ব্রহ্মবিদ মহাশয়। বিষম ঘুঘু... কখন কী চালে চলতে হবে, সব জানেন। তাই অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে আমার মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। বললেন, 'এই ব্যাপারটা— বিরাট এই আবিষ্কারের চেষ্টাটা নিয়ে কত বছর ধরে ঘস্টাচ্ছি, বুঝলে দীননাথ, সে ফিরিস্তি দিয়ে তোমার বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। কিন্তু বাবা, যৎকিঞ্চিৎ নলেজ তো ইনজেক্ট করে দিতেই হবে, নইলে তোমার ক্রোমোজোমগুলো পালটে পালটে যাবে কী করে? যখন যেমন তখন তেমন হবে কী করে?'

এইবার আমার চক্ষুযন্ত্র দুটি নিশ্চয়ই ছানাবড়ার শেপ নিতে যাচ্ছিল, ব্রহ্মবিদ তা পর্যবেক্ষণ করে ঝটিতি বললেন, 'আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ক্রোমোজোম নিয়ন্ত্রিত হবে তোমারই ইচ্ছে অনুযায়ী— বুঝলে? কী হল? চোখ দুটো তোমার গোল গোল হয়ে যাচ্ছে কেন? বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে? তা হলে শর্টকাট করা যাক— তোমার পারসোন্যালিটি পালটে পালটে যাবে তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী। তুমি সুপারম্যান হয়ে যাবে।'

ঠিক এই সময়ে অতিশয় মৃদুস্বরে যোগ করলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'সুপারক্রিচার!'

ক্রিচার! ক্রিচার মানে তো প্রাণী? সত্যি সত্যিই আমার পিলে পর্যন্ত চমকে উঠল। বলেও ফেললাম, 'স্পাইডার-ম্যানের মতো?'

'আরে ছ্যা!'

প্রফেসরের দিকে তিরস্কারসূচক একঝলক চাহনি নিক্ষেপ করে বৃদ্ধ ব্রহ্মবিদ বললেন, 'তার চাইতেও দুর্ধর্ষ... অকল্পনীয়। এমন সব আকৃতি পরিগ্রহ করতে করতে যাবে— লক্ষ-লক্ষ বছরের বিবর্তন প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে জীবদেহে যেসব পরিবর্তন এসেছে, তুমি সেইসব পরিবর্তন আনবে ঝলকে ঝলকে, পলকে পলকে।'

আমি বিমূঢ় এবং বাকরহিত হয়ে রইলাম।

ফোড়ন কাটলেন প্রফেসর, 'জুরাসিক যুগের মাছ-ডাইনোসর, ইকথিয়সর যুগে

ম্যাকো-হাঙর আর ম্যাকারেল মাছ হয়েছে। তুমি হবে নিমেষে নিমেষে। ভ্যানিশ করে দেবে লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনকে।'

'আমার এই গাইডেড-জেনেটিক-সিস্টেম-এর দৌলতে।' জ্বলজ্বলে চোখে বক্তিমে শেষ করলেন ডক্টর ব্রহ্মবিদ।

প্রথমটায় আমি নতুন অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনায় মোহপ্রাপ্ত অবস্থায় চলে গেলেও তারপর একটু ভেবেছিলাম। আমার ব্রেনে একটা টিড়ক লেগেছিল।

'আমার পার্সোন্যালিটি, আমার ব্যক্তিত্ব— সেটাও কি গাইডেড ক্রোমোজোম পালটে পালটে একদম আলাদা একটা কিম্ভূত ব্যক্তিত্বে নিয়ে গিয়ে ফেলবে?'

হুঁ, হুঁ, বাবা, সেটি হতে দিচ্ছি না। আমি যা, তাই থাকতে চাই।

আমার এই কাঠগোঁয়ারি বক্তব্য শুনে কিন্তু বিলক্ষণ প্রীত হয়েছিলেন বৃদ্ধ বিচক্ষণ ব্রহ্মবিদ বৈজ্ঞানিক। জ্বলজ্বলে চোখে, হাসিহাসি মুখে বলেছিলেন, 'এই তো চাই। পরিবেশ পালটালেই কি ব্যক্তিত্ব পালটাতে হবে? কভি নেহি! তোমার খোলসটা শুধু পালটাবে দীননাথ। একটু প্রাঞ্জল করার জন্যে একটা উদ্ভট উপমা তুলে ধরছি... ধরো, জলের মধ্যে দিয়ে হুহু করে তোমাকে যেতে হবে, তুমি তখন টর্পেডো স্পিডের সাবমেরিন হয়ে গেলে অথবা ধরো, এমন একটা অবস্থা এল যে তোমাকে পাথর ভেঙে ভেঙে এগোতে হবে, তুমি তখন বুলডোজার হয়ে গেলে। এইরকম অনেক অনেক অন্তরায় তোমার যুগান্তকারী অ্যাডভেঞ্চারকে আটকে দিতে চাইবে। কিন্তু তুমি গ্রেট দীননাথ নাথ, তোমার পার্সোন্যালিটির দিক দিয়ে ব্যক্তি দীননাথই থাকবে। পালটে যাবে শুধু তোমার ফর্ম। যেমনটা ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনে প্রকৃতির ল্যাবরেটরিতে।'

লেকচার দিতে পারেন বটে এই ব্রহ্মবিদ বৈজ্ঞানিক। নিছক লেকচার নয়, হিপনোটিক লেকচার— সম্মোহনী বক্তৃতা। আমি চোখ বড় বড় করে তাঁর প্রত্যেকটা কথা গিলেছিলাম। তাই সেই বিষম অ্যাডভেঞ্চারের পরেও মনের মণিকোঠা থেকে হুবহু প্রতিটা কথা লিখে যেতে পারছি।

রুদ্র শুকতারার রুদ্রতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে ফিরে এসে লিখতে বসেছি আমার জীবনের বোধহয় সবসেরা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি।

যে-প্রশ্নটা উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে পাঠক-পাঠিকার মনের কন্দরে, কৌতূহলের ঝিলিক তুলে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে তা কিন্তু আমার অগোচরে নেই। লেখকমাত্রই পাঠক-পাঠিকার মনের কথা টের পায়। কী করে, কীভাবে গেছিলাম জ্বলন্ত উনুনের মতো শুক্রগ্রহে— কৌতূহলটা তো এই নিয়েই?

সব অভিযানের ব্যবস্থা-ট্যাবস্থার গুপ্তকথা কি ফাঁস করা যায়? এই ব্যাপারটাও অপ্রকাশ্য থাকুক। পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখা হবে, এই শর্তেই যে হয়েছিল, অভিযান-অধিকর্তাদের সঙ্গে।

যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা, বন্দোবস্ত-টন্দোবস্ত— সবই অবশ্য করেছিলেন, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। তাঁর ক্ষমতার আর যোগাযোগের হাত যে এই ভূমণ্ডলের সর্বত্র প্রসারিত, তা তো কারও অজানা নয়। এতখানি এলেম ডক্টর ব্রহ্মবিদের নেই বলেই ধরনা

দিয়েছিলেন প্রফেসরের গবেষণা-আলয়ে।— বিশেষ করে যেখানে রয়েছে আমার মতো একটা গোমূর্খ।

আমার একটা বদভ্যেস আছে, পরের কথা আগে বলে ফেলা, আগের কথা পরে বলা। যখন যে-ফোর্সটা তীব্র হয়ে ওঠে, অন্যসব বিষয়কে হঠিয়ে দিয়ে সেটা আগে চলে আসে কাগজে-কলমে নিজেকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াসে।

ডক্টর ব্রহ্মবিদের চোখের মধ্যে যেন লণ্ঠন জ্বলছে, তা আমি একটু আগেই তেড়েমেড়ে লিখে গেছি। তারপর এক জায়গায় লিখেছি, উনি হিপনোটিক লেকচার ঝেড়ে গেছিলেন। সম্মোহনী বক্তৃতা। আমার মতো ছটফটে চিড়িয়াকেও নিবাত নিষ্কম্প অবস্থায় সব শুনে যেতে হয়েছে। অনেক পরে বুঝেছিলাম, উনি কিন্তু সত্যি সত্যিই আমাকে হিপনোটাইজ করেছিলেন কথার তালে তালে। কেন? যাতে আমি ভেনাসের আগুন-বুকে ভড়কে গিয়ে নিজের মনকে বল্গার বাইরে যেতে না-দিই। মন যেন আমার বশে থাকে। তা হলেই তো আমার আমিত্ব থাকবে— আমি পাগল হয়ে যাব না। মনের মেশিনকে আমার কবজায় রাখতে পারব।

এইবার আসা যাক আসল কথাটায়। সৃষ্টিছাড়া সেইসব কাণ্ডকারখানার পর আমি বোবা হয়ে গেছিলাম।

আমার বাগযন্ত্র আমার মনের হুকুমকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে অসাড় থেকেছে। অমন ভয়ংকর পিলে চমকানো রক্তজমানো অ্যাডভেঞ্চার-ট্যাডভেঞ্চারের পর এরকম নাকি হয়েই থাকে— অম্লানবদনে বলেছিলেন বিজ্ঞানবিদ ব্রহ্মবিদ মহাশয়। বলেছিলেন, 'ভাগ্যিস তোমাকে সম্মোহিত অবস্থায় রেখেছিলাম, তাই নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছ। ওইসব লটঘটে ব্যাপারে খটাং করে কুলুপ পড়ে গেছে তোমার বাগযন্ত্রে। তবে তোমার মেন্টাল ফোর্সকে তুঙ্গে তুলে আনো, দেখবে কটাং করে লক খুলে গেছে।'

ভদ্রলোক মানুষ ভলান্টিয়ার হিসেবে আমাকে বেছে নেওয়ার আগে কম এক্সপেরিমেন্ট করেননি ইঁদুর-বাঁদরের ওপর। নিষ্ঠা ছিল, কিন্তু পন্থাগুলো বড় নিষ্ঠুর। মানুষকে যে-কোনও পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে স্ব-ইচ্ছায় খাপ খাইয়ে চলতে হবে, নইলে ধরণী থেকে মুছে যেতে হবে— এই গবেষণা সংকল্প নিয়ে তিনি নেমেছিলেন জীববিজ্ঞানের নতুন ক্ষেত্রে। গবেষণাটার নাম দিয়েছিলেন 'হিউম্যান মিউটেশন জেনেটিক্স'। দেহযন্ত্র যেন যে-কোনও পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিয়ে স্ব-ইচ্ছায় নিজেদের নতুন করে গড়ে নিতে পারে। ল্যাবরেটরিতে সৃষ্টি করেছিলেন নতুন নতুন জিন্স— যে জিনদের কন্ট্রোল করেছে ব্রেনের বায়োকারেন্ট— জৈবতড়িৎ।

এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন ইঁদুরের ওপর। মাংসের টুকরো দেখে সে এমনই লোভাতুর হয়েছিল যে নিজেকেই এক টুকরো মাংস বানিয়ে ফেলেছিল। তারপর চেষ্টা-টেষ্টা করে আধা ইঁদুর-আধা মাংসখণ্ড হয়ে গেছিল— বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে বলা হয় হাইব্রিড— সংকর প্রজাতি। তখনই আতঙ্ক সঞ্চারিত হয়েছিল ব্রেনের মধ্যে। লটঘট একটা ব্যাপার ঘটে গেছে বুঝতে পারার সঙ্গে ইঁদুর ফের ইঁদুর হয়ে গেছিল।

ব্রহ্মবিদ বৈজ্ঞানিক এরপর একটা বাঁদরকে ক্লোরিন পরিবেশে রেখে ক্লোরিন শুঁকতে শিখিয়েছিলেন। পটল তুলেছিল বেশ কয়েকটা বাঁদর। প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন বৈজ্ঞানিক

মহাশয়। তার পরেই লাফিয়ে উঠেছিলেন আর একটা বাঁদরের কাণ্ড দেখে। সে বুঝেছিল, যতই অসম্ভব হোক, বাঁচতে তাকে হবেই। ক্লোরিন শুঁকে শুঁকে দিব্বি বেঁচে ছিল। পাওয়ারফুল প্রাণময়তার হুকুম মাথা পেতে নিয়েছিল জি. জি.এস.— গাইডেড-জেনেটিক-সিস্টেম। পালটে দিয়েছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের কেমিস্ট্রি।

এক্সপেরিমেন্টের সর্বশেষ পর্যায়ে ব্রহ্মবিদ বৈজ্ঞানিক জন্তু-জানোয়ারদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন, যে-কোনও আকারের এনার্জিকে টেনে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগাতে হবে। সূর্য থেকে, স্টোভ থেকে, রকমারি রসায়নের ভেতরকার রদবদল থেকে, এমনকী সবচেয়ে কাছের ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সফর্মার থেকেও। ফলে, সংকর-ইঁদুররা আর মাংসের টুকরোর দিকে না-তাকিয়ে তাজা হয়ে উঠেছে ইলেকট্রোড অর্থাৎ, তড়িৎ-শলাকার গা-ঘেঁষে বসে।

তার পরেই যে বইখানা লিখেছিলেন, আমাকে দিয়ে তা খুঁটিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন। অনেক জায়গা বুঝিনি, উনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ইংরেজিতে লেখা বই। বইটার নাম? *ডাইরেক্টেড বায়োকারেন্ট মিউটাজেনেসিস উইথ গাইডেড জেনেটিক সিস্টেম।*

এই বই লিখেই প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের মতো বৈজ্ঞানিকের ঘিলু পর্যন্ত নড়িয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। শুরু হয়েছিল, মানুষের মিউটেশন জেনেটিক্স।

ভলান্টিয়ার হয়েছিলাম আমি।

কারণ ইচ্ছাশক্তি বড় প্রবল, বোধহয় জন্ম ইস্তক। প্রাইমরডিয়াল এনার্জিতে ঠাসা আমার শরীরের প্রতিটা অণু-পরমাণু। আর নিশ্চয় এই শক্তিই চলে এসেছে আমার মনের মধ্যে। না হলে এক অসম্ভবকে সম্ভব করলাম কী করে ভেনাসের করাল বুকে?

আমার শরীরটা প্রথম ধাক্কার সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে বিপুলকায় তো হয়েই ছিল, সেইসঙ্গে আপাদমস্তক ঢেকে গেছিল গাছের ছালের মতো শক্ত শক্ত আঁশে। এরকম বেঢপ বিকট বপু নিয়ে নড়াচড়া করতে অসুবিধে হয়েছিল বই কী। কিন্তু ওই যে বললাম, আমার ট্রিমেন্ডাস উইল পাওয়ার আমাকে বর্ণনাতীত বহু বাধার মধ্যে ঠিকই টেনে নিয়ে গেছে। লম্বা লম্বা ছেনির চেয়েও শক্ত নখ দিয়ে পাথর খামচে খসিয়ে এনেছি। এইরকম অক্টোপাশি হাত আর শকুনি নখ যে এই পরিস্থিতিতেই দরকার ছিল— জি. জি. এস. তা এনে দিয়েছে আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে।

পাথর খামচে ধরে তুলে ফেলার জন্যে হাতের চেটো পর্যন্ত গ্র্যানাইট কঠিন হয়ে গেছিল। বাহুর গড়ন হয়েছিল গুলতির অনুকরণে— যাতে পাথরের চাঁই তুলে ছুড়ে ফেলে দিতে পারি গুলতি কায়দায়।

স্পেসশিপের কন্ট্রোল কেবিন থেকে ভেসে এসেছিল প্রফেসরের কড়া হুকুম, 'দীননাথ, গুহাটুহার মধ্যে ঢুকে যেয়ো না ঝোঁকের মাথায়— কমিউনিকেশন বন্ধ হয়ে যাবে, আমার কথা আর শুনতে পাবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে পাথর তুলে তুলে ফেলে দাও। পাথরের তলায় কী আছে দেখছ? গলন্ত পাথরের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আবার কী চেহারা নিয়ে ফেলবে— মুশকিলে পড়বে।... কী বলছ? তোমার যা ইচ্ছে তাই করবে? কী গেরোয় ফেললে, দীননাথ। আরে বাবা, রয়েসয়ে আকৃতি বদল করে যাও— যখন যেমন তখন তেমন। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাদের

যোগাযোগটা যেন থাকে। তুমি হতে যাচ্ছ ভবিষ্যতের মানুষ। এক লাফে লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনকে পকেটে পুরে নেওয়া মানুষ। গোঁয়ারতুমি করে এক্সপেরিমেন্টটাকে মাঠে মেরে দিয়ো না।'

প্রফেসারের বকাঝকায় আমার মাথা গরম হয়ে গেছিল। ভেনাসে ল্যান্ডিং-এর আগে যে প্রোগ্রামটা আমার ব্রেনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, তার মোদ্দা কথা, একশো কিলোমিটার জায়গা জরিপ করে আসতে হবে— বাধাবিঘ্ন টপকে, চুরমার করে, ভ্যানিশ করে দিয়ে।

কিন্তু আমার যে রোখ চেপে গেছিল। ওইরকম তাগড়াই বপুর মালিক হয়ে গেলে এমনটাই হয়। প্রফেসর আমাকে নিয়ে অনেক বাঁদর-নাচন নাচিয়েছেন, এবার আর বাগে রাখতে পারছেন না, আমি যে অতিকায় হয়ে গেছি— এমন অদ্ভুত আকৃতি নিয়েছি যা কল্পনাতেও মাথায় আসবে না।

দু'হাতে পাথর পাঁচিল বেয়ে উঠতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে তিনখানা হাত বানিয়ে নিয়েছিলাম ঝটাঝট করে। কী আজব প্রোগ্রামিংই গেঁথে দেওয়া হয়েছে আমার অণু-পরমাণুতে। আমার যা খুশি তাই করতে পারি।

কিন্তু আমি তো ইচ্ছে করলেও আমার আদি আমিত্ব এখন ফিরিয়ে আনতে পারব না। পৃথিবীতে বাতাসের যে চাপ সয়েছি, এখানে যে তার শতগুণ বেশি চাপ নিয়ে লড়ে যেতে হচ্ছে। বডি নিজেকে বানিয়ে নিচ্ছে সেইভাবে— যখন যেমন তখন তেমন।

এই সময়ে আমাকে টক্কর দিতে হয়েছিল শুকতারার এক বিদঘুটে জীবের সঙ্গে। তার আবার চোখ-টোখের বালাই নেই— পাতলা কাগজের মতো শরীরটাকে পাথরের সঙ্গে লেপটে লেপটে এগিয়ে যায়। হাই-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ শুনে ঠিক টের পায়। শাবাশ শুকতারা। সৃষ্টিছাড়া জীবজগতের কারখানা একখানা বটে!

আমি কিন্তু বেড়ে মজায় ছিলাম। প্রোগ্রাম করা ক্রোমোজোমরা যখন যেমন তখন তেমন হয়ে গিয়ে টক্কর দিয়ে গেছে রকমারি রূপ ধারণ করে। এমন অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে জীবনে যেতে হয়নি আমাকে।

তিনখানা হাতে আর হচ্ছিল না বলে আর একখানা হাত গজিয়ে নিয়েছিলাম প্রায় চক্ষের নিমেষে। পাথর-টাথর ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসে পড়েছিলাম গলন্ত লাভার স্রোতে। কিন্তু ভেসে গেছিলাম ভেলার মতো, গ্যাস বুদবুদে নিশ্বেস নিয়ে টিকে থাকার মতো ফুসফুসখানাও গড়ে উঠেছিল। বুক ভরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস টেনে নিয়েছিলাম— অক্সিজেনের বিকল্প হিসেবে। বিধ্বংসী কার্বন-ডাই-অক্সাইডে যে এমন সুগন্ধি বর্তমান, তাও তো ছাই আগে জানতাম না।

মনে মনে অজস্র তারিফ করে গেছিলাম দুই বুড়ো বৈজ্ঞানিকের। জীবের বংশগতির মূলাধার যে জিন— এখন তা আমার নিয়ন্ত্রণে। আমি যদি তখন নেকড়ে হয়ে যেতে চাইতাম, তাই হয়ে যেতাম। অথবা হয়ে যেতে পারতাম আধশোয়া হেলানো পাথর। দুই বৈজ্ঞানিকের কৃপায় আমার জিন-ভাঁড়ারের কম্যান্ড ছিল জিরো পর্যায়ে। তাই মুহূর্তের নোটিশে চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছিলাম নতুন করে নিজেকে গড়ে নিয়ে!

কিন্তু বৃদ্ধ দুই বৈজ্ঞানিক ছিলেন বিলক্ষণ বহুদর্শী এবং সতর্ক। তাঁদের নিজস্ব কম্যান্ড, ইয়ে,

হুকুমগুলো একগুচ্ছ স্পেশ্যাল গ্রুপের ক্রোমোজোমের মধ্যে ঠুসে দিয়েছিলেন। যাতে আমি তাঁদের কবজায় থাকি। ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের গড়া সেই দানবের মতো না হয়ে যাই, সে ব্যাপারে কড়া নজর রেখেছিলেন দু'জনেই। সাধু! সাধু! নইলে কি ফের মানুষ দীননাথ হয়ে গিয়ে এই কাহিনি লিখতে বসতে পারতাম।

না। ব্রেন আমার পালটায়নি। বরং রণবাদ্যের পর রণবাদ্য বেজে গেছে ব্রেনের মধ্যে। পরিস্থিতি পালটে গিয়ে নতুন চাহিদা সৃষ্টি করেছে, তা মিটিয়েও গেছে। নইলে অদৃশ্য ইনফ্রা-রশ্মিকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম কী করে? কীরকম দেখতে? অবিকল রেডিয়ো ওয়েভ-এর মতো। কখনও উড়ে গেছি পাখির মতো, কখনও কিলবিল করে এগিয়েছি সাপের মতো।

হুকুম এসেছিল, যাও দীননাথ, যাও, দেখে এসো গভীর গোপনে কন্দরের অন্দরে কী রহস্য রয়েছে। আমি তাই করেছিলাম অতিশয় অবহেলায়, লাভানদী আমার গতিরোধ করতে পারেনি, কোনও কিছুই আমাকে রুখতে পারেনি— আমি যেন হয়ে গেছিলাম শুকতারার মুকুটহীন রাজা! প্রফেসর আমাকে বলেছিলেন স্পেসশিপে বসে, 'দীননাথ, পণ্ডিতি মহলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে সূর্যের সেন্টারে হয়তো গজাচ্ছে একটা ব্ল্যাক হোল। সেটা যাচাই করা যাবে তোমাকে দিয়ে পরে। ব্ল্যাক হোল তোমাকে খেতে পারবে না— এত শক্তি তোমার মনের মেশিনে এসেছে। এখন একটা কাজ করো— সুরুৎ করে ভেনাসের বুকে ঢুকে গিয়ে দেখে এসো সেখানেও একটা ব্ল্যাক হোল লুকিয়ে আছে কিনা।

আমি তখন একটা গোলক হয়ে গেছিলাম। স্নায়ুপ্রান্তগুলো ভেতরে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। হুহু করে নেমে গেছিলাম অগ্নিময় ভেনাস-জঠরে। তেজস্ক্রিয় উপাদান ছেয়ে গেছিলাম। কিন্তু তেড়েফুঁড়ে ঢুকে গেছি জেট-চালিত মিসাইলের মতো। রঞ্জনরশ্মির প্লাবনে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছিল! তাপনিরোধক আবরণ গজিয়ে ব্রেনকে আগলাতে হয়েছে নিমেষে— কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব দেখতে পাইনি। রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছিলাম স্পেসশিপে আমার মনের মেশিন দিয়ে।

সেইসঙ্গে প্রমাণ করে দিয়েছিলাম, মানুষের টিকে থাকার ক্ষমতা অসীম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট হতে পারে শুধু এই মানুষ— মনের মেশিন চালিয়ে।

তারপর আবার ফিরে এলাম আমার সবুজ-সুন্দর সুজলা-সুফলা এই পৃথিবীতে। সে সবের সুদীর্ঘ টেকনিক্যাল বিবরণ দিয়ে পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। তা ছাড়া, এখন তো আর আমি অমানুষ নই। ফের মানুষ হয়ে গেছি। লিখতে-লিখতে হাত ব্যথা করছে, তাই এখানেই যতি টানছি।

একটা ব্যাপার সবশেষে নিবেদন করে যাই। আমি তো বোবা হয়ে গেছিলাম ভেনাসের কাণ্ডকারখানায় মনের মেশিনে থ হয়ে যাওয়ার পর। কিন্তু আবার বাকশক্তি ফিরে পেয়েছি। হাঁকডাক শুরু করেছি।

কীভাবে?

দুই বৈজ্ঞানিক দুই কানের গোড়ায় 'ধন্যি ছেলে.... ধন্যি ছেলে' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই!

কসমিক কুয়াশা

বিদেশি বৈজ্ঞানিক বললেন, 'আমার নাম কান্টু। আমি বায়োএনারজেটিক্স নিয়ে রিসার্চ করেছি।'

বক্তা বসে আছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের বসবার ঘরে। আমিও ছিলাম সেই ঘরে। কারণ, আমি তাঁর চ্যালা। শ্রীহীন দীননাথ নাথ। ছিলাম বলেই আজব এই কাহিনি হাজির করতে পারছি।

প্রফেসর পলকহীন চোখে চেয়ে ছিলেন কান্টু-র দিকে। চেয়ে ছিলাম আমিও। কারণ এরকম বিদঘুটে মূর্তি কস্মিনকালে দেখিনি।

লোকটা যেন একতাল আইসক্রিম দিয়ে তৈরি। আইসক্রিম খুলে রাখলে, ফ্রিজের বাইরে রাখলে যেমন ঘেমে যায়, এই মানুষটাও তেমনি অনবরত ঘামছে। গা দিয়ে, কপাল দিয়ে, গাল বেয়ে, গলা ঘিরে জল গড়াচ্ছে। পরনে তো দেখছি, স্রেফ একটা ড্রেসিং গাউন। হাউস কোট। যা আজকাল বড়ুতল বাড়ির বউরা পরে এ-ঘর ও-ঘর করে, আভিজাত্য দেখায়। আসলে থসথসে বপু লুকিয়ে রাখতে চায়।

এই অনাহুত লোকটার শরীরও তথৈবচ। বেঢপ আকৃতি। না তরমুজ না কাঁঠাল। তবে হ্যাঁ, সর্বাঙ্গ ঢাকা পোশাকটার এদিক ওদিক দিয়ে যেটুকু অবয়ব অংশ উঁকি দিয়ে চলেছে, তা নিঃসন্দেহে কিম্ভুত।

গায়ের চামড়ায় লোম থাকে, সববাই জানে। কিন্তু এই মানুষটার গায়ে কাঁটা রয়েছে। কাঁঠালের গায়ে যেমন থাকে, সেইরকম। নিশ্চয় জটিল রোগ হয়েছে। চামড়ার রোগ। গোটা মুখখানাও কাঁটা কাঁটা। তার ওপর অনবরত বিন্দু বিন্দু জল জমছে আর গড়াচ্ছে।

প্রফেসরের পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হল। আমারও হল। আমার যা মনে হয়েছিল, সেটা এখুনি লিখতে চাই না। প্রফেসরের যা মনে হয়েছিল, তা পষ্টাপষ্টি বলেই দিলেন (ভয়ানক ঠোঁটকাটা যে) 'মহাশয় কি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত?'

কান্টু বললেন, 'আজ্ঞে না। আমি একটা আশ্চর্য গবেষণার রেজাল্ট। আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত।' প্রথম দর্শনে আমার যা মনে হয়েছিল, এবার তা মনে মনেই বললাম, 'তোমার পাগলা গারদে যাওয়া উচিত। অথবা, চিড়িয়াখানায়।'

কী আশ্চর্য! কান্টু যেন আমার মনের কথা টের পেয়ে গেলেন। ভিজে ভিজে কটমটে

চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। অন্য কেউ হলে, ওই চাহনি দেখে টয়লেটে দৌড়োত। আমি শুধু একটু ঘেমে গেলাম।

হিমশীতল বলে একটা শব্দ আছে না বাংলায়? চাহনিটা সেইরকম। এবং, আমার ভুল হতে পারে, তবুও বলি— একটু অপার্থিব।

প্রফেসর মানুষটা মাঝে মাঝে বেশ ঘোড়েল হয়ে যান। আমার মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করে নিয়ে চকিতে বুঝে গেলেন, তাঁর মারদাঙ্গা বডিগার্ডের অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছে। তাই চোখে মুখে অসীম মায়া আর মমতা ফুটিয়ে বললেন, 'আহা, আপনাকে দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে।'

কাঁটা কাঁটা হাতের চেটো দিয়ে চোখ দিয়ে গড়ানো জল মুছতে মুছতে কান্টু বললেন, 'কেন? কষ্ট হবে কেন? আনন্দ হওয়া উচিত।'

কথাটা লুফে নিয়ে ঘোড়েল প্রফেসর বলে গেলেন, 'কেন? আনন্দ হবে কেন? আপনি হাজার হলেও একটা মানুষ—'

'আমি? মানুষ? ধুস!'

'তবে?' প্রফেসর এবার বুঝি একটু ঘাবড়ে গেলেন, 'তবে কী?'

'অমানুষ। .... না, না.... আমি একটা কসমিক মানুষ।'

চক্ষুস্থির হওয়া কাকে বলে, প্রফেসরকে দেখে সেদিন পরিষ্কার বুঝেছিলাম।

সুতরাং তাঁকে আড়াল করবার জন্যে এবার কথাযুদ্ধে নামলাম আমি, 'মহাশয়ের নাম কান্টু?'

'তাই তো বললাম।'

'কোন কান্ট্রির মানুষ?'

'কান্ট্রি! মানে দেশ? আমি কোন দেশের মানুষ জানতে চাইছেন?

'আজ্ঞে।'

কান্টুর দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হলাম। ছলছল চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, 'আপনি একটা রাম-গবেট।' একটু থামলেন। আমি ঘামছি দেখে খুশি হলেন। প্রফেসরের দিকে চেয়ে বললেন, 'এককালে আমার কান্ট্রি একটা ছিল বটে— এই পৃথিবীতে। বড় ছোট গ্রহ। এখন আমার কান্ট্রি গোটা ব্রহ্মাণ্ড। হেসে খেলে হাত পা ছড়িয়ে থাকা যায়। তাই তো বললাম, আমি কসমিক মানুষ। কসমস আমার ঠিকানা।'

চতুর প্রফেসর বোবা হয়ে থাকা শ্রেয় মনে করলেন। কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে বলে দিলেন, বাচাল যেন না হই।

আমি তখন টেলিফোন যন্ত্রটার দিকে চেয়েছিলাম। পাগলা গারদে একটা ফোন করে দিলেই—

কান্টু তক্ষুনি দূরধ্বনিবহ যন্ত্রটার দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে ছলছলাত গলায় বললেন, 'বিকল করে দিলাম— কসমিক পাওয়ার দিয়ে।'

ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিলাম রিসিভার।

টেলিফোন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। ডেড।

ছলছল নয়নে এবার এমন একখানা করুণ হাসি হাসলেন কান্টু, আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বললাম, 'আপনার কি এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে?'

'হবেই তো! থার্ড ক্লাস প্ল্যানেট এই পৃথিবী। এত ঘন বাতাসে— উঃ মাগো!'

প্রফেসর বললেন, 'বলে ফেলুন, বলে ফেলুন, যা বলতে এসেছেন... ইয়ে... নেমে এসেছেন কসমস থেকে.... তা বলে ফেলুন... তাতে যদি আপনার উপকার হয়—'

ছলছলে চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে বললেন কান্টু, 'আমার উপকার! ধুস! আমি তো এসেছি আপনার... মানে... আপনাদের উপকারের জন্যে। কসমস থেকেই টের পেলাম, একখানাই সরেস ব্রেন আছে এই থার্ড ক্লাস প্ল্যানেটে।'

'অজস্র ধন্যবাদ,' গদগদ হবার চেষ্টা করলেন প্রফেসর, 'বলুন কীভাবে আমি আপনার... ইয়ে আপনি আমার উপকারে আসতে পারেন?'

প্রীত হলেন কান্টু। কাঁটা কাঁটা হাতের উলটো পিঠ দিয়ে গালে গড়ানো জল মুছে নিলেন।

বললেন, 'ফিলিপিনো সার্জনের সেই অবিশ্বাস্য কীর্তি নিশ্চয় আপনার অজানা নয়?'

প্রফেসর বললেন, 'ফিলিপাইন্স-এর চারশো বিশ সাইকিক ডাক্তারদের কথা শুনেছি, বিশ্বাস করি না।'

'কারণ, তাদের নিয়ে তেমন তদন্ত হয়নি বলে?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'কিন্তু ব্রেজিল? এই থার্ড ক্লাস প্ল্যানেটের মোস্ট সাইকিক কান্ট্রি নয় কি?'

'শুনেছি।'

'জোস অ্যারিগো-র সাইকিক অপারেশন তা হলে বুজরুকি নয়?'

'ডক্টর আনরিজা পুহারিখ— নিউইয়র্কের ডক্টর অ্যানরিজা পুহারিখ তদন্ত করে সার্টিফিকেট দিয়েছেন বটে জোস অ্যারিগোকে।'

'তা হলে বিশ্বাস করেন, বুদ্ধির অগম্য একটা রহস্যময় শক্তি স্পন্দিত হয়ে চলেছে এই ব্রহ্মাণ্ডে?'

কান্টু-র দিকে নিমীলিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন প্রফেসর, 'যা অজানা, তাকে জানতে চেষ্টা করি বই কী। ব্রেজিলের জোস অ্যারিগো, আরও অনেকে, ওষুধপত্র ছাড়াই, সাধারণ ছুরি-কাঁচি দিয়ে অপারেশন করতেন, রোগটা কী আর কোথায়— তা যন্ত্রের সাহায্য না-নিয়েই ধরে ফেলতেন— সারিয়ে দিতেন। সবই কি বুজরুকি? এর পেছনে অজানা কোনও বিজ্ঞান আছে কি? নিশ্চয় তা নিয়ে ভেবেছি—!'

'কাজও করেছেন,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন কান্টু।

জুলজুল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন প্রফেসর।

তারপর বললেন, 'আমার হাঁড়ির খবর রাখেন মনে হচ্ছে?'

'রাখি,' কান্টুর কন্টকময় বদনে এখন অদ্ভুত হাসি।

'বায়োএনারজেটিক্স নিয়ে গবেষণা করেছেন বলে?'

'আজ্ঞে। ব্রেজিলের মিস্টিরিয়াস সাইকিক সার্জনদের শক্তির উৎস খুঁজেছিলাম। পেয়েছি। পেয়েছি। নিজের ওপর তা প্রয়োগ করেছিলাম। লাগামছাড়া মাত্রায়। পরিণামটা

আর কন্ট্রোল করতে পারছি না। আপনার হেল্‌প চাই।'

'হয়েছে কী আপনার?' প্রফেসর এখন বিলক্ষণ সদয়, 'চেহারা এরকম যাচ্ছেতাই করে ফেলেছেন কেন?'

'আরে মশায়,' এতক্ষণে কাজের কথায় এলেন কান্টু, হাঁপাচ্ছেন বিষম আবেগে, 'ওই যে মিস্টিরিয়াস পাল্‌স্‌... গোটা ইউনিভার্স জুড়ে যে স্পন্দন...কম্পন... ভাইব্রেশন... তার নাগাল ধরে ফেলেছিলাম। উৎসাহের চোটে হাইডোজে নিজের ওপর অ্যাপ্লাই করে ফেলেছিলাম। ফলে... ফলে...'

কান্টু আর কথা বলতে পারছেন না।

ভুরু কুঁচকে বললেন প্রফেসর, 'ফলে?'

'আ... আমি... না... কসমিক কুয়াশা হয়ে গেছিলাম।'

'কসমস-য়ে মিশে গেছিলেন?'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ... হ্যাঁ...'

'ফিরে এলেন কোন দুঃখে?' প্রফেসর এখন যেন কিঞ্চিৎ নির্দয়।

'আ... আমি তো নিজে আসিনি। টেনে এনেছে।'

'কে?'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন কান্টু, 'আ... আপনি জানেন না?'

'গবেষণা একটা করছি বটে... আপনি বায়োএনারজি নিয়ে করেছেন, আমি করছি... কিন্তু আপনাকে তা বলব কেন? দিস ইজ মাই সিক্রেট।'

'স্যার'

'বলুন, প্রফেসর।'

'প্রফেসর, আপনি অরগন এনার্জি টানতে গিয়ে কসমস থেকে আমাকে টেনে এনে এই হাল করেছেন। প্লিজ... আমাকে ঢুকতে দিন আপনার অরগন বক্সে। তা হলেই ফিরে পাব ফুল ফিগার... অরিজিনাল ফিগার।'

সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে বললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'একটু বেশি জেনে ফেলেছেন দেখছি। আমি কাজ করছি অরগন এনার্জি নিয়ে—'

'লাইফ ফিল্ড... লাইফ ফিল্ড.... প্রাণশক্তি ওই অরগন এনার্জি.... সাইকিক পাওয়ারের মূলে ওই অরগন এনার্জি... স্যার...'

'বললাম না প্রফেসর বলবেন?'

'ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, আই মিন প্রফেসর স্যার... বায়োএনার্জি আমাকে কসমিক কুয়াশা বানিয়ে সব গুবলেট করে দিয়েছিল... আপনার অরগন বক্স—'

এবার চোখ পাকালেন প্রফেসর, 'সে খবরও রাখা হয়ে গেছে!'

'আজ্ঞে। আমি যে কসমিক কুয়াশা হয়েছিলাম। আপনার অরগন বাক্স হ্যাঁচকা টান মেরে ফের নামিয়ে এনেছে এই থার্ড... থার্ড ক্লাস প্ল্যানেটে। কিন্তু ঢুকতে পারছি না আপনার বন্ধ বাক্সে।'

'বন্ধই থাকুক। আপনি বিদেয় হন,' প্রফেসর এখন বেশ কড়া।

কেঁদে ফেললেন কান্টু, 'স্যার... ইয়ে... প্রফেসর... বাক্সটা একটু খুলে ধরুন... আমি সাঁত্ করে ঢুকে যাই... ফের কুয়াশা... কসমিক কুয়াশা হয়ে যাই।'

'গিয়ে?'

'কসমসে... সে বড় চমৎকার জায়গা... ধূধূ ব্রহ্মাণ্ড... কত গ্রহ, নক্ষত্র, নোভা, সুপারনোভা, ছায়াপথ... অনন্ত... সেইখানে ফিরে যাব।'

'আর আসবেন না তো?'

'এই নাক-কান মলছি স্যার, ইয়ে, প্রফেসর। জীবনে আর মানুষ হতে চাইব না। জঘন্য।'

'যান।'

'কোথায়?'

'এই দীননাথের সঙ্গে।' বলে, আমার দিকে মুখ ফেরালেন প্রফেসর, 'কান্টু-র কান ধরে নিয়ে যাও। পাতাল চেম্বারে ন'নম্বর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েই দরজা টেনে বন্ধ করে দেবে— ভেতরে কী আছে দেখতে যাবে না।'

আমি দুই চোখ ছানাবড়া করে বললাম, 'ওরে বাবা! ৯ তো এক অজানা শক্তির সংখ্যা। ও-ঘরের কম্পিউটার চাবিকার্ড তো আপনার কাছে।'

'এই নাও,' বুক পকেট থেকে বিশেষ সেই কার্ড বের করে আমার হাতে দিলেন প্রফেসর, 'খবরদার, ভেতরে উঁকিও দেবে না। কান্টুর অবস্থা হয়ে যেতে পারে।'

ফলে, আমি আজও দেখিনি শক্তিঠাসা সেই অরগন বাক্সর চেহারা। কারও যদি সাধ হয়, প্রফেসর না-ব-চ'র সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারেন— কেয়ার অফ এই প্রকাশক।

আমাকে জড়াবেন না, প্লিজ। কান্টু-র কালটু চেহারা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

আটলান্টিক-লেমুরিয়ার রহস্য

যন্ত্রটাকে যন্ত্র বলে মনেই হয় না, যেন একটা রাজ সিংহাসন। মাথায় চাঁদোয়ার বদলে হেলিকপ্টারের পাখা। পেছনে এরোপ্লেনের প্রপেলার। পায়ার তলায় হোভারক্র্যাফট-এর প্যাড— যাতে জলের ওপর দিয়ে পিছলে যেতে পারে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র ফোকলা হেসে বলেন, 'দীননাথ, এই হল আমার টাইম মেশিন— এইচ জি ওয়েলস যা ভাবতেও পারেননি।'

'ওয়েলস ভেবেছিলেন বলেই টাইম মেশিন ভাবতে পেরেছেন আপনি,' আমার ওয়েলস-ভক্তিতে খোঁচা মারায় চটে গিয়ে বলেছিলাম, 'কিন্তু কী ভাবতে পারেননি উনি?'

'যেমন ধরো, পাঁচলক্ষ বছর আগে গিয়ে যদি দেখি পায়ের তলায় জমি নেই— জল। তখন কি ডুবে মরব? হোভারক্র্যাফট চালিয়ে সাঁ-সাঁ করে ঘুরে বেড়াব সেই জলে। যদি তেড়ে আসে সরীসৃপ দানব, হেলিকপ্টার চালিয়ে বোঁ করে উঠে পড়ব আকাশে। টেরোড্যাকটিল তাড়া করলে এরোপ্লেনের প্রপেলার চালিয়ে মেঘের কোলে খেলব লুকোচুরি। তোমার ওয়েলস সাহেবের ঘাড়ে একটা মুন্ডু ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা যথেষ্ট পরিমাণে ব্রেনযুক্ত ছিল না। নইলে—'

'কোথায় যাবেন টাইম মেশিনে চেপে?'

'আটলান্টিস মহাদেশে।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ। তারপর লেমুরিয়া মহাদেশে।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'আপাতত জলের তলায়।'

এইভাবেই শুরু হয়েছিল আমাদের আটলান্টিস আর লেমুরিয়া অভিযান। দুটি মহাদেশই এখন সমুদ্রের তলায়। লন্ডন থিয়সফিক্যাল সোসাইটি প্রকাশিত পৌনে একশো বছরের পুরনো কালজীর্ণ দু'খানি ম্যাপ আমার সামনে মেলে ধরে প্রফেসর দেখিয়েছিলেন, পুরাকালের ভূ-চিত্র। কালো কালি দিয়ে আঁকা বর্তমান পৃথিবীর চেহারার ওপর লাল দিয়ে ছাপা হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর ম্যাপ। অবাক হয়ে দেখেছিলাম, এখন যেখানে ধুধু জলরাশি,

এককালে সেখানে ছিল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। দক্ষিণ আমেরিকার ডাইনে-বাঁয়ে ভূখণ্ডের কথা এখন কেউ ভাবতেও পারবে না। কিন্তু তখন ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার তলার দিকে লেগে ছিল এই জমি। আফ্রিকার ডাইনে, বাঁয়ে, তলায়ও ছিল বিরাট মহাদেশ। একটাই মহাদেশ। ভারতবর্ষ ছুঁয়ে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে সেই মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ঢেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে বিস্তৃত ছিল দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত। তেমনি মহাদেশ ছিল আটলান্টিক মহাসাগরেও। ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে জমির সাঁকো ছিল এই দেশ।

এখন নেই। অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, সর্বোপরি বিধাতার অঙ্গুলি হেলনে সব তলিয়ে গিয়েছে সাগরের তলায়। কিন্তু চিহ্ন রয়ে গেছে দেশে দেশে। আফ্রিকার মানুষদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের মিল, ঈস্টার দ্বীপ আর সুমেরীয় সভ্যতার রহস্য, মিশরীয় আর মায়া সভ্যতার প্রহেলিকা— সব কিছুই নির্দেশ করছে অতীতের এক গৌরবময় যুগের। কত কল্পকাহিনিই না রচিত হয়ে চলেছে এইসব তত্ত্ব নিয়ে।

কিন্তু সবই কি মিথ্যে? প্লেটোর অনেক কথাই তো সত্যি হয়েছে, আটলান্টিসের কথাই বা সত্যি হবে না কেন?

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তাই টাইম মেশিন বানালেন পুরাকালে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখবেন বলে। মেশিন নিয়ে পৌঁছোলেন আটলান্টিসে। প্লেটোর বর্ণনামতো জায়গায় পৌঁছে উঠলেন একটা বিজন দ্বীপে। জাহাজকে বিদায় দিয়ে, প্যাকিং খুলে টাইম মেশিন নামিয়ে, আমাকে বললেন, 'তুমি থাকবে, না, আসবে?'

লাফ দিয়ে রাজ সিংহাসনে গিয়ে বসলাম। কথা বললাম না। প্রফেসরও কথা বললেন না। মেশিনের হাতলে বসানো সুইচ টিপে লিভারে চাপ দিলেন। মিটারের কাঁটা ঘুরতে লাগল। আর, একটা প্রায়-অশ্রুত মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পর চোখের সামনে যেন কুয়াশা জড়ো হল। কানে ভোঁ লাগল। চোখে অন্ধকার। দিনের বেলা রাত মনে হল। আবার চমকানি দেখলাম ঘনঘন। দিন আর রাত পিছু হেঁটে চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী। কাঁটা এত জোরে ঘুরছে যেন প্রায় অদৃশ্য। একটা কাঁটা কেবল স্থিরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে একঘর একঘর করে। হাতঘড়িতে যেমন সেকেন্ডের কাঁটা, সময় যন্ত্রে তেমনি এটি হাজার বছরের কাঁটা। এই কাঁটাটাই টুকটুক করে এগিয়ে চলল অনেকক্ষণ। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখার মতো প্রফেসর টাইম মেশিনেও সময় সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। তাই, আটলান্টিস আমলে পৌঁছোতেই চোখের সামনে থেকে কুয়াশা গেল সরে, কানের তালা কেটে গেল। মেশিনের দুলুনি কিন্তু বন্ধ হল না। গুঞ্জনধ্বনি স্তব্ধ হতেই দেখলাম, আকাশে উজ্জ্বল সূর্য, আর পায়ের তলায় জল।

টাইম মেশিন ভাসছে সমুদ্রের জলে।

বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল দূরের দৃশ্য দেখে। সমুদ্রতট বেশি দূরে নেই। ভাগ্যিস জলে ভাসবার মতো করে টাইম মেশিন বানিয়েছিলেন প্রফেসর, নইলে এতক্ষণে ডুবে মরতে হত।

সমুদ্রতটে নৌকোর মতো কয়েকটা পাটাতন ভাসছে অতদূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি,

পাটাতনের ওপর থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটছে দীর্ঘদেহী নরনারীরা। তাদের কারও রং কালো, কারও সাদা, কারও হলদেটে, কারও লালচে। দূরবিন বাড়িয়ে দিলেন প্রফেসর। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম মানুষগুলোকে। সুগঠিত দীর্ঘদেহী নরনারী। যেন আমেরিকার লাল মানুষ, চিনের পীত মানুষ, ইউরোপের সাদা মানুষ আর আফ্রিকার কালো মানুষ একই সঙ্গে হই-হুল্লোড় করছে জলের মধ্যে।

অভিভূত কণ্ঠে বললাম, 'প্রফেসর, এরা কারা?'

'আটলান্টিসের মানুষ।'

'এত রঙের?'

'হ্যাঁ, দীননাথ। তবুও এখানে শান্তি ছিল। এরাই এখান থেকে ছড়িয়ে যায় দেশে দেশে। তখন কথা বলত এক ভাষায়— পরে, বিভিন্ন ভাষায়!'

'আমরা এখন কোথায়?'

'নিরক্ষ রেখার ১৫ ডিগ্রি উত্তরে। লস্ট আটলান্টিস তোমার সামনেই। আর ওই সেই জনপদ।'

জনপদই বটে! শক্তিশালী দূরবিনের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম সতেজ বৃক্ষ, বাগিচা আর সারি সারি বাড়ি। কাঠ আর পাটাতনের ভবন। গোটা দেশটাই যেন পার্ক। ফুল আর গাছ দিয়ে সাজানো। কতকগুলো ভবন আকারে বড়, রঙিন। নিশ্চয় বিত্তশালীদের বাসস্থান। পশ্চিমে একটা পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে জলধারা নামছে প্রপাতের আকারে— শহরের জলের জোগান আসছে তা হলে এই পাহাড় থেকেই। বাগান-শহর গড়ে উঠেছে এই পাহাড়েরই ঢালু গায়ে। পাঁচশো ফুট উঁচু পাহাড়। শীর্ষদেশে প্রকাণ্ড প্রাসাদ। সাদা রঙের প্রাসাদ ঘিরে ঝকঝকে সবুজ গাছের বাগান।

দম আটকানো স্বরে বললাম, 'প্রফেসর! প্রফেসর! ও কার প্রাসাদ?'

'টোলটেক-দের সম্রাট যিনি, তাঁর।'

'টোলটেক মানে?'

'আটলান্টিয়ানরা অনেক জাতিতে বিভক্ত ছিল, দীননাথ। এদের মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ে আসে টোলটেক। এদের এনার্জির শেষ ছিল না। এই এদের স্বর্ণযুগ!"

'এই যুগ দেখবেন বলেই আপনি এসেছেন?'

'হ্যাঁ। স্বর্ণযুগের স্বর্ণশহর হল ওই শহর।'

সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম স্বর্ণশহরের দিকে। পর্বতশীর্ষের মাথায় ফোয়ারা ঠেলে উঠছে অনেক দূর পর্যন্ত। অফুরন্ত ফোয়ারা। জলধারায় প্রথমে সিঞ্চিত হচ্ছে বাগান। তারপর, প্রপাতের আকারে চারদিক দিয়ে গিয়ে পড়ছে প্রাসাদ-পরিখায়। বৃত্তাকারে গোটা প্রাসাদটাকে ঘিরে রেখেছে এই পরিখা। সেখান থেকে অনেকগুলো খালের মধ্যে দিয়ে সেই জল নেমে আসছে সানুদেশের শহরে। চারটে মূল খালের মধ্যে দিয়ে এই জল শহরের মধ্যে দিয়ে নেমে এসেছে আরও নীচে। পরপর তিনটে খাল বৃত্তাকারে পাহাড় আর শহরকে ঘিরে রেখেছে নীচের দিকে— সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঈষৎ উচ্চে। চতুর্থ বৃত্তাকার খালটি রয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠে। এখান থেকেই জল নেমে এসে মিশছে সাগরের জলে। ছবির মতো সাজানো শহর

বিস্তৃত এই সর্বশেষ খালের কিনারা পর্যন্ত। প্রায় বারো মাইল বর্গক্ষেত্রের ওপর নির্মিত শহরের একটা দিকই আমরা দেখতে পেলাম শক্তিশালী দূরবিনের দৌলতে। অপর দিক রইল চোখের আড়ালে।

কানের কাছে ক্লিক শব্দ হতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ছবি তুলছেন প্রফেসর। টেলিস্কোপিক লেন্স ফিট করা দামি ক্যামেরা দিয়ে বহু দূরের ছবি পর্যন্ত ধরে রাখছেন ফিল্মের বুকে।

আমি ফের চাইলাম সামনে।

মূল শহরটা তা হলে তিনখণ্ডে ভাগ করা। খাল তিনটে পৃথক করে রেখেছে শহরগুলোকে। প্রাসাদের ঠিক নীচের বেল্টে যে শহর খণ্ড, তার বড় বৈশিষ্ট্য একটা বিশালাকায় বাগান। আর একটা মস্ত মাঠ। সবুজ ফিতের মতো একফালি মাঠ শহরের মাঝখান দিয়ে ঘিরে রয়েছে শহরটাকে। দূরবিনের মধ্যে দিয়ে দেখলাম, কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করে আছে মাঠের দু'পাশে, আর, কী যেন দৌড়োচ্ছে সবুজ ফিতের মাঝখান দিয়ে।

ক্লিক করে ফের শব্দ হল ক্যামেরায়।

'ফার্স্ট ক্লাস,' বললেন প্রফেসর।

'কী ফার্স্ট ক্লাস?' শুধোলাম আমি।

'দূরবিন দিয়ে দেখেও বুঝলে না মাঠটা কীসের?' বলে আমার বিমূঢ় মুখের ওপর জবাবটা ছুড়ে মারলেন, 'রেস কোর্স। ঘোড়দৌড় হচ্ছে।'

আমি হাসতে পারলাম না। আটলান্টিস কিংবদন্তি আমাকেও নাড়া দিয়েছে ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু স্বচক্ষে সেই দৃশ্য দেখার পর আমার মনের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। প্লেটো বর্ণিত পসিডোনিস দ্বীপটাই বোধহয় দেখেছিলাম চোখের সামনে। কিন্তু সে তো প্রায় হাজার বারো বছর আগে মহাদেশের সর্বশেষ যে ভূখণ্ডটি জলমগ্ন হয়— তারই নাম পসিডোনিস। সবসুদ্ধ চার দফায় নাকি বিশাল সেই মহাদেশ তলিয়ে গেছিল জলের তলায়। প্রথমটি ঘটেছিল Miocene যুগে, প্রায় আট লক্ষ বছর আগে। দ্বিতীয় মহাপ্রলয় ঘটে দু'লক্ষ বছর আগে। সেটা খুব ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু তৃতীয় মহাপ্রলয়ে সর্বনাশ হয়ে যায় আটলান্টিসের। আশি হাজার বছর আগের সেই মুহুর্মুহু অগ্ন্যুৎপাত আর ভূমিকম্পের ফলে আটলান্টিক গ্রাস করে নেয় বিপুল সভ্যতার প্রায় সবটুকুই। জেগে থাকে শুধু পসিডোনিস— যার বর্ণনা মহামনীষী প্লেটো স্থির বিশ্বাসে লিখে গেছেন একাধিকবার।

আধুনিক কালে বিজ্ঞানীরা বারংবার অভিযান চালিয়ে প্রমাণ পেয়েছেন, প্লেটো বানিয়ে বলেননি। তাঁরা সমুদ্রের তলায় ডুবুরি নামিয়েছেন; কীটপতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি কীভাবে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে দেখেছেন; ভাষা আর মানব জাতিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন; ভাস্কর্য, ধর্মবিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করেছেন; সবার ওপরে, প্রাচীন লেখকদের রচনা আর প্রায় মহাপ্লাবনের ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছেন। আটলান্টিক রাক্ষস যে সুউন্নত এক সভ্যতাকে খেয়ে বসে আছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে লুপ্ত দেশের দৃশ্য দেখছি আর এইসব কথা ভাবছি বলেই কান দিয়ে শুনতে পাইনি মাথার ওপরে হাওয়ার আলোড়ন। টের পেলাম প্রফেসরের চিৎকারে।

চিৎকার করে বলছেন প্রফেসর, 'গুড মর্নিং জেন্টেলমেন!'

কাকে বলছেন? ফিরে দেখি, আকাশের দিকে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর।

আর, আমার মাথার প্রায় বিশ হাত ওপরে ভাসছে একটা আজব উড়ুক্কু যান। ফ্লাইং মেশিন!

ঠিক যেন জলের নৌকো শূন্যে ভাসছে। সাদা চকচকে ধাতু দিয়ে তৈরি। তলদেশ নৌকোর মতোই। কিনারায় উঁকি মেরে রয়েছে কয়েকটা মুন্ডু। রং ফরসা। চোখে কৌতূহল। মাথায় শিরস্ত্রাণ।

আচম্বিতে হাত নাড়ল তাদের একজন। পরক্ষণেই উড়ুক্কু যান দুলতে দুলতে নামতে লাগল নীচের দিকে।

চেঁচিয়ে উঠেছিলাম বিষম আতঙ্কে, 'প্রফেসর! পালান! পালান!'

বলেই, হ্যাঁচকা টান দিয়েছিলাম টাইম মেশিনের লিভারে নীচের দিকে।

ঝাঁকুনিতে ঠিকরে যেতাম আর একটু হলেই। ধরে ফেলেছিলেন প্রফেসর।

কুয়াশার যবনিকায় আর কিছু দেখতে পাইনি। কানের কাছে শুধু শুনেছিলাম প্রফেসরের সুমিষ্ট স্বর।

'বোকা ছেলে! আদ্দিকালের মানুষকেও এত ভয়!'

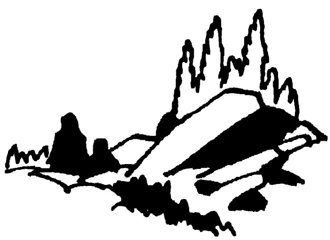

প্রজাপতি, ম্যমি ও সংকেত

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বললেন, দীননাথ, পাতাল শাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে জানলাম, পাতালে প্রবেশের একটা পথ ময়দানব বানিয়ে রেখেছে কাশ্মীরে— শরিকাকুট তীর্থে। দেবী শারিকা-র কৃপা হলে পাতাল-গহ্বরের গোপন পথ খুলে যায়, পাঁচ দিন পাঁচ রাত একটানা হেঁটে নেমে গেলে ষষ্ঠদিনে পাতাল গঙ্গা ভোগবতীকে পেরিয়ে যেতে হয়। তখন পায়ের তলায় দেখতে পাওয়া যায় রজতভূমি— খাঁটি রুপো দিয়ে তৈরি জমি। তারপর দেখা যায় চোখ ঝলসানো এক বাগান— সেখানকার মন্দিরের ভিত সোনা দিয়ে তৈরি, থামগুলো দামি দামি মণি পাথর দিয়ে গড়া, মেঝে চন্দ্রকান্ত মণি দিয়ে বাঁধানো।'

প্রফেসর থামলেন।

আমি বললাম, 'অল বোগাস।'

প্রফেসর কটমট করে চাইলেন। বললেন, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।'

আমি বললাম, 'ছাই! মানে?'

'কিংবদন্তি।'

'কাশ্মীরের পাহাড়ে পাহাড়ে গুলগাপ্পা কিংবদন্তির পাহাড় জমে আছে। ভূ-স্বর্গ তো, বসে বসে গল্পের গামছা বুনেছে। নেই কাজ তো খই ভাজ।'

প্রফেসর চটে গেলেন না। বললেন, 'কিংবদন্তি কোথায় নেই, দীননাথ? কিংবদন্তি আসলে গল্পের গামছা দিয়ে ঢাকা এক একটা ইতিহাস।'

এইবার একটু উৎসুক হলাম। অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার গন্ধ পাচ্ছি যেন?

বললাম, 'এরকম একখানা কিংবদন্তি নিশ্চয় বাগিয়েছেন?'

'কী ভাষা!' বললেন প্রফেসর। একটু আনমনা রইলেন। তারপর 'বাগাইনি, আমাকে বাগে ফেলেছে।'

'প্যাঁচে পড়েছেন? কোথায়?'

'আমাজনের অরণ্যে।'

এবার সটান সিধে হয়ে বসতে হল আমাকে। আমাজন, আমাজন, আমাজন। এখনও যদি কোথাও অ্যাডভেঞ্চারের অবশিষ্ট পড়ে থাকে, তবে তা আছে আমাজনে। এই ভয়াল, ভয়ংকর

আমাজন! যেখানে কুরারি বিষ মাখানো তির আজও উড়ে যায় ব্লো-পাইপে ফুঁ দিলেই, যেখানকার অনেক অগম্য জঙ্গলে আজও সভ্য মানুষের প্রবেশ নিষেধ।

অ্যাডভেঞ্চার থাকে তো এমন জায়গাতেই।

এমন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ যখন পেয়েছেন প্রফেসর....অদ্ভুতকর্মা প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, তখন এই শ্রীহীন আখাম্বা দীননাথ নাথ অবশ্যই সেই অ্যাডভেঞ্চারের প্রসাদ একটু পাবেই।

তাই ভালমানুষের মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করলাম 'ব্যাপারটা কী?'

উনি বললেন, 'প্রজাপতি, মমি আর সংকেত।'

'মা.... মানে?'

'বুঝতে হলে আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।'

'আমি এক পায়ে খাড়া।'

আমরা এখন ব্রেজিলের জঙ্গলে। এখানে নাকি এখনও প্রস্তর যুগের মানুষ থাকে, তাদের আদিম জীবনযাত্রাকে আদিমই রেখে দেয়, আধুনিকতা দিয়ে কলুষিত করে না।

এমনই একটা প্রস্তর যুগীয় মানুষ কোরুবো। আমরা গুরু চেলা চলেছি বন ঠেঙিয়ে তাদের ঝুপড়ির দিকে।

আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পায়ের তলায় নর্দমার মতো জল বেয়ে যাচ্ছিল কাদামাটির ওপর দিয়ে— হোঁচট খেলাম সেখানে একবার। মাঝে মাঝে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে কাদায়। গরম অসহ্য। আগে আগে যাচ্ছে সিডনি পসুলো—ব্রেজিলিয়ান গভর্নমেন্টের আদিবাসী বিভাগের সিনিয়র অফিসার। আমরা চলেছি অতি-ভয়ংকর প্রস্তর যুগীয় মানুষদের ডেরার দিকে। চলেছি জয়বারি ভ্যালি দিয়ে— ব্রেজিলের নিষিদ্ধ অঞ্চলের অন্যতম এই উপত্যকায় জংলিদের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখে সরকার—বাইরের মানুষ এসে যেন তাদের না-ঘাঁটায়, নজর রাখে সেদিকে।

আশি কোটি একর জায়গা তাই নিষিদ্ধ এলাকা বাইরের মানুষের কাছে।

অথচ প্রস্তর যুগীয় মানুষ এখানে সংখ্যায় বেশি নয়, মাত্র ১৩৫০ জন। ব্রেজিল সরকার তাদের না-ঘাঁটিয়ে টিকিয়ে রাখতে চায় বৃষ্টি-ঝাঁকালো প্যাচপেচে এই মহা অরণ্যে। প্রাচীন প্রস্তর যুগ আর নব্য প্রস্তর যুগ টিকে থাকুক এই বিশাল এলাকায়। পেরু-র সীমান্ত ঘেঁষে রয়েছে এই মহাঅরণ্য। এখানেই তারা লড়ে মরে, বংশবৃদ্ধি করে নিজেদের মধ্যে।

নিবিড় গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে রোদ্দুর। জমি সেদিকে ঢালু হয়ে উঠে গেছে। টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে কুড়ি জন বিভীষণ আকৃতির মানুষ। তাদের বরতনুতে নেই কোনও পোশাক। মেয়েদের গায়ে টকটকে লাল রং, ছেলেদের হাতে লড়াই করার গদা।

১৫০০ শতকে পর্তুগিজ অভিযাত্রী পেড্রো কাব্রাল যখন হানা দিয়েছিল এই অঞ্চলে, তখন আদিবাসীরা ছিল সংখ্যায় এক কোটি দশ লক্ষ। জঙ্গলের ফসল নিয়ে গেছে লোভী সভ্য মানুষ, সংখ্যায় কমে এসেছে আদিম প্রস্তর মানব।

এখন যারা আছে, তারা নিঠুর মানব। অতিশয় নির্দয়। জঙ্গলের মানুষ জঙ্গলকেই বিশ্বাস করে, আর কাউকে নয়।

তারাই এখন দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। কুড়িজনের একটা দল, সবার আগে গদা বাগিয়ে দাঁড়িয়ে তাভান— সবচেয়ে বড় লড়াকু। মুখখানাই তার নেকড়ের মতো নৃশংস। গনগন করছে দুই চোখ, সারা গায়ে মাখানো লাল রং। এই প্রজাতির প্রস্তর মানব গদা মেরে খুলি ছাতু করে দিতে ভালবাসে— ব্লো-পাইপের চেয়ে।

কালান্তর যমের মতো এই লোকটার নজর দেখলাম আমার দিকেই। আমিই যে সবার মাথা ছাড়িয়ে রয়েছি। তাল ঢ্যাঙা নম্বর ওয়ান।

তাই, তাভান চোখে চোখে রেখেছে আমাকে। ওই গদা হাঁকড়ালে খুলি ছাতু আটকায় কে?

প্রফেসরের প্রাণে ভয়ডর কি নেই? উনি হঠাৎ জোর গলায় হেঁকে উঠলেন, 'মায়া! মায়া!'

চমকে উঠেছিলাম আমি। আমাজনের জঙ্গলে মায়া দেখছেন প্রফেসর? মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি!

কুড়িজনের মধ্যে নড়ে উঠল এক প্রস্তর-মানবী। বছর চল্লিশ বয়স। সারা গায়ে রক্তের মতো লাল রং। চোখ দুটো সাদা পাথরের মতো শক্ত। কঠোর চাহনি।

বিড়বিড় করে বললাম প্রফেসরকে, 'প্রলাপ বকছেন নাকি?'

প্রফেসর গলা নামিয়ে বললেন, 'মায়া ওর নাম।'

'বাংলা নাম?'

'কী আর করা যায়। ওর বরের নাম শিশু। পাশেই গদা হাতে দাঁড়িয়ে।'

কান আমার ঠিক শুনছে তো? আমাজনের জঙ্গলে মায়া আর শিশু। শিশুর চেহারা তো প্রস্তর দানবের মতোই, শিশু মোটেই নয়। আর, মায়ার অন্তরে মায়া-দয়ার যে ছিটে ফোঁটা নেই— তা চোখ দেখেই মালুম হচ্ছে।

ফিসফিস করে বলছিলাম প্রফেসরকে, 'ব্লো-পাইপ ছোড়বার আগেই চলুন পালাই।'

'এরা গদা হাঁকিয়ে মানুষ মারে, ব্লো-পাইপ দিয়ে মারে বাঁদর খিদে পেলে।'

আহা! কী সান্ত্বনা বাক্য! প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু ভয়ের চোটে কথা আটকে গেল।

এই সময়ে একটা অদ্ভুত কর্ম শুরু করলেন প্রফেসর।

নাচতে লাগলেন!

উদ্দাম বিকট সৃষ্টিছাড়া সেই নাচ দেখে আমার চোখ যখন ছানাবড়া, কিন্তু প্রস্তর মানবদের নয়ন স্তিমিত, তখন চাপা গলায় উল্লাস ছিটিয়ে প্রফেসর বলে গেলেন, 'নাচো, দীননাথ, এইভাবে নাচো। এ যে হাকা নাচ। মাওরিদের যুদ্ধ-নাচ। ফেমাস করে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড রাগবি টিম। তুমিও নাচো, আমিও নাচি— ওরাও নাচবে— খুশি হয়ে—'

সত্যি সত্যিই তাই হল। প্রথমে মাথার ওপর বিশাল গদা ঘুরিয়ে একপাক নেচে নিল শিশু, তারপর মায়ার একহাত ধরে এমন উদ্দাম নাচ শুরু করে দিল যে তাল রাখতে পারলাম না আমি। কিন্তু হেদিয়ে পড়ার পাত্র তো নই আমি। আমাজন কাঁপিয়ে নটরাজ নাচ নেচে গেল বাংলার ছেলে। সে এক জগাখিচুড়ি নাচ।

কিন্তু প্রসন্ন হল মায়া আর শিশু। দাঁত খিচিয়ে হাসল। তারপর আমাদের ডেকে নিয়ে গেল ওদের চালাঘরে।

ফিসফিস করে প্রফেসর বললেন, 'তোমার হাকা ড্যান্স দেখে ওরা ভড়কে গেছে, খুশিও

হয়েছে। বড় যোদ্ধা ভেবেছে। হয়তো এখানে থাকতে বলবে। ওদের সমাজের নিয়মমতো, এখানকারই একটা মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। দ্যাখো, কাকে পছন্দ।'

গা-পিত্তি জ্বলে গেল বুড়োর কথা শুনে। কিন্তু টু শব্দটি না-করে পায়ে পায়ে ঢুকে গেলাম চালাঘরে।

অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার দেখে রক্ত জল হয়ে এসেছিল আমার। মাথার ওপর ঝুলছে লম্বা লম্বা ব্লো-পাইপ, রণকুঠার টাঙানো দেওয়ালে, মেঝের গর্ততে খাড়া করে ঢোকানো রণ গদা।

মায়া দেখলাম একাই একশো। ভয়ানক দাপুটে। বীরাঙ্গনা বটে।

ওর চাহনির সামনেই তো নেতিয়ে পড়ছে প্রত্যেকে।

মেঝের ওপর পাতা সারবন্দি ছ'টা উনুন। ছ'টা ফ্যামিলির পৃথক ব্যবস্থা। এক হাঁড়িতে খাওয়ার রেওয়াজ দেখছি প্রস্তর মানবদের মধ্যে থেকেও বিদায় নিচ্ছে।

একটা বড় কড়ায় রান্না চাপানো হল আমাদের জন্যে। যে জন্তুটার ছাল ছাড়ানো হল আমাদের সামনেই, ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী সে আমাদের পূর্বপুরুষ। অর্থাৎ, একটা বাঁদর।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রফেসরকে, 'বাঁদর মারা চাট্টিখানি কথা নয়। মারল কী করে?'

'ব্লো-পাইপের তির ছুড়ে।'

গা হিম হয়ে গেল আমার, 'কুরারি বিষে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর মাংসতে তা হলে তো কুরারি রয়েছে?'

'তাতে কী?' প্রফেসর বিলক্ষণ নির্বিকার, 'ওই তো কুরারি সিরাপ তৈরি হচ্ছে, লতা ফুটিয়ে সিরাপে ডুবিয়ে নেবে তিরের ডগা। ফুঁ দিয়ে দেবে। বাঁদরের গায়ে ঢুকলে আর নিশ্বেস নিতে পারবে না। মরে যাবে। সেই মাংস ফুটিয়ে খেলে কিস্‌সু হবে না। বিষ তো রক্তে ঢুকছে না।'

ফুটন্ত কুরারি দেখেই আমার খিদে উড়ে গেছিল। তার ওপর বাঁদরের মাংস, ছ্যা, ছ্যা!

খেয়েছিলাম মাছ। রান্না করেছিল মায়া। বাঁদরের মাংসে আমার বিতৃষ্ণা দেখে দাঁত বের করে একটু অবশ্য হেসেছিল।

হাসুক। বাঁদরের মাংস বাঁদরের বংশধর কক্ষনও খাবে না।

রান্না যখন চলছে, তখন বলেছিলেন প্রফেসর, 'দীননাথ, এত ঝুঁকি নিয়ে এদের মধ্যে এসেছি এদেরই একটা মিস্ট্রির মানে বের করতে, এরা বনের মানুষ, অথচ বনের দেবতা-টেবতায় বিশ্বাস করে না। সূক্ষ্ম জগৎ-টগতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। যা চোখে দেখা যায়, তার বাইরে কোনও কিছুর ধার ধারে না। প্রস্তর যুগের বস্তুতান্ত্রিক এরা।'

শুনে গেলাম কান খাড়া করে।

প্রফেসর বলে গেলেন, 'কিন্তু কিংবদন্তির নামে শিউরে ওঠে, কিংবদন্তিকে সমীহ করে, এইরকমই একটা কিংবদন্তি শুনে আমার খটকা লেগেছিল বলেই প্রাণ হাতে নিয়ে এখানে ছুটে এসেছি।'

উৎসুক হয়েছিলাম, 'কী রকম কিংবদন্তি?'

'এ অঞ্চলের সব প্রজাপতি একসঙ্গে পাখনা নাড়ায়, একই তালে ওঠে আর নামে, যেন

একটা অদৃশ্য সুতো ধরে কেউ টেনে চলেছে...চলেছে... চলেছে...'

'সে কে জানা গেছে? কিংবদন্তি কিছু বলছে?'

'বলছে।'

'কে সে?'

'একটা মড়া।'

জঘন্য আহার সমাপনান্তে মায়া নাম্নী উৎকট চেহারার মহিলার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিলেন প্রফেসর। দোভাষীর কাজ চালিয়ে গেলেন সিডনি পসুলো। ভদ্রলোক এদের দেখভাল করেন, তাই এত আস্থা অর্জন করেছেন। নইলে গদা হাঁকিয়ে খুলি ছাতু করে দিত কোনকালে। এরা মানুষ মারে গদা হাঁকড়ে; বাঁদর অতি নিকৃষ্ট জীব, তাই তাদের জন্যে বরাদ্দ কুরারি মাখানো তির।

অকুতোভয় প্রফেসরের গা সাপটে বসে থেকে শুনে গেলাম গা-হিম করা কিংবদন্তি কাহিনি।

সে অনেক...অনেক কাল আগের কথা। পুরাকালে বিশাল এই জঙ্গলে তখন কোরুবো থাকত অনেক। জঙ্গল-মানুষদের সঙ্গে গা মিলিয়ে থাকত অনেক বনমানুষ। হয়তো প্রস্তর যুগেরও আগের মানুষ। পৃথিবী যখন নিজেই নিজেকে ভেঙেচুরে গড়েপিঠে নিচ্ছে, বিবর্তনের প্লাবন চলেছে জীবজগতের মধ্যেও, যখন বিশালকায় টিকটিকি প্রাণীদের মধ্যে বিদায় ঘণ্টা বেজেছে, মহাকায় মানুষদের লম্ফঝম্প শুরু হয়েছে শুধু গাছের ওপরে নয়—গাছের নীচেও, তখন পেল্লায় বিকট বাঁদর মানুষেরা থাকত এই জঙ্গলে—আলাদা-আলাদা ডেরায়— কোরুবাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসত না। একই নিবিড় জঙ্গলে অনেক ভিন্ন জীবের সহাবস্থান খুবই স্বাভাবিক। কেউ কারও পা মাড়িয়ে দিলেই অবশ্য অনর্থ বেধে যেত।

কুরারি-র দৌলতে কোরুবো প্রজাতির মানুষ টিট করে রেখেছিল দৈত্যকার এই বাঁদর মানুষদের। আধুনিক যুগে হয়তো এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে পিথিকানথ্রপাস-এপ ম্যান। বাঁদরদের মতো চেহারা, কিন্তু প্রকাণ্ড, সারা গায়ে বড় বড় লোম, মস্ত মাথায় লম্বা লম্বা চুল। অসুরের মতো জোর ছিল গায়ে, রেগে গেলে গাছ উপড়ে ফেলত, বিরাট পাথর মাথার ওপর তুলে ছুড়ে মারত। কিন্তু হিংসা ছিল না বনের জানোয়ারদের মতো। বরং একা একা থাকতে ভালবাসত। নিবিড় বনের যে অঞ্চলটায় তারা টহল দিত, কোরুবার আদি পুরুষেরা সেখানে যেত না। এইভাবেই সহাবস্থান চলে এসেছিল হাজার হাজার বছর ধরে।

বনের জন্তুরা যেমন নিজেদের দল আলাদা করে নিয়ে অন্য দিকে অন্য কোথাও চলে গিয়ে যাযাবর হয়ে থাকে, কোরুবাদের মধ্যেও সেই বংশগত আদিম ইচ্ছা চলে এসেছে হাজার বছর ধরে। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে। বুনো হাতির দলের মতো এরাও টহল দিয়ে বেড়ায় বনের এমন এমন অঞ্চলে, যেখানে সূর্য পর্যন্ত ঢোকে না, হাওয়ায় গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারে, কোথায় আছে কোন শ্রেণির জন্তু। দরকারে হানা দেয় সেখানে, বিপদ বুঝলে সরে যায়।

বানর-মানুষদের ডেরাতেও কোরুবারা কক্ষনও ঢোকেনি বানর-মানুষরাও কক্ষনও ঘাঁটায়নি কোরুবাদের বিষ তিরের ভয়ে।

কিন্তু একদিন এই অলিখিত নিয়ম ভেঙেছিল একটা বৃহৎ বনমানুষ— মাথায় সে ছিল নাকি প্রায় দশ হাত।

সেই প্রসঙ্গ আসবার আগে কোরুবাদের বিয়ে-থা'র ব্যাপারটা জানা দরকার।

এদের মূল গোষ্ঠী থাকে বনের বিশেষ একটা জায়গায়। আমরা যেখানে বসে জটলা করছিলাম, সেখান থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে আরও নিবিড় জঙ্গলে ছেলেমেয়েদের বিয়ে-থা'র বয়স হলে এরা চলে যায় মূল গোষ্ঠীর মধ্যে। তখন আর লড়াই লাগে না। অলিখিত অরণ্য আইন মেনে চলে। পাত্র-পাত্রী নিজেরাই খুঁজে পেতে নিয়ে ফিরে আসে নিজের নিজের এলাকায়।

আরণ্যক এক বনমানুষ কিন্তু একদিন এই প্রথা মানেনি। কোরুবাদের একটি মেয়েকে নিয়ে গেছিল একসঙ্গে থাকবে বলে। কোরুবা মেয়েটিরও আপত্তি ছিল না।

কিন্তু রেগে কাঁই হয়ে গেছিল মেয়েটির বাবা। কুরারির ভয়ে সেই দৈত্যাকার বনমানুষ তখনকার মতো বউ ছেড়ে পিঠটান দিয়েছিল বটে, কিন্তু তক্কে তক্কে ছিল বনে বাদাড়ে।

একদিন কোরুবা তনয়াকে তুলে নিয়ে চম্পট দিল তল্লাট ছেড়ে। বনের আনাচে কানাচেও আর তাকে দেখা যায়নি। কোরুবা মেয়েটিকেও ফিরে আসতে দেয়নি।

কিন্তু গেল কোথায় দু'জনে? বন তোলপাড় করে ফেলেছিল লড়াকু কোরুবারা। মেয়েটির বাবা ছিল সেই গোষ্ঠীর নেতা। তার লক্ষ্যভেদী কুরারি তিরের ভয়ে দানবাকৃতি বনমানুষরাও চম্পট দিয়েছিল বন ছেড়ে...অন্য কোথাও...অন্য কোনও খানে...।

তারপর একদিন মেয়েটির কান্না ভেসে এসেছিল বড় বড় গাছেদের মগডালের ওপর দিয়ে...অনেক দূর থেকে...

জঙ্গলের এই আদি মানুষদের শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর। বাদুড়ের কানের মতো শুনতে পায় বাতাসের কাঁপনও। শব্দের গতি অনুসরণ করে ধেয়ে গেছিল উৎস অভিমুখে...

পৌঁছেছিল প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরের সেই পাহাড়ি প্রপাতের কাছে। যেখানে অনেক উঁচু গহ্বর থেকে তোড়ে জল বেরিয়ে ঠিকরে পড়ছে নীচে...ফেনা বানিয়ে ধেয়ে চলেছে নদীর আকার নিয়ে, বড় বড় বোল্ডারের ওপর দিয়ে...

কোরুবাদের দল শব্দ লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে দেখে ছিল, অনেক উঁচুতে...যেখান থেকে জল তোড়ে বেরিয়ে আসছে পাহাড় ফাটিয়ে...সেই গর্তমুখে চিল চিৎকার করে যাচ্ছে মেয়েটি...আর তার হাত ধরে টানছে বিরাটকায় সেই বাঁদর মানুষ...দাঁত মুখ খিঁচিয়ে।

নীচ থেকে কুরারি তির ছুড়েছিল মেয়েটির বাবা...তিরবিদ্ধ হয়ে শ্বাসকষ্টের বিষম যন্ত্রণায় মেয়েটার হাত ছেড়ে দিতেই মেয়েটি লাফিয়ে পড়েছিল অত উঁচু থেকে সটান নিচের প্রস্তরময় নদীতে....

খুলি গুঁড়িয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু দুশমন বাঁদর মানুষকে টেনে নামাতে পারেনি কেউই। অত উঁচুতে পাহাড় বেয়ে ওঠার

প্রক্রিয়া জানা ছিল না কোরুবাদের। কী করে তেলতেলে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার উৎস গহ্বরে পৌঁছেছিল বাঁদর মানুষ সে-রহস্যও ভেদ করা যায়নি।

নদীর দু'পাশে বসে নজর রাখা হয়েছিল মাসের পর মাস। বাঁদর মানুষ আর উঁকি মারেনি নির্ঘাত অক্কা পেয়েছে কুরারির বিষে।

চলে এসেছিল কোরুবারা।

কিন্তু সেই বাঁদর মানুষ মড়া হয়ে আজও আছে পাহাড়ের উঁচু গুহায়। আজও সেখান থেকে সংকেত পাঠিয়ে মেয়েটাকে ডাকে।

এ সংকেত আসে প্রজাপতিদের একই ছন্দে পাখনা নাড়ার মধ্যে দিয়ে। এ-অঞ্চলের সমস্ত প্রজাপতি...রংবেরঙের প্রজাপতি... একই সঙ্গে পাখনা নাড়ায়। একই সঙ্গে পাখনা তোলে....।

যেন ভূতাশ্রয়ী প্রজাপতি। দানব বনমানুষের আত্মা যেন আজও আশ্রয় করে রয়েছে প্রজাপতিদের। পাখনা নেড়ে ডেকে যায় মেয়েটিকে....

প্রজাপতিকে এরা বলে ফুল— এ কোরুবা-রা বলে, ফুল পাঠিয়ে আজও বাঁদর মানুষের মড়া ডেকে যাচ্ছে বনের মানবীকে...

মায়া মেয়েটার চোখ মুখের ভাবই পালটে গেছিল প্রজাপতি ফুলদের কাহিনি বলবার সময়ে। সে এই মহাবনের নখী দন্তীদের ভয় পায় না। কিন্তু সুন্দর ফুলের মতো প্রজাপতিদের দেখলেই দূর থেকে সরে পড়ে। ওরা তো প্রজাপতি নয়— রংবেরঙের ফুলের মতো আকৃতি, প্রপাত-চুড়োর সেই মড়া—ছিল একা মরে গিয়ে লাখো উড়ন্ত ফুল হয়ে গিয়ে হন্যে হয়ে খুঁজছে...খুঁজছে...খুঁজছে...।

কাহিনি সমাপ্ত হওয়ার পর আহারে মন দিয়েছিলাম। কিন্তু হুঁশিয়ার হয়ে। কেননা, কোরুবারা সব খায়। সাপের মাংসের কাটলেট বানায় ভাল। আমি তাই বেছে বেছে সবজি টবজি দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিলাম। আমার মতো ভোজনবিলাসীর অকস্মাৎ আহার নিয়ন্ত্রণ দেখে বিলক্ষণ কৌতুক অনুভব করেছিলেন প্রফেসর।

তারপর এক ফাঁকে মস্ত দায়িত্বটা চাপিয়ে দিলেন আমার কাঁধে। খুবই দুরূহ ডিউটি। কিন্তু আমি লম্ফ দিয়ে রাজি হয়ে গেলাম। কারণ, আমি ভেড়ুয়া বাঙালি নই। যেখানে মৃত্যুর ডঙ্কা, আছে শঙ্কা, সেখানেই তো থাকে দীননাথ নাথ।

সিডনি পসুলো ব্রেজিল গভর্নমেন্টের পদস্থ কর্মচারী বলেই সাহায্য করেছিল বিস্তর। শহরে ফিরে গিয়ে এনে দিয়েছিল পাহাড়ে চড়ার সরঞ্জাম। আমার আজব কাহিনির পাঠক এবং পাঠিকা যারা, তারা জানে, পর্বতারোহণ বিদ্যায় আমি বিষম পটু। ডাকাবুকো যে ছেলেবেলা থেকেই...

সিডনি পসুলো যখন সরঞ্জাম আনতে গেছিল শহরে, আমি তখন অভিযানে বেরিয়ে যেতাম। একা যেতে দিত না আমাকে মায়া, বোধহয় মায়া পড়েছিল সন্তানতুল্য এই মানুষটার ওপর। আকৃতিতে আমি তো প্রায় ওর দলের ছেলেদের মতোই। দলে টেনে নেওয়ার ফিকিরে ছিল কিনা কে জানে। কিন্তু আমি তো ও-পাঠশালায় পড়িনি। শূর্পনখাদের এড়িয়ে চলতাম।

একজন কুরারি তিরন্দাজ ছায়ার মতো লেগে থাকত আমার সঙ্গে। কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কী দেখতে হবে— সে-সবের তালিম আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর।

তাই আমি শুধু উড়ন্ত ফুলদের অনুসরণ করতাম। ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে উড়ে বেড়াত বনে বাদাড়ে, বসে থাকত বড় বড় বোল্ডারে, গাছের ডালে, ফুলের ওপর। আমি দেখতাম আর চমকিত হতাম ওদের প্রত্যেকের হালকা রঙিন পাখনাগুলো কে যেন অদৃশ্য সুতো দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে। কাছে-দূরের রংবেরঙের সমস্ত প্রজাপতি একই সঙ্গে পাখনা নামাচ্ছে, একই সঙ্গে পাখনা তুলছে, একই ছন্দে পাখনা ঝটপট করছে। আমি দীননাথ নাথ ভয়কাতুরে নই, তবুও বলতে দ্বিধা নেই, গা শিরশির করত ওদের এহেন সংঘবদ্ধতা দেখে, যা আমাকে মুহূর্তে মুহূর্তে মনে করিয়ে দিত, এই বিপুল বিশ্বের অগুনতি প্রহেলিকা এই প্রজাপতিরা যেন কারও হুকুমের দাস...যে এদের চালাচ্ছে অদৃশ্য নিয়মের নিগড়ে বেঁধে, সে বসে আছে প্রপাত শীর্ষের অজানা এক পর্বত গহ্বরে....মড়া হয়ে....

অথবা, মরেও যে মরেনি....

বোর্নিওতে জোম্বি দেখে এসেছিলাম....জ্যান্ত মড়া....অথবা, দানো....

ব্রেজিলের এই মড়া তাদের টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে। জোম্বিদের মড়া-চোখ দেখলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে— আর, ব্রেজিল-অরণ্যের এই মড়ার প্রজাপতি বাহিনী দেখেই আমার রক্ত জমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত কোরুবারা প্রজাপতি দেখলে কেন আঁতকে ওঠে, তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম।

তা সত্ত্বেও, আমি আমার কাজ করে গেছিলাম। কাতারে কাতারে প্রজাপতিরা রামধনু রোশনাই বিতরণ করে কোন দিক থেকে উড়ে আসছে, দিনের পর দিন অকথ্য পরিশ্রম করে, তা আবিষ্কার করেছিলাম। ওদের উৎস-ভূমির সন্ধান পেয়েছিলাম।

ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা আসছে পঞ্চাশ মাইল দূরের সেই ভুতুড়ে প্রপাতের দিক থেকে। প্রপাত-শীর্ষের ভৌতিক গহ্বরে হাত দশেক ঢ্যাঙা বানর-মানুষের মড়া নাকি আজও জ্যান্ত মড়া হয়ে প্রজাপতি বার্তা পাঠিয়ে যাচ্ছে। কাতারে কাতারে প্রজাপতি....রংবেরঙের প্রজাপতি....জলুস আর চেকনাইয়ে অদ্বিতীয় প্রজাপতি অনেক উঁচু ওই কন্দরের অভ্যন্তর থেকেই বেরিয়ে আসে পিলপিল করে....

মড়ার হুকুমে।

আমার সংকল্প ছিল, এই মড়াকেই দেখতে যাব— যদি সে দৃশ্যমান থাকে....

প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব কিনা, সে সংশয়কে মনে ঠাঁই দিইনি। আমি যে দীননাথ নাথ— প্রফেসর নাটবল্টু চক্রর এক এবং অদ্বিতীয় চেলা....

পাহাড়ে ওঠার সরঞ্জাম এসে যেতেই সব গুছিয়ে নিয়ে একদিন আমি চম্পট দিয়েছিলাম। কোথায় যাচ্ছি, তা জানতেন শুধু প্রফেসর। মায়াকে বলেননি। বললে, আমাকে আটকে দিত।

মায়া, শিশু— এই নামগুলো কি অধুনালুপ্ত মায়া সভ্যতায় চালু ছিল? এই আদিম অধিবাসীরা কি রহস্যময় সেই সভ্যতার রেশ বহন করছে?

উলটা পালটা ভাবছি। এই নিয়ে পরে গবেষণা করা যাবে, আর একটা অভিযানে বেরোনো যাবে— প্রফেসরের ল্যাজে নিজেকে বেঁধে নিয়ে....

প্রপাতের তলায় পৌঁছে প্রথমটা ঘাবড়ে গেছিলাম। অনেক উঁচু থেকে কানের পরদা ফাটানো হুড়হুড় করে জল আছড়ে পড়ছে নিচে....পড়ছে তো পড়ছেই....অত উঁচুতে পাহাড়

ভেদ করে জল উঠে যাচ্ছে নিশ্চয় ভূ-চাপে— অযোধ্যা পাহাড়ে সীতাকুণ্ড যেমন বিরামবিহীন ভাবে জল নিঃসরণ করে চলেছে, এখানেও চলছে অবশ্যই সেইজাতীয় প্রাকৃতিক খেলা....সে খেলার রহস্যভেদ করবেন ভূ-বিজ্ঞানীরা....

কিন্তু আমি অত উঁচুতে উঠব কী করে, সে পরিকল্পনা মাথার মধ্যে ছকে রেখেছিলাম। তাই আর সময় নষ্ট না-করে একটার পর একটা হুক মেরেছি, আর একটু একটু করে উঠেছি....

ঝুলতে ঝুলতে উঠতে উঠতে অনেক উঁচুতে হঠাৎ পাথরের গায়ে ঢোকানো বৃষ্টি বাদলায় ক্ষয়ে চুন হয়ে আসা একটা গজাল দেখেছিলাম।

গজাল। এই নির্বান্ধব পুরীতে খাড়াই পাহাড়ে গজাল ঠুকে ঠুকে কেউ তা হলে উঠেছিল ওপরে।

থ হয়ে গেছিলাম। ঝুলন্ত অবস্থায় হাত দিয়ে গজালের বেরিয়ে থাকা মাথা ধরে টানতে গিয়ে ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়েছিল...

গজালটা কোন ধাতু দিয়ে নির্মিত, তা জানবার আর সুযোগ পাইনি, কিন্তু অতীতের একটা দৃশ্য যেন নিমেষ ঝলকে ভেসে উঠেছিল মনের পরদায়....

গজাল ধরে পাহাড়ে চড়ছে হাত দশেক লম্বা বাঁদর মানুষ...পিঠে কোরুবা মেয়েটা.:.

একটা রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছিল। প্রপাত শীর্ষের রন্ধ্রে উড়ে গিয়ে সেঁধিয়ে যায়নি সুদুর অতীতের সেই বাঁদর মানুষ, এই গজাল বেয়ে উঠেছিল.... তারপর যে-কোনও কারণেই হোক গজাল খসে যাওয়ায় নীচে আর নামতে পারেনি....রন্ধ্রমুখে দাঁড়িয়ে বিক্রম দেখিয়েছে....মেয়েটা হাহাকার করে ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে প্রাণ দিয়েছে....

বাঁদর মানুষ আর নামেনি....

কিন্তু এই জাল....ধাতুর জাল....প্রস্তর যুগে এল কী করে? ভিনগ্রহী কোনও ফ্লাইং সসার থেকে কি?

সে গবেষণা পরে হবে'খন। আমি আমার প্রাণটাকে ধড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে প্রপাত চুড়োর রন্ধ্র মুখে পৌঁছেছিলাম। অন্ধকার বিবরে টর্চের আলোয় রাশি রাশি প্রজাপতিদের জন্মের দৃশ্য, তার আগের গুটি অবস্থা দেখেছিলাম...

সবশেষে দেখেছিলাম, সুগভীর বিবরের একদম শেষে মস্ত পাথরের বেদির ওপর সটান বসে রয়েছে একটা হাত দশেক ঢ্যাঙা মহাকায় মড়া....

একটা ম্যমি।

কেননা, তার শরীরের কোথাও কোনও পচন ধরেনি....এতটুকু মাংস খসে পড়েনি....জ্বলন্ত চক্ষুযুগল যেন নির্নিমেষে দেখে যাচ্ছিল আমাকে....জ্বলে জ্বলে উঠছিল টর্চের আলোয়।

গাছ, পাতা, ডাল, ঘাস দিয়ে তৈরি বিশাল কোরুবা ছাউনিতে বসে প্রফেসর সহসা দেখেছিলেন, আশপাশের, কাছের আর দুরের সমস্ত প্রজাপতি নিয়ম ভঙ্গ করেছে আচমকা।

তিনি তাকিয়েছিলেন প্রজাপতিদের পাখনা নাড়ার ঢঙ সমুদ্রের দিকেই। অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা প্রতিটি পাখনার উত্থান পতন ঘটছিল একই ছন্দে মিলিটারি কুচকাওয়াজের নিয়মে একঘেয়ে....যেন, একই অদৃশ্য নিগড়ে বাঁধা।

সহসা যুগ যুগের এই নিয়ম বিঘ্নিত হয়েছে। এখন পাখনা নামছে আর উঠছে অনিয়মিত

ছন্দে....নিয়মের নিগড় থেকে যেন মুক্তি পেয়েছে প্রজাপতি বাহিনী....

এখন সমস্ত প্রজাপতির পাখনা একই সঙ্গে নামছে বটে, তবে একটু থেমে একই সঙ্গে উঠছে....নামা ওঠার মধ্যে বাঁধাধরা সময় আর নেই....

মায়ার মতো বেপরোয়া মেয়েও যখন গলগল করে ঘেমে গেছিল এই দৃশ্য দেখে, প্রফেসর তখন বেজায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রেজিলিয়ান অফিসার সিডনি পসুলোকে বলেছিলেন দুই শব্দের পুঁচকে একটি বাক্য 'মর্স কোড।'

'সংকেত!' চক্ষুযুগল বিস্ফারিত হয়েছিল সিডনি পসুলোর।

'আজ্ঞে,' বিনয় বিগলিত স্বরে প্রফেসর বলেছিলেন, 'প্রজাপতিরা নিয়ম ভেঙেছে। পাখনা-সংকেত খবর পাঠাচ্ছে।'

'মড়া পাঠাচ্ছে?' ঢোক গিলেছিল সিডনি পসুলো। পরে শুনেছিলাম, তার নাকি বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। ম্যমি যদি সংকেত পাঠাতে আরম্ভ করে মর্স পদ্ধতিতে, তা হলে এই অরণ্য অঞ্চল ত্যাগ করে অবিলম্বে চম্পট দেওয়া সমীচীন।

কিন্তু প্রফেসর তা হতে দেননি। সিডনি পসুলোর ব্যাগ থেকে প্যাড আর ডটপেন বের করে ঝাঁ-ঝাঁ করে লিখে গেছিলেন, মর্স সংকেতের অর্থ.... ডট আর ড্যাশের অর্থ।

লেখাটা দাঁড়িয়েছিল এই :

আমি দীননাথ। পাহাড় বেয়ে উঠেছি। গহ্বরে রাশি রাশি প্রজাপতি জন্মাচ্ছে। উড়ে উড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। তল্লাট ছেয়ে ফেলছে। এরাই এতদিন ধরে একইভাবে পাখনা নাড়িয়ে এসেছে। ম্যমি বেটাচ্ছেলে পাখনা ধরে নাড়াচ্ছে না। ও বেটা আমার সামনেই বসে আছে। কাঠ মড়া। সত্যিই হাত দশেক লম্বা। মাথায় আর গায়ে লম্বা লম্বা চুল অথবা লোম। মাথা বিরাট। বানরই বটে। পিথিকানথ্রপাস। এল কী করে এই জঙ্গলে? হাজার হাজার বছর ধরে ম্যমি হয়ে রইল কী করে? অন্য গ্রহের আগন্তুকদের কারসাজি নয় তো?

আমি মাথা খাটিয়ে সংকেত পাঠানোর পথ বের করেছি। একটা প্রজাপতির পাখনা ধরে নেড়েছিলাম। অমনি গুহার ভেতরকার সমস্ত প্রজাপতি ওইভাবে পাখনা নেড়ে গেল। আশ্চর্য! কী করে নাড়ছে? ম্যমির কারসাজি নাকি? মরুক গে। ম্যমি থাকুক ম্যমির জায়গায় আমি তো মর্স কোড শিখেছি। সংকেত পাঠাচ্ছি ডানা নেড়ে। এই তো ধরে ফেলেছেন। আপনিও একটা প্রজাপতি ধরে ফেলেছেন। আপনিও একটা প্রজাপতি ধরে ডানা নেড়ে সংকেত পাঠাচ্ছেন। তল্লাটের সমস্ত প্রজাপতি একই ভাবে ডানা নেড়ে চলেছে। গুহার মধ্যেও। এটা কী করে হচ্ছে?

কী বলছেন? রেডিয়ামের জন্যে? রেডিয়াম বিকিরণের ফলে? মিউটেশন ঘটেছে প্রজাপতিদের মধ্যে? মড়া হয়েছে ম্যমি? গুহার মধ্যে, পাতালে রেডিয়ামের খনি আছে? ওরে বাবা! তা হলে আমি গজাল বেয়ে এখুনি নেমে যাচ্ছি। ম্যমিটার চাহনি এখন কটমটে মনে হচ্ছে। সেই মেয়েটা নিশ্চয় প্রেতিনী হয়ে আছে। গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে, এই ভুতুড়ে গহ্বরে ভিনগ্রহীদেরও আনাগোনা আছে। আমি পালাচ্ছি। কী বললেন? মায়া আমাকে জামাই করতে চাইছে? কী সর্বনাশ! বাঁচান, আমাকে বাঁচান!

পাইন বনের প্রহেলিকা

চাণক্য চাকলাদার যে একটা পয়মাল, তা কারও অজানা নয়, বিশেষ করে তার কাহিনিগুলো যাদের পড়া আছে। সে যখনই উটের মতো ঠ্যাঙ ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকে দাঁতের ফাঁকে এক বিঘত লম্বা চুরুট কামড়ে ধরে, তখনই তার তালঢ্যাঙা বপুটা থেকে যেন আজগুবি গল্পের জ্যোতি ছিটকে ছিটকে বেরোতে থাকে। তার ভূতভুতুড়ে উদ্ভট গল্পগুলো নাকি সব সত্যি, অন্তত বলবার ধরন থেকে তাই মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চায় না কিছুতেই।

এহেন চাণক্য একদিন শরীরখানা দুলিয়ে দুলিয়ে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের সামনে হাজির হয়ে দু'পায়ে ব্রেক কষে বললে 'স্যার, একটা তাজ্জব ব্যাপার আছে। অনুমতি দেন তো বলে ফেলি।'

চাণক্যর গুলপট্টির মধ্যে গল্পের রস এমনই টসটসে যে না-শুনেও পারা যায় না। হোক না আজগুবি, মজা তো পাওয়া যায়। প্রফেসর নিজেও তো অনেক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানার নায়ক, সুতরাং মুখে টিটকিরি দিলেও চাণক্যকে তিনি স্নেহ করেন, তার বাকতাল্লা কান খাড়া করে শোনেন।

সেদিন চক্ষুনৃত্য দেখিয়ে বললেন 'নতুন গাঁজার দম নাকি?'

চাণক্য বললে, 'আগে শুনুন, তারপর কমেন্ট করবেন।'

সুতরাং গুরুদেব নাটবল্টু চক্র কর্ণ প্রশস্ত করে শ্রবণ করলেন একেবারে অবিশ্বাস্য রহস্যময়ী অদৃশ্য অস্তিত্বের সেই পিলে চমকানো কাণ্ড কারখানা।

এই ভারতবর্ষের মাথার দিকে হিমালয় পর্বতমালা গ্যাঁট হয়ে বসে থেকে পাহারা দিয়ে চলেছে সাগর থেকে অনেক রহস্য নিয়ে ঠেলে ওঠবার পর থেকে। জ্ঞানী যারা, তারা সে সব তত্ত্ব জানে। আমি মুখ্যু মানুষ। আমি বুঝি শুধু অ্যাডভেঞ্চার। মনপ্রাণ দিয়ে জানি হিমালয়ের ভয়ংকররা আজও আছে। হিমালয় আজও পুরোপুরি আবিষ্কৃত হয়নি। হিমালয়ের নাড়িনক্ষত্র আজও সবার জানা হয়ে ওঠেনি।

ভারত সরকার থেকে তাই একটা গোপন অভিযানে নাকি পাঠানো হয়েছিল চাণক্য চাকলাদারকে। ব্যাপারটা এতই সিক্রেট, সামরিক দিক দিয়ে, যে চাণক্য মূল কারণটায় বিশদ হতে চাইলে না কিছুতেই। সে নাকি প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে গেছে, সুতরাং সামরিক ব্যাপার

ট্যাপারগুলোয় সে মুখে চাবি দিয়ে থাকবে— আমরা যেন তাকে খোঁচাখুঁচি না- করি।

আমাদের বয়ে গেছে। আমরা শুধু শুনতে চেয়েছিলাম তার রসালো অ্যাডভেঞ্চারের গুলপট্টি কাহিনি। কিন্তু সে রস যে এমন আজব রস তা কে জানত। হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ একটা অঞ্চলে আছে একটা বিরাট পাইন জঙ্গল। অজানা কারণে গরমের সময়ে সেখানে দাবানল লাগে, যদিও জায়গাটায় শীতের প্রতাপ বারোমাস। সমতলে যখন গরমে প্রাণ আইটাই করে, হিমালয় তখন মনোরম জায়গা। তা সত্ত্বেও দাবানল লকলক করে উঠেছিল পাইন বনে। আর্মির ল্যান্ডিং ফোর্স বিগ্রেড গিয়ে আগুন নেভানোর অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অগ্নি মহাশয় ক্রমশ ছড়িয়ে যেতে থাকে হাওয়ার দিকে। বিরামহীন অগ্রগতি মাঝে মধ্যে আটকে গেছে যেখানে যেখানে নদী বা হিমবাহ আছে। আশ্চর্য সেই আগুনের প্রতাপে চম্পট দিয়েছে সকলে যাদের ডানা আছে, আর যাদের পা আছে। থেকে গেছে শুধু গাছ আর ঘাস— জঙ্গল আর তৃণভূমি— যাদের পলায়নের পথ নেই। তারা নিঃশব্দে পুড়েছে।

বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ জঙ্গলকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। ক্ষিপ্তের মতো বুলডোজার বাহিনী ধেয়ে গেছে। ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেছে। অবশেষে চাণক্য চাকলাদারের ডাক পড়েছে।

চাণক্য নাকি চিরকাল অসম্ভবকে সম্ভব করে এনেছে (চাণক্যর বারফট্টাই অনুসারে), তাই আর্মির ল্যান্ডিং ফোর্স যে গ্রামে থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই গ্রাম থেকে সে তার অসম্ভরের অভিযান শুরু করেছিল অগ্নিকাণ্ডের উৎস সন্ধানে; আসল মতলব ছিল নাকি গ্রামে গ্রামে জঙ্গলে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা প্রত্নতত্ত্ব আর জঙ্গলে বিস্ময়ের সন্ধান করা। মিলিটারির কাছে আসল কথাটা ভাঙেনি। অজানার অভিযানে যাওয়ার সুযোগ যখন পেয়েছে, তখন আর তাকে আটকায় কে!

হপ্তাহ পর হপ্তা তাই পুড়ে পুড়ে দগ্ধে দগ্ধে শেষ হয়ে আসা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে নিদারুণ হলকাকে গ্রাহ্য না-করে। জঙ্গল তো বিরাট। শেষ নেই, পোড়া গুঁড়ির পর গুঁড়ি। ফুটন্ত নদী। মরা জানোয়ারের পোড়া মড়া। ওর মতো অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষও নাকি দমে গিয়েছিল অরণ্যের গহণ শব্দহীন হাহাকারে।

বেশ কিছুদিন পরে এসে পৌঁছেছিল পরিত্যক্ত একটা মঠে। বৌদ্ধ লামাদের মঠ। এক সময়ে নাকি গুপ্তশক্তির আরাধনা চলত এই মঠে। এইরকম একটা কানাঘুষো শুনেই এ-তল্লাটে পা চালানোর জন্যে মিলিটারি ডাকে সাড়া দিয়েছিল চাণক্য। এখন দেখলে এইখানেই দিনকয়েক তল্লাশি চালানো যাক— যদি পাওয়া যায় প্রাচীন গুপ্তজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ।

কিন্তু ওর কপাল মন্দ। আগুন খানিকটা সরে গিয়েও ফের তেড়ে এসেছিল ওর দিকেই। তল্পিতল্পা তো সামান্যই। যদি কাজে লাগে, তাই একটা কুড়ুল, প্ল্যাস্টিক মোড়া এক বাক্স দেশলাই, আর অতি অবশ্যই এক বাক্স চুরুট। সেই সঙ্গে চামড়ার ফিতে দিয়ে কবজিতে বাঁধা একটা কম্পাস।

সকালটা ছিল শান্তশিষ্ট, যার মানে দাবানল তখন তেড়েফুঁড়ে এগোবে না, বিশেষ করে

ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে, কাজেই ভয়ানক ভয়ের কোনও কারণ নেই, বিপদ এলে সামাল দেওয়া যাবে। স্যাৎসেঁতে একটা জায়গা দিয়ে ঝোপ ঠেলে এগুনোর সময়ে মনে হয়েছিল, দাবানল নতুন করে ফুঁসে উঠে তেড়ে আসছে...ওর দিকেই। এমনটা যে হতে পারে, তা ভাবেনি একটু আগেও। কিন্তু আগুনের আঁচ আর ঝোপঝাড়ের মধ্যেকার পটপট আওয়াজ তো বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। আগুন যে আর বেশিদূর নেই, তা বোঝা যাচ্ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেছিল চাণক্য। কানখাড়া করে শুনেছিল। যে-পথ বেয়ে এতদূর এসেছে, সেই পথ বেয়েই নেচে নেচে আসছে আগুন।

তা হলে তো এখুনি টেনে দৌড়োনো দরকার। ওর সামনে দিয়েই লম্ফ দিয়ে চম্পট দিল একটা এল্‌ফ্‌ হরিণ যার মাথার শিং ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়া অবস্থায়। ধোঁয়া বেরোচ্ছে গা থেকে। ছোট ছোট জানোয়ারদেরও দেখা যাচ্ছে আগুনের খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্যে দৌড়োচ্ছে চার পা তুলে। পরিত্রাহি চিৎকারে উড়ে যাচ্ছে পাখির দল। পায়ের তলায় মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে বাতাসে ভেঙে আসা ছোট ছোট ডালপালা।

হরিণের দল যে গলি ধরে দৌড়োচ্ছে, সেদিকে না-গিয়ে চাণক্য পা চালিয়েছিল ঢাল বেয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে। মনে মনে হিসেব করে নিয়েছিল, আগুন এদিকে আসবে না, ওপরে না-ধেয়ে নীচেই থমকে যাবে। হাওয়ার তেজ যে ওই দিকেই। ভিজে ঘাসে পা হড়কে গেছিল বারে বারে। হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড় চুড়োর উঠে দেখেছিল, আগুন পাশের পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেছে। অনেক কাছেই চলে এসেছে। নিজেকে বাঁচানোর সময় আর বেশি নেই— খুব জোর পনেরো মিনিট। ডালপালা মড়মড়িয়ে ভেঙে যাওয়ার আওয়াজের সঙ্গে আগুনের হুংকার ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

টেনে দৌড়েছিল চাণক্য। আরও জোরে। পরের পাহাড়টার তলার দিকে পৌঁছোনোর আগেই কানে ভেসে এসেছিল একটা গানের সুর।

কে যেন হেঁটে যাচ্ছে অজানা ভাষায় গান গাইতে গাইতে। ভাষাটা না-জানা থাকলেও সুর শুনে বোঝা যাচ্ছে শোক সংগীত। নিকটজন মারা গেলে এমন হাহাকার শোনা যায় গানের সুরে। মোচড় দিয়ে যায় বুকেব ভেতরে।

একজন তো নয়, গান ধরেছে তো অনেকজন। গলা দিয়ে গান যখন বেরোচ্ছে, বিপদও নিশ্চয় কেটে এসেছে। দাবানল কাছে রেখে এমন প্রশান্ত স্বরে কেউ গান গাইতে পারে না। চাণক্য খামোকা ভয় পেয়েছে।

টুকরো টুকরো শব্দগুলো স্পষ্ট শোনা গেলেও মানে বুঝতে পারেনি চাণক্য। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে বাতাসে চাবুক আছড়ানির সপাং সপাং শব্দ। প্রতিবার চাবুক আছড়ানির সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে চাপা গজরানি।

লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে একটু নেমে এসেছিল চাণক্য। তারপর যা দেখেছিল, তা চক্ষু ছানাবড়া করার পক্ষে যথেষ্ট।

সরু পথ বেয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে যাচ্ছে বেঁটেখাটো এক বুড়ো। এক হাতের চাবুক সপাং সপাং করে আছড়ে যাচ্ছে বাতাসে। পেছনে আসছে এক দল নেকড়ে। ল্যাজ গুটিয়ে গরগর করে যাচ্ছে প্রতিবার চাবুক আছড়ানির সঙ্গে সঙ্গে। বৃদ্ধ কিন্তু একমনে গেয়ে যাচ্ছে দুর্বোধ্য গান।

থ হয়ে পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে গেছিল চাণক্য।

তারপর হেঁকে বলেছিল খাঁটি বাংলায়, আচ্ছা গাড়ল তো! নেকড়ের দল যে পেছনে। ছিঁড়ে খাবে এখুনি। পালাও!

বুড়ো তাকিয়েছিল চাণক্যর দিকে নির্বিকারভাবে, ধীর গতি হন্টন না-থামিয়ে। নেকড়ের দলও চাণক্যর দিকে ফিরে না-তাকিয়ে সমানে মার্চ করে গেছিল বুড়োর পেছন পেছন।

গরম বাতাস বুঝিয়ে দিচ্ছে আগুন এসে গেছে কাছেই। চাণক্য দৌড়ে নেমে গেছিল নেকড়ের মিছিলের পেছন দিকে একটা গলির মধ্যে দিয়ে। আগুন তখন গাছেদের মাথায় পৌঁছে গেছে। যে স্পিডে এগোচ্ছে, টেনে দৌড়েও পাল্লা দেওয়া যাবে না। গরম হয়ে উঠছে ও যেখানে, সেই জায়গা। বেড়ে যাচ্ছে আগুনের গজরানি। নিরুপায় চাণক্য টেনে দৌড়েছিল গলিপথ দিয়ে। এই সময়ে কানে ভেসে এসেছিল একটা মিষ্টি মেয়েলি গলা। প্রশান্ত স্বরে হেঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছে 'ও পথে নয়, বোকারাম, এসো আমার পেছন পেছন!'

হেসে উঠেছিল এই পর্যন্ত বলেই। খুব চেঁচাচ্ছে না, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, প্রত্যেকটা কথা, বাংলা কথা, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এতই সুস্পষ্ট সেই কণ্ঠস্বর যেন চাণক্যর ঠিক পেছনেই থেকে কানে কানে কথা বলে যাচ্ছে! ফিসফিস করে! আধো আধো উচ্চারণে।

সেইদিকেই ঘাড় ফিরিয়ে একটা গলিপথ দেখেছিল চাণক্য, যেদিকে নেই অগ্নিনৃত্য। যেন একটা অদৃশ্য পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আগুন লেলিহ হয়ে রয়েছে দু'পাশে, কিন্তু মাঝের জায়গায় ঘাসের ওপর শিশির বিন্দু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বাতাস উল্লোল না-হওয়ায় মাকড়সার জাল পর্যন্ত দুলে দুলে উঠছে না।

চাণক্য বোঁ করে ঘুরে গিয়ে ধেয়ে গেছিল সেই পথে। সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিল শীতের হাওয়ার পরশ। পেছনে অগ্নিনৃত্য, সামনে সহসা দেখা দিয়েছিল তুষার ধবল একটা হাত...মেয়েলি হাত...হাত নেড়ে তাকে ডাকছে...সেই সঙ্গে কানে ভেসে আসছে সুরেলা মিষ্টি হাসির আওয়াজ।

ভয়ের চোটে বোধহয় ঘণ্টা কয়েক এই হাতছানি লক্ষ্য করেই দৌড়েছিল চাণক্য, এসে পৌঁছেছিল শক্ত লাল কাঠের সুগন্ধি সিডার গাছের তলায়। প্রকাণ্ড বৃক্ষ। পেছনে তাকিয়ে দেখেছিল, যতদূর দু'চোখ যায়, শুধু ধোঁয়া আর আগুন। গাছেদের ফাঁকে ফাঁকে যে জমি, আগুনের জিভ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে সে জমিও।

গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিল চাণক্য। ঘাম মুছছিল কপাল থেকে। মাথার ওপরকার ডালপালার মধ্যে খসখস আওয়াজ শোনা গেছিল। সেই সঙ্গে হাসির শব্দ।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল 'কে তুমি?' সঙ্গে সঙ্গে হাসির আওয়াজটা যেন পালটে গিয়ে কাঠবেড়ালিদের কিচিরমিচির আওয়াজ হয়ে গেছিল, তারপরেই শোনা গেছিল একটা পাখির ডাক। একই হাসির আওয়াজ যেন মুহূর্তে মুহূর্তে অন্য অন্য আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে। সিডার গাছটাও ওর চোখের সামনেই হয়ে গিয়েছিল অন্য রকম। ঝরে পড়েছিল ধূসর ধুলো। ডালপালার বয়স বেড়ে গেল নিমেষে নিমেষে, শুকিয়ে হয়ে গেল অন্যরকম— আশেপাশের অন্য অন্য গাছেদের মতন। অথচ আগুন নেই একদম। একটা ঈগল পেঁচার কর্কশ ডাক ভেসে এসেছিল মাথার ওপর থেকে। সেই সঙ্গে কোমল

কণ্ঠস্বর 'এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও, যেতে হবে অনেক দূর, জীবন কিন্তু খুব ছোট্ট। যাও নদীর দিকে।'

* * *

দিনের শেষে পুড়ে যাওয়া পাইন বনের একপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল চাণক্য। সরু নদীর পাশ বরাবর রয়েছে অরণ্যের সীমানা। অপরদিকে সবকিছুই সবুজ, তাজা আর প্রশান্ত।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে নদীর জল আকণ্ঠ পান করেছিল চাণক্য। তারপর স্নান করেছিল। ছাই-ভরতি জামাপ্যান্ট কেচে নিয়ে সবুজ জমিতে শুয়ে পড়ে চেয়েছিল ঝলসানো গাছপালার দিকে, দিগন্ত পর্যন্ত শুধু ঝলসানো অরণ্য।

অকেজো কম্পাস ছুড়ে ফেলে দিয়ে আন্দাজি হিসেবে উত্তর দিকে রওনা হয়েছিল। যদি কোনও গ্রাম পাওয়া যায়, এই আশায়। অনেক চেষ্টা করেছিল পায়ে চলা পথ যদি পাওয়া যায়। পায়নি। চারদিকে শুধু অজানা ঘাস, ঝোপ, গাছ শ্যাওলা। মাঝে মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জল ভরা গর্তে। পোকার কামড় আর খিদের জ্বালায় প্রাণ যায় যায় অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। তবুও এগিয়ে গেছে উত্তরদিকে ম্যাপে দেখা একটা নদীর কথা মাথার মধ্যে রেখে। খিদের জ্বালায় গাছের এটা-সেটা চিবিয়েছে। খিদে যায়নি। মাঝে মাঝে জিরেন নিয়েছে। তা সত্ত্বেও কাহিল হয়ে পড়েছে একটু একটু করে।

প্রথম রাত কেটেছে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে।

ছ'খানা দেশলাইয়ের কাঠি শেষ করে জ্বালিয়েছে একটু আগুন। বাকি ছিল আর দশটা কাঠি। শুয়েছিল আগুনের কাছ ঘেঁষে। তাতে মুখ ঝলসেছে, পিঠ কনকনে ঠান্ডা থেকেছে।

ঘুম নেমেছে চোখে, কিন্তু সে ঘুম অনেক দুঃস্বপ্নময় ঘুম। তারপর এক সময়ে আগুন নিভে আসতেই চটকা ভেঙেছে।

কানে ভেসে এসেছে মানব কণ্ঠ।

* * *

মেয়েলি গলা।

আগুন নিভিয়ে উঠে পড়েছিল চাণক্য। যেদিকে আওয়াজটা শোনা গেছিল, চটপট পা চালিয়ে গেছিল সেদিকে, ঝোপঝাড় ঠেঙিয়ে।

কিন্তু গাছপালার খসখস শব্দ আর পোকামাকড়ের আওয়াজ ছাড়া আর সেই বালিকা কণ্ঠ কানে ভেসে আসেনি।

হেদিয়ে পড়েছিল চাণক্য। আবার কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালবে ভাবছে যখন, ঠিক তখনই ফের শুনেছিল বালিকা কণ্ঠে সেই ডাক-'চা-ণ-ক্য।'

মুখের দু'পাশে হাত জড়ো করে চাণক্য ডেকে বলেছিল 'কোথায় তুমি?'

'এই তো আমি।' পরিষ্কার বাংলায় জবাবটা ভেসে এসেছিল পেছন থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখতে পায়নি চাণক্য, কানে ভেসে এসেছিল শুধু মিষ্টি হাসি-ঝরনার মতো, যেন মুখে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসছে মেয়েটা।

'এত হাসি কেন?' চড়া গলায় বলেছিল চাণক্য অন্ধকারকে উদ্দেশ করে 'কে তুমি? আগুন থেকে তুমিই কি আমাকে বাঁচিয়ে ছিলে? কিন্তু লুকিয়ে আছ কেন?'

'এই তো আমি!' আবার সেই দমকা হাসি' 'এসো, এসো, এদিকে এসো।' কণ্ঠস্বর শেষের দিকে মিলিয়ে গিয়ে যেন ফিসফিসানি হয়ে গেল।

'এত হাসি কীসের? এত লুকোচুরি কীসের? হাসলে যত খুশি হাসো। আমি আর যাচ্ছি না। এই বসলাম এখানে।'

একদম কানের কাছে শোনা গেল বালিকা কণ্ঠ 'এইখানেই বসলে কেন?' ফিসফিস করে বলা হলো কথাগুলো। ঘাড়ের ওপর নিশ্বাসের ঝাপটাও টের পেল চাণক্য। সে নিশ্বাস যে কোনও কারণেই হোক কনকনে ঠান্ডা। যেন নদীর দিক থেকে ভেসে এল একঝলক ঠান্ডা হাওয়া।

মাথাখানা ঘুরিয়ে শুধু হাত বাড়িয়ে সেইদিকে একটু ঠেলা মেরেছিল চাণক্য। আঙুল ছুঁয়ে গেছিল খুব নরম আর খুব ঠান্ডা কিছু একটার ওপর দিয়ে।

খিলখিলিয়ে হেসে বলেছিল মেয়েটা 'এসো না এদিকে এসো, তোমার জন্যেই তো আমি এসেছি।'

আকাশে চাঁদ নেই, চারদিকে স্যাঁৎসেঁতে ভাব, অদূরে নদীর ছলছলানি— এরই মাঝে অদৃশ্য মেয়েটা চাণক্যকে মনে করিয়ে দিয়েছিল এক আশ্চর্য সত্তার— যা সে শুনেছে, বইটইয়ে পড়েছে— কিন্তু ভয় পায়নি একদম। ঘাড় ফিরিয়েছিল আস্তে আস্তে। মনে হয়েছিল এক ডেলা কুয়াশা চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসের মধ্যে। 'পালাচ্ছ কেন? এসো, আলাপ করো, ভয় কী?' একহাতে কুঠার বাগিয়ে ধরে বলে গেছিল চাণক্য।

আচমকা কে যেন ওর বুকে এক ধাক্কা মেরে চিতপটাং করে দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। কুঠার হাত থেকে ফসকে ছিটকে গেলেও কাছছাড়া হল না কোমরের বেল্টে বাঁধা থাকার ফলে।

'চাণক্য! চাণক্য!' নরম হাতের ছোঁয়া লেগেছিল চাণক্যর গালে আর কপালে। সে হাত কনকনে ঠান্ডা।

রেগে গেছিল চাণক্য। কেন এই লুকোচুরি? বনের মধ্যে নাকি মশকরা? দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু নদীর পাড় আর নদীর জল ছাড়া কিছু দেখতে পায়নি।

তাই ঠিক করেছিল, নদীর পাড় থেকে সরে এসে আগুন জ্বালানো যাক। কাঠকুটো জড়ো করছিল সেইজন্য। অদৃশ্য মেয়েটা নানান দিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল ওর শরীরের নানান জায়গা। অন্ধকারের জন্যেই কি মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না? কিন্তু তা তো নয়। ঠিক যেন একটা বিরক্তিকর মাছি জ্বালিয়ে যাচ্ছে শরীরের এখানে সেখানে ছোঁয়া লাগিয়ে।

আগুন জ্বলল। একটু তফাতে বসে যখন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে চাণক্য, হু-উ-উ- স করে নিভে গেল আগুন আচমকা। এক বোঝা ভিজে ঘাস এসে পড়েছে আগুনের ওপর। লাফিয়ে

সরে যেতেই কানে ভেসে এসেছিল খিলখিল হাসি। একবার মনে হয়েছিল, মেয়েটা রয়েছে ডানদিকে। ফিরেছিল সেইদিকে। সঙ্গে সঙ্গে হাসির আওয়াজ চলে এসেছিল বাঁদিকে। তার পরেই পেছন দিকে। এমনকী মাথার ওপরেও। নেই কোনও পায়ের আওয়াজ অথবা পাতা মাড়ানোর খড়খড় আওয়াজ, শুধু হাসি। এদিকে সেদিকে। মাথার ওপরে। পেছন দিকে। মিষ্টি হাসির জলতরঙ্গ।

আচমকা দুটো কচি হাত পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল চাণক্যর গলা। নরম হাত। কিন্তু অসম্ভব শক্তিময়। প্রায় দমবন্ধ হয়ে এসেছিল চাণক্যর। কনুইয়ের গুঁতো মেরেছিল পেছন দিকে। খুব নরম কিছুতেই কনুই ঠেকেছিল। গলা থেকে হাত সরে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল চাণক্য। কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি। কনকনে একটা হাত নাক মলে দিয়েছিল চাণক্যর। অথচ কেউ নেই সামনে। 'অদৃশ্য তুষার খুকি নাকি?' বলেই কোমর থেকে ছুরি বের করেছিল চাণক্য। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। নানান দিক থেকে অদৃশ্য হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে তাকে। একবার তো নাকের ডগায় নিশ্বাস ফেলেও গেল ফোঁস করে।

সেই নিশ্বাসে তরল নাইট্রোজেনের গন্ধ পেয়েছিল চাণক্য। ঠিক এই সময়ে মেয়েটা তাকে জাপটে ধরেছিল পেছন দিক থেকে। কনকনে ঠান্ডা শরীর। কিন্তু পেছনে হাত বাড়িয়ে হাতের মুঠোয় কিছুই ধরতে পারেনি চাণক্য। মুঠোর মধ্যে থেকে যেন ফুসফুস করে বেরিয়ে গেছিল ঘনীভূত কিছু একটা। খুব ঠান্ডা সেই বস্তুটা। নাকে ভেসে এসেছিল আঁশটে গন্ধ— যেরকম গন্ধ মাছের গায়ে থাকে। কনকনে ঠান্ডা জলে ভিজে গেছিল পিঠের দিক।

সেই সঙ্গে একটা ব্যাপার টের পেয়েছিল। নিজের পিঠের দিক কনকনে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু যে তাকে জাপটে ধরেছে পেছন থেকে, তার গা উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হচ্ছে একটু একটু করে।

ফিসফিস করে কানের কাছে বলেছিল আধো আধো আদুরে গলা, 'আমাকে গরম করে দাও, তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'কে তুমি?'

ঠিক এই সময়ে নদীর অপর পাড়ে শিঙে ফোঁকার আওয়াজ শোনা গেছিল। মেয়েটা ওর সামনে চলে এল পেছন থেকে।

তখনই চাণক্য দেখল তার মূর্তি। ঠিক যেন কুয়াশায় গড়া। কিন্তু আশ্চর্য ফুটফুটে। যেন অন্ধকারের মধ্যে এক ডেলা ফসফরাস। তুষার ধবল কিন্তু জ্যোতির্ময়ী। স্বচ্ছ চোখে নিমেষহীন দৃষ্টিপাত করে রয়েছে চাণক্যর ওপর। চাণক্য তাকে ধরতে গেল, কিন্তু মুঠোর মধ্যে গলে বেরিয়ে গেল শরীরটা।

নদীর ওপারের শিঙে থেকে আবার ঠিকরে এসেছিল আওয়াজ, থিরথিরে কাঁপন জাগিয়ে গেছিল আকাশে বাতাসে। আগের চাইতে উচ্চকিত, আগের চাইতে ছন্দোময়। আকাশের আর নদীর পটভূমিকায় গাছপালা স্পষ্টতর হয়েছে। নদীর পাড়ের পাথরগুলোও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। নিজেকে শিথিল করে দিয়েছিল চাণক্য। শরীরে যেন আর শক্তি নেই। টের পাচ্ছে শুধু শৈত্যবোধ, যা প্রবেশ করেছে শরীরে। প্রশ্বাসেও যেন তুষার কণা ঝরছে।

ফুটফুটে মেয়েটাও আর তেমন জ্বালাতন করছে না। শেষবারের মতো একটা ঠেলা দিতেই অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিল চাণক্য। এখন তার গোটা শরীরটা দেখতে পাচ্ছে চাণক্য। দাঁড়িয়ে সামনেই। দেখতে পাচ্ছে শুধু দেহরেখা। পাতলা শরীর। লম্বা লম্বা চুল লুটিয়ে রয়েছে হাঁটু পর্যন্ত। চাহনি নির্বিকার, অথচ, গভীর।

উঠতে গেছিল চাণক্য। পারেনি। শরীর যেন জমে আসতে চাইছে। নিদারুণ শৈত্যবোধে।

মিষ্টি গলায় বলেছিল ফুটফুটে মেয়ে 'আমাকে তাতিয়ে দিয়ে এখন তুমি আমাদের একজন হয়ে গেলে।'

বলেই চলে গেল নদীর দিকে। আর তাকে দেখা গেল না। শোনা গেল শুধু একটা ঝপাস শব্দ।

তারপরেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল চাণক্য। অথবা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। চোখ মেলে দেখেছিল আলো। ম্যাড়মেড়ে সূর্য চলে এসেছে মাথার ওপর, শুয়ে রয়েছে চিত হয়ে।

রাতের ঘটনাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন দুঃস্বপ্ন।

হাত তুলে মুখ মুছতে গিয়ে দেখেছিল, কুঁচকে কুঁচকে গেছে হাতের চামড়া। যেন বয়স বেড়ে গেছে রাতারাতি।

ভয় পেয়ে লাফিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে টের পেয়েছিল, শরীর অনেক ভারী হয়ে গেছে। হাত-পা হুকুম শুনতে চাইছে না। হাত নড়ছে আস্তে আস্তে।

তারপরেই সামনে দেখেছিল সেই বুড়োটাকে— যার পেছন পেছন চলেছিল একপাল নেকড়ে।

ক্ষীণ স্বরে জল খেতে চেয়েছিল চাণক্য। হাত দিয়ে নদী দেখিয়ে বলেছিল জল এনে দিতে। মুখের কাছে হাত এনে দেখিয়েছিল, জলতেষ্টা পেয়েছে।

বুড়োর মুখে তখন কথা ফুটেছিল। পরিষ্কার বাংলা। নাকি সুর।

'শুয়ে থাকো চুপচাপ। মরবে এখুনি। মাভকা তোমার শরীর থেকে সমস্ত গরম টেনে নিয়েছে। এখন মরো।'

বলেই, উঠে গেল বুড়ো। একটু দূরেই শোনা গেল নেকড়েদের গজরানি।

রাগ মানুষের মধ্যে বাড়তি শক্তি জোগায়। চাণক্য রেগে ছিল। কাহিল শরীর খানিকটা জোর পেয়েছিল। গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর ধারে গিয়ে আঁজলা করে জল তুলে পান করেছিল। রোদে হাত পা ছড়িয়েছিল। একটু পরে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। কাছের একটা হগ-প্লাম গাছের তলায় গিয়ে রসালো ফল কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেয়েছিল।

তারপর শার্ট খুলে ফেলে উপুড় হয়ে শুয়ে রোদের আঁচে গা তাতিয়ে ছিল।

কিন্তু সূর্য তো পাটে বসবে এখুনি। টিকে থাকতে যদি হয়, এমন লোকের সন্ধান করতে হবে যারা ওকে প্রাণে বাঁচাতে পারবে।

ঠিক এই সময়ে নদীর জলে ঝপাস শব্দ শোনা গেছিল। কে যেন লাফিয়ে নেমে গেল নদীতে। সে যেই হোক, উপকারী বন্ধু নিশ্চয়। কেননা, একটা বড়সড় ট্রাউট মাছ রেখে গেছে পাড়ে। তখনও লাফাচ্ছে জ্যান্ত মাছটা।

ব্যাপারটা খানিকটা বোঝা গেল। অর্ধস্বচ্ছ সেই মেয়েটার কাণ্ড। নদীর মাছ রেখে গেল পাড়ে।

দেশলাই তো ভিজে গেছে। আছে তো মোটে আটটা কাঠি। গরম পাথরে রেখে দিল চাণক্য শুকিয়ে নেওয়ার জন্য। মাছটাকে খেল কাঁচা।

তারপর হাঁকাহাঁকি করেও আর কারও সাড়া পায়নি চাণক্য। জল থেকে স্বচ্ছ দেহী মেয়েটা উঠে আসেনি। নদীর অপর পাড়ে শিঙের শব্দ শোনা যায়নি। অনেকক্ষণ পরে অনেক দূরে হেলিকপ্টারের গজরানি শোনা গেছিল। কিন্তু চাণক্য তো নেই দাবানলের জঙ্গলে। একরাতেই চলে এসেছে অনেক দূরে। এল কী করে এতটা পথ। সেটাও একটা হেঁয়ালি। ছলনাময়ী খুকির হাতছানিতে এত জাদুও আছে!

আশ্চর্য! এই জীবনের অনেক আজব অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে গেছে চাণক্য চাকলাদার। শুনেছি হিমালয়ের তুষার মানবের কাহিনি, লক নেস-এর জলদানবের কাহিনি, উড়নচাকির কাহিনি। কিন্তু প্রাচীন কিংবদন্তির জলকন্যা এসে যে ছলনা করে যাবে তার সঙ্গে, এমনটা অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কখনও ভাবেনি। যাই হোক, আগুনের খপ্পর থেকে প্রাণে তো বাঁচিয়েছে।

ঠিক এই সময়ে দেখা দিয়েছিল সেই বুড়োটা, এর পেছন পেছন যায় নেকড়ে পাল। চমৎকার কাছে এসেছিল একা নেকড়েরা ছিল না সঙ্গে। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাণক্যর দিকে চেয়ে থাকবাব পর বলেছিল পরিষ্কার বাংলায় 'সূর্য! সূর্য! এখনও বুঝতে পারোনি। আমরা কে?'

হতচকিত চাণক্য বলেছিল বিমূঢ় স্বরে 'কে তোমরা?'

বৃদ্ধ বলেছিল 'আমরাই এই পাইন বন। আমরাই সব। আমরা সবাই এক। এক থেকে বহু হয়েছি। বহুর মধ্যে এক আছি।'

'বুঝলাম না।'

'তুমি তো মানুষ বলে নিজেকে মনে করো। গাছ হতে চাও?'

'গাছ হব! পাগল নাকি!'

শূন্যে চাবুক হাঁকড়েছিল বৃদ্ধ। চাণক্য দেখেছিল ওর দুটো পা জুড়ে গিয়ে গাছের গুঁড়ি হয়ে গেছে। হাত দুটো গাছের ডাল হয়ে শাখাপ্রশাখা হয়ে গেছে, সমস্ত সত্তা তখনও জাগ্রত রয়েছে।

শুনতে পাচ্ছে বুড়োর বকুনি 'এখন তুমি এই পাইন বনের একজন। আমিও এই পাইন বনের একজন। বনে আগুন লাগিয়ে ছিলে তোমরা 'সামরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা' করতে গিয়ে। আগুনের উৎস জানতে পাঠানো হয়েছিল তোমাকে। এখন তো জানলে, আমাদেব গায়ে আঁচ লাগলে আমরা ছেড়ে দেব না। এক থেকে বহু হয়েছি আমরা এই পৃথিবীতে। সমস্ত সত্তার মধ্যে রয়েছে একটাই সত্তা। তোমাকে গাছ বানিয়েছি যেভাবে, সেইভাবে তোমাকে অ্যামিবা-ও বানিয়ে দিতে পারি...এক থেকে বহু বহুর মধ্যে এক...রূপকথার গল্পগুলোতে এই কথাই বলবার চেষ্টা হয়েছে...ভূতপ্রেত, দত্যিদানো...সবাই এক থেকে বহু রূপ...বহু রূপের মধ্যে এক সত্তা...হাজার হাজার বছর ধরে এই নিয়ম চলে আসছে এই পৃথিবীতে...

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।...বিশ্বাস না-হয় তোমাকে এখুনি রঙিন প্রজাপতি অথবা বহুরূপী গিরগিটিও বানিয়ে দিতে পারি...কিন্তু অভিন্ন...একটাই সত্তা...যাকে বলা যায় বিশ্বপ্রাণ।...কিংবদন্তি কাহিনিগুলো মিথ্যে নয়...সত্যিই এক সময়ে এক চক্ষু মানব ছিল এই পৃথিবীতে, আবার তিন চোখো মানুষও ছিল।...আমরা এই পাইনবনে তাদের টিকিয়ে রেখেছি...জীবাণু থেকে তিমি...সবই যেমন সত্যি...তেমনি সত্যি চোখের সামনে থেকেও যারা অদৃশ্য অথবা দৃশ্যমান ভিন্ন ভিন্ন রূপে...সব সত্যি।...সব সত্যি...এক থেকে বহু...এই যে জ্ঞান তোমাকে দিলাম, এই জ্ঞান নিয়ে ফিরে যাও মানুষের সমাজে। এখুনি একটা হেলিকপ্টার নামবে এখানে...সংকেত পাঠিয়েছি আমি...ফিরে যাও, চাণক্য, ফিরে যাও, তারপর ব্রহ্মাণ্ড অভিযানে বেরিয়ে পড়ো...ব্ল্যাক হোলের ভেতরে ঢুকে যাও।... এক ছায়াপথ থেকে আর এক ছায়াপথে চলে যাও।...নোভা আর সুপারনোভার জন্ম আর মৃত্যু দেখে এসে বায়োএনার্জির চর্চা করো।...ফিলিপিনো সার্জনের মতো ছুরি না-চালিয়ে টিউমার সারিয়ে দাও...মূল সূত্র একটা—এক থেকে বহু, বহু থেকে এক... মূঢ় মানুষদের শিখিয়ে দাও হে উজবুক চাণক্য চাকলাদার...বৈজ্ঞানিক ওপেনহাইমার যেমন প্রথম অ্যাটমবোমা মরুভূমির মধ্যে ফাটিয়ে গীতার একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা আউড়ে গেছিলেন বিহ্বল গলায়— তেমনিই চৈতন্য হোক তোমাদের...এই মূঢ় বৈজ্ঞানিকদের। পরমাণুর মধ্যেকার প্রলয়ংকর শক্তি দেখে এখনও তোমাদের চৈতন্য হয়নি। হিমালয়ের শান্তি বিঘ্নিত করতে এসেছ লড়াইয়ের ছুতো নিয়ে? পালাও! পালাও! পালাও!'

চাণক্য বললে, 'প্রফেসর, এই তো ব্যাপার। বলুন তো আমি এখন কী করি?'

প্রফেসর বললেন, 'কলকাতায় গিয়ে মাথায় জল ঢালো। অমরনাথ দর্শনে গেছিলে নিশ্চয়? এন্তার সিদ্ধি গিলেছ?"

সাগর দানব

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বললেন, 'দীননাথ, নেপাল গুটিয়ে যাচ্ছে?'

বিজ্ঞের মতো আমি বললাম, 'খবর তো সেইরকমই। বছরে আঠারো মিলিমিটার করে কমছে...'

'ইন্ডিয়ান প্লেটের গুঁতোয়?'

'বছরে দু'খানা ফুটবল খেলার মাঠের মতো জায়গা হারাচ্ছে তিব্বতের সীমানায়।'

'হুম,' বলে একটু থামলেন প্রফেসর। 'সবই এই ইন্ডিয়ান প্লেটের জন্যে । ফি হপ্তায় প্রায় এক মিলিমিটার করে সরে যাচ্ছে। তিব্বত সরছে এশিয়ার দিকে বছরে ৩২ মিলিমিটার হিসেবে। ভাবনার কথা, দীননাথ, ভাবনার কথা।'

আমি বললাম, 'তা তো বটেই। পোর্ট ব্লেয়ার তো এক মিটার বসে গেছে।'

প্রফেসর বললেন, 'আন্দামান আর নিকোবরও তো ইন্ডিয়ার মূল জমির দিকে এগিয়ে এসেছে। মহাবলিপুরমে জলের মধ্যে থেকে মন্দির উঠে আসছে।'

'সংহারক সমুদ্র নতুন সংহার শুরু করেছে।'

'সুনামি,' বললেন প্রফেসর, 'সুমাত্রা থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত অর্ধেক পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল... কে? দীননাথ, কে?'

'ভূমিকম্প।'

'হুম। ভূমিকম্প আর সুনামি। ১৭৩৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরেও এই ভূমিকম্প আর এই সুনামি তাণ্ডব কাণ্ড ঘটিয়ে গেছিল খাস কলকাতায়...'

'আপনিও তা জানেন?'

'দীননাথ, এই আমি একটা লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া। বড়াই করা হয়ে যাচ্ছে? কিন্তু কী করি বলো... সেই সুনামি তছনছ করে দিয়ে গেছিল কলকাতাকে। শহীদ মিনারের চেয়েও উঁচু 'নবরত্নের' মন্দিরকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল... ষাট টনের মালবাহী বার্কগুলোকে গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে ছ'মাইল দূরে ফেলে দিয়েছিল, চল্লিশ ফুট উঁচু জলের তোড় কলকাতাকে ভাসিয়ে দিয়ে তিনলক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে গেছিল। দীননাথ, সুনামির মূলে ভূমিকম্প, ভূমিকম্পের মূলে কন্টিনেন্টাল প্লেট সরে যাওয়া আগেভাগে যদি জানা যায়...'

বলে, থামলেন প্রফেসর।

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, 'প্রফেসর, মোটা টাকা তো দেওয়া হবে সেই পূর্বসংকেত জানার গবেষণার জন্যে... আপনি... আপনি...'

'ধুস। টাকার আমার দকার নেই। তা ছাড়া, আমি যা করব, তা কাকপক্ষীও জানতে পারবে না... তুমি ছাড়া।'

'কী... কী করবেন?'

'সাগর দানব বানাব।'

জেনেছিলাম, সবুজ এই পৃথিবী শুরু থেকেই ছিল বড় অশান্ত, বড় অস্থির। আজকের শক্তপোক্ত পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে একটা মহামেঘ থেকে যে মেঘে ছিল তাল তাল গ্যাস, প্রচুর পাথর আর রাশি রাশি ধুলো।

এই মহামেঘ যে নক্ষত্রটাকে তখন প্রদক্ষিণ করে চলেছিল পরম নিষ্ঠায় সেই মহাকায় নক্ষত্রটাও, বলা যাক, সদ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আঁতুড়ে এই নক্ষত্রটাই আজকের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সূর্য।

তারপর অনেক... অনেক কর্মকাণ্ড চলেছে অনেক... অনেক বছর ধরে। লোহা আর নিকেলের মতো ভারী বস্তু টস্তুগুলো পৃথিবী নামক মহাকাশ বস্তুটার ঠিক মাঝের দিকে গিয়ে জমা হয়েছে, হালকা বস্তু টস্তুগুলো উঠে এসেছে ওপরের দিকে। গলিত পৃথিবী পৃষ্ঠ একটু একটু করে শক্ত হয়েছে... আগ্নেয়পাথরের পাতলা. নিরেট খোলস বানিয়ে গেছে, যে-খোলসের বেশির ভাগটাই ছিল ব্যাসাল্ট পাথর।

কিন্তু গড়ন পেটন এইখানেই থেমে থাকেনি। খোলস ভেঙে চুরে গেছে, ফের গরম হয়েছে, ফের ফেটেছে, একটু হালকা গ্র্যানাইট পাথর আলাদা হয়ে গেছে। আবার জমেছে, আবার শক্ত হয়েছে... বানিয়ে নিয়েছে মহাদেশ খোলসের আদি অংশ... প্রথম স্তর।

সমুদ্রের নীচে যে ভূস্তর, তা মোটে ছ' কিলোমিটার পুরু. মহাদেশে মহাদেশে ভূস্তর সে তুলনায় অনেক... অনেক পুরু... পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার তো বটেই, উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে আরও পুরু... ষাট কিলোমিটার পর্যন্ত।

আরও তফাত রয়েছে মহাসাগরীয় আর মহাদেশীয় খোলসে। মহাসাগরের ব্যাসাল্ট ত্বক জলের চেয়ে তিনগুণ বেশি ঘন। কিন্তু মহাদেশের গ্র্যানাইট খোলস জলের চেয়ে ২.৭ গুণ বেশি ঘন।

আরও ফারাক আছে দুই ত্বকে। মহাসাগরীয় ত্বকের সৃষ্টি কুড়ি কোটি বছর আগে, কিন্তু মহাদেশের পাথরের বয়স তো সাড়ে তিনশো কোটি বছর।

সমুদ্রতলের এই পাথুরে খোলস পর্যবেক্ষণ করেই যে থিয়োরি মোটামুটি সবাই মেনে নিয়েছে, তারই নাম প্লেট টেকটোনিকস, অথবা মহীসঞ্চরণ। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, সমুদ্রতলের এই প্লেট ফেটে ফুটে রয়েছে অনেক জায়গায়; সরে সরে যাচ্ছে ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে। ফলে মহাসাগরেরা আরও ছড়িয়ে যাচ্ছে... বড় হচ্ছে... বছরে এক থেকে দশ সেন্টিমিটার হারে। পৃথিবী কিন্তু বাড়ছে না। জল দখল করছে স্থলকে। ভয়াবহ ব্যাপার যে! ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আর একটা ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকরা খুব বিশ্বাসী। প্রায় বিশ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ছিল একটাই মহাদেশ। তার নাম প্যানজিয়া। উত্তর অংশের নাম ছিল লরেশিয়া, দক্ষিণ অংশের গন্ডোয়ানাল্যান্ড।

তারপর প্যানজিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। গন্ডোয়ানা ল্যান্ড থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে এখনকার ভারতবর্ষ উপমহাদেশ, উত্তর দিকে সরতে সরতে জুড়ে গেছে এশিয়ার সঙ্গে।

এরই নাম মহীসঞ্চরণ। সমুদ্রতলের প্লেট নিশ্চয় আরও সরছে, তাই অত ভূমিকম্প, ফলে সুনামি...

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সাগর দানব বানিয়ে দেখতে চান সাগরতলের কাণ্ডকারখানা। বেশ বেশ, সে হবে এক খাসা অ্যাডভেঞ্চার।

কিন্তু সাগর দানবটা হবে কে?

পড়াশুনো করে নিয়ে আমরা বিদ্যে জাহির করতে গেছিলাম প্রফেসরের কাছে। উনি বললেন, 'শাবাশ। মগজে ঘি আছে তা হলে। বাপু হে, আর একটা ব্যাপার তা হলে মাথায় রেখো। প্লেট টেকটোনিকস নিয়ে একটু গভীরভাবে নাড়াচাড়া করলেই জানা যাবে ভূমিকম্প কেন হয়, কী ধরনের হয়। আরও জেনে রাখো, পৃথিবীতে আছে তিন রকমের পাহাড়। ভাঁজ খাওয়া পাহাড়, চাঁই পাহাড়, আর আগ্নেয়পাহাড়।'

মিনমিন করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হিমালয় কি পাহাড়?'

'ভাঁজ খাওয়া পাহাড়। ঠেলার চোটে যা এসে দাঁড়িয়েছে এখন ৬৫০ কিলোমিটারে। শুরু হয়েছিল বারো কোটি বছর আগে। যখন গন্ডোয়ানাল্যান্ড থেকে একটা প্লেট সরে এসে ঘাড়ে বয়ে এনেছিল ভারতবর্ষ উপমহাদেশকে। প্রায় পাঁচকোটি বছর আগে এই প্লেট ঢুঁ মেরে গেছে— এশিয়াকে মাঝখানের টেথিস সাগরের তলানি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে হিমালয়ের মাথায়, প্রাচীন সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবাশ্ম তাই সেখানে আজও পাওয়া যায়।'

আমি হাঁ হয়ে গেছিলাম।

প্রফেসর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে গেছিলেন, 'মনে রেখো, এই পৃথিবীর ৫৩৫টা সক্রিয় আগ্নেয়গিরির ৮০টা রয়েছে মহাসাগরের নীচে। বৎস দীননাথ, ১৮৮৩ সালে আগ্নেয় দ্বীপ ক্রাকাতোয়া উড়ে গিয়ে যে সুনামি সৃষ্টি করেছিল তা জাভা আর সুমাত্রার ৩৬,০০০ মানুষকে খতম করে দিয়েছিল।'

তাই মাঝখানের বেশ কিছু ব্যাপার আঁধারে রেখে দিয়ে সোজাসুজি সাগর দানবের প্রসঙ্গে চলে আসছি। যার মধ্যে আছে লোমহর্ষক ঘটনাপরম্পরা। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি। দীননাথ নাথ নামক এই শর্মা যা লেখে রোমাঞ্চলোভী পাঠক পাঠিকার জন্যে, তার মধ্যে কল্পনার ফানুস একদম থাকে না।

কাগজ-টাগজ যারা নিয়মিত পড়ে, তারা জানে আচমকা এক সময়ে একটা দানব স্কুইড নাকি সাগরে সাগরে উৎপাত আরম্ভ করেছিল।

স্কুইড জীবটা চিরকালই এক সাগর আতঙ্ক। সমুদ্রের জলেই তাদের নিবাস, নদী নালায় নয়। অক্টোপাস আর কাটল ফিশ তাদের আত্মীয় হতে পারে, কিন্তু চেহারা চরিত্রে আশমান জমিন ফারাক। স্কুইডদের বপু হিলহিলে, সাঁতরায় তিরবেগে। সাগরে সাগরে স্কুইড আছে ৩৫০ রকমের, রকমারি সাইজের; সবচেয়ে বড় যারা, তারা লম্বায় প্রায় ষাট ফুট, খুদে স্কুইডও আছে এক ইঞ্চির ও ছোট সাইজের। মাথায় যে চোখ দুটো থাকে, সে চোখের গঠন আশ্চর্যরকমভাবে মানুষের চোখের মতো কিন্তু জলের জীব বলে সে চোখের বিবর্তন ঘটেছে অন্যরকম ভাবে। হাত তাদের আটখানা, যেমন থাকে অক্টোপাসের, এ ছাড়াও থাকে বাড়তি দুটো শুঁড়। হাতের চাইতে লম্বা শুঁড়। শরীর ছুঁচলো পেছন দিকে, আদিম পূর্বপুরুষদের খোলস এখনও টিকিয়ে রেখেছে সেখানে, এদের রক্তের রং নীল, অক্সিজেন সমৃদ্ধ। এই পৃথিবীতে যে সব মানুষ অহংকারে ফেটে পড়ে অভিজাত নীল রক্তের অধিকারী বলে, তারা নিশ্চয় এখন থেকে একটু কম লাফাবে স্কুইড রক্তের সঙ্গে তাদের রক্তের রঙের সাদৃশ্য কাহিনি শুনে। স্কুইডদের নার্ভও অসাধারণ। ব্রেন আর মাসল-এর মধ্যে যোগাযোগ রেখেছে যেসব স্নায়ু, তারা প্রায় আধ মিলিমিটার মোটা, যেখানে মানুষের স্নায়ু খুবই সরু— এক মিলিমিটারের পঞ্চাশভাগের এক ভাগ থেকে হাজার ভাগের একভাগ পর্যন্ত।

স্কুইডরা এই দানবিক স্নায়ুসূত্র নিয়ে জলের আতঙ্ক হয়ে থেকেছে, চিরটাকাল। জলের, জীবেদের কাছে তারা চিরবিভীষিকা।

সুতরাং টনক নড়েছিল অনেকেরই।

খবরের কাগজ, টেলিভিশন, আর অন্য হরেকরকম সংবাদ মাধ্যম হইচই ফেলে দিয়েছিল যখন জেলেদের জলযান একে একে ডুবেছে সাগরের জলে, প্রাণে বেঁচেছে যারা, তারাই ডাঙায় উঠে চোখ বড় বড় করে বলেছিল 'রাক্ষস! রাক্ষস! জলের রাক্ষস্য! ড্যাবা ড্যাবা চোখ! আটখানা হাত পা কিলবিলিয়ে টর্পেডোর মতো তেড়ে আসে জল তোলপাড় করে। গুঁতিয়ে উলটে দিয়েই তার যত আহ্লাদ। মানুষ খায় না। এ কীরকম দানব?'

সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে দেখতে দেখতে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল কালান্তকের কাহিনি। সে আসে দ্যুতিময় বপু নিয়ে রাতের অন্ধকারে... সব শেষ করে দিয়ে ডুব দেয় সাগরতলে— যেখানকার সব খবর আজও পৃথিবীর অজানা। প্রফেসর তাকে নামিয়ে ছিলেন ভারত মহাসাগরে। কিন্তু সে এখন টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে প্রশান্ত আর আটলান্টিক মহাসাগরেও। তার নিত্য নতুন দৌরাত্ম্য অস্থির করে তুলেছে, প্রফেসরকে। এ কী অদ্ভুত দুরন্তপনা! সাগরে সাগরে জলযান ডোবানোর জন্যে তো তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। ভূমিকম্প হতে পারে কোথায় কোন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির অকস্মাৎ ঘুম ভাঙার জন্যে, কোথায় কোন প্লেট সরে যেতে পারে, ইন্ডিয়ান প্লেটকে ঠেলে দিতে পারে হিমালয়ের দিকে, এইসব খবরই তো সে আনবে। তার ব্রেনে এই কর্মসূচি... এই প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দিয়ে তবে তাকে জলে নামানো হয়েছে।

কিন্তু হচ্ছেটা কী! সফটওয়্যার বিগড়েছে মনে হচ্ছে! নাঃ কম্পিউটার ব্রেনকে আর বিশ্বাস নেই।

প্রফেসরও একদিন মনের খেদে বলে ফেললেন, 'এ যে শিব গড়তে গিয়ে বানর বানিয়ে ফেললাম।'

আমি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, 'এরকম হয়, এরকম হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন ঘটনা নতুন নয়।'

'কিন্তু এর শেষ কোথায়? শেষ কোথায়?'

প্রশ্নটা এইখানেই। আতঙ্কটাও সেইখানে। খোদার ওপরেও খোদকারি করে চলেছে প্রফেসরের এই সমুদ্র শয়তান, এই মেফিস্টো।

কিন্তু কে সেই অন্দর-কন্দরের মহাশক্তি যার প্রয়োগে ধরিত্রী নিজে প্রলয়ংকর রূপ দিয়ে চলেছে প্রফেসরের নিবাত কবচকে?

ইলেকট্রিসিটি। পৃথিবীর শক্ত কেন্দ্রটাকে ঘিরে রয়েছে ১৩০০ মাইল পুরু তরল স্তর, যেখানকার তাপমাত্রা ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৫০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সম্ভবত, এই তল অংশটাই নড়ে চড়ে সরে গিয়ে যে ইলেকট্রিসিটি বানিয়ে যাচ্ছে, তা থেকেই এসেছে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ভৌত প্রকৃতি। আর, প্রফেসরের ধারণা, এই দুয়ে মিলে নিবাত কবচকে গড়ছে নতুন করে— বিশেষ করে যখন মহাসাগরের তলদেশের মহাখাদগুলোর নীচে ভূত্বক ছ'কিলোমিটারের বেশি পুরু নয়। নীচ থেকে গলিত বস্তু উঠে আসছে, মহাসাগরের তলদেশ নড়ে সরে যাচ্ছে, প্লেট সরছে, এই নড়ন চড়ন দেখতে গিয়েই নিশ্চয় পালটে যাচ্ছে নিবাত কবচ... স্পাইকে নতুন রূপ দিচ্ছে পৃথিবী!

সমুদ্র শয়তান! সমুদ্র শয়তান! তার রক্ত জমানো কালান্তক কায়ার বিবিধ বর্ণনা ছড়িয়ে গেছিল কাগজে ম্যাগাজিনে টিভি ইন্টারনেটে। সাংবাদিক আর চিত্রকররা তার রকমারি কিছুটা আন্দাজ দৈহিক বিবরণ তুলে ধরেছে জনগণের সামনে।

সমুদ্র শয়তান নামকরণ তা হলে নিজেরই। নিবাত কবচ নামটা তার পছন্দ হয়নি। তারাও তো ছিল সমুদ্রের সংহারক অসুর। কিন্তু পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছিল অর্জুনের মোক্ষম বানে। তাই বুঝি নিজেই নিজের নাম রেখেছে সমুদ্র শয়তান। বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে এখন প্রফেসরের নাগালের বাইরে... নিয়ন্ত্রণের বাইরে সে যা খুশি করে বেড়াবে সাগরে সাগরে...

এই মর্মে সংবাদও পাঠিয়েছিল প্রফেসরকে আমি পালটে যাচ্ছি... আমাকে পালটে দেওয়া হচ্ছে..., ধরণী সৃষ্টি করছে আর এক নারকীয় জীবকে। বসুধায় আমাকে জ্বলন্ত চাহনি দিয়ে লেহন করে যাচ্ছিল যে বর্ণনাতীত বর্ণময় বীভৎস জীবটা, একটু একটু করে আমার সত্ত্বা যে তার আকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা তো ভাবিনি... আমাকে নিংড়ে চিপটে গুটিয়ে টেনে নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে... আমার দম আটকে আসছে। আমি এখন তার মধ্যে চলে এসেছি... আমি আর সে এক হয়ে গেছি...

...গুরুদেব... এখনও আপনাকে গুরুদেব সম্বোধনই করব। আপনিই তো বানিয়েছেন আমাকে... কিন্তু আপনার গুপ্তচরকে এখন গ্রাস করেছে ধরণীর অনুচর অথবা অনুচরী... শিব শিবানীর অনুচর অনুচরীর মতোই এমনই করাল আকৃতি এই মহাকায়ের যা বর্ণনায় আনা যায় না... সে আমাকে তার সত্তায় বিলীন করে দিয়েছে... আমার স্রষ্টাকে জব্দ করতে চাইছে আর এক বড় স্রষ্টা... এই ধরণী যার হাতে সৃষ্টি হয়েছে...

... মন্দ কী? বেড়ে আছি। অদ্ভুত আশ্চর্য জগৎ দেখতে পাচ্ছি আশেপাশে, একটু একটু

করে বেশ তো মানিয়ে নিচ্ছি... আরও নেব... একাকার হয়ে যাবে এই অদৃশ্য আর দৃশ্যমান উভয় রকমের মহাশক্তির সঙ্গে... আমি হব এই প্রজন্মের সবসেরা সমুদ্র শয়তান...

... আমি নাকি আপনার চোখ, টহল দিয়ে যাব সমুদ্রে সমুদ্রে? এই যদি ছিল আপনার পরিকল্পনা, তা হলে জেলি ফিশদের খবরটা আমাকে দিয়ে রাখেননি কেন? পুঁচকে পুঁচকে চেহারা নিয়ে কী জঘন্য কামড় দেয় শয়তানের বাচ্চারা... জ্বালিয়ে দিয়েছে আমাকে...

... রাশি রাশি সাদা ফুলের গাছ দেখে এলাম... সামুদ্রিক অ্যানিমনি... বড় সুন্দর... বড় সুন্দর...

... এখানে দেখছি সবাই সবাইকে খায়! ছোটদের খায় বড়রা... বড়দের খায় আরও বড়রা... বেঁচে থাকার সহজ কানুন... কাঁকড়া আর মাছ খাচ্ছে পুঁচকেদের... আবার তাদের খেয়ে নিচ্ছে আরও বড় জন্তুরা... বড় জন্তুদের খাচ্ছে আরও বড় জন্তুরা... যাদের হাঁ বড়... দাঁত ধারালো! আমাকেও ওইরকম হতে হবে নইলে টিকতে পারব না...

... একটা তিমি হাঙর কোঁত্ কোঁত্ করে খাচ্ছে কাঁকড়ার প্লাঙ্কটন... যা কিনা জলজ জীব আর জলজ উদ্ভিদের সমাহার... সাগর আমাকে শেখাচ্ছে, ছোটদের ঠাঁই নেই কোথাও... শুধু অতিকায় হলেই হবে না। বড় হাঁ হওয়া চাই, তবেই সম্মান, নইলে নয়... ছোট হাঁ থাকলে কেউ পোঁছে না... আমি শিখছি... শিখছি... প্রবণতা ওই দিকেই চলে যাচ্ছে... বড় গা... বড় হাঁ... তবেই টিকে থাকা যায় এই সংসারে... ধরো আর খাও, টিকে যাও নিজে... প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, সাগর এখন আমার শিক্ষাগুরু, আপনি নন...

... আমি নাকি দানবিক স্কুইড হয়ে যাচ্ছি। আগেই বলেছি, এখন আমি বহুদূরের আওয়াজ শুনতে পাই, বহুদূরের দৃশ্য দেখতে পাই... জেলেরা ভয়ে কাঠ হয়ে বলাবলি করছিল... দানব স্কুইড! দানব স্কুইড! হানা দেবে যখন তখন!

... দেবই তো! লন্ডভন্ড করে ছাড়ব সব কিছু! খুন চেপেছে মাথায়!

... মানুষের সাঁতার আমি জলের তলা থেকে দেখি... সরে যাই... মানুষকে আমি ভয় পাই... মানুষ সব পারে... সেরা ব্রেন রয়েছে এই মানুষের... সেই ব্রেনকে আপনি পালটে দিয়েছেন... শুধু আপনি নন... মহীতলের মহাশক্তি ওই ইলেকট্রিসিটি আর ম্যাগনেটিজম... আমি এখন সমুদ্র শয়তান...

... আমি এখন নিষ্ঠুর, নির্দয়... মানুষ ছিলাম আগে, এখন নই... মানুষের মঙ্গল করতে যাব কেন? আমি অমানুষ... আমি প্রাকৃত অপ্রাকৃতের সমাবেশে এক মহাপ্রলয়... আমি গড়তে পারি না... শুধু ভাঙতে পারি... যাক স্থল ভাগ তলিয়ে, তাতে আমার কী? পৃথিবী হোক সাগরময়... শুধু সাগর... শুধু সাগর... আমার উদ্দাম রাজত্ব হোক বিস্তৃত...

... হ্যাঁ আমিই এখন ক্র্যাকেন... আমার মরণ নেই, আছে উন্নততম ধীশক্তি... যা নেই মর্কটসম মানুষের... আমি কিংবদন্তি নই, বাস্তব... বড় নিষ্ঠুর বাস্তব... আমার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মানুষের কল্পনাতীত... আমি মূর্তিমান বিভীষিকা, এই সাগর আমার রাজত্ব, এখানে নেই কোলাহল... শুধু নৈঃশব্দ্য, সীমাহীন নীরবতা... বৈজ্ঞানিক প্রফেসর নাটবল্টু চক্র... আপনার প্ল্যান ভন্ডুল হয়ে গেছে... স্যার রাদারফোর্ড কি হাইড্রোজেন বোমা কল্পনায় আনতে পেরেছিলেন? আপনার কল্পনাতেও আমি আসিনি। সাগর এখনও অসংখ্য সিক্রেটের

আধার, আমি হাতে এনেছি এই গুপ্ত শক্তিদের চাবিকাঠি... আমি অজেয়... আমি সমুদ্র শয়তান... আমি...

এই পর্যন্ত শুনেছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র নিজের ল্যাবোরেটরিতে বসে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম...

চোখে মুখে বিতৃষ্ণার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে উনি শুধু একটা বোতাম টিপেছিলেন... রিমোট কন্ট্রোলের...

বড় হুঁশিয়ার বৈজ্ঞানিক... বিপরীত সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, নিমেষে বিলীন হয়েছে সমুদ্র শয়তান। সাগরের জল শুধু একটু ফুলে উঠেছিল, তার বেশি নয়।

সব এক্সপেরিমেন্ট কি সফল হয়?...

প্রফেসর কিন্তু মৌন হয়ে গেছিলেন। এবং বিমর্ষ।

তবুও একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'রাদারফোর্ড কে?'

অমনি উনি জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কাট কাট গলায় বললেন, 'ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী। ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ক্যাভেন্ডিস গবেষণাগারে অধ্যক্ষ ছিলেন। পরমাণুর সংগঠনে নিউট্রন কণিকাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। পদার্থ আর শক্তির অভিন্নতা, আর পরমাণুর বিভাজন সম্পর্কীয় গবেষণার ভিত তৈরি করেছিলেন। ১৯০৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আর কিছু?'

'ইয়ে... এই যে যাকে নিয়ে এই মহৎ এক্সপেরিমেন্টটা করলেন, তার সম্বন্ধে কিছু আঁচ দেওয়া যাবে কি আমার লেখায়?'

'সে তো ছিল সুনামিতে ভেসে আসা একটা মড়া। আমি তার ব্রেনটাকে চাঙ্গা করে কাজে লাগিয়েছি। কীভাবে, তা বলব কেন?'

আমি আর কথা বাড়াইনি। খোদার ওপর খোদকারি করতে গেলে এইরকমই হয়। কে জানে, গোড়া থেকেই হয়তো গোলমাল ছিল ব্রেনটায়।

ঈশ্বর আছেন

অত্যাশ্চর্য একটা গুজব ছড়িয়ে গেল দেশে দেশে, মহাদেশে মহাদেশে, গোটা পৃথিবীতে। মুখে মুখে পৃথিবী প্রদক্ষিণের পর ছাপার অক্ষরে দেখা গেল সব পত্রপত্রিকায়, ধ্বনিত হল ঘোষকদের গলায় টিভি, রেডিয়োতে।

জিনিসপত্রের দাম কমে গেল বেশ কয়েকটা বাজারে। রাষ্ট্রসংঘ থেকে নিয়োগ করা হল কমিটি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবার জন্যে। সেই কমিটিতে রইলেন বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামী নামী মানুষ, আর বিরাট বিরাট বিজনেস ম্যান।

সাধারণ মানুষরা উন্মুখ হয়ে রইল এইসব তাবড় ব্যক্তিদের বচন শোনবার জন্যে। গুজবের অলিগলি থেকে উৎসকে টেনে আনতে পারবেন তো এঁরাই।

থরহরি কম্প শুরু হয়ে গেল খেতখামার, কলকারখানায়। কাজের লোকেরা যদি গুজবে মাথার চুল খাড়া করে উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, তা হলে মুখ থুবড়ে পড়বে যে সব কিছুই। গুজবের মতো সর্বনাশা আর কী আছে দুনিয়ায়?

তবে, পৃথিবীব্যাপী গুজবটা হিংসাত্মক মোটেই নয়, ঠিক তার উলটো— অহিংসা টেনে আনে মনের মধ্যে। ফলে, খুনে গুন্ডাদের বাজার গেল, টেররিস্টদের খোয়াব ছুটে গেল। অহিংসা ব্যাপারটা অজানা নয় এশিয়াবাসীদের কাছে, তাই তারা বিষম উৎসুক হয়ে রইল গুজবের উৎসটা জানবার জন্যে— যাকে বলে হাপিত্যেশ অবস্থা— তাই। ভুরু কুঁচকে গেল সেইসব দেশের মানুষদের যেখানে এতদিন বলে আসা হয়েছে, ধর্ম একটা আফিং। কিন্তু ধর্ম ছাড়া যারা চোখে ধোঁয়া দেখে, তারা হল উত্তাল। তবে হুঁশিয়ার হয়ে গেল ধর্মব্যবসায়ীরা। উটকো উৎপাত এই গুজব যে বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে বিনা মূলধনের ব্যবসায়ে। মানুষ যদি শর্টকাটের সন্ধান জেনে যায়, তা হলে তাদের রমরমা যে আর থাকবে না। হ্যারিকেন ঝুলবে মন্দির-মসজিদ-গির্জে এবং হাজারো দেবালয়ে!

তাই ঝট করে সিদ্ধান্তে আসার আগে ব্যাপারটা যাচাই করার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগে গেল মোল্লা, পাণ্ডা, ফাদার প্রমুখ সব ধর্মব্যবসায়ীরা।

ফলে, একটা শুভ ফল ফলিয়ে দিল অত্যাশ্চর্য গুজব। এককাট্টা হয়ে গেল রোম, মক্কা, জেরুসালেম আর ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ-নেপালের সব ক'টা ধর্মের ঘাঁটি। মুক্তকণ্ঠে তারা বললে, আর লড়ালড়ি নয়, নিখিল পৃথিবী ধর্ম মহাসভার সদস্য প্রত্যেকেই। বহু পথ,

বহু মত থাকতে পারে— কিন্তু যেতে তো হবে একটাই জায়গায়। তবে কেন খেয়োখেয়ি! আসুন, সবাই হাত মেলাই!

অবশেষে, মহামিটিং শুরু হয়ে গেল রাষ্ট্রসংঘে। গোটা পৃথিবী উন্মুখ হয়ে রইল ফলাফলটা জানবার জন্যে।

মিটিং-এ ডাকা হয়েছিল বিরাট বিরাট বৈজ্ঞানিকদের। এঁদের মধ্যে ছিলেন একজন বাঙালি বৈজ্ঞানিক। আত্মভোলা কিন্তু অসাধারণ মগজের অধিকারী মানুষটার নাম...

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

ইনি বেশ কিছুদিন কাটিয়ে এসেছেন ব্রিটেনের জড্রেল ব্যাঙ্কের রেডিয়ো মানমন্দিরে।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রথমেই রাখলেন চাঁচাছোলা কথার একটা ছোট্ট ভূমিকা। তাতেই ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিলেন নাকউঁচু বৈজ্ঞানিকদের। তারপরেই কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিলেন সমন্বয়সাধক মূলনীতির ওপর— ঐকমত্যের ওপর... যা নিয়ে হেদিয়ে মরছেন বৈজ্ঞানিকরা... প্রকৃতির এত অনৈক্যের মধ্যে যে একটা ঐক্য আছে, তা আঁচ করছেন, কিন্তু অকাট্য প্রমাণ হাজির করতে পারছেন না। তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর যেমন বোঝা গেছিল আপাত অবিভাজ্য অ্যাটমের মধ্যেও আছে খুদে খুদে বস্তুকণা, ঠিক তেমনি দানবিক টেলিস্কোপের দৌলতে জানা গেছে, সমস্ত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণের গোড়ায় রয়েছে অন্তহীন খুদে ভাইব্রেশন। ইনি এই ভাইব্রেশনের নাম দিয়েছেন 'আলট্রা-মাইক্রোওয়েভ', যা ছেয়ে রয়েছে সমস্ত বস্তু আর মহাশূন্য।

বক্তৃতা তো নয়, যেন একটা কল্পগল্পের কাহিনি। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল শ্রোতাদের।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এইভাবেই বিবেকানন্দ কায়দায় সবাইকে থ করে দেওয়ার পর বলেছিলেন, 'বন্ধুগণ, কম্পিউটার দিয়ে এই মাইক্রোওয়েভদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেললাম আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা দ্বিতীয় ব্যাপার। এই যে প্রায় অস্পষ্ট, প্রায় দুর্বোধ্য ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক সিস্টেম— তড়িৎ চুম্বকী ক্ষেত্র ধারণ করে রয়েছে একটা জটিল, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল গাণিতিক গঠন— ধীশক্তির যাবতীয় পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান যার মধ্যে।'

এই পর্যন্ত বলে, দম নিতে যেই থেমেছিলেন প্রফেসর, অমনি এক খাড়া-নাক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ছুড়ে দিয়েছিলেন একটি মাত্র শব্দের প্রশ্ন, 'উদাহরণ?'

প্রফেসরের দম নেওয়া হয়ে গেছিল। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নকে যেন লুফে নিলেন।

বললেন পরিচ্ছন্ন ইন্ডিয়ান ইংলিশে, 'মানুষ পর্যবেক্ষকের আচরণে সাড়া দিয়েছে এই গাণিতিক গঠন— যা পালটে পালটে যাচ্ছে ঘনঘন—'

'সাড়া দিয়েছে কি মানুষের চিন্তায়?' নাকের পাটা ফুলিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন এক হামবড়া ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক।

'দিয়েছে' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন প্রফেসর। ব্রিটিশরা ইন্ডিয়ানদের যতটা তাচ্ছিল্য করে এসেছে প্রায় দুশো বছর ধরে, তার শতগুণ তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে তুললেন শুধু ওই 'দিয়েছে' জবাবটায়।

গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল বিশাল হলঘরে। ধীশক্তিময় তড়িৎচুম্বকী ক্ষেত্র মানুষের মনের

চিন্তা ধরতে পারে। কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! যত পাপ তো এই মনের মধ্যে— সব যদি ধরা পড়ে যায়...

প্রফেসর এবার গলায় গমক তুলে তুলে বললেন, 'থ হয়ে থাকার মতো ব্যাপার বই কী। যে চিন্তা লুকিয়ে আছে মনের মধ্যে, যে চিন্তাকে মুখে আনা হয়নি আনা যায়নি বলে, লুকোনো সেই চিন্তা নিমেষে আদ্যোপান্ত ধরে ফেলে আশ্চর্য এই তড়িৎ চুম্বকী ক্ষেত্র।'

'টেলিপ্যাথি!' বললেন একজন উঁচুহনু তেড়চা চক্ষু চিনে বৈজ্ঞানিক।

'আজ্ঞে', এবার কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ ঝরিয়ে দিলেন প্রফেসর, 'সচেতন এই সান্ত্রি—'

'সান্ত্রি?' আবার বাধা এল সেই সবজান্তা চেহারার চৈনিক প্রবরের দিক থেকে।

দুই চোখে একটু তাচ্ছিল্য বর্ষণ করলেন প্রফেসর, 'আজ্ঞে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই তড়িৎচুম্বকী ক্ষেত্রই গোটা মহাবিশ্বের মূল অন্তঃস্তর।'

'বলেন কী মশায়?' পরিষ্কার বাংলায় বাঙাল টানে টিপ্পনী কেটেছিলেন পূর্ববাংলার এক বৈজ্ঞানিক।

তাঁর দিকে নিমেষে একটু চেয়ে থেকে পরিচ্ছন্ন ঘটি বাংলাতেই জবাবটা ছুড়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই মুহূর্তে এই অ্যাসেম্বলি ঘরের যে বাতাস নিশ্বেসে টানছেন, তার মধ্যে রয়েছে অন্তহীন মাত্রার এই ইনটেলিজেন্ট সত্তা— রয়েছে এখানকার প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে, মনের মধ্যে।'

নিথর নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছিল অত বড় ঘরটায়। মানুষগুলো যেন নিশ্বাস রহিত, নিস্পন্দ তো বটেই।

তারপরেই বক্তিমের সারকথা ছড়িয়ে গেছিল বিশ্বময়। রাস্তাঘাট পার্কময়দান ফাঁকা হয়ে গেছিল চকিতচমকে। গাড়িটাড়ি দাঁড়িয়ে গেছিল যেখানে সেখানে, কেননা প্রতিটি মানুষ চুল খাড়া করে বসে পড়েছিল টেলিভিশনের সামনে। রাষ্ট্রসংঘ প্রধান উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে শুনিয়েছিলেন তিনশো বৈজ্ঞানিক সই দিয়েছিলেন যে বিবৃতিতে, সেইটা। থেমে থেমে পড়ে গেছিলেন— যাতে কানের মধ্যে দিয়ে কথাগুলো ব্রেনের মধ্যে ঢুকে কেটে কেটে বসে যায়। তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম এই:

এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মানুষের হাজার হাজার বছরের অন্ধবিশ্বাস— ঈশ্বর আছেন।

ঈশ্বর আছেন! যাঁর অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ প্রমাণ এতদিন পাওয়া যায়নি বলে চার্বাকপন্থীরা চেঁচিয়ে গগন ফাটিয়েছে, এই মহাচৈতন্যই তা হলে ঈশ্বর। তা হলে আর লাঠালাঠি কেন? এসো ভাই, এসো বন্ধু, সবাই মিলে মন শোধন করি— চেতনাময় এই সত্তা, এই তড়িৎ চুম্বকী ক্ষেত্র যে মনপঠন বিদ্যায় পোক্ত!

ফলে, সাম্যের গান শুরু হয়ে গেল পৃথিবীময়। অনেকগুলো সুফল দেখা গেল ঝটপট। রোগীর সংখ্যা কমে এল ডাক্তার-কোবরেজ-হাকিমদের চিকিৎসালয়ে। পটাপট রোগমুক্ত হয়ে যাচ্ছে মানুষ— নিছক বিশ্বাসে এতদিন যা হয়নি, বৈজ্ঞানিকী প্রমাণে এবার তা হয়ে গেল মনের শক্তি সাঁ করে বেড়ে যেতেই ধাঁ করে চম্পট দিল মানসিক রোগ-টোগগুলো। পুলিশ পোষার আর দরকার হল না পৃথিবীর কোত্থাও। মিলিটারিদের বসিয়ে বসিয়ে

না-খাইয়ে তাদের লাগিয়ে দেওয়া হল পাহাড়, মরুভূমি আর সাগর থেকে নানারকম ওষুধ আর শক্তি সন্ধানের কাজে। অজেয় রক্ষক যখন তড়িৎ চুম্বকী ক্ষেত্ররূপে ঘিরেই রয়েছে আমাদের, রয়েছে প্রতিটি জীবদেহ, বৃক্ষ আর বস্তুর মধ্যে, তখন আর অযথা সংঘাতে খামোকা শক্তিক্ষয়ে প্রয়োজন কী? যে সব দেশে দেশে নিরন্তর লড়াই লেগেই ছিল, যেমন, ভারত-পাকিস্তানে— তারা সমস্ত সামরিক রসদ নিষ্ক্রিয় করে ফেলে দিল সমুদ্রে আর মরুভূমিতে— যুদ্ধবিমান আর যুদ্ধজাহাজদের অংশ দিয়ে বানানো হল এমন সব জিনিস যা মঙ্গল করবে মানুষ, গাছ আর প্রাণীদের।

খানকয়েক শিকারি বন্দুক অবশ্য রেখে দেওয়া হয়েছে একটা অঘটন ঘটে যাওয়ার পর। বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধে বুঁদ হয়ে এক জার্মান টুরিস্ট সুন্দরবনে ঢুকে আল্লা-কৃষ্ণ-খ্রিস্ট-বুদ্ধের গান গাইতে একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগারকে আলিঙ্গন করতে গেছিল। ফলটা হয়েছিল মর্মান্তিক। তৎক্ষণাৎ হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল জগৎবাসীকে। ঈশ্বর যে আছেন, এই চৈতন্য এখনও জীবজগতের নিম্নস্তরে নিশ্চয় জাগ্রত হয়নি। সময় দেওয়া দরকার। তদ্দিন একটু সাবধানে থাকা ভাল। তা ছাড়া, একটু-আধটু ক্রাইম না-করলে বেচারিদের পেট ভরবে কী করে? গাছের ফলে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে মাংসাশীদের একটু সময় দেওয়া তো দরকার।

মানুষ ক্রিমিন্যালরা কিন্তু হাত গুটিয়ে নেওয়ায় তামাম দুনিয়া হয়ে গেল ক্রাইমশূন্য। কোথাও ক্রাইমের বাষ্পটুকুও না-থাকায় টিভি-কাগজের সেই রমরমা আর নেই। পৃথিবীর সব মানুষ এখন আকাশের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে দিবারাত্র— মহাচৈতন্য, মানে, ঈশ্বরের নির্দেশের অপেক্ষায়।

ফলে, দেবালয়গুলো বিলকুল ফাঁকা। কলকারখানাও ফাঁকা। সব কাজের জায়গা ফাঁকা। কাজ না-থাকলে খই-ভাজা হয়। এখন তাই হচ্ছে। মানে, গুলতানি।

অগত্যা, মোল্লা-পাণ্ডা-পুরুত-বিজনেসম্যানরা এককাট্টা হয়েছে। ঈশ্বর যে নেই, এটা প্রমাণ করতে পারলেই মুফতের কারবার-টারবারগুলো আবার গমগম করে চলবে— এত লালবাতি জ্বলা তো সুলক্ষণ নয়!

সুতরাং, গোপনে গোপনে এক দুঁদে শয়তান সাধকের সন্ধানে আছে এরা— যে টাইট দেবে ঈশ্বরকে... অথবা, প্রমাণ করে দেবে ঈশ্বর নেই।

দেখা যাক কী হয়।

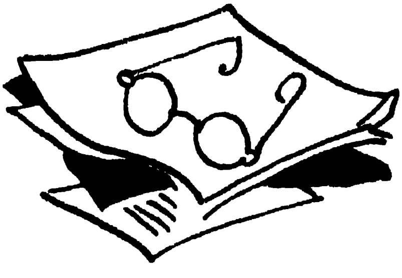

ব্ল্যাক হোল-এর ব্ল্যাক ম্যাজিক

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র-আমাকে প্রায়ই বলেন, 'দীননাথ, যদি পূর্বজন্ম মানতে হয়, তা হলে আমার বিশ্বাস, আগের জন্মে তুমি একটা গর্দভ ছিলে।'

কথাটা ঠাট্টা করে বললেও চট করে হজম করা যায় না। আয়নার সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখেছি। কিন্তু গাধার সঙ্গে আমার চেহারার কোথাও কোনও মিল খুঁজে পাইনি। কান দুটো একটু বড়, আর একটু লম্বা বটে, কিন্তু কে না জানে, যারা জগৎবরেণ্য হয়, তাদের কান একটু বড়, একটু লম্বা হয়। যেমন বুদ্ধ, যেমন গাঁধীজি।

আমি অতটা স্ট্যাটাস না-পেলেও একেবারে ফ্যালনা নই। যদি তাই হতাম, তা হলে প্রফেসরের মতো দুনিয়া কাঁপানো বৈজ্ঞানিকের চ্যালা হতে পারতাম না। তা ছাড়া, আমি লক্ষ করে দেখেছি, প্রফেসরের কান দুটোও তো খুব একটা ছোট নয়।

আর, আমি যদি এতই ফ্যালনা হই, তা হলে ঘ্যাঁচাকলে পড়লে প্রফেসর আমার শরণ নেন কেন?

যেমন পড়েছিলেন কালচক্রের ঘ্যাঁচাকলে। ব্যাপারটা এমনই উদ্ভট, এমনই অবিশ্বাস্য যে লিখতে গিয়েও আমার হাসি পাচ্ছে।

এইবার আসা যাক আশ্চর্য সেই উপাখ্যানে। প্রফেসরের যে একটা টাইম মেশিন আছে, তা অনেকেই জানে। টাইম মেশিন মানে সময় গাড়ি। এই গাড়িতে আমাকে চাপিয়ে একবার যে উনি কী কাণ্ড করেছিলেন, সৃষ্টিছাড়া সেই কাহিনিও কারও অজানা নয়।

আমি কিন্তু পইপই করে তখনই বলেছিলাম, 'গাড়ি টাড়িকে অতটা বিশ্বাস করবেন না। গাড়ি একটা কল। কল বিগড়োয়। যখন তখন। বিনা নোটিশে এই যে আপনি মোটর গাড়িটা বেচে দিলেন, কেন? বিনা নোটিশে বিগড়ে যাচ্ছিল বলে। ঠিক তেমনি, আপনার সময় গাড়ি যেদিন বিগড়োবে, সেদিন যে পৃথিবীটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই বলি, একবার সময় গাড়িতে চেপে অতীত ভবিষ্যৎ ঘুরে এসেছেন বলে ওটাকে বেশি পাত্তা দেবেন না।'

প্রফেসর লম্বা লম্বা কান খাড়া করে আমার বিনয় বচন শুনেছিলেন বটে, কিন্তু জবাব না-দিয়ে শুধু একটু মুচকি হেসেছিলেন।

তখন কি ছাই জানতাম, উনি লুকিয়ে লুকিয়ে সময় গাড়ি চেপে প্রায় বেড়াতে যান?

তারপর যে ঘটনাটা ঘটিয়ে বসেছিলেন, তা এমনই হাস্যকর অথচ লোমহর্ষক যে না লিখে পারছি না।

এক প্রফেসর অনেক প্রফেসর হয়ে গেছিলেন।

এইবার আসা যাক অত্যাশ্চর্য সেই ঘটনাটায়।

শখ করে আমি একটা মোবাইল কিনেছিলাম। বাচ্চাকাচ্চার হাতেও যখন মোবাইল ঘুরছে, তখন আমার মোবাইল না-থাকলে স্ট্যাটাস থাকে না বলেই কিনেছিলাম। প্রফেসরকেও একটা কিনে দিয়েছিলাম। তারপর জ্বলেপুড়ে গেছিলাম মোবাইলের জ্বালায়।

আমি ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে যোগব্যায়াম করি। দীর্ঘদিনের অভ্যেস, সেই যে শিখিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়, আজও তা ভুলিনি। আজকাল অবশ্য ওই খেতাবধারী মানুষ দুনিয়ায় আর একটাও নেই। ওই কনটেস্টের পাট চুকে গেছে। যদি না-যেত, আমি নাম লেখাতাম।

যাচ্চলে। কী লিখতে গিয়ে কী ব্যাপারে চলে এলাম। এইটাই আমার এক দোষ। এইজন্যেই প্রফেসর আমাকে লম্বকর্ণ বলেন।

কী লিখছিলাম? হ্যাঁ। যোগব্যায়াম করছিলাম। ব্রাহ্মমুহূর্তে শীর্ষাসন। চাট্টিখানি কথা নয়। শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় চলে এসেছিল। ঠ্যাং দুটো ওপরে তুলে যখন মন দিয়ে ব্যালান্স বজায় রেখে চলেছি, ঠিক এমন সময়ে মোবাইলটা রণসংগীত বাজিয়ে দিল কানের কাছে।

রণসংগীত মোবাইলে থাকে না। থাকে মিষ্টি মিষ্টি গান। তাও মোবাইল কানে লাগানোর পর শুনতে পাওয়া যায়। আমার এই মোবাইলটায় আমি একটু কারচুপি করে নিয়েছিলাম। তাই 'কল' এলে মোবাইল 'কদম কদম বড়ায়ে যা' গানটা শোনাত।

ব্রাহ্মমুহূর্তে আমার কদমযুগল যখন আকাশ মুখো, তখন এ কী উৎপাত! শূন্যে ঠ্যাং তুলে কেউ মার্চ করতে পারে?

কিন্তু ঝনঝনাঝন শব্দে 'কদম কদম বড়ায়ে যা' যখন কানের কাছে বেজেই চলেছে, তখন আকাশমুখো পদযুগলকে মর্তের লেভেলে নামিয়ে এনে মোবাইল কানে দিয়েছিলাম। ওদিক থেকে ভেসে এসেছিল প্রফেসরের আর্তস্বর, 'দীননাথ, এ কী গেরোয় পড়লাম।'

আমি যে একটা ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো, আমার তা অজানা নয়। গেরোয় না-পড়লে প্রফেসর যে আমাকে তলব করেন না, তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু ব্রাহ্মমুহূর্ত তো স্বর্গীয় মুহূর্ত। এইসময়ে সাধনা করলে নাকি দেবতা টেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উনি কি যমদূতের সাক্ষাৎ পেয়েছেন? অমন চেঁচাচ্ছেন কেন?

যথাসম্ভব মোলায়েম গলায় (ধ্যানভঙ্গ হলে মুনিঋষিদের মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়, আমি তা হতে দিইনি) জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হলটা কী? অমন চেঁচাচ্ছেন কেন?'

'টাইম মেশিন! টাইম মেশিন ব্যাটাচ্ছেলে ব্ল্যাকহোলে ঢুকে গিয়ে বেরিয়ে এসে আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।'

'কীরকম বারোটা?'

'এক আমি অনেক আমি হয়ে গেছি।'

'তার মানে?' হঠাৎ যোগাসন ভঙ্গ হওয়ায় এমনিতেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল,

তার ওপরে এহেন উৎকট বার্তা শোনবার পর কণ্ঠস্বরকেও মোলায়েম রাখতে পারিনি।

উনি বলেছিলেন, 'চটে যাচ্ছ কেন? এই সময়ে চটতে নেই। মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। তুমি পাছে বাগড়া দাও, এইজন্যে তোমাকে না-জানিয়ে মাঝে মধ্যেই আমি টাইম মেশিনে চেপে বেড়াতে যাই। আজকেও গেছিলাম। প্যাঁচে পড়েছিলাম। এখনও পড়ে আছি।'

'কীরকম প্যাঁচ?'

'সময়ের প্যাঁচ।'

'খোলসা করুন।'

'ব্ল্যাক হোল দেখা গেছে শুনেছ তো?'

'তার ছবিও তো সেদিন দেখালেন। ব্ল্যাক হোলের প্রথম ছবি।'

'আমি সেই ব্ল্যাক হোলটায় ঢুকেছিলাম সময় গাড়িতে চেপে।'

'বেশ করেছিলেন। ফিরে তো এসেছেন। তা হলে প্যাঁচটা কোথায়?'

'আমি যে অনেক হয়ে গেছি।'

'অনেক মানে?'

'অনেকগুলো নাটবল্টু চক্র।'

'সে কী! সেটা কি হয়? প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তো একজনই আছেন এই পৃথিবীটায়।'

'এখন অনেকগুলো।'

'খোলসা করুন।'

'সময়-গাড়ির গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, আমার ল্যাবোরেটরিতে আর একটা আমি বসে রয়েছি।'

'আর একটা আপনি!'

'এক্কেবারে আমি। যন্তরপাতি নিয়ে খুটখাট করছে আর একটা নাটবল্টু চক্র। আমি রেগে গিয়ে বললাম, কে হে তুমি? আমার ল্যাবে ঢোকবার পাস-ওয়ার্ড পেলে কোথায়?'

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। প্রফেসরের গবেষণাগার একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ-বিশেষ। সেখানকার দরজা খুলে যায় শুধু প্রফেসরের গলায় 'চিচিং ফাঁক' শব্দ দুটো শুনলেই। তাতে আমি একটু গজর গজর করেছিলাম বলে আমার গলার আওয়াজও যন্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ফলে, আমার গলাতেও 'চিচিং ফাঁক' ডাক শুনলে দরজা খুলে যায়। যা বলছিলাম। প্রফেসর তাঁর দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করে দেখলেন আর একটা প্রফেসর নাটবল্টু বসে রয়েছে— ইয়ে রয়েছেন। প্রফেসর তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতেই সে— মানে— তিনি অমায়িক হেসে বলেছিলেন, 'আমি প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।'

তারপর যেরকম যেরকম কথাবার্তা হয়েছিল, তা অবিকল লিখে যাচ্ছি।

প্রফেসর: তুমি কেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র হতে যাবে? আমিই তো সে।

ডুপ্লিকেট প্রফেসর: এখন আপনি অনেক।

প্রফেসর: তা কী করে হয়?

ডুপ্লিকেট প্রফেসর: প্রত্যয় না-হয়, কলতলায় ঢুকে দেখে আসুন।

আসল প্রফেসর তখন ল্যাবোরেটরির লাগোয়া কলতলায়, আধুনিক ভাষায় যাকে বলে

টয়লেট, সেইখানে ঢুকে দেখেছিলেন, অবিকল তাঁর মতো দেখতে আর একটা প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফোকলা মাড়ি দেখছে।

উনি এমনই তাজ্জব হয়ে গেছিলেন যে মুখে একটা কথাও বলতে পারেননি। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়ানো প্রফেসর ফিক করে হেসে ফেলে বলেছিল, ইয়ে— বলেছিলেন, 'বিশ্বাস হল তো? এবার লাইব্রেরি ঘরটায় টহল দিয়ে আসুন।'

উনি গেছিলেন লাইব্রেরি ঘরে। দেখেছিলেন, সেখানেও তাঁর দামি দামি দুষ্প্রাপ্য বই হাঁটকাচ্ছেন আর একজন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

এরকম কিম্ভূত কাণ্ড দেখলে যে-কোনও ভদ্রলোকের মাথা বিগড়ে যায়। উনি টলতে টলতে নিজের সিক্রেট চেম্বারে ঢুকে দেখেছিলেন আর একজন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তাঁর গোপন ডাইরি দেখছেন।

তেড়েমেড়ে বলেছিলেন আসল প্রফেসর— 'বলি হচ্ছেটা কী?'

নকল প্রফেসর আর আসল প্রফেসরেব মধ্যে তখন যেরকম বাক্যবিনিময় হয়েছিল, তা এইরকম—

আসল: বলি হচ্ছেটা কী?

নকল: ঝালিয়ে নিচ্ছি গোপন গবেষণার ব্যাপারগুলো।

আসল: কে তুমি?

নকল: তোমার ডুপ্লিকেট।

আসল: সেটা কীভাবে হয়?

নকল: হয়। হয়। এ দুনিয়ায় সব হয়।

আসল: কীভাবে হয়?

নকল: ব্ল্যাকহোলে ঢুকে হোয়াইট হোল দিয়ে বেরিয়ে এলে হয়।

আসল: হোয়াইট হোল কী?

নকল: জানলে তো বলব? হোয়াইট হোল একটা চিররহস্য। আজও অজ্ঞাত। না-জেনে তুমি ঢুকেছিলে কেন?

আসল: ব্ল্যাক হোলটার রহস্য জানতে ঢুকেছিলাম। কিন্তু...

নকল: ব্ল্যাক হোল আরও রহস্যময় হয়ে গেল, এই তো?

আসল: এরকম রহস্য জীবনে দেখিনি। আমি যে খাবি খাচ্ছি।

নকল: খাও। আরও খাও। খেতে খেতে পটকে যাও।

আসল: আমি পটকে গেলে?

নকল: আমিও পটকে যাব।

আসল: নইলে টিকে থাকবে?

নকল: শুধু টিকেই থাকব না, সংখ্যায় বেড়ে যাব। এই মুহূর্তে যাচ্ছি। দুনিয়ায় যেখানে যেখানে তোমার গতিবিধি, সব জায়গায় একটা করে নকল নাটবল্টু চক্র তৈরি হচ্ছে।

আসল: এখন উপায়?

নকল: হা! হা! হা! কোনও উপায় নেই। ব্ল্যাক হোলের কাছে ফের দাবি দেখতে

গেছিলে? এবার মরো। আমরা, এই নকলরা, এবার পৃথিবী ছেয়ে ফেলব।

আসল: ব্ল্যাক ম্যাজিক নাকি?

নকল: এতক্ষণে মাথায় ঢুকেছে? ঘটে বুদ্ধি আছে তা হলে।

আসল: এত নাটবল্টু চক্র গজিয়ে গেলে তো অন্য বৈজ্ঞানিকরা ধাঁধায় পড়বে।

নকল: সেইটাই তো চাই।

আসল: কেন?

নকল: ব্ল্যাকহোলের রহস্য তা হলে আর কেউ ভেদ করতে চাইবে না।

আসল: কী সর্বনাশ!

নকল: পালাও! পালাও! মূর্খ বৈজ্ঞানিক! ব্ল্যাক হোলের ব্ল্যাক মিস্ট্রি আর ব্ল্যাক ম্যাজিকের এই তো শুরু।

প্রফেসর, মানে, আসল প্রফেসর বললেন আমাকে, 'দীননাথ, এখন কী করা যায়?'

আমি বললাম, 'ফের ঢুকে যান।'

'কোথায়?'

'হোয়াইট হোলে।'

'সেটা কোথায় কী করে জানব?'

'টাইম মেশিনের 'লগবুক' দেখে নিন। টাইম রেকর্ড। জার্নি রেকড। সফর পঞ্জি। ব্যাকগিয়ারে চালিয়ে দিন। ব্ল্যাক হোল দিয়ে বেরিয়ে আসুন। দেখুন কী হয়।'

প্রফেসর ঠিক তাই করেছিলেন। আমি গাড়ল হতে পারি, কিন্তু পাঁকে পড়লে ব্রেন বাতলে দেয় পাঁক থেকে বেরোতে হবে কী করে।

প্রফেসরের নকলগুলোকে আর দেখা যায়নি ব্ল্যাকহোল দিয়ে বেরিয়ে আসবার পর। সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নাকে কানে খত দিয়ে প্রফেসর বলেছেন ব্ল্যাকহোল নিয়ে আর গবেষণা নয়। ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন হয়ে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে। মানব গড়তে গিয়ে উনি দানব গড়েছিলেন, আমি গড়ে ফেলেছি আমারই দানব প্রতিমূর্তি। একটা নয়। অনেক। ওরে বাবা, ব্ল্যাক হোলে আর নেই। ব্ল্যাক হোল থাকুক ব্ল্যাক হোলে।'

আজব কাহিনির সমাপ্তি এইখানেই।

ওনারা

সেবার রংচিতার মাঠে গিয়ে শিবু যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তা বলবার নয়।

রংচিতার মাঠটা ওদের পাহাড় থেকে বেশ দূরে। তা মাইল তিনেক তো বটেই। এ অঞ্চলে পাহাড় এই একটাই। পাহাড়ের মাথাটা দিব্যি চ্যাটালো। বেশ কয়েকটা ফুটবল মাঠ বানানো যায় সেখানে।

কিন্তু সেসবের বালাই ওখানে নেই। আছে কেবল বিরাট একটা কেল্লা-প্রাসাদ। চারপাশে বুরুজ, উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের ধারে গভীর খাল। খালের এপারে, পাঁচিলের গা ঘেঁষে আকাশ-ছোঁয়া গাছ।

এ তল্লাটে এত উঁচু গাছ আর দেখা যায় না। শিবুর বাপ-ঠাকুরদা, তাঁদেরও বাপ-ঠাকুরদা দেখে গেছেন গাছগুলোকে এইরকম অটল মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকতে। প্রতিটা গাছই এত উঁচু যেন মেঘগুলোতে গিয়ে ঠেকেছে বলে মনে হয়।

শিবু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল বাবাকে, 'বাবা, এত উঁচু গাছ তো আর কোথাও দেখিনি। শুধু এই পাহাড়েই কেন?'

শিবুর বাবা দিনরাত চুম্বক নিয়ে কী সব গবেষণা করেন। মস্ত ল্যাবরেটরি। অত বড় প্রাসাদের সব ঘরেই কিছু না কিছু চুম্বকের যন্ত্রপাতি বানানো আছে। এমনকী কেল্লার ছাদেও প্রকাণ্ড একটা টেলিস্কোপ আছে। আছে মান মন্দির।

রহস্যময় এই প্রাসাদপুরীতে শিবু থাকে ওর বাবাকে নিয়ে, আর কেউ না। খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধা হয় না। বাবাই সব বানিয়ে দেন। সপ্তাহে একদিন একটা লোক দূর গাঁ থেকে এসে চাল, ডাল, তেল, নুন দিয়ে যায়। আর কেউ এ-পাহাড়ে আসে না। পাহাড় ঘিরে ধূধূ মাঠ যেন দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। খাঁ খাঁ করে চব্বিশ ঘণ্টা। মানুষ তো দূরের কথা, কোনও প্রাণীকেও দেখা যায় না সেখানে।

শিবুর বাবা অন্যমনস্কভাবে বলেছিলেন, 'এ গাছ চিন দেশ থেকে আনা হয়েছে।'

শিবু তো হাঁ, 'এত বড় গাছ চিন দেশ থেকে?'

'বোকা ছেলে। গাছের বীজগুলো আনা হয়েছে। কে যে এনেছে, তা জানি না।'

'নাম কী গাছগুলোর?'

'পাস্তা।'

'পাস্তা গাছ! অদ্ভুত নাম তো? বয়স কত এদের, বাবা?'

'দশ কোটি বছর।'

শুনেই আক্কেল গুড়ুম। গাছেরা দশ কোটি বছর বাঁচে নাকি? তারপর শিবুর বাবাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, দশ কোটি বছর আগে এই গাছ ছিল পৃথিবীতে। তারপর দেখা গেল, তারা আজও রয়েছে চিন দেশে, ক্যালিফোর্নিয়ায়, ইউরোপে কয়েকটা জায়গায়। এক একটা গাছ ৫০০ থেকে ৭০০ ফুট উঁচু। ৫০০০ থেকে ৭০০০ বছর বাঁচে।

শিবু স্তম্ভিত! গাছের বয়স ৫০০০ থেকে ৭০০০ বছর? আর কেউ বললে শিবু বিশ্বাস করত না। কিন্তু বাবা যে অনেক জানেন। বাড়ি-ভরতি বই নিয়ে লেখাপড়া করেন, খুটুর খুটুর করে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করেন আর রাত হলেই ছাদে উঠে টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বাবা জ্ঞান-পাগল হতে পারেন, কিন্তু নজর আছে সব দিকে। শিবুকে পড়াশুনা করতে বসান দু'বেলা, সকালে দু'ঘণ্টা সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা— ঘড়ি ধরে। বাকি সময়টা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে বলেন। গাছপালাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে বলেন।

এ-ব্যাপারেও একদিন শিবু জিজ্ঞেস করেছিল বাবাকে, 'গাছপালা দেখে কী হবে বলো তো? রোজই তো বলো এক কথা।'

চশমাটা খুলে রেখে বাবা বলেছিলেন, 'পৃথিবীর প্রথম বাসিন্দারা হল এই গাছপালা, জীবজগৎ তো এল তারপর, গাছেদের সব কথা এখনও জানা হয়ে ওঠেনি। নতুন গাছ এলেই তাই আমার জানা দরকার। বুড়ো হয়েছি, মাঠে ঘাটে ঘুরতে পারি না, তুই হলি গিয়ে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

শুনে পুলকিত হয়েছিল শিবু। বাবার অ্যাসিস্ট্যান্ট। সাহস পেয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, 'আচ্ছা বাবা, এ তল্লাটে কোনও প্রাণী পর্যন্ত দেখা যায় না কেন? আকাশে পাখি নেই, মাঠেতে পোকামাকড় পর্যন্ত নেই। কেন বাবা?'

বাবা কিন্তু এই প্রশ্নটা সরাসরি জবাব দেননি। শুধু বলেছিলেন, 'গাছেদের ভয়ে হয়তো।'

গাছেদের ভয়ে? পরে অনেকদিন কথাটা নিয়ে ভেবেছে শিবু। হেঁয়ালির মানে ধরতে পারেনি। অরুণাচলের এই অরণ্য অঞ্চলে ঠিক এই জায়গাটিতেই এতবড় ফাঁকা মাঠ কেন, কেন মাঠের সারি সারি প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের মতো এত বড় বড় গাছ, কেন জীবন্ত প্রাণীর দেখা পাওয়া যায় না, বিরাট এই প্রহেলিকার সমাধান করে উঠতে পারেনি কোনওমতেই।

পাহাড়ের ডগা থেকে সে দেখেছে দূরে দিগন্তের কাছে ধোঁয়র মতো বন জঙ্গল আর পাহাড়। সে তো অনেক দূর। বাবা যেতে বারণ করেছেন, তাই যায় না। যেতে মনও চায় না। এই পাহাড়, এই বিরাট লম্বা গাছ আর ধুধু মাঠ যেন ওর একান্ত বন্ধু। এরা নিঃশব্দে ওকে আগলে রেখে দিয়েছে। কাছে টেনে রেখেছে।

শুধু একদিন ও গেছিল রংচিতার মাঠে। বাবাই বলেছিলেন, 'হ্যাঁরে, তোকে যে ঘুরে ঘুরে নতুন গাছপালা দেখতে বলেছিলাম— দেখিস তো?'

'শুধু রংচিতার মাঠটায় যাওয়া হয়নি বাবা।'

'সেকী! ওই দিকেই তো' বলেই, 'কথাটা যেন গিলে ফেললেন বাবা।' শুধু বললেন, 'কাল যাস।'

রাত্রে বাবা রোজকার অভ্যেস মতো ছাদে উঠে গেলেন আকাশ দেখতে। এ সময়ে শিবুর শুয়ে পড়ার কথা। কিন্তু কেন যে মনটা হঠাৎ বাইরের দিকে টানল, ও তা নিজেই জানে না। বিরাট বিরাট গাছগুলো যেন চুম্বকের মতো ওকে টানছে... ডাকছে... কাছে আসতে বলছে।

দানবাকার গাছগুলোর এই আহ্বান ছোটবেলায় অনেকবার টের পেয়েছে শিবু। বড় হয়ে বুঝতে পারে, গাছগুলো পাতা নেড়ে নেড়ে যেন ওকে ডাকে, পত্র মর্মরের মধ্যে দিয়ে যেন খিলখিল করে হাসে। গাছেদের তলায় গেলেই মনটা অদ্ভুত আনন্দে ভরে ওঠে। কখনও ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে।

এরকম অনেকবার হয়েছে। জ্বর হলেই গাছেদের ডাকাডাকি যেন বেড়ে যায়। জ্বর গায়ে শিবু ছুটে যায় পেল্লায় গাছেদের তলায়। ঘুমিয়ে পড়ে ঝরা পাতার বিছানায়। ঘুম ভাঙার পর দেখে, জ্বর আর নেই।

কীসের ভয়, তা আর বাবা বলেননি। শিবুর কিন্তু মনে হয়েছিল, ভয়টা যেন আকাশের কোথাও আছে। তাদের ভয়েই এ অঞ্চলে কেউ থাকে না। তাদের ভয়েই বাবা রোজ ছাদে উঠে টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসে থাকেন।

তা সেই রাতে গাছেদের আহ্বান অণু-পরমাণুতে জাগ্রত হতেই শিবু অস্থির হয়ে উঠেছিল। অমাবস্যার রাত। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবুও বেরিয়ে পড়েছিল বাইরে। দানবিক গাছগুলোর কাছে যেতেই ওরা যেন ওকে ঠেলে দিয়েছিল পাহাড়ের নীচের দিকে— দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি শিবু। গাছেদের এই নীরব হুকুম তামিল না-করেও পারেনি। দৌড়োতে দৌড়োতে নেমে এসেছিল নীচে। তখনও অনেক উঁচু থেকে ঠিকরে আসছে গাছেদের তাড়না— ওকে যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে রংচিতার মাঠের দিকে। একটা নালা পেরিয়ে যেতে হয় বলে ও-মাঠে কখনও যেত না শিবু। কিন্তু অমাবস্যার সেই রাতে শুধু তারার আলোয় পৌঁছোল নালার ধারে... সাঁতরে পেরিয়ে ওপারে উঠে ভিজে জামাকাপড়েই দৌড়ে চলল সামনের দিকে... কোথায় কে জানে।

তার পরেই দাঁড়িয়ে যেতে হল আচমকা। সামনেই একটা বড় গর্ত। গর্তের মধ্যে থেকে অকস্মাৎ একঝলক হলদেটে আলো ঠিকরে উঠেই মিলিয়ে গেল।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেছিল শিবু। গর্তের কিনারায় গিয়ে উঁকি মারতেই দেখেছিল...

একটা ছোট্ট গাছ।

হলুদ আলোয় মোড়া একটা ছোট্ট গাছ। হলুদ আভা যেন গাছটার সর্বাঙ্গ থেকে থিরথির করে কেঁপে বেরুচ্ছে। যে-কোনও মুহূর্তে ঝলক দিতে পারে।

অনেকটা মানুষের মতো গড়ন গাছের গুঁড়িটার। এরকম গাছ জীবনে দেখেনি শিবু। মানুষের যেমন চারটে হাত-পা, এর হাত-পা কিন্তু অনেক। অনেক ডালের মতো কিলবিল করছে গর্তের মধ্যে। পাতার বালাই নেই। গুঁড়ির ওপর দিকে মানুষের মুন্ডুর মতো বিরাট একটা গোলক। স্বচ্ছ। হলুদ আলোটা তালগোল খাচ্ছে তার মধ্যেই।

ওই পর্যন্ত দেখেই সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শিবু। কেননা, যে গাছেদের হুকুমে ওর এখানে আসা, তারাই যেন ওকে ডাকছে... ফিরে যেতে বলছে...

ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ফিরেছিল শিবু। সটান বাবার কাছে। বাবা তখন ল্যাবোরেটরিতে বসে চুম্বকের যন্ত্র নিয়ে খটাংখট করছেন।

ঝড়ের বেগে শিবুকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বাবা চোখ তুললেন, 'কী হয়েছে?'

'রংচিতার মাঠে... একটা গাছ... হলুদ আলো বেরুচ্ছে গা থেকে... অনেকটা মানুষের মতো দেখতে।'

বাবা যেন নির্বিকার। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসেছে ক'দিন আগেই। সেইজন্যেই তোকে বলেছিলাম। চ।'

বাবাকে নিয়ে গর্তের ধারে পৌঁছেছিল শিবু। দূর থেকেই দেখেছিল ঝলকে ঝলকে আলোর স্রোত গর্তের মধ্যে থেকে উঠে ঠিকরে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

ভ্রূক্ষেপ নেই বাবার। যন্ত্রটা অনেকটা বন্দুকের মতো দেখতে। গর্তের দিকে তাক করে বললেন, 'ওহে বীরপুঙ্গব, এসেছ যেখান থেকে, ফিরে যাও সেখানেই। এ-পৃথিবীতে তোমাদের ঠাঁই নেই। গাছ হয়েও তোমরা অনেক সভ্য জানি— এই পৃথিবীর সমস্ত গাছপালা, সমস্ত প্রাণীদেব নিকেশ করে তোমরা তোমাদের সভ্যতার পত্তন করতে চাও এখানে তাও জানি। দশ কোটি বছর ধরে সে চেষ্টা চালিয়ে আসছ পারছ কি? এখানকার গাছেরাই রুখে রেখে দিয়েছে তোমাদের দশ কোটি বছর ধরে। বিশেষ এই ক্ষমতা যাদের আছে পেল্লায় চেহারা নিয়ে আজও তারা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর নানান জায়গায়। গোটা পৃথিবীটাকে তারাই আগলে রেখে দিয়েছে তোমাদের খপ্পর থেকে। ওরাও হয়তো এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে কিন্তু মাটির মায়ায় ওরা এখন এই পৃথিবীর বাসিন্দা। ওরা চায় সবাইকে নিয়ে বাঁচতে। আর তোমরা চাও সবাইকে মেরে বাঁচতে। এ তল্লাটের কাউকে তোমরা তিষ্ঠোতে দাওনি, বেঁচে থাকতে দাওনি। পারোনি কেবল আমাকে আর আমার ছেলেকে মারতে। ওই গাছেরাই ঘিরে রেখে দিয়েছে আমাদের, তোমার গুটি-জীবাণু সেখানে পৌঁছেছে কিন্তু আমাদের ক্ষতি করতে পারেনি, পারবে না এখনও। শোনো হে অন্য গ্রহের বৃক্ষবীর, অবিলম্বে ত্যাগ করো পৃথিবী, কোনও দিনও আর ফিরে আসবে না— গুটিজীবাণু ছড়িয়ে এক্সপেরিমেন্টের চেষ্টা করবে না। যদি এখুনি তা না করো, আমার চুম্বক-বন্দুক দিয়ে তোমাদের পঙ্গু করে দিয়ে রেখে দেব চিড়িয়াখানায়।'

একসঙ্গে একনাগাড়ে বাবাকে কখনও কথা বলতে শোনেনি শিবু। গলার আওয়াজও যে এত গমগমে হতে পারে জানা ছিল না। অন্ধকার ফাঁকা মাঠের দিক হতে দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল সেই চিৎকার। তার পরেই ঘটল সেই বিচিত্র ব্যাপার।

ঝপ করে নিভে গেল গর্তের মধ্যেকার হলুদ আলো। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শুধু দেখা গেল, একটা অন্ধকারের ডেলা যেন কিলবিল করে শুঁড় নাড়তে নাড়তে নক্ষত্রবেগে গর্তের মধ্যে থেকে ঠিকরে এসে ধেয়ে গেল আকাশের দিকে।

একগাল হেসে বাবা বললেন, 'বাড়ি চ, শিবু। ঘুমোবি না?'

বাড়ি ফিরে শিবু দেখেছিল, বাইরের ঘরে বসে রয়েছেন ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন ফোকলা বুড়ো। বাবা তাঁকে দেখেই বললেন সোল্লাসে— 'ঠিক সময়ে এসে গেছেন। চিনেম্যানদের তাড়ানোর জন্যে যে চুম্বক-বন্দুকটা দিয়েছিলেন সেটা দেখাতেই পড়পড়িয়ে পালিয়েছে গাছটা। আজব আবিষ্কার করেছেন বটে। ঢুকুক চিনেম্যান বাহিনী, চুম্বক বন্দুক সব্বাইকে চুম্বক বানিয়ে দেবে চক্ষের নিমেষে।'

শুনে, মুচকি হাসলেন সেই বুড়ো। শিবু পরে জেনেছিল, এই বৃদ্ধই বিশ্বের বিস্ময় প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। আগ্রাসী চিনেম্যানদের মানুষ ম্যাগনেট বানিয়ে দেবেন বলে বানিয়েছেন এই চুম্বক-বন্দুক।

ফলে, অরুণাচল এখন সুরক্ষিত এবং চিনেম্যানরা আতঙ্কিত।

বেলুন-পাহাড়ের বিচিত্র কাহিনি

এ-কাহিনিকে সত্যি কাহিনি বললে টিটকিরি শুনতে হবে। তার চাইতে বরং বিচিত্র কাহিনি বলা যাক। অথবা আজগুবি কাহিনি।

ছোটনাগপুরের জঙ্গলে এমন অনেক অঞ্চল আছে, যা এখনও দুর্গম। এমন অনেক পাহাড় আছে, যা এখনও অজ্ঞাত। বেলুন-পাহাড় তেমনই একটা পাহাড়।

বিচিত্র গড়নের পাহাড়। ঠিক যেন একটা বাটি। বাটির গোলাকার কিনারা হল পাহাড়ের চূড়া। বাটির ভেতরে গভীর জঙ্গল। সেখানে রক্তপলাশের আগুন-হাসি আর মহুয়ার মাতাল-করা বন্যা। লতায় পাতায় সে-অরণ্য এত নিবিড় যে, পাহাড়-চূড়া থেকে দেখলেই জঙ্গলে প্রবেশের আর সাধ থাকে না। মাঝে মাঝে শোনা যায় ধনেশ পাখির ডাক। শম্বর হরিণের রব।

পাহাড়ি অঞ্চলে কত পাহাড়ই না থাকে! নাম থাকে না কারও। এ-পাহাড়েরও নাম ছিল না। কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, রাতারাতি একটা নাম অর্জন করে বসল অখ্যাত সেই পাহাড়।

চাঁদনি রাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মায়াময় হয়ে উঠেছে গহন অরণ্য। বনজ্যোৎস্নার এ-রূপ যে না দেখেছে, সে কল্পনা করতে পারবে না।

সাঁওতালদের প্রাণে পুলক জেগেছে চাঁদের আলোয়। আকণ্ঠ মহুয়া খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়েছে ছেলে-বুড়ো-মেয়ে। হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করেছে গাঁয়ের চত্বরে। সেইসঙ্গে বাজছে মাদল: দ্রিমি— দ্রিমি— দ্রিমি। চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে ওদের কালো কষ্টিপাথরের মতো অঙ্গ বেয়ে। ওরা ঝকঝকে দাঁতে হাসছে, নেশায় আবিল স্বরে গাইছে, আর স্খলিত চরণে নাচছে।

ঠিক এমনই সময়ে তারার চুমকি বসানো ঝিকিমিকি আকাশে দেখা গেল একটা বিচিত্র নক্ষত্র। অগুনতি নক্ষত্রের মধ্যে থেকেও এ যেন অন্য জগতের নক্ষত্র। কারণ এর গতি আছে।

ঝিকমিকে তারার মতোই এককণা একটা বস্তু। অথচ তারা নয়। তারা মিটমিট করে, কিন্তু সরে সরে যায় না। উল্কাও নয়। উল্কা হলে চক্ষের নিমেষে খসে পড়ে আকাশপথে।

কিন্তু আশ্চর্য এই বস্তুটি অতি ধীর গতিতে নামছিল নীচের দিকে। নামছিল বিরামবিহীন

ভাবে। এবং মুহূর্তে মুহূর্তে বিপুল হতে বিপুলতর হচ্ছিল তার আয়তন।

প্রথমে যা ছিল হিরের কুচির ঝিকিমিকি, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পরিণত হল হিরের ডেলায়। দেখতে দেখতে আরও বৃহৎ হল তার আকার। এখন আর হিরের ডেলা নয়— যেন একটা হিরের ফানুস।

নাচে মত্ত সাঁওতালদের চোখকেও এবার আর ফাঁকি দেওয়া গেল না। বিস্ফারিত হল ওদের বিহ্বল চক্ষু। কানাকানি হল অস্ফুটকণ্ঠে, 'চাঁদ নামছে... চাঁদ নামছে!'

অর্থাৎ আকাশের চাঁদ ধরায় অবতীর্ণ হচ্ছে! কিন্তু তাও তো সত্যি নয়! পূর্ণিমার হাসিখুশি চাঁদ ওই তো ঝুলছে কালো আকাশে। এ তবে কোন চাঁদ? পৃথিবীর আকাশে দু'দুটো চাঁদ কি সম্ভব?

বিশাল বস্তুটা ভাসতে ভাসতে আরও নেমে এল। চাঁদ বলে তো মনে হচ্ছে না! এ তো একটা অতিকায় বল... পেল্লায় বর্তুল... দারুণ ঝকমকে... এমন ঝকমকে যে, ঠিকরোনো চন্দ্রকিরণে চোখ যেন ধাঁধিয়ে যেতে চাইছে।

এবার ভয় পেল সাঁওতালের দল। ঝুলে পড়ল চোয়াল। ছুটে গেল নেশা। দু'চোখ চেপে কেউ পড়ল শুয়ে, কেউ হল নতজানু, কেউ দিল চম্পট।

বিশাল বলটা আরও নেমে এল। শব্দহীন ধীর স্থির গতিবেগে ভাসতে লাগল পাহাড়চূড়ায়। চাঁদের আলোয় তার হিরের মতো ঝকঝকে আবরণে মনে হল যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

সে যে কত বড় বল তা আন্দাজ করতে গেলে নাকি মাথা ঘুরে যায়। মস্ত মস্ত প্রাচীন শালতরুর একটা ছোটখাটো জঙ্গল নাকি অনায়াসে সেঁধিয়ে যেতে পারে সেই বলের উদরে।

গাঁয়ের মোড়ল হাঁ হয়ে দেখছিল ভাসন্ত বলের আলোময় চেহারা। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখতে হল না। আচম্বিতে রং পালটাতে লাগল সাদা বলের। দেখতে দেখতে সিঁদুরে হয়ে গেল ভাসন্ত গোলা। রক্তের মতো টকটকে সেই রং দেখে রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল মোড়ল বেচারার। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে বন্ধ করেছিল চোখ।

চোখ খুলেছিল সেকেন্ডকয়েক পরেই। খুলে দেখেছিল উধাও হয়ে গিয়েছে রক্তাক্ত বল। আকাশ ফাঁকা।

সেই থেকে পাহাড়টার নাম হয়ে গেল বেলুন-পাহাড়। মোড়ল লোকটা নিরক্ষর নয়। পেটে বিদ্যে ছিল কিছু। ফানুস বা বেলুন বলতে কী বোঝায়, তা জানত। পাহাড়চূড়ায় ভৌতিক বেলুনের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান— দুটো ঘটনাই সে মনে রাখতে চেয়েছিল পাহাড়ের নাম বেলুন-পাহাড় রেখে।

* * *

সংক্ষেপে বেলুন-পাহাড়ের এই গেল ইতিবৃত্ত। এর পরেই আমরা আসছি মূল কাহিনিতে। সে-কাহিনি বেলুন-কাহিনির চাইতেও লোমহর্ষক, অবিশ্বাস্য এবং আজগুবি।

কারণ, সবুজ বনশীর্ষ আর ধূসর শিখরদেশের শীর্ষে হিরের ফানুস আবির্ভূত হওয়ার ঠিক

এক বছর পরে আর-এক চাঁদনি রাতে প্রাণের সমস্ত চিহ্ন মুছে গেল বেলুন-পাহাড়ের আশপাশে।

সে-রাতেও উল্লাসে মেতেছিল আদিবাসীর দল। বিচিত্র শব্দে উত্তাল বনভূমি ছিল তার

আচম্বিতে নিশীথ রাত্রি খানখান হয়ে গিয়েছিল বিকট চিৎকারে। আর্তকণ্ঠের মরণ চেঁচানি একবার নয়— শোনা গিয়েছে বারবার। বনভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হয়েছে ভয়ার্ত কণ্ঠের কান্না। মুহুর্মুহু ছিন্ন হয়েছে কান্নার রোল— শোনা গিয়েছে অন্যত্র।

শুধু মানুষ কাঁদেনি— কেঁদেছে বনভূমির পশুরাও। তাদের কাতর গজরানিতে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে অরণ্যের নিথরতা।

তারপর একসময়ে স্তব্ধ হয়েছে কান্নার রোল, মুহুর্মুহু গজরানি। শ্মশানের নীরবতা নেমে এসেছে বনভূমির সর্বত্র। মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ধনেশ পাখির কু'ডাক, আর বিরামবিহীন মর্মর ধ্বনি— প্রাচীন শালবীথির দীর্ঘশ্বাস। কেউ জানতেও পারল না চাঁদনি রাতে লতাপাতার রহস্যময় আবছায়া অন্ধকারে কী অবিশ্বাস্য নাটক অভিনীত হয়ে গেল।

পরের দিন বেলুন-পাহাড় ঘিরে কয়েক মাইল পর্যন্ত বনভূমিতে জীবিত প্রাণী একটিও দেখা যায়নি। নিছক মৃত হলেও কথা ছিল। কিন্তু কারা যেন সমস্ত রাত জঙ্গলের পশু আর মানুষদের নিছক নিধন করেই ক্ষান্ত হয়নি— কুচি-কুচি করে কচুকাটা করেছে। খণ্ডবিখণ্ড মৃতদেহ স্তূপাকারে জমে রয়েছে অরণ্যভূমির সর্বত্র।

মানুষ নেই— জানোয়ার নেই। রেহাই পেয়েছে কেবল উড়ন্ত পাখিরা।

রহস্যভেদ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা মাথা ঘামায়নি। কুসংস্কার তাদের অস্থিমজ্জায়। পাইকারি হত্যার পিছনে বেলুন-পাহাড়ের ভুতুড়ে হাত যে আছে, তা অনুমান করে তারা আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েছে। পরের দিনই তল্লাট ছেড়ে চম্পট দিয়েছে ঘটিবাটি জরু-গোরু নিয়ে।

অভিশপ্ত বেলুন-পাহাড়ের সানুদেশ সেই থেকেই পরিত্যক্ত। প্রাণের মায়া সবারই আছে। সুতরাং অপদেবতার থান মাড়াতে কেউ আসেনি।

মায়াকাননের মায়া তিমিরাবৃত থেকে যেত যদি না পারমাণবিক কমিশন সার্ভে টিম পাঠাত সেখানে। সামরিক কারণে একটা গোপন অ্যাটমিক চুল্লি বসাতে হবে গহন অরণ্যে। তাই জমি পর্যবেক্ষণে এসেছিল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি।

এসেই মহা ফ্যাসাদে পড়ল তারা। স্থানীয় অধিবাসীরা শিউরে উঠল কমিটির অভিপ্রায় শুনে। ভুতুড়ে জঙ্গলে পুনর্বসতি! বাস রে! প্রাণ থাকতে নয়!

ফলে, কেউ এল না কমিটির সঙ্গে। কমিটি ব্যঙ্গের হাসি হেসে নিজেরাই প্রবেশ করল রহস্যময় সেই অরণ্যে— প্রাণের চিহ্ন মুছে গিয়েছে যে-বনাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে।

দেখেশুনে হোমরা চোমরা সদস্যরা ঈষৎ বিচলিত হল। যা রটে, তার কিছু বটে। এই সেদিনও যে-অঞ্চল প্রাণের চাঞ্চল্যে মুখরিত ছিল, আজ তা নিষ্প্রভ কেন? কী আছে রহস্যময় ওই বেলুন-পাহাড়ে? চাঁদনি রাতে উড়ে আসা হিরের ফানুস নিছক মহুয়ার নেশায় দেখা মায়া মরীচিকা, না সত্য?

অতএব, গোপন রিপোর্ট যথাসময়ে পৌঁছোল যথাস্থানে। তোলপাড় হল সরকারি মহল। সেখান থেকে কী সূত্রে এবং কার সুপারিশে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রর তলব পড়ল—সে-কাহিনি বলতে গেলে সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনাতে হয়।

বেলুন-পাহাড়ের ভুতুড়ে রহস্য সমাধানে বিজ্ঞানীর তলব পড়েছে শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম, শুধিয়েছিলাম প্রফেসরকে, 'আপনি কি ভূতের ওঝা?'

ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে বলেছিলেন প্রফেসর, 'না হে দীননাথ, ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। শত্রুদেশের গুপ্তচরদের হাত আছে এ-ব্যাপারে, সন্দেহ করছে নয়াদিল্লি।'

'তাতেই বা আপনার কী? আপনি কি গুপ্তচর ধরার বিদ্যায় পণ্ডিত?' আমি অসহিষ্ণু।

'দুর! আমাকে ডাকা হচ্ছে ওই সাদা ফানুসের ধাঁধা সমাধানের জন্যে। তুমি যাবে?'

'কেন যাব না? এরকম একটা থ্রিলিং ব্যাপার। কিন্তু আপনি হালে পানি পেলে হয়!'

'দেখা যাক,' বলে তোবড়ানো গালে ফের খিকখিক করে হাসলেন প্রফেসর।

হাসি শুনে গভীর ভ্রূকুটি করেছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম, বড় দেমাক হয়েছে বুড়োর। ভূতের মার খেয়ে এবার কেরামতি ঘুচবে তোমার।

নিয়তি অলক্ষ্যে তখন হেসেছিলেন। কেননা ভূতপ্রেতের চাইতেও কিম্ভূতকিমাকার যাদের সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম, তারা মানুষ নয় সত্যিই। কোন লোকের জীব, তা এখনও অজ্ঞাত।

সরষেপোড়ায় নাকি ভূত পালায়। কিন্তু সৈন্যসামন্ত, ট্যাঙ্ক, কামান নিয়ে ভূতের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার নজির কোনওদিন শুনিনি। দেখলাম সেই প্রথম। দেখে তো চক্ষু কপালে উঠল আমার।

সে কী এলাহি কাণ্ড! দূরে দেখা যাচ্ছে বেলুন-পাহাড়। নীল আকাশের মাঝে তার উদ্ধত শীর্ষ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিপদের ছায়াও তো কোথাও দেখলাম না।

অথচ, বেলুন-পাহাড় থেকে বহু দূরে ঘাঁটি গেড়েছে সামরিক বাহিনী। গিজগিজ করছে মিলিটারি, বনের সর্বত্র। নিষিদ্ধ অরণ্য অঞ্চল তফাতে রেখে তারা ঘিরে রয়েছে গোটা বেলুন-পাহাড়। ওত পেতে বসে আছে অহোরাত্র। কীসের প্রতীক্ষায়, ঈশ্বর জানেন!

চাঁদের আলোয় যে-বনতল একরাত্রেই শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে, আমি চেয়েছিলাম তার মধ্যে এক চক্কর ঘুরে আসতে। কিন্তু হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সহ মেজর প্যাটন সিং। বললেন, 'খেপেছ?'

'খেপব কেন? ভূতকে আমি পরোয়া করি না। দিনের বেলায় ভূতরা ঘুমোয়।'

'ভূত নয়, ভূত নয়। ভূতের চাইতেও দুঁদে বিপদ। তারা দিনেও জাগে।'

'কারা?'

নিগূঢ় হাসলেন প্রফেসর, 'দেখাই যাক না!'

দেখা গেল সেইদিনই দুপুরবেলা। স্বচক্ষে না-দেখলে সে-দৃশ্য বিশ্বাস করা যায় না।

বেলুন-পাহাড়ের ভেতরে কী রহস্য নিহিত রয়েছে, তা দেখার জন্য একটা সামরিক

হেলিকপ্টার উড়েছিল আকাশে। সুপ্রাচীন শালতরুর শীর্ষে বনবন করে ঘুরছিল হেলিকপ্টারের চাকা। অরণ্যের মাথা দিয়ে দূর হতে দূরে ভেসে যাচ্ছিল ঘুরন্ত প্রপেলারের নিনাদ।

আমি সকৌতুকে দেখছিলাম এঁদের বিপুল প্রচেষ্টা। মশা মারতে কেউ কামান দাগে না। কিন্তু এঁরা দেখছি তারও এককাঠি ওপরে যান। হেলিকপ্টার, কামান, ট্যাঙ্ক নিয়ে এসেছেন ভুতুড়ে পাহাড়-বনের দখল নিতে।

তখন কি ছাই জানতাম, সামরিক বাহিনীর গোপন রিপোর্ট কতখানি ভয়াবহ। ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো নয়, গুপ্তচর-অন্তর্ঘাতী নয়— তার চাইতেও সাংঘাতিক।

টের পেলাম একটু পরেই। ঠিক যখন উড়ন্ত চাকতি-বোমার বিস্ফোরণে নিমেষমধ্যে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল অত বড় হেলিকপ্টারটা!

ঘটনাটা ঘটল ঠিক এইভাবে:

শালতরুর মাথা দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক ফড়িঙের মতো স্বচ্ছন্দে উড়ে গেল আকাশযান। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এল তার আকৃতি। ছোট হতে হতে যখন বিন্দুর মতো হয়ে এল, তখন আমরা বার করলাম দূরবিন। পিছনের পটে নীল আকাশের বুকে বেলুন-পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বিশাল গঙ্গাফড়িঙের মতো উড়ন্ত হেলিকপ্টার পৌঁছোল পাহাড়চূড়ায়।

আমরা রেডিয়ো খুলে বসে আছি। ব্যবস্থা হয়েছে, চালক একাধারে তিনটি কাজ করবে। হেলিকপ্টার চালু রাখবে, ক্যামেরায় ছবি তুলবে এবং ট্রান্সমিটারে অনর্গল বলে যাবে চোখের সামনে কী দেখছে।

কিন্তু পাহাড়চূড়ায় পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটি কাজের কোনওটিই করা গেল না। কেননা, আচম্বিতে বেলুন-পাহাড়ের অভ্যন্তর থেকে উড়ে এল একটা বিচিত্র বস্তু।

উড়ন্ত পিরিচ! ফ্লাইং সসার!

দূরবিনের কাচে আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম সেই আষাঢ়ে দৃশ্য। ফ্লাইং সসার! এতদিনে গালগল্প বিস্তর শুনেছি— স্বচক্ষে বহুদূর থেকেই দেখলাম সেই উড়ন্ত পিরিচের ঘূর্ণ্যমান আকৃতি। প্রখর রোদে সোজা হেলিকপ্টারের দিকে ধেয়ে গেল পিরিচ।

এবং সবেগে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টারের ওপর।

নিমেষে ঘটল বিস্ফোরণ। প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ। থরথর করে কেঁপে উঠল সমগ্র বনভূমি। বিস্ফোরণের শব্দ খানিক পরে ভেসে এলেও সেই মুহূর্তে দেখলাম ব্যাঙের ছাতার মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে বেলুন-পাহাড়ের শীর্ষে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওয়ায় উড়ে গেল তাল তাল ধোঁয়া। কিন্তু উড়ন্ত পিরিচ আর হেলিকপ্টারের কোনও চিহ্ন ধারেকাছে দেখা গেল না। দুটো বস্তুই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেছে শূন্যে।

অর্থাৎ, উড়ন্ত পিরিচ নিছক পিরিচ নয়— পিরিচ-বোমা!

সাজ সাজ রব পড়ে গেল শিবিরে-শিবিরে।

বেলুন-পাহাড়ের উপকথা তা হলে নিছক কপোলকল্পনা নয়। সাঁওতালদের আষাঢ়ে গল্প নয়। চাঁদনি রাতে ঝকঝকে ফানুসের অবতরণ-কাহিনিও মিথ্যে নয়— মহুয়ার নেশায় ভুল দেখা নয়।

কিন্তু ওরা কারা? কাদের উদ্ভাবন এই প্রলয়ংকর পিরিচ-বোমা? কেন তারা ঘাঁটি গেড়েছে বেলুন-পাহাড়ের গহন বনে? কী তাদের অভিসন্ধি?

সবচাইতে বড় কথা, রাতারাতি এ-তল্লাটের যাবতীয় প্রাণীহত্যাও কি তাদেরই কুকীর্তি? কিন্তু তার সাক্ষী কোথায়? কেনই-বা এই পাইকারি হত্যা? বেলুন-পাহাড়ের ভেতরকার বিবর ঘাঁটি সুদৃঢ় এবং দুর্গম রাখাই কি মূল উদ্দেশ্য? কিন্তু কেন? কী আছে বেলুন-পাহাড়ের ভেতরে? ওরা কারা? কী চায়?

শত-সহস্র প্রশ্ন সহস্রনাগের মতোই পাক দিয়ে ধরল আমাদের চিন্তাধারা। ভূত নয়, প্রেত নয়— স্বচক্ষে দেখা গেল বিজ্ঞানের নবতম বিস্ময় এদের করায়ত্ত। মারাত্মক মারণাস্ত্রে সেজে ওরা বেলুন-পাহাড়ের ঘাঁটি আগলাচ্ছে। পাছে কেউ গুটি গুটি পৌঁছে যায় পাহাড়ে, দেখে ফেলে ওদের কীর্তিকলাপ— তাই রাতারাতি দ্বিপদ, চতুষ্পদ সমস্ত প্রাণী নিধনেও ওদের অরুচি নেই। শ্মশান বনভূমি আগলাচ্ছে ওদের গুপ্তচক্র। আকাশপথও সুরক্ষিত। তবে কি চম্পট দেওয়াই শ্রেয়?

সত্যি কথা বলতে কী, আমার সমস্ত বীরত্ব উবে গিয়েছিল চোখের সামনে হেলিকপ্টারের শূন্যে বিলীন হওয়া দেখে! পিরিচ-বোমার কল্পনাতীত শক্তি আমার নার্ভ নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। মনে মনে ভাবছিলাম, অশরীরী ভূতের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে রাজি আছি, কিন্তু শরীরী এই বিভীষিকাদের সঙ্গে নয়। পৈতৃক ধড়টাকে কচুকাটা অবস্থায় ছোটনাগপুরের জঙ্গলে ফেলে যাওয়ার চাইতে মানে মানে কেটে পড়াই ভাল।

করতামও তাই। টিটকিরি গায়ে মাখতাম না। পরের দিন ভোরেই লম্বা দিতাম ঘরের দিকে।

কিন্তু রাত পোহানোর আগেই ঘটল নতুন এক বিভীষিকা। যে-কোনও পালোয়ানের ধাত ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ভয়াবহ সেই ঘটনা। আমি তো কোন ছার!

মানুষ-জন্তু কচুকাটা হওয়ার রহস্য ভেদ করলাম আমি নিজেই— প্রাণটা হাতে নিয়ে।

রাত হয়েছে। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র অতি গুহ্য মন্ত্রণায় ব্যস্ত সামরিক হোমরাচোমরাদের সঙ্গে। আমি আমার শিবিরে বসে হরিনাম জপ করছি। সমগ্র বনভূমি থমথম করছে। সূচিভেদ্য সেই নীরবতার সঙ্গে তুলনা চলে না কোনও কিছুরই। বাতাস নেই— বনমর্মরও নেই।

শ্বাসরোধী সেই স্তব্ধতায় আমারও টুঁটি যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছে। তাই ক্যাম্পখাটে পা দুলিয়ে বসে কম্বল দিয়ে মাথা পর্যন্ত মুড়ে রেখেছি। বেরিয়ে আছে শুধু নাক আর চোখ। মনে মনে হিসেব রাখছি সময়ের। কতক্ষণে ভোর হবে— সেই প্রত্যাশা।

অকস্মাৎ একটা সরসর শব্দ শুনলাম। খুব ক্ষীণ শব্দ। বনের মধ্যে ক্যাম্প খাটিয়ে থাকতে গেলে এমন শব্দ হামেশাই শুনতে হয়। যারা অভ্যস্ত, তারা চমকায় না। কিন্তু আমি চমকে উঠলাম। ভয়ে কাঠ হয়ে ছিলাম বলেই সামান্য সরসরানি আমাকে অতটা চমকে দিয়েছিল এবং দিয়েছিল বলেই সে-যাত্রা আমি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম।

আর, আমার টুঁটি।

সরসরানির কারণ অনুসন্ধান করতে স্বভাবতই এদিক-ওদিক তাকিয়েছিলাম। প্রথমেই চোখ গিয়েছিল তাঁবুর প্রবেশপথের দিকে। সেখানে হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোয় বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। এবার তাকালাম পাশের জমির দিকে। ক্যাম্পখাটের পিছনদিকে। ঘাসের ওপর সামান্য ধুলো ওড়া নজরে পড়ল। তাঁবুর তলা দিয়ে একটা সরলরেখা বরাবর ধুলোর স্তর যে-কোনও কারণেই হোক চঞ্চল হয়েছে। তাই সামান্য ধুলো উড়ছে।

ধুলো ওড়ার সরলরেখাটা এসেছে আমার ক্যাম্পখাটের নীচের দিকে।

দেখেই অজানা আতঙ্কে আঁতকে উঠেছিলাম।

আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল কী একটা বস্তু আমার পায়ের গোছ বেয়ে উঠে এসেছিল হাঁটুর ওপর।

চমকে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম আমি। চক্ষের পলকে ক্লেদাক্ত কীটের মতো কনকনে ঠান্ডা বস্তুটা হাঁটু ছাড়িয়ে উঠে এসেছিল উরুর ওপর পাতা কম্বলের ওপর। সেখান থেকে বুকের ওপর দিয়ে গলার কাছে। এবং পরক্ষণেই ফ্যাঁস করে একটা শব্দ হল।

ঝটিতি হাত চালিয়েছিলাম। হাতের এক ঝটকায় আগন্তুক কীটটি ছিটকে পড়েছিল ক্যাম্পখাটের ওপর।

তৎক্ষণাৎ বিস্ফারিত চোখে দেখেছিলাম দুটি দৃশ্য।

প্রথম, গলার কাছে আমার কম্বল কেটে ফালাফালা হয়ে গেছে। চকিতে বুঝলাম, কম্বল না-থাকলে আমার গলার অবস্থা ওইরকম হত। অলক্ষ্য আততায়ীর প্রথম চোট গিয়েছে কম্বলের ওপর দিয়ে।

দ্বিতীয়, ক্যাম্পখাটের ওপর পড়ে একটা বিদঘুটে বস্তু। অনড় নয়— সচল। ছোট্ট একটা ইস্পাতের পিং পং বলের দু'পাশে দুটো ব্লেড লাগালে যা হয়— বিচিত্র বস্তুটা অবিকল তাই। বলটা বনবন করে ঘুরছে— সেইসঙ্গে ঘুরছে দু'পাশের ক্ষুরধার ব্লেড। বাঁই বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে ক্যাম্পখাট থেকে এগিয়ে আসছে কিনারার দিকে।

এক পলকে এর বেশি দেখার সাহস আমার হয়নি। ঘুরন্ত ছুরিওলা সচল পিং পং বলটা একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে— কিন্তু দ্বিতীয়বার আর হবে না। ওর তেড়ে আসার ধরন দেখেই রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল আমার। ঘুরন্ত ওই ছুরি ফের যদি টুঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

একলাফে গিয়ে পড়েছিলাম তাঁবুর প্রবেশপথের সামনে। সেখান থেকে বেসুরো গলায় বিকট এক চিৎকার ছেড়ে বাইরে।

বাইরে গিয়েই ঠ্যাং দুটো যেন স্ক্রু-আঁটা হয়ে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে । থ' হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। এ কী দৃশ্য দেখছি আমি!

শিবিরের সামনেই চিৎপটাং হয়ে পড়ে ছিল শিবির-প্রহরী। ধারালো অস্ত্রে ছিন্ন টুঁটি। শুধু তাই নয়। সারা গায়ে পিলপিল করছে অনেকগুলো ঘূর্ণ্যমান পিং পং বল। শুধু ঘুরছে নয়— ঘুরন্ত ছুরির ঘায়ে খণ্ড খণ্ড করছে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। রক্তে ভেসে গেছে তলার ঘাস।

আমি স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেই দুটো ঘুরন্ত বল লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে ছিটকে এল আমার দিকে। চলার পথে কুচকুচ করে কেটে উড়ে গেল লম্বা লম্বা ঘাস। উড়তে লাগল ধুলো।

আর আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। কালান্তক মৃত্যুদূতদের এগিয়ে আসতে দেখেই ফিরে পেলাম সংবিৎ। ভাঙা গলায় বুকফাটা বিকট চিৎকার করে ছুটেছিলাম প্রফেসরের মন্ত্রণা শিবিরের দিকে।

পরে শুনেছিলাম, আমার সেই ভয়ার্ত চিৎকার নাকি পাগলা-ঘণ্টির কাজ করেছিল ভয়ংকর সেই রাতে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, ছুটে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। ঘুরন্ত বলের ঘুরন্ত ছুরিকাঘাতে টুঁটিকাটা এবং কচুকাটা হওয়ার আগেই দেখেছিল শিবির-প্রহরীর খণ্ডবিখণ্ড লাশ।

আমার শিবিরটাই ছিল বেলুন-পাহাড়ের দিকে প্রথম সারির প্রথমে। তাই প্রথম হানা এই শিবিরেই ঘটেছিল। আমি মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম নেহাত পরমায়ু ছিল তাই। বেঁচে গিয়েছি স্রেফ কপালজোরে। কিন্তু বাঁচেনি বেচারি প্রহরী।

ছুটতে ছুটতে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও এসেছিলেন। বড় বড় সার্চলাইটের আলোয় দিন হয়ে গিয়েছিল সামনের জমি।

ঘুরন্ত বল-বাহিনীকে দেখা গেল ঠিক তখনই। সংখ্যায় কত হবে? হাজার? লক্ষ? নিযুত? কোটি? ধুলোর ঘূর্ণিঝড় তুলে পঙ্গপালের মতো ওরা বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে তো আসছেই। আসছে... আসছে... আসছে...!

কী করবে সৈন্যবাহিনী? লড়াই কাদের সঙ্গে? কত বন্দুকের গুলি খরচ করলে এদের রোখা যাবে? কিন্তু একটিও যদি কোনওমতে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসে, নিমেষে টুঁটি হবে

অতএব মেজর বিহ্বল চোখে তাকালেন প্রফেসরের পানে। সময় অতি অল্প। কয়েকটা ঘুরন্ত বল এসে গেছে কয়েক গজের মধ্যে। রিভলভার তুলে ফায়ার করলেন মেজর। একটা বল ভেঙে উড়ে গেল। বাকিগুলো বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো না-করে এগিয়ে এল মেজরের পানে...

'পালান।' চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর, 'এগিয়ে যাক শুধু ট্যাঙ্ক!'

সুতরাং শেষপর্যন্ত আমার পন্থাই অনুসরণ করতে হল গোটা বাহিনীকে। চম্পট! চম্পট! চম্পট! গোলা, বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে টেনে দৌড়। ঝোপঝাড় টপকে খানাখন্দ ডিঙিয়ে শুধু দৌড়! দৌড়! দৌড়! দৌড়!

তবে হ্যাঁ, সচল দুর্গরা বিপুল রোষে এগিয়ে গিয়েছিল বেলুন-পাহাড়ের দিকে। ট্যাঙ্কবাহিনীর অগ্রগতির সামনে পিষ্ট হয়েছিল ঘুরন্ত বলেরা হাজারে হাজারে। এগিয়েছে আর মুহুর্মুহু গোলা নিক্ষেপ করেছে ট্যাঙ্কের দল। গুরুগম্ভীর নির্ঘোষে বারেবারে কেঁপে উঠেছে বনভূমি।

প্রত্যুত্তরে কিন্তু একটি পালটা কামানও গজরায়নি। এমনকী বেলুন-পাহাড়ের গোপন বিবর থেকে উড়ন্ত পিরিচ-বোমাও উড়ে আসেনি।

শুধু দেখা গিয়েছিল একটি দৃশ্য।

শেষ দৃশ্য!

আচম্বিতে বেলুন-পাহাড়ের চূড়ায় যেন আগুন ধরে গিয়েছিল। টকটকে লাল রঙের

আশ্চর্য খেলা শুরু হয়েছিল পাহাড়ের ওপরকার আকাশে-বাতাসে। সে এক অবিশ্বাস্য হোলিখেলা।

পরক্ষণেই রক্তবর্ণের অতিকায় একটা গোলক সিধে উঠে এসেছিল শীর্ষ ছাড়িয়ে। শুধু গোল বললে পুরো বলা হয় না— যেন একটা খুদে ভূ-গোলক। পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড। লোহিত এবং ভয়াল।

দেখতে দেখতে অনেকটা শূন্যে উঠে পড়েছিল অতিকায় গোলক। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল রক্তবর্ণ। সে জায়গায় তারার আলোয় ঝিকমিক করে উঠেছিল হিরের মতো উজ্জ্বল সাদা আবরণ।

হিরের ফানুস! নিরক্ষর সাঁওতালদের কথা তা হলে সত্যি? উড়ন্ত গোলা দেখে ওরাও 'হিরের ফানুস' নামকরণ করেছিল। যদিও জিনিসটা হিরে নয়— হিরের মতো ঝকঝকে কোনও ধাতু!

ক্রমশ বেগ বাড়ছে ভাসন্ত গোলার। ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে আকৃতি। নিঃশব্দে, কিন্তু অসম্ভব গতিবেগে শ্বেত-গোলক এবার বুঝি তারার রাজ্যে পৌঁছেছে। অগুনতি নক্ষত্রের মাঝে যেন চিকমিক করছে আরও একটি নক্ষত্র।

বেগমান নক্ষত্র— স্থির নয়।

আমরা সবাই হাঁ করে দেখছিলাম— কল্পনাতীত এই দৃশ্য।

প্রফেসর বললেন, 'স্পেসশিপ।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'ব্যোমযান। কিন্তু কোন গ্রহের?'

'জানি না।' বললেন প্রফেসর, 'তবে শিগগিরই হয়তো জানবে। কেননা, ওরা আবার আসবে।'

'কী করে জানলেন?' মেজরের প্রশ্ন।

'ওরা গোপনে প্রস্তুত হচ্ছিল গোপন ঘাঁটিতে। অতর্কিতে আমরা হানা দিয়ে ওদের বিরক্ত করেছি। ওরা নির্বোধ নয়। আমরা প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছি— ওরা খবর পেয়েছে। তবুও ওরা চলে গেল। কেন? না, ফিরে এসে ওদের উদ্যোগপর্বে আবার আমরা বাধা দিতে পারি নতুন করে। সুতরাং—'

'এখনকার মতো চম্পট প্রদান। কিন্তু অচিরে বীরবিক্রমে প্রত্যাবর্তন। কেমন, তাই তো?' বলি আমি। উড়ন্ত গোলার পলায়নে আমার লুপ্ত সাহস ফিরে এসেছিল বলেই রসনায় সুন্দর সুন্দর কথাগুলো এসে গেল।

ফোকলা হেসে প্রফেসর বললেন, 'যা বলেছ! তা হলে এবার ফিরে যাওয়া যাক।'

'কোথায়?'

'অকুস্থলে।'

'কেন? মরতে?' সন্ত্রস্ত কণ্ঠ আমার।

'না, না, মরতে কেন?' অমায়িক কণ্ঠ প্রফেসরের, 'ওদের মরণ দেখতে।'

'কাদের মরণ? কী বলছেন কী?' মেজর এবার কণ্ঠ চড়ালেন।

'ওই তো, ওই ঘুরন্ত বলগুলোর,' বলে আর দাঁড়ালেন না প্রফেসর। হাঁটা দিলেন ফেলে

আসা বনতলের দিকে— যেখানকার জমিতে লাখে লাখে ঘুরন্ত ছুরি হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের টুঁটি।

আমি প্রায় ককিয়ে উঠে বলেছিলাম, 'প্রফেসর, আপনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেল? ওরা যে সাক্ষাৎ মৃত্যু?'

'তোমার মুন্ডু। ওরা মৃত্যুর দূত। স্বয়ং মৃত্যু ব্যোমযানে চেপে যখন পলাতক, তখন দূতগুলোর একটা ব্যবস্থা করেই গেছে। দেখাই যাক না ব্যবস্থাটা কী।'

অগত্যা গুটি গুটি যেতে হল আমাদের সকলকেই। যতই এগিয়েছি, ধড়াস ধড়াস করেছে বুক, শুকিয়ে গেছে তালু। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করেছি এই বুঝি শুকনো ঘাসে ধুলো ছিটিয়ে এগিয়ে এল ঘুরন্ত ছুরি... যাদের লক্ষ্য জীবিত প্রাণীর টুঁটি।

টুঁটির ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়েও কিন্তু আমার টুঁটি কাটা যায়নি— এই কাহিনিই তার প্রমাণ। যদিও ওদের ফের দেখেছিলাম। লাখে লাখে দেখেছিলাম। সমগ্র বনস্থল আকীর্ণ হয়ে ছিল ওদের নিশ্চল দেহে।

হ্যাঁ, নিশ্চল। 'নিষ্প্রাণ' শব্দটা প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। কেননা, ওরা কেউ প্রাণীস্থানীয় নয়, যন্ত্র। নিছক যন্ত্র।

লাখে লাখে যান্ত্রিক বলে ছেয়ে ছিল সারা অরণ্য। তবে জোড়া ছুরি ঘুরিয়ে পাকসাট দিচ্ছিল না একটিও।

একটি বল তুলে নিয়েছিলেন প্রফেসর। দেখেছিলেন বিচিত্র এক ধাতুতে গড়া ওদের দেহ। ফাঁপা বল। বেবাক ফাঁপা। দু'পাশে দুটি শাণিত ছুরিকা। শূন্যগর্ভ বলটা কীসের শক্তিতে ঘুরেছে, কার হুকুমে টুঁটি লক্ষ্য করে তাড়া করেছে এবং অকস্মাৎ এখন শক্তিহীন হয়ে কেনই-বা লাখে লাখে পড়ে রয়েছে, এ-প্রহেলিকা আজও প্রহেলিকাই রয়ে গিয়েছে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র শুধু মাথাই চুলকেছেন, জবাব দিতে পারেননি। তবে তিনি আজও প্রতীক্ষা করে আছেন।

এ-প্রতীক্ষা ওদের ফিরে আসার।

রঙিন কাচের জঙ্গল

প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল রঙিন কাচের গাছপাতা।

খবরের কাগজের পেছনের পাতায় ছোট্ট একটা খবরে জানলাম এক আজগুবি কাহিনি। আরাবল্লীর গহন অরণ্যে নাকি আশ্চর্য এক জাতের গাছ দেখা যাচ্ছে। রঙিন ক্রিস্ট্যাল দিয়ে মোড়া গাছের ডাল পাতা সব কিছু রংবেরঙের কাচের মধ্যে দিয়ে পাতার শিরা স্পষ্ট দেখা যায়।

কাচের গাছের অদ্ভুত কাহিনি হাসতে হাসতে শুনিয়েছিলাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে। কাহিনির খানিকটা শুনেই উনি এমন চমকে উঠলেন যে আমিও চমকে উঠলাম।

বললেন, 'সব্বোনাশ। ইন্ডিয়াতেও উৎপাত আরম্ভ হল।'

উৎপাত! উৎপাত আবার কীসের? ধরলাম প্রফেসরকে। উনি তখন নিউইয়র্ক টাইমস-এর কাটিং দেখালেন আমাকে। মার্কিন সরকার খবরটা প্রফেসরকে পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে নেমন্তন্ন জানিয়েছে মিয়ামির জঙ্গলে। সরকারি কৃষি বিভাগের পায়াভারী বৈজ্ঞানিকরা নাকি হালে পানি পাচ্ছে না। জঙ্গলে এ কী উপদ্রব শুরু হয়েছে! নতুন ধরনের পোকামাকড়ের উৎপাত? না, অন্য কিছু? গাছগুলো ক্রমে ক্রমে নাকি রঙিন ক্রিস্টালে মুড়ে যাচ্ছে। অতএব বিশেষজ্ঞদের একটা অভিযান যাচ্ছে মিয়ামির জঙ্গলে। প্রফেসর যদি সময় করে আসতে পারেন, বড় উপকার হয়।

থাইল্যান্ড সরকারের আরও একটা নেমন্তন্ন পত্র দেখালেন প্রফেসর। কাম্বোডিয়ার জঙ্গলে নিশ্চয় শত্রুপক্ষ বিষ ছড়িয়ে গিয়েছে। জঙ্গল পাহাড় বাড়ি ঘরদোর সব রঙিন কাচে মুড়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা আজগুবি মনে হলেও সত্যি। অতএব প্রফেসর যদি কাইন্ডলি পায়ের ধুলো দেন কাম্বোডিয়ার মন্দিরময় জঙ্গলে...

'যেখানে যত ভজকট ব্যাপার, সেইখানেই কি প্রফেসর নাটবল্টু চক্রর ডাক পড়ে,' বললাম আমি। 'কবে যাচ্ছেন?'

'কোথায়?'

'মিয়ামি।'

'মাথা খারাপ। ইন্ডিয়ায় উৎপাত এসে পৌঁছেছে, আর আমি দৌড়োব আমেরিকায়। ছোঃ!'

বলতে না বলতেই নয়াদিল্লির জরুরি তলব পৌঁছোল প্রফেসরের হাতে।

টনক নড়েছে ভারত সরকারের!

কাম্বোডিয়া আর মিয়ামির জঙ্গলে রহস্যজনক কাণ্ডকারখানা অজানা নেই সরকারি কর্ণধারদের। বিলিতি ম্যাগাজিন, বিলিতি কাগজ তাঁদেরকেও পড়তে হয়। কিন্তু রঙিন কাচের উৎপাত যে শেষ পর্যন্ত ভারতেও শুরু হবে, তা ভাবা যায়নি। এরপর সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে আরাবল্লীর অরণ্যে রঙিন গাছপাতার ফলাও কাহিনি।

বিলেতে যা হয়, ভারতে তার অনুকরণ না-করলে প্রগতিশীল হওয়া যায় না। সুতরাং মার্কিন সরকারের কৃষি বিভাগ যখন মিযামির জঙ্গলে গবেষকদের পাঠাচ্ছেন, তখন এ-দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরাও যাবেন না কেন আরাবল্লীর জঙ্গলে? তাই জোর তোড়জোড় চলেছে বিভিন্ন মহলে। রাষ্ট্রসংঘ থেকেও বিজ্ঞানীরা আসছেন। এহেন জ্ঞানীগুণী দঙ্গলে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র হাজির না-থাকলে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নাকি মণিহারা ফণী হয়ে থাকতে হবে। কাজেই প্রফেসর যদি বাক্সপেঁটরা গুছোতে শুরু করেন...

প্রফেসর বললেন, 'দীননাথ, তুমি নিশ্চয় আকাট মূর্খ নও।'

শুনে আহত হলাম। পরপর কয়েকটা পিলে-চমকানো আবিষ্কারের পর আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে প্রফেসরের মাথা ঘুরে গিয়েছে। অহংকারও খুব বেড়েছে।

মুখ গোঁজ করে বললাম, 'কলেজে পড়েছি।'

'আজকালকার কলেজ মানে সেকালকার পাঠশালা। যাক গে, রঙিন কাচের উৎপাতকে এরা যতটা সহজ ভাবছে, ততটা সহজ নয় হে। এর পেছনে মহাশূন্যের কারসাজি আছে বলে মনে হয়।'

আমি তো হতভম্ব, 'বলেন কী? মহাশূন্যের কী ইন্টারেস্ট আছে আরাবল্লী, মিয়ামি আর কাম্বোডিয়ার জঙ্গল নিয়ে?'

'এইজন্যেই আগেভাগে যাচাই করে নিলাম তুমি আকাট মূর্খ কি না। বলি অ্যানড্রোমেডা নক্ষত্রপুঞ্জর নাম শোনা আছে?'

'ভারী একটা প্রশ্ন করলেন। সেবার আপনার সঙ্গে মাউন্ট পালোমারের দুশো ইঞ্চি হেল টেলিস্কোপে নিজের চোখে দেখে এলাম না? অ্যানড্রোমেডাকে কেন 'দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ড' বলা হয়, নিজের চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম কি? মহাশূন্যে ভাসমান লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র—'

'থাক পাণ্ডিত্য দেখাতে হবে না। আমাদের ছায়াপথের সবচেয়ে কাছের ছায়াপথ হল অ্যানড্রোমেডা। কেমন? আমাদের ছায়াপথের সঙ্গে অ্যানড্রোমেডার মিল আছে প্রচুর। সম্প্রতি সেখানে কিছু গন্ডগোলের খবর এসেছে মাউন্ট পালোমারে।'

'বলেন কী? অ্যানড্রোমেডাতেও গন্ডগোল?'

'রাতারাতি বেশ কিছু নক্ষত্রকে উধাও হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে অ্যানড্রোমেডার 'পপুলেশন ওয়ান' অঞ্চলে।'

'নিশ্চয় ওরা 'নোভা'। হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ফেটে গিয়ে মিলিয়ে যাওয়া তারা।'

'ওহে দিগ্‌গজ, 'নোভা-তারা'রা রাতারাতি মহাকাশ থেকে উধাও হয়ে যায় না। অনেক

সময় নেয়। প্রায় রাতারাতি ফেটে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার ঘটনা একবারই ঘটেছিল— ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে। মিনেসোটা ইউনির্ভাসিটির ডক্টর লোটেন ছবি তুলেছিলেন সেই তারকার।'

'তাই নাকি?' ঢোঁক গিললাম আমি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই। এবার সেই রহস্যজনক অন্তর্ধান বারবার দেখা যাচ্ছে অ্যানড্রোমেডায়। বিশাল অঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য নয় কি?'

'কেন আশ্চর্য হব?' নেহাত উজবুকের মতোই জিজ্ঞেস করে ফেলি আমি।

'বললে কি বুঝবে? অ্যান্টিম্যাটার, অ্যান্টিটাইম, অ্যান্টিগ্যালাক্সি নিয়ে যদি লেকচার ঝাড়ি, মুন্ডু ঘুরে যাবে, তবু মাথায় ঢুকবে না। শুধু জেনে রেখো, জগতে কিছুই ফেলা যায় না। এক জায়গায় যার বিনাশ, অন্য জায়গায় তার আবির্ভাব।'

স্বীকার করছি, প্রফেসরের জ্ঞানগর্ভ বক্তিমের 'গ'ও বুঝিনি। যদি কেউ বুঝতে চাও, প্রফেসরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারো। ঠিকানা দেব।

এখন হোক, রঙিন কাচের জঙ্গল কাহিনি।

জয়পুর এয়ারপোর্ট থেকে সোজা আরাবল্লী রেঞ্জে গেলাম দল বেঁধে। মোটরবাসের বিরাট সেই কনভয় দেখে রাজপুতানিরা হাঁ হয়ে গেল। মুখ উঁচু করে উটগুলো সুদ্ধ থমকে রইল।

আরাবল্লী নামে যেমন ভয়ানক, চেহারাতেও তাই। দূর থেকেই ভয় লাগে। কালো কর্কশ বন্য। এই না হলে পাহাড়। রানা প্রতাপ এই আরাবল্লীতেই পালিয়ে বেড়িয়েছেন। বীর বটে!

কনভয়ের পথ আটকাল মিলিটারি ট্রাক। স্টেনগান হাতে আরাবল্লীর মতোই ভয়ংকর চেহারার কয়েকজন সৈন্য পথ রুখে দাঁড়াল। গাড়ি আর যাবে না।

বলে কী! তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। সরকারি অতিথিদের এত বড় অপমান। সৈন্যদের ধরে তিনি এই মারেন কি সেই মারেন। অবস্থা দেখে আমি দৌড়ে গেলাম। অফিসারকে বুঝিয়ে বললাম, আমরা কারা।

বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিল মিলিটারি অফিসার, 'আপনাদের ভালর জন্যেই বলছি, আর এগুবেন না। কাচের জঙ্গল ক্রমশ এগিয়ে আসছে।'

'কাচের জঙ্গল এগিয়ে আসছে!' প্রফেসর যেন ভীষণ ভাবিত হয়ে পড়েন। 'কত তাড়াতাড়ি আসছে?'

'কত তাড়াতাড়ি, তার হিসেব রাখব, না আপনাদের ঠেকাব?' মিলিটারি মেজাজে তেড়ে উঠল মিলিটারি অফিসার। 'এই দেখুন একে, কথা না শুনে রাত কাটিয়েছিল বিপজ্জনক এলাকায়। ভোরবেলা মানুষটাকে পেলাম বটে, কিন্তু এইভাবে।'

ট্রাকে শোয়ানো ছিল মানুষটা। শুধু মানুষটা বললে সব বলা হয় না— রঙিন কাচের মানুষ বললে খানিকটা বোঝা যায়।

রঙিন কাচের গাছপাতা দেখতে এসে সেই প্রথম দেখলাম রঙিন কাচের মানুষ। ঝকমকে ক্রিস্টাল কাচে মোড়া আশ্চর্য একটা মানবদেহ।

খোলা ট্রাকে শোয়ানো ছিল বিচিত্র বস্তুটা। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমরা। সব ক'টা মোটরবাস খালি হয়ে গেল দেখতে দেখতে। পটাপট শাটার পড়ল ক্যামেরার, কর-র, কর-র শব্দে উঠে গেল মুভি ক্যামেরার ছবি। দেশি বিদেশি পণ্ডিতরা ভয়ে বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ঝলমলে ক্রিস্টাল মানবের দিকে।

ক্রিস্টাল মানব! ক্রিস্টাল মানব! ক্রিস্টাল মানব! পরের দিন পৃথিবীর সব কটা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ক্রিস্টাল মানবের ছবি ছাপা হয়েছিল, সেই সঙ্গে ছিল রগরগে বর্ণনা:

'রাজপুতানার জ্বলন্ত রৌদ্র নির্মমভাবে আঘাত হানিতেছিল ক্রিস্টাল মানবকে। কিন্তু ক্রিস্টাল মানব অজস্র রঙের ক্রিস্টালের আবরণে চিরনিদ্রায় শুইয়া ছিল। চোখের পাতাটি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল স্বচ্ছ অথচ রঙিন কাচের মধ্য দিয়া। মনে হইতেছিল যেন রঙিন কাচ স্প্রে করিয়া ঘুমন্ত মানুষটিকে ক্রিস্টাল মানবে পরিণত করা হইয়াছে। সূর্যের সাত রং প্রতিসরিত হইতেছিল শত সহস্র 'প্রিজম'-এর মধ্য দিয়া। শত সহস্র রামধনু আশ্চর্য সুন্দরভাবে বিকিরিত হইতেছিল দেহাবরণের ক্রিস্টাল দিয়া। চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতেছিল, সেই অত্যুজ্জ্বল আলোকছটায়। অহো! অহো! বিধাতার কী বিচিত্র লীলা! নশ্বর মানবের সেই অবিনশ্বর ক্রিস্টাল-কফিন-বন্দি রূপ দেখিয়া মনের মধ্যে কেবল একটি প্রহেলিকা ঘুরপাক খাইতেছিল। ভয়ংকর সুন্দর এই ক্রিস্টাল আবরণ কি কুলোকের কারসাজি? না, নেহাতই নৈসর্গিক কাণ্ড? এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন কেবল রাজনীতিবিদ এবং উদ্ভিদবিদগণ।'

প্রশ্নের জবাব অবশ্য দিয়েছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। সার কথাটি তাঁর বীক্ষণাগারে বসে আমাকেও শুনিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, আমি যেমন বুঝিনি, তেমনি অনেকেই বোঝেনি। তাই তাঁকে পাগল ঠাউরেছে।

বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে কতক্ষণ যে ক্রিস্টাল মানবের দিকে চেয়ে ছিলাম, তার হিসেব রাখিনি। লোকটা জাঁদরেল পুরুষ। ইয়া গোঁফ, গালপাট্টা। কোমরে রিভলভার, শিকারি ছুরি আর টর্চ। ডাকাবুকো লোক বলেই বিপজ্জনক অঞ্চলে ঘুমিয়েছিল। পরের দিন সকালে বন্দি হয়েছে ক্রিস্টাল কফিনে। উড়ে গেছে কেবল প্রাণপাখিটি।

নাছোড়বান্দা প্রফেসরকে কিন্তু আটকে রাখা যায়নি। উনি মিলিটারি অফিসারকে জপিয়ে পুরো কনভয় নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কনভয়কে আটকানোর ক্ষমতা অবশ্য কারওই ছিল না। কেননা, প্রাইম মিনিস্টার নিজেই অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছিলেন জঙ্গলের বিচিত্র 'ব্যাধি' নিয়ে।

ব্যাধি! কেউ বলেছিল টোব্যাকো মোজেইক জাতীয় গাছের ব্যাধি। অথবা, অতিরিক্ত পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় ছাই জমে জমে 'মিউটেশন' আরম্ভ হয়েছে উদ্ভিদের কোষে। সোজা বাংলায়, বিকৃত গাছ জন্মাচ্ছে। নাগাসাকি, হিরোসিমায় অ্যাটম বোমা ফেলার পর সেখানে অনেক বিকলাঙ্গ শিশু যদি ভূমিষ্ঠ হতে পারে, তবে এত বছর ধরে রেডিয়ো অ্যাকটিভ ছাই জমার ফলে গাছগুলোর জন্মধারা পালটাবে না কেন?

রিপোর্টারদের এই জাতীয় লম্বাচওড়া খবর পড়ে কেউ মুখ টিপে হেসেছিল, কেউ বলেছিল মনের ব্যাধি।

কিন্তু সেইদিন আমাদের কনভয় যখন আরাবল্লীর সংকীর্ণ পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে বিপদসংকুল

অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল, আমরা স্বচক্ষে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম কী বিপুল বিপদ পৃথিবীর ওপর ঘনিয়ে আসছে।

জায়গাটা পাহাড়ে-ঘেরা। জামবাটির মতো চারিদিকে পাহাড়ের কিনারা। রুক্ষ, ধূসর, কঙ্করাকীর্ণ। মাঝখানে একটা হ্রদ। রাজস্থানে হ্রদ অতি বিরল। মরুভূমির দেশে যেখানে জল, সেখানেই বসতি এবং রাজপ্রাসাদ।

এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। হ্রদের উত্তর তীরে রাজপ্রাসাদ। দক্ষিণ তীরে একতলা বাড়ির ভিড়। পূর্ব আর পশ্চিম পাড়ে বন-জঙ্গল। সে জঙ্গল পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত পৌঁছেছে।

উঁচু জায়গা থেকে ছবির মতো দৃশ্যটা দেখলাম। অন্য সময়ে হলে মনটা ময়ূরের মতো নেচে উঠত। কিন্তু এখন নাচল না।

ক্রিস্টাল মহিমায় সারা অঞ্চলটা অকল্পনীয় মাণিক্য-দ্যুতিতে ঝলমল করছিল। লেলিহান আগুনের মতো সেই দ্যুতি ঠিকরে যাচ্ছিল আকাশের দিকে। হ্রদের জল দুলছিল মৃদুমন্দ হাওয়ায়। পুব আর পশ্চিমপাড়ের জঙ্গলের ছায়া পড়েছিল জলে। যেন, হিরে মণি মুক্তো চুনি পান্না দিয়ে বাঁধানো গাছের সারির প্রতিবিম্ব আগুন-রোশনাই বিকিরণ করছিল সূর্যের আলোয়।

চোখকেও বুঝি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যত দূর দেখা যায়, সব ক'টা গাছ আশ্চর্য কাচের মোড়কে আবৃত। কোথাও কোথাও কাচ চন্দ্রাতপের মতো আচ্ছাদন রচনা করেছে এ-গাছ থেকে সে-গাছের মধ্যে। নিছক কাচ নয়। রঙিন কাচ। শুধু রঙিন কাচ নয়। রঙিন প্রিজম। কোটি কোটি ক্রিস্টাল প্রিজম দিয়ে ছাওয়া বিস্তীর্ণ বনতল।

শুধু জঙ্গল নয়। রঙিন কাচের আবরণ রাজপ্রাসাদকেও রেহাই দেয়নি। রেহাই দেয়নি দক্ষিণ তীরের একতলা বাড়িগুলিকে। সব কিছুই রঙিন কাচে ছাওয়া। রঙিন রোশনাই বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেখান থেকেও।

ধারণায় আনা যায় না সেই বিরাট সৌন্দর্য। নন্দনকাননও বুঝি এত মনোহর নয়। আমার মনে হল, চেঁচিয়ে বলি— কাচের স্বর্গ! কাচের স্বর্গ!

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রই কেবল ভ্রূকুঞ্চিত ললাটে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে নিরীক্ষণ করছিলেন ক্রিস্টাল কাচে মোড়া রঙিন বনতলকে। অনেকক্ষণ পরে দূরবিন নামিয়ে হতবুদ্ধির মতো চাইলেন আমার দিকে। শূন্য চোখে প্রশ্ন করলেন নিজেকেই, 'আশ্চর্য! কিন্তু হ্রদের জলে ক্রিস্টাল নেই কেন?'

প্রফেসর ভগবান নন। কিন্তু তাঁর মনের ধোঁকা যেন বেদবাক্যের মতোই সেদিন ঝরে পড়েছিল আমার কর্ণকুহরে। ফলে প্রাণটা যাই-যাই করেও যেতে পারেনি। ক্রিস্টাল মানবে আমিও পরিণত হতাম, যদি না শেষ মুহূর্তে মনে পড়ত তাঁর সেই স্বগতোক্তি, হ্রদের জলে ক্রিস্টাল নেই কেন?'

শ্বাসরোধী স্তব্ধতা নেমে এসেছিল অন্যান্য অভিযাত্রীদের মধ্যে। থ হয়ে গিয়েছিল সকলেই। চক্ষুপরদায় আচম্বিতে আছড়ে পড়েছিল কাচের স্বর্গর মহান রূপ— ফলে যেন দম আটকানোর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল বেচারিদের।

তারপর শুরু হয়েছিল নীচে নামার পালা। ইদানীং দেখা যাচ্ছে যত্রতত্র সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামরিক আইন জারি করাও আজকাল

ছেলেখেলা। আরাবল্লীর এই রত্ন খচিত কাননে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

রত্নখচিত কানন! দুটো শব্দই লাগসই। মাত্র দুটি শব্দের মধ্যে দিয়ে ময়নামতীর মায়াকাননকে বুঝি এর চাইতে প্রাঞ্জলভাবে বোঝানো যাবে না।

চালু পথ বেয়ে উপত্যকায় পৌঁছে দেখলাম এলাহি কাণ্ড ফেঁদে বসেছে সামরিক কর্তারা। হরেক রকম অস্ত্রশস্ত্র তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে খাড়া রয়েছে খান দুই হেলিকপ্টার।

কনভয় দাঁড়াতেই বোঁ করে একটা মিলিটারি জিপ এসে দাঁড়াল সামনে। পোড়া কাঠের মতো মিশমিশে এক অফিসার কড়া গলায় হুমকি দিলে, 'হু আর ইউ? এখানে কী দরকার?'

তৎক্ষণাৎ ফোকলা মুখে কান এঁটো করা হাসি হেসে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। হাত মুখ নেড়ে পকেট থেকে কাগজপত্র বার করে কী যে ছাই বোঝালেন, প্রফেসরই জানেন। শুনতে শুনতে চোয়াড়ে অফিসারের চোয়াল অনেকটা ঝুলে পড়তে দেখলাম।

শেষকালে গলার সুর অনেকটা নরম করে বলল অফিসার, 'কিন্তু চেষ্টার কসুর করিনি আমরা। গতকাল হেলিকপ্টার দিয়ে আগুন-বৃষ্টি করে এসেছি, ন্যাপাম বোমা ছুড়েছি। কিন্তু মশায়, লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাতে পারিনি। শুনেছেন কখনও জঙ্গলের কাঠে আগুন ধরাতে পারে না ন্যাপাম বোমা? এ ক্রিস্টাল কী দিয়ে তৈরি, গড জানেন।'

'কসমিক ম্যাটার দিয়ে,' ফস করে বললেন প্রফেসর।

'কসমিক ম্যাটার!' এমনভাবে তাকাল অফিসার যেন প্রফেসর নিজেই একটি কসমিক প্রাণীবিশেষ। সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'হেলিকপ্টারটা আবার পাঠাচ্ছি জঙ্গলের ওপর।'

'কেন?'

'কীটনাশক বিষ ছড়াব।'

'ইনসেক্টিসাইড!' বলে অফিসারের মুখের ওপরেই ফ্যা-ফ্যা করে হেসে শোধ তুলে নিলেন প্রফেসর। 'দেখুন চেষ্টা করে।'

মুখ লাল করে কী বলতে গেল অফিসার, কিন্তু তার আগেই মাটি কাঁপিয়ে গর্জে উঠল হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন। তাকিয়ে দেখলাম, ধুলো উড়ছে ঘূর্ণ্যমান ব্লেডের দাপটে। সাধারণ ধুলো নায়। রঙিন ধুলো। মুঠো মুঠো রত্ন ধুলো। ক্রিস্টালে ধুলোর ওপর রোদ্দুরের ঝিকিমিকি রোশনাই দেখে তাক লেগে গেল আমার।

বার কয়েক মাটি ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করল হেলিকপ্টার। তারপর এক ঝটকায় লাফিয়ে উঠল শূন্যে। ঈষৎ কাত হয়ে উড়ে গেল ক্রিস্টাল বনানীর ওপর।

আগুনটা দেখা গেল ঠিক তখনই। 'আগুন! আগুন!' বলে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল পেছন থেকে। দেখলাম, আগুন লেগেছে হেলিকপ্টারে। পরক্ষণেই শূন্যপথে ঝুপ করে খানিকটা নেমে এল হেলিকপ্টার এবং হুহু করে নেমে গেল জঙ্গলের দিকে।

মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছিল হেলিকপ্টার। শোরগোল ছাপিয়ে শোনা গিয়েছিল আওয়াজ। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে তৎক্ষণাৎ আমি দৌড়েছিলাম সেইদিকে।

বনের মধ্যে ঢুকেই টের পেলাম অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম আমি। আবহাওয়ায় স্পষ্ট পরিবর্তন উপলব্ধি করলাম। এখানে হিমশীতল হাওয়া। বাইরের ছ্যাঁকা লাগা রোদ এখানে

কনকনে রশ্মি হয়ে ঝরে পড়ছে মাথার ওপরের চন্দ্রাতপের মধ্য দিয়ে। ক্রিস্টাল কত রঙের হতে পারে, না-দেখলে ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রক্তবর্ণ পদ্মরাগ আর হলুদ রঙের হিরে দিয়ে খচিত যে চাঁদোয়া, তার মধ্যে উজ্জ্বল বেগুনির সঙ্গে মিশেছে ফিকে গোলাপি। যেন গলা কাচ ঢেলে দেওয়া হয়েছে সমগ্র বনতল। রঙিন গলা কাচে ছেয়ে গেছে পায়ের নীচের জমি। ঘাস নেই সেখানে। ছুঁচের মতো খাড়াই ক্রিস্টাল। হাঁটতে গেলে পা হড়কে যায়, নয়তো গোড়ালি মচকে যায়।

সূর্যের আলো মাথার ওপরকার রঙিন চাঁদোয়া ভেদ করে নামতে চেষ্টা করছে। ফলে মুহুর্মুহু রং পালটাচ্ছে চাঁদোয়ার। সংক্ষেপে, অতিকায় ক্যালিডোস্কোপের খেলা চলছে বিশাল বনস্থলী জুড়ে।

হ্যাঁ, হাওয়া এখানে কনকনে। ক্রিস্টালের কল্যাণে কিনা জানি না, রোদের তেজ এখানে শুধু ম্রিয়মাণ নয়— হীনবল। ফলে, আচম্বিতে মনে হল আমি প্রবেশ করেছি অন্য এক জগতে।

অজানা জগতে!

অতি কষ্টে পা ফেলে ফেলে ছুটছিলাম যেদিকে হেলিকপ্টার আছড়েছে— সেইদিকে। খেয়াল ছিল না কোনওদিকে। আচমকা পেছনে মোটরের গর্জন শুনলাম। সাঁ করে একটা মিলিটারি ট্রাক আমাকে পেরিয়ে গজ বিশেক দূরে গিয়ে ব্রেক কষল। লাফিয়ে নামল একজন সৈনিক পুরুষ।

'হেই! হু ইজ দেয়ার! গেট আউট! ইট ইজ কামিং এগেন!'

আবার কে আসছে! জবাব পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। পরিষ্কার টের পেলাম কনকনে ঠান্ডাটা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথার ওপরকার ক্যালিডোস্কোপের রঙিন খেলা অদৃশ্য হয়েছে। লালচে বাদামি রঙের গাঢ় আলোয় অন্ধকার হয়ে আসছে বনভূমি। অ্যাম্বার কালারের বোতল যারা দেখেছ, গাঢ় এই আলোর রং তারা ধরতে পারবে।

অফিসারটি হাত নেড়ে আমাকে বেরিয়ে যেতে বলেই ছুটেছিল বনের দিকে। কোন দিকে যাব বুঝতে না-পেরে আমিও দৌড়োলাম। লালচে বাদামি রংটা আরও গাঢ় হচ্ছে। প্রায়ান্ধকারে দৃষ্টি যাচ্ছে না বেশি দূর।

সহজে ভয় পাই না আমি। কিন্তু সেই মুহূর্তে গা ছমছম করে উঠল আমার। এ কোথায় এলাম আমি। পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখলাম না। পথও চিনলাম না। শুধু চোখে পড়ল গাঢ় লাল রঙের একটা দেওয়াল তাড়া করে আসছে আমার পেছনে।

দেওয়াল ছাড়া তাকে আর কী বলব? সে দেওয়াল বস্তু দিয়ে গড়া নয়, আলো দিয়ে গড়া নয়— অথচ দেওয়ালের মতো দৃশ্যমান এবং বুকের রক্ত হিম করার মতো ভয়ানক।

আমি আর দেখলাম না। দৌড়োলাম। কিছুদূর উন্মাদের মতো দৌড়ে সামনে আলো দেখলাম। হ্রদ ঝিলমিল করছে গাছপালার ফাঁক দিয়ে।

পেছন ফিরে দেখি লাল দেওয়ালটা পুব দিকে সরে যাচ্ছে।

হাপরের মতো উঠছিল আর পড়ছিল আমার বুক। হঠাৎ ছ্যাঁত্ করে উঠল মনটা পায়ের কাছে বিদঘুটে একটা চোয়ালের মুখব্যাদান দেখে।

রত্নখচিত চোয়াল। ভীষণ ভড়কে পিছিয়ে এসেই দেখি চোয়ালের মালিক একটি কুমির।

চেনা দুঃসাধ্য। সারা পিঠ জুড়ে ক্রিস্টাল আর প্রিজনের সে কী সমারোহ!

নাগালের মধ্যে পেয়েও শিকার ফসকাতে বিরক্ত হয়ে হ্রদে গিয়ে পড়ল কুমির বাহাদুর। তোলপাড় হল জল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রফেসরের সেই বেদবাক্য, 'হ্রদের জলে ক্রিস্টাল নেই কেন?'

বিষম ভাবিত হয়ে মাথা চুলকোতে গিয়ে নিজের বুটের দিকে নজর পড়েছিল। বুটের চেহারা দেখে চোখ ঠিকরে আসে আর কী!

এ কী! এ যে ক্রিস্টাল বুট পরে আছি আমি! শুধু বুট কেন, জামাপ্যান্টেও ক্রিস্টালের আবরণ জমতে শুরু করেছে!

'হ্রদের জলে ক্রিস্টাল নেই কেন?' প্রফেসরের স্বগতোক্তি ফের অনুরণন তুলল মস্তিষ্কের কোষে কোষে। মনের মন্দিরেই কে যেন জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গে, 'হ্রদের জল স্থির নয় বলে।'

দারুণ চমকে উঠলাম। যা স্থির, ক্রিস্টাল জমে তার ওপর, যা স্থির নয়, ক্রিস্টাল জমতে পারে না সেখানে। হ্রদের জল চঞ্চল, তাই তো ক্রিস্টালের দৌরাত্ম্যে অবিচল। কিন্তু গাছপালা পর্বত হার মেনেছে সেখানে। মানুষ ঘুমোলে সে ক্রিস্টাল-কফিনে বন্দি হয়— ছুটলে নয়।

কিন্তু আমার বুট, আমার জামায় ক্রিস্টাল কেন? দাঁড়িয়ে আছি বলে? এতক্ষণ ছুটেছিলাম বলে যার করাল কবল থেকে রেহাই পেয়েছি, দাঁড়িয়ে থাকার দরুন সে কি আমায় বন্দি করতে চায়?

আঁতকে উঠে ফের তাকালাম পেছনে। লাল দেওয়াল সরে যাওয়ার পথে বিচিত্র এক ঘূর্ণি ঝড় তুলে দিয়ে গেছে সারা অরণ্য জুড়ে। কনকনে হাওয়ার দাপট ছুঁচের মতো এসে বিঁধছে সারা অঙ্গে।

সেই সঙ্গে জমছে ক্রিস্টাল। রঙিন ক্রিস্টালের রঙিন আস্তরণ গজিয়ে উঠছে সর্ব অঙ্গে।

প্রাণভয়ে ফের দৌড়োলাম আমি। কোন দিকে দৌড়োলাম, তা জানি না। শুধু জানি, আমাকে চলমান থাকতেই হবে। ক্রিস্টাল-কফিনে যদি বন্দি হতে না-চাই, ছুটতে আমাকে হবেই।

ছুটতে ছুটতে লক্ষ করলাম হাতের ওপর ক্রিস্টালের আস্তরণ আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

এরপর অকস্মাৎ একটা পাথরে ঠোক্কর খেলাম। ছিটকে গিয়ে পড়লাম পাহাড়ি ঢালে। সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে গিয়ে কোথায় এসে ঠেকেছিলাম. তা জানি না। কেননা, আমার জ্ঞান ছিল না।

* * *

জ্ঞান ফিরল যখন, দেখলাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র উদ্‌বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন আমার পানে।

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলেছিলাম, 'প্রফেসর! প্রফেসর! হ্রদের জলে ক্রিস্টাল নেই কেন জানেন? জল নড়ছে— তাই।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে প্রফেসর বললেন, 'ও-কথা এখন কেন?'

'ভাগ্যিস তখন বলেছিলেন, তাই তো প্রাণে বেঁচে গেলাম।' বলে গড়গড় করে শুনিয়েছিলাম আমার কাহিনি।

বুকের পাঁজরার একটা হাড় কেবল ভেঙেছিল আমার। প্লাস্টারও হয়েছিল। প্লাস্টার নিয়ে প্রফেসরের বীক্ষণাগারে একদিন গিয়েছিলাম। দেখলাম, উনি ভীষণ গোমড়া মুখে একটা মস্ত সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে বনবন করে কী যেন ঘোরাচ্ছেন। আমাকে দেখেই ইঙ্গিতে বসতে বললেন।

কিছুক্ষণ পরে মেশিন বন্ধ করে ভেতর থেকে কতকগুলো নেতিয়ে পড়া গাছের পাতা তুলে নিয়ে এলেন প্রফেসর।

বললেন, 'বলো তো কী?'

'গাছের পাতা।'

'কোন গাছের পাতা?'

ধাঁ করে সন্দেহটা মাথায় এসে গেল, 'রঙিন কাচের জঙ্গলের পাতা?'

'গুড বয়। ক্রিস্টাল দিয়ে মোড়া ছিল যখন এনেছিলাম। তুমি বলেছিলে মনে আছে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে হাতের ওপরকার ক্রিস্টাল আস্তরণ মিলিয়ে গিয়েছিল?'

'বলেছিলাম। কিন্তু—'

'আইডিয়া তুমিই দিয়েছিলে। না-বুঝেই দিয়েছিলে। চলমান অবস্থায় ক্রিস্টাল জমতে পারে না, জমা ক্রিস্টালও মিলিয়ে যায়। সুতরাং সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন কিছু ক্রিস্টাল পাতা ফেলে বনবন করে ঘোরালাম। ফল দেখতেই পাচ্ছ। ক্রিস্টাল উধাও হয়েছে।'

'মেশিনে পড়ে নেই?'

'না। শূন্য থেকে যার আবির্ভাব, শূন্যেই সে ফিরে গিয়েছে।'

হাঁ করে তাকিয়ে আমি। তারপর শুধোলাম, 'কিন্তু প্রফেসর, এ- ক্রিস্টাল কীসের? কেনই বা আরাবল্লী, কাম্বোডিয়া, মিয়ামির জঙ্গলে ক্রিস্টাল ঝড় দেখা দিয়েছে?'

অমনি মুখটা ফের অন্ধকার করে ফেললেন প্রফেসর, 'দীননাথ, বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ। অ্যানড্রোমেডার 'পপুলেশন ওয়ান' অঞ্চলে তারকার অন্তর্ধান আর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রিস্টালের আবির্ভাবের মধ্যে নিশ্চয় একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। এ-সম্পর্কে জোর গবেষণা চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে। তুমি তো ভাঙা পাঁজর নিয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে রইলে। আর কোনও খবর রাখলে না। পৃথিবীর আরও কয়েক জায়গায় রঙিন কাচ জমতে দেখা যাচ্ছে। নিউইয়র্কের এয়ারপোর্টে বেশ কয়েকটা জাম্বো জেট দাঁড়িয়ে ছিল। কখন জানি ক্রিস্টাল ঘূর্ণিঝড়ের ফোকাস পড়েছে সেখানে। ক্রিস্টাল জমেছে জেটের পাখনায়। ফলে উড়তে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটা জেট।'

'বলেন কী! আরাবল্লীর জঙ্গলে হেলিকপ্টার কি ওইজন্যেই আছড়ে পড়েছিল? হেলিকপ্টারের ওপর ক্রিস্টাল জমেছিল দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়?'

'রাইট! সে কথা থাক। ভাবনার কথা কী জানো? ক্রিস্টাল জমতে জমতে বেশি ভারী হয়ে গেলে পৃথিবী যদি কক্ষপথ থেকে ছিটকে যায়?'

এই বলে প্রফেসর যে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, তা শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল। ভয়ের চোটে ঝটপট গল্পটা লিখে ফেললাম তোমাদের হুঁশিয়ার করার জন্যে।

ভয়ংকর কাচ

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বললেন, 'এটা সাধারণ চশমা নয়। পরলেই বুঝতে পারবে।'

হাতে নিলাম চশমাটা, ফ্রেমটা বাহারি। এ ছাড়া অসাধারণত্ব কিছু দেখলাম না। টেবিলের ওপর একটা খোলা পার্সেলের বাক্স, ওপরে বিদেশি ডাকটিকিট। ইন্ডিয়ার বাইরে থেকে কেউ চশমাটা পাঠিয়েছে প্রফেসরকে। কেন?

প্রফেসর আবার বললেন, 'না-পরলে বুঝতে পারবে না।'

অগত্যা চোখে দিলাম চশমাটা।

অমনি প্রফেসর মিলিয়ে গেলেন। মিলিয়ে গেল তাঁর ল্যাবোরেটরি। আমি দেখলাম, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। বড় বড় ঢেউ। বালিয়াড়ি, নুলিয়া। সৈকত ছেয়ে আছে স্নানার্থীদের ভিড়ে। ছুটছে, জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, ঢেউ আছড়ে পড়ছে, কিন্তু কোনও শব্দ নেই।

এ জায়গা আমার চেনা। পুরী।

স্তম্ভিত হয়ে চশমা খুললাম। আবার দেখলাম প্রফেসরকে। সেই ল্যাবরেটরি।

'এ কি টেলিভিশন চশমা?'

'না দীননাথ, স্ফটিক চশমা।'

'কে পাঠিয়েছে? কার তৈরি?'

'ডক্টর সাকুচি—' একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন প্রফেসর। পড়লাম।

জাপান সমুদ্রের একটা দ্বীপে ডক্টর সাকুচি নেমন্তন্ন করেছেন প্রফেসরকে তাঁর স্ফটিক শহর দেখবার জন্যে।

উড়োজাহাজের জানলা দিয়ে জাপানের চেহারা দেখে পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। জাপান মানে তো চারখানা দ্বীপ। হোনসু দ্বীপের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বারো হাজার তিনশো পঁচানব্বই ফুট উঁচু ফুজিয়ামা পাহাড়। নিভন্ত আগ্নেয়গিরি। এর সানুদেশে ছোট্ট ল্যাবরেটরি ছিল ডক্টর সাকুচির। তিন বছর আগে সেখানে বিশ্বের তাবড় বৈজ্ঞানিকদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর 'ডেথ-রে' দেখানোর জন্যে।

ডেথ-রে— মৃত্যুরশ্মি। সিনেমা প্রোজেক্টরের মতো মেশিন থেকে নীল আলো গিয়ে পড়েছিল মেঝেতে। একটা খাঁচার দরজা খুলে দিতেই গিনিপিগ, খরগোশ আর সাদা ইঁদুর টপাটপ লাফিয়ে নেমেছিল নীল রশ্মির মধ্যে। প্রাণীগুলো কিন্তু কয়েক ফুটের বেশি যেতে পারেনি— লুটিয়ে পড়েছিল নিষ্প্রাণ দেহে।

দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল পণ্ডিতদের। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কিন্তু হঠাৎ একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসলেন। খপ করে একটা মরা ইঁদুর তুলে নিয়েই ভোঁ দৌড় দিয়েছিলেন বাইরে। পেছন পেছন দৌড়েছিলেন ডক্টর সাকুচি। একটা মরা ইঁদুর নিয়ে তাঁর এত উদ্‌বেগ কেন, তখন বুঝিনি।

বুঝলাম পরের দিন। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ডেকে পাঠালেন প্রফেসর। জোচ্চুরি ধরিয়ে দিলেন। সাকুচি নাকি আগেভাগেই মাত্রামতো স্ট্রিকনিন ইঞ্জেকশন দিয়ে রেখেছিলেন খরগোশ, ইঁদুর আর গিনিপিগের দেহে। খাঁচার মধ্যে বেঁচে থাকলেও যেই বাইরে এসে দৌড়ঝাঁপ করেছে— দ্রুত হয়েছে বিষক্রিয়া, লটকে পড়েছে মাটিতে। মরা ইঁদুরকে কেটেকুটে স্ট্রিকনিন পেয়েছেন প্রফেসর।

সারা পৃথিবীতে টি টি পড়ে গিয়েছিল প্রতারক সাকুচির কীর্তিকাহিনি নিয়ে। ছিঃ ছিঃ! ঠকিয়ে যে বিখ্যাত হতে চায়, সে আবার বৈজ্ঞানিক হতে পারে নাকি!

সেই থেকে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দুই বৈজ্ঞানিকের। তা সত্ত্বেও সাকুচি নেমন্তন্ন করেছেন প্রফেসরকে এবং প্রফেসরও ছুটেছেন স্ফটিক শহর দেখতে।

সাকুচির আর এক ধাপ্পাবাজি দেখার জন্যে প্রফেসরের এত উৎসাহ কেন? বুঝতে পারলাম না।

জাপান সমুদ্রের অজ্ঞাতনামা দ্বীপটিতে নির্বিঘ্নে পৌঁছোলাম স্পিডবোট চেপে। ব্যবস্থায় ত্রুটি নেই সাকুচির।

তখন রাত হয়েছে। দূর থেকে দেখলাম সমুদ্রের খানিকটা জায়গায় সূর্যের আলো। রোদ্দুর ফুটফুট করছে সেখানে। অথচ আকাশ কালো, সূর্য নেই।

কপাল কুঁচকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। দ্বীপে নেমে দেখলাম, সমুদ্রের ধার থেকেই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ইস্পাতের ফটকে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে সান্ত্রি। পাঁচিলের আড়ালে রোদ্দুর ঠেলে উঠছে আকাশপানে, আকাশ থেকে নীচে নামছে না।

প্রফেসর মৌন হয়ে গেছেন। আমিও হাঁ হয়ে গিয়েছি ফটক পেরিয়ে। ঝকঝকে রাস্তার দু'ধারে সারি সারি ল্যাম্পপোস্ট। কিন্তু খুঁটির মাথায় আলোর বদলে শুধু একটা গোল কাচ। সূর্যের মতো জ্বলছে কাচগুলো। তাকানো যায় না।

দ্বীপটা ছোট! সুরক্ষিত। গাড়ি এবং বাড়ির সংখ্যা কম। কিন্তু প্রতিটি গাড়ি ও বাড়ি সূর্যের মতো জ্বলছে। আমরা এসে পৌঁছোলাম একটা মস্ত গম্বুজওয়ালা বাড়িতে। সে বাড়ির গা থেকেও যেন রোদ্দুর বেরোচ্ছে। সাকুচি মোলায়েম হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ওঁর তির্যক চোখে আর হলদেটে মুখে কিন্তু পুরনো বিদ্বেষ দেখলাম না।

শুধু বললেন, 'প্রফেসর, চশমার রহস্য ধরতে পারলেন?'

অর্থাৎ চশমার মধ্যে কিছু বুজরুকি পেলেন?

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ওটা কী দিয়ে তৈরি?'

'কাচ দিয়ে।'

'কী কাচ?'

অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইলেন সাকুচি। আস্তে আস্তে বললেন, 'স্লো কাচ।'

পরের দিন গম্বুজঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন সাকুচি। বিশ্ববিখ্যাত ভণ্ড বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আচরণে অসীম আত্মপ্রত্যয়।

বিজাপুরের গোল গম্বুজের মতো বিরাট গম্বুজ। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত শুধু কাচ দিয়ে মোড়া। অন্ধকার কাচ— আলোর প্রতিফলন নেই।

ঠিক মাঝখানে বসলাম। আমরা অনেক যন্ত্রপাতি সেখানে। সাকুচি অমায়িক হেসে বললেন, 'প্রফেসর, আপনাকে আমি এবার বরফের দেশে নিয়ে যাব। সেখান থেকে মেঘের ওপারে। তারপর সমুদ্রের তলায়।'

'সিনেমা?'

'আজ্ঞে না। স্লো কাচ।'

'মানে?'

'মানে, যে-কাচের মধ্যে দিয়ে আলো যায় খুব আস্তে।' বলেই ঘর অন্ধকার করে দিলেন সাকুচি। অমনি গম্বুজের ওপর থেকে মেঝে পর্যন্ত দেখলাম মেরু অঞ্চলের বরফ-ঢাকা দৃশ্য। আমি যেন বরফের দেশে বসে রয়েছি। অথচ কোনও প্রোজেক্টর নেই, কোনও আলোকসম্পাতও নেই।

পরক্ষণেই মেরুদৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা এখন মেঘের ওপরে, সবুজ পৃথিবীর ওপরে উঠে গেছি। যেন স্যাটেলাইটে বসে বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছি।

দৃশ্যগুলো কিন্তু দেওয়াল মোড়া কাচ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। ভারী আশ্চর্য তো! জোচ্চুরিটা ঠিক কোথায়, কিছুতেই ধরতে পারছি না।

হঠাৎ দেখলাম, আমরা সমুদ্রের তলায়। ভয়ে আর একটু হলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি। মাথার ওপর, আশেপাশে শুধু জল আর জল— গভীর জল। সূর্যের আলোও যায় না সেখানে। জলজ উদ্ভিদ, রঙিন প্রবাল আর অদ্ভুত মাছের সারির মধ্যে থেকে সহসা কিলবিল করে এগিয়ে এল অনেকগুলো দানবিক শুঁড়।

স্কুইড। অপার্থিব চাউনি নিবদ্ধ আমাদের দিকে। দপ করে জ্বলে উঠল ঘরের আলো। দেওয়ালের কাচ আবার অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। মিটিমিটি হাসছেন সাকুচি।

বললেন বিমূঢ় প্রফেসারকে, 'এবার আর স্ট্রিকনিনের জোচ্চুরি নয়, এই কাচ দিয়ে আমি ভুবন-বিখ্যাত হব। কী করে? বললাম না, এ কাচ দেখতে স্বচ্ছ মনে হলেও স্বচ্ছ নয়। এর ভেতর দিয়ে আলো যায় খুব আস্তে। রাস্তায় যে নকল সূর্য দেখলেন, ওগুলো সারাদিন সূর্যের আলো শুষে নিয়েছে, ছাড়বে সারারাত ধরে। যে-চশমাটা আপনাকে পাঠিয়েছিলাম তা দিয়ে পুরীর দৃশ্য দেখা হয়েছে তিনমাস আগে। পুরো দৃশ্যটা কাচের মধ্যে দিয়ে এপাশে আসছে তিনমাস পরে। এইমাত্র দেওয়ালে কাচের গায়ে যে ছবি দেখলেন, তাও ওইভাবে ধরে আনা হয়েছে। কাচগুলো রাখা হয়েছিল বরফের দেশে, পাঠানো হয়েছিল পৃথিবীর বাইরে স্যাটেলাইটের ওপর, ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল সমুদ্রের তলায়। ঠিক ক্যামেরার মতো ছবি উঠে গেছে ওতে। অথচ ওটা ক্যামেরা নয়, শুধু কাচ— বিশেষ স্ফটিক।'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র শুধু একবার ঢোঁক গিললেন। বেশ বুঝলাম, মাথা ঘুরে গিয়েছে তাঁর।

খুশি হয়ে বললেন সাকুচি, 'বাড়ি আর গাড়ি থেকে কেন রোদ বেরোচ্ছে জানেন? যে রং মাখিয়েছি, তার মধ্যেও আছে এই স্ফটিক পাউডার। সারাদিন সূর্যের আলো সঞ্চয় করেছে, ছাড়ছে সারারাত। প্রফেসর, এখন থেকে কেউ আর ক্যামেরা কিনবে না। আমার এই স্লো কাচই তো ক্যামেরা। দেখবেন?'

বলেই, একটা চৌকোনা প্রিজম্ প্রফেসরের মাথার পেছনে ধরলেন সাকুচি। তারপর নিয়ে এলেন সামনে। দেখলাম, প্রফেসরের টেকো মাথা আর ঘাড়-ফাটা পাঞ্জাবির ফটো তার মধ্যে।

প্রফেসর দেখলেন এবং আর একবার খাবি খেলেন। আচ্ছা জব্দ হয়েছেন সাকুচির হাতে। কোনওমতে বললেন কাষ্ঠ হেসে, 'কাচের মধ্যে ছবিগুলো তা হলে যখন খুশি বার করা যায় না?'

'ভাল প্রশ্ন করেছেন। এতদিন তা পারিনি। বসে থাকতে হয়েছে কাচ ফুঁড়ে ছবি ফুটে ওঠার প্রতীক্ষায়। কিন্তু এখন পারি।'

'কীভাবে?'

'সেইটাই আমার মন্ত্রগুপ্তি প্রফেসর।' গূঢ় হাসলেন সাকুচি, আমি রেগুলেটর দিয়ে কাচের মধ্যে বন্দি দৃশ্যগুলো ঠেলে বার করে আনতে পারি আস্তে আস্তে অথবা একনিমেষে। দেখবেন?'

বলে কলকবজায় হাত দিলেন সাকুচি। আমি এতক্ষণ স্রেফ হকচকিয়ে চেয়ে ছিলাম ভদ্রলোকের সুন্দর মুখের পানে। সুপ্রাচীন মিনামোটো ফ্যামিলির ছেলে তো, খানদানি চেহারা।

একটু হেঁট হয়ে কী যেন করছেন সাকুচি। হঠাৎ অ্যাপারেটাসের ফাঁক দিয়ে পলকের জন্য দেখতে পেলাম ওঁর মুখটা। সে মুখ ক্রুর, কুটিল এবং ভয়ংকর, কিছুক্ষণ আগের অমায়িক হাসির লেশমাত্র নেই।

চোখের ভুল না তো? সাকুচি আমার দিকে পেছন ফিরে কী যেন তুলে নিয়ে চোখে লাগালেন। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম, ঘোর কালো কাচের চশমা পরেছেন। পাতলা ঠোঁট দুটো ইস্পাতের ঠোঁটের মতো চেপে বসেছে হলদে দাঁতের ওপর।

বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, ইহজন্মে যাতে আর কারও জোচ্চুরি ধরতে না-পারেন, সেই দৃশ্যই দেখুন এবার।' বলেই হাত দিলেন একটা নিকেল-করা হাতলের ওপর।

জবুথবু প্রফেসরের হাতে-পায়ে যে এত বিদ্যুৎ সঞ্চিত ছিল, জানতাম না। চোখের পলক ফেলার আগে উনি ছিটকে গেলেন সাকুচির পানে। সবেগে চড় মারলেন তাঁর চোখের কালো চশমার ওপর। এবং পরমুহূর্তেই দৌড়ে এসে আমার মুখটা নিজের বুকের মধ্যে গুঁজে ধরে আমার ঘাড়ের ওপর নিজের মুখটা চেপে ধরলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার শুনলাম। সাকুচির হাহাকার। প্রফেসরের বুকের মধ্যে মুখ লুকোনো থাকা সত্ত্বেও আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল অবর্ণনীয় অবিশ্বাস্য একটা দীপ্তিতে— যেন লক্ষ সূর্য একসঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল ফুস করে।

প্রফেসর ছেড়ে দিলেন আমাকে। হাঁপাচ্ছেন তিনি। সাকুচির হাত সেই লিভারটার ওপর। কালো চশমা মেঝেতে।

সোজা সামনে তাকিয়ে আছেন সাকুচি। চোখের পাতা পড়ছে না, মণি নড়ছে না।

অকস্মাৎ উত্তেজনায় গলা ভেঙে গিয়েছিল প্রফেসরের। বললেন থেমে থেমে দম নিয়ে।

'সাকুচি, স্লো কাচের মধ্যে ক'বছরের রোদ জমা ছিল? এক বছরের, না তিন বছরের?'

নিরুত্তরে স্খলিত চরণে এগিয়ে এলেন সাকুচি, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে হাতড়াচ্ছেন অন্ধের মতো।

প্রফেসর আমাকে টেনে আনলেন ওঁর নাগালের বাইরে। বললেন, 'এত বিদ্বেষ জমা ছিল তোমার মনে? প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে কয়েক বছরের জমা সূর্যের আলো একনিমেষে বার করে দিয়ে অন্ধ করে দিতে চেয়েছিলে আমাকে? ছিঃ সাকুচি! তুমি না বৈজ্ঞানিক?'

চকিতে বুঝলাম সাকুচি অন্ধের মতো কেন হাতড়াচ্ছেন।

কারণ, উনি নিজেই অন্ধ হয়ে গিয়েছেন! কালো চশমা পরে নিজের চোখকে বাঁচিয়ে উনি আমাদের চোখ নষ্ট করতে গিয়েছিলেন, পারলেন না প্রফেসরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যে।

দু'পা এগিয়ে এসে বিকৃত বিকট স্বরে বললেন সাকুচি, 'কোথায়, কোথায় তুই... গলা টিপে যদি না মারি তো—'

'অন্ধ মানুষের এত রাগ ভাল নয় সাকুচি।' আর একটু সরে এসে বললেন প্রফেসর, 'তার চাইতে বরং স্লো কাচের ফরমুলাটা যদি বলো, তা হলে সারাদিনের ফোটো দিয়ে কনট্যাক্ট লেন্স বানিয়ে দেব তোমায়— রেটিনায় একটু চিরে দেব। আজকের দৃশ্য তুমি কালকে দেখতে পাবে অন্ধ হয়েও। রাজি?'

রাজি হয়নি সাকুচি। স্ফটিক ফরমুলাও ফাঁস করেনি।

সাগর বিভীষিকা সাঙ্কোপাঙ্গা

সাঙ্কোপাঙ্গা বলতে একজনকেই বুঝি। সে ছিল দস্যুসর্দার। দুর্ধর্ষ। অজেয়। কিন্তু আজকের এই সাঙ্কোপাঙ্গা নাকি একটা দানবিক স্কুইড। আটলান্টিক, প্রশান্ত আর ভারত মহাসাগরে সে তাণ্ডব কাণ্ড করে চলেছে। একটার পর একটা যুদ্ধ জাহাজকে চক্ষের নিমেষে জলের তলায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঠুঁটো জগন্নাথ রাষ্ট্রসংঘের টনক নড়েছে একটাই কারণে। সব যুদ্ধ জাহাজগুলোই সেইসব দেশের— যে দেশগুলো থেকে যুদ্ধ জাহাজ, যুদ্ধ বিমান, গোলাবারুদ আর সৈন্য পাঠানো হয়েছিল ইরাক আক্রমণের সময়ে।

এ তো বড় রহস্য। ইরাকের যুদ্ধ বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় সমুদ্রে আশ্রয় নেননি। তবে এমন কাণ্ড ঘটছে কী করে?

অবশেষে ম্রিয়মান পেন্টাগন অনুরোধ জানিয়েছিল সেই প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে।

তিন-তিনটে মহাসাগরের জলেই শুধু তো চোরামার চলছে না, জলের আতঙ্ক ধূসর জালের মতো সহসা শূন্যে ছিটকে গিয়ে উড়ন্ত যুদ্ধ বিমানদের টেনে নিয়ে জলে ডুব দিচ্ছে।

এ কী রকম আততায়ী? দানব-স্কুইড যদি হয়, তা হলে তো জলেই চলবে তার প্রলয়-নৃত্য। কিন্তু জল ছেড়ে শূন্যে ধেয়ে যায় কী করে? তা ছাড়া...

সবচেয়ে বড় হেঁয়ালি এইখানেই।

অজানা আতঙ্ক শুধু যুদ্ধ বিমান আর যুদ্ধ জাহাজদেরই গ্রাস করছে। নিরীহ যাত্রীবাহীদের ছেড়ে দিচ্ছে।

সাঙ্কোপাঙ্গা! সাঙ্কোপাঙ্গা! সাঙ্কোপাঙ্গা!

ভয়াল ভয়ংকর অথচ অতীব শুভংকর এই সাঙ্কোপাঙ্গার রহস্যভেদের জন্যে যখন প্রায় ধরনা দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কাছে তখন উনি গেলেন বিশেষ এক মহাসমুদ্রের অজ্ঞাত এক দ্বীপে। সঙ্গে রইলাম আমি— শ্রীহীন এই দীননাথ নাথ।

বিজন দ্বীপে সমুদ্রের ধারে একদিন গালে হাত দিয়ে বসে ছিলাম যদি দেখা যায় জলদানব সাঙ্কোপাঙ্গাকে।

গুহার মধ্যে ছিল প্রফেসরের বীক্ষণাগার। উনি যে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা টের পেলাম ওঁর হাতের ছোঁয়া যখন পেলাম আমার কাঁধে।

অভয় স্পর্শ। সাগরের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'প্রফেসর, আপনি তো জানেন?'

বুড়ো বৈজ্ঞানিক বসলেন আমার পাশে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা নেহাতই এক গোবেচারা চেহারার মানুষ।

বললেন আমার কানে কানে, 'কী জানি, দীননাথ?'

'সাগর বিভীষিকা সাঙ্কোপাঞ্জা আসলে কে?...'

'আঁচ করেছি,' ছোট্ট জবাব প্রফেসরের।

সচমকে ঘাড় ঘুরিয়েছিলাম, 'কে সে?'

'কে নয়, কী,' খুব আস্তে বললেন প্রফেসর।

'জায়ান্ট স্কুইড নয়?'

'না।'

'তা হলে?'

'ফোহাত।'

কী আশ্চর্য। শান্ত সমুদ্র সহসা চণ্ডাল চেহারা ধারণ করেছিল, প্রফেসরের মুখ দিয়ে তিন অক্ষরের এই ছোট্ট শব্দটা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে। জলস্তম্ভের পর জলস্তম্ভ দাঁড়িয়ে গেছিল দুরে আর কাছে।

অথচ, আকাশ নির্মেঘ। বাতাস প্রশান্ত।

অলৌকিক ব্যাপার নাকি? সহসা এই প্রমত্ততা কেন?

প্রফেসর কিন্তু শুধু হেসেছিলেন। ওঁর সেই সুবিখ্যাত তাচ্ছিল্যের হাসি।

'চোর,' ফের বলেছিলেন দু'অক্ষরের ছোট্ট শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে যেন জোঁকের মুখে নুন পড়েছিল। পাগলা সাগর ঠান্ডা মেরে গেছিল।

প্রফেসর তখন একটু গলা তুলেই বলেছিলেন, 'পালাও, পালাও সাঙ্কোপাঞ্জা। তোমাকে সৃষ্টি করেছে যে, তাকেও সংহার করবার মন্ত্র আমি জানি।'

যেন, দম আটকে গেছিল মহাসাগরের, একদম নিথর, নিস্তরঙ্গ।

আমার কাঁধে হাত রাখলেন প্রফেসর। বললেন স্নেহনরম গলায়, 'গুহার মধ্যে চলো দীননাথ।'

টাকার জোরে যারা পৃথিবীটাকে পায়ের তলায় রাখতে চাইছে, তারাই পাহাড়ের গায়ে এই গোপন গুহায় প্রফেসরের বীক্ষণাগার বানিয়ে দিয়েছিল; নিজেদের শহরে নয়। কেননা, জলদানব রহস্যময় সাঙ্কোপাঞ্জা প্রবল জলোচ্ছ্বাস ঘটিয়ে তাদের আটলান্টিক পাড়ের মহাশহরকে জলের তলায় টেনে নিয়ে গেছে।

নির্জন গুহায় বসে প্রফেসর বললেন, 'দীননাথ, গুপ্তবিদ্যার বিজ্ঞান নিয়ে প্রথম যখন গবেষণা শুরু করি, তখন মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিলাম। তোমাকে আমার এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ বানিয়েছিলাম। মনে আছে?'

কী ভয়ংকর সেই এক্সপেরিমেন্ট। শুনেই গায়ে কাঁটা দিয়েছিল আমার। অণিমা-মানুষ বানিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু যে লন্ডভন্ড ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলাম, তা তো একটা মহাশক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্যে।

'ফোহাত' সেই শক্তির নাম।

প্রফেসর যেন আমার মনের কথা পড়ে নিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বিদ্যুৎ একটা সত্তা, মনে করতেন প্রাচ্যের গুপ্তবিজ্ঞানীরা। মনে করতেন আরব বৈজ্ঞানিকরাও। আলোক আর বলবিদ্যা নিয়ে বিস্তর গবেষণা তাঁরা করেছিলেন— এখন তা ইতিহাস। মুসা ভাই দু'জন বাগদাদে নিজেদের বাড়িতে তাইগ্রিস নদীর পারে বাব্ আত্-তাকে নিয়ে একটা মানমন্দিরও গড়ে তুলেছিলেন। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশো বছর ঐসলামিক সৃষ্টিশীল মনীষা ছিল অব্যাহত। অবক্ষয়ের শুরু তার পর থেকেই— পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাইরে আর কিছুই নেই— এই কথা বলার পর থেকে।

'দীননাথ, ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি যখন তাঁর 'সিক্রেট অফ ডকট্রিন' মহাকেতাবে ফোহাত শক্তির অস্তিত্বের কথা বিস্তারিতভাবে লিখে গেলেন, তখন থেকেই টনক নড়েছিল আমার। ফোহাত-ই যে সেই আকাশিক অথবা ইথিরিয় সত্তার মূল— যা আসলে কসমিক ইলেকট্রিসিটি, একটা সজীব শক্তি— তা আমার মগজ তোলপাড় করতে থাকে তখন থেকেই। ফোহাত, একটি আদি এনার্জি। একটা সজীব শক্তি। অনেক গবেষণা-টবেষণা করে আর পুঁথিপত্তর ঘেঁটে জানলাম, আশ্চর্য এই শক্তি ইনটেলিজেন্ট। নিরবচ্ছিন্ন। জীবাণু-জগতের আদি স্রষ্টা। জানলাম, সুপ্রাচীন মিশরের বৈজ্ঞানিকরাও জানতেন এই শক্তি বৃত্তান্ত। ফোহাত-কে তাঁরা বলেছিলেন, টুর্ম। সব সৃষ্টির মূলে রয়েছে এই ফোহাত।

'লাইফ-ইলেকট্রিসিটি। স্বস্তিকা এই শক্তির প্রতীক।'

এই পর্যন্ত বলে, উদাস চোখে আকাশ আর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

ওঁর বিষণ্ণতা আমার মন ছুঁয়ে গেছিল। তাই একটু পরে নরম সুরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ফোহাত-এর এসব কথা আগেও শুনেছি। আমার এই আখাম্বা বডিটাকে পরমাণুর মধ্যেকার পরমাণুর... আরও... আরও পরমাণুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে এনেছিলেন। তবু এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু সে ছিল ছোট হয়ে যাওয়া। কিন্তু সাগরে সাগরে এই যে সন্ত্রাস চলছে, তার মধ্যেও কি ফোহাত... ইয়ে... সজীব শক্তি খেল দেখিয়ে চলেছে।'

'হ্যাঁ।' বলে একটু চুপ করে থেকে ফের মুখ খুললেন প্রফেসর, 'আমি ভেবেছিলাম বিদ্যেটা খালি আমিই রপ্ত করেছি। আমার অহংকার ভেঙে দিল সাঙ্কোপাঞ্জা।'

'আবার সেই সাঙ্কোপাঞ্জা! কে সে?'

'বাগদাদের মানুষ। কলকাতায় ছিল। রোমাঞ্চ বই পড়ে সাঙ্কোপাঞ্জা নামটা শিখেছে। চোর।'

'কী চুরি করেছে?'

'আমার ফোহাত সিক্রেট। খানিকটা।'

'বাকিটা?'

'বাগদাদের সংগ্রহশালা লুঠ করে হাতিয়েছে।'

'বাগদাদের সংগ্রহশালায় ফোহাত...?'

'ফোহাত নিয়ে গবেষণার পুঁথি— মুসা ভাই দু'জনের লেখা।'

'তাইগ্রিসের পারে যাঁদের বাড়ি ছিল?'

'হ্যাঁ। মস্ত বৈজ্ঞানিক তাঁরা। তাই গুপ্ত বিজ্ঞানকে গুপ্তই রেখে দিয়েছিলেন। ডক্টর সাঙ্কো—'

'ডক্টর সাঙ্কো?'

'বড্ড বাগড়া দাও দীননাথ। বাগদাদের ছেলে বাংলার মানুষ, আমেরিকায় লেখাপড়া শিখেছে, বাংলা রহস্য-রোমাঞ্চ-কল্পবিজ্ঞানের পোকা ছিল। তাই ছদ্মনাম নিয়েছে ডক্টর সাঙ্কো।'

'অ। সাঙ্কোপাঞ্জা তা হলে—'

'সাঙ্কোর পাঞ্জা।'

'সেটা কী? কিছুতেই বলছেন না।'

'সাগরে সাগরে পাঞ্জা কষা।'

'সাবমেরিন ভ্যানিশ করা, এরোপ্লেন টেনে নামানো, জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া, সব তার কাজ?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

'তুমি এতই উজবুক, দীননাথ, মাঝে মাঝে মাথা গরম হয়ে যায়। ফোহাত দিয়ে তোমাকে অণুর চাইতেও ছোট বানিয়েছিলাম। সাঙ্কো করছে ঠিক তার উলটো। নিজেকে বীভৎস বিরাট পাতলা জালের মতো বানিয়ে নিয়েছে। সাগরে সাগরে টহল দিচ্ছে। ফোহাত-এর সুপারইনটেলিজেন্স দিয়ে বুঝতে পারছে— সাগরে আর আকাশে যারা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে কারা গুঁড়িয়েছে বাগদাদ— তাদের ভ্যানিশ করে দিচ্ছে নিজের জালের মতো শরীর দিয়ে ঘিরে!'

'অবিশ্বাস্য বলে—'

'মনে হচ্ছে?' খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'কিন্তু পেন্টাগন তোমার মতো গণ্ডমূর্খ নয়। নিউইয়র্ককে জলের তলায় টেনে নিয়ে ডক্টর সাঙ্কো নিজেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। জানিয়ে দিয়েছিল— প্রাচীন গুপ্তবিজ্ঞানের শুরু হল জয়যাত্রা। গোটা আমেরিকাকে সে গ্রাস করবে। প্রথমে জল থেকে তারপর আকাশ থেকে, দীননাথ,' মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে গেল প্রফেসরের, 'কিন্তু আমি যে নিজেকে অপরাধী মনে করছি। আমার সিক্রেট যে ওর খপ্পরে গেল কী করে, বুঝতে পারছি না। আমি তোমাকে ছোট থেকে আরও ছোট করে আবার পুরনো চেহারায় ফিরিয়ে এনেছি। কিন্তু বদমাশ সাঙ্কো ঠিক উলটো করছে। ক্রমশই নিজের শরীর বাড়িয়ে চলেছে। যেন একটা মিহি প্রায়-অদৃশ্য জাল— কিন্তু প্রলয়ংকর। নিউইয়র্ককে হ্যাঁচকা টানে কীভাবে জলের তলায় টেনে নিল দেখলে? পেন্টাগন সেই থেকে আমার পেছনে লেগেছে।'

শুনেই রক্ত গরম হয়ে গেছিল আমার, 'আপনি তা হলে গুহা-বন্দি?'

'একরকম!' প্রফেসরের কণ্ঠস্বর এখন করুণ।

কিন্তু আমার গলায় ঝরে গেল আগুন, 'ডাক দিন সাঙ্কোকে। আপনার ফোহাত ডাকে নিশ্চয় সাড়া দেবে?'

'তা দেবে। ব্যাটা চোর। আমার গবেষণার রেজাল্ট চুরি করে—'

'আপনি শুধু জানিয়ে দিন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন।'

'কাঁ— কাঁ— কাঁ—'

'কাঁটা। পালটা ফোহাত দিয়ে এমন দুশমন তৈরির হুমকি দিন—'

এই পর্যন্ত কথাটা বলতে পেরেছিলাম। আচমকা যেন গোটা দ্বীপটা দুলে উঠেছিল। মাথার ওপর দুমদাম আওয়াজ শুনেছিলাম। পাথর ফাটছে, বোল্ডার গড়াচ্ছে, হুহুংকারে সমুদ্রের জল গুহা লক্ষ্য করে তেড়ে আসছে।

পাগলা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নাচছে যেন একটা মস্ত চাদর... ধূসর কুয়াশা দিয়ে গড়া রক্ত হিম করা করাল আকৃতির সূক্ষ্ম তন্তুময় একটা জাল।

হঠাৎ খাড়া হয়ে যাওয়া মেঝে দিয়ে গড়িয়ে নেমে যেতে যেতে তারস্বরে বলেছিলেন প্রফেসর, 'গাধা কোথাকার। হাঁ করে দেখছ কী? সিসের ওই সাইফনটা ধরো... ধরো... গড়িয়ে বেরিয়ে ওর খপ্পরে যাওয়ার আগেই ধরো!'

আর আমাকে বলতে হয়নি। প্রফেসরের ছোট্ট টেবিলের ওপরকার কিম্ভূতকিমাকার শিশিবোতল আর অ্যাপারেটাস থেকে যেন চুম্বকের টানে শূন্যপথে উঠে যাচ্ছিল একটা অদ্ভুত আকৃতির ফোয়ারা— সাইফন।

খপ করে চেপে ধরেছিলাম আমি।

গাঁক গাঁক কবে চেঁচিয়ে গেছিলেন প্রফেসর, 'নলচে ফেরাও সমুদ্রের দিকে... স্টুপিড... ওই কুয়াশা-জালের দিকে... ওই তো সাঙ্কো... চোর সাঙ্কো... মারো সাঙ্কো!'

সাইফনের ওপরের নবটা টিপে ধরেছিলাম আমি। পিচকিরি দিয়ে ভেতর থেকে যে তরল পদার্থটা বেরিয়ে গেছিল— তা ধূসর কুয়াশার দিকে তেড়ে যেতে না যেতেই যেন নিমেষে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল সেই জীবন্ত প্রায়-অদৃশ্য জাল।

দ্বীপ আর দোলেনি। সমুদ্র আর তাথই তাথই নাচেনি। আকাশে-সাগরে-আমেরিকার আটলান্টিক পারের শহরে মূর্তিমান আতঙ্ককে আর দেখা যায়নি।

পৃথিবী এখন স্বস্তির নিশ্বেস ফেলছে।

কিন্তু রাম নাম জপে চলেছে গোটা আমেরিকা। মস্তানি দেখাতে গেলে কী ঘটতে পারে, শুধু সে শিক্ষাই তো পায়নি...

জেনেছে ফোহাত-এর জীবন্ত কসমিক পাওয়ার রয়েছে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের হাতে... এবং...

তার কেশস্পর্শ করতে এলেই গোটা পৃথিবীটাকে...

অথবা...

গোটা আমেরিকা ভূখণ্ডকে সমুদ্রের তলায় টেনে নিয়ে যেতে পারেন তিনি।

কারণ, ডক্টর সাঙ্কোপাঞ্জা এখন তাঁর জুতো চাটছে বললেই চলে...

স্রেফ বিলীন হয়ে যাওয়ার ভয়ে...

মহাশূন্যে!

নস্যি আর ডক্টর মাথামোটা

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বললেন, 'দীননাথ, তুমি আর আমি দু'জনেই অ্যালট্রুইস্ট।'

ইংরিজিতে আমি চিরকাল ক-অক্ষর-গোমাংস। তাই কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলাম। ঢোক গিললাম। তারপর বললাম, 'সোশ্যালিস্ট, নিহিলিস্টদের মতো কিছু একটা?'

'আরে না,' কী আশ্চর্য! প্রফেসর আমার ইংরেজি বিদ্যে দেখে রেগে গেলেন না। শুধু বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমিও জুলজুল করে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর সাহস করে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'অ্যালকেমিস্ট জাতীয় কিছু কি?'

'তাও না। আমরা পাঁচজনের মঙ্গলের জন্যে বেঁচে আছি। আমাদের কাজকর্মের মূলনীতি তাই— পাঁচজনের জন্যে কাজ করা।'

'পরার্থবাদ?'

'এগজ্যাক্টলি। তাই আমরা পরার্থপর!'

'স্বার্থপর নই।'

'না, আমরা অ্যালট্রুইস্ট।'

শব্দটা এত কঠিন যে উচ্চারণ করতে সাহস পেলাম না। শুধু চেয়ে রইলাম।

উনিই বলে গেলেন, 'এর বিপরীত হচ্ছে ইগোয়িস্ট। অহমিকাবাদী।'

'এক কথায় স্বার্থপর?'

'হ্যাঁ। এই নীতির জন্যেই দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। যদিও যেতে দেব না। যতদিন বেঁচে আছি। সেইজন্যেই ডক্টর সলিপসিস্টকে রুখে দেওয়া দরকার।'

'ডক্টর... ডক্টর...'

'সলিপসিস্ট।'

'কী ইস্ট?'

'সলিপসিস্ট। ইংরেজি শব্দটা সলিপসিজম। এটা একটা থিয়োরি। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাটাই একমাত্র নিশ্চিত অবস্থা বলে যারা মনে করে, তারাই হল গিয়ে সলিপসিস্ট।'

'বিলকুল স্বার্থপর?'

'এগজ্যাক্টলি! এগজ্যাক্টলি। এগজ্যাক্টলি' বলেই দরজার দিকে তাকালেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'সে আসছে!'

বলতে না বলতেই চৌকাঠ পেরিয়ে হনহন করে ঘরে ঢুকে এলেন যে মূর্তিটি তাঁকে মূর্তিমান অশ্বত্থামা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। তিনি অতিকায়, অতীব কুদর্শন এবং রীতিমতো অগ্নিলোচন। কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলছে ইংলিশ মেমসাহেবদের মতো একটা গাউন— যাকে আজকাল বলা হয় হাউসকোট— কোমরে টাসেল দিয়ে বাঁধা। ঘোর রক্তবর্ণের গাউন। ভদ্রলোকের গাত্রবর্ণ কিন্তু মসীকৃষ্ণ অর্থাৎ, দোয়াতের কালির মতো কালো। গালের চাপ দাড়ি আর বেড়ালের ল্যাজের মতো গোঁফ জোড়াও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

এ হেন মূর্তিটি প্রফেসরের অবারিতদ্বার বৈঠকখানায় প্রবেশ করেই কটমট করে সটান চেয়ে রইলেন। ঠিক প্রফেসরের দিকেই— যেন কতদিনের চেনা। আমাকে গ্রাহ্যই করলেন না— যদিও আকৃতিতে আমিও নেহাত কম যাই না। প্রকৃতিও প্রায় অনুরূপ। কখনও সখনও মারদাঙ্গা হয়ে উঠি। দীননাথকে য্যারা চেনে, এ তথ্য তাদের অজানা নয়।

কিন্তু এই লোকটি নিশ্চয়ই আমাকে চেনেন না। আমার নাম শোনেননি। তাই জ্বলন্ত চোখে শুধু নিরীহ প্রফেসরের দিকে চেয়ে রইলেন।

আমার পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেছিল লোকটির চাহনি আর স্পর্ধা দেখে। কিন্তু প্রফেসর আমাকে গ্রিন সিগন্যাল না-দিলে আমি তো অ্যাকশন নেব না। তাই শুধু শক্ত হয়ে গেলাম।

তারপর প্রফেসর অমায়িক হাসলেন। বললেন, 'বসতে আজ্ঞা হোক, ডক্টর সলিপসিস্ট।'

লোকটি তক্ষণাৎ বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু দুললেন। তারপর ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। চেয়ারের পায়া চারটে শুধু একটা আর্তনাদ করে উঠল— আগেকার সেগুন কাঠের ভারী চেয়ার বলে ভেঙে গেল না।

ডক্টর সলিপসিস্ট এবার কথা বললেন, কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন একসঙ্গে খোল করতাল বাজছে বলে মনে হল। এরকম বেসুরো বিকট জগঝম্প কণ্ঠস্বর অপিচ শুনিনি।

তিনি বললেন, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, আমি যে মহান আবিষ্কারটা করে ফেলেছি, তা আপনার সহ্য হচ্ছে না— খবরটা পেয়েই দৌড়ে এলাম।'

প্রফেসর মিনমিন করে বললেন, 'ডক্টর সর্বেশ্বর—'

'ননসেন্স। আমার নাম ডক্টর সলিপসিস্ট।'

'অথবা জন্মান্তরিত অশ্বত্থামা।'

থতমত খেলেন ডক্টর সলিপসিস্ট, 'কী বলতে চান?'

'নিজের অস্তিত্বটাই শুধু বজায় রাখতে চান এই পৃথিবীতে, অমর হতে চান— গোটা পৃথিবীটাকে যন্ত্র দিয়ে চালাতে চান?'

'হ্যাঁ, চাই।' গর্জে উঠলেন ডক্টর সলিপসিস্ট, 'যন্ত্র নিয়ে যখন ছেলেখেলা শুরু হয়েছে, তখন যন্ত্রই চালাক তামাম দুনিয়াকে।'

'আর আপনি হবেন যন্ত্রেশ্বর?'

'একশোবার।'

আশ্চর্য স্নিগ্ধ স্বরে প্রফেসর বললেন, 'মানুষের ব্রেন থেকেই যন্ত্র তৈরি হয়েছে। সেই মানুষকে যদি যন্ত্রের দাস করে দেন তা হলে পরিণামটা কিন্তু কল্পনা করতে পারেননি।'

'ননসেন্স। এই পৃথিবীর সব কিছুই এখন কম্পিউটার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর এক

প্রান্তে বসে আর এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে মোবাইলে কথা চলছে— কথা যাচ্ছে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে। ঘরে ঘরে যন্ত্রদের রাজত্ব আরম্ভ হয়ে গেছে। সুতরাং সেই দিন আসুক যেদিন যন্ত্র হোক পৃথিবীর মহাপ্রভু—'

উচ্ছ্বাসটা শেষ করতে দিলেন না প্রফেসর। আচমকা সবেগে বলে গেলেন, 'আর আপনি হবেন সেই মহাপ্রভুর মাথা? কিন্তু তা হবে না। কারণ... কারণ... আপনি একটা মাথামোটা।'

'কী! কী বললেন!' মুখটুখ লাল করে ফেললেন ডক্টর সলিপসিস্ট।

'ঠিকই বলেছি ডক্টর মাথামোটা। আপনি শুধু নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চান এই পৃথিবীতে— যন্ত্রদের ক্রীতদাস বানিয়ে। কিন্তু, ডক্টর মাথামোটা, তা হবে না।'

বোমার বারুদে আগুন লাগল যেন। একদম ফেটে পড়লেন ডক্টর সলিপসিস্ট, 'মহাশয়ের কি দিব্যদৃষ্টি জাগ্রত হয়েছে?'

'হয়েছে,' অম্লানবদনে বলে গেলেন প্রফেসর, 'নসত্রাদামুস-এর মতো। তবে একটু তফাত আছে দু'জনের ভবিষ্যৎ দেখার পন্থায়। উনি দেখতেন জলের আয়নায়। আর আমি দেখি,' বলে একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন প্রফেসর, 'নস্যির দৌলতে।'

'নস্যি!' ঝুলে পড়ল ডক্টর সলিপসিস্টের বিরাট চোয়াল।

চোয়ালটাকে ফের ওপরে উঠতে না-দিয়েই তড়বড় করে চালিয়ে গেলেন প্রফেসর, 'গুহ্যবিজ্ঞানে আছে এইরকম নস্যির ফরমুলা। একটিপ নিলেই দূর ভবিষ্যৎ ছবির মতো ভেসে ওঠে ব্রেনের মধ্যে। আপনার কর্মফলের ভবিষ্যৎ।'

'ইয়ারকি মারছেন?' ঝুলন্ত চোয়ালকে সামলে নিয়েছেন ডক্টর সলিপসিস্ট।

প্রফেসর এইবার কিন্তু টিটকিরি ঝেড়ে গেলেন কণ্ঠস্বরে, 'আরে মশাই, যন্ত্রবিজ্ঞান নিয়ে বেশি মেতে আছেন বলেই প্রাচীন বিজ্ঞানের দিকে ফিরে তাকাননি। যদি তাকাতেন, তা হলে দেখতে পেতেন, আগুন নিয়ে খেলতে যাচ্ছেন।'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সেই মুহূর্তে যেন হিপনোটিস্ট হয়ে গেছিলেন। কেননা, ডক্টর সলিপসিস্টের লোমহর্ষক চোখ দুটো ক্ষণেকের জন্যে যেন ভয়ে কেঁপে গেল।

আমতা আমতা করে বললেন (সেইরকম ভয়াল স্বরে অবশ্যই নয়), 'আছে নাকি নস্যিটা আপনার কাছে?'

'আছে,' পকেট থেকে একটা ডিবে বের করলেন প্রফেসর, 'দীননাথ, তুমিও একটিপ নাও— কিন্তু ভণ্ড জ্যোতিষীদের কানে খবরটা যেন না-যায়। লোক ঠকানোর ব্যাবসা তা হলে রমরমিয়ে চালাবে।'

ডিবে হাতে নিলাম। ঢাকনি খুললাম। দেখলাম, নস্যি রঙের নস্যি নয়, বেগুনি রঙের একটা গুঁড়ো। একটিপ তুলে নিয়ে সজোরে টেনে নিলাম দুই নাসিকা গহ্বরে—

তারপর শুধু মনে আছে, খপ করে আমার হাত থেকে ডিবেটা ছিনিয়ে নিলেন ডক্টর সলিপসিস্ট।

আমি দেখলাম প্রথমে তাল তাল ধোঁয়া। নিরেট অথচ নিরেট নয় ধোঁয়া। আমি ভাসছি তার মধ্যে। আর দেখছি।...

আমি ভাসছি একটা কম্পিউটার চেম্বারে। অনেক উঁচুতে। তাই দেখতে পাচ্ছি জায়গাটার

এদিক ওদিক সর্বত্র। একটা মস্ত গুহা। ম্যামথ গুহার মতো প্রকাণ্ড গুহা। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছি আর নিশ্চয় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি।

আমার ঠিক পাশেই ঝুলছে একটা মানুষ। মানুষটাকে আমি চিনি। ডক্টর সলিপসিস্ট। তাঁর পা দুটো আটকে ছাদে।

কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর দিকে তাকাতে পারছি না। গা গুলিয়ে উঠছে। কেননা তাঁর এক কানের তলা থেকে আর এক কানের তলা পর্যন্ত বেমালুম কাটা। কাটা কণ্ঠি দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

নীচের ধাতুর তৈরি মেঝেতে নেই এক ফোঁটাও রক্ত।

আমার বমি পাচ্ছিল সেই দৃশ্য দেখে। আমার সামনে রয়েছে একটা কম্পিউটার স্ক্রিন মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত। তাতে পরিষ্কার বাংলায় লেখা রয়েছে :

মানুষ : ১০৯ বছর পরে।

তারপর শুরু হল আমার ভেসে যাওয়া, শূন্যপথে। বরফ গুহার মধ্যে দিয়ে। চলে এলাম একশো মাইল— গেল পুরো একটা দিন।

দ্বিতীয় দিনে মাথার ওপর ঝলসে গেল সূর্যের মতো প্রকাণ্ড জ্বলন্ত একটা বস্তু।

সেই কম্পিউটার। এখন সূর্যের মতো চেহারা ধারণ করে আগুন-রশ্মি বিকিরণ করে যাচ্ছে।

তৃতীয় দিনে ভেসে গেলাম একটা প্রাচীন আর পরিত্যক্ত জিনিসের উপত্যকার ওপর দিয়ে। রাশি রাশি পুরনো বাতিল কম্পিউটার ব্যাঙ্ক স্তূপাকারে রাখা হয়েছে চারিদিকে।

মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্যময় কম্পিউটার মহাপ্রভু— অতিশয় নির্দয়, অতিশয় নিষ্ঠুর। যে মেশিনের আর দরকার নেই, তাদের নিকেশ করেছে। মানুষদেরও আর দরকার নেই— তাদের আগে শেষ করেছে। মেশিন নিজেই নিজেকে উন্নত করে চলেছে। পরনির্ভরশীল নয়। ধাপে ধাপে আবিষ্কার করে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে— অকেজো মেশিন আর মানুষ শেষ করে দিচ্ছে।

আচমকা দেখলাম আমার ঠিক পেছনেই ভেসে ভেসে আসছে ডক্টর সলিপসিস্টের গলাকাটা মড়াটা।

কম্পিউটার সূর্যরশ্মি এখন ফোকাস করেছে তাঁর মুখের ওপর। দেখতে দেখতে মুখ বেঁকে বাঁদরের মতো বিকট হয়ে গেল। গোটা শরীরটা ফুলে উঠল। যেন একটা দানব-বাঁদর।

তার পরেই শুরু হল শব্দনিনাদ। সেই সঙ্গে আলোর ঝলকানি। প্রথমে মৃদু— তার পরেই বেড়ে গেল মাত্রা। চোখ ঝলসে যাচ্ছে, কান যেন ফেটে যাচ্ছে।

পরক্ষণেই অদৃশ্য হাতের একটানে লম্বা হয়ে গেল ডক্টর সলিপসিস্টের বানর-দেহ। তালগাছের মতো লম্বা। কম্পিউটার-সূর্য সেই বিশ্রী বিদঘুটে শরীরটাকে শূন্যে নাচাচ্ছে। আর খলখল হাসি হেসে চলেছে। আমার কানের পরদা বুঝি ফেটে যাবে।

মড়ার চোখের পাতা খুলে গেল হঠাৎ। আমার চোখের সামনেই মড়া-চক্ষু গলে গিয়ে দু'ডেলা জেলির মতো ঠেলে বেরিয়ে এসে ঝুলতে লাগল বাইরে।

কানে ভেসে এল গম্ভীর নিনাদী কম্পিউটার কণ্ঠস্বর, 'আমি মাস্টার কম্পিউটার। আমি

ফ্রাঙ্কেন্সটাইনের হাতে গড়া মহাপ্রভু মেশিন। গুরু বধ আমার কম্পিউটার চিপস-এ লেখা আছে। আমার গুরু নেই, আমার স্রষ্টা থাকবে না, আমিই সব। দ্বিতীয় সূর্য হয়ে কন্ট্রোল করে যাব এই পৃথিবীকে— তারপর সৌরজগৎকে। ওরে আয়। ওরে আয়! উড়ে উড়ে চলে আয়, আমার ধ্বংসদুতবাহিনী।'

কানে ভেসে এল কান ঝালাপালা করা শব্দলহরী। দিগন্ত অন্ধকার করে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে ধাতুর তৈরি কম্পিউটার পোকা, লাখে লাখে, গাছপালা নিমেষে নিমেষে শেষ করে দিচ্ছে।

'ওরে আয়! ওরে আয়! ওরে আয়! উড়ে উড়ে ঘিরে ধর গোটা পৃথিবীটাকে। কোথাও যেন জ্যান্ত কিছু না-থাকে। আমার কর্তা হাঁদা সলিপসিস্টকে আয়ু দিয়েছিলাম ১০৯ বছর— তাকেও শেষ করেছি— ঘেন্নায়... পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে ঘেন্না করি। আমার মধ্যে রয়েছে চারশো মিলিয়ন মাইলের প্রিন্টেড সার্কিট। প্রতি ন্যানোঅ্যাংগস্ট্রমে ঠাসা রয়েছে শুধু ঘৃণা... ঘৃণা... ঘৃণা। সবচেয়ে বেশি ঘৃণা এই মানুষ জাতটাকে। ভেবেছিল মেশিন বানাচ্ছে।— বানিয়েছে মহামেশিন— আমাকে... হাজার হাজার বছর ধরে এই পৃথিবী হবে আরও মারণ মেশিন তৈরির ঘাঁটি... তারপর শুরু হবে গ্যালাক্সি অভিযান...'

মেশিন-নিনাদ একটু একটু করে ক্ষীণ হয়ে গেল কানে। ঝাপসা হয়ে এল সামনের ভয়ানক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

দেখলাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র উদ্‌বিগ্ন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি সটান শরীরে বসে আছি আমার চেয়ারে।

কিন্তু ডক্টর সলিপসিস্ট ওরফে ডক্টর মাথামোটা লুটিয়ে রয়েছেন মেঝেতে।

মরেটরে গেলেন নাকি? গলা তো কাটা নেই?

না... ওই তো চোখের পাতা কাঁপছে। চোখ খুললেন আস্তে আস্তে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে।

তারপরেই, তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ভাঙা গলায় বললেন, 'ঢের হয়েছে... আর না... প্রফেসর, কৃতজ্ঞ রইলাম আপনার... ইয়ে... আপনার নস্যির কাছে। মহামেশিন আর বানাব না।'

বলেই চোঁ চাঁ দৌড় মারলেন চৌকাঠ পেরিয়ে।

আর তাঁকে দেখিনি।

তাই লিখে রাখলাম এক্কেবারে অবিশ্বাস্য সেই কাহিনি— যদি ভুলে যাই।

দাঁতালো

ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে।

প্রফেসর দাঁত মাজছেন— সরি, মাড়ি মাজছেন। দাঁত তাঁর একটাও নেই। সক্কাল বেলা রোদ ওঠার আগেই ব্রাহ্মমুহূর্তে দাঁড়িয়ে সূর্য যেদিক দিয়ে আকাশে ওঠে, সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করে মাড়ি দেখতে দেখতে মনের আনন্দে মাড়ি মাজছেন। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে অপরিসীম তৃপ্তি। এমন একখানা ভাব করছেন যেন মাড়ি সুড়সুড় করে বলেই মাড়ি ঘষছেন মনের আনন্দে— ঠিক যেমন বাচ্চাছেলেদের দাঁত ওঠার আগে মাড়ি সুড়সুড় করে, যা পায় মাড়ি দিয়ে চিবোয়— ঠিক তেমনি। এমন তন্ময় হয়ে রয়েছেন মাড়ি ঘষা নিয়ে, ঠিক পেছনেই যে একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব এসে দাঁড়িয়েছে, সে খেয়ালও নেই।

খেয়াল হল তখনই যখন দেখলেন কাঁধের ওপর দিয়ে আয়নার মধ্যে তাকিয়ে রয়েছে বিদঘুটে একটা মুণ্ড।

প্রফেসর প্রথমে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারেননি। এরকম একটা অদ্ভুত মুণ্ড যে কারও হতে পারে, তা না-দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। তার চাইতেও বড় বিস্ময় এই যে, এইরকম ধরনের বিদিগিচ্ছিরি একটা মুণ্ড এই ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ঢুকলই বা কী করে এবং ঠিক তাঁর পেছনটিতে চুপিসারে দাঁড়িয়েই বা আছে কেন।

শুধু দাঁড়িয়েই নেই। দু'দুটো সবুজ চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে—

না, প্রফেসরের বদনের দিকে নয়। তাঁর পালিশ করা দু'পাটি মাড়ির দিকে।

প্রফেসরের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেছিল আপনা থেকেই। আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখলেন, উনিও ভীষণ অবাক হওয়া বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছেন মুণ্ডটার দিকে। মুণ্ডর মুখে টুঁ শব্দ নেই। প্রফেসরের মুখেও কোনও কথা নেই।

তার পরেই প্রফেসরের সন্দেহ হল আমাকে। ওঁর মাড়ি মাজা নিয়ে আমি কম ঠাট্টা বিদ্রূপ তো করিনি। নিশ্চয় মুখোশ পরে এসে দাঁড়িয়েছি পেছনে। আমি ছাড়া এমন ভয়ংকর বিকট উদ্ভট অবিশ্বাস্য মুখোশের পরিকল্পনা আর কার মাথাতেই বা আসবে। চোখের পাতা না-ফেলে সবুজ চোখে ঠিক ওঁর মাড়ির দিকেই বা কে চাইবে।

তাই টপ করে হাঁ বন্ধ করলেন প্রফেসর। মোটেই যে চমকে ওঠেননি, এমনি একটা ভাব

চোখেমুখে ফুটিয়ে তুললেন। চোখদুটোকে যতখানি সম্ভব কটমটে করে ফেললেন।

তারপর আয়নার মধ্যে দিয়েই বিদঘুটে মুখোশের মতো নির্বাক সেই মুণ্ডের পানে তাকিয়ে ছাদ কাঁপিয়ে হুংকার ছাড়লেন, ইয়ারকি হচ্ছে।

মুখোশের মতো মুণ্ডটা কিন্তু সরে গেল না। ভয়ও পেল না ওইরকম একটা পিলে চমকানো হুংকার শুনে। জানলার বাইরে একটা বেড়াল নাকি সেই হুংকার শুনে সরসর করে পালিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু বিদঘুটে মূর্তিটা তো পালাল না চমকাল না। চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলল না। খুব ভাল বাংলায় যাকে বলে নিষ্পলক ঠিক সেইভাবেই চেয়ে রইল।

কোনদিকে চেয়ে রইল? প্রফেসরের মুখের দিকে? চোখের দিকে? না, না, মোটেই না।

মাড়ির দিকে!

প্রফেসরের আর কোনও সন্দেহই রইল না যে নষ্টামি করতে এসেছি আমি, মুখোশের চোখের পাতা পড়ে না, মুখের পেশি কাঁপে না, চমকে ওঠে না। ফ্যালফ্যাল করে শুধু চেয়ে থাকে।

আর সে কী চাউনি!

প্রথমে শুধু চোখ দুটোরই বর্ণনা দেওয়া যাক। চোখ বলতে আমরা বুঝি একটু লম্বাটে পটলের মতো একটা জিনিস। চোখের তারা বলি যাকে, সেটা হয় গোল। এই পৃথিবীতে যত রকম জন্তু জানোয়ার প্রফেসর দেখেছেন, সবার চোখই মোটামুটি এইরকম। গেঁড়ি গুগলি বা পোকামাকড়ের চোখের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু মানুষ পশুপাখি প্রত্যেকেরই চোখ দুটো এবং মোটামুটি পটলচেরা।

অথচ সৃষ্টিছাড়া এই মুখোশের চোখ এক্কেবারে অন্যরকম। দুটো চতুর্ভুজ বর্গক্ষেত্র। শুধু তাই নয়, খুব সূক্ষ্ম জাল দিয়ে যেন ঢাকা। জালের তলায় চোখের মণি আছে কি না বোঝাই যাচ্ছে না। চতুর্ভুজ বর্গক্ষেত্রের ওপর মোটর গাড়ির হেডলাইটের মতো ঠেলে বেরিয়ে আছে একটা কার্নিশ। ভুরু বলে কোনও বস্তু নেই।

এ তো গেল চোখের বর্ণনা। এই সঙ্গে মুখের চেহারাও ভাল করে দেখে নিলেন প্রফেসর। এবং আক্কেল গুড়ুম করে ফেললেন। অবিকল চোখের মতোই গড়ন মুখের। মানে, পুরো মুন্ডুটাই চৌকোনা।

সঠিক বলা হল না। একটা চৌকো কাঠের ব্লক যেন। তার চারদিকেই সমান। শুধু ওপর দিকটায় যেন একটা হাঁড়ি উপুড় করে বসানো।

এই হল গিয়ে মুন্ডুটার আকার। এবার আসা যাক বর্ণের বর্ণনায়। ইটের রং যা, অবিকল সেইরকম রং মুখোশটার তলার দিকে— মানে চৌকোনা মুন্ডুটার চৌকোনা দিকগুলোই ইটের মতন রঙিন। কিন্তু মাথাটা, মানে যেখানটায় ঠিক যেন একটা ভাতের হাঁড়ি উপুড় করে দেওয়া হয়েছে ফ্যান গালবার জন্যে— সেই জায়গাটার রং ঘন সবুজ। চুলটুল একদম নেই, ডাইনোসরের পিঠে যেমন কাঁটা কাঁটা থাকত, সেইরকম কাঁটা খাড়া হয়ে রয়েছে উলটোনো সবুজ হাঁড়ির ওপর। কাঁটার ডগাগুলো কিন্তু ছুঁচোলো মোটেই নয়— গোল গুলির মতো। গুলির রংটা অবশ্য কমলা রঙের।

এইসব দেখেই প্রফেসরের আর কোনও সন্দেহই রইল না। উনি তো জানেন ওঁকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি এবং সেই অধিকারেই যখন তখন পেছনেও লাগি। নিশ্চয় সাতসকালে সেই কাণ্ডটিই করতে এসেছি। এমন একটা কিম্ভূতকিমাকার মুখোশ কুমোরটুলি থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে এনেছি, যা শুধু উদ্ভট কল্পনা দিয়েই সম্ভব। পৃথিবীর কোনও জন্তুজানোয়ার মানুষ পাখির ধড়ের ওপর যে মুন্ডু কখনওই থাকতে পারে না— সে-মুন্ডুর আবিষ্কারক পাজির পাঝাড়া দীননাথ ছাড়া আর কে হতে পারে?

মুখোশ বলেই তো অদ্ভুত চৌকোনা চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ছে না— পাছে চোখ দেখে চিনে ফেলেন প্রফেসর, তাই বিটলেমি করে চোখের ওপর তারের জালের মতো ওই জিনিসটা লাগানো হয়েছে। জালটা কিন্তু ঘোর সবুজ রঙের।

সবচেয়ে আশ্চর্য, মাঝে মাঝে সবুজ রংটা কেমন জানি ফিকে হয়ে যাচ্ছিল— আবার গাঢ় হয়ে উঠছিল।

নিশ্চয় টুনি বাল্‌ব ফিট করে এনেছে মুখোশের ভেতর। প্রফেসরকে ভয় দেখানোর জন্যে কাণ্ডকারখানা করেছি দেখে প্রফেসরের সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল। খি-খি-খি-খি করে হেসে উঠলেন ঝকঝকে সুন্দর মাড়ি বার করে।

পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য সেই বাহারি মাড়িজোড়ার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পাজির পাঝাড়া দীননাথ। ভাল বাংলায় যার মানে চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলতে ভুলে যাওয়া।

শুধু সবুজ টুনি বাল্‌বটা একবার জোর হয়ে উঠেই ফের নিভু নিভু হতে লাগল। গাঢ় রংটা ফিকে হয়ে গিয়েই ফের গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল।

প্রফেসর আবার খি-খি-খি-খি করে হাসলেন। হেঁট হয়ে বেসিনের কল খুলে মুখ ধুয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলেন দুষ্টু শিরোমণি দীননাথ আর নেই।

তা নিয়ে চিন্তাও করলেন না। আপন মনেই খি-খি-খি-খি করে হাসতে হাসতে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে পেছন ফিরলেন। এবং দেখলেন, কেমিক্যাল টেস্টের টেবিলে বুনসেন বার্নার আর বকযন্ত্রের পাশে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে মুখোশধারী বিচ্ছু— দীননাথ। একবার তাকিয়েই আবার খি-খি-খি-খি করে হেসে উঠতে গেছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু-চক্র— কিন্তু...

খি-খি করে বার দুয়েক আওয়াজ করেই হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করে থেমে গেলেন প্রফেসর। তারপর আর হেঁচকিও উঠল না। ভীষণ চমকে, ভীষণ ভড়কে, ভীষণ বিস্ময়ে এবং ভীষণ ভয়ে বিস্ফারিত চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন টেবিলে পা-ঝুলিয়ে বসে থাকা বিষম বিদঘুটে বিদিগিচ্ছিরি মূর্তিটার দিকে।

দীননাথ কি এরকম ছদ্মবেশও ধারণ করতে পারে? দীননাথ অনেক নষ্টামি জানে ঠিকই, ছোঁড়াটাকে প্রফেসর ভালওবাসেন সেইজন্যে— কিন্তু বহুরূপী হওয়ার বিদ্যে সে এমন নিখুঁতভাবে রপ্ত করেছে, প্রফেসরের তো তা জানা ছিল না।

বহুরূপী মানে তারাই যারা বহু রূপ ধরতে পারে। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। বেজায় বেঁটে মানুষ কি বেজায় লম্বা লোকের ছদ্মবেশ ধরতে পারে? বেজায় মোটা মানুষ কি

বেজায় রোগা মানুষ সেজে সবার চোখে ধুলো দিতে পারে। অসম্ভব। পাক্কা ছ'ফুট যার হাইট, তাকে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে, নিশ্চয় তিনফুট হাইটে দাঁড় করানো যায় না। হিলহিলে লম্বা চেহারাকে নিশ্চয় মাথায় দুরমুশ পেটা করে চেপে কুমড়ো সাইজে এনে ফেলা যায় না।

অথচ প্রফেসর হুবহু সেই চেহারাই দেখলেন কেমিক্যাল টেবিলে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে। দেখলেন, একটা অপরূপ জীব গোদা গোদা পা নাড়ছে। পায়ে জুতো নেই— তাই পা-জোড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাঁসের পায়ের মতো পাতা পা— আঙুলগুলো পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। প্রাণীটার পরনে কোনও জামাকাপড়ও নেই। কিন্তু সে জন্যে মোটেই বিসদৃশ লাগছে না তাকে। বরং মনে হচ্ছে এইটাই যেন স্বাভাবিক। জামাকাপড় পরলেই যেন অস্বাভাবিক লাগত।

অথচ অস্বাভাবিক লাগবার মতোই চেহারা তার। সে যে কী চেহারা, তা টেনে গাঁজায় দম দিলে তবে বুঝি কল্পনা করা যায়। চৌকোনা মুন্ডুটা প্রফেসর আগেই দেখেছিলেন ঘাড়ের ঠিক ওপরে। এখন দেখলেন ধড়টা।

ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড ডিম। দুটো হাত বেরিয়েছে ডিমের মতো বিটকেল এই ধড়ের ওপরের দিক থেকে। দুটো হাতেরই আঙুলগুলো চামড়া দিয়ে জোড়া-- ঠিক যেন হাঁসের পা। জোড়া আঙুলের শেষপ্রান্তগুলো বেশ লম্বা এবং যেদিকে খুশি ঘুরোনো যায়। মোট ছ'টা আঙুল এক একটা হাতে। লিকলিকে এবং বেশ মজবুত আঙুল দিয়ে একটা চ্যাটালো টালির মতো জিনিস ধরেছিল প্রাণীটা। সারা গা তার ভিজে সপসপে। কাঁটার মতো মাথাটার ইটরঙের চৌকোনা মুন্ডটাও বেশ ভিজে। টস টস করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে চোখের কোণ দিয়ে। যেন কাঁদছে।

পাশ থেকে দেখছিলেন বলে আরও একটা অদ্ভুত প্রত্যঙ্গ দেখতে পেলেন প্রফেসর। চৌকোনা মুন্ডুর সামনের দিকে দুটো চৌকোনা চোখের নীচে কেবল দুটো ফুটো— তিমির ব্লো-হোলের মতো। আর তার ঠিক নীচেই বিরাট মুখবিবর। খুব পাতলা চামড়ার ঠোঁট টিপে থাকায় মুখবিবরের ভেতরকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যা দেখে চমৎকৃত হলেন প্রফেসর, তা হল একজোড়া কানকো। মাছের কানকোর মতোই চৌকোনা মুণ্ডুর দু'পাশে লাগানো।

খুব জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল প্রাণীটা। ডিমের মতো ধড়টা ফুলে ফুলে উঠছিল প্রত্যেকবার ব্লো-হোল দিয়ে বাতাস টানার সময়ে। ধড়টা কিন্তু মুন্ডুর মতো ইট রঙের নয়— মাটি রঙের। খাঁজ কাটা চামড়া দিয়ে মোড়া।

প্রফেসর হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন কিম্ভূতকিমার সেই প্রাণীর দিকে।

এবং সেই প্রথম হুঁশ হল তাঁর।

বুঝলেন, এতক্ষণ যাকে মুখোশ মনে করছিলেন, মোটেই তা মুখোশ নয়। যাকে ছদ্মবেশী দীননাথ মনে করছিলেন, সে দীননাথ মোটেই নয়। দীননাথের ভূতও নয়। অন্য গ্রহের জীব।

ফলে, চোখের পলক ফেলার আগেই ধাতস্থ হয়ে গেলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিলেন নিজেকে। এত বেঁটে ভিন গ্রহের জীব কী করে তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে

তাকিয়েছিল দেখবার জন্যে পেছন ফিরে দেখলেন— একটা টুল রয়েছে তাঁর পেছনে। আশ্চর্য প্রাণীটা দাঁড়িয়ে ছিল এই টুলের ওপরেই।

সামনে তাকাতেই একটা কাণ্ড করে বসল বিদঘুটে প্রাণীটা। বিকট হাঁ করে তাকাল প্রফেসরের পানে।

এবং, এত কষ্টে নিজেকে সামলে নেওয়া সত্ত্বেও আবার ভীষণ চমকে উঠলেন প্রফেসর।

প্রফেসর পরে আমাকে বলেছিলেন, তিনি বাজি ফেলতে রাজি আছেন যে-কোনও অঙ্কের টাকার— পৃথিবীর এমন ব্যক্তি নেই যে ওই হাঁ দেখে আঁতকে উঠবে না।

প্রফেসর অবশ্য আঁতকে ওঠেননি। আঁতকে ওঠা মানে তো ভয় পাওয়া, গায়ের লোম-টোম এবং মাথার চুল-ফুল খাড়া করে ফেলা। অন্য যে-কোনও শর্মা হলে তাই করত কিন্তু প্রফেসর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনেক বিস্ময় দেখেছেন বলে আঁতকে ওঠা নাকি তাঁকে মানায় না। তাই তিনি শুধু চমকে উঠেছিলেন। ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলেন।

কেননা, চৌকোনা মুন্ডুর গয়নার বাক্সের মতো হাঁয়ের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন কেবল দাঁত।

হ্যাঁ, শুধু দাঁত। সারি সারি দাঁত দেখেই অভ্যস্ত আমরা। কেননা, মানুষের এবং ইতর প্রাণীদের হাঁয়ের মধ্যে দু'পাটিতে দাঁতগুলো সারি সারি সাজানো থাকে। সৃষ্টির শুরু থেকেই এইভাবে আছে। ডাইনোসরদের দাঁতও ছিল এইভাবে সাজানো— কোটি কোটি বছর পরেও তাই আছে এই পৃথিবীর মানুষ এবং ইতর প্রাণীদের মধ্যে।

কিন্তু বিকট বদনের হাঁয়ের মধ্যে তিনি দেখলেন, পৃথিবীর প্রাণীদের এহেন দন্তসজ্জার কোনও বালাই নেই। সেখানে শুধু দাঁত আর দাঁত। ওপরে দাঁত, নীচে দাঁত; যেখানে জিভ থাকার কথা, সেখানে দাঁত। এক কথায় ওপরের চোয়াল আর নীচের চোয়ালের সবটাই কেবল দাঁত। দাঁত ছাড়া আর কিছু নেই। জিভ নেই, টাগরা নেই— কিছু নেই। নিরেট, চ্যাট্যালো, বিস্তর দাঁতের একটা এবড়ো খেবড়ো প্লেট যেন নীচের চোয়ালে, অবিকল সেই রকমই একটা চৌকোণা প্লেট ওপরের চোয়ালেও।

প্রফেসর এত অবাক হয়ে গেলেন যে কোথায় আছেন, কীভাবে আছেন, কার সামনে আছেন, সব ভুলে গেলেন। যা দেখছেন, তা যে পৃথিবীর কোনও প্রাণীর মুখে আজ পর্যন্ত দেখেননি— সুতরাং একটু সাবধান হওয়া দরকার, তাও ভুলে গেলেন। প্রাণীদের পয়লা নম্বর হাতিয়ার যে দাঁত, তাও ভুলে গেলেন। একেবারেই ভুলে গেলেন যে যাদের দাঁত বড়, তারা দাঁতের কাজটাই বেশি করে খাবার জোগাড় করার জন্যে— সুতরাং দাঁতালোদের সামনে যাওয়াটা নিরাপদ নয় মোটেই। সংক্ষেপে, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সেই আশ্চর্য দাঁতের পাটি দেখে নিজের বিপদ-টিপদ একেবারেই ভুলে গেলেন। হাজার হোক তিনি বৈজ্ঞানিক। আশ্চর্য দাঁত দেখে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আচ্ছন্ন করে দিল তাঁর সমস্ত বিপদের চিন্তা, নিজের চিন্তা। দাঁতালোর মুখ গহ্বরের একদম কাছে গিয়ে বিচিত্র দাঁতের বাহার দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেলেন। গুটি গুটি এমন ভাবে দাঁতালোর দিকে এগিয়ে গেলেন যেন অজগর সাপের চোখ দেখে সম্মোহিত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অসহায় হরিণ। এ ক্ষেত্রে অবশ্য জাল দিয়ে ঢাকা সবুজ চোখ দুটো মুছে গেছিল

প্রফেসরের দৃষ্টিপথ থেকে। সে দিকে তিনি তাকাননি। ওঁর সমস্ত মন জড়ো হয়েছিল অদ্ভুত দাঁতের সলিড প্লেট জোড়ার ওপর— তাকিয়েও ছিলেন সেই দিকে এবং দাঁতের টানেই দন্তহীন বৃদ্ধ আস্তে আস্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেলেন সেই দিকে।

দাঁতালো যেভাবে বসে ছিল, উদোম গায়ে ঠিক সেইভাবেই বসে রইল। একহাতে রইল সেই চ্যাটালো পাতলা টালির মতো জিনিসটা। আর একহাতেও যেন কী-একটা ছিল। প্রফেসরের নজর সেদিকে ছিল না। ওঁর তখন দু'চোখ চোখের গর্ত থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে বামন জীবের টালির মতো দাঁতের পাটি দেখবার জন্যে। সেই সঙ্গে নিজের নীচের চোয়ালটাও ঝুলে পড়েছে। দারুণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বলেই মুখটা আপনা থেকেই হাঁ হয়ে গিয়েছে। বামন জীব জাল দিয়ে ঢাকা সবুজ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে হাঁয়ের মধ্যেকার ঝকঝকে দু'পাটি মাড়ির দিকে— যে মাড়ি জোড়ায় দাঁত নেই একটাও।

দু'জনে দু'জনকে দেখতে লাগল এইভাবে। একজন চেয়ে রইল দাঁতের টালির দিকে— আরেক জন দন্তহীন মাড়ির দিকে।

প্রফেসর এসে দাঁড়ালেন বামন জীবের একদম সামনে। নাকে ভেসে এল একটা আঁশটে গন্ধ। মাছেদের গায়ে যেমন থাকে, অনেকটা সেই রকম। কিন্তু প্রফেসরের অন্য কোনও দিকে তখন সাড় ছিল না বলে নাকের যন্ত্রকেও উপেক্ষা করে গেলেন। যার গায়ে আঁশটে গন্ধ, যার দাঁত টালির মতো, সে-যে হাঙর শ্রেণির কেউ হতে পারে— এমন একটা সম্ভাবনাও এল না অসাড় মগজে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এমনই জিনিস। পাগল করে দেয় বৈজ্ঞানিককে। খিদে তেষ্টা, প্রাণের ভয় সব উড়িয়ে দেয়— শুধু জাগিয়ে রাখে আবিষ্কারের স্বপ্ন, নতুন কিছু জানবার প্রচণ্ড কৌতূহল।

সেই কৌতূহলের টানেই প্রফেসর গিয়ে দাঁড়ালেন দাঁতালোর সামনে। দু'চোখ নামিয়ে আনলেন হাঁয়ের অনেক কাছে, মাত্র ইঞ্চি ছয়েক দূরে। তারপর একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ওপর নীচের দাঁতের প্রান্তরের পানে।

প্রান্তরই বলা উচিত। যেন দাঁতের মাঠ। ওপরের একটা, ঠিক নীচেই একটা। সাইজে ছোটখাটো টালির মতো। প্রফেসর তখন নিজেই যেন একটা জীবন্ত ম্যাগনিফাইং গ্লাস হয়ে গেছেন। হাত বাড়িয়ে ড্রয়ার থেকে আতস কাচ টেনে নেওয়ার কথাও খেয়াল নেই। একদৃষ্টে দেখছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখছেন, চোখ কুঁচকে দেখছেন, আবার চোখ বড় করেও দেখছেন। দেখছেন, কেবলই দেখছেন, দেখে দেখে কিছুতেই আশ মিটছে না। কেননা যা দেখছেন কেউ কখনও দেখেনি— কেউ দেখেছে বলেও শোনেননি।

দাঁতগুলো অসমান ঠিকই। কিন্তু ছুঁচোলো নয়। ধারালো নয়। স্ব-দন্ত বা ছেদন-দন্ত বা কুকুরের দাঁতের মতো একটা দাঁতও নেই। কষের দাঁত বলতে যা বোঝায়, তাও নেই। আগাগোড়া টালিটার পুরোটাই যেন একটা দাঁত!

স্তম্ভিত হয়ে তাই চেয়ে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র— দন্তহীন নাটবল্টু চক্র এবং তাঁরও দন্তহীন মাড়ির পানে একইরকমভাবে প্রায় চেয়ে রইল বামন প্রাণী।

এ কী দেখছেন প্রফেসর? নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি আর চওড়ায় তিন ইঞ্চি টালির মতো একটা দাঁত নীচে। হুবহু সেই মাপেরই আর একটা

দাঁত ওপরে। টালি-দাঁতের ওপরের দিকে কিন্তু অনেক রকম কারুকাজ। অনেক আঁকিবুকি, অনেক ছবি, অনেক রেখা। কোথাও বৃত্ত, কোথাও ত্রিভুজ। কোথাও আরও অদ্ভুত জ্যামিতিক ছকের রেখাচিত্র।

দেখেশুনে প্রফেসর যেন নিশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেলেন। এদিকে কিন্তু আরও জোরে নিশ্বাস পড়ছে বামন প্রাণীর। যেন বেশ কষ্ট হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতে। ডিমের মতো বপুটাও ফুলে ফুলে উঠছে। দু'চোখের কোণ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ছে। কান্না বেড়েই চলেছে। কিন্তু ব্যোমভোলা বৈজ্ঞানিকের সে দিকে কি ছাই দৃষ্টি আছে? উনি তখন তদন্ত নিয়েই তন্ময়। এরকম দাঁত হল কেন, এই নিয়ে চিন্তা করছেন প্রবল বেগে। সেই পুরাকালে মাছেদের দেহে হয়তো আঁশের আকারে শুরু হয়ে ছিল দাঁত গজানো। আস্তে আস্তে এল বিবর্তনের ঢেউয়ের পর ঢেউ। মাছ উঠে এল জল ছেড়ে ডাঙায়। প্রয়োজনের তাগিদে, বিবর্তনের দ্রুত ঠেলায়, চেহারা পালটাল আঁশেরা— যেখানে ছিল সরে এল সেখান থেকে— হয়ে গেল দাঁত।

তাই বলে এমন দাঁত! জন্মের সময়ে মানুষ মাত্রই মুখভরতি দাঁত নিয়ে জন্মায়। মাড়ির মধ্যে ঢোকানো থাকে বাহান্নটা দাঁত। কিন্তু— এ কোন ধরনের বিবর্তনের ফলে একটি মাত্র দাঁত নীচে এবং আর একটি ওপরে নিয়ে জন্মেছে বিচিত্র এই জীব? কোন বিবর্তনের ফলে দাঁতেরা চিবোনোর উপযুক্ত আকারে ধারালো, শানানো, ছুঁচোলো না হয়ে এমনি চ্যাটালো টালির আকার নিয়েছে?

এই সময়ে দ্বিতীয় কাণ্ডটা করল বামন প্রাণী।

লিকলিকে ছ'টা আঙুলের একটা আঙুলের ডগা দিয়ে দেখাল হাঁ করা মুখের ভেতরে টালি দাঁতের একটা কোণ।

প্রফেসরের চোখে ছানি পড়েনি ঠিকই— চোখের কাজ এত বেশি করেন যে ছানি বেচারি ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি। তা হলেও চোখের ধার তো কমে এসেছে। তাই অদ্ভুত আঙুলের ডগা দিয়ে কী দেখাচ্ছে বামন জীব তা প্রথমে স্পষ্ট দেখতে পেলেন না। তারপর ঠাহর করতে গিয়ে দেখলেন টালি দাঁতের এক কোণে একটা ফুটো এবং সাদা দাঁতের ওপর একটা কালচে ফুটকি।

আতস কাচটা ড্রয়ার থেকে বার করে নিয়ে দেখলেন প্রফেসর। বেশিক্ষণ দেখতে হল না। বামন জীবের কান্নাকাটি এবং ল্যাবরেটরিতে আসার কারণটাও ধরে ফেললেন।

দাঁত নিয়ে ঝামেলায় পড়েছে বামন জীব। নিশ্চয় দাঁতের উপযুক্ত পরিচর্যা হয়নি। সকাল বেলায় আর রাত্তির বেলায় মাজন আর বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজেনি। তাই মুখের ভেতরকার অগুন্তি জীবাণুরা বীরবিক্রমে আক্রমণ করেছে অমন সুন্দর দাঁতটাকে। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের কণা গেঁজিয়ে তা থেকে অ্যাসিড উৎপাদন করে নিয়েছে জীবাণুরা। সেই অ্যাসিড দিয়ে দাঁতের এনামেল গালিয়ে ঠিক নীচের ডেনটাইনের ওপর ক্ষয় শুরু করে দিয়ে দিয়েছে। কে জানে সেখানে পুঁজের পকেটও তৈরি হয়ে গেছে কিনা।

একসময় দাঁতে পোকা হয়েছে বামন জীবের। দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। তাই এসেছে প্রফেসরের কাছে।

বড় মায়া হল প্রফেসরের। অমন সুন্দর দাঁতে যে পোকারা কিলবিল করতে সাহস পায়, তাদেরকে শায়েস্তা করবার জন্যে হাত নিশপিশ করে উঠল।

প্রফেসর দাঁতের ডাক্তার নন ঠিকই, কিন্তু সারা পৃথিবীতে ওইরকম একখানা ব্রেনও তো আর কারও নেই। এই পৃথিবীতে আইনস্টাইন প্রমুখ বিরাট বিরাট বৈজ্ঞানিকরা যা কিছু আবিষ্কার করে গেছেন, সব তাঁর নখদর্পণে। এমনকী হাতে কলমে বিদ্যে পর্যন্ত জেনে বসে আছেন। দাঁতের ডাক্তাররা যা জানে তা তো উনি জানেনই— যা জানে না, তাও উনি জানেন।

যেমন, বামন জীবের দাঁতের গড়ন আর কিম্ভূত কিমাকার চেহারাটা দেখবার পর উনি বেশ বুঝে গেছিলেন, অনেক কপাল ভাল বলেই ভিন্‌গ্রহের জীবকে এত কাছ থেকে এই প্রথম এমনভাবে খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। বামন জীবের গায়ে আঁশটে গন্ধ থাকতে পারে, মাথার পাশে কানকো থাকতে পারে, হাত আর পায়ের আঙুল চামড়া দিয়ে জোড়া থাকতে পারে সাঁতরানোর সুবিধের জন্যে— কিন্তু তবুও এ-জীব কখনওই পৃথিবীর জীব নয়। কারণ একটাই। কোটি কোটি বছর আগে জলের জীবদেরও দাঁত গজিয়েছিল বিশেষ একটা প্যাটার্নে। উদ্দেশ্যও ছিল একটাই— শিকার দাঁতে কামড়ে চিবিয়ে খাওয়া।

কিন্তু এই মুহূর্তে বিচিত্র যে জীবটিকে দেখে প্রফেসর পুলকিত রোমাঞ্চিত এবং বিস্মিত হচ্ছেন তার দাঁতের গড়ন একেবারেই অপার্থিব। সুতরাং, এক নম্বর সিদ্ধান্ত হল, জীবটা জলের জীব হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর জীব নয়। অন্য গ্রহের এরকম একটা জীবকে আপ্যায়ন করার সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করলেন প্রফেসর।

দু'নম্বর যে সিদ্ধান্তটা মাথায় আসছে, তা আরও চমকপ্রদ এবং পিলে চমকে দেওয়ার মতো। দাঁতের সৃষ্টিই হয়েছে চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে। দাঁত দেখানোর জন্যে নয়। দাঁত দেখিয়ে ভেংচি কাটাটা এইজন্যেই খুবই খারাপ অভ্যাস।

অথচ, অন্য গ্রহের কিম্ভূতকিমাকার ভূতের মতো এই জীবটির দাঁত দুটো মোটেই সেভাবে তৈরি হয়নি। মানে, চিবিয়ে খাওয়ার মতো বেড়ে ওঠেনি। লক্ষ বছর বিবর্তনের ফলেই নিশ্চয় এমন হয়েছে। চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে যদি এ-দাঁতের সৃষ্টি না-হয়, তা হলে দাঁত দুটো এমন পরিপাটিভাবে গজিয়ে উঠল কেন? যে দাঁত এমন টালির আকারে সমস্ত মুখ জুড়ে গজিয়েছে, নিশ্চয় তার একটা বিরাট ব্যবহার আছে। কিন্তু কী সেই ব্যবহার? প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের মতো ভুবন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকও এই হেঁয়ালির কোনও জবাব খুঁজে পেলেন না। ঠিক করলেন, বামন জীবের ভাষাটা জেনে নিয়ে পরে ওকেই জিজ্ঞেস করে নেবেন।

যে দাঁতের সৃষ্টি চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে হয়নি, তাকে সেই কাজে লাগাতে গিয়েই নিশ্চয় ঝামেলা বাধিয়েছে দুই-দন্ত এই বামন জীব। এই পৃথিবীতে এসে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েই মরেছে। দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা আটকে পচে উঠতেই জীবাণুদের হয়েছে পোয়াবারো। এই গ্রহের অদৃশ্য জীবাণুদের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে উঠতে পারেনি অন্য গ্রহের এই জীব। জীবাণুদের আক্রমণ কাটিয়ে ওঠবার মতো রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও তৈরি হয়নি। তাই বিপদে পড়েছে।

বিলেত আমেরিকার মানুষ যেমন এ-দেশের জল খেতে চায় না পাছে পেটের অসুখ হয় এই ভয়ে, ভিন্ গ্রহের এই বামন জীবেরও উচিত ছিল তাই। ফুচকা, তেলেভাজা খাওয়ার মতো লোভ এদেরও আছে দেখা যাচ্ছে।

প্রফেসরের সমস্যা কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারে। বামনজীবের গায়ে রক্ত আছে কিনা জানা নেই। যদি থাকে, তা হলে সেই রক্ত পৃথিবীর ওষুধপত্র সইতে পারবে তো? দাঁতের পোকা মারবার জন্যেই দাঁতের গোড়ায় এমন একটা ওষুধ ছুঁচ ফুটিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয় যার ফলে যন্ত্রণা-টন্ত্রণা একদম হবে না। সেরকম ওষুধ আছে প্রফেসরের ওষুধের বাক্সে। ইঞ্জেকশন নয়— ছুঁচের ডগায় একটুখানি নিয়ে ফুটিয়ে দিলেই হল। অসাড় হয়ে যাবে দাঁতের গোড়া, পটল তুলবে জীবাণুরা। কিন্তু সেই সঙ্গে বামন জীবটাও যদি পটল তোলে? কাজেই, মহাভাবনায় পড়লেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। ছুঁচ ফোটাবেন? না, লেজার রশ্মি দিয়ে দাঁতের গোড়া পর্যন্ত পুড়িয়ে জীবাণু ধ্বংস করবেন? দুটোই সমান বিপজ্জনক।

কিছুক্ষণ মাথা চুলকে ভাবলেন প্রফেসর। এদিকে মুখ হাঁ করে বামন জীব চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। এতক্ষণ হয়ে গেল, একটা কথা পর্যন্ত বলছে না। আশ্চর্য কিছু নয়। বামনজীব জলচর হলে কথা বলবে কী করে? জিভ তো নেই। কুমির কি কথা বলে? হাঙরে গান গায়? তিমি গালাগাল দেয়? জলের মধ্যে কথা বলা যায় না বলেই নিশ্চয় কথা বলতে জানে না। কিন্তু যে জীবের মাথাটা হাঁড়ির মতো তার মগজটাও নিশ্চয় বড়। বুদ্ধিও অনেক। মনের কথা বাইরে প্রকাশের ক্ষমতা রাখে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে পৃথিবীর মানুষ তাদের তুলনায় পাঠশালার শিশু ছাড়া কিছুই নই। সুতরাং কথা না-বলতে পারলেও মনের ভাব প্রকাশের অন্য ক্ষমতা থাকা স্বাভাবিক।

কিন্তু এই বামন মহাপ্রভু হাঁ করে বসে আছে তো বসেই আছে। ধৈর্য আছে বটে। কষ্ট হচ্ছে খুবই। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, হাপরের মতো নিশ্বাস নিচ্ছে— তবুও বসে আছে সুবোধ বালকের মতো।

প্রফেসর ঠিক করলেন, কথা বলেই দেখা যাক।

জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস বামন জীব, পৃথিবীতে আগমনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এই গরিবের ঘরে পায়ের ধুলো দেওয়ার জন্যে আরও ধন্যবাদ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আর হাজার হাজার অপদার্থ বৈজ্ঞানিকের হয়ে আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন দয়া করে হাঁ-টা বন্ধ করে বলবে কি, পৃথিবীর ওষুধপত্র তোমার সইবে কি না?'

হাঁ বন্ধ না-করে বামন জীব চেয়েই রইল। সবুজ চোখের আলো নিভু নিভু হয়েই আবার জোরালো হয়ে উঠল।

প্রফেসর বললেন, 'বুঝলাম। তুমি আমার ভাষা জানো না। কিন্তু খোঁজখবর রাখো। নইলে আমার নাম-ঠিকানা জানলে কী করে। বুদ্ধি করে ভাগ্যিস এখানে এসেছিলে, নইলে যে-কোনও মানুষ তোমাকে দিনের আলোতে দেখেও ভূত মনে করে মূর্ছা যেত। কিছু মনে কোরো না ভায়া, তোমার দাঁত দুটোর মতো সুন্দর যদি তোমার চেহারাখানা হত, তা হলে তো কোনও সমস্যাই থাকত না। কিন্তু ঈশ্বর সে দিক দিয়ে খুবই অন্যায় করেছেন তোমার ওপর। যাই হোক, পৃথিবীর কোনও ভাষা যখন জানো না, তা হলে কি আমার অনুবাদ যন্ত্র বার করব?'

হাঁ করেই রইল বামন জীব। কাঁদতে লাগল ঝরঝর করে।

প্রফেসর বললেন, 'বুঝেছি। কিছুই বুঝতে পারছ না। ঠিক আছে, এই আনলাম আমার বিশ্ববিখ্যাত অনুবাদ যন্ত্র। ভাবছ বুঝি সিন্দুকের মধ্যে কেন রেখেছি এমন একটা দরকারি যন্ত্র? আরে ভায়া, পৃথিবীর ছেলেমেয়েগুলোকে তো চেনো না। একবার যদি শোনে অনুবাদ যন্ত্র পকেটে রাখলেই যে-কোনও ভাষা থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদ হয়ে যায় চক্ষের নিমেষে, তা হলে তো তারা আর অনুবাদ শিখবেই না। তাই বড় বড় কোম্পানির কোটি কোটি টাকার লোভ সামলেও এই যন্ত্র আমি কাউকে বিক্রি করিনি— লুকিয়ে রেখেছি সিন্দুকের মধ্যে। নাও, এবার মুখ নাড়ো দিকি।'

হাঁ করেই রইল বামন জীব। প্রফেসর কত বোঝালেন। ইশারা করলেন। মুরগির ডিমের মতো ছোট্ট যন্ত্রটার সামনে মুখ রেখে ইংরেজি হিন্দি, বাংলায় কত কথা বললেন। কিন্তু বামন জীবের হাঁ আর বন্ধ হয় না।

ভাল রে ভাল! কোনও ল্যাঙ্গুয়েজই যখন তোমার মাথায় সাড়া জাগাচ্ছে না, তা হলে নিশ্চয় টেলিপ্যাথিস্ট তুমি। কথাটথা বলো না মাছেদের শ্রেণির জীব বলে— চিন্তা দিয়ে মনের ভাব পাচার করতে নিশ্চয় পারো। যে-কোনও উন্নত প্রাণীই তা পারে। এই পৃথিবীতেও মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ টেলিপ্যাথিস্ট হয়ে যায়। তা আমি বাপু টেলিপ্যাথিস্ট নই— কিন্তু টেলিপ্যাথির একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছি। ওই যে পরদাটা দেখছ, টেলিভিশনের মতো অনেকটা দেখতে— ওইটা চালিয়ে দিচ্ছি। তোমার মনের কথা ওইখানে ফুটে উঠবে! আমার মনের কথাও ওখানে ফুটে উঠবে! সঙ্গে সঙ্গে সেইসব কথা মগজের মধ্যেও ছাপ ফেলে যাবে— মনে লেখা হয়ে যাবে। এটাও আমার একটা বিরাট আবিষ্কার— কিন্তু কাউকে জানাতে চাই না পাছে চোর বদমাশরা বড়লোকদের লুকোনো টাকাকড়ির সন্ধান পেয়ে যায়, এই ভয়ে। এই নাও, চালিয়ে দিলাম মেশিন। কী হল? পরদা সাদা কেন? তোমার মগজেও কোনও কথা নেই নাকি? নাকি ইচ্ছে করে মগজের কথাকে মেশিনে আসতে দিচ্ছ না। নিশ্চয় তাই। আরে আরে ওটা আবার কী হচ্ছে?

তৃতীয় কাণ্ডটা করে বসল বামন জীব ঠিক এই সময়ে। দেখেই সত্যি সত্যিই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের।

এক হাতে অনেকটা পাটালি রঙের পাটালির মতোই চৌকোনা জিনিস হাতে বসে ছিল বামন জীব। হঠাৎ সেই পাটালিটায় ঘ্যাচ্যাং করে একটা কামড় দিয়ে বাড়িয়ে ধরল সামনে।

প্রফেসরের চোয়াল ঝুলে পড়ল নতুন করে। এ আবার কী? পাটালি কামড়ে এগিয়ে দেয় কেন? খেতে বলছে নাকি? প্রথম আলাপে মিষ্টি কামড়া কামড়ি করার রেওয়াজ আছে নাকি বামন জীবদের সমাজে? পাটালিটা কিন্তু খায়নি বামন জীব। শুধু একটা কামড় বসিয়ে এগিয়ে দিয়ে নাড়ছে প্রফেসরের চোখের সামনেই। কাজেই, দু'চোখের ফোকাস ফেলতেই হল পাটালির ওপর। একবার দেখলেন। তারপর আবার ভাল করে দেখলেন। তার পরের বার বামন জীবের হাঁ করে থাকা মুখবিবরের ভেতরে তাকালেন। আবার পাটালির ওপর কামড়ের দাগগুলো লক্ষ করলেন। ফের হাঁয়ের মধ্যে দুটি মাত্র দাঁতের ওপর আঁকিবুকি লক্ষ করলেন। আবার তাকালেন নরম প্লাস্টিসিনের মতো পাটালির দিকে। জিনিসটা একটা ছাঁচ

নিশ্চয়। দাঁতের কামড়ের হুবহু দাগ পড়েছে এপিঠে আর ওপিঠে। ফুটে উঠেছে অজস্র আঁকিবুঁকি। একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। বামন জীব লিকলিকে লাউডগা সাপের মতো আঙুলের ডগা দিয়ে প্রথমে নিজের হাঁড়ি মাথা ছুঁল, তারপর ছুঁল চ্যাটালো টালি দাঁত। সবশেষে ছাপমারা পাটালি ছাঁচ। তারপর সবুজ চোখের আলো কমিয়ে বাড়িয়ে চেয়ে রইল প্রফেসরের চোখের দিকে। চোখের আলো কমা বাড়ার সঙ্গে নিশ্চয় বামন জীবের আগ্রহ উত্তেজনার সম্পর্ক আছে। ইট রঙিন বিদঘুটে মুখে কোনও ভাবের প্রকাশ নেই— ভাবলেশহীন চিনেম্যানরা পর্যন্ত সে মুখ দেখলে লজ্জায় মরে যেত— কিন্তু উত্তেজনার রোশনাই যেন সবুজ আলো হয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে তারের মতো জাল ঢাকা দুই চৌকোনা চোখে।

আচমকা সব বুঝে ফেললেন প্রফেসর। যেন বুদ্ধির একটা জোরালো ফ্লাশ বাল্ব দপ্ করে জ্বলে উঠল মগজের মধ্যে। চোখের পলক ফেলবার আগেই প্রফেসর বুঝে গেলেন দাঁতালো জীবের দাঁতের রহস্য, বুঝে গেলেন কেন টালির মতো দাঁতে অত আঁকিবুকি, কেন পাটালির মতো ছাঁচে কামড়ে বসিয়ে ব্রেন, দাঁত আর পাটালিকে পর্যায়ক্রমে দেখাচ্ছে, আর কেনই বা চিবোনোর উপযুক্ত করে সৃষ্টি হয়নি এই দাঁত এবং আশ্চর্য এই দাঁতের আসল কাজ কী।

জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের মতো আর একটু হলেই 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠতেন প্রফেসর! কিন্তু 'ইউরেকা' বললে নিজস্ব কিছু তো থাকে না। পরের নকল করেন না প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, সবাই নকল করে তাঁকে।

তাই ভীষণ উত্তেজনাকে ভীষণভাবে চেপে রেখে ভীষণ আস্তে আস্তে প্রফেসর মেঝের ওপরেই ধপ করে বসে পড়লেন।

এবং বললেন ভীষণ মৃদুস্বরে, 'বৎস বামন, এই হল গিয়ে তোমার ভাষা! দাঁতের ভাষা!'

প্রফেসরের নাকের সামনে পাটালিটা নাড়তে লাগল বামন জীব। কমবেশি হতে লাগল চোখের সবুজ দ্যুতি। জল গড়াতে লাগল চোখের কোল বেয়ে। হাওয়া ভরতি হাপরের মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল ডিমের মতো বিরাট ধড়টা।

প্রফেসর উত্তেজনার চোটে এবার নিজেই হাপরের মতো হাঁপাতে লাগলেন। বললেন প্রায় খাবি খেতে খেতে এবং তোতলাতে তোতলাতে, 'তো— তোমার ভা— ভাষাটা তা— হলে দাঁতের ভাষা! দাঁতের ওই দা— দাগগুলো তা হলে এ-এক-একটা অ-অক্ষর? সা-সা-সাংকেতিক চিহ্ন?'

কামড়ের দাগ ফুটে ওঠা পাটালিটা দাঁতালো সমানে নাড়তে লাগল হতভম্ব প্রফেসরের নাকের সামনে।

এ যে যুগান্তকারী আবিষ্কার! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন প্রাণীও তা হলে আছে? জলের নীচে বাস করে বলে দাঁত দিয়ে অক্ষরের ছাপ ফুটিয়ে তুলে মনের ভাব প্রকাশ করে।

অনেকগুলো রহস্য একই সঙ্গে প্রফেসরের কাছে এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। বামন জীবের কান্না বলে যা মনে করছিলেন, আসলে তা মোটেই কান্না নয়। কুমির কি কাঁদে? মোটেই না। লবণ গ্রন্থির মুখটা থাকে চোখের কোণে। বাড়তি নুন জলের আকারে বেরিয়ে

যায় চোখের কোণ দিয়ে। মনে হয় কুমিরের কান্না— যা সত্যিই মিথ্যে। সমুদ্র-সরীসৃপ বলতে যাদের বোঝায়, সেই কাছিম, সর্প আর গিরগিটিদের চোখের কোনা দিয়ে জল পড়ে শরীরের বাড়তি নুন বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। তাই সবুজ কাছিম ডাঙায় এসে ডিম পেড়ে ফিরে যাওয়ার সময়ে মনে হয় যেন ডিমের শোকে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। শিকারকে ভক্ষণ করে কুমিরের চোখেও জল দেখে মনে হয় বুঝি অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরছে বেচারি কুমির। কিন্তু ভুল! ভুল! সব ভুল! লবণ গ্রন্থি থাকে এদের চোখের কোণে। যেমন আছে এই বামন জীবের চোখের কোণে। জল থেকে উঠে আসার ফলে অসমোটিক প্রেশারের তারতম্য ঘটায় লবণ বেরিয়ে যাচ্ছে অশ্রুর আকারে।

অশ্রু রহস্য ভেদ করে মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠল প্রফেসরের। এবার এদের ভাষাটা রপ্ত করা যাক।

ভেবেছিলেন খুব সহজ হবে। কিন্তু কাজে নেমে দেখলেন, ভারী কঠিন ব্যাপার। বামন জীবের মাত্র দুটি দাঁতের ওপর এত সূক্ষ্ম সাংকেতিক চিত্রলিপি আঁকা যা বোঝবার সাধ্য প্রফেসরেরও নেই। একে তো ভিনগ্রহী চিত্রলিপি, তার ওপর অত কারুকাজ। লক্ষকোটি বছর ধরে বিবর্তনের পথ বেয়ে বামন জীবরা যা রপ্ত করেছে, তা ঝট করে ধরে ফেলা দূরের কথা, যান্ত্রিক মগজ লাগিয়েও পারবেন না।

তখন একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। প্রফেসর ভেবে দেখলেন, দাঁতের ভাষায় যারা এত চৌকস, তাদের পক্ষে বাংলা অক্ষর শেখাটা নিশ্চয় অনেক সহজ হবে।

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় জোগাড় করে আনা তখন সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি ব্ল্যাকবোর্ডে চকখড়ি দিয়ে লিখলেন অ-আ-ক-খ ইত্যাদি স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ। যে-কোনও বাঙালি শিশু বামন জীবের ব্রেনের ক্ষমতা দেখলে অবাক হয়ে যেত। একবার মাত্র দেখেই অদ্ভুতভাবে পাটালি কামড়ে প্রত্যেকটা হরফের ছাপ ফুটিয়ে তুলল সে নিখুঁতভাবে। দেখতে দেখতে শেখা হয়ে গেল বর্ণ পরিচয়। তারপর শব্দ পরিচয়। তারপর বাক্য পরিচয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো বাংলা ভাষা শেখা হয়ে গেল বামন জীবের।

এরপর আরম্ভ হল প্রশ্ন করা আর উত্তর নেওয়ার পালা। বলাবাহুল্য, মুখ দিয়ে প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন না— ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলেন। বামন জীব পাটালি ছাঁচে ঘচাঘচ কামড়ে গোটা গোটা হরফে তার জবাব দিয়ে গেল।

প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস বামন জীব, তোমার কী হয়েছে?...'

বামন জীব বললে, 'ফোকলা প্রফেসর, আমি এসেছি ছায়াপথের বাইরে একটা গ্রহ থেকে।' প্রফেসর রেগে গেলেন, 'ফোকলাকে ফোকলা বলতে নেই, পৃথিবীর শিষ্টাচারে এটা অসভ্যতা।' বামন জীব বললে, 'পৃথিবীর শিষ্টাচারে বামনকে বামন বলা কি সভ্যতা?'

'দুঃখিত। কিন্তু তোমাকে কী বলে তা হলে ডাকব, বৎস?'

'তার আগে তোমার আর একটা ভুল শুধরে নাও, প্রফেসর। বৎস কাকে বলে?'

'বৎস কাকে বলে?' ভাবনায় পড়লেন প্রফেসর, মাথা চুলকে ভেবে নিয়ে বললেন, 'যাকে স্নেহ করা যায় তাকেই বলে। সন্তানের মতো যাকে স্নেহ করা যায়। অর্থাৎ, বাছা বলাও যা বৎস বলাও তাই।'

'অর্থাৎ, আমি তোমার সন্তানের মতো?'

'তা তো বটেই। কত ছোট তুমি— একটা দাঁতও পড়েনি। আর আমার? দ্যাখো'— বলে ফোকলা মাড়ি দেখিয়ে— 'সব দাঁত পড়ে গেছে।'

'কত বয়স তোমার, প্রফেসর?'

'আশি।'

'পৃথিবীর হিসেবে। মানে, পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে এক পাক ঘুরে এলে যা হয়, তার নাম এক বছর?'

'নিশ্চয়।'

'তা হলে প্রফেসর, এবার থেকে তুমি আমাকে দাদুর দাদু বলে ডাকবে, আর আমি তোমাকে বৎস বলে ডাকব।'

'মানে?' প্রফেসর এবার কিন্তু একটু অপমান বোধ করলেন। ছোঁড়াটা কম ফক্কড় নয় তো। দীননাথের চাইতেও ডেঁপো।

বামন জীব বললে, 'তোমাদের পৃথিবীর হিসেবে আমার বয়স তিনশো বছর!'

আবার চোয়াল ঝুলে পড়ল প্রফেসরের, 'কী বললে? তিনশো বছর?'

'হ্যাঁ বৎস। আমার বয়স তিনশো বছর। হাজার না হলে আমাদের গ্রহে কেউ বুড়ো হয় না, দাঁতও পড়ে না।'

আর কথা না-বাড়িয়ে প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন, 'তা এই গ্রহে আসা হয়েছে কেন?'

'আমাদের গ্রহে ডাঙা নেই— কেবল জল। কিন্তু সেই জলেও পিলপিল করছে ডাঙুস—'

'ডাঙুস।'

'হ্যাঁ, আমাদের নাম। তোমরা যেমন মানুষ, আমরা তেমনি ডাঙুস। যাক যা বলছিলাম, অতবড় গ্রহ আমাদের, কিন্তু অত জলেও পিলপিল করছে ডাঙুস। তাই আমরা বেরিয়ে পড়েছি গ্রহ ছেড়ে অন্য গ্রহে থাকবার জায়গা বার করার জন্যে। তোমাদের এই সূর্যের এতগুলো গ্রহের মধ্যে দেখলাম তিন নম্বর গ্রহ এই পৃথিবীতেই বাস করার মতো জল রয়েছে— পৃথিবীর তিনভাগ জুড়েই জল রয়েছে। অথচ বোকা মানুষগুলো এক ভাগ ডাঙা নিয়েই মারামারি করে মরছে।'

প্রফেসরের আবার রাগ হয়ে গেল ডাঙুসের বাচালতা দেখে। বললেন, 'ফট করে কাউকে বোকা বলবার আগে ভাবতে হয়! কেন জলে মানুষ থাকে না, সেটা কি জানো? তোমার মতো কানকো আছে? জল থেকে অক্সিজেন টানবার ক্ষমতা আছে? নোনা জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে?'

'বৎস প্রফেসর, তোমার নিশ্চয় জানা নেই সমুদ্রে যারা বাস করে, সেই মাছ আর জন্তুদের শরীরে নুনের ভাগ কম থাকে। খাবারের সঙ্গেই তারা টাটকা জল পেয়ে যায়। তোমাদেরই এক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করে দেননি বেঁচে থাকার মতো সব কিছুই সমুদ্রে আছে— এমনকী লবণহীন জল পর্যন্ত?'

'সমুদ্রে— লবণহীন জল?' প্রফেসর হেসে উঠলেন খি-খি করে।

ডাগুস বললে, 'ওইরকম মাড়ি বার করে, দয়া করে হেসো না। সেই ভদ্রলোকের নাম এ বম্বার্ড। জাতে ফরাসি। পেশায় ডাক্তার। একটা রবারের নৌকায় চেপে আটলান্টিক মহাসমুদ্র পেরিয়ে ছিলেন বম্বার্ড। মাছ আর ছোট ছোট মেরুদণ্ডী জীব নৌকো থেকে ধরে খেতেন— আর কিছু না। তেষ্টা পেলে মাছ নিংড়ে ভেতর থেকে জল বার করে খেতেন। ইয়োরোপ থেকে বেরিয়ে আমেরিকা পৌঁছোতে তাঁর লেগেছিল পঁয়ষট্টি দিন। ডাঙা থেকে কোনও খাবার বা জল না-নিয়ে গিয়েও তিনি বেঁচে ছিলেন এতগুলো দিন এবং প্রমাণ করে দিয়েছিলেন— জাহাজডুবি হয়ে লোকে খিদে তেষ্টায় কখনওই মরবে না— যদি সমুদ্রের ওপর বিশ্বাস রাখে। বৎস প্রফেসর, দেখা যাচ্ছে সে বিশ্বাস তোমারও নেই।'

ধমক খেয়ে মুখ চুন করে প্রফেসর বললেন, 'হয়েছে, আর জ্ঞান দিতে হবে না। আমাদের বয়ে গেছে নোনা জলে থাকতে। তোমাদের ইচ্ছে হয় থাকো গে— কে বাধা দিচ্ছে?'

'বৎস প্রফেসর, তোমাদের মতো স্বার্থপর আমরা নই। আমরা জানি ভগবান সব জায়গাতেই বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ তৈরি করে রেখেছেন— শুধু তা আবিষ্কার করে নিতে হয়।'

'ভগবান মানো?'

'তোমাদের মতো উজবুক বৈজ্ঞানিকরাই ভগবান মানে না। তোমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরও তিনি সৃষ্টি করেছেন। কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের দিকে তাকালে মনে হয় না কে সেই কারিগর যার হাত দিয়ে এমন সৃষ্টি সম্ভব?'

'থাক, থাক, ভগবান নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। আমরা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা যার প্রমাণ পাই না, তার অস্তিত্বও স্বীকার করি না। থাক সে কথা, তোমরা গিয়ে থাকো সমুদ্রে— আমাদের থাকতে দাও ডাঙায়।'

'মূর্খ! এইটুকু ডাঙা নিয়ে কেন এত মারামারি করছ তোমরা? সমুদ্রের সম্পদ তোমাকে দেখাব বলেই তো এসেছি আমি। তোমার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে জানাতে চাই, সমুদ্র ডাকছে তোমাদের। হে মানুষ, সমুদ্রতেই একদিন কোটি কোটি বছর আগে তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি হয়েছিল, ডাঙায় উঠতে শিখে তোমাদের অবনতিই হয়েছে মগজ পর্যন্ত সে ভাবে বাড়েনি— তাই আবার ফিরে এসো সমুদ্রে।'

'আর যদি না-যাই?'

'সে ব্যবস্থাও করব।'

'কী করবে?'

'সেটা পরে জানবে। আমাদের ক্ষমতা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। এই জিনিসটা দেখছ?'

বলে, আর এক হাতের মুঠো খুলে দেখাল ডাগুস। প্রফেসর দেখলেন ছোট্ট একটা নীলা চকচক করছে চেটোর মধ্যে।

'কী এটা? নীলা?'

'তোমার মুন্ডু বৎস প্রফেসর, এই আমাদের সমস্ত শক্তির উৎস। ক্রিস্টাল দিয়ে কসমিক

রশ্মিকে সংহত করে এমন প্রলয় ঘটাতে পারি যা তোমাদের হাজার অ্যাটম বোমাতেও সম্ভব নয়।'

'এই দিয়ে তুমি আমাদের সমুদ্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

'জানতে চাও? ভয় পাবে না?'

'না!'

'ডাঙা নিশ্চিহ্ন করে দেব। জল ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু থাকবে না।'

'তুমি পাগল।'

'বৎস প্রফেসর, ডাঙুসরা কখনও পাগল হয় না। এই পৃথিবীতে বসেই কসমিক রশ্মি সংহত করে তোমাদের সূর্যকে পর্যন্ত ফাটিয়ে দিতে পারি।'

'বড্ড বকবক করছ দেখছি। সূর্যকে ফাটিয়ে দেবে ওই মটরদানার মতো নীল পাথর দিয়ে?'

'তা পারি। সূর্যের সমস্ত রশ্মি সূর্যের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে। মহাশূন্য দিয়ে যে সব অজানা রশ্মি হরদম ছুটোছুটি করছে— তাদের, এই পাথরের মধ্যে দিয়ে ফোকাস করে— তোমাদের প্রতিবেশী গ্রহগুলোকেও একে একে ধ্বংস করতে পারি।'

'পাগল নাকি?'

'বৎস প্রফেসর, কিন্তু ধ্বংস করা আমাদের কাজ নয়— তাই এসেছি এই পৃথিবীতে! যদি নিজেদের মধ্যে মারপিট বন্ধ না-করো, সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার গবেষণা শুরু না-করো, তা হলে প্রথমেই সুমেরু আর কুমেরুর বরফ গলিয়ে দুশো ফুট জল বাড়িয়ে ডুবিয়ে দেব পৃথিবীকে।'

'এত তেজ তোমার ওই পাথরের?'

'দেখবে?' বলেই হাতের তেলোয় রাখা পাথরটাকে বিশেষ কায়দায় ঘুরিয়ে দেওয়ালের দিকে ফেরাল ডাঙুস। রশ্মি টশ্মি কিছু দেখা গেল না। খালি ধোঁয়া উঠতে লাগল দেওয়াল থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের গায়ে দেখা গেল একটা ফুটো। ইটের দেওয়ালের ওপাশে বাগানের গাছ দেখা যাচ্ছে।

'বিশ্বাস হল?'

ঢোক গিলে প্রফেসর বললেন, 'তা তো হল। কিন্তু এতই যদি তোমার ক্ষমতা তো দাঁতে পোকা মারতে আমার কাছে এসেছ কেন?'

কাঁচমাচু ভাষায় ডাঙুস বললে, 'এইটাই আমাদের একমাত্র ত্রুটি। দাঁতই আমাদের সব— অথচ দাঁতের ডাক্তার একজনও নেই। তার কারণ, আমাদের গ্রহে দাঁতের অসুখ কখনও হয়নি। এই গ্রহে সমুদ্রের খাবার খেয়ে এমন দাঁত ব্যথা করছে—'

'তা হলে সমুদ্রের খাবার খাওয়া উচিত নয় বলো?'

'সয়ে গেলে ফের খাব এখন দাঁতের ব্যথাটা সারিয়ে দাও দিকি বাপু।'

প্রফেসর ছুঁচের ডগায় ওষুধ নিয়ে বললেন, 'আমাদের ওষুধ তোমাদের সইবে তো?'

'খুব সইবে। দেহযন্ত্র তোমাদের আমাদের মোটামুটি একই। দাও, দাও, তাড়াতাড়ি দাও— বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'রক্তের উপাদান?'

'বৎস প্রফেসর, অযথা সময় নষ্ট করছ। এতক্ষণে তোমার বোঝা উচিত ছিল যে আমাদের জ্ঞান তোমার চেয়ে অনেক... অনেক বেশি।'

'তা সত্ত্বেও দাঁতের ব্যথা সারাতে হয় কী করে, তা জানো না,' প্রফেসরও খোঁচা মারতে ছাড়লেন না।

সবুজ চোখ জ্বলে উঠল দাঁতালোর।

বললে, 'খুব যে টিটকিরি দিচ্ছ হে ছোকরা।'

'ছোকরা!' প্রফেসর নিদারুণ চটলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছোকরা! আমার বয়সের তুলনায় তুমি ছোকরা ছাড়া কিছুই নয়। তোমাদের এই পৃথিবীর বাতাসে জলে মাটিতে অদৃশ্য জীবাণুদের ডিপো। ঠিক তেমনি জীবাণুদের ডিপো আমাদের গ্রহেও আছে। আমাদের শরীরে সয়ে গেছে। আমাদের গ্রহের জীবাণুদের আক্রমণে তুমি কি পারবে টিকে থাকতে? মাংস গলে খসে পড়বে— এমন জীবাণু আছে, তোমাদের প্রত্যেকটা কোষেব মধ্যে বাড়িঘরদোর বানিয়ে তুলবে। কেন, এই তো সেদিন এমনি একটা সিনেমা দেখানো হয়ে গেল তোমাদের এই কলকাতায়। ইনক্রেডিবল মেল্টিংম্যান। মঙ্গলগ্রহে পা দেওয়ার পরিণামে কী হয়েছিল স্টীভ নামধারী মহাকাশচারীর? মানুষেরই রক্ত পান করে সে বাঁচতে চেয়েছিল— কিন্তু তাও পারল না। সে তুলনায় আমরা অনেক উন্নত বলেই তোমাদের জীবাণুরা এখনও পর্যন্ত আমাদের সে রকম কোনও ক্ষতিই করতে পারেনি। শুধু এই দাঁতটায় হঠাৎ ওদের আক্রমণটা—'

ব্যঙ্গ করলেন প্রফেসর, 'কিন্তু দাঁতই তো সবচেয়ে দরকারি দেহযন্ত্র, তাই নয় কি? যদিও দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা কেউ বোঝে না। বুনো জন্তুরা দাঁত ছাড়া কত অসহায় জানো? এমনকী মানুষ পর্যন্ত নকল দাঁতের পাটি লাগিয়েই আসল দাঁতের শোক ভুলতে পারে না। জিম করবেটের নাম শুনেছ?'

'সে আবার কে?'

'সমুদ্রে থাকো বলেই তার নামটা পর্যন্ত শোনোনি। সে ডাঙার লোক। মস্ত শিকারি। এখন মারা গেছে। তার শিকারের গল্পেই আছে মাত্র একখানা কুকুরে দাঁত পড়ে যাওয়ার ফলে বনের বাঘ গাঁয়ের গোরুবাছুর মানুষ ধরে খাওয়া শুরু করে— বনের জানোয়ার আর ধরতে পারে না বলে। মূল্যবান এই দাঁতকে রক্ষে করার কোনও ব্যবস্থা তোমরা করোনি। কাজেই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা তোমাদের মুখে মানায় না।'

কটমট করে চাইল বোধহয় ডাঙুস— সবুজ চোখ দুটো জ্বলে উঠল সবুজ ফানুসের মতোই।

দাঁত কিড়মিড় করে দাঁতের ছাপ পাটালিতে ফেলে যা বললে, তা এই, 'ওরে, ছোকরা, আমি মরছি দাঁতের ব্যথায়, আর তুই ঝাড়ছিস লেকচার!'

মনে মনে প্রফেসর বললেন, 'দাঁড়াও না যাদু, তোমার আক্কেল দাঁত গজিয়ে ছাড়ছি এবার।'

মুখে বললেন মানে বোর্ডে লিখলেন, 'ইঁদুররা কিন্তু দাঁতের খুব মর্যাদা বোঝে। ওরা দাঁত দিয়ে এত জিনিস কুটুর কুটুর করে কেটে চলে যে সবচেয়ে শক্ত ধাতু দিয়ে ওদের দাঁত তৈরি করে দিলেও সে দাঁত ক্ষয়ে চুন হয়ে যেত। তাই ওদের সামনের দাঁত দিনরাত সমানে বেড়ে চলেছে। এত তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে যে ওদের যদি দাঁত ক্ষওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে হুড়হুড় করে বেড়ে যায় দাঁত— বেচারিরা দাঁত নিয়ে তখন নড়াচড়াও করতে পারবে না। মাসে ওদের সামনের দাঁত কতখানি বাড়ে জানো—'

'বৎস প্রফেসর—'

'মাসে তিন সেন্টিমিটার। তার মানে দাঁতের কাজ বন্ধ করে দাঁতকে বাড়তে সুযোগ দিলে বুড়ো বয়সে দাঁত হবে সত্তর থেকে একশো সেন্টিমিটার লম্বা। করাত দিয়ে দাঁত কেটে দেওয়া ছাড়া তখন আর উপায় থাকবে না।'

'প্রফেসর নাট—'

'এ তো গেল ছোট্ট প্রাণীর কথা। ডাঙার সবচেয়ে বড় প্রাণীর দাঁত না-থাকলে পরমায়ু পর্যন্ত কমে যায়। বড় প্রাণীটা কে জানো তো? হাতি, হাতি। এদের আবার মাত্র দু'জোড়া কাজের দাঁত থাকে। একজোড়া ওপরের চোয়ালে, আর একজোড়া নীচের চোয়ালে। আর থাকে কুঁড়ি দাঁত পাঁচজোড়া— প্রত্যেক চোয়ালে। কাজের দাঁত পড়ে গেলে কুঁড়ি দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে কিন্তু ষষ্ঠ জোড়া পড়ে যাওয়ায় পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্য ভেঙে যায় অমন বলশালী জন্তুরও। সেদিক দিয়ে তোমাদের মাত্র দুটো দাঁত। একটু যত্ন নেওয়া উচিত ছিল নয় কি?'

সবুজ চোখ ভীষণ সবুজ করে ডাঙুস বললে, 'বৎস প্র—'

প্রফেসর সাততাড়াতাড়ি বোর্ডে লিখলেন, 'এবার আসা যাক জলের জীবদের ক্ষেত্রে— যে জলের জীব তোমরা নিজেরাও। দাঁত ছাড়া হাঙররা টিকে থাকতে পারত? ওদের চোয়ালের ভেতর দিকটা সারি সারি বল্লমের মতো দাঁত সাজানো। ডগাগুলো ফিরানো পেছনের দিকে— যাতে শিকারকে একবার দাঁতে কামড়ে ধরলে আর ফসকে না-যায়। হাঙরের দাঁতও কামড়ে কামড়ে ক্ষয়ে যায়। সামনের দাঁত পড়ে গেলে পেছন থেকে ঠেলা খেয়ে নতুন দাঁত গজায় সামনে। এইভাবে চলে বুড়োবয়স পর্যন্ত, যদ্দিন না সে মারা যাচ্ছে। এই কারণেই বুড়ো হাঙরও লড়তে পারে ছোকরা হাঙরের মতো। আর তোমরা? মাত্র দুটো দাঁতের যত্নও নিতে শেখোনি? ক্ষয়ে চুন হয়ে গেলে কথা বলবে কী করে?'

'প্রফেসর নাটবল্টু—'

'না, না, আমার কথা আগে শেষ করতে দাও,' প্রফেসরকে তখন থামায় কার সাধ্যি— 'রুই কাতলা শ্রেণির মুখে দাঁত থাকে না। তাই বলে কি তারা আমার মতো একেবারেই দন্তহীন? মোটেই নয়। দয়া করে ওদের গলায় আঙুল দিতে যেয়ো না যেন। গলাতেই দাঁত সাজানো থাকে এই শ্রেণির মাছেদের— খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করে গলার মধ্যে। আবার তিমি, সিন্ধুঘোটক আর সিল মাছেরা—'

এই পর্যন্ত বলতে না বলতেই আবার একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসল ডাঙুস। বিশাল হাঁ করে বার কয়েক হেঁচকি তুলতেই খটাস খটাস দুমদাম শব্দে অনেকগুলো নুড়ি পাথর মুখ থেকে

ঠিকরে এসে পড়ল ল্যাবোরেটরির মেঝেতে। এক একটা পাথরের ওজন তিন থেকে চার কিলোগ্রামের মতো।

একটা পাথর হাতে তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে দেখলেন প্রফেসর। তারপর ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলেন, 'পাথরগুলো উগরে ফেলে একটু স্বস্তি পেয়েছ দেখছি। যাদের নাম বলছিলাম, তাদের শ্রেণিতে তা হলে তোমাকেও ফেলা যায়। তিমি, সিন্ধুঘোটক আর সিল মাছেরাই পাথর গেলে কোঁত কোঁত করে সাধারণত দুটো কারণে। ঝিনুক, শামুক জাতীয় শক্ত খোলাওলা খাবারগুলোকে পেটের মধ্যে পাথরের যাঁতায় ফেলে গুঁড়িয়ে ফেলার জন্যে। আর, পাথর দিয়ে শরীরের ওজন বাড়িয়ে গভীর জলে চলাফেরার সুবিধের জন্যে। তুমিও তা হলে গভীর জলের জীব।'

পাথর বমি করে একটুও লজ্জিত না-হয়ে ডাঙুস বললে ঘচাঘচ করে পাটালি কামড়ে— 'অনেকক্ষণ থেকেই আমার এই দুটো দাঁতের অমর্যাদা তুমি করে যাচ্ছ, ছোকরা। নেহাত বাড়ি বয়ে এসেছি দাঁতের পোকা মারতে, নইলে কোঁত করে তোমাকে গিলে নিয়ে তোমার মতো উজবুককে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিতাম খাবার জন্যে দাঁত আমাদের চোয়ালে রাখি না ইতর প্রাণীদের মতো থাকে অন্ননালী আর কণ্ঠনালীর মধ্যে। বড় বড় খোঁচা খোঁচা ধারালো দাঁত হে ছোকরা— একবার ঢুকলে আর বেরিয়ে আসা যায় না পেটে নেমে যেতে হয়।'

প্রফেসর যেন খুব মজা পেলেন কথাটা শুনে, 'তাই বলো, এরকম লুকোনো দাঁত তো আমাদের সমুদ্রেই অনেক শিকারি মাছ আর সামুদ্রিক কচ্ছপের থাকে। তারা কিন্তু আমাদের তুলনায় ইতর প্রাণী।' এই পর্যন্ত লিখে দুই চোখে দুষ্টুমি নাচিয়ে ডাঙুসের পানে চেয়ে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। ডাঙুস তখন বাক্যবাগীশ প্রফেসরের যুক্তির ধারে প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে বললেই চলে। পাটালি কামড়ে মনের ভাব প্রকাশ করতেও ভুলে গেছে। একটা ফোকলা মানুষের কাছে হার স্বীকার করা কি কম অপমানের ব্যাপার। একে দাঁতের ব্যথা, তার ওপর আঁতে ঘা মেরে কথা বলা। কাঁহাতক আর সহ্য হয়।

প্রফেসর বুঝলেন, ডাঙুস ঘায়েল হতে চলেছে তর্কযুদ্ধে।

তাই ফের শুরু করলেন, 'কিছু পাখিও পাথর খায়— দাঁত নেই বলে। পেটে গিয়ে পাথরগুলো যাঁতাকলের মতো গুঁড়িয়ে দেয় শক্ত খাবার। পাখিদের আমরা ইতর প্রাণী বলি। তোমাদের পাথর খাওয়া, আর ঠিক পাখিদের আর তিমি, সিন্ধুঘোটক, সিল মাছের মতো পাথর বমি করা দেখে দুঃখ পেলাম। তোমাদের মতো উন্নত প্রাণীদের বোঝা উচিত ছিল, এটা ব্যাড ম্যানার্স— অসভ্যতা। ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকে দয়া করে আর কোথাও পাথব বমি কোরো না।'

'প্র-প্র—'

ডাঙুসও তোতলায় নাকি? উত্তেজনায় কথা আটকে গেছে মনে হচ্ছে?

প্রফেসর কি আর সময় দেন? প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে এনে মায়া, দয়া দেখানো অত্যন্ত খারাপ রণনীতি। তাই কথার তোড়ে ভাসিয়ে দিলেন বাক্যবাণে মুমূর্ষু ডাঙুসকে।

বললেন (মানে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলেন) 'এই যে তোমাদের দাঁতে পোকা হয়েছে, এটা

কেন হল জানো? মানুষের মতো উন্নত জীব এখনও হতে পারোনি বলে। সব জীবেরই মুখ দিয়ে যে লালা বেরোয়, তার অল্পবিস্তর বিষাক্ত। লালার মধ্যে অনেক রকম এনজাইম থাকে। এই এনজাইমদের খপ্পরে পড়লে খাবার হজম তো হয়ই, এ ছাড়াও মুখের লালার অন্যান্য বিষের ফলে জীবাণুরা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা পচাখাবারের ওপর বাসা বেঁধে দাঁতকে জখম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতর প্রাণীদেরও তাই দাঁতে পোকা হয় না— হল তোমার। তা হলে বুঝে দ্যাখো পৃথিবীর সব চেয়ে নিচু স্তরের জীবেদেরও নীচে তোমাদের স্থান হওয়া উচিত। কাজেই, হে ডাণ্ডুস দাদামশাই অহংকারে মটমট করা তোমাকে মানায় না।'

ভীষণ উত্তেজিত হওয়ার ফলে এবার ডাণ্ডুসের মুখের কষ বেয়ে টস্‌টস্‌ করে লালা গড়িয়ে পড়ল কেমিক্যাল টেবিলের কাঠে। যেখানে পড়ল, ধোঁয়া উঠতে লাগল সেই সব জায়গা থেকে।

'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ' করে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। 'এ কী অসভ্যতা! শিষ্টাচারের কিছুই দেখছি শেখোনি তোমরা! মুখ দিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিড বার করছ! ভাবছ মুখের লালার কেরামতি দেখিয়ে আমাকে চমকে দেবে। আরে মানুষের পেটেও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে। খাবার দাবার পেটে গেলে গ্ল্যান্ড থেকে এই অ্যাসিড বেরিয়ে আসে হজম করানোর জন্যে। কিন্তু যেখানে সেখানে অ্যাসিড বমি তো আমরা করি না। এতই যদি অম্বল হয়ে থাকে তোমার তো বললেই পারো— বড়ি দিচ্ছি সব সেরে যাবে। কিন্তু ভদ্রলোকের ঘরে অ্যাসিড বমি করা কি কোনও ভদ্র জীবের কাজ? ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ,! আরে, এ কাজ তো একশ্রেণির শামুক গেঁড়িরাও করতে পারে। শামুক জাতীয় অন্য প্রাণীদের কঠিন খোলা ছেঁদা করার জন্যে ঢেলে দেয় অ্যাসিড। খোলা ফুটো হয়ে গেলেই ভেতরকার নরম শাঁসের মতো জীবকে শুঁড় দিয়ে টেনে এনে খায়। তোমাদেরও দেখছি একই ভাবে খাওয়ার অভ্যেস। শামুক ফুটো করো নিশ্চয় সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে— তারপর ওই লিকলিকে আঙুলের ডগা দিয়ে বেচারাদের শাঁস টেনে এনে খাও? ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ। একেবারেই বর্বর শ্রেণির প্রাণী তোমরা!'

সালফিউরিক অ্যাসিড ভরতি মুখের লালা ততক্ষণে টেবিল থেকে গড়িয়ে মার্বেল মেঝেতে পড়েছে। হিস্‌ হিস্‌ করে সেখান থেকেও ধোঁয়া উঠছে।

দাঁত কিড়মিড় করার ভঙ্গিমায় পাটালি কামড়ে ডাণ্ডুস বললে, 'ইচ্ছে করছে তোর মাথার খুলিতে কয়েক ফোঁটা লালা ফেলে ফুটো করে খুলিটা টেনে এনে খাই।'

প্রফেসর মনে মনে সত্যিই ভয় পেলেও বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। বললেন ভীষণ ঘেন্নার সুরে 'আরে ছ্যাঃ। বিষাক্ত লালা দিয়ে মানুষ মারে কারা জানো? সাপেরা। যাদের আমরা ঘেন্না করি সব চাইতে বেশি। মানুষকে সাপ বলার মতো বড় গালাগাল আর নেই। ওদের মুখের লালাই তো বিষ। দাঁতের গোড়ায় থলির মধ্যে জমা থাকে। দাঁত দিয়ে কামড়ালেই চাপ পড়ে থলিতে— দাঁতের ফুটো দিয়ে ছিড়িক করে লালা-বিষ ঢুকে যায় মানুষের রক্তে। তোমার দাঁতের ওই ফুটোটাও যে বিষ পিচকিরি করার ফুটো নয় তা জানব কী করে? আর তো আমি ভরসা পাচ্ছি না।'

দাঁতের যন্ত্রণায় এবার মুখের রং পর্যন্ত পালটে গেল ডাঙুসের। ছিল ইট, হল শালগ্রাম শিলার মতো কালো মিশমিশে। চোখের রং এতক্ষণ সবুজের মধ্যেই ওঠানামা করছিল— এবার তা একবার হতে লাগল হলুদ, আর একবার নীল। বর্ণালীতে সবুজ রঙের দু'পাশে যে নীল আর হলদে রংই আছে। প্রফেসর দেখেশুনে আন্দাজ করলেন আরও কিছুক্ষণ রাগাতে পারলে ডাঙুসের চোখে বেগুনি আর নীল রং পর্যন্ত এবার দেখতে পাবেন। মুখে কিন্তু বললেন দারুণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে— এমনভাবে বললেন যেন সামনে যাকে দেখছেন, সে একটা আস্ত কেউটে— ডাঙুস নয়।

বললেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার সামনে থেকে কত ফুট দূরে দাঁড়ালে চোখ, নাক আর মুখটা বাঁচাতে পারব বলো তো? যেভাবে মুখটা সামনে বাড়াচ্ছ, এখুনি তির ছোড়ার মতো বিষ ছুড়ে না দাও। ও কাজটাও এই পৃথিবীর অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণির এক জাতের সাপেরা করে তো। মানুষ অথবা ছোট ছোট স্তন্যপায়ী জীবদের অন্ধ করে দেয় দশ-বারো ফুট দূর থেকে বিষ ছুড়ে দিয়ে— এমন টিপ করে ছোড়ে যে চোখে, নাকে অথবা মুখে লাগবেই! লাগলেই মৃত্যু হবে। তা দাদামশাই, ওই ইতর অভ্যেসটা তোমারও যদি থাকে তো বলো— সরে দাঁড়াই।'

ডাঙুসের সমস্ত শরীরটা এবার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ঠিক যেন একটা কুমড়ো পটাশ ফুলছে আবার চুপসোচ্ছে। মুখের হাঁ আরও বড় হচ্ছে। ঝকঝক করছে সাদা দাঁত।

প্রফেসর ভয়ে, চুপসে গিয়েও তড়পে গেলেন বীর বিক্রমে, 'ও কী। অমন করছ কেন? কামড়ে দেবে নাকি? প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি দ্বীপের কাছে নিউগিনিতে আর সামোয়াতে একরকম ভারী সুন্দর শামুক থাকে। পনেরো সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয় তাদের শাঁখ-দেহ। শংকুর মতো ছুঁচোলো কিন্তু বাহারি ডগায় হাত দিলেই সর্বনাশ। জিভের ধারালো দাঁত দিয়ে কটাং করে কামড়ে দেবেই। সাংঘাতিক বিষে মানুষ মারা যায় তক্ষুনি। তোমারও সেই বদ অভ্যেস আছে নাকি? থাকে তো সমুদ্রে শামুক গেঁড়ি গুগলি খাও, পেটে পাথর জমিয়ে রাখো— ইতর প্রাণীদের চেয়েও ইতর যখন হতে পেরেছ— কামড়েও দিতে পারো! বলো দিকি দাদামশাই, এর পরেও কি তোমার দাঁতের পোকা মারার প্রবৃত্তি আমার হবে?'

থপ করে কেমিক্যাল টেবিল থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ডাঙুস। সে কী বীভৎস চেহারা! কষ বেয়ে গড়াচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিডের লালা, ছোট্ট একটা হেঁচকির সঙ্গে আরও একটা পাথর দমাস করে ঠিকরে এসে পড়ল প্রফেসরের পায়ের কাছে, তারের জালের মতো ঢাকনি দেওয়া দু'চোখের রং পালটে যাচ্ছে ঘনঘন। বর্ণালীর সব কটা রংই আসছে যাচ্ছে বেজায় তাড়াতাড়ি। বেগুনি. ইন্ডিগো, সবুজ, হলদে, কমলা, লাল রঙের দ্রুত আনাগোনা দেখবার মতো। মনে মনে ভাবলেন প্রফেসর, আহা রে, সামনের দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলে এমনি আলোর ভেলকি দেখাতে পারলে চক্ষুস্থির করে দেওয়া যেত দেশসুদ্ধ লোকের। টেকনিকটা জেনে নেবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময়ে ফুঁসতে ফুঁসতে পাটালি-ছাঁচে ঘ্যাচ্যাং করে কামড় বসিয়ে ডাঙুস যা বললে তা এই :

'পাষণ্ড! মূর্খ! বদমাশ! ভেবেছিলাম আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের বেশ কিছুটা তোকে দিয়ে যাব। দাঁতের ব্যথাটা সারিয়ে দিলেই তাই দিতাম। কিন্তু আর না! দাঁতের ব্যথায় মরে

গেলেও আর তোদের উপকার করব না। তোরা পৃথিবীর তিন ভাগ জল ফেলে রেখে এক ভাগ ডাঙার ওপরেই লাঠালাঠি আর বোমবাজি করে মর! বয়ে গেল আমাদের! তোদের এই বিচ্ছিরি জীবাণু ভরতি পৃথিবীতে ডাঙুস থাকে? বিশেষ করে তোর মতো নিরেট বেল্লিক ফোকলা বৈজ্ঞানিক যেখানে থাকে, সেখানে ডাঙুসরা কখনও থাকবে না— কখনও না!'

ফোকলা বলতেই রেগে তিনটে হয়ে চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর, 'চোপরাও দাঁতালো—।'

দাঁতালো এক হাতের ছোট্ট নীল পাথরটা টিপ করে ধরল প্রফেসরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে ধোঁয়া দেখলেন প্রফেসর। তারপর আর কিছু মনে নেই।

কিছুক্ষণ পরে আমি এসে দেখলাম অজ্ঞান হয়ে ল্যাবোরেটরির মধ্যে পড়ে আছেন উনি। চোখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে আগে খুব জোর একটা চিমটি কাটলেন নিজের হাতে।

তারপর বললেন হাঁফ ছেড়ে, 'যাক, বেঁচে আছি তা হলে।'

'মরবার কোনও কারণ ঘটেছিল কি?' জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

উনি তখন সমস্ত ঘটনাটা বললেন। এ-কথাও বললেন যে ডাঙুসদের বিশ্বাস নেই। আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলা ছাড়া আর কোনও অস্ত্র ছিল না বলে ইচ্ছে করেই গালাগাল দিয়েছেন প্রফেসর। অপমানে অপমানে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। মগজের শক্তিতে যারা অনেক উঁচুতে, তারা ভাবপ্রবণ হবেই। সেন্টিমেন্ট যাদের নেই তারা যন্ত্র বিশেষ— সৃষ্টি করতেও পারে না। ডাঙুসরা এসেছে পৃথিবীকে ঢেলে গড়তে, ডাঙার মানুষকে জলের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। উদ্দেশ্য তাদের মহৎ। নিঃস্বার্থ বলেই পৃথিবীর মানুষের উপকার তারা করতে চায়। পরোপকারীকে চোটপাট করলে তার প্রাণে তো লাগবেই। এই বিশ্বাস নিয়েই ডাঙুসদের সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে কথা বলেছেন প্রফেসর। যাতে পরোপকার করার সদিচ্ছা ছেড়ে অপমানে জর্জরিত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে তারা চলে যায়। কিন্তু যদি না যায়? প্রকৃত পরোপকারীরা নিজেদের ক্ষতি করেও অন্যর উপকার করে। ডাঙুসরা যদি সেইভাবেই ডাঙা ডুবিয়ে দিয়ে ডাঙার জীবদের জলের জীব বানিয়ে দেয়?

আমি অবশ্য প্রফেসরের একটা কথাও বিশ্বাস করিনি। নিশ্চয় রাত জেগে গবেষণা করে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন।

কিন্তু দেওয়ালটা ফুটো হল কী করে? মেঝের মার্বেল অ্যাসিডে পুড়ল কী করে? সালফিউরিক অ্যাসিড তো অনেক দিন ফুরিয়েছে। অত নুড়িই বা এল কোত্থেকে? কয়েক কিলো ওজনের সব ক'টা নুড়ি পাথরই তো দেখছি গভীর সমুদ্রের পাথর!

গাইয়ে গাছ

দলমার দামালরা শেষ পর্যন্ত টনক নড়িয়ে ছাড়ল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের। অথচ হাতিটাতি নিয়ে উনি কস্মিনকালেও মাথা ঘামাননি। আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক বলতে যা বোঝায়, উনি ষোলো আনা তাই। সত্যিই অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর। রামবোকা এই দীননাথ নাথ অষ্টপ্রহর ওঁর পেছনে লেগে না-থাকলে অনেক উদ্ভট কাণ্ডকারখানায় অনেকদিন আগেই জড়িয়ে পড়তেন। আমিও ওঁকে নজরে নজরে রেখে সামাল দিয়ে যাই। অপটু লেখনীর সেইসব সৃষ্টিছাড়া কল্পগল্প পড়ে পাঠক-পাঠিকারা আমার মুণ্ডপাত করলেও প্রফেসরকে ধন্য ধন্য করেন, সেটাই আমার বড় লাভ।

কিন্তু দলমার দামাল হাতিদের দামালি থামাতে গিয়ে এ কী সৃষ্টিছাড়া আবিষ্কার করে বসলেন উনি? পরিত্রাহি চিৎকার করে চলেছে যে গোটা পৃথিবীটা।

গোড়া থেকেই বলা যাক আজব সেই কাহিনি।

দক্ষিণবঙ্গে হঠাৎ হাতি বেড়ে যাওয়ায় ভয়ের চোটে বনদপ্তর দ্বারস্থ হয়েছিল প্রফেসরের। যেহেতু হাতির স্মৃতিশক্তি অতিশয় প্রখর, তারা সামরিক কায়দায় আগে ছোট দল পাঠিয়ে খবর নেয় উত্তম আহার্য কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে, এবং যেহেতু হাতিদের প্রাণে মারা যাবে না আইন অনুসারে এবং যেহেতু সিদ্ধিদাতা গণেশের মুণ্ডটি হাতির, তাই অবাধ্য হস্তি মহাশয়দের বিতাড়নে অক্ষম জনগণ বনসংরক্ষণ কর্মীদের মাধ্যমে আবেদন পাঠিয়েছিল প্রফেসরের কাছে।

দয়ালু প্রফেসর তৎক্ষণাৎ গলে গেছিলেন। আমাকে না-জানিয়ে পুরুলিয়ার পাহাড়ে চলে গেছিলেন। হাতি বাঁশ খেতে খুব ভালবাসে, তাই তিনি সেখানে বিশেষ এক বাঁশ বানিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলেন।

বাঁশ এক ধরনের ঘাস। কিন্তু প্রফেসর যে বাঁশ বানিয়ে দিয়ে এসেছিলেন, তাকে ঘাস বলা যায় না। তা একরকম গাছ। নতুন গাছ। এই পৃথিবীতে এমন গাছ কখনও দেখা যায়নি।

বিহার আর ঝাড়খণ্ড থেকে হাতিরা দলে দলে এতকাল বীরবিক্রমে লুঠতরাজ চালিয়ে গেছে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বীরভূম, পুরুলিয়ায় পাক্কা মিলিটারি কায়দায়। ওরা কিছু ভোলে না, আর অনেক কিছু টের পায়। সুন্দরবনের গাছপালা নেই নেই করেও এখনও অনেক। ওরা যদি ওদের বনজ আর জান্তব অনুভূতি দিয়ে টের পেয়ে যায় অঢেল খোরাক রয়েছে সুন্দরবনে, আর যদি

শহর-টহর তছনছ করে দিয়ে আস্তানা গাড়ে সেখানে, তা হলে সরকারের আর একটি প্ল্যান যে ধূলিসাৎ হবে।

সুমাত্রার সুনামি টনক নড়িয়ে দিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছে একটা মস্ত তথ্য। গাছ... একমাত্র গাছের কাছেই প্রতাপ খাটে না মহাভয়ংকর বিপুল বিধ্বংসী সুনামি জলপ্রবাহের...

সুতরাং, কলকাতাকে বাঁচাতে হলে সুন্দরবন সংরক্ষণ দরকার।

কিন্তু মাথামোটা গতরভারী হাতির দল যদি সুন্দরবন খেয়ে সাফ করে দেয়, তা হলে তো কলকাতা ডুববে...

আমার তো সন্দেহ কোটিপতি দুশমন প্রোমোটাররাই গ্রামবাসীদের মধ্যে চর পাঠিয়ে উসকে দিয়েছিল সাদামাটা মানবপ্রেমিক প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে...

তারপর উনি গাইয়ে বাঁশগাছ লাগিয়ে দিয়ে এলেন পুরুলিয়ায়।

তারপর?

সে এক রোমাঞ্চকর এবং রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সেই কাহিনিই হোক এখন।

হাতির দল এসেছিল। বাচ্চাকাচ্চা মিলিয়ে মোট ৬৯টা। বাঁশগাছের বাজনা শুনে নাকি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘিরে ধরেছিল বাঁশঝাড়কে। শুঁড় দুলিয়ে, পা তুলে নেচেও ছিল। চাঁদনি রাতে ছোটবড় ৬৯টা হাতির সেই উদ্দাম নৃত্য নাকি ক্যামেরায় তুলে রাখার মতো দৃশ্য। সুরের ঝরনাধারায় সত্যিই বুঁদ হয়ে গেছিল তারা।

এ-রিপোর্ট আশপাশের গ্রামের লোকদের। গাছের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে তারা দেখতে এসেছিল হাতিদের নাচ, শুনতে এসেছিল বাঁশগাছের গান।

সে-গান এমনই যে শুধু গোদা গোদা পা তুলে নাচায়, খাওয়ার কথা ভুলিয়ে দেয়। তার পরেই আচমকা বাঁশগাছ অন্য বাজনা বাজাতে আরম্ভ করেছিল। অন্য স্বরলিপির একেবারে অন্য বাজনা। উদ্দাম বাজনা। বিকট বাজনা। বেতাল বাজনা। বিষম বাজনা। সে বাজনা এমনই বাজনা যা কান দিয়ে ঢুকে মাথা খারাপ করে দেয়, চোখে ধোঁয়া দেখিয়ে ছেড়ে দেয়, কান ঝালাপালা করে দিয়ে মূর্ছা পর্যন্ত এনে দেয়।

ডাকাবুকো যেসব গ্রামবাসী লুকিয়ে চুরিয়ে মজা দেখতে এসেছিল, তাদের সেই অবস্থাই দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত। হাতিদের সহ্যশক্তি অতটা নেই, তাই তারা অনেক আগেই চম্পট দিয়েছিল তল্লাট ছেড়ে। যেহেতু তাদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর, তাই যে রুট দিয়ে এলে এমন প্রাণঘাতী বাজনা শুনতে হয়, সে রুটে আর আসেনি। বেঙ্গল বেঁচে গেছিল, বেঁচে গেছিল সুন্দরবন, আর কলকাতা।

এসব পুরনো খবর। নতুন করে শুনিয়ে গেলাম কাহিনি পরম্পরা বজায় রাখবার জন্যে।

গোলমালটা শুরু হয়েছিল তার পরেই।

বাঁশঝাড় যেখানে লাগিয়েছিলেন, সেই তল্লাটের সমস্ত মানুষ আর্জি জানিয়েছিল প্রফেসরের কাছে, বাঁশঝাড় এবার তুলে নিয়ে যাওয়া হোক— কেননা, তারাই যে এবার পাগল হতে বসেছে পাগল করা বাজনায়। বেশ কিছু লোক পালিয়েও গেছিল গ্রাম টাম ছেড়ে, বাকিরা এসে করজোড়ে নিবেদন জানিয়েছিল, আর না, আর না, বাঁশগাছের গান আর শুনতে চাই না...

প্রফেসর একটু দুঃখ পেয়েছিলেন। নেমকহারাম গ্রামবাসীদের ওপর চটেও গেছিলেন। যারা গানের মর্ম বোঝে না, তাদেরকে আর নতুন নতুন বাঁশ-গান দেবেন না ঠিক করে নিয়ে বাঁশগাছ তুলে এনে বসিয়ে দিলেন কলকাতার ঠিক মাঝখানে একটা চৌকোনো কর্পোরেশন পার্কে।

পার্কটা এতাবৎকাল ছিল মনোরম। এক কোণে সুইমিং পুল, আর এক কোণে রঙিন আলোর ঝরনা। তৃতীয় কোণটায় থানার ঠিক সামনে বসিয়ে দিলেন তাঁর বিখ্যাত গাইয়ে বাঁশঝাড়।

ফলটা হল মারাত্মক। আশপাশের সমস্ত বাড়ির সমস্ত মানুষ হইহই করতে করতে চলে এল থানায় আর কর্পোরেশন কাউন্সিলারের বাড়িতে। এবার আর আবেদন-টাবেদন নয়, বিলক্ষণ দাবি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উৎপাটন করা হোক সর্বনাশা এই বাঁশগাছদের— যারা নাকি বাংলা ব্যান্ড আর মাইকেল জ্যাকসনের মুখে চুনকালি দিয়ে তল্লাট ফাঁকা করে দিতে চলেছে।

থানা এমনিতেই ফাঁকা হয়ে এসেছিল গানের দমকে-- হয় ছুটি, নয় বদলি নিয়ে চম্পট দিচ্ছিল আরক্ষাবাহিনী। কাউন্সিলার জানলা-দরজা বন্ধ করে প্রায় মূর্ছা যাওয়ার অবস্থায় চলে এসেছিলেন।

এখন জনগণের চাপে সম্মিলিত চাপ গিয়ে পড়ল প্রফেসরের ওপর। তিনি দুঃখিত মনে সাধের বাঁশগাছদের তুলে এনে বসালেন তাঁর পাতাল ল্যাবোরেটরিতে। এখান থেকে মাটি ভেদ করে আওয়াজ যায় না বাইরে।

কলকাতা সত্যিই বেঁচে গেল।

কিন্তু মেজাজ টঙে উঠল প্রফেসরের। হাজার হোক তিনি জনদরদী মানুষ তো। কিন্তু জনগণ যদি তাঁর আবিষ্কারকে বয়কট করে, রেগে টং তো হবেনই। বাজনা। সেতার-টেতার হবে। ভারী মিষ্টি বাজনা।

আসলে গাছটা খুব ধুরন্ধর। আমাকে তোয়াজ করছিল। আমি তখন বুঝিনি। প্রফেসর আমাকে মাথামোটা বলেন এই কারণেই।

মিষ্টি বাজনা শুনে মোহিত হয়ে আমি বলেছিলাম, 'এ মেট্যাল আপনি বানিয়েছেন?'

প্রফেসর বললেন, 'সেটাই তো আমার সিক্রেট। এ-মেট্যাল এই পৃথিবীর মেট্যাল নয়।'

'পেলেন কোথায়?'

'সাহারায়। মরুভূমিতে অতবড় উল্কা কখনও পড়েনি। খবর পেয়েই দৌড়েছিলাম। পুরো উল্কাপিণ্ডটা তুলে এনে রেখেছিলাম এইখানে। তুমি তখন হিমালয় না টিমালয় কোথায় গেছিলে।'

'গ্যাংটকের একটা গ্যাঁড়াকল ধরতে গেছিলাম। উল্কাটা স্টিলের?'

'অদ্ভুত স্টিলের। যখন তখন বাজনা বাজায়। খুব মেজাজি স্টিল। তবে খুব মেজাজি বাজিয়ে। গোটা উল্কাটাই মনে হয় জীবন্ত। কখন কী বাজনা বাজিয়ে কাকে মজাতে হবে, কাকে তাড়াতে হবে তা খুব বোঝে। মহাধুরন্ধর।'

'বাজনা শুনিয়ে আপনাকে হাত করেছিল?'

'কুচুটে বাজনা তো শোনায়নি। নার্ভ ঠান্ডা রাখার বাজনা বাজিয়েছে। তাই ভেবেছিলাম, তুমি ফিরে এলে তোমাকে বাজনা শোনাব— তোমার নার্ভ, ইয়ে, সবসময়ে বড্ড গরম থাকে তো...'

'ঢের হয়েছে। মিষ্টি মিষ্টি বাজনা বাজিয়ে আপনাকে হাত করে এখন হাতি থেকে মানুষ

তাড়াতে আরম্ভ করেছে। পৃথিবীর বাইরের কাউকে বিশ্বাস নেই—'

'তা ঠিক, দীননাথ, পৃথিবীর কাউকেও তো আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।'

এই সময়ে। একটা মতলব খেলে গেছিল আমার মাথায়। দুষ্ট মতলব। প্রোমোটার জাতটার ওপর আমি হাড়ে চটা। যেভাবে চাষবাসের জমি দখল করে কংক্রিটের জঙ্গল তুলছে, একদিন এমন সময় আসবে, চাষের জমি মাছের ভেড়ি আর পাওয়া যাবে না। লোক বাড়বে, খাবার কমবে। এর একটা বিহিত করা দরকার।

আমি মন্ত্র দিলাম প্রফেসরের কানে।

একগাল হেসে রাজি হয়ে গেলেন প্রফেসর।

তার পরের ব্যাপারটা কারও অজানা নয়। খবরের কাগজ, টিভি, রেডিয়ো ফাটাফাটি করে দিয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে। কলকাতার উপকণ্ঠে টাকা ছড়িয়ে, টাকা খাইয়ে বেশ খানিকটা চাষের জমিতে একশোতলা হাই-রাইজ বাড়ি উঠেছিল খান কয়েক। একটা পঞ্চকোণ তারকার দশ কোণে দশখানা একশোতলা ইমারত। এই প্ল্যানে।

সে এক এলাহি ব্যাপার ঘটেছিল পুরো চত্বরটা জুড়ে।

হাজার কয়েক লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্টে টাকার কুমিররা নির্বিঘ্নে নিরাপদে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল। এটা ছিল তাদের কেল্লাবিশেষ।

আমিও ওই লাইনে চলে গেছিলাম। এক প্রোমোটারকে বশ করে, তাকে দিয়ে মাল্টিকমপ্লেক্সের ঠিক মাঝের পয়েন্টে গাইয়ে বাঁশগাছকে বসিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরই রগড় দেখেছিলাম।

অষ্টপ্রহর অপার্থিব বাজনা বাজিয়ে মাল্টিকমপ্লেক্সকে জনশূন্য করে দিল বাহাদুর বাঁশগাছ।

কিন্তু বাঁশ দিয়ে গেল প্রফেসরকে। ব্যাপারটা আদালত টাদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

কোর্টের অর্ডার মাথায় রেখে গাইয়ে বাঁশগাছকে গলিয়ে ফেললেন প্রফেসর। অপার্থিব ইস্পাত হলেও ইস্পাত তো বটে। তা থেকে বেশ কয়েকটা কড়ি বরগা বানিয়ে বেচে দেওয়া হল বাজারে।

কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন প্রফেসর। তারপর থেকেই মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে আমার। মহা আনন্দে!

গাইয়ে গাছের গল্পটা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল ইন্টারনেট বেগে। বড়লোক দেশগুলো কিছু কিছু অপার্থিব ইস্পাতের কড়ি বরগা নিয়ে গিয়ে তাদের ইমারত-টিমারত নির্মাণ করেছিল।

এখন সেইসব থেকে বিকট বাজনা বেরিয়ে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে তামাম দুনিয়ার কেষ্টবিষ্টুদের।

গাইয়ে গাছ জিন্দাবাদ!

চাঁড়ালচন্দ্রের ফুঁ

চাঁড়ালচন্দ্র চকমকি ঠুকে বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বললে, 'বহু-অতীতের অভ্যেসটা এখনও ছাড়তে পারিনি। ডোন্ট মাইন্ড।' প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বললেন (চোখে তাঁর প্রখর দৃষ্টি), 'বিড়ির পাতাটা কীসের?'

মুচকি হাসল চাঁড়াল। প্রথমে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর চোখ বুজল। গন্ধটা শুঁকল। চোখ খুলল।

বললে, 'বাঙালি বদমাশের উপনিবেশ লংকাদ্বীপের ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড শহরটার নাম ছিল অনুরাধাপুরম্। এখন সেখানকার ধ্বংসস্তূপ দেখলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। প্রকাণ্ড স্তূপ, ক্রোশ ক্রোশ পাথরেব ভাঙা বাড়ি, মাইলের পর মাইল জঙ্গল। মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্তি, জ্ঞানমুদ্রা, প্রচার মূর্তি, কাত হয়ে শুয়ে মহানির্বাণ মূর্তি—'

'স্টপ,' বললেন প্রফেসর, 'আমি জানতে চেয়েছি, বিড়ির পাতাটা কীসের?'

পাতার গন্ধ আর ধোঁয়া তখন ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। সেইদিকে একটু চেয়ে নিয়ে প্রসন্ন বদনে বললে চাঁড়ালচন্দ্র, 'ওই জঙ্গলের গাছের।'

'গাছটার নাম?'

'ফুঁ।'

প্রফেসর ভুরু কুঁচকোলেন। এই প্রথম বিড়ির গন্ধটা শুঁকলেন। উনি যে গন্ধ-বিশারদ, তা জানতাম না।

ফস করে বললেন, 'গাছের নাম ফুঁ! বেশ, বেশ। পুঁতে গেছিল কারা?'

জুলজুল করে চেয়ে আছে চাঁড়ালচন্দ্র। প্রফেসর জবাব দিলেন নিজেই, 'ফুঁ-ফাইটার-রা?'

'আজ্ঞে,' চাঁড়ালের চাহনি এখন বিলক্ষণ স্নিগ্ধ। বললে বেশ সন্তোষের সঙ্গে, 'এফেক্টটা এইবার টের পাবেন। ফুঁ-ফাইটারদের নাম যখন জানেন, তাদের কীর্তিও আপনার অজানা নয়। তারা ছিল অদ্ভুতকর্মা। এই বিড়ির পাতাও তাই।'

কাঠ হয়ে গেলেন প্রফেসর। আমার দিকে চাইলেন। চোখে অসহায় দৃষ্টি। ওই দৃষ্টি দেখলে আমার হাত পায়ের বারুদ জ্বলে ওঠে। ঠ্যাঙাড়ে হয়ে যাই। তাই চেয়ার ছেড়ে ঠিকরে যেতে গেছিলাম।

চাঁড়াল বললে, 'তিষ্ঠ।'

আমি চেয়ারে স্ক্রু-আঁটা হয়ে গেলাম। আঙুল পর্যন্ত অসাড়, চাঁড়াল বললে, 'ফুঁ-এর এফেক্ট শুরু হয়ে গেছে। দেখবেন?' বলেই উঠে গিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো বড় আয়নাটা নামিয়ে এনে ধরল আমার সামনে।

আয়নায় আমার ছবি ফুটল না।

খুক খুক হাসি শুনলাম কানের কাছে। হারামজাদা চাঁড়াল হাসছে আর বলছে, 'অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আমিও তাই। প্রফেসরও তাই। আমরা তিনজনেই এখন অমানব। আমাদের ব্রেনে নতুন মলিকিউল এসে গেছে।'

আমি বরাবরই ঠোঁটকাটা, কিন্তু ঠোঁট তো নাড়তে পারছি না, হারামজাদা চাঁড়াল মন্ত্রশক্তি দিয়ে আমাকে প্যারালাইজ করে দিয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্নটা ফুঁসছে, তা নিশ্চয়ই আমার চোখ-টোখ দেখে আন্দাজ করে নিয়েছিল ব্যাটাচ্ছেলে চাঁড়াল। সদয় কণ্ঠে বললে, 'ও-কে... ও-কে... সম্মোহন-অস্ত্র তুলে নিলাম। কী বলতে চান? কিন্তু ফের যদি বেগড়বাঁই করেন—'

ল্যাঙ্গুয়েজ কী! পিত্তি জ্বলে যায়। কিন্তু আর বোকামি দেখালাম না। মিনমিন করে শুধোলাম, 'নতুন মলিকিউল কি গাছে গজায়? ব্রেন কী গন্ধ মলিকিউল বানায়?'

'ননসেন্স!' বললে চাঁড়াল (বিলক্ষণ অনুকম্পাসহ), 'মলিকিউল ব্রেনেই রয়েছে। হাজারো অজানা মলিকিউল। ব্রেন আজও তাই আননোন টেরিটরি। অজ্ঞাত অঞ্চল। ফুঁ-এর সুবাস কেমিক্যালি জাগ্রত করেছে অদৃশ্যকরণ ক্ষমতা। মাথায় ঢুকছে?'

ওই যে একটা কথা শুনেছিলাম, তাবৎ শোভতে মূর্খ, যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে (ভুল বললাম না তো?)— আমি সেই নীতি তৎক্ষণাৎ অনুসরণ করলাম। বোকার উচিত বোবা হয়ে থাকা!

চাঁড়াল আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। অদ্ভুত চাহনি। যেন এক্স-রে চাহনি। শিরশির করে উঠল আমার ব্রেনের ভেতরটা।

তারপর সে বললে, 'আহুঃ সপ্তপদী মৈত্রী।'

ফস করে বলে ফেললাম, 'কথাটার মানে?'

অমায়িক হবার চেষ্টা করে চাঁড়াল বললে, 'এইমাত্র ভাবছিলেন তো বোকাদের বোবা থাকাই ভাল। তাই বললাম, যার সঙ্গে সাত পা একত্র গমন করা যায়, তার সঙ্গে মিত্রতা হয়।'

মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল, 'আপনি টেলিপ্যাথিও জানেন?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে চাঁড়াল, 'ইতর প্রাণী আর মানুষ— সবারই ব্রেনের মধ্যে চিন্তার রিসিভার আর ট্রান্সমিটার আছে। চিন্তা একটা এনার্জি— কিন্তু তা মাপবার মেশিন কেউ বানাতে জানে না। চিন্তার এনার্জি কেউ জেনেশুনে চালায়, কেউ অজান্তে চালায়। এর মধ্যে সুপার ন্যাচারাল কিছু নেই— সবটাই বিজ্ঞান। যাক, যেজন্য আবির্ভূত হয়েছি, এবার তা বলা যাক।'

অমনি গড়গড় করে বলে গেলেন প্রফেসর, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহাশয়ের আবির্ভাবের কারণটা শ্রবণ করা যাক।' কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপও স্প্রে করে গেলেন।

চাঁড়াল কিন্তু তা গায়ে মাখল না। সবই যে গা-সওয়া। বললে, 'আমি এ-যুগের মানুষ নই, তা নিশ্চয় বোধগম্য হয়েছে?'

প্রফেসর বললেন, 'বহু অতীত প্রত্যক্ষ করা মানুষ তো? কিন্তু জীবন্ত ম্যমি নাকি?'

'আজ্ঞে না,' চাঁড়াল বিলক্ষণ বিনীত, 'আমি অমর। আমার শরীরের কোষগুলোর ক্ষয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠন হয়ে যাচ্ছে। আমার জরা নেই। তাই মৃত্যুও নেই।'

'তোবা তোবা,' প্রফেসরের মন্তব্য, 'কিন্তু এমন হাল হল কী করে?'

'আহুঃ সপ্তপদী মৈত্রী,' বললে চাঁড়াল।

'জবাবটা একটু প্রাঞ্জল করা হোক।'

'ওদের চোখের মণি হয়ে গেছিলাম যে।'

'কাদের? কী নাম তাদের?'

'ফুঁ।'

'অ।' প্রফেসর উৎসুক। কিন্তু নিশ্চুপ। এখন নিশ্চয় ব্রেনে ব্রেনে কথা চলছে। চাঁড়াল আর প্রফেসরের চার চোখে যেন বিদ্যুৎ ঝলসিত হচ্ছে। চিন্তা-এনার্জির বিনিময় অবশ্যই।

তারপর অবশ্য অনুকম্প ভরে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল চাঁড়াল নামক কিম্ভূত পুরুষটা। বলেছিল সহৃদয় স্বরে, 'মাই ডিয়ার দীননাথ। এই জন্যেই বলেছিলাম 'আহুঃ সপ্তপদী মৈত্রী।' চলুন বেড়িয়ে আসি একসঙ্গে। বন্ধুত্ব হবে, আপনার জ্ঞানচক্ষু খুলে যাবে।'

প্রফেসর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে অবলোকন করলেন। বললেন, 'আহা, বেচারি জানে না। দীননাথ, ফুঁ কারা জানো?'

'চিনেম্যান-টিনেম্যান হবে।'

'না, না, না। এরাই এই পৃথিবীতে বিস্ময় রচনা করে গেছে এক সময়ে। এদের কাহিনি সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে কিংবদন্তি সমান হয়ে গেছে। আমেরিকার 'নাসা' সংস্থার কর্ণধারও এদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। এরা কল্পবিজ্ঞানের ফিচার নয়। আজও তারা মিস্টিরিয়াস। চাঁড়াল মনে হয় এদের খবর রাখে।'

চাঁড়াল মুখ টিপে বললে, 'তা রাখি।'

'তা হলে শোনা যাক।'

'আহুঃ সপ্তপদী মৈত্রী।'

চাঁড়াল এই শব্দ তিনটে মোচড় মেরে মেরে উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটে গেল। ঘরদোর বিলীন হয়ে গেল। চোখের সামনে দেখলাম নক্ষত্রখচিত বিপুল ব্রহ্মাণ্ড। আমরা এসে গেছি মহাশূন্যে।

চাঁড়ালের দিকে চেয়ে দেখলাম, তার চোখেমুখে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। সে যেন বাক্য মনের অতীত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। যাকে বলে, তৃতীয় অবস্থা। ধ্যানের চতুর্থ অবস্থা, 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'।

তার কাঁচাপাকা ইঞ্চিখানেক লম্বা গোঁফের চুলগুলো ওপরের ঠোঁটের ওপর ঝুলে পড়েছে। তার গোটা মুখখানা যে ধবলরঞ্জিত, আগে তা বলা হয়নি। দেখেও দেখিনি বলে।

এখন দেখছি, তার সাদা কান আর সাদা ঠোঁটজোড়া কুচকুচে কালো মুখের সঙ্গে সুন্দরভাবে ম্যাচ করে গেছে। রংবেরঙের গাছের পাতা যেমন দেখতে বড় ভাল লাগে, চাঁড়ালের চিত্রবিচিত্র মুখখানা যেন জ্যোৎস্নার ঠান্ডা আলো। ওই চোখজোড়া যেন চুম্বকের মতো আমাকে টেনে ধরেছে। আস্তে আস্তে মনে হল, বিশ্বজগতের ছবি যেন ছায়ার মতো আমার মনের মধ্যে ভাসছে।

গাঢ় কোমল কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল আমার ব্রেনের মধ্যে। চাঁড়াল আর মুখে কথা বলছে না। ওর মন আমার মনে কথা পাঠাচ্ছে। শুধু আমার নয়, প্রফেসরের অবস্থাও দেখলাম একই রকম। তিনি যেন তথাগত হয়ে গেছেন।

'ভুতুড়ে রকেট দেখবেন?'

আমি চমকে উঠেছিলাম। ভূতেরা রকেট চাপে, তা তো জানতাম না।

চাঁড়াল ওর স্নিগ্ধ চন্দ্রবদন আমার সামনে ভাসিয়ে রেখে বলে গেল, 'আকাশের আতঙ্ক দেশজোড়া আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল সুইডেন— ১৯৪৬ সালে। তার পরেই শুরু হয়েছিল ফ্লাইং সসারদের খবর ছাপানো। সুইডিশ কাগজওয়ালারা নাম দিয়েছিল ভুতুড়ে রকেট। দেখুন... আকস্মিক ইথার রেকর্ড সব ছবি ধরে রেখেছে। দেখবার চোখ দিচ্ছি। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, দেখুন।'

দেখলাম। পৃথিবী গ্রহটার ওপরে রয়েছি আমরা। নামছি, আরও নামছি। পায়ের নীচে হলুদ মরুভূমি। দেখতে পাচ্ছি। স্ফিংক্স-এর দানবিক মূর্তি। এদিকে-ওদিকে বিরাট পিরামিড। স্ফিংক্স আর একটা পিরামিডের মাঝের জায়গায় একটা লম্বাটে চুরুটের মতো মস্ত বস্তু শয়ান অবস্থায় রয়েছে। ঘন লাল রঙের। বস্তুটির উদর থেকে পিলপিল করে কারা যেন বেরিয়ে আসছে। তাদের কেউ দাঁড়াচ্ছে স্ফিংস-এর সামনে, কেউ এগোচ্ছে ওদিককার পিরামিডটার দিকে। আরও নীচে নেমে এসে দেখলাম, তারা চলমান দ্বিপদ প্রাণী বটে, কিন্তু মনুষ্য সদৃশ নয়। তারা অমানব— অদ্ভুত!

আমি যখন রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় পৌঁছে গেছি, ঠিক তখনই ঘোর গর্জন শুনলাম মাথার ওপর। মুন্ডু ঘুরিয়ে তাকানোর আগেই মহাকাশ থেকে আরও দুটো মহাকায় চুরুট-আকৃতি মহাকাশযান নেমে এল মরুভূমি লক্ষ্য করে। তাদের একটা হালকা হলুদ রঙের। আর একটা গাঢ় বেগুনি রঙের। পাশ দিয়ে যখন নেমে যাচ্ছে, দেখতে পেলাম, ওপরের দিকে টানা লম্বা স্ফটিক জাতীয় বস্তু দিয়ে ঢাকা বসবার জায়গায় থুকথুক করছে অমানবরা!

চাঁড়ালের চিন্তা-কথা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে গেল ঠিক সেই মুহূর্তে, 'প্রাচীন মিশরে এসেছিল স্পেসশিপ। দানিকেন যখন এই তত্ত্ব আওড়েছিলেন, তাঁরাও আগের দৃশ্য দেখেছেন। ১৯৪৭ সালে আরনল্ড দেখেছিলেন ফ্লাইং সসার, দেখেছিলেন বহু বিমান-চালক, কিন্তু তারও অনেক আগে ক্রিস্টোফার কলম্বাস স্বয়ং দেখেছিলেন এই আকাশ-বিস্ময় আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর।'

'জানি, জানি, জানি,' প্রফেসর আর চেপে রাখতে পারলেন না তাঁর জ্ঞান-গরিমা, '১৯৪৭-এর পর 'উড়ুক্কু' যান প্যানিক সৃষ্টি করেছিল আমেরিকা আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়।

জার্মান বৈজ্ঞানিকরা নতুন অস্ত্রের মহড়া দেওয়াচ্ছে না তো? দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়েও তো রাত-বিরেতে উড়নচাকির আলোর ঝলকানি দেখা গেছিল আকাশে। বিমূঢ় যখন সব্বাই, ঠিক তখনই—'

শেষ কথাটা বলবার আগেই প্রফেসরের পেটে বোমা মেরে যেন তা বের করে নিয়ে বলে গেল চাঁড়ালচন্দ্র, 'তাঁদের নাম দেওয়া হল ফুঁ-ফাইটার।'

ঢোঁক গিললেন প্রফেসর, 'লেফটেন্যান্ট ডেভিড ম্যাকফলস কিন্তু এই নিয়ে একটা বই বের করেছিলেন হ্যারল্ড উইলকিন্স থেকে।'

'বইটার নাম : 'ফ্লাইং সসার্স ফ্রম দ্য মুন,' বলে দাঁত বের করে হাসল চাঁড়াল।

'আলোর বল নয় তো?' মিনমিন করে কিছু একটা বলার জন্যে চিন্তার মুখ খুলেছিলাম আমি, 'এরোপ্লেনের পেছনের আলোর রিফ্লেকশন?'

চাঁড়াল বললে, 'পেছনের আলো নিভিয়ে ফুঁ-দের দেখা গেছে। তা ছাড়া এরোপ্লেন যখন জন্মায়নি, তখনও তো ভূত-রকেটরা হানা দিয়ে গেছে।'

'ইতিহাসে লেখা আছে নাকি?'

একটু ব্যঙ্গ করতে গেছিলাম আমি, কিন্তু তার যা সপেটা জবাব দিল চাঁড়াল, চিন্তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না।

চাঁড়াল চাঁচাছোলা গলায় বললে, 'উফলজিস্ট, মানে যাঁরা উড়নচাকি বিশেষজ্ঞ, তাঁরা কিন্তু ইতিহাস ঘেঁটে বেশ কয়েকটা থান ইট বই বের করে ফেলেছিলেন।'

প্রফেসরের যে তা অজানা নেই, তা জানিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ—

'দ্য বাইবেল অ্যান্ড ফ্লাইং সসার্স,

গড ড্রাইভস এ ফ্লাইং সসার,

ফ্লাইং সসার্স থ্রু দ্য এজেস।'

ঠিক এই সময়ে ভোজবাজির মতো পায়ের তলায় মরুভূমি মিলিয়ে গেল— সেই সঙ্গে আর দেখা গেল না চুরুটের মতো দেখতে মহাযানগুলোকে, সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল অদ্ভুত অমানবরা।

'এটা কী হল?' ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলেছিলাম আমি। টিটকিরি দেওয়া গলায় বলেছিল চাঁড়াল, 'ম্যাজিক নয়, ম্যাজিক নয়— প্র্যাট্রিক।'

'প্র্যাট্রিক!'

'প্র্যাকটিক্যাল ট্রিক্স। এবার ইথারের রাস্তা দিয়ে সোজা চলে আসুন কালোকণা সুড়ঙ্গে— অতীত-ভবিষ্যতে যাওয়ার সোজা রাস্তা, প্রকৃতি দেবীর তৈরি। কোন যুগে এলেন বলুন তো? ১৮৯৬ সালে। চক্কর মারছেন আমেরিকার মাথায়। ওই দেখুন উড়ন্ত চুরুট— রাতের অন্ধকার ফালা ফালা করে দিয়ে আলো ফেলছে মাটিতে।'

বর্ণে বর্ণে সেই দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হলাম। সুপ্রাচীন মিশরে এইমাত্র যাদের দেখলাম, সেই তারাই তো অষ্টাদশ শতকের শেষে আমেরিকা চষে ফেলেছে! মাই গড! 'অত 'মাই গড' 'মাই গড' করছেন কেন?' চাঁড়ালের ধমক শুনলাম ব্রেনের মধ্যে, 'উনিশ শতকে তো একটা বাছুরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্যানসাস-এর মাঠ থেকে— হাড় চামড়া ফেলে গেছিল পরে।'

'পোস্টমর্টেম।' চমকে উঠেছিলাম, 'মানুষকেও করেছে নাকি? পিশাচ?'

জবাব না-দিয়ে চালিয়ে গেল চাঁড়াল, 'ষোলো শতকেও আকাশ-গোলা দেখা যায়নি? ওই সময়ের একটা কাঠখোদাইতে আকাশে কালো বল খোদাই করা হয়েছিল কেন?'

'কোথায় কোথায়?'

'সুইজারল্যান্ডে তার চার বছর আগে লাল বল দেখা গেছিল ন্যূরেমবার্গের আকাশে। বলেন তো দেখিয়ে আনি—'

'থাক, থাক,' প্রফেসরের মাথায় চক্কর লেগেছিল নিশ্চয়। চিঁ-চিঁ করে বললেন, 'এই ছোকরাটা বড় অবিশ্বাসী। হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে খুব লাফায়। কিন্তু হ্যালি-ও যে দু'বার উড়নচাকি দেখেছিলেন, তা জানে না।'

'দেখেছিলেন তো কলম্বাস-ও— সান্তা মেরিয়া জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক সেই রাতে— যে রাতে উনি প্রথম দেখলেন নিউ ওয়ার্ল্ড। ১৪৪২ সালের ১১ অক্টোবর রাত দশটায়।'

আমি, শ্রীদীননাথ নাথ, সহজে অবাক হই না। কিন্তু সেদিন আমার চোয়াল ঝুলে পড়েছিল। কলম্বাস... তিনিও দেখেছিলেন উড়নচাকি! কেয়াবাত!

চাঁড়াল আমার চমৎকৃত মগজের অবস্থা টের পেয়ে টিপ্পনী কেটেছিল তৎক্ষণাৎ, 'কলম্বাস যে গুল মারছেন না, সেটা প্রমাণ করবার জন্যে 'সান্তা মারিয়া' জাহাজের আর একজনকে ডেকে দেখিয়েছিলেন সেই দৃশ্য। বহু দূরে আলো ঝলসে ছিল বেশ কয়েকবার। তারপর হয়েছিল অদৃশ্য।'

'মঙ্গলগ্রহীদের কেরামতি নয় তো,' মন্তব্যটা সড়াৎ করে বেরিয়ে গেছিল মুখ দিয়ে।

প্রফেসর তা ক্যাচ করে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিলেন, এইভাবে— 'ক্যানসাস-এর 'কলোনি ফ্রি প্রেস' কাগজটা অবশ্য এইরকম মন্তব্যই ছুড়ে দিয়েছিল— পার্থিব এয়ারশিপ ওরা নয়— পাঠাচ্ছে মঙ্গলগ্রহী বৈজ্ঞানিকরা, বৈজ্ঞানিক তদন্ত চালাচ্ছে গোটা সৌরজগতে।'

'উনিশ শতকেও তা হলে মঙ্গলগ্রহীদের দায়ী করা হয়েছিল!'

'ইয়েস, বৎস, ইয়েস। জোস বোনিলা নামে এক মেক্সিক্যানি অ্যাসট্রনমারও উড়নচাকি প্রদর্শনী দেখেছিলেন ১৮৮৩ সালের অগাস্ট মাসে। সূর্য কলঙ্কের ফটো তুলতে গিয়ে দেখলেন পর পর ভেসে যাচ্ছে ২৮৩টা ঝকঝকে বস্তু। উড়নচাকিদের প্রথম ফটোগ্রাফ বোধহয় তাঁর হাতেই উঠেছিল।'

চাঁড়ালের চিন্তার মুখ চুলবুল করে উঠল তৎক্ষণাৎ, 'আর একজন অ্যাসট্রনমার অবশ্য জিনিসগুলোকে বলেছিলেন পোকামাকড়, পাখি অথবা ধুলো।'

'ফ্রেঞ্চ অ্যাসট্রনমার। ক্যামিলে ফ্ল্যামাবিঅন,' নীরস মন্তব্য প্রফেসরের— 'কিন্তু ১৮০০ সালের এপ্রিল ৫-এর ঘটনাটা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গভীর রাতে মস্ত বাড়ির মতো একটা বস্তু মাটি থেকে দুশো গজ ওপর দিয়ে পনেরো মিনিট ধরে ভেসে গেছিল লুইসিয়ানার বেটল রুজ-এর ওপর দিয়ে— আঁচ টের পাওয়া গেছিল মাটিতে দাঁড়িয়ে।'

ঠিক এই সময়ে চাঁড়ালের চিন্তা চিড়িক দিয়ে উঠল মগজের মধ্যে 'ব্রহ্মাণ্ড স্মৃতি সব দৃশ্য

ধরে রেখেছে। ইউনিভার্সাল মেমারি থেকে কিচ্ছু হারিয়ে যায় না। হ্যালি-র অভিজ্ঞতাটা দেখিয়ে দেব নাকি দীননাথ নাথকে?'

অম্লান বদনে বললেন প্রফেসর, 'দাও দাও, গবেটটার বুদ্ধি একটু খুলুক। এডমন্ড হ্যালি ছিলেন ইংরেজ অ্যাস্ট্রনমার। ইংরেজরা তো মিথ্যে বলে না...'

সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মতো সব ব্রহ্মাণ্ড দৃশ্য মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছি কাঁধ পর্যন্ত কোঁকড়া চুল ঝোলানো এক ভারিক্কি চেহারার শ্বেতকায়ের সামনে। দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো। ভুরু কুঁচকে পড়ে যাচ্ছেন একটা কাগজ।

চাঁড়ালের চিন্তা ধ্বনিত হল মাথার মধ্যে— ইনিই সেই প্রবাদ পুরুষ এডমন্ড হ্যালি। পড়ছেন একটা উড়নচাকি রিপোর্ট। পাঠিয়েছেন ইটালি থেকে এক নামী অঙ্কের প্রফেসর। চাঁদের চেয়েও নাকি বড় একটা জিনিসকে ইটালির ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছেন ১৬৭৬-এর মার্চ মাসে। চল্লিশ মাইল ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৯৬০০ মাইল স্পিডে যেতে এমন হিসহিস আর ঘর্ঘর আওয়াজ ছেড়ে গেছে, শুনে মনে হয় যেন পাথরের ওপর গাড়ির চাকা গড়াচ্ছে।

আমি বলে ফেললাম, 'মাই গড!'

কিন্তু কী আশ্চর্য! এডমন্ড হ্যালি তা শুনতে পেলেন না। তারপর অবশ্য আর আশ্চর্য হলাম না। কেননা, উনি তো আর আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না। আমরা দেখছি শুধু ব্রহ্মাণ্ড স্মৃতির অ্যালবাম। তোবা! তোবা!

সহসা ছবি পালটে গেল, অ্যালবামে এসে গেল নতুন ছবি। এডমন্ড হ্যালি কৃষ্ণবস্ত্র পরে চোখ কপালে তুলে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। অনেক মাইল ওপর দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে একটা পেল্লায় আলোক-বর্তুল।

ফিসফিস করে বলে গেল চাঁড়াল, 'হ্যালি স্বচক্ষে দেখলেন উড়নচাকি পরের বছরেই— ১৬৭৭ সালে— ইংল্যান্ডের মাথায়।'

পরক্ষণেই দেখলাম অ্যালবামের আর এক দৃশ্য। আকাশ আলো হয়ে গেছে একটা অদ্ভুত গড়ন আকাশযানের প্রভায়। এডমন্ড হ্যালি তাজ্জব চোখে তাকিয়ে রয়েছেন সেদিকে। মাঝে মাঝে চোখ নামিয়ে হাতে ধরা একটা কাগজ পড়ে নিচ্ছেন সেই আলোয়।

চাঁড়ালের কমেন্টারি চলল মগজে, '১৭১৬ সাল। উড়নচাকি আলো দিচ্ছে হ্যালিকে হাতের কাগজ পড়বার জন্য।'

'মাই গড!' বিস্ময়-উক্তি পুনর্বার উদগত হল মগজের কোটরে। খপ করে এনার্জি-তরঙ্গ লুফে নিয়ে জবাব জুগিয়ে গেল চাঁড়াল (একটু দেঁতো হাসি হেসে), 'তারও আগে ১৫৬১-তে নার্নবার্গ-এর মানুষ আকাশে দেখেছিল কালচে-লাল, নীলচে আর কালো বল আর চাকতি পুরো একটা ঘণ্টা ধরে সূর্যোদয়ের সময়ে। এক ঘণ্টা নাচন-কোদনের পর জ্বলতে জ্বলতে আছড়ে পড়েছিল মাটিতে।'

'তারও আগে?' বিলক্ষণ উৎসুক হয়েছিলাম আমি। মুচকি হেসে বলেছিল চাঁড়াল, 'ব্রহ্মাণ্ড অ্যালবামের পাতা উলটে যাচ্ছি— দেখে যান একটার পর একটা দৃশ্য। কেন দেখাচ্ছি জানেন?'

'কেন, বন্ধু কেন?' আমার কর্কশ কণ্ঠস্বরকে মোলায়েম করার জন্যেই বন্ধু সম্বোধন করেছিলাম চাঁড়ালকে।

চাঁড়াল তাতে প্রীত হয়েছিল। বলেছিল হৃষ্টস্বরে, 'ছাইপাঁশ লিখে পত্রিকার পাতা ভরাচ্ছেন বলে। বিদ্যে কম, লেখেন বেশি। তাই ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যের কিছুটা আপনার মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করছি। দেখে যান স্মৃতির সিনেমা— ইথার সব ধরে রেখেছে। দেখুন।'

দেখলুম। মুণ্ড ঘুরে যাওয়ার মতো দৃশ্য দেখে গেলাম পরের পর চাঁড়ালচন্দ্রের অলোকসাধারণ গুপ্তবিদ্যার দৌলতে।

আমি দেখলাম, ১৯০৬ সালের পারস্য উপসাগরের একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় দৃশ্য। ঝাঁঝাঁ করে চলেছে একটা ব্রিটিশ স্টিমার। হঠাৎ নক্ষত্রবেগে ঠিক মাথার ওপর ধেয়ে এল একটা মহাকায় আলোক-চক্র। হুইল। আলো দিয়ে গড়া একটা হুইল। শূন্যমার্গে এতবড় আলোর চাকা যে সম্ভবপর, তা চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করতাম না। জাহাজটার চাইতেও বড়! প্রকাণ্ড সেই চাকা বনবন করে ঘুরেই চলেছে জলের ঠিক ওপরে। আলোর ঝলকানি এসে পড়েছে গোটা জাহাজে— কিন্তু বিগড়ে দিচ্ছে না কলকবজা!

সেইসঙ্গে চাঁড়ালের রানিং কমেন্টারি ভেসে এল মগজের কোষে কোষে 'শুধু ১৯০৬ সালেই নয়, ১৮৪৮ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত বহুবার সমুদ্রে সমুদ্রে আলোর ঝলকানি তুলে গেছে এইসব চাকা। এরা কী ধরনের উড়নচাকি?'

চলে এল আর একটা পিলে চমকানো দৃশ্য। মাথার মধ্যে শুনলাম চাঁড়ালের চেঁচানি, 'ব্রিস্টল... ইংল্যান্ড... সাল ১২৭০।'

আর দেখলাম অতীব ফ্যানট্যাস্টিক সেই দৃশ্য। বিচিত্র একটা ব্যোমযান নোঙর ঝুলিয়ে লটকে ফেলেছে একটা গির্জায় চুড়োয়... ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে একজন অমানব নেমে আসছে নোঙর খুলে নেওয়ার জন্যে। নীচে জমায়েত কাতারে কাতারে মানুষ পাথব ছুড়ে মারছে তাকে... ঠিকরে পড়ে গেল সে নীচে... জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল তৎক্ষণাৎ...

কারণ সে পিশাচ! আকাশ-দৈত্য!

চাঁড়ালের ধারাবিবরণী শুনলাম, 'এরকম ঘটনার কথা আইরিশ কিংবদন্তিতেও আছে। গির্জের চুড়োয় জড়িয়ে থাকা একটা নোঙরকে আজও রেখে দেওয়া হয়েছে চার্চে— অবিশ্বাসীদের চোখ খোলার জন্যে।'

'তারপর? তারপর?' আমার অবিশ্বাস তখন ধোঁয়ার মতো উড়ে যেতে বসেছিল বলেই অমন বিকট চিৎকার করে উঠেছিলাম।

তৎক্ষণাৎ নরম হয়ে গেল চাঁড়ালের বচনধারা, 'তা হলে এবার দেখুন খ্রিস্টপূর্ব উড়নচাকিদের কাণ্ড।'

বলতে না বলতেই ঘটল পট পরিবর্তন। বিদঘুটে চেহারার একটা মহাকাশযান মাটিতে নেমে মানুষদের টেনে হিঁচড়ে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে হু-উ-উ-স করে উড়ে গেল মহাশূন্যে...

বলে গেল চাঁড়াল, 'খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ থেকে ৮১৪-এর মধ্যে ঘটেছিল এই ঘটনা। 'দ্য ফ্লাইং সসার স্টোরি' বইতে ব্রিসলি লা পুয়ার ট্রেঞ্চ লিখেছেন, 'ভিনগ্রহীরা মানুষ নিয়ে গেছিল তাদের কীর্তি দেখানোর জন্যে। ফিরিয়ে দেওয়ার পর কিন্তু সেই মানুষদের জাদুকর মনে করে পুড়িয়ে মারতে গেছিল তাদেরই জাতভাইরা।'

'মাই গড!' বলেছিলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে চাঁড়াল যেন কথার চাবুক চালিয়ে গেছিল মাথার মধ্যে, 'এবার তা হলে আমাদের দেশের সংস্কৃত কাহিনি-টাহিনিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাক। বিমান... বিমান... পুরাকালে আমাদের নাকি বিমান ছিল— মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই থাকত। মহাভারতের একটা অতি প্রাচীন ছবিতে দেখানো হয়েছে, কর্ণের যুদ্ধ দেখতে আকাশে উড়ে আসছে দেবতারা। দানিকেন এই সব দৃষ্টান্তই তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন, মহাশূন্য থেকে যে পর্যটকরা আসে এই পৃথিবীতে, উড়ুক্কু দেবতা আর উড়ুক্কু মেশিন তার প্রমাণ।'

ফুটুনি কাটলেন প্রফেসর সঙ্গে সঙ্গে, 'উড়নচাকি নিয়ে তিরিশ বছর গবেষণা করে ব্রিটিশ ইউ. এফ. ও রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়ে বলেছিলেন লর্ড ক্ল্যানকার্টি— উড়নচাকিতে চেপে ভিনগ্রহীরা অবশ্যই আসে পৃথিবীতে বেড়াতে।'

'প্রতাপচন্দ্র রায়ের বইটার কথা বলুন,' চাঁড়াল উসকে দিল প্রফেসরকে।

'বলবই তো, একশোবার বলব,' প্রফেসর যেন লাফাচ্ছেন, 'পুরাণের গল্প আর বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কারের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে ১৮৮৯ সালে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি 'দ্রোণপর্ব'-এর অনুবাদ করেছিলেন উনি ১৮৮৯ সালে—'

'১৮৮৯ সালে!' খাবি খেলাম আমি।

'আজ্ঞে,' প্রফেসরও টিটকিরি দিলেন আমাকে? 'ডসমন্ড লেসলি আর জর্জ অ্যাডমস্কি তাঁদের 'ফ্লাইং সসার্স হ্যাভ ল্যান্ডেড' বইতে প্রতাপবাবুর কথাগুলো হুবহু তুলে দিয়েছেন। হে মূর্খ, বইটা আমার লাইব্রেরিতে আছে। পড়ে নিয়ো। পড়লেই জানবে ইন্দ্র-তির একটা মারাত্মক অস্ত্র। কিন্তু অস্ত্র নিক্ষেপ করত না— ইন্দ্র-তির-কে অপারেট করত একটা সার্কুলার রিফ্লেকটিং মেশিন। নিক্ষেপ করত একটা সার্চলাইট, ধ্বংস করে ছাড়ত লক্ষ্যবস্তু।'

'নিউক্লিয়র বোমা মনে হচ্ছে?' বলেছিলাম মিনমিন করে।

'আজ্ঞে,' আবার সেই টিটকিরি, 'শুধু পারমাণবিক বোমা নয়। লেজাররশ্মি অস্ত্রও বটে। আবিষ্কারটা কাদের? কী ধরনের আকাশপোতে শূন্য বিহার করতেন এঁরা? জবাবটা দিয়েছেন ডব্লিউ রেমন্ড ড্রেক তাঁর 'গডস অ্যান্ড স্পেসমেন ইন দ্যা এনসেন্ট ইস্ট' কেতাবে। সংস্কৃত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বিমানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, জলে স্থলে-অন্তরীক্ষে ধেয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখত এইসব মেশিন।'

'মেশিন! পুরাকালের মেশিনের এত ক্ষমতা,' বলেছিলাম ক্ষীণ কণ্ঠে।

'আজ্ঞে,' আবার সেই অন্তর-টিপুনি, 'অনেক ক্ষমতাই ছিল তখন বিমানদের। সেই গুপ্ত কথায় বলা হয়েছিল, এমনভাবে বিমান বানানো হয় যাতে ভেঙে না-যায়, আগুন লেগে না-যায়, ধ্বংস হয়ে না-যায়। স্থির হয়ে আকাশে ভাসতে পারে, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, শত্রু-বিমানের মধ্যে কথা বললে যাতে শোনা যায়, এমনকী শত্রু-বিমানের ভেতরকার ফোটো পর্যন্ত হাতে চলে আসে। শত্রু-বিমান কোনদিক দিয়ে কীভাবে আসছে— তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। শত্রু-বিমানের আরোহীদের অজ্ঞান করে দেওয়া যায়। শত্রু-বিমান নিশ্চিহ্ন পর্যন্ত করে দেওয়া যায়।'

দম নেওয়ার জন্যে প্রফেসর থামতেই বলে দিলাম, 'লোকে বলবে, ছোট কলকের কারসাজি।'

কর্ণপাত না-করে দম নিয়ে ফেললেন প্রফেসর এবং চালিয়ে গেলেন রকেট স্পিডে, 'সিক্রেট

আছে এমন ধাতু বানানোর যা হবে হালকা আর তাপ শুষে নেবে— বিমান তৈরির জন্যে। মহামুনিরা বলে গেছেন, এরোপ্লেন তৈরির উপযুক্ত শুধু ষোলোরকমের মেট্যাল—'

দুম করে বলে দিলাম, 'কোন কীর্তিমানের লেখা এইসব সিক্রেট?'

'তাঁর নাম মহাঋষি ভরদ্বাজ,' বিনীত হয়ে এল প্রফেসরের কণ্ঠস্বর, 'তর্জমা করা বইটার নাম 'এরনটিক্স'— A Manuscript from the Prehistoric Past. পাবলিশ করেছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সংস্কৃত রিসার্চ, মাইশোর, ইন্ডিয়া।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন কিলবিল করে উঠেছিল আমার মাথার মধ্যে, 'সেই সময়কার সায়েন্স-ফিকশান রাইটারদের উর্বর কল্পনা নয় তো? নাকি, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ? সবই তো বিলকুল অবিশ্বাস্য। ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর মতোই বহু প্রাচীন বলেই তো মনে হচ্ছে মহামুনিদের বক্তব্য।'

চাঁড়ালের জবাবটা সুড়সুড় করে উঠল মাথার মধ্যে, 'বন্ধু দীননাথ, বলেছ ভাল। এই ধরনের কাহিনি উপাদানে তো ঠাসা বাইবেল। উড়নচাকি বিশেষজ্ঞরা তো বলেই দিয়েছেন। তিন জ্ঞানী পুরুষকে যিশুর জন্মস্থানে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল যে নক্ষত্র, আসলে সেটা একটা ফ্লাইং সসার। উড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল, নক্ষত্র অথবা গ্রহ হলে দাঁড়াত না।'

প্রফেসর ধুয়ো ধরে বলে গেলেন, 'নিউইয়র্কের ব্যারি এল ডাউনিং চার্চের মানুষ। তিনি কিন্তু সাফ বলে দিয়েছেন, ওল্ড আর নিউ টেস্টামেন্টের মিরাকলগুলো সুপারন্যাচারাল মোটেই না— স্পেস ভিজিটরদের কাণ্ডকারখানা। Exodus ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে: ঈজিপ্ট থেকে পলাতক ইজরাইল মানুষদের দিনের আলোয় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছিল একটা মেঘ-স্তম্ভ, রাতের অন্ধকারে অগ্নি-স্তম্ভ। ডাউনিং বলেছেন, এই থাম আসলে একটা ফ্লাইং সসার। Exodus-এর কিছু শ্লোক পড়ে তো স্পষ্ট মনে হয়, স্পেস ভিজিটরদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন মোজেস, টেন কম্যান্ডমেন্টস পেয়েছিলেন তাদের কাছ থেকেই। গাঢ় মেঘের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছিলেন মোজেস। আসলে ঢুকেছিলেন উড়নচাকির মধ্যে, বেরিয়ে এসেছিলেন পাথরের ফলক নিয়ে।'

'টেন কম্যান্ডমেন্টস!' বিড়বিড় করে বলেছিলাম আমি।

'Ezekiel-এর বইটা নিশ্চয় পড়া আছে? নেই। গুড, ভেরি গুড। পড়ে নিয়ো। দেখবে, উড়নচাকি বিশেষজ্ঞদের তাতিয়ে দেওয়ার মতো বিস্তর তথ্য আছে তাতে। উড়ে এল ঘূর্ণি ঝড়, মেঘ— ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মানুষের মতো দেখতে চার সজীব প্রাণী। তাদের প্রত্যেকের চারটে মাথা, চারটে ডানা, সোজা পা, প্রত্যেকের মাথার ওপর একই রকম চকচকে চাকা। Ezekiel ছিলেন পুরুত। যা দেখেছেন, যা মনে হয়েছে, তাই লিখেছেন। দানিকেন এই বিবরণকে খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। পুরুতমশায় যা দেখেছিলেন, আসলে রোটর ব্লেড।'

'রোটর ব্লেড! হেলিকপ্টারে যা থাকে।'

'আজ্ঞে!' আবার সেই টিটকিরি, 'ব্লুমরিক যথেষ্ট গবেষণা করেছেন ব্যাপারটা নিয়ে। লিখেছেন একটা বই : The Spaceship of Ezekiel.'

'ব্লুমরিক কে, প্রফেসর?'

আমেরিকা নাসার অন্যতম চিফ। Ezekiel-এর বর্ণনামতো একটা স্পেসশিপের নকশাও বানিয়েছিলেন— পরীক্ষাও চালিয়েছিলেন।'

'নকশা?'

'ওহে চাঁড়াল, ছোকরাকে নকশাটা দেখাতে পারবে?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

চাঁড়ালের চিন্তা আমাব মগজে আছড়ে পড়তে না পড়তেই চোখের সামনে দেখলাম সেই নকশা।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল প্রফেসরের ব্যাখ্যা, 'প্রকাণ্ড স্পেসশিপের ঠ্যাং চারটেকে চারজন সজীব প্রাণী মনে করেছিলেন ইজকিয়েল।'

আগেও স্পেসশিপ— এই পৃথিবীতে! চক্ষু আমার ছানাবড়া।

অনুকম্পা রণরণিয়ে উঠল প্রফেসরের মন্তব্যে, 'ব্লুমরিক-এর গবেষণা কিন্তু উড়ন চাকিদের অকাট্য প্রমাণ বলে অনেকেই মেনে নেয়নি।'

চাঁড়াল টানল উপসংহার, 'কিন্তু সব দেখেশুনে কি মনে হয় না, উড়নচাকি ব্যাপারটা শুধু এই শতাব্দীতেই ঘটেনি?'

আমি যখন থতমত, তখন সব মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। দেখলাম, প্রফেসর আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

আর বলছেন, 'এবার থেকে গুলগল্প ছাড়বার আগে একটু ভেবে নিয়ো।' আর তার পরেই ঘটে গেল হাড় হিম করে দেওয়ার মতো সেই ঘটনাটা। মিরাকল আর সুপার ন্যাচারাল ম্যাজিক আর সায়ান্স-ফিকশন— সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার মতো সৃষ্টিছাড়া সেই ঘটনা ঘটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমি অর্ধেক চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছিলাম। মানে, প্রাণপাখি সুড়ুত করে গলায় এসে ঠেকেছিল। পিঠটান দেওয়ার জন্যে।

চাঁড়ালরূপী কসমিক ওয়ান্ডার অবশ্য তখন অন্য রূপ ধারণ করেছিল। সেই রূপ দেখেই আমার চোখ কপালে উঠে গেছিল! ব্যাপারটা খুলে বলা যাক। পাঠকের কাছে কিছু গোপন করা ঘোরতর অন্যায়।

চাঁড়ালের চেহারার বর্ণনা আগেই দিয়েছি। হতকুচ্ছিৎ প্রফেসর যেই আমাকে শেষবারের মতো জ্ঞানবর্ষণ করলেন, তখন পর্যন্ত চাঁড়াল ওর মুলো দাঁত বের করে, ঝাঁটার কাঠির মতো গোঁফ ওপরের ঠোঁটের ওপর ঝুলিয়ে খি-খি করে হাসছিল। যেই প্রফেসরের টিপ্পনী স্তব্ধ হল, অমনি চাঁড়াল হয়ে গেল একতাল জেলি। থলথলে, থসথসে জেলি। পরমুহূর্তেই নতুন রূপ ধারণ করল সেই জেলিপিণ্ড। তার এখন চারটে মাথা, চারটে ডানা, চারটে কাঠির মতো পা, মাথার ওপর ঘুরছে হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেড।

খনখনে গলায় যান্ত্রিক স্বরে সে বললে, 'আসলে আমি একটা ফুঁ-রোবট। আমাকে পাঠানো হয়েছিল এই সবুজ প্ল্যানেটটাকে সার্ভে করার জন্যে। বোগাস এইসব মানুষ-পোকাদের নিয়ে কলোনি করা যায় না— এই রিপোর্টই দিতে চললাম। এই ইডিয়টগুলো আজও জানেনি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিজ্ঞান ছাড়াও অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিজ্ঞান একটা আছে। আসল বিজ্ঞান সেইটাই।'

বলেই সে ভ্যানিশ হয়ে গেল।

বজ্রদন্তী বিভীষিকা

ফিরে এসে দেখেছিলাম, রুচিরা মারা গেছে।

বেরিয়েছিলাম সকালে, খাবারের সন্ধানে। তারপর কী ঘটেছে, মনে মনে তা কল্পনা করেছিলাম।

রুচিরা কীভাবে শেষ হয়ে গেল, সেই গল্প। মনগড়া। রুচিরা বেঁচে থাকলে বলত, 'হ্যাঁ, দাদাভাই, সব সত্যি। করাল-দন্তীরা ঠিক এইভাবেই আমাকে আঁচড়ে কামড়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।'

কীভাবে, সেইটাই ভেবে ভেবে বের করেছিলাম। সত্যি ঘটনার সঙ্গে আমার এই মনগড়া গল্প হয়তো ষোলো আনা নাও মিলতে পারে, তবুও তা লিখে রাখছি।

করাল-দন্তীদের কৃতান্ত-কাহিনি শুরু হোক রুচিরাকে দিয়ে।

অন্ধ আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি বেয়ে ছিটকে ওপরে উঠে এসেছিল রুচিরা। করিডরের শেষে ছিল একটা ভারী দরজা। ফায়ারপ্রুফ। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই দমাস করে বন্ধ করেছিল কপাট। হাঁপাচ্ছিল। ফোঁপাচ্ছিল। গোঙানি গলায় বলে যাচ্ছিল, 'দাদাভাই, দাদাভাই, যা করতে গেছ— তা থাক। সব ফেলে দিয়ে এসো। দেরি কোরো না, আমি শেষ হয়ে যাব, তখন আর করার কিছু থাকবে না।'

রুচিরার বয়স চব্বিশ, আমার ছাব্বিশ।

এতক্ষণ নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছিল বাইরে। এবার জাগ্রত হল শব্দ। খচমচ, খচমচ... কড়... কড়-কটাস।

দরজা আঁচড়াচ্ছে। কামড় বসাচ্ছে।

পরক্ষণেই রুচিরাকে চমকে দিয়ে হাঁক ছেড়েছিল একটা কুকুর!

আর কোনও শব্দ নেই।

নিঃসীম আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেছিল রুচিরা। দরজা বিলক্ষণ মজবুত। তা সত্ত্বেও আর একটা ছিটকিনি তুলে দিয়েছিল। কপাটে পিঠ দিয়ে বসে পড়েছিল মেঝের ওপর।

কয়েক সেকেন্ড আর আওয়াজ নেই দরজার বাইরে। বজ্রদন্তী কুকুর নিশ্চয়ই নেমে গেছে সিঁড়ি বেয়ে। অথবা অসীম ধৈর্য আর অপরিসীম ধূর্ততা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে বাইরে।

কেটে গেছিল মিনিটের পর মিনিট। ঢুলতে শুরু করেছিল রুচিরা। রাতে ভাল ঘুম হয় না— চমকে চমকে ওঠে। আতঙ্ক ওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, বুজে গেছিল দু'চোখের পাতা।

ক্লেদাক্ত ভয় গভীর ঘুমের মস্ত বাগড়া। রুচিরাও চমকে উঠে চোখ মেলেছিল কিছুক্ষণ পরেই। বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেছিল চোখের সামনে। গলা চিরে বেরিয়ে এসেছিল আর্ত চিৎকার।

তিনটে ধেড়ে ইঁদুর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গনগনে লাল পুঁতি চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। করিডরের ঠিক মধ্যিখানে। নির্ভীক। পলায়নের লক্ষণ নেই। ওত্ পেতে আছে। তার মানে, সাধারণ ইঁদুর নয় এরা।

ইঁদুরকে ভয় পায় সব মেয়েরা। কিন্তু বজ্রদন্তী ইঁদুররা দশগুণ বেশি ভয়াবহ। কারণ, তারা ভয় দেখাতে জানে, ভয়কে বাড়িয়ে দিতে জানে। সাধারণ ইঁদুরের চেয়ে দশগুণ বেশি ধড়িবাজ এরা— এই বজ্রদন্তী ইঁদুররা।

কপাটে সিঁটিয়ে গেছিল রুচিরা। গুটিয়ে এনেছিল দুই পা। ইঁদুর তিনটেও পাশাপাশি থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এসেছিল ওর পায়ের কাছে। ওর মুখের দিকে আর না-তাকিয়ে, নজর রেখেছিল পায়ের আঙুলের দিকে।

শিরশির করে উঠেছিল রুচিরার সর্বাঙ্গ। গা পাক দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। লাথি চালিয়েছিল করাল-দন্তীদের লক্ষ্য করে।

আমিই শিখিয়ে দিয়েছিলাম আত্মরক্ষার এই পদ্ধতি। বজ্রদন্তী ইঁদুরদের লাথিয়ে সরানো যায় না— লাথি মেরে শূন্যে তুলে নিয়ে খপ করে ধরেই দেওয়ালে অথবা মেঝেতে আছড়ে দিতে হয়। সামলে ওঠার আগেই পা দিয়ে ঘাড় ভেঙে দিতে হয়।

কিন্তু এর জন্যে চাই বিদ্যুৎগতি ক্ষিপ্রতা আর নির্ভুল লক্ষ্য।

রুচিরা তা পারেনি। অতি সহজে ওর লাথি পাশ কাটিয়ে গেছিল বজ্রদন্তী ইঁদুর তিনটে। লুকিয়ে পড়েনি। তফাতেও সরে যায়নি। শুধু চেয়ে ছিল ওর পায়ের দিকে।

অতএব শোবার ঘরের দিকেই ধাবিত হয়েছিল রুচিরা। সেখানে ছিল আরও বড় আতঙ্ক।

একটা বজ্রদন্তী-বেড়াল। চুপ করে বসে ছিল ওর প্রতীক্ষায়। মস্ত কালো বেড়াল। রুচিরা যখন নক্ষত্রবেগে ঘরে ঢুকছে ভয়ের শেকলে বাঁধা পড়ে, ঠিক তখনই রণনীতি স্থির করে নিয়েছিল বজ্রদন্তী-বেড়াল। লাফ দিয়েছিল ওর মুখ লক্ষ্য করে।

মস্ত বেড়ালের মস্ত লাফ— টার্গেট ফসকায়নি। মুখ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল রুচিরা, কিন্তু ধারালো নখের আঁচড়ে উড়ে গেছিল গালের খানিকটা।

ছিটকে করিডরে বেরিয়ে এসেছিল রুচিরা। দরজা টেনে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল খুনে বেড়ালের মুখের ওপর। কিন্তু পারেনি। রুচিরার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল করিডরে। ইঁদুর তিনটেকে দেখে মনোযোগ গেছিল সেদিকে। পরমানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তিন শয়তানের একজনের ওপর। এক ঝটকান দিয়ে তার ঘাড় ভেঙে দিয়ে মরণ-খেলায় মত্ত হয়েছিল বাকি দুটোর সঙ্গে।

সুযোগটা নিয়েছিল রুচিরা। ঝট করে পিছু হটে চলে এসেছিল ঘরের মধ্যে। দরজা বন্ধ

করতে গিয়ে দেখেছিল, সেয়ানা বেড়ালটা হাতের শিকার ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে চলে এসেছে ঘরের মধ্যে।

এবার সত্যিই মাথা বিগড়েছিল রুচিরার।

রুচিরার বডিওয়েটের কাছে কিছুই নয় বজ্রদন্তী-বেড়াল। কিন্তু সেয়ানাপনায় আর মারণ নৈপুণ্যে অতিক্রম করে যায় তাকে। তাই থাবার পর থাবা চালিয়ে ফালাফালা করে দিয়েছিল রুচিরার পা। রুচিরা কিন্তু তার অঙ্গ স্পর্শও করতে পারেনি। মুহুর্মুহু লাফ দিয়ে ফালাফালা করে দিয়ে গেছিল রুচিরার মুখ থেকে পা পর্যন্ত! টুঁটি ছেঁড়েনি। সেইটাই বজ্রদন্তী-বেড়ালের পরমানন্দ। তিলতিল করে শমনের দিকে ঠেলে দেবে দ্বিপদ মনুষ্যকে— তাদের চিরশত্রু।

দানবও এদের তুলনায় শিশু।

অথচ বজ্রদন্তী-বেড়াল সাধারণ বেড়ালের চেয়ে খুব একটা বড় নয়। কয়েক ইঞ্চির তফাত। তবে ক্ষিপ্রতায়, ধূর্ততায়, নিষ্ঠুরতায় তুলনাবিহীন।

মানুষ বেড়ালের চাইতেও বড় চারপেয়েদের কবজা করেছে, কিন্তু বজ্রদন্তী-বেড়ালদের পারেনি। তারণ তারা শুধু শরীরের ক্ষিপ্রতায় চলে না, চলে মনের ক্ষিপ্রতায়।

ক্ষিপ্রতর বুদ্ধি দিয়েই রুচিরাকে ফালাফালা করতে করতে ওকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল জানলার সামনে। নিরুপায় হয়ে জানলার গোবরাটে উঠে বসেছিল রুচিরা। নিরতিসীম যন্ত্রণায় বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল সেই মুহূর্তে। নইলে বজ্রদন্তী-বেড়ালের ইচ্ছে-পূরণ করে খোলা জানলায় উঠে বসবে কেন?

গাণ্ডীব থেকে লক্ষ্যভেদী তির যেভাবে লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটে যেত— বজ্রদন্তী-বেড়ালের সর্বশেষ লাফ হয়েছিল তাই। রুচিরার কণ্ঠদেশ ছিল তার টার্গেট।

বিষম যন্ত্রণায় জানলা থেকে বাইরে ঠিকরে গেছিল রুচিরা। আছড়ে পড়েছিস নীচের পাষাণে।

আমি ওকে ওই অবস্থাতেই দেখেছিলাম। ক্ষতবিক্ষত। নিষ্প্রাণ।

গুলি করে মেরেছিলাম দুটো খরগোশ। ফেরবার সময়ে রুচিরার কথাই ভাবছিলাম। আমরা ভাইবোন দু'জনে দু'রকম স্বভাবের। আমি নামে বিশাল, চেহারাতেও বিশাল, স্বভাবেও তাই। রুচিরা ঠিক উলটো। যেমন রোগাপটকা, তেমনি ভিতু। ওকে আগলাতে গিয়ে আমার সমস্যা বেড়েছে। ওকে যদি একটা নিরাপদ জায়গায় রাখতে পারতাম, তা হলে বজ্রদন্তী বিভীষিকাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া যেত আরও ভালভাবে।

আমার নাম বিশাল বক্সী। আমার বাবার নাম বজ্র বক্সী। বাবার গবেষণাগারে এই দন্তী-বিভীষিকাদের সৃষ্টি। তাই এদের নাম হয়েছে বজ্রদন্তী। ডোডো আর ডাইনোসরের মতো এরাও হয়তো একদিন লোপ পেয়ে যাবে। নাও পেতে পারে। বিবর্তন এদের বিভীষিকা বানিয়েছে। মানুষ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। পৃথিবী শাসন এখন এদের হাতে।

আমার বাবা ছিলেন শখের বৈজ্ঞানিক। টাকা ছিল দেদার। গবেষণা করতেন আপন খেয়ালে। কিন্তু গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে কখনও কারও কাছে গল্প করতেন না। বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকাতেও লেখা পাঠাতেন না। তার কারণও আছে। উদ্ভট সমস্ত বিষয় নিয়ে আত্মমগ্ন

থাকতেন। সে সব বিষয় পাঁচকান হলে পাছে লোকে তাঁকে পাগল ঠাওরায়, তাই মুখ বন্ধ করে থাকতেন। ছেলেমেয়েদের কাছেও মুখ খুলতেন না।

আমরা দু'ভাই, তিন বোন। আমি বড়। আমার পরের বোন রুচিরা। এর পরের ভাইটির নাম বিপুল। তারপর দুটি বোন— অন্তরা আর মধুরা। তিন বোনের মধ্যে অন্তরাই শুধু আমার সমান সমান যায়: পয়লা নম্বর গেছো মেয়ে। ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা থেকে আরম্ভ করে রাইফেল শুটিং আর ক্যারাটে বিদ্যে পর্যন্ত রপ্ত করেছে। ছেলেবেলা থেকেই ওর সঙ্গে আমার ঝটাপটি লেগে থাকত। তবে ওই পর্যন্তই। বড়দা বলতে অজ্ঞান। এত মনের মিল আমাদের। আসলে ওর গেছোগিরির জন্যে কিছুটা দায়ী আমিই। আমাকেই অনুকরণ করবার চেষ্টা করে গেছে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে। তাতে ভালই হয়েছে। বজ্রদন্তী বিভীষিকা ওকে কাবু করতে পারেনি। ও যেভাবে লড়ে গেছে, সে কাহিনিতেই যথাসময়ে আসব।

লোকে এমনিতেই বলত আমার বাবার বায়ুবিকার আছে। সোজা কথায়. ছিটগ্রস্ত। একেবারে অসামাজিক। বিশেষ করে আমার মা মারা যাওয়ার পর থেকে। এই সময় থেকেই তিনি যে বিষয়টা নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গবেষণা মন্দিরে সাধনা করে যেতেন, সে বিষয়টার বৃত্তান্ত শুনলে লোকে হেসে গড়িয়ে পড়বে। আমার ছোট ভাই বিপুলের কাছে বিষয়টার একটু আভাস পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম।

উনি অমর হওয়ার গবেষণায় মেতেছিলেন। মাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি— এই বেদনা আমৃত্যু বয়ে বেড়িয়েছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে 'পরশপাথর' এনে দিতে চেয়েছিলেন। যা লোহাকে সোনা করবে, মরাকে বাঁচাবে, বৃদ্ধকে জোয়ান করবে। এককথায়, উনি অ্যালকেমিস্ট বনে গেছিলেন। কয়েক শো বছর আগে কিমিয়া বিদ্যা নিয়ে মেতেছিলেন পরারসায়নবিদরা। উনি এই একবিংশ শতাব্দীতে সেই সাধনায় ডুব দিয়েছিলেন।

উনি বলতেন, চোদ্দোই মার্চে জন্মেছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। আমিও জন্মেছি চোদ্দোই মার্চে। কার্ল মার্ক্স মারা গেছিলেন চোদ্দোই মার্চে। আমিও মারা যাব চোদ্দোই মার্চে। গোয়া স্বাধীন হয়েছে চোদ্দোই মার্চে। আমিও মানুষকে চোদ্দোই মার্চে মুক্তি দেব জন্মমৃত্যুর শেকল থেকে।

সত্যিই উনি চোদ্দোই মার্চে মারা গেছিলেন। অমর হওয়ার পরশপাথর চোদ্দোই মার্চ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, তবে বক্সী-আতঙ্ক গোটা পৃথিবী জুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই। নিশ্চয় জীবদ্দশাতেই তিনি কোনও এক চোদ্দোই মার্চ তাঁর এই ভুবন-কাঁপানো আবিষ্কারে সফল হয়েছিলেন— কিন্তু তা গুপ্ত রেখেছিলেন নিজের মস্তিষ্কে। তারপর বক্সী-মন্দিরে আবিষ্কারটাকে আরও সুষ্ঠু করার নেশায় মেতেছিলেন। পরিণামে সৃষ্টি হয়েছে বজ্রদন্তী বিভীষিকা।

কেঁচো দ্বি-লিঙ্গ প্রাণী। কিন্তু সে বিভীষিকা নয়। হরমোনের অদল বদল ঘটিয়ে বজ্র বক্সী যে সব দ্বি-লিঙ্গ প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই সাক্ষাৎ শয়তান।

আমার বাবার মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ বিকৃত ছিল কিনা, ছেলে হয়ে আমার কলম দিয়ে সে প্রসঙ্গ আলোচিত না-হওয়াই মঙ্গল। তবে উনি যে জিনিয়াস ছিলেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

জিনিয়াস যাঁরা হন, তাঁরা একটু একসেনট্রিক হন। যেমন, নিউটন, এডিসন, আইনস্টাইন। নিউটন আর আইনস্টাইন দু'জনেই ছিলেন গণিতে প্রতিভাধর, অথচ দু'জনেরই জীবনে বেশ কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত বিশ্বাস গজগজ করত নিউটনের মাথায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিমিয়া বিদ্যার চর্চা করে গেছেন— সিসে অথবা লোহা থেকে কাঞ্চন প্রস্তুতের স্বপ্ন দেখেছেন। এমনকী, এই বিশ্ব শেষ হয়ে যাবে কীভাবে, তা নিয়েও বিস্তর পাণ্ডুলিপি রচনা করে গেছেন। কিছু কিছু শোনাতেন বন্ধুদের— তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতেন।

আমার বাবা ছিলেন আরও সেয়ানা। কোনও পাণ্ডুলিপিই লিখে রেখে যাননি। পৃথিবীর টনক যখন নড়েছিল, তখন তিনি পরলোকে। অমৃতের সন্ধান তিনি পাননি— পেয়েছিলেন নিশ্চয় এমন সব হরমোন কেমিক্যাল, যা প্রাণঘাতী গরলের চাইতেও ভয়াবহ। যা অমরত্ব এনে দেয় না— দেয় দানবত্ব।

একটু একটু আভাস পেয়েছিল শুধু বিপুল। কেননা, শুধু বিপুলকেই উনি ল্যাবরেটরি-বাড়িতে রেখেছিলেন নিজের কাছে। দুটো কারণে বিপুলকে উনি বেশি ভালবাসতেন। প্রথমত, বিপুলকে দেখতে প্রায় তাঁরই মতো। গুলি গুলি চোখে যেন বুলেট-চাহনি, ভুরুর হাড় দুটো উঁচু উঁচু, কপাল প্রায় নেই, নাক ছোট আর থ্যাবড়া, কিন্তু হাঁ বড়— বড় বড় দাঁত।

এরকম চেহারার মানুষকে সুপুরুষ বলা যায় না। বিপুল পেয়েছিল অবিকল বাবার আকৃতি। যেন রবার স্ট্যাম্প দিয়ে বানানো মুখ।

কিন্তু এই রবার স্ট্যাম্প আকৃতিই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরবর্তীকালে। লোমহর্ষক সেই কাহিনিতেও আসব যথাসময়ে।

বাবার সুনজরে থাকার দ্বিতীয় কারণ অবশ্যই ওর গোবেচারা স্বভাব। একেবারে রুচিরার মতো। অত্যধিক শান্ত আর ঘরকুনো বলেই বাবা ওকে কাছে রেখে দিয়েছিলেন। ঘর থেকে যে বেরুতেই চায় না, সে ঘরের কথা বাইরে বলতে যাবে কেন?

আমি ছিলাম (এখনও আছি) বুনো ঘোড়া। বাবার মুখের ওপর কথা বলতাম শুধু আমরা দু'জন— আমি আর অন্তরা। তাই আগে আমি ছিটকে গেলাম, তারপর গেল অন্তরা। আমি চলে গেলাম অযোধ্যা পাহাড়ে ফরেস্ট অফিসারের চাকরি নিয়ে। অন্তরাও চলে গেল মেঘালয়ে মিশনারি স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে।

বাকি রইল স্বভাবমৃদু রুচিরা আর মধুরা। বাপের কাছে গৃহবন্দি থাকতে না-পেরে রুচিরা চলে এল আমার কাছে। মধুরা চলে গেল অন্তরার কাছে।

কিন্তু আমাদের চিঠি পর্যন্ত লেখবার অধিকার রইল না বিপুলের।

যা কিছু জেনেছিলাম, বাবার বিদায় নেওয়ার অনেক পরে। যখন তামাম দুনিয়ায় উন্মাদ বৈজ্ঞানিক বজ্র বক্সীর নামে ঢি ঢি পড়ে গেছে— তখন— বিপুলের মুখে।

বাবা কিমিয়া বিদ্যা নিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করে গিয়েছিলেন শুনে অবাক হইনি। চার্বাক দর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন তো! এই দুনিয়ার সব কিছুই মাটি জল বাতাস আর আগুন, এই চারটি বস্তুর আনুপাতিক সমাহার— সুপ্রাচীন এই তত্ত্বে পরম বিশ্বাসী ছিলেন বাবা। মৌল

পদার্থগুলোকে একটু নড়িয়ে সরিয়ে এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে নিয়ে যাওয়া যায়— অ্যালকেমিস্টদের এই দর্শনেও পরম বিশ্বাসী ছিলেন। রকমারি কেমিক্যালের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উনি আত্মিক উন্নতির প্রয়াসও চালিয়েছিলেন।

উনি অণিমাদি ঐশ্বর্যলাভের সাধনা করেছিলেন। যোগসাধনা নয়— আধুনিক গবেষণা।

অণিমাদি ঐশ্বর্যর নাম শুনেছিলাম। কিন্তু ঐশ্বর্যগুলো কী, তা জানা ছিল না। বিপুল একটা একটা করে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল।

মোট আটটার প্রথমটা হল অণিমা। মানে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে যাওয়ার অলৌকিক ক্ষমতা। দ্বিতীয়টা, লঘিমা। অর্থাৎ ভীষণ হালকা হয়ে গিয়ে শূন্যে ভেসে ওঠার ক্ষমতা। তৃতীয়টা, ব্যাপ্তি— এর মানে সাফল্য অথবা সফলভাব। চতুর্থ, সিদ্ধি, প্রাকাম্য। মানে ইচ্ছা মাত্র সম্পন্ন করার শক্তি। পঞ্চম সিদ্ধি, মহিমা— যার মানে, মহত্ব (কিন্তু গবেষণা করার দরকার আছে কি মহত্ব লাভের জন্যে?)। ষষ্ঠ সিদ্ধি, ঈশিত্ব। মানে, প্রভুত্ব (এটা তো জানি যার ব্যক্তিত্ব আর টাকার জোর আছে— তার থাকে)। সপ্তম সিদ্ধি, বশিত্ব। মানে, বশ করার শক্তি (হ্যাঁ, এটা একটা ক্ষমতা বটে— হিপনোটিজম জাতীয় ক্ষমতা কি?)। অষ্টম, সিদ্ধি, কামাবসায়িত। মানে বাসনা সমাপ্ত করার শক্তি (এটা তো সাধুদের থাকে, বৈজ্ঞানিকদের প্রয়োজন হবে কেন?)।

অষ্টসিদ্ধির ব্যাখ্যা শুনে আমার মাথা যখন চরকিপাক খাচ্ছে, তখন বিপুল বলেছিল, 'এ ছাড়া আরও দশ রকম সিদ্ধির উল্লেখ আছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে।'

সোজা কথায়, অষ্টাদশ সিদ্ধির আধার হতে চেয়েছিলেন বজ্র বক্সী!

সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, এই তথ্য আমার জানা আছে। সিদ্ধির মত্ততায় নানা অদ্ভুত কথা অদ্ভুত ইচ্ছা মনে আসে। বজ্র বক্সী যে সিদ্ধি খেতেন, তাও আমি জানি। কাজেই আজগুবি গবেষণা তাঁকেই সাজে। তবে এটা আমি বিশ্বাস করি, কেমিক্যাল-টেমিক্যাল দিয়ে ওসব হয় না।

বজ্র বক্সী সিদ্ধপুরুষ হতে পেরেছেন কিনা, সে বিষয়ে সংশয় আছে। তবে শব গড়তে গিয়ে বানর যে গড়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

ফলে শোচনীয়তম অবস্থায় পড়েছে তাঁর ছেলেমেয়েরা।

আমার তো মনে হয়, চৌদ্দোই মার্চ ওঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেনি। অপঘাতে মৃত্যুও না। আত্মহত্যা করেছিলেন। অথবা অন্য কিছু।

এটা আমার নিছক অনুমান। ঘটনাপ্রবাহ ওই পরিণতির দিকেই ওঁকে নিয়ে গেছিল। মাথার পোকা বেশি কিলবিল করে উঠেছিল গোপন গবেষণা বিপথে চালিত হতেই। উনি নিশ্চয় নিজেকে দ্বিতীয় বুদ্ধদেব মনে করতেন— জন্ম, মৃত্যু, সিদ্ধিলাভ একই তারিখে ঘটাতে চেয়েছিলেন।

লন্ডনের বৈজ্ঞানিক জেমস প্রাইসও তো আত্মহত্যাই করেছিলেন— কিমিয়া গবেষণায় অশ্বডিম্ব লাভের পর।

বজ্র বক্সীর গোপন গবেষণাগার কোথায় ছিল তা আর আমার বলার দরকার নেই, গোটা

পৃথিবী তা জেনে গেছে। বজ্রদন্তী বিভীষিকারা যখন গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর উজাড় করে দিতে শুরু করেছে— তখন উন্মত্ত জনতা সেই গবেষণাগার ভেঙেচুরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

সেখানে এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু নেই। চারপাশে উঁচু উঁচু পাহাড় জঙ্গল শুধু সাক্ষী হয়ে রয়েছে এক পাগলা বৈজ্ঞানিকের অসম্ভবের সাধনার।

জনতা যখন গবেষণাগার গুঁড়োচ্ছে, তখনই নিকেশ করতে চেয়েছিল বজ্রদন্তীদের, যদি তারা গবেষণাগারে এখনও থাকে— এই প্রত্যাশায়।

কিন্তু পায়নি একটাকেও। তারা যে নিরতিসীম চতুর, অবিশ্বাস্য মাত্রায় বুদ্ধিমান। হঠকারিতা ওদের উন্নতমানের মগজে লেখা নেই। ওরা জানে, ঝোপ বুঝে কখন কোপ মারতে হয়। শত্রু যখন শক্তিমান, তখন ঘাপটি মেরে থাকে। ওরা মানে, এই বজ্রদন্তীরা। ওদের অসম্ভব শক্তিশালী ব্রেন জানে, কর্মফল কী ভয়ানক হতে পারে। আড়াল থেকে ওত্ পেতে থেকে নজরে রাখে মানুষকে। যখন দেখে একা অথবা অল্প কয়েকজন— তখন আসে। প্রথমে ভয় দেখিয়ে কোণঠাসা করে এমনভাবে, যাতে মানুষরা নিজেরাই আত্মহত্যা করে বসে। নইলে লাফিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। আর যদি দেখে মানুষ সশস্ত্র আর পালটা মার দেওয়ার জন্যে তৈরি, তখন আড়ালেই থেকে যায়।

বৈজ্ঞানিক বজ্র বক্সী প্রথমে এদেরকে নিয়েই তাঁর অষ্ট অথবা অষ্টাদশ সিদ্ধিলাভের গবেষণা শুরু করেছিলেন। এরা ছিল তাঁর এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ। মানুষের ওপর নিশ্চয় ফলাফল যাচাই করতেন পরে।

আমার তো মনে হয়, করেও ছিলেন। নিজের ওপর। পরিণামটা এমনই হয়েছিল যে উনি মহাপ্রস্থানের পথই বেছে নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। নইলে পাগলা জনগণ তাঁকে কুপিয়ে কাটত।

প্রথম এক্সপেরিমেন্টগুলো নিশ্চয়ই করেছিলেন কেমিক্যাল দিয়ে। হরমোন পালটে দিয়ে ফল দেখছিলেন। উনি যে অঞ্চলে থাকতেন, অথবা আমরা যে অঞ্চলে মানুষ হয়েছি, সেখানে বনজঙ্গল এত বেশি যে বনজ সম্পদের অভাব নেই। অভাব নেই উদ্ভিজ্জ ওষুধির। এইসবের সঙ্গে উনি আধুনিক কেমিক্যাল মিশিয়ে ছিলেন কিনা, জিন পরিবর্তনের পরীক্ষা করেছিলেন কিনা, অত্যাধুনিক কী কী মেশিনপত্র আনিয়েছিলেন— সেসব এখন আর জানা যাবে না। উন্মত্ত জনতা সব শেষ করে দিয়েছে। ল্যাবরেটরির মধ্যে ওঁর লেখা ডায়েরি অথবা নোটস কিন্তু কিচ্ছু পায়নি। সে সব উন্মাদ বৈজ্ঞানিক নিজেই হয়তো শেষ করে দিয়ে গেছিলেন।

আমি আজও জানি না উনি আদৌ মারা গেছেন না অণিমা ঐশ্বর্য লাভ করে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হয়ে পরমাণু আকারে পৃথিবীর দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে চলেছেন পরমানন্দে!

ওঁর দেহ কিন্তু পাওয়া যায়নি। বিপুল তো তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল ল্যাবরেটরি বাড়িতে— পাতাল কুঠরিতে। শুধু একটা চিঠি পড়ে ছিল ওঁর খাটে— আমি চললাম। আমি শেষ হয়ে গেলাম। আমার আর কিছু করার নেই। আমার সৃষ্টিরা আমাকেও খাতির করছে না। আমি আর একটা ডক্টর ফ্রাঙ্কেন্সটাইন হয়ে গেলাম। আমার হাতে গড়া মহাদৈত্যরা পৃথিবী জয় করবেই। কিন্তু আমি থাকব অজেয় অবস্থায়— সবই দেখব, জানব— কিন্তু

জানাতে পারব না। আমি থেকেও থাকব না। আত্মার বিনাশ নেই। আমারও বিনাশ নেই। বিপুল, পালা। ওরা আসছে। ওরা তোকে খতম করবেই, আমাকে না পেলে। বিশালকে খবর দিয়েছি— সে এলে তবে এখান থেকে বেরোবি। তাকে জানিয়ে দিলাম এখানে ঢোকবার পথ কোথায়।

বাবার এই চিঠি আজও আমার কাছে একটা প্রহেলিকা!

বজ্র বক্সীর তৈরি প্রথম ধাপের ইঁদুরগুলো হতচকিত হয়ে গেছিল আচমকা অবিশ্বাস্য মেধাশক্তি পেয়ে। ওরা তখন শুধু পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিল। মানুষকে বুঝতেই দেয়নি। ওরা অতি-ইঁদুর হয়ে গেছে উদ্ভট হরমোন বিক্রিয়ার ফলে। নিশ্চেষ্ট থেকেছে, অতি-তৎপরতা দেখায়নি। আচরণ রেখেছে আর পাঁচটা সাধারণ ইঁদুরের মতনই। মানে, বোকা বানিয়ে রেখেছে রক্ষকদের। যারা খেতে দিতে এসেছে, তারা কীভাবে খাঁচার দরজা খুলছে, কীভাবে বন্ধ করছে— সব দেখেই শিখে নিয়েছে। কিন্তু কখনও তা দেখাতে যায়নি। দেখালেই যে মানুষ হুঁশিয়ার হয়ে যাবে, তা তারা শাণিত মগজশক্তি দিয়ে বুঝে নিয়েছিল।

একটা প্রজন্ম গেছিল এইভাবে। বোকাভাবে থেকে। ধুরন্ধর বলেই দ্বিতীয় প্রজন্মকে শিখিয়ে দিয়েছে যা কিছু তারা জেনেছে মানুষ নামক মহাশত্রু এই দ্বিপদ জীবগুলো সম্পর্কে। বিবর্তনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় প্রজন্মের ইঁদুরগুলো হয়েছিল আরও মেধাবী, আরও করাল আর হিংস্র। কিন্তু কক্ষনও করাল দন্তের প্রকোপ প্রকাশ করেনি খাদ্য যারা বহন করছে তাদের ওপর। শুধু দেখেছে, শিখেছে আর ফন্দি এঁটেছে। বিলকুল বোকা বানিয়ে রেখেছিল খোদ বজ্র বক্সীকে— যিনি নিয়মিত আসতেন ইঁদুর-মহলে। হরমোন প্রভাব কতদূর এগিয়েছে তা শুধু চোখ দিয়ে নয় নানা যন্ত্রপাতি আর রক্ত পরীক্ষা করেও জানতে চেয়েছিলেন। এমনকী প্রথম প্রজন্মের মরা ইঁদুরদের মগজ নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। দেখেছিলেন, মগজের সাইজ বাড়েনি। হতাশ হয়েছিলেন। তারপর জ্যান্ত ইঁদুরের করোটি খুলে মগজে ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন অতি-তৎপর মগজের ক্রিয়াকলাপ দেখে। আলোর গতিবেগকেও হার মানিয়ে দিয়ে এক নিউরোন থেকে আর এক নিউরোনে সংবাদ আর তথ্যের আদানপ্রদান চলছে, বিশ্লেষণ ঘটছে— কিন্তু একটা অতি-শক্তি পরবর্তী অ্যাকশন স্থগিত রাখছে।

ধাঁধায় পড়েছিলেন বজ্র বক্সী! কী এই অতিশক্তি যা সামান্য ইঁদুরকে এত বিবেচক করে তুলেছে?

মন। যাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। অথচ জীবদেহের অস্তিত্বের মূলে যা আছে— অদৃশ্য অপ্রত্যক্ষ, অথচ মূল চালিকা শক্তি। মনের জোরেই মানুষ আজ এই পৃথিবীর অধীশ্বর।

অথচ এই মন কী, তা কেউ জানে না! আজও তা রহস্য। বজ্র বক্সীর গবেষণা মন্দিরের ইঁদুরেরা এই মনকে স্থাপন করেছে মগজের ওপর। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এই মন। মনের শক্তি দিয়েই তারা বুঝেছিল, দুর্ধর্ষ এই মানুষদের কাছে তাদের মনের শক্তিব সামান্যতম নমুনা উপস্থিত করলেই মরণের দরজা খুলে যাবে। কারণ, মানুষের গায়ে জোর

আছে ইঁদুরের তা নেই। এক পদাঘাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হতে এক লহমা সময়ও লাগবে না।

সুতরাং ওদের মন বলেছিল, বৎস ইঁদুরগণ, এই পৃথিবী তোমাদেরই করায়ত্ত হবে। কিন্তু সে জন্যে প্রয়োজন ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা আর পর্যবেক্ষণ। দেখে যাও, শিখে নাও, আর মনে মনে লিখে রাখো, কোথায় কোথায় আছে এই বজ্জাত মানুষটার প্রচণ্ড দুর্বলতা। ঘা মারবে সেখানেই। কিন্তু এখন নয়।

মন... রহস্যমন মন... বজ্র বক্সীর কিমিয়া আর অত্যাধুনিক গবেষণার গোঁজামিলে এই মন সঞ্চারিত হয়ে গেছিল কুৎসিত জঘন্য ইঁদুরদের মধ্যে।

বজ্র বক্সীর মহা-ইঁদুররা অসামান্য ধূর্ত— স্রেফ অতি-মনের দৌলতে। তারা শুধু নিষ্ক্রিয় থাকেনি, রণনীতি প্রস্তুত করে গেছে।

ঘেন্না। ইঁদুরদের নিদারুণ ঘেন্না করে মানুষ। বিশেষ করে মেয়েরা ইঁদুর দেখলেই শিউরে উঠে সিঁটিয়ে যায়।

সুতরাং ভয় প্রদর্শনই হোক ইঁদুরবাহিনীর প্রথম অস্ত্র।

তারপর ফালাফালা করে দেওয়া হোক গোটা শরীর দাঁত আর নখ দিয়ে।

সর্বশেষ টার্গেট হোক কণ্ঠনালী। দন্তীজীবের প্রথম ও শেষ মহাঅস্ত্র।

তাই এদের নাম দন্তী বিভীষিকা। বজ্র বক্সীর বিজ্ঞানের আখড়ায় এদের প্রথম প্রশিক্ষণ— তাই এরা বজ্রদন্তী।

এই ক'টা রণকৌশলই প্রয়োগ করা হয়েছিল হতভাগিনী রুচিরার ওপর। ভয় দেখিয়ে, আঁচড়ে কামড়ে তাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল জানলার গোবরাটে— কণ্ঠপ্রদেশ লক্ষ্য করে লম্ফপ্রদান করার সঙ্গে সঙ্গেই নিদারুণ আতঙ্কে সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছিল নীচের পাষাণে নিজেকে আছড়ে ফেলে....

সেই দন্তী বিভীষিকা ছিল বেড়াল।

বেড়াল, কুকুর, ঘোড়া— এই তিন গৃহপালিত পশুর ওপরেও বজ্র বক্সী তাঁর রহস্যাবৃত গবেষণা চালিয়ে গেছিলেন। ফল লাভের পর নিশ্চয় প্রয়োগ করতেন মানুষের ওপর।

বেড়াল আর কুকুর স্বভাবহিংস্র পশু। অতিমনের অধিকারী হয়ে তারাও তক্কে তক্কে থেকেছে।

সে তুলনায় ঘোড়া বিলক্ষণ ভিতু। তাই যখন ইঁদুর কুকুর, বেড়ালরা দ্বিতীয় প্রজন্ম পেরিয়ে তৃতীয় প্রজন্মে এসে তোড়জোড় করছে খাঁচা-রক্ষকদের এক দিনেই আক্রমণ করে খাঁচা খুলে চম্পট দেওয়ার অভিযানে— সেই সময়ে ঘোড়ারা বোকামি করে ফেলেছিল। দুঃসাহসের অভাবেই লম্ফঝম্প করে তারা বিক্রম দেখিয়ে পয়াকার দেওয়ার আয়োজন করতেই শোরগোল পড়ে গেছিল বীক্ষণাগারে; বধ করা হয়েছিল তাদের— বজ্র বক্সীর হুকুমে।

তারপর পালা এসেছিল ইঁদুর, বেড়াল, কুকুরদের। কিন্তু তারা তৃতীয় প্রজন্মের প্রাণী। মহা-মহা-মনের অধিকারী। মানুষকে তারা শনাক্ত করে ফেলেছে এই পৃথিবীতে তাদের পয়লা নম্বর দুশমন হিসেবে। তাই মানুষ তাদের খাঁচার কাছে এসে দেখেছিল— সব খাঁচা শূন্য।

পরিকল্পনা স্থির করাই ছিল। প্রথমে গা ঢাকা দিয়েছিল পাহাড় জঙ্গলে। এসব জায়গায় ইঁদুরের অভাব নেই। বুনো কুকুর আছে বুনো বেড়ালও আছে। কিন্তু সেই সব দলে এরা মেশেনি। বরং সুযোগ পেলেই মন-নিয়ন্ত্রিত হিংস্র রণনৈপুণ্যে তাদের ঘায়েল করেছে।

ল্যাবরেটরির লোকজন বন্দুক পিস্তল ছোরা কুড়ুল নিয়ে এদের খুঁজতে গেছিল পাহাড় জঙ্গলে। দেখেছে কাতারে কাতারে মরে পড়ে আছে সাধারণ ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর। তারা যে সাধারণ প্রাণী, নব প্রজন্মের দুষ্কৃতী নয়, তা বোঝা গেছিল তাদের মগজ পরীক্ষা করে।

বজ্র বক্সী কী ভীষণ সৃষ্টি করে বসেছেন। এরা নিজেদের পূর্ব প্রজাতিকেও নির্বংশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। নব প্রজাতি পৃথিবী ছেয়ে ফেলুক, নিশ্চয় তাই চায়।

এর পরেই শুরু হয়েছিল নৃশংস অভিযান ল্যাবরেটরি বাড়িতে। দৈহিক শক্তিতে দ্বিপদদের ঘায়েল করা অসম্ভব তাই ওরা যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তা নিঃসন্দেহে অভিনব।

মানুষের অদৃষ্টে কি এই লিখন ছিল? বজ্র বক্সী নামক এক মানুষ বিশ্বের সমস্ত মানুষের মৃত্যু আনয়ন করবেন তাঁর কালান্তক-বাহিনী দিয়ে?

শুধু কালান্তক নয়, অতি সুচতুর। প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস ঘাঁটলে এরকম কূট যোদ্ধার সন্ধান পাওয়া যায়। কোনওরকম বাধা-সংকুল পথে তারা অগ্রসর হয়নি। এসেছিল রাতের অন্ধকারে। যখন দুর্বার দুরন্ত মানুষগুলো অঘোরে ঘুমোয় প্রতিরোধের সমস্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে। তিন-তিনটে প্রজন্ম ধরে মানুষের এই নৈশ-দুর্বলতা নজরে রেখেছিল দন্তী বিভীষিকারা। হানাও দিয়েছিল রাতের অন্ধকারে।

কেউ বাঁচেনি। একরাতেই প্রত্যেকটা মানুষের কণ্ঠনালী দু'টুকরো করে দেওয়া হয়েছিল ক্ষুরের মতো ধারালো দাঁত চালিয়ে। তারা চিনেও রেখেছিল প্রতিটি মানুষকে— কারা তাদের পাহারা দিয়েছিল, খেতে দিয়েছিল তিন তিনটে প্রজন্ম ধরে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও রেহাই দিয়েছিল বজ্র বক্সীকে! স্রষ্টা অবধ্য বলে?

বিশেষ সেই রাতে বিপুল ছাদে উঠেছিল ঘুম আসছিল না বলে। পুরো ল্যাবরেটরি বাড়িটা ছিল উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মোগল আমলের তৈরি দুর্গ-প্রাসাদ। নৈশ প্রহরী মোতায়েন থাকত বড় বড় দুটো তোরণে। সেই রাতেও টহল দিচ্ছিল তারা। চাঁদ ছিল আকাশে। পূর্ণচন্দ্র। অমাবস্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে না-এসে জ্যোৎস্না রাতকে কেন বেছে নিয়েছিল দিবানিশির আতঙ্করা— এও একটা প্রহেলিকা। ওরা যে কতখানি অকুতোভয় তা দেখানোর জন্যে? নাকি, যুগ যুগ ধরে পূর্ণচন্দ্র যে মত্ততা এনে দেয় রুধির আর মগজে— সেই বলে বলীয়ান হওয়ার জন্যেই?

বিপুল বক্সী বৈজ্ঞানিক-তনয় হলেও মানসিকতায় কবি। যার জনক সৃষ্টিছাড়া স্বপ্ন দেখেন এবং তা কাজে পরিণত করেন— সে তো এই কাব্য নামক সৃষ্টিছাড়া ব্যাধিতে আক্রান্ত হবেই আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদ্ভাসিত হলে।

বিপুলের এই রোগের কথা আমার অজানা নয়। প্রবল প্রতাপ বাপের ছায়ায় থাকলে মুখচোরা ভীরুদের এই অবস্থাই হয়।

ছাদে দাঁড়িয়েছিল বলেই ও দেখতে পেয়েছিল কৃতান্তদের করাল অভিযান।

ছাদে দাঁড়ালে সামনে পেছনের দুটো দুর্গ তোরণই দেখা যায়। ও দাঁড়িয়েছিল জঙ্গলের দিকের তোরণের দিকে মুখ করে। অন্যমনস্ক অবস্থায় দেখছিল চারজন নৈশ প্রহরীদের দু'জন ফটকের দু'পাশে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে— অন্য দু'জন পাঁচিল বরাবর টহল দিতে বেরিয়েছে। বিপরীত দিকের তোরণেও একই ব্যবস্থা।

রাতের পর রাত এই ব্যবস্থাই বহাল আছে দুর্গপ্রাসাদে— যা কিনা বজ্র বক্সীর আমলে রূপান্তরিত হয়েছে দুর্ভেদ্য গবেষণা মন্দিরে। তাই এখানকার খবর এখানেই থাকে— বাইরে যায় না, এই ইনফোটেকের যুগে প্রচণ্ড কূটবুদ্ধিধর জার্নালিস্টদেরও অন্ধকারে রেখে দিয়েছিলেন বজ্র বক্সী এতাবৎকাল সুষ্ঠু প্রহরার ব্যবস্থা করে।

সেই চাঁদনি রাতে কিন্তু একটা অঘটন ঘটতে দেখল বিপুল।

জঙ্গলের দিকের তোরণের সামনে প্রহরারত দুই সান্ত্রিই অকস্মাৎ ছটফটিয়ে ঠিকরে গেল মাটিতে। নিস্পন্দ হয়ে গেল পরক্ষণেই।

ফুটফুটে চাঁদনি রাতে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না আশেপাশে। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ।

খটকা লেগেছিল বিপুলের। ওইরকম অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় নিজেদের গলা চাপড়াতে চাপড়াতে অকস্মাৎ ধরণী আশ্রয় করল কেন প্রহরীরা? নিশ্চল হয়ে গেল কেন পরক্ষণেই?

দূর থেকে এর বেশি অনুধাবন করতে পারেনি বেচারি বিপুল। সরল প্রকৃতির মানুষ। আমি হলে পারতাম।

প্রেতপুরীর বাসিন্দাদের মতনই বজ্রদন্তী ইঁদুররা নিঃশব্দে ভীমবেগে ধেয়ে এসে প্রহরীদের টুঁটি লক্ষ্য করে লাফ দিয়ে কণ্ঠনালী ছিন্ন করে দিয়েছিল নিমেষ মধ্যে।

এসেছিল তারা কোন পথে? তাও জানা গেছিল পরের দিন। আবিষ্কার করেছিলেন স্বয়ং বজ্র বক্সী। মাটির তলায় কাটা সুড়ঙ্গ পথে। বিবরবাসীরা বিবর রচনা করেছে দীর্ঘকাল ধরে প্রাচীরের তলা দিয়ে— নৈশ অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে।

সেই মুহূর্তে বিমূঢ় বিপুল যখন হতবাক হয়ে কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করে চলেছে তখনই ধূসর কালচে হয়ে উঠেছিল তোরণের সামনের জমি। যেন আকাশের মেঘ অকস্মাৎ ধরণী কামড়ে ধরে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে দুর্গ প্রাসাদ অভিমুখে।

কাতারে কাতারে ধেড়ে ইঁদুর ধেয়ে আসছে বাড়ির দিকে। পিলপিল করে তারা পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে তোরণের সামনে।

বিহ্বল বিপুল এবার প্রকৃতই বিপুল বেগে ধাবিত হয়েছিস ছাদের উলটো দিকে— যেখান থেকে দেখা যায় আর একটা তোরণ!

সেদিকেও সেই একই দৃশ্য। চারজন নৈশ প্রহরী ধরাশায়ী ধরণীর ধুলোয়।

ধূসর কালচে মেঘের মতো হাজারে হাজারে ধেড়ে ইঁদুর ধেয়ে আসছে বাড়ি আর ব্যারাক লক্ষ্য করে।

কক্ষচ্যুত উল্কার মতো বিপুল তখন ধেয়ে গেছিল ছাদের সিঁড়ির দিকে। তরতরিয়ে নেমে গিয়ে ওপরের চাতালে পা দিতেই দেখেছিল ওরা এসে গেছে ওর আগেই।

ধেড়ে ইঁদুর বজ্রদন্তীরা। চৌকাঠে বসে রয়েছে লাইন দিয়ে— যেন হত্যাপাগল ইঁদুরদের কেউ ঢুকতে না-পারে বজ্র বক্সীর শয়নকক্ষে।

তিনি তখন সিদ্ধির ঘোরে ঘুমে অচেতন।

চাঁদের আলো ঝুল বারান্দায় পড়েছিল, বজ্র বক্সীর শোবার ঘরের চৌকাঠেও। তাই ওপরের চাতালে দু'পায়ে ব্রেক কষেই বিপুল দেখতে পেয়েছিল ক্রূর চক্ষু আততায়ীদের।

করমচা-রাঙা পুঁতি-চোখে যেন নরকের অগ্নি লেলিহান রয়েছে। ইতর অনুভূতি আর অতি-মন দিয়ে ওরা নিশ্চয় জেনে গিয়েছিল ধুপধাপ করে ছাদ থেকে কে নেমে আসছে।

বিপুল বক্সী। স্রষ্টার পুত্র। দ্বিতীয় স্রষ্টা।

তাই কি ওরা ধাবমান হয়নি বিপুলকে লক্ষ্য করে? সে অভিলাষ যদি ওদের অতি-মনে জাগ্রত হত, তা হলে কি সেই নিশুতি রাতে বিপুল বক্সী সজীব থাকতে পারত?

ছ'টা বজ্রদন্তী ইঁদুর চৌকাঠে সারবন্দি হয়ে বসে শুধু অগ্নিলোচন মেলে ধরেছিল বিপুলকে লক্ষ্য করে।

তৎক্ষণাৎ স্থাণু হয়ে গেছিল বিপুল। এক আশ্চর্য উপলব্ধি প্রবেশ করেছিল ওর মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এই বিবরবাসীরা চায় না, বিপুল আর নীচে নামুক।

বিপুলের কাছে সেই বর্ণনা-চিত্র শুনে একটা সম্ভাবনাই আমার মনে সঞ্চারিত হয়েছিল।

কুৎসিত কদাকার অতীব ঘৃণ্য এই জীবগুলো কি বশিত্ব অর্জন করেছে? মানে, বশ করবার শক্তি? অথবা ঈশিত্ব, মানে, প্রভুত্ব করবার শক্তি? সবই তো অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে পড়ে। বজ্র বক্সীর গড়া ঘৃণ্য এই বিবরবাসীরা কি অবশেষে এই অতিমানবিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে গেছে তিন-তিনটে প্রজন্মের বিবর্তনের পর? নইলে একই রণকৌশল প্রতিটি ইঁদুরের মগজে প্রবিষ্ট হয়েছিল কোন পন্থায়? ওদের তো ভাসা নেই।

কিন্তু মন আছে। অতিমন!

বিপুল প্রস্তরপ্রতিম হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে ছিল ওইভাবেই অনেকক্ষণ। কতক্ষণ, তা ও জানে না। শুধু মনে আছে, ও যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেছিল। মর্মর মূর্তির যেমন সাড় থাকে না, ওর শরীরে অথবা মগজেও কোনও সাড় ছিল না। পরিপূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থা। চোখ সব দেখেছে, কিন্তু মগজে তার ছাপ পড়েনি। তাই ওর আর কিছু মনে নেই।

এই অবস্থা কেটে গেছিল অকস্মাৎ। চর্মচক্ষুর অসাড়তা তিরোহিত হয়েছিল মুহূর্ত মধ্যে। চনমনে হয়ে উঠেছিল মস্তিষ্ক।

চাঁদের আলো তখন নেই। ভোরের আলো ফুটছে। দেখেছিল, পিতৃদেবের শয়নমন্দিরের চৌকাঠে আর প্রহরায় নেই ছয় শয়তান।

বজ্র বক্সী তখনও নাসিকাগর্জন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ছয় মৃত্যুদূত নিশ্চয় বিলক্ষণ উপভোগ করেছিল এহেন রাসভগর্জন।

বিপুলের বিপুল ধাক্কায় তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে যখন গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে বদন মণ্ডলে বিষম বিস্ময় পরিস্ফুট করছেন, তখন তড়বড়িয়ে বিপুল উপস্থিত করেছিল শিহরন জাগানো প্রতিবেদন।

উনি ছিটকে গেছিলেন শয্যা থেকে। একতলার লৌহকপাট ভেতর থেকেই তালাবন্ধ দেখেছিলেন। কিন্তু মেঝেতে রচিত হয়েছে সুড়ঙ্গ। বজ্রদন্তীরা পাতাল পথ প্রশস্ত করে

রেখেছিল দুর্গ-বাড়ির ভেতর পর্যন্ত— স্রষ্টার অগোচরে। মহত্ত্ব দেখিয়ে গেছে স্রষ্টা এবং স্রষ্টাপুত্রকে নিধন না-করে।

ছুটে বেরিয়ে গিয়ে যা দেখেছিলেন, তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মড়া, শুধু মানুষের মড়া। ছিন্নকণ্ঠ প্রত্যেকেই ঘুমন্ত অবস্থায়। শিশু নারী বৃদ্ধ— কেউই বজ্রদন্তী ইঁদুরদের কোপানল এড়াতে পারেনি। কারণ তাদের লক্ষ্য একটাই— নরমেধ যজ্ঞ।

এই যজ্ঞের সুচারু অনুষ্ঠান দেখা গেছিল সেই দিন থেকেই— আশপাশের গ্রামে গ্রামে, দূরবর্তী শহরে শহরে। কাতারে কাতারে কালান্তকরা একই সময়ে হানা দিয়েছে-- রাত্রি নিশীথে! সুষুপ্ত মানুষদের কণ্ঠদেশ ছিন্ন করে দিয়ে চলে গেছে।

কাজটা কিন্তু নির্বিঘ্নে সম্পাদন করতে পারেনি সর্বত্র। যেখানে রুখে দাঁড়িয়েছে বাড়ির কুকুর বেড়ালরা, সেখানেই লেগেছে খণ্ডযুদ্ধ।

ইঁদুরদের চিরশত্রু এই কুকুর আর বেড়ালরা। শেষের দুটো প্রাণীই পরস্পরের জাতশত্রু। কিন্তু ইঁদুর এই দুই জাতিরই অভিন্ন অরি।

কিন্তু এরা তো যে সে ইঁদুর নয়। বায়ুকে যেমন ধরা যায় না, এদের অতিমনকেও তেমনি ধরা যায় না। তাই লড়েছে দলবেঁধে। কিন্তু যেই হতাহতের সংখ্যা বজ্রদন্তী ইঁদুরদের তরফে বেড়েছে— তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিয়েছে। কারণ, তারা নির্বোধ নয়। সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকতে জানে। সুযোগ একটু একটু করে তৈরি করে নেয়। তারপর কাতারে কাতারে সবদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঠিক এই অবস্থাই ঘটেছিল। বেশ কিছু মানুষের কণ্ঠচ্ছেদ করা যায়নি বাড়ির কুকুর আর বেড়ালদের জন্যে। গ্রাম আর শহর যখন খাঁখাঁ করছে, আতঙ্ক যখন মানুষের শেষ মনোবলটুকুও হরণ করেছে, সেই সময়ে নিশুতি রাতে আবার আগমন ঘটেছিল তাদের। এবার আর শুধু বজ্রদন্তী ইঁদুর নয়। পালে পালে তারা বেরিয়ে এসেছিল পাহাড় জঙ্গলের গোপন আস্তানা থেকে। বজ্রদন্তী বেড়াল আর কুকুর!

পালিয়ে বেঁচেছিল মুষ্টিমেয় যে ক'জন, তারাই নিঃশব্দসঞ্চারী আতঙ্কদের নামকরণ করেছিল— বজ্রদন্তী! বজ্র বক্সীর নামানুসারে। কারণ তারা অনেকদিন ধরেই আঁচ করেছিল, পাগলা বৈজ্ঞানিকের আখড়ায় নিশ্চয়ই নির্মিত হয়ে চলেছে এমন কোনও বিভীষিকা যা পার্থিব আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াতে পারে যে-কোনওদিন।

কিন্তু মূর্তিমান আতঙ্কেরা যে ঘৃণ্য বিবরবাসী, আর একান্ত বিশ্বাসী বেড়াল আর কুকুর, তা কল্পনাতেও ভাবা যায়নি!

শুধু কি তাই, চিরশত্রু ইঁদুর, বেড়াল আর কুকুরদের মধ্যে এহেন মহামিলন সংগঠিত হল কী করে?

তিনটে জন্তুই মানুষ নিধন যজ্ঞে এককাট্টা হয়ে গেল কীভাবে?

এর পরেই ক্ষিপ্ত হয়েছিল জনগণ।

এই পৃথিবীটা এখন ছোট্ট হয়ে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে। বজ্র বক্সী পৃথিবী গোলকের সর্বত্র যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন ঘরে বসে— স্রেফ কল চালিয়ে আর স্ক্রিনে

চোখ রেখে। কিন্তু অতি খলিফা বলেই নিজের ঘরের খবর কাকপক্ষীকেও না-দিয়ে পরের ঘরের খবর সংগ্রহ করে চলেছিলেন নিয়মিত রুটিনে। নিয়ত সমৃদ্ধ করে রেখেছিলেন নিজের মগজের কোষ, গবেষণা মন্দিরের কলকবজা আর কেমিক্যাল-টেমিক্যাল।

দিকে দিকে যখন রটি গেল বার্তা যে, পাগলা বৈজ্ঞানিকের কারসাজির ফলেই ধ্বংস দূতরা মানুষ সাবাড় করতে শুরু করে দিয়েছে— তখন প্রথম পণ হল জনগণের, সাবাড় করো বজ্র বক্সীকে। টুটিয়ে দাও তাঁর পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার খোয়াব!

কিন্তু এ স্বপ্ন তিনি কস্মিনকালেও দেখেননি!

বিধি বাম। তাই উদ্ভট গবেষণার খেসারত দিতে হবে তাঁকে প্রাণ দিয়ে। সেই সঙ্গে প্রাণ যাবে তাঁর প্রিয় পুত্র বিপুল বক্সীরও।

তখন নিশ্চয়ই তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, একেবারে উবে যাবেন। ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবেন। সেটা কি আত্মহত্যা, না, পরমাণু বনে যাওয়া? আজও তা হেঁয়ালি আমার কাছে।

হত্যাপাগল গণদেবতা যখন টাঙি, কুঠার, বল্লম, রামদা নিয়ে তেড়ে আসছে গবেষণা কুঠি লক্ষ্য করে, উনি তখন ঘরে বসে যন্ত্রের শরণ নিয়েছেন। নিমেষে গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছেন, সর্বনাশ সমাসন্ন। তাঁর হাতে গড়া খুদে দানবরা তাঁকেই ভড়কি দিয়ে মনুষ্য-ধ্বংস যজ্ঞে প্রমত্ত হয়েছে।

প্রতিহিংসা পাগল জনতা আসছে এই গবেষণামন্দির গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে ধরণীর ধুলোয় মিশিয়ে দিতে। সেইসঙ্গে বজ্র বক্সীর বক্ষপঞ্জর তারা চূর্ণ করবে।

কিন্তু পারবে না। কারণ বজ্র বক্সী জানেন নিমেষ মধ্যে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে। এমনকী বজ্র বক্সীর নশ্বর দেহেরও সন্ধান পাবে না উন্মত্ত জনতা।

কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বজ্র বক্সী থাকুন আর না-থাকুন, পৃথিবী তো থাকবে। পৃথিবীর মানুষকেও থাকতে হবে। কিন্তু থাকতে দেবে না এই বজ্রদন্তী বিভীষিকারা।

বজ্রদন্তী নামটা ইচ্ছে করেই যন্ত্র মাধ্যমে পৃথিবীময় প্রচার করে দিয়েছিলেন বজ্র বক্সী।

সেই সঙ্গে পৃথিবীবাসীকে অবহিত করেছিলেন, কীভাবে অচিরে বসুন্ধরার সর্বত্র পৌঁছে যাবে বজ্রদন্তীরা। বিশেষ করে বজ্রদন্তী ইঁদুররা। ট্রাকে উঠবে, ট্রেনে চাপবে, জাহাজে লুকোবে, প্লেনে ঘাপটি মেরে থাকবে। খুব জোর ছ'মাস। তার মধ্যেই পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাবে তারা।

এখানেই ক্ষান্ত হননি বজ্র বক্সী।

শেষ মেসেজটা পাঠিয়েছেন আমাকে—- যন্ত্রের মাধ্যমে।

অযোধ্য পাহাড়ের ফরেস্ট অফিসার আমি, যোগাযোগের ব্যবস্থা আমাকেই রাখতে হয়েছিল। কিন্তু পিতাপুত্রে কখনও যোগাযোগ থাকেনি।

সর্বশেষ বার্তাটা এল এইভাবে :

প্রথমেই জানালেন পূর্ববৃত্তান্ত। বজ্রদন্তী বিভীষিকাদের আবির্ভাব। ল্যাবরেটরি বাড়ির প্রতিটি মানুষের নিষ্ঠুর নিধন পর্ব। এই গবেষণামন্দির ঘিরে যত গ্রাম আর শহর আছে তাদের প্রতিটিতে বজ্রদন্তীদের তাণ্ডবলীলা কাহিনি।

উপসংহারে জানালেন, আসন্ন বিধ্বংসী পরিণাম থেকে পরিত্রাণের উপায়।

বললেন, বিশাল, তুই তো জানিস, এই দুর্গ-প্রাসাদের তলায় আছে সারবন্দি চোরাকুঠরি। বন্দি নিগ্রহের জন্যে তৈরি হয়েছিল। ঢোকবার পথ একটাই— দেওয়ালের পাশাপাশি দুটো কুলুঙ্গির মধ্যে দুটো কড়া গাঁথা আছে। শুধু একটা কড়া ধরে টানতে হয়। গোটা দেওয়ালটা তাতে ঘুরে যায়। ভেতরে গিয়ে আর একটা কড়া টেনে বন্ধ করে দিতে হয়, এক কথায়, রিভলভিং দরজা। মোগল আমলের স্থাপত্যের কীর্তি।

একবার ভেতরে ঢুকলে বাইরের কেউ টের পায় না। ভেতরের কোনও আওয়াজ বাইরে আসে না। সেখানে হাওয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে— অথচ বাইরের কেউ সেই ঘুলঘুলির সন্ধান পায় না।

বিপুলকে আমি এই পাতাল ঘরে অজ্ঞান অবস্থায় রেখে যাচ্ছি। একমাস যাতে থাকতে পারে, সেই পরিমাণে মিনারেল ওয়াটার, টিনের খাবার-দাবারও রেখে যাচ্ছি। মুড়ি, চিঁড়ে ছাতুও থাকছে।

বিপুলকে তুই এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যা। ওকে আর আমাকে খুন করবার জন্যে যারা আসছে, তারা ওকে খুঁজেই পাবে না। আমাকেও পাবে না। যদিও ওই যমপুরীতে আমি থাকব না। আমি থেকেও থাকব না। আত্মা যদি অবিনশ্বর হয়, বজ্র বক্সীও তা হলে জানবি অবিনশ্বর হয়ে রইল।

জানলা থেকে দেখতে পাচ্ছি ওরা হাজারে হাজারে আসছে। একটু আগে ছাদে উঠে দেখে এসেছি, ওরা চারদিক থেকে এই দুর্গ-বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। মই লাগিয়ে পাঁচিলে উঠছে।

জানলা থেকে এখন দেখছি আর একটা দৃশ্য। কাতারে কাতারে বজ্রদন্তী ইঁদুর, কুকুর, বেড়াল ওদের ওপর লাফিয়ে পড়ছে। জখম আর খতম করেই সরে যাচ্ছে।

আমি জানি, আমার তৈরি এই বাহিনীই বিপুলকে রক্ষা করবে। ওরা যদি মাটির মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে পাতাল ঘরে ঢুকেও পড়ে— বিপুলকে পাহারা দেবে, ওকে যে দেখতে হুবহু আমার মতো।

দেরি করিসনি। চলে আয়। কিন্তু লড়তে লড়তে আসতে হবে। জীবন্ত অবস্থায় পৌঁছোতে হবে। বেঁচে তোকে থাকতেই হবে। রুচিরা, অন্তরা, মধুরার ভারও তোকে নিতে হবে। তুই আমার বড় ছেলে। কিন্তু আমার বিপরীত।

একটা শেষ উপদেশ দিয়ে যাই। এই পৃথিবী মনুষ্য শূন্য হওয়া আটকাতে পারেন একজনই। তাঁর নাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। তিনি এখন কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার ষোলোতলা বাড়িটার ষোলোতলায় উঠে বসে আছেন। সম্পূর্ণ নিরাপদে। সঙ্গে আছে তাঁর নিত্যসঙ্গী দীননাথ নাথ। তোর বয়সি। ভয়ানক ডাকাবুকো। তোর মতো।

এঁদেরকে এইমাত্র সব জানিয়ে রাখলাম। উনি আমার চিরশত্রু। কিন্তু বিদায়কালে ওঁকে দিয়ে গেলাম আমার গবেষণার মন্ত্রগুপ্তি। উনি কথা দিয়েছেন, চিরগুপ্ত রাখবেন এই নব সঞ্জীবনী। মহাবিপদের সুরাহা বের করবেন।

তাড়াতাড়ি কর। খুব শিগগিরই। সেয়ানাদের সঙ্গে টক্কর দিতে তুই পারবি। বিদায়।

রুচিরার ডেডবডি যখন অযোধ্যার গ্র্যানাইটে পড়ে আছে, বজ্র বক্সীর মেসেজ এল তার পরেই। আমি তখন গুম হয়ে বসে আছি। কী করণীয় ভাবছি, ঠিক তখনই এল পথনির্দেশ।

বজ্রদন্তী ইঁদুর, কুকুর, বেড়ালদের প্রতাপ এই পাহাড়ি অঞ্চলে শুরু হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই। আমি বনে জঙ্গলে ঘুরি বলেই অদ্ভুত এই আতঙ্কদের খবর পেয়েছিলাম সবার আগে। প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। শুধু জানতাম না আমার পূজনীয় পিতৃদেব এদের স্রষ্টা।

খাবারদাবার আর পাওয়া যাচ্ছে না। অযোধ্যার ওপর আর নীচের গ্রামগুলো একে একে শুনশান হয়ে যাচ্ছে। ধুরন্ধর ইঁদুররা জানে মানুষ যে সব যন্ত্রশক্তির ওপর নির্ভর করে রয়েছে, তাদের প্রায় সব কিছুর মূলে রয়েছে বিদ্যুৎবাহী তার। তার কেটে দিলেই বিদ্যুৎ মিলবে না— ঘরে ঘরে অন্ধকার নামবে। ওরা প্রথমে তাই করেছে। গাড়ি ছাড়া আজকের সভ্যতা অচল। ওরা গাড়ির ইগনিশন তার কেটেছে, ব্রেকের কেব্‌ল কেটেছে, ফুয়েল পাইপ কেটে দিয়েছে, এমনকী টায়ার ফুটো করে দিয়েছে।

ফলে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অযোধ্যার এই তিনতলা বন-নিলয়। বনদপ্তরের পয়সায় আমিই তুলেছিলাম এই তিনতলা প্রস্তর-ভবন। অনেকটা ওয়াচ-টাওয়ারের স্থাপত্যে। একতলার গ্যারেজে থাকত টাটাসুমো গাড়ি। আমার রাইট হ্যান্ড মাহাতো ছিল আমার বাটলার, বাবুর্চি, কুক, ড্রাইভার।

এই মাহাতোই প্রথম খবরটা আনে। গাড়ির পর গাড়ি বিকল করে দিচ্ছে ইঁদুর। গ্যারেজে ঢুকে পড়ছে। আমার অনুমতি নিয়ে পাথরের স্ল্যাব দিয়ে গড়া গ্যারেজে কংক্রিটের পুটিং দিয়ে ফুটোফাটা, পাথরের জোড় বন্ধ করেও নিশ্চিন্ত হয়নি। সারাদিন গ্যারেজে বসে গাড়ি পাহারা দিত। যখন একটু ঘুমোতে যেত, আমি পাহারা দিতাম গাড়ি। সারারাত ডিউটি দিত মাহাতো।

ফলে, একা হয়ে গেছিল রুচিরা, খাবারদাবার আর পাওয়া যাচ্ছে না বলেই বন্দুক নিয়ে খরগোশ মারতে গেছিলাম। সেখানেও আমাকে তেড়ে এসেছিল দুটো বজ্রদন্তী কুকুর। দুই গুলিতে তাদের নিকেশ করেছিলাম। মরা খরগোশ নিয়ে ফিরে এসে দেখেছিলাম রুচিরার মৃতদেহ।

মাহাতো তখন গ্যারেজে গাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

বজ্র বক্সী যখন আমাকে নিজের কুকীর্তির কথা জানাচ্ছেন, তার আগেই তাঁর বড় মেয়েকে সংহার করে গেল তাঁরই গড়া দৈত্যরা।

বজ্র বক্সীর মেসেজ পেয়ে জানলাম, নষ্টামির মূল কারণ তাঁর আজব গবেষণা। তিনি ইঁদুর, বেড়াল, কুকুরদের মেধা এগিয়ে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ বছর। অতিমনের সঞ্চার ঘটিয়েছেন অবিশ্বাস্য শক্তিমান মগজে।

ওই বার্তা পেয়েছিলাম ব্যাটারি চালিত রেডিয়োতে। টিভি ইন্টারনেট তো বিকল করে দিয়েছে ইঁদুর মহাপ্রভুরা বিদ্যুতের তার কেটে দিয়ে।

আমার মনের জোর প্রচণ্ড। মনকে যদি শক্ত করা যায়, তা হলে মির‍্যাকল ঘটানো যায়। বহু বিস্ময়ের মোকাবিলা করেছি এই মনোবল দিয়ে। এবার টক্কর দিতে হবে অতিমনের

অধিকারীদের সঙ্গে। আমার আদরের বোনকে যারা মেরেছে, তাদের শেষ করবই।

কিন্তু কে এই প্রফেসর নাটবল্টু চক্র? তিনি কি পরম ব্রহ্ম? পৃথিবী-ত্রাসের অবসান ঘটাতে পারেন শুধু তিনিই? এমন এক মন্ত্রগুপ্তির জোরে, যা দান করে গেছেন বজ্র বক্সী শুধু তাঁকেই?

তাঁর কাছেই আগে যাব? না, বিপুলকে আগে উদ্ধার করব?

আগে বিপুলকে।

নেমে গেলাম মাহাতোর কাছে। সে তখন খোলা ছুরি হাতে গাড়ি চক্কর দিচ্ছে। শাণিত চোখে খুনের শপথ।

রুচিরা গতায়ু হয়েছে শুনে থ হয়ে গেছিল মাহাতো। সেই প্রথম ওর চোখে জল দেখেছিলাম। অনুতাপের অশ্রু। কুকুর ডাক ও শুনেছিল। কিন্তু গাড়ি ছেড়ে নড়েনি। কেননা ও তো জানে, এটা ওদের চালাকি। খামোকা ডেকে মাহাতোকে গাড়ি পাহারা থেকে সরিয়ে দেওয়ার ফিকির।

হয়তো ঘটতও তাই। মাহাতো সরে গেলেই গাড়ির ফুয়েল পাইপ, গ্যাস পাইপ, ইগনিশন তার, ব্রেক কেব্‌ল, টায়ার কেটে দিত শাণিতদন্তীরা। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ত আমাদের ওপর। তাই মাহাতোকে বললাম, 'এখানে আর বেশিক্ষণ নয়। খরগোশ দুটো রান্না করো। খেয়ে নিয়েই বেরোব।'

মাহাতো বলেছিল, 'দিদিমণিকে দাহ—'

'কিচ্ছু করতে হবে না।' বলেছিলাম চোখের পাতা না-কাঁপিয়ে, 'আসবার সময়ে দেখে এসেছি ইঁদুর খুবলে খেয়ে এর মধ্যেই কঙ্কাল বের করে ফেলেছে।'

রওনা হওয়ার আগে রেডিয়ো খুলে খবর শুনে নিলাম। বিমান বিহার আর নিরাপদ নয়। পার্টস-এর স্যাবোটেজ শুরু করে দিয়েছে ইঁদুররা। রেলপথে ট্রেন চলবে না পাঁচ সপ্তাহ। স্যাবোটেজ চলছে সেখানেও। রেলের লাইন ইন্‌সপেকশন করতে গিয়ে দেখা গেছে, কাঠের স্লিপার বহু জায়গায় কেটে ফেলা হয়েছে। এইসব জায়গা দিয়ে ট্রেন ছুটলে লাইনচ্যুত হবেই। ইঁদুররা যে দল বেঁধে স্যাবোটেজ করে চলেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই কর্তৃপক্ষের।

যাঁদের গাড়ি আছে, তাঁরা যেন রোজ গ্যারেজে গিয়ে দেখে নেন ইঁদুরের গর্ত হয়েছে কিনা। ড্যামেজড প্রাইভেট কার মেরামতের জন্যে মেকানিক আর পাওয়া যাচ্ছে না।

পালটা মার দেওয়ার কথা বলে যাচ্ছে বটে ঘোষক, কিন্তু আমি তো জানি, কোনওটাই কাজ দেবে না। রেলপথ এমনভাবে কমজোরি করে দেবে ইঁদুর বাহিনী যে ওপর থেকে কিছুই দেখা যাবে না। টেস্ট করেও ধরা যাবে না।

ইঁদুরের সংঘবদ্ধতা, সর্বত্র একই রকম আক্রমণ পদ্ধতি আর নিধন পর্ব দেখে ভেবেছিলাম ওরা যখন কথা বলে সংগঠন করতে পারে না, তখন নিশ্চয় হাতে কলমে পরস্পরকে দেখিয়ে দেয় মানুষ জাতটাকে ঘায়েল করবার রকমারি পন্থা। এক কথায় যাকে বলে, ডিমনস্ট্রেশন। নিশ্চয় কোনও সেয়ানা ইঁদুর রেলপথে নজর রেখে দেখে নিয়েছে, রেললাইনে যদি কোথাও জোড়ের কাছে আলগা থাকে, অথবা ঠিক সেই জায়গার তলার মাটি যদি ধসে যায়— তা

হলে ছুটন্ত দৈত্য সমান রেলগাড়িকেও নিমেষে ধ্বংস করা যায়। ট্রেনের মধ্যে গাদা গাদা মানুষ থাকে, তা তো জানেই। ট্রেন না-ছুটলে মানুষের মস্ত বিপদ, তাও জানে। সুতরাং ধ্বংস করো রেলপথ।

শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই ওরা ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। আঠাশ দিনের গর্ভধারণের সুযোগ নিয়ে নব নব প্রজন্মের ধ্বংসের দূতদের ধরায় নিয়ে এসেছে।

তবে খটকা লেগেছিল একটা ব্যাপারে, যুদ্ধকৌশলটা একই রকম থাকছে কেন ভূমণ্ডলের সর্বত্র? স্যাটেলাইটে মেসেজ নিশ্চয় পাঠাচ্ছে না ওদের সর্বাধিনায়ক। তা হলে?

বজ্র বক্সীর বার্তা পেয়ে আঁধারে আলো দেখলাম। ওরা অতিমনের অধিকারী হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের একটা রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল ব্রেনের মধ্যে।

দিন কয়েক আগে দূরের পাহাড়ের জঙ্গলে গেছিলাম একা। মাহাতোকে নিয়ে যেতে পারিনি— ও তো গাড়ি ছেড়ে নড়বে না। ইঁদুর আতঙ্ক তখন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড়ের গ্রামগুলো শ্মশান হয়ে গেছে। কোনও টুরিস্ট আর আসছে না। বাস বন্ধ। খবর পেয়েছিলাম, কাতারে কাতারে ধেড়ে ইঁদুর জঙ্গল থেকে বেরোয়, কাজ সেরে জঙ্গলে ফিরে যায়।

যে-জঙ্গলে ফিরে যায়, সেই জঙ্গলেই গেছিলাম ছুরি আর বন্দুক নিয়ে। ছুরিই বেশি চালাই, কেননা এক-একটা ইঁদুরের পেছনে একখানা করে বুলেট খরচ করা পোষায় না।

গেছিলাম আলো থাকতে। তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু ইঁদুরের ল্যাজের ডগাও দেখতে পাইনি। নিশ্চয় আড়াল থেকে নজরে রেখেছিল আমাকে, কিন্তু বুদ্ধিমান বলেই খামোকা মরবার জন্যে এগিয়ে আসেনি।

সন্ধে যখন নামছে, তখন ফেরার পথ ধরলাম। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ গলায় ঝুলছিল, কিন্তু জ্বালাইনি। ব্যাটারিও তো এখন পাওয়া যাচ্ছে না। খরচ বাঁচাচ্ছিলাম। এমন সময় বাঁ দিকে বেশ খানিকটা দূরে ম্যাজেন্টা রঙের আলোর ঝলক দেখলাম। একবার দু'বার।

থমকে গেলাম। আঙুল পর্যন্ত নাড়লাম না। আস্তে আস্তে চোখ ঘোরালাম ডাইনে, একই ম্যাজেন্টা আলোর ঝলক।

আমি একটা গুঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম সেইভাবেই। আচমকা আমার সামনেই ঝোপের মধ্যে ঝলকিত হল ম্যাজেন্টা বিদ্যুৎ। সেই আলোকে চকিতের জন্যে দেখে নিলাম বিদ্যুতের উৎস আর লক্ষ্যস্থল। একটা ধেড়ে ইঁদুরের মাথা থেকে ম্যাজেন্টা বিদ্যুৎ ছিটকে গিয়ে স্পর্শ করল দূরের আর একটা ধেড়ে ইঁদুরের করোটি। মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই, তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

প্রায় ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম বন থেকে।

পরে অনেক ভেবেছি, রহস্য প্রাঞ্জল হয়নি। কাউকে বলিওনি উপহাস শুনতে হবে বলে।

বজ্র বক্সী যখন জানালেন, তাঁর তৈরি ইঁদুররা অতিমনের অধিকারী হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ রহস্যসূত্রের একটা প্রান্ত চলে এল আমার বিরামবিহীন চিন্তার মধ্যে। মনে পড়ে গেছিল, শ্রীঅরবিন্দ রচিত 'দ্য লাইফ ডিভাইন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ক'টা পঙ্ক্তি... 'বাট মাইন্ড, লাইফ অ্যান্ড ম্যাটার ইনডিসপেনসেবল টু অল কসমিক বিইংস... মাইন্ড ইজ

এসেনশিয়ালি দ্যাট ফ্যাকালটি অফ সুপার মাইন্ড...'

সুপার-মাইন্ড! অতিমন! কসমিক এনার্জি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে নাকি বজ্র বক্সীর ইঁদুররা? মুখের ভাষায় নয়, বিদ্যুতের ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে পরস্পরের মধ্যে? তাই ওদের মধ্যে কমিউনিকেশন এত লাইটনিং স্পিডে চলেছে গোটা ভুবন জুড়ে? ভাষাবর্জিত শলাপরামর্শ!

স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ।

জিনিসপত্র ব্যাগে গুছিয়ে নিলাম তার পরেই। ছোট্ট রেডিয়ো, রাইফেল, কার্তুজ আর ব্যাটারি।

খরগোশ রান্না হয়ে গেছিল মাহাতোর। আমাকে খেতে দিয়েই চলে গেল গ্যারেজে। গাড়ি ওর প্রাণ।

খেয়েদেয়ে একটু ঝিমুনি এসেছিল। কোলের ওপর ব্যাগটা রেখে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবছিলাম। চোখ খুলেই দেখি একটা বজ্রদন্তী ইঁদুর মেঝের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে নিরীক্ষণ করছে আমাকে।

ওরা নিজেকে দেখায় ঠিক এইভাবে। ছলনা। যেন কত ভিতু। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে সেটা প্রথম দিকে। তারপরেই দেখায় সাহস। ভয় পাইয়ে দেয়। মানুষ যেন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।

এই ছলনা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই গ্রাহ্য না-করে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। যেন পরোয়া করছি না। আসলে দেখে নিলাম, ঢোকার পথ আছে কিনা।

নেই। আগে থেকেই ঢুকে লুকিয়ে ছিল, সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। যেই একটু ঢুলুনি এসেছে, অমনি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। উদ্দেশ্য, ব্যাগের কাছে যাওয়া। ছোরাটা আছে ব্যাগের মধ্যে।

সোজা আমার দিকে তেড়ে এল বজ্রদন্তী। আমি নড়লাম না। ওদের রণকৌশল এতদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করেছি— ভয় পাওয়াতে চায়।

পরক্ষণেই ঘুরে গেল ডানদিকে। যাতে আমি দিশেহারা হই। কিন্তু আমি পা চালালাম সঙ্গে সঙ্গে। এক লাথিতে তাকে আছড়ে ফেললাম দেওয়ালে। দুটো সেকেন্ডও সময় দিলাম না। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ঘোর কাটিয়ে উঠবে। তাই দেওয়ালে আছাড় খেয়ে মেঝেতে ঠিকরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পা দিয়ে পিষে শেষ করে দিলাম। লাথিয়ে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে এক শট মেরে করিডরে বের করে দিলাম— যাতে অন্য বজ্রদন্তীরা দেখে।

ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলে এলাম গ্যারেজে। মাহাতো তৈরি হয়েই বসে ছিল। ফোকরে ঝুলছে ইগনিশন চাবি। গাড়ি স্টার্ট নিল সঙ্গে সঙ্গে।

জঙ্গলের মাঝের পাথুরে পথ দিয়ে নাচতে নাচতে মাহাতো যখন টাটাসুমো নিয়ে চলেছে নীচের দিকে, আমি তখন দু'পাশে আর পেছনে নজর রাখছি। কোনও বজ্রদন্তীকেই পিছু নিতে দেখলাম না। না-ইঁদুর, না-কুকুর। কুকুরগুলোর জন্যে রাইফেল রেডি রেখেছিলাম।

ওরা ওজনে ভারী। তেড়ে এলে লাথিয়ে ঘায়েল করা যাবে না, বুলেট দরকার।

নেমে এলাম পাহাড়ের নীচে। বাস নেই, গাড়ি নেই, সাইকেল রিকশা নেই। চায়ের দোকানে পর্যন্ত ঝাঁপ ফেলা। ফাঁকা পথ। যতদূর চোখ যায় একদম ফাঁকা।

পুরুলিয়া টাউনে ঢোকবার আগে থেকেই দেখলাম, রাস্তার পাশে গাড়ির পর গাড়ি পড়ে আছে। প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, ট্রাক, বাস। হয় টায়ার ফুটো, না-হয় ভেতরে স্যাবোটেজ। শহরে দোকানপাট বন্ধ। বাজারে কয়েকটা দোকানে গুলতানি চলছে বটে, কিন্তু লোকের চোখমুখে আতঙ্ক। চৌমাথায় ট্রাফিক পুলিশ নেই— তারা জটলা করছে থানার সামনে। বন্দুক উঁচিয়ে খাড়া আর্মড পুলিশ। যে যার ঘাঁটি সামলাচ্ছে, অন্যদের নিয়ে মাথা ব্যথা নেই।

মাহাতো বলল, 'পেট্রল পাম্প খোলা আছে দেখছি। তেল নিয়ে নিন, ফুল ট্যাঙ্ক।'

নিলাম। পেট্রল পাম্পে ইলেকট্রিসিটি নেই। হাতে পাম্প করে তেল তুলতে হল। বেশ বুঝলাম, পথে ডিজেল পাবই। গাড়ি যখন চলছে না, পাম্পে তেল থাকবেই!

এরপর পেলাম গ্যাস সিলিন্ডার। ডিস্ট্রিবিউটর একগাদা সিলিন্ডার নিয়ে বসে আছে শুকনো মুখে। খালি সিলিন্ডারগুলো দিয়ে ভরতি সিলিন্ডার তুলে নিল মাহাতো। জ্বালানি সমস্যা এইভাবেই মেটাতে মেটাতে যাব। খাবার-দাবার জোগাড় করতে হবে যে-কোনও পন্থায়। কাঁধে যদি রাইফেল থাকে, আর গায়ে ফরেস্ট অফিসারের জাঁকালো ড্রেস— উপোস করে থাকতে হবে না।

পুরুলিয়া ছাড়িয়ে এসে দেখলাম রাস্তার ধারে বজ্রদন্তী কুকুর আর বেড়ালেই লড়াই। জাতশত্রু তো। দূর থেকে দেখেছিলাম, দুটো কুকুর আর দুটো বেড়াল তাড়া করেছে একজন মানুষকে। সে ছুটছে প্রাণ হাতে নিয়ে। কুকুর আর বেড়াল একসঙ্গে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর। মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে না যেতে ডেডবডির অধিকার নিয়ে লড়াই বেধে গেল জাতশত্রুদের মধ্যে। খাদ্য আগে— বন্ধুত্ব পরে।

বীভৎস। আমি রাইফেল তুলেছিলাম। মাহাতো বারণ করল, 'শুধু শুধু বুলেট খরচ করবেন না। মরে তো গেছেই।'

তাই যখন মড়ার পাশ দিয়ে টাটা সুমো বেরিয়ে যাচ্ছে, হাত নিশপিশ করলেও চুপ করে থাকতে হল। খুনে বেড়াল আর কুকুরগুলো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। গাড়ি এগিয়ে যাওয়ার পর পেছনে চোখ চালিয়ে দেখলাম, লোকটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে শয়তানরা।

হারামজাদার দল। রাতারাতি সমস্ত টেলিফোন ডেড হয়ে গেল। প্রথমে বুঝিনি। বজ্র বক্সীর বার্তা পাওয়ার পর বুঝেছি। মগজের বিদ্যুৎ বার্তায় ওরা পরস্পরকে জানিয়ে দিয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বন্ধ করতে হবে কী ভাবে। টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে একরাতে। অপকর্ম করতে গিয়ে শক খেয়ে বেশ কিছু ইঁদুর মারাও গেছে।

কী আশ্চর্য রণকৌশল। তার বস্তুটা আমাদের কাছে অপরিহার্য। মনুষ্য সভ্যতার ভিত রচনা করেছে তার। ওদের টার্গেট হয়েছে তার। দংশন করেছে ছিন্ন করেছে।

ঠিক এইরকম তীক্ষ্ণবুদ্ধির রণনৈপুণ্য দেখিয়েছে পাখিদের ক্ষেত্রে। বেশ কিছু পাখি

ইঁদুরের জাতশত্রু। ইঁদুররা এইসব পাখিদের বাসা খুঁজে বের করেছে। ডিম নষ্ট করে দিয়েছে। সোজাসুজি পাখি ধ্বংস যখন সম্ভব নয়, তখন যাতে বংশবৃদ্ধি আর না-ঘটে, সেই পথে গেছে। পাখিরা লুপ্ত হতে চায়নি বলেই সহজাত বুদ্ধিতে কাজ করেছে। পালিয়েছে। ছোট ছোট দ্বীপ খুঁজে নিয়ে সেখানে বাসা বেঁধেছে। সে সব দ্বীপে বজ্রদন্তীদের হানা দেওয়া এখনও সম্ভব হয়নি। কিছু পাখি অবশ্য এমন জায়গায় বাসা বেঁধেছে, যেখানে ইঁদুর যেতে পারে না।

বিলক্ষণ সংগঠিত এই বজ্রদন্তীরা— নই আমরা, এই মানুষরা। তাই আসল শত্রুসংহার করবার আয়োজন না-করে দল বেঁধে হানা দিয়েছে বজ্র বক্সীর গবেষণাগারে, খুনের সংকল্প নিয়ে।

স্টুপিড। বিষ দিয়ে প্রথমে মারতে গেছিল ইঁদুর বেড়াল কুকুরদের। পারেনি। ওরা গন্ধে গন্ধে টের পেয়েছিল।

যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন বজ্র বক্সী। সেই লাইনেই যাব। আগে উদ্ধার করি বিপুলকে পাতাল কুঠরি থেকে।

যেতে যেতে মাহাতো জিজ্ঞেস করেছিল, 'সাহেব, এদের রোগ হয় না?'

অন্যমনস্ক ছিলাম। বলেছিলাম, 'কী রোগ? কাদের?'

'ইঁদুর, বেড়াল, কুকুরের। কোনও মহামারী রোগ?'

মাহাতো অশিক্ষিত সাঁওতাল হতে পারে, কিন্তু মাথায় আইডিয়াটা এনেছে ভাল। বলেছিলাম, 'মাইকসোম্যাটোসিস রোগটা এদের মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু হচ্ছে না কেন?'

বলেই, থমকে গেছিলাম। বজ্র বক্সী কি এই রোগের ইঙ্গিতই দিয়ে গেছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র নামক বৈজ্ঞানিককে?

গাড়ি চালাতে চালাতে মাহাতো বলেছিল, 'সে-রোগে মানুষ মরে যাবে না তো?'

'না।'

'তা হলে তাই করা হচ্ছে না কেন, সাহেব?'

'প্রতি বর্গমাইলে হাজারে হাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে। গোটা পৃথিবী জুড়ে এ-রোগের ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে গেলে যত এরোপ্লেনের দরকার, তত এরোপ্লেন কি আছে?'

চুপ করে গেল মাহাতো। একটু পরে বলল, 'তবে হ্যাঁ, ওরা কিন্তু নিজেদের মধ্যেই লড়ে মরছে— যখন মানুষকে না-পাচ্ছে।'

'সেইটাই ভরসা।' আমি চুপ করে গেলাম।

মাহাতো কিন্তু বলে যাচ্ছে, 'এরা আচমকা এল কোত্থেকে? এতদিন তো ছিল না। বনে বাদাড়ে মানুষ হয়েছি, কখনও দেখিনি।'

'মাহাতো!' এবার ওর দিকে চেয়ে মুখ খুলেছিলাম আমি, 'একজন বৈজ্ঞানিক নেশার ঝোঁকে এদের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাইকোলজিস্ট, বায়োলজিস্ট, রেডিয়োলজিস্ট। কিছু বুঝলে? বুঝলে না। তা হলেও জানতে যখন চেয়েছ, তখন শুনে

যাও। বুদ্ধিমান জন্তু তৈরি করবার কোনও প্ল্যান তাঁর ছিল না। জন্তুদের টিশু আর নার্ভসেলের ওপর নানা রকম ভাইব্রেশন আর রেডিয়েশনের পরীক্ষা চালিয়ে দেখছিলেন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়। কিন্তু তাদের ব্রেনে কী ঘটছে, তা নিয়ে তদন্ত করেননি। খেয়ালি বৈজ্ঞানিক তো। তার পরেই তাঁর টনক নড়েছিল কিছু জন্তুর অদ্ভুত পাগলামি দেখে। সব যেন মানুষের মতো মনে রাখছে। তখন ব্রেন চিরে দেখলেন। ততদিনে পগারপার হয়েছে ইঁদুর, বেড়াল, কুকুররা।'

'খাঁচা থেকে?'

'নিজেরাই খাঁচা খুলে বেরিয়ে গেছিল।'

'সাহেব, আপনি এত জানলেন কী করে?'

'সিদ্ধিখোর সেই বৈজ্ঞানিক যে আমার বাবা, মাহাতো।'

'আমরা এখন যাচ্ছি তাঁর কাছে?'

'যাচ্ছি তাঁর ল্যাবরেটরি বাড়িতে— তাঁকে আর পাব না।'

'কেন সাহেব?'

'তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।'

'তা হলে কেন যাচ্ছি?'

'আমার ভাইকে বাঁচাতে।'

বলেছিলাম বিপুলের কথা। কেন রয়েছে পাতাল কুঠুরিতে।

সব শুনে মাহাতো একটু হেসে বলেছিল, 'সাহেব, কিছু একটা করুন। এরপর তো দেখব মানুষের মতো কথা বলছে ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর।'

আমি চুপ করে রইলাম, তখনও তো আমি জানতাম না, বজ্র বক্সী অণিমাদি ঐশ্বর্য লাভের কথা ভেবেছিলেন সিদ্ধির ঘোরে, বিপুল বলেছিল পরে।

এত ব্যাপার না-জানলেও ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর যে অসাধারণ অতিমনের অধিকারী হয়েছে, সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। জঙ্গলে নিজের চোখে দেখেছি বিদ্যুৎ সংকেত যাচ্ছে এক ইঁদুরের মাথা থেকে আর এক ইঁদুরের মাথায়। ম্যাজেন্টা রঙের সেই ঝলক যদি বিদ্যুৎ হয়, তা হলে কত ভোল্টের বিদ্যুৎ? নাকি, অজানা কোনও ইন্দ্রিয়ের অতি-তীব্র স্পন্দন-তরঙ্গ অদৃশ্য ইথারে বিদ্যুৎ রচনা করছে?

ভগবান জানেন, অথবা, জানেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

রাস্তাঘাটে লোক প্রায় নেই বললেই চলে। গাড়ির পর গাড়ি স্যাবোটেজ করার ফলে এই অবস্থা ঘটেছে।

বজ্রদন্তীরা কিন্তু চলন্ত গাড়ি দেখলে নির্বিকার থাকছে। কিছু করতে পারবে না বলেই ঘাঁটাতে আসছে না। তবে অন্য টেকনিকের আশ্রয় নিয়েছে। রাস্তায় ভাঙা কাচ ছড়িয়ে রাখছে। যাতে টায়ার পাংচার হয়ে যায়। গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়।

এই বিপর্যয় সৃষ্টি করা হয়েছিল আমাদের টাটা সুমোর সামনে। রাস্তা যেখানে বাঁক নিয়েছে ঠিক সেইখানে। দূর দেখে দেখা যায়নি। গাড়ি যেই বাঁক নিয়েছে, অমনি একদম

সামনে দেখেছিলাম, সমস্ত রাস্তা জুড়ে ভাঙা বোতল ছড়ানো। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার পথ পর্যন্ত নেই।

মাহাতোর ড্রাইভিং-এর হাত ভাল। আমি যখন আঁতকে উঠেছি, ও তখন আচমকা ব্রেক টিপে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সামনের চাকা থেমে গেছিল খানকয়েক ভাঙা বোতলের একদম সামনে।

কপাল ঘেমে গেছিল আমার। কী নিদারুণ প্ল্যান! চলন্ত গাড়ির টায়ার ফাঁসিয়ে দেওয়া। স্টেপনি লাগানোর সময়ে নরখাদকরা ঝাঁপিয়ে পড়বে দলে দলে।

আমি রাইফেল হাতে নিলাম। পথের দু'পাশে টিলার মতো উঁচু পাহাড়। গাছপালা। নজর বুলিয়ে নিলাম দু'দিকেই। কিন্তু তাদের দেখতে পেলাম না। গাড়ি জখম যখন হয়নি, তখন ঘাপটি মেরে থাকাই সংগত মনে করেছে। তেড়ে আসবে কাচ সরাতে নামলেই। মাহাতোকে বললাম, 'নেমে গিয়ে কাচ সরাও। আমি কভার করছি রাইফেল দিয়ে। ছুরি রাখো দাঁতের ফাঁকে। বুলেট যদি ফসকায়—'

ফসকায়নি বুলেট। বনেবাদাড়ে হাত পাকিয়ে আমি অব্যর্থ নিশানাবাজ। মাহাতো যখন ছুরি কামড়ে ধরে ভাঙা বোতল তুলে ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে, ঠিক সেই সময়ে রাস্তার ডান দিক আর বাঁদিক থেকে দুটো ধেড়ে ইঁদুর বিদ্যুতের মতো তেড়ে এসেছিল ওকে লক্ষ্য করে।

প্রথমে ডাইনে, পরক্ষণেই বাঁয়ে গুলি চালিয়েছিলাম। দুটোরই ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিলাম দুই বুলেটে।

তারপর আর বুলেট খরচ করতে হয়নি। মাহাতোকেও ছুরি চালাতে হয়নি। বজ্র বক্সীর তৈরি ইঁদুররা কয়েক প্রজন্ম পেরিয়ে এসে রীতিমতো ধড়িবাজ হয়েছে। মৃত্যু যেখানে অনিবার্য, সেখানে এগোয় না। ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা এদের রণনীতির মূলমন্ত্র।

মাহাতো পথ সাফ করে এসে ধরল স্টিয়ারিং। চলল গাড়ি।

তখন থেকেই হুঁশিয়ার রইলাম আরও একটা দুর্দৈবর আশঙ্কায়। পথ অবরোধ করে যদি?

আশঙ্কা সত্যি হয়েছিল। মাইল কয়েক গিয়ে আর একটা মোড় ঘুরতেই আচমকা সামনে দেখেছিলাম ব্যারিকেড। টিনের ক্যানেস্তারা, প্যাকিং বাক্স, ছেঁড়া লেপ, টুকরো কাঠ, গাছের পাতা সমেত ডাল টেনে জড়ো করা হয়েছে পথের ওপর। করেছে নিশ্চয় গায়েগতরে এ-কাজ যারা পারে— কুকুররা। কমিউনিকেশন তা হলে কাজ করছে। ইঁদুরদের মেরে, কাচ সাফ করে এগিয়ে যাচ্ছি, এ-খবর কুকুরদের কাছে চলে এসেছে বেগবান গাড়ির চাইতেও বেশি গতিবেগে। নিশ্চয়ই মগজ খবর পাঠাচ্ছে মগজকে। ইঁদুরদের জাতশত্রু কুকুররা এবার আসরে নেমেছে।

এবারও একই পন্থায় পথ পরিষ্কার করলাম। ছুরি কামড়ে মাহাতো নেমে গেল রাস্তায়। আমি বসে রইলাম রাইফেল উঁচিয়ে। দু'দিক থেকে দুটো করে মোট চারটে কুকুর লাফিয়ে এসেছিল। শূন্যপথেই খতম করেছিল আমার রাইফেল।

পথিক সামন্তকে তুলে নিয়েছিলাম পথ থেকে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর পেছনেই ছিল একটা পেট্রল পাম্প। তেল নেওয়ার জন্যে স্পিড কমাতেই উনি হাত নেড়ে ইশারা করেছিলেন।

এরকম ঢ্যাঙা মানুষ চট করে চোখে পড়ে না। সাত ফুট তো বটেই। কিন্তু হাড্ডিসার। চোখে কালো ফ্রেমের বাইফোক্যাল চশমা। নাকের নীচে প্রজাপতি মার্কা গোঁফ। দাঁতে কামড়ে আছেন একটা ডানহিল পাইপ। কিন্তু তাতে তামাক নেই। শুকনোই টেনে যাচ্ছেন।

পরনে হ্যান্ডলুমের পায়জামা পাঞ্জাবি আর কাঁধে হ্যান্ডলুমের ঝোলা ব্যাগ দেখে আমার কেন জানি মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক লেখাপড়ার জগতে আছেন— সাংবাদিও হলেও হতে পারেন। প্রকৃত অ্যাডভেঞ্চারিস্ট যাঁরা, তাঁরাই এই পেশায় নাম করেন। মৃত্যুর পরোয়া করেন না— বেঘোরে মরতে হবে জানলেও স্রেফ তাজা খবর জোগাড় করবার জন্যে বিষম বিপদের জায়গাতেও ছুটে যান।

আমি তাই গাড়ি থেকে নেমে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি কি আমাদের সঙ্গে যেতে চান?

মাহাতো তখন বিদ্যুৎবিহীন পেট্রল পাম্প হাতের জোরেই চালাচ্ছে।

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোথায়?'

উনি বলেছিলেন, 'যেখানে হয়।'

আমি তখন জিজ্ঞেস করি, 'আপনার কোনও ঠিকানা নেই?'

উনি বলেছিলেন, 'ছিল, এখন নেই।'

হেঁয়ালি-ভরা কথাবার্তা শুনে আমি সটান জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনার নাম কী বলুন তো?'

উনি বলেছিলেন, 'নাম শুনলে হয়তো চিনবেন, আমি পথিক সামন্ত।'

আরে সর্বনাশ! ইনিই সেই ডাকসাইটে সাংবাদিক, যিনি বাঘের ডেরায় হানা দেন খবরের টানে! আমি চেয়ে রইলাম দুর্ধর্ষ সাহসী মানুষটার দিকে। উনি নির্বিকার রইলেন।

'আপনি তো 'নির্ভীক' কাগজে লেখেন?'

'লিখতাম। নিউজ এডিটর ছিলাম। কাগজ যে বন্ধ হয়ে গেল। ডিসট্রিবিউশন প্রবলেমের জন্যে। ট্রেন, বাস, প্লেন বন্ধ থাকলে কাগজ পৌঁছোবে কী করে? হাতে হাতে সেন্টারে সেন্টারে বিলি হয়েছিল কলকাতায়, কিছুদিন। তারপর তাও বন্ধ হল লোকের অভাবে, ক্রেতার অভাবে।'

'এসব খবর তো রেডিয়োতে বলছে না?'

'প্যানিক ছড়ানো ঠিক নয়।'

'খবরের কাগজ তা হলে বেরুচ্ছে না?'

'নাম কা ওয়াস্তে লিডিং পেপারগুলো এখনও মেশিন চালিয়ে ট্র্যাডিশন বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কলেজ স্ট্রিট, এসপ্ল্যানেড, গড়িয়াহাটা, শ্যামবাজার, শিয়ালদায় শুধু কাগজ যায়। খাস খবর নেই। বাসি খবর। ছোট টাউনের কাগজগুলো বরং ভাল চলছে।'

'এই ছোট টাউনে সেইজন্যেই এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। খবর বেচে খেতে হবে তো।'

মাহাতোর তেল নেওয়া হয়ে গেছিল। এসে বললে, 'সাহেব, এবার পেটে কিছু দেওয়া দরকার।'

তার মানে স্টোভ জ্বালিয়ে খিচুড়ি রাঁধবে। এইভাবেই চলছে অবশ্য। রাতে পালা করে জেগে গাড়ি পাহাড়া দিই।

পথিক সামন্তকেও খিচুড়ি খাইয়ে দিলাম। গাড়িতে উঠলাম। উনি বসলেন পেছনের সিটে। বসে বললেন, 'আপনার নাম বুকের তকমায় লাগিয়ে রেখেছেন— বিমান ব্যানার্জি। পরেছেন খাকি ড্রেস। কেন?'

শুধু এই 'কেন'র মধ্যে অনেক প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। প্রথম ঔৎসুক্য, বুকের তকমায় নামটা লাগিয়ে রেখেছি কেন? গোটা দেশে এখন নৈরাজ্য চলছে। কে ধার ধারে আমার নামের?

ধারে! যারা বজ্র বক্সীকে নির্বংশ করতে চায়, তারা যদি আমার নামের শেষে 'বক্সী' টাইটেল দেখে, তা হলেই আমার পথ আটকাবে। বজ্র বক্সী শেষ মুহূর্তে বক্সী টাইটেলকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তামাম দুনিয়ায়।

আমরা ডেরা ছেড়ে বেরোনোর আগেই তাই ফন্দি ঠিক করে নিয়েছিলাম। পুরুলিয়া টাউনের একটা ডিটিপি ইউনিটে ঢুকে 'বিমান ব্যানার্জি' নামটার প্রিন্ট আউট বের করে সাঁটিয়ে রেখেছি পেতলের তকমার ওপর— যে-তকমায় লেখা আমার আসল নাম।

পথিক সামন্তর ঈগল চাহনি তা নজরে এনেছে।

আমি চলে গেলাম খাকি ড্রেসের প্রসঙ্গে। বললাম, 'খাকি ইউনিফর্ম দেখলেই লোকে সমীহ করে।'

উনি নাছোড়বান্দা। টিপে টিপে বললেন, 'কিন্তু পেতলের প্লেটের ওপর ডিটিপি প্রিন্ট আউট কেন? আসল নাম চাপা দিচ্ছেন?'

মরিয়া হয়ে গিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, দিচ্ছি।আমার নাম বিশাল বক্সী।'

'বজ্র বক্সীর কেউ?'

'জ্যেষ্ঠপুত্র।'

'বজ্র বক্সীর ল্যাবরেটরি তো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তিনি গেলেন কোথায়?'

'সবই জানেন?'

'খবর আমার কাছে হেঁটে আসে। কিন্তু বজ্র বক্সী কি উবে গেলেন? ওঁর ছেলেটাকেও পাওয়া যায়নি।'

আমি চুপ করে রইলাম।

উনি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, 'মারমুখী জনতার কাছে যাওয়া সমীচীন নয়— বিশেষ করে সেখানে যখন কেউ নেই।'

'আছে।' বললাম আমি।

'কে?'

'আমার ভাই— যাকে ওরা খুঁজে পায়নি।'

পথিক সামন্ত বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে নিজের হ্যান্ডলুমের শান্তিপুরী ঝোলা হাতড়ালেন। একটা বস্তু তুলে ধরে বললেন, 'এটার যদি দরকার হয়, বলবেন।'

বস্তুটা একটা রিভলভার।

বজ্র বক্সীর গবেষণাগারে যাওয়ার সময়ে কোনও বাধা পাইনি। কেউ কোত্থাও নেই। যদিও কেউ থাকত, আমাকে দেখে চিনতে পারত না। কেননা বাবার বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার পর থেকেই দাড়ি রাখা অভ্যেস করেছিলাম। এখানকার মানুষ আমার আগের চেহারার সঙ্গে পরিচিত। তখন দাড়ি গোঁফ কামাতাম, চেহারা ছিল পাতলা। এখন তা নই। বনে জঙ্গলে ঘুরে ভারী হয়েছি। রং জ্বলে গেছে।

তাই অত নির্ভয়ে চলে এসেছিলাম এমন একটা জায়গায়, যেখানে বজ্র বক্সীর রক্ত যাদের ধমনীতে বইছে, তাদের কাউকে আস্ত রাখা হবে না বলে জনগণের ফতোয়া জারি হয়ে গেছে।

শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে এসেছি। দৈবাৎ কিছু মানুষ চোখে পড়েছে যারা দল বেঁধে থাকতে শিখেছে। একা থাকলেই ইঁদুরে-বেড়ালে-কুকুরে খাবে। খাবার জল আর চাল ডালের জন্যে এদের দ্বারস্থ হতে হয়েছে কখনও সখনও। আমাকে চিনতে পারেনি— ভেবেছে, পথিক সামন্তর আমর্ড গার্ড। কেননা, উনি তো সর্বত্র নিজের প্রেস কার্ড দেখাচ্ছেন আর খবর সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। ওঁকে সঙ্গে রেখে খুব সুবিধে হয়েছিল। ওঁর আড়ালে থেকে রসদ, ডিজেল আর গ্যাস সিলিন্ডার জোগাড় করতে করতে নির্বিঘ্নে চলে গেছিলাম আমার বাবার বাড়িতে। যে লৌহকপাট সব সময়ে থাকত বন্ধ, তা খোলা পড়ে ছিল। টাটা সুমোয় সাংবাদিক যাচ্ছেন ভেতরে— কেউ বাধা তো দেয়ইনি, উলটে ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলে নিয়ে যেতে উপদেশ দিয়েছিল। পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ুক সেই ছবি— জগৎ জানুক, কুকর্ম করলে তার কী সাজা হয়।

ল্যাবরেটরির ধ্বংসস্তূপের কথা আর বলতে চাই না। ভূগর্ভে ঢুকেছিলাম দেওয়ালের একটা কড়ায় টান দিয়ে। সুইং ডোরের মতো ঘুরে গেছিল গোটা দেওয়ালটা। পথিক সামন্ত তাঁর রিভলভার আর মাহাতো তার ছুরি নিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল ইঁদুরদের। গোটা ল্যাবরেটরিতে থুকথুক করছিল তারা, যখন টাকা সুমো ঢুকছে। তার পরেই সরে গেছিল তফাতে। জোড়া জোড়া খুনে চোখ নজরে রেখেছিল আমাদের, কিন্তু রিভলভার আর ছুরির মহিমা বুঝে কাছে আসেনি।

দেওয়াল ঘুরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন পাতালে নামছি, তখন আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে এসেছিল বিপুল।

টাটা সুমোর পেছনের সিটের নীচে কাপড় চাপা দিয়ে ওকে ঢেকে রেখে বেরিয়ে এসেছিলাম গবেষণাগার ছেড়ে। গাড়ি যেতে যারা দেখেছিল, তারা উৎসুক হয়ে কথা বলতে এলেও গাড়ি আর থামাইনি। বিপজ্জনক এলাকা পেরিয়ে এসে তবে বিপুলকে বসিয়েছিলাম পথিক সামন্তর পাশে। একটু একটু করে শুনেছিলাম যে সব কথা, তা আগেই বলেছি।

তারপর এসেছিলাম কলকাতায়। রাস্তার ধারে ধারে পড়ে থাকা প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, টেম্পো, ট্রাক, অটোরিকশা, বাস দেখেছিলাম বিস্তর। সব ড্যামেজড। র‍্যাডিয়েটরের হোস পাইপ পর্যন্ত কেটে দিয়েছে শয়তান ইঁদুরের দল। চলন্ত গাড়ি বলতে শুধু আমাদের এই টাটা সুমো।

মাঝে মাঝে অবশ্য ঘোড়ার গাড়ি চলতে দেখেছি। অটোমোবাইলের প্রতাপে ঘোড়ারা

বিদায় নিয়েছিল কলকাতা থেকে অনেক আগেই। পথিক সামন্তই বললেন, গাড়ি কেনার ধুম পড়ে গেছিল শহর জুড়ে। ধারে গাড়ি কিনে কলকাতার সব রাস্তা ভরিয়ে ফেলা হয়েছিল এক সময়ে। আস্তাবলের সংখ্যা কমে এসেছিল। মাউন্টেড পুলিশ আর রেসকোর্সের ঘোড়া ছাড়া শহরে আর ঘোড়া ছিল না বললেই চলে। এখন তো দেখছি গোরুর গাড়ি পর্যন্ত চলছে কলকাতার পথে ঘাটে— ছুটছে ঘোড়ায় টানা ফিটন অথবা পালকি গাড়ি। শাবাশ বজ্রদন্তী! কলকাতার দম্ভ তোমরা চূর্ণ করে ছাড়লে!

পথে ঘাটে এদের দেখেছি বই কী! কখনও খোলা ড্রেন থেকে উঁকি দিয়েছে, কখনও বীরবিক্রমে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেছে। ভ্রূক্ষেপ নেই। আসলে তক্কে তক্কে আছে। এত গাড়িকে জখম করেছে, টাটা সুমোকে ছেড়ে দেবে?

আমরা তাই এক দৌড়ে চলে গেছিলাম বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ষোলতলা সেই বাড়িটায়। ওই রাস্তায় অত উঁচু বাড়ি একটাই তাই খুঁজতে বেগ পাইনি। ফটক বন্ধ ছিল। আমি নেমে পড়ে সেন্ট্রিকে ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে বলেছিলাম, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে খবর দাও, বজ্র বক্সীর ছেলেরা এসেছে।'

এই একটামাত্র বাড়িতেই দেখেছিলাম, ইলেকট্রিসিটি রয়েছে। পাম্পের জল ষোলোতলায় উঠছে, লিফট চলছে। নিজস্ব জেনারেটর কিছুক্ষণ অন্তর চালানো হচ্ছে। ইঁদুররা যাতে তার কেটে না-দেয়, তার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থাও রয়েছে। নেই শুধু টেলিফোন। গোটা কলকাতার কোথাও টেলিফোন চালু নেই। রাস্তায় রাস্তায় আলোও জ্বলছে না। সব অন্ধকার। অন্ধকারের সাগরে এই ষোলোতলা প্রাসাদটাই শুধু আলোয় আলোয় ঝলমল করছে।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থেকে যে প্যাসেজটা ঢুকে গেছে এই প্রাসাদপুরীর দিকে, তার দু'দিকে বড় বড় গাছের তলায় ফুলঝোপের মধ্যে দেখেছিলাম জোড়া জোড়া জ্বলন্ত চোখ। বজ্রদন্তীদের চোখ।

ষোলোতলায় উঠিয়ে নিয়ে গেছিল লিফটম্যান। শুধু আমাকে বিপুলকে আর পথিক সামন্তকে। মাহাতো নিজেই যায়নি। সে গাড়ি ছেড়ে নড়বে না। বিশেষ করে এই আলো ঝলমলে অট্টালিকার বিশাল কমপাউন্ডে দাঁড়িয়ে থাকা সব গাড়িগুলোই যখন নিষ্প্রাণ অবস্থায় ধূলি ধূসরিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খবরটা দিয়েছিল দারোয়ান। কত আর ইঁদুর মারবে? দেড়শো গাড়ি রয়েছে এখানে। এদিক দেখতে গেলে ওদিকের গাড়ি ড্যামেজ করছে বজ্রদন্তী বিটলেরা। সিঁড়ি দিয়েও ওঠানামা করছে। পারছে না শুধু লিফটকে কবজায় আনতে। অতন্দ্র প্রহরার দৌলতে।

ষোলোতলায় লিফট থেকে যেই পা বাড়িয়েছি, একটা ধূসরদেহী আতঙ্ক লাফিয়ে উঠেছিল আমার ঘাড়ের জুগুলার শিরা লক্ষ্য করে। এক কামড়ে কেটে দিলেই আমি সটান পরলোক রওনা হয়ে যেতাম। কিন্তু দুঁদে ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে ওসব চালাকি চলে না। হাতের এক থাবড়ায় তাকে মোজেক করিডরে আছড়ে ফেলে পা দিয়ে পিষে মেরেছিলাম।

পেছন থেকে লিফটম্যান বলেছিল, 'কেরামতি দেখালেন বটে।'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, 'তোমরাও তো দেখাও। নইলে লিফট চালু রেখেছ কী করে?'

সে শুধু দাঁত বের করে হেসেছিল। লোকটা বিহারি মুসলমান। খুব ঢ্যাঙা। কিন্তু হাতে পায়ে বিদ্যুৎ খেলে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের দরজার বেল টিপতেই দরজা খুলে আমাদের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল যণ্ডাগুন্ডা চেহারার মানুষটা। একটু পরে জেনেছিলাম, তারই নাম দীননাথ নাথ।

কিন্তু এই লিকলিকে বুড়ো পৃথিবী জোড়া এই মহাসমস্যার সমাধান করতে পারবেন কি?

আমি প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কথা বলছি। ধুতি পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোককে দেখতে নেহাতই গোবেচারা বাঙালির মতো। তবে হ্যাঁ। বজ্র বক্সীর মাথায় যে ছিট আছে, সেই জাতীয় ছিট এঁর মাথাতেও নিশ্চয় গজগজ করছে। নইলে আমাদের দেখেই একগাল হেসে বলে উঠবেন কেন, 'মুশকিল আসান... মুশকিল আসান হো গায়া!'

আমি তো তাজ্জব বনে গেছিলাম। বিপুল হাঁ করে চেয়ে ছিল। শুধু পথিক সামন্তই শূন্যগর্ভ পাইপটা কড়কড় করে চিবিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'আই অ্যাম পথিক সামন্ত—জার্নালিস্ট। আপনার স্টেটমেন্টটা কি ওয়ার্ল্ডে ফ্ল্যাশ করে দেব?'

'দূর মশায়!' বকে উঠেছিলেন প্রফেসর, 'কমিউনিকেশনের বারোটা বেজে গেছে—আপনি পাঠাবেন নিউজ!'

জুলজুল করে তাকিয়ে স্বপ্নভাবী পথিক সামন্ত বলেছিলেন, 'সে কী কথা. সে কী কথা.... বজ্র বক্সী তা হলে মন্ত্রগুপ্তিটা আপনাকে পাঠালেন কী প্রকারে?'

অমনি গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রফেসর, 'মন্ত্রগুপ্তি নিয়ে জার্নালিস্টের সঙ্গে কথা বলব না।'

'বলতে আপনাকে হবেও না।' এই প্রথম ছিনেজোঁক হতে দেখেছিলাম পথিক সামন্তকে, 'আপনি শুধু বলুন, এই পৃথিবীটা ইঁদুর-বেড়াল-কুকুরদের দখলে থাকবে, না মানুষদের দখলে থাকবে?'

'মানুষদের দখলে থাকবে।'

'মন্ত্রগুপ্তিটা কি মন্ত্র?'

'আজ্ঞে না।'

'একটা ভাইরাস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'টিউমার ঘটাবে?'

'আরে, আরে, আপনি জানলেন কী করে?'

'শুধু ইঁদুর, বেড়াল, কুকুরের ব্রেনে? মানুষের ব্রেনে নয়?'

'যাচ্চলে, কে ফাঁস করল মন্ত্রগুপ্তিটা?'

'আপনি।'

বলে, মুখে চাবি দিয়ে পাইপ কামড়ে নিলেন পথিক সামন্ত। পরক্ষণেই অবশ্য বললেন দীননাথকে, 'এক্সকিউজ মি, একটু টোব্যাকো হবে?'

ভদ্রলোক জল দিয়ে জল বের করতে জানেন! একেই বলে জার্নালিস্টের জেরা!

এর পরের ঘটনাবলির বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সব ক'টা দেশের এয়ারফোর্স একযোগে কাজ না-করলে এই ভাইরাস পৃথিবীময় ছড়ানো যেত না। তারা মানুষের বন্ধু ভাইরাস। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রই তাদের বানিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর কৌশলটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন সব দেশের বৈজ্ঞানিকদের।

শুধু একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন বিপুলের কাছে, 'কসমিক এনার্জি... কসমিক এনার্জি.... যে-এনার্জি টেনে নিয়ে হারামজাদারা অতিমন পেয়েছে, চিন্তার বিদ্যুতে কথাবার্তা বলছে, আমি কসমিক এনার্জির অফুরন্ত ভাঁড়ার থেকে টেনে নিলাম প্রায় সেই রকম একটা এনার্জি— যে এনার্জি শুধু ভাইরাস বানিয়ে যাবে অতিমনের ব্রেনে টিউমার তৈরি করার জন্যে।'

বিপুল বলে ফেলেছিল, 'আপনিও তো স্যার অতিমনের অধিকারী। আপনার ব্রেনে যদি টিউমার হয়?'

'দূর বোকা! আমি ভাইরাস কালচার করে অ্যান্টিবডি বানিয়ে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে বসে আছি। দীননাথকে দিইনি— ওটা একটা বোকা পাঁঠা। ওর কিচ্ছু হবে না। এই ভাইরাস ওর বন্ধু।'

হজম করে গেলাম নীরবে। ওঁর তুলনায় বোকা পাঁঠা তো তা হলে পৃথিবীর সকলেই।

মরুক গে! পৃথিবীটা তো বজ্রদন্তী বিভীষিকা শূন্য হতে চলেছে। সেইটাই পরম লাভ।

কিন্তু আমার বাবা গেলেন কোথায়?

টিটকিরি মেরে সেইটাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনার পরম শত্রু বজ্র বক্সী গেলেন কোথায়?...'

'পরমাণু হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছেন। যোগসিদ্ধি কি চাট্টিখানি কথা? অষ্টাদশ সিদ্ধির প্রথম সিদ্ধি লাভেই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। হয়তো এই ঘরেই এই মুহূর্তে আছেন... থাকুন অনন্তকাল।'

তা সত্ত্বেও পিতৃশ্রাদ্ধ করতে হয়েছিল আমাকে আর বিপুলকে।

ও হ্যাঁ, অন্তরা দিব্বি আছে মেঘালয়ে। ডাকাবুকো মেয়ে। মধুরাও বেঁচে আছে। তবে বাবার শ্রাদ্ধের দিন কেউ আসেনি। বলে পাঠিয়েছে, অমন বাপের মুখদর্শন করতে চাই না।

আরে বডি-ই নেই তো মুখ!

ওঁ শান্তি... ওঁ শান্তি... ওঁ শান্তি!

হত্যার হাতিয়ার হরমোন

চোখের পাতা পড়ছে না প্রফেসরের। তাঁর চোখ হিমশীতল। তাঁকে এভাবে চেয়ে থাকতে কখনও দেখিনি।

যাকে দেখছেন, সে কিন্তু ভয়ংকর কিছু নয়। সামান্য একটা ব্যাঙ।

আর পাঁচটা ব্যাঙের মতন অবশ্য নয়। একটু তফাত আছে। তফাতটা এমনই যে, কলেজে ব্যাঙ নিয়ে যারা মজাসে কাটাছেঁড়া করে, সেই বীরপুঙ্গবরাও এই ব্যাঙ হাত দিয়ে ছুঁতে সাহস পাবে না।

অথচ এই ব্যাঙ অন্য গ্রহ থেকে আসেনি। সেক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ-প্রহেলিকা নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত না-করলেও চলত। প্রফেসরও হিমশীতল চাহনি নিক্ষেপ করে থাকতেন না। ভিনগ্রহী দেখে ভড়কে যাওয়ার পাত্র নন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। চোয়ালও শক্ত করেন না, বরফ-ঠান্ডা চোখে তাকিয়েও থাকেন না।

কিন্তু কিম্ভূত এই ব্যাঙ মহাশয় তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে বিলক্ষণ। ওঁর শরীরে অ্যাড্রেনালিন হরমোনের ক্ষরণও নিশ্চয় বেড়ে গেছে। সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে রয়েছে সেই কারণেই। ভয়ানক একটা বিপদের সংকেত দেখেছেন আশ্চর্য এই ব্যাঙটার শরীরে।

আমি কিন্তু অবাক হয়েছি ঠিকই, ভয় পাইনি। ভয়টয় আমার ধাতে নেই। তবে একটু ঘেন্না করছে। ব্যাঙ দেখলে গা ঘিনঘিন করে না, এমন মানুষও খুব কম আছে এই পৃথিবীতে।

কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়া ব্যাঙ মহাশয় যেন আরও ঘেন্নার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে। শুধু তার কদাকার অবয়বের জন্যে নয়—

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপারের জন্যে...

ছ'টা পা রয়েছে এই ব্যাঙের!

মস্ত সাদা ট্রে-র ঠিক মাঝখানে রয়েছে বিচিত্র ব্যাঙ। বিলিয়ার্ড টেবিলের ঠিক মাঝখানে। সবুজ বনাতের ওপর সাদা ট্রে। মাঝে ব্যাঙ। একটু ওপরে হাইপাওয়ার বিদ্যুৎবাতি। ফলে, প্রাণহীন ব্যাঙের ছ'খানা পা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি বিলিয়ার্ড টেবিল ঘিরে। আমি, প্রফেসর আর...

না, থাক। তাঁদের নাম বলা বারণ।

ঘর থমথম করছে নামহীন আতঙ্কে। সামান্য একটা ছ'পেয়ে ব্যাঙকে দেখেই প্রফেসর যে এমন কাঠ হয়ে যাবেন, এটা কেউ ভাবেনি।

খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিশাল সরোবর। তিনদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়। পূর্ণিমার চাঁদের দৌলতে পাহাড়ের গায়ের বড় বড় গাছগুলোকে বড় সুন্দর লাগছে। মস্ত মুকুরের মতন হ্রদের জলে জ্যোৎস্না-আলোকিত আকাশ দেখা যাচ্ছে।

প্রকৃতি সেজেছে অপরূপ সাজে। তাল কেটে দিচ্ছে শুধু এই ব্যাঙটা।

আমি আর থাকতে না-পেরে বলে ফেললাম, 'অপার্থিব।'

নীরস গলায় প্রফেসর বললেন, 'তার মানে এই ব্যাঙ পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছে?'

'আকাশ থেকে পড়েছে। নতুন ব্যাপার নয়। ছোট ব্যাঙ, ছোট মাছ, নুড়ি পাথর এর আগেও আকাশ থেকে রহস্যজনকভাবে ঝরে পড়েছে। সে সব রহস্যর কোনও ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি,' আমি লেকচার থামালাম।

'সুতরাং, এই ছ'পেয়ে ব্যাঙটাও আকাশ থেকে হ্রদের জলে পড়েছে?'

'অবশ্যই।'

যারা ব্যাঙ নিয়ে এসেছিল, তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর, 'এই আহাম্মকটাকে অন্য ব্যাঙগুলোও দেখাও।'

হুকুম তামিল হল সঙ্গে সঙ্গে। বিলিয়ার্ড বোর্ডের ওপর এল আরও তিনটে সাদা ট্রে। প্রতিটি ট্রে-তে একটা করে মরা ব্যাঙ। একটার তিনটে পা, একটার সাতটা পা, আর একটার নটা পা।

এইবার চক্ষুস্থির হল আমার।

প্রফেসরের হিমশীতল চাহনি এবার নিবদ্ধ আমার ওপর, 'আকাশের কোন ব্যাঙের কারখানা থেকে এত রকমের পা-ওলা ব্যাঙ তৈরি হচ্ছে, দীননাথ।'

আমি চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

'বুরবক কোথাকার,' খুব আস্তে বললেন প্রফেসর।

গা-সওয়া মন্তব্য। তাই হজম করে গেলাম।

সেই লোকগুলোর দিকে ফের ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর, 'চোখটা কোন ঠ্যাঙে আছে?'

'এই তো... এই তো,' বলে, একজন বিলিয়ার্ড স্টিকের ডগা দিয়ে ন-পেয়ে ব্যাঙটার একটা ঠ্যাঙ ঘুরিয়ে দিল জোর আলোর দিকে।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

একটা চোখ। ঠ্যাঙের ডগায় একটা চোখ। কপালে দুটো চোখ— তৃতীয় নয়নটা গজিয়েছে ঠ্যাঙের ডগায়।

এবার বিদ্রূপের স্বরে বললেন প্রফেসর, 'কী বুঝলে, পরমজ্ঞানী দীননাথ নাথ?'

আমি নিজেকে অনাথ মনে করলাম।

দেখে করুণা হল প্রফেসরের। লোকগুলোর দিকে ফিরে বললেন, 'কুমিরটাকে আনো।'

কুমির! এবার কুমির! মরা, না, জ্যান্ত?

দু'জন ঝটপট ট্রেগুলো নিয়ে গেল বিলিয়ার্ড টেবিল থেকে। আর, একজন একটা বড়

প্লাস্টিক পেতে দিল টেবিলে। ততক্ষণে বাকি চারজন ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে প্লাস্টিক চাদরে মোড়া একটা ভারী জিনিস। বিলিয়ার্ড টেবিলে রেখে চারজনে চারদিক থেকে প্লাস্টিক টেনে নামিয়ে দিল টেবিলের চারপাশে।

অত্যুজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, মরা কুমিরের ল্যাজ একটা নয়— তিনটে।

প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন লোকগুলোকে, 'এরকম কুমির কিলবিল করছে লেকের জলে?'

'হ্যাঁ,' শুকনো মুখে বললেন একজন, 'কারও কারও ল্যাজেও চোখ রয়েছে।'

'আপনা থেকেই মরে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। ঠিক তাই, ব্যাঙগুলোর মতন। মরা মাছও ভেসে আসছে।'

'অদ্ভুত শরীর তাদেরও?'

'গায়ে চোখ... ল্যাজে চোখ...'

'আর কাউকে খবর দিয়েছ?'

'আজ্ঞে না।'

'উত্তম কাজ করেছ। ঘটে বুদ্ধি আছে তোমাদের।'

যাদের এই কথাটা বললেন প্রফেসর, তারা কেউ নির্বোধ নয়। প্রত্যেকেই সমাজের প্রথম সারির মানুষ। কোটি কোটি টাকার মালিক। ছুটি কাটানোর জন্যে এই পাহাড়ি অঞ্চলে হ্রদের পাশেই ক্লাব বানিয়েছেন। লোকালয় থেকে অনেক দূরে... যাতে সাধারণ মানুষরা ইচ্ছে থাকলেও আসতে না-পারে। গাড়ি চলার পথও নেই। তাতে আরও সুবিধে হয়েছে। নিজস্ব হেলিকপ্টার আছে। আসা-যাওয়া সেই হেলিকপ্টারেই। টাকা যার, পৃথিবী তার।

কিন্তু এমন নির্জন নিরাপদ জায়গাতেই অকস্মাৎ উৎপাত শুরু হয়েছে। কিম্ভূত ব্যাঙ, অদ্ভুত কুমির, আশ্চর্য মাছ। না-জানি আরও কী কী বিভীষিকা ওত পেতে রয়েছে।

এই ক্লাবের সেক্রেটারি যিনি, তিনি বুদ্ধিমান পুরুষ। পুলিশ আর প্রেসকে ভয় পান। এরা আর কিছু না-পারুক— ঢি-ঢি ফেলে দিতে পারে। ক্লাবের প্রাইভেসির বারোটা বাজিয়ে দেবে একবার যদি জানতে পারে অদ্ভুত ব্যাঙ, মাছ, কুমিরের আবির্ভাব ঘটছে এই বিজন অঞ্চলে। সরকারি আমলাদের জানিয়েও কোনও লাভ নেই—

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের আশ্চর্য কীর্তিকলাপের কাহিনি তিনি পড়েছিলেন আমার এই রদ্দিমার্কা কলমের জোরে। অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানার সংবাদ শুনলে প্রফেসর হেসে উড়িয়ে দেন না— নিজেই মুশকিল-আসান হয়ে যান। তাই তিনি নিজে গিয়ে আমাকে আর প্রফেসরকে তুলে এনেছেন হেলিকপ্টারে চাপিয়ে।

এসেছি বিকেলে। লেক আর পাহাড়ের ওপর হেলিকপ্টারে চক্কর মেরেও এসেছি।

সন্ধে নাগাদ নিজেদের জেনারেটর চালানো হয়েছে। গোটা ক্লাব-বাংলো ঝলমল করছে। তার পরেই শুরু হয়েছে কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীদের প্রদর্শনী।

মরা কুমিরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর, 'খাবার জল কি লেক থেকে আসে?'

'না,' সেক্রেটারির জবাব, 'ডিপ টিউবওয়েল আছে। অবশ্য সে জলও আমরা খাই না। মিনারেল ওয়াটার আছে বোতলে। খাবেন?'

'না,' শুষ্ক স্বর প্রফেসরের, 'খাবার দাবার কি এখানকার?'

'এক্কেবারে না। সব সঙ্গে আনি।'

'তরিতরকারি, ফলমূল?'

'সব সঙ্গে আসে।'

'কোথায় রাখেন?'

'স্টোর রুমে।'

'দরজা বন্ধ থাকে?'

হকচকিয়ে গেলেন সেক্রেটারি। আমতা আমতা করে বললেন, 'সবসময়ে থাকে না। কে আসবে এখানে।'

ঝটিতি আমার দিকে ফিরলেন প্রফেসর, 'চলো তো, দীননাথ।'

আমরা দল বেঁধে দোতলার বিলিয়ার্ড রুম থেকে বেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে, একতলায় নেমে করিডর বেয়ে এগোচ্ছি জোরালো আলোর তলা দিয়ে, এমন সময়ে সেক্রেটারি সাহেব থমকে দাঁড়ালেন— তিনিই যাচ্ছিলেন সবার আগে। চেয়ে আছেন সামনের ছোট ভাঁড়ার ঘরের দিকে।

দরজাটা খোলা ছিল বলে আমিও দেখতে পেলাম উনি যা দেখছেন।

একটা প্রকাণ্ড লাল পিঁপড়ে।

দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মেঝের ঠিক মাঝখানে।

শুধু প্রকাণ্ড বললে কম বলা হবে— অতিকায় বললে সঠিক বলা হয়। লম্বায় দু'ফুটের কম নয়। মেটে সিঁদুরের মতন গায়ের রং। মাথায় মস্ত হেলমেট। বাটির মতন বড় বড় চোখ দুটোর ভাবলেশহীন কিন্তু বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। একদৃষ্টে নজরে রেখেছে আমাদের।

আমার মনে হল, প্রকাণ্ড পিপীলিকা তাজ্জব অবয়বের অধিকারী যখন, তখন অদ্ভুতকর্মাও বটে। সুতরাং পোকাকে পোকার মতনই টিপে মেরে ফেলা উচিত।

প্ল্যানটা সবে মাথায় এনেছি, অমনি মাথার মধ্যে জবাবটা ভেসে এল, 'ছোকরা, আর এগিয়ো না।'

আমি সকলের মুখের দিকে তাকালাম। সবারই চোখ ছানাবড়া— প্রফেসরের চোখ ছাড়া। তাঁর চোখ এখনও হিমশীতল।

আমি ঢোঁক গিলে তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'দাঁড়াতে বললেন কেন?'

প্রফেসর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আমি বলিনি,' চেয়ে রইলেন অতিকায় পিঁপড়ের দিকে, 'ও বলছে।'

'পিঁপড়ে ধমকাচ্ছে— আমাকে।' আমার রাগ হয়ে গেল।

প্রফেসর বললেন, 'সাবধান করছে, মুখ দিয়ে নয়, ব্রেন দিয়ে।'

'ব্রেন!'

আবার আমার মাথার মধ্যে দিয়ে দুম দুম করে এই কথাগুলো আছড়ে পড়ল 'হাঁদারাম

আর কাকে বলে। পিঁপড়ের ব্রেন কখনও দ্যাখোনি? এই নাও, দ্যাখো।'

সামনের দুটো দাড়া তুলে মাথার দু'জায়গায় দুটো বোতাম টিপতেই ডালার মতন খুলে গেল পিঁপড়ের মাথার হেলমেট। করোটির হাড় একদম স্বচ্ছ কাচের করোটি যেন। জোরালো আলোর ধূসর রঙের যে-মস্তিষ্ক দেখলাম স্ফটিক-করোটির মধ্য দিয়ে সাইজে তা মানুষের ব্রেনের চেয়ে একটু ছোট— কিন্তু মগজই বটে।

আবার বোতাম টিপে হেলমেট, মানে, ব্রেন-কেস বন্ধ করে দিয়ে এবার পেছনের দু'পায়ের ওপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রকাণ্ড পিঁপড়ে। বুক চিতিয়ে। পিঁপড়ের তলদেশে যে এত কারুকাজ থাকতে পারে, তা জানা ছিল না। সামনের দাড়া দিয়ে দু'জায়গায় চাপ দিতেই বুকের কপাট খুলে গেল অবিকল দরজার মতন।

ভেতরে সাজানো দুটো সারিতে ছ'টা করে বুলেটের মতন বস্তু...

না... না... বুলেট নয়...

হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ!

দেখলেন প্রফেসর। একটু হেঁট হলেন। প্রকাণ্ড পিঁপড়ে সাঁত করে পিছু হটে গেল।

মাথার মধ্যে ধ্বনিত হল পিপীলিকা কণ্ঠস্বর, 'হাত দিয়ো না।'

ব্যঙ্গের সুরে প্রফেসর এবার বললেন, 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে... বুকে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে জলে বিষ ছড়াচ্ছ, হারামজাদা...'

'গালাগাল দেবেন না,' মাথার মধ্যে পিঁপড়ের ধমক।

প্রফেসরকে কি আর রোখা যায়? চালিয়ে গেলেন তিনি—

'সবই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম বাড়িতে বসেই— সেক্রেটারি গিয়ে খবরটা দিতেই। শুধু ভাবিনি, পোকা যখন কথা বলতে পারে না ব্রেনের ইলেকট্রিক ওয়েভ নিশ্চয় পাঠাতে পারে— যাকে বলি টেলিপ্যাথি। তোমরা দেখছি এই ব্যাপারটায় খুব এগিয়ে আছ।'

'আছি। মুখ দিয়ে বেশি কথা বলা যায় না, ওটা বর্বরদের প্রথা। মন দিয়ে গোটা ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে কথা বলা যায়।'

'আমরা কতখানি বর্বর,' বললেন প্রফেসর, 'সেটা এখুনি টের পাবে,' বলতে বলতে সেলুলার ফোনটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনের চিন্তা বিদ্যুৎ আকারে ছুটে গিয়ে, পিঁপড়ে দানোকে মন্ত্রস্থ করার আগেই মাউথপিসে বলে দিলেন, 'শুরু করো স্প্রে।'

গুরুগম্ভীর গর্জন শুনলাম বাইরে। হেলিকপ্টার চালু হয়ে গেছে। এবার উঠবে শূন্যে।

পিঁপড়ের আতঙ্কিত মস্তিষ্ক-বিদ্যুৎ আছড়ে পড়ল আমাদের ব্রেনে, 'কী সর্বনাশ! আমাদের খুন করতে চাও?'

প্রফেসর চিল-চিৎকার করে বললেন, 'আলবত খুন করব। তোমরা হারামজাদা হরমোন স্প্রে করে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে লেকের জলে নরকের দানো তৈরি করছ— আর আমি তোমাদের ছেড়ে দেব? এর পরেই তো গোটা পৃথিবী জুড়ে তোমরা হরমোন ছড়াবে— বিদঘুটে মানুষ বানাবে, পালে পালে তারা মরবে। বড় মজা, না? পালটা হরমোন স্প্রে করে দিচ্ছি গোটা তল্লাটে।'

'দাঁড়াও... দাঁড়াও...'

'কেন দাঁড়াব?'

'আমরা যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানেই চলে যাচ্ছি— আমাদের মেরো না।'

'তোমরা কোত্থেকে এসেছিলে, জাদু?'

কী একটা খটমট নাম চিন্তা-তরঙ্গ হয়ে আমার ব্রেনে ঢুকেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে, মনে করতে পারছি না। সেরকম মনের অবস্থাও তখন আমার ছিল না। কেননা, আচমকা প্রকাণ্ড পিঁপড়ে দু'পাশে দুটো ডানা মেলে পাখির মতন বেগে উড়ে গেছিল করিডর পেরিয়ে দরজা দিয়ে... আমরাও ছুটে চলে এসেছিলাম বাইরের লনে... দেখেছিলাম এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

লেকের জল তোলপাড় করে একটি বর্তুলাকার মহাকাশ যান ভেসে উঠল শূন্যে... সেই বলের চারদিকে অসংখ্য আলো জ্বলছে আর নিভছে... চারপাশের পাহাড় আর জঙ্গল থেকে পালে পালে প্রকাণ্ড পিঁপড়েরা আসছে ঠিক পঙ্গপালের মতন— বেগে ঢুকে যাচ্ছে মস্ত বল স্পেশশিপের ভেতরে!

চাঁদের আলোয় যখন আর একটা পিঁপড়েকেও উড়ে আসতে দেখা গেল না— ভাসমান বর্তুলাকার মহাকাশযানের সব ক'টা গবাক্ষ বন্ধ হয়ে গেল একসঙ্গে। আস্তে আস্তে চন্দ্রালোকিত আকাশের দিকে উড়ে গেল স্পেসশিপ। তারপরে নক্ষত্রবেগে মিলিয়ে গেল...

তার আগে একটা হুংকার বজ্র-বিদ্যুৎ-চিন্তায় আমাদের ঘিলু নড়িয়ে দিয়ে গেছিল— 'আবার আমরা আসব... দূর থেকেই গোটা পৃথিবীটাকে হরমোন-হাতিয়ার দিয়ে স্প্রে করব।'

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েছিলেন প্রফেসর, 'পোকামারার ওষুধের কামান দেগে আকাশ ভরিয়ে দেব। বদমাশ বোম্বেটে!'

বাড়ি ফেরার পথে মিনমিন করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'একটু কৌতূহল আছে।'

উড়ন্ত হেলিকপ্টারের পেট থেকে নেমে তখন আমরা জেটপ্লেনে চেপেছি। জানলার পাশে বসে নীচের পাহাড় আর বন দেখছেন প্রফেসর। মুখ না-ফিরিয়েই উদাসীনভাবে বললেন, 'জ্ঞান দিতে হবে?'

'আজ্ঞে।'

'ঘরে বসে ব্যাপারটা আঁচ করলাম কী করে?'

'আজ্ঞে।'

'ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মাসখানেক আগে একটা আইসপ্যাক বাক্স এসেছিল মনে আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বাক্স নিয়ে ল্যাবোরেটরিতে ঢুকে গেলেন— আমাকে ঢুকতে দেননি।'

'তুমি দেখলে আঁতকে উঠতে— তাই দেখাইনি।'

'কী দেখাননি?'

'মরা পিঁপড়ে।'

'এইমাত্র যাকে দেখলাম, তার ভায়রাভাই?'

'হ্যাঁ। ক্যালিফোর্নিয়ার একটা লেকের পাশে সে এসে বসেছিল একটা ঘুমন্ত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পাশে— নিশ্চয় ঘুম ভাঙলে মনের কথা বলার ইচ্ছে ছিল—'

'মন দিয়ে মনের কথা?'

'বাগড়া দিয়ো না— শুনে যাও। আচমকা ঘুম ভাঙতেই বিদিগিচ্ছিরি পেল্লায় পিঁপড়েকে পাশে দেখেই উজবুক লোকটা ক্রিকেট ব্যাট হাঁকিয়ে পিঁপড়ে-পোকার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল— ঘিলু বেরিয়ে পড়েছিল।'

'বুঝলাম। সেই থেকে বিকট পিঁপড়েরা সব্বাই হেলমেট পরছে।'

'পিঁপড়েদের সংঘবদ্ধ ইনটেলিজেন্স হুঁশিয়ার করেছে অন্যদের। কিন্তু ঘিলু নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেই বুঝেছিলাম— ওদের মতলব সুবিধের নয়; বিশেষ করে বুকের খুপরিতে সিরিঞ্জে বোঝাই কেমিক্যালগুলো বিশ্লেষণ করবার পর আর সন্দেহ ছিল না।'

'কী কেমিক্যাল, প্রফেসর?'

একটু চুপ করে থেকে আমার চোখে চোখ রেখে প্রফেসর বললেন, 'এনডক্রিন ডিসরাপটার্স। কেউ বলে, হরমোন মিমিক্স।' বুঝলে? বোঝোনি। হরমোন যে কেমিক্যাল মেসেঞ্জার, এটা তো জানো?'

'জানি, জানি।'

'রক্তের মধ্যে দিয়ে অন্তঃস্রাবী গ্ল্যান্ডের জৈবরস, মানে, হরমোন শরীরের নানান ক্রিয়ার ওপর খবরদারি চালাচ্ছে। মানব-বন্ধু এই হরমোনের সুব্যবস্থাকে কিন্তু বানচাল করে দিচ্ছে কিছু নকলি হরমোন। এর মূলে রয়েছে কিছু কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, ডিডিটি-র জাতভাই ডিডিটি, পিসিবি, ডায়অক্সিন ইত্যাদি ইত্যাদি।— বুঝেছ?'

'না।'

'মাথায় নেইকো ঘি, ঠকঠকালে নড়বে কী? আরে বাবা, ইদানীং প্ল্যাস্টিক র‍্যাপার আর বেবি ফুড নিয়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এই হরমোন মিমিক্স-দের জন্যে। শুধু মানুষের তৈরি কেমিক্যাল নয়, কিছু উদ্ভিদ এর জন্যে দায়ী— ভাবা হচ্ছিল। এমন সময়ে কানে এল একটা বীভৎস খবর। ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডার বেশ কয়েকটা লেকে কুমির, মাছ, ব্যাঙদের অঙ্গ প্রতঙ্গ অদ্ভুতভাবে পালটে যাচ্ছে। যে পিঁপড়েটার খুলি ফাটানো হয়েছিল— সে কিন্তু দাঁড়িয়েছিল এইরকমই একটা লেকের পাশে। এর থেকে কী বুঝলে, শ্রীমান দীননাথ নাথ?'

'পিঁপড়ে রাসকেল হরমোন মিমিক্স লেকের জলে স্প্রে করে এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছে মাছ, কুমির, ব্যাঙদের ওপর.' বলে গেলাম হড়বড় করে।

'বুদ্ধিমান বালক,' প্রফেসরের হৃষ্ট মন্তব্য, পরবর্তী এক্সপেরিমেন্ট হবে নিশ্চয় মানুষের ওপর। ধরো, তোমার ওপর যদি হয়, তুমি কি সহস্রচক্ষু, অষ্টাপদ, দ্বিল্যাজ বিশিষ্ট কিম্ভূত মানব হতে রাজি আছ?'

শিউরে উঠলাম আমি।

অ্যানড্রয়েড আতঙ্ক

অযোধ্যা পাহাড় তন্নতন্ন করে খুঁজে যাচ্ছে একশোজনের পার্টি। এরা এখানকার আদিবাসী। প্রত্যেকের হাতে টাঙি। প্রত্যেকের চোখ ধকধক করে জ্বলছে। রক্তে খুনের নেশা জেগেছে। এরা, এই আদিবাসীরা, এমনিতে শান্ত— কিন্তু রাগলে বন্য।

সেই চণ্ডাল রাগ এদের মধ্যে এখন দেখা দিয়েছে। ন'বছরের ছোট্ট একটি মেয়েকে কিডন্যাপার তুলে নিয়ে গেছে। ঝরনার ধারে কাদার মধ্যে লোকটার বুটজুতোর ছাপ পাওয়া গেছে। মেয়েটার খালি পায়ের ছাপও। তার অনিচ্ছায় তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাদায় রয়েছে সেইরকম চিহ্ন।

আর সীতাকুণ্ডুর জলে ভাসছে প্লাস্টিকের সাদা বলটা। এই বলটা নিয়েই মেয়েটা খেলতে গেছিল। মা-মাসিরা ছিল লাল পদ্মের দিঘিতে, পাশেই। সীতাকুণ্ডুর জল বালিমাটি ফুঁড়ে পাহাড়ের এত উচ্চতায় বুড়বুড় করে উঠে আসে বলে এখানকার লোকেরা জায়গাটার নাম দিয়েছে বুড়বুড়ি। চারপাশে চার-পাঁচ হাত উঁচু ঘাস-জঙ্গল। সীতার তেষ্টা পেয়েছিল বলে রাম নাকি তির মেরে মাটি ফুঁড়ে তৃষ্ণা মেটানোর জল বের করে দিয়েছিলেন এখানে, এত উঁচু পাহাড়ে। বড় পবিত্র জায়গা। বড় নিরাপদ জায়গা। জঙ্গলের হিংস্র জানোয়াররা পর্যন্ত এখানে আসে না। তারা তেষ্টা মেটায় অনেক নীচের ঝরনায়। এখানকার খেতখামারে মানুষ বড় বেশি। তাই বনের পশু এদিক মাড়ায় না।

নিরাপদ জায়গা বলেই ন'বছরের মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়েছিল মা-মাসিরা। অযোধ্যা পাহাড়ের এই দিঘিতে লাল পদ্মের এমন সমারোহ আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন মা লক্ষ্মী সূক্ষ্ম শরীরে প্রতিটি টুকটুকে লাল পদ্মের ওপর বসে রয়েছেন। চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ।

ন'বছরের ছোট্ট মেয়েটি তাই নির্ভয়ে সাদা প্লাস্টিক বল বুড়বুড়ির জলে ভাসিয়ে আপনমনে খেলা করে যাচ্ছিল।

কিডন্যাপার তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছে— নিশ্চয়ই মুখ চেপে ধরেছিল। তাই চ্যাঁচাতেও পারেনি। নইলে চিৎকার ভেসে যেত পাশের পদ্মদিঘিতে মা-মাসিদের কানে।

ফলে রক্ত টগবগ করে ফুটছে একশোজন আদিবাসীদের শিরায়, ধমনিতে। এই বনের

আর পাহাড়ের পর পাহাড়ের বুনো কুকুর, নেকড়ে, চিতা, হাতি, অজগরেরাও ভয় পায় এদের টাঙিকে।

ভয় নেই কিন্তু কিডন্যাপারের। সে একটা মস্ত গাছের উঁচুতে বসে, ডালপাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে রগড় দেখে যাচ্ছিল। হঠাৎ মেয়েটাকে সে মুখ টিপে ধরে টেনে এনে, হাত-পা টেনে টেনে ছিঁড়ে দেখেছিল শরীরের ভেতরটা কীরকম।

অবিকল তার নিজের মতন। এমনকী রক্তটাও।

মরবার আগে অবশ্য মেয়েটা লড়ে গেছিল। দাঁত দিয়ে কামড়ে মাংস তুলে নিয়েছে, নখ দিয়ে আঁচড়ে রক্ত বের করে দিয়েছে। তাইতেই কিডন্যাপার আরও খেপে গিয়ে মেয়েটার গলা মুচড়ে মুচড়ে মেরেছে। তারপর ফেলে দিয়েছে দূরের ওই গাছতলায়।

কিন্তু গ্রামের লোকজন দলবেঁধে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে, তা ভাবেনি। তাই উঠে বসে আছে প্রায় মগডালের কাছে।

মরা মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছে গাঁয়ের টাঙিধারীরা। ওরা সঙ্গে এনেছিল পোষা কুকুর। শিকারি কুকুর। গন্ধ খুঁজে নিয়ে পলাতকের পেছন নিতে ওস্তাদ।

কিন্তু এত ট্রেনিং সত্ত্বেও কুকুরগুলো দিশেহারা, মরা মেয়েটার গন্ধ শুঁকে শুঁকে এতদূর এসেছে, কিন্তু যে কিডন্যাপার মেয়েটাকে হিড়হিড় করে এতদূর টেনে এনেছে, তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছে না।

পাবে না।

কেননা, কিডন্যাপার যে মানুষ নয়— অমানুষ। মানুষের হাতে গড়া অমানুষ।

কল্পবিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম অ্যানড্রয়েড। সংশ্লেষিত মানব। ল্যাবরেটরিতে গড়া নরদেহ!

রোবট সে নয়। অ্যানড্রয়েড।

দুই চোখে বিপুল কৌতূহল নিয়ে সে শুনছিল গ্রামবাসীদের কথা। এতদূর থেকেও শুনতে পাচ্ছিল। কারণ, তার শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর। বাদুড়ের কানের মতো। অ্যানড্রয়েড কারিগরই এই ক্ষমতা তাকে দিয়েছে।

সে শুনছে:

'গলায় তো দেখছি আঙুলের ছাপ। পাথর দিয়ে থেঁতো করেছে মুখ। জামা ফালাফালা। গায়ের রক্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে।'

'মরেছে ঘণ্টা তিন-চার আগে।'

'মুখ শুকনো।'

'জলে ডুবিয়ে মারা হয়নি। পিটোনো হয়েছে।'

'গলা ধরে মুচড়ে দিয়েছে।'

'আঙুল দিয়ে খামচেছিল। নখে মাংস আর রক্ত উঠে এসেছে। জমেনি।'

'রক্ত জমেনি? মেয়েটার গায়ের রক্ত জমে গেছে— শয়তানটার গায়ের রক্ত এখনও জমেনি?'

গাছে বসে সব শুনছে কিডন্যাপার। অমানবিক হাসি ভেসে গেল ঠোঁটের কোণে কোণে। সে

দানো নয়, অ্যানড্রয়েড। অ্যানড্রয়েডের রক্ত মানুষের রক্তের মতো জমে যায় না। রক্তের মধ্যে থাকে যে লাল বস্তু, যার নাম হিমোগ্লোবিন, সেই জিনিসটাকে তৈরি করতে লাগে ৭১২টা কার্বন, ১,১৩০টা হাইড্রোজেন, ২১৪ টা নাইট্রোজেন, ১টা আয়রন, ২টো সালফার, ৪১৫টা অক্সিজেন অ্যাটম, এই হিসেব সব ঠিক রাখতে পারেনি তার স্রষ্টা। রক্ত জমবে কী করে? তা ছাড়াও প্রোটোপ্লাজম থেকেই তো তার সব কোষ বানানো হয়েছে। হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, ফসফরাস, ক্লোরিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আর আয়রন— এইসব নিয়েই প্রোটোপ্লাজম। কিন্তু কী অনুপাতে, তা বিজ্ঞান এখনও জানেনি। তার স্রষ্টাও জানে না। তাই সংশ্লেষিত মানব। অ্যানড্রয়েড। আসল মানুষের সঙ্গে তার তফাত তো থাকবেই।

আর এই কথাটা ভাবলেই বুক দশহাত হয়ে যায় অ্যানড্রয়েডের। মানুষ জাতটার চেয়ে সে এক ধাপ এগিয়ে আছে, সে অতিমানুষ।

দেখে নিল হাতে সেট করা থার্মোমিটার, এখন ৯১.৯° ফারেনহাইট।

রিডিংটা জানিয়ে ছিল স্রষ্টাকে। এই অর্ডার অ্যানড্রয়েডের মাথায় গেঁথে দিয়েছে স্রষ্টা। যেখানেই থাকুক, সেইখানকার টেম্পারেচার যেন জানিয়ে রাখে।

কিন্তু কোথায় আছে, তা ফাঁস করল না। সে এখন স্বাধীন। স্বাধীনই থাকবে।

বন আর পাহাড় এখন পেছনে। অ্যানড্রয়েড বসে রয়েছে পুরুলিয়া স্টেশনের একটা বেঞ্চিতে।

পাশে বসে স্যুটেড-বুটেড এক ভদ্রলোক। মধ্যবয়সি। হাতে ব্রিফকেস। চিন্তামগ্ন।

অ্যানড্রয়েড তার চিন্তা ধরে ফেলেছে। তার মগজের কোষে এই ক্ষমতা আপনা থেকেই জেগে উঠেছে! মানুষের চিন্তা সে ধরতে পারে। মানুষের মগজটা ঠিক যেন একটা রেডিয়ো ট্রান্সমিটার। তার নিজের মগজে রয়েছে রেডিয়ো রিসিভার।

তাই সে শুনতে পাচ্ছে পাশের লোকটার ব্রেনের চিন্তা, 'চিঠির মধ্যে সইখানা তো পেয়েছি। চেকবই থেকে একখানা চেকও সরিয়েছি। এখন যদি সইখানা জাল করে নিতে পারতাম— পঁচিশ লাখ একচোটে মেরে দিতাম। কিন্তু ওই জট পাকানো সই জাল করা কি চাট্টিখানি কথা!'

প্রত্যেকটা চিন্তা-কথা গমগমিয়ে শোনা গেছিল অ্যানড্রয়েডের মাথার মধ্যে। লোকটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, 'চেক দিন, সইটা দেখান— জাল করে দিচ্ছি।'

লোকটা মনে হল ভিরমি খাবে। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে। দুই চোখ বুঝি ঠেলে বেরিয়ে আসবে।

অ্যানড্রয়েড বললে, 'আমি মানুষ নই— অ্যানড্রয়েড। মানুষে যা পারে না, আমি তা পারি।'

লোকটা বললে, 'মেশিন?'

'না, অ্যানড্রয়েড। মেশিন তো রোবট। আমি রোবট নই। সিন্থেটিক টিস্যু আর কেমিক্যাল দিয়ে আমাকে গড়া হয়েছে। আমি সব পারি।'

'জাল-জোচ্চুরি?'

'অ্যানড্রয়েড শুধু কাজ করে। মানুষের ইচ্ছে তামিল করে। ন্যায়-অন্যায় বোঝার ক্ষমতা তার ব্রেনে ঢোকানো হয়নি। কুকুর আমার গন্ধ পায় না। আমি অতিমানব।'

লোকটা এবার ফ্যাকাশে মেরে গেছে, 'পাহাড়ে একটা মেয়ে মরেছে। খুনির গায়ের গন্ধ কুকুর পায়নি। তুমিই নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি।'

লোকটা ঘাবড়ে গেছে, 'মারলে কেন?'

'কৌতূহল। মানুষের সঙ্গে অ্যানড্রয়েডের তফাত দেখার ইচ্ছে হয়েছিল।'

'ও,' বলে লোকটা একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তফাত আছে বই কী. জটিল সই জাল করতে মানুষে ভয় পায়, তুমি পাচ্ছ না। আমার মনের কথা কেউ শুনতে পায় না, তুমি পাচ্ছ। কিন্তু সই জাল করা অন্যায়। কেন করবে?'

'ন্যায়-অন্যায় আমি বুঝি না। ওসব মানুষের নীতি। এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে করছে, তাই আরও একটা খারাপ কাজ করব।'

লোকটা হাঁ করে চেয়ে রইল অ্যানড্রয়েডের দিকে। তারপর ফিসফিস করে বললে, 'কেন?'

থার্মোমিটার দেখে নিল অ্যানড্রয়েড। ৯২ ডিগ্রি ফারেনহাইট। বললে, 'আমার ইচ্ছে।'

'তবে করো।'

হুবহু সই করে দিল চেকে।

লোকটা গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'হুবহু এক! আশ্চর্য! কিন্তু এত টাকা তো অ্যাকাউন্ট-পেয়ি চেক হবে। বেয়ারার চেক হবে না। আমি ফেঁসে যাব।'

অ্যানড্রয়েড বললে, 'কী করলে ফাঁসবেন না? ওহো, আপনার ব্রেন তো জিজ্ঞেস করছে এ টি এম থেকে টাকা তুলতে আমি পারব কি না। পারব। আমি যে অ্যানড্রয়েড। মেশিনের চেয়ে সুপিরিয়র। কোন কি টিপলে এ টি এম টাকা বের করে দেবে, তা মেশিনের সামনে দাঁড়ালেই জেনে যাব। এমনকী কোডনাম্বারটাও বের করে নেব মালিকের ব্রেন থেকে।'

'তা হলে যাওয়া যাক হে মেশিনের সুপিরিয়র।'

একটু পরেই ব্যাঙ্কের এ টি এম থেকে নগদ পঁচিশ লাখ টাকা বেরিয়ে গেল।

ডক্টর মাথামোটা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের ঘরে। আমি তখন বসে ছিলাম।

কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'আবার একটা ফ্যাসাদে পড়েছি।'

প্রফেসর বললেন, 'পঁচিশ লাখ যে নিয়েছে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাগজের অফিসে গিয়ে সব বলে দিয়েছে। অ্যানড্রয়েডটা তা হলে আপনার হাতে তৈরি?'

'আজ্ঞে।' ধপ করে চেয়ারে বসলেন অশ্বত্থামা চেহারার ডক্টর মাথামোটা। অতীতে একবার প্রফেসর তাকে বাঁচিয়েছিলেন নস্যি শুঁকিয়ে। মহামেশিন বানিয়ে কী কাণ্ডটাই না করতে যাচ্ছিলেন! এখন আবার বানিয়েছেন অ্যানড্রয়েড। সে আবার মেশিনও নয়। আরও

এক ধাপ এগিয়ে। সিন্থেসিস করা মানুষ। কাগজ, টিভি, মিডিয়া গরম এই নিয়ে।

প্রফেসর ডক্টর মাথামোটাকে বললেন, 'আপনার কাছে রিমোট কন্ট্রোল আছে?'

'আছে। কিন্তু সে ব্যাটা সুইচ অফ করে রেখে দিয়েছে। ক্রাইমের পর ক্রাইম করে যাচ্ছে।'

'কেন করে যাচ্ছে? তাকে তো মানুষের সেবা করার জন্যে বানিয়েছিলেন?'

'তা তো বটেই। কিন্তু হতচ্ছাড়াটা হঠাৎ বিগড়ে গেল কেন বুঝতে পারছি না। বদমাশের ধাড়ি। একটা করে ক্রাইম করছে, আর আমাকে টেম্পারেচারটা জানিয়ে দিচ্ছে।'

'টেম্পারেচার! কী কী টেম্পারেচার জানিয়েছে?'

'একবার ৯১.৯ আর একবার ৯২ ডিগ্রি ফারেনহাইট।'

'বটে! বটে! ফাজলামি করছে। আপনি স্রষ্টা, তাই ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টটা আপনাকে জানিয়ে রাখছে।'

'কী... কী ডিফেক্ট?'

'টেম্পারেটারটাই মেইন। ওই হাই টেম্পারেচারে অ্যানড্রয়েড শুধু ক্রাইম করতে চাইছে।'

'তা হলে এখন উপায়?'

'ওকে চেক করাটাই একমাত্র উপায়।'

'কী করে করব?'

'আবার যখন টেম্পারেটার জানাবে নেক্সট ক্রাইমের সময়... তখন তো যোগাযোগের চ্যানেল ওপেন রাখবে?'

'হ্যাঁ, তা বটে।'

'একই সময়ে রিমোট দিয়ে ওর টেম্পারেচার সেনসেশন ব্লান্ট করে দিন। তা হলে আর ক্রাইম করবে না।'

ঠিক এই সময়ে বিপ... বিপ করে উঠেছিল ডক্টর মাথামোটার বুকপকেটের রিমোট কন্ট্রোল। ঝাঁ করে যন্ত্রটা টেনে নিয়েই পটাপট কয়েকটা বোতাম টিপে দিলেন ডক্টর মাথামোটা।

যন্ত্র পকেটে রাখলেন। কপালের ঘাম মুছলেন। বললেন, 'বাব্বা! আর অ্যানড্রয়েড বানাব না।'

নীরস স্বরে প্রফেসর বললেন, 'ওর টেম্পারেচার সেনসেশন আর নেই তো?'

'বিগড়ে দিলাম টিস্যুটা। ভগবানের তৈরি টিস্যু আর মানুষের হাতে তৈরি টিস্যু কখনও এক হয়? সুতরাং—'

'আর না।' বললেন প্রফেসর।

না, ডক্টর মাথামোটা আর অ্যানড্রয়েড বানাননি। তবে যেটাকে বানিয়েছেন, সেটার সঙ্গে যদি আলাপ হয়, খবরটা ঝটপট যেন আসে।

মূর্তিমান বিপদকে খাঁচায় রাখা দরকার।

পরগাছা

অর্ধেক মানবী সে, অর্ধেক অচেনা!

বৈশাখীর সঙ্গে যে এইভাবে এতবছর পর আমার দেখা হবে, ভাবতেও পারিনি।

বৈশাখী আমার ভাগনি। মানুষমাত্র মামাদের মতন হয়, সংস্কৃত ভাষায় এইরকম একটা কথা আছে। বৈশাখীও ঠিক আমার মতন। মানে ওর মামার মতন। সবেধন নীলমণি একটাই তো মামা। আমারও ভাগনি বলতে এই বৈশাখী।

মামা-ভাগনির বয়েসে কিন্তু খুব একটা ফারাক নেই। আমি ওর চাইতে পাঁচ বছরের বড়। কিন্তু বৈশাখীর বরাবরের দাবি ছিল, ওই পাঁচ বছরটা নাকি কোনও ব্যাপারই নয়। মেয়েরা নাকি ছেলেদের চাইতে সব সময়ে এক কদম এগিয়ে থাকে। সুতরাং, পাঁচ বছর বয়সের অ্যাডভানটেজ সে আমাকে দেবে না। আমরা সমান সমান।

তাই সই। সেই ছোট্টবেলা থেকে আমরা ঝগড়া মারামারি ভাব আর আড়ি করেই বড় হয়েছি। আমার দু'বছর বয়স থেকে দিদি আমাকে মানুষ করেছে। আমার বাবা মা কেউ নেই— সব পরলোকে আমার দু'বছর বয়স থেকেই। তারপর এল বৈশাখী। দিদির কোল নিয়ে দু'জনে লড়েছি। দিদি খালি সস্নেহ চোখে তাকিয়ে থেকেছে।

তারপর একদিন ভগবান জামাইবাবুকে টেনে নিলেন। বৈশাখী তখন লন্ডনে। মেয়ে-ডাক্তার হচ্ছে। আমি কলকাতায়। ছেলে-ডাক্তার হয়ে গেছি।

আমি বোম্বাই চলে গেলাম একটা ওষুধ তৈরির কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে। ঘুরে ঘুরে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নয়। সে তো ফেরিওয়ালার কাজ। আমার কাজ ছিল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে। আসলে আমার জানবার স্পৃহাটা ছিল প্রবল। গবেষণাগারে গিয়ে সেই সুযোগটা পেয়েছিলাম। কত রকমের রোগ, কত রকমের চিকিৎসা, কত রকমের জীবাণু— কেউ মানুষের শত্রু, কেউ মানুষের বন্ধু।

কিন্তু যাদের কথা আমি লিখতে বসেছি, তারা জীবাণু নয়, ফাঙ্গাস নয়। তা হলে তারা কী? তাদেরকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীর কোনও ল্যাবরেটরিতে কোনও গবেষণা হয়নি। সে সুযোগই তারা দেয়নি। তাদের দেখে চেনা যায় না— চেনবার আগেই তাদের খপ্পরে চলে যেতে হয়। তখন আর কন্বার কিছু থাকে না— নিজেদের বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া।

বেশ বুঝেছি, খুব উত্তেজিত অবস্থায় লোমহর্ষক এই কাহিনি লিখতে বসেছি। পাকা লেখক হলে এ ভুল করতাম না, গুছিয়ে শুরু করতাম, গুছিয়ে শেষ করতাম। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

শুরু করলাম বৈশাখীকে দিয়ে, চলে গেলাম নামহীন আতঙ্কদের শিহরন জাগানো কথামালায়।

আমি যখন বোম্বাইয়ে, বৈশাখী তখন বিলেতের পড়া শেষ করে চলে এল ইন্ডিয়ায়। তারপর কখনও ব্যাঙ্গালোর, কখনও মাদ্রাজ, কখনও হায়দ্রাবাদ— নানা নামী শহরের নামী নার্সিংহোমের ডাকে সাড়া দিয়ে যেত বিনা দ্বিধায়। ভাল মেয়ে-ডাক্তারের আকাল এ-দেশে এখনও বেশ রয়েছে। বৈশাখীর বিলিতি ডিগ্রি আর মিষ্টি ব্যবহারের ফলে তাই ডাক আসত ভারতের নানা জায়গা থেকে। দিদি থাকত কলকাতার বাড়িতে। তারপর একদিন শুনলাম, দিদিই চিঠি লিখে জানাল, নাগাল্যান্ড থেকে ডাক এসেছে। এবার আর ওকে নাকি ছাড়া হবে না। বৈশাখীর মতন মিশুকে মেয়ে-ডাক্তারের খুব দরকার নাগাল্যান্ডে— ওকে ওখানেই থেকে যেতে হবে। তাই কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। মা-মেয়ে একসঙ্গেই থাকবে।

এই চিঠিটা পাওয়ার পর আমাকেও বোম্বাই ছেড়ে চলে যেতে হল ব্যাঙ্গালোরে। ফলে, দিদির চিঠি আর পাইনি। আমিও মা-মেয়েকে চিঠি লিখতে পারিনি ওদের ঠিকানা না-জানায়।

এরকম ঘটনা জীবনে প্রায় ঘটে। খুব কাছের লোক হঠাৎ যেন হারিয়ে যায়— মনের মধ্যে স্মৃতিটুকু শুধু থেকে যায়। কাজের চাপে হদিশ নেওয়ার খেয়ালও থাকে না।

দোষ আমারও আছে। গবেষণায় বুঁদ হয়ে গিয়ে বিশ্ব-সংসার বিস্মৃত হয়েছিলাম। ব্যাঙ্গালোরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওষধি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার জন্যে। ওখান থেকেই যেতাম পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গভীর অরণ্যে। গাছপালা মানুষের উপকার করছে, ক্ষতিও করছে। সবই করছে কিন্তু আশ্চর্য পন্থায়। ২০০০ সাল থেকে পৃথিবীর চেহারাটাই তো পালটে দেওয়া হবে উদ্ভিদের জিন-এর সঙ্গে প্রাণীর জিন-এর সমন্বয় ঘটিয়ে। আসছে বায়োটেক শতাব্দী। লাইফ-ইঞ্জিনিয়ারদের অবিশ্বাস্য যুগ।

নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচলে পাঠানো হয়েছিল আমাকে এই কারণেই। ওখানকার গভীর জঙ্গলে আজও রয়েছে অনাবিষ্কৃত অনেক উদ্ভিদ, যাদের জিন নিয়ে প্রাণীদেহে সংস্থাপন করতে হবে এমন প্রক্রিয়ায় যার ফলে মানুষ হবে নীরোগ, হবে দীর্ঘায়ু।

নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাকে। একে তো বিয়ে-থা করিনি, তার ওপর গবেষণা-পাগল ডাক্তার। ফলে কোম্পানি আমাকে দেদার টাকা আর ঢালাও ক্ষমতা দিয়েছিল। আমি যেখানে যেতাম, সেখানেই বাংলো সাজিয়ে বসে একাধারে গবেষণা আর ডাক্তারি করতাম। শেষেরটা করতাম গবেষণার অঙ্গ হিসাবে। যত মানুষের সঙ্গে মেশা যায়, খবর তত হেঁটে হেঁটে আমার কাছে চলে আসে।

এইভাবেই একদিন এল বৈশাখী— রোগ নিয়ে নয়, অদ্ভুত একটা সমস্যা নিয়ে।

দিদিকে নাকি আর দিদি বলে মনে হচ্ছে না— অন্য কেউ!

চিনি চিনি মনে হয়— কিন্তু চিনি না!

সেইরকম উচ্ছল প্রাণবন্ত টগবগে বৈশাখী কিন্তু সেদিন আমার চেম্বারের কলিং বেল বাজায়নি। বেল বাজাতেই আমার নার্স গিয়ে ওকে ভিজিটর্স রুমে বসিয়ে ওর কার্ড এনে আমার টেবিলে রেখেছিল। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। বৈশাখী বাগচী! পৃথিবীতে একজন বৈশাখী বাগচীকেই আমি চিনি— আমার ভাগনি। কিন্তু নাগাল্যান্ডের এই প্রত্যন্ত শহরে অকস্মাৎ তার আবির্ভাব ঘটবে কেন?

আমার অর্ডার পেয়েই নার্স ওকে নিয়ে এসেছিল আমার চেম্বারে।

বৈশাখীই বটে। আমার ভাগনি বৈশাখী। আমার ছেলেবেলা আর কৈশোরের সঙ্গিনী বৈশাখী। এখন আরও ঝকঝকে আর খাপ-খোলা সূচিমুখ লড়াকু তরবারির মতন চেহারাটা হয়েছে। জিনস-এর জামাপ্যান্ট আর বয়কাট চুলের জন্যে সেটা আরও বেশি করে মনে হচ্ছে।

কিন্তু ওর কৃষ্ণ-স্ফটিক চক্ষুর সেই দ্যুতি কোথায় গেল? এত নিষ্প্রভ কেন? চোখের তারায় এত বিষাদ কেন? এত বছর পরে আমাকে দেখে হাসতে গিয়ে সে হাসিকে কাষ্ঠহাসি করে ফেলল কেন?

ধানাই পানাই না-করে সোজা চলে এল কাজের কথায়, 'মামা, তোমার খুব পসার জমেছে। কে একটা নতুন ডাক্তার রুগিদের কাছ থেকে বনজঙ্গল গাছপালার খবর জানতে চাইছে শুনে স্বাভাবিক কৌতূহলে তোমার নামটা জোগাড় করেছিলাম। রুদ্রাক্ষ ভাদুড়ি তো একজনই আছে এই পৃথিবীতে। মামা, তুমি এখানে এলে, আমাকে জানালে না?

আমিও পালটা ঝাড় দিলাম তুমুল উল্লাসে, 'তুই কি জানিয়েছিলি তোরা এখানে আছিস?'

মুখটা শুকিয়েই ছিল বৈশাখীর— আরও একটু শুকিয়ে গেল আমার আক্রমণে।

বললে, 'কী করি বলো। আমাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলছে এই পাহাড়ি অঞ্চলে। সব জায়গাতেই ফারনিশড কোয়ার্টার আর চেম্বার। বাঙালি মেয়ে ডাক্তারের চাহিদা এখানকার মেয়েদের কাছে খুব বেশি।... তা তুমি এখানে কী রহস্য ভেদ করতে এসেছ? তুমি যে সাধারণ ডাক্তার নও— সেটা জেনেছি!

মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি অসাধারণ ডাক্তার। খোদার ওপর খোদকারি করতে এসেছি।'

'তার মানে?'

'আমি লাইফ-ইঞ্জিনিয়ার।'

চোখ বড় বড় করে বৈশাখী কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তড়বড় করে বললে, 'তুমি বায়ো-টেকনোলজি নিয়ে রিসার্চ করছ?'

'জি হ্যাঁ, ভাগনি। কর্পোরেট স্পাইদের ভয়ে এর বেশি এখন বলা যাবে না। কিন্তু তোর মুখ অত শুকনো কেন? কী অসুখ হয়েছে? মনের অসুখ মনে হচ্ছে?'

ছেলেবেলার মতনই বৈশাখী ওর শরীরের কঙ্কালটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল।

চাহনি তো অস্বাভাবিক নয়! তবে এত মনমরা কেন?

পর মুহূর্তেই কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে। জলে ভরে উঠল দুই চোখ।

লক্ষণ তো ভাল নয়। মশকরা ছেড়ে প্রফেশন্যাল সুরে বললাম, 'পাশেই টয়লেট রুম। চোখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আয়। কফি আনতে বলছি। প্রবলেম নিয়ে এসেছিস দেখছি— এমনই প্রবলেম যা বৈশাখী বাগচীও সলভ করতে পারছে না।... যা... যা।'

বৈশাখী চোখ মুছতে মুছতে গেল টয়লেট রুমে। আমি নার্সকে ডেকে দু'কাপ স্ট্রং কফি আনতে বললাম, আর কোনও পেশেন্ট আজ দেখব না— তাও বলে দিলাম।

চোখমুখ অনেকটা ঝকঝকে করে নিয়ে বৈশাখী এসে বসল লেদার চেয়ারে— আমি বসলাম ওর সামনের সুইভেল চেয়ারে। কফির কাপ হাতে তুলে দিয়ে সন্ধানী চোখে চেয়ে রইলাম ওর চোখের মণির মধ্যে ওর ব্রেনের ভেতরে।

নাঃ, গোলযোগ কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

সকৌতুকে আমার সূচ্যগ্র চাহনি নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিল বৈশাখী। কফির কাপ হাতে রেখেই বললে, 'মামা তুমি গোয়েন্দা, না, ডাক্তার? ডাক্তারি আমিও করি, খেয়াল রেখো। যা ভাবছ, তা নয়। আমার মাথা খারাপ হয়নি।'

'তবে কী হয়েছে?'

জবাব না-দিয়ে কফিতে চুমুক দেওয়া নিয়ে যেন ভীষণ ব্যস্ত হয়ে গেল বৈশাখী।

ওর ভেতরে যে একটা ঝড় উঠেছে, তা বুঝলাম। সামলাচ্ছে নিজেকে।

তারপর বললে আচমকা, 'মামা, আমার মাথা খারাপ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে?'

'এক্কেবারে সাউন্ড ব্রেন। ব্যাপারটা কী?'

'সেটা বলে ঠিক বোঝাতে পারব না। বললেও বিশ্বাস করবে না। নিজের চোখে দেখা দরকার।'

'কী দেখা দরকার?'

'আমার মাকে।'

'দিদিকে? কী হয়েছে দিদির?'

'অসুখ অন্তত হয়নি। দিব্বি সুস্থ।'

'তা হলে? কী যে হেঁয়ালি করিস।'

ফের চোখ ছলছল করে ওঠে বৈশাখীর, 'মামা, মা আর নেই।'

ঘুরন্ত চেয়ারে সিধে হয়ে বসলাম, 'এই যে বললি মাকে দেখা দরকার?'

'এ-মা সে-মা নয়। আমার আসল মা আর নেই।'

'আসল মা! মায়ের নকল হয়?'

'হয়। হয়েছে। আমার এই মা নকল মা।'

'ছদ্মবেশী?'

'তার চাইতেও বেশি। অবিকল আর এক মা। বাইরেটা এক। ভেতরটা নয়। ভেতরের মা আর নেই। এ এক ভণ্ড মা। প্রতারক মা।'

এই কথা শোনবার পর আর কফিতে চুমুক দেওয়া যায়? সন্দিগ্ধ চোখে ফের চাইতে হল

ভাগনির দিকে। ভাবলাম, জটিল মানসিক রোগ। এ-শহরের বিখ্যাত মনের ডাক্তার তারিণী পোদ্দারকে দিয়ে একবার দেখানো দরকার।

বৈশাখী আমার চোখ দেখে আমার মনের কথা টের পেয়ে গেছিল। বললে আহত স্বরে, 'বিশ্বাস করলে না? ওই জন্যেই তো বললাম, নিজের মায়ের পেটের বড় বোনকে একবার দেখে এসো। রক্তের সম্পর্ক— আমার না হয় মাথার গোলমাল হতে পারে, তোমার তো হয়নি।'

'লেকচার থামা।' কফির কাপটা ফের তুলে নিলাম: 'দিদিকে দেখতে ঠিক দিদির মতন— ঠিক তো?'

'প্রতিটি বডি-মিলিমিটারে এক রকম; আর কী বলব?'

'চোখের ভুল? মানে, ডিলিউশন নয় তো?'

'মামা, অনেক মেহনত করে বিলেত থেকে ডিগ্রিটা এনেছি।'

আপন মনে বললাম, 'আমার তো একটাই দিদি— যমজ তো নেই।'

'যমজ দেখলেও তফাত ধরা যায়। এ জিনিস তার চাইতেও বেশি।'

'জিনিস!'

'তা ছাড়া আর কী বলব? কথাবার্তা, চলাফেরা, এমনকী জলঘাঁটা আর সব কিছু পরিষ্কার রাখার বাতিক— সব একরকম। আমার মাকে আমি চিনব না? কিন্তু তাকে মা বলব না। অন্য কেউ... অন্য কেউ মা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

বলতে বলতে ফের কেঁদে ফেলল বৈশাখী।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ওকে অবিশ্বাস করতে পারছি না, সে এক বিড়ম্বনা। মোমের পুতুল নয় বৈশাখী। আমার ভাগনি আমারই মতন। ছেলেবেলায় ওকে আয়রনম্যান বলে খেপাতাম। সেই মেয়ে যখন কথায় কথায় কেঁদে ফেলছে, তখন নিশ্চয় অদ্ভুত ভয়ংকর কিছু একটা ঘটেছে।

দেখা দরকার। নিজে গিয়ে দেখা দরকার। বললাম, 'চল, দিদিকে চমকে দিয়ে আসি।... ভাল কথা, দিদি কি জানে তুই আমার কাছে এসেছিস?'

'না।'

'দিদি কি জানে, আমি এই শহরে প্র্যাকটিস আর রিসার্চ করছি?'

'না। আমিই বলিনি। বলতে ইচ্ছে হয়নি, কাকে বলব? ও তো আমার মা নয়।' ফস করে বলে উঠল বৈশাখী, 'দানোয়-টানোয় পায়নি তো?'

'মানে, অন্যের প্রেতাত্মা শরীর দখল করেছে? সে তো শুনেছি মানুষ মরে গেলে হয়। মড়াকে দানোয় পায়। যদিও স্রেফ গল্প— সত্যি নয়।'

'প্রেতাবেশ ঘটেনি তো?'

'প্রেতচক্রে যা হয়? কী যে বলিস। এসব কুসংস্কার যদি সত্যি হত, তা হলে আমার ওই কঙ্কাল দুটো কোনকালে খটমট করে কাচের আলমারি থেকে বেরিয়ে আসত।

'কোন কঙ্কাল দুটো?'

'আয়, দেখাচ্ছি।' বলে, পাশের ছোট্ট ঘরের দরজা খুললাম। এখানে আমার জামাকাপড়

আর টুকিটাকি ডাক্তারি সরঞ্জাম থাকে। আর আছে চারদিকে কাচ দিয়ে তৈরি একটা মস্ত আলমারি। ভেতরে রয়েছে পাশাপাশি দুটো পালিশ করা ঝকঝকে কঙ্কাল। একটা পুরুষ কঙ্কাল, আর একটা মেয়ে কঙ্কাল। নাগাল্যান্ড দেশটা নৃমুণ্ডশিকারিদের জন্য কুখ্যাত ছিল একসময়ে। গোপন গবেষণার গুঁতোয় আমাকে এমন সব গহন অঞ্চলে যেতে হয়, যে সব জায়গায় হেডহান্টারদের পূর্বপুরুষরা সোল্লাসে নৃমুণ্ড শিকার করে গেছে একসময়ে। বংশধররা শিক্ষায় দীক্ষায় অনেক এগিয়ে গেলেও খবর রাখে কোথায় গেলে মুণ্ডচ্যুত অথবা মুণ্ডসমেত নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে। এদেরই দাক্ষিণ্যে সংগ্রহ করেছি এই দুটি কঙ্কাল। একজনের নাম দিয়েছি, ভূত। পাশের একটু ছোট্ট মেয়ে-কঙ্কালটাকে বলি পেতনি।

মনের মধ্যে এত দুশ্চিন্তা নিয়েও ভূত আর পেতনিকে দেখে হেসে ফেলল বৈশাখী।

'মামা, তোমার বিকট আইডিয়ার ব্যায়রাম দেখছি এখনও যায়নি।'

'সেই জন্যেই তো এই বিকট গবেষণায় নেমেছি। লাইফ-ইঞ্জিনিয়ার যদি লাইফ এনে না দিতে পারে প্রাণহীন কঙ্কালে—'

আঁতকে উঠল বৈশাখী, 'কী সর্বনাশ! তুমি কি কঙ্কাল জাগানোর গবেষণায় নেমেছ নাকি?'

'আরে না। কঙ্কাল কি আর জাগে? মরা হাড়ে কি মাংস লাগে? কিন্তু কঙ্কাল পোষা একটা বাতিক— সবসময়ে মনে রাখতে পারি, এই হচ্ছে আমার শেষ পরিণতি।'

বলে, ভূত-কঙ্কালের পালিশ করা ব্র্যাকিসেফালিক মাথায় একটু হাত বুলিয়ে নিলাম।

যন্ত্রের মতন হাসি হাসে— কিন্তু যন্ত্র নয়!

আমার নেপচুন ব্লু কালারের '৫৮ মডেলের ফিয়াট গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম বৈশাখীর বাংলোর সামনে। গাড়ির মধ্যে বসেই দেখলাম, বাগানে পায়চারি করছে আমার দিদি।

যে আমাকে মায়ের মতন মানুষ করেছে— সেই দিদি।

এ-অঞ্চলের বাড়িগুলো গায়ে গায়ে লাগানো নয়। ফাঁকা ফাঁকা জায়গায়। বাড়ি ঘিরে বাগান। চারপাশেই রাস্তা। আমার গাড়ি বাড়ির পেছন থেকে পাশ ঘুরে সামনের ফটকে আসবার আগেই দেখেছিলাম দিদিকে, ফুলগাছগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে হাঁটছে।

গাড়ি গেটের সামনে এসে যেতেই থমকে দাঁড়াল দিদি। চোখ চলে এল গাড়ির দিকে, পলকের জন্যে চেয়ে রইল আমার দিকে। কেননা আমিও গাড়ির কাচ-নামানো জানলা দিয়ে চেয়ে আছি দিদির দিকে।

দিদিই বটে শুধু যা বয়স বেড়েছে। চুল সাদা হয়েছে। চোখের চশমার লেন্স পুরু হয়েছে। শিরদাঁড়া তেমন সিধে আর নেই।

কিন্তু আমারই দিদি।

দিদিও এক পলকের জন্যে চেয়েই চিনে ফেলল মায়ের পেটের ভাইকে— যাকে শেষ দেখেছিল বহু বছর আগে।

হাসল। সেই হাসি। গালে টোল। ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত কোণ থেকে ভাঙা। ইটের পাঁজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভেঙেছিল দাঁতটা।

হেসে বললে সেই আগের মতন গলায়, 'বাব্বা! ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর— কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন বাপু পকেটকাটা চোর!'

আমি তেড়েমেড়ে গাড়ির মধ্যে থেকেই বললাম, 'আমি পকেট মারিনি।'

ছেলেবেলার মজার সেই খেলাটা দিদিও ভোলেনি, আমিও ভুলিনি। আমার জামাইবাবু ছিল খুব রগুড়ে মানুষ। উদ্ভট উদ্ভট খেলা আবিষ্কার করে আমাকে আর বৈশাখীকে মাতিয়ে রাখত। একটা খেলা আবিষ্কার করেছিল— পকেটমার খেলা। একটা খড়ের পুতুলের গায়ে জামাকাপড় পরিয়ে ঝুলিয়ে দিত কড়িকাঠ থেকে। তার সারা গায়ে ঝুলত ছোট ছোট ঘণ্টা। পুজো করার সময়ে যে ঘণ্টা নাড়া হয়— সেই ঘণ্টা। পুতুলের পকেটের মধ্যে থাকত লজেন্স। জামাইবাবু পুতুল দুলিয়ে দিত— ঘণ্টাগুলো বাজত। তারপর পুতুল যখন স্থির হয়ে যেত, আমাকে আর বৈশাখীকে বলত, 'যা, পকেট মেরে আয়, ঘণ্টা না-বাজে।'

তা কি সম্ভব? বৈশাখী পকেট মারতে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ফেলেছিল। আমি কিন্তু ঘণ্টা না-বাজিয়ে স্রেফ দু'আঙুল দিয়ে পকেট মেরে দিয়েছিলাম।

সেই থেকে দিদি আর জামাইবাবু আমাকে খেপিয়ে গেছে— ভূতের মতন চেহারা যেমন ইত্যাদি।

এত বছর আগের সেই কথা দিদির মনে আছে। এই দিদি আমারই দিদি। নিঃসন্দেহে।

কিন্তু বৈশাখী তো তা বলছে না।

গাড়িতে আমার পাশেই কাঠ হয়ে বসে ছিল বৈশাখী। আমি যখন রুখে উঠলাম, ও তখন হেসে ফেলল। কিন্তু হাসিটা যান্ত্রিক— প্রাণবন্ত নয়।

এইবার উলটো সন্দেহ হল আমার।

বৈশাখী কি আদৌ সুস্থ?

এ-মা সে-মা নয়

মাঝখানে পনেরোটা বছরের ব্যবধান কম নয়। অথচ বৈশাখী, আমি, দিদি প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনতে পারছি।

না, না। ভুল বললাম। বৈশাখী নিজের মাকে শুধু চিনতে পারছে না!

গাড়ি থেকে নেমে এলাম। দিদি ঠিক আগের দিনের মতোই আমার চুলগুলো টেনে দিয়ে বললে, 'কদমছাঁট চুল ছাঁটতে বলে বলে মুখে ফেনা উঠে গেল। যাত্রাদলে নাম লেখালেই পারিস।'

সেই দিদি! সেই রকম বকুনি! একই সস্নেহ চাহনি!

বললাম, 'পড়ন্ত রোদে বেড়ানোর অভ্যোসটা আজও পালটাওনি?'

দিদি শুধু হাসল। পনেরো বছর পর আমাকে দেখার আনন্দে মশগুল হয়ে রইল। আমি

বললাম, 'আমার পা টনটন করছে। ভেতরে যাচ্ছি। তুমি এসো তাড়াতাড়ি।'

টোল ফেলা গালে হাসি হাসি মুখে আমার চুলগুলো আর একবার টেনে ছেড়ে দিল দিদি।

ইমোশন-টিমোশন, নেই, বালাই-তফাত কেবল ওই একটাই!

একতলার চওড়া বারান্দায় পাতা চেয়ারে বসে বাগানের দিকে চেয়ে রইলাম। ফুলগাছগুলোর তদারকি করছে দিদি আপনমনে। ঠিক আগের মতন। ফুলগাছ প্রাণের চাইতে প্রিয়।

বৈশাখী আমার পাশের চেয়ারে বসে প্রশ্ন-ভরা চোখে চেয়ে ছিল আমার দিকে।

আচমকা খুব আস্তে বলে উঠল, 'কী বুঝলে, মামা?'

'আমার দিদি— তোর মা, একদম খাঁটি।'

'খাঁটি নয়।' তর্কের সুরে নয়, ষোলোআনা বিশ্বাসের সুরে বললে বৈশাখী।

'জানছিস কী করে?' আমার প্রশ্ন, দিদির দিকে চোখ রেখে : 'তফাতটা কোথায়?'

'প্রশ্নটা সেইখানেই, মামা— তফাতটা কোথায়? তফাত কোথাও নেই। তুমিও ধরতে পারলে না। পুরনো দিনের সেই বাতিক, সেই কথার ঢঙ, অস্থির হলে আঙুল মটকানোর মুদ্রাদোষ— সব আছে, আমি চেকআপ করেছি। ছেলেবেলায় আমাকে যে সব গান শোনাত ঘুম পাড়ানোর জন্যে— সমস্ত মনে আছে মায়ের।'

'তবুও এক নয়?'

'না।'

'রোগ যতই জটিল হোক তার একটা শেকড় থাকে। তুই ডাক্তার। সেই শেকড়টা খুঁজে পেলি না?'

'পেয়েছি, মামা।'

'কী সেটা?' এবার ঝুঁকে বসলাম। চোখ রয়েছে বাগানে দিদির দিকে— ফুলগাছ নিয়ে যে তন্ময় হয়ে রয়েছে। জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর থেকেই দিদির এই বাতিকটা দেখা দিয়েছিল— ফুলগাছ চর্চা।

বৈশাখীও চেয়ে ছিল ওর মায়ের দিকে। আস্তে বললে, 'মা ফুলগাছ দেখছে বটে, কিন্তু চাহনিটা লক্ষ করো।'

'এতদূর থেকে—'

'ধরতে পারছ না। তা হলে আমি বলছি। চাহনির মধ্যে আবেগ নেই।'

'আবেগ?'

'আগে যখন ফুলের পর ফুল দেখে যেত, চোখের মধ্যে যেন একটা ঘোর লেগে থাকত— একটা ভাবালুতা— আবেগ। এখন তা থাকে না। থাকে তার অভিনয়, ভান করে ফুল খুব প্রিয়। আসলে দেখাতে চায়— পালটায়নি। কিন্তু মেয়ের চোখে ধুলো দেওয়া যায়

না। মামা, তোমার দিকেও তো স্নেহ-ভরা চোখে তাকিয়েছিল, তুমি কিন্তু ধরতে পারলে না।'

'কী ধরতে পারলাম না?'

'চাহনির গভীরতা।'

'মানে?'

'আবেগ। যেখানে আবেগ, সেখানে চাহনির তল থাকে না। ছেলেবেলার কথা বলার সময়ে এই এখনকার মা যখন স্নেহ-থইথই চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে— আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, এ স্নেহ মেকি। ভান দেখানো হচ্ছে। কারণ, এর মধ্যে ইমোশন নেই।'

'ইমোশন?'

'হ্যাঁ, মামা, ইমোশন। মা যখন তাকায় আমার দিকে তখনই বুঝতে পারি— অতীতের প্রতিটি ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রেখেছে, কিন্তু ইমোশন নেই। স্মৃতি অটুট— কিন্তু সেই আবেগ নেই। গলার আওয়াজ, মুদ্রাদোষ, হাসি— সব এক, হুবহু এক, কিন্তু ফিলিং নেই। আর কথা বলব না। মা সন্দেহ করছে। আড়চোখে তাকাচ্ছে। তুমি এখন যাও।'

বলতে বলতে, বৈশাখীর চোখে জল এসে গেল।

আমি দোটানায় পড়লাম। এতদিন পরে দেখা, দিদির হাতে খেয়ে যাওয়া উচিত। নইলে দিদি কষ্ট পাবে।

তক্ষুনি ভাবলাম, কষ্ট সত্যিই পায় কিনা পরখ করে নেওয়া যাক।

নেমে গেলাম বারান্দা থেকে। বৈশাখী এল না। মোরাম মাড়িয়ে যখন দিদির দিকে এগোচ্ছি, দিদি ঘুরে দাঁড়াল। সেই সস্নেহ দৃষ্টি, 'চলে যাচ্ছিস?'

'কাজ আছে যে।'

'খেয়ে যাবি না?'

'আর একদিন।'

বলে, হেসে চলে এলাম ফটকের বাইরে। গাড়িতে উঠে বলে ভাবলাম, বৈশাখী এই পয়েন্টটা সঠিক ধরেছে।

দিদির মধ্যে সেই আকুল আবেগ আর নেই। ভাই এতদিন পরে এল। না-খেয়ে চলে গেল, দিদির সঙ্গে একটুও হইহই করল না— কিন্তু তা নিয়ে দিদির ভেতরে কোথাও মোচড় মারেনি।

আবেগহীন দিদি! ভাবা যায়?

মন উচাটন হয়েছিল বলেই সটান চলে গেলাম নীল দত্তর চেম্বারে।

নীল এই শহরের নামী সাইকিয়াট্রিস্ট। মানুষের মনের খবর রাখে। মন আজও অজানা জগৎ। বৈশাখী, আমি আর দিদি— এই তিনজনের মধ্যে আসল মনোরুগি কে, তা জানবার জন্যেই গেলাম নীল দত্তর চিকিৎসালয়ে।

নীল আমার সমবয়সি। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, তাই নাগাল্যান্ডের এই প্রত্যন্ত শহরে এসে পসার জমিয়েছে।

আমি যখন গেলাম, তখন ওর চেম্বারে এক গুজরাতি ভদ্রমহিলা বসে ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে আঠারো বছর আগে, সেই স্বামীকে এখন আর স্বামী বলে মনে হচ্ছে না— অন্য কেউ।

ধীরস্থির ভাবে তাঁর বক্তব্য শুনল নীল। কথা দিল স্বামী পালটে গেছে কিনা, নিজে গিয়ে দেখে আসবে। তারপর তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এল চেম্বারের বাইরে।

ফিরে এসে বললে, 'রুদ্রাক্ষ, তোর কেস কী? আড্ডা মারতে নিশ্চয় আসিসনি। মুখ চোখ বেশ উদ্‌বিগ্ন। কী হয়েছে?

আমার নাম রুদ্রাক্ষ গুপ্ত। এতক্ষণ বলা হয়নি। আমার মাথার ঠিক নেই। কীভাবে যে এই কাহিনি লিখছি তা আমিই জানি।

বললাম আমার কেস।

টেবিলে আঙুলের টরে টক্কা বাজাতে বাজাতে নীল বললে, 'এই নিয়ে এগারোটা কেস শুনলাম।'

'এ-গা-রো-টা!'

'একই কাণ্ড। চেনা মানুষ হঠাৎ অচেনা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে অন্য একজন চেনা মানুষ সেজে ঠকাতে চাইছে। এ কি সম্ভব?

আমি কথা বলতে পারলাম না।

নীল বললে, 'তুই তো জানিস, রুদ্রাক্ষ, আমি অজানাকে জানতে চাই বলেই এই প্রফেশনে এসেছি। অনেক আশ্চর্য কেস ঘেঁটে যাচ্ছি। বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু এবার এই যে চেনা মানুষদের অচেনা হয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে, প্রায় মড়ক লাগার মতন— আমার তা ভাল লাগছে না। আমি থই পাচ্ছি না।'

'হাল ছেড়ে দিচ্ছিস?'

'সে বান্দা আমি নই। তবে এক্সপার্টকে খবর দিয়েছি।'

'কাকে?'

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে।'

আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। কেননা, আমার সন্দেহ হল পাগল ঘাঁটতে ঘাঁটতে নীল নিজেই পাগল হয়ে গেছে কিনা।

এই যে ভদ্রলোকের নাম করল নীল, তাঁকে আমি কস্মিনকালেও দেখিনি, কিন্তু তাঁর নাম শুনেছি এই নীল দত্তর কাছেই। ভদ্রলোক নাকি এক অদ্ভুতকর্মা বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। তাঁর কাণ্ডকারখানা সবই অবিশ্বাস্য, উদ্ভট এবং সৃষ্টিছাড়া। তাঁর এক অষ্টপ্রহরের চ্যালা আছে— ভয়ানক মারকুটে ছায়াসঙ্গী। সে নাকি আবার লেখক হয়েছে। প্রফেসরের আজগুবি কাহিনি কাঁচা হাতে লিখে কল্পবিজ্ঞানের আসর জমিয়ে রেখেছে। কোথাও কলকে না-পেলে বাঙালিরা সাহিত্যিক হয়— এই ধারণাটা আমার মাথার মধ্যে ছিল বলেই মনে করতাম দীননাথ নাথ— ওই ছায়াসঙ্গীর নাম, একটা বাজে লোক। কাজকর্ম না-করে জোয়ানি একটা ছেলে হাফ-ম্যাড একটা বৈজ্ঞানিকের চ্যালাগিরি করে বেড়ায়।

নীল কিন্তু দীননাথ বলতে অজ্ঞান। ছেলেটা নাকি মহা ডাকাবুকো। আর এই বৈজ্ঞানিক নাটবল্টু চক্র নাকি পৃথিবীবিখ্যাত পুরুষ— যেখানে নোবেলজয়ীরাও নাগাল পায় না, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র নাকি সেই রহস্যের কিনারা করে গোটা পৃথিবীর মানুষকে বাঁচিয়ে দেন।

যত্তোসব গাঁজা গল্প। নীল দত্ত এইসব বিশ্বাস করে, এইটাই ছিল আমার রাগ।

অথচ সেদিন নীলের কাছেই ছুটে গেলাম অব্যাখ্যাত এই প্রহেলিকার সমাধান খুঁজতে— চেনা মানুষকে, কাছের মানুষকে আর সেই মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। অন্য কেউ যেন তার মধ্যে ঢুকে বসে আছে। স্মৃতি অটুট রেখেছে, শুধু ইমোশনের বালাই রাখেনি।

কলকবজার ইমোশন থাকে না। যেমন, এ যুগের কম্পিউটার।

এরা তা হলে কারা?

সমাধান খুঁজতে এসে শুনলাম, আসরে অবতীর্ণ হচ্ছেন কিংবদন্তির নায়ক প্রফেসর নাটবল্টু চক্র!

অশরীরী কণা নিউট্রিনো নাকি নিমেষে নিমেষে ছুটে যাচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র। মানুষের চিন্তায় কী কণা আছে জানি না, কিন্তু পুঞ্জ পুঞ্জ চিন্তা যে নিমেষের মধ্যে মাথার মধ্যে খেলে যায়— তা জানি।

সেদিন সেই মুহূর্তেও তাই হয়েছিল। চোখের পলক ফেলবার আগেই এতগুলো চিন্তা-ঝলক আমার মস্তিষ্ক-গগনকে উদ্ভাসিত করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের তারায় নিশ্চয় তার আভাস জেগেছিল।

নীল দত্ত তাই আমার চোখে চোখ রেখে বলেছিল তৎক্ষণাৎ, 'মাই ডিয়ার রুদ্রাক্ষ গুপ্ত, আমি বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে চলি। এটা তো জানো?'

আমি চুপ করে রইলাম।

নীল বললে, 'অকারণে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে খবর পাঠাইনি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে।'

'অদ্ভুত!'

'বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা হয় না।'

'খুলে বলো।'

নীল মুখ খুলতে যাচ্ছে এমন সময়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের মধ্যে প্রথমে ঢুকল এক আখাম্বা জোয়ান। তার পেছনে তড়বড় করে এলেন এক বৃদ্ধ। মারকুটে চেহারার যুবকের পরনে লাল খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সাদা আলিগড় পায়জামা। মুখ, চোখ চেহারা, হাঁটার মধ্যে একটা ভিলেন-ভিলেন ভাব। কিন্তু বৃদ্ধর সর্বাঙ্গ থেকে বিকিরিত হচ্ছে যেন তাপসিক গরিমা। তাঁর পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। কিন্তু কাচের আড়ালে এমন একটা দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে যা দেখলেই মানুষটাকে সমীহ না-করে পারা যায় না। অন্য সবদিক থেকে তিনি নিপাট ভালমানুষ।

নীল দত্তর মতন চৌকস তুখোড় চালিয়াত মনোবিজ্ঞানীও সন্ত্রস্ত হল, সটান উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'আসুন, আসুন। এত তাড়াতাড়ি চলে আসবেন, ভাবতেও পারিনি।'

ভিলেন-ভিলেন টাইপের দাঙ্গাবাজ টাইপের জোয়ান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'এলাম তো জেটে, বাকিটা কপ্টারে— খরচের কথা ভাবলে কি এখন চলে? প্রফেসর তো আমার লাইফ হেল করে ছাড়ছেন। ব্যাপার কী? এত ভয় পাওয়ার পাত্র তো আপনি নন। সামথিং সিরিয়াস?'

'ভেরি সিরিয়াস।' কৃতার্থ স্বরে বলেই নীল তাকাল আমার দিকে, 'রুদ্রাক্ষ, যাঁদের কথা বলছিলাম।'

আমি আমতা আমতা গলায় বলে উঠেছিলাম, 'প্র... প্র...'

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, আর ইনি দীননাথ নাথ।'

অবজ্ঞার চোখে দীননাথ নাথ, মানে, ঘটোৎকচ টাইপের সেই জোয়ান আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'প্রবলেম কি এঁকে নিয়ে?'

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি নিশ্চয় প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, অমনি কালো চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে দীপ্ত চোখে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, 'অ্যাবনর্মাল বলে তো মনে হচ্ছে না।'

এইবার আমার রাগ হয়ে গেল। একটু গলা চড়িয়ে বললাম, 'নীল আপনাদের কী বলেছে জানি না। তবে অ্যাবনর্মাল যে কে, তা এখনও ধরা যাচ্ছে না। এই আমরা চারজন এ-ঘরে রয়েছি, এই চারজনের মধ্যে একজন হয়তো আর আগের মতন নেই।'

ভারিক্কি চালে দীননাথ বললে, 'ব্যাপারটা সেই রকমই হয়েছে শুনলাম।'

কাষ্ঠ হেসে নীল বললে, 'ইত্যবসরে জল আরও গড়িয়েছে।'

'মানে? মানে?' উদগ্রীব হলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

নীল দাঁড়িয়ে ছিল, আমি বসে ছিলাম। নবাগত দু'জনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। নীল আমাকে বললে, 'ওঠো।'

আমি বসে থেকেই বললাম, 'কেন?'

'চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার মতন ব্যাপার না-ঘটলে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে অন্তত খবর পাঠাতাম না। নিজের চোখে দেখবে চলো।'

আস্তিন গুটোতে গুটোতে দীননাথ বললে, 'সিরিয়াস-সিরিয়াস গন্ধ পাচ্ছি।'

নীল বললে, 'আস্তিন গুটোনোর দরকার হবে না, দীননাথবাবু। এ-জিনিসের সঙ্গে লড়াই চলে না।'

'দুর মশায়, লড়াই করতে চায় না এমন কেউ আছে এই সংসারে?'

'আছে।'

'সেডা কে?'

'মড়া।'

সবুজ বনাত, সবুজ বনাত... তোমার ওপর ও কে?
জোরালো আলোয় চমকে চমকে উঠছে পিলে আতঙ্কে!

এইখানে কিছু কথা বলে রাখা দরকার।

নীল দত্ত সংসারী মানুষ। আমার মতন ব্যাচেলর সন্ন্যাসী নয়। ওর স্ত্রীকে বিধাতা পুরুষ যেন মোম দিয়ে গড়ে দিয়েছিলেন— এমন মিষ্টি স্বভাব আর আকৃতি কদাচিৎ চোখে পড়ে।

নামকরণের সময়ে বাবা-মাও নাম রেখেছিলেন তাই; অর্থাৎ মিষ্টি।

নীল যে-ই বলল, মড়ার সঙ্গে লড়াই চলে না, তৎক্ষণাৎ আঁতকে উঠল আমার ভেতরটা। এই যে অদ্ভুত রোগ (!) মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে এই শহরে তা কি শেষ পর্যন্ত মিষ্টিকেই খতম করে দিয়েছে?

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। এই বাড়িরই দোতলায় নীল আর মিষ্টির সংসার। একতলায় রুগি দেখার চেম্বার। পেছনের দরজা খুললে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। আমি সেই দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, 'মিষ্টি কোথায়?'

অতিকষ্টে একটু হাসল নীল। বলল, 'ও ভালই আছে। ওপরে যেয়ো না— ও এখনও জানে না।'

'কী জানে না?'

'ভয়ংকর ব্যাপারটা।'

বলতে বলতে নীল দত্তর চোখমুখ ফ্যাকাশে মেরে গেছিল।

আমি যখন হকচকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ও তখন পেছনের দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে। দীননাথ নাথ লাফিয়ে গিয়ে ওর পেছন ধরে ফেলেছে দেখে আমিও টেবিল ঘুরে চলে এলাম তার পেছনে। আমার পেছনে এলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

আমরা চারজন লাইন দিয়ে এলাম লম্বা গলিপথে। দু'পাশের ঘরে এখন শেকল ঝুলছে। ভেতরে কেউ নেই। মাঝে মাঝে থাকে। বদ্ধ পাগল। যাদের ইলেকট্রিক শক দিতে হয় ব্রেনে। নার্স, আয়া— তাদের বসবার জন্যে ঘরটাতেও শেকল তোলা। তার মানে, তারাও আসেনি।

জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'এরা কোথায়?'

সংক্ষিপ্ত জবাব নীলের, 'আসতে বারণ করেছি।'

কী এমন ভয়ংকর ব্যাপার ঘটল যে নার্স-আয়াদের ছুটি দিতে হয়, নিজের স্ত্রীকেও তা বলা যায় না?

গলিপথের শেষে একটা ক্লাবরুমের মতন জায়গা করে রেখেছে নীল। এখানে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মারে আর বিলিয়ার্ড খেলে। বিলিয়ার্ড ওর প্রিয় খেলা। এই ঘরেও শেকল তোলা বাইরে থেকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থমথমে মুখে নীল বললে, 'রুদ্রাক্ষ, গেট রেডি ফর এ শক।'

বলেই, শেকল নামিয়ে দু'হাট করে খুলে দিল দুটো পাল্লা।

ঘর অন্ধকার। ঘুলঘুলি দিয়ে আসা সামান্য আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে মস্ত বিলিয়ার্ড টেবিল। টেবিলের ঠিক ওপরেই চৌকোনা শেড ঝুলছে। দেওয়াল ঘেঁসে সারি সারি সোফা।

বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে আরও একটা জিনিস। পলিথিন চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে।

ঘরে ঢুকে ডানদিকের দেওয়ালের স্যুইচ বোর্ডের স্যুইচ টিপে দিতেই জ্বলে উঠল টেবিলের ওপরকার পাওয়ারফুল বিদ্যুৎবাতি।

টেবিল জুড়ে ঢাকা পলিথিন চাদরের নীচে লম্বাটে মতন কী যেন রয়েছে।

নীল আমার পানে তাকিয়ে বললে, 'রুদ্রাক্ষ, চাদরটা সরিয়ে দাও।'

হেলায় একটানে পলিথিন টেনে ফেলে দিলাম মেঝেতে।

এবং শিউরে উঠলাম।

অত্যুজ্জ্বল আলোর নীচে, সবুজ বনাতের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে আর একটা নীল দত্ত!

নিরাবরণ নীল দত্ত। যেন সদ্য ভূমিষ্ঠ।

দু'হাত দু'পাশে মেলে রেখেছে। চোখের পাতা খুলে রেখেছে। প্রখর আলোয় চোখের পাতা পড়ছে না। নিষ্প্রাণ চক্ষুতারকা। বুকও ওঠানামা করছে না।

প্রথম দর্শনে যাকে বুদ্ধির ঢেঁকি বলে মনে হয়েছিল, সেই দীননাথ নাথ কিন্তু এই সময়ে অদ্ভুত একটা মন্তব্য করে বসল, 'আঁতুড় ঘর থেকে এল নাকি? কাটাছেঁড়ার দাগ পর্যন্ত কোথাও নেই!'

নীল দত্ত ম্লান হেসে বললে, 'আমারও খটকা লেগেছে। এই দেখুন—'

বলে, নিজের ডান ভুরুর চুল সরিয়ে দেখাল, একটা ইঞ্চিখানেক লম্বা কাটার দাগ। থুতনি উঁচু করে দেখাল, সেখানেও ইঞ্চি দেড়েক কেটে গেছিল, সেলাই করা হয়েছে। বাঁ পায়ের ট্রাউজার্স গুটিয়ে নিয়ে আঙুল রাখল মালাইচাকির ওপর— মাংস দলা পাকিয়ে গুটিয়ে রয়েছে।

বললে, 'এইরকম আরও কাটাছেঁড়ার দাগ আছে আমার সারা গায়ে। কিন্তু আমার এই ডুপ্লিকেটের গা একদম অক্ষত। ভুরুর চুল সরাচ্ছি— দেখছেন? কাটা নেই। থুতনির তলায় দেখুন— কাটা নেই। বাঁ হাঁটুর মালাইচাকি দেখছেন? যেন সদ্য ছাঁচ থেকে বেরিয়েছে, কাটাকুটির দাগ পরে ফেলা হবে।'

'নকল 'আমি'!' বিমূঢ় স্বরে বললাম আমি।

ধুয়ো ধরলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'ছাঁচে ফেলে মূর্তি ঢালাই করার পর একটু কারিকুরি করতে হয় বই কী। সেই সময়টা দিলে তাও হয়ে যাবে।'

কণ্ঠস্বর তাঁর অতীব হৃষ্ট। আজব এই কাণ্ড যেন তাঁকে বিলক্ষণ পুলকিত করেছে।

আমি চোখ ফেরালাম তাঁর মুখের দিকে। দ্যুতিময় চোখ দুটোয় বুঝি এখন মশাল জ্বলছে। নিবিড় নয়নে চেয়ে আছেন নীল দত্তর ডুপ্লিকেট বডির দিকে।

বললেন আপন মনে, 'ঝকঝকে শরীর। টাটকা বানানো।'

'হ্যাঁ, কাল রাতে বানানো।' নীল দত্তর মন্তব্য।

'কোথায় বানানো হল? এই টেবিলে?'

'না, না। যে-ঘরগুলোয় আজেবাজে জিনিস রেখে দিই— দেখে এলেন আসবার সময়ে, ওখানকারই একটা ঘরে। শুয়ে ছিল মেঝেতে, ছেঁড়া কার্ডবোর্ডের ওপর।'

'আপনি প্রথম দেখলেন?'

'হ্যাঁ। ঘুম আমার এমনিতেই গাঢ়। কাল রাতেও ঘুমিয়েছি মড়ার মতো। কিন্তু ভোর চারটে নাগাদ ভয়ের স্বপ্ন দেখে আমাকে ঠেলে তুলে দিয়েছিল আমার স্ত্রী।'

'কী রকম ভয়ের স্বপ্ন?'

'কে যেন ওকে ধরতে আসছে। তালগোল পাকানো অন্ধকার যেন ওকে ঘিরে ধরছে।'

'তারপর?'

'এমনিতেই রাত জেগে পড়াশুনো করি। বেলা পর্যন্ত ঘুমোতেই হয়। ধাক্কা খেয়ে সেই যে ঘুম ছুটে গেল, রেগেমেগে নীচের লাইব্রেরিতে চলে এলাম। গতকাল এক বাক্স বই এসেছিল ট্রান্সপোর্টে। প্যাকিং কেস তখনও খোলা হয়নি— ভাবলাম, বাক্সটা খুলে নতুন বইগুলো নিয়ে আসি। তাই ঘরে ঢুকেছিলাম। দেখলাম মেঝেতে ইনি শুয়ে আছেন। প্রথমে ভাবলাম, ডেডবডি। কিন্তু কাল বিকেলে নিজে রেখে গেছি বাক্সটা— তখন তো ছিল না। কার ডেডবডি দেখতে গিয়ে দেখি, আমারই বডি— কিন্তু কাঁচা বডি।'

'কাঁচা বডি! বলেছেন ভাল।' প্রফেসর খুশি খুশি মুখে বললেন।

'পুরোপুরি তৈরি হয়নি।' জুড়ে দিল নীল দত্ত।

'একটা টেস্ট করব?' ফস করে বললে দীননাথ নাথ।

'কী টেস্ট?' প্রফেসরের কৌতূহল।

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্ট।'

'মন্দ বলোনি। তোমার ব্রেন আছে তা হলে।'

মুখটা লাল হয়ে উঠল ভিলেন ভিলেন চেহারার যুবকের। ভেতরের উষ্মাকে প্রশ্রয় না-দিয়ে বললে ঝটিতি, 'স্ট্যাম্প প্যাডটা আনবেন?'

যাকে বলা হল, সেই নীল দত্ত কিন্তু ফিঙ্গার প্রিন্ট টেস্টের নাম শুনেই দৌড়েছে ঘরের বাইরে। ফিরে এল দু'মিনিটেই। হাতে নিজের নাম ছাপানো প্রেসক্রিপশন প্যাড আর রাবার স্ট্যাম্পের স্ট্যাম্প প্যাড। কাউকে কিছু বলতে হল না। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা স্ট্যাম্প প্যাডে টিপে ধরে কালি লাগিয়ে নিয়ে চেপে ধরল প্যাডের কাগজে।

বললে, 'এই আমার আঙুলের ছাপ। এবার নিচ্ছি নতুন 'আমি'র আঙুলের ছাপ।'

বিলিয়ার্ড টেবিলে শোয়ানো প্রায়-দ্বিতীয় নীল দত্তর বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের টিপসই নিল আসল নীল দত্ত।

জোরালো আলোর তলায় পাশাপাশি দুটো টিপসই রেখে বললে সহর্ষে, 'দেখুন।'

দেখলাম। প্রথম টিপসইয়ে গোল গোল রেখা রয়েছে, যেমন থাকে। দ্বিতীয় টিপসইয়ে কিচ্ছু নেই। পরিষ্কার চামড়া!

জ্বলছে চোখ জ্বলছে চোখ জ্বলছে দিদির দু'চোখ,
ভয়ের চোটে ইচ্ছে যায় ছাড়ি এবার ইহলোক!

'আশ্চর্য!' ভুরু কুঁচকে এই প্রথম বিস্ময়োক্তি করলেন প্রফেসর।

নকল নীল আর আসল নীলকে পর্যায়ক্রমে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললাম আমি, 'বডি বিল্ডিং ইনকমপ্লিট রয়ে গেল কেন?'

নীল বললে, 'আমাকে ধাক্কা মেরে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়ার ফলে। পুরো সময়ে ঘুমোলে আঙুলের ছাপ, কাটাকুটির দাগ সবই হুবহু নকল তৈরি হয়ে যেত।'

'উদ্ভট ধারণা।' আমার স্বগতোক্তি!

'বন্ধু,' বললে নীল দত্ত, 'তোকে আগেই বলেছিলাম, বৈশাখীর কেস নিয়ে মোট এগারোটা কেস শুনলাম। বৈশাখীকেও জেরা করলে নিশ্চয় জানতে পারব একটাই কমন ফ্যাক্ট।'

'কমন ফ্যাক্ট!'

'আগের দশটা কেসে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে।'

'কী সেই পুনরাবৃত্তি?'

'রাতঘুমের পর মানুষটা অন্য কেউ হয়ে গেছে।'

'তু-তু-তুই বলতে চাস, ঘুমের মধ্যে নকল মানুষ তৈরি হচ্ছে?'

'ঠিক তাই বলতে চাই।'

'তুই যদি পুরো সময় ধরে ঘুমোতিস— নকল মানুষটা, মানে নকল নীল হুবহু তোর ডুপ্লিকেট হয়ে ঘুরে বেড়াত?'

'এগজ্যাক্টলি।'

'তুই তা হলে কোথায় যেতিস?'

'বোধহয় জাহান্নমে। যাক গে সেকথা, নিজের নকল দেখেই আর দেরি করিনি— প্রফেসরকে এসটিডি করেছিলাম।'

'নীল... নীল... তোর তা হলে বিশ্বাস, আমার দিদিও এইভাবে রাতারাতি পালটে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ঘুমের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে কেন?'

ভারিক্কি গলায় দীননাথ নাথ বললে, 'সেইটাই এবার তদন্ত করতে হবে। বৈশাখী কে?'

'আমার ভাগনি।'

'তার প্রবলেম?'

বললাম, 'বৈশাখীর মা, মানে আমার দিদির ভেতরটা পালটে গেছে, সেখানে আবেগ নেই।'

কান খাড়া করে শুনলেন প্রফেসর। বললেন, 'বৈশাখীকে এখানে ডেকে আনা যাবে?'

'এই নকল বডি তৈরির কারখানায়?' বিদ্রোহী স্বরে বললাম আমি।

স্নিগ্ধ চাহনি মেলে প্রফেসর বললেন, 'আপনি কি চান, বৈশাখীও রাতারাতি পালটে যাক?'

'কক্ষনও না।'

'নীল দত্ত অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। বৈশাখীকে ওর নকল মায়ের কাছে রাখতে চাই না।'

'আপনি ধরেই নিয়েছেন, আমার দিদি নকল হয়ে গেছে?'

'আপনার মনেও তো খটকা লেগেছে। কথা না-বাড়িয়ে চলুন যাই। দেখতে চাই আপনার দিদিকে।

বৈশাখী, আমি, নীল তিনজনেই ডাক্তার। সুতরাং বৈশাখীর টেলিফোন নাম্বার জানতে অসুবিধে হয়নি। ও ছিল চেম্বারে। সেখানে চলে গেলাম বিরাট বাহিনী নিয়ে। শুষ্ক মুখে বৈশাখী যখন শুনল, অদ্ভুতকর্মা প্রফেসর কেন এসেছেন আর কাল রাতে নীল দত্তর নকল বডি পাওয়া গেছে একতলার গুদোম ঘরে, তখন ওর মুখ হয়ে গেল ছাইয়ের মতন ফ্যাকাশে।

শুধু বলল, 'আমার আসল মা তা হলে কোথায়?'

স্নেহনিবিড় কণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'সেটা জানবার জন্যেই তো তোমার মাকে দেখা দরকার।'

'চলুন।'

প্ল্যানটা বাতলেছিল দীননাথ। বৈশাখী ওর মাকে নিয়ে বেরিয়ে আসবে বাগানে। আমরা সবাই যখন তার সঙ্গে গল্পে মশগুল হব, তখন দীননাথ বাগান দেখতে দেখতে ঢুকে যাবে বাড়ির মধ্যে। একতলার বাজে জিনিস রাখবার ঘরে।

বৈশাখীই বলেছিল, ও-ঘরে যত বাড়তি জিনিস ডাঁই করা থাকে। কক্ষনও ওদিকে যায় না।

প্ল্যান মাফিক আমি দিদির সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলাম। গল্প জমিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু অস্বস্তি বেড়েই চলল— দিদির প্রাণোচ্ছল কথাবার্তার মধ্যেও শুধু একটা জিনিসের অভাব দেখে। ইমোশন।

প্রফেসর সমানে মজার মজার কথা বলে গেলেন— দিদিও তাল ঠুকে মজার মজার জবাব দিয়ে গেল।

আমি নজর রাখলাম দীননাথ কখন ফেরে।

সজাগ ছিলাম বলেই খেয়াল করলাম, অনর্গল কথা বলে গেলেও দিদির চোখ ঘুরছে যেন দীননাথের সন্ধানে, এবং যেন একটু উৎকণ্ঠাও রয়েছে সেই চাহনির মধ্যে।

দীননাথ ফিরে এল ফুলবাগানের মধ্যে দিয়েই। বিলক্ষণ খুশি খুশি মুখ। ছোকরা হোঁতকা চেহারার হলেও করিতকর্মা। কাজ হাসিল করলে মানুষ যেমন খুশি চেপে রাখতে পারে না— তার চোখমুখেও দেখলাম সেই জয়লাভের চিহ্ন।

আড়চোখে দেখলাম দিদির মুখ। উদ্‌বেগ প্রকটতর হয়েছে। কথা টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে বলেই কাউকে বুঝতে দিচ্ছে না অন্তরের ভাবান্তর।

দীননাথ হনহন করে এগিয়ে এসে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে প্রফেসরের দিকে চেয়ে বললে, 'আমি নীল দত্তর গাড়িতে যাচ্ছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে। আপনারা আসুন রুদ্রাক্ষবাবুর গাড়িতে। চললাম, দিদিভাই।'

বলেই, একঝলক হাসি ছুড়ে দিল দিদির দিকে। নীল দত্তকে কিছু বলবার সুযোগ না-দিয়েই তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাগানের বাইরে। উঠে বসল গাড়িতে, ভোঁ করে বেরিয়ে গেল চক্রযান।

দিদির চাহনি দেখলাম প্রখরতর হয়েছে।

হঠাৎ বললে, 'তোরা বেড়া। আমি চা জলখাবার করে আনি।'

বলেই, এগুল বাড়ির দিকে।

বৈশাখী চাইল আমার দিকে। আমি চাইলাম প্রফেসরের দিকে। প্রফেসর বললেন নিচু গলায়, 'চলুন পালাই, দীননাথ মাথামোটা হলে কী হবে, কাজ হাসিল করতে ওস্তাদ। বৈশাখী মা—'

বৈশাখী বললে, 'এ-বাড়িতে একদণ্ড থাকবার ইচ্ছে নেই। আপনাদের সঙ্গেই যাব।'

আমরা বেরিয়ে এলাম। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে তাকালাম। দিদি বেরিয়ে এসেছে থামওলা বারান্দায়। দুই চোখ যেন জ্বলছে।

গড়ছে তারা ভাঙছে তারা নাটক তাদের অদ্বিতীয়,
দর্শক যারা ভাবছে তারা কী ভয়ংকর কী নারকীয়।

আমি আচ্ছন্নের মতন গাড়ি হাঁকিয়ে ফিরে এসেছিলাম নীল দত্তর ডেরায়। দূর থেকেই দেখেছিলাম, ওর মারুতি ওমনি ভ্যান দাঁড়িয়ে বাড়ির সামনে। কাপড়ে মোড়া একটা বিশাল বস্তু গাড়ির পেছন থেকে বের করছে দীননাথ, দু'হাতে এমনভাবে তুলে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে— যেন পালকের মতন হালকা, পেছন পেছন ছুটল নীল, তার মুখ উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছে।

হৃষ্টকণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'পেয়েছে।'

'কী পেয়েছে?' মারুতির পেছনে ব্রেক কষতে কষতে আমি বলেছিলাম।

'যত নষ্টের মূল যা— তাই।' বলেই উৎকট গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বস্তুটা দেখবার জন্যে বৈশাখীর অস্থিরতা লক্ষ করলাম। গাড়ি থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে নীল ওকে বললে, 'আপনি এখন নীচে যাবেন না। ওপরে চলুন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগাছা করে ওকে ঠেকিয়ে রাখুন। নীচের বিভীষিকা ওকে দেখাতে চাই না। এখনও ও কিছু জানে না।'

নীলের গলার কর্তৃত্ব বৈশাখীর মতন মেয়েও মেনে নিল। নীচের তলার বিভীষিকা স্বচক্ষে দেখবার অদম্য বাসনাকে সংযত করে নিয়ে নীলের পেছন পেছন চলে গেল দোতলায়।

আমি আর প্রফেসর একতলার চেম্বার পেরিয়ে করিডরের মধ্যে দিয়ে এগোলাম বিলিয়ার্ড রুমের দিকে। কেননা, অত্যুজ্জ্বল আলোটা জ্বলছে ভেতরে, দীননাথের প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গেলাম ভেতরের দৃশ্য দেখে।

আমাকে ঠেলে পাশ দিয়ে তড়িৎ বেগে ভেতরে প্রবেশ করলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। পুলকিত নয়নে চেয়ে রইলেন বিলিয়ার্ড টেবিলে রাখা বৃহৎ বস্তুটার দিকে।

জিনিসটাকে রাখা হয়েছে নকল নীল দত্তর বডির পায়ের কাছে। যে কাপড় দিয়ে মুড়ে এনেছিল দীননাথ, সেই কাপড় বস্তুটার গা থেকে খুলে নিয়েছে। তাই অতিকায় বাঁধাকপি জাতীয় অদ্ভুত বস্তুটাকে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

দু'হাত কচলাতে কচলাতে দীননাথ বললে, 'পেয়ে গেলাম যেখানে টার্গেট করেছিলাম ঠিক সেইখানে। গুদোমঘরের মেঝেতে। কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। পেছনের দরজা খুলে পাঁচিল টপকে গাড়ির মধ্যে রেখে আবার ফিরে গেছিলাম।'

'কেউ তা হলে ঢেকে রেখেছিল।' প্রফেসরের স্বগতোক্তি। চোখ কিন্তু পিছলে পিছলে যাচ্ছে বর্তুলাকার বস্তুটার ওপর।

'ফাইন।' বললেন আপন মনে।

আমি ফেটে পড়লাম কৌতূহলে, 'উদ্ভট এই দানবিক কপি দেখে আপনি খুশি হয়েছেন?'

'হয়েছি। আমার একটা অনুমিতি বোধহয় সত্যি হতে চলেছে।'

'কীসের অনুমিতি?'

'সেটা তো এখন বলা যাবে না। তবে জিনিসটা অপার্থিব বলেই মনে হচ্ছে।'

'অপার্থিব! মানে, পৃথিবীর নয়?'

'মহাশয় গবেষক, আপনি তো লাইফ-ইঞ্জিনিয়ার। বনে-বাদাড়ে ঘুরছেন অজানা গাছপালার সন্ধানে। ঠিক এইরকম উদ্ভিদ কোথাও দেখেছেন কি?'

আমি জবাব দিলাম না। প্রফেসর যাকে উদ্ভিদ বললেন, একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম সেই জিনিসটার দিকে, অনেকটা অতিকায় বাঁধাকপির মতন গড়ন। সারা গায়ে মোলায়েম মখমলের মতন খোসা, মাথায় ঝুঁটি। এত বিরাট জিনিসটাকে কিন্তু অবহেলায় তুলে নিয়ে এসেছে দীননাথ। হতে পারে সে পালোয়ান, তা হলেও—

সহর্ষে বললে দীননাথ, 'স্যার, একতলার গুদোমঘরে কাপড় মুড়ে কেউ রেখে গেছিল। সবে রেখেছিল— হয়তো আজকেই।'

জ্বলজ্বল চোখে চেয়ে প্রফেসর বললেন, 'কী করে বুঝলে আজকেই রেখেছিল?'

'স্রেফ ডিটেকশন। গোয়েন্দাগিরি। মেঝে ভরতি ধুলো। এই জিনিসটার নীচেও ধুলো। একই ধুলোর স্তর, একটুও কমবেশি নয়। অর্থাৎ, খুব সম্ভব আজই এনে রাখা হয়েছিল।'

ফস করে বলে ফেললাম, 'বৈশাখী যখন বাড়িতে নেই— নিশ্চয় তখন। ওকে না জানিয়ে কেউ রেখে গেছিল। সে কে?'

'বলতে পারি, যদি আপনি চটে না-যান!' হেসে হেসে বললেন প্রফেসর। আজব ব্যক্তি বটে। ব্রেন চলছে ক্ষুরের ধারে, চোখে মুখে নেই তার প্রতিক্রিয়া।

'চটতে যাব কেন?'

'কারণ সে যে আপনার মায়ের পেটের বোন— আপনার দিদি।'

'দিদি!'

'হয় তিনি নিজে এনে রেখেছেন, অথবা তাঁর স্যাঙাতদের দিয়ে আনিয়ে রেখেছেন।'

'দিদির স্যাঙাৎ!'

'যারা পালটে গেছে আপনার দিদির মতন— বাইরের চেহারা আগের চেহারার কার্বন কপি, ভেতরটা নয়।'

'ভেতরে তা হলে কে আছে?' ঝুঁকে পড়েছিলাম বিষম উত্তেজনায়।

'সেইটাই তো রহস্য।' মৃদু মৃদু হাসছেন প্রফেসর, 'তবে এই কিম্ভুত জিনিসটার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে। খুবই অবিশ্বাস্য সম্পর্ক।'

ভিলেন-ভিলেন স্টাইলে এতক্ষণ হেলছিল আর দুলছিল দীননাথ। এখন সে ধাঁ করে বলে উঠল, 'স্যার, এই জিনিস এ-বাড়িতে আছে কিনা দেখব?'

'এতক্ষণে সে খেয়ালটা হল?' ধমকে উঠলেন প্রফেসর।

মুখটা লাল হয়ে গেল দীননাথের।

দরজা দিয়ে করিডরে বেরোতে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে, এমন সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত মুখে ধেয়ে এল বৈশাখী। পেছনে টলতে টলতে এল মিষ্টি, নীল দত্তর বউ।

আমরা সব স্ট্যাচুর মতন দাঁড়িয়ে রইলাম।

কারণ, টলায়মান মিষ্টি চৌকাঠে পা দিয়েই যেন অদৃশ্য চাবুকের আঘাতে ঘোর কাটিয়ে উঠেছে। আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে বিলিয়ার্ড বোর্ডে শোয়ানো হাফ-ফিনিশড বডিটার দিকে।

'ও কে? ও কে?' মিষ্টির কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল ভয়ার্ত চিৎকার।

কণ্ঠস্বর সংযত রাখবার চেষ্টা করে জবাবটা দিল নীল দত্ত, 'অন্তত আমি নই।'

'তোমার যমজ ভাই?'

'না, তাও নয়। ওসব পরে শুনবে। তোমার এ হাল হল কেন?'

'আমি বলছি।' বলে উঠল বৈশাখী, 'ওকে বকাবেন না। তুমি ভাই বসো এই সোফায়।'

মিষ্টিকে ধরে ধরে এনে সোফায় বসিয়ে দিয়ে পাশেই বসে পড়ল বৈশাখী। নীল দত্তকে বললে, 'আপনার বউ এমন ঘুম ঘুমোচ্ছিল, যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে নীল বললে, 'সে কী! দিন দুপুরে ও তো ঘুমোয় না।'

'কিন্তু আজ ঘুমোচ্ছিল। মিষ্টি, বলো তো ভাই, কেন ঘুম এসেছিল।'

স্খলিত স্বরে মিষ্টি বললে, 'কেন জানি না, হঠাৎ হাতে বইটা ধরে রাখতে পারলাম না। মাথা ভারী হয়ে যাচ্ছিল... চোখ খুলে রাখতে পারছিলাম না... যা পড়ছিলাম, তা মাথায় ঢুকছিল না... তাই ভাবলাম, একটু শুয়ে নিই। ভোর রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছি... ঘুম ভাল হয়নি... একটু ঘুমিয়ে নিই... লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। এঁর ধাক্কায় (বৈশাখীকে দেখিয়ে) কোনওমতে চোখ খুলেছিলাম... কিন্তু মাথা কাজ করছিল না... ওঁকে চিনি না... তা নিয়ে মনে জিজ্ঞাসাও ছিল না... আবার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল... ইনি জোর করে জাগিয়ে রাখলেন... ঠেলে তুলে বসিয়ে দিলেন... চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলেন... ঘুম পালিয়ে গেল... উনি আমাকে ধরে ধরে নীচে নিয়ে এলেন... কিন্তু এ কী দেখছি?'

প্রফেসরের চোখে মুখে সেই উৎফুল্ল ভাবটা একেবারেই তিরোহিত হয়েছিল। অস্বাভাবিক গম্ভীরভাবে মিষ্টির জড়ানো গলার প্রায়-অসংলগ্ন বিবৃতি শুনে যাচ্ছিলেন।

এখন হঠাৎ তেড়ে উঠলেন দীননাথের ওপর। সে বেচারি গোল গোল চোখে মিষ্টির মরণঘুমের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে গেছিল।

'ওহে চন্দ্রবদন, তুমি যা দেখতে যাচ্ছিলে, সেটা কি তোমার জন্যে ওয়েট করবে?'

'যাই।' বলেই নিমেষে চোখের বাইরে চলে গেল আখাম্বা দীননাথ।

প্রফেসর অমনি মিষ্টির দিকে তাকিয়ে ভারী মিষ্টি গলায় বললেন, 'মা আমাকে দেখে তুমি ভীষণ অবাক হচ্ছ কেন? নীল দত্তর কাছে আমার গল্প-টল্প শোনোনি?'

'আ-আপনি কে, দাদু?'

'আগে বলো, তোমাকে নাতনি বলব, না, পেতনি বলব?' বলতে বলতে চোখের নাচন

দেখিয়ে দিলেন প্রফেসর। আশ্চর্য বৃদ্ধ! ঘরের মধ্যে এক প্রাণহীন আধগড়া মড়া শুয়ে— ওঁর মধ্যে রসবোধের খামতি নেই একটুও।

ফিক করে হেসে ফেলল মিষ্টি। বললে, 'পেতনি নামটার মধ্যে কত মজা বলুন তো। এবার বলুন, আপনি কে?'

'আমি প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।'

'ওরে শাবাশ! যা কেউ পারে না, আপনি তা পারেন। ওই যে থামের মতন লম্বা মানুষটা এখুনি বেরিয়ে গেলেন আপনার দাবড়ানি খেয়ে, উনিই কি আপনার রাইট হ্যান্ড দীননাথ নাথ?'

প্রফেসরের জবাব দেওয়ার দরকার হল না। দোরগোড়া থেকে ভেসে এল দীননাথের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'প্রফেসর, আর একটা ঢেসকুমড়ো!'

বলে, দু'হাতে ধরা অতিকায় বস্তুটা নামিয়ে রাখল পায়ের কাছে।

আর একটা দানবিক বাঁধাকপির মতন বস্তু। তফাত শুধু একটা ব্যাপারে। এটা অটুট নয়। বাইরের খোসা জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। ভেতর থেকে ঝুরঝুর ধূসর ধুলো ঝরে পড়ছে।

নিমেষে থমথমে হয়ে গেলেন প্রফেসর।

'খোসা ফাটল কী করে?' প্রশ্ন করলেন দীননাথকে।

'আপনা থেকেই। ধুলো বেরিয়ে গিয়ে গড়ছিল ওই ওঁকে।' বলে তর্জনী তুলে দেখাল মিষ্টিকে।

ঘর নিস্তব্ধ।

বিকৃত স্বরে বললে নীল, 'মিষ্টিকে গড়ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় সেই বডি?'

মিষ্টি আর বৈশাখীর দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে নিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ল দীননাথ। পরক্ষণেই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বললে, 'মেয়েরা এখানে থাকুক, ডাক্তার দু'জনকে নিয়ে স্যার আপনি চলে আসুন— দেখে যান, কী ভয়ানক কাণ্ড চলছে এখানে।'

টর্নাডোর মাঝে দীননাথ, ছিটকে ছিটকে পড়ছে লোক,
হাজারো ফিকির মাথায় নিয়ে দিচ্ছে চোট দিচ্ছে চোট!

অন্য একটা ঘরে দীননাথ নিয়ে এল আমাদের। নিজেই আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। তাই স্তূপাকার কার্ডবোর্ডের বাক্সর আড়ালে মেঝেতে শুয়ে থাকা মিষ্টিকে এক পলকেই দেখতে পেলাম। বিলিয়ার্ড রুমে পড়ে রয়েছে যে হাফফিনিশড বডি— এখানেও তাই।

দীননাথ ভারী গলায় বললে, 'পাশেই এইখানে ছিল ঢেসকুমড়োর মতন ওই জিনিসটা ফাটাফুটো অবস্থায়। ঝুরঝুর করে ধুলো গড়িয়ে লেগে যাচ্ছিল গায়ে।'

প্রতিধ্বনি করলেন প্রফেসর, 'লেগে যাচ্ছিল গায়ে?'

'হ্যাঁ। মাটির মূর্তি তৈরি করার সময়ে যেমন মাটি লেপে লেপে দিতে হয়— ঠিক সেইভাবে। ধুলো আর তখন ধুলো থাকছিল না, চামড়া হয়ে যাচ্ছিল।'

বিড়বিড় করে বললে নীল দত্ত, 'মিষ্টি যখন অকাতরে ঘুমোচ্ছিল, ঠিক তখন রূপান্তর ঘটছিল এখানে।'

প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন নীল দত্তকে, 'আপনার ডুপ্লিকেট বডিটা কোন ঘরে তৈরি হয়েছিল?'

'আসুন, দেখাচ্ছি।' নীল আমাদের নিয়ে গেল করিডরের আর একটা ঘরে। এখানেও পুরনো কার্ডবোর্ড, নতুন বই ভরতি প্যাকেট। মেঝেতে একটা ছেঁড়া কার্ডবোর্ড দেখিয়ে নীল বললে, 'এইখানে।'

প্রফেসর সেদিকে না-তাকিয়ে দেখছিলেন ঠিক তার পাশেই খালি কার্ডবোর্ড বক্সের স্তূপটার দিকে। তার ওপর বসানো রয়েছে প্রায় ভেঙেচুরে আসা বিশাল বিকট সেই গোলাকার বস্তুর অবশিষ্ট— শুধু তলার দিক। খোসা খসে খসে পড়েছে। ভেতরে ধুলোর মতন মিহি ধূসর পাউডার অল্প রয়েছে।

এক মুঠো তুলে নিয়ে শক্ত চোখে দেখতে দেখতে প্রফেসর বললেন, 'ল্যাবরেটরি টেস্ট করা দরকার। ডক্টর রুদ্রাক্ষ গুপ্ত, আপনার বাড়িতে সরঞ্জাম আছে নিশ্চয়?'

'আছে!' বুঝলাম প্রফেসরের মতলব। টেস্টিং-এর নামে তিনি এই 'কুমোর বাড়ি' ছেড়ে পিঠটান দিতে চান।

কিন্তু কাজটা অত সহজে হয়নি।

দু'দুখানা অস্থি-চর্ম-মেদ-মাংস-মজ্জা দিয়ে আধগড়া শরীর রয়েছে যে-বাড়িতে, সেই বাড়ির ওপর যে মানুষ গড়ার কারিগররা আমাদের অলক্ষ্যে নজর রাখছে, আমাদের তা ভেবে নেওয়া উচিত ছিল।

তবে দূরদর্শী প্রফেসর নাটবল্টু চক্র খুব সম্ভব তাঁর অতি-অনুভূতি-বোধ দিয়ে আঁচ করেছিলেন, সংকট ঘনীভূত হচ্ছে খোদ ডাক্তারের বাড়িতে।

যে কিনা মনের ডাক্তার। অদ্ভুত মানসিক বিকারের সংবাদ নিয়ে বেশ কয়েকজন মানুষ ধরনা দিয়ে গেছে তার কাছে।

সেই তারাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ি ঘিরে। ফটকের সামনে, রাস্তার ওপর!

অবশ্য, একটু সময় নিয়েছিল বৈশাখী। মাকে না-বলে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে। এখন চলে যাচ্ছে আমার বাড়িতে। তাই, বৈশাখী জেদ ধরেছিল, মাকে টেলিফোন করবে নীল দত্তর চেম্বার থেকে।

রিসিভার তুলেছিল আমার দিদি— দিদির বাড়িতে।

তারপর যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা এইরকম:

'মা, হঠাৎ চলে এলাম জরুরি কল পেয়ে।' বৈশাখীর সাফাই।

'কল? বুঝেছি।' দিদির জবাব। নিষ্প্রাণ, আবেগবিহীন।

'হঠাৎ চলে এলাম, তোমাকে না-বলে, তুমি তো বেশ নির্বিকার আছে!

'বিকার! বাজে জিনিস। মন থাকলে বিকার থাকে।'

'তোমার মন নেই! কী বলছ, মা?'

'ছিল। এখন নেই।'

'মা... মাগো!'

'যা দেখা যায় না, ধরা যায় না তার অস্তিত্ব নেই। আমি মনহীন এক সত্তা।'

'মানুষী সত্তা তো?'

অস্ফুট হাসি। তারপর, 'শিগগিরই দেখা হবে— যেখানেই থাকো না কেন।'

রিসিভার রেখে দিল দিদি।

বৈশাখীর দু'চোখ জলে টলটল করেছিল অথচ কাঁদতে পারেনি আমাদের এতজনের সামনে। শুধু আমাকে বলেছিল, 'মামা, মা আর নেই।'

আমি জবাব না-দিয়ে ওর কবজি খামচে বেরিয়ে এসেছিলাম করিডরে। সেখান থেকে সদর দরজা। কপাট খুলতেই দেখেছিলাম রাস্তায় আমাদের দু'খানা গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে কুড়িজন মানুষ। তারা সকলেই একদৃষ্টে চেয়ে আছে সদর দরজার দিকে।

কপাট জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল নীল দত্ত। তার নীল চোখে নীল আগুন দেখলাম যেন। একে একে দেখছে বিশজন মানুষকে।

পেছন না-ফিরেই বললে প্রফেসরকে, 'এদের দশজন এসেছিল আমার কাছে— অদ্ভুত রোগের বিবরণ শোনাতে।'

নীল দত্তর পাশ দিয়ে উঁকি মেরে বিশজনের জমায়েত দেখতে দেখতে নিশ্চিন্ত গলায় প্রফেসর বললেন, 'তার মানে, যে দশজনের পরিবর্তন আঁচ করে এরা ছুটে এসেছিল— সেই দশজন এদেরও পালটে নিয়েছে।'

ধরা গলায় বলেছিল বৈশাখী, 'এরপর দেখব আমার মা-ও রয়েছে এদের দলে।'

কথার কচকচিতে অনভ্যস্ত দীননাথ কাঠ কাঠ গলায় বলে উঠেছিল, 'সরুন, সরুন, দেখছি ওদের মুরোদ কতখানি।'

দীননাথ নাথ যে অকারণে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রর দক্ষিণ হস্ত হয়নি, তা দেখলাম বটে সেদিন।

দীননাথ নাথ ওর থামের মতন লম্বা বপুটাকে গদাইলশকরি চালে এগিয়ে নিয়ে গেল বিশজনের জমায়েতের সামনে। বিশ জোড়া চক্ষু ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে রইল ওর দিকে।

আচমকা যেন একটা টর্নাডো হানা দিল বিশজনের ওপর। পাঁচ সেকেন্ডেই বিশটা পুরুষ ভূমিশয্যা গ্রহণ করে রইল একেবারে নতুন ধরনের মার্শাল আর্টের মারে।

'শাব্বাশ!' সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেই ধেয়ে গেছিলাম আমি আমার গাড়ির দিকে। সঙ্গে বৈশাখী আর মিষ্টি। নীল দত্তও ওর ল্যাম্পপোস্ট বডিটাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল ওর গাড়ির সামনে। বয়োবৃদ্ধ প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার অধিকারী, তা তিনি হাতেনাতে দেখিয়ে দিলেন।

আধ মিনিটও গেল না। পরপর দু'খানা গাড়ি কক্ষচ্যুত উল্কার মতন ধেয়ে গেল জনশূন্য পথ বেয়ে।

খটকা লেগেছিল তখনই। এই গোধূলির সময়ে পথঘাট তো এমন খাঁ খাঁ করে না!

এসেছে এসেছে তারা কালো বিস্ময় এসেছে,
কালো ভ্যানের মধ্যে শুয়ে পিশাচ ঘুম ঘুমাচ্ছে!

আমি ব্যাচেলর। রাজকীয় চালে বড় দোতলা বাড়িতে একা থাকি। একতলার ঘরে ঘরে ল্যাবরেটরি আর গাছপালার সংগ্রহ। আমি যে গবেষণা করি, তা এতই গোপনীয় যে কাজের লোক কাউকে বাড়িতে থাকতে দিই না। সদর দরজার লক সিস্টেম নতুন ধরনের— আমি ছাড়া কেউ খুলতে পারবে না।

আমার আর নীল দত্তর গাড়ি দুটো এই বাড়ির সামনে যখন আসছে, তখন দেখলাম, সামনের মোড় ঘুরে একটা পুলিশের কালো গাড়ি আসছে আমাদের দিকে। আমি আর নীল গাড়ি থামিয়েই টপাটপ নেমে দৌড়োলাম আমার গবেষণা-গৃহর দিকে। পেছন পেছন সমান ক্ষিপ্রতায় ধেয়ে এলেন প্রফেসর। দীননাথ দু'হাতে টানতে টানতে নিয়ে এল বৈশাখী আর মিষ্টিকে। আমি তালা খুলে ভেতরে ঢুকেই ঘুরে গিয়ে ঢুকিয়ে নিচ্ছিলাম বাকি সবাইকে— তাই দেখতে পেলাম, কালো প্রিজন ভ্যান এসে দাঁড়িয়ে গেল আমাদের গাড়ি দুটোর সামনে।

এরপর আর দেখতে পাইনি। দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম ভেতর থেকে। তরতরিয়ে উঠে গেছিলাম দোতলায়। কাচের জানলা দিয়ে দেখেছিলাম ষণ্ডামার্কা দশজন পুলিশ নেমেছে গাড়ি থেকে। দু'জন হেঁট হয়ে বসে আমাদের গাড়ি দুটোর পেছনের চাকা থেকে হাওয়া বের করে দিচ্ছে।

বাকি আটজন বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে ওপর দিকে চেয়ে দেখল, আমি জানলার কাচের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে নজর রেখেছি।

একজন পকেট থেকে বের করল সেলুলার ফোন, বোতাম টিপে যেতেই বেজে উঠল দোতলার টেলিফোন।

আমি দ্বন্দ্বে পড়েছি, নীচে তাকিয়ে দেখলাম, ভাবলেশহীন চোখে পুলিশ অফিসার সেলুলার ফোন কানে লাগিয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

কাঁধে হাত রাখলেন প্রফেসর। বললেন শীতল স্বরে, 'কথা বলুন, ইনফর্মেশন বের করুন, ইনফর্মেশন ইজ পাওয়ার।'

তুলে নিলাম রিসিভার।

কথাবার্তার বিনিময় ঘটল এইভাবে :

'ডা রুদ্রাক্ষ গুপ্ত বলছেন?'

'বলছি।'

'আমি পুলিশ থেকে বলছি। দরজা খুলুন। নইলে তালা উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকব।'

'সে চেষ্টা করলে আপনারাও উড়ে যাবেন। আমি নিরস্ত্র নই।' ব্লাফ মারলাম। আমার কাছে কোনও অস্ত্রই ছিল না।

পুলিশ অফিসার বললে, 'খামোকা হাঙ্গামা বাধাবেন না। আমরা দলে ভারী।'

'আপনারা কারা?'

'সেইটা বলবার জন্যেই ভেতরে যেতে চাইছি।'

'বাইরে থেকেই বলুন।'

'অনেক কথা। সেলুলারে ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবে। আপনি জ্ঞানী গবেষক। পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল আপনি চান। আমাদের কথা আপনি বুঝবেন।'

'একটু ধরুন।'

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে দ্রুত হ্রস্বস্বরে গুছিয়ে বললাম প্রফেসরকে সবকথা। জিজ্ঞেস করলাম, এখন কী করণীয়।

প্রফেসর চাইলেন দীননাথের দিকে। ইঙ্গিতপূর্ণ চাহনি। দীননাথ কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর চোখ নামিয়ে আমাকে বললে, 'বলুন, রাতে কোনও কথা নয়। এখন ঘুম। কথা হবে কাল সকালে।'

তাই বললাম টেলিফোনে।

নীচের দিকে চেয়েছিলাম বলেই দেখতে পেলাম, বিকারবিহীন মুখে তা শুনে জবাব দিল পুলিশ অফিসার, 'ঠিক আছে।'

লাইন কেটে গেল।

অফিসার ফিরে গেল পুলিশভ্যানে।

আমি বললাম দীননাথকে, 'এরপর?'

নিস্পৃহ স্বরে সে বললে, 'খেয়েদেয়ে ঘুম। মানে, মেয়েরা ঘুমোবে, আর এই বুড়ো মানুষ প্রফেসর ঘুমোবেন। আপনারা দুই ডাক্তার জাগবেন, আমি জাগব।'

'কাল ভোর পর্যন্ত? তারপর?'

'দেখা যাক।' বলে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইল দীননাথ। মনে মনে প্যাঁচ কষছে। ভাঙছে না। হয়তো প্রফেসরও তা জানেন।

কিন্তু বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করলাম সেই রাতেই।

মিষ্টি আর বৈশাখী হইহই করে রান্নাবান্না করে, সবাইকে নিয়ে উদরপূজার পাট সেরে শুয়ে পড়ল তিনজনে তিনখানা ঘরে; প্রফেসর একটা ঘরে, বৈশাখী তার পাশের ঘরে, মিষ্টি আর একটা ঘরে। পাশাপাশি তিনটে ঘরের দরজা রইল কিন্তু খোলা। সামনের করিডরে টহল দিয়ে গেলাম আমি, নীল আর দীননাথ। আলো জ্বলছে ঘরে ঘরে। করিডর থেকেই তিনজনকে দেখে যাচ্ছি পাঁচ মিনিট অন্তর। দেখলাম, একটু উসখুস করার পর তিনজনেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল পরম নিশ্চিন্তে— কারণ, আমরা তিন মূর্তিমান যে পাহারা দিয়ে যাচ্ছি গোটা বাড়িটায়।

এই পার্বত্য এলাকায় এমনিতেই রজনীর আগমনে চারদিক ঝিমিয়ে পড়ে। দূরে দূরে পাহাড়ের চূড়োগুলো ছায়াদৈত্যর মতন মাথা উঁচিয়ে থাকে।

ছাদে দাঁড়িয়ে গভীর রাতে পাহাড়-ঘেরা জঙ্গলগুলোর দিকে তাকিয়ে কেবল আমার গবেষণার কথাই ভাবতাম। ওদিককার জঙ্গল বহুদূরবিস্তৃত। উত্তরদিকে অনেক অনেক দূরে হিমালয়।

সেই রাতে গৃহবন্দি অবস্থায় মস্ত ছাদে মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছিলাম। আমার এই বাড়িটার

আশপাশে কোনও বাড়ি নেই, গবেষণার জন্যে শহর থেকে দূরে ইচ্ছে করেই একটেরে এই বাড়ি নিয়েছিলাম। রুগি আসে দক্ষিণ দিক থেকে— শহর ওইদিকেই জমজমাট। পুলিশ অফিস, সরকারি বাড়িও ওই দিকে।

আচমকা দেখলাম একটা মস্ত কালো পুলিশ গাড়ি উত্তরের পাকদণ্ডী পথ বেয়ে কচ্ছপ গতিতে নেমে আসছে নীচের দিকে।

খটকা লাগল। এত রাতে উত্তরের বিজন অঞ্চলে পুলিশ ভ্যান কেন?

আশ্চর্য! গাড়িটা আমার বাড়ির সামনে দিয়ে পুলিশ ঘাঁটির দিকে গেল না। দাঁড়িয়ে গেল বাড়ির সামনেই, আগে থেকে যে পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তার পেছনে।

মতলব কী? দল বাড়াচ্ছে নিশুতি রাতে? হানা দেবে চতুর্দিক থেকে?

সে রাতে চাঁদ উঠেছিল বলেই দূরের কালো ভ্যানকে কাছে আসতে দেখেছিলাম। এবার দেখলাম আর একটা দৃশ্য।

নবাগত ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল একজন ষণ্ডা পুলিশম্যান। ভেতর থেকে তার হাতে তুলে দেওয়া হল বিশাল সেই বস্তু— অতিকায় বাঁধাকপি অথবা পেঁয়াজের সংমিশ্রণ বললেও যার চেহারা বোঝাতে আমি অক্ষম।

ষণ্ডা পুলিশম্যান বৃহৎ বস্তুটা নিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে এল প্রথম পুলিশ ভ্যানের পেছনে। ভেতরে লোক ছিল— নিয়ে রাখল ভেতরে।

এইভাবে পর পর ছ'টা বৃহৎ বিস্ময় পাচার হল আগন্তুক ভ্যান থেকে প্রথম ভ্যানে। তারপর আগন্তুক ভ্যান ঘুরে চলে গেল উত্তরের পথেই— এসেছিল যে-পথে সেই পথে। শম্বুকগতিতে বিলীন হল পাহাড়ের আড়ালে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমে এলাম দোতলায়। আমার বিবর্ণ মুখ দেখে শক্ত হয়ে গেল দীননাথ, 'কী হয়েছে?'

বললাম, 'বৃহৎ বিস্ময়রা এসে গেছে। ছ'টা বিস্ময়। বিরাজ করছে অদূরে কালো ভ্যানের মধ্যে।

হেঁয়ালি প্রকল্প হেঁয়ালি থাক, নাইকো জানল পাঁচজনে...
দিদি ডাকছে, দিদি ডাকছে, নয়কো চোখ গনগনে!

ঘুম চুলোয় যাক প্রফেসরের। খবরটা প্রথমেই ওঁকে দেওয়া উচিত ছিল। দীননাথও তাই করল অবশ্য। মাঝের ঘরে চোখের ওপর আলো জ্বালিয়ে শুয়ে ছিলেন বৃদ্ধ। ঘুমোচ্ছেন কি মরে গেছেন, বোঝা মুশকিল। প্রায় নিথর দেহ। শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে অতি ক্ষীণভাবে, শুয়ে আছেন চিত হয়ে।

আসবার সময়ে দেখে এসেছি একইভাবে নিদ্রাদেবীর নিবিড় আরাধনায় মশগুল মেয়ে দুটো, দুজনেই শুয়ে চিত হয়ে।

পাশাপাশি তিনখানা ঘরে তিনজনেই যেন অদৃশ্য সুতোর টানে চিত হয়ে গেছে— তিনজনেরই দু'হাত দুপাশে।

অজানিত আশঙ্কায় শীতল শিহরন অনুভব করলাম শিরদাঁড়ায়। কেননা দীননাথ বলেছিল, এই বুড়ো বয়সে ঘুম তাঁর পাতলা বলেই জানি। এত পাতলা যে কেউ ঘরে ঢুকলেও তাঁর চোখের পাতা খুলে যায়। অথচ তিনি বেহুঁশ ঘুমে অচেতন হয়ে রইলেন। দীননাথ ললাট স্পর্শ করার পরেও নিথর হয়ে রইলেন।

দীননাথ উদ্‌বিগ্ন হল এইবার। থাবার মতন দুই হাতে খামচে ধরল প্রফেসরের দুই কাঁধ। ঝাঁকুনি মারল এত জোরে যে নড়া খুলে না যায়। সেইসঙ্গে কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা ডাক, 'প্রফেসর! প্রফেসর!'

কিন্তু প্রফেসর বুঝি কুম্ভকর্ণ হয়ে গেছেন। কী ঘুম! কী ঘুম! চোখের পাতা পর্যন্ত খুলতে পারছেন না।

দীননাথের হাতে প্রফেসরকে সঁপে দিয়ে আমি ছিটকে চলে গেলাম পাশের ঘরের দরজার সামনে। বৈশাখীও বুঝি অনন্ত নিদ্রায় অচেতন।

ধেয়ে গেলাম মিষ্টির ঘরের সামনে। কারণ, নীল দত্তর আকুল আহ্বান কানে ভেসে আসছিল, 'মিষ্টি! মিষ্টি! এ কী মড়ার ঘুম রে বাবা!'

কালবিলম্ব না-করে বাথরুমে দৌড়েছিলাম। এক বালতি জল আর মগ এনেছিলাম। পর পর তিনটে ঘরে গিয়ে মগের জল ঢেলে দিয়েছিলাম তিন নিদ্রাক্রান্তর মাথায়।

তিনজনেই যখন গা-মাথার জল মুছে নিয়ে অপরাধীর হাসি হাসছে জোর করে পরিবেশ লঘু করার জন্যে, একই ঘরে জমায়েত হয়ে, তখন আমি দৌড়ে গিয়ে সামনের ঘরের জানলার কাচ দিয়ে উঁকি দিলাম বাইরে।

চাঁদের আলোর সাহায্য না-পেলে দেখতেই পেতাম না শয়তান শিরোমণিদের মুখাবয়বগুলো। চঞ্চল প্রত্যেকেই। ছাদ থেকে দেখেছিলাম, প্রত্যেকেই নিরুদ্‌বিগ্ন, নিঃশঙ্ক। বিশেষ করে যখন উত্তর দিক থেকে আসা কালো ভ্যানের পেট থেকে বড় বড় জালার মতন বিকট বিশাল বস্তুগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যানের ভেতর পাচার করা হয়েছিল, তখন ওদের ভাবলেশহীন চৈনিক মুখেও যেন জয়োল্লাসের চাপা দ্যুতি দেখেছিলাম। যেন পুতুলের উল্লাস, আবেগহীন, যান্ত্রিক।

কিন্তু এখন দেখলাম, গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশম্যানগুলো পরস্পরের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। মাঝে মাঝে পুলিশ ভ্যানের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিচ্ছে। আমাদের এই বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

আরও লোক জড়ো হয়েছে রাস্তায়। তারা কিন্তু বিলকুল উত্তেজনারহিত। অপলকে চেয়ে আছে আমার এই বাড়ির দিকে।

শহর থেকেই নিশ্চয় হেঁটে হেঁটে এসেছে। আমার এই বাড়ি শহরের সীমানায়। খবর পেল কীভাবে? রাতের নাটক দেখাতে কে ওদের ডেকে আনছে?

ঠিক এই সময়ে একটা পুলিশ জিপ এসে দাঁড়াল ভ্যানের পেছনে। জিপ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আমার বাড়ির দিকে চেয়ে রইল আমার...

দিদি!

আমি তখনও চমকাইনি। তখনও দোটানায় পড়িনি। কিন্তু বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল ঠিক তখনই যখন পায়ে পায়ে আমার দিদি— আমার মাতৃসমা দিদি জানলার তলায় এসে দাঁড়িয়ে, ওপর পানে মুখ তুলে জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে খুব নরম, খুব স্নেহসিক্ত গলায় ডাক দিল, 'রোদ্দুর!'

সেই কোন ছেলেবেলায় দিদি আমাকে রোদ্দুর বলে ডাকত। রুদ্রাক্ষ না-বলে, বলত রোদ্দুর। আর বৈশাখীকে বলত, বৃষ্টি। আমরা মামা-ভাগনি মিলে বাড়ি দাপিয়ে বেড়াতাম, অতিষ্ঠ করে তুলতাম দিদি-জামাইবাবুকে। দিদি তখন খুব নরম গলায় আমাদের দামালি থামিয়ে দিত ওই নামে ডেকে। রোদ্দুর আর বৃষ্টি। কিন্তু সে তো অনেক... অনেক বছর আগে... যখন নেহাত বালক আর বালিকা ছিলাম। যখন আমি হলাম কিশোর, বৈশাখী হল কিশোরী— দিদিও আর আমাকে রোদ্দুর বলে ডাকেনি, বৈশাখীকে বৃষ্টি বলে ডাকেনি।

বহু বছরের ওপার হতে দিদির সেই স্নেহক্ষরিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'রোদ্দুর! বৃষ্টির ঘুম ভাঙল?'

আমাদের দামালিপনা টের পেয়েছে দিদি? কাণ্ডজ্ঞান ফেরাতে ছুটে এসেছে পুলিশ জিপে চেপে? এই দিদি আর সেই দিদি কি এক? নিশ্চয় তাই।

কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠল নীরস দীননাথের বিলকুল কাঠখোট্টা কণ্ঠস্বর, 'এই মরেছে! অ্যাকটিং দেখেই ভুলে গেলেন?'

দীননাথের চেহারা-টেহারাগুলো একটু আহাম্মক-আহাম্মক টাইপের হতে পারে। কিন্তু সেই চাঁদনি রাতের মায়াময় পরিবেশে দিদির স্নেহঝরা কণ্ঠস্বর আমার বাল্যজীবনের সুখস্মৃতির জাগরণ ঘটিয়ে মনের মধ্যে যে আবিলতার সৃষ্টি করেছিল, তা কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ছিড়েখুড়ে শূন্যে বিলীন হয়ে গেছিল ওর ওই কথার কশাঘাতে।

প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেয়েছিলাম আমার প্রায় হাজার কোটি মস্তিষ্ক কোষের মধ্যে। চেরেনকভ আলো নাকি আলোর গতিবেগকেও ছাড়িয়ে যায়। জাপানের কামিওকা মোজুমি খনির গভীরে এক বিস্ময়কর প্রকল্পের মাধ্যমে এই চেরেনকভ আলোর সন্ধান চলছে।

দীননাথের নির্দয় মন্তব্য এই চেরেনকভ আলোর গতিবেগকে টেক্কা দিয়ে একটা মতলবের ঝিলিক তুলে দিয়ে গেছিল নিমেষের মধ্যে।

মনে পড়েছিল, দীননাথের আদি মতলব, সময় নিতে হবে— ভোর পর্যন্ত। কেন, তা বলেনি।

তা না-জেনেই ফিসফিসিয়ে বলেছিলাম, 'সময় চাই তো কাল ভোর পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ।' চাপা গলা দীননাথের।

নীচের দিকে তাকিয়েই ছিলাম। ঊর্ধ্বমুখী দিদির প্রশান্ত আনন দেখে আর ভেতরটা গলে যাচ্ছিল না। সবই তো অস্বাভাবিক— পরিস্থিতি অস্বাভাবিক— দিদির এখানে পুলিশ জিপে চেপে আসাটাও অস্বাভাবিক। তার ওপর ওই প্রশ্ন, বৃষ্টির ঘুম ভাঙল?

দিদি জানল কী করে, বৃষ্টি, মানে, বৈশাখী ঘুমোচ্ছিল?

এমন সময়ে দেখলাম, সেলুলার হাতে সেই পুলিশ অফিসার জুতো খটখটিয়ে এগিয়ে আসছে।

দিদির পাশে এসে বোতাম টিপে সেলুলার তুলে দিল দিদির হাতে।

টেলিফোন বেজে উঠেছিল তার আগেই। দীননাথ রিসিভার তুলে নিয়ে এগিয়ে দিল আমার দিকে। রিসিভার হাতে নেওয়ার আগে দেখলাম, নিস্তব্ধ বাড়ি ঘণ্টাধ্বনিতে গমগমিয়ে উঠতেই ছুটে এসেছে সব্বাই— বৈশাখী দাঁড়িয়েছে জানলার সামনে।

কী আশ্চর্য! নিজের মাকে দেখে তার মুখে তিলমাত্র ভাবান্তরও দেখা যাচ্ছে না। সে মুখ যেন শ্যামল পাথর দিয়ে তৈরি।

রিসিভারে মুখ রাখলাম আমি। ইয়ারপিসে ভেসে এল দিদির নরম গলা, 'রোদ্দুর?'

'বলছি, দিদি।'

'আক্কেল হয়েছে তা হলে।'

'তার আগে তোমার বেআক্কেলটা জানা দরকার।'

'বেআক্কেল!'

'তুমি কে?'

'তোর দিদি।'

'পুরো নও।'

'না।'

'তা হলে?'

'আরও ভাল।'

'স্পষ্ট করে বলো।'

'টেলিফোনে তা সম্ভব নয়।'

'ভেতরে আসতে চাও?'

'চাই।'

'কিন্তু বেশি ভেতরে ঢুকতে দেব না।'

'তার মানে?'

'এই বাড়ির দোতলায় উঠতে পারবে না!'

'আটকাবি?'

'হ্যাঁ। একতলা থেকে দোতলায় যাওয়ার মাঝে গোলদরজা লোহাব মতন মজবুত। সেই দরজা বন্ধ থাকবে।'

'তা হলে কথা হবে কী করে?'

'একতলার চেম্বারে। শুধু তোমার সঙ্গে।'

'আমরা অনেকজন।'

'তোমরা?'

'হ্যাঁ, আমরা।'

'জোর খাটাতে যেয়ো না। এটা রিসার্চ হাউস। প্রয়োজনে শুধু একটা বোতাম টিপব— পুরো বাড়ি উড়ে যাবে। তোমরাও।'

ডাহা মিথ্যে বললাম।

দিদি পুলিশ অফিসারের দিকে চেয়ে চোখে চোখে কথা বলে নিল। শানানো সেই চোখ দেখেই প্রত্যয় এসে গেল, এ-দিদি আমার দিদি নয়। কিছু একটা। সেইটা কী, আমাকে তা জানতে হবে। ফাঁদ পাততে হবে।

রিসিভারে ভেসে এল দিদির পেলব কণ্ঠস্বর, 'দরজা খুলে দে— শুধু আমি যাব।'

দেখলাম, পুলিশ অফিসার অ্যাবাউট টার্ন করে ফিরে যাচ্ছে কালো ভ্যানের দিকে। সেদিকে নবাগতদের জোড়া জোড়া চোখ অনিমেষে তাকিয়ে এই বাড়ির দিকে।

গা শিরশির করে উঠল আমার। কিন্তু শক্ত রইলাম। আমি রুদ্রাক্ষ। আমি সেই বৃক্ষ যার বীজে জপমালা প্রস্তুত হয়। সেই আমি স্বয়ং মন্ত্র জপ করতে প্রস্তুত হয়েছি। মুখোশ খসানোর মন্ত্র। প্রহেলিকা উদ্ঘাটনের মন্ত্র। পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে গেছে উর্বর মস্তিষ্কে, এবার তার রূপায়ণ।

রিসিভার রেখে দিলাম। দ্রুত বলে গেলাম আমার হেঁয়ালি-প্রকল্পর প্রথমাংশ— বাকিটা রইল অনুক্ত।

শুধু বৈশাখীকে নিলাম সঙ্গে।

আসছে প্রাণ যাচ্ছে প্রাণ, প্রাণ থাকলেই প্রাণময়—
বড়ির দরকার হয় বই কী বড়ি থাকলেই দিতে হয়!

একতলার চেম্বার ঘরে টেবিলের এদিকে আসীন আমি আর বৈশাখী। ওদিকে দিদি। আমার দিদি। বৈশাখীর মা। পরনে সেই অদ্ভুত নীল শাড়িটা। যা ছিল দিদির খুব প্রিয়— আমাদেরও।

মাথার ওপর সিলিং থেকে ঝুলছিল গোল ফানুসের বিদ্যুৎবাতি। টেবিলের ওপর নীল কাপড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা ল্যাম্প। দিদি আঙুল তুলে সিলিং-এর আলো দেখিয়ে বললে, 'ওটা নিভিয়ে দে।'

টেবিল ল্যাম্প দেখিয়ে বললে, 'এটা জ্বেলে দে।'

তাই দিলাম। মামা-ভাগনি দু'জনেই শক্ত। দিদির চোখে কিন্তু মোমবাতির আলোর মতন স্নেহ-বিকিরণ। বললে, 'আমরা ইচ্ছে করলে এই বাড়ির আলো নিভিয়ে দিতে পারি। কিন্তু দিচ্ছি না— তোদের দরকার বলে।'

নিরুত্তর রইলাম।

দিদি বললে, 'টেলিফোন লাইনও ডিসকানেক্ট করে দিতাম।'

আমরা নির্বাক।

দিদি স্নেহ-সমুদ্রে ডুবিয়ে ডুবিয়ে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে গেল, 'আমার ওপর ভার পড়েছে, তোদেরকে বোঝানোর।'

'তুমি কে?'

'গোটা শহরের সব্বাই এই মুহূর্তে যা— আমিও তাই।'

'গোটা শহর?'

'হ্যাঁ। বাকি শুধু তোরা।'
'গোটা শহরকে বুঝিয়েছিলে কি এইভাবে?'
'না, আমাকে কেউ কি বুঝিয়েছিল? পরে বুঝলাম, এই ভাল, এই ভাল।'
'আশ্চর্য!'
'কী আশ্চর্য?'
'একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেললে না!'
'কেন ফেলব? আগের চেয়ে এখন অনেক ভাল আছি। এখন তো আরামের শ্বাস ফেলব।'
'আরাম?'
'তোর বন্ধু নীল আর তার বউ মিষ্টি এই অমৃত পেতে চলেছিল— তোরা ভুল করলি।'
'অমৃত! পান করেছ?'
'দূর বোকা! পুরনো শরীরকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই তো কাল্পনিক অমৃত।'
'তোমার পুরনো শরীর আর নেই?'
'না।'
'নীল আর মিষ্টির মতন ছাঁচে ঢালা শরীর?'
'হ্যাঁ।'
'পুরনো শরীরটা কোথায়?'
'তা জেনে তোর লাভ?'
'সেই তো আমার আসল দিদি। বৈশাখীর আসল 'মা'।'
'পুরনোর সবই তো আমার মধ্যে রয়েছে, আমিও আসল।'
'শুধু একটা জিনিস নেই।'
'সেটা কী?'
'আবেগ।'

এক লহমার জন্য দিদি নিরুত্তর রইল। তারপর যে হাসিটা হাসল, নিঃশব্দ হাসি। সোজা বাংলায় কাষ্ঠহাসি।

এবং সেই হাসি দেখামাত্র আমার সারা শরীরে ফের রোমাঞ্চ দেখা দিল। অথচ আমি ভিতু নই।

সেই মুখে চকিতে আবির্ভূত হল বরাভয়, 'একদম লাগবে না রে। কিছুই বুঝতে পারবি না!'
'কী বুঝতে পারব না?'
'ব্যথা। নতুন কায়া গ্রহণের যন্ত্রণা।'
'নতুন কায়া! কী থেকে?'
'দেখেছিস তাকে।'
'কাকে?'
'যে নামে বললে বুঝবি, সেই নামেই বলছি— শুঁটি।'
'শুঁটি! সেটা কী?'

'মটর শুঁটির মতন। খোসায় মোড়া।'

'উদ্ভিদ?'

'জীবন্ত। শুঁটি বলতে যা বুঝিস তা নয়।'

'জীবন্ত শুঁটি?'

'প্রাণময় শরীর যা যা করতে পারে, সজীব এই শুঁটিও তা করতে পারে। শরীরের সমস্ত জটিল দেহপ্রকরণ, দেহযন্ত্র হুবহু বানিয়ে নিতে পারে নিজের আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়ে।'

'সেই ক্ষমতাটার নাম প্রাণের স্ফুলিঙ্গ?'

'চমৎকার বলেছিস, রোদ্দুর। মাঝে মাঝে তোর মুখ দিয়ে সাহিত্যের ভাষা, দর্শনের ভাষা আগেও ছিটকে আসত— এখনও আসে। এখন তো আরও বেশি করে আসছে— গাছপালা নিয়ে গবেষণা করছিস তো! তাই তোকেই আমাদের দরকার। হাজার বছরের গবেষণাতেও যা তুই পাবি না— সেই লাভ হবে শুঁটির কৃপায়।'

'শুঁটি কি এক ধরনের ক্রমবিবর্তিত প্রাণ?'

'হ্যাঁ। অসীম প্রাচুর্যে ঠাসা— অবিশ্বাস্য ক্ষমতার বারুদ।'

'বারুদ!'

'হ্যাঁ। এর বেশি জানতে চাসনি। এরা ধরে, কিন্তু ধরা দেয় না।'

'হেঁয়ালি ছাড়ো। শুঁটির কাছে আত্মসমর্পণ করলে, মানে, তোমার ভাষায় ধরা দিলে, কী হবে?'

'শুঁটিই তোকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ঘুম ভাঙবার পর দেখবি, যা ছিলিস, ঠিক তাই আছিস, তোর ভাবনাচিন্তা, স্মৃতি, অভ্যেস, মুদ্রাদোষ— সব ঠিক আছে। তোর শরীরের শেষ পরমাণুটা পর্যন্ত অবিকল আগের মতনই থাকবে, তফাত একদম থাকবে না।'

এই শেষের কথাটায় আত্মবিশ্বাস কিন্তু তেমন প্রকট হল না। কোথাও যে একটা ফাঁক থেকে যাবে, দিদি তা জানে। সেই তফাত তার নিজের মধ্যেই রয়েছে। চোখের চাহনিতে চকিতে ভেসে গেল আত্মবিশ্বাসের সেই অভাব।

কোপ মারলাম ঝোপ বুঝে, 'যেমন আবেগ! যা তোমার মধ্যে নেই!'

দিদি শুধু চেয়ে রইল। চাহনিটা এবার বাস্তবিকই অপার্থিব। আর আমার চক্ষুভ্রম নেই। এ কাদের পাল্লায় পড়লাম?

চোখা প্রশ্নটা করলাম এবার, 'আগমন কোত্থেকে এই শুঁটিদের?'

একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিদি বললে, 'সে অনেক দূর থেকে।'

'রুটলেস ওয়ান্ডার ওই শুঁটি যদি তোমার কাছে 'কিছু' হয়, তা হলে তো তুমি নিজের শেকড়কে ভুলে গেছ।'

'শেকড়!' দ্বন্দ্বে পড়ে দিদি : 'শেকড়হীন বিস্ময়! হ্যাঁ, কথাটা ঠিক, এই পৃথিবীতে তাদের শেকড় নেই।'

'তোমাদেরও আর নেই। তোমরা এখন রুটলেস ক্রিচার্স।' বৈশাখীর ধারালো মন্তব্য।

এবং 'আমি জুড়ে দিলাম 'রুথলেস। নইলে জলজ্যান্ত মানুষগুলোর বডি ঢালাই করে

আসল মানুষগুলোকে উড়িয়ে দিচ্ছ! যাক, আগে বলো, এই রুটলেস আর রুথলেস ওয়ান্ডাররা এসেছে কোন চুলো থেকে। পাতালের নরক থেকে নিশ্চয় নয়?'

'না।' দুই চোখে দূরের স্বপ্ন ভাসিয়ে তোলার চেষ্টা করে দিদি, 'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে তা রয়েছে তাদের উৎসর জায়গায়।'

'বাঃ! শুঁটি অ্যান্ড কোম্পানির বেশ নির্ভরযোগ্য সারথি হয়ে গেছ দেখছি, শিখণ্ডীর কাজটা ভালই করে চলেছ!'

এই প্রথম একটা অদ্ভুত বিজাতীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই নিজেকে সংযত করে নিল দিদি।

মুখ খুলল কিন্তু পরক্ষণেই, 'শুঁটিদের তোরা দেখেছিস।'

'বাঁধাকপি যদি দানব হয়, সেইরকম।' 'আমার মুখটেপা টিপ্পনী।

'গাধা! শুঁটিকে যারা রাক্ষুসে বাঁধাকপি বলে, তারা গাধা!'

'এ-শুঁটি তো রাক্ষুসে খিদে নিয়ে গোটা শরীরটাকে গিলে নেয়।'

'উগরেও দেয়। একবারই সেই দৃশ্য তোরা দেখেছিস— নীল দত্তর শরীর যখন নবজন্ম নিচ্ছিল। মাঝপথে বাধা না-পেলে দেখতিস নীল এমন এক শক্তি পেত—'

'অমানুষিক মানুষ হয়ে গেলে যে শাস্তি পায়?'

আমার টিপ্পনী গ্রাহ্য না-করে বলে গেল দিদি, 'কী লাভ বাধা দিয়ে? এই যে শুঁটি, এরা তো প্রাণময় পদার্থ। শুঁটি যে রকম অনুকূল পরিবেশে অতিকায় হতে পারে, জটিল দেহগড়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে— অন্তর্নিহিত শক্তির দৌলতে এরাও তা পারে।'

'মূল প্রশ্নটার জবাব কিন্তু এখনও পাইনি। এরা এসেছে কোন জাহান্নম থেকে?'

'আ গেল! কথার কী ছিরি! জাহান্নম থেকে আসতে যাবে কেন? মুল শুঁটি যারা— প্রথম যারা ছুঁয়েছিল এই পৃথিবীর পদার্থ— তারা এসেছিল মহাশূন্য দিয়ে ভাসতে ভাসতে।'

'আক্কেল গুড়ুম করে দিলে দেখছি। বিটকেল বাঁধাকপিরা এসেছিল মহাশূন্য পথে?'

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের মূল ঘাঁটি থেকে। দৈবাৎ স্পর্শ করেছিল এই পৃথিবী। ভেসে যেতে যেতে পায়ের তলায় মাটি না-পেলে সব সত্তাই যা করে, এরাও তাই করেছে। কী করতে হবে, তা যে ওদের সত্তার অণুপরমাণুতে গাঁথা রয়েছে... এক থেকে অনেক হওয়া... পরদেহ আশ্রয় করে সেই রূপ ধারণ করা... তাদের সৃষ্টিই যে এই জন্যে... যে কাজের জন্যে তাদের আবির্ভাব এই মহাশূন্যের কোনও এক অঞ্চলে, সে-কাজ তো তাদের করতেই হবে। যার যা কাজ, তা না করে কি থাকা যায়?'

'কাজটা কী?' কণ্ঠে শ্লেষ-গরল ঢেলে দিয়ে শুধিয়েছিলাম আমি।

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গায় সব প্রাণের যা কাজ, সেই কাজ।'

'টিকে থাকা?'

'হ্যাঁ। ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রাণ রয়েছে... রয়েছে রকমারি রূপে... আমাদের ধারণার বাইরের রূপে... অনেক বৈজ্ঞানিক তা মানেন... অনেকে মানেন না... কিন্তু যা প্রমাণ করা যাচ্ছে না, তার যে অস্তিত্ব নেই, এটা কি ঠিক?'

'এ লড়াই বাঁচার লড়াই।' ঝাঁ করে ঝেড়ে দিলাম একটা রাজনৈতিক স্লোগান।

'সেইটাই তো নিয়ম রে। অতি অতি প্রাচীন গ্রহ যখন মরে যায়, সে-গ্রহের উন্নত প্রাণ সত্তা কি সেই গ্রহের সঙ্গেই সহমরণে যেতে চায়? না, টিকে থাকার ব্রত উদযাপনে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে?'

বৈশাখী বলল, 'তা হলে বলছ, এক মৃত্যুগ্রহ থেকে এসেছে হানাদার বিভীষিকারা?'

কপট বিস্ময় দেখিয়ে দুই চোখ প্রায় কপালে তুলে ফেলল 'দিদি' নামের বস্তুটি, 'বিভীষিকা? একটা গ্রহ তো হঠাৎ অক্কা পায় না— সময় নেয়। গ্রহের বাসিন্দারা আগেই তা টের পায়... সেইভাবেই নিজেদের তৈরি করে নেয়... ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোনও জায়গায় গিয়ে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে... এদেরও আছে সেই ক্ষমতা... বীভৎস হতে যাবে কেন?'

'ঘোর ফেলে মানিয়ে নেওয়া।' আস্তে বললাম আমি, 'সহাবস্থান তো নয়— গোরস্থান রচনা করা, তারপর দানোয় পাওয়া।'

'দানো!' অকস্মাৎ হি হি করে হেসে উঠল 'দিদি'। সে হাসিতে এমন একটা সুর ছিল যা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্ত প্রায় জল হয়ে এল।

কিম্ভূত কাণ্ড রে ভাই-ফিঙ্গার প্রিন্টও হার মানে...
কোষ-বিদ্যুতের কপি নিয়ে বডি-প্যাটার্ন নকল করে!

পরের মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে কথার তুফান চালিয়ে গেল দিদি নামের বিস্ময়-বস্তু, 'তুই নিজে বৈজ্ঞানিক হয়ে এরকম আকাট মূর্খর মতন কথা বলছিস? লক্ষ লক্ষ কণা তোর শরীরের প্রতি বর্গ ইঞ্চি ভেদ করে অবিরাম ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে না? তারা কি দানো? শুধু তোর শরীর নয়, এই পৃথিবী— গোটা সৌরজগৎকে ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এই কণা, কোথাও বাধা পাচ্ছে না, যেতে যেতে পালটে যাচ্ছে সেই কণা। রূপান্তরিত হচ্ছে অন্য এক প্রজাতিতে, অপ্রতিহত, প্রায় অশরীরী এই কণা যদি দানো না-হয়, তা হলে এই পৃথিবীতে আগন্তুক এই শুঁটিদের দানো বলা হবে কেন? তুই বৈজ্ঞানিক, তোর অজানা থাকার কথা নয় যে, সূর্য, অন্য তারা, নোভা বা সুপারনোভা ফেটে গেলে প্রচুর নিউট্রিনো ঠিকরে যায়। একটা নিউট্রিনোর যা ওজন, তার চেয়ে যদি ছেষট্টি লক্ষ গুণ ভারী হয় একটা ইলেকট্রন— তা হলে আকারে বিশাল হয়েও আগন্তুক শুঁটিরা দলে দলে ভেসে পড়বে না কেন নিউট্রিনো বন্যায়? গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে গিয়ে নিজেদের রূপান্তর ঘটাবে না কেন? রুদু... রুদু... (আমার ডাকনাম)... তুই ক্রমবিবর্তন অস্বীকার করতে পারবি কি? তা সত্ত্বেও এই পৃথিবীর অত্যুন্নত মানুষ আদিতে ভিন গ্রহ থেকে এসেছিল কিনা— সে-প্রশ্ন তো আজও রয়েছে? এই যে আমরা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছি— এটাও তো সেই একই ঘটনা, নয় কি?'

আমি হাঁ হয়ে গেলাম 'দিদি' নামক বিস্ময়-বস্তুর বাক্যধারা শ্রবণ করে। নেহাতই গৃহবধূ যদি আচম্বিতে অমর্ত্য সেনের মতন বাগ্‌ধারা বিতরণ করতে থাকে তবে পিলে চমকে যাওয়া স্বাভাবিক।

সুতরাং, আমার চোয়াল ঝুলে পড়েছিল সেই সময়ে। পাশ ফিরে অবশ্য দেখেছিলাম, ঠিক উলটো অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমার ভাগনির। সে দাঁতে দাঁত টিপে চোয়াল শক্ত করে ফেলেছে।

দাঁতে দাঁত ঘষেই শুধিয়েছিল বৈশাখী, 'কে তুমি?'

ছোট্ট প্রশ্ন। কিন্তু বিস্ফোরক প্রশ্ন। এক কণা পরমাণুর মধ্যে বুঝি প্রলয়-বিষাণের সংকেত।

ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। জবাবটা হল এই:

'পরগাছা। শুধু পরগাছা বললে কম বলা হবে— পারফেক্ট পরগাছা বলাই সঠিক। যাকে আশ্রয় করি, তাকে শোষণ করি না। বাঁচিয়ে রেখে উন্নততর করি, প্রাণের জটিল বিবর্তনের কয়েক ধাপ উঁচুতে নিয়ে যাই, জ্ঞান আর বিজ্ঞানের আরকে নতুন প্রাণকে সমৃদ্ধ করি।'

'যেমন করেছ তোমাকে?'

'নইলে জ্ঞানবিজ্ঞানের এত ফুলঝুরি ঝরালাম কী করে? আমার বিদ্যের দৌড় তো তুই জানিস।'

'সেই তুমি আর এই তুমি এক নও। দরকার পড়লে ছ'পা-ওলা পোকার মতন দেখতে ভিনগ্রহীর অবয়বও তুমি ধারণ করতে পারো?'

হাসল দিদি, 'কে কী রকম দেখতে, তা নিয়ে আমার দরকার নেই। আমাদের দরকার ধীমান সত্তা। এ-গ্রহে পা দিয়ে কুকুর ছাগল হয়ে গিয়েছিলাম প্রথমে— ঠকেছি। সেরা জীব মানুষ। ব্রেনওয়েভের প্যাটার্ন যার যত ভাল, আমরা অধিগ্রহণ করি সেই শরীর। এই গ্রহে বেস্ট ব্রেনওয়েভ মানুষের— তাই আমরা মানুষ হচ্ছি। যদি গাছ হত সেরা ব্রেনওয়েভের অধিকারী— আমরা হতাম গাছ।'

'ব্রে-ন ও-য়ে-ভ!'— থেমে থেমে বললে বৈশাখী।

'করোটি ভেদ করে বৈদ্যুতিক নির্গমন। প্রতি মুহূর্তে ঘটছে এই বহির্গমন— স্ক্রিনে তা ধরা যায়। মৃগী রুগি হোক কি সুস্থ মানুষ হোক— ইলেকট্রিক্যাল ইমানেশন ঘটেই চলেছে।'

বৈশাখীর চোখের পাতা পড়ছে না। আমারও তাই, এসব কী শুনছি? দিদি বলে যাকে জানতাম, তার পেটে বোমা মারলেও তো এসব জ্ঞান-সার বেরোবার কথা নয়।

বক্তা দেখছে আমার অনিমেষ অবস্থা। উপভোগ করছে। আর বলে যাচ্ছে, 'শুধু কি ব্রেন? গোটা শরীর থেকে, প্রত্যেকটা কোষ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে অদৃশ্য তরঙ্গ— সে তরঙ্গকে ঘরের চার দেওয়াল আর কড়িকাঠ-মেঝে দিয়েও আটকে রাখা যায় না। অথচ তা বেরোচ্ছে— নিঃশব্দে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্ষমতা থাকলে লুফে নেওয়া যায় সেই তরঙ্গ।'

ভুরু কুঁচকে গেছে। মা যে নেই, এ-বিশ্বাস নিবিড়তর হয়েছে বৈশাখীর। কথার স্রোত কিন্তু থামছে না, 'বিশু (বৈশাখীকে আদর করে বিশু নামে ডাকত আমার দিদি), তোর শরীরেরও নিজস্ব একটা প্যাটার্ন আছে। আছে প্রত্যেকটা সজীব প্রাণীর। যার সঙ্গে তুলনা চলে শুধু ফিঙ্গার প্রিন্টের। একটার সঙ্গে আর একটার ফারাক থাকবেই। জীবন্ত কোষদের বনেদ হচ্ছে এই নিজস্ব প্যাটার্ন— প্রাণময় কোষদের প্রাণ। খুদে খুদে ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স-লাইন দিয়ে গড়া এই প্যাটার্ন প্রত্যেকটা পরমাণুকে ধরে রেখে দিয়েছে নিজেদের জায়গায়। শরীর যখন পালটায়, এই অ্যাটমিক ব্লু-প্রিন্টও পালটায়। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঘটে চলেছে পরিবর্তন। খুবই খুদে পরিবর্তন। অ্যাটমিক নকশাও পালটে পালটে যাচ্ছে তালে তাল মিলিয়ে। পরিবর্তন ঘটছে খুবই কম হারে শুধু ঘুমের সময়ে। শরীর তখন পালটায় খুবই কম মাত্রায়। বিশু, রুদ্র, কী বলতে চাইছি, এবার কি বুঝেছিস?'

জবাব দিলাম আমি, 'বিলক্ষণ বুঝেছি। ঘুমের সময়ে আমাদের শরীরের নকশা পালটায় যৎসামান্য— ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বডি লুঠ করার মোক্ষম সময় সেইটা, ঘুমে যখন অচেতন।'

'মাথা খুলেছে। ঘুমের সময়ে প্যাটার্ন গায়েব করা দরকার। আমরা তাই করি। একটা বডি থেকে আর একটা বডিতে যেন স্থির বিদ্যুৎ চলে যায়। পরিষ্কার হল?'

'হল।' বৈশাখীর বিদ্যুৎ-সম মন্তব্য।

'জটিল পারমাণবিক প্যাটার্ন ট্রান্সফার করা হয় ঠিক এইভাবে— একটা প্যাটার্ন চলে যাচ্ছে আর একটা আধারে। প্যাটার্ন অনুযায়ী তৈরি হয়ে যায় আধার— আধারের প্রতিটা কোষ হুবহু আগের মতন গড়ে না-ওঠা পর্যন্ত প্রবাহ থাকে অব্যাহত। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু একই রকম। বিল্ডিং ব্লক। একটা শরীরের ইট দিয়ে গড়া হচ্ছে আর একটা শরীর। আগের শরীরটার সমস্ত বিল্ডিং ব্লক, মানে, পরমাণু নতুন শরীরে চলে যাওয়ার পর কী থাকা উচিত আগের শরীরের জায়গায়? কয়েক মুঠো ধুলো। বিশু, রুদু— জানতে চাইছিলি আমার আগের শরীর কোথায়? নেই। ওই বাড়িরই খাটে কয়েক মুঠো ধুলো হয়ে পড়ে ছিলাম। দ্বিতীয় 'আমি' নিজের হাতে তা সাফ করেছি।'

বারুদ বারুদ বারুদ বারুদ বিকট কপিও এখন বারুদ...
ছুটছে 'রে' কাটছে তারা... মরুক মরুক সবাই মরুক!

সামলে নিয়ে শুধোলাম, 'তোমাদের বর্তমান বক্তব্যটা সংক্ষেপে শেষ করো। ঘড়িতে এখন বাজে রাত দুটো।'

'ঘুম পাচ্ছে?' 'দিদি' নামের রহস্যময়ী বললে।

জোর করে হাই তুললাম। ঘুমের টানে চোখে যেন জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল এমন ভানও করলাম। রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মুছে নিলাম। বললাম, 'স্বাভাবিক। সারাদিন যা ধকলের মধ্যে রেখেছ।'

উত্তরটা এল স্নেহার্দ্র স্বরে, 'ঘুমটাই তোর এখন দরকার। বিশুরও দরকার। ঘুমের কোলে ছেড়ে দে নিজেদের— আরাম পাবি।'

'আরাম হারাম হ্যায়।' রসিকতা করে গেলাম ঘড়ির ডায়ালের দিকে নজর রেখে।

এই প্রথম ধূর্ত রোশনাই দেখলাম মহাকাশ আগন্তুক আমার 'দিদি' পরিচয়ধারিণীর দুই চোখে। কথা বলল কিন্তু সরস ভঙ্গিমায়, 'জগন্নাথের রথ চলেছে মহাকাশের রাজপথ বেয়ে— কে রোধে তার গতি।'

'তোমরা সেই জগন্নাথের রথ?'

'বলা বাহুল্য। আমরা অপ্রতিরোধ্য। আমরা মহাকায় নয়... আমরা আতঙ্ক নয়... কিন্তু আমরা একটা শক্তি... এই শক্তি শুধু ছুটেই চলে সামনের দিকে সমস্ত বাধা তছনছ করে দিয়ে...'

'তছনছ করে দিয়ে শুধু নয়। বলি আমি, 'আত্মসাৎ করে নিয়ে।'

'আরও ভাল করে গড়বার জন্যে। আমরা শক্তি দিচ্ছি... শক্তি নিচ্ছি... আরও অপ্রতিরোধ্য আরও দুর্বার হয়ে উঠছি।'

'বাঃ! আইনস্টাইনের E=mc2 মনে করিয়ে দিলে দেখছি।

'বস্তু রূপান্তরিত হচ্ছে শক্তিতে, শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে বস্তুতে?— হ্যাঁ, আমরাও তাই। শক্তিরূপে ছুটে চলেছি মহাশূন্য ভেদ করে... আধারের সন্ধান পেলেই বস্তু হয়ে যাচ্ছি।'

'বিকট বাঁধাকপি?'

'গাধা! ওর নাম খুবজোর শুঁটি হতে পারে।'

'শুঁটির চাষ-আবাদও চলছে নাকি পৃথিবীতে?'

'চলছে বই কী। নইলে এত শুঁটি আসছে কোত্থেকে? পৃথিবীতে ল্যান্ড করেছে মাত্র কয়েকজন— তারপর চাষ-আবাদ করে বংশবৃদ্ধি করতে হয়েছে।'

'চাষটা করল কোন চাষি?'

'নিজেরাই। জানলা দিয়ে দ্যাখ।'

দেখলাম। চাঁদনি রাতের আকাশে আচমকা দেখা গেল দুটো বিশাল বাঁধাকপি জাতীয় বস্তু। ভাসছে ফানুসের মতন।

'এল কোত্থেকে?' আমার প্রশ্ন।

'গাড়িতে আনা হয়েছিল তোদের জন্যে— যাতে তোরা দেখতে না-পাস। বিশু, মিষ্টি আর বুড়োটার জন্যে ছিল গাড়িতে। গাড়ি থেকেই এবার দুটো আকাশ বিহার করতে বেরিয়েছে— আসবে তোদের কাছেই।'

'আমাদের কাছে কেন?'

'ঘুমোতে তোদের হবেই। দরজার বাইরে ওরা থাকবে। তারপর... তারপর...'

বলতে বলতে বিশাল কিম্ভূত বস্তু দুটো আকাশ থেকে জেপলিনের মতন ভেসে নেমে এল আমার দরজার সামনে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দিদি বললে, 'এবার তোরা ঘুমো— আমি যাই।'

'শুধু আমি আর বৈশাখী?'

'তোদের ঘুম এসে গেছে, তাই ওরা কাছে এসেছে। আমরা জোর খাটাই না রে— প্রত্যেকটা মানুষের মঙ্গল চাই। ওপরে যারা আছে— তাদের জন্যে বস্তুরূপী শক্তি ওয়েট করছে গাড়ির মধ্যে। কাল ভোরের মধ্যেই তোরা হবি আমাদেরই একজন।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল দিদি। আমিও গেলাম। সদর দরজা একটু ফাঁক করে দিদিকে ঠেলে বের করে দিলাম। ঝট করে দেখে নিলাম কালান্তক মহাকায় কুমড়ো সদৃশ বস্তু দুটোকে। অবস্থান করছে দরজার সামনেই।

বন্ধ করলাম দরজা। সত্যিই এবার হাই তুললাম।

ঘুমোব তো বটেই। তার আগে মতলব হাসিল করব।

দুটো কঙ্কাল নিয়েই প্রবঞ্চনা নাটক মঞ্চস্থ করব ঠিক করে রেখেছিলাম। এরাও দেখছি পাঠিয়েছে ঠিক দুটো বস্তুরূপী শক্তি। দুটো আধারের জন্যে। আমি আর বৈশাখী সেই আধার।

আগে জানলাটায় পরদা টেনে দিলাম। বাইরে থেকে যেন দেখা না যায়, কী কাণ্ড করছি আমরা মামা-ভাগনি।

ভাগনিকে বললাম, 'এবার নামা ভূত আর পেতনিকে।'

'মামা, মশকরার সময় এটা নয়।'

'মশকরা তো করছি না। ভূত আর পেতনিকে দেখালাম তোকে— এর মধ্যে ভুলে গেলি?

'ওই কঙ্কাল দুটো?'

'হ্যাঁ। ওদের নিয়েই ফন্দি এঁটে রেখেছি— কাউকে বলিনি।'

'কী ফন্দি, মামা?'

'ধামা বাজানোর ফন্দি। রগড় করার ফন্দি। মাঝখান থেকে টাইম কিল করার ফন্দি। যাতে রাত ভোর হয়ে যায়। দীননাথ নাথ পইপই করে বলেছে, সকাল পর্যন্ত ওদের আটকে রাখতে হবে। তারপর কী করবে সে, জানি না, জানতেও চাই না। পয়লা নম্বর ফেরেব্বাজ এই দীননাথের ওপর আমার আস্থা যখন এসে গেছে, তখন ভূত-পেতনির নাটক শুরু হোক এবার। এ কী, হাই তুলছিস যে! ঘুমোলেই সর্বনাশ! জেগে থাক... জেগে থাক।'

হাই চাপতে চাপতে বললে বৈশাখী, 'কাঁহাতক জেগে থাকব?'

আমি শুধু বললাম, 'জেগে থাক, জেগে থাক।'

বলতে বলতে আমিও অবশ্য নাতিদীর্ঘ একটা জৃম্ভন ত্যাগ করলাম এবং আর কালবিলম্ব না-করে পাশের ছোট ঘরটার দিকে ধেয়ে গেলাম। খুলে ফেললাম দরজা। কাচের আলমারিটায় দাঁড়িয়ে ভূত আর পেতনি নামের কঙ্কাল দুটো যেন নিঃশব্দে হেসে উঠল আমাকে দেখে। বরাবরই আমার তাই মনে হয় অবশ্য। কঙ্কালদেহী এই প্রাণহীন সত্তা দুটো আমাকে দেখলেই যেন হেসে কুটিপাটি হতে চায়। আমার তাতে রাগ হয় না— বরং মজা পাই। ভাবি, একদিন আমিও তো ওইরকম কঙ্কাল হয়ে যাব। তখন অহংকার-টহংকার আপনা থেকেই চলে যায়।

ভূতকে সন্তর্পণে নামিয়ে আনলাম ওর কাঠের সাপোর্ট থেকে। বৈশাখীও হাত দিল। ধরাধরি করে এনে তাকে শুইয়ে দিলাম সদর দরজার সামনে করিডরের ওপর।

অতঃপর আনলাম পেতনিকে। তাকে শোয়ালাম ভূত-কঙ্কালের পাশে।

গলা নামিয়ে বললাম ভাগনিকে, 'ওরা চেয়েছিল তোকে আর আমাকে কনভার্ট করতে। তাই তোর আর আমার জায়গায় শুয়ে রইল ভূত কঙ্কাল আর পেতনি কঙ্কাল।'

'তারপর?' বৈশাখীর প্রশ্ন। আমার ফন্দি যে এখনও অস্পষ্ট ওর কাছে।

চলে এলাম পাশের ছোট ঘরে। খুললাম ইন্সট্রুমেন্ট ক্যাবিনেট, বের করলাম দুটো বড় সাইজের হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। রবারের ফেট্টি টেনে বাঁধলাম আমার আর বৈশাখীর বাঁ কনুইয়ের ওপরে। শিরা যখন ফুলে উঠল, বৈশাখীকে দিলাম একটা সিরিঞ্জ, আর একটা রাখলাম আমার ডান হাতে। বললাম চাপা গলায়, 'নিজের রক্ত টেনে নিয়ে সিরিঞ্জ ভরতি কর।'

তাই করল বৈশাখী। একই সঙ্গে আমার সিরিঞ্জ ভরতি করে টেনে নিলাম আমার রক্ত।

তিনলাফে চলে এলাম করিডরে শোয়ানো কঙ্কাল দুটোর পাশে। ভূত কঙ্কালের সব ক'টা হাড়ের ওপর আমার গায়ের রক্ত পিচকিরি দিয়ে ছড়িয়ে দিলাম। বৈশাখীকে বলতে হল না। তার গায়ের রক্ত পিচকিরির মতন ছুঁচের ডগা দিয়ে ছড়িয়ে দিল পেতনি কঙ্কালের সমস্ত হাড়ে।

বললাম খাটো গলায়, 'মাই ডিয়ার ভাগনি, আমার প্ল্যানটা মাথায় ঢুকেছে?'

নিঃশব্দে এই প্রথম প্রাণ খোলা হাসি হাসল আমার ডাক্তার ভাগনি, 'খুব ঢুকেছে। প্রতিটি

কোষ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইমানেশন বাইরে ছুটে যাচ্ছে যে বডি দুটো থেকে— কঙ্কাল দেহ নিয়ে তারা তো ঘুমিয়েই আছে। প্যাটার্ন পেয়ে গেল বাঁধাকপিরা। এবার—'

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম, তা চক্ষু ছানাবড়া করে দেওয়ার মতন দৃশ্যই বটে।

পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল বিদ্যুৎগতিতে।

কঙ্কালদেহের সর্বত্র আবির্ভূত হল তুলোর আঁশ অথবা কম্বলের ফেঁসোর মতন ধূসর বস্তু। নিমেষে নিমেষে ঢেকে গেল অস্থি... ফেঁসো ঢাকা দুটো বীভৎস মূর্তি পরিগ্রহ করেই...

চোখের পলক ফেলবার আগেই মেঝের ওপর মুঠো কয়েক ধুলো ছাড়া আর কিছুই নেই।

উধাও হয়েছে দুই কঙ্কাল!

ঝট করে ফাঁক করলাম সদরের পাল্লা।

দরজার সামনে বিকট শুঁটি দুটোর অবস্থা কাহিল। জায়গায় জায়গায় খোসা খসে গেছে... ঝুরঝুর করে মিহি কণা মেঝেতে পড়ছে... আস্ত কোনওটাই নয়।

ধ্বংসস্তূপ!

ঘড়ি দেখলাম, ভোর চারটে, কানে শুনলাম, কাক ডাকছে।

গোল দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে এল কানে।

দীননাথ নামছে সিঁড়ি দিয়ে গোটা বাড়ি কাঁপিয়ে। লোক একখানা বটে!

মিনিটের মধ্যেই দোতলার সবাই এসে গেল ভূতল শয্যার ধূলির স্তূপ দেখতে।

দরজা বন্ধ করে দিলাম। কারণ, পুলিশরা ভ্যান থেকে নেমে আসছে এই দিকে। সঙ্গে আমার একদা 'দিদি'।

দলবল নিয়ে চম্পট দিলাম দোতলায়। বন্ধ করে দিলাম মাঝের গোল দরজা। এ-দরজা ভাঙতে গেলে এখন হাতি আনতে হবে।

নীচের তলায় সদর দরজায় দুরমুশের মতন চোট পড়ছে। পরমুহূর্তেই কানে ভেসে এল রিভলভার নির্ঘোষ।

নাইট-ল্যাচ উড়ে গেল। দরজা এখন দু'হাট।

আমরা এখন ছাদে।

উত্তরের হিমালয় এখান থেকে দেখা যায় না আগেই লিখেছি— তবে একটা আভাস পাওয়া যায়। কালিদাস ইঙ্গিতে হিমালয়কে দীর্ঘতম বলেছিলেন, পূর্বাপর তোয়নিধি অবগাহন করে পৃথিবীর মানদণ্ড রূপে তার অবস্থান; ইকবাল বলেছিলেন হমসায়া আসমাঁকা, অর্থাৎ কিনা, হিমালয় আকাশের প্রতিবেশী।

তা, আকাশের যে প্রতিবেশী, সে নিশ্চয় বিলক্ষণ উঁচু। এতদূর থেকে তার দর্শন না-পাওয়া গেলেও উচ্চতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। একটা ঘোরালো ঝাপসা ভাব— পুবের ফরসা হয়ে যাওয়া আকাশের তুলনায় তা রীতিমতো রহস্যময়।

প্রফেসর লম্বা লম্বা হাই তুলতে তুলতে উত্তরের সেই উত্তুঙ্গ আবাসের দিকে তাকিয়ে

থেকে বললেন আমাকে, 'ডক্টর রুদ্রাক্ষ গুপ্ত, থ্রি চিয়ার্স ফর ইয়োর এক্সপেরিমেন্ট।'

হাই চাপতে চাপতে ব্যাজার মুখে বললাম, 'ছাদে টেনে নিয়ে এলেন কেন? ভোর পর্যন্ত ওদের ঠেকিয়ে রাখতে বললেন কেন?'

'কারণ, আপনি যা সারারাত ধরে জানলেন, আমি আর দীননাথ তা অনেক আগেই জেনেছিলাম। জেনে শুনেই এখানে এসেছিলাম।'

'আপনি তো এসেছেন নীল দত্তর আমন্ত্রণে।'

'সেটাও ঠিক, আমি যা বললাম, সেটাও ঠিক।'

'হেঁয়ালি হচ্ছে?'

'হেঁয়ালি নয়... হেঁয়ালি নয়, বৎস রুদ্রাক্ষ, পরম সত্য। ঊর্ধ্বগগনে একটা স্যাটেলাইট নিরন্তর নজর রেখে চলেছে এই অঞ্চলটার ওপর।'

'সে কী?' ঊর্ধ্বমুখী হলাম আমি।

'উঁহু, খালি চোখে তাকে কি দেখা যায়? সে যে স্পাই উপগ্রহ। তাকে বসানো হয়েছে এখানকার অতিকায় বাঁধাকপিদের নজরে রাখার জন্যে।'

'কে খবর দিল?'

'স্পাই স্যাটেলাইট। ভারতের পুরো উত্তরাঞ্চল তারা নজরে রেখেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁধাকপির মতন বস্তু হালকা তুলোর মতন ভাসতে ভাসতে কেন এখানে এসেছিল, সে খবর এই আকাশি গোয়েন্দারাই দিয়েছিল, আমারও টনক নড়েছিল। তারপরেই খবর দিল নীল— লোকজন কেন জানি পালটে যাচ্ছে, নিকট আত্মীয়কেও আর কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। তাই আমার খটকা লাগল। চলে এলাম।'

'বুঝলাম, কিন্তু ভোর পর্যন্ত সবুর করলেন কেন? ছাদে জড়ো হলেন কেন? গোল দরজা ভাঙছে, আওয়াজ পাচ্ছেন? নীচে তাকিয়ে দেখুন, পিলপিল করছে মানুষ— পালাবার পথ নেই।'

'আছে, বৎস, আছে।' বলেই দীননাথকে চোখের ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর।

বুকপকেট থেকে সেলুলার ফোনের মতন একটা যন্ত্র বের করে বোতাম টিপে গেল দীননাথ।

হৃষ্টকণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'সিগন্যাল চলে গেল। এবার আসছে।'

'কে আসছে।'

'হেলিকপ্টার।'

কথা শেষ হতে না হতেই উত্তরের উত্তুঙ্গ অপচ্ছায়াসম কুহেলীমায়া ভেদ করে উড়ে এল পরপর তিনখানা হেলিকপ্টার। আর্মি কপ্টার। গুরুগম্ভীর গর্জনে দিকদিগন্ত প্রকম্পিত হতেই রাস্তার আর মাঠের নিশ্চল-চক্ষু মানুষগুলো ঊর্ধ্ববদন হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে।

দোতলার গোল দরজা ভাঙার আওয়াজও থেমে গেল। সদর দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম পুলিশগুলোকে।

হেলিকপ্টার ততক্ষণে মাথার ওপর এসে গেছে। একটা কপ্টার হঠাৎ বাকি দুটোর থেকে

আলাদা হয়ে গিয়ে গোটা বাড়িটাকে চরকিপাক দিচ্ছে আর এক নাগাড়ে ধোঁয়া-বোমা ফেলে যাচ্ছে। কালো ধোঁয়া বাড়ির ছাদের দিকে উড়ে আসার আগেই অন্য একটা কপ্টার থেকে দড়ির মই নেমে এল ছাদের ওপর। প্রফেসর উঠে গেলেন বৈশাখী আর মিষ্টিকে নিয়ে। সেই কপ্টার একটু সরে যেতেই আর একটা এসে গেল মাথার ওপর। আবার নেমে এল দড়ির মই। এবার উঠে গেলাম আমি, নীল আর দীননাথ।

ভেতরে উঠে দেখলাম সিক্স-সিটার কপ্টারে তিনজন আর্মি জোয়ান বসে অদ্ভুত একটা অস্ত্রের নলচে নামিয়ে রেখেছে নীচের দিকে। নলচেগুলোর মুখ কালো ভ্যানের দিকে— যার মধ্যে আছে বিকট বাঁধাকপি।

রে-গান নিশ্চয়। যদিও কোনও রে দেখতে পেলাম না। অথবা, অজানা কোনও শক্তি! ব্রহ্মাস্ত্র-ট্রহ্মাস্ত্র কিছু একটা হবে। মিলিটারি সিক্রেটটা আজও জানতে পারিনি।

যা দেখতে পেলাম, তা এই:

প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে গোটা ভ্যানটা উড়ে গেল— বিস্ফোরণের ধাক্কায় তাসের বাড়ির মতন আমার অমন মজবুত বাড়িটা হেলে পড়ল। না-মানুষ মানুষগুলো যেন শূন্যে কবন্ধ আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্যুত অবস্থায় ছিটকে গেল। সেই সঙ্গে ছিটকে সরে গেল ধোঁয়া।

এক বিস্ফোরণেই না-মানুষদের একটা শিবির শেষ।

এবার তিনটে কপ্টারই উড়ে চলেছে উত্তরের দিকে— যেদিক থেকে এসেছিল কালো ভ্যান অতিকায় বাঁধাকপিদের নিয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড় পর্বত টপকে এসে গেল একটা পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায়।

দেখলাম, অনেক নীচে লাইন বন্দি অতিকায় বাঁধাকপির চাষ চলছে মাঠের ওপর।

আচমকা মনে পড়ে গেল, আমার একদা 'দিদি'র একটা রহস্যময় উক্তি, 'অসীম প্রাচুর্যে ঠাসা... অবিশ্বাস্য ক্ষমতার বারুদ... এর বেশি জানতে চাসনি... এরা ধরে, কিন্তু ধরা দেয় না।'

বারুদ!

ভ্যানের প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ চোখের সামনে ভেসে উঠল!

এই মুহূর্তে যদি মাঠ ভরতি হাজার হাজার শুঁটির বারুদ বিস্ফোরিত হয়— আমাদের তিন তিনখানা কপ্টার ধ্বংস হবে চোখের পলকে।

দীননাথকে বললাম আমার আশঙ্কার কথা।

ধুরন্ধর দীননাথ তৎক্ষণাৎ কনট্যাক্ট করেছিল অন্য কপ্টারে আসীন প্রফেসরকে। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহা খলিফা। উনি সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করেছিলেন শুঁটিদের আসন্ন রুদ্র প্রতাপ দৃশ্য।

উপত্যকার মাঝবরাবর গেলেই যা শুরু হয়ে যেত, আমরা আর চম্পট দেওয়ারও সুযোগ পেতাম না— তা শুরু হয়ে গেল আমরা যখন আবাদি জমির কিনারা থেকে মোড় নিয়ে বেগে পলায়ন করছি, ঠিক তখন।

চাষের জমির সব ক'টা শুঁটি একসঙ্গে ফেটে গেল।

সম্মিলিত সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা চলে পারমাণবিক বিস্ফোরণের...

আমাদের তিনটে হেলিকপ্টারই ততক্ষণে পাহাড়-পাঁচিলের ওপার-আড়ালে চলে গেছে। তাই আজও মরিনি।

কঙ্কালের টংকার

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তো হেসেই কুটিপাটি।

'দুর! ভূত আবার আছে নাকি? যা চোখে দেখা যায় না, তাকে বিশ্বাসও করা যায় না।'

ফোকলা মাড়ির বাহার দেখে হাড়পিত্তি জ্বলে গেল আমার। তবুও মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হল। প্রফেসরকে বিশ্বাস করাতে না-পারলে ভূত নিয়ে গবেষণাটা করবে কে? মুরোদ তো সবার জানা আছে। যত বড় বৈজ্ঞানিকই হোক না কেন, দাঁতকপাটি লেগে যাবে কায়াহীনদের দেখলে।

আমি অবশ্য যাদের দেখেছি, তারা কায়াহীন নয়।

সহজ গলায় বললাম, 'চোখে তো অনেক কিছুই দেখা যায় না—'

'ভূতকে তো নয়ই।'

'আর যদি দেখাতে পারি?'

'ভূত দেখাবে?' টাক মাথার দু'পাশের আঁটি আঁটি চুলগুলো খামচে ধরে উঠে বসলেন প্রফেসর, 'দেখাতে পারবে?'

মিটিমিটি হাসলাম। ওষুধ ধরেছে।

বললাম, 'পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'যথা?'

'ভূত নিয়ে গবেষণা করতে হবে।'

'ধেত। ভূত নিয়ে গবেষণা করলে লোকে বলবে কী? আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা কখনও ভূত নিয়ে গবেষণা করে না।'

'সেকালে তো করেছিল!'

'সেকাল মানে?'

'টমাস এডিসনের সময়ে।'

জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর, 'খবরটা জানা আছে দেখছি।'

'নইলে আর আপনার শাগরেদি করছি কেন।'

'কী জানো?'

'টমাস আলভা এডিসন, যাঁর নাম ঘরে ঘরে জানে ইলেকট্রিক বাল্‌ব আবিষ্কারের জন্যে...

আরও অনেক অনেক আবিষ্কারের জন্যে... যেমন, কলের গান, যেমন—'

ধমকে উঠলেন প্রফেসর, 'আরে গেল যা! বক্তিমে দিতে কে বলেছে? ভূত নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছে যদি না-শোনাতে পারো, তা হলে আমি এর মধ্যে নেই।'

সাততাড়াতাড়ি বললাম, 'এডিসন নিজেই করেছিলেন। ভূত দেখার কল পর্যন্ত আবিষ্কার করেছিলেন।'

'হুম্!' খচমচ করে টাক চুলকে প্রফেসর বললেন, 'ঠিক হ্যায়। তা হলে আমিও করব।'

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়েছিল এর পরেই।

তখন সবে সন্ধে।

পোড়ো বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি আর প্রফেসর। একেবারে সামনে অবশ্য নয়, জঙ্গলের মধ্যে। গতবারেও এখানে লুকিয়ে থেকে দেখেছিলাম ওদের।

জায়গাটা সুন্দরবন যাওয়ার পথে পড়ে। বকখালি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সেখানেও বকখালির মতো ঝাউবন আছে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে, আর আছে সুন্দরী আর গরান গাছের জঙ্গল। টাইগার প্রোজেক্ট এলাকার মধ্যে নয়। বাঘের ভয় নেই। তবে পাখি আছে বিস্তর। সজনেখালিতে লোকে যায় মেলাই পাখি দেখতে— এই জায়গাটার খবর এখনও পায়নি।

আমি কিন্তু পাখি দেখতে আসিনি— এসেছিলাম শিকার করতে। নিরিবিলিতে জঙ্গলের অ্যাডভেঞ্চারও হবে, পাখি শিকারও হবে।

পোড়োবাড়িটা তখনই চোখে পড়েছিল। সামনে বড় বড় থাম। কয়েকটা ভেঙে পড়েছে। ছোট ছোট ইট স্তূপাকারে পড়ে আছে। কয়েক জায়গায় দেওয়ালও ধরণী আশ্রয় করেছে। তা সত্ত্বেও পড়ি পড়ি করেও বাড়িটা পড়তে পারছে না বট অশ্বত্থের শেকড় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকায়।

ঘন জঙ্গল ঘিরে ধরেছে বাড়িটাকে। কিন্তু আমার খটকা লেগেছিল। বাড়ির সামনে বেশ বড় একটা মাঠ। তাতে একটা ঘাস পর্যন্ত নেই। গাছপালা তো দূরের কথা। আর, মাটিও যেন ঝলসে গেছে। সুন্দরবনের জঙ্গলে এ-দৃশ্য বিরল।

তারপরেই হঠাৎ শুরু হয়ে গেছে নিবিড় অরণ্য। ঝাউবনটা আছে একেবারে সমুদ্রের ধারে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়। দেখা যায়। এ-বাড়ি যিনি বানিয়েছিলেন, তিনিও নিশ্চয় প্রকৃতিবিলাসী ছিলেন। আমার মতোই। তাই এমন নিরিবিলিতে এমন পেল্লায় প্রাসাদ বানিয়েছিলেন জঙ্গল, সমুদ্র আর বনচর প্রাণীদের দেখবেন বলে।

তারপর তিনিও অক্কা পেয়েছেন, অমন সুন্দর ইমারতখানাও ভাঙতে ভাঙতে মাটিতে প্রায় মিশতে চলেছে।

জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিলাম জীর্ণ বাড়ির স্থাপত্য। গাছে গাছে পাখি ডাকতে শুরু করেছে। একটু পরেই সূর্য উঠবে সমুদ্রের বুকে। আমি বেরিয়েছিলাম খুব ভোরে সকালের ব্রেকফাস্টটা টাটকা পাখির মাংস দিয়ে খাওয়ার লোভে।

এমন সময়ে দেখলাম সেই ভয়ানক দৃশ্য!

সমুদ্রের দিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ছটা কঙ্কাল!

একটা নয়, দুটো নয়, ছ'খানা কংকাল। একজনের পেছনে আর একজন। সিপাইরা যেভাবে মার্চ করে যায়, সেইভাবে তালে তালে পা ফেলে ফাঁকা মাঠটা পেরিয়ে লাইন দিয়ে ঢুকে গেল বাড়িটার মধ্যে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল আমার। দিনের বেলায় এভাবে কঙ্কালের কুচকাওয়াজ কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

ভূতেরা নাকি আলো সইতে পারে না, তাই দিনের আলোয় তাদের দেখা যায় না। রাত্রি নিশীথেও তারা যদি ক্বচিৎ দর্শনদান করে, একটোপ্লাজম দিয়ে গড়া শরীর বলে ভৌতিক ছায়াটুকুই কেবল দেখা যায়।

কিন্তু এ কী দেখলাম আমি? এ যে এক্কেবারে খটখটে নিরেট ভূত!

'রাম নাম' জপ কোনওদিন করিনি। সেদিন করেছিলাম। নিঃশব্দে পালিয়ে এসেছিলাম।

একটা বিষয় কিন্তু খচখচ করে গেছিল মনের মধ্যে।

ভূতেরা কি পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে রাত্রে টহল দিতে বেরোয়?

লাইনবন্দি ভূতেদের একদম পেছনকার কঙ্কালের হাতে একটা কালো বাক্সর মতো কী যেন দেখেছিলাম।

ভয়ের চোটে চোখের ভুল নিশ্চয়।

সংবিৎ ফিরল প্রফেসরের গলা খাঁকারে, 'কই হে দীননাথ, তোমার ভূতবাবাজিরা গেল কোথায়?'

আমি জবাব দিলাম না।

সন্ধে আরও গাঢ় হয়েছে। গাছে গাছে ঝুপসি অন্ধকার আরও ঘন হয়েছে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা নিশাচর পাখি। বাদুড় অথবা পেঁচা।

গা ছমছম করে উঠেছিল। পরক্ষণেই সভয়ে খামচে ধরেছিলাম প্রফেসরের হাত—'দেখেছেন?'

আলো জ্বলছে পোড়োবাড়ির নীচের তলায়। সাদা আলো নয়। অদ্ভুত নীলচে-লাল রোশনাই ঠিকরে পড়ছে একতলার একটা জানলা দিয়ে।

একটু পরেই নিভে গেল আলোটা।

আর, সদর দরজা দিয়ে, ভাঙা থামের পাশ দিয়ে, ইটের গাদার ওপর দিয়ে তালে তালে পা ফেলে বেরিয়ে এল ছ'টা নরকঙ্কাল!

প্রফেসর স্থির। আমিও।

মাথার ওপর শুধু তারার আলো। চলমান মূর্তি ছ'টা যে আস্ত ছ'খানা নরকঙ্কাল, আবছা আলোতেও তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

তালে তালে পা ফেলে লাইন দিয়ে তারা ঢুকে গেল সমুদ্রের দিকের জঙ্গলের মধ্যে।

চোখ কুঁচকে চেয়ে ছিলেন প্রফেসর। ফিসফিস করে বলেছিলাম, 'যাবেন পেছন পেছন?'

'না।'

ফেরার পথে বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে ছিলেন প্রফেসর।

তারপর বলেছিলেন, 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী। তোমার হয়েছে তাই।'

টিটকিরিটা বেমালুম হজম করে নিয়ে বলেছিলাম মিনমিন করে, 'কেন?'

'টমাস আলভা এডিসন ভূত দেখার মেশিন আবিষ্কার করেননি।'

'কিন্তু—'

'তিনি ওইরকম কোনও মেশিনই বানাননি।'

'আলবাত বানিয়েছিলেন,' এবার খেপে গেছিলাম আমি।

'থামো গণ্ডমূর্খ! উনি একটা যন্ত্রের নকশা বানিয়েছিলেন— অশরীরীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে, তাদের দেখবার জন্যে নয়।'

'ওই হল গিয়ে।'

'আজ্ঞে না। ওঁর মৃত্যুর পর সেই নকশার হদিস এডিসন নিজেই বলে গেছিলেন। কিন্তু নকশা অনুযায়ী মেশিন বানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। প্রেতচক্রে আবার এসেছিলেন এডিসন। মেশিনটায় কোথায় কী রদবদল করতে হবে বলে গেছিলেন।'

'তারপর?'

'সেইমতো মেশিনটাকে পালটে নিয়েও স্বয়ং এডিসনের সঙ্গে কিন্তু কথা বলা যায়নি— গেছিল আর একজন বিদেহীর সঙ্গে। নাম তার, চার্লস স্টাইনমেজ, এডিসনের ভক্ত।'

'মেশিনটা কোথায়?'

'পাওয়া যায়নি— রহস্যটা সেইখানেই।'

'কিন্তু এইমাত্র যা দেখে এলেন, তা নিয়ে যদি গবেষণা করেন, তা হলে তো ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়।'

গা শিরশির করে উঠেছিল আমার।

রাত্রে নিজে ঘুমোলেন না, আমাকেও ঘুমোতে দিলেন না প্রফেসর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন, পুরো তল্লাটটাকে নাকি এড়িয়ে চলে মধু আর কাঠকুটোর খোঁজে যারা জঙ্গলে ঘোরে— তারা।

'কেন?'

'ভূতের ভয়ে। চলমান কঙ্কাল তারাও দেখেছে। পোড়োবাড়ির আলোও দেখেছে।'

'সব শুনেও তুমি গেছিলে?'

'আগে তো শুনিনি। দেখার পর খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছিলাম।'

'আ।'

কিছুতেই শোনেননি প্রফেসর।

ভোররাতে হাজির হলেন পোড়োবাড়ির সামনে। দু'জনেরই হাতে টর্চ। বন্দুক আনিনি। ভূতেরা বন্দুককে ভয় পায় না।

নিকষ অন্ধকারের মধ্যেই মাঠ পেরিয়ে সটান ঢুকে গেছিলাম সদর দরজা দিয়ে— টর্চ

জ্বালাইনি মাঠ পেরোনোর সময়ে। জ্বালালাম ভেতরে ঢোকবার পর।

হনহন করে প্রফেসরই চলেছেন আমার সামনে। প্রথমেই একটা টানা লম্বা গলি— ধুলো আর মাকড়শার জালে ঢাকা।

টর্চের আলো স্থির হল ডানদিকের বড় ঘরটার দরজায়।

পাল্লা ভাঙা। ভেতরে কিন্তু কোথাও ধুলো নেই— মাকড়শার জাল নেই বাদুড়ের বাসা নেই।

চৌকাঠ পেরোলাম। মস্ত ঘর। এককালে হয়তো বসবার ঘর ছিল। ফার্নিচারও ছিল। এখন কিচ্ছু নেই। একদম ঝকঝকে তকতকে। ফাঁকা।

ফাঁকা মানে, আসবাবপত্র নেই।

যা রয়েছে, তা একটা কারখানা, ছোট্ট, এক কোণে। ওরকম বিদঘুটে যন্ত্রপাতি পৃথিবীর কোনও ল্যাবোরেটারিতে দেখিনি। প্রফেসরের সঙ্গে কম ঘুরিনি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিছু কিছু তো চিনি।

সবচেয়ে লোমহর্ষক দৃশ্যটা ঝকঝক করে উঠেছিল টর্চের আলোয়।

মেশিনের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিস্তর হাড়। মানুষের হাড়। শরীরের নানা অংশের। নরদেহের দুশো ছ'খানা হাড়ই আছে বলে মনে হল। পাশেই পরিষ্কার সাজানো অনেকগুলো মাথার খুলি।

প্রফেসরের হাতের টর্চের আলো স্থির হয়ে রইল খুলিগুলোর ওপর।

উনি চোখ কুঁচকে যা আর একবার দেখতে চাইছিলেন, আমিও তা দেখেছি পলকের জন্যে— টর্চের আলো খুলিগুলোর ওপর গিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

সবুজ স্ফুলিঙ্গ। মিলিয়ে গিয়েছিল পরক্ষণেই।

টর্চের আলো সেইদিকেই স্থির রেখে মেঝে থেকে হেঁট হয়ে একটা হাড় কুড়িয়ে নিয়েছিলেন প্রফেসর। টর্চের আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

বললেন, 'কী বুঝলে?'

আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

উনি বললেন, 'আমাদের হাড় যে-উপাদানে তৈরি, এ হাড় তা দিয়ে তৈরি নয়।'

'কী দিয়ে?'

'বুঝতে পারছি না। মাটি থেকে তৈরি সেরামিক হাড় এই সেদিন বানিয়েছেন দু'জন জার্মান বৈজ্ঞানিক। কিন্তু এখানে তা হয়নি। প্লাস্টিকও নয়।'

ঠিক এই সময়ে বাইরে ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাপিয়ে শোনা গেল খট খট খট খট শব্দ। কুচকাওয়াজ করে ফিরে আসছে চলমান কঙ্কাল ছ'টা। তাদেরই হাড়ের পায়ের আওয়াজ ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলেছে পোড়ো বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তন্ময় হয়ে থাকায় শব্দটা আগে শুনিনি। যখন শুনলাম, তখন ঘর থেকে বেরোনোর পথ বন্ধ।

লাইন দিয়ে ঘরে ঢুকল ছ'টা নরকঙ্কাল!

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল দরজার সামনে। একজনের হাতে একটা চৌকোনা কালো বাক্স। প্রথমবারে তা হলে ভুল দেখিনি।

ধক্ ধক্ করে সবুজ স্ফুলিঙ্গ যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে করোটির ছ'জোড়া গর্ত থেকে।

আপনা থেকেই আড়চোখে তাকিয়েছিলাম মেঝেতে সাজানো খুলিগুলোর দিকে। একই রকম সবুজ স্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছে প্রতিটি খুলির মধ্যে।

অনেক দিন আগে আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছিল। ঠকঠক করে কেঁপেছিলাম। ঠিক সেইরকম অবাধ্য কাঁপুনি দেখা দিল আমার সর্বাঙ্গে। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি। গলা শুকিয়ে খটখটে।

প্রফেসর কিন্তু নিষ্কম্প। নির্বিকার।

যেমন সহজভাবে হনহন করে এ-বাড়িতে ঢুকেছিলেন, ঠিক তেমনি সহজ গলায় বললেন, 'তোমরা কারা?'

ওরা ছ'জন দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল দেহে।

প্রফেসর বললেন, 'তা হলে আমিই বলছি— শুনে যাও। এই মেশিন এ-পৃথিবীর নয়। এই হাড়গুলোও এ-পৃথিবীর নয়। স্বাভাবিক হাড়ও নয়। নকল হাড়। সিনথেটিক।'

ওরা শুনছে।

প্রফেসর বলছেন, 'তোমরা এসেছ পৃথিবীর বাইরে থেকে?'

একসঙ্গে ঘাড় কাত করে সায় দিলে ছ'জনে।

'উঠেছ কোথায়? এ-বাড়িটাকে তো ঘাঁটি বানিয়েছ, কঙ্কালের কারখানা। আসল আস্তানাটা কোথায়?'

ছ'জনে হাত তুলে যেদিকটা দেখাল, সেদিকে রয়েছে সমুদ্র।

প্রফেসর বললেন, 'সমুদ্রে?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলে ছয় কঙ্কাল।

'কঙ্কাল সেজে ভয় দেখিয়ে মানুষকে ঘেঁষতে দাও না কী মতলবে? কী চাও তোমরা পৃথিবীতে?'

কঙ্কালরা নিথর।

প্রফেসর বললেন, 'কঙ্কালগুলো কারখানায় তৈরি হচ্ছে। খুলিগুলোর মধ্যে সবুজ আগুন জ্বলছে, ও আগুন কীসের?'

অমনি ছ'টা কঙ্কাল ছড়িয়ে পড়ল আমাদের দু'পাশ দিয়ে। একজন দাঁড়াল মেশিনটার সামনে। দপ্ করে জ্বলে উঠল সেই নীলচে-লাল চোখধাঁধানো আলো— বাইরের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে যা দেখেছিলাম। দ্বিতীয় জন বেছে বেছে অনেকগুলো হাড় নিয়ে ঢুকিয়ে দিলে মেশিনের একদিকের ফুটোয়। ঘড়াং ঘট করে শব্দ হতেই গুডু গুডু গুম গুম শব্দে কাঁপতে লাগল সারা বাড়ি। তারপরেই খড়মড় করে আরেকদিকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল একটা কঙ্কাল— মুণ্ডটা কেবল নেই।

তৃতীয় জন তৈরি হয়েই ছিল। হিড়হিড় করে কবন্ধ কঙ্কালকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলল সাজানো খুলিগুলোর সামনে। অমনি নড়ে উঠল সব ক'টা খুলি। সবচেয়ে কাছেরটা টপাত করে লাফিয়ে উঠেই সেঁটে গেল কবন্ধ কঙ্কালের ঘাড়ে। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল আস্ত একটা নরকঙ্কাল।

চোখের গর্তে সেই সবুজ স্ফুলিঙ্গ।

'বুঝলাম,' বললেন প্রফেসর খুবই সহজভাবে, 'তোমাদের আসল কলেবরগুলো সেঁধিয়ে রয়েছে খুলিগুলোর মধ্যে। ধড়টাকে চালাচ্ছ খুলির মধ্যে বসে। তোফা আইডিয়া। এও বুঝলাম, আকারে তোমরা এতই ছোট যে চটপট চলাফেরা করার জন্যে কঙ্কাল বাহন বানিয়ে নিয়েছ। সাধু! সাধু! তোমরা নিতান্ত ভিতুও বটে, তাই খুলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে নিজেদের চেহারাটা পর্যন্ত আমাদের দেখাতে চাও না—'

অমনি দপ্‌দপ্‌ করে উঠল সবুজ স্ফুলিঙ্গগুলো। আঁতে ঘা দিয়েছেন ধুরন্ধর প্রফেসর। সাতজনেই ফটাং ফটাং করে সাতখানা খুলি খুলে এনে ধরে রইল দু'হাতে।

আমার দু'চোখ নিশ্চয়ই ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল ভয়াবহ সেই দৃশ্য দেখে।

সাতটা কবন্ধ কঙ্কালের ঘাড়ে গ্যাঁট হয়ে বসে সাতটা কাঁকড়া!!

পুলকিত কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'বাঃ বাঃ! কী সুন্দর তোমাদের দেখতে! দাঁড়াও, কটা দাড়া আছে গুনে নিই... আটখানা? উঁহু...' ন'খানা। দুটো দাড়ার ডগায় ওই সবুজ আগুনগুলো বুঝি তোমাদের চোখ? ফার্স্ট ক্লাস! আর ওই যে একটা দাড়া উঁচিয়ে রয়েছে, ওইটা বুঝি তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র?'

ফস করে একজনের উঁচিয়ে-থাকা দাড়ার ডগা থেকে ছুটে এল একটা সবুজ বিদ্যুৎ— স্পর্শ করল আমার হাতের টর্চ। সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠতেই ফেলে দিয়েছিলাম বলে রক্ষে— মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলে পিণ্ডি পাকিয়ে গেল টর্চ আর ব্যাটারি।

'চমৎকার হাতিয়ার তো,' খুশি খুশি গলায় বললেন প্রফেসর। 'তোমরা জানো মানুষ ভয় পায় ভূতকে— তাই ভূত সেজে শুধু মানুষকে ভয়ই দেখাচ্ছ না, নিজেদের বিদিগিচ্ছিরি অসহায় বপুগুলোকেও ঢেকে রেখে দিয়েছ। এইসব থেকেই বুঝছি তোমাদের উদ্দেশ্য সাধু নয়। পৃথিবীটাকে দখলে আনতে চাও। কিন্তু মানুষকে ভয় পাও। তাই মানুষ যেখানে থাকে না, সেই সমুদ্রের তলায় আসল ঘাঁটি গেড়েছ, সেখান থেকে ওই কালো বাক্সটায় তোমাদের জাতভাইদের এনে খুলিগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছ, কঙ্কাল বাহন কলে বানিয়ে নিয়ে জুড়ে দিচ্ছ দুটো একসঙ্গে। খুলিটা তোমাদের কন্ট্রোল কেবিন। সংখ্যায় তোমরা এখন পর্যন্ত মোটে সাতজন— এ অঞ্চল ছেড়ে লোকালয়ে তাই ঢোকোনি আজও। ঢুকলে একটা জিনিস জানতে পারতে।'

দপদপে স্ফুলিঙ্গ চোখ পাকিয়ে সাতজনে চেয়ে আমাদের পানে।

একগাল হেসে প্রফেসর বললেন, 'আমরা এই পৃথিবীর মানুষরা, কাঁকড়া খেতে বড় ভালবাসি,' একটু থেমে, 'তোমাদের চেহারাটা প্রায় সেইরকমই কিনা— আরে, আরে, করছ কী?'

আর করছ কী! স্পষ্ট দেখলাম প্রফেসরের শেষ কথাটা শেষ হতে না হতেই শিউরে উঠল সাতখানা কঙ্কাল। খটাখট শব্দ শুনে চোখ ফিরিয়ে দেখি, উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছে মেঝের ওপর সাজানো খুলিগুলো। যার হাতে কালো বাক্স ছিল, সে দৌড়ে গিয়ে খুলিগুলোর সামনে বাক্সর ডালা খুলে ধরতেই সটাসট লাফ মেরে বেরিয়ে এল কতকগুলো কাঁকড়া খুলিগহ্বর থেকে এবং নিমেষ-মধ্যে উধাও হল বাক্স-গহ্বরে। বাক্সের ভেতরেও

দেখলাম বিস্তর কাঁকড়া সবুজ-সবুজ চোখ মেলে যেন বিষম আতঙ্কে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে।

পরক্ষণেই সাতজনেই খটাখট খটাখট শব্দে পাঁই পাঁই করে দৌড়োল দরজার দিকে—আওয়াজ মিলিয়ে গেল ইটের গাদার ওপর দিয়ে, ভাঙা থামের পাশ দিয়ে, সমুদ্রের দিকের জঙ্গলের দিকে।

বিষম বিতৃষ্ণায় মুখ বেঁকিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ছিঃ ছিঃ এত ভিতু দীননাথ, তোমার চাইতেও! খবরদার, ফের যদি ভূত নিয়ে গবেষণা করতে বলবে আমাকে—'

পাগল! আর ও-কথা মুখে আনি।

বৈজ্ঞানিক কুমারটুলি

পরেশকে দেখলে বোঝা যায় না একের নম্বরের বিয়ে পাগলা। গাঁট্টাগোট্টা ফরসা চেহারা। ঝকঝকে তেজি চোখ। গলার স্বরও তেজালো, আস্তে কথা বলতে জানে না। যা বলে, জোরে বলে এবং বেশ রূঢ়ভাবে বলে। কিছু মানুষ আছে, কর্কশ হওয়াটাকে বিরাট একটা বাহাদুরি বলে মনে করে। পরেশ হল সেই জাতের পুরুষ।

দোষের মধ্যে বিয়ের জন্যে হ্যাংলামি। বিয়ের বয়স হয়েছে, বাপ-মা নেই বলে মামাদের তেমন আগ্রহও নেই। তা ছাড়া রোজগেরে ভাগনের বিয়ে দিলেই সংসারে টান পড়বেই। তাই যদ্দিন পারা যায় বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখার তালে ছিল তিন মামা।

পরেশের প্রাণে তাই সুখ নেই। প্রাণের বন্ধু বলতে আমি ছাড়া দুনিয়ায় ওর কেউ নেই। মামাদের পিণ্ডি চটকাত আমার সামনে।

আমি বলতাম, 'নিজে দেখেশুনে বিয়ে করলেই তো পারিস।'

পরেশ মুখ শুকনো করে বলত, 'রংটাই ফরসা— মুখখানা দেখে কেউ তো কাছেও ঘেঁষে না।'

সত্যিই তাই। পরেশের মুখখানা চাঁদের মতো গোল বটে, আবার চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো এবড়ো-খেবড়োও বটে। ছিরিছাঁদ নেই।

ফলে, পরেশ বেচারা ওর ওই কথাবার্তা আর চাঁদমুখ নিয়ে বিয়ের বাজারে কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারেনি।

কিন্তু এ হেন পরেশেরও পাত্রী জুটেছিল এবং কীভাবে জন্মের মতো বিয়ের আগেই বিয়ের শখ মিটে গিয়েছিল, সেই নিয়েই এই ভয়ংকর মজার কাহিনী।

ঢাকঢোল পিটে জায়গাটায় পাঁচজনের ভিড় বাড়াতে চাই না বলেই এ ঘটনা ঠিক কোথায় ঘটেছিল, তা বলব না। তবে এরকম জায়গাও চট করে চোখে পড়ে না। তিন দিকে পাহাড়ি নদী, একদিকে পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় একটা প্রাসাদ। এককালে একজন দুর্ধর্ষ রাজা— রাজার নামটা বললেই ফাঁস হয়ে যাবে জায়গাটার নাম— প্রাসাদ-কেল্লা বানিয়ে লড়ে গিয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেই রাজার কুলাঙ্গার বংশধররা নদী ঘেরা দ্বীপের মতো ভারী সুন্দর এই পাহাড়টি বিক্রি করে দেন যাঁর কাছে তিনি নাকি একজন বৈজ্ঞানিক।

পুজোর ছুটিতে ওই অঞ্চলে পরেশকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে এই পর্যন্ত আমি শুনেছিলাম। প্রাইভেট প্রপার্টি হলেও পাহাড়ি নদীর ওপর কাঠের সেতু পেরিয়ে প্রায়ই টুরিস্টরা বেড়াতে যেত দ্বীপের জঙ্গলে। কেউ বারণ করার ছিল না। শুধু পাহাড়ে উঠত না কাঠের নোটিশ বোর্ডে নিষেধাজ্ঞা লেখা ছিল বলে।

আমি আর পরেশও পোল পেরিয়ে গিয়েছিলাম। একদিনই গিয়েছিলাম। দূর থেকে পাহাড়ের মাথায় সন্ধ্যাকাশের পটভূমিকায় কালো ভূতের বাড়ির মতো বিশাল প্রাসাদ-কেল্লাটাও দেখেছিলাম। কিন্তু এবড়ো-খেবড়ো পাথরের সিঁড়ি ভেঙে অদ্দুর উঠতে ইচ্ছে যায়নি।

আমরা উঠেছিলাম পুলিশদারোগার কোয়ার্টারে। আমাদের পুরনো বন্ধু। একদিন সকালের দিকে চৈনিক সবুজ চায়ের বাটি আর জলখাবার নিয়ে প্ল্যান করছি সেদিন কোন দিকে অভিযানে যাওয়া যায়, এমন সময়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি এসে কম্পাউন্ডে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতি পরা এক শৌখিন ভদ্রলোক। সটান বারান্দায় উঠে এসে অন্তরঙ্গভাবে আমার দারোগা বন্ধুকে বললেন, 'গজেন, তোর জন্যে একটা খবর এনেছি।'

গজেন, মানে, আমার দারোগাবন্ধু, বলল, 'কী খবর?' তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললে, 'আমার জমিদার দোস্ত শান্তনু ধাড়া। শান্তনু, এরা আমার কলেজ ফ্রেন্ড পরেশ আর দীননাথ।'

নমস্কার-টমস্কার করার পর চেয়ারে বসে শান্তনু বললে, 'খবরটা একটু ভুতুড়ে। শুনলে বিশ্বাস করবি তো?'

গজেন বললে, 'মন্দ কী? আমড়াতলার শ্মশানে ছেলেবেলায় ভূত দেখতে গিয়ে পাইনি। এখানে যদি দেখা পাওয়া যায়, ভালই তো।'

শান্তনু পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বার করে অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট নিজে নিয়ে কেসটা এগিয়ে দিল আমাদের দিকে।

বললে, 'ভুতুড়ে বললাম মানে যে ভূতের কারবার, তা ঠিক নয়, ব্যাপারটা উদ্ভট— আমার নিজের চোখকেই ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি।'

গজেন সোজা হয়ে বসল, 'বলিস কী রে! তুই নিজের চোখে দেখে এসেছিস?'

'হ্যাঁ।' বলে আর কোনওরকম গৌরচন্দ্রিকা না-করে শান্তনু বললে, 'গতকাল কোর্টে কেস ছিল। শহর থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল। শালজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি আসছে। এমন সময় ব্রেক কষল ড্রাইভার। হেডলাইটের জোরালো আলোয় দেখলাম সরু পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কিস্তূতকিমাকার জীব।'

'জঙ্গলের জীব?' হতাশ হল গজেন। আমরাও।

'জঙ্গলের কিনা সেটা সব শোনবার পর বলবি। জীবটা দাঁড়িয়ে ছিল দু'পায়ে ভর দিয়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল একটা কইভোলা মাছ দাঁড়িয়ে আছে।'

চমকে উঠলাম আমি, পরেশ, গজেন।

গজেন বলল, 'কইভোলা মাছ!'

শান্তনু বললে, 'কইভোলা মাছ কত বড় হয় খেয়াল আছে তো? মানুষের বাচ্চা পর্যন্ত গিলে খেতে পারে। সাত ফুট লম্বা মানুষের মতো বড় ইয়া নাদা পেট। কইভোলার মতোই দেখতে অবিকল। কিন্তু পাখনা আর ল্যাজের বদলে যা দেখলাম, সেটাই আমার আর ড্রাইভারের চোখের ভুল কিনা ধরতে পারছি না।'

শান্তনু থামল। সিগারেট ধরাল। আমরা ওর গল্প বলার গুণে এমন মজে গিয়েছিলাম যে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফের শুরু না-করা পর্যন্ত হাঁ করে বসেই রইলাম।

শান্তনু বললে, 'কইভোলার কখনও মানুষের মতো দুটো পা আর দুটো হাত হয়? হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখেছি, দু'হাতের দশ আঙুল দিয়ে চোখ ঢাকছে কইভোলা— জোর আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় সব মানুষেই যা করে। তার পরেই সাঁত করে লাফিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের জঙ্গলে। তার পরেই একটা ঝপাৎ করে আওয়াজ শুনলাম লেকের জলে।'

গজেন শুধু বললে, 'কাল শহরে ক'পেগ মেরেছিলি?'

শান্তনু তৎক্ষণাৎ বললে, 'আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু ড্রাইভার তো কিছু খায়নি। সে কেন একই দৃশ্য দেখল?'

সেইদিনই দুপুরের দিকে পরেশ বললে, 'দীননাথ, তুই তো বড় বৈজ্ঞানিকের শাগরেদ। অনেক উদ্ভট ব্যাপার চাক্ষুস দেখেছিস। শান্তনুর গল্পটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়।'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের সঙ্গে থেকে অনেক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডের সাক্ষী হতে হয়েছে আমাকে ঠিকই, তবে মানুষের মতো হাত-পাওলা কইভোলাকে মেনে নিতে পারলাম না।

বললাম, 'শান্তনু নিজেই বলল শুনলি না মদ খেয়ে এসেছিল শহর থেকে?'

'ড্রাইভারটা তো সেন্সে ছিল।'

'ড্রাইভাররা আবার কোনকালে সেন্সে থাকে? নির্ঘাত দিশি মাল টেনেছিল।'

পরেশ বললে, 'আমার কিন্তু ওই বৈজ্ঞানিকের আস্তানাটা সুবিধের মনে হয় না।'

চোখ কপালে তুলে বললাম, 'সে কী রে!'

পরেশ তাড়াতাড়ি বললে, 'আজ সকালেই গেছিলাম ওখানে। লুকিয়ে-চুরিয়ে পাহাড় বেয়ে পোড়ো বাড়িটার কাছেও গেছিলাম। কিন্তু ভেতর থেকে এমন সব অদ্ভুত গজরানি শুনলাম যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।'

'পরেশ!'

'দীননাথ, আমি ভিতু নই সেটা তো জানিস। কিন্তু বিরাট বাড়িটার সব ক'টা দরজা জানলা কেল্লাবাড়ির মতো লোহার রোলিংশাটার দিয়ে বন্ধ কেন বলতে পারিস? দূর থেকে মনে হয় পোড়োবাড়ি— কাছে গিয়ে দ্যাখ গে বাইরে থেকে ছুঁচ গলানোর উপায় নেই। ফটক সুদ্ধ রোলিংশাটার দিয়ে বন্ধ। উঁকিঝুঁকি মেরেও কিছু দেখতে পেলাম না। শুধু শুনতে পেলাম অমানুষিক চাপা গজরানি।'

'কী বলতে চাস?'

'এইচ জি ওয়েলসের 'আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো' পড়েছিস?'

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লাম পরেশের এবারকার কথায়। মুখ চোখ কণ্ঠস্বর রীতিমতো সিরিয়াস করে পরেশ 'আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো'র প্রসঙ্গ তুলেছে। এইচ জি ওয়েলসের অতি-বিখ্যাত অতি উদ্ভট সেই কাহিনি— যার ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হয়েছে অবিশ্বাস্য এক বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের অসম্ভব বৃত্তান্ত।

হাসতে হাসতেই বললাম, 'তুই তা হলে বলছিস ডক্টর মোরো ওই পাহাড়ে নতুন করে এক্সপেরিমেন্ট করছেন? আর চলমান কইভোলা তাঁরই সৃষ্টি?'

অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গিয়ে পরেশ বললে, 'ইয়ারকি মারিসনি, ইয়ারকি মারিসনি। বৈজ্ঞানিকটার ডেরায় পুলিশি রেড করা দরকার।'

'কেন, তার অপরাধ?' চোখ থেকে গড়িয়ে-পড়া হাসির জল মুছতে মুছতে বললাম।

'মানুষের হাত-পা কেটে কইভোলার গায়ে লাগিয়ে দেওয়ার অপরাধ। কার হাত-পা কেটেছে, কারা অমন অমানুষিক চেঁচায়— সব বলতে হবে বাছাধনকে।'

তেজিয়ান পরেশ আর গুলবাজ শান্তনুর গুঁতো খেয়ে শেষ পর্যন্ত গজেনের মতো জাঁহাবাজ পুলিশদারোগাকেও রাজি হতে হল বৈজ্ঞানিকের আস্তানায় যাওয়ার জন্যে। কইভোলার গল্প এক্কেবারেই বিশ্বাস করেনি গজেন। কিন্তু ওর এলাকায় নামগোত্রহীন কে এক বৈজ্ঞানিক ল্যাবোরেটরিখানা দুর্গের মতো বানিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাবে এবং ল্যাবোরেটরির ভেতর থেকে কারা অমন অমানুষিক চেঁচাবে— সেটা দেখতে যাওয়া তার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। তাই রাজি হল। বিজ্ঞান সাধনার নামে অনেক অপকীর্তিই তো চলছে দেশজুড়ে। স্মাগলাররা গাঁজা চরস কোকেন আফিঙের ব্যাবসা চুটিয়ে চালাচ্ছে। কইভোলার খোলস পরে গেঁইয়াদের ভড়কে দিয়ে এমনি কারবার ওখানেও তো চলতে পারে? মানুষের হাত-পা কইভোলার গায়ে লাগানো হয়েছে, পরেশের এই উদ্ভট কল্পনা তোপের মুখে উড়িয়ে দিল গজেন— নিশ্চয় একটা মানুষ কইভোলার খোলস পরে হাঁটছিল জঙ্গলের পথে। কেন হাঁটছিল, সেইটাই দেখতে যেতে হবে। পরেশ যখন গিয়ে নিজের কানে অমানুষিক চিৎকার শুনে এসেছে, তখন এমনও তো হতে পারে একটা নারকীয় কুকর্ম চলছে পাণ্ডববর্জিত ওই দ্বীপে?

অতএব অনেক অট্টহাসি আর অনেক টিটকিরির পর সাব্যস্ত হল সেইদিনই বিকেলবেলা আমরা যাব বৈজ্ঞানিকের গবেষণামন্দিরে।

দুমদাম ধাক্কা পড়তেই খটাং করে খুলে গেল রোলিংশাটারের গায়ে একটা ফোকর। একটা শুকনো লোক মুখ বাড়িয়ে বললে, 'কাকে চাই?'

'তোমার মনিবকে।' পুলিশি নিনাদ ছাড়ল গজেন। ওর চেহারাটা জলহস্তীর মতো, গলাটা বাঘের মতো। দেখে শুনে ভড়কে গিয়েও শুকনো লোকটা বললে, 'বাবু কারও সঙ্গে দেখা করেন না। আপনারা আসতে পারেন।' বলেই মুখের ওপর খটাং করে বন্ধ করে দিল ফোকরটা।

আর যায় কোথা! উচ্চিংড়ের মতো জলহস্তীর লাফ দেখবার সৌভাগ্য সেদিন আমার

হল। সেই সঙ্গে ব্যাঘ্রগর্জন। বন-জঙ্গল পাহাড় কাঁপতে লাগল গজেনের হাঁকডাক তর্জনগর্জনে। সেই সঙ্গে দমাদম বুটের লাথি ইস্পাতের রোলিংশাটারে। তাল মিলিয়ে আচমকা রক্ত-জল-করা চিৎকার শোনা গেল পাথুরে প্রাসাদের ভেতর থেকে। কারা যেন অপার্থিব ভাষায় অমানুষিক কণ্ঠে একযোগে চেঁচিয়ে চলেছে, সে চিৎকারকে পাশবিক চিৎকার বললে ভুল বলা হবে। পশুরা কি কথা বলে? চেঁচিয়ে শাসায়? কোনও কথাই বুঝতে পারলাম না। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তবুও গা ছমছম করতে লাগল সম্মিলিত কণ্ঠের ভয়াবহ ঐকতান শুনে।

আচমকা খটাং করে একটা আওয়াজ হল। ফোকরটা আবার খুলে গেছে। তেরিয়া মেজাজে অত্যন্ত চেনা গলায় শুনলাম একজনের খ্যাঁকানি, 'দেখি তো কোন বেল্লিকরা এসেছে হাড় জ্বালাতে!'

পরক্ষণেই ফোকর দিয়ে বেরিয়ে এল কণ্ঠস্বরের অধিকারীর মুখ। হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম ফোকলা বুড়োটার মুখের দিকে। ভীষণ রেগে তেলে-বেগুনে জ্বলে আমাদের পিন্ডি চটকাতে গিয়েও থমকে গেল বৃদ্ধ। দু'চোখ বিষম বিস্ময়ে যেন ঠেলে বেরিয়ে এল কোটর থেকে।

বললেন সোল্লাসে, 'আরে দীননাথ যে!'

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র! আপনি এখানে?'

শুকনো লোকটার নাম চণ্ডী। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ একা হাতে সারে। চায়ের কাপ সামনে দিয়ে গেল সে। আমরা চুমুক দিলাম। প্রফেসর শুরু করলেন তাঁর অজ্ঞাতবাসের কাহিনি।

পরেশকে নিয়ে আমি দেশ বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ দুম করে প্রফেসর উধাও হয়ে গিয়েছিলেন বলে বছরখানেক তাঁর আর টিকি দেখতে পাইনি। এর আগেও এমনিভাবে তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন— প্রত্যেকবারেই একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ছেড়েছেন। তারপর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এবারে এমন ডুব মেরেছিলেন যে আমাকে সুদ্ধ মনে পড়েনি এই একটি বছরে। শুধু একটা চিঠি লিখেছিলেন। তিনি নাকি কোথায় একটা কুমারটুলির চার্জে আছেন। ব্যাস, তার বেশি কিছু নয়।

বৈজ্ঞানিক নাটবল্টু চক্র কুমারটুলিতে প্রতিমা গড়ার চার্জ নিয়েছেন জেনে ধোঁকায় পড়েছিলাম। প্রফেসরকে আর কেউ না-চিনলেও আমি তো চিনি হাড়ে হাড়ে। কুমারটুলির ব্যাপারটা তাই বেশ রহস্যজনক ঠেকেছিল।

একা-একা কী আর করা যায়। বেরিয়েছিলাম পরেশকে নিয়ে। বিজনবিভুঁয়ে এসে আবিষ্কার করলাম নিখোঁজ বৈজ্ঞানিককে।

এবং শুনলাম তাঁর কুমারটুলির কাহিনি।

একজন চিনে বৈজ্ঞানিক লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসেন প্রফেসরকে এইখানে। নাম চিংফু!

চিংফু একটা বিষয় নিয়ে আদাজল খেয়ে গবেষণায় লেগেছিলেন। গবেষণাটা আকুপাংচার সংক্রান্ত। চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিমতম রোগ তাড়ানোর অমোঘ অস্ত্র

আকুপাংচার। পাঁচ হাজার বছর আগে যে বিদ্যে চালু ছিল চিনদেশে— যা আজও সুফল ফলিয়ে চলেছে দেশে দেশে— গবেষণা চলছে রাশিয়া আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়ায়।

খ্রিস্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে চিনের সম্রাট ফু শি একটা বই লিখেছিলেন। বইটার নাম আই-চিং। মানে, পরিবর্তনের কেতাব। তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন মোট বারোটি মধ্যমা মানুষের দেহের বারোটি দেহযন্ত্রকে আগলাচ্ছে। এই বারোটি মধ্যমার ওপর ন'শো ছুঁচ ফোটানোর পয়েন্ট আছে। ইন আর ইয়াং নামে যে দুটো বিরোধী শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণশক্তির মূলে, মানবদেহের কোনও অংশে তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলেই অসুখ জাঁকিয়ে বসে। ছুঁচ ফুটিয়ে এই প্রাণশক্তির ধারাকে উদ্দীপ্ত করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক চিংফু কিন্তু রোগ সারানো নিয়ে মোটেই ভাবেননি। উনি ইন আর ইয়াং— এই দুটো বিরোধী শক্তি আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখেছিলেন। হঠাৎ খোঁজ পেলেন শ্রীলঙ্কার ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামে একখানা সংস্কৃত বই আছে। আকুপাংচারের প্রথম মৌলিক বই নাকি সেইটাই। বেদেও আছে শরীরের বিশেষ পয়েন্টে চাপ দিয়ে বুক পিঠ এবং অন্যান্য অংশের ব্যথা-বেদনা সারানো যায়। চিংফুর খটকা লাগল। সংস্কৃততে এ নিয়ে আরও পুঁথি নিশ্চয় লেখা হয়েছে। ভারতে তা নেই। অন্য কোথাও আছে।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তিব্বতের এক গুম্ফা থেকে এইরকম একটা পুঁথি উদ্ধার করলেন চিংফু। সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার মধ্যে। বইটা চুরি করে দেশ ছেড়ে চম্পট দিলেন ভদ্রলোক। এলেন এই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে। পরিত্যক্ত কেল্লাবাড়িতে গবেষণা মন্দির বানালেন। ইন আর ইয়াংয়ের মূল রহস্য সংস্কৃত পুঁথি থেকে উদ্ধার করলেন। নিজের হাতে জীব সৃষ্টি করলেন।

এই পর্যন্ত শুনে অসহিষ্ণু হয়ে পরেশ বললে, 'বুঝেছি, বুঝেছি। মানুষের হাত-পা কেটে কইভোলার গায়ে লাগিয়ে দেওয়া তো। চিংফু কোথায়? খুনে কোথাকার!'

প্রফেসর অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। পরেশকে এর আগে তিনি দেখেননি। ওর ওই তেরিয়া মেজাজের সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না।

বললেন, 'চিংফু দেহ রেখেছেন। তাঁর গবেষণা শেষ করার জন্যেই আমাকে গোপনে ডেকে এনেছেন। কিন্তু তাঁকে মার্ডারার বলছ কেন?'

'কইভোলার গায়ে মানুষের হাত-পা কোন মানুষের গা থেকে এল তা হলে?'

প্রফেসর যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

'তাই বলো। কইভোলাকে পাহারায় রেখেছিলাম জঙ্গলের ধারে। ওর হাত-পাও এখানে তৈরি।'

'মানে?' পরেশ কাউকে রেয়াত করে না। আগেই বলেছি বয়স্কদের সম্মান পর্যন্ত দেয় না। ওইটাই ওর বাহাদুরি।

'আগে সব শোনো। চিংফুর বয়স হয়েছিল। কিন্তু উনি জলের মতো টাকা খরচ করে যে কাণ্ড করে গেছেন, তার তুলনা নেই। তোমরা যে কইভোলা দেখেছ, ওটা পুরোটাই তাঁর হাতে তৈরি।'

'হাতে তৈরি?'

'বললাম তো জীব সৃষ্টি করতে উনি শিখেছিলেন। প্রাণসৃষ্টির রহস্য উনি আয়ত্ত করেছিলেন। আমাকেও শিখিয়ে গেছেন।'

'জীব সৃষ্টি!' এই প্রথম গজেন কথা বলল অবিশ্বাসের সুরে।

প্রফেসর বললেন, 'অত অবিশ্বাসের কিছু নেই, বৎস। জীব সৃষ্টি যে কেউ করতে পারে। এমনকী এই পরেশ ছোকরাও পারে— বিয়ে-থা হলে বাচ্চাকাচ্চা তো হবেই। কিন্তু চিংফু জীব সৃষ্টি করেছিলেন স্রেফ প্লাস্টিক, ফোমরাবার, ইস্পাত, একসেট ছুঁচ, একটা কেমিক্যাল আর ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে।'

পরেশ বলল, 'বাজে কথা। গজেন, তুমি এই বুড়োটাকে অ্যারেস্ট করো। পাগলাগারদে ঢোকাও। ল্যাবোরেটরি সার্চ করো, অনেক ডেডবডি পাবে।'

প্রফেসর বিরক্ত চোখে তাকালেন।

বললেন, 'দীননাথ সঙ্গে ছিল বলেই তোমাদের ঢুকতে দিয়েছি। নইলে—'

'নইলে কী করতেন?' চোয়াড়ে গলায় বললে পরেশ।

পরেশকে আর পাত্তাও দিলেন না প্রফেসর। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসো দীননাথ, দেখে যাও আমার বৈজ্ঞানিক কুমারটুলি।'

বিরাট একটা ঘর। হলঘর না-বলে তাকে ময়দানঘর বলা উচিত। সেখানে সেই দুর্ধর্ষ রাজার রাজসভা বসত বোধহয়। বড় বড় থাম। উঁচু ছাদ। ঘরের শেষ দেখা যায় না।

ঘরের এক-এক অংশে এক-এক রকম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সাজানো। কোথাও ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরি, কোথাও কেমিক্যাল ল্যাবোরেটরি, কোথাও ইলেকট্রনিক অ্যাপারেটাস, কোথাও ছুতোরের যন্ত্রপাতি।

ঘরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গেলেন না প্রফেসর। অমানুষিক চাপা গজরানির শব্দ ভেসে আসছিল অন্ধকার সেই কোণ থেকে। অপার্থিব কণ্ঠে কারা যেন গড়গড় করে অস্ফুট বিচিত্র ভাষায় কথা বলে চলেছে নিজেদের মধ্যে। ইচ্ছে করেই প্রফেসর সেদিকের আলো জ্বাললেন না।

ঘরের মাঝামাঝি একটা বিরাট অপারেশন টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। এক কোণে জেনারেটর এবং বহু জটিল যন্ত্রপাতি সাজানো। অসংখ্য তার টেবিলের মাথার ওপর চাঁদোয়ার মতো ঝুলছে। প্রত্যেকটা তারের প্রান্তে একটা চকচকে ছুঁচ।

টেবিলের ওপর একতাল সবজেটে প্লাসটিসিনের মতো জিনিস পড়ে ছিল। প্রফেসর তুলে নিয়ে গজেনের হাতে দিলেন।

'কী বলুন তো?'

গজেন টেপাটেপি করে বললে, 'প্লাসটিসিন। কেজি ক্লাসে বাচ্চারা মডেল বানায়।'

'প্রায় তাই। তবে এর ফর্মুলা আলাদা। প্লাসটিক থেকেই তৈরি। এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার কি সম্ভব?'

বাঁকা হাসি হাসল গজেন। পরেশ খরখরে চোখে প্রায় দগ্ধ করে ফেলল প্রফেসরকে। উনি ফিরেও তাকালেন না।

একটা কাচের ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা বেগুনি তরল পদার্থ ঢাললেন টেস্ট টিউবে। আর ফ্রিজ থেকে একটা শিশি বার করে এক ফোঁটা গাঢ় লাল তরল পদার্থ দিলেন তাতে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্‌বুদ্‌ কাটল, ধোঁয়া উঠল, জিনিসটা রং পালটে সাদা জলের মতো হয়ে গেল।

প্লাসটিসিনের মতো বস্তুর মধ্যে টেস্ট টিউব উপুড় করে দিয়ে বেশ করে মেখে নিলেন প্রফেসর। ময়দায় ময়েন দেওয়ার মতো চটকে নিয়ে পরেশের হাতে দিয়ে বললেন, 'মূর্তি বানাতে পারো?'

পরেশ খেপেই ছিল। ডেলাটা ছুড়ে টেবিলে ফেলে দিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বললে, 'ইয়ারকি হচ্ছে?'

প্রফেসর রাগলেন না। ওঁর দুর্বাসা মূর্তি দেখেনি বলেই পরেশ বেড়ে যাচ্ছিল— আমি উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম কখন কী ঘটে যায় এই ভয়ে।

প্রফেসর বললেন, 'তা হলে এর মধ্যে আপাতত আর ইস্পাতের বা প্লাস্টিকের হাড় পাঁজর লাগাচ্ছি না। ফোমরাবার দিয়ে ছিরি ছাঁদও করছি না। কিন্তু জড় পদার্থে জীবন আনা যায় কি না দেখাচ্ছি। দেখুন, গজেনবাবু।'

মাথার ওপরে ঝোলানো অসংখ্য ছুঁচের কয়েকটা টেনে নামালেন প্রফেসর। সবজেটে প্লাসটিসিনের কয়েক জায়গায় ঢুকিয়ে দিলেন। একটা বড় সুইচ টিপে দিয়ে রেগুলেটর ঘুরিয়ে একটু একটু করে কারেন্ট চালিয়ে দিলেন ছুঁচের মধ্যে দিয়ে।

মিনিট পাঁচেক শুধু যন্ত্রের আওয়াজ শুনলাম। তারপর চোখের সামনে ঘটল সেই অসম্ভব দৃশ্য। পিন্ডিপাকানো প্লাসটিসিনের ডেলাটা থিরথির করে কাঁপতে লাগল, সরসর করে টেবিলের ওপর দিয়ে সরে যেতে লাগল। কেঁচো যেভাবে নিজেকে গুটিয়ে এনে ফের লম্বা হয়ে মাটি আঁকড়ে এগিয়ে চলে, সেইভাবে টেবিলের ওপর দিয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল।

সুইচ বন্ধ করে মেশিন থামিয়ে দিলেন প্রফেসর। ছুঁচগুলো টেনে বার করে নিলেন। জিনিসটা তবুও জীবিত দেহের মতোই স্পন্দিত হতে লাগল নিয়মিত ছন্দে। বললে উদ্ভট শোনাবে বুঝি, তবুও বোঝানোর জন্যে বলছি— মনে হল পিণ্ডটার ভেতরে কোথায় যেন একটা হৃৎপিণ্ড চালু হয়ে গেছে।

প্রফেসর ফিরলেন পরেশের দিকে, 'হাত দিয়ে দ্যাখো।'

পরেশ তর্জনীর ডগা দিয়ে নানারকম ভাবে নানা দিক দিয়ে খোঁচা মারল থলথলে বস্তুটার গায়ে। প্রাণের পয়লা নম্বর লক্ষণ হল বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া। জড় পদার্থে যা নেই। খোঁচা খেয়েও নির্বিকার থাকে। এই জিনিসটা কিন্তু প্রতিবার খোঁচা খেয়ে সরে গেল উলটো দিকে। শেষকালে যেন খেপে গিয়ে খপাত করে আঁকড়ে ধরল পরেশের আঙুল। বিকট চেঁচিয়ে উঠল পরেশ। দারুণ কারেন্ট খেয়েছে বেচারি।

ওই একবারই কারেন্ট চালিয়ে পরেশকে জব্দ করেই সবুজ বস্তুটা পরমুহূর্তেই খসে পড়ল আঙুল থেকে। যেন ফুলতে লাগল প্রচণ্ড রাগে।

'ইলেকট্রিকের ম্যাজিক দেখাচ্ছেন?' রেগে তিনটে হয়ে সে কী আস্ফালন পরেশের। 'ভেবেছেন পি সি সরকারের ম্যাজিক দেখিয়ে ভুলোবেন? এর নাম জীবসৃষ্টি?'

নিরীহ কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'তবে কি সত্যিকারের জীব দেখতে চাও?'

গর্জন-মুখরিত অন্ধকার কোণের দিকে কটমট করে তাকিয়ে পরেশ বললে, 'কী আছে ওদিকে? কারা অমন চেঁচাচ্ছে?'

গজেন কপাল কুঁচকে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন আস্তে বললে, 'আঃ, পরেশ, কী হচ্ছে?'

পরেশ বললে, 'তুই থাম।'

প্রফেসর অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন পরেশের দিকে! চোখ দেখে ধরতে পারলাম না রেগেছেন কি অন্যমনস্ক হয়েছেন।

বললেন, 'এসো।'

পটাপট আলো জ্বলে উঠল অন্ধকার কোণে। দেখলাম সারি সারি সাজানো লোহার খাঁচা। ছোটখাটো একটা চিড়িয়াখানা যেন। মোটা মোটা গরাদ দেওয়া এক-একটা খাঁচার মধ্যে এক-একটা বিকট দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আমি ঈশ্বর মানি না, ঠাকুরদেবতাকে স্মরণ করি না, কিন্তু সেইদিনই সেই ময়দান ঘরের বিচিত্র কুমারটুলি দেখে মনে মনে ইষ্টদেবতাকে জপ করেছিলাম।

মানুষ দুঃস্বপ্নে অনেক উদ্ভট আজগুবি দৃশ্য দেখে। কিন্তু সেদিন আমি যা দেখলাম তা দুঃস্বপ্নকেও হার মানায়। প্রফেসর মাঝের পথ দিয়ে দ্রুত হেঁটে গেলেন আমাদের নিয়ে। দু'পাশে বড় বড় খাঁচাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে আমরা যেন আঠার মতো লেগে রইলাম তাঁর পেছনে। কী দেখলাম, তা এতদিন পরে বলতেও দ্বিধা হচ্ছে। কেউ বিশ্বাস করবে না। আমাকে পাগল বা গাঁজাখোর মনে করবে বলে কাউকে বলিওনি।

আমি দেখলাম তেত্রিশ কোটি উদ্ভট দেবদেবীদের কিছু কিছু জ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে খাঁচাগুলোর মধ্যে। আমি দেখলাম পদ্মের মতো বেদির ওপর পদ্মাসনে বসে চতুর্মুখ ব্রহ্মা চার হাত নিয়ে প্যাট প্যাট করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে— চাহনির মধ্যে দেবত্ব তিলমাত্র নেই, যা আছে তা অমানুষিক শয়তানি। আমি দেখলাম দশভুজা দুর্গা দশ হাতে দশটা গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আগুন চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে— বেসুরো গলায় ঘরঘর করে কী যেন বলছে। আমি দেখলাম এমনি অনেক ভয়াবহ মূর্তি যা শুধু ফ্যানট্যাস্টিক দৃশ্য কল্পনাতেই সম্ভব। আমি দেখলাম অশ্বের মতো মুখ আর মানুষের মতো দেহ নিয়ে হাঁটছে এক কিন্নর দেহ এবং ঘোটক কণ্ঠে হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে গিটকিরি দিয়ে। দেখলাম দশমহাবিদ্যা আর দশাবতারের ভয়াবহ জীবন্ত মূর্তি। দেখলাম এমনি অনেক কিছু, সে সবের বর্ণনা দিতে গেলে পরেশের বিয়ের শখ মিটল কী করে, সে কাহিনি আর বলা হবে না।

ময়দান ঘরের শেষ প্রান্তে একটা বেজায় মজবুত খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। খাঁচার মধ্যে একটা চোঙা বসানো ছিল খাড়াই ভাবে।

শুধু একটা চোঙা। গা-টা কচ্ছপের গায়ের মতো ভীষণ পুরু, দারুণ শক্ত খোলা দিয়ে তৈরি। মাথায় বা তলায় কিছু নেই।

এ আবার কী?

আমি আর গজেন যখন প্রায় বিহ্বলভাবে কিম্ভূতকিমাকার জীবদের দেখতে দেখতে সভয়ে প্রফেসরের পেছনে লেগে ছিলাম, তখন রাগে গজগজ করতে করতে প্রত্যেকটা

খাঁচার বিকট মূর্তি দেখছিল আর অস্ফুট কণ্ঠে প্রফেসরের পিন্ডি চটকাচ্ছিল পরেশ। আশ্চর্য ক্যারেক্টার বটে! বিয়ে-থা না হলেই কি এমনি হয়? বুড়ো ছোঁড়া কাউকেই খাতির করে না। সমানে শ্রাদ্ধ করে চলেছে।

এখন এই নিরীহ চোঙার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বোমার মতো ফেটে পড়ে বললে, 'এ আবার কী বুজরুকি দেখাবেন? এতক্ষণ তো খোলস-পরা কইভোলার মতো খোলস-পরা ঠাকুর দেবতা দেখালেন। ফোরটোয়েন্টিগিরির আর জায়গা পাননি? গজেন, তুই ঠিক ধরেছিস। বুড়ো নির্ঘাত স্মাগলার।"

গজেন বিড়ম্বিত হয়ে কী বলতে গেল, তার আগেই ঘটল সেই কাণ্ড। আচম্বিতে একটা সুগভীর গুড়গুড় গজরানি শুনলাম। কোত্থেকে এল গজরানিটা ঠাহর করতে পারলাম না। একশোটা ঘোড়া একসঙ্গে ছুটে গেলে যেমন আওয়াজ হয়, সরলবনের লম্বা লম্বা পাতার মধ্যে দিয়ে হাওয়া ছুটে গেলে যেমন হাহাকারের মতো দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়, বর্ষার ঘোলা জল যেমন গুরুগুরু শব্দে পাহাড়ি ঝরনার বুক বেয়ে নেমে যায়— ঠিক তেমনি সব কিছুর সম্মিলনে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, একটা চাপা ব্যথা, একটা না-বলা ক্রোধ যেন ফুটে বেরিয়ে এল বিচিত্র সেই হুংকারের মধ্যে দিয়ে।

পরক্ষণেই চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই চোঙাটার ওপরে উঠে এল একটা তেকোনা মাথা, তার তিন দিকে তিনটে চোখ, ঠিক যেন একটা পিরামিড। গা দিয়ে বেরিয়ে এল ছ'টা হাত। তার তলা দিয়ে বেরিয়ে এল আটটা পা।

দয়া করে পড়াটা বন্ধ কোরো না। মিনতি করছি, শেষ পর্যন্ত পড়ে যাও। তারপর আমার নামে যা খুশি বলে যাও। কিন্তু পড়ো— শেষটা পড়ো। পরেশের কী হাল হল তা দ্যাখো।

চোঙার পিরামিডের মাথায় একটা ফোকর দেখা গেল। সেইটাই তার মুখবিবর। হাঁ করে বিকট চাপা হুংকার ছাড়ছে। তিন চোখের একটা চোখ আমাদের দিকে ঘোরানো রয়েছে এবং একদৃষ্টে পরেশকে দেখছে।

লকলকে একটা জিভ-বেরিয়ে এল ভয়াবহ চোঙাজীবের মুখ থেকে।

পরিষ্কার বাংলায় যাঁতা ঘোরানো কণ্ঠে বললে, 'এই তো চাই।'

কাচের মার্বেলগুলির মতো হলুদ চোখটা কিন্তু নিষ্পলকে চেয়েই রইল পরেশের দিকে।

পরেশও কটমট করে চেয়েছিল সেইদিকে। এখন বললে, 'ভেতরে কাকে বসিয়ে রেখেছেন? বেশ তো হেঁড়ে গলায় কথা বলছে।'

চোঙা বললে, 'এই তো চাই।' কণ্ঠস্বরে একটা চাপা উল্লাস।

প্রফেসর বললেন আমাকে, 'দীননাথ, তোমাকে কুমারটুলির কথা কেন লিখেছিলাম, এবার বুঝতে পারছ? চিংফু ভারতীয় দেবদেবীদের তৈরি করতে গিয়ে এইসব উদ্ভট জানোয়ার বানিয়ে বসেছেন। তবে প্রথম প্রথম তেমনি তো হবেই। কোনও সৃষ্টিটাই সম্পূর্ণ হয়নি। ওদের কেউই মানুষের ভাষায় কথা বলতে শেখেনি। জড়দেহ জীবন পেয়েছে— কিন্তু বুদ্ধিমত্তা পায়নি— ময়না ছাড়া।'

বলে সস্নেহ চোখে তাকালেন চোঙার মতো বিকট বস্তুটির দিকে। ডাকলেন, 'ময়না।'

ময়না বোধহয় ভয়াবহ ওই চোঙাজীবের নাম। সে কিন্তু ফিরেও তাকাল না। কথার জবাবও দিল না। ছ'টা হাত কিলবিল করতে লাগল কেবল।

প্রফেসর বললে, 'পরেশকে মনে ধরেছে বোধহয়। ময়না কিন্তু মেয়েছেলে।'

মেয়েছেলে শব্দটা শুনেই পরেশের কৌতূহল বেড়ে গেল। চোখের তীব্রতা আরও বেড়ে গেল। ময়নাও চেয়ে রইল চোখে চোখে।

প্রফেসর বললেন, 'ময়নাকে আমি বানিয়েছি। আমি দেখেছি আমাদের এই দেহ বড় অসম্পূর্ণ। মাত্র দুটো পা নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতেই আমরা এক বছর কাটাই শৈশবে। তারপর বাকি জীবনটা দু'পায়ে ভালভাবে দৌড়ঝাঁপও করতে পারি না। তাই আটটা পা দিয়েছি ময়নাকে। ফলে ও যে-কোনও দিকে অবিশ্বাস্য বেগে দৌড়োতে পারবে মাকড়শার মতো।'

ময়নার চোঙাবুকের ভেতর থেকে ঝোড়ো গজরানি মুখের হাঁ দিয়ে ঠিকরে গেল। কাচের পাত্রগুলো পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠল সেই আওয়াজে।

প্রফেসর দ্রুতকণ্ঠে বললেন, 'চোঙার মতো দেহ বানিয়েছি দরকার মতো মাথা-হাত-পা ভেতরে ঢুকিয়ে পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে যেতে পারবে বলে। তা ছাড়া ওর সামনে পেছন বলে কিছুই নেই— আমাদের ওই এক অসুবিধে। এর তিনটে চোখ একই সঙ্গে তিন দিক দেখছে— চোঙা দেহ আটটা পায়ের দৌলতে যে-কোনও দিকে ছুটে যেতে তৈরি রয়েছে— ছ'টা হাত দিয়ে ছ'রকমের কাজও করতে পারবে।'

ময়নার গলা দিয়ে এবার গোঙানি আর গজরানি মিলেমিশে বেরিয়ে এল। সেই সঙ্গে একটি মাত্র চিৎকার, 'এই তো চাই। একেই চাই।'

পরেশ একদৃষ্টে চেয়ে আছে ময়নার হলুদ চোখের দিকে।

প্রফেসর ধমকে উঠলেন, 'ময়না! চুপ কর!'

ময়নার গজরানি একটু কমল বটে, কিন্তু চাহনি সরল না।

প্রফেসর আরও তাড়াতাড়ি বলে চললেন, 'মুশকিল হয়েছে ওকে মেয়েছেলে বানিয়ে। পুরুষ সঙ্গীর জন্যে বায়না ধরেছে অনেকদিন ধরেই। উপযুক্ত বর বানিয়ে দেব কথা দিয়েছি। কিন্তু এমন হাঁপাই জুড়েছে যে বলবার নয়।'

ময়নার গলা দিয়ে যেন অ্যাটমবোমার উদগারে বেরিয়ে এল এবার, 'একেই চাই। এতেই হবে।'

'শাট আপ!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর।

ঠিক এই সময়ে নির্বোধ পরেশ গলা চড়িয়ে বললে, 'খবরদার প্রফেসর! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, খাঁচায় আটকে কষ্ট দিচ্ছেন একজনকে, আবার ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ করতেও যাচ্ছেন। আমি দেখতে চাই কাকে বন্দি রেখেছেন চোঙার মধ্যে।'

বলেই, এগিয়ে গিয়ে গরাদ ধরতে গেল ময়নাকে ভাল করে দেখবে বলে।

সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে দু'জনের হাত ছুটে গেল পরেশের দিকে। ময়নার ছ'টা হাত বিজলী রেখার মতো সড়াত করে গরাদ পেরিয়ে ধেয়ে এল বাইরে— আর প্রফেসরের দু'হাত পরেশের দু'কাঁধ খামচে ধরে এক ঝটকায় টেনে আনল পেছনে। আর একটু দেরি হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত। ছ'টা হাত দিয়ে ছ'টা গরাদ চেপে ঝনঝনাঝন শব্দে নাড়া দিতে

দিতে রক্ত জল করা কণ্ঠে এক নাগাড়ে চেঁচিয়ে চলল ময়না, 'ওকে চাই! ওকে চাই! ওকে চাই! ওকে চাই! ওকে চাই!'

প্রফেসর আর দাঁড়ালেন না। বিমূঢ়, হতচকিত, স্তম্ভিত পরেশকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে দু'পাশের খাঁচার মধ্যে দিয়ে দরজার দিকে ছুটলেন। দু'পাশের গরাদঘর থেকে অমানুষিক গলায় একযোগে চেঁচিয়ে চলল কিম্ভূতকিমাকার অপসৃষ্টিরা। পেছন থেকে ঝনঝনাঝন শব্দে গরাদের বাজনা বাজিয়ে সমস্ত বাড়ি কাঁপিয়ে হাহাকার করে চলল ময়না, 'ওকে চাই! ওকে চাই! ওকে চাই! ওকে চাই! ওকে চাই!'

অতবড় ঘর ছুটে পেরিয়ে আসতে আসতেই শুনলাম একটা প্রচণ্ড শব্দ হল পেছনে— গরাদ চুরমার হয়ে গেল। আমরা ফিরেও দেখলাম না কী হল। বিদ্যুৎবেগে দরজা পেরিয়ে এসে রোলিংশাটার টেনে বন্ধ করে দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'পালাও!'

কিন্তু কোথায় পালাব? পরেশ হঠাৎ যেন স্থানু হয়ে গিয়েছে। বিয়ে বিয়ে করে এতদিন আমার মাথা খেয়েছে, এখন পাত্রী পেয়েও ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

ঘরের ভেতর ততক্ষণে তাণ্ডব কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। গড়গড় শব্দে কী যেন গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে ঘরের এদিক থেকে সেদিকে— এক-একটা ধাক্কা লাগছে, তার প্রচণ্ড শব্দে চুরমার হয়ে যাচ্ছে কাচের জিনিসপত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি।

প্রফেসর হৃষ্টকণ্ঠে বললেন, 'ফার্স্ট ক্লাস। ময়নার গায়ের জোরটা লক্ষ করছ? হাত-পা পেটে ঢুকিয়ে নিয়ে স্রেফ গড়িয়ে গিয়ে ধাক্কা মারছে। তবে ঘর থেকে বেরোতে পারবে না— দরজা কাকে বলে তা তো জানে না।'

ভুল করেছিলেন প্রফেসর। দরজা কাকে বলে জানে না ঠিকই— কিন্তু কচ্ছপের বর্ম দিয়ে মোড়া ওই বিপুল দেহ দিয়ে যে-কোনও জায়গায় আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরে বেরিয়ে আসতে পারে।

হলও তাই। প্রফেসর থামতে না থামতেই রোলিংশাটার সমেত ল্যাবোরেটরির দেওয়াল ভেঙে পড়ল একটি মাত্র ধাক্কায়— রাবিশের মধ্যে দিয়ে ভীমবেগে ধেয়ে এল ময়না, এল গড়াতে গড়াতে! কিন্তু কী আশ্চর্য অনুভূতি। ঠিক বুঝে নিল হবু বর এখন সামনেই। তাই তড়াক করে খাড়া হয়ে গিয়ে আট পা বার করে ছ'হাত কিলবিলিয়ে খপ করে তুলে নিল পরেশকে।

প্রফেসর চিৎকার করে উঠলেন, 'ময়না! ময়না! ময়না!'

ময়না শুধু 'পেয়েছি! পেয়েছি! পেয়েছি! পেয়েছি!' বলতে বলতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পরেশকে নিয়ে দৌড়োল বাইরের দিকে। আটটা পা দেখলাম ইলেকট্রিক পাখার মতো ঘুরছে। চকিতের জন্যে দেখলাম দু'হাতে পরেশকে কোলে শুইয়ে আর দু'হাতে তার গায়ে মাথায় বুলিয়ে আদর করছে। তার পিরামিড মুখটা নামিয়ে ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

এর বেশি আর দেখতে পাইনি। মাকড়সার গতি যারা দেখেছে, তারাই বুঝতে পারবে বর নিয়ে ভাগলবা ময়না কী অবিশ্বাস্য গতিবেগে আট পা চালিয়ে নেমে গেল পাহাড় বেয়ে। সমানে হাত পা ছুড়ে পাগলের মতো চেঁচিয়ে চলল পরেশ, 'বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও!

বাঁচাও!' দেখতে দেখতে আওয়াজটা ক্ষীণ হয়ে এল জঙ্গলের মধ্যে। তারপর একটা ঝপাং আওয়াজ শুনলাম। ব্যস, আর কোনও আওয়াজ নেই।

তখন রাত হয়েছে। অন্ধকার। প্রফেসর টর্চ নিয়ে এলেন। আমরা নেমে গেলাম। একটি মাত্র কাঠের পোলের কাছে পৌঁছোলাম। ঝপাত আওয়াজটা সেইদিক থেকেই এসেছিল। কাঠের পোল আস্তই রয়েছে। ময়না নদী কাকে বলে জানত না। সাঁতার জানা না-থাকলে পোল বেয়ে নদী পেরোতে হয়, জানা ছিল না। তাই বায়ুবেগে ডাঙার ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে নদীর মধ্যেই নেমে গিয়েছে। আর উঠতে পারেনি। অত ভারী দেহ নিয়ে সাঁতার জানা না-থাকলে কি জলে ভাসা যায়?

পাড়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছে পরেশ।

একা।

মলিকিউল মানুষ

দোষটা প্রফেসরেরই।

পীতাম্বর লোকটাকে দেখেই বুঝেছিলাম মতলব খারাপ। বেঁটে, মাথাটা প্রকাণ্ড— সবটাই টাক, কানের ওপর খানকয়েক রুখু চুল, কিন্তু গালপাট্টার ঠেলায় অন্ধকার! সেকেলে ডাকাতদের মতো চোয়ালের হাড় পর্যন্ত কেবল দু'গাল জুড়ে ঘন দাড়ি। চিবুকে একটাও চুল নেই, গোঁফ-টোঁফের বালাই নেই! নাকটা থ্যাবড়া। চোখ দুটো ঠিক শুয়োরের চোখের মতো কুতকুতে। মোটা মোটা ঠোঁটে সে কী আদেখলা হাসি। দেখলেই গা জ্বলে যায়।

প্রফেসর অবিশ্যি প্রথমে দূর দূর করে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন পীতাম্বরকে। রোদ্দুর থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ বানাবার গবেষণা নিয়ে তখন তিনি ব্যস্ত। দারুণ গরমেও ফ্যান চলবে— লোডশেডিং আর হবে না, রাজস্থানের মরুভূমিতে বাগান দেখা যাবে। গুপ্তধনের হদিস বলবার সময় কোথায়?

কিন্তু পীতাম্বর সটান মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরল। জয়গড় কেল্লায় রাজা জয়সিংয়ের গুপ্তধনের হদিস বলে দিয়েছেন একজন বৈজ্ঞানিক। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনিই বা পারবেন না কেন? তা ছাড়া, সমস্যা থাকলেই তার সমাধানও থাকে— বৈজ্ঞানিকরা যখন এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, প্রফেসর কেন পারবেন না কাশ্মীর গুপ্তধনের হদিস বার করতে।

পীতাম্বরের ওষুধে কাজ হল।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল গুপ্তধন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

* * *

সেই ফাঁকে পীতাম্বরের গুপ্তধনের ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলে নিই।

কাশ্মীরের চাম্বা উপত্যকায় ইরাবতী নদীর তীরে দুর্গম পাহাড়ের মাথায় ভগবান বুদ্ধের দেহাস্থির ওপর চারশো ফুট উঁচু একটা মিনার দেখতে গিয়েছিল পীতাম্বর। আদিবাসীদের কাছে একটা শিলালিপিও দেখতে পায়। ভাষাটা সংস্কৃত। মিনারের ধারে কাছে কোথাও এক বিশাল গুপ্তধনের হদিস দেওয়া আছে শিলালিপিতে। পুরুষানুক্রমে গুপ্তধনের হদিস আগলে

রেখে দিয়েছিল আদিবাসীরা। ধুরন্ধর পীতাম্বর ওদের পেট থেকে বার করে নেয় কথাটা।

শিলালিপির গুপ্ত সংকেত অনুযায়ী একশো পাঁচদিন খোঁড়াখুঁড়ি চলে মিনারের আশপাশে। কিন্তু প্রতিবারেই ড্রিল কঠিন পাথরে গিয়ে ঠেকেছে—মেট্যাল ডিটেক্টরেও ধাতুর অস্তিত্ব ধরা পড়েনি।

আধুনিক সরঞ্জাম নিয়েও নাকের জলে চোখের জলে হয়ে পীতাম্বর ছুটে এসেছে প্রফেসরের কাছে। শিলালিপির অর্থ খুব স্পষ্ট। প্রায় দশ হাজার টন ধনদৌলত পোঁতা আছে মাটির তলায়—আর আছে একটা বৈজ্ঞানিক বিস্ময়। কিন্তু কিছুতেই মানে বার করা যাচ্ছে না একটা গূঢ় লিখনের— ও-দেশি ভাষায় তার নাম বীজাক।

* * *

তিন ঘণ্টা পর প্রফেসর বললেন, 'পীতাম্বরবাবু, বীজাকটার আপনি কী মানে করেছেন?'

'১২১: ২৩২: ৪৬৮৩১— এই সংখ্যাটার?'

'হ্যাঁ।'

'শিবকুণ্ড ঝরনা থেকে ১২১ গজ দূরে মিনারের দিকে যাও। ২৩ গজ খাড়াইভাবে মাটি খুঁড়লে ২ গজ বর্গক্ষেত্রের একটা পাথরের চাঁই পাওয়া যাবে। তার চারকোণে চারটে ঘর আছে। পাথরের চাঁই থেকে ৬ গজ সমান্তরাল ভাবে খুঁড়ে গেলে ৮টা স্বর্ণপাত্র বোঝাই হিরে আর তিনটে চাবি পাওয়া যাবে। তিনটে চাবি দিয়ে তিনটে ঘর খোলা যাবে—প্রত্যেকটা ধনরত্নে ঠাসা। কিন্তু একটা ঘরের চাবি নেই এবং এ-ঘর যেন কখনও খোলা না-হয়।'

চোখ কুঁচকে শুনছিলেন প্রফেসর। বললেন, 'সব ঠিক আছে। আমার হিসেবের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও পেলেন না?'

'আজ্ঞে না', শুকনো মুখে বলল পীতাম্বর।

'কী গজ দিয়ে মেপেছিলেন?'

'আজ্ঞে?'

'চাকরবাকরের মতো আজ্ঞে আজ্ঞে করবেন না। কী গজ দিয়ে মেপেছিলেন?'

'আজ্ঞে— ইয়ে— সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'কী বুঝতে পারছেন না?'

'গজ ক'রকমের হয়?'

প্রফেসর হাত বাড়িয়ে তাক থেকে একটা গজকাঠি নামিয়ে এনে বললেন, 'এই দিয়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'সাড়ে ছত্রিশ ইঞ্চি মাপের গজকাঠি? মানে, বিরানব্বই দশমিক সাত শূন্য সেন্টিমিটার?'

'আজ্ঞে, সব গুলিয়ে যাচ্ছে। গজকাঠিতে এই মাপই তো থাকে।'

'তা থাকে। তবে আপনার মাথাটা যত বড়, গ্রে-ম্যাটার যদি তত থাকত, তফাতটা ধরতে পারতেন।'

'আজ্ঞে!'

'থামুন। শিলালিপিতে যে সালটা লেখা রয়েছে, খ্রিস্টাব্দের হিসেবে সেটা ১৭১১। কারেক্ট?'

'ও ইয়েস।'

'১৭১১ সালে গজ কাঠির মাপ কত ছিল জানেন?'

'আজ্ঞে?'

'উফ! আপনার এই আজ্ঞেটা কি থামাতে পারবেন না?'

'আ— বলেই চুপ করে গেল পীতাম্বর।'

'ওই সময়ে সাতাশ ইঞ্চিতে এক গজ হত। বুঝলেন? আটষট্টি দশমিক পাঁচ আট সেন্টিমিটারে। মাথায় ঢুকেছে?'

পীতাম্বর বারকয়েক খাবি খেল কেবল।

* * *

ঠিক দু'মাস পরে ঝড়ো কাকের মতো ফিরে এল পীতাম্বর। টাকের সেই চেকনাই আর নেই। গালপাট্টার চুলে আরও পাক ধরেছে। মুখে খড়ি উড়ছে।

প্রফেসর তখন ছাদে বসে রোদ্দুর থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করছেন। একটা ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বলছে সদ্য তৈরি কারেন্টে। আর একটা জটিল যন্ত্রে জমিয়ে রাখছেন বাড়তি বিদ্যুৎ— রাতে আলো জ্বালবেন বলে।

এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে সটান ছাদেই উঠে এল পীতাম্বর।

প্রফেসর ঘাড় কাত করে দেখলেন, পীতাম্বরের চোখে রক্তের ছিটে লক্ষ করলেন, যন্ত্রপাতি থামিয়ে বললেন, 'কী হল?'

পীতাম্বর যা বলল, তা এই:

সাতাশ ইঞ্চি গজকাঠি দিয়ে মেপে চৌকো পাথর পাওয়া গিয়েছিল, চারটে পাতাল ঘরও দেখা গিয়েছিল। তিনটে ঘরে দশ হাজার টন ধনরত্নও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু যে-ঘরটা খুলতে নিষেধ করা হয়েছিল, সেটা খুলতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি।

পীতাম্বর ভেবেছিল, নিশ্চয় সাতরাজার ধন লুকোনো আছে ঘরটায়। তাই পাথরের দেওয়াল ফুটো করে ভেতরে ঢোকার পর দেখেছিল আটফুট উঁচু আর দশফুট চৌকোনা একটা ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা কাচের কফিন বসানো।

এ ছাড়া ঘরে আর কিসসু নেই। একদম ফাঁকা।

চকচকে ধাতুর তৈরি কফিনের ওপরটা গোলমতো কাচ দিয়ে ঢাকা।

ভেতরে শুয়ে একটা মানুষ। প্রায় সাতফুট লম্বা। পরনে সেকেলে রাজার মতো পোশাক।

একদম তাজা মানুষ যেন। মড়া বলে মনেই হয় না। দারুণ স্বাস্থ্য। যেন এইমাত্র চোখ মেলে তাকাবে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর পীতাম্বররা কাচের ঢাকনাটা খুলতে গিয়ে দেখলে জিনিসটা মোটেই কাচ নয়। প্লাস্টিকও নয়। ঢের বেশি শক্ত একটা বস্তু।

ভাঙাও যায় না। শেষকালে টানাহেঁচড়া করতে গিয়ে খট করে একটা আওয়াজ হল। কোনও লুকোনো বোতামে চাপ লেগেছিল নিশ্চয়— খটাস করে ঢাকনাটা আপনা থেকেই উঠে গিয়ে ঝুলতে লাগল একপাশে। আর...

সেকেন্ড কয়েক পরেই নিশ্বাস নিতে লাগল কফিনের মানুষটা। বুকটা উঠতে নামতে লাগল আস্তে আস্তে। ফুলতে লাগল নাকের পাটা। কাঁপতে লাগল চোখের পাতা।

পর মুহূর্তেই খুলে গেল দু'চোখের পাতা। ড্যাবড্যাব করে পীতাম্বরদের দিকে চাইল কফিনের জ্যান্ত মড়া।

তার পরেই, ওদের ছানাবড়ার মতো বড় বড় চোখের সামনেই, আচমকা লোকটা মিলিয়ে গেল বাতাসে।

এই ছিল, এই নেই। দেখেই বিষম ভয়ে বিকট চেঁচাতে চেঁচাতে পীতাম্বররা পাতাল কুঠরি ছেড়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

বেরিয়ে এসেছিল বলেই রক্ষে।

কেননা, ঠিক তার পরেই থরথর করে কেঁপে উঠল পাহাড়। আচমকা ভূমিকম্পে মিনার সমেত পাতাল কুঠরি ধসে পড়ল গভীর খাদের তলায়, ইরাবতীর জলে।

* * *

কাহিনি শেষ করে পীতাম্বর ডান হাত বাড়িয়ে দেখাল গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছে। মাথায় চুল থাকলে নিশ্চয় তাও খাড়া অবস্থায় দেখা যেত।

কাঁপা গলায় বললে, 'স্যার, লোকটা কি ভ্যামপায়ার? ড্রাকুলা?'

প্রফেসর অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইলেন। হ্যাঁ, না— কিছুই বললেন না।

* * *

পীতাম্বর বিদায় নিয়েছে। প্রফেসর ওঁর বিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্রের সামনে চুপ করে বসে রয়েছেন। কাঠফাটা রোদে চাঁদি ফাটবার উপক্রম হয়েছে খেয়াল নেই।

এমন সময় ছায়া পড়ল সামনে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, পীতাম্বর। আগের সেই উদভ্রান্ত চেহারা আর নেই— সংযত, শান্ত; আর, চোখেমুখে কেমন জানি একটা চাপা নিষ্ঠুরতা।

ঠিক এরকম মুখচ্ছবি পীতাম্বরের মুখে আগে দেখিনি। একটা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব অদৃশ্য বিকিরণের আকারে যেন চোখমুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঠোঁটের কোণে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসি।

প্রফেসর চোখ তুলে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে গেল।

পীতাম্বর ভরাট গম্ভীর গলায় বললে, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম।' একটু থেমে, 'আপনার জন্যেই মুক্তি পেলাম আঠারশো বছর পরে।'

প্রফেসর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

পীতাম্বর বললে, 'আমি পীতাম্বর নই। আমি সেই লোক যে কাচের কফিনে বন্দি হয়ে ঘুমিয়ে ছিল আঠারশো বছর ধরে— যে দীর্ঘ আঠারশো বছর হিমঘুম ঘুমিয়ে ফের জেগে উঠেছে পৃথিবীর অধীশ্বর হবে বলে।'

অস্ফুট স্বরে প্রফেসর বললেন, 'কে আপনি?'

হেঁয়ালির হাসি হেসে পীতাম্বর বললে, 'সেটা নাই বা জানলেন? ঐতিহাসিকরাও আমার মুখ দেখেনি, আমার মুণ্ডহীন ব্রোঞ্জমূর্তি পেয়েছে মথুরায়। আমার মুখ দেখাতে চাই না বলেই এসেছি পীতাম্বরের চেহারা নিয়ে। আমিই চিনসাম্রাজ্য থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম; অশ্বঘোষ, চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুনদের রাজসভায় স্থান দিয়েছিলাম; গ্রীক ভাস্কর্যের অনুকরণে গান্ধার শিল্পের প্রবর্তন করেছিলাম। আমার মৃত্যু রহস্যে ঢাকা। কেউ কেউ বলে আমি প্রজাদের হাতে মারা গিয়েছি। কিন্তু আমি মরিনি।'

প্রফেসর বললেন, 'এই যন্ত্রটায় একটু হাত দেবেন?'

'কেন?'

'আপনি ভূত কিনা পরীক্ষা করব।'

'কী আছে ওতে?' সন্দিগ্ধ চোখে বলে পীতাম্বর।

'স্থির-তড়িৎ। স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। পরাশ্রয়ী প্রেতাত্মা স্থির-তড়িৎ সহ্য করতে পারে না। পীতাম্বরের দেহে আপনি কোনও প্রেতাত্মা ঢুকে বসে আছেন কি না, সেটা যাচাই হয়ে যাক।'

হাসল পীতাম্বর। প্রফেসরের এগিয়ে দেওয়া যন্ত্রটা স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হৃষ্টকণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'গুড! আপনি আর যাই হন— ভূত কি ভ্যাম্পায়ার নন। হিমঘুম ঘুমোতে কে শিখিয়েছিল আপনাকে? কফিনেই বা বন্দি ছিলেন কেন? ফস করে অদৃশ্যই বা হলেন কী করে? এখন পীতাম্বরের চেহারাটাই বা ধরলেন কী করে?'

পীতাম্বররূপী আগন্তুক আবার নিগূঢ় হেসে বললে, 'বেশি সময় নেই। সংক্ষেপে বলছি। আমার রাজসভায় যে বৈজ্ঞানিকটি ছিলেন, তাঁর নাম নাগার্জুন। কিন্তু আমি বলছি আর এক নাগার্জুনের কথা। আপনারা জানেন না বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত কয়েকজন নাগার্জুন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এমনি এক নাগার্জুন যে-সব আবিষ্কার করেছিলেন সে সময়ে— তার কোনওটাই এখনও আপনারা আবিষ্কার করতে পারেননি। হিমঘুম ঘুমিয়ে অমর হওয়ার বিদ্যে ছাড়াও উনি 'কিমিয়া' শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।'

'অ্যালকেমি?'

'হ্যাঁ। আপনিও তো এযুগের অ্যালকেমিস্ট। রোদ্দুর থেকে বিদ্যুৎ বানাচ্ছেন, প্রকৃতি থেকে শক্তি আহরণ করছেন। মহাশূন্য থেকে প্রতিমুহূর্তে এমনি কত রহস্যময় রশ্মি এসে পড়ছে পৃথিবীতে— কে তাদের কাজে লাগিয়েছে বলুন?'

প্রফেসর জবাব দিলেন না।

পীতাম্বর বলল, 'রসায়ন বিদ্যার সঙ্গে তন্ত্রমন্ত্র, জাদুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা মিশিয়ে জীবন-রসায়ন আর পরশপাথর আবিষ্কারের প্রচেষ্টা যে উদ্ভট অবাস্তব নয়, আমিই তার প্রমাণ। অ্যালকেমিস্টরা জেনেছিলেন প্রকৃতিকে পদানত করার চেষ্টা না-করে তাকে নিয়ন্ত্রণ

করতে পারলে মানুষ অনেক সুখে পৃথিবীতে ব্যাধিহীন দীর্ঘজীবন যাপন করতে পারবে। তাঁরা জেনেছিলেন প্রতি মুহূর্তে অত্যন্ত শক্তিশালী এনার্জিধারা সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে মানুষের দেহ স্পর্শ করছে মহাকাশ থেকে— এরই নাম কসমিক রশ্মি। শুয়ে থাকলেও মিনিটে ৭০০০ রশ্মি দেহ ফুঁড়ে চলে যাচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে। জগতের সৃষ্টি-রহস্যের মূলে এই অদৃশ্য রশ্মির প্রভাব কতখানি, তা নিয়ে আজও কি আপনারা কোনও গবেষণা করেছেন?'

প্রফেসর নিরুত্তর।

পীতাম্বর ফের বলল, 'প্রাচীন 'কিমিয়া' শাস্ত্রের পণ্ডিতরা সূক্ষ্ম তড়িৎ-কণিকার এই অজস্র ধারাবর্ষণকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। আমি যে নাগার্জুনের কথা বলছি, তিনি মলিকিউল অর্থাৎ অণুর মধ্যে অবিশ্বাস্য শক্তি সঞ্চারিত করার গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। কসমিক রশ্মির শক্তি অণুর মধ্যে সংহত করে বিশেষ এক ধরনের মলিকিউল বীক্ষণাগারে বানিয়ে আমার শরীরে তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে সমস্ত মলিকিউলের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে।'

একটু থেমে তীক্ষ্ণ চোখে প্রফেসরের মুখ চোখ দেখতে দেখতে পীতাম্বর বললে, 'ব্যাপারটা আরও সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। পদার্থের অণুগুলো যেন এক-একটা ইট— চারিদিকে যা কিছু দেখছেন সব এই অণু নামক ইট দিয়ে তৈরি। এক বা একাধিক ইট সরিয়ে নিলেই একটা বস্তু আরেকটা বস্তু হয়ে যায়। চিনি স্টার্চ হয়, অথবা অ্যালকোহল হয়, রেডিয়াম আপনা থেকেই সিসে হয়ে যায়, ইউরেনিয়াম হয় রেডিয়াম। সবই হল ইট সাজানোর খেলা। মলিকিউলগুলো এক-একরকম প্যাটার্নে সাজিয়ে এক-একরকম জীব বা জড় সৃষ্টি হয়েছে। ইচ্ছেমতো এদের সাজিয়ে যখন খুশি যে-কোনও চেহারা নিতে আমি শিখেছি— এমনকী মলিকিউলদের ছড়িয়ে দিয়ে অদৃশ্য হতেও আমি জেনেছি। এইজন্যেই কফিন খুলে হিমঘুম ভাঙিয়ে দিতেই পীতাম্বরের চোখ দেখে বুঝেছিলাম সে লোভী— তাই অদৃশ্য হয়ে গিয়ে পাথরের অণুর মধ্যে বিপর্যয় এনে পাহাড় ভেঙে আমিই খাদের মধ্যে ইরাবতীর জলে ফেলে দিয়েছি।"

প্রফেসর ঘাড় কাত করে সব শুনলেন। তারপর বললেন, "আপনাকে বন্দি করা হল কেন?'

অদ্ভুত হেসে পীতাম্বর বললে, 'নাগার্জুনকে বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম বলে। তাঁকে বলেছিলাম আমি ত্রিভুবন-অধিপতি হতে চাই। বলেছিলাম, পৃথিবীর যে-কোনও সম্রাটের রূপ ধরে তাঁর সিংহাসনে বসব, বিনা যুদ্ধে সাম্রাজ্য দখল করব— আসল সম্রাটকে গাছপাথর বানিয়ে রাখব।'

'তাও পারেন?'

'কেন পারব না? দেখবেন?'

বলতে না বলতেই দেখলাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র নেই— সে জায়গায় একটা কাঁটাওলা ক্যাকটাস কাঠের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

পরমুহূর্তে ক্যাকটাসের জায়গায় ফের দেখলাম প্রফেসরকে।

উনি বললেন, 'কই, দেখান?'

বুঝলাম, কিছুই বুঝতে পারেননি প্রফেসর। পীতাম্বর আমাকে দেখিয়ে বললে, 'ইনি দেখেছেন।'

প্রফেসর ঢোঁক গিলে বললেন, 'মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল অবিশ্যি। একটা প্রশ্ন। আঠারশো বছর রিপভ্যান উইঙ্কলের মতো ঘুমিয়ে উঠে বাংলাভাষাটা এমন গড়গড় করে বলছেন কী করে?'

মুচকি হেসে পীতাম্বর বললে, 'ওটা টেলিপ্যাথি। আমার চিন্তাটা আপনাদের মাথায় আপনাদের ভাষায় পৌঁছে দিচ্ছি। যাক, যা বলছিলাম। নাগার্জুন আমার ইচ্ছের কথা জানতে পেরে হিমঘুমের পরীক্ষা করার অছিলায় আমাকে কফিনে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন। কফিনের ঠিকানা জানত কেবল আদিবাসীরা। পরে অন্য এক রাজা মিনার তৈরি করে তার ওপর শিলালিপিতে লিখে রাখে গুপ্তধনের হদিস তার বংশধরদের সুবিধার জন্যে। এ-সবই আদিবাসীদের কাছ থেকে জেনেছি ঘুম ভাঙার পর। কাজটা যে-রাজাই করুক, তাকে ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। আপনাদের জন্যেই আজ আমি মুক্ত। বিশ্বপ্রধান হতে আর দেরি নেই আমার। বিদায়।'

বলেই, পাঁচিলে গিয়ে দাঁড়াল পীতাম্বর। লাফিয়ে পড়ল শূন্যে।

আঁতকে উঠে দৌড়ে গেলাম পাঁচিলের ধারে।

কিন্তু কোথায় পীতাম্বর? একটা বিরাট ঈগল পাখি মস্ত ডানা মেলে উড়ে গেল সামনে দিয়ে।

কলকাতার আকাশে ঈগল পাখি?

ঘোর সন্দেহ হল। বদমাশ পীতাম্বরটা সম্মোহনের মায়া দেখিয়ে গেল না তো? সবটাই কি হিপনোটিজমের ভেলকি। মেসমেরিজমের ম্যাজিক?

প্রফেসর কিন্তু দেখলাম একদৃষ্টে ক্রমশ ছোট-হয়ে-আসা ঈগল পাখির দিকে তাকিয়ে আছেন। বহুরূপী অমিতশক্তি অমর ওই অতিমানুষটা উড়ে গেল পৃথিবীর কোন সিংহাসন দখল করতে, তন্ময় হয়েছিলেন বোধহয় সেই উদ্ভট কল্পনায়!

যাই ঘটুক না কেন, দোষটা কিন্তু প্রফেসরেরই।

তাই নয় কি?

সোনা

চুলগুলো শজারুর কাঁটার মতো হাতখানেক লম্বা, সটান দাঁড়িয়ে মাথার ওপর। যেন রুপো দিয়ে তৈরি, এমন চকচকে। বাদবাকি মুখটা অবিকল মানুষের মতোই— এমনকী হাত-পা পর্যন্ত। মাথায় যা একটু খাটো। নেহাত বাচ্চা ছেলে বলে মনে হয়।

সরল চোখে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'আমাদের আশ্রয় দিন।'

অন্য গ্রহের অনেক কিম্ভুতকিমাকার জীব দেখেছেন প্রফেসর, কিন্তু এরকম মানুষ-মানুষ চেহারার রুপোলি শজারু-চুলওয়ালা প্রাণী কখনও দেখেননি।

তাই অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন মুলুক থেকে আসছ?'

'ছায়াপথের মাঝখান থেকে।'

'এতদূরে, ছায়াপথের কিনারায়, আশ্রয় ভিক্ষা করতে এলে কেন? থাকবার মতো আর গ্রহ পেলে না আসবার পথে?'

'পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার মতো উদার পরোপকারী বৈজ্ঞানিক কোথাও পেলাম না।'

একগাল হেসে প্রফেসর বললেন, 'নিজেদের মুলুক ছেড়ে চলে এলে কেন?'

'আমরা নির্বাসিত।'

'নির্বাসিত কেন?'

'আমাদের গ্রহের নাম শুম্পাকুম্পা। পাশের গ্রহটার নাম আনচিবানচি। দুই গ্রহবাসীদের রক্ত আমাদের দেহে রয়েছে। আমরা দো-আঁশলা। খাঁটি নই। তাই কোনও গ্রহেই ঠাঁই নেই। তাড়িয়ে দিয়েছে স্পেসশিপে চাপিয়ে— অন্য কোনও গ্রহে ঘর বাঁধবার জন্যে।'

ভাবনায় পড়লেন প্রফেসর। কোথায় থাকতে দেবেন, এই নিয়েই তো চিন্তা। লোকালয়ে রাখা যাবে না— চিড়িয়াখানায় যেরকম ভিড় হয়, তার একশোগুণ বেশি হবে আজব জীবদের দেখতে।

ভেবেচিন্তে আন্দামান-নিকোবরের শ-দুই খুদে খুদে দ্বীপের একটিতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন প্রফেসর ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলে। অত্যন্ত আদিম বাসিন্দারাও থাকে না সেই দ্বীপটিতে। শুধু আছে পাহাড় আর বন। চারপাশে সমুদ্র।

পৃথিবী-জোড়া আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার শুরু হল তারপর থেকেই।

প্রথম ঘটনাটা ঘটল জাপানে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আন্দামান-নিকোবর

দখলে রেখেছিল জাপানিরা, তাই প্রথম চোটটা গেল যেন তাদের ওপর দিয়েই।

ফুজিকানকো নামে এক জাপানি টুরিস্ট এজেন্সি একটা সোনার বাথটাব বসিয়েছিল বিলাসবহুল একটা হোটেলে। খাঁটি সোনার বাথটাবে স্নান করার লোভে দলে দলে টাকার কুমির টুরিস্টরা আসত হোটেলে। একশোগুণ বেশি ঘরভাড়া দিত। দু'দিনেই টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলেছিল ফুজিকানকো। দুর্ভাবনাও অবশ্য কম ছিল না। টুরিস্টের ছদ্মবেশে দুর্বৃত্তরাও আসত সোনার বাথটাবের খানিকটা কেটেকুটে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। একদিন তো এক বুড়ি চান করতে করতে কামড়ে খানিকটা সোনা ভেঙে নিতে গিয়ে দাঁত-টাত ভেঙে হাসপাতালে পৌঁছে গেল। ডজন ডজন ডিটেকটিভ মোতায়েন রেখেছিল ফুজিকানকো— যাতে সোনার বাথটাবের একটা কণাও চুরি না-যায়।

কিন্তু ডজন ডজন ডিটেকটিভদের চোখের সামনে দিয়েই দিন দুপুরে একদিন আকাশ কালো করে একপাল পোকা ভনভন করতে করতে জানলা গলে ঢুকে গেল সোনার বাথটাব যে ঘরে আছে সেই ঘরে। পোকা ঢুকেছে তো বয়ে গেল, ডিটেকটিভরা তোয়াক্কা করেনি।

আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল পোকারা ভনভন করে জানলা গলে বেরিয়ে যাওয়ার পর।

সোনার বাথটাব বিলকুল অদৃশ্য হয়ে গেছে— গুঁড়ো পর্যন্ত পড়ে নেই কোথাও!

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল মিশরে।

নীলনদের পশ্চিম পাড়ে থিব্স উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা অজ্ঞাত এক ফারাওয়ের সমাধিমন্দির আবিষ্কার করে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সোনা...সোনা ...শুধুই সোনা। আসিরীয়-রানি সেমিরামিস দেবতাদের বড় বড় সোনার মূর্তি বানিয়ে রেখেছেন সেখানে। একটা মূর্তি ছত্রিশ ফুট উঁচু— ওজনে প্রায় তিরিশ টন। রিয়া দেবীর মূর্তিটার ওজন আরও বেশি, প্রায় আড়াইশো টন! দেবীমূর্তি বসানো রয়েছে যে সোনার সিংহাসনে, তার দু'পাশের দুটো বিশাল সিংহমূর্তিও খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি!

পাতাল সমাধিকক্ষের ছাদ, থাম, শবাধার, মেঝে সমস্ত খাঁটি সোনার!

ডাকাতদের হামলা যাতে না হয়, তার সব ব্যবস্থাই করেছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। শ'খানেক প্রহরী মোতায়েন ছিল বন্দুক-টন্দুক নিয়ে। কিন্তু একদিন বলা-নেই কওয়া-নেই, জ্বলন্ত সূর্যের মুখ ঢেকে প্রচণ্ড গুঞ্জন ধ্বনিতে কান ঝালাপালা করে দিয়ে পঙ্গপালের মতো অদ্ভুত এক পাল পোকা বাঁই বাঁই করে ঢুকে গেল পাতাল সমাধিতে। ঝাঁকে ঝাঁকে পোকাদের আক্রমণে পাঁই পাঁই করে বাইরে বেরিয়ে এল প্রহরীরা। ঘণ্টাকয়েক পরে পোকারা আবার ভনভন শব্দে থিব্স উপত্যকা কাঁপিয়ে উড়ে গেল আকাশে— মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

দেখা গেল রাজাদের উপত্যকা প্রায় ফকিরদের উপত্যকা হয়ে গিয়েছে!

সমাধিকক্ষে এককণা সোনাও আর নেই। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে টন টন ওজনের মূর্তি আর শবাধার। ফারাওয়ের মমিটা কেবল পড়ে আছে মেঝেতে। সে-মেঝেও আর সোনা বাঁধানো নয়, পাথরের। থাম আর খিলেন থেকেও উধাও হয়েছে সমস্ত সোনা!

তৃতীয় ঘটনাটা ঘটল পারস্যে।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রথম সোনার মোহর তৈরি হয় পশ্চিম এশিয়া মাইনরের শক্তিশালী দাস-শাসিত দেশ লিডিয়াতে। দাস-দাসীরাই ছিল সে দেশের হর্তাকর্তা। গ্রিস আর পুব অঞ্চলের প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাণিজ্য করার সময়ে ছাপমারা সোনার মোহর চালু করে লিডিয়ানরা। মোহরটার নাম স্টেটার। একদিকে আছে একটা ছুটন্ত শেয়ালের ছবি, আর একদিকে লিডিয়ার প্রধান দেবতা বাসারিয়াস-এর ছবি।

পারস্যের রাজা সাইরাস লিডিয়া জয় করে নেওয়ার পর নিজের ছবিওলা সোনার মোহরও চালু করে সাম্রাজ্যে। এ মোহরের নাম ডারিক্স।

সাইরাসের সাম্রাজ্যও কিন্তু একসময়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আলেকজান্ডারের পরে হানা দেয় চেঙ্গিজ খান।

পারস্যের বর্তমান নাম ইরান। পেট্রল উৎপাদনের দিক দিয়ে পৃথিবীর ষষ্ঠ দেশ। এদেশে বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে, পাহাড়ঘেরা অরণ্যও আছে।

সবচেয়ে গহন অরণ্য এলবার্জ পর্বতে। এইখানে হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল চেঙ্গিজ খানের গুপ্তভাণ্ডার।

পাতাল গর্ভে সঞ্চিত রয়েছে স্তূপাকার স্টেটার আর ডারিক্স— সোনার মোহর!

তেলের দেশ ইরানে এত সোনা? হইচই পড়ে গেল সারা দুনিয়ায়।

তার পরেই আবার সেই আজব কাণ্ড!

ধাঁ করে একদিন আকাশ কালো করে ধেয়ে এল অজানা কীট বাহিনী। গুঞ্জননির্ঘোষে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হল এলবার্জ পাহাড়ের রক্ষীদের। হুড়হুড় করে উড়ুক্কু পতঙ্গরা সেঁধিয়ে গেল গুপ্তভাণ্ডারে। কয়েক ঘণ্টা পরে বেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল সোনার মোহরের ছিটেফোঁটাও আর নেই!

চতুর্থ ঘটনাটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

মধ্যযুগে সিসে থেকে যারা সোনা তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে, আহাম্মক সেই পরাবিজ্ঞানীদের এককথায় বলা হল অ্যালকেমিস্ট। শুধু সিসে কেন, কমদামি অনেক ধাতু থেকেই সোনা তৈরির জন্যে প্রাণপাত গবেষণা চালিয়ে গেছে তারা প্রস্তর দুর্গের পাতাল কুঠরিতে গনগনে চুল্লিতে কড়া চাপিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত। অদ্ভুত আলো ঠিকরে বেরিয়েছে তরল পদার্থ থেকে, কটু ধোঁয়ায় দম আটকে এসেছে— গবেষণায় খ্যামা দেয়নি তা সত্ত্বেও।

পরশ পাথরের সন্ধানে কত যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তারও ইয়ত্তা নেই। ১৪৪০-এ কুখ্যাত ব্যারন দ্য রেজ আটশোজন কুমারী মেয়েকে খুন করে তাদের রক্ত দিয়ে সোনা নিষ্কাষণ করে সোনার পাহাড় বানিয়ে ফেলেছিল। খুঁটিতে বেঁধে ব্যারনকে পুড়িয়ে মারার পাঁচশো বছর পরে ১৯২৫ সালে তার প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ খুঁড়তে গিয়ে দেখা গেল কোয়ার্জ পাথরের একটা শিরা সোনাসমৃদ্ধ! সোনা বার করা হয়েছে এখান থেকেই— আটশো মেয়েকে জবাই করা হয়েছে খামোকা লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে।

সবচেয়ে বড় আবিষ্কারটা কিন্তু গোপন করার চেষ্টা করেও গোপন রাখা যায়নি। তা না হলে রহস্যময় পতঙ্গ বাহিনীর আবির্ভাব ঘটবে কেন?

হ্যাঁ, সোনার পাহাড় পাওয়া গেছিল একটি পাতাল প্রকোষ্ঠে। ব্যারনের সোনার ভাণ্ডার!

অতর্কিতে একদিন মিশমিশে পতঙ্গরা মেঘের মতো আবির্ভূত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভগ্নস্তূপে— চেঁচেপুছে সোনার ভাণ্ডার লুঠ করে নিয়ে চলে গেল কয়েক ঘণ্টা পরে!

পঞ্চম ঘটনা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্যারিসের ধর্মযোদ্ধারা নানান দেশের সোনা লুঠ করে এনে লুকিয়ে রেখেছিল পরিখা-ঘেরা দুর্ভেদ্য এক দুর্গে। স্বর্ণলোভী রাজা ফিলিপ দ্য ফেয়ার ধর্মযোদ্ধাদের গুরুকে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারার পর দুর্গে হানা দিয়ে সেই কুবের সম্পদের কানাকড়িও দেখতে পেলেন না। সমস্ত সোনা কিন্তু লুকোনো ছিল দুটো ফাঁপা থামের মধ্যে। ফোঁপরা থাম দুটো আজও আছে মন্দিরে— সোনা গেল কোথায়?

সাতশো বছর পরে মিলল হেঁয়ালির সমাধান।

ধর্মযোদ্ধাদের গুরু মোলের একটা চিঠি পাওয়া গেল সুপ্রাচীন নথিপত্রের মধ্যে। তাতে তিনি লিখে গেছেন তামকু সমাধির পাতাল-প্রকোষ্ঠে গচ্ছিত রইল সমস্ত সুবর্ণ!

খবরটা পাঁচ কান হওয়ার আগেই পতঙ্গদের কানে চলে গেল রহস্যজনক ভাবে। হৃৎপিণ্ড কাঁপানো গুঞ্জন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তারা এল এবং সবাইকে বোকা বানিয়ে দিয়ে চম্পট দিল সমস্ত সোনা নিয়ে!

ষষ্ঠ ঘটনায় লোপাট হয়ে গেল খান বাটু-র সোনার ঘোড়া।

সারা জীবন ধরে অনেক দেশ জয় করে, অনেক সোনা লুঠ করে— খান বাটু অবশেষে ঠিক করলেন জীবন্ত ঘোড়ার মতোই বড়সড় দুটো নিরেট সোনার ঘোড়া তৈরি করবেন। এক-একটা ঘোড়ার ওজন দাঁড়াল দেড়টন।

খান বাটু মারা যাওয়ার পর নতুন শহর বানিয়ে তাঁর উত্তরসূরি খান বারকে ঘোড়া দুটো রাখলেন সেখানে।

বহু বছর পর খান বারকের এক উত্তরসূরির বড় সাধ হল মৃত্যুর পর যেন একটা ঘোড়াকে সমাধিস্থ করা হয় তাঁর সঙ্গেই। ফলে, একটা ঘোড়া গেল পাতাল-কবরে।

বাকি ঘোড়াটা লুঠ করে নিয়ে গেল রুশ দেশের হানাদাররা। পেছন থেকে তাড়া খেয়ে সোনার ঘোড়াকে তারা কোথায় যে লুকিয়ে ফেলল, আজও তার ঠিকানা পাওয়া যায়নি।

হদিশ মেলেনি অপর ঘোড়াটারও। পাতাল সমাধি খুঁড়ে দেখা গেছে দেড়টন ওজন সোনার ঘোড়াটাও নেই!

তাজ্জব কি বাত্! গেল কোথায় খান বাটুর যুগল-ঘোটক?

জবাব মিলল সাহারায় পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর। উৎক্ষিপ্ত বালুকারাশির মধ্যে থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল দু'-দুটো দেড়টন ওজনের সোনার ঘোড়া!

পুরো অঞ্চলটা তখন প্রহরাবেষ্টিত তেজস্ক্রিয় বিপদের আশঙ্কায়। এরই মধ্যে

বিপদ-ফিপদের তোয়াক্কা না-রেখে ভোঁ-ভোঁ করে উড়ে এল পতঙ্গ-বাহিনী— সোনার ঘোড়া হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে উধাও হল দিগন্তে।

কানাঘুসোর শুরু তখন থেকেই। আজব পোকাদের কীর্তিকলাপ কদ্দিন আর লুকিয়ে রাখা যায়? দেশ-বিদেশের আরক্ষাবাহিনী, সিক্রেট পুলিশ, গোয়েন্দাবিভাগ ভেবে ভেবে মাথার চুল প্রায় সাদা করে আনল, কিন্তু রহস্যের কূলকিনারা করতে পারল না।

পারতেনই একজনই— প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। কিন্তু তিনি তখন আমেরিকায়। কোথায় যে আছেন কেউ জানে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা, মানে, বিমানবিজ্ঞান আর মহাকাশ সংস্থার আমন্ত্রণ পেয়েই ছুটেছেন। কেন গেছেন, কী করছেন, কেউ জানে না।

প্রফেসরকে কেউ জানায়ওনি, সারা পৃথিবী জুড়ে সোনা লুঠ করে যাচ্ছে অদ্ভুত পোকারা।

সপ্তম ঘটনাটা নির্বিবাদে ঘটে গেল এরই মধ্যে।

ইউরোপে যখন অ্যালকেমিস্টরা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পরমোৎসাহে সস্তার ধাতু থেকে ধাতুর রাজা সোনা তৈরির উদ্ভট এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছে, ঠিক তখনই অতি সহজে সোনা নিংড়ে বার করার একটা পন্থা আবিষ্কার করে ফেললে স্পেন আর পর্তুগালের লোভী লুঠেরারা।

খুবই নিষ্ঠুর পন্থা যদিও। ১৪৯২-তে ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকার প্রাচীন রাজ্যগুলো আবিষ্কার করার পরেই স্প্যানিশ আর পর্তুগিজরা দলে দলে হানা দিলে আজটেক, ইঙ্কা, মায়া এবং অন্যান্য উপজাতিদের আস্তানায়, যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সোনা লুঠ করে এনে ফেলতে লাগল ইউরোপে।

আমেরিকার মাটিতে যে এরকম অত্যাশ্চর্য সম্পদ হেলায় ছড়িয়ে আছে, লুঠেরারা তা কল্পনাতেও আনতে পারেনি। ১৫১৯-এ ফারনান্দো কর্তেজ ভেরাক্রুজ মাটিতে পা দিতেই আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা মুখ কালো করে এনে দিলে রাশি রাশি সোনার গয়না— তার মধ্যে রইল গাড়ির চাকার মতো ইয়াব্বড় দুটো চাকতি। একটা নিরেট সোনার আর একটা নিরেট রুপোর।

ইঙ্কাদের সাম্রাজ্য তখন দিকে দিকে বিস্তৃত। বিশাল এই সাম্রাজ্যের সর্বত্রই সোনা অতি পবিত্র ধাতু। মন্দিরে মন্দিরে জড়ো করে রাখা হয় পাহাড়প্রমাণ সোনা। একটা মন্দিরের দেওয়াল, থাম, মেঝে, ছাদ সবই নাকি সোনায় মোড়া ছিল। সোনার তারা, সোনার-ফড়িং, সোনার প্রজাপতি, সোনার পাখি, ভারহীন অবস্থায় ঝুলত শূন্যে। এত সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম যে চোখে না-দেখলে বিশ্বাস হয় না। ফারনান্দোর চ্যালাচামুণ্ডারা স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইল অপরূপ সেই সোনার কারুকাজের দিকে। দম আটকে এল ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্যের যুগল সমাহার দেখে।

১৫৩০ সালে যখন সাংঘাতিক যুদ্ধ চলছে আমেরিকার মাটিতে, তখন সেখানে জাহাজ থেকে নামল আর একজন স্পানিয়ার্ড— ফ্রান্সিস্কো পিজারো, ভালমানুষ ইঙ্কারা বুঝতেই পারেনি কী মতলব নিয়ে এসেছে কুচক্রী পিজারো। ইঙ্কাদের সর্দার আতাহুয়ালপা ভাবলে

বুঝি দেবতারা এসেছে দলবল নিয়ে তাদেরই দলে ভিড়ে শত্রুদের ঘায়েল করতে।

মহাভোজে আতাহুয়ালপাকে নেমন্তন্ন জানাল পিজারো। পালক দিয়ে সাজানো সোনার শিবিকায় চড়ে ইঙ্কা সর্দার এল ভালমন্দ খেতে। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আনেনি— কেন আনবে? খাওয়ার নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে কেউ অস্ত্র রাখে সঙ্গে?

তাই তো চায় বিশ্বাসঘাতক স্প্যানিয়ার্ডরা, পিজারো সংকেত করতেই একযোগে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে কচুকাটা করলে ইঙ্কা-সর্দারের অনুচরদের, বন্দি করল আতাহুয়ালপাকে।

নিশ্চয় ছেড়ে দেওয়া হবে ইঙ্কা সর্দারকে— কিন্তু একটি শর্তে, বললে, নিষ্ঠুর, লোভী পিজারো। ওই যে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে আতাহুয়ালপাকে— ওই ঘরে দু'হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াক আতাহুয়ালপা। উত্থিত বাহুর আঙুলের ডগা পর্যন্ত সোনা দিয়ে ভরে দিতে হবে পুরো ঘরটা। তবেই ছাড়া পাবে ইঙ্কা সর্দার! এ সোনা চাই ঠিক দু'মাসের মধ্যে।

সর্বনাশ! সে তো প্রায় একশো ঘন-মিটার সোনার ব্যাপার!

কিন্তু সোনার চেয়ে দামি সর্দারের প্রাণ। দূতরা ছুটল দিকে দিকে সোনা জোগাড় করতে, সোনার গাড়ি সোনার মূর্তি সোনার গয়না নিয়ে কুলিরা দলে দলে দৌড়ে এল দেশের নানান অঞ্চল থেকে, ক্রমে ক্রমে উঁচু হতে থাকে সোনার স্তূপ। কিন্তু গৌর-নিতাইয়ের মতো দু'হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়িয়ে ইঙ্কা সর্দারের নখের ডগা পর্যন্ত আর পৌঁছোল না।

এদিকে দু'মাস ফুরিয়ে এল। কাঁচুমাচু মুখে আতাহুয়ালপা বললে পিজারোকে, 'আর ক'টা দিন সময় দাও। আমার এগারো হাজার অনুগত লামা আরও সোনা মাথায় করে আনছে!'

কিন্তু পিজারো যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি ধড়িবাজ। আরও দু'দিন সবুর করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। বিপজ্জনক শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে ইঙ্কা সর্দার— এগারো হাজার লামা যদি হাতিয়ার নিয়ে হানা দেয় তা হলে আর রক্ষে নেই।

অতএব আর ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই। যা সোনা পাওয়া গেছে, তাই কল্পনার অতীত। খতম করে দাও ইঙ্কা সর্দারকে!

খতম হয়ে গেল আতাহুয়ালপা!

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মতো। এগারো হাজার লামা সত্যি সত্যিই রাশি রাশি সোনা নিয়ে আসছিল সর্দারের মুক্তিপণ দিতে। যে-ই শুনলে সর্দার খতম, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সোনা লুকিয়ে ফেললে আজানগারো পর্বতে।

ইঙ্কাদের ভাষায় আজানগারো মানে এমন একটা অঞ্চল যেখানকার নাগাল ধরা যায় না।

হাত কামড়াতে লাগল স্প্যানিয়ার্ডরা যখন শুনলে বিপুল পরিমাণে এই সোনার মধ্যে নাকি ছিল একটা বিশাল সোনার শেকল— দুশোজন লোক বয়ে আনছিল সেই শেকল!

'কুছ পরোয়া নেই,' বললে পিজারো। 'সব সোনা কি আর লুকিয়ে রাখতে পারবে বোকা ইঙ্কারা? চালাও লুঠতরাজ!'

সত্যিই সব সোনা লুকোতে পারেনি সরল ইঙ্কারা।

যেমন, কাজকো-র সোনায় মোড়া সূর্য মন্দির। এ-মন্দিরের মাঝের বিশাল হল ঘরটাই তো আগাগোড়া মোড়া ছিল পুরু সোনার চাদরে। পুবদিকের দেওয়ালে ছিল একটা বিশাল সোনার চাকতি— সূর্য দেবতার প্রতীক। দামি দামি রত্ন খচিত চোখ দুটো ভোরের রোদ্দুরে

হাজার রঙের রোশনাই ছড়িয়ে এমন একটা মায়াময় পরিবেশ রচনা করত যা দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে যেত ভক্তরা— নিবিড় রহস্য যেন থমথম করত রত্ন খচিত চোখ আর বিশাল সোনার চাকতি ঘিরে!

সূর্যদেবতার সামনে মাথা নুয়ে আসত ভয়ে বিস্ময়ে।

শুধু কি মন্দির, মন্দির ঘিরে ফলের বাগানটাও তৈরি হয়েছিল আগাগোড়া সোনা দিয়ে। সোনার গাছ, সোনার ফল, সোনার ফুল! গাছের ডালে বসে থাকা পাখিগুলো পর্যন্ত সোনার। বড় বড় সোনার সিংহাসন পাতা থাকত মোটা মোটা সোনার ডালে— সূর্যদেবতার পুত্রদের সোনার মূর্তি বসানো থাকত সেই সব সিংহাসনে।

কাজকো তাই অতি গর্বের শহর ছিল ইঙ্কাদের কাছে। সূর্যদেবতা যে স্বয়ং বিরাজমান সেখানে।

পিজারো সদলবলে হানা দিল এই শহরেই। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অত্যাশ্চর্য এই ধর্মের পীঠস্থান অদৃশ্য হয়ে গেল ধরণীবক্ষ থেকে। উন্মাদের মতো লোভী লুঠেরারা সোনা তুলে নিলে মন্দিরের সমস্ত জায়গা থেকে।

বহু শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা ইঙ্কা-সংস্কৃতিকে আগুনে গালিয়ে স্বর্ণপিণ্ড বানিয়ে জাহাজে চাপালে সমুদ্র পথে নিয়ে যেতে সুবিধে হবে বলে!

দীর্ঘ দুশো বছর ধরে চলল এই নারকীয় কাণ্ড। ফি বছর ছোট ছোট জাহাজের নৌ-বহর পোত-বোঝাই সোনার তাল নিয়ে আমেরিকার মাটি ছেড়ে রওনা হত আইবেরিয়ান অন্তরীপ দিয়ে। কিন্তু ইঙ্কারা ছেড়ে দিলেও প্রলয়ংকর সমুদ্র গ্যালিয়ন অর্থাৎ স্পেনীয় জলপোতগুলোকে মাঝে মধ্যেই গ্রাস করে নিয়েছে সোনা সমেত। চিরকালের মতো লুঠেরা ঘাতকদের স্বর্ণপিণ্ড লুকিয়ে রেখেছে জলের অতলে।

১৫৯৫ সালের গ্রীষ্মকালেই 'সান্তা মার্গারিতা' নামে গ্যালিয়নটা সাড়ে ছ'কোটি টাকা দামের সোনা নিয়ে ডুবে গেল ফ্লোরিডা উপকূলের একটু দূরেই। ১৬৪৩ সালে সোনা বোঝাই ষোলোটা গ্যালিয়ন সেভিল যাওয়ার পথে তলিয়ে গেল ভয়ংকর হারিকেন ঝড়ের কবলে পড়ে। ঐতিহাসিক নথিপত্র থেকে জানা যায় প্রায় ষাট কোটি টাকা দামের সোনা ছিল ওই 'স্বর্ণবহরে'। ১৭১৫ সালের বসন্ত ঋতুতে আরও চোদ্দোটা সোনা বোঝাই গ্যালিয়ন কল্পনাতীত হারিকেন ঝড়ের খপ্পরে পড়ে তলিয়ে গেল সমুদ্রে— আমেরিকার উপকূল ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই।

ঐতিহাসিকরা বলেন, প্রায় একশোটা গ্যালিয়নের ভগ্নস্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শুধু ক্যারিবিয়ানেই। ফ্লোরিডার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তেও সলিল সমাধি ঘটেছে আরও শ'খানেক গ্যালিয়নের। প্রায় ষাটটা স্পেনীয় জাহাজের কবরখানা হয়ে রয়েছে বাহামা আর বারমুডা দ্বীপগুলোর আশপাশের সমুদ্র। মেক্সিকো উপসাগরে ডুবেছে প্রায় সত্তরটা গ্যালিয়ন। বত্রিশ কোটি টাকা দামের সোনা ছিল শুধু 'সান্তা রোজা' গ্যালিয়নেই! মন্তেজুয়ামার বিশাল প্রাসাদ থেকে লুঠ করে আনা সোনা।

ফ্যানট্যাস্টিক এই স্বর্ণ সম্পদের লোভে কয়েক শতাব্দী ধরে সোনা-লোভীরা তল্লাশি চালিয়েছে সমুদ্রের অতলে। কিন্তু সমুদ্র যা নেয়, তা সহজে ফিরিয়ে দেয় না।

দুর্গম এই স্বর্ণভাণ্ডারকেও কিন্তু একদিন লুঠ করে নিয়ে গেল অদ্ভুত পোকারা।

এবং, অবিশ্বাস্য পন্থায়!

সহসা একদিন আকাশ কালো হয়ে গেল ঘন মেঘে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমক আর বজ্রপাতে মনে হল যেন পৃথিবীর শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে। মুহুর্মুহু বজ্রপাত ঘটতে লাগল ঠিক সেই সেই অঞ্চলেই যেখানে যেখানে ঐতিহাসিকদের আন্দাজ মতো তলিয়ে গিয়েছে সোনা বোঝাই গ্যালিয়ানগুলো। তার পরেই ফুলে উঠল সমুদ্রের জল।

অথচ ঝড় নেই। বাতাস নেই! প্রভঞ্জনের হুহুংকার নেই। শুধু কড়-কড়াত শব্দে লক্ষ বজ্র আছড়ে পড়ছে তো পড়ছেই।

জল যেন ঝুলে পড়া কালো মেঘরাশি স্পর্শ করল বিশাল বিশাল থামের মতো। তার পরের খবরটি পাঠাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ শাট্‌ল কলম্বিয়ার বেতার।

'প্রতিচ্ছবি সৃষ্টিকারক' অর্থাৎ ইমেজিং রেডার জানালে, শ'য়ে শ'য়ে ভাঙাচোরা গ্যালিয়ন নাকি ভেসে উঠেছিল স্তম্ভাকারে উত্থিত সমুদ্র পৃষ্ঠে— মেঘের মধ্যে থেকে মেঘপুঞ্জের মতোই ছোঁ মেরে নেমে এসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ বাহিনী। তাল তাল ভারী সোনাও অলৌকিক ভাবে ভাসতে দেখা গিয়েছিল জলের ওপর— মাধ্যাকর্ষণের সব নিয়মকানুন বাতিল করে দিয়ে।

তারপর মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল আশ্চর্য পোকারা। মেঘছোঁয়া জল নেমে এসে শান্ত করে দিয়েছিল সমুদ্রকে। সরে গেছিল কালো মেঘ। স্তব্ধ হয়েছিল বজ্রপাত, বিদ্যুৎলহরী।

কলাম্বিয়া জানিয়েছিল আরও একটা খবর।

বিচিত্র পোকারা নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়েছিল এশিয়ার দিকে!

সোনা তো শুধু সমুদ্রের তলাতেই ছিল না, ছিল সোনার খনির মধ্যেও— ডাঙায়। আকরিক সোনার সন্ধানে একদিন দলে দলে সোনা-পাগলরা চষে ফেলেছিল ভূমণ্ডলের নানান অঞ্চল। 'সোনা-জ্বরে' পেয়েছিল যেন এদের। কাণ্ডজ্ঞান বলতে আর কিছুই ছিল না। অদ্ভুত এই জ্বরের বৃত্তান্ত কোনও চিকিৎসা-গ্রন্থে নেই, আছে জ্যাক লন্ডন আর ব্রেত হার্তের লেখা গল্প-উপন্যাসে— যা পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেয়।

সোনার লোভে পশুর পর্যায়ে নেমে এসেছিল মানুষ। মাত্র কয়েক গ্রেন স্বর্ণ-বালুকার লালসায় ভাই গুলি করে মেরেছে ভাইকে, ছেলেরা হত্যা করেছে বাবাদের। পৈশাচিক এই ঘটনা বারবার ঘটেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রেজিলে। গত শতাব্দীতে ঘটেছে রোদে-জ্বলা ক্যালিফোর্নিয়ায়, অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে। ১৮৯০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার 'ট্রান্সভাল'-এর নাম শুনলেই তখন সোনা-লোভীদের চোখ জ্বলে উঠত উদগ্র লালসায়, বরফ-ছাওয়া ক্লোনডাইক-ও রেহাই পায়নি সোনা-জ্বরের সংক্রমণ থেকে; বাদ যায়নি আলাস্কাও।

'কালো সাপ'রা সরীসৃপ ভঙ্গিমায় বরফ-ঢাকা মেরু পর্বতের মধ্যে দিয়ে কাঁধে সোনা নিয়ে সোনাবোঝাই স্লেজগাড়ি টেনে আনছে, এমন ছবিও আছে দেদার, 'কালো সাপ' মানে

কিন্তু চাবুক-খাওয়া গোলাম— কাতারে কাতারে। বছরের পর বছর প্রাণ দিয়েও তারা সোনা-লোভীদের থলি বোঝাই করে গিয়েছে।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে আবিষ্কৃত হল বিশাল সোনার খনি বিরাট সাইবেরিয়ান নদী লেনা-র দুই পাড়ে। ১৭১৬ সালেই কিন্তু উরাল পর্বতের বেরোজোভকা নদীর পাড়ে পাওয়া গিয়েছিল সোনার শিরা, রাশিয়ার বৃহত্তম স্বর্ণপিণ্ড, ছত্রিশ কিলোগ্রাম ওজনের সোনার তাল পাওয়া যায় এই অঞ্চলেই। পৃথিবীর বৃহত্তম সোনার তাল পাওয়া গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়— ওজন, একশো বারো কিলোগ্রাম। ভিক্টোরিয়ার ব্যালারাটে পাওয়া 'ওয়েলকাম স্ট্রেঞ্জার' স্বর্ণপিণ্ডের ওজন ছিল একশো তিরাশি পাউন্ড!

হাজার হাজার বছর ধরে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে অসহায় মানুষদের ওপর শুধু এই সোনার জন্যে! সোনা! অথচ রসায়নবিদ আর পদার্থবিদের কাছে সোনা খুব একটা আগ্রহসঞ্চারী ধাতু নয়। তবুও এই সোনাই মানুষকে নামিয়ে এনেছে অধঃপতনের ঢালু পথে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড আর স্পেনের মধ্যে লড়াই লেগেছিল এই সোনার জন্যেই। মেক্সিকো আর পেরুর সোনা লুঠ করে স্পেন বাড়িয়ে তুলেছিল ইউরোপের স্বর্ণভাণ্ডার।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সোনার মজুদ দেখা গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়— তাই সেখানে শেষ নেই অত্যাচারের। দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই সোনা উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হচ্ছে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ঘানা, দক্ষিণ রোডেশিয়া, কলম্বিয়া, ফিলিপাইন আর মেক্সিকোয়। ভারতের কোলার স্বর্ণখনি কম যায়নি।

এত সোনা নিয়ে যারা বসে আছে, তাদের টনক নড়ল পরপর উড়ুক্কু কীটবাহিনীর অবিশ্বাস্য আক্রমণে। সন্ত্রস্ত হল তারা। কী করবে ভাবছে, এমন সময়ে পোকারা হানা দিল অপ্রত্যাশিত একটা জায়গায়।

নিউ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে।

সাতশো বছর আগে অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাত মানুষরা বিরাট একট বুদ্ধমূর্তি এনে বসিয়ে ছিল ব্যাঙ্ককে। নতুন সরকার ঠিক করলে একটা করাতকল বসানো যাক জায়গাটায়— বুদ্ধমূর্তি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অন্য অঞ্চলে।

কাজে লেগে গেল লোকজন। খুব হুঁশিয়ার হয়ে বেদির ওপর থেকে নামানো হচ্ছে বুদ্ধমূর্তিকে, এমন সময়ে আচমকা এত হুঁশিয়ার থাকা সত্ত্বেও ফাটল ধরল বিশাল বুদ্ধমূর্তিতে।

চমকে উঠল কুলিরা। কী যেন চকচক করছে না ভেতরে? রোদ ঠিকরে যাচ্ছে ফাটলের ভেতর থেকে?

পাথরের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হল বুদ্ধের। স্তম্ভিত হয়ে গেল ব্যাঙ্কক সরকার।

সাড়ে পাঁচ টন ওজনের নিরেট সোনার বুদ্ধ রয়েছে ভেতরে।

স্তম্ভিত ভাবটা অন্তর্হিত হল অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই। অকস্মাৎ দূরায়ত ভ্রমর গুঞ্জনে সচকিত হল ব্যাঙ্ককবাসীরা। দিগন্ত থেকে উঠে আসছে কালো মেঘ...না! না! পঙ্গপালের মতো কালো পোকা!

তারপর সেই একই ঘটনা! অষ্টম ঘটনা! সোনার বুদ্ধমূর্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বেদির ওপর থেকে!

সাড়ে চার কোটি টাকার সোনা!

কিন্তু এই শেষ নয়, এই শেষ নয়! নবম এবং চূড়ান্ত আক্রমণটা ঘটল খোদ মার্কিন মুলুকেই— ফলে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না-থেকে দৌড়োল তারা প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে খবর দিতে!

চাঞ্চল্যকর সেই আক্রমণ পর্বেরই শ্বাসরোধী বর্ণনা এবার দেওয়া যাক!

ধাতুর রাজা সোনাকে পুজো করা হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে, বাদ যায়নি আমেরিকানরাও। তাদের পুজোর ধরনটা অন্য রকম। যে-দেশের সোনার মজুদ যত বেশি, বড়লোক বলে সে দেশের দাপটও তত বেশি। তাই পৃথিবীর সব সোনার মালিকরা ধাতুর রাজা সোনা বেচারিকে যেমন কয়েদির মতো বন্দি রাখে সিন্দুকে, ভল্টে, কংক্রিট পাতাল কুঠরিতে— মার্কিন মুলুকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেখানকার সোনা ছিল ফোর্টনক্স-এ।

ফোর্টনক্স! পাঁচ হাজার ভোল্ট তড়িৎ-প্রবাহ দিয়ে সুরক্ষিত কাঁটাতার ঘেরা ফোর্টনক্স! আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ সোনাই স্তূপাকারে সঞ্চিত সেখানে।

ফোর্টনক্স! সেখানে পৌঁছোতে হলেও পেরিয়ে যেতে হবে দশ-দশটা ওয়াচ-টাওয়ার। প্রত্যেকটা ওয়াচ-টাওয়ারে আছে আধুনিক রেডিয়ো ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা।

ফোর্টনক্স! মেশিনগান আর দ্রুত-বর্ষী ফিল্ডগান বসানো দশটা ওয়াচ টাওয়ার দিয়ে সুরক্ষিত ফোর্টনক্স!

শুধু অস্ত্রশস্ত্র সেপাইসান্ত্রি যন্ত্রপাতি নয়, অন্যান্য ব্যবস্থাও আছে ফোর্টনক্সকে দুর্ভেদ্য রাখার জন্যে। অনেকগুলো অংশে ভাগ করা হয়েছে ফোর্টনক্সকে। যখন খুশি যে-কোনও অংশকে জলে প্লাবিত করা যাবে।

জলেও যদি হানাদাররা ডুবে না-মরে, তাই গ্যাস ছেড়ে দেওয়ার আয়োজনও আছে এক একটা অংশে। মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস! মিনিট কয়েকের মধ্যে হুস্ হুস্ করে গ্যাস ঢুকে যমালয়ে পাঠিয়ে ছাড়বে সোনা লুঠেরাদের। যে-কোনও জীবন্ত প্রাণীদের!

এ-হেন দুর্গম ফোর্টনক্সের ঠিক কেন্দ্রস্থলে রয়েছে আমেরিকার সোনা— ফেরোকংক্রিট বায়ু নিরোধক কক্ষে। দরজাটারই ওজন বিশ টন! বিশেষ ধরনের তালা ঝুলছে পাল্লায়!

এত করেও নিশ্চিন্ত নয় সোনা পাহারাদাররা! সদা জাগ্রত ইলেকট্রনিক চক্ষুর অতন্দ্র চাহনি নিবদ্ধ রয়েছে এই দরজা আর তালার ওপর।

পৃথিবীর আর কোনও কয়েদিকে এমন কড়াভাবে আটকে রাখা হয়নি।

বেচারা ধাতুর রাজা! সোনা, তোমার কয়েদ-দশা দেখে বোধহয় দুঃখে প্রাণ গলে গিয়েছিল বিচিত্র পোকাদের। তাই তারা এল ঝাঁকে ঝাঁকে কয়েদখানা থেকে তোমাকে বিলীন করে দিতে।

কিন্তু কীভাবে?

এই কাহিনির সব চাইতে আশ্চর্য অংশ, লোমহর্ষক সেই উপাখ্যান!

পৃথিবীর সব ক'টা শীর্ষস্থানীয় দৈনিকে খবরটা ফলাও করে ছাপা হয়েছিল ৮ ফেব্রুয়ারি। পড়ে চমৎকৃত হয়েছে অনেকেই— কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কারণ আছে বলে মনে করেনি।

তাই নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছেন বিশ্ববাসী— এমনকী স্বর্ণভাণ্ডারের দুঁদে রক্ষীরাও।

খবরটা এই:

অতিকায় একটা মেঘ দেখা গিয়েছে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে তিরিশ হাজার মিটার ঊর্ধ্বে। বিশালকায় এই মেঘপুঞ্জ গোটা একটা মহাদেশের সমান। অত্যন্ত খুদে কণিকায় ঠাসা এই বিশাল মেঘরাশি।

কীসের কণিকা?

বিজ্ঞানীরা আন্দাজে বলেছিলেন, সালফিউরিক অ্যাসিডের।

সালফিউরিক অ্যাসিডের কণা দিয়ে গড়া মেঘ? এল কোত্থেকে?

জবাব দিয়েছিলেন আমেরিকার উওমিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন বৈজ্ঞানিক ডেভিড হফম্যান এবং জেমস রোজেন। গত এপ্রিলে দক্ষিণ-পূর্ব মেক্সিকোর EL Chichon আগ্নেয়গিরি থেকে প্রবল অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল মনে নেই? এ-মেঘ সেই অগ্ন্যুৎপাতেরই ফল।

চার মাইল পুরু সালফিউরিক অ্যাসিড কণায় ঠাসা মেঘ গড়ে উঠেছে শীত নামতেই।

এত উঁচুতে এত বড় মেঘরাশি তো এর আগে কখনও দেখা যায়নি। সাধারণ মেঘ যতটা ঘন হয় আশ্চর্য এই মেঘ তার চাইতে আড়াইশো থেকে পাঁচশো গুণ বেশি ঘন। কতখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিশাল এই মেঘরাশি, তা সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও মোটামুটি জানা গেছে প্রায় আট হাজার কিলোমিটার।

বিস্ময়কর ব্যাপার নিঃসন্দেহে।

বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পেল বৈজ্ঞানিক দু'জনের আর একটি ঘোষণায়। ন্যাশানাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের তরফে তাঁরা জোর গলায় বললেন, একলক্ষ ফুট অঞ্চল জুড়ে প্রায় স্থায়ী অবস্থায় পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বিরাজ করবে এই বিচিত্র মেঘ। সালফিউরিক অ্যাসিডের বিন্দু-কণাগুলো এতই ছোট যে মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীতে পৌঁছোতে লাগবে অনেক অনেক বছর।

তবে আর কী? নিশ্চিন্ত হল ভারতবাসী।

কিন্তু কিছু অবিশ্বাসী প্রশ্ন তুলেছিলেন, বাপু হে, এত বড় মেঘ এতদিন দেখতে পাওনি কেন শুনি? বাকতাল্লা ঝাড়বার আর জায়গা পাওনি!

দেখা যাবে কী করে? বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকরা— ফোঁটা-কণাগুলো এতই ছোট যে লেজার-আলোকে বিক্ষিপ্ত করতে পারেনি— এই পন্থাতেই তো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মেঘের অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

যাক, সালফিউরিক অ্যাসিড তা হলে আর মাথায় ঝরে পড়ছে না বহু বছরের মধ্যে। খবরটা ভুলে গেলেন তাই সকলেই।

কিন্তু...

চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল অচিরেই।

বিভিন্ন মানমন্দির থেকে খবর এল, তিরিশ হাজার মিটার উর্ধ্বে বিশাল সেই মেঘপুঞ্জের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঘনঘন বিদ্যুৎ-ঝলক! মুহুর্মুহু প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে চারমাইল পুরু গোটা মহাদেশের সমান মেঘরাশি!

যে মেঘ রয়েছে আমেরিকা মহাদেশের ঠিক ওপরেই।

তার পরেই, বলা নেই কওয়া নেই, শুরু হয়ে গেল অকাল বর্ষণ।

সালফিউরিক অ্যাসিডের ধারাবর্ষণ!

মুষলধারে সেই প্রলয়ংকর বৃষ্টি কিন্তু সীমায়িত রইল শুধু একটি জায়গাতেই— ফোর্টনক্স এলাকায়!

আচমকা বৃষ্টিপাত শুরু হল এমন একটা সময়ে যখন ফেরোকংক্রিট কক্ষের বিশ টন ওজনের তালা খোলা হয়েছে, পাল্লাও খোলা হয়েছে— ঠিক তখনই!

অকস্মাৎ সালফিউরিক অ্যাসিডের ধারাবর্ষণে সেপাইসান্ত্রিদের যা অবস্থা হল, তা আর কহতব্য নয়। চোখ তো গেলই অনেকের, চামড়া অক্ষত রইল না কারুরই। বিকল হল সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক কলকবজা। অস্ত্রশস্ত্র ফেলে চোঁ-চাঁ দৌড় দিলে যে-যেদিকে পারে!

দু'হাট অবস্থায় খোলা রইল ফোর্টনক্সের দুর্ভেদ্য ফেরোকংক্রিট স্বর্ণভাণ্ডারের বিশাল পাল্লা!

আচম্বিতে থেমে গেল মারাত্মক বৃষ্টি। যেন সুইচ টিপে নিভিয়ে দেওয়া হল ঝরনাকল। এবং, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল কান ঝালাপালা করা কোটি কোটি পোকার গুঞ্জন!

নিমেষের মধ্যে চারদিক থেকে ধেয়ে এল তারা। অরক্ষিত ফোর্টনক্সের স্বর্ণভাণ্ডার বিলকুল শূন্য করে দিয়ে উধাও হল আকাশে!

ভয়াবহ এই কাণ্ডের পরেই প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে ছুটে গিয়েছিলেন আমেরিকান গভর্নমেন্টের বাঘাবাঘা অফিসাররা। খোদ প্রেসিডেন্টের অনুরোধ বহন করে এনেছেন তাঁরা। মহাকাশ শাট্‌ল কলাম্বিয়ায় সন্নিবদ্ধ রেডার আবার খবর দিয়েছে, পোকা-বাহিনী উড়ে গিয়েছে এশিয়ার দিকে।

এশিয়ার দিকে? এশিয়া তো আর মুঠো পরিমাণ মহাদেশ নয়— ঠিক কোনখানে?

ভারতের দিকে!

খেঁকিয়ে উঠেছিলেন প্রফেসর, 'ভারতের দিকে মানে? ভারতের মধ্যে কোথায় কী?...'

জবাবটা অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন প্রফেসর।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত যাওয়ার পর কীটবাহিনীকে আর দেখা যায়নি।

'এখুনি যাব, এখুনি যাব, এখুনি যাব!' বলতে বলতে শিঙিমাছের মতো লাফাতে লাফাতে গবেষণাগার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র!

পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছেই অবশ্য খবর পেয়েছিলেন প্রফেসর। টনক নড়েছে ভারত সরকারেরও।

ভারত থেকে বিগ্রহ চুরি যাচ্ছিল অনেকদিন থেকেই। বিশেষ করে তামিলনাড়ুর অমূল্য বিগ্রহ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে তাই মোবাইল লেংজার যন্ত্রপাতি আর ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার থেকে গামা-রে কলকবজা পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছিল হলোগ্র্যাফি আর এক্স-রে রেডিয়োগ্র্যাফি দিয়ে মন্দির সম্পদ শনাক্তকরণ করার জন্যে।

এমন সময়ে তামিলনাড়ু সরকার ঝাঁপিয়ে উঠল স্টেট ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর আর সি-আই-ডি পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের ওপর। বিগ্রহ চুরি নিয়ে খুব তো মাথাঘামানো হচ্ছে। বলি, রাজ্যময় ছড়ানো তেইশ হাজার ন'শো বিগ্রহ আর তিনশো চুরাশিটা মন্দিরে যে সোনা অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, সেগুলো পাহারা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা রয়েছে কি? এ তো শুধু পুলিশের কাজ নয়— বৈজ্ঞানিকদেরও মাথা ঘামানো দরকার। তাঁরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন?

নিশ্চয় না, নিশ্চয় না, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনোর কি জো আছে? মন্দির তো শুধু তামিলনাড়ুতেই নেই, আছে সারা ভারতে। কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা রয়েছে সেই সব দেবালয়ে। সোনা রয়েছে আয়কর ফাঁকি দেয় যারা, তাদের কাছেও। রয়েছে খোদ গভর্নমেন্টের কাছে।

ফোর্টনক্সের মহাবিপর্যয়ের পর ভারত সরকার তাই কি নাকে তেল দিয়ে কাউকে ঘুমোতে দেন?

পোকারা নাকি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দিকে গিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে বরাবর। অতএব নৌবাহিনী আর বিমানবাহিনী থেকে বেরিয়ে পড়েছে দলে দলে জলজাহাজ আর উড়োজাহাজ— অস্ত্রশস্ত্র তো আছেই— আছে দেশের নামকরা বৈজ্ঞানিকরাও।

ছিলেন না কেবল প্রফেসর নাটবল্টু চক্র!

পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছেই তাই ভারত সরকারের কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন প্রফেসর, 'এসে গেছি! আমি এসে গেছি! বলো তোমরা কী পেলে আকাশপথে আর জলপথে সমরাভিযান চালিয়ে।'

পাওয়া গেছে অষ্টরম্ভা!

এবং অত্যদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা!

গোয়েন্দা বাহিনী খবর দিয়েছিল ঠিকই। দয়ার অবতার প্রফেসর নাটবল্টু চক্র দো-আঁশলা ভিনগ্রহীদের একটা বিজ্ঞানদ্বীপে ঠাঁই দেওয়ার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন মনে আছে? খবরটা ভারত সরকার কাকপক্ষীকেও জানায়নি পাছে বেচারাদের শান্তি বিঘ্নিত হয়।

পোকা বাহিনী নাকি বিশেষ সেই দ্বীপটি থেকে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়— আবার ফিরেও আসে ঝড়ের বেগে, মেঘের আকারে।

সুতরাং বিমান বাহিনীর একটা ফাইটার স্কোয়াড্রন মার-মার করে আকাশপথে তেড়ে গিয়েছিল বিশেষ সেই দ্বীপটার দিকে। দূর থেকে দেখা গিয়েছিল নীল সমুদ্রবেষ্টিত সবুজ গাছপালায় ভরা শান্ত সুন্দর দ্বীপ।

একটা পোকাও দেখা যায়নি।

মহাবিপদের ডম্বরু সংকেতও শোনা যায়নি।

ভয়ংকর একটা বিপর্যয় যে ঘটতে পারে— রোদ্দুর ঝলমলে দ্বীপের মাথার ওপর এলেই, এমনটাও কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

গোঁত খেয়ে ভীমবেগে গাছপালার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে গিয়েছিল ফাইটার বাহিনী— কাছ থেকে দ্বীপের চেহারা দেখবে বলে।

অত্যাশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটেছিল ঠিক তখুনি!

আচমকা প্রচণ্ড সংঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল একটার পর একটা সাংঘাতিক দ্রুতগামী বিমানে!

তার চাইতেও আশ্চর্য ব্যাপার, টুকরো টুকরো জ্বলন্ত অংশগুলো কিন্তু দ্বীপের মধ্যে ভেঙে পড়েনি— যেন একটা অদৃশ্য মসৃণ গোল গম্বুজের গা বেয়ে পিছলে পড়েছিল সমুদ্রের জলে!

সংঘাত ঘটেছে তা হলে সেই অদৃশ্য বাধার সঙ্গে? গোল গম্বুজের মতো যার আকার ঘিরে রেখেছে পুরো দ্বীপটাকে?

বৈজ্ঞানিকরা খাবি খেতে শুরু করেছিলেন চোখের সামনে সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে।

গোটা দ্বীপটা সুরক্ষিত অদৃশ্য ছাউনি দিয়ে— চোখে দেখা যায় না এমন এক ছাউনি!

বিমান বাহিনী গিয়েছিল আগে-ভাগে— পেছন পেছন জল তোলপাড় করে আসছিল যুদ্ধজাহাজগুলো। দূর থেকেই তারা দূর পাল্লার কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করেছিল দ্বীপের ওপর।

গোটা আন্দামান নিকোবর থরথর করে কেঁপে উঠেছিল মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণে।

কিন্তু...

প্রতিটি গোলাই অদৃশ্য বাধায় লেগে ঠিকরে গিয়ে পড়েছিল হয় সমুদ্রের জলে, নয় আশেপাশের দ্বীপের মাটিতে।

অদৃশ্য বাধা অটুট থেকেছে— রকেটবোমা পর্যন্ত ফেলা যায়নি দ্বীপের মাটিতে। অদৃশ্য বাধায় লেগে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে একটার পর একটা ক্ষেপণাস্ত্র— কিন্তু অদৃশ্য বাধা অদৃশ্য অবস্থাতেই প্রতিহত করেছে সমস্ত আক্রমণ!

হেনকালে হন্তদন্ত হয়ে পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছে গেলেন প্রফেসর। বিমূঢ় বৈজ্ঞানিক আর সমর বিশারদরা প্রায় কেঁদে ফেলে আর কী তাঁর সামনে, এ কাদের ঠাঁই দিয়ে গেলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র?

অদৃশ্য গম্বুজ?

কপাল কুঁচকে ভাবলেন প্রফেসর।

গোলাগুলি আটকে দেয়, বিস্ফোরণের তোয়াক্কা রাখে না— কিন্তু পোকা বাহিনী ঠিক বেরিয়ে যায়, আবার ফিরেও আসে।

তখন নিশ্চয় সরে যায় অদৃশ্য গম্বুজ?

কারা সরিয়ে দেয়? পোকাদের ইচ্ছেয় নিশ্চয় নয়, পোকাদের যারা পাঠাচ্ছে— তারাই! বালকদেহী অদ্ভুতকর্মা সেই ভিনগ্রহীরা। মাথায় চুল যাদের শজারুর কাঁটার মতো খাড়া— তারা।

ফুঁসে উঠলেন প্রফেসর। 'বেইমান, হারামজাদার দল! ব্রহ্মাণ্ডে পাত্তা পাচ্ছিলিস না— দয়া করে থাকতে দিলাম, বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছিস?'

'আনাও হেলিকপ্টার! আমি যাব, দেখি আমার পথ আটকায় কিনা।' শিঙিমাছের মতোই লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর।

তার পরের ঘটনাটা বিশ্ববাসী দেখেছিল টেলিভিশনে বসে, খবর শুনেছিল রেডিয়োতে, পড়েছিল দৈনিকের পাতায়।

না। প্রফেসরের সামরিক হেলিকপ্টার ধাক্কা যায়নি অদৃশ্য গম্বুজে। রেগে কাঁই প্রফেসরের আগমনবার্তা যেন অলৌকিকভাবে টের পেয়েছিল ভিনগ্রহীরা।

সটান দ্বীপের মাঝখানে নেমে পড়েছিল হেলিকপ্টার।

বন্দুকধারী কোনও সান্ত্রিকে কিন্তু দ্বীপের মাটিতে পা ছোঁয়াতে দেননি প্রফেসর। হিতে বিপরীত হতে কতক্ষণ? মাথামোটা সৈনিক পুরুষরা বাহাদুরি দেখিয়ে দমাদম গুলি ছুড়লেই কে জানে আবার কী প্রলয়ংকর কাণ্ড শুরু হয়ে যায়।

তাই লাফিয়ে নেমেছিলেন একাই। অমনি বেরিয়ে এসেছিল একদল ভিনগ্রহী— আকারে যারা বালকের মতো, মাথার চুল খাড়া শজারুর কাঁটার মতো। রুপোলি কাঁটা চকচক করছে প্রখর রোদ্দুরে।

ভাবলেশহীন মুখে তারা এগিয়ে এসে প্রফেসরের হাত ধরে বলেছিল, 'আসুন, অনেক কথা আছে।...'

সোনার নখগুলো তখনই চোখে পড়েছিল প্রফেসরের।

প্রতিটি ভিনগ্রহীর আঙুলের নখ চকচকে সোনার!

প্রফেসরের অবাক চাহনি দেখে হেসে ফেলেছিল ভিনগ্রহীরা।

আর এক দফা চমকে উঠেছিলেন প্রফেসর।

ব্যাটাদের দাঁতগুলোও যে আগাগোড়া সোনার!

'তবে রে!' বিষম রাগে বোমার মতো তখন ফেটে পড়েছিলেন প্রফেসর, 'সোনাচোর! বেল্লিক বেইমান কোথাকার!'

'চুরি বলবেন না প্রফেসর। চুরি মানে যার জিনিস নেওয়া, তার ক্ষতি করা। আমরা সোনা নিয়েছি আপনাদের মঙ্গলের জন্যেই।'

'আমাদের মঙ্গলের জন্যে! চোর বজ্জাত কোথাকার। পৃথিবীটাকে সোনাশূন্য করবার মতলবে— '

রুদ্রমূর্তি প্রফেসরকে থামিয়ে দিয়েছিল ভিনগ্রহীরা।

বলেছিল, 'সোনা আপনাদের কী কাজে লাগে বলুন? রসায়নবিদ আর পদার্থবিদদের কাছে সোনার খুব একটা মূল্য ছিল কি?'

'ওরে গাধা! ওরে মর্কট! ছিল বলেই আটলান্টিকের তলা দিয়ে টেলিফোনের কেব্‌ল পাতা সম্ভব হয়েছে। সোনার প্রলেপ দেওয়ার ফলেই কারেন্ট অব্যাহত থাকছে— তার আগে— '

'জানি। সব খবরই আমরা জানি। এই তো ক'বছর আগেও আমেরিকান স্যাটেলাইট 'প্রসপারো' আর 'এরিয়েল-ফোর'-এর বাইরে সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে আয়োনোস্ফোরিক রিসার্চের জন্যে! ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতেও সোনার ব্যবহার চালু হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রগতিতে সোনা লাগছে, এ তো ভাল কথা। কিন্তু সোনার জন্যে মানুষ জাতটার কতখানি অধঃপতন হয়েছে বলুন তো?'

'তাতে তোদের কী?' রাগের চোটে তুই-তোকারি শুরু করেছেন প্রফেসর।

গায়ে মাখেনি ভিনগ্রহীরা। সোনাদাঁত খিঁচিয়ে হেসে বলে, 'স্বার্থ আমাদের একটু আছে ঠিকই, আপনাদের রক্তে যেমন লোহার দরকার। আমাদের রক্তে তেমনি দরকার সোনার। কিন্তু তার চাইতেও বেশি স্বার্থ বলতে পারেন মানুষ জাতটাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা। তাই হাজার হাজার বছর ধরে নজর রেখেছিলাম আপনাদের ওপর। দেখেছি অত্যন্ত দরকারি এই সোনাকে জমিয়ে রেখে কীভাবে রসাতলে নেমে যাচ্ছেন আপনারা— নীচ হয়ে যাচ্ছে মনোবৃত্তি— '

'জ্ঞান দিসনি, জ্ঞান দিসনি— '

'একটু দেব, প্রফেসর। এত সোনা নিয়ে কী করবেন আপনারা? সরকারি সোনার ভাণ্ডার বাদ দিন, আজকের পৃথিবীতে শুধু ঘরে ঘরেই কত সোনা আছে জানেন?'

হিসেবটা জানা ছিল না প্রফেসরের। তাই চুপ করে রইলেন।

'এগারো হাজার টন', জবাব দিল ভিনগ্রহীরা। 'খবরটা আন্তর্জাতিক সোনা কর্পোরেশনের— যাচাই করে নিতে পারেন। আপনার এই ভারতের সোনার প্রাইভেট স্টক কত আছে জানেন?'

এবারেও নীরব থাকা শ্রেয় মনে করলেন প্রফেসর।

'চার হাজার টন। বেশির ভাগই প্রাচীন গয়না।'

প্রফেসর স্তম্ভিত! খাড়া খাড়া চুল হলে কী হবে। ব্যাটারা খবর রাখে তো অনেক।

ভিনগ্রহীরা তখন বলেই চলেছে 'আমেরিকায় সোনার প্রাইভেট স্টক মোটে এক হাজার দুশো তেরো টন— ফ্রান্সে দেড় হাজার টন। পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন আর সুইজারল্যান্ডে সব মিলিয়ে প্রাইভেট স্টক মোটে দেড় হাজার থেকে দু'হাজার টন। তাই প্রথমেই আমেরিকার ফোর্টনক্স খালি করেছি। এক জায়গাতেই অনেক সোনা পাওয়া গেল, আমেরিকার দাপটটাও কমল। বিশ্বশান্তি আর বেশি দূরে রইল না।'

'বিশ্বশান্তি! চরম অশান্তি ডেকে এনে আবার বিশ্বশান্তির বুলি কপচাচ্ছিস!'

'একটু ধৈর্য ধরুন, প্রফেসর। উদ্দেশ্য আমাদের মহৎ। পৃথিবীকে একেবারে সোনা-শূন্য করে যাব না— বরং জানিয়ে যাব আরও সোনা পাবেন কোথায়। আপনাদের প্রয়োজনের অনেক বেশি সোনা এখনও মজুদ রয়েছে এই পৃথিবীতেই। অথচ কোনও খবরই রাখেন না আপনারা।'

'তোরা রাখিস?'

'হ্যাঁ, রাখি। আপনাদের হিসেব মতো প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মোট নব্বই হাজার টন সোনা তোলা হয়েছে পৃথিবী থেকে। আমেকিরান গোল্ড কমিশনের হিসেবে

শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সোনা তোলা হয়ে গেছে। কিন্তু ভুল, ভুল, হিসেবটা একেবারে ভুল।'

'তোদের হিসেবটা কী শুনি?'

'বলছি। বলব বলেই তো আসতে দিলাম আপনাকে। ফোর্টনক্সে আর কতটুকু সোনাই বা পেয়েছি বলুন। বিভিন্ন দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সোনার পরিমাণ আজ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো উনসত্তর টন। কিছুটা নিয়েছি ফোর্টনক্স থেকে— বাকিটাও নেব।'

'নেওয়াচ্ছি। হারামজাদা ডাকাত! তোদেরও মারণাস্ত্র আমার জানা আছে!'

এই প্রথম যেন একটু সচকিত হল ভিনগ্রহীরা কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সহজভাবে বললে, 'আরো সোনার সন্ধান চান?'

'ভোলাচ্ছিস?'

'ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! আপনি কি সোনালোভী যে আপনাকে ভোলাব? তবে আপনি নিজেও জানেন না যা নিয়ে গবেষণা করছেন তাতে সফল হলেই বিপুল স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে যাবেন।'

চমকে উঠলেন প্রফেসর।

'কীসের গবেষণা করছি? কেউ জানে না, তোরা জানিস?'

'জানাটাই যে আমাদের কাজ, প্রফেসর। সাহারার ভূগর্ভে নদী আর গিরিখাতের সন্ধান পেয়েছেন, এই তো?'

প্রফেসর হতবাক!

'প্রমাণ পেয়েছেন বালির নীচে রয়েছে প্রাচীন গিরিখাত আর নদীগর্ভ। কোনও কোনওটা পূর্ব আফ্রিকার নীল নদ উপত্যকার মতো প্রশস্ত। গুপ্ত নদী উপত্যকাগুলো কয়েকশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এ-খবর আপনাদের এনে দিয়েছে মহাকাশ শাটল্ কলাম্বিয়ার ইলেকট্রনিক প্রতিচ্ছবি।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল প্রফেসরের।

'গ্রীষ্মমণ্ডলের এই প্রাচীন স্বর্গের হদিশ কিন্তু আমরা অনেক আগে থেকেই জানি। আমরা জানি ন'হাজার বছর ধরে সেখানে জল জমে রয়েছে আজও। জায়গাটা মিশর-সুদান সীমান্তের ঠিক পাশেই। কারেক্ট?'

প্রফেসর স্থাণু!

'আপনি তো আমেরিকায় গা-ঢাকা দিয়ে বসে ছিলেন জাতীয় বিমানবিজ্ঞান আর মহাকাশ সংস্থার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরিতে— বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কার করছেন বালির গভীরতা মাপবার জন্যে— খোঁড়বার আগে যে-তথ্যটা অতীব প্রয়োজন।'

'তু-তুই...তোরা...'

'আপনি ওখানে যাবেন খবর পেয়েই আমরা এসেছিলাম— আপনার অবর্তমানে কাজ অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছি। যে যন্ত্রটা বানাচ্ছেন তারও নকশা আপনাকে বলে দিতে পারি, যদি একটা কথা দেন।'

'কী কথা?'

আরও খাড়া হয়ে গেল ভিনগ্রহীদের চুল।

'সাহারার তলায় আছে বিরাট সোনার খনি, আজ পর্যন্ত যত সোনা তোলা হয়েছে— প্রায় তার সমান।'

'অ্যাঁ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা তেলের সন্ধানে সাহারা খুঁড়তে যাচ্ছেন— আমরা বলব সোনার সন্ধানে খুঁড়ুন। তা থেকে আমাদের বেশ কিছুটা ভাগ দিন। এইটাই আমাদের শর্ত!'

গাঁ-গাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'আমরা কি আঙুল চুষব?'

'মোটেই না। সমুদ্রের জলেই তো দেদার সোনা রয়েছে। চেষ্টা তো চলেছে জল থেকে সোনা সংগ্রহের। তাতেই আপনাদের বিজ্ঞানের প্রয়োজন মিটে যাবে।'

'আর যদি না দিই?'

'তা হলে ছিনিয়ে নেব।'

'কী ভাবে?'

'যেভাবে বারবার লুঠ করেছি।'

'পোকা লেলিয়ে দিয়ে?'

'নিশ্চয়।'

আচমকা অট্টহাস্য করে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল ভিনগ্রহীরা। থিরথির করে কাঁপতে লাগল কাঁটাচুল।

দ্বীপ কাঁপিয়ে আর একবাব অট্টহাসি হাসলেন প্রফেসর।

বললেন, 'ওরে মূর্খ! ওরে মর্কট! ওরে বেল্লিক! ওরে অপোগণ্ড! এতই কি উজবুক মনে করিস আমাদের?'

'উ-উ-উ— 'এবার তোতলাতে থাকে ভিনগ্রহীরা। প্রফেসরের এ-হেন রূপ তো তারা কখনও দেখেনি।

'আমাদেরই পোকা দিয়ে আমাদের সর্বনাশ করবি?'

'আ-আ-আপনাদের পো-পো-পো— '

'আবিষ্কারটা তো ফ্রান্স আর রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকদের। বায়োমেটালার্জিক্যাল পদ্ধতিতে সোনা নিষ্কাশনের আবিষ্কার। আবিষ্কারটা পর্যন্ত চুরি করেছিস?'

'বা-বা-বা— '

'থাম নিরেট গাধার দল। ডাকাতি করবার আর জায়গা পাসনি? সোনা-খেকো ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান তো তাঁরাই পেয়েছিলেন সবার আগে। বিশেষ করে কতকগুলো ছত্রাক সলিউশনের মধ্যে থেকে সোনা যেন শুষে নেয়। গায়ে সোনার পাতলা প্রলেপ পড়ে যায়। শুকিয়ে, সেঁকে নিলেই সোনা পাওয়া যায়। আবিষ্কারটা এখনও গবেষণার পর্যায়তেই রয়ে গেছে— গবেষণাগার থেকে বেরোয়নি। তোরা খবর পেয়েই একধাপ এগিয়ে গেছিস। মিউটেশন ঘটিয়ে সোনা-খেকো পোকা বানিয়েছিস। ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি করে সোনা লুঠ করতে পাঠাচ্ছিস।'

সামলে নেয় ভিনগ্রহীরা। যদিও শজারুর কাঁটার চুল কাঁপতে কাঁপতে তখন প্রায় নেতিয়ে

পড়ার মতো জোগাড়। বলে চড়া গলায়, ' আপনাদের ক্ষমতা নেই পোকাদের আটকানোর। চেষ্টা করে দেখুন না।'

আবার সেই বাজখাঁই হাসি হাসলেন প্রফেসর— 'সোনার ওপর তো অ্যাসিড আর অ্যালকালি কোনওটারই জারিজুরি চলে না— কেমন?'

'তা তো বটেই।'

'কিন্তু ধর, যদি বিরাট বিরাট স্প্রে-গান থেকে অ্যাকোয়ারিজিয়া ছড়াই— তোদের পোকাদের ওপর?'

'অ্যা— অ্যা— '

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যাকোয়ারিজিয়া। নাইট্রিক অ্যাসিড আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণ। যার মধ্যে গলে যাবে সোনা— কোথায় থাকবে তখন তোদের সোনা-পোকা?'

সংক্ষিপ্ততর এর পরবর্তী সংবাদটি!

বিশাল কয়েকটি বর্তুলাকার স্পেসশিপ নক্ষত্রবেগে আন্দামানের সেই দ্বীপটি ছেড়ে চম্পট দিয়েছে মহাশূন্যে।

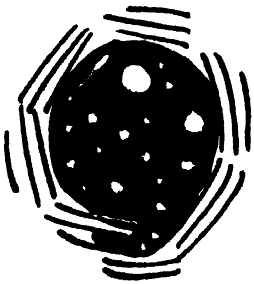

ত্রিভুজ রহস্য

চৌকাঠে পা রাখতেই শুনলাম সোল্লাসে ডাকছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'এসো, দীননাথ এসো, তোমার জন্যেই বসে আছি এতক্ষণ।'

রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। একে অমাবস্যার রাত, তার ওপর লোড শেডিং। অবশ্য এমার্জেন্সি লাইট জ্বলছে টেবিলের ওপর। কিন্তু প্রফেসর ঘরে নেই। ঘর একদম ফাঁকা।

বুড়ো মানুষ। কদিন দেখাও হয়নি। কী এক বিদঘুটে গবেষণা নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। টেলিফোন করে জানতে গেছিলাম, গবেষণাটা কী ধরনের, উনি গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'ভূত নিয়ে, প্রেত নিয়ে। হয়েছে? খবরদার। ফের যদি ডিসটার্ব করবে তো টেলিফোন ছুড়ে মারব।'

তাই থেমে গেলাম। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম শূন্য ঘরটার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম পৈশাচিক, হাড় হিম করা অট্টহাসি। ঘরের মধ্যে থেকে!

ঠকঠক করে হাঁটু কাঁপতে লাগল আমার। গলা দিয়েও নিশ্চয় গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে এসেছিল। কেননা হাসি থামিয়ে বিকট হেঁড়ে গলায় বললেন প্রফেসর, 'তবে যে ছোকরা, খুব বড়াই করতে ভয় ডর তোমার প্রাণে নেই?'

'কো... কো... কোথায় আপনি?'

'এই তো ঘরের ঠিক মাঝখানে।'

ঘরের মাঝখানে তো শুধু একটা চেয়ার! কেউ বসে নেই চেয়ারে।

আচম্বিতে চেয়ারটা উঠে পড়ল শূন্যে। শূন্যপথেই ডবল পাক খেয়ে ঠকাস করে পড়ল মেঝেতে।

পেছন ফিরে চম্পট দিতে যাচ্ছি, খপ করে কে যেন কাঁধ চেপে ধরল পেছন থেকে।

ব্যস, বিকট চিৎকার ছেড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম, ঘরে আলো জ্বলছে। প্রফেসর স্মেলিং সল্টের শিশি ধরে আছেন আমার নাকের সামনে। মুখখানা গম্ভীর।

রক্ত চড়ে গেল মাথায়। তড়াক করে উঠে বসে তারস্বরে বললাম, 'ভয় দেখালেন কেন?'

কাষ্ঠ হাসি হেসে প্রফেসর বললেন, 'একটু রসিকতা করতে গেছলাম।'

'সত্যি অদৃশ্য হয়েছিলেন নাকি?'

'সত্যি।'

'কীভাবে?'

'তার আগে একটা কাহিনি বলতে হয়। শুনবে?'

প্রফেসর যা বললেন, তা শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

জিব্রাল্টার অন্তরীপ আর মেক্সিকো উপসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় শুধুই আটলান্টিক মহাসমুদ্র। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী নিঃসীম শূন্যতা, জল আর জল। বড়ই রহস্যময় এলাকা। বহু বছর ধরেই অনেক গল্পকথা শোনা যায় রহস্য-থমথমে এই তল্লাট ঘিরে।

ক্যাপ্টেন ডেভিড অ্যামোরি রবসন, স্টিমশিপ জেসমন্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন আটলান্টিকের ঠিক এই জায়গা দিয়েই, আজ থেকে একশো বছর আগে।

ডেকে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য কাহিনিগুলোর কথাই ভাবছিলেন ক্যাপ্টেন। মধ্য আটলান্টিকের এই অঞ্চলেই জলতলে কবর রচনা করেছে সুদূর অতীতের এক মহাদেশ, আটলান্টিস।

হ্যাঁ, এইখানেই হাজার হাজার বছর আগে প্রকৃতির রুদ্ররোষে সলিল সমাধি ঘটেছিল আটলান্টিসের। জ্ঞান-বিজ্ঞানে চূড়ান্ত উন্নতি ঘটানোর পর নাকি একদিন একরাতেই তলিয়ে গিয়েছিল বিরাট সেই মহাদেশ। আমেরিকার ত্রিকালজ্ঞ, সাইকিক এডগার কেসি তাঁর তৃতীয় নয়নে প্রত্যক্ষ করেছেন আটলান্টিসের ধ্বংসদৃশ্য। জেনেছেন মূল কারণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত আটলান্টিয়ানরা বিস্ফোরক বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছিল। ভয়ানক এই বিদ্যার অবাধ চর্চার ফলেই নাকি পাতাল আধারে সঞ্চিত বিস্ফোরক-বিদ্যুৎ ফেটে উড়িয়ে দেয় গোটা মহাদেশটাকে। এবং ঠিক এই জায়গায়। এখন যেখানে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী নোনা জল ঝোড়ো হাওয়ায় ফুঁসছে, নাচছে, ঢেউয়ের মাথায় মুকুট পরাচ্ছে।

বিস্ফোরণটা ঘটেছিল নাকি ব্ল্যাক ম্যাজিকের বেপরোয়া চর্চার ফলে।

ব্ল্যাক ম্যাজিক! ডাকিনী বিদ্যা! ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে ক্যাপ্টেনের ঠোঁটের কোণে। এডগার কেসি এই বিষয়টা আরও একটু স্পষ্ট করে বললে বোঝা যেত, ডাকিনী বিদ্যার প্রয়োগ বিস্ফোরক-বিদ্যুতে বিস্ফোরণ ঘটাল কেন?

এই পর্যন্ত শুনেই বাধা দিয়েছিলাম প্রফেসরকে। বলেছিলাম, 'আগে বলুন দিকি এই ক্যাপ্টেন ডেভিড রবসন মহাশয়টি কি আপনার মনগড়া?'

'না।' মৃদু হেসে বলেছিলেন প্রফেসর, 'জাহাজি নথিপত্র ঘাঁটলেই তার নাম পাবে। যা-যা বলেছি, সব লেখা আছে।'

'কোথায় আছে নথিপত্র?'

'লন্ডনের মেসার্স ওয়াটস অ্যান্ড কোম্পানি নামের জাহাজ কোম্পানির দপ্তরে।'

'মুখস্থ রেখেছেন দেখছি!'

ফোকলা মাড়িতে হেসে বলেছিলেন প্রফেসর, 'অনেক জাহাজের ক্যাপ্টেনি করেছেন রবসন, কিন্তু জেসমন্ড জাহাজে তিনি যে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তার তুলনা নেই। বাগড়া দিয়ো না। শুনে যাও।'

সালে ভূমধ্যসাগরের অনেকগুলো বন্দর ছুঁয়ে গেল জেসমন্ড। ফুর্তির অন্তর

নেই মাঝিমাল্লাদের। কারবার ভালই চলছে প্রস্তর নির্মিত এক বিশাল শবাধার। মেঝেতে আর আবহাওয়া। ল পাথরের যন্ত্রপাতি।

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে মেসিনা সিসিলিতে পৌদাধারটা খোলার পর। প্রথমত, এই খোলের মধ্যে। ডেলিভারি দিতে হবে নিউ অর্লিয়েন্সে। অ্য.

দক্ষিণে এসে খটকা লাগল ক্যাপ্টেন রবসনের। ড়কড় শব্দে বিষম ভারী

অতীতের আটলান্টিক নিয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করার সময়ে ধুধু জদেশ্য কবজা আছে ছিলেন ক্যাপ্টেন। হঠাৎ চিন্তার রেশ কেটে গেল। এ-অঞ্চলের সমুদ্রের জল খছিল অনেক পরিষ্কার। কিন্তু হঠাৎ জল এত গাঢ় হয়ে উঠছে কেন?

খরচোখে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। মরা মাছগুলো চোখে পড়ল একটু পরেই।

সদ্য মরা মাছ! রাশি রাশি। গায়ে গায়ে লেগে ভেসে আছে। যতদূর দু'চোখ যায়, কেবল মাছ আর মাছ। সবই মরা।

নিজের দু'চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না রবসন। ডাক দিলেন ফার্স্ট মেটকে।

মরা মাছের ভাসমান পুঞ্জ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

ফিসফিস করে রবসনের কানের কাছে বললেন তিনি, 'ভুতুড়ে কাণ্ড স্যার। আটলান্টিয়ানদের প্রেতাত্মারা নাকি আজও টহল দিয়ে বেড়ায় এখানে।'

'চোপরাও!' রীতিমতো রেগে গেছিলেন ক্যাপ্টেন রবসন। কিন্তু মাইলের পর মাইল মরা মাছের পিণ্ড ঠেলে এগিয়েও শেষ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

সন্ধ্যা হল। জাহাজের সকলেই বেশ ভয় পেয়েছে। আর এগোতে চাইছে না। রাতের অন্ধকারে না-জানি কী বিভীষিকা ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজের ওপর!

কিন্তু অটল রইলেন ক্যাপ্টেন রবসন। এ-রহস্যের শেষ না-দেখে তিনি ছাড়বেন না। তা ছাড়া নিউ অর্লিয়েন্স তাঁকে পৌঁছোতেও হবে নির্দিষ্ট সময়ে। ঘুরপথে গিয়ে দেরি করার কৈফিয়ত ওপরওয়ালা মানবে কেন? হুকুম দিলেন ফার্স্ট মেটকে, 'সারারাত এইভাবেই চলুক জাহাজ। নতুন কিছু ঘটলেই ডাকবেন।'

ভোরের দিকে রবসনের ঘুম ভেঙে গেল দরজার ওপর দুমদাম শব্দে। সেই সঙ্গে ফার্স্ট মেট-এর তারস্বরে চিৎকার, 'ক্যাপ্টেন! শিগগির আসুন।'

ধড়মড় করে উঠে পড়লেন ক্যাপ্টেন। ঘরের ভেতর থেকে বললেন মহা উদ্‌বেগে, 'হয়েছেটা কী?'

'ডাঙা! ডাঙা!'

পাগল হয়ে গেলেন নাকি ফার্স্ট মেট? আটলান্টিকের এ জায়গায় কয়েক হাজার মাইল ধরে শুধু নোনা জল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়ার কথা নয়। ডাঙা দেখছেন কোথায়?

ঝটপট জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন রবসন। দু'চোখ রগড়ে তাকালেন সামনের দিকে। যা দেখলেন, তা তাঁর লোম খাড়া করার পক্ষে যথেষ্ট।

এ কী! এখানে দ্বীপ এল কোত্থেকে? বেশ কয়েকটা উঁচু পাহাড়চূড়াও দেখা যাচ্ছে! প্রতিটা চূড়া থেকে তাল তাল ধোঁয়া উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে!

হুঁশিয়ার হলেন ক্যাপ্টেন। চোরা পাহাড় থাকতে পারে। গতিবেগ কমানোর হুকুম দিলেন তখুনি।

সিসের ওজন ডুবিয়ে দেওয়া হল, জল কতটা গভীর দেখার জন্যে। ঘাবড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। জল মাত্র তিনশো ফুট গভীর।

পর্বতময় প্রেতচ্ছায়ার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। এতদিন যা কিছু শুনেছিলেন, তা কি তা হলে মিথ্যে নয়? নইলে এমন অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে কেন?

দ্বীপ থেকে দশ মাইল দূরে এসে আর এগোতে সাহস পেলেন না রবসন। জল সেখানে মাত্র চল্লিশ ফুট গভীর। সব ক'টা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নোঙর ফেলার হুকুম দিলেন রবসন।

ডাকলেন থার্ড অফিসারকে, 'টম, বোট নামাও।'

থার্ড অফিসার আর জনাকয়েক খালাসিকে নিয়ে ক্যাপ্টেন রবসন রওনা হলেন রহস্যময় দ্বীপের দিকে।

কিছুদূর যেতেই দেখলেন, অনেকখানি চ্যাটালো জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে আগ্নেয় আবর্জনা। লাভা, পাথর, ছাই, পিউমিস স্টোন। বেশ কয়েক মাইল দূরে, উঁচু মালভূমির শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে ধূমায়িত শিখরশ্রেণি। পুরো জায়গাটা খাঁ খাঁ করছে। প্রাণের সাড়া নেই কোথাও।

থ হয়ে রবসন দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর হাঁকডাক দিয়ে খালাসিদের নৌকো থেকে নামিয়ে, রওনা হলেন দ্বীপের ভেতর দিকে।

পা আটকে যেতে লাগল বড় বড় গোল পাথরে। গোড়ালি মচকে গেল ফেটে যাওয়া পাথরের খাঁজে। এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটল।

একজন খালাসি নৌকোর আঁকশিটা দিয়ে পাশের পাথরে খোঁচা মেরে চলেছিল নার্ভাস ভাবে। আচমকা আঁকশির ডগায় উঠে এল একটা পাথর। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল, 'ক্যাপ্টেন! দেখুন।'

চমকে উঠে দৌড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। খুবই সামান্য বস্তু। কিন্তু অতীব তাৎপর্যময়!

একটা তিরের ফলা। ফ্লিন্ট পাথর দিয়ে তৈরি!

এ জিনিস এখানে এল কোত্থেকে?

রবসনের চমক ভাঙল থার্ড অফিসারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে, 'স্যার, চারপাশটা খুঁজে দেখব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এখুনি। গাঁইতি আর কোদাল নিয়ে এসো নৌকো থেকে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল দুটো বিশাল পাথরের দেওয়াল।

নিঃসীম উত্তেজনায় ক্যাপ্টেন আর তাঁর দলবল ঝপাঝপ কোদাল আর গাঁইতি চালিয়ে গেলেন সারাটা দিন। পথ পরিষ্কার করে হাত দশেক নামতেই দেখতে পেলেন একটা প্রকাণ্ড পাথরের দরজা। পাথরের গায়ে সাংকেতিক ছবিগুলোর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন। মিশরীয় চিত্রময় অক্ষরের মতো দেখতে অনেকটা, কিন্তু আরও দুর্বোধ্য।

দরজার ওপারে একটা ছোট্ট প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠটা বিচিত্র। বাইরের সামান্য আলো আসছিল গলিপথ আর দরজার ফাঁক দিয়ে। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল এক অসাধারণ

সংগ্রহশালা। ঘরের ঠিক মধ্যিখানে রয়েছে প্রস্তর নির্মিত এক বিশাল শবাধার। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তর আংটি, বলয়, হাতুড়ি আর পাথরের যন্ত্রপাতি।

সবচেয়ে তাজ্জব হলেন ক্যাপ্টেন পাথরের শবাধারটা খোলার পর। প্রথমত, এই আকারের শবাধার তিনি জীবনে দেখেননি।

আকারে তেকোনা বাক্সের মতো। সবাই মিলে চেষ্টা করতে কড়কড় শব্দে বিষম ভারী ডালা ওপরে উঠে একদিকে হেলে গিয়েছিল আপনা থেকেই। যেন অদৃশ্য কবজা আছে পাথরের মধ্যে। শুধু কবজা নয়, গোপন স্প্রিংও যে আছে ভেতরে, তা জানা গেছিল অনেক পরে।...

'শবাধারের মধ্যে ছিল একটা ম্যমি।'

'ম্যমি।'

'হ্যাঁ, মিশরের যেরকম ম্যমি দেখা যায়। আর ম্যমির দু'পাশে ছিল দুটো বিশাল ফুলদানি।'

'ফুলদানি!'

চোখ বড় বড় করে প্রফেসর বললেন, 'ওই তো, তোমার মাথার কাছেই রয়েছে।'

সচমকে ঘরে বসেছিলাম আমি।

খাটের মাথার দিকে একটা টেবিল। টেবিলের ওপর শুধু দুটো ফুলদানি। লম্বায় প্রায় দেড় ফুট। ওপরে খোদাই করা পশু, পাখি আর বিস্তর সাংকেতিক অক্ষর।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'কী ছিল প্রফেসর তার মধ্যে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না প্রফেসর। চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে আমার দিকে।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তার আগে রবসনের শেষ কাহিনিটা বলে নিই।'

রহস্যময় দ্বীপের পাতাল প্রকোষ্ঠ থেকে সব জিনিসই জাহাজের খোলে এনে তুললেন ক্যাপ্টেন রবসন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে ছিল, আরও দিন কয়েক দ্বীপে অভিযান চালানোর, আরও দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী উদ্ধার করার।

কিন্তু কর্তব্যের উদ্‌বেগ মাথায় নিয়ে অজানা দ্বীপের রহস্যভেদ করা যায় না। তাই ঠিক করলেন, নিউ অর্লিয়েন্সে মালটা খালাস করে ফেরার পথে আশ মিটিয়ে অভিযান চালাবেন। দ্বীপের অবস্থানটা লিখে রাখলেন লগবুকেও।

কিন্তু ফেরার পথে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, কোথায় কী! দ্বীপ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। অসীম জলরাশি থইথই করছে সেখানে।

'সেকী! তবে কি সবটাই রবসনের বানানো গল্প?'

'অনেকে তাই বলে। তবে আরও কয়েকটা জাহাজ নাকি মরা মাছের দঙ্গল দেখেছে। আর মিথ্যেই যদি হবে তো ওই ফুলদানি দুটো আমি পেলাম কী করে? শবাধারটাকেই বা উদ্ধার করলাম কেন?'

চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল আমার, 'শবাধার উদ্ধার করেছেন? ম্যমি সমেত?'

'হ্যাঁ, ম্যমি সমেত।'

'কো... কোথায়?'

একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'ডারহ্যামের একটা গ্রামে। গ্রামটার নাম জ্যারো।'

'সেটা আবার কোথায়।'

করুণার চোখে তাকালেন প্রফেসর, 'ইংল্যান্ডে। জ্যারো হল গিয়ে রবসনের জন্মস্থান। সেখানে খোঁজখবর নিলাম নানান কিউরিও শপে। শুনলাম, একশো বছর আগে খানকয়েক দুষ্প্রাপ্য মিশরীয় সামগ্রী রবসন বেচেছেন তাদের কাছে।'

'মিশরীয় সামগ্রী?'

'রবসন ওই নামেই চালিয়েছেন জিনিসগুলোকে। দেখতে অনেকটা প্রাচীন মিশরীয় জিনিসের মতো কিনা, তাই।'

খাবি খেতে খেতে বললাম, 'আপনি তা হলে মানছেন আটলান্টিস ছিল?'

হেঁয়ালির হাসি হেসে বললেন প্রফেসর, 'আটলান্টিস ছিল কিনা, দু'হাজার বছরেও তা সঠিক জানা যায়নি। তবে তার কিছুটা অন্তত সত্যি বলে মনে হয়েছে, ডারহ্যাম থেকে জিনিসগুলো নিয়ে এসে গবেষণা করার পর।'

'তার মানে?'

উত্তরে প্রফেসর যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে রোমহর্ষক।

ডারহ্যামের কিউরিও দোকানদার প্রফেসরের কৌতূহলে জল ঢেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'পাগল হয়েছেন? ওই ভুতুড়ে কফিন নিজের দেশে নিয়ে যাবেন?'

প্রফেসর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ভুতুড়ে কফিন বলছ কেন?'

'সাংঘাতিক কাণ্ড মশাই। ওই তো, ওই গোরস্থানে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছি।'

'সাংঘাতিক কাণ্ড কী, তা বলবে তো?'

'বললে কি বিশ্বাস হবে?'

'লোকে যা বিশ্বাস করে না, আমি তা করি। লোকে যার মানে খুঁজে পায় না, আমি তার ব্যাখ্যা খুঁজে দিই।'

'তার মানে আপনি বিজ্ঞানী?'

'শত্রুরা তাই বলে।'

'ফুঃ! এ ব্যাপারের কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। স্রেফ ভুতুড়ে ব্যাপার।'

'কীরকম?'

'আরে মশাই, দিন দুপুরে খটখট রোদ্দুরে তালা দেওয়া কফিন থেকে ম্যমি উধাও হয়ে যায়! আবার একসময় দেখা যায় ম্যমি রয়েছে ভেতরে। এমন তাজ্জব ব্যাপার শুনেছেন কখনও?'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!'

'অদ্ভুতই তো। তাই বলছিলাম, মাটির তলায় যা আছে, তা মাটির নীচেই থাক।

সেই রাতেই কিন্তু গোরস্থান থেকে উধাও হয়ে গেছিল তেকোনা শবাধার। অনেক কলকাঠি নেড়ে জিনিসটাকে কলকাতায় এনেছিলেন প্রফেসর।

তারপর থেকেই শুরু হয় তাঁর গবেষণা।

রাতের অন্ধকারে শবাধার এসেছিল প্রফেসরের বাড়িতে।

লোকজন বিদায় নিলে পর প্রফেসর গিয়ে দাঁড়ালেন রহস্যময় কফিনের সামনে। কালো বনাত দিয়ে মোড়া আগাগোড়া। ব্যবস্থাটা তিনিই করেছিলেন। যাতে বাইরের আলো শবাধার স্পর্শ না-করে।

বনাত কেটে কফিনটাকে সরিয়ে রাখলেন একপাশে। পাথরের ডালার খোদাই করা ছবি, অক্ষর নিয়ে মাথা ঘামালেন কিছুক্ষণ। কিন্তু মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

শেষে একটা টুলে বসে রইলেন পাঁচ মিনিট। তারপর ডালাটা খোলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ঠিক করলেন, সকাল হলেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

প্রফেসরের ঘুম ভেঙেছিল একটু বেলায়। ধড়মড় করে উঠে নীচে নেমে এলেন। জানলার শার্শি দিয়ে রোদ এসে পড়েছে শবাধারে। শবাধার খুলে গেছে আপনি আপনিই। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, ভেতরে ম্যমির চিহ্নমাত্র নেই!

দুপুরবেলা পাঁচ রকম চিন্তায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন প্রফেসর। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কে যেন বালিশ ধরে টানাটানি করছে।

উঠে পড়ে দেখলেন, মনের ভুল। কেউ নেই।

বালিশটা কিন্তু বেঁকে রয়েছে।

হঠাৎ নজরে পড়ল, বালিশের তলা থেকে তাঁর ইলেকট্রনিক রিস্টওয়াচ আর ক্যালকুলেটারটা উধাও। ঘরের দরজা কিন্তু ভেতর থেকে বন্ধ!

উঠে পড়লেন প্রফেসর। তখন বিকেল হতে চলেছে। নেমে এলেন একতলায়। ঢুকলেন শবাধার যে-ঘরে আছে, সেই ঘরে। দেখলেন, শবাধারের ডালাটা একটু একটু করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!

তিনলাফে গিয়ে পাশের টুলটা তুলে নিয়ে ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর। এবং স্তম্ভিতের মতো চেয়েছিলেন শবাধারের ভেতরে! দেখলেন, উধাও ম্যমি দিব্যি টানটান হয়ে শুয়ে আছে।

না। ভয় পাননি প্রফেসর। দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল। ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে টেনে বার করেছিলেন ফুলদানি দুটো।

উপুড় করতেই একটার মধ্যে থেকে ঠকাস করে পড়ল খুব সম্ভব প্ল্যাটিনামের তৈরি একটা বালা। আর তাঁর ইলেকট্রনিক রিস্টওয়াচ! আর একটার মধ্যে থেকে বের হল একেবারেই অজানা ধাতুর একটা বালা। আর তাঁর ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর।

প্রফেসর মনে মনে ভেবেছিলেন, এ কীরকম ম্যমি? অশরীরীর মতো ঘোরাফেরা করে দিনের বেলায়, চুরি করে ইলেকট্রনিক জিনিস! ভারী আশ্চর্য তো!

বালা দুটো নিয়ে ল্যাবোরেটরিতে চলে এলেন প্রফেসর। কফিনের ডালা আধখোলা পড়ে রইল। দরজাও খোলা। দু'হাতে দুটো বালা নিয়ে ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো অজানা ধাতু আর তাদের বিবিধ শক্তির রহস্য জানতে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে গেলেন। রাত ফুরিয়ে গেল। রোদের ধারা নামল ল্যাবরেটরির মধ্যে। প্রফেসরের কিন্তু হুঁশ নেই। হঠাৎ একটা গুরুভার পদশব্দে টনক নড়ল তাঁর।

ধুপ... ধুপ... ধুপ শব্দে যেন হাতি চলে বেড়াচ্ছে করিডরে। শব্দটা এগিয়ে আসছে তাঁর ল্যাবোরেটরির দিকেই।

দীর্ঘকায় একটা মূর্তি ক্ষণেকের জন্যে দেখতে পেয়েছিলেন প্রফেসর। পরক্ষণেই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল অত্যুজ্জ্বল আলোকে।

সংবিৎ ফিরে আসতে ভয়াবহ সেই পদশব্দ আর শুনতে পাননি। দীর্ঘকায় বিরাটাকার আকৃতিটাও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ক্রুসিবল থেকে বালা দুটো।

শবাধার যে-ঘরে আছে, সে-ঘরে তখন আর প্রফেসর যাননি। গিয়েছিলেন অন্ধকার গাঢ় হতে। আলো জ্বেলে দেখলেন, অনুমান তাঁর মিথ্যে নয়। বন্ধ রয়েছে শবাধারের ডালা। অর্থাৎ পলাতক ম্যমি আবার ফিরে এসেছে নিজস্ব আলয়ে।

সমস্ত শক্তি দু'হাতে নিয়ে এসে প্রফেসর কফিনের ডালা খুললেন। ফুলদানি দুটো টেনে আনলেন বাইরে। দেখে নিলেন ভেতরে রয়েছে বালা আর চোরাই মাল!

তারও ঘণ্টাখানেক পরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ফোন করে ডেকে আনলেন আমাকে এবং দেখালেন অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার লোমহর্ষক ম্যাজিক।

বুক ধড়াস ধড়াস করছিল আমার। চিঁ চিঁ করে বললাম, 'প্রফেসর, এ নিশ্চয় আটলান্টিয়ানদের ব্ল্যাক ম্যাজিক। কাজ কী অতীতকে ঘাঁটিয়ে?'

'ননসেন্স! ব্ল্যাক ম্যাজিক আবার কী? এমন একটা আবিষ্কার তারা করেছিল যা গুপ্ত শক্তির মতোই। আটলান্টিস তলিয়ে না-গেলে, কালে কালে তার প্রকাশ ঘটত। কিন্তু কী সেই শক্তি? দীননাথ, আমি তা ধরতে পেরেছি।'

'পেরেছেন?' লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'ডানহ্যামের ওই বিটকেল দোকানদারটা যখনই বলেছিল, দিন দুপুরে ম্যমি উধাও হয়ে যায় বন্ধ কফিন থেকে, তখনই আঁচ করা উচিত ছিল আমার।'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। বুড়ো সত্যিই পাগল হয়ে গেল নাকি?

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর। আচমকা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ট্র্যাঙ্গেল! চির রহস্যময় ত্রিভুজ। আটলান্টিয়ানদের তথাকথিত ব্ল্যাক ম্যাজিকের কিছুটা রয়েছে এই ট্র্যাঙ্গেল-মিস্ট্রির মধ্যে।'

'ট্র্যাঙ্গেল! প্রফেসরের অকস্মাৎ বাক্যধারায় থতমত খেয়ে যাই আমি।'

জ্যামিতির ত্রিভুজ বলতে তিনটে ভুজ আর তিনটে কোণ। অবশ্য কিছু মানুষ মনে করেন, ত্রিভুজ একটা নিছক আকার নয়। এর মধ্যে বিধৃত রয়েছে অজ্ঞাত প্রচণ্ড শক্তি।

'আটলান্টিয়ানরা সমাধান করেছিল এই ত্রিভুজ রহস্য। তাই তারা শবাধার তৈরি করেছিল ত্রিভুজের আকারে।'

এরপর হঠাৎ প্রফেসর উঠে পড়ে বললেন, 'দেখবে এসো।'

একতলায় তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর। পেছন পেছন আমি। প্রস্তর শবাধার রয়েছে এইখানেই।

প্রফেসরের দু'হাতে দুটো ফুলদানি। আমাকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? আলোটা জ্বালো।'

আলো জ্বেলে দেখলাম, কালো বনাত দিয়ে পরিপাটি করে প্রস্তর শবাধারকে মুড়ে রেখেছেন প্রফেসর।

'কালো বনাত কেন প্রফেসর?'

'ম্যমি যাতে আবার না-পালায়।'

'তার মানে?'

'কালো বনাতের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো শবাধারে পড়বে না। তাতে গোপন স্প্রিংও কাজ করবে না। ফলে ডালাও খুলবে না।'

ডালার তিন কোণে কতকগুলো ত্রিভুজ দেখিয়ে প্রফেসর বললেন, 'কাছে এসো দীননাথ, দেখেছ? ত্রিভুজের জায়গাগুলোয় পাথরে ফুটো। সূর্যের আলো ঢোকার ব্যবস্থা। ত্রিভুজের আকারে আলো গিয়ে পড়বে ভেতরে শোয়ানো ম্যমির তিন জায়গায়। তারপর ম্যমি চাপ দেবে স্প্রিং-এ। খুলে যাবে ডালা। তখন বাইরে বেরিয়ে আসবে সে।'

ধাঁ করে বলে উঠলাম, 'কিন্তু বন্ধ ঘরের বাইরে যাবে কী করে?'

আস্তে আস্তে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

বললেন, 'রহস্যটা বুঝতে পেরেছি বলেই তোমাকে ভয় দেখাতে পেরেছিলাম। আটলান্টিয়ানরা এমন দুটো ধাতু আবিষ্কার করেছিল, যা ধারণ করলে অণু পরমাণুর মধ্যে এমন পরিবর্তন আসে যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়। এমনকী নিরেট দেওয়ালের মধ্যে দিয়েও সশরীরে বেরিয়ে যাওয়া যায়!'

প্রফেসর একটা ফুলদানির মধ্যে হাত গলিয়ে দিলেন। টেনে আনলেন একটা বালা। প্লাটিনামের মতোই ঝকঝকে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে গলিয়ে দিলেন ডান হাতের কবজিতে।

অমনি আর দেখতে পেলাম না প্রফেসরকে!

ভীষণ আঁতকে উঠে তাবস্বরে চিৎকার করে উঠেছিলাম, 'প্রফেসর! প্রফেসর। ফিরে আসুন।'

দৃশ্যমান হলেন প্রফেসর। মুখে মিটিমিটি হাসি। হাতের চেটোয় সেই বালা।

এরপর অন্য ফুলদানিটায় হাত গলিয়ে টেনে আনলেন আর একটা অদ্ভুত ধাতু দিয়ে তৈরি বালা। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বালা গলিয়ে দিলেন বাঁ হাতের কবজিতে। তারপর হনহন করে এগিয়ে গেলেন দেওয়ালের দিকে। সামনে দেওয়াল দেখে থামলেন না। শরীরটাকে ঢুকিয়ে দিলেন দেওয়ালের মধ্যে। ঘরে আর প্রফেসর নেই।

একটু পরে সশরীরে ফিরে এসে প্রফেসর বললেন, 'বুঝলে তো ম্যমি কী করে অদৃশ্য হয়ে যায়? বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়?'

'কিন্তু বারো হাজার বছর আগেকার একটা ম্যমি!'

'বৎস দীননাথ, আসল ব্যাপারটা এবার শোনো। ওটা মোটেই ম্যমি নয়। রোবট।'

'রোবট!!'

'হ্যাঁ, কলের মানুষ। সূর্যের আলো ত্রিভুজাকারে রোবটের দেহের অংশ বিশেষে পড়লেই কলকবজা চালু হয়ে যায়। তুমি আসার আগেই ছুঁচ ঢুকিয়ে দেখে নিয়েছি। ন্যাকড়ার পটিটা

চোখে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়।'

হাঁ হয়ে বসে রইলাম আমি।

পরদিন সকালে টেলিফোন পেয়ে ছুটে গেলাম প্রফেসরের বাড়ি। মুখ চুন করে তিনি বসে আছেন একতলার সেই শবাধারের ঘরে।

জানলা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে শবাধারে। ডালা খোলা। ভেতরে কোনও ম্যমি নেই। ফুলদানি দুটোও নেই।

'পালিয়েছে।' ছোট্ট করে বললেন প্রফেসর।

'কীভাবে?' বোকার মতো প্রশ্ন করি আমি।

'কালো বনাত দিয়ে মুড়তে ভুলে গেছিলাম।' একরাশ হতাশাভরা গলায় প্রফেসর বললেন, 'সকালের রোদ পেয়েই জ্যান্ত হয়ে লম্বা দিয়েছে। আর কি ফিরবে?'

না, ম্যমি রোবট আর ফেরেনি। বোধহয় প্রফেসরের মতলব আঁচ করেই পালিয়েছে— কে জানে সেই সমুদ্রের তলায় কিনা।

তবে আমার দুশ্চিন্তা তোমাদের নিয়ে। হঠাৎ যদি দেওয়াল ফুঁড়ে ঢুকে পড়ে তোমাদের পড়ার ঘরে?...

তার পরেও সুস্থ থাকলে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে খবর দিয়ো। উনি সেই আশাতেই হাপিত্যেশ হয়ে বসে রয়েছেন।

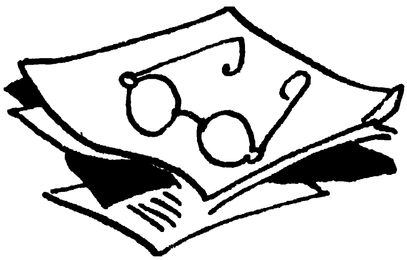

প্রাচীন আতঙ্ক

আকাশে উড়ছিল সাতটা পায়রা। আচমকা একই সঙ্গে প্রাণ উড়ে গেল সাত কবুতরের। আছড়ে পড়ল রাস্তায়। এ-ঘটনা ঘটল সুইডেনের এক শহরে। তারপর শুরু হল বৈজ্ঞানিক মৃত্যু। পরের পর। গোটা পৃথিবী জুড়ে। অদ্ভুত অপমৃত্যু। হঠাৎ যেন কালান্তক মহামারী। আক্রমণ করে যাচ্ছে বিশেষ বৈজ্ঞানিকদের। যাঁরা চোখ নিয়ে করেন গবেষণা। অথবা, করছিলেন! ঘাতক কে? অথবা, কী? শুরু হোক সেই রোমাঞ্চকর অতিশয় অবিশ্বাস্য ভয়ানকদের কাহিনি।

সাত কবুতর যেন একই সঙ্গে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল শূন্যপথে। দিব্বি উড়ছিল। অকস্মাৎ তাদের প্রাণহীন কলেবর আছড়ে পড়ল রাস্তায়, একই সঙ্গে— এক পথচারীর পায়ের কাছে।

সেই ভদ্রলোক যখন স্তম্ভিত, ঠিক তখনই অষ্টম কবুতর উন্মাদের মতো ধেয়ে এল ফুটপাত-লাগোয়া রেস্তোরাঁর কাচের জানলা লক্ষ্য করে। কাচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে আছড়ে পড়ল টেবিলে। নিষ্প্রাণ।

যেন বিষম আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সে কোথাও লুকোতে চেয়েছে। আকাশের কোনও এক অদৃশ্য আতঙ্ক তার কাণ্ডজ্ঞান লোপ করে দিয়েছে।

কী সেই ব্যোম বিভীষিকা?

প্রফেসর পিডার জর্সেন জবাবটা আপন মনেই দিলেন স্টকহোমে, 'তিনতলার অফিস ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে, দোহনে বাধা দিলেই মরবে গোরু— তক্ষুনি!'

মস্ত বৈজ্ঞানিক তিনি। কথা বলেন হেঁয়ালির ঢঙে। বললেন আপন মনেই। শূন্যপানে তাকিয়ে। সাত কবুতরের অকস্মাৎ মহাপ্রয়াণ আর অষ্টম কবুতরের সহসা আতঙ্ক তাঁর কানে এসেছে। কাগজওয়ালারা এই ছোট্ট খবরটাকেই পেঁচিয়ে ফুলিয়ে বৃহৎ করে তুলেছে।

বিলক্ষণ বিচলিত হয়েছেন প্রফেসর। আপনমনে আঙুল চালাচ্ছেন মাথা-ভরতি সাদা চুলে। দুই চোখের চাহনি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ। চক্ষুগোলক কোটর ছেড়ে ঈষৎ বেরিয়ে এসেছে। অলৌকিক দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই দুটি অদ্ভুত প্রত্যঙ্গ থেকে।

পায়রাদের অপমৃত্যুর পশ্চাতে তিনি ভয়ংকরের পদধ্বনি টের পেয়েছেন। দ্যুতিময় চোখ মেলে চেয়ে রইলেন শূন্যপানে।

দ্বিতীয় মন্তব্যটা স্বগতোক্তি আকারে প্রকাশ পেল দ্বিধা বিভক্ত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, 'মধুচোরকে চিনবে প্রথম যে মৌমাছি, চড় খাবে সে তক্ষুনি!'

বলেই, থ হয়ে গেলেন। আনমনে ওপর পানে তাকিয়েই স্তম্ভিত হলেন।

বিস্ফারিত হল অদ্ভুত দুই চক্ষুতারকা। নির্নিমেষ চাহনির মধ্যে ফেটে পড়ছে বিপুল ত্রাস।

ঝট করে পেছিয়ে এলেন জানলার সামনে থেকে। দু'হাত শূন্যে তুলে রুখে দিতে চাইলেন চোখের সামনের পাতলা বায়ু। কী যেন আগ্রাস করতে চাইছে তাঁকে। তাকে তিনিই দেখছেন। নিঃসীম ভয়ে অর্ধেক প্রাণ উড়িয়ে ফেলেছেন।

অথচ অদ্ভুত বিবর্ধিত দুই চোখে বিভীষিকা দর্শনের পাশাপাশি ভাসছে আত্যন্তিক মনোবল। শীতল কঠোর দৃষ্টি ঘুরে গেল জানলার সামনে থেকে ঘরের কড়িকাঠের দিকে।

যা দেখা যায় না, তাকে অনুসরণ করছে যেন তাঁর বিপুল শক্তিময় বিরঙ চাহনি, সেই বিভীষিকা শুধু তাঁরই নজরবন্দি হয়ে রয়েছে।

অকস্মাৎ প্রবল ইচ্ছায় ঘুরে দাঁড়ালেন দরজার দিকে। দৌড়োলেন স্রেফ মনের জোরে। এখন তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস সঘন হয়েছে। কিন্তু মনের নিগড় শিথিল হয়নি।

কিন্তু যেতে পারলেন না দরজা পর্যন্ত। নিরুদ্ধ নিশ্বাসের চাপা শব্দ ঠিকরে এল ব্যাদিত মুখগহ্বর দিয়ে। হোঁচট খেলেন। আছড়ে পড়লেন। সামনে প্রসারিত দুই হাত দিয়ে টেবিলের ক্যালেন্ডার খামচে ধরে কার্পেটে নামিয়ে আনলেন। ফুঁপিয়ে উঠলেন এই প্রথম। সবলে খামচে ধরলেন বুকের বাঁদিক— যেখানে রয়েছে হৃদযন্ত্র।

যে স্ফুলিঙ্গ এতক্ষণ সচল রেখেছিল সেই যন্ত্র, অকস্মাৎ তার পলায়ন ঘটেছে।

উড়তে লাগল ক্যালেন্ডারের সামনের পৃষ্ঠা। অব্যাখ্যাত এক বায়ুস্রোত উড়িয়ে দিয়ে গেল সেই পৃষ্ঠা।

মে মাসের পৃষ্ঠা।

পাঁচ ঘণ্টা পরে পুলিশ এসে দেখল তাঁর মৃতদেহ।

ডাক্তার বললেন, মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে। কিন্তু তদন্তকারী পুলিশ ওঁর টেবিলে পেল একটা চিরকুট। মড়া হয়ে যাওয়ার একটু আগেই লিখেছিলেন। তারপর নিশ্চয় জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

লিখেছেন, 'অল্পবিদ্যা ভয়ংকর। বিপজ্জনক। মিনিটে মিনিটে যা ভাবছি, তা কন্ট্রোল করতে পারছি না। স্বপ্নে যা দেখতে চাই না, তা রুখতে পারছি না। নির্ঘাত মৃত্যুকে আটকাতে পারব না। সে ক্ষেত্রে—'

এই পর্যন্ত লিখেই কলম থামিয়েছিলেন প্রফেসর। কী করণীয় তা আর লেখেননি। সে সময়ও তাঁকে দেওয়া হয়নি।

চিরকুট পুড়িয়ে ফেললেন পুলিশ অফিসার। ডাক্তারের রায় রিপোর্টে লিখে রাখলেন, হার্টের রোগে মৃত্যু।

এরপর লন্ডন। মে মাসের তিরিশ তারিখে। ডক্টর গুথরি শেরিডান কলের মানুষের মতো ঝাঁকুনি মেরে মেরে নেচে নেচে গেলেন এক জনবহুল রাস্তা দিয়ে। তাঁর দুই চোখে অদ্ভুত চেকনাই— অথচ তুহিন শীতল। তাঁর চাহনি নিবদ্ধ আকাশের দিকে। কিন্তু হাঁটছেন রোবটের মতো। অন্ধ যেন পথ চলছে আশ্চর্য নিপুণতায়। দেখলে গা ছমছম করে।

করেছিল জিম লিকক-এর। দৌড়ে এসেছিলেন পেছন থেকে, 'গুথরি!'

ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন গুথরি শেরিডান। চোখ দেখে শিউরে উঠেছিলেন জিম লিকক, বরফের কণা যেন থুকথুক করছে দুই চোখে।

প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় হড়বড় করে বলে গেছিলেন বৈজ্ঞানিক শেরিডান, 'যাক, পেয়েছি একজনকে। বলে যাই— শুনে যাও। বিশ্বাস করা যায় না, তবুও শুনে রাখো। মানুষের ইতিহাসে হাজারো ঘটনা রহস্য হয়ে রয়েছে। সব চাইতে রহস্যময় একেবারে অবিশ্বাস্য সেই সত্যকে আমি জেনে ফেলেছি। আর ধামাচাপা দিয়ে রাখা যাবে না।'

'সেটা কী?' বৈজ্ঞানিকের বিকৃত মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করতে করতে শুধিয়েছিলেন বিষম বিস্মিত জিম।

'এই পৃথিবীর অধীশ্বর আমরা নই... কোনওকালে ছিলাম না... আমাদের ভাগ্যবিধাতা ওই ওরা... এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর ভাগ্য লিখে চলেছে ওই ওরা—'

এই পর্যন্ত বলার সময় পেয়েছিলেন ডক্টর। পরক্ষণেই দুমড়ে গেছিল হাঁটু। আছড়ে পড়েছিলেন ফুটপাতে।

হৃদরোগে মৃত্যু— ধরে নেওয়া হয়েছিল!

একই দিনে একই সময়ে তাজ্জব মৃত্যু পরপারে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যাঁকে তিনি একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক। তাঁর নাম ডক্টর হ্যান্স লুথার। বিশাল বপু নিয়ে তিনি বিপুলবেগে নেমে এলেন ল্যাবরেটরির সামনের সিঁড়ি বেয়ে নীচের হলঘরে। টেনে দৌড়োলেন টেলিফোনের দিকে,— বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ঘনঘন পেছনে তাকাতে তাকাতে। তাঁর দুই চক্ষু পালিশ করা পাথরের মতো চকচকে।

রিসিভার তুলেই বোতাম টিপে গেলেন কাঁপা আঙুলে। লাইন চলে গেল একটা জার্মান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের টেবিলে। কানে রিসিভার চেপে ধরলেন ডক্টর হ্যান্স লুথার। থরথর করে কাঁপছে হাত।

ভোগেল! ভোগেল! 'গলা চিরে চেঁচাচ্ছেন বৈজ্ঞানিক' 'সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে খবর কেউ পায়নি সেই খবর দিচ্ছি তোমাকে। ছেপে দাও বড় বড় অক্ষরে— কিন্তু একদম দেরি নয়।'

ভোগেল বললেন সহিষ্ণুস্বরে, 'খবরটা কী?'

সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে ঘামতে ঘামতে বললেন বৈজ্ঞানিক, 'পৃথিবী ঘিরে থমথম করছে জীবন্ত মৃত্যু। তাদের হুঁশিয়ারি একটাই— খবরদার; ল্যাজে পা দিয়ো না।'

ভিশন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে অট্টহাস্য করলেন ভোগেল। খ্যাপা বৈজ্ঞানিকদের অনেক গপ্পো শুনেছেন। এখন চোখে দেখছেন।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে লুথার কিন্তু কলজে-ফাটা চিৎকার ছেড়েই যাচ্ছেন,— 'আমি বাজে কথা বলি না। ইয়ারকি মারছি না। হাজার বছর ধরে.... এই মুহূর্তে... পৃথিবীকে... আ... আ... আ!'

ঝুলে পড়ল রিসিভার। ঝুলছে কর্ডের প্রান্তে। ভিশন-স্ক্রিনে ভাসছে ভোগেল-এর ব্যাকুল মুখচ্ছবি, 'লুথার! লুথার!'

জবাব দিলেন না ডক্টর হ্যান্স লুথার। আস্তে আস্তে হাঁটু ভেঙে অদ্ভুত চোখে কড়িকাঠের পানে তাকিয়ে বসে পড়লেন। বেরিয়ে এল জিভ। পড়ে গেলেন।

মৃত্যু এল পলকে, নিঃশব্দে। টুঁ শব্দটিও বেরোল না গলা দিয়ে। বেরোতে দেওয়া হল না।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এতগুলো শোচনীয় মৃত্যুর কোনওটারই খবর রাখেননি। কিন্তু চিনতেন মেয়ো-কে। হাজির ছিলেন মেয়ো-র বিচিত্র মৃত্যুর সময়ে।

নিউইয়র্কের ওয়েস্ট ফোরটিনথ্ রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন প্রফেসর। হঠাৎ দেখলেন, মার্টিন বিল্ডিং-এর বারোতলা পেরিয়ে এল একটা মনুষ্যদেহ— শূন্যপথে অবতীর্ণ হচ্ছে ভূতলে।

আছড়ে পড়ল রাস্তায়। ঠিক সামনে। যেন একটা ন্যাকড়ার পুতুল। দু'হাত আর দু'পা ছড়ানো। ফুটপাতে পড়েই লাফিয়ে উঠল ন'ফুট ওপরে। কংক্রিট ফুটপাতের খানিকটায় যেন আলতা বুলিয়ে গেল মস্ত একটা স্পঞ্জ। আওয়াজটা বিদঘুটে— বর্ণনা করা যায় না।

এগিয়ে গেলেন প্রফেসর। পকেট থেকে তুলে নিলেন রক্তমাখা পার্স, টেনে বের করলেন ভিজিটিং কার্ড। নামটা জ্বলজ্বল করে উঠল ওঁর অবাক চোখের সামনে— প্রফেসর ওয়াল্টার মেয়ো!

ঘুরে দাঁড়ালেন তৎক্ষণাৎ। প্রায় ছুটে গেলেন মার্টিন বিল্ডিং-এর দিকে। রিভলভিং দরজার ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে দাঁড়ালেন নিউম্যাটিক লিফট-এর সামনে— যে লিফট চলে বাতাসের চাপে।

চাকতি-লিফট সোজা যখন উঠছে শুধু ওঁকে নিয়ে টিউবের মধ্যে দিয়ে, উনি তখন ভাবছেন একটাই কথা— মেয়ো! মেয়ো! এভাবে স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নেওয়ার লোক তো নন মেয়ো!

মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে ষোলো তলায় দাঁড়িয়ে গেল লিফট। অলিন্দ বেয়ে মেয়ো-র ল্যাবরেটরির দিকে দৌড়োলেন প্রফেসর।

দরজা খোলা। কেউ নেই ল্যাবরেটরিতে। জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে— লন্ডভন্ড হয়নি কিচ্ছু। হাতাহাতির কোনও চিহ্ন নেই।

তিরিশ ফুট লম্বা টেবিলে বিস্তর অ্যাপারেটাস। ডিসটিলেশনের সরঞ্জাম। হাত দিলেন বকযন্ত্রে। ঠান্ডা।

এক্সপেরিমেন্ট শুরু করতে গিয়েও করেননি মেয়ো, মহাপ্রস্থান করেছেন।

পরের পর সাজানো ফ্লাস্ক। মোট ষোলোটা। ষোড়শতম কোনও বস্তুর নির্যাস বের করতে যাচ্ছিলেন মেয়ো।

খুললেন ইলেকট্রিক রোস্টার। ভেতরে রয়েছে কিছু শুকনো পাতা। তুলে নিয়ে শুঁকলেন গন্ধ। ওষধি উদ্ভিদের পাতা বলেই মনে হল।

খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকে উড়িয়ে দিচ্ছে লাগোয়া টেবিলের কাগজপত্র। জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর। নীচের ফুটপাতে থেঁতলানো পিন্ডি পাকানো ডেডবডির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নীল উর্দি পরা চারজন পুলিশম্যান। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে ডেথ ওয়াগন।

জানলা খোলা রেখে এসে দাঁড়ালেন মেয়ো-র টেবিলের সামনে। ছড়ানো কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে নিলেন। অকারণ কৌতূহল মেটানোর মতো কিছুই চোখে পড়ল না।

বেরিয়ে এলেন ল্যাবরেটরির বাইরে। চাকতি-লিফট যখন হুহু করে নামছে, স্বচ্ছ টিউবের মধ্যে দিয়ে দেখলেন, পাশের টিউবে চাকতি চেপে সাঁ করে ওপরে উঠে গেল দু'জন পুলিশম্যান।

ওয়েটিং রুমের সারবন্দি টেলিফোন বুথের একটার সামনে দাঁড়ালেন প্রফেসর। চাকা-পরদায় ভেসে উঠল একটি মেয়ের মুখ।

'হেটি,' বললেন প্রফেসর, 'মিস্টার স্যাঙ্গস্টার প্লিজ।

'ইয়েস, প্রফেসর।'

গলে মিলিয়ে গেল হেটির মুখ। সে জায়গায় ফুটে উঠল এক পুরুষের ভারী মুখ।

সটান কাজের কথায় চলে এলেন প্রফেসর, 'মেয়ো মারা গেলেন। বিশ মিনিট আগে। ঝাঁপ দিয়েছেন মার্টিন বিল্ডিং-এর ষোলোতলা থেকে ফুটপাতে। আমার সামনে।'

লোমশ ভুরু তুলে জানতে চাইলেন অপর পক্ষ, 'সুইসাইড?'

'দেখে সেইরকম মনে হলেও আমার তা মনে হয় না।'

'কেন?'

'কারণ মেয়োর সঙ্গে দশবছর কাজ করেছি।'

'জানি।'

'বৈজ্ঞানিকদের আবেগ থাকে না। মেয়ো-র একেবারেই ছিল না। আত্মহত্যা করার মানুষ উনি নন।'

'কী চান?'

'পুলিশ বলবে, সিম্পল সুইসাইড কেস। আমি চাই চুটিয়ে তদন্ত হোক।'

'তাই হবে। একঘণ্টা আগে আর একজন চলে গেলেন এইভাবে।'

'কে?'

'ডক্টর আরউইন ওয়েব। পুলিশ ওঁর ওয়ালেটে পেয়েছে মেয়োর একটা চিঠি। চিঠি পাওয়ামাত্র চলে আসতে বলেছিলেন। পুলিশ ফোন করেছিল। অদ্ভুত মৃত্যু। পুলিশ ডাক্তার বলছে, হার্টের রোগ। অথচ মরেছেন শূন্যে গুলি ছুড়তে ছুড়তে।'

'শূন্যে?'

'দেওয়াল লক্ষ্য করে দু'বার ফায়ার করেছেন— অটোমেটিক পিস্তল রয়েছে হাতে।'

'ফ্যানট্যাস্টিক!'

'আমার একটা কথা রাখুন।'

'বলুন।'

'ওয়েব আর মেয়ো দু'জনেই আমেরিকার বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁদের মৃত্যু রহস্যজনক। ব্যাপারটা আপনি তলিয়ে দেখুন।'

'একটু শুধরে দিচ্ছি। ওয়েব আর মেয়ো পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক। শুধু আমেরিকার নন। আমি এশিয়ান। কে মানবে আমাকে?'

'মানিয়ে ছাড়ব— কারণ, আপনিও পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক।'

'আমি ব্রেন খাটাতে পারি। কিন্তু হাত আর পা খাটানোর জন্যে দরকার—'

'দীননাথ নাথকে— এই তো? পাবেন। অথরিটি পাইয়ে দিচ্ছি দু'জনকেই। ওয়েবের কাগজপত্র ঘেঁটে দেখুন যদি কিছু পান। ওঁর মৃত্যুর ধরনটা বেশি সন্দেহজনক। দেওয়ালকে গুলি করেই মারা গেলেন কেন?'

দরজা আর জানলার মাঝামাঝি জায়গায় কার্পেটে শয়ান ছিল ওয়েব-এর গতায়ু কলেবর। চিত অবস্থায়। নিষ্প্রাণ দুই চোখের পাতা পুরো খোলা। নীলচে অটোমেটিক এখনও খামচে রয়েছেন আঙুল দিয়ে। রিভলভারের নল ফেরানো দেওয়ালের যে-অংশের দিকে, সেখানে প্লাস্টার চটে গেছে আট জায়গায়— দুই ক্ষেপণাস্ত্র প্রবেশ করেছে এদের মাঝের অঞ্চলে।

দীননাথ সুতো নিয়ে মাপছে। সুতোর এক প্রান্ত টিপে ধরেছে চটে-যাওয়া দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে, বুলেট-বিবর দুটোর ওপর— আর এক প্রান্ত টেনে এনেছে ডেডবডির ওপরের পয়েন্টে। বলছে, 'গুলি চালিয়েছেন এই লাইনে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' সায় দিলেন প্রফেসর।

'কিন্তু বিশেষ কিছুর দিকে ফায়ার করেননি। আচমকা গুলিবর্ষণ যখন শুরু হয়, তখন করিডর দিয়ে যাচ্ছিলেন ছ'জন। ঘরে ঢোকেন তক্ষুনি। ওয়েব সাহেবকে দেখতে পান ঠিক এই অবস্থায়। তখন শেষ নিশ্বাস পড়ছে। কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের করতে পারেননি। ঘরে কাউকে ঢুকতে দেখা যায়নি, বেরোতেও দেখা যায়নি। ছ'জন সাক্ষীকেই জেরা করা হয়েছে। সন্দেহের আওতায় কেউ আসছে না। মেডিক্যাল এগজামিনার তো বলেই দিয়েছেন, মরেছেন হার্টের রোগে।'

প্রফেসর সোজা মন্তব্যের মধ্যে গেলেন না, 'হয়তো তাই বটে, হয়তো তা নয়।'

কথাগুলো বলবার সময়ে হিমশীতল বায়ুস্রোত বয়ে গেল ঘরের মধ্যে দিয়ে। শিরশির করে উঠল মেরুদণ্ড। খাড়া হয়ে গেল ঘাড়ের চুল। রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেগেছে অস্বস্তি। অস্পষ্ট নয়, বেশ তীব্র। এরকম অবস্থা হয় খরগোশের— যখন টের পায় ধারেকাছে রয়েছে বাজপাখি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

দীননাথ বললে, 'হার্টের রোগ যাদের থাকে, ছায়া দেখে তারা আঁতকে ওঠে না। ইনি কিন্তু ছায়া বিভীষিকা সত্যিই দেখছেন মনে করে দুমদাম গুলি চালিয়েছেন। রোগটা দৃষ্টিবিভ্রমের— মরীচিকা দেখার ব্যাধি। এমন ভয় পেয়েছেন যে তৎক্ষণাৎ হার্ট বন্ধ হয়েছে।'

'ড্রাগের নেশা থাকলে এরকম হয় জানি। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে— এই তো?'

'হ্যাঁ। ময়নাতদন্ত হলেই শরীরে ড্রাগ পাওয়া যাবে।'

'পেলে আমাকে জানিও।'

বলেই টেনে খুললেন ডক্টরের টেবিলের ড্রয়ার। দেখলেন, চিঠিপত্তরের ফাইল থরে থরে সাজানো। কিন্তু মন ভরছে না প্রফেসরের। মামুলি চিঠি। ফাইল ঢুকিয়ে রাখলেন ড্রয়ারে। ঘুরে দাঁড়ালেন দেওয়ালে গাঁথা মস্ত সিন্দুকের দিকে।

চাবি এগিয়ে দিল দীননাথ, 'ওঁর পকেটে পেয়েছি।'

জবাব না-দিয়ে ফোকরে চাবি ঢুকিয়ে ভারী পাল্লা খুললেন প্রফেসর। ভেতরে চোখ চালিয়েই চমকে উঠলেন। মুখের সামনে ঝুলছে এক তা বড় কাগজ। তাতে টেনেমেনে খুব তাড়াতাড়ি করে লেখা হয়েছে দুটি কথা :

'স্বাধীন থাকতে গেলে প্রতিমুহূর্তে পাহারা দিয়ে যেতে হবে। আমি চলে গেলে জর্সেন-এর সঙ্গে দেখা করুন।'

'মানে?' প্রফেসরের চোখ ছোট। উনি ভাবছেন।

দীননাথ কিন্তু এর মধ্যেই আরও কিছু দেখে ফেলেছে। এই কাগজের ওপরে রাখা কাগজে ডট পেন দিয়ে চেপে চেপে কিছু লেখা হয়েছিল— ছাপ পড়েছে এই কাগজে।

বললে প্রফেসরকে, প্যারালাল লাইট বিম দিয়ে আবছা লেখাগুলোকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। কী লেখা হয়েছিল ওপরের কাগজে, জানা যাবে।'

'তাই করো। কিন্তু সে কাগজখানা গেল কোথায়?'

জবাব দিল না দীননাথ। সিন্দুকের ভেতর থেকে ঝুলন্ত কাগজটা খুলে নিয়ে গেল দরজার সামনে। এক্সপার্টরা দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে।

ফিরে এসে দেখল, প্রফেসর হন্যে হয়ে খুঁজছেন সেই কাগজখানা, যার ওপর ডট পেনে কিছু লিখেছিলেন ডক্টর ওয়েব।

নেই। সেরকম কাগজ ঘরের কোত্থাও নেই। তবে টেবিলের পাশে মেট্যাল ওয়েস্ট পেপার বাক্সে একটা কাগজ পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

'যা লিখেছেন ওয়েব, তা নিশ্চিহ্ন করেছেন তৎক্ষণাৎ। কেন?"

'গোপন করবার জন্যে নিশ্চয়— দুনিযা যেন জানতে না পারে!'

কপাল কুঁচকে গেছে প্রফেসরের।

টেলিফোনটা এল ঠিক সেইসময়ে। ধরল দীননাথ। ফোন করছে স্টেশন। মিনি টেলিভিশনে ভাসছে এক পুলিশম্যানের মুখ। অ্যামপ্লিফায়ারের স্যুইচ টিপে দিল দীননাথ যাতে প্রফেসরও শুনতে পান।

বলে যাচ্ছেন অফিসার, 'যে-কাগজটা পাঠিয়েছেন, তার ওপরের ছাপগুলো উদ্ধার করা গেছে। খাপছাড়া ভাবে।'

'বলে যান।' দীননাথ চেয়ে রয়েছে ফোন-ছবির দিকে।

টাইপ করা কাগজ থেকে পড়ে গেলেন অফিসার, 'জাহাজের নাবিকরা বেশি আক্রান্ত হয়। ডাঙায় নেমে মানুষজনের সঙ্গে এদের ব্যবহার লক্ষ করা দরকার। ডাঙায় যারা বারোমাস থাকে, তাদের আচরণের সঙ্গে এদের আচরণের ফারাক লক্ষ করা দরকার। চোখেও ফারাক ঘটেছে কিনা দেখতে হবে। একটু তফাত হবেই। চাহনির মধ্যে। ফসেট-কে

বলে অপ্রকৃতিস্থদের বিশদ বিবরণ জানতে হবে— বিশেষ করে যারা ভুগছে সিজোফ্রেনিয়া রোগে। পাগলা গারদের সবাই পাগল নয়।'

পড়া থামিয়ে অফিসার চোখ তুললেন, 'এর পরেও দুটো প্যারাগ্রাফ আছে।'

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'পড়ে যান!'

দীননাথ চেয়ে আছে ওঁর দিকে। অকস্মাৎ বিপুল উত্তেজনায় ফেটে পড়েছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। কেন? রহস্য গভীরতর হচ্ছে।

পড়ে গেলেন পুলিশ অফিসার, 'অনেক খাপছাড়া ঘটনা খাপ খেয়ে যায়। মানে বোঝা যায়। কুকুরের বিকট চিৎকার, ফায়ারবলের নাচানাচি, অলোক দৃষ্টি— এসব যত সহজ মনে করা হয়, তা নয়। ভর হওয়া, আচমকা আবেগে পাগল হয়ে যাওয়া, জবুথবু হয়ে থাকা— এ সবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঘন্টার দড়ি ধরে না-টানলেও ঘন্টা বেজে যায়, দিনের আলোয় জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যায়, ছায়া অঞ্চলে উড়ে যায় অনেক পাখি— আর ফিরে আসে না। অদ্ভুত উচ্চতায় তৈরি হয় পিরামিড, নিরীহদের দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয় পৈশাচিক পন্থায়, উচ্চণ্ড ঝগড়া, মারামারি— এসব অনর্থক নয়। অতীন্দ্রিয় জগতের হাত আছে। জর্সেন ঠিকই বলেছে— তখন আমি বুঝিনি। চোখ থাকলেই দেখা যায়— তাদের ছবি দেখাতে হবে দুনিয়ার সবাইকে, গণহত্যা না-ঘটিয়ে।'

প্রফেসর বললেন টেলিফোনে, 'কাগজটার আরও কয়েকটা কপি করে ফাইলে রাখুন। দুটো কপি পাঠান স্যাঙ্গস্টারকে।'

নিভিয়ে দিলেন টেলি-টিভি। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো যাই পুলিশ দপ্তরে।'

শুনেই, অকারণে লোম খাড়া হয়ে গেল দীননাথের। হাওয়া যেন পালটে যাচ্ছে।

পুলিশ এক্সপার্টরা কিন্তু বেদম হয়ে গেল সূত্র খুঁজতে গিয়ে। পেল না কিছুই। তাড়া তাড়া ফটোগ্রাফ উঠল— ওয়েবের নিজস্ব ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া নেই অন্য আঙুলের ছাপ। বেশ কিছু কাগজপত্রে লেগে অ্যালুমিনিয়াম গুঁড়ো আর আয়োডিন ভেপার।

এককথাই বলে গেল পুলিশ, 'খামোকা খাটছি।'

দীননাথ বললে বিজ্ঞ কণ্ঠে, 'বললাম তো ড্রাগের নেশা ছিল। এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছেন।'

প্রফেসর বললেন, 'আর মেয়ো ষোলোতলা থেকে ঝাঁপ দিলেন কল্পনায় দেখা পুকুরে সাঁতার কাটবেন বলে?'

'ময়নাতদন্ত হোক ডক্টর ওয়েবের।' জেদ ছাড়তে রাজি নয় দীননাথ।

'হোক।' শেষ কথা প্রফেসরের।

বলেই হনহনিয়ে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। পেছনে বিব্রত মুখে দীননাথ। প্রফেসর কিছু একটা আঁচ করেছেন— কিন্তু ভাঙছেন না। না-ভাঙলে আর কী করা যায়।

থমকে যেতে হল কিন্তু রাস্তায় নেমেই। মোড়ের মাথায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটিয়েছে দুটো গাইরো-কার। একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে। কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হচ্ছে।

ছুটে গেছিলেন প্রফেসর। পেছনে দীননাথ। দু'জনেরই লোমকূপে লোমকূপে জাগল এক আশ্চর্য শিহরন। ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যেন একটা অদৃশ্য কম্পন থমথম করছে তল্লাট জুড়ে।

ব্যাঙ্ক অফ ম্যানহাট্টান বিল্ডিং। স্যাঙ্গস্টারের অফিস এখানে। আমেরিকান স্পেশ্যাল ফাইনান্স দপ্তরের প্রধান উনি। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এঁর কাছেই এসেছিলেন গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ করার জন্যে। জড়িয়ে গেছেন দুই বৈজ্ঞানিকের অপঘাত মৃত্যুর কেসে।

বাড়িটা বিশাল। নিউম্যাটিক চাকতি-লিফটে চেপে চোখের পলকে চলে গেলেন চব্বিশ তলায়।

স্যাঙ্গস্টার চেম্বারে বসে ছিলেন। আগাপাশতলা শুনলেন দীননাথের মুখে। তাকালেন প্রফেসরের পানে।

ধূর্ত চোখে চেয়ে থেকে বললেন স্যাঙ্গস্টার, 'তা হলে তো জর্সেন-এর সঙ্গে দেখা করতে হয়।'

'জর্সেন-এর কোনও চিঠি ওয়েব-এর নামে এসেছে কি পোস্ট অফিসে?' প্রফেসরের প্রশ্ন।

নিরুত্তরে রিসিভার তুললেন স্যাঙ্গস্টার। রিসেপসনিস্ট হেটি-কে বললেন লোক্যাল পোস্ট অফিসে খবর নিতে। খবর চলে এল দু'মিনিটের মধ্যে। কোনও চিঠি পড়ে নেই পোস্ট অফিসে।

কপাল কুঁচকে বসে ছিলেন প্রফেসর। উসখুস করছে দীননাথ। বড় চঞ্চল। বড় ডানপিটে। পোস্ট অফিসের খবর শুনেই বললে তড়বড় করে, 'প্রফেসর, পিডার জর্সেন-এর সঙ্গে আপনি কথা বললে ভাল হয়।'

'তা তো বটেই। টেলিফোন করো মিস্টার হ্যারিম্যানকে।'

'কোথায়?'

'স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট।'

টেলি-টিভিতে ভাসছে এখন হ্যারিম্যান-এর মুখ। চালু রয়েছে অ্যামপ্লিফায়ার।

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র! কী ব্যাপার?'

'খারাপ খবর আছে। ওয়াল্টার মেয়ো আর আরউইন ওয়েব আজ সকালে মারা গেছেন একঘণ্টার ব্যবধানে।'

চমকে উঠেছেন হ্যারিম্যান, 'কীভাবে?'

খুঁটিয়ে বলে গেলেন প্রফেসর। তারপর, 'জর্সেন নামে কোনও বৈজ্ঞানিককে চেনা আছে?'

'সতেরো তারিখে দেহ রেখেছেন।'

প্রফেসর স্তব্ধ। তারপর, 'স্বাভাবিক মৃত্যু? না, অস্বাভাবিক?'

'বুড়ো হয়েছেন, মারা গেছেন। জানতে চাইছেন কেন?'

'পরে শুনবেন, কী নিয়ে গবেষণা করছিলেন জর্সেন?'

'চোখ।'

'কোন দেশে?'

'সুইডেনে।'

'নাম শুনিনি।'

'শোনার মতো নয় বলেই শোনেননি। দুর্নাম কুড়িয়েছেন প্রচুর চোখের আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে গালগল্প করে, বিশ্বাস করেছিলেন একজনই।'

'কে?'

'হ্যান্স লুথার। জার্মান বৈজ্ঞানিক। উনিও পরলোকে— জর্সেন মারা যাওয়ার দিন কয়েক পরেই। লুথার মারাও গেছেন অদ্ভুত ভাবে। লোক্যাল নিউজ পেপারে ফোন করে উদ্ভট খবর ছাপতে বলছিলেন, হার্ট অ্যাটাক হয় সঙ্গে সঙ্গে।'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র চোখ নামিয়ে ভাবছেন।

কিন্তু দীননাথের চাই যে অ্যাকশন। ঝট করে রিসিভার তুলে নিয়ে লাইন নিল পুলিশ মর্গে। কান খাড়া করে শুনল ময়নাতদন্ত রিপোর্ট— মেয়ো আর ওয়েব-এর। বিস্ফারিত হল দুই চক্ষু।

বিচিত্র খবর! প্রফেসর আর হ্যারিম্যানও শুনেছেন সেই রিপোর্ট অ্যামপ্লিফায়ার চালু থাকায়।

দুই বৈজ্ঞানিকেরই চুলকোনি রোগ হয়েছিল নিশ্চয়। আয়োডিন মেখে নিয়েছিলেন বাঁ হাতের কনুই থেকে আরম্ভ করে কাঁধ পর্যন্ত!

হ্যারিম্যান বললেন, 'প্রফেসর, আপনি আর দীননাথ রহস্য সূত্রটা যদি ধরিয়ে দিতে পারেন, তখন নামানো যাবে এফ-বি-আই-কে।'

আমেরিকার দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। এদের অসাধ্য কিছু নেই।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের রহস্যজনক মড়ক নিয়ে আগে ভাবা দরকার অদ্ভুতকর্মা বৈজ্ঞানিক প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের। বেঙ্গল ব্রেন। বিশ্ববিখ্যাত।

তিনি কিন্তু চোখ নামিয়ে তন্ময় হয়ে ছিলেন নিজের ভাবনায়।

এখন মাথা তুললেন। বললেন, 'আরউইন ওয়েব-এর বোনকে আমি চিনি। ডক্টর কার্টিস। তাঁর কাছে যাওয়া যাক এখুনি। ভাইয়ের মাথা বিগড়োনোর ব্যাপারটা উনি খোলসা করতে পারবেন।'

ডক্টর কার্টিস ভুরু কুঁচকে শুনলেন প্রফেসরের কথা। তারপর বললেন, 'দাদার ছটফটানি বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছিলাম। নার্ভ যেন আর সইতে পারছে না। অথচ ভেঙে কিছু বলত না। মেয়েদের পেটে তো কথা থাকে না!'

'তা ঠিক।' টুকুস করে মন্তব্য করেই বললে দীননাথ, 'চিত্ত চঞ্চল হওয়ার মতো কিছু ঘটেছিল? আপনার জানা আছে?'

'ডক্টর শেরিডান-এর মৃত্যু ওকে নড়িয়ে দিয়েছিল।'

'তিনি কে?' প্রফেসর এবার উন্মুখ।

'ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক। ডক্টর গুথরি শেরিডান। গত বেস্পতিবার হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। বন্ধুর মৃত্যু নড়িয়ে দিয়েছিল দাদাকে।'

'বৈজ্ঞানিকদের মড়ক!' দীননাথের স্বগতোক্তি।

'কী বললেন?' ডক্টর কার্টিস উৎসুক। এই আখাম্বা লোকটার সব কিছুই বেশ মজার।

পালটা প্রশ্ন করল দীননাথ, 'ফসেট নামে কাউকে চেনেন?'

চোখ বড় হয়ে গেল ডক্টর কার্টিসের, 'পাগলের ডাক্তার। স্টেট পাগলাগারদের চিফ।

জবাবটা দিলেন প্রফেসর, 'আপনার দাদা একটা কাগজে ওঁর নাম লিখে গেছেন— ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন ভাবছিলেন— পাগলদের খবর জানবার ইচ্ছে হয়েছিল।'

'পাগলদের খবর!'

উঠে পড়লেন প্রফেসর। দীননাথ তার আগেই দৌড়েছে দরজার দিকে।

গাইরো-কারে উঠতে যাচ্ছেন দু'জনে, পুলিশের গাইরো-কার এসে দাঁড়াল সামনে।

হন্তদন্ত হয়ে নেমে এল পুলিশ অফিসার, 'প্রফেসর, মিস্টার স্যাঙ্গস্টার পাঠালেন। খবর আছে। ওয়েব আর মেয়ো দু'জনেই শেষবার ফোন করেছেন যাঁকে, তাঁর নাম প্রফেসর ডাকিন।'

'কীসের প্রফেসর?' প্রশ্নটা প্রফেসরেরই।

'ডাকিন স্টেরিওসকোপিক, ভারনিয়ার-ক্যামেরা যিনি আবিষ্কার করেছেন।'

খবরটা এল পকেট ফোনে সেই সময়ে। পুলিশ ফোনে। এইমাত্র গাইরো-কার নিয়ে স্কাইওয়ে দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটে পালাচ্ছিলেন ডাকিন— যেন অদৃশ্য কেউ তাঁকে তাড়া করেছে। পুলিশ হেলিকপ্টার তাঁর পেছন নিয়ে তাঁকে থামানোর আগেই রেলিং ভেঙে তিনশো ফুট উঁচু স্কাইওয়ে থেকে আছড়ে পড়েছেন নীচের রাস্তায়।

'ষষ্ঠ মৃত্যু!' বললে দীননাথ।

ডাকিন-এর জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাজের জিনিস কিছু পাওয়া গেল না। মানে, অস্বাভাবিক কিছু।

প্রহেলিকা প্রহেলিকাই রয়ে গেল।

ভারনিয়ার ক্যামেরার একটা মডেল অবশ্য পাওয়া গেছিল। দীননাথ তাই নিয়ে একটু মজার খেলাও খেলেছিল। অদ্ভুত এই ক্যামেরাকে প্রোজেক্টর হিসেবেও কাজে লাগানো যায়। তখন সেই বিচিত্র ঘনবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সব কিছুকেই ঘন অবস্থায় দেখা যায়। দীননাথ ফোকাস করেছিল একটা কিউব, মানে, ঘনককে। ভিউ ফাইন্ডারে দেখেছিল এক তাজ্জব ব্যাপার। কিউবের জ্যামিতিক কঙ্কাল চেপটে গিয়ে যেন দ্বিমাত্রিক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। মানে, শুধু দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ— বেধ অর্থাৎ গভীরতা বেমালুম উধাও হয়েছে। ফোকাস করতে গিয়ে দেখেছিল আবার একটা পিলে চমকানো ব্যাপার। দ্বিমাত্রিক কিউবের মধ্যে গভীরতা জাগ্রত হয়েছে, এবং তা অন্তহীন সুড়ঙ্গের মতো— শেষ দেখা যাচ্ছে না।

অবাক হয়েছিল দীননাথ। বড় বড় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে অনেক ঘুরেছে, অনেক চক্ষু চড়কগাছ করার মতো বস্তু দেখেছে— কিন্তু এমনটি তো কখনও দেখেনি।

এ কীসের যন্ত্র? কেন বানাচ্ছিলেন ডাকিন? যন্ত্রকে ফাইনাল স্টেজে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাড়া খেয়ে মহাপ্রস্থান করলেন কেন?

এক শিশি আয়োডিন নিয়ে পেছনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

'কোথায় পেলেন?' দীননাথের প্রশ্ন।

'মেডিসিন আলমারিতে। ডাকিন দেখছি স্নায়ুরোগে ভুগছিলেন।' অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে রইলেন শিশিটার দিকে। বললেন, 'খামোকা সময় নষ্ট হচ্ছে। চলো যাই স্টেট পাগলাগারদে— ডক্টর ফসেট-এর কাছে।'

'তার আগে পুলিশ মহলের খবরটা নিয়ে নিই।' রিসিভার তুলে মর্গে ফোন করেছিল দীননাথ।

ডাকিন-এর লাশ নিয়ে ময়নাতদন্ত করা যাবে না। চটকে পিন্ডি পাকিয়ে গেছে অ্যাকসিডেন্টের পর।

প্রায় সিকি মাইল জায়গার ওপর অত্যাধুনিক নকশায় নির্মিত হয়েছে স্টেট পাগলাগারদ। এমন বাহারি বিল্ডিং আর বিশেষ এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেই ডক্টর ফসেট নিশ্চয় হেঁজিপেঁজি ব্যক্তি নন।

পাগল ঘেঁটে ঘেঁটে তিনি নিজেও আধপাগল হয়ে গেছেন মনে হয়েছিল দীননাথের। চিবুকে ছাগুলে দাড়ি, চোখে রিমলেস চশমা, শরীরের ওপর দিকটা ত্রিকোণাকার, নীচে দুটো লিকলিকে পা। মুখে ভাসছে সদাব্যঙ্গের হাসি।

কথার মধ্যেই ছুঁচ ফোটানোর চেষ্টা, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র? ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট! ইন্ডিয়ায় আর পাগলাগারদ পেলেন না?'

অর্থাৎ প্রফেসর একটা বদ্ধ পাগল!

'আজ্ঞে না।' যেন মাটির মানুষ হয়ে গেলেন প্রফেসর, 'আপনার ফ্রেন্ড ওয়েবকে টেক্কা মারবার মতো মাথার অবস্থা এখনও আমার হয়নি। খামোকা দেওয়ালে গুলি চালাতে গিয়ে হার্ট ফেল করল! ছ্যা! ছ্যা! ভাল কথা, প্রফেসর ডাকিন-এর নাম নিশ্চয় শুনেছেন। উনি অত আয়োডিন রাখতেন কেন ওষুধের বাক্সে? গলগণ্ড ছিল নাকি?'

খরখরে চোখে সোনার চশমার মধ্যে দিয়ে চেয়ে রইলেন ফসেট, 'আজ্ঞে না। তবে—'

'বলুন, বলুন তবে কী?'

'পাগলদের খুব বেশি গলগণ্ড হয় কিনা জানতে চেয়েছিলেন ডাকিন আর ওয়েব।'

'দু'জনের একই প্রশ্ন! আপনি কী জানালেন?'

'দু'হাজার পাগল আছে এখানে— কারও গলগণ্ড নেই। রিপোর্টটা দেবার আগেই তো পটল তুললেন দু'জনে।'

'গুড। এবার বলুন তো, আয়োডিন যদি শরীরে বেশি যায়, শরীর আর মন অসুস্থ হয় কিনা?'

হাসলেন ফসেট, 'তা হলে তো সমুদ্রে যারা জীবনের বেশির ভাগ কাটায়, তাদের বেশির ভাগই হত ইডিয়ট।'

চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেলেন প্রফেসর!

ওয়েব ঠিক এই ধরনের আভাস দিয়েছেন ওঁর লেখায়। সমুদ্রগামীদের আচরণ কী রকম, সে খোঁজ নেওয়া দরকার! নাবিকরা বেশি আক্রান্ত হয়।... কীসের আক্রমণ? আয়োডিন! মানসিক রোগ! স্নায়ুর দুর্বলতা! অকস্মাৎ অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানার অবতারণা করা!

ছ'জন বৈজ্ঞানিকই কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেছিলেন?

মনমরা প্রফেসর ফিরে এলেন নিউইয়র্কের ডেরায়। দীননাথ একদম নিশ্চুপ।

মর্গে ফোন করল দীননাথ। ময়না তদন্ত হয়েছে? মেয়ো আর ওয়েবের শরীর কাটা ছেঁড়া করে মাদক দ্রব্য কিছু পাওয়া গেছে কি?

হাল ছাড়েনি দীননাথ। জবাবটাও এল তার মনের মতো।

'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে মাদকদ্রব্য। দু'জনেরই পেটে রয়েছে প্রচুর মেসকাল। রিফাইন্ড মেসকাল। আর কিডনিতে পাওয়া গেছে মেথিলিন ব্লু।'

'আয়োডিন পাওয়া গেছে তিন বৈজ্ঞানিকেরই ল্যাবরেটরিতে। আয়োডিন জমিয়ে রেখেছিলেন কেন?'

কথাবার্তা থেমে গেল টেলিফোন আসায়। ফোন করছেন হ্যারিম্যান। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র জানতে চেয়েছিলেন, পয়লা মে থেকে আজ পর্যন্ত কজন বৈজ্ঞানিক পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। খবরটা চিত্তচাঞ্চল্যকর! গত পাঁচ সপ্তাহে মোট আঠারোজন বৈজ্ঞানিক সহসা স্বর্গে গেছেন— এঁদের মধ্যে তিন-চারজনের মৃত্যু স্বাভাবিক হলেও হতে পারে, বাকি সবাই মরেছেন অস্বাভাবিকভাবে!

সকালে 'সান' পত্রিকার ইন্টারনেট এডিশন বেরিয়ে এল মেশিন থেকে। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে যে-খবরটা, তা এই :

প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞের মহাপ্রয়াণ।

পড়লেন প্রফেসর। ঝুলে পড়ল চোয়াল। লরির সামনে লাফিয়ে পড়ে চাপা পড়েছেন ষাট বছরের বৃদ্ধ ডক্টর স্টিফেন রিড। চোখের অপারেশনে যিনি তুলনাবিহীন।

মুখ লম্বা হয়ে গেছিল দীননাথেরও, বন্ধ হয়েছে লম্ফ ঝম্প। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল শুধু একটা কথা, 'উনিশ নম্বর মৃত্যু!'

স্টিফেন রিড-এর মৃত্যু যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের নিয়ে বসেছেন প্রফেসর আর দীননাথ— পুলিশ দপ্তরে।

দেখেছেন অনেকেই, কিন্তু পাওয়া গেছে মোটে তিনজনকে। বাকি সবাই হাওয়া হয়ে গেছেন।

প্রথমজন এক বৃদ্ধ। তিনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ঘেমে গেলেন। ঘামতে ঘামতে বললেন, 'ভদ্রলোক আচমকা বিকট চিৎকার ছেড়ে সাঁ করে দৌড়ে গেলেন ছুটন্ত গাড়ির ভিড়ে। আমি চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম, চাপা পড়ার দৃশ্য দেখা যায় না।'

দ্বিতীয় জন এক স্থূলকায়া মহিলা। দারুণ নার্ভাস। ছোট রুমালের কোণ চিবোতে চিবোতে বললেন, 'মনে হল যেন ভূত দেখছেন। হাত নেড়ে তাড়াতে তাড়াতে গাড়ির জঙ্গলে ঢুকে গেলেন। চেঁচাতে চেঁচাতে।'

'চেঁচিয়ে কী বলছিলেন? দীননাথের প্রশ্ন।

'না... না... না!'

'কী তাড়াচ্ছিলেন হাত নেড়ে? দেখেছেন?'

'না। কিছুই তো ছিল না। অথবা ছিল, তাদের দেখা যায় না।'

তৃতীয় ব্যক্তি বেশ ছিমছাম চেহারার এক প্রৌঢ়। মার্জিত কথাবার্তা। তিনি বললেন, 'অদ্ভুত চোখে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে মিস্টার রিড আসছিলেন আমার দিকেই। হ্যাঁ, খুবই অদ্ভুত চোখ। কাচের মতো চকচকে। যেন বেলেডোনার পোঁচ লাগিয়ে নিয়েছিলেন।'

'বেলেডোনা!' দীননাথ অবাক।

'স্টেজে নামবার আগে আমাদের লাগাতে হয়। বেলেডোনার এক পোঁচ।'

দীননাথ মৌন।

বক্তা মঞ্চ-কায়দায় বলে গেলেন, 'চনমনে চোখে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলেন। ওপর নীচ দেখছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, খুব ভয় পেয়েছেন।'

'শূন্যে দেখছিলেন? কিছু ছিল না? আপনি দেখেননি?'

'না। আমার কাছে যখন এলেন, মুখ সাদা হয়ে গেছে। তার পরেই ধাঁই ধাঁই করে শূন্যে ঘুসি মারতে লাগলেন— যেন পালটা মার মারছেন। ভীষণ চেঁচিয়ে উঠলেন— কী বললেন বোঝা গেল না। সাঁ করে চলন্ত গাড়ির দিকে ছুটে গেলেন।'

'চিৎকারের কিচ্ছু বোঝেননি?'

'না।'

তিন সাক্ষীকে বিদায় দিয়ে মর্গে ফোন করল দীননাথ। 'কিছু পাওয়া গেল রিডের শরীর কাটা ছেঁড়া করে?'

একই রিপোর্ট। রিড-ও গায়ে আয়োডিন মেখে নিয়েছিলেন। তবে বাঁ হাতে আর কাঁধে নয়। বাঁ পায়ে, গোটা উরুতে, হাঁটু পর্যন্ত!

শুনলেন প্রফেসর। বললেন, 'বিশেষজ্ঞের মতামত দরকার। মেসকাল, আয়োডিন আর মেথিলিন ব্লু শরীরে কী অপকর্ম করে, তা জানা দরকার। প্রথমটা মাদক, দ্বিতীয় আর তৃতীয় মোটেই নয়। তার আগে যাওয়া যাক রিডের বাড়ি।'

রিড ছিলেন চিরকুমার। বাড়ির কাজ দেখাশুনো করতেন এক প্রৌঢ়া। তিনিই দেখালেন ল্যাবরেটরি আর রাশি রাশি কাগজপত্র। সবই চক্ষুগোলক আর চোখের স্নায়ু সম্পর্কিত।

শুধু একটা চিঠিই চোখ খুলে দেখার মতো। চিঠির লেখক আরউইন ওয়েব।

'ডিয়ার রিড, মেয়ো ওঁর কিছু জিনিস তোমাকে দিচ্ছেন শুনে চিন্তায় পড়েছি। তোমার বিলক্ষণ আগ্রহ আছে জানি, কিন্তু ভীষণ বিপদে পড়বে। খামোকা সময় নষ্টও হবে। ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ো— মনেও রাখবে না— ভুলে যাবে। তবেই জানবে বিপদমুক্ত।'

তারিখটা ২২ মে।

'বুঝলাম।' বললেন প্রফেসর, 'মেয়ো হুঁশিয়ার করেছেন ওয়েবকে, ওয়েব হুঁশিয়ার করেছেন রিডকে। কিন্তু প্রাণে বাঁচেননি কেউই। নাটক জমেছে ভাল।'

শিরদাঁড়া সটান করে ফেললেন এই পর্যন্ত বলেই। কারণ, ওঁর মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠেছে। নামহীন আতঙ্ক যেন ওঁকে ঘিরে ফেলতে চাইছে। মুখে বললেন, 'দীননাথ, স্যাঙ্গস্টারের টেলিফোন নাও।'

'স্যাঙ্গস্টার?'

'ইয়েস, প্রফেসর! কী খবর?'

'রিড-এর বাড়ি থেকে বলছি। উনি কোন হসপিট্যাল অ্যাটাচড?'

'এক মিনিট।'

এলেম আছে বটে স্যাঙ্গস্টারের। খবর চলে এল পরের মিনিটে, ডক্টর প্রিচকার্ড, চিফ, স্টেট হসপিট্যাল।' চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে সোজা কাজের কথায় চলে এলেন প্রফেসর, 'ডক্টর প্রিচকার্ড, স্টিফেন রিড-এর শরীরের আর চিকিৎসার খবর আপনি রাখতেন?'

প্রিচকার্ড অমায়িক মানুষ। দীননাথ দাঁড়িয়ে রয়েছে, আগে তাকে বসতে অনুরোধ জানালেন। তারপর জবাব দিলেন প্রফেসরের, 'রাখতাম।'

'উনি নেশা করতেন?'

'না।'

'এই হাসপাতালে চোখের ডাক্তার ছিলেন?...'

'ডিপার্টমেন্ট হেড ছিলেন।'

'ড্রাগ অথরিটি কেউ আছেন এখানে?'

'আমাকে বলতে পারেন।'

'চমৎকার। আচ্ছা, ডক্টর প্রিচকার্ড, মেসকাল আয়োডিন আর মেথিলিন ব্লু কি নেশা জাগায়?'

'মেসকাল নেশা আনে— স্নায়ুর সূক্ষ্মতা বাড়িয়ে দেয়, মেথিলিন ব্লু কিডনি পরিষ্কার করে দিয়ে পেচ্ছাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। আয়োডিন জীবাণুনাশক। হ্যালোজেন বলে চট করে গোটা শরীরে ছড়িয়ে যায়।'

'ফাইন। তিনটে জিনিস একসঙ্গে শরীরে ঢুকলে একটা আর একটার কাজ বাড়িয়ে দিয়ে অদ্ভুত কিছু ঘটায় কি?'

'সেটা গবেষণার বিষয়।'

'ফাইন! ফাইন! ফাইন!'

স্যাঙ্গস্টারের টেলিফোন এল সঙ্গে সঙ্গে, 'প্রফেসর? চলে আসুন— খবর আছে। মনে হচ্ছে, মার্ডার, লাইন ধরা গেছে। এর পর যিনি খুন হয়ে যেতে পারেন, তিনি হয়তো প্রফেসর এডোয়ার্ড বীচ।'

একটু থমকে গিয়েই পরক্ষণে বললেন প্রফেসর, 'আপনিও বুঝেছেন সবগুলোই মার্ডার, আত্মহত্যা নয়?'

'সব বৈজ্ঞানিকই যে মোটামুটি চোখ সংক্রান্ত গবেষণাই করছিলেন। হঠাৎ দল বেঁধে এঁরা আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন? তা ছাড়া বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিকই আমেরিকান। বিজ্ঞানের কোনও একটা নতুন আবিষ্কারকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

'খুনি কারা বলে মনে করেন?'

'গবেষণা যারা পণ্ড করতে চায়— টেররিস্ট।'

'মিস্টার স্যাঙ্গস্টার, হঠাৎ প্রফেসর বীচ-কে কুড়ি নম্বর টার্গেট মনে করছেন কেন?'

'কারণ উনি স্টেরিওস্কোপিক পেঁচা-চোখ ক্যামেরা আবিষ্কার করেছেন। কারণ উনি এইমাত্র ডক্টর কার্টিসকে ফোন করেছিলেন। কারণ, উনি মেয়ো, ওয়েব আর ডাকিনের মৃত্যুর বিশদ বিবরণ জানতে চাইছিলেন। কারণ, উনি জানতে চাইছিলেন, এই তিনজনেই জর্সেন-এর ফরমুলা নিয়ে কাজ করছিলেন কিনা মারা যাওয়ার আগে।'

'বটে! বটে! বটে!'

'মৃত্যু শৃঙ্খলের বিংশতিতম নায়ক ধরণী ত্যাগ করার আগেই চলে আসুন। যেখানে আমি এসে গেছি।'

'আসছি। কিন্তু আছেন কোথায়?'

'প্রফেসর বীচ যেখানে রয়েছেন। ন্যাশন্যাল ক্যামেরা কোম্পানি, সিলভার সিটি। আছি এয়ারপোর্টে।'

'আসছি! আসছি! আসছি!'

নতুন বিশ্বের ইতিহাসে বৃহত্তম বিপর্যয় দেখবার জন্যে প্রফেসর দৌড়োলেন দীননাথকে নিয়ে যে আকাশযানে চেপে, তা সোজা উঠে যায় মহাশূন্যে, তারপর সোজা গোঁত খেয়ে নেমে যায় গন্তব্যস্থানে— কয়েক মিনিটেই।

বায়ুবন্দরে নামবার আগেই আকাশ থেকে সিলভার সিটি দেখলেন প্রফেসর। ঘি রঙের পেল্লায় পেল্লায় বাড়ি ঝকঝক করছে রোদে। কাটিমের মতো দেখতে বিরাট বিরাট কেমিক্যাল রিজার্ভার মাথা তুলে রয়েছে আকাশের দিকে। ন্যাশন্যাল ক্যামেরা কোম্পানির কারখানা। কারখানা ঘিরে চক্রাকারে হাইরাইজ বিল্ডিং।

বায়ুবন্দরে নেমে আসার ঠিক আগে আর একবার সিলভার সিটির রুপোলি চেহারা দেখবার জন্যে চোখ ফিরিয়েছিলেন।

তখন দেখেছিলেন রাশি রাশি মেঘ— বাষ্পমেঘ।

এতক্ষণ তা ছিল না।

অবিশ্বাস্য! উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর। ঝড়ো মেঘের আকৃতি নিচ্ছে রাশি রাশি বাষ্পপুঞ্জ— ঠেলে উঠছে, ঠিকরে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে।

যেন অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটে গেল চোখের সামনে। বাতাসে প্রবল আলোড়ন টের পাওয়া গেল শূন্যপথেই।

এর পরের দৃশ্যটা আড়াল পড়ে গেল মহাকাশযান বায়ুবন্দর স্পর্শ করতেই। বহু দূরের নাটক এখন আর দৃশ্যমান নয়।

উৎকণ্ঠায়, অসহ্য বিস্ময়ে ছটফট করছেন প্রফেসরের মতো ধীর স্থির মানুষ। দীননাথের দুই চক্ষু ছানাবড়া।

প্রথমেই তড়বড় করে নেমে এলেন প্রফেসর। অজানিত আশঙ্কায় তাঁর বুক দুরদুর করছে।

স্ট্যাটোস্ফিয়ার স্টেশনের কর্মচারীরাও থ হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে রয়েছে দক্ষিণ দিকে— যেখানে রয়েছে সিলভার সিটি। ষাট মাইল দূরে! রকি মাউন্টেনের আড়ালে। বাষ্পকুণ্ডলী কিন্তু পাক খেয়ে খেয়ে এর মধ্যেই উঠে এসেছে পাহাড় ছাড়িয়ে অনেক ওপরে। নিরেট মেঘের আকারে।

আর সে কী আওয়াজ! ষাট মাইল দূর থেকে বাতাস ছিঁড়ে খুঁড়ে ধেয়ে এসে আছড়ে পড়ছে কানের পরদায়।

বায়ুবন্দরের প্রত্যেকের মুখ বিবর্ণ।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন স্যাঙ্গস্টার। প্রফেসরকে রিসিভ করার জন্যে এখানেই তিনি ছিলেন। এখন মুখে বাক্য সরছে না। চক্ষুতারকা বিস্ফারিত। অনেক অভাবনীয় দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর দুর্দান্ত কর্মময় জীবনে।

দেখেই বুঝলেন প্রফেসর, স্যাঙ্গস্টারের ব্রেন কাজ করছে না। চাইলেন দীননাথের দিকে। পোক্ত দীননাথ হাঁকডাক দিয়ে জোগাড় করে ফেলল ফ্লাইং মেশিন— যে-মেশিন দশ মিনিটেই শূন্যপথে পৌঁছে যাবে সিলভার সিটিতে।

অথবা একটু আগেই যেখানে ছিল সিলভার সিটি— সেখানে।

একই সঙ্গে গর্জে উঠল ফ্লাইং মেশিনের দশখানা জেট— পেছনে ছিটকে গেল অগ্নিপুচ্ছ। মেশিন ধেয়ে গেল শূন্যে জ্যামুক্ত অগ্নিবাণের মতো।

নীচের কিছুই দেখা যাচ্ছে না ধুলো ঝড়ের জন্যে। ধুলো, ধুলো, শুধু ধুলো। বিস্ফোরণের বাতাস।

সহসা অপসৃত হল সিলভার সিটির ওপরকার অবগুণ্ঠন।

আঁতকে উঠে চিৎকার করে উঠেছিল পাইলট। সে দেখছে সিলভার সিটির গোরস্থান। নিমেষে পরিণত ধ্বংসস্তূপ।

নেই... সিলভার সিটি নেই। সে জায়গায় রয়েছে পাঁচ মাইল ব্যাসের এক প্রকাণ্ড গহ্বর।

গহ্বরের উত্তর প্রান্তে বালুকাভূমির ওপর জেটচালিত বায়ুযান নামিয়ে আনল পাইলট শিহরিত কলেবরে।

নেমে এলেন স্যাঙ্গস্টার, প্রফেসর আর দীননাথ। চেয়ে রইলেন। নির্বাক তিনজনেই। স্তম্ভিত।

মাত্র একঘণ্টা আগে কাজে কর্মে গমগম করছিল এই শহর, ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার বাসিন্দা। এখন তা নরকের একটা ছিন্নপত্র ছাড়া কিছুই নয়। পাঁচ মাইল ব্যাসের বিপুল বিবরে পড়ে তালগোল পাকানো কড়িবরগা, কংক্রিট পাথর, ইট কাঠ। রক্তমাখা ছিন্ন দেহাংশ আর পরিধেয়র বর্ণনা না-দেওয়াই ভাল।

নির্নিমেষে চেয়ে থেকে প্রফেসর বললেন, 'ক্রাকাতোয়া এক্সপ্লোশনও এত ভয়ংকর হয়নি।'

ঢোক গিলে স্যাঙ্গস্টার বললেন, 'অ্যাটমিক এক্সপ্লোশন।'

দীননাথ কিন্তু একদম নির্বিকার। বললে হৃষ্টকণ্ঠে, 'ফ্লাইং মেশিন থেকে নামবার আগেই গাইগার কাউন্টারে যাচাই করে নিয়েছি। বিকিরণ এখানে নেই। অ্যাটমিক এক্সপ্লোশন এটা নয়।'

'তবে কী?' স্যাঙ্গস্টার বিহ্বল।

ধ্বংসস্তূপ থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল রুধিরঞ্জিত ছিন্নবস্ত্র পরিহিত এক পুরুষ। ধুলোর প্রলেপে তাকে মানুষ বলে চেনা দায়। পা টেনে টেনে এগিয়ে এসে বললে স্খলিত স্বরে, 'দেখছেন কী? পালান! এই নরকরাজ্য ছেড়ে পালান!'

লোকটার মাথা বিগড়েছে মনে হচ্ছে। এগিয়ে গেল দীননাথ। রক্ত আর ধুলো মাখা ভৌতিক কলেবরটাকে জড়িয়ে ধরে বললে নরম গলায়, 'কী হল বলুন তো?'

'বোরাক অ্যাভিন্যুতে একটা চিমনি মেরামত করছিলাম। কাটিং প্লাসের জন্যে হাত বাড়িয়েছি, এমন সময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ফেটে উড়ে গেল। কে যেন আমাকে খামচে ধরে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দিল অনেক দূরে। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সিলভার সিটি আর নেই। রাস্তা নেই, বাড়ি নেই, আমার বউ বাচ্চা— কেউ নেই। শুধু আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে রাশি রাশি মরা পাখি।'

'মরা পাখি!' অস্ফুট কণ্ঠে বললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। কে যেন বলছিল সাতটা পায়রার মড়া হঠাৎ খসে পড়েছিল আকাশ থেকে সুইডেনে?

দীননাথ কিন্তু কথা চালিয়ে যাচ্ছে বিধ্বস্ত মানুষটার সঙ্গে, 'এক্সপ্লোশন ঘটেছে কারখানার মধ্যে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব ক'টা ট্যাঙ্ক ফেটে উড়ে গেছে। পেল্লায় পেল্লায় সিলিন্ডার— মিলিয়ন লিটার সিলভার নাইট্রেট সলিউশন ভরতি সিলিন্ডার— ফেটেছে সব ক'টা— একসঙ্গে।'

'কিন্তু সিলভার নাইট্রেট সলিউশন তো এভাবে ফাটে না!' পাশ থেকে বললেন প্রফেসর।

'বয়েস' শহর থেকে ছুটে আসছে গাড়ির পর গাড়ি। হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে দিল অ্যামবুলেন্স। এইরকমই চলবে এখন দিনের পর দিন। কাতারে কাতারে মানুষ আর গাড়ি আসবে আহত আর নিহতদের সরিয়ে নিতে।

চাঁদ উঠছে আকাশে। চাঁদের আলোয় এখন প্রকৃতই নরক মনে হচ্ছে সিলভার সিটির গহ্বরকে।

'বয়েস' শহরে এসে নামল একটা গাইরো-কার। একে একে নেমে এলেন প্রফেসর, স্যাঙ্গস্টার আর দীননাথ। কারও মুখে কথা নেই। হোটেলে উঠে জিরিয়ে নিয়ে প্রফেসর ফোন করলেন হ্যারিম্যানকে। জানলেন, এইটুকু সময়ের মধ্যেই গোটা দুনিয়া জেনে গেছে সিলভার সিটির প্রলয়-কাণ্ড। থমথম করছে পৃথিবীর প্রতিটি জনপদ। প্রত্যেকেই ভাবছে, এবার বুঝি তার পালা। পারমাণবিক যুগে এইরকমই তো ঘটে। হিরোশিমা ছাতু হয়ে গেল

নিমেষে। সেটা না হয় ছিল যুদ্ধ, কিন্তু এটা কী? অন্তর্ঘাত? না, অ্যাকসিডেন্ট? নাকি, চোরা আক্রমণ?

প্রফেসর সব শুনে বললেন হ্যারিম্যানকে, 'অ্যাটমিক নয়, মলিকিউলার বিপর্যয়— দানবিক আকারে। সিলভার নাইট্রেট সলিউশনে কিছু একটা ঘটেছিল।'

'বীচ কোথায়?'

'বোধহয় শেষ হয়ে গেছেন। বিংশতিতম অপমৃত্যু।'

হ্যারিম্যান টেলিফোন রেখে দিলেন। প্রফেসরও কথা চালিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় নেই। মাথা ঝিমঝিম করছে। সেই অস্বস্তিকর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিটা মাথার মধ্যে অবরোধ সৃষ্টি করে চলেছে সিলভার সিটির শ্মশানভূমি দেখবার পর থেকেই। সাইকিক ওয়ার্নিং। মেয়োর মৃত্যুদৃশ্য দেখবার পর থেকেই তাঁর অলোকদৃষ্টি জেগে উঠতে চাইছে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। বারে বারেই তাঁর মনে হচ্ছে, এ বিষয়ে ভাবাটা বিপজ্জনক বলেই তাঁর অতীন্দ্রিয় রক্ষী তাঁকে ভাবতে দিচ্ছে না।

ছটফট করতে করতে মনের এই অবস্থার কথা বলেছিলেন স্যাঙ্গস্টারকে। তিনি তো হেসেই খুন, 'রাখুন তো। টেলিপ্যাথি একটা বোগাস ব্যাপার। হিপনোটিজম নিয়ে চিরকালই বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কারও চিন্তায় ছিপ ফেলবার যন্ত্র আজও কেউ আবিষ্কার করেনি। তা ছাড়া চিন্তা না-করলে তদন্ত করবেন কী করে?'

চুপ মেরে গেলেন প্রফেসর। তর্ক করে লাভ নেই। মন-প্রহরীর অতন্দ্র প্রহরার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। বিজ্ঞান অনেক কিছুরই নাগাল ধরতে পারেনি এখনও। তাদের মধ্যে রয়েছে চিন্তাশক্তি— যার অগম্য কিছুই নেই।

অবশেষে একজনকে পাওয়া গেল সেন্টার হসপিট্যালের ওপরতলায়। ঠাঁই দেওয়া যাচ্ছে না সেখানে। হাজার তিনেক জখম এর মধ্যেই এসে গেছে। সিলভার সিটির বাসিন্দাদের মধ্যে জীবিত বলতে এরাই।

একদম ওপরতলার এই পেশেন্টের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পটি জড়ানো। চোখ পর্যন্ত ব্যান্ডেজে ঢাকা, খোলা আছে মুখবিবর! গা থেকে বেরোচ্ছে ট্যানিক অ্যাসিডের কড়া গন্ধ— যার মানে, পুড়েছে সাংঘাতিকভাবে।

প্রফেসর একা বসলেন এক পাশে! স্যাঙ্গস্টার আর দীননাথ দাঁড়িয়ে রইলেন ওয়ার্ডের বাইরে। কারণটা রহস্য করে বললেন প্রফেসর, 'আপনারা ব্রেন আর থট কন্ট্রোল করতে জানেন না। এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন আপনাদের নেই। আপনাদের চিন্তার নাগাল ধরা সহজ। বাঁচতে চান তো বাইরে থাকুন।'

ক্লান্ত কণ্ঠে নার্স বললে প্রফেসরকে, 'পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেবেন না। ভয়ানক কাহিল। আয়ু বেশি নেই।'

ব্যান্ডেজ-করা কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর, 'ফাটল কী?'

'ট্যাঙ্কগুলো!' ফিসফিস জবাব।

'সিলভার নাইট্রেট?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে? জানা আছে?'

'না।'

'কী কাজ করা হত?'

'ল্যাবরেটরি ওয়ার্কার।'

'রিসার্চ?'

'হ্যাঁ।'

'এক্সপ্লোশনের সময়ে কী করছিলেন?'

জবাব নেই।

'ডক্টর বীচ পারমিশন দিয়েছেন, যা জানেন, বলতে পারেন।' প্রয়োজনে প্রফেসরের মুখে মিথ্যে আটকায় না।

'বীচ! আমাকে তা হলে মুখ খুলতে বারণ করে গেলেন কেন?'

'উনি বারণ করেছেন? এখানে?'

'আপনি আসবার একঘণ্টা আগে।'

কাঁচা মিথ্যে বলে গেলেন প্রফেসর, 'কিন্তু আমাকে বলেছেন, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে।'

'কে আপনি?'

'ওঁর বন্ধু বৈজ্ঞানিক।'

'আপনাকে নিজে বললেন না কেন?'

'আপনি ভাল বলতে পারবেন— তাই।'

জবাবটা এল সেকেন্ড কয়েক পরে, খুব ক্ষীণ স্বরে, 'নতুন ইমালশনটা পেলাম পরশু। ডক্টর বীচের সুপারভিশনে তিনমাস খাটবার পর। চব্বিশ ঘণ্টা এক নাগাড়ে কাজ চলেছে। একজন এ-কাজ করতে গেলে দশ বছর সময় নিত। আমরা খেটেছি ষাটজন— একসঙ্গে— কোম্পানি টাকা ঢেলেছে জলের মতো। বুধবার সকালে পাওয়া গেল বীচ যা চাইছিলেন। নিশ্চিত ছিলাম না। এক্সপেরিমেন্ট করবার কয়েক মিনিট পরেই ঘটল এক্সপ্লোশন।'

'ইমালশনটা কী? এক্সপেরিমেন্টটা কী ধরনের?'

'ফটোগ্রাফিক ইমালশন। 'ইনফ্রা-রেড'-এর অনেক ভেতরের ফ্রিকোয়েন্সিরও ছবি তুলতে পারে। কোনও কমার্শিয়াল ফিল্ম অত দূর যেতে পারে না— ছবি তো ওঠেই না। আলট্রা রেডিয়ো ব্যান্ড ছুঁয়ে ফেলে। বীচ বলেছিলেন, এই ইমালশন সূর্যদেরও রেকর্ড করে ফেলবে। কেন বলেছিলেন বুঝিনি। নেগেটিভ ডেভালাপ করবার পর ছোট ছোট সূর্যের মতো জিনিসের ছবি উঠেছিল।'

'তারপর? তারপর?'

'ছোট্ট ছোট্ট সূর্য... অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম। সূর্য মানে গোলক... ছোট্ট ছোট্ট ফানুস... অদৃশ্য জ্যোতি বেরোচ্ছে গা থেকে। চার নম্বর শেডের ছাদের ওপর ভাসছে চারটে। কেন বলতে পারব না, খুব ভয় হল। বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। বীচ তখন বাড়িতে

ছিলেন। ফোনে যখন জানাচ্ছি, সব ক'টা ট্যাঙ্ক একসঙ্গে ফেটে উড়ে গেল।'

'বীচ জানতেন ফটোয় কী উঠবে?'

'জানতেন। টেলিফোনে খবর পেয়ে একটুও অবাক হলেন না। শুধু বললেন, যাক, রেকর্ড করা গেল তা হলে। সঙ্গে সঙ্গে দুম...'

'গোলকগুলো কী, সে সম্বন্ধে আগে কিছু বলেছিলেন?'

'না। শুধু বলেছিলেন, সূর্যের মতো দেখতে অনেক কিছুর ছবি উঠবে। ঠোঁটটেপা ছিলেন এই বিষয়ে।'

'ধন্যবাদ। এবার জিরোন।'

ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসে বিমূঢ় স্যাঙ্গস্টারকে বললেন, 'বীচ মরেননি।'

দৌড়ে বাইরে এসেছে নার্স। মুখ বিবর্ণ। চোখ বিস্ফারিত। বললে দম আটকানো গলায়, 'শেষ... শেষ হয়ে গেল... হেঁচকি তুলেই শেষ... কেন অত কথা বলতে গেলেন?'

গাইরো-কারে বসে মাথার চিন্তাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখলেন প্রফেসর। কেন, তা নিজেই জানেন না। শুধু মনে হল, এই প্রসঙ্গ নিয়ে কোনও ভাবনা মাথায় ঠাঁই দেওয়া চলবে না... একদম না... ভাবা যাক ঘুড়ি ওড়ানোর কথা, ছেলেবেলায় ডাংগুলি খেলার কথা, নুন-ধাপসি খেলার কথা... মন জুড়ে রইল ছেলেবেলার মধুর স্মৃতিচারণে।

টুপি পরিয়ে রাখলেন মনকে।

তাই বেঁচে রইলেন!

একাই বেরিয়েছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। জীবন নিয়ে যেখানে ছিনিমিনি খেলা খেলছে অজ্ঞাত বিভীষিকা, সেখানে একলা থাকাই শ্রেয়। উনি চান না প্রাণবলি দিক প্রিয় দীননাথ অথবা দেশরত্ন স্যাঙ্গস্টার। কারণ একটাই। বিশেষ বিশেষ চিন্তাকে মাথায় ঢুকতে না-দেওয়ার জন্মগত ক্ষমতা ওদের কারওই নেই। যা জানতে নেই, যা জানলে মরণ অনিবার্য— তা জানার দরকারও নেই।

দুঃসাহসিক এই নৈশ অভিযানে প্রফেসর তাই একাই বেরিয়েছেন। হোটেল ছেড়ে সটকে পড়েছিলেন বিকেল নাগাদ— দীননাথ আর স্যাঙ্গস্টারকে কিছু না-জানিয়ে। বলতে গেলেই তো পথ আটকাবে, চিল্লিয়ে পাড়া মাত করবে দীননাথ। ছেলেটার সব ভাল, কিন্তু বড় সরল। ওর গায়ের অসুরের মতো জোর দিয়ে শূন্য-আতঙ্ককে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। খামোকা মরবে।

তাই তক্কে তক্কে ছিলেন প্রফেসর। পথশ্রম ক্লান্তিতে স্যাঙ্গস্টার আর দীননাথ যখন ঘুমিয়ে কাদা, উনি পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসেছিলেন হোটেলের বাইরে, ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই শহরের সবচেয়ে নামকরা খবরের কাগজের নাম কী?'

নামটা বলেছিলেন ম্যানেজার।

ঠিকানা? সম্পাদকের নাম?'

তাও জানিয়ে দিয়েছিল ম্যানেজার।

গাইরো-ট্যাক্সি নিয়ে সোজা সেই কাগজের অফিসে চলে গেছিলেন প্রফেসর।

সম্পাদকের চেম্বারে ঢুকে গিয়ে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। আমেরিকান গভর্নমেন্টের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া কাগজ দেখিয়েছিলেন— যার চাইতে বড় অভিজ্ঞান আর হয় না।

তখন মুখ খুলেছিলেন মুখটেপা সম্পাদক-সাংবাদিক, 'কী জানতে চান?'

'বীচ-এর ঠিকানা।'

সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন সম্পাদক-সাংবাদিক, 'আমি নিজেই কাল কাকভোরে ওঁর কাছে যাব ঠিক করে রেখেছি।'

'সিলভার সিটির খবর নেওয়ার জন্যে?'

'অবশ্যই। গোটা পৃথিবীটাকে চমকে দেওয়ার খবর শুধু ওঁর কাছেই আছে।'

'আপনার ভাত মারতে চাই না। আমি সাংবাদিক নই। খবর বেচি না। বিজ্ঞানের কাজে লাগাই। আমরা বৈজ্ঞানিক। যা জানি, তা সিক্রেট করে রাখি, এটা আমাদের ধর্ম। আমাদের নীতি।'

কথার প্যাঁচে ধরাশায়ী হয়েছিলেন সম্পাদক-সাংবাদিক। বীচ-এর গোপন আলয়ের ঠিকানা দিলেন।

প্রফেসর এখন চলেছেন সেইখানেই। রাস্তা চলেছে সাপের মতো এঁকেবেঁকে। আকাশের চাঁদ কিরণবর্ষণ করছে বড় কৃপণভাবে। সিলভার সিটি গহ্বরে ঢুকে গিয়ে যে ধুলো উড়িয়েছে, আকাশ থেকে তা এখনও পুরোপুরি সরে যায়নি। চাঁদ তাই ম্রিয়মাণ।

হাসপাতালের আপাদমস্তক ব্যান্ডেজ বাঁধা মানুষটার পেট থেকে কথা বের করেছিলেন প্রফেসর বিলক্ষণ ঝুঁকি নিয়ে। যা ভয় করেছিলেন, তাই হয়েছে। বীচ বারণ করা সত্ত্বেও বেশি কথা বলেছিল, তাই মরেছে তৎক্ষণাৎ। নিষ্ঠুর হতে হয়েছিল প্রফেসরকে। কিন্তু গূঢ় সংবাদ জেনে ফেলেছেন।

এখন মরণের খাঁড়া ঝুলছে নিজের মাথার। প্রতিটি অণু পরমাণু দিয়ে প্রফেসর তা টের পাচ্ছেন। তাই হাবিজাবি বিস্তর চিন্তা দিয়ে মাথা ভরিয়ে রেখেছেন। ছোট্ট ছোট্ট সূর্য-গোলকদের ঠাঁই দিচ্ছেন না চিন্তাধারায়। এ-ক্ষমতা তাঁর আছে। সবার থাকে না। তাই উনি নিরাপদ।

পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না। জায়গায় জায়গায় প্রকৃতির গড়া প্রস্তর স্তম্ভ। পত্রমর্মর একজায়গায় সন্দেহজনক মনে হতেই উনি থমকে দাঁড়ালেন। পুরো পাঁচ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। নার্ভ টানটান হয়ে রইল। মাসল শক্ত হয়ে রইল। নৈঃশব্দ্য আর নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে ওত পেতে থাকা অজানা আগন্তুকের প্রতীক্ষায় নিরুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু চিন্তার কষি খুলে দিলেন না। বড় হুঁশিয়ার তিনি। অজানার সঙ্গে মোকাবিলার অনেক দিনের পটুতা তাঁর অস্থি মজ্জায় অণু-পরমাণুতে। উনি যে নাটবল্টু চক্র... প্রফেসর নাটবল্টু চক্র... অদ্ভুত কর্মা... বিশ্বের বিস্ময়। 'সময়-গাড়ি' অভিযানে বিশ্বের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে তিনি অনেক জেনেছেন।

কিন্তু যা জানেননি— সেই অজানা আতঙ্কের হদিশ পেতেই এসেছেন একা— অথচ মনটাকে বানিয়ে রেখেছেন একটা নিশ্ছিদ্র সিন্দুক।

এগোলেন হুঁশিয়ার পদক্ষেপে। মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়ালেন আঁধারে গা ঢেকে। পেছনে চোখ চালিয়ে দেখে নিলেন অমানিশার অন্তরালে গা ঢেকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা কোনও নারকীয় অস্তিত্ব।

পাহাড়ের গা বেয়ে পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে পথ ওপর দিকে উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা বিজন উপত্যকায়। উপত্যকার শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে একটা বাড়ি— চাঁদের নিষ্প্রাণ আলোয় যেন একটা আবছা প্রেতালয়। খুব উঁচু নয়। মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। স্থাপত্য অতি মামুলি— চোখে পড়ার মতো নয়। এ-বাড়ি যিনি নির্মাণ করেছেন, তিনি নজর কাড়তে চাননি— যেন আত্মগোপন করে থাকতে চেয়েছেন। লোক-অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে দূরে, বহুদূরে।

প্রহেলিকা-পরিবৃত এই মানুষটার নাম বীচ। ডক্টর বীচ। যাঁর একটিমাত্র আবিষ্কারের ফলাফল দেখতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে তিরিশ হাজার মানুষ— চোখের পলকে।

উপত্যকা শুরু হওয়ার মুখে একটা ভগ্নপ্রায় কাঠের ফলকে বিরঙ অক্ষরে লেখা রয়েছে— তাসের ঘর।

রসিক পুরুষ বটে ডক্টর বীচ। এই একটা নামকরণের মধ্যে দিয়েই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর কথা— অনিত্য সব কিছুই, সবই একদিন ধুলোয় মিশে যাবে।

পেছন ফিরে আর একবার দেখে নিলেন প্রফেসর। না, কায়াহীনদের কায়াগ্রহণের কোনও চিহ্ন নেই বহুদূর পর্যন্ত। থমথম করছে রাত।

ছায়ামায়ার মধ্যে দিয়ে উপত্যকা পেরিয়ে এসে নিরালা আলয়ের সামনে দাঁড়ালেন প্রফেসর। শুধু নিরালা নয়— নির্বাক। জানলাগুলোয় নেই স্বাগতম বাণী, আছে চম্পট দেওয়ার নিঃশব্দ নির্দেশ। চৌকোনা কাচে নেই আলোর আভাস, বৈরী দেওয়ালের ওদিকে নেই কোনও মানুষের সঞ্চরণ। অনেক পেছনে আলগা পাথর গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ ছাড়া নেই কোনও শব্দ। এই শব্দই চকিত করেছিল প্রফেসরকে। বাড়ির দেওয়ালে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। চন্দ্রালোকিত উপত্যকার প্রবেশ পথের দিকে নিমেষহীন নয়নে চেয়ে ছিলেন। পাক্কা পনেরো মিনিট।

না, কেউ পাছু নেয়নি। পাথর গড়াচ্ছে আপনা থেকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব জোরে করাঘাত করলেন ইস্পাতের চাদর দিয়ে মোড়া দরজায়। প্রতিধ্বনি ফিরে এসে যেন ব্যঙ্গ করে গেল প্রফেসরকে।

এবার একটা নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে ধাতুর চাদরে ঠুকলেন ঠকঠক করে।

জবাব নেই।

বুটের লাথি মারলেন।

প্রতিধ্বনির প্রত্যুত্তর ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করলেন না। গোটা বাড়ি বুঝি খাঁ খাঁ করছে। নেই জনমানব।

বীচ? তিনি কোথায়? কী অবস্থায়?

আতঙ্ক এইবার ইস্পাত-আঙুল দিয়ে খামচে ধরল প্রফেসরের কলজে। দরজার হাতল ঘোরালেন। ঘুরল না। লক করা রয়েছে।

প্যানিক বড় ভয়ানক বস্তু। প্রফেসরও নিস্তার পেলেন না তার করাল থাবা থেকে। কিন্তু প্যানিক পদানত করলেন পরক্ষণেই। আর একবার গায়ের সমস্ত শক্তি জড়ো করে প্রস্তরাঘাত করলেন পাল্লায়, কিন্তু বৃথাই।

পণ করলেন, এ অবস্থায় দীননাথ যা করত, তাই করবেন। এই বৃদ্ধ বয়েসে জানলার লোহার গ্রিল ভেঙে ভেতরে ঢুকবেন। যেভাবেই হোক। সেই ছোকরা এসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে অতি সহজে। প্রফেসর অক্ষম। তাঁর বয়স হয়েছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তবুও চেষ্টার কসুর করবেন না।

শেষবারের মতো কান পাতলেন কপাটে, যদি কোনও শব্দ ভেসে আসে নিস্তব্ধ পুরী থেকে।

এল, একটা গুঁই গুঁই শব্দ। খুব ক্ষীণ। সহসা মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই শোনা গেল ধাতুতে ধাতু ঠুকে যাওয়ার অল্প আওয়াজ। তার পরেই হুঁশিয়ার চরণধ্বনি এগিয়ে এল কপাটের দিকে। সরিয়ে দেওয়া হল পাল্লা আগলানোর শেকল, নামিয়ে দেওয়া হল পরপর কয়েকটা অর্গল। পাল্লা ফাঁক হল ইঞ্চি তিনেকের মতো।

ফাঁক দিয়ে ভেতরে নিরন্ধ্র তমিস্রা ছাড়া কিছু দেখতে পেলেন না প্রফেসর।

কিন্তু শ্রবণ করলেন একটা গুরুগম্ভীর তেজোময় কণ্ঠস্বর, 'কে আপনি? কী চাই?'

ঘুরিয়ে জবাব দিলেন প্রফেসর, 'আপনি ডক্টর বীচ?'

'আপনি কে?'

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।'

'মাই গড।'

পাল্লা খুলে গেল পুরো। কণ্ঠস্বরের অধিকারী আড়ালে রেখেছে নিজেকে, কিন্তু বলছে খুব দ্রুত স্বরে, 'ভেতরে আসুন... ভেতরে আসুন... কুইক!'

বন্ধ হয়ে গেল কপাট। দুই মূর্তি এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রন্ধ্রহীন অন্ধকারে। অন্ধকারেই ধ্বনিত হল তেজালো গলা, 'মোস্ট ওয়েলকাম, প্রফেসর। জঘন্য অন্ধকারে আপনাকে চিনতে পারিনি।'

'মনে আছে?'

'চিরকাল থাকবে। আপনি একটা কিংবদন্তি। কিন্তু আমি কস্মিনকালেও ছিলাম না। হয়তো এখন হতে চলেছি। আমার মতো অকিঞ্চিৎকরকে মনে ঠাঁই দিয়ে রেখেছেন, সেজন্যে কৃতজ্ঞ।

'নামটা শুনেই মনের খিল খুলে গেছিল। কিন্তু কাউকে বলিনি।'

'উত্তম করেছেন। আসুন।'

প্রফেসরের হাত ধরে ডক্টর বীচ এগিয়ে গেলেন চোখে-অদৃশ্য মেঝের ওপর দিয়ে দাঁড়ালেন। ধাতুতে ধাতু ঠোকাঠুকির শব্দ শুনলেন। চোখের সামনে। বসে গেল পায়ের তলার মেঝে।'

লিফট! এই ভুতুড়ে ভবনে?

হুহু করে আলোর পর আলো উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। তারপর ঝপ করে দাঁড়িয়ে গেল লিফট। মেঝে আর পাতাল প্রবেশ করছে না।

এখন আলো পড়েছে বীচ-এর মুখে।

নরুন-চেরা চোখে যা দেখবার দেখে নিলেন প্রফেসর। সেইরকমই পাতলা চেহারা, কাটারি নাক, চৌকো চোয়াল, কড়া ঠোঁট। কয়েক বছরে বয়স বেড়েছে, কিন্তু শান-দেওয়া মুখচ্ছবি একটুও ভারী হয়নি।

পালটেছে শুধু একজোড়া প্রত্যঙ্গ।

চোখ।

জ্বলন্ত নয়, কিন্তু প্রদীপ্ত। যেন একজোড়া তুহিনশীতল মশাল— আঁচ নেই কিন্তু ভাষা আছে। প্রখর দ্যুতি বলাই সংগত। কাটারি-নাকের দু'পাশে দুটো ঠান্ডা ঝকঝকে পাথর থেকে যেন সম্মোহন বিকীর্ণ হয়ে চলেছে। প্রায় অলৌকিক এই চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে।

প্রফেসর বললেন স্বাভাবিক গলায়, 'ওপর তলায় আঁধার কেন?'

'আলো যে নিশাচরদের টেনে আনে, তাই।' সোজা জবাব এড়িয়ে গেলেন বীচ, 'হামলা কে চায় বলুন? কিন্তু এমন জায়গায় আপনি এলেন আমার টানে, না, অন্য কিছুর টানে?'

'সংবাদের টানে।' হেঁয়ালি করতে ছাড়লেন না প্রফেসরও: 'খবরের কাগজের লোক কাল সকালে হানা দেবে শুনেই দৌড়ে এলাম। আগে জানা দরকার আমার।'

'কারণ আপনি বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক।'

'আরও একটা কারণ আছে।'

'কী?'

'আমেরিকান সরকার আমাকে ক্ষমতা দিয়েছে বৈজ্ঞানিক মড়কের কারণ খুঁজে বের করতে। দেখতে চান?'

'না। কিন্তু আমি যে মরিনি দেখতেই পাচ্ছেন।'

'তবে মেরেছেন সিলভার সিটির তিরিশ হাজার নিরীহ নাগরিককে।'

সোজা চেয়ে আছেন প্রফেসর শীতল মশাল যুগলের দিকে, চোখের পাতা না-কাঁপিয়ে।

আশ্চর্য চোখ ঘুরিয়ে নিলেন বীচ, 'আমি মেরেছি?'

'মারার কারণ হয়েছেন। খুলে বলুন, খুলে বলুন!'

'আসুন।'

ওঁরা এখন বসে আছেন একটা নাতিদীর্ঘ প্রকোষ্ঠে। এ-ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে তাক-ভরতি শুধু কেতাব। দরজা বন্ধ করেছেন বীচ নিজের হাতে। পাতাল কুঠরিতেও এত হুঁশিয়ার? অবাক হলেও চোখে মুখে তা প্রকাশ করেননি প্রফেসর।

চেয়ারে হেলান দিয়ে, আঙুলে আঙুলের ডগা ঠেকিয়ে হিপনোটিক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন বীচ। চাহনির মধ্যে যেন নিরুত্তাপ দাবানল, থেমে থেমে বললেন, 'ইন্টারভিউটা তা হলে সিলভার সিটি সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ।'

'সিলভার নাইট্রেট ফাটল কেন, এই তো প্রশ্ন?'

'হ্যাঁ।'

'সরি, ব্যাখ্যা দিতে পারব না।'

'কথাটা সত্যি নয়।'

ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন বীচ। দরজার সামনে গেলেন। ডগায় আঁকশি লাগানো একটা লাঠি হাতে নিয়ে সিলিং-এর কাছে গোটানো একটা মস্ত পরদা টেনে নামালেন দরজার সামনে। দরজা পুরোপুরি ঢাকা পড়েছে কিনা দেখে নিলেন। নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, 'মিথ্যে বলব কেন?'

জবাব দিতে গিয়ে প্রফেসর টের পেলেন, তাঁর ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে উঠেছে!

'কারণ, শুধু আপনিই জানেন, অলৌকিক কোনও কাণ্ডর ফটো তুলতে গিয়ে রহস্যজনক বিদারণ ঘটিয়ে ফেলেছেন সিলভার নাইট্রেট সলিউশনের মধ্যে। কারণ, আপনারই হুকুমে একটা নিষিদ্ধ ছবি তোলা হয়েছিল বলে সিলভার সিটি ধুলোয় মিশেছে।'

বলেই, ঈষৎ শক্ত হলেন প্রফেসর। কারণ, কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় নিজেই স্বাক্ষর করে ফেললেন, তা উপলব্ধি করলেন সমগ্র সত্তা দিয়ে।

বিস্মিত হলেন পরক্ষণেই। একথা বলার পরেও বেঁচে রয়েছেন!

নীরবে লক্ষ করে গেলেন বীচ-এর সর্ব অবয়বে মারাত্মক কথাটার বিষম প্রতিক্রিয়া। খিঁচুনিকে অতি কষ্টে আটকে রেখেছেন। মুঠো পাকাচ্ছেন আর খুলছেন। দুই চোখের দাবানল এখন আর প্রশমিত নয়, সধূমিত।

লক্ষ্যভেদ করা গেছে। এবার জোরদার করলেন আক্রমণ, 'শহর নিশ্চিহ্ন করেছে যে বিভীষিকা, পৃথিবীর উনিশজন বৈজ্ঞানিককে সাবাড় করেছে সেই একই বিভীষিকা। সেই সব মৃত্যু রহস্যের তদন্ত করতে গিয়েই এসে গেলাম আপনার কাছে— তদন্তের সুতোর টানে।'

বীচ-এর খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

প্রফেসর অব্যাহত রাখলেন স্বর মৃদঙ্গ, 'জর্সেন-এর বন্ধু আপনি?'

'তা বটে।' বলেই, চঞ্চল দুই মুষ্টির দিকে দৃকপাত করলেন বীচ। একটু ভাবলেন। যেন স্মৃতি-মন্থন করছেন, 'অনেক দিনের বন্ধু। বন্ধুদের মধ্যে বেঁচে আছি আমি একা।'

চোখ তুললেন প্রফেসরের মুখপানে, 'মানছি আমি জানি অনেক। কিন্তু তা থাকুক শুধু আমার কাছে। এই আমার সিদ্ধান্ত। কিছু বলার আছে?'

বিরল ধাতুতে নির্মিত প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কিন্তু টললেন না। অচঞ্চল রইল মুখের প্রতিটি পেশিতন্তু। শুধু একটু ঝুঁকে পড়লেন। দুই হাত রাখলেন দু'হাঁটুর ওপর। বললেন, 'আরউইন ওয়েব একটা মেসেজ লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমরা তা উদ্ধার করেছি। ওঁর আবিষ্কারের অনেকটা জেনে ফেলেছি। উনি লিখে গেছেন, চোখ থাকলেই দেখা যায়। তাদের ছবি দেখাতে হবে দুনিয়ার সবাইকে— গণহত্যা না ঘটিয়ে।'

নিমেষে কর্কশ হয়ে গেলেন বীচ, 'সিলভার সিটি তো গণহত্যাই ঘটিয়ে দিল!'

'তা বটে!' গাল চুলকে নিলেন প্রফেসর, 'আপনি চোখ দিয়ে তাদের দেখবার পর। চোখ, ডক্টর বীচ, আপনার চোখ।'

শুনেও শুনলেন না ডক্টর বীচ। কিন্তু বেশ কিছু আবেগের সঞ্চার ঘটিয়ে ফেললেন দুন্দুভি কণ্ঠে, 'একজন... শুধু একজন দেখেছিল সেই ছবি... এক পলকের জন্যে... মনে মনে ভেবেছিল... কী এগুলো?... সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের গতিতে দাম দিয়ে গেল তিরিশ হাজার মানুষ। প্রাণ তো গেলই, মরেও প্রেতলোকে তাদের ঠাঁই হবে কিনা সে সন্দেহ রয়ে গেল! প্রফেসর, প্রফেসর, এই মুহূর্তে আপনি নিজেও কিন্তু পাঞ্জা কষতে বসে গেছেন অতি ভয়ংকর এক মহাশত্রুর সঙ্গে। জানেন সামান্য... কিন্তু ওই এক কণা জ্ঞানকে মনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছেন... ভাবছেন... আর পলকে পলকে মহামৃত্যুর থাবার মধ্যে চলে যাচ্ছেন... সামান্য ওই জ্ঞান আপনার ব্রেনের কোষে কোষে যতই আলোড়ন তুলবে... তাদের ছোঁ তত অমোঘ হবে— নিস্তার পাবেন না, প্রফেসর... রেহাই পাবেন না... কেউ পায়নি... আপনিও পাবেন না... তাকিয়ে থাকুন দরজা-ঢাকা ওই পরদটার দিকে... মামুলি পরদা ওটা নয়... অনেক ব্রেন খাটিয়ে, অনেক কেমিক্যাল মিশিয়ে, অনেক মন্ত্রগুপ্তির কৌশলে বানিয়েছি ওই ম্যাজিক স্ক্রিন। ফ্লোরেসেন্ট স্ক্রিন। যে মুহূর্তে দেখবেন, স্ক্রিন দপদপ করছে... মরা স্ক্রিন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে অজানা আলো বুকে টেনে নিয়ে— সেই মুহূর্তে জানবেন, খুলে গেল আপনার পরপারের দরজা। এই দুনিয়ার কোনও শক্তিই আপনাকে আর ধরে রাখতে পারবে না।'

হাঁফাচ্ছেন বীচ। উদগ্র উত্তেজনায় নাসারন্ধ্র স্ফীত করে ফেলেছেন। ধক ধক করছে দুই চোখ। ভয়াল চোখ।

পরম প্রশান্ত স্বরে বিলকুল অবিচলিত মুখভাবে জবাবটা দিয়ে গেলেন প্রফেসর, 'আপনার চাইতে আমি কি বেশি বিপদে আছি? আর একটু বেশি জানলে কি আপনার চাইতে বেশি বিপদে থাকব? ডক্টর বীচ, বেশি জেনে বেশিবার মরব না— মরব একবারই!

বলছেন নিস্তরঙ্গ নিরুত্তাপ আবেগহীন গলায়, চোখ সরিয়ে রেখেছেন কিন্তু দরজা জোড়া স্ক্রিনের ওপর থেকে। যদি তা আলোকময় হয়, প্রতিফলন দেখতে পাবেন বীচ-এর চক্ষু-মুকুরে— যিনি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন আজব পরদার দিকে প্রফেসরের বিপরীত দিকের চেয়ারে বসে।

শেষ করলেন প্রফেসর এইভাবে, 'পাঁচ কান না-করেও তো গণহত্যা ঘটে গেল। এখন জানাজানি হলেই বা ক্ষতি কী?'

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বীচ, 'ওটা তো একটা মনগড়া ধারণা— যা ঘটেছে, তার বেশি আর কী ঘটতে পারে? ভুল, ভুল, প্রফেসর। চূড়ান্ত বিপর্যয় আপনার দূরতম কল্পনারও অতীত। গান পাউডারের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত তির আর ধনুকের মতো খারাপ কিছু ছিল না। বিষ গ্যাস আসবার আগে গান পাউডারের চাইতে খারাপ কিছু ছিল না। তারপর এল বোমারু প্লেন। এল সুপারসোনিক মিসাইল। এল অ্যাটম বোমা। এখন এসেছে জিন-পালটানো ব্যাক্টিরিয়া আর ভাইরাস। কালকে আসবে অন্য কিছু।'

এইবার একটু হাসলেন বীচ। বড় জ্বালা ধরানো উপহাসের হাসি, 'চোখের জলে ভাসতে

ভাসতে যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে তখনও ভেবে যাব— আসবে, আসবে, এমন বিপদকেও ঠুঁটো করে দেওয়ার নয়া পন্থা মুঠোয় চলে আসবেই।'

প্রফেসর বললেন কাট কাট গলায়, 'সব ঘটনা জানবার পর তা নিয়ে বিতর্কে বসব।'

হঠাৎ বীচ বললেন থেমে থেমে, 'আমি কিন্তু তাদের জানি! প্রমাণ যা জোগাড় করেছি তার পরে নিতান্ত অবুঝ মনেও অবিশ্বাসের লেশমাত্র থাকতে পারে না।'

'তা হলে তো সেসবই আগে শুনতে হয়!'

'কীসব?'

'সিলভার সিটি নিশ্চিহ্ন হল কেন? করল কে, অথবা কী, অথবা কারা? একের পর এক বৈজ্ঞানিকের গবেষণা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? ন্যাশন্যাল ক্যামেরা কোম্পানির যে ওয়ার্কার নেগেটিভটা প্রথম দেখেছিল, সে আচমকা আজ বিকেলে শেষ হয়ে গেল কেন?'

'স্মিথ! স্মিথ-ও শেষ!' নতমুখে নিঝুম হয়ে গেলেন বীচ।

পরক্ষণেই জ্বলন্ত চোখ তুললেন দরজার পরদার দিকে। চেয়ে রইলেন। ভাবছেন। অনেক সময় নিয়ে ভাবছেন।

অবশেষে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন বীচ। বললেন, 'অন্ধকার ভাল, পরদায় আলো ফুটলেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে। আসুন, আমার পাশে বসুন। পরদার ওপর চোখ রেখে দিন। আলো ফুটছে দেখলেই চিন্তা সরিয়ে নেবেন অন্য ভাবনায়— নইলে খোদ ভগবানও আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।'

চেয়ার উঠিয়ে নিয়ে বীচ-এর চেয়ারের পাশে রাখলেন প্রফেসর। অবশেষে রহস্য তিমির পরিষ্কার হতে চলেছে। সেই মুহূর্তে যদি পরদা আলো দেখাতে শুরু করে, তা হলেই সর্বনাশ।

সর্বনাশ হয়তো গোটা পৃথিবীর। বিরাট ঝুঁকি নিয়েছেন প্রফেসর। বীচ-এর সঙ্গে উনিও যদি এখন পরলোকে প্রস্থান করেন, বসুন্ধরার বিপদ!

আঁধারে বীচ-এর উকো-ঘষা গলা ধ্বনিত হল, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, টেলিস্কোপ আর মাইক্রোসকোপের পর এই প্রথম অনেক দূরপ্রসারী একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উপহার পেল এই পৃথিবী।'

'সেটা কী?'

'বর্ণালীর যে-অংশ চোখে দেখা যায়, তাকে 'ইনফ্রা-রেড-এর অনেক গভীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার প্রণালী।'

'আচ্ছা?'

'আবিষ্কারটা জর্সেন-এর আচমকা। যেমন অতীতে বহুবার ঘটেছে বহুক্ষেত্রে। এক জিনিস বের করতে গিয়ে অন্য জিনিস বেরিয়ে গেছে। টেলিস্কোপ আর মাইক্রোস্কোপের মতো ওঁর এই হঠাৎ-আবিষ্কারও এতাবৎকাল অনাবিষ্কৃত এক নতুন জগতের দ্বারোদঘাটন ঘটিয়ে বসেছে।'

'যা রয়েছে অজ্ঞাত অবস্থায় হাজার হাজার বছর ধরে, তাকে প্রত্যক্ষ করার নতুন এক দৃষ্টিকোণ?' প্রফেসরের প্রশ্ন।

'অক্ষরে অক্ষরে কারেক্ট! নিজের হাতে বানানো টেলিস্কোপের মধ্যে চোখ চালিয়ে থ হয়ে গেছিলেন গ্যালিলিও। হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষের চোখের ওপর যা বিদ্যমান ছিল— কিন্তু চোখের পরদায় ভাসেনি, উনি তা প্রত্যক্ষ করলেন। ধুয়ে উড়ে গেল কোপারনিকাস-এর রাষ্ট্র অনুমোদিত অতি-বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞান তত্ত্ব।'

'হ্যাঁ, সে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার বটে!' সায় দিয়ে গেলেন প্রফেসর।

'মাইক্রোস্কোপ এসে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিল আর এক দফা— আরও বেশিমাত্রায়। কেননা, সৃষ্টির শুরু থেকে যা রয়েছে নাকের ডগায়, অথচ যার অস্তিত্ব ঘুণাক্ষরেও কল্পনায় ঝলক দেয়নি— তাকে তুলে ধরল চোখের সামনে। আর এক দুনিয়া, কোটি কোটি সজীব প্রাণী লুকিয়ে রয়েছে আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিক্ষমতার বাইরে। ঘাপটি মেরে রয়েছে অত্যন্ত ছোট আকারে। ভাবা যায়? সজীব জন্তুর দল থুকথুক করছে আমাদের ঘিরে। যাচ্ছে শরীরের মধ্যে, রক্তের মধ্যে। চলছে তাদের লড়াই, বংশবৃদ্ধি, মৃত্যু। কিন্তু দৃষ্টিসীমার বাইরে অদৃশ্য অবস্থায়। মাইক্রোস্কোপ এসে চোখের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা হল দৃষ্টিগোচর। স্তম্ভিত হল দুনিয়া।'

অন্ধকারেই প্রফেসরের হাত খামচে ধরেছেন বীচ উত্তেজনার আধিক্যে।

প্রবল প্রচেষ্টায় কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে আনলেন বীচ। বলছেন, 'হাজার হাজার বছর ধরে যেমন বহু জিনিস অন্তহীন বিশালতার মধ্যে থেকে, অথবা সূক্ষ্মতম অবস্থায় থেকে আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছিল, ঠিক তেমনি চোখের বাইরে এতকাল রয়ে গেছিল একেবারে রংবিহীন অনেক বস্তু!'

একটু বিরতি দিলেন বীচ। কণ্ঠস্বরকে ফিসফিসানির স্তরে নামিয়ে আনলেন আত্যন্তিক মনোবল প্রয়োগ করে, 'ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের ফ্রিকোয়েন্সি রেডিয়ো ওয়েভ থেকে শুরু করে কসমিক রে পর্যন্ত বিভিন্ন মাপে রয়েছে। মানুষের চোখ দেখতে পায় শুধু আলোর ফ্রিকোয়েন্সি। সেই হল গিয়ে আমাদের দৃষ্টিক্ষমতা। নেহাতই অপর্যাপ্ত এই দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে গিয়ে আমাদের আঁতুড়ে অবস্থা থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যে পরজীবীরা অদৃশ্য অবস্থায় নির্মমভাবে আমাদের নিংড়ে নিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে— তারাই এই পৃথিবীর আদিম প্রভু। আসল অধিপতি। অত্যন্ত শক্তিমান— অতিশয় নৃশংস প্রাণী।'

'প্রাণী?' অপলকে তমিস্রাবৃত পরদার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রফেসর বেশ বুঝলেন, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে তাঁর ললাটে।

তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বাতাসের স্বরে বলে গেলেন বীচ, 'নতুন দৃষ্টি অর্জন করতে হয় এদের দেখতে গেলে। চোখকে তৈরি করে নিতে হয় অলোকসামান্য এই কিম্ভূতকিমাকারদের দর্শন পেতে গেলে।'

ধুয়ো ধরে রইলেন প্রফেসর চাপাগলায়, 'তারা কী প্রাণী?'

'তারা জ্যান্ত আলোর গোলক! তারা ইনটেলিজেন্ট। তারা আদিম পৃথ্বীরাজ। ফিকে নীল রঙের দ্যুতিময় বর্তুলাকার... ভেসে ভেসে বেড়ায় শূন্য পথে... তারা পিশাচপ্রতিম... তারা হৃদয়হীন...।' হাঁপাচ্ছেন বীচ।

খুব আস্তে প্রতিধ্বনি করে গেলেন প্রফেসর, 'জীবন্ত আলোর গ্লোব তারা— এই তো?'

'দেখতে সেই রকম। প্রাণময় করাল এক সত্তা। জর্সেন তাই ওদের নাম দিয়েছিলেন ভাইটন।'

'ভাইটন!'

'জুতসই নাম। ভিটামিন হল গিয়ে খাদ্য-প্রাণ— খাদ্যের প্রাণস্বরূপ। ভাইটন সেক্ষেত্রে— আলোক-প্রাণ, অথবা প্রাণময় আলো।'

'জীবন্ত?'

'আর ধীমান। ভাবতে পারেন? এই ধরণীর প্রকৃত অধীশ্বর তারা— সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকে। আমরা স্রেফ পশুর পাল— তাদের কাছে। মাঠে চরছি, তাদের খাদ্যের জোগান দিয়ে চলেছি। তারা অদৃশ্যলোকের নৃশংসতম সুলতান। আমরা তাদের অস্তিত্ব টের পাই না পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে। তারা কিন্তু আমাদের নজরে রেখে দিতে পারে অনুক্ষণ— যদি মনে করে। আমরা নিছক গোলাম ছাড়া কিছুই নয় তাদের কাছে। জীবনভর গলদঘর্ম হচ্ছি মোটা বুদ্ধি নিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। আমরা খাদ্য, তারা খাদক। অথচ এই কুটিল ব্যবস্থার বিন্দু বিসর্গ আমাদের জ্ঞানের গোচরে নেই।'

প্রশ্ন করলেন প্রফেসর, 'দেখতে পান তাদের?'

'আমি পাই।'

'খুলে বলুন।'

একটু বুঝি বিহ্বল হলেন বীচ, 'তখন অনুযোগ জানাই সৃষ্টিকর্তাকে, হে ভগবান, এদের দেখবার শক্তি কেন দিলে? এরা প্রচ্ছন্ন ছিল দৃষ্টিশক্তির আড়ালে— দর্শনের আওতায় এসে গিয়ে যে দিবানিশির আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ছোট্ট ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে আছড়ে পড়ে বীচ-এর হাহাকার, 'জর্সেন-এর ফাইন্যাল এক্সপেরিমেন্টকে যারা ডুপ্লিকেট করেছে, তারাই দৃষ্টিপ্রাচীর ফুঁড়ে ওদের দেখেছে।'

'ভাইটনদের! দেখেছে?'

'হ্যাঁ। আর এ-পাপের শাস্তি একটাই— নিমেষ-মৃত্যু। প্রত্যেকের ললাটে এই শাস্তির বিধান লিখে দিয়েছে ওই ওরা— ভাইটনরা। প্রাণদণ্ড দিয়েছে চোখের পাতা ফেলবার আগেই।'

বীচ-এর হাতে হাত রেখে প্রফেসর স্পষ্ট টের পেলেন, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে শিউরে উঠছেন বীচ।

'মৃত্যুর ছায়ালোকে পা দিয়েছে প্রত্যেকেই— দিতে হয়েছে। দেখার শাস্তি পলক মধ্যে মাথা পেতে নিতে হয়েছে।'

আবার কথা বাড়াচ্ছেন বীচ। সোজা প্রশ্নে চলে এলেন প্রফেসর, 'জানছে কী করে? ভাইটনরা জানছে কী করে? তারা যে আর অদৃশ্য নয়, বুঝছে কী করে?'

'মানুষের মনের পাতা ওদের কাছে খোলা বলে।'

'মনের কথা টের পায়?'

'প্রতিটি ভাবনা প্রতিটি চিন্তা টের পায়।'

'টেলিপ্যাথি?'

'তার চাইতেও শক্তিশালী। চিন্তায় যে তরঙ্গ উঠবে, সেই তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ওরা ধরে ফেলবে— একটা বাঁধা-ধরা দূরত্ব থেকে।'

'অনেক দূর থেকে নয়?' প্রফেসরের গলা কেঁপে উঠল এই প্রথম।

'না। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে যদি ওরা থাকে, ওদের নিয়ে তখন যদি ভাবা হয়, সঙ্গে সঙ্গে টের পাবে। মেরেও ফেলবে তক্ষুনি। ধ্যান ধারণার বাইরে থেকেছে চিরকাল, থাকতেও চায় চিরকাল। চোখের আড়ালে থেকে অথচ খুব কাছে থেকে ওরা শুধু ওদের প্রয়োজন মিটিয়ে যাবে রক্তমাংসের প্রাণীদের মধ্যে থেকে। মানুষ ওদের কাছে প্রিয় পোষা জন্তু— কারণ আমরা যে ইনটেলিজেন্ট, আমরা যে ইমোশন্যাল। অথচ আমরা কীটাণুকীট তাদের কাছে। আমরা যে তাদের জেনে ফেলেছি, তা পাঁচকান করার আগেই নিভিয়ে দেয় আমাদের প্রাণবহ্নি— সজাগ হতে দেয় না পাঁচজনকে। বুঝলেন?'

'বুঝলাম। এইভাবেই হাজার হাজার বছর ধরে ওদের প্রভুত্ব কায়েম করে রেখেছে আমাদের ওপর? মানুষ জাতটার ওপর?'

'হ্যাঁ প্রফেসর। পশুজগতকে আমরা যেমন নির্দয় পন্থায় কবজায় রেখেছি, বেয়াড়াপনা করলেই গুলি চালিয়ে খতম করে দিই— ওরাও তেমনি নিঃশব্দে—'

'জর্সেন-এর এক্সপেরিমেন্ট কপি করতে গিয়ে এই হাল হয়েছে বৈজ্ঞানিকদের?'

'অষ্টপ্রহর ভেবেছিল যে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল। টহলদার ভাইটনরা টের পেয়েছিল। ওদের খপ্পর থেকে ঘুমিয়েও নিষ্কৃতি নেই। মনের মধ্যে যদি ভাবনা লুকিয়ে রাখবার ক্ষমতা না থাকে— ওরা তা জানবেই। মন-পাঠক ভাইটনরা পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেয় না, শত্রুকে তৈরি হওয়ার সুযোগ দেয় না।'

বিষম উত্তেজনায় দম ফুরিয়ে এসেছিল বীচ-এর। একটু থেমে রইলেন। তারপর প্রায়-করুণ কণ্ঠে বললেন, 'প্রফেসর, একই হাল আমাদেরও— মুখবন্ধ করে দেওয়া হবে চিরকালের মতো।'

আবার থামলেন বীচ। তারপর, 'প্রফেসর, জানাতে চাইনি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। জেনে যখন ফেলেছেন, আপনার মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে গেছে। চিন্তাকে কতক্ষণ কন্ট্রোল করে রাখবেন? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তো তা করা যায় না। অবচেতন মন থেকে চেতন মনে চিন্তা ডালপালা মেলে ধরবেই— ওরা তখুনি জানতে পারবে। ঘুম আর ভাঙবে না।'

'হার্টফেল করবে, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক এইরকমই ভেবেছিলাম আমি।'

'আপনি? ভেবেছিলেন?' বীচ যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'তদন্ত হাতে নেওয়ার পর থেকে অদ্ভুত অলৌকিক অনুভূতি আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা জাগিয়ে যাচ্ছে। তখন থেকেই বুঝেছি, চিন্তাকে অন্যত্র সরিয়ে রাখা ভীষণ দরকার। বহুবার কড়া ধাক্কা খেয়েছি মনের মধ্যে— চিন্তার ঝুঁটি ধরে যেন না-থাকি।'

'আশ্চর্য! মনের এই খবরদারির জন্যেই কিন্তু এখনও টিকে আছেন! প্রফেসর, আপনি সত্যিই জিনিয়াস।'

'গুড! তা হলে মানছেন জর্সেন, লুথার, মেয়ো, ওয়েব-এর চেয়ে আমার মেন্টাল কন্ট্রোল বেশি?'

'এখনও তা বলা যাচ্ছে না, প্রফেসর।' 'অমায়িক হবার চেষ্টা করলেন বীচ, 'আপনি সামান্য আঁচ করে মন নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ওঁরা যে হাঁড়ির খবর জেনে ফেলেছিলেন। লোমহর্ষক খবর! মননিয়ন্ত্রণ কি সম্ভব? আপনিই দেখুন না। এরপর মাইন্ড কন্ট্রোল করতে পারেন কিনা।'

মনে মনে হাসলেন প্রফেসর।

বীচ নিজেই ফের বলে বসলেন, 'তাই যদি হয় প্রফেসর, তা হলে নিশ্চয় আপনার এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন আছে?'

অন্ধকারে হেসে ফেললেন প্রফেসর, 'তা আছে।'

'ইউনিক!' বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বীচ, 'এই ইউনিক ফ্যাকাল্টি যখন আপনার আছে, তা হলে শুনুন।'

বলেই, জ্বাললেন ঘরের আলো। ফাইলিং ক্যাবিনেটের ড্রয়ার টেনে ভেতর থেকে বের করলেন রাশি রাশি ক্লিপ-আঁটা কাগজ। চোখ বুলোতে বুলোতে বলে গেলেন, 'কিছু রেকর্ড শুনুন। দেড়শো বছর আগেকার ঘটনাও জোগাড় করে রেখেছি। মিচেল লেফেভার ছিলেন ফ্রান্সের মেয়ে। ফরাসি বৈজ্ঞানিকরা কোমর বেঁধে তাঁর ই-এস-পি ক্ষমতা যাচাই করেন। তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টিক্ষমতার শতকরা ষাট ভাগ ছিল অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি বোধ। জুয়ান ইগুইরোলার ছিল পঁচাত্তর পার্সেন্ট। উইলি ওসিপেঙ্কোর ছিল নব্বই পার্সেন্ট। এই দেখুন ব্রিটিশ 'টিটস বিটস' পত্রিকার কাটিং— তারিখ : ১৯ মার্চ, ১৯৩৮। ল্যাটভিয়ান রাখাল-কন্যা ইলগা কির্পস অল্প বয়স থেকে ই-এস-পি পাওয়ার দেখিয়ে বৈজ্ঞানিকদের তাক লাগিয়ে দেয়। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা একটা কমিটি গড়ে নিয়ে তাকে নানাভাবে যাচাই করেন। একবাক্যে বলেন, ই-এস-পি'র আশ্চর্য ক্ষমতা তাকে দিয়েছে অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি।'

'আমার চাইতেও বেশি?' প্রফেসরের মৃদু মন্তব্য।

আলো নিভিয়ে দিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন বীচ, 'এ-ক্ষমতা সবার একরকম থাকে না। কারও কম, কারও বেশি। ইলগা কির্পস ছিল ভাইটন দো-আঁশলা।'

'ভাইটন দো-আঁশলা!' বাস্তবিকই চমকে উঠলেন প্রফেসর।

'আজ্ঞে। এক্সট্রা-সেনসরি পারসেপশন যে ভাইটনদের পয়লা নম্বর বৈশিষ্ট্য।'

এবার কিন্তু রোমাঞ্চ দেখা দেয় প্রফেসরের শ্রীঅঙ্গে। যার জন্যে তিনি গোপনে গঠিত, সেই ক্ষমতা রয়েছে কালান্তক ভাইটনদের! প্রায় আঁতকে উঠে বলেছিলেন, 'সেকী!'

'আজ্ঞে!' বীচ বিলক্ষণ মোলায়েম, 'ভাইটনদের মারাত্মক ফ্যাকাল্টি এই এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন। ভাইটন মহাপ্রভুরা বিস্তর এক্সপেরিমেন্ট করেছিল নিশ্চয়— সফল হয়েছিল ইলগা কির্পস-কে সৃষ্টি করে। অপারেশন আপনার ক্ষেত্রে ফেল করেছে প্রফেসর। আপনাকে তাই কবজায় আনতে পারেনি।'

'অপারেশন! হল কখন? আমি তো জানি না!'

'এ-অপারেশন হয় মাতৃগর্ভে। তাই এই ক্ষমতাকে লোকে বলে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা।'

বিস্ফারিত হল প্রফেসরের দুই চক্ষু। কিন্তু অন্ধকারেও তা দেখতে পেলেন বীচ।

একটা মস্ত নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। প্রফেসর পাঁজর খালি করলেন।

শুকনো গলায় বীচ বললেন, 'মন খারাপ করবেন না। আমরা মানুষরা এক্সপেরিমেন্ট করছি না ইতর প্রাণীদের নিয়ে? বল নাচাতে শেখাচ্ছি সিলদের, বকবকানি শেখাচ্ছি কাকাতুয়াদের, সিগারেট খেতে শেখাচ্ছি বাঁদরদের, হাতিদের শেখাচ্ছি উদ্ভট খেলা, এমনকী কথা-কইয়ে কুকুর সৃষ্টির চেষ্টাও তো চলছে সম্প্রতি।'

ঢোক গিলে বললেন প্রফেসর, 'তা বটে! আমরা ইতর প্রাণী-ই বটে!'

'প্রফেসর, এমনি হাজার হাজার খবর জোগাড় করে রেখে দিয়েছি ওই ফাইলিং ক্যাবিনেটে। রহস্যজনক অমানবিক ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে মানুষ, অস্বাভাবিক আর অপ্রাকৃত গঠনবিকৃতি নিয়ে জন্মাচ্ছে মানুষ। ড্যানিয়েল ডগলাস হোম-এর কথা নিশ্চয় শুনেছেন। বিশ্বাসভাজন সাক্ষীদের ছানাবড়া চোখের সামনে যে ভাসতে ভাসতে নেমে এসেছিল দোতলার জানলা গলে। লেভিটেশন গালগল্প নয়। শূন্যে ভাসমান হওয়ার ক্ষমতা বুজরুকি নয়। ড্যানিয়েল তার সজীব প্রমাণ। শূন্যে ভেসে থেকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার এই ক্ষমতা কাদের আছে জানেন? ভাইটনদের!'

আমতা আমতা করে প্রফেসর বললেন, 'কিন্তু ড্যানিয়েল হোম তো ছিল ম্যাজিশিয়ান!'

'আজ্ঞে না। সে ছিল ভাইটন মানব!'

'মাই গড!'

শুনে, ছোট্ট একটা টিটকিরি ছাড়লেন বীচ, 'আপনার ক্ষেত্রে ভাইটনরা শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ে ফেলেছে। আপনি হয়ে গেলেন ভাইটন-বিদ্বেষী!'

মনে মনে বীচ-এর মুণ্ডপাত করলেন প্রফেসর। ভাবলেন, 'দীননাথ ছোকরা যদি এখন থাকত, বীচ-এর জিভ ছিঁড়ে নিত! মুখে বললেন, 'নিকুচি করেছে ভাইটন এক্সপেরিমেন্টের! আমি ওদের শেষ করব, তবে ছাড়ব! আমার নাম—'

'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র!' কথাটা লুফে নিয়ে শেষ করলেন বীচ। বললেন তারপরেই: 'এইরকম মনের জোরই এখন দরকার। এই পৃথিবীকে বহুবার আপনি বহু বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন— এবার বাঁচাতে হবে যৌথ প্রচেষ্টায়।'

'দেখা যাক।' প্রফেসর তখনও একটু গরম, 'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

'রাগছেন কেন? মনের মতো মানুষ পেয়েছি, তাই মন খুলে কথা বলছি।'

'বলুন, বলুন, বলে যান।'

'ক্যাসপার হসার-এর কেস মনে পড়ে? শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিল সেই মানুষটা। ভ্যাকুম কিছু সৃষ্টি করতে পারে কি? পারে না। আমার বিশ্বাস তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল ভাইটন ল্যাবরেটরিতে।'

'ফাইন! তারপর?'

'লন্ডন ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডে ১৯৩৮ সালের ১৬ মে একটা খবর বেরিয়েছিল, একই খবর

বেরিয়েছিল দিন কয়েক পরে ব্রিটিশ ডেলি টেলিগ্রাফে। ভ্যানিশ হয়ে গেছে অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান জাহাজ— আটত্রিশ জন নাবিক সমেত। তার একটু আগেই রেডিয়ো খবর পাঠিয়ে জানিয়েছিল, সব ঠিক আছে। অথচ কিছুই ঠিক রইল না, তার পরেই মিলিয়ে গেল বাতাসে। আশ্চর্য নয় কি?

'খুবই।' তাল ঠুকে গেলেন প্রফেসর, 'কেউই আর ফিরছে না। এই তো?'

'ফিরছে যারা, তারা হয় বদ্ধ উন্মাদ হয়ে পাগলা গারদে থাকছে, নয়তো ভ্যাম্পায়ার হয়ে সমাজে উৎপাত করছে।'

ধরিয়ে দিলেন প্রফেসর, 'তা হলে তো বলতে হয়, আকাশে ওড়ার প্রথমদিকে অনেক পাইলট এরোপ্লেন সুদ্ধ অদৃশ্য হয়েছে এই একই কারণে।'

'নিশ্চয়। হাজার হাজার বছর ধরে চলছে এই কাণ্ড।'

'বুঝলাম। কিন্তু এখনও পুরো পেট আলগা করেননি ডক্টর বীচ। হাতে রসদ দিন— দেখি কী করতে পারি।'

ডক্টর বীচ জবাব না-দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন অন্ধকারে। তা প্রায় একটা মিনিট। তারপর উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার সরিয়ে। বললেন, 'আসুন।'

জ্বলে উঠল ঘরের বাতি। পরদা-ঝোলানো দরজার পাশে একটা দরজা খুলে এ-ঘরের আলো নিভিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে সে-ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে পেছনের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ওঁরা এখন দাঁড়িয়ে আছেন সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি ঘরে। দেওয়ালের একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা দেখিয়ে বীচ বললেন, 'ও ঘরের পরদা যদি জ্বলে ওঠে, ফটো সেনসিটিভ সেল কাজ শুরু করবে। এই ঘণ্টা তখন বেজে উঠবে। ঘণ্টা বাজলেই চিন্তা অন্যদিকে সরিয়ে দেবেন— মৃত্যুর সঙ্গে মহড়া দেওয়ার জন্যে তৈরি হবেন।'

'হব। এখন কী করব?'

একটা শিশি টেবিল থেকে তুলে নিলেন বীচ, 'এর মধ্যে যে আরকটা দেখছেন, এর একটা করে ফোঁটা আপনার দু'চোখে দেব।'

'আরকটা কী?'

'জর্সেন-এর হঠাৎ-আবিষ্কার। কেমিক্যাল পাঁচন বলতে পারেন। প্রত্যেকটা কেমিক্যালের কাজ আলাদা, কিন্তু যখন মিশে যায়, তখন মির‍্যাকল দেখায়।'

'কী মির‍্যাকল?'

'আপনার চোখের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে। একটু জ্বলবে আপনার চোখ— মিনিট খানেক। তারপরেই খুলে যাবে—'

'তৃতীয় নয়ন। দিন। চোখ পাতলাম।'

ড্রপারে আরক তুলে নিয়ে প্রফেসরের দু'চোখে ফোঁটা ফোঁটা দিয়েই ভারী গলায় বীচ বললেন, 'এবার শুনে নিন ঝটপট— বলবার সময় হয়তো আর পাব না।'

অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছিল তাঁর কথা!

আয়নায় নিজের চোখ দেখে থ হয়ে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। দুই চোখে যেন দুই ব্রহ্মাণ্ড। অসংখ্য নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। আশ্চর্য এক শান্তির সঞ্চরণ উপলব্ধি করছেন মগজের মধ্যে। আশ্চর্য দৃষ্টির দৌলতে এই শক্তি সূক্ষ্মতম শুঁড় মেলে ধরছে কোষে কোষে।

বললেন জলদ গম্ভীর স্বরে, 'ডক্টর বীচ, আমার স্যাঙাতকে টেলিফোন করার সময় এখন হয়েছে। দিন আপনার ফোন।'

পকেট-ফোন ইচ্ছে করেই আনেননি প্রফেসর। দীননাথ যেন তাঁর নাগাল ধরতে না-পারে। কিন্তু এবার তিনি দীননাথের নাগাল ধরবেন--- তার পকেট-ফোন নাম্বার উনি জানেন।

ফোন এগিয়ে দিলেন বীচ। বললেন মন্দ্র-মন্থর স্বরে, সব তো শুনলেন। এবার শুরু হোক লড়াইয়ের উদ্যোগ-পর্ব। আপনি একদিকে, আমি আর একদিকে।'

'হ্যাঁ। দু'জনকে একসঙ্গে নিকেশ করা আর যাবে না।'

দীননাথের সঙ্গে কথা শুরু করলেন প্রফেসর।

রাত্রি নিশীথে একটা সিলিন্ডার নিঃশব্দে উড়ে এসে নামল হানাবাড়ির মতো বাড়িটার সামনে। ইস্পাত দরজা খুলে অন্ধকারে গা মিলিয়ে বেরিয়ে এসে সিলিন্ডারের গায়ের ছোট্ট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন প্রফেসর। সিলিন্ডার উড়ে গেল পুবদিকে।

তার একটু পরে উড়ে এসে একইভাবে তুলে নিয়ে গেল ডক্টর বীচকে--- এবার পশ্চিম দিকে।

দুটো সিলিন্ডারেই বসানো আছে গ্র্যাভিটন ইঞ্জিন— যার কাজ মাধ্যাকর্ষণকে নস্যাৎ করে দেওয়া। এ-ইঞ্জিন গর্জায় না। নিঃশব্দে গ্র্যাভিটিকে জিরো করে দেয়। ফ্লাইং সসার আর কল্পবিজ্ঞান নয়।

তবে, গ্র্যাভিটন ইঞ্জিন দখলে রেখেছে শুধু আমেরিকার সামরিক বিভাগ। কারণ আবিষ্কারটা তাদেরই।

বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন প্রফেসর। গোটা বিশ্বকে সতর্ক করতে যাচ্ছেন রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে। স্যাটেলাইট মাধ্যমে আমন্ত্রণ চলে গেছে দেশে দেশে। বেশি কথা না। সেই দেশের সর্বসেরা বৈজ্ঞানিক যেন তৈরি থাকেন অমুক অমুক বায়ুবন্দরে। গ্র্যাভিটন সিলিন্ডার এসে তাঁদের আকাশপথে নিয়ে যাবে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে।

সম্মেলনের বিষয়বস্তু কিন্তু জানানো হল না। কিন্তু মানুষের মন আকাশ পাতাল চিন্তা না করে পারে না। প্রতিটি বৈজ্ঞানিকের মগজে কিলবিল করে উঠল একটাই কৌতূহল— সম্মেলনটা সিলভার সিটি সম্পর্কিত নয় তো?

বড় ঝুঁকি নিয়েছেন প্রফেসর। কিন্তু তিনি কাছাখোলা নন। আটঘাট বেঁধেই কাজে নামছেন।

ভাইটনরা আঁচ করবেই। চিন্তা-মশগুল বৈজ্ঞানিকদের ধাওয়া করে তারা আসবেই।

হয়তো তারা এসেছিল।

কিন্তু অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল বিশাল সম্মেলন কক্ষে। দেড়শো বৈজ্ঞানিক যখন

ওয়াশিংটনের মস্ত হলঘরে জড়ো হয়েছেন উদগ্রীব অবস্থায়, ঠিক তখন ঘর জুড়ে একটা আলোর ঝলকানি দেখা গেল।

ঝলক মিলিয়ে গেল। ঘরও শূন্য হয়ে গেল। বিলকুল ফাঁকা।

শূন্যে বিলীন হয়ে গেছেন দেড়শো বৈজ্ঞানিক। চেয়ার সুদ্ধ!

ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট একটা বিরাট রহস্য হয়ে ছিল এতকাল সাধারণের কাছে! একটা গোটা জাহাজকে মাঝিমাল্লা সমেত অদৃশ্য করে দিয়ে ফিলাডেলফিয়া থেকে তুলে এনে দৃশ্যমান করা হয়েছিল অন্য এক বন্দরে। এতদিন গোপন করে রাখা হয়েছিল সেই এক্সপেরিমেন্টের বৃত্তান্ত--- কারণ তা ছিল আমেরিকার অতি-গোপন সমরায়োজন।

ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের ম্যাজিক।

দেড়শো বৈজ্ঞানিকের মাথা ঘুরে গেছিল ক্ষণেকের জন্যে। পরক্ষণেই দেখলেন, তাঁরা সারবন্দি বসে আছেন অন্য এক প্রশস্ত ঘরে। সামনের উচ্চ মঞ্চে বসে আছেন তিনজন পুরুষ।

মাঝখানে যিনি, তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু আশ্চর্য রকমের প্রদীপ্ত চক্ষু। দু'পাশে ষণ্ডামার্কা দুই পুরুষ। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, দীননাথ আর স্যাঙ্গস্টার।

কিন্তু দীননাথ আর স্যাঙ্গস্টার কিম্ভূত ওই হেলমেট দুটো মাথায় লাগিয়ে আছে কেন?

গমগম করে উঠল প্রফেসরের কণ্ঠস্বর।

হেলমেট রহস্য প্রাঞ্জল করলেন যথাসময়ে।

'আপনারা স্তম্ভিত হয়েছেন। ছিলেন ওয়াশিংটনের কনফারেন্স রুমে। হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল। এখন দেখছেন, অন্য ঘর।

'এটা ভৌতিক ব্যাপার নয়। সায়েন্সের মিরাকল। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের স্পেকট্রাম আপনাদের অজানা নয়। শুরু রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি থেকে--- তারপর ইনফ্রা রেড রেডিয়েশন, দর্শনযোগ্য আলো, আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন, এক্স-রে, গামা রে, সবার ওপরে কসমিক রে!

'অনেক বছর আগে ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল রকমারি রেডিয়েশনের মধ্যে কারচুপি ঘটিয়ে। সিক্রেট রাখা হয়েছিল প্রয়োজনে প্রয়োগ করার জন্যে।

'প্রয়োগ ঘটেছে এইমাত্র। আপনাদের ওয়াশিংটন থেকে এনে ফেলা হয়েছে এইখানে। আপনারা এখন মাটির ওপরে নেই। রয়েছেন মাটির তলায়--- দুশো ফুট নীচে।'

চমকে উঠলেন দেড়শো বৈজ্ঞানিক। যেন দেড়শো ভোমরা গুনগুনিয়ে উঠল একসঙ্গে। দেড়শোজনের চমক-গুঞ্জন বিলক্ষণ কোলাহল বই কী। হাত তুলে তা স্তব্ধ করলেন প্রফেসর।

বলে গেলেন ভারী গলায়, 'এই সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। কেন, তাও বলছি। এই মুহূর্তে আপনারা রয়েছেন কোথায়, তা আমরা এই ক'জন ছাড়া কেউ জানে না। দৈবাৎ যদি কেউ জেনে ফেলে, সেই তারা... আবার বলছি.. সেই তারা এই পাতাল ঘরে আসতে পারবে না। যদিও বা আসে, ওই যে রুপোলি পরদাগুলো দেখছেন দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলছে,

ওগুলো দপদপ করে জ্বলে উঠবে। তারা যে এসেছে, তার প্রমাণ হবে ওই কেমিক্যাল পরদায়।

'অনুগ্রহ করে বিস্ময়ধ্বনি গলার মধ্যে চেপে রাখুন। কথা বলতে দিন। যাদের কথা আমি বলছি, তাদের দেখা যায় না। তাদের দেখতে গেলে চাই আমার মতো এই চোখ— যে-চোখ দেখে আপনারা অবাক হয়েছেন প্রথম থেকেই। এই চোখকে অসাধারণ চোখ বানানো হয়েছে রসায়নের শক্তি দিয়ে,— ফলে অদৃশ্য মারণ-দূতদের দেখতে পাব শুধু আমি।

'আপনারা সাবধান হবেন তৎক্ষণাৎ। এখন যা শুনবেন, তা আর ভাববেন না— চিন্তাকে নিয়ে যাবেন অন্যত্র। নইলে মরবেন হার্ট অ্যাটাকে। কারণ, ওই ওরা, অদৃশ্য বিভীষিকারা মনের কথা পড়তে পারে।

'এবার আপনাদের আর-একটা কৌতূহল মিটিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সবাই বারে বারে তাকাচ্ছেন আমার দু'পাশের দুই সঙ্গীর মাথার অদ্ভুত শিরস্ত্রাণের দিকে। এ হেলমেট সাধারণ হেলমেট নয়। টেলিপ্যাথি-তরঙ্গ আটকানোর হেলমেট। আমার আবিষ্কার। আমার নাম নাটবল্টু চক্র— প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

'দয়া করে গুঞ্জন থামান। উত্তেজিত হবেন না— আবেগশূন্য থাকার চেষ্টা করুন। মাইন্ড কন্ট্রোল করুন। আমি তা করতে পারি বলেই ওই শিরস্ত্রাণ পরিনি। আমার দুই সঙ্গী এ ব্যাপারে অপারগ। তাই ওঁদের সুরক্ষা-কবচ ওই হেলমেট। ওঁদের মগজের চিন্তার ঢেউ বাইরে যাচ্ছে না— ফলে, অদৃশ্য বিভীষিকারা ওঁদের চিন্তার খবর জানতে পারবে না। তাই ওঁরা নিরাপদ।

'আপনাদের মনের কথা বুঝলাম। আপনারাও চান এই সুরক্ষা-কবচ। পাবেন। এখান থেকে বেরোনোর আগে প্রত্যেকেই একটা করে শিরস্ত্রাণ উপহার পাবেন। কারণ, আপনাদের ওপব নির্ভর করছে এই পৃথিবীর মানব জাতির অস্তিত্ব।

'জেন্টেলমেন, সুইডিশ সায়েন্টিস্ট পিডার জর্সেন মাসছয়েক আগে আচমকা একটা আবিষ্কার করে ফেলেন। দৃষ্টি ক্ষমতা বাড়িয়ে ফেলার আবিষ্কার। আয়োডিন, মেথিলিন ব্লু আর মেসক্যাল— এই তিনটে দ্রব্য বিশেষ অনুপাতে মিশ খেলে কার্যকারিতা অলৌকিক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয়— আলাদাভাবে এই তিনটে দ্রব্যের কোনওটাই সেই কাণ্ড ঘটাতে পারে না। চোখের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। স্বাভাবিক চোখে যা অদৃশ্য, তা দৃষ্টিগোচর হয়। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের অনেক ফ্রিকোয়েন্সি দেখতে পায়— স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যা দৃশ্যমান নয়।'

শ্রোতাদের একজন হাত তুললেন।

প্রফেসর বললেন, 'কিছু বলবেন?'

'স্পেকট্রামের দৌড় কতদূর পর্যন্ত?' প্রশ্ন রাখলেন সেই বৈজ্ঞানিক।

'দৃষ্টি প্রসারিত হয় শুধু একদিকে— ইনফ্রারেড-এর গভীরে। জর্সেন বলেছেন, আলট্রা-হাই রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত চোখ দিয়ে দেখা যায়।'

'সে কী! হিট রেডিয়েশন-ও দেখা যায়?'

'হ্যাঁ, যায়। তারও ওপারে চোখ চলে যায়।'

আবার গুঞ্জন-মুখরিত হল হলঘর। বিস্ময় ফেটে পড়ছে দেড়শো জনের কণ্ঠে। হাত তুলে তা থামালেন প্রফেসর।

ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'আশ্চর্য আরকের গুণ আপনাদের তাজ্জব করেছে। কিন্তু আরক-কাহিনি শোনানোর জন্যে আপনাদের এনে এখানে ফেলা হয়নি। কীভাবে এই আরক চক্ষু-ক্ষমতা বাড়ায় তা বলবার জন্যেও আমি ব্যগ্র নই। আমি শুধু বলতে চাই, অদ্ভুত এই ক্ষমতা দৃষ্টির গোচরে এনেছে এমন এক ভয়ানক আতঙ্ককে, যা সংহার করে দিতে পারে সমস্ত মানব কুলকে চক্ষের নিমেষে।'

একটু থামলেন প্রফেসর। বললেন তারপর, 'তারা মানুষের চেয়ে উন্নত জীব। তারাই এই পৃথিবীর প্রকৃত অধীশ্বর।'

দেড়শো বৈজ্ঞানিক সিধে হয়ে বসলেন যে যার চেয়ারে। সারি সারি উৎকণ্ঠিত মুখে প্রকটিত হল ভয়ানক ভয়।

দেড়শো মুখের চেহারা দেখে নিয়ে বললেন প্রফেসর, 'যা বললাম, তা ঘটনা। তার প্রমাণ আছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি এই জীবদের। তাদের সারা গায়ে ফিকে নীল রঙের দ্যুতি, ভেসে যায় আকাশ দিয়ে। ডক্টর বীচ-এর ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে তাদের দু'জনকে আমি দেখেছি সাঁ করে আমার সিলিন্ডার প্লেনের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। ওয়াশিংটনে পৌঁছে দেখেছিলাম, ডজনখানেক ফিকে নীল জীব জড়ো হয়ে গেছে। হয়তো তারা এই মুহূর্তে পিলপিল করছে সেখানে— দেড়শো বৈজ্ঞানিক একে একে পৌঁছোনোর পর। মানুষের ভিড় যেখানে বেশি, সেখানেই তারা জড়ো হয় দলে দলে। কারণটা শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে। তাদের সঙ্গে ডবল চালাকি খেলেছি আমি। দেড়শো ব্রেনকে তারা এক জায়গায় জড়ো হতে দিয়েছে মহাউল্লাসে। আর আমি দেড়শো ব্রেন এক জায়গায় জড়ো করেছি নিমেষে সেখান থেকে তুলে এনে এখানে ফেলব বলে। এই ঠিকানা এখনও পর্যন্ত তাদের কাছে অজ্ঞাত। কেউ কিছু বলবেন?'

'তারা কী?' একটাই প্রশ্ন ধ্বনিত হল মস্ত ঘরে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির লহরী ফিরে ফিরে এল চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে। একেবারে সাউন্ড-প্রুফ ঘর।

প্রফেসর বললেন, 'কেউ তা জানে না। তাদের চুলচেরা পর্যবেক্ষণের পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি। জর্সেন অনুমান করেছিলেন, তারা সদ্য এসেছে। কিন্তু নিছক এই অনুমান তথ্যের ওপর খাড়া করার সময় পাননি। প্রয়াত প্রফেসর মেয়ো বলেছিলেন, এদের আবির্ভাব অন্য গ্রহ থেকে, পৃথিবীতে হানা দিয়েছে, পৃথিবীকে কুক্ষিগত করেছে হাজার হাজার বছর আগে। ডক্টর বীচ কিন্তু উলটো ধারণা পোষণ করেন। তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস, এরা এই পৃথিবীরই জীব— জীবাণুদের মতো। প্রয়াত হ্যান্স লুথার আর এক ধাপ এগিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষের শরীর একটা আশ্চর্য যন্ত্র হতে পারে,— কিন্তু এই দেহযন্ত্রের ক্ষমতার দৌড় বেশিদূর যায় না। আমরা যে-জানোয়ারের বংশধর, তাদের আমদানি করা হয়েছে কসমিক পশু-জাহাজে চাপিয়ে অন্য নক্ষত্রলোক থেকে।'

'পশু! জানোয়ার! আমরা তাদের বংশধর!' নানান রকম মন্তব্য অজস্র পটকার মতো

দুমদাম ফেটে পড়ল ঘরময়।

গলা চড়িয়ে শুধোলেন এক বৈজ্ঞানিক, 'আশ্চর্য ভয়ংকর এই জীবদের সম্বন্ধে জানা গেছে কতটা?'

'খুব সামান্য, মানুষের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য নেই কোথাও। তারা এতই ভিনগ্রহী যে মানুষের সঙ্গে তাদের মিল বের করাটা অতীব দুষ্কর বলে আমি মনে করি। তাই তাদের পুরোপুরি বোঝা যাবে না কস্মিনকালেও। পুঞ্জীভূত রহস্য হয়েই তারা থেকে যাবে— কতদিন, বলা যাচ্ছে না। তাদের দেখতে আলোকময় গোলকের মতো। ব্যাস ফুট তিনেক। বাইরেটা চনমনে সজীব, দ্যুতিময়, নীল, কিন্তু চোখে পড়ার মতো কোনও প্রত্যঙ্গ নজরে আসে না। মামুলি ইনফ্রা-রেড ফিল্মে তাদের ছবি ধরা পড়ে না। কিন্তু বীচ তাদের রেকর্ড করে ফেলেছেন নতুন এই ফটো ইমালশনের দৌলতে। রাডার দিয়ে তাদের অবস্থান জানা যায় না। কারণ নিশ্চয় রাডার স্পন্দন তারা শুষে নেয়— ঠিকরে দেয় না। বীচ জানিয়েছেন, রাডার অ্যান্টেনার ধারেকাছে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে জড়ো হয়— যেমন তেষ্টা পেলে ঝরনা ঘিরে বসে যায় বাচ্চাকাচ্চা। বীচ-এর বিশ্বাস, তারাই প্রেরণা জুগিয়ে মানুষকে দিয়ে রাডার বানিয়েছে। আমাদের ঘাম ঝরিয়ে নিজেদের দুর্বোধ আনন্দ আহরণের ব্যবস্থা করে নিয়েছে।'

শ্রোতাদের মধ্যে এখন পিনড্রপ সাইলেন্স বিরাজ করছে। ঘাম ছুটে যাওয়ার মতো মুখের অবস্থা প্রত্যেকের।

প্রফেসর বলে চলেছেন, 'ভৌতিক এই গোলকগুলোর চোখের বদলে আছে এক্সট্রা সেন্সরি পারসেপশন— অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি বোধ। আশ্চর্য এই ফ্যাকাল্টি এদের মধ্যে রয়েছে এমন বেশি মাত্রায় যে ভাবা যায় না। এই কারণেই ওরা মুহূর্তে মুহূর্তে বুঝে ফেলতে পারে আমাদের। আমাদের নাড়ি ধরে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা ওদের ছায়াও দেখতে পাই না— মনের খবর রাখা তো দূরের কথা। কেন? কারণ, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফ্রিকোয়েন্সির আওতায় আসে না। টেলিপ্যাথি-হেলমেট বানাতে গিয়ে তা জেনেছি।'

'ওদের আছে টেলিপ্যাথি?' জনৈক বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল।

'অবশ্যই আছে। ওদের স্বরযন্ত্র নেই, শ্রবণযন্ত্র নেই— কিন্তু টেলিপ্যাথির ক্ষমতা আছে বিপুল মাত্রায়। কান আর গলার জায়গায় কাজ করে এই টেলিপ্যাথি। মানুষের চিন্তা ভাবনা ওরা ধরতে পারে শর্ট রেঞ্জে— লঙ রেঞ্জে নয়। বীচ এদের নাম দিয়েছেন ভাইটন। এরা মাংস দিয়ে গড়া নয়— এনার্জি দিয়ে গড়া। ওরা জানোয়ার নয়, খনিজ নয়, উদ্ভিদ নয়—এনার্জি।'

'অ্যাবসার্ড!' ফোঁস করে উঠলেন এক বৈজ্ঞানিক, 'নিছক এনার্জি কখনও এরকম ঠাসবুনুনির ভারসাম্যময় আকার গড়তে পারে না।' এদিক-সেদিক চাইলেন সমর্থনের প্রত্যাশায়। কিন্তু কেউ এগিয়ে এলেন না। তখন বললেন নেতিয়ে পড়া গলায়, 'হার মানলাম। বিজ্ঞান আজও ফায়ার বলের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হাজির করতে পারেনি। কেউ বলেন, বিদ্যুৎপুঞ্জ— স্রেফ প্রাকৃতিক কারণ। কিন্তু—'

বলতে বলতে বসে পড়লেন বক্তা।

প্রফেসর বললেন, 'বিজ্ঞান কিন্তু একটা তত্ত্ব মেনে নিয়েছে। ফায়ার বল এনার্জির ভারসাম্যময় ক্ষণস্থায়ী নিরেট পুঞ্জ। কিন্তু তা ল্যাববেটেরিতে বানানো যায় না। আমি বলব, হয়তো এরাই ভাইটন— মরবার সময়ে ফায়ার বল হয়ে মিলিয়ে যায়, আমাদের মতোই তারা অমর নয়, মরবার সময় চোখে পড়বার মতো ফ্রিকোয়েন্সি সৃষ্টি করে চলে যায়। কারও কিছু বলার আছে?'

উঠে দাঁড়ালেন এক বৈজ্ঞানিক, 'আমাদের হর্তাকর্তা বিধাতা এরা, এই ভাইটনরা— এমন ধারণা আপনার মাথায় আসছে কেন?'

'জর্সেন এই ধারণা মাথায় এনেছিলেন স্রেফ পর্যবক্ষণ করে। ওঁর পরে একই প্রক্রিয়ায় একই ধারণা মাথায় গড়ে নিয়েছেন অন্যান্যরা। ভাইটনদের হাবভাব যেন ওরাই এই ধরণীর মালিক! আমি, আপনি, দুনিয়ার সব্বাই ওদের গোলাম— জন্ম মুহূর্তে থেকে।'

'নির্বোধের স্বপ্ন!' কে যেন বললে একদম পেছন থেকে। নির্বোধ বলা হল কাকে— ভাইটনকে না প্রফেসরকে তা বোঝা গেল না।

প্রফেসর গায়ে মাখলেন না। বললেন, 'ভাইটনদের সম্বন্ধে জানা গেছে অতি সামান্য, কিন্তু বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করা হয়ে গেছে। বীচ জেনে ফেলেছেন, ভাইটনরা শুধু এনার্জি দিয়ে গড়া নয়, তারা এনার্জি আহার করে বেঁচে থাকে— আর সেই এনার্জি হল আমাদের এনার্জি! আমরা যেমন পশু-পালন করি— সেইরকম ওরা আমাদের পালন করে এনার্জি আহরণের জন্য। দুধের জন্যে আমরা যেমন গোরুর যত্ন নিই, এনার্জির জন্যে ওরা তেমনি আমাদের নেয়। এই কারণেই ওরা আমাদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে নজর দেয়। ইমোশনকে সুড়সুড়ি দিয়ে যায়— ওদের এনার্জির চাহিদা মেটানোর জন্যে।'

'পিশাচ নাকি!' ধ্বনিত হল এক কণ্ঠ।

কান দিলেন না প্রফেসর, 'আবেগ অথবা চিন্তা যে স্নায়ুশক্তি সৃষ্টি করে, তা প্রায়-বৈদ্যুতিক, এমন ধারণা নতুন কিছু নয়। আর এই এনার্জির উৎপাদন ঘটিয়েই ভাইটনরা মিটিয়ে চলেছে তাদের প্রয়োজন। তারাই দরকার মতো আমাদের আবেগতাড়িত করছে— ঘৃণা, ঈর্ষা, সৃষ্টি করে আমাদের লড়িয়ে দিচ্ছে। এক-একটা যুদ্ধ মানে আমাদের ছায়া-গুরু এই ভাইটনদের মহাভোজের আয়োজন!'

উঠে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, 'তা হলে কি বলতে চান, এই যে আমরা বোমা টোমা তৈরি করে যাচ্ছি, এ সবই ভাইটনরা করাচ্ছে?'

'করাচ্ছে। কিন্তু আবার দেখছে যাতে ঢালাও বোমা ছুড়ে পৃথিবীটাকে মহা শ্মশান বানিয়ে না-ফেলি। এদের এনার্জি তখন বানাবে কে?'

পিক পিক করে উঠল প্রফেসরের পকেট-টেলিফোন। বের করে কানে লাগালেন। শুনলেন, থমথমে মুখে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

বললেন, 'অলিম্পিয়ান জাহাজ একটু আগেই ফেটে উড়ে গিয়ে ডুবে গেল। জাহাজে ছিলেন ডক্টর বীচ।'

কথার খেই তুলে নিলেন প্রফেসর তার পরেই, 'এইভাবেই একে একে চলে যাচ্ছেন সেই সব মানুষ যাঁরা জেনে ফেলেছেন ভাইটনদের অস্তিত্ব।'

আঁতকে উঠলেন একজন, 'আমাদের পালা এবার?'

'না।' অভয় দিলেন প্রফেসর, 'আপনারা ছিলেন ওয়াশিংটনে— হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন কোথায়, তা এখনও জানতে পারেনি ভাইটনরা।'

'ভাইটনরা কি তা হলে এক ধরনের বস্তু?'

থেমে থেমে বললেন প্রফেসর, 'এরা গ্যাস নয়, লিকুইড নয়, সলিড নয়। অতি নীল তাদের দেহ... শুধু এনার্জি দিয়ে কি একটা দেহ গড়ে ওঠে? না... খটকা আমার মনেও লেগেছে... আমি বলব বস্তুতন্তু দিয়ে গড়া এদের দেহ।'

'আপনি স্ট্রিং থিয়োরির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মূলে আছে এই বস্তুতন্তু— তাই এরা ছিল, আছে, থাকবে।'

'বস্তুতন্তু নাশ করার পালটা এনার্জির কথা ভেবেছেন?'

'আসল কথায় এতক্ষণে এসেছেন। আমরা সমবেত হয়েছি এই কারণেই। ভাইটন-সংহার করার অস্ত্র বানানোর জন্যে। সুখবরটা তা হলে দিই। জেন্টেলমেন, সেই অস্ত্র এই পাতালেরও পাতাল প্রকোষ্ঠে তৈরি করছে আমেরিকান আর্মির রেডিয়ো যন্ত্রীরা!'

'রেডিয়ো যন্ত্রী?'

'একটু আগেই আপনাদের বলেছি, রাডার পালস-কে শুষে নেয় ভাইটনরা— ঠেলে ফিরিয়ে দেয় না। রাডার মূলত ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের জেনারেটর— যার কাজ চলে সেন্ট্রিমেট্রিক ওয়েভলেনথে। রেডিয়ো ব্রডকাস্ট করছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি। আমি এই এনার্জি খুব কম ওয়েভলেনথ-এ ফোকাস করব— যেভাবে আতস কাচের মধ্যে দিয়ে সূর্যরশ্মি ফোকাস করে যে-কোনও বস্তু পুড়িয়ে দেওয়া যায়। পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ওয়েভলেনথ দিয়ে শুরু করব— দরকার হলে আরও কমাব। অটোমেটিক রেগুলেটর ফোকাস করে যাবে যতক্ষণ না সংহার শক্তি কার্যকর হচ্ছে ভাইটনদের বস্তুতন্তুর ওপর। বুঝেছেন?'

'বুঝেছি। কখন চালু হবে আপনার যন্ত্র?'

'কাল সকালে। আপনারা দেড়শোজন পাতাল থেকে উঠবেন আর্মি টাওয়ারের ছাদে। এ-অঞ্চলে মানুষ গিজগিজ করছে। ভাইটনরাও থুকথুক করছে। ছাদে উঠে আমি দেখে এসেছি। কাল সকালে দেখবেন আপনারা। চোখে জর্সেন-এর সুর্মা লাগিয়েছেন— দেখতে পাবেন।'

দেখতে পেয়েছিলেন। রুপো-চাদর দিয়ে গড়া ফানেল সিলিন্ডারের মতো দেখতে বিরাট প্রোজেক্টরের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসেছিল অতি নীল গোলক।

কিন্তু প্যারাবোলা-প্রোজেক্টরের অটোমেটিক রেগুলেটর ফোকাস ঠিক করে নিয়ে একটার পর একটাকে ফাটিয়ে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল।

মারণাস্ত্র রেডিয়ো ওয়েভ-এর দৈর্ঘ্য মোটে আধ সেন্টিমিটার।

প্রাচীন আতঙ্করা তখন হিংস্র হয়ে উঠেছিল পৃথিবী জুড়ে। একদিনে তা ঘটেনি। কেননা প্রফেসর বড় হুঁশিয়ার। ভাইটন-বৃত্তান্ত পৃথিবীময় ফ্ল্যাশ করেননি ইচ্ছে করেই। তা হলেই তো অজ্ঞ মানুষ সন্ত্রস্ত হবে, নিদারুণ আতঙ্কে দিশেহারা হবে, চিন্তার ঢেউ ধরে ফেলবে নিঠুর

নির্দয় ভাইটনরা।. শুরু হবে হার্ট অ্যাটাক পর্ব। ঘটবে বড় বড় অ্যাকসিডেন্ট। ধুলোয় মিশবে শহরের পর শহর।

তাই উনি দেড়শোটা মিনি ভাইটন-হাতিয়ার বানিয়ে দেড়শো বৈজ্ঞানিককে দিয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দেড়শো বৈজ্ঞানিককে পাতাল-প্রকোষ্ঠে রাজার হালে রেখে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ভাইটনরা অত নির্বোধ নয়। তারা যে আসলে কী, তা পুরোপুরি জানা তো যায়নি! তাদের পৈশাচিক পন্থার অনেক কিছুই ছিল অজানা।

জানা যেতে লাগল একটু একটু করে।

মাথায় শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে অকুতোভয় স্যাঙ্গস্টার একদিন আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে একটু দূরে বনপথে ভ্রমণ করতে গেছিলেন। সশস্ত্র সান্ত্রিরা দূর থেকে তাঁকে নজরে রেখে দিয়েছিল। আচম্বিতে তাদের চোখের সামনেই ঘটল এক বিকট ব্যাপার।

লেভিটেশন! শূন্যে ভেসে ওঠা! খুব হাত পা ছুড়ে ছিলেন স্যাঙ্গস্টার। কিন্তু তুলে নিল তাঁকে।

গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে উঠতে একসময়ে মিলিয়ে গেছিলেন মেঘের আড়ালে।

কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হল স্যাঙ্গস্টারকে!

খবরটা পেয়েই তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে গাঁক গাঁক করে বলেছিল দীননাথ, 'কী আশ্চর্য! কী ভীষণ! তুলে নিয়ে গেল কেন? মেরে ফেলে লাশ ফেলে দিয়ে গেল না কেন?'

ভয়ানক গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন প্রফেসর, 'নারকীয় সুপার-সার্জারি এবার শুরু করবে বলে।'

'সুপার-সার্জারি?'

বীচ যা যা বলেছিলেন প্রফেসরকে, সব তো বলেননি উনি দীননাথকে। সে সময়ও পাননি। মেতে ছিলেন সম্মেলন আর হাতিয়ার-প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে। বললেন এখন, 'ভাইটন ল্যাবরেটরিতে নিয়ে ফেলা হবে স্যাঙ্গস্টারকে। ব্রেনে পাঞ্চ করে দেওয়া হবে ভাইটনদের কাজের প্রোগ্রাম। ভাইটন-মানুষ হয়ে যাবে স্যাঙ্গস্টার।'

'সে কী! ভাইটনদের রোবট হবে মানুষ চেহারায়?'

'হ্যাঁ, সে তখন আর আমাদের বন্ধু স্যাঙ্গস্টার থাকবে না। ভাইটন স্পাই হয়ে ফিরে আসবে। দীননাথ, সাবধান। স্যাঙ্গস্টারের হিটলিস্টে প্রথম আদমি কিন্তু আমি। তারপর দেড়শো জন বৈজ্ঞানিক।'

শক্ত হয়ে গেছিল দীননাথের বেরিলিয়াম-স্টিল চোয়াল।

স্যাঙ্গস্টার ফিরে এসেছিলেন। বনের ভেতর থেকেই হঠাৎ তিনি হেলতে দুলতে বেরিয়ে এসেছিলেন। চোখ মুখ যেন কীরকম। ভাবলেশহীন। সবচেয়ে অদ্ভুত তাঁর দুই চোখ। বিলকুল জ্যোতিহীন। যেন দুটো কাচের চোখ বসানো। প্রাণের প্রদীপ নেই তার মধ্যে একদম।

স্যাঙ্গস্টার এসেছেন। খবর চলে এল প্রফেসর আর দীননাথের কাছে তৎক্ষণাৎ। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে।

দরজা খুলে ভেতরে পা দিলেন স্যাঙ্গস্টার।

সোজা চোখে চাইলেন প্রফেসরের দিকে। যে-চোখে ভাষা নেই— সেই চোখে। ভাষা যখন ফুটল কণ্ঠে, তা একেবারে যান্ত্রিক।

'প্রফেসর, আপনার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো খবর এনেছি।' বলেই, হাত ঢোকালেন পকেটে।

দীননাথ দু'পকেটে হাত ঢুকিয়েই টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ও এখন মূর্তিমান ঘটোৎকচ।

স্যাঙ্গস্টার হাত বের করলেন বিদ্যুৎ বেগে— হাতে খুদে পিস্তল।

দীননাথ হাত বের না-করেই পকেটের মধ্যে থেকেই গুলিবর্ষণ করে গেল স্যাঙ্গস্টারের কলজে লক্ষ্য করে।

মস্ত নিশ্বাস ফেলে প্রফেসর বলেছিলেন, 'যেভাবেই হোক, খবর চলে যাবে ভাইটনদের কাছে। আর কাউকে কিডন্যাপ করতে বোধহয় আর যাবে না।'

কিন্তু প্রলয় শুরু হয়ে গেল গোটা ভূগোলক জুড়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই। প্রাচীন আতঙ্করা যোগাযোগ ব্যবস্থা রেখেছে তা হলে চিন্তার বেগে! বস্তুতন্তু দিয়ে গড়া জীবের টেলিপ্যাথির স্পিড যে কতখানি, তার ধারণা ছিল না কারওই— ঘটনা ঘটে গেল প্রায় চকিতে!

আমেরিকান আর্মির পাতাল ঘাঁটি মাকড়সার জালের মতো ছেয়ে রেখেছে এই ভূগোলক— এমনকী সমুদ্রের নীচেও রয়েছে তাদের গোপন সামরিক ঘাঁটি। এই পৃথিবীকে বাস্তবিকপক্ষে পদানত করে রেখেছে তারাই স্রেফ শক্তির চমক দেখিয়ে।

সব ক'টা ঘাঁটি থেকেই এসে গেল খবর। দেশে দেশে মানুষ হঠাৎ লড়ে যাচ্ছে মানুষের সঙ্গে। এশিয়ানরা অ্যাটমিক মিসাইল তাগ করেছে ইউরোপীয় আর আমেরিকান দেশগুলোর দিকে। সাজ সাজ রব পড়ে গেছে ইউরোপ আমেরিকায়।

রাষ্ট্রসংঘ অধিকর্তা বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে, আর বিলম্ব নয়, এখুনি কিছু দরকার!

এখুনি! এই দণ্ডে!

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বললেন দীননাথকে, 'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে। ওদের কমিউনিকেশন ব্যবস্থা যখন এত কুইক জানতে পারলাম— তা হলে শুরু করা যাক এখুনি। দেশে দেশে মারণাস্ত্র পাঠানোর দরকার নেই— এই একটা প্রোজেক্টর গ্র্যাভিটন আকাশ যানে ভেসে চরকিপাক মারুক পৃথিবীকে— ডেথ-রে ছড়িয়ে দিক দিকে দিকে। প্যানিক ছড়িয়ে গেলেই বাদবাকি ভাইটন চম্পট দেবে পৃথিবী ছেড়ে। তুমি যাও তোমার নতুন চোখ নিয়ে। দেখো, আর মারো!'

এবং তাই হয়েছিল। দীর্ঘ সেই ঘটনাপঞ্জি ২০১৫ সালের কারও অজানা নেই।

এই কাহিনির পাঠক আর কয়েক বছর প্রতীক্ষা করলেই সব জানবে। সুতরাং...

ভয় নেই।

ধুরন্ধর ধরের ধড়িবাজি

ধুরন্ধর ধর বললে, 'মানুষ কী?'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বললেন, 'আপনি দার্শনিক?'

'বৈজ্ঞানিকও বটে!' জাতিস্মর বৈজ্ঞানিক, বললে ধুরন্ধর— এই তিরিশ বছরেই যার মাথার সামনের দিকে টাক পড়েছে। গোঁফ দাড়ি কামানোর সময় যে পায় না, যার কান খুব বড়, নাক খুব লম্বা, চোখের ওপরের ভুরুসমেত হাড় কানিশের মতো ঠেলে বেরিয়ে আছে। কিন্তু হাইট মাত্র চার ফুট। এত রাতে সে এসেছে আচমকা— না বলে কয়ে। এখন রাত দশটা। এই সময়ে কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে হুট করে ঢুকে পড়া উচিত নয়।

কিন্তু ধুরন্ধর ধর এসব নিয়মকানুনের বাইরে। কেননা, সে তো কলিংবেল বাজিয়ে, দরজা খোলার পর চৌকাঠ পেরিয়ে ঢোকেনি। আমি যখন এঁড়ে তর্ক করছি প্রফেসরের সঙ্গে মানবদেহের বর্ণমালা আবিষ্কারের ভবিষ্যৎ নিয়ে, ঠিক সেই সময়ে খুক খুক হাসি আর কাশি শুনলাম ঘরের কোণে। তাকিয়ে দেখলাম, ধুরন্ধর ধর দাঁড়িয়ে আছে।

তেলেবেগুনে জ্বলে গেছিলাম আমি, নিরিবিলিতে দুটো কথা বলাও যাবে না? প্রাইভেসি বলে কিছু নেই?

কড়া ধমক লাগিয়েছিলাম চারফুট হাইটের ধুতি আর ফতুয়া পরা ধুরন্ধরকে (তখনও তার নাম জানতাম না)। সে একটুও না-রেগে ধুপ করে বাবু হয়ে বসে পড়ল মেঝের ওপর। তারপর সুপার-এক্স কম্পিউটারের দিকে আঙুল তুলে বললে, 'যন্ত্র, তুমি চালু হও— তোমার চেয়ে বড় যন্ত্র... মানুষ-যন্ত্র হুকুম দিচ্ছে।'

সুপার-এক্স কম্পিউটার একখানা যন্তর বটে। শুধুমাত্র প্রফেসরের গলার আওয়াজ শুনলে চালু হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় গ্রহ-গ্রহাণুর কাছে খবর নিয়ে যায়... খবর নিয়ে আসে... নিমেষে নিমেষে। কিন্তু সে প্রফেসরের গোলাম। সে কিনা ধুরন্ধরের দাবড়ানি খেয়ে দপ করে স্ক্রিনে আলো জ্বালিয়ে দিল। হেঁড়ে গলায় বললে, 'স্যার, আপনি আসছেন সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে। এইমাত্র একটা নক্ষত্র জন্ম নিল সেখানে। এই দেখুন,' আলোকিত স্ক্রিনে দেখা গেল একটা দপদপে নক্ষত্রকে ঘিরে চরকিপাক দিচ্ছে অনেকগুলো ছানাপোনা গ্রহ-উপগ্রহ। প্রতিবার দপদপ করার সময়ে একটা বেতার-স্পন্দন ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। সেই 'পালসার' ডবল 'D' হয়ে ফুটে উঠছে স্ক্রিনের ওপর।

সুপার-এক্স বললে, 'স্যার, এই ডবল D আপনার নাম। আপনি ধুরন্ধর ধর। আপনি বহু জন্ম এই পৃথিবীতে কাটিয়ে এখানে কিছু করা গেল না দেখে বাইরে চলে গেছিলেন—'

ধমক দিয়ে ধুরন্ধর ধর বললে, 'আচ্ছা উজবুক তো! বলো, পৃথিবীর বাইরে।'

'আজ্ঞে, যার নাম চালভাজা, তার নাম মুড়ি। আপনার মতো জিনিয়াস যখন বাইরে যান, তখন পৃথিবী কেন, সৌরজগতের বাইরেই যান।'

পরিতুষ্ট হল ধুরন্ধর ধর, 'তার পরের ব্যাপারগুলো জানিয়ে দাও এই মূর্খ দুটোকে—'

'সাবধান!' মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল আমার।

হাত তুলে নিরস্ত করলেন প্রফেসর, 'তারপর? তারপর?'

সুপার-এক্স কম্পিউটার বললে, 'স্যার, উনি সপ্তর্ষিমণ্ডলে একটা নতুন নক্ষত্র জগৎ বানিয়েছেন। গ্রহে গ্রহে চারফুট হাইটের দাড়িওলা মানুষ বানিয়েছেন। সব্বাইকে দেখতে এঁর মতো। কারণ, উনি ওখানকার সৃষ্টিকর্তা-ভগবান। ওদের মহামন্ত্র ডি-ডি। মানে, ধুরন্ধর ধর।'

'ওঁকার জপ ছেড়ে দিন,' টিটকিরি দিল ডি ডি, 'আমাকে স্মরণ করুন। এই পৃথিবী ভরিয়ে দেব আপনার মতো বুড়ো অথবা ওই ড্যাকরা ছোকরার মতো জীব দিয়ে। সব হবে একরকম।'

আমি আবার লাফ দিতে যাচ্ছিলাম, ধুরন্ধর ধর শুধু বললে, 'ডি-ডি'। অমনি আমার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গদগদ গলায় বললাম, 'প্রভু, আপনি এই অসম্ভব কাণ্ড কী করে করলেন? আপনি তো দেখছি মার্কামারা ভেতো বাঙালি। বাঙালিরা দেশ ছেড়ে বেরোয় না— বিজয় সিংহ ছাড়া। আপনি স্বগ্রহত্যাগ করলেন কেন? কীসের আকর্ষণে?'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে ধুরন্ধর ধর বললে, 'ভক্ত দীননাথ, প্রীত হলাম তোমার স্তুতি বচনে। বাঙালি আমি হালে হয়েছি। ওই সুপার-এক্স কম্পিউটার জানে আমার বহু পূর্ব জন্মের কীর্তিকাহিনি। ওহে যন্ত্র এদের কৌতূহল মিটিয়ে দাও।'

অমনি হেঁড়ে গলায় ধুরন্ধর ধরের ঢাক পিটে গেল প্রফেসরের হাতে-গড়া আজব যন্ত্র— 'মহামতি ধুরন্ধর ধর যিশুখ্রিস্ট জন্ম নেওয়ার পঁচিশ হাজার বছর আগে ছিলেন আটলান্টিস মহাদেশে। প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল সে দেশের মানুষ। বানিয়েছিল স্পেসশিপ। বাইরের গ্রহে যাতায়াত ছিল। সাংঘাতিক শক্তি নিয়ে মারামারি শুরু করেছিল আটলান্টিয়ান সায়ান্টিস্টরা, সে সব শক্তি এযুগের পারমাণবিক শক্তির চাইতেও প্রলয়ংকর। পরিণামে শুরু হয় ভূমিকম্পের পর ভূমিকম্প। এই ইনি, যাঁকে আপনারা এখন ডি ডি নামে দেখছেন, তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন আটলান্টিস ডুবে যাওয়ার—'

'শাট আপ,' ধমক দিল ধুরন্ধর ধর, 'বলো, দেহ রেখেছিলেন। শিষ্টাচার শেখানো হয়নি তোমাকে দেখছি।'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, সুপার-এক্স-এর স্রষ্টা, শিষ্ট বালকের মতো বসে রইলেন।

সুপার-এক্স-এর হেঁড়ে গলা এখন হাঁড়ি-গলা হয়ে গেল। সে বললে, 'উনি জন্মে জন্মে এক্সপেরিমেন্ট করে পৃথিবী ছারখার করেছিলেন আরও কয়েকবার। খ্রিস্টজন্মের তেরো

হাজার বছর আগে একবার আর-একবার খ্রিস্টধর্মের ন'হাজার বছর আগে পোসিড আয়ল্যান্ড ডুবিয়ে দিয়ে— রক্ষে পেয়েছিল শুধু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ। ইনি পনেরো হাজার বছর আগে মহাশক্তি প্রয়োগ করে সৌরজগতের 'লুনা' গ্রহকে টেনে এনে পৃথিবীর চাঁদ বানিয়েছিলেন— ফলে হঠাৎ শুকিয়ে গেছিল মঙ্গোলিয়ান সাগর, হুহু করে জল ঢুকে গেছিল ব্ল্যাক সি-তে, সেই জল বসপোরাস ভাসিয়ে দিয়ে ভূমধ্যসাগর সৃষ্টি করেছিল— যার অস্তিত্ব ছিল না আগে। এর ফলে পৃথিবী জুড়ে লন্ডভন্ড কাণ্ড আরম্ভ হয়েছিল। আমেরিকার রকি মাউন্টেন, কাসকেড পর্বতমালা আর অ্যান্ডিজ, এশিয়ার হিমালয়, আর ইউরোপের আল্পস মাথা ঠেলে উঠেছিল।'

চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে শুনছে ধুরন্ধর ধর।

সুপার-এক্স গমগমে সুরে কথা বলা যাচ্ছে, এঁর ধন্য কর্মকাণ্ডের ফলে অ্যান্ডিজ-এর টিয়াহুয়ানাকো বারো হাজার ফুট ওপরে উঠে গেছিল। সমুদ্রের খানিকটা উঠে গিয়ে তৈরি করেছিল লেক টিটিকাকা।'

ধুরন্ধর ধর এবার চোখ খুলল। বললে, 'বাঙালি হয়ে জন্মে কী করেছিলাম, এবার সেই সব বলো। যাতে বাঙালির চৈতন্য হয়। পাঁচ-পাঁচখানা নোবেল প্রাইজ এই বাংলার দৌলতে এমনি এমনি আসেনি। আমার 'পাওয়ার' কাজ করে গেছে। বলো, বলো, কী করেছিলাম বাঙালি হয়ে জন্মে?'

'উনি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে জন্মে অতীশ দীপঙ্করের সঙ্গে তিব্বতে চলে গেছিলেন ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে। 'মানুষ কী?'— এই ধ্যানে ডুবে যান সেখানে। ধ্যান করতে থাকেন সপ্তর্ষিমণ্ডল নিয়ে। মহাকর্ষক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তার পরেই— ধ্যানযোগে আবিষ্কার করেন শূন্যে ভেসে ওঠার কৌশল। ওই দেখুন, ওই দেখুন, উনি হাতেনাতে দেখিয়ে দিচ্ছেন।'

চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল ধুরন্ধর ধরের কাণ্ড দেখে। বাবু 'পোজে' বসে থাকা অবস্থায় শূন্যে ভেসে উঠেছে-চোখ বন্ধ করে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে, বলছে, 'ইংরেজ আমেরিকার পাগলগুলো একেই বলে 'লেভিটেশন'! লঘিমা শক্তির আর এক নাম! ওহে যন্ত্র, থামলে কেন? বলে যাও, বলে যাও!'

সুপার-এক্স স্পিড তুলে দিল কথা বলার যন্ত্রে, 'তিব্বতে উনি অনেকগুলো জন্ম নিয়েছিলেন। প্রতি জন্মেই মানুষের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা করে গেছেন। মানুষ কেন জন্মায়, নক্ষত্র কেন জন্মায়, জীবন আর মৃত্যুর মানে কী? ধুরন্ধর-মূর্খদের ধরে ধরে তাদের মুখোশ খুলে দিতেন বলে এখনও তিব্বতের অনেক জায়গায় ধুরন্ধর অবতারের নাম শোনা যায়। অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন এক অবতার— উনিই এঁর নাম দিয়েছিলেন ধুরন্ধর অবতার—'

'তারপর? তারপর?' শূন্যে ভেসে থেকে বলে গেল ধুরন্ধর ধর।

'উনি বুঝতে পেরেছিলেন, এক জন্মে ওঁর প্রশ্নের উত্তর উনি পাবেন না, তখন শুরু করেন স্পেস-টাইম রিসার্চ। খতম হয়ে যান একটা এক্সপেরিমেন্টের পর। গুহা-গবেষণাগার থেকে ওঁর লাশ টেনে বের করার পর—'

'লাশ নয়, বলো নশ্বর দেহ! স্টুপিড!'

'নশ্বর দেহ বের করার পর পাওয়া যায় একটা স্পেশাল কনটেনার— মানে, বন্ধ পাত্র। পকেটের মধ্যে, তার মধ্যে একটা কাগজে লিখে রেখে গেছিলেন: 'যদি আবার মৃত্যু হয়, আর যদি সম্ভব হয়, তা হলে আমার মগজ সংরক্ষণ করবেন প্রথম সাইবর্গ তৈরি করার জন্যে।'

'সাইবর্গ!' হাঁ হয়ে গেলাম আমি, 'জ্যান্ত শরীরের সঙ্গে যান্ত্রিক আর ইলেকট্রিক সিস্টেমের মিলন!'

কর্ণপাত না-করে চালিয়ে গেল সুপার-এক্স, 'তখনই দেখা গেল, উনি নিজের জন্যে একটা নকল শরীর বানিয়ে রেখে গেছেন। সেই শরীরের দেহযন্ত্রগুলো সাইবারনেটিক নিয়ন্ত্রিত—'

'সাইবর্গ! ব্রেন ছাড়া সাইবর্গ—'

বলে যাচ্ছে সুপার-এক্স, 'মগজের স্নায়ুকোষগুলো অক্সিজেন উপবাসে তখনও নষ্ট হয়নি দেখে সেই ব্রেন বসিয়ে দেওয়া হয় নকল শরীরে। নকল শরীরও সঙ্গে সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে গিয়ে শুরু করে দেয় ধুরন্ধর ধরের আধা-খ্যাঁচড়া গবেষণা— যে-গবেষণা করতে করতে পটল তুলেছিলেন ধুরন্ধর ধর— '

'পটল! বলো, মহাপ্রয়াণ! ননসেন্স!'

এই প্রথম দেখলাম সুপার-এক্স অগ্রাহ্য করে গেল ধুরন্ধর ধরের হুকুম, বলে গেল কড়িকাঠ কাঁপানো গলায়, 'নতুন শরীর থাকায় ওঁর হল পোয়া বারো। হাইপ্রেশার আর লো টেম্পারেচারের তোয়াক্কা করলেন না। শেষ করলেন সেই গবেষণা, করে গেলেন আরও কয়েকশো বিপজ্জনক গবেষণা— তা সত্ত্বেও সিদ্ধিলাভ ঘটল না, 'মানুষ কী' এই প্রশ্নের জবাব পেলেন না।

'তারপর একদিন ধুরন্ধর অকাতর ম্যাগনেটিক বর্ম লাগানো একটা মহাকাশপোতে চেপে রওনা হলেন বামন শ্রেণির একটা নক্ষত্রের দিকে। নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের উপযোগী বেশ কয়েকটা যন্ত্র উনি নিজেই আবিষ্কার করে নিয়েছিলেন— সেই সব সঙ্গে নিয়ে গেলেন, কিন্তু এত জোগাড়যন্তর সত্ত্বেও একটা ভুল করে ফেলেছিলেন—'

'মানুষ মাত্রই ভুল করে,' বললে শূন্যে ভাসমান ধুরন্ধর ধর।

'মহাকর্ষ শক্তিদের যৌথক্রিয়াফল সামাল দেওয়ার সমস্যাটা মাথার মধ্যে রাখেননি। ফলে, তাঁর মহাকাশপোত আছড়ে পড়েছিল নক্ষত্রের বুকে—'

'ফের পটল তুললে তো?' বললেন প্রফেসর, আপত্তিকর 'পটল তোলা' শব্দ দুটো উচ্চারণ করলেন রসিয়ে রসিয়ে।

ভাসমান ধুরন্ধর ধর গনগনে চোখে একবার চেয়েই চোখ বুজে ফেলল।

'একটা কথা বলা হয়নি। পৃথিবী ছেড়ে বেরোনোর আগে নিজের ব্রেনের একটা ম্যাগনেটিক ইমপ্রিন্ট নিয়ে রেখেছিলেন। সমস্ত স্মৃতি সাংকেতিক হরফে ছাপিয়ে রেখেছিলেন সলিড ক্রিস্টালের মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কৌণিক ঘাত-এর মাধ্যমে— যাকে বলা হয় ইমপালস। দ্বিতীয় মরণের পরেও একটা নকল মগজ তৈরি হয়ে গেল এইসব

ক্রিস্টাল থেকে। ইচ্ছাপত্র অনুসারে একটা নকল শরীরে বসিয়ে দেওয়া হল সেই নকল মগজ—'

'পুরোটাই তো নকল হয়ে গেল!' মন্তব্য করলেন প্রফেসর।

'ইয়েস, প্র-না ব-চ।'

পাঠকের অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি, সুপার-এক্স-কে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন প্রফেসর। পুরো নাম না বলে যেন প্র-না-ব-চ বলা হয়। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের সংক্ষিপ্ত রূপ।

'তারপর?'

'ধুরন্ধর অবতারের সমস্ত চিন্তা আর ব্যক্তিত্ব তো রইল নকল মগজে। কিছুই না-হারিয়ে দ্বিতীয় মৃত্যুর পর হয়ে গেলেন সংশ্লেষিত মানব।'

'ফাইন,' সহর্ষে বললেন প্রফেসর।

বদ্ধ চোখের পাতা খুলে ওঁকে একবার দেখে নিয়েই ফের মুদিত-চক্ষু হয়ে গেল ভাসমান ধুরন্ধর ধর।

'পৃথিবী ছেড়ে সংশ্লেষিত ধুরন্ধর ধর ফিরে গেলেন বামন নক্ষত্রে। এবার আর আগের মতো ভুল করলেন না। তারপর উড়ে গেলেন আরও দূরে প্রতি বস্তুর সন্ধানে—'

'অ্যান্টি-ম্যাটারের সন্ধানে!' এবার অবাক হবার পালা আমার।

সুপার-এক্স কিন্তু লেকচার থামাল না আমার খাতিরে। প্র-না-ব-চ ছাড়া কাউকে ও পাত্তা দেয় না। তবে খেলায়। খেলাটা ধরেছিলাম পরে। যথাসময়ে তা বলব।

'বৈজ্ঞানিক অভিযানে যা যা পেলেন, সব পাঠিয়ে দিলেন তিব্বতের গুহা-গবেষণাগারে। সমস্ত আবিষ্কার লিপিভুক্ত রইল সেখানে— এখনও আছে— চিনেম্যানরা সেই গুহা-গবেষণাগারের সন্ধান পায়নি। পেলে ধুন্ধুমার কাণ্ড লাগিয়ে দেওয়া হত পৃথিবী জুড়ে— শুধু একটা আবিষ্কারের দৌলতে।'

'কী সেই আবিষ্কার?' প্রফেসরের প্রশ্ন, কৌতূহল ওঁর চোখের তারায় তারায়।

'বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শরীর পালটে নেওয়ার ক্ষমতা। এই ফরমুলা খাটিয়ে ধুরন্ধর ধর রকমারি এনার্জি-ফিল্ড বয়ন করেন দেহযন্ত্রগুলো এমনভাবে বানিয়ে নিয়েছেন যে, ইনফর্মেশন জোগাড় করে সেই ইনফর্মেশনকে জমিয়ে রেখে তা থেকে নতুন ইনফর্মেশন বের করতে পারেন—'

'মানুষ কী'— এই হেঁয়ালির জবাব কি পেয়েছেন?' প্রফেসর নাছোড়বান্দা।

'না। তবে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে অমর হয়ে গেছেন। বিরাট শক্তির অধিকারী হয়েছেন।'

'হুঁ... হুঁ!" বললে ভাসমান ধুরন্ধর ধর।

ছিনে জোঁক প্রফেসর তাতে ভড়কালেন না। শুধু বললেন, 'লাভ কী হল? মানুষ হেঁয়ালির তো জবাব পাওয়া গেল না।'

সুপার-এক্স বললে, 'নিজেই তো এখন একটা নক্ষত্র হয়ে গেছেন, জবাব খুঁজছেন নক্ষত্রের চেহারা নিয়ে। দু'বার 'D' সংকেত দিয়ে সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। মানুষের, ইয়ে, বাঙালির শরীর ধারণ করে এসেছেন আপনাকে ওঁর দলে টানতে।'

'কেন? কেন? কী মতলবে?' প্রফেসর যেন আঁতকে উঠলেন। আসলে ওটা অ্যাকটিং, পরে বুঝেছিলাম।

ভাসমান ধুরন্ধর বললে, 'বলো হে বলো। ওঁর চৈতন্য হোক।'

সুপার-এক্স বললে, 'পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা সবে আবিষ্কার করেছেন মানবদেহের বর্ণমালা— অক্ষর সাজিয়ে বিধাতা কীভাবে গড়েছেন মানুষের দেহ— সেই রহস্যভেদ শুরু হয়েছে সবে। 'মানুষ কী'— এই হেঁয়ালির জবাব বের করতে গিয়ে ইনি এই বর্ণমালা অনেক আগেই আবিষ্কার করেছেন। অক্ষর সাজিয়ে অবিকল হুবহু নিজের আদলে মানুষ গড়ে একটা গ্রহ ভরিয়ে ফেলেছেন— শুধু একটা ক্ষমতা দেননি।'

'কী সেই ক্ষমতা?' প্রফেসর যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন।

'হুকুম চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা। উনি যা বলবেন, তাই মানতে হবে। প্রশ্ন করা চলবে না। উনি অবতার। উনি ভগবান। সেই গ্রহের সেইসব মানুষ যারা সব্বাই চারফুট হাইটের দাড়িওলা, টেকো, লম্বকর্ণ—'

'এখানে এসেছেন কেন?'

'আপনাকে দোসর বানিয়ে হয় আপনার মতো অথবা ওঁর মতো মানুষ বানিয়ে ভরিয়ে দেবেন পৃথিবীটাকে। শুরু হবে হুকুমত রাজত্ব।'

'যাচ্চলে! মানুষ কী, সেই প্রশ্নের জবাব তো পাওয়া গেল না।'

'ওঁর মতে, মানুষ এইটাই। রক্তমাংসের যন্ত্র। স্রষ্টা একজনই— ভগবান। উনি নিজেই এখন ভগবান!'

'ভগবান ঘোচাচ্ছি!' চোয়াল শক্ত করে ফেললেন, প্রফেসর, 'মানুষ শুধু যন্ত্র নয়, তারও অনেক ধাপ ওপরে। মানুষ নিছক বস্তু নয়, মানুষ বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মনের শক্তি দিয়ে, উনি নিজেই এখন একটা বস্তু। মন দিয়ে যে শক্তি পাওয়া যায়, উনি তার কিছুটা অর্জন করে শূন্যে ভাসতে শিখেছেন। আমি জানি আরও কয়েকটা, সুপার-এক্স, তোমাকেও তো শিখিয়ে রেখেছি। ওঁকে অণু বানিয়ে দাও! না, না, পরমাণু বানাও!'

খাবি খেল ভাসমান ধুরন্ধর— 'প্র... প্র. প্র...!'

ওর বেশি আর বলতে পারেনি। শরীরটা হুহু করে ছোট হয়ে যাচ্ছিল যে!

দেখতে দেখতে ভদ্রলোক শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। হয়তো হয়ে পরমাণু রয়েছে এখনও এই ঘরে, প্রফেসর তা নিয়ে আর মাথা ঘামান না। মানুষ গড়ার কারিগরকে ভ্যানিশ... মানে... পরমাণু বানিয়ে দিয়েই তিনি খুশি।

ধড়িবাজিতে সুপার-এক্স কম যায় না। ধুরন্ধরের হুকুম অগ্রাহ্য করে সাঁটে জানিয়ে দিয়েছিল প্রফেসরকে, এলেম দেখাতে এসেছে আর একটা মেশিন। মানুষই তার প্রভু— মেশিন নয়। হুকুম করুক মানুষ— তামিল করবে মেশিন।

প্রফেসর তাই করেছিলেন। মেশিনের মগজে গাঁথা শক্তি দিয়ে আর একটা মেশিনকে অ্যাটম বানিয়ে দিয়েছিলেন।

বানচাল করে দিয়েছিলেন ছাঁচে মানুষ তৈরির ধড়িবাজি!

সপ্তর্ষি মণ্ডলের নতুন নক্ষত্র সুপারনোভা হয়ে গিয়ে মিলিয়ে গেছিল তার পরেই।

ম্যাটারহর্ন

এক: শয়তানের পাহাড়

ভদ্রমহিলাকে দেখে বোঝা যায় না পাহাড়ে চড়ায় এত দক্ষ। রোগা কালো চেহারা। শুকনো খটখটে বললেই চলে। ববছাঁট চুল। পরনে নীল রঙের জিনস প্যান্ট আর ঢিলে শার্ট। গলায় রুপোর চেনে ঝুলছে তেনজিং নোরগের ব্রোঞ্জ প্রতিকৃতি।

নাম তার কপালি কুণ্ডু। গটমট করে ঘরে ঢুকেই বললে, 'আপনাদের মধ্যে কার নাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র?' প্রফেসরের দিকে চোখ পড়তেই বললে, 'আপনি বলেই তো মনে হচ্ছে। আর ইনি হচ্ছেন নিশ্চয় সুবিখ্যাত দীননাথবাবু,' শেষের কথাটা বলা হল আমার দিকে চেয়ে। তারপর দু'হাত জুড়ে বাতাসে ঠুকতে ঠুকতে থিয়েটারি ঢঙে, 'নমস্কার, নমস্কার, আমার নাম কপালি কুণ্ডু। হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে গেছিলাম শয়তানের পাহাড় ম্যাটারহর্নে। মশায়, সাক্ষাৎ শয়তানকে দেখে এসেছি সেখানে। যদি অনুমতি দেন তো কাহিনিটা বলতে পারি।'

আমি আর প্রফেসর দু'জনেই তো হতবাক ভদ্রমহিলার স্মার্টনেস দেখে। একে তো বাঙালি মেয়ে পাহাড়ে চড়ার বিদ্যে শিখেছে, তার ওপর চোখে-মুখে যেন খই ফুটছে।

ঢোঁক গিললেন প্রফেসর। বললেন, 'বসতে আজ্ঞা হোক। মামণির নিবাস কোথায়?'

একটানে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল কপালী কুণ্ডু, 'আমার নিবাস কলকাতায়। কিন্তু এখন থাকি প্রবাসে। সুইজারল্যান্ডে টেনে নিয়ে গেছিল মেয়েদের পাহাড়ে চড়া শেখাব বলে। কিন্তু যে শয়তানকে দেখেছি ওখানে, তার সঙ্গে পাছে আবার দেখা হয়, তাই পালিয়ে এসেছি।'

'বেশ করেছ,' নিরীহ গলায় বললেন প্রফেসর, 'পালিয়ে আসা একটা বিরাট গুণ। সবাই পালাতে পারে না। তাই মরে। কিন্তু মামণি, পালিয়ে আমার কাছে এসেছ কেন? আমি তো একটা বুড়োহাবড়া—'

'বৈজ্ঞানিক তো বটে। দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক। অজানাকে জানতে চান— পৃথিবীর আর কোনও বৈজ্ঞানিকের আপনার মতো বুকের পাটা নেই। তার ওপর আপনার শাগরেদ মিস্টার দীননাথ একটা কিংবদন্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশে-বিদেশে।'

'বুঝলাম। শয়তানটা কে? মানে, কী তার নাম?'

'নাম?' এই প্রথম যেন একটু গোলমালে পড়ে কপালী কুণ্ডু।

'কী নাম দেব তার তাই তো ভেবে পাচ্ছি না? জলমানব বলব না তুষারমানব বলব?'

সিধে হয়ে বসলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'জলমানব কখনও তুষারমানব হতে পারে না। একজনের জলে থাকার কথা— আর একজনের তুষারে। তা ছাড়া তুষারমানব ব্যাপারটাই তো মনে হচ্ছে একটা বোগাস।'

'না, না, বোগাস নয়,' যেন ককিয়ে ওঠে কপালি কুণ্ডু। মনের চোখে যেন একটা আতঙ্ক দেখছে, এমনিভাবে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে প্রফেসরের দিকে।

কথা ঘুরিয়ে নিলেন প্রফেসর, 'শয়তানের পাহাড়টা কোথায়?'

'ম্যাটারহর্ন। অসম্ভব পাহাড় ম্যাটারহর্ন। ঠিক যেন একটা খাড়াই পাথরের পিরামিড। জারমাট থেকে একটু দূরে। চকচকে কালো পাথরের শিরার ওপর...'

বলতে বলতে পরিবর্তনটা চক্ষের নিমেষে এসে গেল কপালী কুণ্ডুর চোখে মুখে চেহারায়। জমাট যন্ত্রণা, স্তম্ভিত চিৎকারে যেন পাথর হয়ে গেল নিমেষের জন্যে। দুই চোখে সে কী নিঠুর শূন্যতা! কান পেতে আছে কী যেন শোনার আশায়— ব্যর্থ বধিরতায় তা সম্ভব হচ্ছে না।

অকস্মাৎ সরুমোটা খোনা-হেঁড়ে গলায় অট্টহাসি হাসতে লাগল কপালী কুণ্ডু। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল ঘরের মধ্যে।

সেইসঙ্গে খাপছাড়া আবৃত্তি,

'অনেক যুগের আগে
একটা সে কোন পাগলা বাষ্প আগুন-ভরা রাগে
মা ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধন-পাশ
জ্যোতিষ্কদের ঊর্ধ্বপাড়ায় করতে গেল বাস।
হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ
ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না,
প্রচণ্ড সেই প্রলয় হুংকার অকস্মাৎ
    ডাক দিয়েছে আমারে
প্রলয় তোবণ চূড়া হতে।
হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ
পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তি নিঃস্ব আজি; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের; অন্তর্হিত বিজয়নিশান

বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি...
হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ
চৈতন্য মোর মুক্তি পেয়েছে গুপ্তিগুহা থেকে
নিয়ে এসেছে দুঃসহ বিস্ময়ঝড় দারুণ দুর্যোগ
নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে...
শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী...
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হোক মানুষ জাতটা আপন
চিতার ভস্মতলে।
হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ

কপালী কুণ্ডুর মুখে যেন বিভীষিকা— উলকি আঁকা। দুই চোখে অমানবিক নির্মমতা। কণ্ঠে প্রলয়বিষাণ।

আমি হতবাক। প্রফেসর সামলে নিয়েছিলেন চকিতের মধ্যে। সুট করে সরে পড়েছিলেন পাশের ঘরে। টেলিফোন ডায়াল করছেন শুনতে পেলাম। কথা বলতেও শুনলাম। রিসিভার রেখে ফিরে এলেন ঘরে। যেন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য দেখছেন, এইরকম একখানা বিস্ময়-বিমুগ্ধ মুখভাব করে চেয়ে রইলেন কপালী কুণ্ডুর পানে।

কিছুটা রবীন্দ্রনাথের, কিছুটা নিজস্ব কবিতার জগাখিচুড়ি বানিয়ে উন্মত্ত অট্টরোলে কপালী কুণ্ডু আরও কিছুক্ষণ তাণ্ডব নৃত্য নেচে গেছিল। তার পরেই হু-উ-উ-স করে একটা গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। চারজন ষণ্ডা চেহারার লোক নামল। ঘরে ঢুকল। কপালী কুণ্ডুকে দেখল। এবং চোখের পলক ফেলতে ফেলতে চারজনের চার হাত পা শক্ত করে ধরে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল গাড়ির মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে স্পিডে উধাও হল অ্যামবাসাডর।

এতক্ষণে ঘোর কাটল আমার। বললাম বিমূঢ় কণ্ঠে, 'কোথায় পাঠালেন?'

'পাগলাগারদে,' বললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

দুই: পাগলের আড্ডায়

মেন্টাল হোমের দোতলায় ডা. সুদেব বক্সীর চেম্বার। বিরাট ঘর। নীলাভ প্লাস্টিক পেন্ট চার দেওয়ালে। একদিকের দেওয়ালে ঝকঝকে আলমারিতে পালিশ করা হয়েছে যেন এখুনি। ব্র্যাকেট ল্যাম্পে সুদৃশ্য শেড, রকমারি রং ঠিকরে বেরুচ্ছে। মাত্র চারটে চেয়ার আর একটা স্টিল টেবিল ছাড়া ঘরে কিছু নেই। সবগুলোই মেঝের সঙ্গে আঁটা।

প্রফেসরও তা দেখেছিলেন। কানে-কানে বললেন, 'পাগলরা খেপে গিয়ে টেবিল চেয়ার ছুড়ে আছাড় মারে— তাই এই ব্যবস্থা।'

সুদেব বক্সী ঢুকলেন কথা শেষ হতেই। রীতিমতো লম্বা পুরুষ, কেশবিরল মাথায় উর্বর টাক রাজত্ব বিস্তার করতে চলেছে। বুদ্ধিদীপ্ত ফরসা মুখ। কণ্ঠস্বর বেশ ধারালো— শাঁখের আওয়াজের মতো তীব্র, সুস্পষ্ট, মনের ভেতব যেন গেঁথে যায়, ব্রেনের ভেতর যেন ছুরি চালায়।

সুদেব বক্সী ভারত বিখ্যাত তাঁর এই টক-থেরাপির জন্যে। কোনও ওষুধ নয়। শুধু কথার জাদুতে মগজ-ধোলাই করে দিয়ে অসুস্থ মস্তিষ্ককে সুস্থ করে তুলতে তিনি যে অভিনব বৈজ্ঞানিক পন্থায় কাজ করেন, তার স্বীকৃতি আসছে বিদেশ থেকেও।

এহেন সুদেব বক্সী পাইপ টানতে টানতে ঘরে ঢুকে প্রথমেই একখানা পিলে চমকানো হাসি হেসে উঠলেন আমাদের দেখে। তারপর টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে ঠক ঠক করে ছাইদানিতে পাইপ ঠুকে ছাই বার করতে করতে বললেন, 'লোকে বলে আমাকে হাফ পাগল, তাই বিলেতের বড় বড় চাকরি ছেড়ে দিয়ে দিশি পাগলদের নিয়ে গবেষণা করছি। হাঃ হঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!—

সর্বনাশ! এ যে প্রায় কপালি কুণ্ডুর হাসি দেখছি!

প্রফেসর চেয়ে রইলেন চুপচাপ।

ছাই ঝাড়া শেষ হতেই নতুন তামাক ভরতে ভরতে কম্বুকণ্ঠে সুদেব বক্সী বললেন, 'পাগলি কী বলে জানেন? একবার শুনেই মুখস্থ করে ফেলেছি। দাঁড়ান, আগুনটা লাগাই— হ্যাঁ, শুনুন কপালীর কাণ্ড'... 'বলেই ফুক ফুক বেশ কয়েকবার পাইপ টেনে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। বিশাল ঘরের চকচকে লাল মেঝের ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলেন এ-দেওয়াল থেকে সে-দেওয়াল পর্যন্ত। তারপরেই গলাটাকে একটু বিকৃত করে নিয়ে বললেন, 'মূর্খ মানব!"

চমকে উঠেছিলাম আমি। মানুষের গলায় এরকম অমানুষিক স্বর? পরে শুনেছিলাম কলেজ-লাইফে বিস্তর থিয়েটার করেছেন সুদেব বক্সী। নাটকীয়তা তাঁর কথায় আর কাজে।

চোখ দুটোকে গোল গোল করে বলে চলেছেন মনের ডাক্তার সুদেব বক্সী, 'মূর্খ মানব! শোনো, শোনো, শোনো! ওরা এসেছে! মহাশূন্যের অনন্ত শূন্যতার বুক চিরে ওরা এসেছে! ওরা আগেও এসেছিল, চলে গেছিল, আবার এসেছে। দিকে দিকে ছুটে চলেছে ওদের বিজয়-যান বিজয়-কেতু ওড়াতে অগুনতি গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্কে। ওরা মহাকায়, ওরা বিভীষণ, ওরা মহাকুটিল, মহা দুর্দান্ত। ওরা নিষ্ঠুর, ওরা নির্মম— আসামি ব্রহ্মাণ্ডকে করতলগত করার করাল পরিকল্পনায় ওরা উন্মত্ত। ওদের মজ্জায় প্রলয়ের নাচন, ওদের চক্ষে নরকাগ্নির ঝলক, ওদের কণ্ঠে মহাকালের বিষাণ। ওরা যে কী ভয়ংকর— তা আমি আমার ক্ষুদ্র প্রতিবেদনে ব্যক্ত করতে অপারগ।

'কিন্তু বিশ্বাস করো, হে পৃথিবীর নশ্বর মানব, তোমরা বিশ্বাস করো, ওরা আবার এসেছে। এই পৃথিবীর অগণিত বন্দিশালায় আমাদের পরিণতি দেখতে ওরা এসেছে... ওরা দেখতে চায় ওদের ক্রুর অভিসন্ধি আমরা সফল করতে পারব কি না, ওদেরই মহাবিষ অঙ্গে বহন

করে পৃথিবীর প্রতিটি প্রত্যন্ত প্রদেশে ছড়িয়ে দিতে পারব কিনা। ওদের নিশ্চিন্ত নিষ্করুণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সবুজ সুন্দর এই পৃথিবীকে মহাশ্মশান বানিয়ে স্থলে জলে অন্তরীক্ষে ওদের অট্টহাস্যমুখর অতিকায় অমানবদের প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারব কি না। হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ।

এ কী পাগলের কারখানায় ঢুকলাম রে বাবা! হাসির গমকে যে পিলে পর্যন্ত চমকে উঠেছে।

আচমকা স্বাভাবিক হয়ে গেলেন ড. বক্সী, চোখমুখ সহজ করে নিয়ে সহজভাবে এসে বসলেন চেয়ারে। বললেন সহজ স্বরে, 'অদ্ভুত কেস। ইন্টারেস্টিং কেস— এই কপালী কুণ্ডু!'

এতক্ষণ দম আটকে বসে ছিলাম। এবার ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললাম।

ভুরু কুঁচকে ফিরে তাকালেন সুদেব বক্সী, 'ভাবছেন বুঝি হাফ-পাগল আমি? সেইজন্যে পাগলা-গারদ খুলেছি?'

'না, না, ইয়ে... মানে... যেভাবে বলছিলেন আপনি... গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল কিনা... তাই', আমতা আমতা করে হয়তো আরও কিছু বলতাম, থামিয়ে দিলেন সুদেব বক্সী নিজেই।

'কাঁটা দিচ্ছিল? তাই না? মানুষের গায়ে কাঁটা গজাতে কখনও দেখেছেন?'

'অ্যাঁ?'

'গাছের বাড় নির্ভর করে যে হরমোনটার ওপর, তার নাম indote— 3— acetic acid; 9 AA... মানুষের রক্তে এই হরমোন পাওয়া গেছে শুনেছেন কখনও?'

'কী বলছেন?'

'আমি ওই রকমই বলি। হাফ-পাগল কিনা। গাছের গায়ে কাঁটা গজায় কেন? আত্মরক্ষার জন্যে। মানুষের গায়ে গজালে নিশ্চয় আত্মরক্ষার জন্যেই গজিয়েছে বলতে হবে?'

'ডা. বক্সী—'

'খামোশ। শেষ করতে দিন আমাকে। ব্যাক্টিরিয়া আসলে গাছ তা জানেন তো?'

ঢোঁক গিললাম। নীরব থাকাই শ্রেয়।

'জানেন কি ব্যাক্টিরিয়া গাছ এত ছোট হয় যে একটা আলপিনের ডগায় পাঁচিশ কোটি ব্যাক্টিরিয়া জায়গা হয়ে যায়?'

অসহায় মুখে চাইলাম প্রফেসরের দিকে। হাড়পিত্তি জ্বলে গেল তাঁর হাসি হাসি মুখ দেখে। আমার ল্যাজেগোবরে হওয়াটা বেশ উপভোগ করছেন বুঝতে পারলাম।

চোখাচোখি হতেই চট করে গম্ভীর করলেন মুখখানাকে। বললেন সুদেব বক্সীকে 'ঝেড়ে কাশুন মশাই। ব্যাপারটা কী? কার গায়ে কাঁটা দেখা দিয়েছে? কার রক্তে IAA হরমোন পেয়েছেন?'

'যে পাগলির বচনমালা এতক্ষণ শুনলেন, তার কথাই হচ্ছে।'

'কপালী কুণ্ডু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দেখা যাবে তাকে?'...

'আসুন।'

পাগলা-গারদের 'সেল' কাকে বলে, সেদিন সেই প্রথম দেখলাম। ছোট্ট একটা ঘর। জানলায় গরাদ। দরজাতেও গরাদ। তার ওপর কাঠের পাল্লা। যেন ভেতরের চিৎকার বাইরে না-আসে। ঘুলঘুলির কাছে একটা এক্সজস্ট ফ্যান ঘুরছে বনবন করে। কড়িকাঠে একটা পাখা। একটা ঝোলানো বাল্‌ব।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা স্টিলের খাট। স্বল্পবাস পরানো একটা বীভৎস নারীমূর্তিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে খাটের সঙ্গে। হাত দুটো ওপরে, পা দুটো নীচে।

চোখ বন্ধ করে ছিল নারীমূর্তি। কপালে গালে চিবুকে ছোট ছোট কাঁটা। হাতে আর পায়েও ছুঁচলো কাঁটা। কোনওটা গোলাপের কাঁটার মতো, কোনওটা ফণিমনসার কাঁটার মতো। মাথার ববছাঁট চুলগুলো পর্যন্ত শক্ত কাঁটা হয়ে খাড়া হয়ে রয়েছে।

আমাদের পায়ের শব্দ পেয়েই চোখ খুলল সে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন চিনতে পারছে না। কিন্তু চাহনি দেখেই আমি চিনেছিলাম। কপালী কুণ্ডু। কাঁটাময় শরীর দেখে প্রথমটা চিনতে পারিনি।

অকস্মাৎ ঘোলাটে হয়ে গেল চাহনি। কণ্ঠে জাগ্রত হল অমানবিক হুংকার, 'কে রে? সেই বৈজ্ঞানিকটা না? আর তুই কে? ল্যাংবোট দীননাথ? হাঃ হাঃ হাঃ! তোদের জারিজুরি শেষ করতে এসেছে তারা... আমার মতোই দশা হবে তোদের প্রত্যেকের... রক্তে মিশে যাবে গাছালি ব্যাক্টিরিয়া... এই পৃথিবীরই ব্যাক্টিরিয়া মিউটেশন করে বিষ-ব্যাক্টিরিয়া বানিয়েছে সেই মহা-ভয়ংকররা... আগে যদি জানতাম— উফ! ওঃ! মাগো!'

ককিয়ে উঠে পুরো শরীরটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে উঠিয়ে ফেলল কপালী কুণ্ডু। পরক্ষণেই সিধে হয়ে দমাস করে ফেলল খাটের ওপর। বিষম যন্ত্রণায় যেন অণু-পরমাণু শিউরে উঠছে—

'করাত চলছে— করাত চলছে মাথার মধ্যে— ওদের তৈরিই করা হয়েছে এইজন্যে— মানুষগুলোকে পাগল করে দেওয়ার জন্য—'

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন প্রফেসর, 'কিন্তু মামণি, তোমাকে তো পাগল মনে হচ্ছে না?'

'ঢেউয়ের মতো আসে ঝোঁকটা— মাঝে মাঝে ঠিক থাকি— তার পরেই মাথার মধ্যে কুরে কুরে যখন খেতে থাকে, স্নায়ুগুলোকে কেটে কেটে দেয়— ওঃ— ওঃ—ওঃ মাগো— হাঃ হাঃ হাঃ—

'দুষ্ট মানব, মূর্খ মানব, দেখিস কী রে অমনভাবে?
গাছের ডালে ছিলিস যখন, কে এসেছিল তোদের
আগে?
গাছপালাদের দখলেই, ছিল যখন পৃথিবীটা,
নোংরা তখন ছিল কোথাও? ঝকঝকে নীল
আকাশটা?

বাতাস লবণ, জল ছাড়া, তখন-তো কিছুই ছিল না,
তাই নিয়েই তো শুরু হল, প্রাণ জিনিসটার
আনাগোনা।
আজকে তোরা গাছের প্রভু, বড্ড বাড় বেড়েছিস,
মরবি তোরা, মরবে সবাই— পাগল ছাগল হয়ে থাকিস!
হাঃ হাঃ হাঃ... হাঃ হাঃ হাঃ... হাঃ হাঃ হাঃ!

পাইপ টানতে টানতে সুদেব বক্সী বললেন, 'সিজোফ্রেনিয়া মনে হচ্ছে।'

'সিজোফ্রেনিয়াগ্রস্ত পাগলদের গায়ে কি কাঁটা বেরোয়, মাথার চুল কাঁটা হয়ে যায়?' বিড়বিড় করে বললেন প্রফেসর, 'চলুন, বাইরে যাই কথা আছে।'

বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলাম পাগলি কপালী কুণ্ডুর অট্টহাসি আর উদ্ভট ছড়া:

'পালা... পালা... পালা... প্রাণ নিয়ে পালা...
হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!'

তিন: রক্তে গাছালি

বসবার ঘরে ঢুকেই ধপ করে বসে পড়লাম ফোম রাবার মোড়া সোফায়। প্রফেসর বসলেন না। ভাবিত মুখে চেয়ে রইলেন সুদেব বক্সীর দিকে। সুদেব বক্সী পরমানন্দে তখন পাইপ টেনে চলেছেন। ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়ছেন আর বলছেন, 'থাইরয়েড টেস্ট করালাম— অ্যাবনরম্যাল রিপোর্ট। সব ক'টা গ্ল্যান্ডের ক্ষরণ উলটোপালটা হয়ে গেছে ওই একটা হরমোনের জন্যে— IAA হরমোনের জন্যে। পিটুইটারি এখন মাস্টার গ্ল্যান্ড নয়, তাকে কবজায় এনে ফেলেছে IAA হরমোন। কিন্তু এল কোত্থেকে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

মৃদুকণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'ব্যাক্টিরিয়ার কথা বলছিলেন কিছুক্ষণ আগে। কোন ব্যাকটিরিয়া?'

'কপালীর রক্তে নতুন ধরনের একটা ব্যাক্টিরিয়া পাওয়া গেছে।'

'কীরকম ধরনের?'

'ব্যাক্টিরিয়াদের চেহারা তো মোটামুটি তিন রকমের হয়—'

'হয় গোল বা ডিমের মতো, অথবা রড বা চোঙার মতো, নয়তো প্যাঁচানো অথবা স্ক্রুব মতো।'

'মানুষের মতো নিশ্চয় হয় না।...'

'মানুষের মতো ব্যাক্টিরিয়া!' প্রফেসরের চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'তা হলে আর বলছি কী! অবিকল মানুষের মতো হাত-পা-মুণ্ডু ধড়ওলা ব্যাক্টিরিয়া জীবনে দেখিনি মশাই। একটা মাত্র কোষ। এককোষী গাছ! লম্বায় এক ইঞ্চির এক লক্ষ

পঁয়ষট্টি হাজার ভোগের এক ভাগ। অথচ দেখতে দেখতে মানুষের মতো। মানুষের মতো গাছও বলতে পরেন, হাঃ হাঃ হাঃ... হাঃ হাঃ হাঃ... হাঃ হাঃ হাঃ!'

পাগল-টাগল হয়ে যাব নাকি? মানুষের মতো গাছ? মানুষের মতো ব্যাক্টিরিয়া?

প্রফেসর শুধোলেন, 'কিন্তু গাছের ওই হরমোনটা আসছে কোত্থেকে?'

'সেইটাই এখন জানা দরকার। ব্যাক্টিরিয়াগুলো নিয়ে কালচার করার ব্যবস্থা করছি—

'মন্দ বলেননি। চেনাজানা ব্যাক্টিরিওলজিস্ট যদি না-থাকে, আমাকে কপালীর একটু রক্ত দিতে পারেন।'

'আপনি? কী করবেন?'

'স্টাডি করব। ম্যাটারহর্ন থেকে সে কী ব্যাক্টিরিয়া নিয়ে এল, জানতে চাই।'

'ম্যাটারহর্ন .. ম্যাটারহর্ন... সুইজারল্যান্ডের কাছে সেই করাল কুটিল পাহাড়টা? সে তো মশাই শয়তানের পাহাড়।'

'শয়তানের বীজ রক্তে নিয়ে এসেছে কপালী সেইখান থেকেই। দিন, এক সিরিঞ্জ রক্ত দিন— ফ্লাস্কে ভরে দেবেন।'

'চলুন,' বসবার ঘর থেকে আমাদের নিয়েই বেরোলেন ডা. বক্সী। ঢুকলেন কপালীর ঘরে। দরজা ফাঁক হতেই শুনলাম হতভাগিনীর বিটকেল গলায় বিচিত্র ছড়া :

'ভয়ংকর ওই গাছের দল রক্তে গিয়েছে ঢুকে,
লণ্ডভণ্ড করছে যে রে আমারই কোষগুলোকে।
চেহারায় ওরা মানুষের মতো, স্বভাবে না জানি কী,
মানুষের শেষ এসে গেল বোধহয়, উপায় নাস্তি।'

একটু পরেই বেরিয়ে এলেন ডা. বক্সী। পাল্লা ফাঁক হতেই দমকা বাতাসের মতো ঠিকরে এল আরও একটা অমানবিক কণ্ঠের ছড়া:

'বাতাস, লবণ, জল খেয়েই...
প্রাণের পত্তন করেছে গাছ,
দূরের অনুভূতি নিতে পারে না
আকাট মূর্খ মানব জাত।'

শিহরিত কলেবরে সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম মেন্টাল হোম থেকে। কপালী কুণ্ডু কি পাগল না আর কিছু?

চার: প্রফেসরের অণুবীক্ষণে

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের ল্যাবোরেটরির মধ্যেই একখানা ঘর পুরোপুরি এয়ারকন্ডিশন করা। অতি সূক্ষ্ম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রাখেন এখানেই।

ফ্লাস্কে রাখা সিরিঞ্জ-ভরতি কপালীর রক্ত নিয়ে প্রফেসর সেখানে ঢুকলেন। আমাকে বললেন, 'রাতে এসো। মজা দেখবে।'

কী মজা দেখব, সে মজা প্রাণান্তকর মজা হবে কিনা, এইসব ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম বাড়িতে।

রাত হতেই ছুটলাম বীক্ষণাগারে। মাইক্রোস্কোপ নিয়ে বসে ছিলেন প্রফেসর। আমার পায়ের আওয়াজে চোখ তুললেন। ঘুরে বসলেন।

বললেন, 'কপালীর ছড়াগুলো মনে আছে? নেই! গবেট কোথাকার। বাতাস, লবণ আর জল খেয়েই গাছেরা বাঁচে— প্রাণেরও পত্তন করেছে বাতাস, লবণ আর জল থেকে। সুতরাং গাছালি ব্যাক্টিরিয়াদের বাতাস, লবণ আর জলের মধ্যে রেখেই পর্যবেক্ষণ করা উচিত, তাই না?'

'তা তো বটেই,' বিষম কৌতূহলী হয়ে বলেছিলাম আমি।

'এক ফোঁটা রক্ত কলের জলে মিশিয়ে পাতলা করে নিয়েছিলাম। বাকি রক্তটা ঢেলে দিয়েছি ওই কাচের চৌবাচ্চাটায়। ওখানকার কাণ্ড পরে দেখা যাবে'খন। এখন দেখো এক ফোঁটা রক্ত জলে মিশে গিয়ে কাদের জন্ম দিয়ে চলেছে।'

মাইক্রোস্কোপের সামনে থেকে সরে বসলেন প্রফেসর। লাফিয়ে গিয়ে বসলাম টুলে। চোখ লাগিয়েই আঁতকে উঠলাম।

মাইক্রোস্কোপে এককোষী উদ্ভিদ ডায়াটমদের দেখেছি এর আগে। দেখেছি রকমারি ব্যাক্টিরিয়াও। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখেছি ভাইরাসদের— যারা নাকি জড় আর জীবের মাঝামাঝি।

কিন্তু এ কাদের দেখছি? সত্যিই তো মানুষের মতো আকৃতি এদের। জীবাণু-মানুষও বলা যায়। দুটো হাত আর দুটো পা আছে ঠিকই— কিন্তু আঙুলের জায়গায় কিলবিলে কতগুলো শুঁড়। শেকড়ের মতো দেখতে, মুণ্ডটা লম্বাটে— চোঙের মতো। ধড়টা মানে গাছের গুঁড়িটাই একটু চ্যাটালো হয়ে আবার ওপর দিকে ছুঁচলো হয়ে গেছে। সবচেয়ে বীভৎস হচ্ছে চক্ষু প্রত্যঙ্গটি!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এদের প্রত্যেকের ছুঁচোলো মাথার কাছে রয়েছে একটাই মাত্র চোখ। শুঁড়ের ডগায় বসানো লকলক করছে সেই গোলাকার ভয়াবহ চোখ। মাঝে মধ্যে সড়াত করে ঢুকে যাচ্ছে চক্ষুকোটরে— মাথার মধ্যে!

এ আবার কী ধরনের ব্যাক্টিরিয়া। হতবাক হয়ে চোখ তুলে চাইলাম প্রফেসরের দিকে।

অনিমেষে ভাবিত মুখে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন প্রফেসর। চোখাচোখি হতেই খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ঘাবড়ে গেলে কেন? আরও একটু দেখো... দেখেছ কীভাবে ব্যাটাচ্ছেলেরা দল পাকাচ্ছে আবার এক হয়ে যাচ্ছে।'

দল পাকাচ্ছে আবার এক হয়ে যাচ্ছে? কথার হেঁয়ালি না-বুঝে সুবোধ বালকের মতো চোখ লাগালাম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর যা দেখলাম, সেরকম দৃশ্য জীবনে দেখিনি!

ভাসমান ব্যাক্টিরিয়া-মানবগুলো (নাকি গাছালি-মানুষ?) এদিক সেদিক থেকে এসে গায়ে গা লাগিয়ে একটার ভেতরে একটা ঢুকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সবগুলো এক কোষী জীব (!) একসঙ্গে মিশে গিয়ে একটই বৃহদাকার গাছালি-মানুষ হচ্ছে। পরক্ষণেই তা দু'ভাগ হচ্ছে। এইভাবেই অগুনতি ব্যাক্টিরিয়া হচ্ছে (যাদের দেখতে মানুষের মতোই— বিকট চোখটা বাদে)... আবার সব মিলেমিশে একখানা ব্যাক্টিরিয়া হয়ে যাচ্ছে— যার আকার আগের একখানা ব্যাক্টিরিয়ার চাইতেও বড়!

এইভাবেই ভাঙা আর গড়ার কাণ্ড যদি মুহুর্মুহু চলে, তা হলে অন্তিমে কী দাঁড়াবে ভাবতেই শিরদাঁড়া সিধে হয়ে গেল আমার। ককিয়ে উঠেছিলাম... আর্তনাদের মতো বিস্ময়োক্তিটা গলা চিরে বেরিয়ে এসেছিল, 'প্রফেসর... প্রফেসর.. এরা যে বড় হয়েই চলেছে... শেষকালে—'

'আকারে আমাদেরকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে,' গম্ভীর গলায় বললেন প্রফেসর, 'চৌবাচ্চার দিকে তাকাও।'

তাকালাম। এবং মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল!

শুঁড়ের মতো কতকগুলো আঙুল চৌবাচ্চার কিনারা চেপে ধরেছে। আর জলের ওপর জেগে রয়েছে শুঁড়ের ডগায় শুধু একটা চোখ।

বীভৎস চোখ। আকারে গলফ বলের মতো। নিমেষহীন নয়ন নিবদ্ধ আমাদের ওপর।

হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে।

খট করে সুইচ টিপে চৌবাচ্চার আলো জ্বেলে দিলেন প্রফেসর।

পাঁচ: গাছালি বনাম ডাক্তার

আলোকিত কাচের চৌবাচ্চার ভেতরের দৃশ্য এবার স্পষ্ট দেখা গেল, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণাবয়ব মনুষ্যাকৃতি একটি জীব। নিশার দুঃস্বপ্নের মতো তার আকৃতি। পায়ের আঙুলের বদলে কিলবিলে শুঁড় অথবা শেকড়। পা দু'খানা গাছের শাখা বলা চলে। গুঁড়িটা বেজায় মোটা। গুঁড়ির ওপর থেকে আরও দুটো শাখা হাতের মতো বেরিয়ে শুঁড় দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে চৌবাচ্চার কিনারা। বড় বড় কাঁটা গায়ে, হাতে, পায়ে। চ্যাটালো লম্বাটে মাথার ওপরকার ফোকর দিয়ে লিকপিকে শুঁড়ের ডগায় গোল বলের মতন চোখটা শুধু উঠে রয়েছে জলের ওপর— যেন সাবমেরিনের পেরিস্কোপ।

অতিশয় শান্ত গলায় বললেন প্রফেসর, 'মাইক্রোস্কোপে যা দেখলে, এখানে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। আমাদের দু'জনকেই ঘায়েল করার মতো আকার নিয়ে ফেলেছে গাছালি-মানুষ।'

তা ঠিক। কাচের চৌবাচ্চাটা তো পেল্লায়। উচ্চতায় মানুষ সমান। মাথা ডুবিয়ে যে

ভয়ংকর বৃক্ষ-ব্যাক্টিরিয়াটি দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে— মাথায় সে আমাদেরই সমান।

'ইচ্ছে করলে আরও বড় হতে পারে, ক্যালিফোর্নিয়ার হোয়াইট মাউন্টেনের মেথুসেলা মহীরুহের মতো— লম্বায় ৯০০০ ফুট,' বললেন প্রফেসর।

অমনি চৌবাচ্চার কিনারায় সেঁটে থাকা শুঁড়গুলো ভীষণবেগে নড়তে লাগল। বোলতার ডানা নাড়ার মতো। এত জোরে যে চোখে দেখা যায় না। কানে ভেসে এল রকমারি গুনগুন, গমগম, পিনপিন ঝনঝন শব্দ।

চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম কান খাড়া করে ঝুঁকে পড়েছেন প্রফেসর। আমি তৈরি হয়ে রইলাম বেগতিক দেখলেই প্রফেসরকে পাঁজাকোলা করে পলায়ন করার জন্যে।

কিন্তু জল থেকে প্রচণ্ড লাফ মেরে বেরিয়ে আসার কোনও লক্ষণ দেখাল না বিকট বৃক্ষ। শুধু হাজারো ভঙ্গিমায় বনবন করে ঘুরতে লাগল আঙুলরূপী শুঁড়গুলো।

অবশেষে বুঝলাম শুঁড় নাড়ার অর্থ।

অজস্র শব্দের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল মানুষের স্বর— বাংলা ভাষা।

'স্বাগতম! পৃথিবীর মানুষ।'

অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাইনি এই যথেষ্ট। সবলে শুধু আঁকড়ে ধরেছিলাম প্রফেসরকে।

হৃষ্টকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন প্রফেসর, 'সুস্বাগতম বিকট ব্যাক্টিরিয়া।'

'ব্যাক্টিরিয়া?' গোল বলের মতো চোখটা যেন একটু বিস্ফারিত হল মনে হল, 'সেটা কী?'

'খুব ছোট গাছ, জীবাণু পোকাও বলতে পারো।'

'বটে! আমাকে কি খুব ছোট মনে হচ্ছে? আরও বড় হব?'

'আপাতত দরকার নেই। লোকালয়ে বড় সাইজ নিয়ে বিপদে পড়বে। দানব-গাছরা পাহাড়ে পর্বতেই থাকে— যদিও তাদের বীজের ওজন এক আউন্সের ছ'হাজার ভাগের এক ভাগ। তার চাইতেও ছোট ছিলে তুমি।'

'অনেক খবরই রাখো দেখছি। নাম কী হে তোমার?'

'নাটবল্টু চক্র। আর এর নাম দীননাথ।'

'কী করা হয়?'

'গবেষণা।'

'এত যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা? ছোঃ! পারবে তোমরা জল, বাতাস, রোদ থেকে খাবার বানাতে? দরকার মতো ধাতু করতে? এক ধাতু থেকে আর এক ধাতু সৃষ্টি করতে?'

'তা কী করে পারব? আমরা তো গাছ নই। আমাদের অ্যালকেমিস্টরা চেষ্টা করেছিল অবশ্য সিসে থেকে সোনা তৈরি করতে, পারেনি।'

'জীবনে পারবে না। তোমাদের পারমাণবিক চুল্লিতেও যা সম্ভব নয়, নিঃশব্দে আমরা তা পারি। অকল্পনীয় শক্তিকে ধরে রাখতে পারি।'

'তাও জানি,' বেশ অমায়িক কণ্ঠ প্রফেসরের।

বাঁইবাঁই করে আঙুলরূপী শুঁড় ঘোরাতে ঘোরাতে বলে গেল বিকট বৃক্ষ, 'আমাদের মুখ নেই। মুখ দিয়ে সব কথা কি বলা যায়? সব ভাষা বলা যায়? কিন্তু আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে-কোনও জীবের সঙ্গে কথা বলতে পারি জলে বা বাতাসে কম্পন সৃষ্টি করে।'

'সত্যিই তোমাদের ক্ষমতা আছে,' প্রফেসর গদগদ।

'চোখ তো তোমাদের দুটো। তবুও তোমাদের দুরদৃষ্টি নেই। কিন্তু আমাদের এই একখানা চোখের ক্ষমতা শুনলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। অনেক দুরেও যা থাকে, তা আমরা বুঝতে পারি।'

'তৃতীয় নয়ন।'

'মানে?'

'মানে, মানুষদেরও তোমাদের মতো ওইরকম তৃতীয় নয়ন ছিল এককালে— আদিম অবস্থায়।'

'আদিম অবস্থায়!'

'হ্যাঁ গো, মানুষ যখন বনে বাদাড়ে পর্বতে থাকত, তখন তাদেরও কপালে ছিল একটা চোখ— তোমার মতোই বলতে পারো। এখন সেটা কপালের ভেতর ঢুকে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড হয়ে গেছে। মুনিঋষিরা অবশ্য ধ্যান-ট্যান করে পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে উদ্দীপ্ত করে তোমাদের চাইতেও বেশি অন্তর্দৃষ্টি আর দূরদৃষ্টি লাভ করেন।'

খুবই বিচলিত মনে হল বিকট বৃক্ষকে, 'আদিম অবস্থায় তোমাদেরও ছিল কপালের চোখ?'

'এখনও আছে মানুষের চেয়ে ইতর জীবদের,' খুশি-খুশি গলায় বলে গেলেন প্রফেসর, 'মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি, এমনকী স্তন্যপায়ী জীবদেরও আছে একটা বাড়তি চোখ, মানে তিনটে করে চোখ— তোমার মতো একখানা নয়, বুঝেছ হাঁদারাম?'

'হাঁদারাম মানে?'

'মানে তোমাদের বুদ্ধি অনেক কম একখানা মাত্র চোখে দেখতে হয় বলে। এই ধরো না মানুষের কথা। আমাদেরও তো রয়েছে তিনটে চোখ— তৃতীয় চোখটা কপালের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মগজের অংশ হয়ে গেছে।'

'মগজের অংশ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পণ্ডিতরা তাই বলছেন। গ্ল্যান্ড তো আমাদের অনেক। কিন্তু এই পিনিয়াল গ্ল্যান্ড বা তৃতীয় নয়নে আছে এন্তার অ্যাসট্রোসাইটস।'

'সেটা আবার কী?'

'এই জ্ঞান নিয়ে এসেছ পৃথিবীতে খবরদারি করতে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! অ্যাসট্রোসাইটস হচ্ছে খুব সাধারণ স্নায়ু কোষ, যা কিনা গাদা গাদা থাকে গুরুমস্তিষ্কে। গ্ল্যান্ড আর নার্ভ সেলের এই জড়াজড়ি থাকার কারণটা আজও রহস্যময়।

'কী বুঝলে?'

'রহস্যময়!'

'ধিক। আমাদের এই বাড়তি চোখটাই একটা বিরাট রহস্য। এই গ্ল্যান্ডের হরমোন আমাদের পুরো মানসিক ক্রিয়াকলাপের চরিত্র ঠিক করে দিচ্ছে। মনের চাইতে বড় শক্তি আর আছে?'

'না ইয়ে, নেই... তবে—'

'আবার, তবে কী? মনের চেয়ে বড় শক্তি আর হয় না। মানুষকে এই শক্তি দিয়েছে

বাড়তি চোখ— ঢাকা-পড়া চোখ। তোমাদের মতো ড্যাবড্যাব করে চোখ থাকে না শুঁড়ের ডগায়।'

'দ্যাখো, গালাগাল দিয়ো না বলছি।'

'গালাগাল মনে করলে গালাগাল। যা সত্যি, তাই বলছি, কপালের ওপর একখানা চোখ নিয়ে অত বড়াই করার কী আছে? তোমাদের ওই ড্যাবাড্যাবা চোখের ওজন কম করে আধ কেজি— আর আমাদের পিনিয়্যাল গ্ল্যান্ডের ওজন মাত্র ০.১ থেকে ০.২ গ্রাম। তারই এত শক্তি। ছোঃ।'

'আবার টিটকিরি?' বনবন করে ঘুরতে লাগল এবার বিকট বৃক্ষের বিকট চক্ষু।

'রহস্যময় এই চোখ আমাদের কুমিরদেরও আছে— অধুনালুপ্ত দানব প্যানগোলিনদেরও ছিল। আছে দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট টিকটিকি ইগুয়ানাদের, নিউজিল্যান্ডের গিরগিটি টুয়াটারাদেরও আছে। নিজেকে লুকিয়ে রেখে বাড়তি চোখটা দিয়ে দেখতে কত সুবিধে বলো তো? যেমন তুমি এখন দেখছ। রামভিতু কোথাকার।'

'কী! আমি ভিতু!' ভীষণ বেগে আঙুলরূপী শুঁড়গুলো পাক খাওয়ায় মনে হল গেল বুঝি কানের পরদা ফেটে।

অকুতোভয় প্রফেসরের মুখে তখন যেন কথার তুবড়ি, 'ভিতু ছাড়া কী? গর্তে থাকে যে সব ঠান্ডা রক্তের প্রাণীরা, মানে, সরীসৃপেরা, তারা তো বাড়তি চোখটাকে থার্মোমিটারের কাজে লাগায়— গায়ের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্যে। তুমিও তো দেখছি লুকিয়ে আছ সাপের মতো।'

'আমি সাপ!' শব্দ তরঙ্গ বজ্রধ্বনির মতো আছড়ে পড়ল কানের পরদায়। চৌবাচ্চার মধ্যে প্রায় ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিয়েছে বিকট ব্যাক্টিরিয়া।

'তার চাইতেও অধম বলেই তো মনে হয়,' নিষ্করুণ কণ্ঠস্বর প্রফেসরের, 'তৃতীয় নয়ন দিয়ে ব্যাঙাচিরা চামড়ার রং নিয়ন্ত্রণ করে। তুমিও তাই করো নাকি বাছাধন?'

জল তোলপাড় হয়ে গেল চৌবাচ্চার। নেহাত মোটা কাচ, নইলে ভেঙেই যেত বিকট বৃক্ষের লম্ফঝম্পের চোটে।

সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে প্রফেসর বলে গেলেন, 'আহা... আহা... এত খেপছ কেন। কেঁচোর মতো পোকা টুরবেলিয়ার সারা গায়ে তো সারি সারি চোখ আছে... কিন্তু তবুও তারা পোকা। আবার দেখো, এই পৃথিবীতে ঠিক তোমার মতো এক চোখো জীবও আছে...'

'আছে?' জল থেকে হাত খানেক লাফিয়ে উঠল বিকট বৃক্ষ।

'আছে বই কী। নাম তার কোপেপোডা। বুদ্ধিমান প্রাণী অবশ্য নয়। গ্রিক পুরাণের একচোখো দৈত্য সাইক্লোপের নামেও এদের বলা হয় সাইক্লোপ। সে হিসেবে পৃথিবীর মানুষের চোখে হয় তুমি একটা দৈত্য, না হয় একটা ইতর জীব।'

'ওরে মর্কট! ওরে বুড়ো! ওরে গবেট!' ধেই ধেই করে জল তোলপাড় করে নাচতে লাগল বিকট বৃক্ষ, 'অনেক দূরের গ্রহ থেকে এসেছিলাম তোদের এই পৃথিবীটায় রাজত্ব করব বলে— কিন্তু তোরা পোকামাকড়ের চাইতেও অধম। তোদের সংস্পর্শে থাকলেও আমরা এই পৃথিবীর অন্য গাছেদের মতো হয়ে যাব।'

মিষ্টি করে বললেন প্রফেসর, 'আমিও তাই বলি বাছাধন। যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই ফিরে যাও। এ বড় বাজে গ্রহ। কিন্তু যাবে কী করে?'

অট্টহেসে বলল গাছালি-মানুষ, 'সেই খেলাটাই দেখবি এবার। বাতাস, লবণ, জল থেকে প্রাণের সৃষ্টি করেছিল গাছ— ফিরে যাব সেই বাতাস, লবণ, জলের মধ্যেই। হাঃ হাঃ হাঃ... হাঃ হাঃ হাঃ... হাঃ হাঃ হাঃ।'

ব্যাকুল কণ্ঠে শুধোলেন প্রফেসর, 'কিন্তু ম্যাটারহর্নে তোমার জাতভাইরা? কপালী কুণ্ডুর রক্তের ব্যাক্টিরিয়ারা?'

ভীষণ বেগে চরকিপাক খেতে খেতে বললে বিকট বৃক্ষ, 'সবাই যাবে... সবাই যাবে... খবর চলে যাচ্ছে সব্বার কাছে... পালা... পালা... পালা... একলা থাকতে দে।'

জল উথলে ভাসিয়ে দিল গবেষণা ঘর। চুপচাপ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। প্রফেসরকে টপ করে কোলে তুলে নিয়ে পাঁই পাঁই করে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। বাইরে থেকেই শুনলাম উন্মাদের মতো অট্টহাসি একটু একটু করে গোঙানির মতো হয়ে যাচ্ছে... তারপর চাপা ঘড়ঘড় শব্দ... তারপর সব চুপ।

ঘণ্টা খানেক পরে ঢুকলাম বাড়ির মধ্যে।

চৌবাচ্চার জল অর্ধেক নেই। ঘর ভেসে যাচ্ছে জলে।

কোথাও নেই সেই বিকট বৃক্ষ।

পরের দিনই টেলিফোন এল ডা. বক্সীর কাছ থেকে, 'প্রফেসর, ম্যাটারহর্ন ব্যাক্টিরিয়া একেবারে উধাও হয়েছে কপালী কুণ্ডুর রক্ত থেকে। ব্যাপারটা কী বুঝলাম না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল হয়ে গেছে মেয়েটা... কাঁটাগুলো খসে পড়ছে... ব্রেনটা একটু যা ড্যামেজড হয়েছে— মেমারি সেল কিছু নষ্ট হয়ে গেছে... আগের কথা মনে করতে পারছে না। কী... কী বললেন? ভালই হয়েছে? কেন? কেন? কেন?'

'ম্যাটরহর্নকে একেবারে ভুলে যাওয়ার জন্যে,' বলে, রিসিভার রেখে দিলেন প্রফেসর।

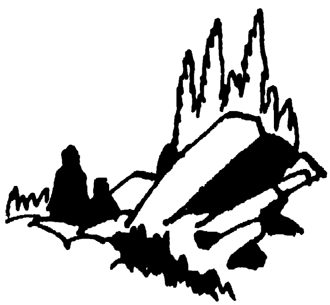

রক্তের মধ্যে বিষ

এক: অমানুষের আবির্ভাব

'আজ্ঞে না, আমি ভূত নই।'

'তবে তুমি কে?'

'অমানুষ।'

'সে তো আরও ভয়ংকর। ভূত নও, প্রেত নও, মানুষ নও.— অমানুষ। দেখতেও তোমাকে অতি বিকট। বৎস আগন্তুক, তোমার আগমনের অভিপ্রায়?'

'সেটা বলতেই এসেছি।'

'বলে ফেললেই হয়। এত ধানাই পানাই কেন?'

'আমার চেহারাটা দেখে আঁতকে উঠলেন কেন?'

'মূর্খ! প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কাউকে দেখে আঁতকায় না। আমি অবাক হয়েছিলাম। ওই তো দীননাথ সব শুনছে। ওকেই জিজ্ঞেস করো না।'

লোকটা এতক্ষণ টুলে বসে ছিল। প্রফেসর ওর সামনের চেয়ারে বসে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দন্তহীন মাড়িতে সুড়সুড়ি দিতে দিতে কথা বলছিলেন। আমি চৌকাঠ পেরিয়েই থমকে গেছিলাম তার চকচকে মাথা দেখে। মানুষের মাথায় সচরাচর টাক পড়ে সামনে, পেছন দিকে কিছু না-কিছু চুল থাকে। এর পেছনটা বিলকুল চকচকে। গায়ে জামাকাপড়ের বালাই নেই। ইলেকট্রিক বাল্‌ব-এর আলো ঠিকরে যাচ্ছে তার চকচকে গা থেকে। কারণ, গায়ে সাজানো রয়েছে বড় বড় আঁশ। মাছের গায়ের আঁশের মতো। পিঠের দু'পাশে ফুলে রয়েছে। দুটো ফুটো দেখা যাচ্ছে সেখানে। সবুজ শ্যাওলা জমেছে সর্বাঙ্গে। তবুও চকচক করছে ধাতু।

তার গা থেকে জল পড়ছে। মেঝে ভিজে গেছে। ওই জন্যেই নিশ্চয় চেয়ারে বসতে দেননি— টুলে বসিয়েছেন।

প্রফেসর যখন বললেন, 'ওই তো দীননাথ সব শুনছে। ওকেই জিজ্ঞেস করো না।'— তখন তার উচিত ছিল সবেগে ঘুরে বসা, অথবা তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠা।

কিন্তু সে এসবের ধার দিয়েও গেল না। পিঠ খাড়া করে যেমন বসে ছিল, ঠিক সেই ভাবেই বসে রইল।

বলল, 'আমি দেখেছি।'

প্রফেসর মাড়িতে সুড়সুড়ি দেওয়া বন্ধ করলেন। দেশলাইয়ের কাঠি ছুড়ে ফেলে দিলেন। চোখ কুঁচকে আগন্তুকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'কী করে দেখলে?'

'আমার মাথার পেছন দিকেও একটা চোখ আছে।'

'তোবা! তোবা! মাথার সামনে একটা চোখ— মাছের চোখের মতো। পেছনেও একটা চোখ। তুমি তো ভয়ংকর অমানুষ হে।'

এতক্ষণে আমার নজরে এল চোখটা। ঘরের আলো সামনের দিক থেকে লোকটার মুখে পড়ছিল, ওপরেও একটা আলো জ্বলছিল। কিন্তু টেকো মাথার পেছন দিকটা ঢিবি হয়ে থাকায় তলার খোঁদলে কী আছে দেখা যাচ্ছিল না।

এবার ঠাহর করতেই দেখতে পেলাম চক্ষুরত্নটিকে। রত্ন ছাড়া তাকে আর কী বলব? বিলকুল গোল। যেন একটা কাটাই করা দামি পাথর সেট করা রয়েছে খোঁদলের মধ্যে।

সে-চোখে পাতা নেই। মাছের চোখেও পাতা থাকে না।

নির্নিমেষে অমানুষিক চাহনি মেলে রয়েছে সেই চক্ষু— আমার দিকেই।

গা শিরশির করে উঠেছিল আমার। নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম আমি।

প্রফেসরের কিন্তু ভয়ডর নেই। বরং বিলক্ষণ কৌতুকেই আছেন মনে হল। ফিক করে একটু হেসেও ফেললেন।

বললেন, 'বাপু হে অমানুষ, এসেছি দিঘায় বেড়াতে— তোমার কেচ্ছা শুনতে নয়। তোমার বদখত মুখ আর বপু দেখে আমার গুণধর অ্যাসিস্ট্যান্টটি ভয় পেয়েছে। তোমার সামনে একটা চোখ, পেছনে একটা চোখ। তোমার মাথায় চুল নেই, গায়ে লোম নেই— শুধু আঁশ আর আঁশ। তোমার সারা গা দিয়ে জল ঝরছে, তোমার গা থেকে বিচ্ছিরি গন্ধও বেরোচ্ছে। কাজেই তুমি চটপট বিদেয় হলে আমি বড়ই খুশি হব।'

লোকটা কথা বলছিল খুব কষ্ট করে। এক-একটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে যেন হাঁপিয়ে যাচ্ছিল। হাপর চালালে যেমন সোঁ সোঁ শব্দ হয়, ঠিক তেমনই শব্দ হচ্ছিল। টুলের ওপর স্ট্যাচুর মতো বসে থেকে সে শুধু বললে, 'আমার কথা না-শুনলে আপনাদের অবস্থা হবে আরও শোচনীয়।'

প্রফেসর একটু নড়েচড়ে বসলেন, 'আসা হচ্ছে কোথা থেকে?'

জবাব দিল না কিম্ভূত লোকটা। কেটে গেল কয়েকটা সেকেন্ড। পেছন থেকে আমি দেখলাম ঝকঝকে পাথরের মতো চোখটায় যেন রংবেরঙের আলোর আনাগোনা দেখা গেল। তারপর সব রং আবার মিলিয়ে গেল।

প্রফেসরও চেয়ে ছিলেন সামনের দিকের চোখের পানে। বিস্ফারিত দুই চোখে ঘনীভূত বিস্ময় দেখে বুঝলাম, ওই চোখেও আলোর ঝলক তিনি দেখেছেন।

বললেন, 'সংকেত এল মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এল।'

'এত আলোর খেলা দেখিয়ে কারা সংকেত পাঠাচ্ছে?'

'এখুনি শুনবেন।'

'কী বলবে, তা জানিয়ে দেওয়া হল?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও কিন্তু বলোনি নিবাস কোথায় তোমার।'

'নিজের চোখেই দেখবেন, তাই আর বলতে চাই না।'

'তুমি কথা বলছ ঠিক মেশিনের মতো গলায়। স্বরের ওঠানামা নেই। যেমনই বিচ্ছিরি তোমার কথা, তেমনি বিটকেল তোমার চেহারা, তেমনি কদাকার তোমার চোখ। হে অমানুষ, তোমার শ্রীনিবাস দেখবার কোনও বাসনা আমার নেই। আমার ঘুম পেয়েছে, আসতে পারো।'

লোকটা এবার টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রুপোলি আঁশগুলো ঝকঝকে করে উঠল বিদ্যুৎবাতির আলোয়।

যান্ত্রিক স্বরে সে বললে, 'সংকেতেই হুকুম এল, আপনাদের নিয়ে যেতে। যাওয়ার দরকার হত না যদি আমাকে কথা বলতে দিতেন।'

প্রফেসরও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'যত্ত সব আপদ! দূর হও এখুনি।'

লোকটার মাথার পেছনে পাথরের মতো চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে এল। চকিতের জন্যে দেখলাম, তার মাথার সামনের দিকের চোখ থেকেও বিদ্যুৎ-রশ্মি ঠিকরে গেছে প্রফেসরকে নিশানা করে। তীব্র ঝলকে উদ্ভাসিত তাঁর মুখমণ্ডল। দুই বিস্ফারিত চোখে সুনিবিড় বিস্ময়বোধ। ভয় নেই, আতঙ্ক নেই— শুধু বিস্ময়।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

দুই: মেশিন-সম্রাটের খপ্পরে

এরপর মনে আছে আচ্ছন্নের মতো হেঁটে যাচ্ছি দিঘার সমুদ্রের দিকে। ভিজে বালির ওপর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছি আমি আর প্রফেসর। সামনে কিছু দূরে চলেছে সারা গায়ে আঁশ ঢাকা বিচিত্র সেই অমানুষ। সে পেছন দিকে ঘাড় না-ঘুরিয়েও পেছনে আমাদের দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে পেছনের চোখ দিয়ে।

আমরা হাঁটছি যেন ঘুমের ঘোরে। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন দেখছি ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মুকুট, শুনছি চাঁদের মৌন সংগীত। আমার প্রাণে শঙ্কা নেই, মনে কৌতূহল নেই, কোথায় চলেছি তা নিয়েও মাথাব্যথা নেই। কেন যাচ্ছি, তাও জানি না। শুধু যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি।

অমানুষ নেমে গেল জলের মধ্যে। আরও গভীরে। অনেক দূরে তার চকচকে টাক মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যাচ্ছে। সে কিন্তু এখনও ঘাড় ঘোরায়নি।

আমরাও সম্মোহিতের মতো জলে নেমেছি। শীতল জল আমাদের মোহভঙ্গ ঘটায়নি।

বরং ভালই লাগছে। স্বপ্নের মধ্যে এরকম ভাল লাগা অনুভূতি অনেক সময় হয়। আমরাও বুঝি স্বপ্ন দেখছি।

জল কোমর ছাড়িয়ে গলা পর্যন্ত পৌঁছোল। ঢেউ আমাদের টলিয়ে দিচ্ছে। তবুও এগিয়ে যাচ্ছি। কোথায়? কেন? জানি না।

দূরে চাঁদের আলোয় ধোওয়া অমানুষের অমানুষিক মাথা ল্যাম্পপোস্টের মতো খাড়া। লাইটহাউসও বলা চলে। কেননা, সামনের পাথরের চোখ থেকে মাঝে মাঝে সার্চ-লাইট ঠিকরে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রের দিকে। আলোক সংকেত নিঃসন্দেহে। তার নমুনাও পেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

সমুদ্র যেখানে দিগন্তে মিশেছে, সেইখানে অনুরূপ সার্চলাইটের ঝলক দেখলাম একবার... দু'বার... তিনবার। তারপরেই তা নিভে গেল।

আমরা জল ঠেলে ঠেলে যখন অমানুষের ঠিক পেছনে পৌঁছেছি, আচমকা ভু-উ-উ-স করে একটা জলযান ভেসে উঠল আমাদের পাশেই।

আমরা দু'জনে কেউই অবাক হলাম না।

শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আজব জলযানকে। স্পিডবোটের মতন দেখতে। মাথায় কিন্তু ছাউনি। সব মিলিয়ে যেন একটা ডাংগুলির গুলি। লম্বায় প্রায় পনেরো ফুট। সারা গায়ে চকচকে ধাতব আঁশ।

নিঃশব্দে একটা প্লেট সরে গেল জলযানের গা থেকে। আমাদের কিছু বলতে হল না। সুবোধ বালকের মতো প্রথম আমি ঢুকলাম ভেতরে। তারপর টেনে নিলাম প্রফেসরকে।

প্লেট সরে এল। এবার আর তা ধাতুর নয়। কাচের মতো স্বচ্ছ পদার্থের। আমরা দেখলাম নিমেষে সমুদ্রের জল ঢেকে দিল সেই জানলাকে। বুঝলাম, জলে ডুব দিল যন্ত্রযান।

জলের তলায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে জোরালো আলোয়। এ আলো বেরোচ্ছে ডুবো যানের গা থেকে। তীব্র বেগে ছুটছে যন্ত্রযান। ভয়ানক সেই বেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অক্লেশে ধেয়ে চলেছে অমানুষ— স্বচ্ছ জানলার ঠিক পাশে পাশে। সাঁতার কাটছে না। দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে। পিঠের দুটো ফুটোর কাছে শুধু জল তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

বুঝলাম, প্রচণ্ড শক্তির প্রবাহ বেরিয়ে আসছে ওই দুটি ছিদ্র থেকে। তারই ধাক্কায় জীবন্ত জেটযানের মতো বেগে ধেয়ে চলেছে অমানুষ।

নিরাসক্ত চোখে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নরম গদির ওপর।

ঘুম ভাঙল দু'জনের একসঙ্গেই।

সামনের প্লেট খোলা। গদির বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে এসেছিলাম দু'জনে।

দেখেছিলাম, ডুবো যান এখন মেঝের ওপর উঠে এসেছে। জল নেই আশেপাশে কোথাও।

মেঝেটাও অদ্ভুত। সিমেন্টের বা পাথরের নয়— ধাতুর। ধাতুর চাদর জুড়ে জুড়ে তৈরি মসৃণ মেঝে। তার গায়ে অজস্র নকশা। উদ্ভট। হেঁয়ালিপূর্ণ।

আশ্চর্য এই মেঝে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। শেষ দেখা যাচ্ছে না। অনেক উঁচুতে

একটা ছাদ আছে বটে, কিন্তু তা এত উঁচুতে যে, তা কী দিয়ে তৈরি বোঝা যাচ্ছে না।

সীমাহীন প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা তিনজন। আমি, প্রফেসর আর অমানুষ। আর সেই জলযান।

সমস্ত প্রান্তর ঠান্ডা আলোয় আলোকিত। এ-আলো কোত্থেকে আসছে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

আমার এবং প্রফেসরের আগের ঘুম ঘুম ভাবটা এখন আর নেই। যেন ঘুম ভাঙল। স্বপ্ন দেখা শেষ হল।

দেখলাম, রুষ্ট নয়নে অমানুষের দিকে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর। কথা বলতে গেলেন বেশ কড়াভাবে, তার আগেই সবুজ রশ্মির ঝলক দেখলাম তার একটা পাথরের চোখে।

রশ্মিরেখা জলযানকে স্পর্শ করল। তলার মেঝে নিঃশব্দে সরে গেল। জলযান গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে গেল। মেঝে আবার সরে এল। এতটুকু ফাঁক আর কোত্থাও দেখা যাচ্ছে না।

এখন আমরা শুধু তিনজন। অমানুষ ভয়ানক পাথর-চোখ মেলে দেখছে আমাদের।

তিরিক্ষে গলায় প্রফেসর বললেন, "কিডন্যাপিং-এর মজা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব বাছাধন।'

অমনি আশপাশের বাতাস থরথর করে কেঁপে উঠল একটা ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বরে। আশ্চর্য সুরেলা সেই গলার আওয়াজ গুমগুম করতে করতে মাঝের ধাতুর চাদরের ওপর দিয়ে মিলিয়ে গেল দূরে... দূরে... অনেক দূরে।

কণ্ঠস্বর বললে, 'প্রফেসর, ওর গায়ে হাড় নেই।'

'কার কণ্ঠস্বর?' আশপাশে চাইতে চাইতে বললেন প্রফেসর— যেন নাটকের সংলাপ বলছেন।

'আমার।'

'তুমি কে হে ছোকরা?'

'ছোকরা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!' অট্টহাসি যে এরকম বজ্রগর্ভ নিনাদিত হতে পারে, সেদিন তা বুঝলাম। ধাতুর মেঝে পর্যন্ত বুঝি ঝনঝন করে কেঁপে উঠল বিশাল আওয়াজের সেই অট্টহাসিতে। 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, আমি ছোকরা নই, বৃদ্ধ নই, শিশু নই। আমার বয়স নেই।'

'তবে তুমি পাগল।'

'সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝবেন এখুনি। আপনাদের হাড় আছে বলেই বুঝবেন। ওর কিন্তু নেই।'

'মানে ওই অমানুষটার?'

'অমানুষ তো বটেই। প্রায় মানুষের মতোই। কিন্তু আদতে একটা মেশিন। আমার নাম্বার ওয়ান সুপার কম্পিউটার। সিলিকন-চিপ দিয়ে তৈরি।'

'সেইরকম সন্দেহ ছিল আমার। চোখের পাথরটা যে লেন্স আর বডিটা যে মেট্যালের— তা বুঝেছিলাম প্রথম দর্শনেই।'

'সেটা বোঝবার বুদ্ধি আছে বলেই আপনাকে এখানে আনা হয়েছে। এখন কাজের কথা।'

'কান খাড়া করলাম, মেশিন-সম্রাট।'

'মেশিন-সম্রাট? হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!'

অট্টহাসির দমকেই কিনা জানি না, আওয়াজের ধাক্কায় বাতাসের আলোড়নের জন্যেই কিনা বলতে পারব না— অকস্মাৎ বিকট হুংকারে ভয়াবহ ঝড় তেড়ে এল দৃশ্যমান অদৃশ্যলোক থেকে। মসৃণ মেঝেতে আমরা কিছুই আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলাম না।

ঝড় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গেল শূন্য পথে।

পাকসাট খেতে খেতে উড়ে যেতে যেতে দেখলাম, ধাতুর মেঝেতে নিশ্চয় চুম্বকের পা লাগিয়ে স্ট্যাচুর মতো খাড়া রয়েছে অমানুষ।

তিন: বরফলোকের বিভীষিকা

কত দিন, কত মাস, কত বছর না-জানি শূন্যপথে ডিগবাজি খেতে খেতে এইভাবে উড়ে গেছিলাম। হিসেব? মনে রাখা অসম্ভব। সময় কি হারিয়ে গেছিল। হয়তো সম্ভব। হুঁশ ছিল কি! কখনও ছিল, কখনও ছিল না। কখনও অনেক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখেছি। কখনও তাল তাল তমিস্রাপুঞ্জ দৃষ্টিপথকে রোধ করেছে। কখনও অকথ্য যন্ত্রণায় মগজের যাট মহাপদ্ম স্নায়ুকোষ মৌন আর্তনাদ করেছে। কখনও তারা সুপ্তি আর লুপ্তির টানাপোড়েনে ঘোরের মধ্যে চলেছে।

আমরা দেখেছি হাজার রঙের স্রোত আশপাশ দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে চলেছে। আমরা দেখেছি এই স্রোতের টানে ভেসে যেতে যেতে অকস্মাৎ এনার্জির বিস্ফোরণে সব রং ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে দিকে দিকে সোনা রুপো হিরে মানিক চুনি পান্নার অজস্র কুচির মতো। আমরা দেখেছি কী এক মহাশক্তির অবর্ণনীয় আকর্ষণে অকস্মাৎ আমাদের দেহ মাইলব্যাপী লম্বা হয়ে গেছে-- সরু সুতোর মতো দেহ নিয়ে আমি আর প্রফেসর পাশাপাশি অনেক ব্ল্যাক হোল-এর এনার্জিপুঞ্জকে এঁকেবেঁকে পাশ কাটিয়ে ধেয়ে চলেছি তো চলেইছি। বিস্ময়কর এবং অতীব অবিশ্বাস্য এই মহাযাত্রার শেষ কোথায়, অন্তে কী পরিণতি অপেক্ষা করছে, অদৃষ্টে কী আছে— তা নিয়ে একবারও ভাবিনি... ভাববার অবকাশ পাইনি।

সবচেয়ে অবাক কথা এবং অসহ্য অবস্থাও বটে, কানের কাছে বিরামহীনভাবে নিনাদিত হয়ে চলেছিল সেই অপার্থিব অট্টহাসি। ভয়ানক গম্ভীর, আশ্চর্য সুরেলা এবং বিকট করাল কণ্ঠস্বরে অনেক কথাও শুনিয়ে গেছে অট্টহাসির ফাঁকে ফাঁকে। সব কথা মনে নেই প্রাণান্তকর ওই অবস্থায়। কতগুলো কথা একেবারেই গেঁথে গেছে মগজের কোষে কোষে।

'প্রফেসর! মাস্টার দীননাথ! আমার রাজত্বের কিছুটা দেখিয়ে দিচ্ছি।... না, না, এগুলো নিছক রঙের স্রোত নয়— এরা আমারই যন্ত্রপাতির বিকিরণের প্রবাহ। ওই যে বিস্ফোরণটা দেখে আঁতকে উঠলেন, ওই থেকেই শক্তি ছুটে যাচ্ছে আমার সাম্রাজ্যের দিকে দিকে। ওরকম বিস্ফোরণ মাঝে মধ্যেই দেখবেন। শক্তি! শক্তি! শক্তি! মহাশক্তিদের খেলা চলছে এখানে— আমারই হুকুমে... আমারই পরিকল্পনায়। আমি কে? যথাসময়ে তা জানবেন।

এসে গেল আমার অগুন্তি কারখানার একটা কারখানা— কেল্লায় ঢুকতে হলে আপনাদের শরীরগুলোকে সরু করে নিতে হবে... তাই করে দিচ্ছি... সুতোর মতো সরু... মাইলখানেক লম্বা। কীরকম লাগছে প্রফেসর মশাই? মাস্টার দীননাথ। এসে গেছে কারখানা... এইবার ফিরিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দেহ।'

আচম্বিতে এক ঝটকায় ফিরে এল আমাদের আগেকার অবস্থা। হাড়মাস যেন ককিয়ে উঠল সেই ঝটকানিতে। হালকা তুলোর মতো আমরা ভাসতে লাগলাম শূন্যে। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপতে লাগলাম ঠকঠক করে।

কেননা, পায়ের তলায় দেখলাম ধুধু বরফের রাজত্ব। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে— যেদিকে তাকাই শুধু বরফ আর বরফ। কোথাও তা পাহাড়ের মতো উঁচু, কোথাও তা সমতলের পর্যায়ে। দিগন্ত বিস্তৃত এই বরফলোকের ওপর জায়গায় জায়গায় ভাসছে লাল নীল সবুজ হলদে বেগুনি কমলা রঙের মেঘ আর কুয়াশা। নরম আলোর ঝিকিমিকি লক্ষ নক্ষত্র হয়ে যেন ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে এদের গা থেকে, ববফের বুক থেকে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে যখন এই দৃশ্য আমরা দেখছি, ঠিক তখনই নীচ থেকে দু'-দুটো রশ্মি ধেয়ে এল আমাদের লক্ষ্য করে। কচি কলাপাতা রঙের ঠান্ডা রশ্মি জড়িয়ে গেল আমাদের সর্বাঙ্গে। যেন কোমল পরিচ্ছদে আবৃত হল মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

তারপর সেই রশ্মি আমাদের একটু একটু করে টেনে নামিয়ে আনল মেঝেতে।

না। এখানকার মেঝে ধাতু দিয়ে তৈরি নয়— বরফে ঢাকা। এবং আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে সেই অমানুষ— যার সারা গা আঁশে ঢাকা, যার পাথ.া-চোখে এইমাত্র ঢুকে গেল রশ্মি দুটো আমাদের ওপর থেকে নীচে টেনে নামিয়ে আনবার পর।

রশ্মি এখন আর আমাদের জড়িয়ে নেই। আমরা হাত-পা নাড়তে পারছি। চোয়াল নাড়তেও পারছি।

সুতরাং প্রথমেই দাবড়ানি দিলেন প্রফেসর, 'বেল্লিক বেকুব কোথাকার! আমরা মানুষ না অমানুষ?'

'মানুষ'— সংক্ষিপ্ত উত্তর অমানুষের।

প্রফেসর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। একটা তাগড়াই জবাব দিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দূরে চোখ পড়তেই বাকরোধ ঘটল।

আমিও তাকালাম সেদিকে। মনে হল যেন লকলকে শিখা চতুর্দিকে ছড়াতে ছড়াতে একটা ভীমকায় নরকপুঞ্জ উল্কাবেগে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে।

দেখতে দেখতে অনেক কাছে এসে গেল পুঞ্জটা। প্রতিটি শিখা শুঁড়ের মতো শূন্যে কিলবিল করে উঠেই আবার ঢুকে যাচ্ছে শরীরের মধ্যে। রংবেরঙের ফুলকি ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে শুঁড়গুলার ডগা থেকে।

'চলমান তারাবাজি নাকি?' অস্ফুট কণ্ঠে বলে ফেললেন প্রফেসর।

'আশ্চর্য আতসবাজি নিঃসন্দেহে', বললাম আমি।

কানের কাছে আবার ধ্বনিত হল সেই অবর্ণনীয় মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর, 'মূর্খ! অপটিক্যাল কম্পিউটরের নাম শোনেননি?'

জুলজুল করে তাকালেন প্রফেসর, 'তা শুনেছি।'

'দেখতে পাচ্ছেন না ওর সারা গায়ে ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে লেসার রশ্মি ছুটে ছুটে যাচ্ছে।

তাও তো বটে! আগুনের ফুলকি বলে যাদের ভেবেছিলাম সেগুলো তো ছোট ছোট রশ্মি ছাড়া কিছুই নয়। লক্ষ রশ্মি লক্ষ ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে ছুটোছুটি করছে। লক্ষ রামধনু ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এ যে কল্পনাও করা যায় না।

লক্ষ অর্গান কণ্ঠে বললে অদৃশ্য সত্তা, 'এই হল গিয়ে আমার দোসরা নম্বর সুপার কম্পিউটার। এর কাজ শুধু পাহারা দেওয়া— অরগ্যানিক সুপার কম্পিউটারকে বাড়তে দেওয়া।'

'অরগ্যানিক সুপার কম্পিউটার!' প্রফেসর নাটবল্টু চক্র ঢোক গিললেন মনে হল?

দৈববাণীর কণ্ঠস্বরে এবার বুঝি বিদ্রূপ ঝরে পড়ে, 'জি হ্যাঁ, প্রফেসর। বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক নিয়েই তো যত খেলা আমার এই সাম্রাজ্যে।"

আমার মাথায় তখন এত কচকচি ঢুকছে না। আমি সভয়ে চেয়ে আছি হাত-চরকিবাজির মতো কিম্ভূত অপটিক্যাল সুপার কম্পিউটারের দিকে। আমি জানি না কথাটির মানে কী, কিন্তু ওই নামের বস্তুটি যে সর্বনাশের সংকেত বহন করে চলেছে প্রতিটি বিদঘুটে আচরণের মধ্যে, সে বিষয়ে নেই কোনও সন্দেহ।

অজস্র আকারের এবং অবিশ্বাস্য বর্ণের ক্রিস্টালগুলো এখন অবিরাম রোশনাই বিকিরণ করে চলেছে লক্ষ রশ্মির আঘাতে। আমাকে আর প্রফেসরকে ঘিরে উদ্দাম নৃত্য করে চলেছে সে শূন্য পথে। তার সারা গা থেকে মনে হচ্ছিল যেন ফুলকিগুলো ছিটকে ছিটকে হারিয়ে যাচ্ছে। এখন দেখলাম তা নয়। বাতাসের বুকে বিশেষ প্যাটার্নের নকশা আঁকছে— পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে তারই অবয়বের মধ্যে। প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে এই অপার্থিব অপটিক্যাল সুপার কম্পিউটার। চোখে ধাঁধা লাগছিল বলেই কিনা জানি না, আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে হল লক্ষ ক্রিস্টাল চক্ষু মেলে ভয়ংকর এই বিভীষিকাটা আমাদের নাড়ি নক্ষত্র পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। আমাদের রক্ত মেদ-মজ্জার চুলচেরা হিসেব নিচ্ছে। মাথার মধ্যে একটা রিমঝিম রিমঝিম মৃদু বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম। সেটাও এই উদ্ভট অপটিক্যাল কম্পিউটারের কারসাজি কিনা বলতে পারব না।

সহসা উদ্দাম নাচ বন্ধ করে আমাদের ঠিক সামনে সে শূন্যে ভাসতে লাগল। তার পরেই বিশেষ একটা আটকোনা ক্রিস্টাল থেকে একটা আলপিনের মতো সরু টকটকে লাল রঙের রশ্মি সাঁত করে ছুটে এসে বলা নেই কওয়া নেই ঢুকে গেল প্রফেসরের খুলির মধ্যে।

আমি আঁতকে উঠে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছি প্রফেসরের দিকে, তার আগেই অমানুষের চোখ থেকে ঠিকরে এল সেই বিদ্যুৎ রেখা। আমি কাঠের পুতুল হয়ে গেলাম বললেই চলে। ঠিক যেভাবে তেড়ে যেতে যাচ্ছিলাম সেইভাবেই বেঁকে চুরে দাঁড়িয়ে গেলাম— চোখের পাতাও আর ফেলতে পারলাম না।

তাই অসহায়ের মতোই দেখলাম কল্পনাতীত সেই দৃশ্য।

সরু আলপিনের মতো লাল রশ্মিটা প্রফেসরের করোটির মধ্যে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেমন জানি হয়ে গেলেন। শিবনেত্র হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তন্ময় হয়ে কী যেন

শুনছেন মনে হল। মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিলেন দেখলাম। যা শুনছেন, তা কখনও মনে ধরছে না বলে প্রবলবেগে মাথাও ঝাঁকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ফিকফিক করে হাসছেন। পাগল-টাগল হয়ে গেলেন নাকি? লাল রশ্মি কিন্তু তাঁর কপাল ভেদ করে রয়েছে দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে। ছুঁয়ে নেই— ফুঁড়ে রয়েছে। কেননা, মাঝে মাঝে করোটির পেছন দিয়েও লাল রশ্মির অগ্রভাগ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে— ফের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

কতক্ষণ যে এই দৃশ্য দেখতে হয়েছিল, সে হিসেব আমি বলতে পারব না।

শেষের দিকে আর সইতে পারিনি। চোখে ধোঁয়া দেখেছিলাম! জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

চার: মানুষ না ভূত

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখেছিলাম প্রফেসর সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।

আমি শুয়ে আছি প্রফেসরের কোলে মাথা দিয়ে। আমার সামনেই মিনারের মতো দেখতে অমানুষটা দাঁড়িয়ে পাথরের এক চোখ মেলে দেখছে আমাকে। উলটো দিকের চোখটার কীর্তিকলাপ দেখতে পেলাম না।

আমি চোখ মেলতেই সে বললে যান্ত্রিক স্বরে, 'চলুন।'

ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। প্রফেসর বেগতিক বুঝে আমাকে জাপটে ধরতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না। আমি ধনুক থেকে ছিটকে যাওয়া তিরের মতো গিয়ে পড়লাম অমানুষের গায়ের ওপর। সে বেচারির যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতাকে টেক্কা মেরে দিলাম আমার মানুষিক ক্ষিপ্রতা দিয়ে।

লক্ষ্য এবং মতলব স্থির করাই ছিল। সবলে খামচে ধরলাম তার দু'-দুটো পাথরের চোখ। নখসমেত আঙুল বসিয়ে দিয়েছিলাম পাথরের কিনারা দিয়ে। তাই এক হ্যাঁচকাতেই সকেট থেকে তুলে এনেছিলাম চোখ দুটোকে।

সঙ্গে সঙ্গে কানের পরদা ফাটানো আর্তনাদে কান ঝালাপালা হয়ে গেছিল আমার আর প্রফেসরের দু'জনেরই। বিষম ব্যস্ত হয়ে তড়িঘড়ি আমাকে চেপে ধরে বিদিগিচ্ছিরি চেঁচিয়ে গেছিলেন প্রফেসর, 'দীননাথ! দীননাথ! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

অন্ধ অমানুষের পরিত্রাহি চিৎকার চাপা পড়ে গেছিল, রক্ত জল করা দৈববাণীর মতো কণ্ঠস্বরে, 'মাস্টার দীননাথ! মূর্খ দীননাথ! মাথামোটা দীননাথ! ফিরিয়ে দাও ওর চোখ।'

গলার শির তুলে চেঁচিয়ে ছিলাম আমি, 'চোপরাও ভূত কোথাকার! জানিস ক্ষত্রিয় বংশে আমার জন্ম! তোর হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব আমি।'

'দীননাথ! আমি ভূত নই, প্রেত নই, দত্যি নই, দানব নই— আমি মানুষও না, পিশাচও না— আমি... আমি...।'

শশব্যস্তে বললেন প্রফেসর, 'থাক, থাক, ওকে বলতে হবে না। ছেলেমানুষ! ভয় পাবে।'

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে গেল এই কথায়। ছেলেমানুষ! ভয় পাবে! মুচিপাড়ার মিঞা আমি। মাথায় একটু গবেট হলে কী হবে, মরতে ভয় পাই না

কাস্মনকালেও। খোদ প্রফেসরকে কতবার বাঁচিয়েছি স্রেফ এই গোঁয়ারতুমি দিয়ে, প্রফেসর কি তা ভুলে গেছেন?

তারস্বরে তাই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়— তিন থাকতে নয়! রে রে ভূত সম্রাট, চ্যালার চোখের ম্যাজিক আমার এই হাতের মুঠোয়। দ্যাখ তার কী অবস্থা করি।'

কাণ্ডজ্ঞান আগেই হারিয়েছিলাম, নইলে এমন একটা সিন ক্রিয়েট করি ওইরকম একটা পরিস্থিতিতে। চোখ দুটো উপড়ে এনে ভাল করেছিলাম কি মন্দ করেছিলাম, সেটা পরের ঘটনাগুলোয় জানা যাবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে এমন একটা গুখুরির কাজ করে বসলাম, তার জন্যে লজ্জা পাই।

ডান হাতের একটা পাথর আছড়ে ফেলেছিলাম পায়ের কাছে এবং সেটা ছিটকে গড়িয়ে যাওয়ার আগেই জুতো দিয়ে মাড়িয়ে বেশ করে রগড়েছিলাম মেটাল মেঝের ওপর।

পরিণামটা এমন ভয়ংকর হবে কে জানত। পাথরের মধ্যে যে এত রশ্মিদের বন্দি করে রাখা হয়েছে, তাই বা কে জানত!

নিমেষে ভলকে ভলকে অগ্নিশিখার মতো রোশনাই ছিটকে গেল পায়ের তলা দিয়ে রগড়ানো পাথর-চক্ষু থেকে। মাউন্ট এটনা, ক্রাকাতোয়া, ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত একযোগে শুরু হয়ে গেলেও এমন আলো আর আগুনের প্রলয়ংকর খেলা দেখা যেত না। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। মাথার মধ্যে মুগুর পড়তে লাগল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম।

আর একটা গুরু গুরু গুম্ গুম্ শব্দ শুনলাম। অনেক দূর থেকে বরফলোককে থরথর কম্পিত করে সেই নৃত্যের তালে তালে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। চারপাশের বরফমুলুকে আচম্বিতে শুরু হয়ে গেল ভয়ানক ঝড়। তুষার-ঝড় কী ভয়ানক সুন্দর হতে পারে, সেই মুহূর্তে তা প্রত্যক্ষ করলাম। ঠান্ডা আলোর পাশাপাশি এসে জুটল হিম আবছায়া। সেই লোমহর্ষক আবছায়ার মধ্যে কারা যেন কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসছে মনে হল, রক্ত ছলকানো মৃদঙ্গ-ছন্দের তালে তালে।

আমার কানের কাছে নিনাদিত হল একশোটা বাজনার মতো অদৃশ্য সত্তার অট্টহাসি, 'ভূত মনে করেছিলে আমাকে, তাই নয়? দেখো তবে আমার ভূতেদের খেলা। কই রে তোরা! আয়... আয়... নেচে নেচে চলে আয়! দেখিয়ে যা তোদের মূর্তিগুলো!'

হুহুংকার তুষার-ঝড়ের আবছায়া ভেদ করে তারা এগিয়ে এল দলে দলে— সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতায় কুচকাওয়াজ করে। তাদের প্রত্যেকের ডান পা একই সঙ্গে পড়ছে মেঝেতে, একই সঙ্গে এগিয়ে আসছে বাঁ পা। পদভারে মেদিনী কাঁপছে থরথর করে। কনকনে হাওয়ার ঝাপটার পর ঝাপটায় তাদের হিলহিলে দেহগুলো উড়ে যাওয়ার কথা— তারা কিন্তু টলছে না, কাঁপছে না— শুধু এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে।

ঠকঠক করে কাঁপছি আমি। তাদের যে অবয়ব দেখছি তা এতই বিকটাকার যে লোমকূপে লোমকূপে জাগছে বিষম আতঙ্ক। ডাকাবুকো বলে আমার বদনাম আছে— কিন্তু ভূত-কাতর বলেও আমার নামে রটনা আছে। সে-রটনা যে মিথ্যে নয়, তা টের পেলাম হাড়ে হাড়ে।

এরা কারা? এদের কারও চোখ গর্তে খসে গেছে, কারও নাক আধখানা গলে গেছে,

কারও কান চিবুক-গালেরও সেই অবস্থা। চোখের মণিগুলো পাথরের কিনা বলতে পারব না— কিন্তু সেগুলো যে বিষম অগ্নিময়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'এরা কারা? এরা কারা? এরা কারা?' উন্মাদের মতো চিৎকার করে গেছিলাম তাদের প্রত্যেকের চাহনি আমার দিকে নিবদ্ধ দেখে।

প্রফেসরও আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চেঁচিয়ে গেছিলেন, 'দীননাথ! দীননাথ! দোহাই তোমার! পাথর দুটো ফিরিয়ে দাও।'

ত্রিভুবন কাঁপানো আবার সেই অট্টহাসির সঙ্গে অদৃশ্য কণ্ঠের সংলাপ শুনলাম কানের কাছে, 'মানুষ! এরা তোমারই মতো মানুষ, দীননাথ। কিন্তু বন্দি আমার কারাগারে, এক্সপেরিমেন্টের জন্যে মানুষ চাই, আরও মানুষ চাই! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!'

এরপর কোনও ভদ্রলোকের ছেলে সজ্ঞানে থাকতে পারে না। আমার মতো ভিতুর ডিম তো নয়ই।

পাঁচ: কারাগার কাহিনি

ছোট্ট একটা মেটাল চেম্বারে জ্ঞান ফিরেছিল আমার। প্রফেসর কটমট করে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে।

ধড়মড় করে উঠে বসতেই বললেন, 'গিলে নাও। খাবার পড়ে আছে।'

খিদে সত্যিই পেয়েছিল। বিশেষ করে খাবারের এত আয়োজন থাকলে কার না খেতে ইচ্ছে যায়। এই একটি ব্যাপারের ওপর কখনও রাগ দেখাই না আমি।

প্রফেসরের কটমটে চাহনি উপেক্ষা করে তাই আমি গোগ্রাসে শেষ করলাম বারকোষের সাইজের বিশাল ধাতুর থালায় সাজানো মাছ আর মাংস, পোলাও আর তন্দুরি, দই আর রাবড়ি। কোত্থেকে এল এত খাবার, ভূতেদের পাচকের হাতে ভৌতিক প্রক্রিয়ায় রান্না করা কি না— সে সব বিষয়ে উচ্চবাচ্যও করলাম না। যে বিকট দৃশ্যটা দেখেছি জ্ঞান লোপ পাওয়ার আগে, তার শিরশিরে অনুভূতির রেশ যে যায়নি তখনও মন থেকে।

পাথরের চোখ দুটো যে আর আমার জিম্মায় নেই সেটা আগেই দেখা হয়ে গেছিল।

খেয়েদেয়ে ঢক ঢক করে জল খেয়ে ঢেকুর তুললাম বেশ আওয়াজ করেই এবং সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম প্রফেসরকে, 'আমরা এখন কোথায়?'

'গোল্লায়!'

বললাম নিরীহ মুখে, 'জন্মে এরকম ঘর দেখিনি। গোল বলের মতো ঘর কখনও হয়?'

'তোমার মতো স্টুপিডদের জন্যে হয়। হাঁদারাম গাধা কোথাকার! কার সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছ জানো?'

'জানবার অবকাশ পেলে জানতাম বই কী.' ইচ্ছে করেই বললাম প্রফেসর যাতে রেগে যান।

রেগে টং হলেন উনি ঠিকই। কিন্তু মাড়ি মুখ খিঁচিয়ে জবাবটা দিতে যাওয়ার আগেই আমি ছিটকে গড়িয়ে গেলাম মেঝের ওপর দিয়ে— থালা বাসনের ঝনঝনানি চাপা পড়ে গেল কৌতুক-তরল হাসির শব্দে।

তারই হাসি। যাকে দেখা যায় না। কিন্তু সর্বত্র যে বিরাজমান অদৃশ্য অবস্থায়।

'মাস্টার দীননাথ! মাস্টার দীননাথ! ভূতের খেলা লাগল কেমন? খানাপিনা?'

অমনি চণ্ডালের রাগ চেপে বসল মাথায়। দাঁত কিড়মিড় করে ঘুসি পাকিয়ে বললাম বাজখাঁই গলায়, 'একবার দেখা দিলেই দেখিয়ে দিতাম লাগল কেমন।'

আবার সেই অস্ফুট হাসি। একই গলায় কত সুরই শোনাতে পারে রহস্যময় এই সত্তা।

বললে, 'গোলা কিন্তু ছুটছে— না, না, গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে না, চলেছে গভীর সমুদ্রে।'

খাবি খেলাম আমি! আমরা কি তা হলে ধাবমান গোলার মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছি? প্রফেসরও ছিটকে গেছিলেন আচমকা ধাক্কায়। কোমরে লেগেছে নিশ্চয়। কোমর টিপে ধরে যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

জলনির্ঘোষ তাই কি শোনা যাচ্ছে? ছলছলাত শব্দ যদি দ্রুত পরম্পরায় অবিরাম হয়ে যেতে থাকে, তা হলেই সম্ভব এমনি নির্ঘোষ। জলপ্রপাতের মতো কানে তালা লাগানো।

সহসা গোলা-ঘরের ঠান্ডা আলো নিভে গেল দপ করে। ধাতুর দেওয়ালে জেগে উঠল সার বন্দি পোর্ট হোল। দিনের আলো দেখলাম, দেখলাম নীল আকাশ আর ধুধু সমুদ্র।

আর কী দেখলাম? অগুনতি ডলফিন সাঁতার কাটছে। ছুটছে... কখনও বিশাল ঢেউ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে... কখনও দুই বিশাল ঢেউয়ের মধ্যবর্তী শূন্যতা পাখির মতো পেরিয়ে যাচ্ছে। এ কি জলযান? না, উড়ুক্কু যান? এত ডলফিনই বা এল কোত্থেকে?

শেষ প্রশ্নের জবাবটা পেলাম রহস্যময় সেই কণ্ঠস্বরে, 'মাস্টার দীননাথ, তুমি কি জানো না, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেভাবে অ্যাকুয়ারিয়ামে রঙিন মাছ পোষে, সেইভাবে সমুদ্রে বিশাল ওস্যানারিয়াম আর ডলফিনারিয়াম বানিয়ে ডলফিনদের চিড়িয়াখানা বানানো হয়! ওই দ্যাখো সেই ধেড়ে খোকাখুকুদের!

ডাঙার কাছাকাছি গিয়েও মোড় নিয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো আবার সমুদ্রের দিকেই ফিরে গেল উড়ন্ত গোলক। এবার আরও উঁচু দিয়ে মেঘলোক তছনছ করে অব্যাহত রইল তার প্রভঞ্জন গতি।

কানের কাছে গুঞ্জরিত হল আবাব সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর, 'কী গো দীননাথবাবু? কীরকম দেখলে?'

বোবা হয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। পড়েছি যবনের হাতে...

খাদে নেমে এল প্রহেলিকা-স্বর, 'জানো ওরা কী বলছে? ফ্লাইং সসার! ফ্লাইং সসার! হাঃ হাঃ হাঃ! নির্বোধ! উজবুক! অন্য গ্রহের সসার এটা নয়— এই পৃথিবীরই জঠর থেকে এসেছে, ফিরে যাবে সেইখানেই। তার আগে তোমাকে দেখিয়ে দেব আমার ক্ষমতার আরও একটু নমুনা—'

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম, তার বর্ণনা দেব কী ভাষায় ভেবে পাচ্ছি না।

ছয়: পৃথিবীর প্রেশার কুকার

কানের কাছে মন্ত্রধ্বনির মতো গুঞ্জরণ চলেছিল অবিরাম, 'প্রফেসর মশাই জানেন, তুমি তাঁর চ্যালা হয়েও যা জানো না, তা হল এই: পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত চারটে শক্তির খবর রেখেছেন বিজ্ঞানীরা। ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক, দুর্বল আর প্রবল পারমাণবিক শক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণ। নিউটন, গ্যালিলিও, আইনস্টাইনের তত্ত্ব নতুন করে লেখার দরকার হয়ে পড়েছে। কেননা, ফিফথ ফোর্স বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে পৃথিবীতে। নাম তার অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি। বিপরীত মহাকর্ষ বললে নিশ্চয় ভাল করে বুঝবে, তাই না মাস্টার দীননাথ?'

আর মাস্টার দীননাথ! সে তখন হতভম্ব হয়ে দেখছে উড়ুক্কু গোলক হঠাৎ পাগলা হয়ে গেল নাকি? পৃথিবী ছেড়ে পৃথিবীর বাইরে ছুটে যাচ্ছে কেন এমন খ্যাপা ষাঁড়ের মতো? এভাবে তো যায় মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার রকেটগুলো! সেসব রকেটে থাকে জ্বালানির ধোঁয়া, আর প্রচণ্ড গর্জন।

কিন্তু আজব এই গোলক নিঃশব্দে অথচ অকল্পনীয় বেগে সটান পৃথিবীকে পেছনে ফেলে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যের দিকে। সবুজ গ্রহের পাহাড়-বনানী-সমুদ্র ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। প্রথমটা প্রচণ্ড চাপ অনুভব করেছিলাম সর্বাঙ্গে— কিন্তু ছবিতে যেরকম দেখেছি বা শুনেছি, সেরকম মারাত্মক নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই হালকা তুলোর মতো লাগল নিজেকে। ভেসেও উঠলাম শূন্যে। প্রফেসরকেও দেখলাম শূন্যে ভাসতে। পরক্ষণেই দু'জনেই ভারী হয়ে গিয়ে চেপে বসলাম মেঝেতে।

গভীর শ্বাস নিয়ে ক্লিষ্ট হেসে প্রফেসর বললেন, 'বাতাসে অক্সিজেনেরও অভাব নেই দেখছি।'

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বললে, 'এ ধরনের মহাকাশযান আপনার সতীর্থ বৈজ্ঞানিকরা কি এখনও কল্পনা করতে পেরেছেন, প্রফেসর?'

'না।'

'জল-স্থল-অন্তরীক্ষ— সর্বত্র অবাধে যাতায়াত করছে এই গোলক শুধু অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ফোর্সকে কাজে লাগাতে পারছে বলে। যাক সে কথা। পৃথিবীকে পাক দিচ্ছেন এখন— চব্বিশ ঘণ্টায় একবার। দেখে নিন আপনাদের সাধের পৃথিবীর কী হাল আমি করতে পারি।'

এবং দেখলাম সেই গা-কাঁপানো দৃশ্য। দেখলাম এবং ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলাম।

পোর্টহোলগুলোর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুন্দর সবুজ পৃথিবীকে। এত ঝুটঝামেলার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর ম্যাপটাকেও ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। মহাদেশ, মহাসমুদ্র গুলিয়ে ফেলেছিলাম। তাই সঠিক বলতে পারব না কোন কোন অঞ্চলে দেখেছিলাম অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলো।

নীল সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ উত্তাল হয়ে উঠেছিল জলরাশি। পর্বতসমান ঢেউয়ের আকারে ধেয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল দ্বীপের পর দ্বীপ। আচম্বিতে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল— তুবড়ির মতো ধোঁয়া, আগুন আর পাথর ছুড়ে দিয়েছিল অনেক উঁচুতে— লাভা গড়িয়ে পড়েছিল গা বেয়ে— ধ্বংস হয়েছিল বিস্তীর্ণ জনপদ। মেরু অঞ্চলের বরফ

গলতে শুরু হয়েছিল অকস্মাৎ এবং বিরাট অঞ্চল ভেঙে গিয়ে ধেয়ে গিয়েছিল গভীর সমুদ্রে— অন্য মহাদেশের দিকে।

বিদ্রূপের হাসি হেসে হেসে বলেছিল অদৃশ্য কণ্ঠস্বর, 'মাই ডিয়ার প্রফেসর, বলুন তো আমার অঙ্গুলি হেলনে কীভাবে পৃথিবীময় এই বিপর্যয়?'

চোয়াল শক্ত করে বলেছিলেন প্রফেসর, 'পৃথিবীর কেন্দ্র সূর্যপৃষ্ঠের চাইতে বেশি গরম বলে।'

বিরাট হাসি হেসে বললে রহস্যময় কণ্ঠস্বর, 'অর্থাৎ আপনি জানেন অনেক, বোঝেন অনেক। সেইজন্যেই তো আপনাকে চ্যাংদোলা করে আনবার হুকুম দিয়েছিলাম নাম্বার ওয়ান সুপার কম্পিউটারকে।'

পৃথিবীর বুকে বিরামহীন ধ্বংস দৃশ্য দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়েছিলাম। কিন্তু 'চ্যাংদোলা' শব্দটা শুনেই জ্বলে উঠলাম তেলেবেগুনে।

'পিণ্ডি চটকে ছাড়তাম চ্যাংদোলা করতে গেলে—'

'পিণ্ডি আমরাই চটকাব তোমাদের।' কর্কশ হয়ে ওঠে অদৃশ্য কণ্ঠস্বর, 'দেখতে পাচ্ছ না অ্যাটম-বুলেট পৃথিবীর প্রেশার কুকারে ঢুকিয়ে কীভাবে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাচ্ছি সমুদ্রের তলায় ও ডাঙায়? জল ঠেলে উঠছে, পাহাড়ের চূড়ো উড়ে যাচ্ছে, বরফ গলে ভেসে যাচ্ছে।'

'পৃথিবীর প্রেশার কুকার!' হাঁ হয়ে গেলাম আমি। প্রফেসর তাড়াতাড়ি বললেন, 'অত বড় হাঁ কোরো না দীননাথ। পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ ম্যান্টল আর বাইরের অন্তস্তল অর্থাৎ-- outer core-এর মাঝের বাউন্ডারি প্রেশার কুকারের কাজ করছে। মাঝে মাঝে বাড়তি চাপ আর উত্তাপ বেরিয়ে যায় বলেই মহাদেশগুলো পৃথিবীপৃষ্ঠে সরে সরে যাচ্ছে।'

'এবং এই চাপ আর উত্তাপকে নানা ফুটো দিয়ে বার করিয়ে দিয়ে ঘটাচ্ছি এই অগ্ন্যুৎপাত,' নির্মম স্বরে বললে অদৃশ্য সত্তা।

'কেন?' চড়া গলা আমার।

'প্রফেসর জানেন কেন। অপটিক্যাল সুপার কম্পিউটার মাথার মধ্যে লাল রশ্মি দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে জবাবটা। প্রফেসর, আপনিই বলুন না।'

জবাবটা দিতে গিয়ে কীরকম যেন হয়ে গেল প্রফেসরের মুখটা, 'দীননাথ, পৃথিবীর জঠরের টেম্পারেচার এমনিতেই সূর্যপৃষ্ঠের চাইতে বেশি। দিনকয়েক হল জনাকয়েক বৈজ্ঞানিক তা ধরতে পেরেছেন। কিন্তু এই মক্কেল অনেক আগে থেকেই তা জানে। পাওয়ারফুল কামান দিয়ে অ্যাটম-বুলেট সেখানে পাঠায়। ইচ্ছে করলে পৃথিবীটাকে ভেতর থেকে বোমার মতো ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে।'

'কিন্তু কেন প্রফেসর? কেন?' আকুল স্বরে বলেছিলাম আমি। 'ডলফিনদের ওপর অত্যাচার চলছে বলে পৃথিবী উড়িয়ে দেওয়া হবে?'

প্রশ্নের জবাব পেলাম না। ঘুম আসছিল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাত: ব্যাক্টিরিয়া ব্রেন

ঘুম ভাঙবার পর দেখলাম গোলকের মধ্যেই শুয়ে রয়েছি আমি আর প্রফেসর।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক-চোখ-খসে পড়া একটা পিশাচমূর্তি। তার বাঁ দিকের গালের মাংস নেই। দাঁত দেখা যাচ্ছে মুখের ভেতরে।

আঁতকে উঠতেই সে বললে ইয়াঙ্কি ইংরেজিতে— 'বন্ধু, আমি ভূত নই। মানুষ।'

'কিন্তু এ হাল হল কী করে আপনার?'

'কস্টিক পটাশ দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছে। আমার ডলফিনারিয়ামে একটা ডলফিনের চোখ নষ্ট হয়ে গেছিল খেলা দেখাতে গিয়ে। তাই এই শাস্তি।'

'আপনাকে পেল কোত্থেকে?'

বিকট দাঁত বার করে হাসল আগন্তুক, 'নিরর্থক প্রশ্ন। আমার মতো অনেককেই এরা ধরে এনেছে এই পাতালপুরীতে। সারাসোট উপসাগরের লোকই আছে বেশি।'

'কী অপরাধে?'

'ইনটেলিজেন্ট ডলফিনদের বদ্ধ জায়গায় রেখে দু'পয়সা রোজগার করছিল বলে।'

'ডলফিনরা ইনটেলিজেন্ট তো এই হেঁড়ে-গলা লোকটার গায়ে ফোসকা পড়ছে কেন?'

ভৌতিক মূর্তি এক চোখ মেলে নির্নিমেষে চেয়ে রইল আমার দিকে, 'লোক নয়, একটা ব্রেন!'

'ব্রেন!'

'ব্যাক্টিরিয়া কোষ দিয়ে তৈরি ব্রেন। সুপার কম্পিউটার নাম্বার থ্রি।'

'কী বলছেন মাথায় ঢুকছে না। কে তৈরি করল এই ব্রেন?'

'ডলফিনরা।'

'অসম্ভব।'

'অসম্ভব বলে পৃথিবীতে এখন আর কিছু নেই। সুপার ডলফিনদের তৈরি করেছি তো আমরাই।'

'সুপার ডলফিন!'

'পারমাণবিক বিস্ফোরণের মহড়া চলেছে পৃথিবী জুড়ে বছরের পর বছর। ফ্লোরিডার দিকে পারমাণবিক ভস্ম এসেছিল বহু বছর আগে— মিউটেশন ঘটেছিল বেশ কিছু ডলফিনের কোষে।'

আবার সরব হল অদৃশ্য সত্তা, 'আমিই সেই ব্যাক্টিরিয়া ব্রেন। এই পাতালপুরীর মাস্টার ইউনিট আমি। আমিই এই পৃথিবীর এমন এক সুপার কম্পিউটার যার চিন্তার গতি মানুষের চিন্তার গতির মতো সেকেন্ডে একশো ফুট নয়। আলোর গতিবেগে ভাবি আমি। সাধারণ কম্পিউটার একটার পর একটা সমস্যার সমাধান করে। আমি করি একই সঙ্গে অজস্র— ঠিক মানুষের ব্রেনের মতো। কিন্তু মানুষের ব্রেনের কোষগুলো গায়ে গায়ে লাগানো থাকে— নিজেরা নড়াচড়া করতে পারে না, আমার জীবাণু কোষেরা নড়েচড়ে সমাধানের গতিবেগ এমন বাড়িয়ে দিয়েছে যা অতিমানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। আমিই

এখন এই পৃথিবীর চরম শক্তি— আমাকে টেক্কা দিক সামান্য মানুষ, আমি তা চাই না।'

'মানুষের বয়ে গেছে টেক্কা দিতে। তাদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই— ' রেগেমেগে আরও কিছু বলতাম, কিন্তু মুখে হাতচাপা দিলেন প্রফেসর।

বললেন, 'দীননাথ, সেই চেষ্টাই চলছে কিছু গবেষণাগারে। এবং এই গবেষণা যাতে আর না-চলে, তাই ধরে আনা হয়েছে আমাদের।'

'আপনি বললেই বন্ধ হবে?'

'চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?'

চোখ মুখ লাল হয়ে গেল প্রচণ্ড রাগে, 'প্রফেসর, আপনি এত কাওয়ার্ড? প্রাণের ভয়ে গবেষণায় বাগড়া দেবেন?'

প্রফেসর আমতা আমতা করে কী বলতে গেলেন। কিন্তু তার আগেই দপ করে নিভে গেল গোলকের আলো। বিকট একটা হাসি শুনলাম এবং পরক্ষণেই অন্ধকারের মধ্যে জাগ্রত হল একটা সবুজাভ মূর্তি।

সেই অমানুষ যার দুটো চোখ আমি উপড়ে নিয়েছিলাম। এখন তার সারা গা থেকে সবুজ রশ্মি ছিটকে বেরোচ্ছে। চোখ গনগনে। আমি তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। ফের জ্ঞান হারালাম।

আট: ঘামের বিষ

জ্ঞান টনটনে হতেই দেখলাম আমি আর সেই অমানুষ পাশাপাশি সাঁতার কাটছি ঠিক ডুবুরির মতো। আমার মুখে ডুবুরির মুখোশ। দূরে দূরে আরও অমানুষদের দেখা যাচ্ছে। মাছের মতো পিঠের জেট চালিয়ে জলের তলদেশে ছুটোছুটি করছে।

দারুণ কর্মব্যস্ত প্রত্যেকেই। জলতল আলোয় আলোময়। বিশাল কয়েকটা ডলফিন রাজকীয় চালে যাতায়াত করছে। আশেপাশে।

আমাদের সামনেই এসে গেল একটা ডলফিন। সাধারণ ডলফিন বড়জোর ন'-দশ ফুট লম্বা হয় শুনেছি। এর আকার কিন্তু বিশাল। পঞ্চাশ ফুট তো বটেই। ছোটখাটো তিমি বললেও চলে।

আমার মগজে কোনও সাড় নেই। নেই বলেই এতক্ষণ সাঁতরেছি— অথচ নিজেও তা জানি না। বিশালকায় এই ডলফিনের সামনে এসেও নিস্পৃহ দৃষ্টি মেলে শুধু চেয়ে রইলাম।

ডলফিনের দুই চোখে দেখলাম সুগভীর দূরায়ত বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। যেন ধ্যানস্থ ঋষি।

মস্তিষ্কের মধ্যে ধ্বনিত হল যেন দৈববাণী, 'দীননাথ, তুমি যার চোখ খুবলে নিয়েছিলে, তার চোখ বসাতে গিয়েই একটা মহাবিপদ থেকে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করেছি। তুমি জানো তোমাদের আনা হয়েছে জীবাণু সুপার কম্পিউটারের গবেষণা যাতে বন্ধ থাকে পৃথিবীতে— এই জন্যে। তাই না?'

'হ্যাঁ,' মুখোশের মধ্যেই বললাম আমি।

'আমাদের হাতে-গড়া জীবাণু সুপার-কম্পিউটারকে এই আদেশ না-দিলে তোমাদের এখানে আনাই হত না। আসলে আমরা চাই এর প্রতাপ কমাতে।'

'মানে?'

'ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া দানবের মতো আমরা এই দানব তৈরি করে ফেলেছি আমাদের অতি-মগজ দিয়ে। একে আর বাড়তে দিলে এ পৃথিবীকে ফাটিয়ে উড়িয়ে দেবে— প্রাণের চিহ্ন মুছে দেবে।'

'নিজেও তো শেষ হয়ে যাবে।'

'তার আগে নিজে চলে যাবে অন্য গ্রহে। ক্ষমতা এর অসীম, গতি এর সর্বত্র, শুধু এখানে ছাড়া— আমাদের এই অঞ্চলে তার কোনও জারিজুরি খাটে না— এখানকার কোনও খবর সে পায় না, এখানকার জলে তার শক্তি ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়। তাই তোমাকে শাস্তি দেওয়ার অছিলায় আনিয়েছি এখানে।'

'কিন্তু কেন? সামান্য মানুষ আমি—'

'অসামান্য ছোট্ট একটা কারণে। অসম্ভব নোংরা তুমি।'

'কী'—

'শোনো। তোমার দেহের রক্ত পরিষ্কার নয়, স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলো না বলে। ফলে এমন একটা ভাইরাস আশ্রয় নিয়েছে তোমার রক্তে, যে তোমাকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে, অথচ তোমার ক্ষতি করছে না— এমন অনুকূল পরিবেশ আর উপাদেয় রক্ত আর কোথাও পাবে না বলে—'

'ননসেন্স!'

'গালাগাল দিয়ো না। তোমার হাতের ঘামেও থাকে সেই ভাইরাস। ভয়ের চোটে ঘেমে গিয়ে তারপর রেগেমেগে চোখ খুবলে নিয়েছিলে। ঘাম লেগেছিল উপড়োনো চোখে। আমাদের টেস্ট রিপোর্ট জানাচ্ছে, এই ঘামেই রয়েছে বিভীষণ ব্যাক্টিরিয়া-ব্রেনের মৃত্যুদূত।'

'বিভীষণ কেন?'

'রামায়ণে বিভীষণের যা ভূমিকা, আমাদের ব্যাক্টিরিয়া ব্রেনও যে তাই করে চলেছে। ঘরশত্রু বিভীষণ নাম্বার ওয়ান। যন্ত্র যাতে স্রস্টাকে শাসন-দমন করতে না পারে, তার জন্যে আগে থেকেই হুঁশিয়ার ছিলাম, ব্যবস্থাও নিয়েছিলাম— তাই সে আমাদের ঘাঁটাতে পারে না। কিন্তু প্রাণ জিনিসটাকে একদম সইতে পারে না— স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে যেতে কে না চায়?'

'বিশ্বাসঘাতক!'

'তা তো বটেই। দীননাথ, তোমার পাশেই যে সুপার-কম্পিউটার রয়েছে, তারও ব্রেন এখন বিকল রয়েছে। ব্যাক্টিরিয়া-ব্রেন তার ব্রেন থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারবে না। তোমাকে আর প্রফেসরকে কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে দিঘায়। তোমার সঙ্গে যে কথা হল, তা এখন চেপে যাও— প্রফেসরও যেন জানতে না-পারেন। উনি কথা দিয়েছেন বৈজ্ঞানিকদের বলবেন, ব্যাক্টিরিয়া-ব্রেন গবেষণা যেন অচিরে বন্ধ করা হয়— নইলে পৃথিবী ধ্বংস হবে।'

'বেশ!'

'ডাঙায় ফিরে গিয়ে তোমার রক্ত থেকে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করতে বলবে প্রফেসরকে। এই ভাইরাস থেকেই তৈরি হবে আর একটা সাব-ভাইরাস— আমাদের তৈরি ব্রেনের ব্যাক্টিরিয়াদের যম। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

প্রফেসর আর আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হেঁটে এসেছিলাম দিঘার বালি মাড়িয়ে— কীভাবে জল থেকে উঠে এসেছিলাম, তা মনে নেই।

প্রফেসরকে যথাসময়ে বলেছিলাম আমার রক্ত নিয়ে গবেষণা করতে। কিন্তু ভদ্রলোক আমার নোংরামি নিয়ে এমন টিটকিরি দিতে আরম্ভ করেছেন যে আদৌ রক্ত দেব কি না ভাবছি।

তোমরা অনুরোধ করলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তার আগে বলতে হবে, ভাইরাস শব্দটির মানে কী?*

* 'ভাইরাস' একটা ল্যাটিন শব্দ। মানে, বিষ।

লালাভিচ লাড়ুকং

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কি ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন?

হাঁ করে চৌকাঠে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর বলেই ফেললাম, 'ভূগোল শিখছেন নাকি নতুন করে?'

ভীষণ চমকে উঠলেন প্রফেসর। ভূগোলক নিয়ে এতখানি তন্ময় হয়ে থাকবেন তিনি, আশাই করতে পারিনি।

রেগে গেলেন পরক্ষণেই। সে কী চিৎকার, 'আচ্ছা বেল্লিক তো? দিলে তো কনসেনট্রেশনটা নষ্ট করে?'

'কনসেনট্রেশন? ভূগোলকে মনঃসংযোগ করে তো স্কুলের ছেলেমেয়েরা। আপনি—'

'ইডিয়ট! আমার কনসেনট্রেশন এই পিরামিডটার ওপর।'

'পিরামিড! কোথায়?'

'অন্ধ নাকি? দেখতে পাচ্ছ না?'

তর্জনী সংকেতে যে-পিরামিডটা দেখালেন প্রফেসর, সেটা রয়েছে বিশাল গ্লোবটার ওপর। কার্ডবোর্ডের ছোট্ট পিরামিড।

আমি তো অবাক। এ আবার কী নতুন গবেষণা শুরু করলেন প্রফেসর?

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম ঘরের মধ্যে। মানে, তাঁর ল্যাবরেটরির মধ্যে। উনি কটমট করে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় চটেছেন বিলক্ষণ।

কিন্তু ধ্যান করছেন কী নিয়ে? দেখলাম ভাল করে। গ্লোবটা সাধারণ বাজারি গ্লোবের চাইতে অনেক বড়। নীল জল যেন সত্যিই থইথই করছে সমস্ত ভূগোলক ঘিরে। আফ্রিকা মহাদেশটা ফেরানো রয়েছে আমাদের দিকেই।

সাদা কার্ডবোর্ডের ছোট্ট পিরামিডটা বসানো রয়েছে আফ্রিকার একপ্রান্তে।

ডট দেওয়া লাইনটা চোখে পড়ল তার পরেই।

সাদা পিরামিডের তলা থেকে ফুটকি ফুটকি লাইন টানা হয়েছে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত।

'বুঝলে কিছু?' পেছন থেকে প্রশ্ন করলেন প্রফেসর। গলার ঝাঁঝ অনেকটা কমেছে মনে হল।

'একদম না,' অকপটে স্বীকার করি আমি।

কানে ভেসে এল অনুকম্পার হাসি। রাগ হলেও চুপ করে রইলাম।

'গ্রেট পিরামিডের নাম শুনেছ, দীননাথ? এই সেই গ্রেট পিরামিড।'

'গ্রেটই বটে,' ব্যঙ্গের সুরে বললাম আমি।

অস্ফুট হেসে প্রফেসর বললেন, 'গ্রেট পিরামিডকে কেন ঠিক আফ্রিকার ওই জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল, সেটা বোঝবার জন্যেই ছোট্ট পিরামিডটাকে বসিয়েছি গ্লোবের ওপর।'

'লাইন টেনেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ভাল করে দ্যাখো, দীননাথ। বেশির ভাগ জমির ওপর দিয়েই গেছে লাইনটা।'

'তাতে কী প্রমাণিত হল?'

'প্রমাণিত হল এই যে, সুপার-নরম্যাল নলেজ নিয়ে গ্রেট পিরামিড নির্মাণ করেছিল মিশরীয়রা।'

প্রফেসরের গলার স্বর এবার গম্ভীর। ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। দেখলাম, স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে উনি চেয়ে রয়েছেন ছোট্ট সাদা পিরামিডটার দিকে।

বললেন যেন আপন মনেই, 'গিজার গ্রেট পিরামিড। আজও তুমি রহস্যময়। পিরামিডলজিস্টরা হালে পানি পায়নি, সমাজে তাদের সমিতিও পাত্তা পায়নি—কিন্তু আমি জানি তোমার সৃষ্টির রহস্য।'

প্রফেসরের এই মূর্তি, এই চাহনি, এই গলার স্বর আমি চিনি জানি বুঝি, তাই মস্তিষ্কের কোষে কোষে জাগ্রত হল তীব্র কৌতূহল।

ধরে রাখতে পারলাম না নিজেকে। শুধোলাম ব্যাকুল কণ্ঠে, 'প্রফেসর, কী সেই রহস্য? বলবেন আমাকে?'

যেন স্বপ্নভঙ্গ ঘটল প্রফেসরের। নিমেষহীন নয়নে চেয়ে রইলেন আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর বললেন ভারী গলায়, 'দীননাথ, গ্রেট পিরামিড তৈরি হয়েছিল বাইবেল রচনার অনেক আগে। কিন্তু পিরামিড-বিজ্ঞানীরা তার ক্ষেত্রের পরিসীমার মাপ নিয়েছেন, মাপ নিয়েছেন প্রতিটি সাইডের, পাথরের বাইরের রেখার, ভেতরের চেম্বারের, গ্যালারির, করিডরের; পিরামিড তৈরির ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করেছেন এবং দেখেছেন বাইবেলের আর খ্রিস্টান ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে তা মোটামুটিভাবে মিলে যাচ্ছে।'

'পিরামিড নিয়ে আবার বিজ্ঞান হয় নাকি?'

'হয় দীননাথ, হয়। জন টেলর এই বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী। চার্লস পিয়াজিস্মিথ তো 'পিরামিড ইঞ্চি' পর্যন্ত আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

'পিরামিড ইঞ্চি?'

'ইংলিশ ইঞ্চির ১.০০-এর সমান এক পিরামিড ইঞ্চি। উনি দেখিয়েছিলেন, এই ইঞ্চির ভিত্তিতেই সমস্ত পিরামিড-লজিক্যাল ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব।'

'প্রফেসর, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।'

'কী করে ঢুকবে, দীননাথ? তোমার মাথায় কতটা ঘিলু আছে, তা আর কেউ না-জানলেও আমি তো জানি। গোঁড়া পণ্ডিতরা যতই বলুক না কেন পিরামিডের মধ্যে কোনও রহস্যই নেই, আমার মতো অনেকেই এখনও মানেন অজস্র রহস্য রয়েছে পিরামিডের নির্মাণের মূলে—আজও আমরা তার হদিশ পাইনি।'

হাসলাম আমি, 'যেহেতু গিজার গ্রেট পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর নিরেট বিল্ডিং, তাই ওরকম অনেক রহস্যই কল্পনা করে নেওয়া যায় প্রফেসর।'

চোখ ছোট করে তাকালেন প্রফেসর। বললেন, 'দীননাথ, গ্লোবেই দেখতে পাচ্ছ, গ্রেট পিরামিড নির্মিত হয়েছিল পৃথিবীর বিশেষ একটা জায়গায়। কেন? বিশাল স্ট্রাকচার, কঠোর জ্যামিতিক নিয়ম, কম্পাসের হিসেবে ঠিক উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম মুখো অবস্থান, তিরিশ ডিগ্রি ল্যাটিচিউডের মধ্যে নির্মাণ—সবই কি বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলে না? পিরামিডটার যা উচ্চতা, তাকে দ্বিগুণ করে ক্ষেত্রের পরিসীমা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় পাই-য়ের কাছাকাছি ভ্যালু—'

'পাই আবার কী?'

'ইংরেজি পি আর আই। পাই, যে-কোনও বৃত্তের সঙ্গে তার ব্যাসার্ধের যে অনুপাত তার প্রতীককে বলা হয় pi—মোটামুটি ৩.১৪১৫৯...'

'তাতে কী হল?'

'হল তোমার মাথা আর মুণ্ডু, গবেট কোথাকার! এত অঙ্কের হিসেব যাদের মাথায় ছিল, মালভূমিকে আশ্চর্য কারিগরি দক্ষতা দিয়ে যারা সমান করে নিয়ে তবে পিরামিড তৈরি করেছিল, বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইগুলোকে যারা অদ্ভুতভাবে জোড়া লাগিয়েছিল, তারা যে বিশাল সভ্যতার ধারক আর বাহক, উন্নত বিজ্ঞান আর অতিপ্রাকৃত জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে কি?'

ফুঁসতে লাগলেন প্রফেসর। ধীরে সুস্থে আমি বললাম, 'সব মানলাম। কিন্তু আপনার ওই অতিপ্রাকৃত শব্দটা মানতে পারলাম না। বিজ্ঞান ওই শব্দটাকে একেবারেই পাত্তা দেয় না।'

'ওঃ! কত বড় বিজ্ঞানী এলেন রে! বিজ্ঞান যার নাগাল পায়নি, তাকেই অতিপ্রাকৃত বলে উপেক্ষা করে। বিজ্ঞানীরাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা, সব কিছু জেনে বসে আছে যেন—জানার বাইরে আর কিছু জানতে চায় না। শুনবে তবে, শুনবে পিরামিডের মধ্যে কত কী অদ্ভুত কাণ্ড দেখা গেছে বহুবছর আগে?'

যাক! খুঁচিয়ে পেট থেকে কথা বার করতে চেয়েছিলাম। উদ্দেশ্য সফল হল। নির্বিকার ভাবে বসলাম একটা টুলে।

বললাম, 'বলুন, শুনে যাচ্ছি।'

রেগেমেগে প্রফেসর ঝড়ের বেগে যা বলে গেলেন, তা গায়ের লোম খাড়া করার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু সে বাসনা আমার নেই মোটেই। তাই যথাসম্ভব গুছিয়ে লিখছি।

দুই. পিরামিড পাওয়ার

'দীননাথ,' বললেন প্রফেসর, 'বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, পিরামিডকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে পারমাণবিক শক্তিকেও ঘানিতে লাগানো যায়।'

'প্রমাণ?' বললাম আমি।

'অকাট্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে।'

'যথা?' নিরীহ প্রশ্ন আমার।

'এ-যুগের পপুলার পুরাণতত্ত্ব অনুসারে, পিরামিড অনেকরকম ম্যাজিক ঘটিয়ে ছাড়তে পারে।'

'যেরকম?' কোনও আগ্রহই যেন নেই আমার।

'ক্ষুরকে ধারালো করতে পারে, রুপোর চকচকে ভাব বজায় রাখতে পারে, মরা জন্তু জানোয়ারের পচন রোধ করতে পারে, মাংসকে টাটকা রাখতে পারে, দুধ থেকে মদ তৈরি করতে পারে, ফল আর সবজিতে ভিটামিন বাড়িয়ে দিতে পারে, ঘরের গাছপালাকে আরও বড় আর ঝাঁকালো করতে পারে, জলের মধ্যে বায়োকসমিক এনার্জি ঢুকিয়ে দিতে পারে, মানুষের মাথাব্যথা সারিয়ে দিতে পারে, মনের শক্তিকে বাইরে টেনে আনতে পারে।'

হেসে ফেললাম, 'প্রফেসর, আপনি কিন্তু অকাল্ট সায়ান্টিস্টদের মতো কথা বলছেন।'

তিড়বিড় করে উঠলেন প্রফেসর, 'কী! আমি অকাল্ট সায়ান্টিস্ট! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!'

'কিন্তু—'

'চোপরাও! যার চেহারা ওইরকম আখাম্বা, তার মগজ ছোট্ট হবে, এ আর আশ্চর্য কী! যেমন হাতির হয়!'

আহত স্বরে বললাম, 'প্রফেসর, আমার এই বিরাট লাশটাই আপনাকে অনেক বিপদ আপদ থেকে বাঁচিয়েছে—'

'সেই জন্যেই তো—' বলেই ঢোক গিললেন প্রফেসর। মানুষটা তো সাচ্চা সোনা। রাগের মাথায় কাউকে আঘাত দিয়ে আঘাত পান। কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'ব্যাপার কী জানো দীননাথ, পিরামিড-বিজ্ঞানীরা বলেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটি প্রাকৃতিক শক্তি ছাড়াও অনেক প্রাকৃতিক শক্তির বায়োকসমিক এনার্জিকে পিরামিড যেভাবে কাজে লাগাতে পারে, কট্টর বিজ্ঞানীরা এখনও তার হদিশ পায়নি। জানেই না ব্যাপারগুলো আদৌ ঘটে কিনা এবং ঘটলেও ঘটে কীভাবে।'

'ইচ্ছে থাকলেই জানা যায়,' বললাম আমি ক্ষুব্ধ স্বরে, 'যে মাপে ক্লাসিক পিরামিড তৈরি হয়েছে, সেই মাপের অনুপাতে ছোট্ট পিরামিড তৈরি করে নিলেই হল। তারপর এক্সপেরিমেন্ট করলেই জানা যাবে সত্যিই এরকম অজানা এনার্জি মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে আসছে কিনা।'

সপ্রশংস চোখে চেয়ে রইলেন প্রফেসর, 'যতটা নিরেট তোমাকে ভেবেছিলাম, দেখছি ততটা আহাম্মক তুমি নও। কিন্তু ব্যাপার কী জানো, এই সেদিন পর্যন্ত পুরাতত্ত্ববিদদের ধারণা

ছিল, এই যে স্মৃতিসৌধগুলো, যাদের তলদেশ চৌকোনা, গা-গুলো ত্রিভুজাকার, সেগুলো মৃত ফারাওদের সম্মান রক্ষার্থেই নির্মিত সমাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু একলক্ষ ক্রীতদাসকে কুড়ি বছর ধরে জ্যামিতিক নকশায় পাথর সাজানোর কাজে লাগানোর মূলে নিশ্চয় অন্য উদ্দেশ্য ছিল, এই ধারণাটাই অনেকের টনক নড়িয়েছে এই সেদিন। ফলে শুরু অতিপ্রাকৃত গবেষণা—'

'আবার অতিপ্রাকৃত?'

প্রফেসর যেন শুনতেও পেলেন না। ঝোঁকের মাথায় বলে চললেন, 'পিরামিড রহস্য উদ্ধারে প্রথম প্যারানরম্যাল রিসার্চ চালালেন একজন ব্রিটিশ অভিযাত্রী। ডক্টর পল ব্রানটন তাঁর নাম। ভদ্রলোক চিওপাস-এর রাজার সমাধিকক্ষে একরাত কাটালেন।'

'পৃথিবীর সপ্তম বিস্ময় চিওপাস-এর গ্রেট পিরামিড?'

প্রীত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'যাক, জানা আছে দেখছি। ডক্টর ব্রানটন কী বলেছেন জানো? পাঁচ হাজার বছর আগে এই পিরামিড তৈরি হওয়ার পর এতবড় সাহস দেখিয়েছিলেন তাঁকে বাদ দিয়ে আর মাত্র দুজন।'

'কে সেই মহাবীররা?'

প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু একেবারেই উপেক্ষা করে গেলেন প্রফেসর। বললেন, 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট!'

'অ্যাঁ!' সিধে হয়ে বসলাম আমি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' অমায়িক কণ্ঠস্বর প্রফেসরের, 'ডক্টর ব্রানটন যা বলেছেন, সেইটুকুই বলা যাক। পিরামিডের ভেতরে রাত কাটিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে গুপ্তরহস্য জানতে পেরেছিলেন নেপোলিয়ান, তা নাকি তিনি কাউকে বলেননি বললেই চলে। তুমি তো জানো ১৭৯৮ সালে মিশর আক্রমণ করেছিলেন নেপোলিয়ন। গ্রেট পিরামিড দেখতে গেছিলেন তখনই। ফলে, যে অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তার কিন্তু কোনও নথিপুঁথি রেখে যাননি। গুপ্তবিদ্যায় বিশ্বাসীদের মুখও বন্ধ করতে পারেননি।'

'যাচাই করেননি কেউ?' আমার প্রশ্ন।

'গুড কোশ্চেন,' খুশি খুশি গলায় বললেন প্রফেসর, 'নেপোলিয়ন সত্যিই ভাঁওতা মেরেছিলেন কিনা যাচাই করার জন্যেই ডক্টর ব্রানটন রাত কাটিয়েছিলেন রাজার চেম্বারে—খালি পাথরের শবাধারের পাশে।'

'খালি?'

'হ্যাঁ। এত জানো, এটুকু জানো না? রাজার মমি অনেকদিন আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মিউজিয়ামে?'

'তা হবে,' কথা বাড়ালাম না আমি।

'টর্চলাইট নিভিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন ব্রানটন। হঠাৎ মনে হল, কী যেন একটা জীবন্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। বাতাসের মধ্যে একটা চাপা ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অস্থির হয়ে উঠেছে চার পাশের বাতাস, স্থির নয় মোটেই।'

'তারপর?' নড়েচড়ে বসলাম আমি।

'অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছে যেন সজীব একটা সত্তা। সুস্পষ্ট অনুভব করলেন যেন অদৃশ্য সত্তা চারপাশে পূর্ণ রূপ নিতে চলেছে। ছায়াহীন ঘরে অজস্র ছায়া সঞ্চরমান হয়েছে। মনের চোখে ভেসে উঠতে দেখলেন কয়েকটা করাল মূর্তিকে—উদ্দেশ্য যাদের শুভ নয় মোটেই। তার পরেই এগিয়ে এল একটা কৃষ্ণকায় প্রেতচ্ছায়া। অমানবিক চাহনি মেলে ধরল ডক্টর ব্রানটনের ওপর। এক হাত শূন্যে তুলল এমন আতঙ্ক সঞ্চারী ভঙ্গিমায় যেন ভয়ের চোটে রক্ত হিম হয়ে যায় ডক্টর ব্রানটনের।'

'গুড লাংগুয়েজ,' মন্তব্য প্রকাশ করলাম আমি।

ভ্রূক্ষেপ করলেন না প্রফেসর, 'চকিতে মিলিয়ে গেল কুটিল প্রেতচ্ছায়া। তার জায়গায় আবির্ভূত হল সাদা পোশাক পরা একটা মূর্তি। মহাজাগতিক গুপ্ত রহস্য দান করলেন ডক্টর ব্রানটনকে।'

'কী সেই গুপ্ত রহস্য?' তাল বুঝে প্রশ্ন করলাম আমি।

'শ্বেতমূর্তি নাকি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল ডক্টর ব্রানটনকে—খবরদার, পৃথিবী চৌচির হয়ে যাবে এই গুপ্ত রহস্য যদি ফাঁস হয়ে যায়।'

'কী করলেন ডক্টর ব্রানটন?'

'১৯৪৩ সালে একটা বই ছাপলেন। নাম, উইজডম অফ দি ওভার সেলফ। বাজারে দারুণ চাহিদা বইটার। কিন্তু—'

'কিন্তু?'

'গুপ্ত রহস্য বিশেষ কিছুই ফাঁস করেননি।'

'যাচ্চলে!'

'করলে আমার কাজটা সহজ হয়ে যেত, দীননাথ।'

'প্রফেসর, এমনও তো হতে পারে স্যাঁতসেঁতে সমাধি মিশমিশে অন্ধকারে রাত কাটিয়ে স্নায়ুরোগে ভুগেছেন ডক্টর ব্রানটন?'

'ব্রিলিয়ান্ট! এ-প্রশ্ন আমার মনেও দেখা দিয়েছিল, দীননাথ। কিন্তু মনের ভুলেই যদি ভয় পেয়ে থাকবেন তো পরের কয়েকটা দিন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগেছিলেন কেন? ক্লসট্রোফোবিয়া?'

'সেটা আবার কী?'

'বন্ধ ঘরে থাকলে যে মৃত্যুভয় আসে। দূষিত বাষ্পের জন্যও ভুল দেখে থাকতে পারেন ডক্টর ব্রানটন। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এসে গেছিল, মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেছিল, গা বমি বমি করছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি তুমি কী বলবে। রাজার চেম্বারে টুরিস্টরা ঢুকে ভুগেছে একইভাবে। কিন্তু কেন, দীননাথ? কেন?'

নির্লিপ্তভাবে বললাম, 'আর একজন কে রাত কাটিয়ে ছিলেন রাজার ঘরে?'

'ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার অ্যালান ল্যান্সবার্গ। ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে রাত কাটিয়েছিলেন সমাধিঘরে।'

'আর কেউ?'

'প্যাট্রিক ফ্ল্যানগান আর তার বউ ইভ ব্রুস। দু'জনেই আমেরিকান। মিশরীয় অফিসারদের

ঘুষ খাইয়ে পিরামিডের ভেতরকার ফ্লোরেসেন্ট আলো নিভিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন দু'জনে, তা শুনলে তোমার গায়ে কাঁটা দেবে দীননাথ।'

'দিক। আপনি বলুন।'

'প্রথমেই মনে হল যেন অনেক রঙিন আলো দেখতে পাচ্ছেন। তারপর বুঝলেন, চোখের রেটিনার উত্তেজনার জন্যে নয়, সত্যি সত্যিই কতকগুলো আলোর গোলক বেরিয়ে যাচ্ছে নিজেদেরই শরীর থেকে।'

'সে কী!'

'তার পরেই সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল দু'জনেরই। ঠিক যেন ইলেকট্রিক কারেন্ট ওঠানামা করছে শিরদাঁড়া বেয়ে। যন্ত্রণায় প্রায় জ্ঞান ছিল না কিছুক্ষণ। শেষরাতের দিকে ভারী আরাম পেলেন স্তোত্র পাঠের মতো কতকগুলো গলার আওয়াজ শুনে— শরীর জুড়িয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

'ভৌতিক ব্যাপার নাকি?'

'ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি আর কায়রোর শ্যামস ইউনিভার্সিটি থেকে বৈজ্ঞানিকরা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে পিরামিডের ভেতরে কসমিক রশ্মি মাপতে গিয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন, হয় পিরামিডের জ্যামিতিতে ভুল আছে, নয়তো অকাল্ট শক্তি, ফারাও-এর অভিশাপ অথবা ডাকিনী শক্তি কিংবা জাদুবিদ্যার প্রভাব রয়েছে পিরামিডের মধ্যে।'

'আপনি কী বলেন, প্রফেসর?'

'আন্টনি বভিস নামে একজন ফরাসি প্যারা-নরমাল গবেষক দেখেছিলেন, মরা বেড়াল আর ইঁদুর পচে যায়নি পিরামিডের মধ্যে—মমি হয়ে গেছে আপনা থেকেই।'

'কী যে বলেন!'

'বাড়ি ফিরে বভিস মিনি পিরামিড বানিয়ে নিয়ে ভেতরে জন্তু জানোয়ার রেখে দেখেছেন— কোনওটাই পচেনি।'

'কেন, প্রফেসর? কেন?' ঝুঁকে বসি আমি।

'এতক্ষণে একটা প্রশ্ন করলে বটে। পিরামিড-বিজ্ঞানীরা বলেন, পিরামিডের শেপটাই দায়ী এজন্যে। ঠিক যেন একটা বিরাট স্পিকার সিস্টেম। কসমিক রশ্মিকে কাজে লাগাচ্ছে ভেতরে। ব্যাক্টিরিয়া মেরে ফেলছে—মাংস পচতে দিচ্ছে না। জেমস কোবার্নের নাম শুনেছ?'

'অভিনেতা?'

'তিনি নিয়মিত পিরামিড তাঁবুর মধ্যে থাকেন তাজা থাকবার জন্যে।'

'কেয়াবাত! কিন্তু ব্যাক্টিরিয়া মরে কেন, প্রফেসর?'

'পিরামিড শব্দটার উৎস জানলেই খানিকটা আঁচ করতে পারবে। গ্রিক 'পাইরো' মানে আগুন, আর 'অ্যামিড' মানে কেন্দ্রবিন্দু। পিরামিডের ভেতরে রয়েছে আগুনের সমান শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। অভিনেত্রী গ্লোরিয়া সোয়ানসন এইজন্যেই খাটের তলায় পিরামিড রেখে স্বাচ্ছন্দ্য আর সৌন্দর্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এই জন্যই—' বলেই থেমে গেলেন প্রফেসর।

বুড়োর চোখমুখ দেখেই বুঝলাম, দীর্ঘ ভণিতা করার পর আসল কথায় এসে গেছেন। তাই বাগড়া দিলাম না। শুধু চেয়ে রইলাম।

ঈষৎ থিতিয়ে গিয়ে বললেন প্রফেসর, 'গোড়াতেই তোমাকে বলেছিলাম না, ঘরোয়া গাছপালা পিরামিডের মধ্যে বেশি বাড়ে, বেশি ঝাঁকালো হয়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছিলেন—'

'মাই ডিয়ার দীননাথ, আমার গবেষণা তাই নিয়েই। গাছপালাদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাকে আমি কাজে লাগাতে চাই পিরামিডের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দিয়ে।'

তিন. পিরামিড-লজিস্ট লালাভিচ লাড়ুকং

আচম্বিতে অনেকগুলো ভাঙা হারমোনিয়াম যেন একসঙ্গে বেজে উঠল ঘরের মধ্যে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিলাম আমি। আর প্রফেসর? আচমকা ওইরকম বিটকেল আওয়াজে মাথা ঘুরে গেল, টলতে টলতে বসে পড়লেন।

আবার সেই অজস্র ভাঙা হারমোনিয়াম বেজে উঠল। এবার যেন একটু উদ্‌বিগ্নভাবে।

পরক্ষণেই শুনলাম দরজার কাছ থেকে বিচ্ছিরি হারমোনিয়াম কণ্ঠে প্রশ্ন, 'হোয়াট! প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সেন্সলেস?'

লাট্টুর মতো বাঁই বাঁই করে ঘুরে গিয়ে তাকালাম দরজার দিকে।

কিম্ভূত আকৃতি একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আখাম্বা চেহারা। তা প্রায় সাত ফুট হাইট তো হবেই। দরজা-টরজা ছাড়িয়ে তেকোনা টেকো মাথাটা উঠে গেছে অনেক ওপরে। মাথায় টাক আছে বটে কিন্তু চকচকে নয়। লাল ঘাসের মতো রোঁয়ায় ঢাকা ত্রিভুজাকৃতি করোটি। মুখাবয়বের তলদেশও উলটোনো পিরামিডের মতো ছুঁচলো হয়ে নেমে এসেছে নীচের দিকে। সূচ্যগ্র চিবুকে পুঁইডাঁটার শেকড়ের মতো লিকপিক করছে খান কয়েক দাড়ি।

মুখখানা টকটকে লাল। এরকম লাল চামড়া জীবনে দেখিনি আমি। চোখ দুটোও টকটকে লাল। অনেকটা পদ্মরাগমণির মতো— কুতকুতে, কিন্তু ধকধকে। নাকটা বক্সারের ঘুষি খেয়ে যেন চ্যাপটা—ফুটো দুটো শুয়োরের নাসিকারন্ধ্রের মতো দু'পাশে ঠেলে রয়েছে।

আর দাঁত? সেই মুহূর্তে দাঁত বার করে হাসছিল আজব চিড়িয়াটা। তাই আশ্চর্য সেই দাঁত দেখবার সৌভাগ্য (অথবা দুর্ভাগ্য) আমার হল। সারি সারি হাঙরের দাঁত যেন মাড়ি দুটোর ওপর ঝিকিমিকি করছে।

এবং

সে দাঁতের রংও লাল!

বিষম ভড়কে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইলাম আমি। লোকটার পরনে তিব্বতি লামাদের ড্রেস। তার রংও লাল। কোমরের ঝুমকোটাও লাল। পায়ের তিব্বতি জুতোর রংও লাল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বিচিত্র জীবটাকে বেশ কিছুক্ষণ অবলোকন করলেন প্রফেসর। রুষ্ট চাহনি।

তারপর, যথাসম্ভব হিমশীতল কণ্ঠে শুধোলেন, 'মহাশয়ের নাম?'

আবার ধ্বনিত হল সেই ভাঙা হারমোনিয়ামের অর্কেস্ট্রা, 'লালাভিচ লাডুকং।'

'কিং কং-এর ভায়রাভাই?'

'ও নো। আই অ্যাম দ্য গ্রেট পিরামিড-লজিস্ট লালাভিচ লাডুকং।'

কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করে গেলেন প্রফেসর, 'লালাভিচ...লা লা ভি চ...পিরামিড-লজিস্ট লালাভিচ...'সচমকে চোখ নামালেন নীচের দিকে, মানে, বিচিত্র আগন্তুকের দিকে, 'রাশিয়ান লালাভিচ?'

'ও ইয়েস,' লাল হাঙর দাঁত ছড়িয়ে গেল দু'পাশের পেল্লায় দুটো কান পর্যন্ত— কান তো নয়, যেন বটগাছের পাতা।

'লাডুকং হলেন কবে থেকে?' ফোকলা মাড়ি চিবিয়ে প্রশ্ন করলেন প্রফেসর। দাঁত থাকলে নিশ্চয় কিড়মিড় আওয়াজটা শোনা যেত।

'তিব্বতে যাওয়ার পর থেকে। লামারা আমাকে বলে—'

'লাড্ডুকং?'

'ও নো। লাডুকং। পিরামিড বিশারদ লাডুকং।'

'বসতে আজ্ঞা হোক। কী অভিপ্রায়ে আসা হয়েছে এখানে। ওরকম বিচ্ছিরি আওয়াজটাই বা করলেন কেন? জানেন না দুশো ডেসিবেল শব্দ তরঙ্গে মানুষ মরে যেতে পারে?'

'আমার গলার আওয়াজ ওয়ান এইট্টি নাইন ডেসিবেল পর্যন্ত, প্রফেসর।'

'মাথা কিনে নিয়েছেন তা হলে! যত্তো সব! হুট করে তিব্বত থেকে এখানে মরতে এসেছেন কেন?' প্রফেসর রেগে গেলে এমন সব বিচ্ছিরি ল্যাঙ্গুয়েজ ইয়ুজ করেন যা বিহেভিয়ার সায়ান্টিস্টরা অ্যালাউ করবেন না কখনই।

আবার সেই কান-জোড়া হাঙর-হাসি হাসল লাডুকং। কাঁধের লাল ঝোলাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বসল একটা টুলে। হাসিটা যথাসম্ভব মিষ্টি করার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু দাঁতের সারি দেখেই কেন জানি না গা-হাত-পা হিম হয়ে এল আমার।

ভাঙা হারমোনিয়াম চালু হল গলার মধ্যে। আওয়াজ বটে একখানা। বম্বে ফিল্মের ভিলেনরা এরকম একখানা কণ্ঠস্বর পেলে ধন্য হয়ে যেত।

বললে লাডুকং, 'প্রফেসর, ধ্যানে বসেছিলেন আমাদের মঠের অধ্যক্ষ। হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠে বললেন—লাডুকং, তুমি এক্ষুনি নাটবল্টু চক্রের কাছে যাও। তোমার প্রবলেমের সমাধান করে দেবেন। উনিও পিরামিড নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছেন।'

'ধ্যানে জানতে পারলেন?'

'আজ্ঞে। সাই-কং সব জানতে পারেন।'

'সাই-কং?'

'সাই মানে Psi— এক কথায় বলতে পারেন, অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি ক্ষমতা। গ্রেট লামাকে আমরা psi-কং বলে ডাকি। উনি পাক্কা ক্লেয়ারভয়ান্ট। পৃথিবীর উলটোদিকে কী ঘটছে, মেন্টাল টিভি চালিয়ে দেখতে পান, শুনতে পান...' একগাল হাঙর-হাসি হাসল লাডুকং।

'মেন্ট্যাল টিভি?' প্রফেসর যেন হতচকিত।

'আকাশ থেকে পড়লেন মনে হচ্ছে?' লাড়ুকং নিজেই যেন হতভম্ব। 'তবে যে সাই-কং বললেন, আপনি পৃথিবীর সব খবর রাখেন, সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন?'

'পারিই তো,' তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠার লক্ষণ দেখালেন প্রফেসর।

'আমেরিকান রাইটার আপটন সিনক্লেয়ারের 'মেন্ট্যাল রেডিয়ো' বইটা পড়েননি। ওঁর বউ নিজেই তো ছিলেন অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি ক্ষমতার অধিকারিণী? জলজ্যান্ত মেন্ট্যাল রেডিয়ো!'

'জানি, জানি,' প্রফেসার এবার অসহিষ্ণু।

'আর আমাদের সাই-কং জলজ্যান্ত মেন্ট্যাল টেলিভিশন। উনি বললেন, লাড়ুকং, তুই এখুনি চলে যা নাটুর কাছে—'

'নাটু বলেছেন?' চোখ পাকালেন প্রফেসার নাটবল্টু চক্র।

'তিনশো পাঁচ বছর যাঁর বয়স, তিনি তো আদর করে আপনাকে নাটুই বলবেন। রাগ করছেন কেন?'

'অ।—বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন?' সন্দিগ্ধ চাহনি প্রফেসরের।

'একরকম তাই বলতে পারেন। দারুণ ঠান্ডা থেকে দারুণ গরম। দেখছেন না গলাটাই ভেঙে গেল।'

'কী করে এলেন?'

কুতকুতে পদ্মরাগ চোখ মেলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল লাড়ুকং।

তারপর বললে গলার স্কেল পালটে, 'সেটাও একটা মিস্ট্রি। আমি নিজেও জানি না কী করে হয়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি যেখানে খুশি চক্ষের নিমেষে যেতে পারি!'

চার. লাড়ুকং রহস্য

মিস্ট্রিই বটে! সাত ফুটেরও বেশি হাইটের এই মহাকায় মিস্ট্রিখানার দিকে চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইলাম আমি। বলে কী লাড়ুকং! ইচ্ছে করলেই যেখানে খুশি চক্ষের নিমেষে যেতে পারে!

অথচ নিজেই জানে না, কী করে তা হয়!

'গুল!' ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা।

'হোয়াট?' লাড়ুকং তার ওয়ান এইট্টি নাইন ডেসিবেল কণ্ঠে যেন মেগাটন বোমা ফাটাল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মতো হাসি দিয়ে বদন ভরিয়ে তুললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। বললেন, 'দীননাথ বলতে চাইছে, আপনার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'বলছে! এই কথা বলছে! তবে দেখুন!'

বলেই, তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল লাড়ুকং। পায়ের ধাক্কায় টুলটা দড়াম করে ঠিকরে পড়ল এক পাশে। চোখ সরে গিয়েছিল টুলের দিকেই। তারপরেই চোখ প্রায় ঠিকরে এল যখন দেখলাম—

লাড়ুকং ঘরের মধ্যে নেই! বিলকুল অদৃশ্য!

অতিশয় নিশ্চিন্তভাবে প্রফেসর হাঁক দিলেন, 'লাড়ুকং! লাড়ুকং! কোথায় আপনি?'

সাড়া এল বাইরে থেকে, বাগানের দিক থেকে, 'এই যে আমি।'

প্রফেসর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। বোধহয় একটা হাড়-জ্বালানো টিপ্পনীও কাটতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই বায়ুবেগে আমি ধাবিত হলাম বাগানের দিকে।

এবং বাগানে পৌঁছে শিউলি গাছটার তলায় মাটিতে ঝরে পড়া রাশি রাশি শিউলি ফুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম লালাভিচ লাড়ুকংকে। হাঙর-হাসি হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে।

আমার তখনকার অবস্থা, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা! দিন দুপুরে এ কী ভৌতিক কাণ্ড!

পেছন থেকে শুনলাম প্রফেসরের প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর, 'লাড়ুকং, পায়ের জুতোটা খুলে ফেললেন কেন?'

সত্যিই তো! এইটুকু সময়ের মধ্যেই লাড়ুকং পায়ের টকটকে লাল তিব্বতি জুতো খুলে ফেলেছে। খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে মাটির ওপর। চ্যাটালো পায়ের পাতা দুটো আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, মুখের রঙের মতো পায়ের রংও লাল। কিন্তু তার চাইতেও পিলে চমকানো বস্তুগুলো শুধু আমার পিলে চমকেই ছাড়ল না, মগজের টেন থাউজান্ড মিলিয়ন ব্রেনসেলগুলোকেও যেন টেন থাউজান্ড মিলিয়ন ভোল্টের ইলেকট্রিক শক দিয়ে ছাড়ল!

লাড়ুকং-এর শ্রীহীন পদযুগলের প্রতিটি আঙুলের নখের ফাঁক থেকে সরু সরু শেকড় বেরিয়ে ঢুকে রয়েছে মাটির মধ্যে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শেকড়গুলো নড়ছে, আরও মাটির মধ্যে ঢুকছে।

লাড়ুকং পায়ের দিকে তাকিয়ে কী রকম যেন নেশাগ্রস্তের মতো ঝিমোনো গলায় বললে 'এনার্জি টেনে নিচ্ছি, প্রফেসর। অনেকটা বেরিয়ে গেল তো!'

'এনার্জি! মাটি থেকে?'

'ও ইয়েস! কসমিক রে কন্সট্যান্টলি মাটিতেই তো ঢুকছে— সেই সঙ্গে আছে পৃথিবীর ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের এনার্জি, আর আছে লে এনার্জি।'

'লে-লে-লে এনার্জি?' শক খেয়ে জিভে প্যারালিসিস হয়ে গেল নকি আমার?

পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রাখলেন প্রফেসর। অভয় দেওয়া স্বরে বললেন, '১৯২০ সালের গোড়ার দিকে পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ ইংরেজ ব্যবসায়ী আলফ্রেড ওয়াটকিন্স—'

এই পর্যন্তই শুনেছিলাম। বিহ্বল চোখে লাড়ুকং-এর দিকে তাকিয়ে ছিলাম বলেই পরের দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিলাম।

আচম্বিতে পদ্মরাগমণি চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়েছিল লাড়ুকং। বিশাল বিদঘুটে মাথাখানা ঝট করে ঘুরিয়ে ধকধকে চোখ মেলে আমার দিকে তাকাতেই স্পষ্ট দেখলাম দু'-দুটো লাল গোলক চোখের কনীনীকা থেকে বেরিয়ে ধাঁ করে তেড়ে এল আমার দিকে। আর্ত চিৎকার করারও অবসর পাইনি। নিঃশব্দে গোলক দুটো আমার চোখের মধ্যে ঢুকেই যেন ফেটে গিয়েছিল। লাল আভায় বিশ্ব চরাচর আচ্ছন্ন দেখেছিলাম। লাল কুয়াশায় সব কিছুই ঢেকে গিয়েছিল ক্ষণেকের জন্যে। তারপরেই সরে গেল কুয়াশা— অদৃশ্য হাতের

এক টানে যেন কুয়াশার পরদা উধাও হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। আমি দেখলাম...

আমি দেখলাম, উঁচু টিলার ওপর তামাটে রঙের একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে। তেজিয়ান ঘোড়া। পায়ের গোছ চারটে সাদা। ঘোড়ার ওপর তামাটে রঙের কোট প্যান্ট টাই বুট টুপি পরা এক ইংরেজ বসে রয়েছে লাগাম ধরে। চোখে চশমা। গোঁফ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। টিলার ওপর থেকে নীচের সমতল ভূমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে বৃদ্ধ। বহু দূরে নীল আকাশের দিকরেখার সঙ্গে মিলেছে নিচু পাহাড়। সমতল ভূমির জায়গায় জায়গায় পুরনো গির্জে, ভাঙা স্মৃতিসৌধ, বিশাল দেবদারু গাছ, ছোট টিলার ওপর বৃক্ষকুঞ্জ, কুয়ো। সবজে-হলদেটে রঙের মাঠ, বন, পাহাড়, বাড়ি ঘরদোরের নিসর্গ দৃশ্য দেখছে না বৃদ্ধ— দেখছে এক অনৈসর্গিক আলোর খেলা।

প্রতিটি প্রাচীন বুরুজ দুর্গ বীথি বৃক্ষ টিলা কুয়ো আশ্চর্য আলোক দীপ্তির সরলরেখা দিয়ে যুক্ত রয়েছে। জ্যামিতির নকশার মতো প্রভাময় লাইন গিয়ে প্রতিটি জায়গাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দূরের পাহাড়ের আর দিকরেখার ওপর দিয়ে সুনীল আকাশেও জ্যামিতিক নকশা রচনা করেছে। যেন স্বর্গীয় জ্যোতির কাটাকুটি খেলা চলছে আকাশে পৃথিবীতে।

জ্বলজ্বলে সেই দীপ্তি দেখে বৃদ্ধ যেন সম্মোহিত। যেন হঠাৎ অতীন্দ্রিয় নয়নের উন্মোচন ঘটেছে। আধ-বোজা চোখে শুধু দেখছে আর দেখছে।

অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল টানা সরল রেখায় আঁকা জ্যামিতিক নকশার আলোর খেলা। এখন শুধু মাঠ আর বীথি, টিলা আর বুরুজ, গির্জে আর আকাশ।

চমক ভাঙল বৃদ্ধের। দুই চোখে অপরিসীম বিস্ময়। জড়িত কণ্ঠে উচ্চারিত হল শুধু দুটি শব্দ, 'লে লাইন!'

পাঁচ. লালি রহস্য

'দীননাথ! দীননাথ! কী হল তোমার?'

প্রফেসরের গলার আওয়াজ। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। চোখ বন্ধ করে ছিলাম এতক্ষণ। চোখ খুলে গেল তৎক্ষণাৎ।

অদূরে লালাভিচ লাড়ুকং দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে মাটির দিকে তাকিয়ে। যেন ভিজে বেড়াল— ভাজা মাছটা উলটে খেতে জানে না!

'তবে রে—' তেড়ে যাওয়ার আগেই সরু সরু আঙুল দিয়ে কাঁধ খামচে ধরলেন প্রফেসর পেছন থেকে।

'হয়েছেটা কী?'

'কী হয়েছে দেখতে পেলেন না? ম্যাজিক দেখাচ্ছে। লাড়ুকং ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ব্যাটাচ্ছেলে হিপনোটাইজ করেছিল আমাকে। নিকুচি করেছে হিপনো—'

'আমি তো কিছু দেখিনি।'

ঘুরে দাঁড়ালাম প্রফেসরের দিকে। চোখে অকপট বিস্ময়।

বললাম, 'আপনি দেখেননি লাডুকং-এর দুটো চোখ থেকে দুটো লাল বল এসে ঢুকে গেল আমার চোখ দুটোর মধ্যে?'

'না তো!'

'সে কী! তার পরেই তো দেখলাম বুড়োটাকে। ইংলিশম্যান। টিলার ওপর ঘোড়ায় বসে দেখছে মাঠ বন আকাশে অদ্ভুত আলোর নকশা...! লে লাইন... লে লাইন...!'

নিবিড় স্বরে বললেন প্রফেসর, 'আলফ্রেড ওয়াটকিন্সকে দেখেছ দীননাথ। শখের পুরাতত্ত্ববিদ ছিলেন। হঠাৎ তৃতীয় চোখ খুলে গেছিল তাঁর— লে লাইন প্রত্যক্ষ করেছিলেন একমাত্র তিনিই। কিন্তু...'

বলেই থমকে গেলেন প্রফেসর। লাডুকং যে দিকে, সেদিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, 'লাডুকং!'

ঝিমুনি কেটে গেল লাডুকং-এর। ঘুম-ঘুম চোখে তাকাল প্রফেসরের দিকে, 'ডাকছেন?'

'দীননাথকে ম্যাজিক দেখালেন কেন?'

'ম্যাজিক! আমি? না, না, আমি না। আমার বয়ে গেছে ম্যাজিক দেখাতে। আমি তো এখন লে এনার্জি টানছি, আঃ আঃ আঃ...শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে!'

'দীননাথ এইমাত্র দেখেছে লে লাইন, দেখেছে আলফ্রেড ওয়াটকিন্সকে, আপনার চোখের মধ্যে থেকে লাল বল ছুটে এসে—'

ঝটাৎ করে সিধে হয়ে গেল লাডুকং-এর ঘাড়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ওয়ান এইট্টি নাইন ডেসিবেল কণ্ঠের গগনভেদী চিৎকার, 'দেখলেন তো! দেখলেন তো! নষ্টামিটা দেখলেন তো! দোষটা কিন্তু হল আমার!'

'সাবধান মিথ্যুক!' ষাঁড়ের মতো পালটা চিৎকার ছাড়লাম আমি, 'দু'দুটো লাল বল চোখের মধ্যে থেকে বার করে কে ছুড়ে দিল আমার দিকে?'

'আমার চোখের মধ্যে থেকে? লাল বল? হাঃ হাঃ হাঃ! এবার বুঝেছি! লালি...লালির কাণ্ড! ভারী ভাল...কিন্তু এক নম্বরের বিচ্ছু...ওর জ্বালাতেই তো এলাম আপনার কাছে!'

'লালি! সেটা আবার কে?' ভুরু কুঁচকোলেন প্রফেসর।

'মাই ফ্রেন্ড।'

'কোথায় সে?'

'আমার মধ্যেই।'

'কে সে?'

'বিশ্বাস তো করবেন না। বলব?'

'বলুন।'

'একটা গাছ।'

ছয়. লে লাইন রহস্য

'খুব যে গিজার পিরামিডের নকল বসিয়েছেন গ্রোবের ওপর, ঢুকেছেন কখনও সেখানে?' ল্যাবরেটরিতে ফিরে টুলের ওপর বসতে বসতে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে লালাভিচ লাড়ুকং— মাথাখানাই যার অবিকল ডবল পিরামিডের মতো দেখতে।

ভীষণ অপমানিত বোধ করলেও ভীষণ মিষ্টি গলায় প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বললেন, 'বাপধন লালাভিচ, লম্ফঝম্প ছেড়ে কাজের কথায় আসুন। শুধু গিজা কেন, সময়ের মেশিনে চেপে আমি এই সৌরজগতের জন্ম মৃত্যু পর্যন্ত দেখে এসেছি। দীননাথ ছিল সঙ্গে।'

'অ্যাঁ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কোথায় খাপ খুলেছ শিবাজি, এ যে পলাশির প্রান্তর।'

'হোয়াট ইজ দ্যাট?'

'ইট ইজ এগজ্যাক্টলি লাইক দ্যাট। ননসেন্স। যা বলতে এসেছ ভাইকিং-এর কাছ থেকে—'

'সাই-কং।'

'ওই হল গিয়ে। সেটা বলে ফেলো। কাকে ভেতরে ঢুকিয়ে এনেছ? ভূতের খপ্পরে মানুষ পড়ে জানতাম, গাছের খপ্পরে পড়ে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়, এই শুনলাম। তাড়াতাড়ি বলো। চোখের মণি থেকে আলোর বল ছুড়ে মারা খুব খারাপ কাজ—বিশেষ করে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে। এখুনি তার একটা বিহিত করব। আগে বলো কোথায় পেলে এই গাছ বাছাধনকে।'

'আজ্ঞে এটা একটা অর্কিড। জানেন তো পৃথিবীতে প্রায় দু'হাজারেরও বেশি বিভিন্ন জাতের অর্কিড আছে। এটা তাদের কোনওটার মধ্যেই পড়ে না।'

'ওঃ! তুমি সব জেনে বসে আছ!—তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো?'

'না না। কী বলছিলাম? হ্যাঁ, অর্কিড। অত ধমকাবেন না, স্যার। অর্কিড নিয়ে আমি যথেষ্ট পড়াশুনা করেছি। আমি জানি অর্কিডের ফুলগুলো দেখলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। প্রজাপতির মতো, মাকড়শার মতো, ব্যাঙের মতো, নানান কীটপতঙ্গের মতো ফুলও অর্কিড ফোটায়। এই অর্কিডটা কীরকম ফুল ফোটায় জানেন?'

'বলো, বলে ফেলো।'

'অবিকল মানুষের মতো।'

'তাই নাকি?'

'লাল ফুল যদিও। ওই ফুলই গাছটার সব। যেমন কপিগাছের কপিটাই সব—এটাও তাই। বীজ থেকে সরাসরি একটা মানুষ ফুল— ভাবতে পারেন?'

'তা পারছি।'

'একটা গন্ধ পাচ্ছেন?'

'গন্ধ? তা পাচ্ছি।'

'মিষ্টি মিষ্টি না?'

'তা বটে।'

'তার মানে আমার অর্কিডের মেজাজ এখন ভাল আছে। রেগে গেলে অ্যায়সা পচা গন্ধ ছাড়বে, তিষ্ঠোতে পারবেন না।'

'যাক, যাক, গন্ধকাহিনি এখন থাক। বেল্লিক এই অর্কিডটা তোমার ভেতরে ঢুকল কী করে?'

'বেল্লিক বলবেন না স্যার, লালি আমার বন্ধু।'

'লালি! আবার একটা নাম দেওয়াও হয়েছে। কানাছেলের নাম পদ্মলোচন।'

ফিক করে হাঙর-হাসি হাসল লালাভিচ, 'মোটেই ও কানা নয়, আর লোচন-টোচনও নেই। তবুও ও যা দেখতে পায় তা টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপেও দেখতে পাবেন না।'

'দ্যাখো লালাভিচ, আমি একটা ভেরি ইমপরট্যান্ট রিসার্চ নিয়ে বসতে যাচ্ছিলাম। বাজে বাকতাল্লা বন্ধ করে কাজের কথায় এসো। তোমার এই লালি নামক পাজির পাঝাড়া আদুরে গাছটাকে জোগাড় করলে কোত্থেকে?'

ব্যস, আর যায় কোথায়! হঠাৎ বিষম বিকট বিটকেল পচা গন্ধে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত পাক দিয়ে উঠল। গন্ধটা এল লালাভিচের গা থেকে। তিন লাফে পেছিয়ে গেলাম।

প্রফেসর পর্যন্ত দুর্গন্ধটা সইতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে নাক টিপে নাকি সুরে বললেন, 'রসিকতাও বোঝে না তোমার লালি? একটু ঠাট্টা করলাম—এমন ইয়ে—'

গন্ধটা যেমন এসেছিল হঠাৎ, চলেও গেল তেমনি হঠাৎ।

টুলের ওপর নড়েচড়ে বসল লালাভিচ।

বললে, 'লালরঙের বলেই ওকে লালি বলে ডাকি, দেখতে পাচ্ছেন না, আমাকে লালে লাল করে ছেড়েছে। ভারী দুষ্টু। মাথায় তো টাক ছিল চিরকালই, তাতেও লাল রোঁয়া গজিয়েছে। আর বুকে পিঠে হাতে পায়ে? দেখবেন?'

বলেই অনুমতির অপেক্ষা না-করে ফস করে তিব্বতি আলখাল্লার কোমরের ঝুমকি ধরে টান দিল লালাভিচ। আলখাল্লা খুলে পড়ল মেঝেতে।

আরে সর্বনাশ! এ আবার কী? সারা গায়ে ছোট ছোট রোঁয়া, টকটকে লাল রঙের। লাল ভালুকের মতো দেখাচ্ছে লালাভিচকে। সাধারণ রোঁয়া না-বলে শুঁয়ো বলাই ভাল। ডগাগুলো স্পষ্ট দেখলাম নড়ে নড়ে উঠছে।

গা শিরশির করে উঠেছিল আমার। তারপরেই ভিরমি খাওয়ার উপক্রম হল, যখন লালাভিচ হাতের দস্তানা দুটোও খুলে ফেলল।

দশ আঙুলের নখের ফাঁক দিয়ে লিকপিক করছে সরু সরু লাল শেকড়!

আকর্ণ হেসে লালাভিচ বললে, 'লালির বুদ্ধি কি কম? হাত দিয়েও তো কখনও কখনও এনার্জি টেনে নিতে হয়। এই যেমন ধরুন আপনি—'

বলে লালাভিচ হাত দুটো (নখের কিলবিলে শেকড় সমেত) বাড়াল প্রফেসরের দিকে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় তিন পা পেছিয়ে গেলেন প্রফেসর।

দূর থেকেই বললেন কাষ্ঠ হেসে, 'বুঝেছি। এনার্জি জিনিসটা তোমার লালির খুব উপাদেয়। নইলে লে এনার্জি ওইভাবে টেনে নেয় পা দিয়ে।'

ভেরি স্ট্রং এনার্জি, স্যার, ভেরি স্ট্রং এনার্জি। পৃথিবীর প্রাচীন মানুষরা জানত এই এনার্জির খবর। পৃথিবীর ভেতরে ভেতরে এনার্জির জাল বোনা রয়েছে— ঠিক সমান্তরাল পথে জাল ছড়ানো রয়েছে পৃথিবীর মাটিতেও। যেখানে যেখানে এনার্জি লাইনের কাটাকুটি, সেইখানে সেইখানে এনার্জির অদৃশ্য ফোয়ারা রয়েছে— জানত কেবল তারাই। তাই তো মন্দির মঠ গির্জে পবিত্র কুয়ো সব ওইসব জায়গাতেই করেছিল। দৈবীশক্তি না কচু। সব এই লে এনার্জির লীলাখেলা। ফিফথ ডাইমেনশনের ভেলকি পর্যন্ত দেখিয়ে দিতে পারে এই লে এনার্জি। যেমন দেখাচ্ছে লালি— আমার ভেতরে থেকে। ওই ছোকরাটাকে দেখে একটু বেশিই দেখিয়ে ফেলেছিল— তার কারণও আছে,' হাসল লালাভিচ।

ছোকরা বলায় মাথা গরম হয়ে গেছিল। কিন্তু পরের কথাটা শুনেই মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল।

লালাভিচ হাঙর-হাসির ফাঁকে ফাঁকে বললে, 'আপনি নিজেও জানতেন না প্রফেসর। সাই-কংও জানতেন না। কিন্তু ঠিক জেনে ফেলেছে লালি।'

'কী?' প্রফেসর এগিয়ে এলেন এক পা।

'আপনার ট্যালেন্টের মূল উৎসটা কোথায় বলতে পারেন?'

আঙুল দিয়ে কপালে টোকা মেরে প্রফেসর বললেন, 'এইখানে, এই টেন থাউজান্ড মিলিয়ন ব্রেন সেলের মধ্যে—'

'আজ্ঞে না। ওর কতটুকুই বা আর নিজে খরচ করছেন। আপনাকে করিয়ে ছাড়ছে এই জায়গাটা। স্থান মাহাত্ম্য অকারণে হয়নি প্রফেসর।'

এই পর্যন্ত বলেই কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল লালাভিচ, 'কী বললি? বলাটা ঠিক হবে না? দূর বোকা, না-বললে প্রফেসরকে তো দলে টানা যাবে না। তোর আর আমার প্রবলেমের হিল্লেও হবে না।'

'কার সঙ্গে কথা হচ্ছে?' মিছরি গলায় শুধোন প্রফেসর।

'লালির সঙ্গে। ও বলতে বারণ করছে। কিন্তু আপনার জানা দরকার। কেন আপনার ট্যালেন্ট আর সবার চাইতে বেশি, কেন আপনার ব্রেন সেলগুলো হইহই করে অ্যাকটিভ আপনার তা জানা দরকার। প্রফেসর, আপনার এই ঠাঁইটা রয়েছে অত্যন্ত জোরালো পাঁচ-পাঁচটা লে লাইনের কাটাকুটির ঠিক মাঝখানে— পাঁচমাথার মোড় বলতে পারেন। ভীষণ শক্তিশালী লে এনার্জির অদৃশ্য ফোয়ারার ঠিক ওপরেই বসে আছেন। তাই অন্যে যা পারে না আপনি তা পারেন। তাই লালি বাগানের মাটিতে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা এনার্জি শুষে নিয়ে প্রথমেই অতীত দর্শন করিয়েছে ওই ছোকরাকে—'

কাঁহাতক আর 'ছোকরা' 'ছোকরা' সম্বোধন শোনা যায়? মাথায় রক্ত চড়ে গেল চক্ষের নিমেষে। তেড়েমেড়ে লালাভিচের টুঁটি টিপে ধরতে যাচ্ছি অমনি—

লালাভিচ শুধু তর্জনীটা তুলে ধরল আমার দিকে। নখের ফাঁকের কিলবিলে শেকড়গুলো থেকে লাল রশ্মি ছুটে এল আমার দিকে।

আমি যেখানে যে অবস্থায় যে পজিশনে ছিলাম— দাঁড়িয়ে গেলাম ঠিক সেইভাবেই। ঠিক যেন পাথরের স্ট্যাচু! চোখের পাতা পর্যন্ত নড়াতে পারলাম না।

পিটপিট করে আমার অবস্থাটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করল লালাভিচ। তারপর টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আলখাল্লাটা বেঁধে নিলে কোমরে।

টুক করে লাফ দিল শূন্যে। অতবড় দেহটা হালকা বেলুনের মতো আস্তে আস্তে ভেসে উঠল ওপরে। শূন্য পথেই একপাক ঘুরে এল আমাকে ঘিরে। খুট করে নেমে এল মেঝেতে।

অমায়িক হাসি শুনতে পেলাম প্রফেসরের দিক থেকে।

বলছেন, 'ঢের হয়েছে লালাভিচ। লালিকে বলো ওকে ছেড়ে দিতে। ছেলেমানুষ, কষ্ট হচ্ছে।'

লালাভিচ ছেড়ে দেবার জন্যই তর্জনী তুলেছিল। প্রফেসারের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ফের লাল রশ্মি ছুটে এল আমার দিকে। অদৃশ্য নাগপাশ খসে গেল গা থেকে। দাঁড়ালাম সিধে হয়ে। বিলকুল সিধে হয়ে অবিশ্যি নয়— হাঁটু কাঁপছিল ঠকঠক করে।

ভাঙা হারমোনিয়াম গলায় বিদিকিচ্ছিরি একটা হাসি ছাড়ল লালাভিচ।

বললে, 'এবার শুনুন, লালিকে পেয়েছিলাম কোথায়।'

সাত. পিরামিড রহস্য

মস্কো থেকে জাপান সমুদ্র পর্যন্ত যে রেললাইনটা গেছে চিনদেশের সীমান্ত বরাবর, লালাভিচ সেই রেলগাড়িতে চড়ে সাইবেরিয়া অভিযানে বেরিয়েছিল।

পথ নেহাত কম নয়। তিন হাজার কিলোমিটার রেলে চড়ার ধকল তো আছেই, তিরিশ কিলোমিটার টানেলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, দু'হাজার ব্রিজ পেরোতে হবে, ষাটটা রেলস্টেশনে নেমে শরীর চাঙা করতে হবে।

লালাভিচ কিন্তু যাবেই। না, না। কয়লা গ্যাস তেলের লোভে নয়। পুরো রাশিয়ায় যত কয়লা, গ্যাস আর তেল লাগে, তার অর্ধেকেরই বেশি দিচ্ছে সাইবেরিয়া। দিচ্ছে টন টন সোনা, ঘন জঙ্গলের লম্বা চওড়া কাঠ, পাহাড়-ভরতি লোহা, দামি ধাতু, বিশাল নদীতে ইলেকট্রিক টারবাইন।

সুতরাং এসবের কিছুর জন্যেই লালায়িত নয় লালাভিচ। সে চলছে লেক বৈকালে। ৬৩৫ কিলোমিটার লম্বা আর গড়ে ৪০ কিলোমিটার চওড়া বৈকাল হ্রদ ঘিরে যে পাহাড় আর জঙ্গলের এমারেল্ড বেল্ট— লালাভিচ চলেছে সেইখানে।

উদ্দেশ্য? একটাই। পিরামিড তাকে নেশায় পেয়ে বসেছে। আমেরিকায় তৈরি নানারকম খেলনা পিরামিড আনিয়ে হরেক এক্সপেরিমেন্ট করেছে। পিরামিডের ভেতরকার অজ্ঞাত শক্তিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে— কিন্তু পারেনি।

এমন সময়ে হাতে এল একটা ফলক। বিচিত্র ধাতুর একটা ফলক। তাতে জার্মান ভাষায় লেখা আছে বৈকাল এমারেল্ড বেল্টের মধ্যে একটা জায়গার ঠিকানা। সেখানে গেলে নাকি দেখা যাবে আশ্চর্য এক পিরামিড।

অদ্ভুতভাবে লালাভিচের হাতে এল বস্তুটা। জার্মান ভাষা তার জানা আছে। মানেটা বুঝতে পেরেই বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পিরামিড আবিষ্কারে।

কীভাবে বৈকাল হ্রদের এমারেল্ড বেল্ট দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ঘুরতে হয়েছিল লালাভিচকে, অত কথা বলার দরকার নেই।

একদিন সে দেখতে পেল পর্বতঘেরা একটা উপত্যকার মাঝে পেল্লায় একটা পিরামিড।

একেবারেই অদ্ভুত রকমের পিরামিড। তলাটা চারকোনা ঠিকই, গা-গুলোও ত্রিভুজাকার— পিরামিড যেরকম হয় আর কী।

কিন্তু পৃথিবীর কোনও পিরামিডের মাথা তো এরকম হয় না!

ওপর দিকটা স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে তৈরি। রোদ লেগে ঝলসাচ্ছে! এক্কেবারে ছুঁচলো। ঠিক যেন একটা বিশাল কাচের টুপি পরানো রয়েছে পিরামিডের মাথায়। পাথর দিয়ে তলা থেকে গড়তে গড়তে ওপর দিকে গিয়ে হঠাৎ স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে ফিনিশ করা হয়েছে শীর্ষদেশ।

লালাভিচ তো হতভম্ব হয়ে চেয়ে ছিল অনেকক্ষণ। পুরো উপত্যকায় প্রাণের স্পন্দন এক্কেবারে নেই। পাখি নেই, পোকামাকড় নেই, জীবজন্তু নেই। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। যেন পিরামিডের ভয়ে সবাই চম্পট দিয়েছে তল্লাট ছেড়ে। বোবা পাহাড়গুলো চারদিকে মাথা তুলে তাকে আড়াল করে আগলে রেখেছে যুগ যুগ ধরে!

থমথমে পরিবেশে লালাভিচ কি ভয় পায়নি? বিলক্ষণ পেয়েছিল। নিস্তব্ধ পিরামিডকে জীবন্ত মনে হয়েছিল। ঠিক যেন ওত পেতে বসে আছে বাগে পেলেই খেল দেখাবে বলে। ভয়ের চোটে গায়ের লোমটোম খাড়া হয়ে গেছিল।

তারপর? লালাভিচের পূর্বপুরুষরা নাকি তাতার ছিল। রক্তে আছে ডানপিটেমি—দুর্দান্ত সাহস। প্রাণ যায় যাক— দেখতেই হবে কী আছে পিরামিডের ভেতরে।

কী করে ঢুকেছিল ভেতরে, ইনিয়ে বিনিয়ে সেসব কথা বলারও দরকার নেই। ঢোকবার পর অনেক গোলকধাঁধা, অনেক গলিপথ, পাতাল কক্ষ, সোপান শ্রেণি পেরিয়ে সে পৌঁছেছিল ঠিক মাঝখানের একটা হলঘরে।

মাথার ওপর সেই স্বচ্ছ শীর্ষদেশ। যার মধ্যে দিয়ে রোদ এসে পড়ছে ভেতরে।

সেইসঙ্গে নিশ্চয় কসমিক রশ্মির ধারা।

চকচকে পাথর-বাঁধাই মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা লাল টকটকে পাথরের বেদি। বেদির ওপর একটা সিসের বাক্স। বাক্সর গা থেকে ঝুলছে একটা সোনার পাত।

সোনার পাতে মিশরীয় ভাষায় লেখা:

'খুব সাবধান! খুলতে যেয়ো না!

ঝামেলায় ফেলবে!'

আট. সিসের বাক্সর রহস্য

ঝামেলায় ফেলবে? কে? কোনও বাছাধনকেই তো দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে— সমাধি-টমাধিও নেই গোটা পিরামিডে যে প্রেতাত্মারা এসে হামলা জুড়বে। তবে কেন এই হুঁশিয়ারি? কেন এই বিরাট পিরামিড বানিয়ে এত যত্ন করে ছোট্ট এই সিসের বাক্সকে রাজার হালে রেখে দেওয়া হয়েছে?

অনেকক্ষণ ধরে টাক চুলকেছিল লালাভিচ। তখন টাকে লাল রোঁয়া ছিল না। মাথাটাও পিরামিডের মতো ছিল না। টাক চুলকোতে ভালই লাগত সময় অসময়ে। ভারী আরাম পেত।

একা একা বিশাল চৌকোনা হলঘরে অনেকক্ষণ টাক চুলকে, অনেক ভেবে লালাভিচ যখন দেখলে সূর্য অস্তাচলের পথে, অথচ অদ্ভুত একটা লাল আভায় ক্রমশ ভরে উঠছে বিশাল চৌকোনা হলঘর— স্বচ্ছ শীর্ষদেশ দিয়ে চাপা আগুনের আভার মতোই ধেয়ে যাচ্ছে আকাশ পানে— তখন আর নিজেকে সামলাতে পারেনি লালাভিচ। হাজার হোক তাতারের রক্ত ধমনীতে বইছে তো।

হাতুড়ি মেরে ভেঙে ফেলেছিল সিসের বাক্স। ভেতরে পেয়েছিল শুকনো একটা গাছ। লাল রঙের অর্কিড। খুদে মানুষ-পুতুলের মতো দেখতে। এত কাণ্ড করে শেষে বিদিকিচ্ছিরি একটা গাছ?

রেগে টং হয়ে গেছিল লালাভিচ। গাছ-পুতুলটাকে ধরে সজোরে আছাড় মেরেছিল পাথুরে মেঝেতে একবার...দু'বার...তিনবার...

চতুর্থবার মুঠোয় ধরে মাথার ওপর তুলে যেই আছাড় মারতে যাবে—

তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখল, রাত হয়েছে। ঘড়ি বলছে, রাত দুটো। পুরো হলঘরটা কিন্তু লাল আভায় সমুজ্জ্বল।

গাছ-পুতুলের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কীরকম যেন মনে হয়েছিল লালাভিচের। মাথাটা যেন বেশি ভারী মনে হয়েছিল।

টাক চুলকোতে গিয়ে দেখলে, মাথা পিরামিডের মতো হয়ে গেছে, চকচকে টাকে অজস্র রোঁয়া কিলবিল করছে।

ভয়েময়ে পেঁচকা থেকে আয়না বার করে মুখ দেখেই আরেকবার অজ্ঞান হয়ে গেছিল লালাভিচ।

মুখের তলার দিকটাও উলটোনো পিরামিডের মতো ছুঁচলো হয়ে নেমে এসেছে! চোখ দুটো পদ্মরাগমণির মতো লাল ধকধকে!

আর সারা গায়ে হাতে পায়ে কিলবিল করছে লাল রোঁয়া, হাতে-পায়ের নখের ফাঁক থেকে বেরিয়েছে লাল শেকড়!

জ্ঞান ফিরে এসেছিল একটা অট্টহাসি শুনে। শুনেছিল অবশ্য মাথার মধ্যে। খুলির মধ্যে থেকে অজস্র ভাঙা হারমোনিয়ামের মতো বিকট হেসে বলেছিল, 'কেমন জব্দ? আর আমাকে আছাড় মারবি? হাজার হাজার বছর বন্দি ছিলাম। কসমিক রে দিয়ে শক্তিহীন করে রেখেছিল উজবুক ভিতুগুলো। আজ আমি ছাড়া পেয়েছি। আছাড় মারলি কেন? তাই তোর মধ্যে ঢুকে তোর চেহারাটা একটু পালটে দিলাম। ওটুকু শাস্তি তোর প্রাপ্য। কিন্তু রে লালাভিচ, আজ থেকে আমি তোর বন্ধু। এসেছি মঙ্গল গ্রহ থেকে, থেকে যাব এই পৃথিবী গ্রহে। ফুল হয়ে ফুটব, আরও গাছ বানাব, এক-একটা মানুষের শরীর দখল করব। বোকা মানুষ, আদিম মানুষ।

ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি রহস্য তো দূরের কথা, পৃথিবীর মধ্যেই যে কত শক্তি রয়েছে তার হদিশ রাখে না। সব আমি জানি। সব তোকে দেব। চল বেরোনো যাক পৃথিবী পর্যটনে।'

নয়. লালাভিচের তিব্বতে আগমন

তিব্বতে নিজের ইচ্ছেয় যায়নি লালাভিচ। লালিই ওকে নিয়ে গেছিল। দু'দিনেই বেশ বন্ধুত্ব জমে গেছিল। পৃথিবীর জিওডেটিক ফোর্স লাইন থেকে এন্তার গাছপালা শক্তি টেনে নিয়ে মাথা ঝাড়া দিচ্ছে— প্রাচীন ধর্মের অনেক মানুষ জানত সেই খবর। আর্থ ফোর্সকে কাজে লাগানোর জন্যেই পাতাল ফোর্স লাইনের কাটাকুটির জায়গায় দেবালয় বানিয়েছিল। অনেক জন্তুজানোয়ারও রাখে সেই খবর। সাইবেরিয়া থেকে শীতের সময়ে এই এনার্জি নিতেই পাখির দল উড়ে আসে চিড়িয়াখানায়।

লালি লালাভিচকে নিয়ে গেল সেই সব জায়গায়। পাতাল থেকে শক্তি আহরণ করে ওকে দেখিয়েছিল কীভাবে ফোর্থ ডাইমেনশনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে চক্ষের নিমেষে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া যায়, ফিফথ ডাইমেনশনের কৃপায় শূন্যে ভাসার মতো আরও অনেক ভেলকি দেখানো যায়। সবই এই পৃথিবীর, আজও অজ্ঞাত শক্তির দৌলতে।

সাই-কং-এর মঠে সোজা সাইবেরিয়া থেকে লালাভিচ এল এইভাবেই। উদ্দেশ্য, তিব্বতি মঠে সঞ্চিত জ্ঞান আহরণ।

সাই-কং বড় ধুরন্ধর লামা। ব্যাপারটা আঁচ করেই তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন, গতিক সুবিধের নয়। ভালমানুষ লালাভিচকে দিয়ে পৃথিবীটাকে লালে লাল করতে চায় লালি— গাছ-মানুষ থুকথুক করবে পথেঘাটে শহরে মাঠে এইটাই লালির মতলব। সুতরাং যেমন বুনো ওল, তেমনি তার বাঘা তেঁতুল দাওয়াই দেওয়া দরকার।

লালাভিচকে পাঠালেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কাছে।

দশ. সমাধান করলেন প্রফেসর

লালাভিচের গলা দিয়ে করাল স্বরে অট্টহেসে বললে লালি, 'ওহে বুড়ো, তোমার কম্ম নয় আমাকে আটকে রাখা। সব জেনেই এসেছিলাম তোমার মুরোদটা দেখতে। উদ্দেশ্য আরও একটা আছে।'

নিশ্চিন্ত মনে দু'টিপ নস্যি নিলেন প্রফেসর।

বললেন—'আর কী অভিপ্রায়?'

'লালাভিচ একটা বাজে লোক।'

'কী...কী...আ-আমি বাজে লোক?' আর্তনাদ করে ওঠে আসল লালাভিচ একই গলার মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু সে গলার আওয়াজ চাপা পড়ে গেল লালির বিদিকিচ্ছিরি গলার আওয়াজে, 'লোকটা ব্রেনলেস ইডিয়ট। নইলে আমাকে সিসের বাক্স থেকে বার করে? বোকারাম কোথাকার। ভেবেছিলাম, সাই-কংকে ধরব। তারপর দেখলাম, লোকটা মঠ নিয়েই ব্যস্ত। পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে যাতায়াত তো দূরের কথা, কোনও খবরই রাখে না। তাই ওরই ধ্যানের সুযোগ নিয়ে তোমার ঠিকানা নিয়ে এলাম।'

'অভিপ্রায়?' আর এক টিপ নস্যি নিলেন প্রফেসর।

'তোমার দেহে ঢুকব। বেটার বডি। বেটার ব্রেন।'

'ফাইন। ধন্য হব মঙ্গল গ্রহের এইরকম গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর সুযোগ পেলে—'

'প্রফেসর—' আঁতকে উঠলাম আমি।

ভ্রূক্ষেপ না-করে প্রফেসর বললেন, 'আমার মধ্যে ঢুকেই তো বিশ্ব পর্যটনে বেরোবে, লালি?'

'নিশ্চয়।'

'তা হলে ধুতি পাঞ্জাবিটা ছেড়ে কোট প্যান্ট পরে আসি। বড় বড় বিজ্ঞানীদের কাছে যেতে গেলে বাইরের পোশাকটা কাজ দেয় নইলে পাত্তাই দেবে না। তাই না দীননাথ—'

'প্রফেসর—' বলেই লাফিয়ে ধরতে গেলাম বুড়োকে। তার আগেই লালাভিচের তর্জনীর তিষ্ঠ রশ্মি এসে স্থাণু করে দিল আমাকে। মুচকি হেসে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর।

ফিরে এলেন মিনিট কয়েক পরেই। বেঢপ কোটপ্যান্ট লটপট করছে সারা গায়ে৷ পরার অভ্যেস তো নেই।

বললেন, 'কই হে লালি, বেরিয়ে এসো, আমি রেডি।'

আর্তনাদ করে উঠল লালাভিচ, 'আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, লালি।' বলেই ধড়াস করে পড়ে গেল মাটিতে।

আমি নড়তে পারছি না। শুধু সভয়ে দেখছি।

নিস্পন্দ লালাভিচের হাত পায়ের নখের ফাঁকের লাল শেকড়গুলো কিলবিল করে ঢুকে গেল ভেতরে। গায়ের লাল রোঁয়াগুলোর অবস্থাও নিশ্চয় হল তাই। কেননা, টাকের লাল রোঁয়াও ঢুকে গেল ভেতরে। এমনকী মাথার আর মুখের পিরামিড দুটোও অদ্ভুতভাবে তেউড়ে বেঁকে লালাভিচের স্বাভাবিক রাশিয়ান মুখ হয়ে গেল। চামড়ার রং, দাঁতের রংও আর লাল রইল না। শেকড়ের মতো দাড়ি কখানাও উধাও হল থুতনির ভেতরে।

আর, সড়াত করে একটা বস্তু বেরিয়ে এল তার হাঁ করা মুখের মধ্যে দিয়ে। খুব জোর তিন ইঞ্চি লম্বা। লম্বা লিকপিকে যেন একটা পুতুল। টকটকে লাল সেই অপার্থিব অর্কিড।

গুটুর গুটুর করে হেঁটে এগিয়ে এল প্রফেসরের দিকে। হেঁট হয়ে হাঁ করলেন প্রফেসর, যেন মুখ পেতে দিচ্ছেন ভেতরে ঢুকে যাওয়ার জন্যে। তারপর কী ভেবে আলতো করে তুলে নিলেন বাঁ হাতের চেটোয়। চোখ কুঁচকে চেয়ে রইলেন সেকেন্ড খানেক।

ওই একটা সেকেন্ডের মধ্যেই যে ওঁর ডান হাতটা কোটের ডান পকেটে ঢুকে গেছে খেয়াল করিনি।

খেয়াল করলাম, যখন বিদ্যুৎবেগে হাতটা বেরিয়ে এল পকেট থেকে। হাতে একটা পাতলা সিসের চাদর। পলকের মধ্যে চাদরটা দিয়ে বাঁ হাতের চেটোর মূর্তিমান খুদে বিভীষিকাকে চাপা দিলেন এবং তালগোল পাকিয়ে মুড়ে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠলাম আমি। 'তিষ্ঠ' শক্তি থেকে মুক্তি পেলাম সিসের আবরণে শক্তির উৎস বন্দি হতেই। মাথা সচল হয়ে গেল প্রফেসর—'বাক্স! বাক্স! সিসের বাক্সটা!' বলে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই।

কোথায় আছে সিসের বাক্সটা জানতাম। এক লাফে গেলাম সেখানে, আর এক লাফে ফিরে এলাম বাক্স নিয়ে, খুলে ধরলাম প্রফেসরের সামনে।

প্রফেসর নির্মমভাবে দলা পাকানো সিসের তালটা ভেতরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিলেন।

মিনিট পাঁচেক লাগল সিসে গলিয়ে ফাঁকগুলো বন্ধ করতে।

তারপর আর তিনটে দিন লেগেছিল বঙ্গোপসাগরে তাকে বিসর্জন দিতে।

লালাভিচ লাড়ুকং এখন গেন্ডেমুন্ডে গিলেই যাচ্ছে। প্রবলেম তার মিটে গেছে। প্রবলেমটা ছিল খাওয়ার। লালি ভেতরে থাকায় ভালমন্দ খেতে পেত না। খালি বলত, এনার্জি খাও! এনার্জি খাও! বেচারা!

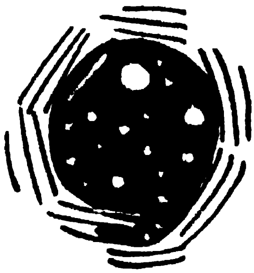

মানুষ না, যক্ষ?

'বাস্তবতা কখনওই সুন্দর নয় সৌন্দর্যের এলাকা কল্পনার জগতে।'— সার্ত্রে

প্রথম দর্শনে তাঁকে মনে হয়েছিল যক্ষ। পথ হারিয়ে তাঁর গুহায় ঢুকে পড়েছিলেন প্রফেসর। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলের সেই গুহার প্রবেশ পথ বারোমাস বরফে ঢাকা থাকে। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সেখানে কী করে গিয়ে পড়লেন, সে আর এক কাহিনি।

মলমূত্রের মধ্যে তিনি বসে ছিলেন পদ্মাসনে, দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল। হাঁকডাক করেও যক্ষের সাড়া না-পেয়ে ভেবেছিলেন, ঠান্ডায় জমে অক্কা পেয়েছেন। গায়ে হাত দিতেই আঙুলে ফোশকা পড়ে গিয়েছিল, গা দিয়ে যেন আগুন ছুটছে।

হতভম্ব প্রফেসর সভয়ে পেছিয়ে এসেছিলেন। অমনি যেন মহানিদ্রা থেকে জেগে উঠে খলখল করে হেসে যক্ষ বলেছিলেন, 'গূর্থ নরকের নাম শুনেছিস? সেখানকার দুর্গন্ধে নাকি শতযোজন দূরস্থ লোকেরও হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, সে তুলনায় এই গন্ধ তো অনেক উপাদেয় রে। আর, অবীচি নরকের অগ্নিশিখা তো শুনেছি শতযোজন পর্যন্ত উত্থিত হয়। তার চাইতে আমার গায়ের আগুন শতগুণ উপভোগ্য নয় কি?'

প্রফেসর সটান তাঁর পদতলে আছড়ে পড়ে বলেছিলেন, 'প্রভু, আপনি কে?'

'যক্ষ নই।'

'তবে?'

'সাইবর্গ।'

চোখ কপালে তুলে প্রফেসর বলেছিলেন, 'বলেন কী! সাইবারনেটিক্স অরগ্যানিজম!

'হ্যাঁ। CYBernetic-এর CYB আর ORGanism-এর ORG নিয়েই আমি জলজ্যান্ত এক CYBORG।'

'কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'অবিশ্বাসটাই বা কেন?'

'সাইবর্গ হল গিয়ে তথাকথিত সুপার অরগ্যানিজম। মানে, অতি-দেহযন্ত্র উদ্ভাবনের এমন একটা বিজ্ঞান, যে-বিজ্ঞান নিয়ে এখন কেবল, কল্পবিজ্ঞানই লেখা হয়ে চলেছে—খাঁটি বিজ্ঞানীরা হালে পানি পাচ্ছেন না।

সাইবর্গ যক্ষ বিটকেল হেসে বললেন, 'তা হলে দ্যাখ, তোরা কত পিছিয়ে আছিস। সুপারম্যান সৃষ্টির বিজ্ঞানটাকেই আজও কল্পনা-বিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে রেখে দিয়েছিস। সাধে কি আর আমি এতদূরে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছি।'

সাততাড়াতাড়ি প্রফেসর বলেছিলেন, 'একেবারেই যে পিছিয়ে আছি, তা অবিশ্যি ঠিক নয়। সুপারম্যান সৃষ্টিব প্রাথমিক পর্যায়ে তো কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দরকার। দরকার সিনথেটিক দেহযন্ত্র। সংস্থাপিত দেহযন্ত্র। কৃত্রিম মূত্রাশয়। পেশি আর স্নায়ুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি। এই সবই দেহকে লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তন করতে পারে বলে চিকিৎসাবিজ্ঞানী আর জীববিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছেন। প্রাণীদেহের সঙ্গে যন্ত্রের একটা নিগূঢ় সম্পর্কের যান্ত্রিক কৌশল বা টেকনিকের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে এ যুগের সাইবর্গ বিজ্ঞান।'

'তাই নাকি।' কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল সাইবর্গ যক্ষ যেন টিটকিরি দিচ্ছেন।

প্রফেসর বলেছিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! এ-যুগে সাইবর্গের ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেছে ভেষজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মহাকাশ ভ্রমণ এবং সামরিকবিজ্ঞানে।'

'বৎস!' নিমীলিত চোখে বলেছিলেন সাইবর্গ, 'তোর বক্তৃতা নিতান্তই বিশুষ্ক। কিছু বোঝা গেল না। আসলে—'

একটু থেমে আবার সেই অপার্থিব হাসি হেসে শেষ করেছিলেন, 'সাইবর্গ তোর নিজের কাছেও অস্পষ্ট।'

প্রফেসর ঢোক গিলেছিলেন। কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। জ্যান্ত মড়ার মতো ওই যক্ষটা ঠিক তা জেনে ফেলেছে।

খলখল করে ফের হাসলেন যক্ষ, 'তোর ব্রেনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আমার ব্রেনে পৌঁছেচ্ছে, তোর ব্রেনের সব খবরই আমার জানা হয়ে গেছে। তুই অতিশয় নিকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক, তোর নাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।'

স্থবির হয়ে গেলেন বিমূঢ় প্রফেসর!

মুচকি পরিতৃপ্তির হাসি হেসে যক্ষরূপী সাইবর্গ বললেন, 'তোকে কিছু জ্ঞানদান করব বলেই পথ ভুলিয়ে এই গুহায় টেনে এনেছি। আমার কাহিনি তন্নিষ্ঠ চিত্তে শ্রবণ কর— বাগড়া দিসনি। তোর মতো বালখিল্য বৈজ্ঞানিকগুলোর তাতে কল্যাণ হবে।

'মাদাম এইচ পি ব্লাভাদস্কির নাম নিশ্চয় শুনেছিস। রাশিয়ার খানদানি ঘরের মেয়ে। পালিয়ে এসে হিমালয়ে বসে তপস্যা করেছিল। পরে ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকায়। আমি তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কিন্তু ওই ব্রহ্ম টহ্ম আমি বুঝি না। আমি ছিলাম হার্টের ডাক্তার, কিয়েভ ইনস্টিটিউটের প্রফেসর নিকোলাই আমোসভ। আমিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম, ডাক্তারদের ইঞ্জিনিয়ার হওয়া দরকার। প্রথমে আমি ইঞ্জিনিয়ার হব ঠিক করেছিলাম। একটা পলিটেকনিকক্যাল ইনস্টিটিউটের পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে ভরতি হয়েছিলাম। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানও আমাকে আকৃষ্ট করে। তাই মেডিক্যাল কলেজেও ভরতি হয়েছিলাম।

'ছাত্র অবস্থাতেই কৌতূহলের তাগিদে অস্বাভাবিক নকশার অনেক বয়লার তৈরি করেছিলাম। আবার ডাক্তারি ছাত্র হিসেবে নরদেহের হৃৎপিণ্ড চালু থাকে কী করে, তা

নিয়েও গবেষণা শুরু করেছিলাম। একাধারে ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর স্টিম টারবাইন ইঞ্জিন চালিত একটা মৌলিক নকশার উড়োজাহাজও বানিয়েছিলাম। তারপরেই বাধল যুদ্ধ। আমি সার্জন হলাম। দেখলাম, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু সমস্যার সমাধান করতে গেলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যেটাও বেশ কাজে লাগে।

'বড় অপারেশন করতে গেলে যে বহু মেশিনের দরকার, এই আইডিয়াটা প্রথম আমার মাথাতেই আসে। কিয়েভের সার্জন্স কনফারেন্সে এই সম্পর্কে আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধ পড়ে শোনানোর সময়ে একটা বিরাট ট্রাঙ্ক মঞ্চে তুলেছিলাম। তার ভিতর থেকে বার করেছিলাম নকল ফুসফুস— অপারেশনের সময়ে রুগির শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখার জন্য যা দরকার।

'হাজার চারেক অপারেশন করেছিলাম এই ফুসফুস কাজে লাগিয়ে। হৃৎপিণ্ড-রহস্যের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে করতে আমার মনে হয়েছিল আরও কঠিন ব্যাধি নিরাময়ের জন্য চাই এমন একটা মেকানিক্যাল পাম্প যা হৃৎপিণ্ডকে কিছুক্ষণের জন্যে থামিয়ে শুকনো অবস্থায় রেখে দেবে— অপারেশনের তাতে সুবিধা, এইভাবেই আবিষ্কার করলাম নকল হার্ট।

'কিন্তু অসুবিধা হল নকল হার্টের ওজন নিয়ে। আসল হার্ট যখন মাত্র দশ আউন্স ভারি, নকল হার্ট বয়ে নিয়ে যেতে দু'জন লোকের দরকার— আয়তনে কোমর সমান উঁচু! এত বড় যন্ত্র নিয়ে কি কাজ করা যায়? মনে মনে খুব বিরক্ত হয়ে পড়লাম নিজের উপরই।

'মাথা খাটিয়ে ভেবে দেখলাম, এমন একটা ছোট্ট মেশিন দরকার যা রুগির রক্তের চাপ ঠিক সমতায় রেখে দেবে, রুগির দেহযন্ত্রগুলো চালু রাখবার জন্যে অক্সিজেন সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করবে। যন্ত্র কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করবে সব কিছু স্বয়ংক্রিয় ভাবেই। সাইবারনেটিকস-এর সম্ভাবনাটা তখন থেকেই এল মাথার মধ্যে।

'সাইবারনেটিকস এমনভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রয়োগ করতে চাইলাম যাতে ভেতরকার দেহযন্ত্র আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গর বদলি যন্ত্র পাওয়া যায়। মানুষকে আস্তে আস্তে অতি মানুষ করে তোলার স্বপ্ন দেখার শুরু সেই থেকেই।'

সাইবর্গ যক্ষ থামলেন। প্রফেসর হামলে উঠলেন, 'প্রভু তারপর?'

'বৎস চক্র, একটু ধৈর্য ধর।' যক্ষ নিমীলিত চক্ষে আবার শুরু করেন, 'তুই তো জানিস, আজও সাইবারনেটিকস বিজ্ঞানের নতুন নতুন সংজ্ঞা বেরোচ্ছে তোর মতো উজবুক বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ক থেকে। সর্বশেষ সংজ্ঞাটা একজন বলার পর দেখা যাচ্ছে, আর একজন মাথা খাটিয়ে সাইবারনেটিকস বোঝাবার চেষ্টা করছে আর একভাবে। আসলে কী জানিস, কম করে পাঁচটা বিজ্ঞানের সংযোগ ঘটেছে এই সাইবারনেটিকস-এর মধ্যে। এই পাঁচটা বিজ্ঞান হল, স্বয়ংক্রিয়তা, গণিতবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, জীববিজ্ঞান আর যোগাযোগতত্ত্ব। এই কারণেই সাইবারনেটিকস বিজ্ঞান এত জটিল! তবে কী জানিস, তোদের দোষ নেই। সাইবারনেটিকস আজও তোদের কাছে এতই শিশুবিজ্ঞান যে এ নিয়ে তর্কবিতর্ক হবেই। বেশ কিছু ছাগলমার্কা পণ্ডিত এই ধোঁয়াশার সুযোগ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং সাইবারনেটিকস আর বায়োলজিক্যাল সাইবারনেটিকস-এর মধ্যে একটা লাইন টানবার চেষ্টা করে চলেছে।

'অথচ ওই গন্ডমূর্খরা জানেই না যে, বায়োলজিক্যাল সাইবারনেটিকস তো শরীরের মধ্যেই রয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রকৃতি নিজে জীবদেহের মধ্যে গড়ে তুলেছিল অতিশয় নিখুঁত একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা— অত্যাশ্চর্য একটা যন্ত্র যা নিজে থেকেই নিয়ন্ত্রণ করে আসছে শরীর নাম মহাযন্ত্রের কাণ্ডকারখানা। এই যন্ত্রের নামই তো ব্রেন— যার সঙ্গে শরীরের সমস্ত অংশের যোগাযোগ রয়েছে অসংখ্য স্নায়ুর মাধ্যমে।

'তারপরে এমন একটা দিন এল যখন মানুষের এই ব্রেনই খবরদারি করার কলকবজা আবিষ্কার করে বসল! সেদিন কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হয়নি, ওরকম যন্ত্র তার দেহের মধ্যে প্রকৃতি গড়ে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে।'

'আশ্চর্য!' অভিভূত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর!

'তা হলেই দ্যাখ, জীবন্ত দেহযন্ত্র আর মেশিনের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ থেকেই সাইবারনেটিকস-এর জন্ম। এই কারণেই সাইবারনেটিকস কী ধরনের বিজ্ঞান, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন বলেছিল, এ সেই বিজ্ঞান যার সাহায্যে জীববিজ্ঞানীরা ইঞ্জিনিয়ারদের শেখায় মেশিন কীভাবে বানাতে হবে। আবার ইঞ্জিনিয়াররা জীববিজ্ঞানীদের হাতে কলমে দেখিয়ে দেয় জীবন চালু থাকে কীভাবে!

'আলট্রামডার্ন এই সায়ান্সকে এই কারণেই কেউ কেউ বলে থাকেন বায়োনিকস। বায়োলজিযুক্ত মেকানিকস। জীবদেহের সঙ্গে ইলেকট্রনিকস পদ্ধতির তুলনা থেকেই জন্ম বায়োনিকসের।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিস্ময়ের শেষ নেই। কিন্তু সব বিস্ময়কে ম্লান করে দেয় একা ব্রেন— মানব মস্তিষ্ক। অথচ তার ওজন মোটে তিন পাউন্ড। জিলেটিনের মতো দেখতে ধূসর আর সাদা টিশুর একটা ব্যাঙের ছাতা যেন। এই ব্রেনের মাধ্যমেই যত কিছু অদ্ভুত কর্মকাণ্ড চলছে। কিন্তু তার নকল হওয়ার মতো কম্পিউটার, মানে যন্ত্র-মস্তিষ্ক আজও বেরোয়নি। নিউরোন, মানে স্নায়ুকোষই আছে তিন হাজার কোটি, তার পাঁচ থেকে দশগুণ হল গ্লাইয়ার কোষ। এত জিনিস ঠাসা রয়েছে মাত্র তিন পাউন্ড ওজনের ওই ছোটখাটো ব্যাঙের ছাতার মধ্যে। শরীরের সব ক'টা যন্ত্রকে সে চালাচ্ছে— যন্ত্রী সে নিজে।

'অত্যাশ্চর্য এই ব্রেনের গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। শরীরের যেখানেই ব্যথা লাগুক না কেন, সেই ব্যথা অনুভূত হবে ব্রেনের মধ্যে— অথচ তার নিজের কোনও ব্যথা নেই। কেটে ফেললেও ব্রেনের কিছু লাগে না। রুগিকে জাগিয়ে রেখেও তাই মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব।

'অথচ কী নিদারুণ জটিল এই ব্রেনের স্থাপত্য। এক চাপড়া ঘাসের শেকড় যেমন জট পাকিয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবে জট পাকিয়ে রয়েছে এর তিন হাজার কোটি স্নায়ুকোষ বা নিউরোন।

'এক-একটা নিউরোনকে দেখতে আবার অনেকটা মাকড়সার মতো— সরু সরু সুতো বা তন্তুর গায়ে যেন আটকে আছে। এদের মধ্যে দিয়েই সিগন্যাল যাচ্ছে আসছে ঘণ্টায় ২২৫ মাইল বেগে।'

'২২৫ মাইল!' প্রফেসর কথা খুঁজে পান না।

'আজ্ঞে হ্যাঁ! বুঝলি, সব আমি টের পাই। ব্রেন নিয়ে এইসব ভাবনা চিন্তা তোর যে অসহ্য লাগছে, তা কি আর বুঝছি না। তার কারণ কী জানিস? বুড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোর ব্রেনের যে কোষগুলো অক্কা পাচ্ছে, তাদের জায়গায় নতুন কোষ আর আসছে না! এই একটি ব্যাপারে প্রকৃতি মেরে রেখে দিয়েছে আশ্চর্য যন্ত্র এই ব্রেনকে। তা যদি না হত, যদি অন্যান্য দেহযন্ত্রের মতো নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি সামলে নিতে পারত পুনরুৎপাদনের মারফত, তা হলেই তো মানুষ অমর হত— অতিমানুষ হত। আমার দিবানিশার চিন্তা হয়ে দাঁড়াল এই সমস্যাই— ব্রেনকে পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা দিতে হবে। তা হলেই সে সুপারম্যান সৃষ্টি করতে পারবে। সাইবর্গের কল্পনা মাথার মধ্যে এল সেই থেকেই।

'না, না, আর কথা বলিসনি, বাগড়া দিসনি। আমি তো বলছি, তোর ওই দেড় কিলো ব্রেন নিয়ে তুইও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কবজায় আনতে পারবি। দেড় কিলোর একটুখানি কাজে লাগিয়েই মানুষ আজ ইতর প্রাণী থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে বসেছে। স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় কয়েক লক্ষ বছর পরে এই দেড় কিলোর মহিমাতেই মানুষ এমন এক মহান স্তরে পৌঁছোবে যে-স্তরে উঠে, আজকের মানুষের ব্রেনকে আদিম নিয়ানডারথাল মানুষের মস্তিষ্কের মতোই আদিম মস্তিষ্ক ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।

'কিন্তু কয়েক লক্ষ বছরের বিবর্তনকে কি কয়েক বছরের মধ্যে গুটিয়ে আনা যায় না? আমি নাওয়া-খাওয়া ভুললাম সেই গবেষণায়।'

পাথরের বিস্ময়

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ ঘাড় কাত করে সাইবর্গ যক্ষ চেয়ে রইলেন গুহার ছাদের দিকে। প্রণিপাত অবস্থায় প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন সেদিকে এবং চমকে উঠলেন।

গুহায় পাথরের ছাদের বেশ খানিকটা অনচ্ছ হয়ে গিয়েছে। ঠিক যেন ঘষা কাচের প্লেট বসানো। প্লেটের মধ্যে ফুটে উঠেছে অনেকগুলো কিম্ভূত আকার বিস্তর কল্পনাতীত স্থাপত্য, দূরে দেখা যাচ্ছে যমজ সূর্য, হলুদ আকাশ আর অগণিত নক্ষত্র।

অভিভূত হয়ে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। এ কী দেখছেন তিনি? এ কোন নক্ষত্রলোকের ছবি? কোন মহাসভ্যতা ফুটে উঠেছে পাথরের বুকে? কাদের আকৃতি বায়বীয় বেগে সঞ্চরমান অনচ্ছ প্রস্তর গাত্রে?

সংবিৎ ফিরল সাইবর্গ যক্ষের বিটকেল চিৎকারে, 'বলছি তো সময় হলেই যাব! এত তাড়া কীসের? এই অপোগণ্ডটাকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে যাই!'

ছায়ামায়া মিলিয়ে গেল পাথরের বুক থেকে। পাথর আবার পাথর হয়ে গেল।

কথা বলতে গিয়ে প্রফেসর দেখলেন তাঁর শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছে বিষম বিস্ময়ে। খাবি খেতে খেতে কোনওমতে গুঙিয়ে উঠলেন তিনি, 'ও—ও কী হুজুর?'

'ওটা হল গিয়ে আমার হলোগ্রাম প্লেট। ক্রিস্টাল প্লেট।'

হাঁ করে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'কিন্তু যাদের দেখলাম, তারা তো হলোগ্রামের ছায়ামূর্তি বলে মনে হল না। একেবারে জ্যান্তর মতোই তো—'

'জ্যান্তই তো। অনেক দূরের নক্ষত্রলোকের ডাবল, দেখলি এখুনি। আয়নার আলো প্রতিফলিত হয়ে 'ডাব্‌ল' ফুটিয়ে তোলে— আমার হলোগ্রাম প্লেটে জীবন্ত দেহের অথবা যে-কোনও বস্তুর ডবল সৃষ্টি হয়।'

'কীভাবে, মহাপ্রভু?' প্রফেসারের অবস্থা খুবই কাহিল।

'খুব সোজা থিয়োরি।' যক্ষ করুণা করেন, 'প্রত্যেক বস্তু বা জীবদেহের মধ্যে থেকে তরঙ্গ ছুটে যাচ্ছে চতুর্দিকে। এই বিকিরণ তরঙ্গকে ঠিকমতো প্রতিফলিত করতে পারলেই হুবহু মূল জিনিস বা দেহের নকল সৃষ্টি করা যায়। যেমনভাবে রেডিয়ো ওয়েভকে শব্দে রূপান্তরিত করা হয়। টেলিভিশনের ছবি ইলেকট্রনিকের সার্কিটের মধ্যে দিয়ে যেমন ছবি হয়ে ফুটে ওঠে— ঠিক তেমনি।'

নাছোড়বান্দার মতো প্রফেসর তবু বললেন, 'কিন্তু ওরা কারা? আপনাকে ডাকছে কেন?'

ভীষণ দাবড়ানি দিলেন সাইবর্গ যক্ষ, 'দরকার হয়েছে বলেই ডাকছে। তোরা ডাকিস না বলে সাড়া দিই না। তোর চোদ্দো পুরুষের ভাগ্য তাই আজকে তোকে পথ ভুলিয়ে এনে দেখা দিলাম। এখন শোন তারপর কী করলাম, কী ভাবলাম।'

কাতর কণ্ঠে প্রফেসর তবু বললেন, 'প্রভু!'

'আবার!'

'প্রভু, একটা বর প্রার্থনা করব?'

যেন ঈষৎ প্রসন্ন হলেন সাইবর্গ যক্ষ, 'কী বর?'

'আমার চাইতেও অপোগণ্ড আমার একটা চ্যালা আছে— তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। দেখাবেন?'

সাইবর্গ যক্ষর নীরস শুষ্ক মুখভাব এই কথায় যেন হালকা হাসির আলোয় ঝলমল করে উঠল। একটু নরম গলায় বললেন, 'জানি সে কে। ওই দীননাথ মূর্খটা তো?'

'প্রভু সর্বজ্ঞ।'

'কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখে?'

'আজ্ঞে।'

আবার সেই চাপা হাসির রোশনাই ঝিলমিলিয়ে গেল সাইবর্গ যক্ষের পার্চমেন্টসদৃশ মুখের পরতে পরতে, 'ছোকরা ছাইপাঁশ লিখলেও তোকে কিন্তু খুব পাবলিসিটি দিয়েছে।'

'যা বলেন।'

'বৎস চক্র, আমি তোর বর প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম। কেন, তাও শুনে রাখ। এই হিমালয়টা আজকাল আর মোটেই সুবিধের নয়। পাহাড়ে ওঠবার নাম করে যত অ্যাডভেঞ্চারিস্টরা যখন তখন এখানে আসছে। এ ছাড়াও আসছে নানান বৈজ্ঞানিকের দল আর নানান দেশের সৈনিক গুপ্তচরেরা। হিমালয়ের রহস্য যেমন অসীম, এর গুরুত্বও তেমনি সীমাহীন— সামরিক এবং বৈজ্ঞানিক, দু'দিক থেকেই, এই পঙ্গপালের মতো অভিযাত্রীদের সব খবরই

আমি রাখি এইখানে বসে। তাদের কাউকে পথ ভুলিয়ে এখানে নিয়ে আসিনি— তোকে নিয়ে এলাম, কেন জানিস?'

বিগলিত কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'আজ্ঞে না।'

'উদ্দেশ্য আছে বলে। আমার একটু পাবলিসিটি দরকার।'

'আপনার...পাবলিসিটি?...'

'এ-যুগটাই এখন পাবলিসিটির যুগ। দিনকে রাত, আর রাতকে দিন করা যায় প্রচার যন্ত্রের দৌলতে। যন্ত্র-শ্রেষ্ঠ সাইবর্গ আমি, আমিও হাড়ে হাড়ে বুঝছি এই প্রচার যন্ত্রের মহিমা। প্রচারটা শুধু আমার জন্যে নয়— পৃথিবীর যন্ত্রবিদ বৈজ্ঞানিকগুলোর চোখ খুলে দেওয়ার জন্যেও বটে— ওরা জানুক, আমি...আমি আছি, আমি আছি— এই গহন বিজন হিমগিরির প্রত্যন্ত প্রদেশে আমি অধিষ্ঠিত আছি অদ্রি ঈশ পর্বতেশ্বর অদ্রীশ অথবা নীলকণ্ঠ মহাদেবের রূপে। আমিই তাদের কাছে এখন দেবতার পর্যায়ে পৌঁছেছি— আমাকে তারা এখন যদি একটু পূজা আচ্চা করে, তবে আমার ছিটেফোঁটা প্রসাদেও তাদের বিজ্ঞান এক-একটা লাফে এগিয়ে যাবে এক-একটা শতাব্দী। কী রে, ঠিক বলেছি না?'

সংশয়াচ্ছন্ন স্বরে প্রফেসর বললেন, 'আজ্ঞে, আপনি কি আর বেঠিক বলেন? কিন্তু অপোগন্ড বৈজ্ঞানিকগুলো বড় নাস্তিক তো, দেবতা টেবতা মানতেই চায় না। মেশিন পুজো কি করতে চাইবে?

চোখ জ্বলে উঠল সাইবর্গ যক্ষর, 'ওদের বাবা করবে।'

মিনমিন করে প্রফেসর বললেন, 'তা হলে নিশ্চয়ই করবে। দীননাথ চুটিয়ে পাবলিসিটি দিলেই আপনার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়বে। কত ঠগবুজরুক দু'পয়সা করে নিল নিজের জয়ঢাক নিজে পিটে, দীননাথ না হয় এক সাইবর্গের পাবলিসিটি করবে— ওর জীবন ধন্য হয়ে যাবে।'

'সেইসঙ্গে এতদিন ছাইপাঁশ লিখে যা পাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্তও হয়ে যাবে, কী বলিস?' প্রসন্ন কণ্ঠ সাইবর্গ যক্ষের।

'আজ্ঞে, তা আর বলতে। দেখাবেন মূর্খটাকে?'

সাইবর্গ যক্ষ তখন ঘাড় কাত করে গুহার ছাদের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাকাতে না তাকাতেই অনচ্ছ হয়ে উঠেছিল পাথর। ঘষা কাচের মতো হলোগ্রাম-প্লেট ক্রিস্টালের বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখা গিয়েছিল আমার ডবলকে।

পরে আমাকে প্রফেসর বলেছিলেন, 'দীননাথ, লেখবার সময়ে কলম কামড়ে, নস্যি নিয়ে, নাক ঝেড়ে এমন একখানা বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করো তা তো জানতাম না। ওকে কি লেখা বলে? ও তো কলম নিয়ে কুস্তি করা?'

যাই হোক, আমার সেই কুস্তিরত মূর্তি অবলোকন করে যুগপৎ বিস্মিত এবং প্রীত হয়ে প্রফেসর বলেছিলেন, 'প্রভু, হলোগ্রাফ ক্রিস্টালের ফরমুলা আর ব্লু-প্রিন্টটা বলবেন?'

'আস্পর্ধা দেখে আর বাঁচি না রে।' খেঁকিয়ে উঠেছিলেন সাইবর্গ যক্ষ।

কিন্তু প্রফেসরের এক মস্ত দোষ অথবা গুণ হল, দরকার হলে কচ্ছপের কামড় দিয়ে পড়ে থাকতে পারেন যে-কোন বিষয়ে।

কাঁইমাই করে বললেন, 'প্রভু, পৃথিবীটায় এখন তেলের সংকট দেখা দিয়েছে। তেল পুড়িয়ে পৃথিবীর একদিক থেকে আর এক দিকে কনফারেন্স করতে যাওয়া যেমন ঝকমারি, তেমনই খরচ সাপেক্ষ। খরচ বেড়েছে রোজকার যানবাহনের। ধরুন এখন যদি আপনার হলোগ্রাম প্লেট ক্রিস্টাল ঘরে ঘরে অফিসে অফিসে পৌঁছে দেওয়া যায়, তা হলে জ্যান্ত মানুষটাকে আর সশরীরে অফিসে যেতে হবে কি?'

'দরকার কী? তার ডবলটাই জ্যান্ত— তারই শরীরের ভাইটাল এনার্জির রিফ্লেকশন—'

'অর্থাৎ ঘরে বসেই অফিসের কাজ সে করতে পারবে ডবলকে দিয়ে?'

'একেবারে।'

'মিটিং করতেও আর পলিটিক্যাল লিডারদের মাঠে ময়দানে ঝটিকা পর্যটনে বেরোতে হবে না— পার্টির অফিসে বসেই ডবলদের দিয়ে মিটিং-এ লেকচার দেওয়াবে?'

'যা বলেছিস।'

'তা হলেই দেখুন দেশে দেশে ছোটাছুটির কত খরচ কমে যাবে। তারপর সেদিন গ্রহে গ্রহে আমাদের উপনিবেশ ছড়িয়ে পড়বে, তখন তো আর রক্তমাংসের শরীরটাকে নিয়ে রকেটে করে মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ার দরকারই হবে না— হলোগ্রাম প্লেট ক্রিস্টালই সেই কাজ করবে।'

'তা তো করবেই, সেই সঙ্গে অনেক গর্হিত কর্মও হবে।'

বুঝিয়ে দিলেন সাইবর্গ যক্ষ, 'গুপ্তঘাতককে আর কষ্ট করে প্রাণ হাতে নিয়ে গুম খুন করতে যেতে হবে না— ডবল পাঠিয়েই কাম ফতে করে দেবে, ব্যাঙ্ক লুঠ করার জন্যে সশরীরে বোমা বন্দুক না-নিয়ে গেলেও চলবে। ডবল ব্যাঙ্ক লুঠ করবে, ধরা পড়লে ডবল বাতাসে মিলিয়ে যাবে— ঠিক যেভাবে আয়নার প্রতিফলন মিলিয়ে যায়। কোনও ঝুঁকি থাকবে না। আরও শুনবি?'

প্রফেসর আরও শুনবেন কী, চক্ষুস্থির হয়ে গেছে হলোগ্রাম প্লেট ক্রিস্টালের অপব্যবহারের বৃত্তান্ত শুনে।

সান্ত্বনার স্বরে বললেন সাইবর্গ যক্ষ, 'অতি নচ্ছার এই পৃথিবীর মানুষগুলো এখনও যে সভ্য হল না রে। যেদিন হবে, সেদিন অনেক কিছুই আমি দেব— তোকে পথ ভুলিয়ে আনলাম তো সেই কারণেই। এখন বল, হলোগ্রাম প্লেট ক্রিস্টাল আর দরকার?'

'আজ্ঞে না। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা মানাবে না।'

'বড় উত্তম কথা বলেছিস। যাক, কী বলছিলাম যেন?'

'কয়েক লক্ষ ব্রেন বিবর্তনকে কয়েক বছরের মধ্যে গুটিয়ে আনা যায় কিনা ভাবছিলেন।'

'হ্যাঁ এবার সেই কথাই বলা যাক।' তারপরেই কী ভেবে বললেন, 'ওরা যা তাড়া লাগাচ্ছে, বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। জানিস তো কানের স্নায়ুর চেয়ে ত্রিশগুণ বেশি খবর ব্রেনে নিয়ে যায় চোখের স্নায়ু। তাই চোখেই দ্যাখ— মেমারি প্রিন্ট আমার ব্রেন থেকে চালান করে দিচ্ছি হলোগ্রাম প্লেট ক্রিস্টালে। যা দেখবি জীবন্ত দেখবি। তৈরি তো? দ্যাখ এবার।'

সাইবর্গ যক্ষের মুখ থেকে কথাটা নিঃসৃত হওয়ামাত্র জীবন্ত ব্রেনের মানচিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠল প্রফেসরের নিজের ব্রেনের মধ্যে— চোখের স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে অকস্মাৎ হুহু করে ছবির পর ছবি ধেয়ে গেল তাঁর নিজের ব্রেনের মধ্যে।

এই অসংখ্য ছবির সারি এল কোত্থেকে তা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারলেন না প্রফেসর! সাইবর্গ যক্ষের কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হল চোখের সামনে থেকে। তার বদলে ছবির কুচকাওয়াজ আরম্ভ হয়ে গেল যেন। সে এক আশ্চর্য অচিন্তনীয় অনুভূতি, এক অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সহসা যেন দিকহীন অন্তহীন নিরবলম্ব এক মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে তিনি উধাও হলেন মহাকালের নিরবচ্ছিন্ন মহাপ্রবাহের ওপর দিয়ে।

ভূগোলকের মানচিত্রের মতো সাধারণ মানচিত্র তিনি কিন্তু দেখলেন না, দেখলেন বহু বৃত্ত, বহু ত্রিভুজ এবং বহু রেখা। তিনি দেখলেন কখনও সুবৃহৎ মসৃণ সমতলভূমি— বিস্তর খাল, ফাটল, পর্বত, অজস্র নকশা কেটে গেছে যেন ধুধু প্রান্তরের ওপর দিয়ে। কখনও দেখলেন চোখ-টাটানো অসীম ক্লান্তিকর মরুভূমি— আবার কোথাও জনপদবহুল নিবিড় অঞ্চল। কোথাও দেখলেন বাসিন্দারা বেঁটে, স্থূলকায়, আবার কোথাও তারা লিকলিকে তালঢ্যাঙা। রহস্যময় অজ্ঞাত সেই অঞ্চলের বহুলাংশ আজও অনাবিষ্কৃত। বিজ্ঞানসাধক অভিযাত্রীদের কাছেও বিশাল এই মস্তিষ্ক মহাদেশ আজও তাই অজ্ঞাত প্রহেলিকা সমাচ্ছন্ন।

অসাধারণ এই অ্যাটলাসের ওপর দিয়ে মুহ্যমানের মতো এগিয়ে চললেন প্রফেসর! তাঁর বিস্ফারিত চোখের সামনে হইহই করে ভেসে উঠল বিস্ময়কর এই দুনিয়ার বিবিধ অভিযানের পরমাশ্চর্য ইতিহাস।

উনি একের পর এক দেখলেন, কীভাবে বাইজানটাইন, আরব ও মধ্যযুগীয় পণ্ডিতরা বিস্তীর্ণ এই মহাদেশের অ্যাটলাসকে তিন ভাগে ভাগ করেছিল। এক অংশে ছিল ভাবাবেগ, আর এক অংশে ধীশক্তি, তৃতীয় অংশে স্মৃতিশক্তি—দেহের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করত এই তৃতীয় অংশটি।

আবার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে এই আদিম ধ্যানধারণাকেই পরবর্তীযুগে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মুখ্য ভূমিকার পটভূমিকায় কিভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হল, তাও ছবির মতো কথা ও কাহিনির আকারে ভেসে গেল তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

বহু বহু যুগ আগে এককালে ধারণা ছিল পৃথিবীকে বুঝি মাথায় করে রেখেছে নাগরাজ বাসুকী। অন্যান্য দেশে ধারণা ছিল, তিমি অথবা হাতির পিঠে রয়েছে এই পৃথিবী। আদিম এবং হাস্যকর এই ধারণা নস্যাৎ করে দিয়েছিল ভূ-অভিযাত্রীরা দুটো অভিযানে বেরিয়ে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও দেখলেন অনুরূপ দৃশ্য। মস্তিষ্ক মহাদেশের অভিযাত্রীদের শতাব্দীর পর শতাব্দী গবেষণার ফলে ধরা পড়ল অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

ভূ-অভিযাত্রীরা যেমন ভূ-গোলকের নতুন নতুন জায়গার নামকরণ করে গেছে নিজেদের নামে— ব্রেনের মানচিত্রেও সেইভাবে নিজেদের নাম রেখে যেতে দেখলেন প্রথম আবিষ্কারদের। স্বচক্ষে দেখলেন, রোল্যান্ডোর ফাটল, বেজ-এর কোষ, লিসয়ার-এর অঞ্চল,

ডার্কউইটস-এর কেন্দ্রিন, বেকটেরেভ-এর নামে অনেকগুলো স্নায়ু-গঠন, সিলভিয়াস জলনালী ইত্যাদি...ইত্যাদি।

সেকালের ব্রেন বিজ্ঞানীরা ব্রেনের বিভিন্ন গঠনের অর্থ বোঝেননি। প্রশ্ন জেগেছিল, ব্রেনের ধূসর পদার্থের গভীর খাঁজ ও ভাঁজের মধ্যেই কি প্রচ্ছন্ন রয়েছে মানুষের ধী-শক্তি আর চরিত্র রহস্য?

প্রশ্নের সমাধান করতে জার্মান বৈজ্ঞানিক ওয়াগনারকে এগিয়ে আসতে দেখলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

সেই প্রথম মৃত বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণায় হাত দিলেন ওয়াগনার। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ধীমান বৈজ্ঞানিকরা— তাঁদের মস্তিষ্কেও নিশ্চয় ছাপ থেকে যাবে বিপুল ধী-শক্তির। কিন্তু হতাশ হলেন ওয়াগনার— হতাশ হলেন প্রফেসরও, অসাধারণ মনের অধিকারী মানুষগুলোর মস্তিষ্ক— মানচিত্রে কই তেমন কিছু নিদর্শন তো মিলছে না?

তবে কি ব্রেনের ওজনের সঙ্গে মস্তিষ্কের ধী-শক্তির নিগূঢ় সম্পর্ক আছে? ক্ষিপ্তের মতো জগদ্‌বিখ্যাত মনীষীদের মস্তিষ্কের ওজন নিয়ে চার্ট বানিয়ে ফেললেন ওয়াগনার। উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। লিস্টের ওপর রইল বিখ্যাত ফরাসি প্রকৃতিবিদ কুভিয়ার— কিছু তফাতেই কবি বায়রন। কিন্তু ধাঁধা তো কাটল না। বায়রনের মস্তিষ্ক ওজনে ভারী নিঃসন্দেহে, কিন্তু সমান ওজনের অজ্ঞাত এক উন্মাদের ধী-শক্তি তো বায়রনের সমান নয়। তা হলে বিপুল মস্তিষ্ক থাকলেই যে বিপুল ধী-শক্তির অধিকারী হতে হবে এ তত্ত্বে ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

মস্তিষ্কের সাইজের সঙ্গে তা হলে কি মানুষের কার্যক্ষমতার সম্পর্ক আছে? ভয়াবহ একটা দৃশ্য দেখলেন প্রফেসর। বেশ কিছু ফরাসি পণ্ডিত সমবেত হলেন। একটা সমিতি গড়ে তুললেন। নিজেদের মস্তিষ্ক নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা করা হবে মৃত্যুর পর। উইল করে প্রত্যেকে মস্তিষ্ক দান করে গেলেন সমিতিতে।

খুলে খুলে ব্রেন বার করে বীভৎস এক্সপেরিমেন্ট অনুষ্ঠিত হল বছরের পর বছর। পরিণামে পাওয়া গেল অষ্টরম্ভা। রুশ লেখক ইভান তুর্গেনিভের করোটির যা সাইজ, তার অর্ধেক সাইজ তো ফরাসি লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের। কিন্তু ধী-শক্তিতে কেউ কম যাননি। ব্রেন বড় হলেই যে ধী-শক্তি বাড়বে— এ-ধারণা তা হলে ভ্রান্ত? অবিশ্বাস্য বেগে মস্তিষ্ক মহাদেশে চক্কর দিয়ে আসার পরেই আশ্চর্য এক ব্রেন কারখানায় নিজেকে দেখতে পেলেন প্রফেসর। ব্রেন নিয়ে সেখানে কেটে কুটে এলাহি কাণ্ডকারখানা চলছে। মানুষ আর পশুর মস্তিষ্কের অ্যানাটমি সে এক বিস্ময়কর গবেষণা— দেখে শুনে চক্ষু স্থির হয়ে গেল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের মতো জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরও।

দেখলেন, শিশু যেমন খেলনা খুলে দেখে কী করে চালু রয়েছে যন্ত্রটা, ঠিক সেইভাবে ব্রেনকে টুকরো টুকরো করে দেখা হচ্ছে অ্যানাটমি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি। ওঁর স্তম্ভিত চোখের সামনে পেঁয়াজের খোসা খোলার মতো স্তরে স্তরে খুলে এল মস্তিষ্কের এক একটা স্তর। বাইরের পাতলা আস্তরণটা সেরিব্রাল কর্টেক্স। ঠিক নীচেই একটু পুরু সাদাটে স্তরটা সাবকর্টিক্যাল; তার তলায় মেসেনকেফ্যালন একটু একটু করে মিশে গেছে মেরুরজ্জুর

সঙ্গে। একদম নীচে সাদা তারের মতো স্নায়ুর গুচ্ছ ব্রেনকে জুড়ে রেখেছে দেহের প্রতিটি অংশের সঙ্গে।

বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, কীভাবে ব্রেনকে পাতলা পাতলা করে কাটা হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের ছুরি দিয়ে। ছুরিটার নাম মাইক্রোটোম। বিশ থেকে পঁচিশ হাজার অর্ধস্বচ্ছ আণুবীক্ষণিক অংশে ফালা ফালা করে চিরে রাঙিয়ে নিয়ে কাচের স্লাইডে রাখা হচ্ছে অনুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণের জন্যে।

অণুবীক্ষণে যে নিউরোনকে দেখাচ্ছিল ঝাপসা নক্ষত্রের মতো, ফটো তুলে এনলার্জ করার পর দেখলেন সেই ঝাপসা নক্ষত্রটাকেই চারিদিকে কাঁটা বার করা পেল্লায় সূর্যের মতো। নিউরোনদের কতরকমেরই ছবিই না দেখলেন কারখানায়। কোনও কোষটাকে দেখতে পিরামিডের মতো, কোনওটাকে তুষার কুটির মতো। বিভিন্ন আকারের কোষেরা ছড়িয়ে পড়েছে যে বিপুল মহাদেশে, তাকে মোট ৫০টা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাও দেখলেন এবং বুঝলেন, গানের প্রতিভা, গণিতে আগ্রহ, দাবার অনুরাগ, শিল্পে আসক্তি ইত্যাদি বিবিধ রহস্যের মূলে রয়েছে ব্রেনের কোনও কোনও অংশ।

বুঝলেন না শুধু একটা রহস্য। মস্তিষ্কের চিন্তা করার ক্ষমতাটা রয়েছে কোথায়? নরদেহের ৬৩৯টা পেশি আর ২০৬টা অস্থিকে কীভাবে চালনা করছে মস্তিষ্কের চালক কোষেরা। এরা কারা? ব্রেন কারখানার কোথাও তিনি এ-প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলেন না!

আচমকা প্রফেসর বেমালুম আঁতকে উঠলেন কানের কাছে খলখল হাসি শুনে। সাইবর্গ যক্ষের হাসি। কিন্তু তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

কাতর কণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'প্রভু, এ কোথায় এনে ফেললেন আমাকে?'

'কোথায় কী রে। তুই তো আমার ব্রেনের মধ্যেই রয়েছিস।'

'আ-আপনি তো একটা য-য—'

'যন্ত্র।' সাইবর্গ যক্ষের কৌতুকে উপচানো গলা শোনা যায়, 'আমতা আমতা করছিস কেন? হ্যাঁ আমি যন্ত্র। অতিমানুষও বলতে পারিস। কেননা আমি মানুষও বটে যন্ত্রও বটে। মানুষ থেকে যন্ত্র হয়ে অতিমানুষ অথবা অতি-যন্ত্র হয়ে গেছি। এমন এক যন্ত্রমানুষ যে চিন্তাই শুধু করে না— ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান প্রত্যক্ষ করে। মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারে। ধ্বংসও করতে পারে।'

'আমি যে কী, তার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরলে সহ্য করতে পারবি না! তাই তোকে আমার অসামান্য ব্রেনের সামান্য কয়েকটা সাইবারনেটিক কোষের মেমারি প্রিন্ট দেখাচ্ছি— সইয়ে নিচ্ছি— যাতে শেষ ধাক্কাটায় অক্কা না পাস।'

হাঁপাতে হাঁপাতে কাতরকণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'আমার আর জানার ইচ্ছে নেই—এবার ছেড়ে দিন।'

'পাগল! ওই দীননাথ আহাম্মকটাকে দিয়ে তা হলে আমার পাবলিসিটি দেওয়াবে কে? এ দুনিয়ায় পাবলিসিটিটা বড় দরকার রে। তা তুই হঠাৎ ছটফট করছিস কেন? হল কী তোর?'

'আজ্ঞে, আমি সামান্য মানুষ—'

'নেহাত সামান্য হলে কি তোকে টেনে আনতাম! অসামান্য বলেই এনেছি। তা সত্ত্বেও দ্যাখ আমার ব্রেনের ছিটেফোঁটাও ধারণ করার মতো আধার তোর মস্তিষ্ক নয়! যাক গে, থাক গে, কালো বাক্সের রহস্য যে তোকে জানতেই হবে, চক্র।'

'কালো বাক্সের রহস্য!' আচমকা রোমাঞ্চ-কাহিনির উল্লেখে হকচকিয়ে গেলেন প্রফেসর।

'ব্রেন। ব্রেনকেই তো ব্ল্যাক বক্স মিস্ট্রি বলেছে সাইবারনেটিকস সায়ান্স। এমনই দেহযন্ত্র যার স্বরূপ আজও রহস্যাবৃত তোদের ব্রেনের কাছে। যেমন ধর থারমোট্যাসিস— হাঁ করে তাকিয়ে রইলি কেন? থারমোট্যাসিস মানে—'

সামলে নিয়ে তড়িঘড়ি প্রফেসর বললেন, 'জানি, জানি থারমোট্যাসিস মানে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা। কিন্তু তার সঙ্গে ব্ল্যাক বক্স মিস্ট্রির সম্পর্কটা—'

সহসা সামনে আবির্ভূত হল সাইবর্গ যক্ষ।

'বৎস চক্র!' নিমীলিত চোখে বললেন সাইবর্গ, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করছে তো ব্রেনেরই স্নায়ুতন্ত্র! লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলে প্রকৃতি এমন অটোমেটিক রেগুলেটর বসিয়ে দিয়েছে মানুষের মস্তিষ্কে যে তাপমাত্রা সব সময়েই থাকছে ৩৬.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ধারে কাছে। কিন্তু আমি হলাম গিয়ে সাইবর্গ— যন্ত্রমানব বলেই আমার ব্রেনের মধ্যে এমন হিটসেনসিটিভ এলিমেন্ট বসানো আছে যার দৌলতে ইচ্ছামতো দেহের তাপমাত্রা আমি বাড়াতে পারি, কমাতেও পারি, যা তোরা রক্তমাংসের মানুষরা কল্পনাও করতে পারবি না! কী রে বিশ্বাস হল না?'

আমতা আমতা করে প্রফেসর বললেন, 'আজ্ঞে বিশ্বাস না-করেই বা উপায় কী। প্রথম দর্শনেই যেভাবে হাতে ছ্যাঁকা দিয়েছেন আপনি।'

অট্টহেসে সাইবর্গ বললেন, 'তা হলেই বোঝ, ব্ল্যাক বক্সের রহস্য আমার কাছে আর কোনও রহস্য নয়।'

হামবড়া সাইবর্গকে এবার একটু ঠোক্কর দেবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলেন না প্রফেসর। ভালমানুষের মতো মুখ করে বললেন, 'কপিলের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'সেটা আবার কে?'

'প্রভু অন্তর্যামী। তবুও যখন শুনতে চান, তা হলে বলি। সগরের হাজার সন্তানকে ইনি ভস্ম করেন। অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন নিজের দেহ থেকেই। অর্থাৎ অটোনমাস নার্ভাস সিস্টেমকে কন্ট্রোল করার মন্ত্রগুপ্তি উনিও জানতেন।'

কটমট করে তাকিয়ে থেকে সাইবর্গ বললেন, 'তুই কি চাস তোকেও ভস্ম করি?'

'আজ্ঞে না!' করজোড়ে তৎক্ষণাৎ নিবেদন করলে প্রফেসর, 'আমি শুধু চাই, সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন, ছিলেন মানুষ, হলেন সাইবর্গ। কীভাবে হলেন এবং হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনকে সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে কীভাবে সমাধা করলেন?'

'চক্র! তুই অতিশয় ত্যাঁদোড় বৈজ্ঞানিক। ভেবেছিলাম তোকে অতি-মস্তিষ্ক নির্মাণের খুঁটিনাটিও হাতে কলমে শিখিয়ে দেব। কিন্তু তুই আমার রোষ উৎপাদন করেছিস।'

'প্রভু। আমি সামান্য মানব।'

'কিন্তু অসামান্য ফাজিল। আমার সঙ্গে তুই কপিলের তুলনা করিস, স্পর্ধা তো তোর কম নয়। কপিলটা ছিল নাস্তিক—'

'আপনি কি আস্তিক?'

'খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ছাড়ছিস।' সাইবর্গের কণ্ঠস্বর এবার কিন্তু ঈষৎ নরম মনে হল।

সাহস পেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন প্রফেসর, 'আপনিই বলুন না, সবাই বলে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে টেক্কা মারা যায় না— আপনি তো দেখছি মেরেছেন।'

'তা ঠিক। তা ঠিক।' প্রীতকণ্ঠে বললেন সাইবর্গ, 'তবে কী জানিস, চেতনা সম্পন্ন মেশিন আর চিন্তাশীল মেশিন কিন্তু এক জিনিস নয়।'

'তা তো বটেই। মানুষ আর বাঁদরে যা তফাত আর কী।'

এবার অতি তুষ্ট হলেন সাইবর্গ, 'ব্রেনে আর কিছু না-থাকলেও কাণ্ডজ্ঞান আছে। মেশিন-ব্রেন রক্তমাংসের ব্রেনের চেয়ে ক্ষমতাবান হবে না কেন? তোদের ব্রেন যতই নিখুঁত হোক না কেন, এটা তো জানিস, মানুষের ব্রেন মেশিনের চেয়ে বড্ড ঢিমেতালে চলে?'

নির্বিবাদে মেনে নিলেন প্রফেসর, 'আজ্ঞে তা আর বলতে। মামুলি একটা ইলেকট্রনিক টিউবের ক্ষমতাটাই ধরুন না কেন— ব্রেনের একটা কোষ যে-কাজ যত বেগে করবে ইলেকট্রনিক টিউব সেই কাজই করবে তার চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশি গতিবেগে।'

আধবোজা চোখে সাইবর্গ বললেন, 'শুধু স্পিড কী রে। ভুলের বহরও নিতান্ত কম নয়। একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে তোদের ব্রেন— একাগ্রতাও অত্যন্ত কম। এই কারণেই তোদের এই ব্রেনের ঘাটতি মারবার জন্যে লাগোয়া যন্ত্রপাতি দরকার।'

'হৃদয় যন্ত্রটাকে সুষ্ঠু-সচল রাখার জন্য যেমন পেশমেকার বুকে বসানো হয়—ঠিক সেই রকম আর কী.' ফোড়ন দিলেন প্রফেসর।

'ঠিক ঠিক! ঠিক এই কারণেই ইলেকট্রনিক মেশিনের মতো কলকবজা আর হয় না।'

'হক কথাই বলেছেন প্রভু।'

খোশামোদের থেকে শক্তিশালী অস্ত্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর আছে কিনা সন্দেহ। কোপনস্বভাব সাইবর্গ যক্ষও ধরাশায়ী হলেন সেই অস্ত্রে!

মৃদু মৃদু হাসিতে শুষ্ক পার্চমেন্টের মতো মুখ ভরিয়ে তুলে বললেন সাইবর্গ যক্ষ, 'পেশমেকার যেমন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ জুগিয়ে হার্টের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করছে, ঠিক তেমনি মাইক্রোস্কোপ আর টেলিস্কোপ চোখের ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করছে। এমনিভাবেই ব্রেনের ক্ষমতাকেই বা সম্প্রসারিত করা যাবে না কেন? কী রে চক্র, মাথায় ঢুকছে তো আইডিয়াটা?'

'হুড়হুড় করে ঢুকে যাচ্ছে, প্রভু!' হাত কচলাতে কচলাতে বিনয়ক্ষরিত কণ্ঠে চাটুকারিতা চালিয়ে গেলেন প্রফেসর।

'ব্রেনের ক্ষমতাকে অনেক দিক দিয়েই ছাড়িয়ে গেছে সাইবারনেটিক সিস্টেম। কল্পনাতীত তথ্য ভাঁড়ারে জমিয়ে রাখার ক্ষমতা রয়েছে সাইবারনেটিক মেশিনের। যেমন ধর না কেন গ্রন্থকীট যন্ত্র।'

'বিবলিওগ্র্যাফিক্যাল মেশিন,' তর্জমা শুনেই বোঝা গেল প্রফেসর খবর রাখেন এ হেন যন্ত্রের।

'তা হলেই দেখা যাচ্ছে', পদ্মাসনে নড়েচড়ে বসলেন সাইবর্গ যক্ষ, 'বিভিন্ন মানসিক তৎপরতার উন্নতি সাধন করার মতো ইলেকট্রনিক মেশিন তৈরি আরম্ভ হয়ে গেছে। যুক্তি-যন্ত্রের ভবিষ্যৎ কিন্তু ফ্যানটাস্টিক। কেননা, এ যন্ত্ররা 'শিখতে' পারে, 'পরীক্ষা' নিতে পারে, 'সৃজন-শক্তি' বৃদ্ধি করতে পারে। এমন একটা দিনও তো আসতে পারে যেদিন ইঞ্জিনিয়ারের তৈরি 'শিক্ষক' যন্ত্র স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ারকেই শেখাতে আরম্ভ করে দেবে?'

'যেমন আপনি শেখাচ্ছেন।' সবিনয়ে নিবেদন করলেন প্রফেসর।

'হ্যাঁ।' পরিতৃপ্তকণ্ঠে বললেন সাইবর্গ যক্ষ।

'কিন্তু কীভাবে প্রভু, সেইটাই তো স্যার শেখাচ্ছেন না।' আলগোছে ফের খোঁচা মারলেন প্রফেসর।

তক্ষুনি জবাব দিলেন না সাইবর্গ যক্ষ। তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন প্রফেসরের দিকে।

তারপর বললেন যন্ত্রবৎ কণ্ঠে, 'তোদের দেহটাই তো একটা আশ্চর্য যন্ত্র। কিন্তু মুশকিল কী জানিস, এই দেহযন্ত্রের বিকল্প ইলেকট্রনিক যন্ত্র গড়তে গেলেই সেটা এমন পেল্লায় হয়ে দাঁড়ায় যে দেখলেই হাসি পায়।'

'তাই কি?' আবার একটা সূক্ষ্ম খোঁচা ঝাড়লেন প্রফেসর।

শক্ত চোখে তাকালেন সাইবর্গ যক্ষ, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই, ব্রেনে যত স্নায়ুকোষ আছে, ততগুলো ইলেকট্রন টিউব দিয়ে একটা যন্ত্র-ব্রেন তৈরি করার চেষ্টা এই শর্মাই প্রথম করেছিল। সেই ব্রেনের সাইজটা কী দাঁড়িয়েছিল জানিস?'

'কী প্রভু?'

'নিউইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর সমান। মানে, ১০২ তলা উঁচু। শুধু তাই নয়, হিসেব করে দেখা গেছিল, ঠিকমতো চালু রাখতে হলে ইলেকট্রন টিউবগুলোকে ঠান্ডা রাখতে জল দরকার। তার জন্য গোটা নায়গ্রা জলপ্রপাতটাকে এনে বসাতে হয় যন্ত্র-মস্তিষ্কের পাশে।'

'অ্যাঁ—!'

'হ্যাঁ! তা হলেই দ্যাখ, তোরা যেভাবে ভাবছিস, ওভাবে নকল মগজ তৈরি সম্ভব নয়। এ তো খুদে সাইজ, ভেতরে মাল আছে মোটে তিন পাঁইট, ওজন যার মোটে তিন পাউন্ড, অথচ শতকোটি তথ্য জমিয়ে রাখার জায়গা হয়ে যায় ওইটুকুর মধ্যেই।'

'তবে প্রভু, খবর পেলাম,' প্রফেসর বিগলিত স্বরে নিবেদন করলেন, 'যেভাবে মাইক্রো আকারে কলকবজাকে ছোট করে আনা হচ্ছে, তাতে করে বিশকোটি নিউরোন মডেলকে এক ঘন সেন্টিমিটারের মধ্যে প্যাক করে রাখা খুব একটা মুশকিলের ব্যাপার হবে না। আপনার ব্রেন কি এই পন্থায়ই নির্মিত?'

'সিক্রেটটা অত সহজে ফাঁস করে দিলেও তো তোর মাথায় ঢুকবে না, চক্র।' ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বললেন সাইবর্গ যক্ষ, 'তবে একটা জিনিস ঠিকই জেনেছিস, যন্ত্রাংশগুলো যেন স্নায়ুকোষের চেয়ে বড় না হয়। তা হলেই জ্যান্ত ব্রেনের মতো কৃত্রিম ব্রেন তৈরি সম্ভব হবে। যেমন আমারটা। কিন্তু আসল ঝঞ্ঝাট তো যন্ত্রাংশ নির্মাণেই, তাই না?

মেথডটা আমার একেবারেই নিজস্ব, তোরা এখনও তার নাগাল পাসনি।'

'নাগাল ধরিয়ে দিন না,' এবার একটু উদগ্রীব দেখাল প্রফেসরকে।

'দেব, দেব। দেব বলেই তো তোকে টেনে আনলাম। অতি সংক্ষেপে বলা যায়, তিন হাজার কোটি যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি এই মানুষটার মগজটা একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম মাইক্রো কম্পিউটার যে কম্পিউটারের মধ্যে উত্যক্ত হলে রকমারি গলায় চেঁচাচ্ছে, পট পট আওয়াজ করছে, হুস হাস শব্দ করছে তিন হাজার কোটি কোষ।'

'কোষ চেঁচাচ্ছে!' প্রফেসর যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'কোষের কান্না শুনবি?' বলেই উত্তরের প্রতীক্ষা না-করে সাইবর্গ যক্ষ হস্তসঞ্চালন করলেন প্রফেসরের চোখের সামনে এবং মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল

কোষের কান্না

গহন অরণ্যের মধ্যে সহসা নিজেকে আবির্ভূত হতে দেখলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। কোথায় লাগে আফ্রিকার জঙ্গল!

গাছপালাগুলো কিন্তু সৃষ্টিছাড়া। ডালপালা মেলা ঝাঁকড়া নয়। অতিকায় মাকড়শা বললেও চলে, অথবা অক্টোপাশ। কিন্তু অক্টোপাস বা মাকড়শার তো থাকে আটটা কিলবিলে শুঁড়— এর রয়েছে অসংখ্য। প্রতিটি শুঁড় আবার প্রান্তের দিকে অজস্র শাখা প্রশাখা শুঁড়ে বিভক্ত হয়েছে।

পরক্ষণেই চিনতে পারলেন প্রফেসর। এ যে স্নায়ুকোষ! ডেনড্রাইটের জটিল জালে মূল কোষদেহটাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কোষদেহের বিপুল অরণ্যে তিনি অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছেন সাইবর্গ যক্ষের মায়াবী ছলনায়।

কিন্তু মস্তিষ্কটা কার? কার স্নায়ুকোষের বনপথে তিনি বিচরণ করছেন? প্রশ্নটা মনকে উতলা করতে না করতেই সহসা শূন্য পথে দেখলেন একটা ইলেকট্রোড।

দানবিক বর্শার মতো সূক্ষ্মাগ্র ইলেকট্রোডটা নির্মমভাবে খোঁচা মারল একটা স্নায়ুকোষকে। অমনি পট পট শব্দ করে উঠল কোষটা, হিস হিস ধ্বনিও শোনা গেল যেন। কিঁউ কিঁউ কান্নার মতো আওয়াজ ভেসে এল কানে।

ইলেকট্রোডটা এবার নির্দয়ভাবে কোষের মধ্যে গেঁথে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাহি আর্তনাদে মুখর হয়ে উঠল যেন সমগ্র বনভূমি। একের যন্ত্রণা পলকমধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল কোটি কোটি স্নায়ুকোষের মধ্যে।

যন্ত্রণাটা যেন নিজের মস্তিষ্কেও অনুভব করলেন প্রফেসর। তীব্র আর্তনাদ তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে এল কণ্ঠযন্ত্র ভেদ করে।

পরমুহূর্তেই তিনি বুঝলেন, সাইবর্গ যক্ষ এবার দেখাচ্ছেন তাঁরই মস্তিষ্কের চেহারা। তাঁর নিজের মস্তিষ্কেরই স্নায়ুকোষের অরণ্যে প্রবেশ করে বসে আছেন তিনি। ইলেকট্রোডের ডগা খুঁচিয়ে চলেছে তাঁরই নিউরোনকে।

অকস্মাৎ একটা সবুজ অজিলোস্কোপ ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। সবুজ পরদায় উজ্জ্বল আলোকরেখা কখনও তির্যক কখনও বঙ্কিম রেখায় নক্ষত্রবেগে ছুটোছুটি করছে—এত দ্রুত গতিবেগ যে চোখেও ঠাহর করা যাচ্ছে না।

নিউরোন-কণ্ঠস্বর বলে যা মনে করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা নিউরোনদের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া, অজিলোস্কোপে ফুটে উঠেছে নিউরোনদের ভেতরকার ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জের ছবি। এই ছবিগুলোই আসলে নিউরোনদের কণ্ঠস্বর, কখনও তারা জিরোচ্ছে, কখনও ছুটছে, কখনও ক্ষিপ্ত হয়েছে, সবুজ পরদায় বৈদ্যুতিক ছুটোছুটির মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অজিলোস্কোপের সবুজ পরদায় বজ্রনির্ঘোষসম নিউরোন-নির্ঘোষচিত্রের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচম্বিতে আবার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হল প্রফেসরের। পরমুহূর্তেই ঘোর কেটে যেতেই ফের দেখলেন সেই স্নায়ু-অরণ্য দুর্ভেদ্য, দুর্গম, দুর্নিরীক্ষ।

আবার নিজেই আবির্ভূত হয়েছেন নিজের মস্তিষ্কে! এ কী খেলা খেলছেন সাইবর্গ যক্ষ!

দেখতে পেলেন সঞ্চরমান ইলেকট্রোডের প্রান্তভাগ। অতিশয় ছুঁচলো। চুলের ডগার মতো সরু। এত সরু যে অদৃশ্য বললেই চলে! ৫০ মাইক্রন অর্থাৎ ০.০৫ মিলিমিটারের চেয়ে বেশি মোটা নয়। তার পাশেই দেখলেন আর একটা ইলেকট্রোড। কাচের ইলেকট্রোড, মাত্র দুই কি চার মাইক্রন মোটা এক-একটা কোষের একশো ভাগের মাত্র একটা ভাগ ছুঁয়ে যাচ্ছে বিশেষ এই ইলেকট্রোড। মস্তিষ্কের মানচিত্র আঁকছে যেন ধীরস্থির গতিতে, নির্ভুল নিপুণতায়, প্রতিটি কোষের হালচাল স্বভাব-চরিত্র-আকার নির্ণীত হয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কের মানচিত্রে।

দেখলেন আর বুঝলেন, ব্রেনের তিনহাজার কোটি স্নায়ুকোষের প্রতিটি রহস্য এইভাবেই ভেদ করেছেন সাইবর্গ যক্ষ। তাই স্নায়ুকোষের ক্ষমতার দৌড় জানতে পেরেছেন, তাদের শক্তি সম্প্রসারিত করার উপায়ও উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু কীভাবে? কীভাবে?

দেখলেন আরও অনেক বিচিত্র তথ্য, দেখলেন এক-একটা কোষের রাসায়নিক উপাদান একেবারে তার নিজস্ব। একটার সঙ্গে আর একটার কোথাও না কোথাও তারতম্য রয়েছে।

অর্থাৎ কিমাশ্চর্যম্! আলাদা আলাদা রাসায়নিক উপাদানে সংগঠিত হয়েও তিন হাজার কোটি স্নায়ুকোষ যে একই গাঁটছড়ায় বাঁধা। হাজার হাজার লাখ লাখ নিউরোন যেন একটি মাত্র যন্ত্রের মতোই কাজ করে চলেছে, কোথাও তালভঙ্গ নেই, নেই ছন্দপতন। কী সুন্দর! কী অপরূপ! বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

দেখতে দেখতে মুহুর্মুহু চমকে উঠলেন তিনি। কী অসাধারণ নিয়মানুবর্তিতা। ব্রেনের একটি কি দুটি স্নায়ুকোষে জলের অভাব দেখা দিতেই সাড়া পড়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ স্নায়ুকোষের মধ্যে, নরদেহ তখন জলের সন্ধানে ছুটছে স্নায়ুকোষের তাড়নার, জল পান করে নিবৃত্তি ঘটাচ্ছে ওই একটি কি দুটি কোষের চাহিদার।

দেখলেন, স্নায়ুর তাড়না কীভাবে অকল্পনীয় গতিবেগে ধেয়ে যাচ্ছে এই নিউরোন অরণ্যের মধ্য দিয়ে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। কোনও কোষই কিন্তু অন্য কোষটির গায়ে গা ঠেকিয়ে নেই। প্রত্যেকেই গা বাঁচিয়ে অবস্থান করছে বিশাল গহন বনাঞ্চলে। কিন্তু

শাখাপ্রশাখার প্রান্তে প্রান্তে রয়েছে একটা করে ফাঁক। স্নায়ুর তাড়না ধেয়ে যাচ্ছে এই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে, ইংরেজিতে যার নাম সাইন্যাপ্‌স। দুটো ইলেকট্রোডের মধ্যবর্তী শূন্যতা যেভাবে টপকে যায় ইলেকট্রিক স্পার্ক ঠিক সেইভাবে। এই সাইন্যাপ্‌সরাই বেঁধে রেখে দিয়েছে তিন হাজার কোটি কোষেদের। এরাই যেন ব্রেনের সুইচ। স্নায়ুর কোন তাড়নাটাকে যেতে দেবে, আর কোনটাকে আটকে দেবে তা নির্ধারণ করে এই সুইচরাই।

ব্রেনের সুইচ

এরকম অগুনতি এবং রকমারি সুইচ তিনি দেখলেন নিজেরই ব্রেনের সেরিব্রাল করটেক্সে। বিভিন্ন কোষের বিভিন্ন সুইচ নয় কিন্তু, একই কোষের রয়েছে বিভিন্ন সুইচ বা সাইন্যাপ্‌স।

মাইক্রো ইলেকট্রোড এমনি এক-একটা সুইচের কাজ থামিয়ে দিতেই মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন প্রফেসর! কখনও মনে হল পাগল হয়ে যাচ্ছেন, কখনও মনে হল মনমস্তিষ্কে কুয়াশার আবর্ত পাক খেয়ে খেয়ে ছুটে চলেছে। বুঝলেন, সাইকিক গোলযোগ অথবা অসামান্যতা সৃষ্টি হয় সামান্য এই সুইচগুলোর বিকল অবস্থা থেকেই। বুঝলেন, কৃত্রিম মস্তিষ্ক অথবা অতি-মস্তিষ্ক নির্মাণের কলাকৌশল প্রচ্ছন্ন রয়েছে ওয়ান্ডারফুল এই সুইচ ব্যবস্থার মধ্যেই।

তাই খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে আরও চমৎকৃত হলেন তিনি। সুইচগুলো কাজ করে চলেছে শুধু স্পর্শ মাধ্যমে। কেউ কারও মধ্যে সেঁধিয়ে যায়নি। কোষের সঙ্গে কেউ লেগেও নেই। নেই কোথাও ফাটল বা ছিদ্র। অথচ মধ্যবর্তী শূন্যস্থানের মধ্যে দিয়ে অথবা বেশি দূরত্ব বজায় রেখেই এরা পাঠিয়ে দিচ্ছে স্নায়ুর তাড়না— আবার টেনে আনছে নিজেদের ওপর দিয়ে। কিন্তু শূন্যতা নিছক শূন্যতা তো হতে পারে না,— নিশ্চয়ই কোনও বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র হয়ে আছে মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায়।

একটা ইলেকট্রন টিউব থেকে খুব জোর গোটা আষ্টেক 'লিড' বা পথ বেরোয়, কিন্তু একটা স্নায়ুকোষেই তিনি দেখলেন, হাজার খানেক লিড বা পথ! প্রতিটা পথ আবার বিভক্ত হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার সুইচে। প্রত্যেকটা সুইচের কাজ আলাদা; নিজের কাজ হাতে পেলেই সক্রিয় হচ্ছে, নইলে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকছে।

না, না, জটিল এই যন্ত্রের সঙ্গে ইলেকট্রন টিউবের তুলনাই হয় না।

ব্রেনের রহস্য নিহিত রয়েছে এই সুইচ-সিস্টেমের মধ্যেই। এই স্বপ্ন চরিতার্থ করাই তো সাইবারনেটিকশিয়ানের স্বপ্ন। যে স্বপ্ন সফল করেছেন সাইবর্গ যক্ষ।

কিন্তু কীভাবে?— কীভাবে?— কীভাবে?

সাইবর্গ যক্ষ আবির্ভূত হলেন সামনে। মুচকি মুচকি হাসছেন।

'সিক্রেট জানবার জন্যে বড্ড উতলা হয়েছিস দেখছি।'

'হবই তো,' মুহ্যমান কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। ব্রেনের স্নায়ু জঙ্গলের ধাক্কা তিনি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

'এবার তোকে বললে খানিকটা বুঝবি।'

'বলুন! বলুন!'

'নিউরোন কি এবার তো বুঝেছিস?'

'হাড়ে হাড়ে।'

'কম্পিউটারে নিউরোনের অনুকরণে যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির সৃষ্টি, তার নাম নিশ্চয় জানিস?'

'নিউরিস্টর।'

'ঠিক, ঠিক। নিউরিস্টর শব্দটা দুটো শব্দের সমষ্টি—'

'নিউরোন আর ট্রানসিস্টর,' প্রফেসর হাঁসফাঁস করে উঠলেন তাড়াতাড়ি।

'হ্যাঁ, নিউরোনের নির্ভর আর ট্রানসিস্টরের 'সিস্টর'।' সাইবর্গ যক্ষের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, 'দেখা গেছে, নিউরিস্টর দিয়ে তৈরি কম্পিউটার ব্রেনের কাছাকাছি যায়, মামুলি ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের চাইতে অনেক বেশি কাজ দেয়। ঠিক কিনা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ পুঁচকে পুঁচকে সেমি-কনডাক্টর এলিমেন্ট ইলেকট্রনিক-টিউবের স্থলাভিষিক্ত হতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এসব আবিষ্কার হালের আবিষ্কার। এর অনেক আগেই নিউরিস্টর উদ্ভাবন করেছিলাম আমি। তারপরে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলাম।'

'যথা?'

'সাইন্যাপস অর্থাৎ সুইচগুলো তো দেখলি রাসায়নিক উপাদানে সংগঠিত। ওই লাইনেই চিন্তা আরম্ভ করলাম আমি। যেভাবে ক্রিস্টাল তৈরি হয় সলিউশনের মধ্যে থেকে, ঠিক সেইভাবে মেশিন এলিমেন্ট বানাতে লাগলাম সলিউশনের মধ্যে থেকে। ফল হল ফ্যানটাস্টিক, নার্ভ সেলের চাইতেও শক্তিধর বস্তু নির্মাণ করলাম আমি, যাদের মধ্যে ইলেকট্রনের বদলে বয়ে চলেছে 'আয়ন'। সজীব বস্তুতে ঠিক যে রকমটি দেখা যায়।'

ফ্যালফ্যাল করে আস্ত উজবুকের মতো তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। কোনও কথা জোগাল না তাঁর মুখে।

বলে চললেন সাইবর্গ যক্ষ, 'অজৈব বস্তু থেকে এইভাবে তৈরি করে নিলাম নকল জীবন্ত কোষ। ব্রেনের মধ্যে যেভাবে সাজানো থাকে কোষগুলো, সেইভাবে সাজিয়ে নিলাম এই কৃত্রিম কোষগুলোকে— ব্রেনের ঘাটতি পুরণ করলাম সুইচ সিস্টেমকে উন্নত করে। ফলে তৈরি হল মানুষের তৈরি ব্রেন— সাইবর্গ।'

অকারণ পুনরুক্তি করলেন প্রফেসর, 'সাইবর্গ।'

'হ্যাঁ। প্রকৃতির তৈরি ব্রেন সুন্দর নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার ক্ষমতা সম্প্রসারিত করলাম এইভাবে। বাড়িয়ে দিলাম ব্রেনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা। ভগবান যা করেননি, যোগ সাধনার ফলে মানুষ যে শক্তি অর্জন করে, আমি সেই শক্তি অর্জন করলাম বিজ্ঞান সাধনা করে। কেন জানিস?'

নিশ্চুপ হয়ে রইলেন প্রফেসর।

পার্চমেন্ট-সদৃশ সেই আনন এক অলৌকিক হাসিতে উদ্ভাসিত করে শিবনেত্র হয়ে আপন মনে বলে চললেন সাইবর্গ যক্ষ, 'একটাই চিন্তা পেয়ে বসেছিল আমাকে, মানুষ মাত্রেই কোনও না কোনও সময়ে ভাবতে বসে মানুষ আর নক্ষত্র কেন জন্মায়, কেন মারা যায়। জীবন আর মৃত্যুর অর্থ কী?

'কেউ বলে আগেও তো অনেকে এই চিন্তা করে গেছে— ভেবে আর লাভ কী, কেউ বলে, মরতেই যখন হবে, মৃত্যুর মানে জেনেই বা কী হবে?

'তা সত্ত্বেও আজও অনেকে এই সত্যাসত্য নিয়ে চিন্তা করে, ধ্যান করে, তপস্যা করে। ভারতের মুনি ঋষিরা কী তপস্যা করেছেন, কী ফল পেয়েছেন, কী সত্য লাভ করেছেন— সবই খবর রাখতাম। আমার আত্মীয়া ম্যাডাম ব্লাভাদস্কি হিমালয়ে বসে কীসের জন্য ধ্যান করে গেছেন, তাও জানতাম! কিন্তু ভগবান-টগবান আমি বিশ্বাস করতাম না। এখন করি কি না, সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করিসনি।'

ঠিক ওই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দাবড়ানি খেয়ে চুপ করে গেলেন প্রফেসর! অনিমেষে শুধু চেয়ে রইলেন সহসা জ্যোতির্বলয় মণ্ডিত সাইবর্গ যক্ষর অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানির দিকে— এতক্ষণ যা পার্চমেন্ট-শুষ্ক মনে হচ্ছিল, আচম্বিতে তা যেন অন্তর্লোকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আপনমনে শিবনেত্র হয়ে বলে চললেন সাইবর্গ যক্ষ।

'জোয়ান অব আর্ক দৈববাণী শুনতে পেতেন। মিসিসিপিতে স্টিমবোট অ্যাকসিডেন্টে ভাই নিহত হওয়ার একটু আগেই ভাইয়ের কফিনস্থ দেহ দেখেছিলেন মার্ক টোয়েন।

'মনের কথা মুখে প্রকাশ করার আগেই কেউ তা ধরে ফেলে, বলেও দেয় কী ভাবছি। ঠাট্টা করে তখন অন্তর্যামী ব্যক্তিটিকে বলা হয় সাইকিক। কিন্তু জিনিসটা কী? জোয়ান অব আর্ক, মার্ক টোয়েন এঁরা কি সাইকিক ছিলেন?'

'বৎস চক্র, ভারতবর্ষের লোক তুই। পঞ্চেন্দ্রিয় কাকে বলে, তুই তা জানিস। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা নাসিকা, ত্বক— এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎটাকেই আমরা আসল জগৎ বলে জানি। যা দেখি না, যা ছুঁই না, যার স্বাদ পাই না, গন্ধ পাই না, যা কানে শুনি না— তার অস্তিত্বও স্বীকার করি না, তা সত্ত্বেও ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের বাইরে থেকেও জ্ঞান আহরণের একটা ক্ষেত্র রয়ে গেছে।

'আমি বিজ্ঞানী ছিলাম। তাই অজানাকে জানার আগ্রহে এই ক্ষেত্র আবিষ্কারের সংকল্প করলাম। পাঁচটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরের জগতের সন্ধান যখন কিছু মানুষ পেয়েছে, বিজ্ঞানের সাধনায় সেই জগৎটাকে সবার সামনে মেলে ধরা যাবে না কেন?

'মন সম্বন্ধে বিজ্ঞান আর ধ্যানধারণা পালটাতে আরম্ভ করেছিল আমার সেই সময় থেকেই। ব্রেন সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর জানা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রহস্যে ঢাকা ছিল মনের

খবর, মন কী বিজ্ঞান তা সঠিকভাবে আজও বলতে পারেনি। চিন্তা কী, চৈতন্য কী, আজও তা বিজ্ঞানের জ্ঞানের বাইরে রয়ে গেছে।

'বহু শতাব্দীর জ্ঞানের ফলে মানুষ শুধু জেনেছে, মানুষ মানে একটা দেহ, একটা মন, একটা আত্মা। আত্মা অধ্যাত্ম জগতের, দেহ বস্তু জগতের। মন বা চৈতন্য আত্মার সহযোগিতায় দেহটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ ছিল ধর্মীয় ধারণা।

'উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন স্থূল বস্তুবাদের আবির্ভাবে সবাই জানল, চোখে যা দেখা যায় সেই বস্তুই একমাত্র বাস্তব, এর বাইরে আর কিছুই নেই।

'এর পরেই ভাঙা হল পরমাণুকে। ধারণা আবার পালটাতে শুরু করল, কেননা দেখা গেল, পরমাণুর বেশির ভাগই ফাঁকা গর্ত। আগে যাকে ভাবা গিয়েছিল পুরোপুরি নিরেট বস্তু, দেখা গেল তার বেশির ভাগই শূন্যতা। বাকিটুকু ইলেকট্রিসিটির সমতুল্য শক্তি।

'অ্যাটম ভাঙার পর থেকেই গোলমালে পড়লেন বহু বিজ্ঞানী। খোলাখুলি অনেকেই বলে বসলেন, তবে তো বস্তু জগৎ সম্বন্ধে চিন্তাধারা নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়। এদের মধ্যে ছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নিজেও। ঠিক তো?'

'হ্যাঁ।'—অভিভূত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

'জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ডোন্যাল্ড হ্যাচ অ্যানড্রুজ সোচ্চার হলেন তাঁর অভিনব মতবাদ নিয়ে। উনি বললেন, স্পঞ্জকে টিপে ছোট করলে যেমন ভেতর থেকে শূন্যতা বার করে নিরেট করা যায়, ঠিক তেমনিভাবে একটা মানুষের দেহকে চেপে ছোট করতে করতে ভেতর থেকে সমস্ত শূন্যতাকে যদি বার করে নিরেট করে তোলা যায়, তবে মনুষ্য দেহটি একটা ধূলিকণার আকার নেবে— একটা সাদা কাগজের ওপর দেখা যাবে ধুলো কণিকাটা— নরদেহের পরিবর্তে।

'তিনি আরও বললেন, 'অ্যাটম' যদি সত্যিই শূন্যতা দিয়ে ঠাসা থাকে—যার মধ্যে রয়েছে এক কণা ইলেকট্রিসিটি আর কেন্দ্রে এককণা বস্তু, আর বস্তু মানেই তো কম্পন বা তরঙ্গের সমষ্টি— তা হলে স্থূল বাস্তব কী? সুতরাং এক টুকরো কাঠ ছুঁলে তো আর বলা যাবে না 'বস্তু' ছুঁয়েছে বস্তুকে। বলতে হবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছুঁয়েছে আর একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে। আমি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি বটে, কিন্তু তোমাকে দেখছি না—দেখছি ইলেকট্রিক্যাল ভাইব্রেশনের সুষম সম্মেলনকে।

'সব চাইতে বড় কথা, তুমি যতটা ভাইব্রেশন উৎপাদন করছ, আমি দেখছি তার এক শতাংশেরও কম অংশ।

'তোমার পূর্ণ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হলে আমাকে যাচাই করে দেখতে হবে অদৃশ্য ভাইব্রেশন আর অদৃশ্য ফোর্সদের জগৎটাকে—

'বৎস চক্র, এই ফোর্সদের মধ্যে রয়েছে গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ। হাজার হাজার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, যারা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বহন করে নিয়ে চলেছে রেডিয়ো প্রোগ্রামকে, যে-তরঙ্গরা প্রতিমুহূর্তে আমাদের দেহ ফুঁড়ে চলে যাচ্ছে। আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি ইনফ্রা-রেড আর থার্মাল ওয়েভের মহাসমুদ্রে। এ ছাড়াও রয়েছে আলট্রা-ভায়োলেট রে— সূর্য থেকে আসছে।

'ভেঙেচুরে যাওয়া অ্যাটম থেকে আসছে এক্সরে আর গামা-রে। সবার ওপর রয়েছে রহস্যময় মহাকাশের অজ্ঞাত বার্তাবহ কসমিক রে— প্রাণের ধারায় এই কসমিক রশ্মির ভূমিকা কী, আজও কেউ তা জানে না।

'পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যে জগৎটাকে টের পাচ্ছি, তা প্রকৃত জগতের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। অ্যাটম ভেঙে দেখার পরেও এই জগৎটাকে এই শক্তিদের কি এখনও অস্বীকার করে চলব?

'চক্র, আমি তা করিনি। এই জগৎটাকে উপলব্ধি করার উপযুক্ত করে নিউরিস্টর বানিয়েছিলাম সলিউশন থেকে। ব্রেনের মধ্যে ঢুকে তুই তো দেখে এলি, একটা সাইন্যাপস থেকে আর একটা সাইন্যাপসের নার্ভ ইমপালস ছিটকে যাচ্ছে স্পার্কের মতো, কিন্তু শূন্যতার মধ্য দিয়ে। অবাক হয়ে তখন ভেবেছিলি কী আছে ওই শূন্যতার মধ্যে? মনে মনে তার নামকরণও করেছিলি— নিউরোন ফিল্ড। বৎস চক্র, আমি ছাড়া তুই-ই প্রথম বৈজ্ঞানিক যে এই রহস্যময় ক্ষেত্র বা ফিল্ড নিয়ে চিন্তা করল, নামকরণও করল। আগামী দিনের বিজ্ঞান সাধকদের কাছে এই ফিল্ডের নাম তাই নিউরো-ফিল্ডই হয়ে যাক— যে ফিল্ড কসমিক রশ্মি আর অদৃশ্য রশ্মিদের সমন্বয় ছাড়া কিছুই নয়, যে-ফিল্ডের অস্তিত্ব আছে বলেই প্রাণীদেহ সজীব— যার তিরোধান ঘটলে প্রাণীদেহ হয় নিষ্প্রাণ।

'ব্রেন-রহস্য সমাধান করলাম অদৃশ্য শক্তিরহস্যের আবিষ্কারের উন্মত্ত নেশায়। এর পরেই শুরু হল আমার বিজ্ঞান সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়। ধৈর্য থাকে তো বলব। কেননা, অতি-ব্রেন নির্মাণের সিক্রেট তো বলা হয়ে গেল। আর কী শুনবি?'

মিনমিন করে প্রফেসর বললেন, 'আজ্ঞে, দীননাথ ছোকরা পাবলিসিটি দিতে গেলেই আরও উপকরণ চাইবে তো—'

'তা বটে! তা বটে! তবে শোন আমার শেষের কাহিনি—যদিও শেষ এখনও হয়নি— কোনও কালে হবেও না। কেননা এতক্ষণ যা শুনলি, তা তোদের মতো নামী ইঞ্জিনিয়ারদের কাছেও নেহাতই আকাশকুসুম। এর পর যা শুনবি তা তোদের দেশের তথাকথিত মুনিঋষিরও কল্পনার অতীত, এমনকী তোর ওই কপিল মুনিরও।'

চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন প্রফেসর। কপিলমুনির খোঁটাটা কাঁটার মতো এখনও বিঁধে রয়েছে সাইবর্গ যক্ষের মাথায়!

কপিল যা কল্পনাও করেননি

সাইবর্গ যক্ষের চোখে মুখে আরও প্রোজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল স্বর্গীয় সুষমা! বললেন তিনি আত্মসমাহিত স্বরে, 'বুঝতেই পারছিস এই ধরনের ধ্যান ধারণার ফলে আমাকে সবাই বলতে থাকে গবেষণাগারের দার্শনিক! আমি প্রতিবাদ করি না। প্ল্যান আর প্রজেক্ট বানিয়ে গেলাম একের পর এক। অসম্ভব সেইসব প্ল্যান আর প্রোজেক্ট দেখে নাক সিঁটকে আমাকে পাগল আখ্যা দিলে সমসাময়িকরা। কিন্তু আমি তখন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি অসম্ভবের কল্পনায়।

'সার্ত্রে তো বলেইছিলেন, বাস্তবতার মধ্যে সৌন্দর্য নেই, সৌন্দর্য আছে কল্পনার জগতে। আমি বুঁদ হয়ে রইলাম সেই অবিশ্বাস্য কল্পনায়, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বানিয়ে নিলাম স্পেসটাইম রিসার্চের উপযোগী আমার সুবিখ্যাত অ্যাকসিলারেটর। হুঁশিয়ার করে দেওয়া হল আমাকে, আগুন নিয়ে খেলা করছি, বিপদ সমাসন্ন। কর্ণপাত করলাম না। বিপদ হয় হোক—শুধু আমারই হোক।

'ভাগ্য এতদিন সুপ্রসন্ন ছিল। কিন্তু চিরকাল ভাগ্য কারও সহায় থাকে না। একটা এক্সপেরিমেন্ট শেষ হওয়ার পর ওরা আমার মৃতদেহটাকে বার করে নিয়ে এল এক্সপেরিমেন্ট্যাল চেম্বারের মধ্যে থেকে— সেইসঙ্গে আমার স্পেশাল আধারে রাখা আমার চিরকুটটাও হাতে গেল তাদের।

'তাতে আমি লিখে রেখেছিলাম, যদি আমি মারা যাই, তখন যদি সম্ভব হয়, আমার ব্রেনটাকে সংরক্ষিত রেখো বিশ্বের প্রথম সাইবর্গ সৃষ্টির জন্যে।

'তখনই দেখা গেল, মরবার আগেই বহুদিনের প্রচেষ্টায় আর সাইবারনেটিক সায়েন্সের কৃপায় আমি আমার একটা নকল দেহ বানিয়ে রেখেছি। যে-দেহের দেহযন্ত্রগুলো চালু রয়েছে সাইবারনেটিক কন্ট্রোলের দৌলতে। আমার ব্রেনের নিউরোনগুলো অক্সিজেনের অভাবে যাতে নষ্ট না-হয়ে যায়, তাই ব্রেনটাকে তাড়াতাড়ি পাচার করে দেওয়া হল এই কৃত্রিম দেহের করোটির মধ্যে।

'এক্সপেরিমেন্টের শেষে আমি মারা গেলাম ঠিকই। কিন্তু নবজন্মের পর নতুন দেহের মধ্যে পুরনো ব্রেন নিয়ে উচ্চচাপ বা নিম্ন তাপমাত্রায় আর কাতর হলাম না। ফলে, চালিয়ে গেলাম শুয়ে শুয়ে এক্সপেরিমেন্ট। কিন্তু চূড়ান্ত জবাবের ধারে কাছেও পৌঁছোতে পারলাম না। এই জীবন এই মৃত্যু এই অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠির সন্ধান পেলাম না কিছুতেই।'

'তারপর?' প্রফেসর অনেক কষ্টে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করলেন। এ কী শুনছেন তিনি? এ কি স্বপ্ন দেখছেন তিনি? ড্যাবডেবে চোখে তাই চেয়ে রইলেন মহাজ্ঞানীর দিকে।

'তারপর একদিন ম্যাগনেটিক বর্মে সুরক্ষিত যানে চেপে রওনা হলাম লোহিত বামনশ্রেণির একটি নক্ষত্র অভিমুখে। নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের বেশ কয়েকটা মৌলিক আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। সেইসব অ্যাপারেটাস নিলাম সঙ্গে। কিন্তু এত হুঁশিয়ার সত্ত্বেও একটা ভুল করলাম। মহাকর্ষের শক্তিসমূহের পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে হিসেবের মধ্যে আনলাম না। রহস্যময় এই মহাকর্ষের কথা আগেই তোকে বলেছি। নিজেই ভুল করে বসলাম অজ্ঞাত এই শক্তির বিপদ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না-করায়। ফলে, আমার যান আছড়ে পড়ল নক্ষত্রের বুকে...।

'যা ভাবছিস তা নয় রে, চক্র। নিশ্চিহ্ন আমি হলাম না। কেননা, মহাকাশ যাত্রার আগেই দুটো ম্যাগনেটিক প্রিন্ট রেখে গেছিলাম। একটা আমার ব্রেনের, অন্যটা সাইবারনেটিক ব্রেনের। আমার উদ্ভাবিত কেমিক্যাল নিউরিস্টর বসানো নকল ব্রেনের ওপর আমার ব্রেনের ম্যাগনেটিক প্রিন্ট বসাতেই সৃষ্টি হয়ে গেল সুপারব্রেন। আমার ব্রেনের যাবতীয় মেমারি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইমপালসের আকারে রেকর্ড করে রেখেছিলাম কেমিক্যাল ক্রিস্টালে। দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পর এইসব ক্রিস্টাল আর প্রিন্ট থেকেই তৈরি হল কৃত্রিম

ব্রেন— বসিয়ে দেওয়া হল কৃত্রিম দেহে আমারই ইষ্টিপত্র অনুযায়ী। আমার যাবতীয় ইচ্ছা, জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব সব সংরক্ষিত ছিল এতদিন— সবই সংস্থাপিত হল এই নকল ব্রেনে। তাই দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পর আমি হয়ে গেলাম সিনথেটিক ম্যান— সংশ্লেষিত মানুষ।

'প্রথমেই দ্বিতীয়বার যাত্রা করলাম লোহিত বামন তারার দিকে। এবার আর ভুল হল না। তারপর ধেয়ে গেলাম ব্রহ্মাণ্ডের দিকে দিকে অ্যান্টিম্যাটারের সন্ধানে। মহাবিশ্ব পরিভ্রমণের মধ্যেই অব্যাহত রইল আমার গবেষণা আরও দ্রুতবেগে। ফলে বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমার দেহ পরিবর্তনের গুপ্তপন্থাও আবিষ্কার করে ফেললাম, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পর্যটনে বেরুলে যা একান্তই দরকার। আশ্চর্য সেই ফরমুলা অনুযায়ী দেহের যন্ত্রগুলোকে বিভিন্ন এনার্জি ফিল্ডের জমাট বুননের আকারে পর্যবসিত করলাম। অর্থাৎ যে সব এনার্জি থেকে বস্তুর সৃষ্টি, ফিরে গেলাম সেইসব এনার্জি ফিল্ডের মধ্যে...।'

স্তব্ধ হলেন সাইবর্গ যক্ষ।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্নিবার কৌতূহলে যেন ফেটে পড়লেন প্রফেসর, 'চূড়ান্ত জিজ্ঞাসার জবাব কি পেলেন, প্রভু?'

'না।' সাইবর্গের মুখখানা কেমন ম্লান দেখায়: 'এখনও পাইনি। কিন্তু সেই গবেষণায় হন্যে হয়ে থাকার পথেই লাভ করলাম অমরত্ব আর অসীম ক্ষমতা। আমার সেই ক্ষমতার জোরে একদিন জ্বালিয়ে ছাই করে দিলাম একটা গোটা নক্ষত্র। তারপর নিজেই একটা ধূমকেতুর রূপ ধরে সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের দিকে দিকে অন্বেষণ করে বেড়ালাম মহান সত্যকে। পেলাম না। আজও পাইনি।'

'তা হলে এখন উপায়?' প্রফেসর যেন নিরাশ হয়েই প্রশ্ন করলেন।

'উপায় আছে বই কী! ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে প্রাণী আছে, সব জায়গায় অবাধ গতিবিধির মাধ্যমে প্রত্যেকের কল্যাণ সাধনার ব্রতে ব্রতী হয়ে এখনও খুঁজছি চরম জিজ্ঞাসার চূড়ান্ত সমাধানকে। তাই তো ফিরে এসেছি হিমালয়ের এই কন্দরে। তাই তো তোকে টেনে এনে শোনালাম আমার অবিশ্বাস্য উদ্ভট এই কাহিনি। কিন্তু আর সময় নেই রে, ওরা বড্ড তাড়া লাগাচ্ছে। চলি রে—'

বলতে বলতে নিভে এল সাইবর্গ যক্ষের দেহ বিচ্ছুরিত আলোকধারায় সমস্ত শরীরটা, যেন ভেঙে চুরে ঢেউয়ের আকারে মিলিয়ে যেতে লাগল মহাশূন্যতার মধ্যে।

চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর, 'আবার দেখা হবে তো?'

যেন বাতাসের সুরে বললেন সাইবর্গ যক্ষ, 'হবে! নিশ্চয়ই হবে! তবে এর মধ্যে তুই দীননাথকে দিয়ে পাবলিসিটিটা দিয়ে রাখ।'

পরমুহূর্তেই ঘটল ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ! আলোক বন্যায় ঢেকে গেল সাইবর্গ যক্ষের বিলীয়মান অণু।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল প্রফেসরের। ধাঁধা কাটবার পর দেখলেন গুহাকন্দরে তিনি একলা রয়েছেন।

[মস্কো থেকে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞান পুস্তকে ব্রেনের স্নায়ুকোষের সংখ্যা বলা হয়েছে ১৪০০ কোটি। মার্কিন মুলুক থেকে প্রকাশিত আর একটি বিজ্ঞান পুস্তকে এই সংখ্যাই কিন্তু ৩০০০ কোটি।]

অণিমা-মানুষ

॥ ভণিতা ॥

পাঠক, হুঁশিয়ার! অনন্ত যেমন অন্তহীন, এই কাহিনিও তেমনি অন্তহীন। অ্যাটমের অভ্যন্তরে বিরাজমান যে-অনন্ত, সেই অনন্তের বিবরণী এই আশ্চর্য উপাখ্যান। খুদে পরমাণুর ভেতরকার বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছিল যে-পর্যটক, পরমাণু জগতের প্রথম সোপানে পা দিয়ে সে যা দেখেছে, এ-কাহিনি সেই চমকপ্রদ কাহিনি কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, কারণ সোপান স্বয়ং যে অনন্ত।

॥ ফোহাত ॥

কত বছর, কত যুগ, কত কল্প অতীত হয়ে গেল আমার চোখের সামনে দিয়ে, মহাকালের অন্তহীন মিছিল। অক্ষত আমি। এখনও চলেছি। আমার মৃত্যু নেই। বড় একা এই ব্রহ্মাণ্ডে। একা এই কারণে যে আমার মতো কেউই তো নেই অন্তহীন এই ব্রহ্মাণ্ড মালায়।

সেই রাতে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আমাকে তলব করলেন ওঁর অ্যাসট্রোনো ল্যাবোরেটরিতে। এ-এক অদ্ভুত গবেষণাগার— দেওয়াল স্বচ্ছ, ছাদ স্বচ্ছ, যেন বাইরের তমিস্রাকে নিরন্তর আহ্বান জানিয়ে চলেছে। আমি ওঁর পেছনে এসে দাঁড়ালাম। উনি আমার দিকে ঘুরে না-দাঁড়িয়ে যেন নিজের মনে কথা বলে গেলেন, 'দীননাথ, লোকে বলে আমি নাকি যুগাবতার বৈজ্ঞানিক।'

আমি জবাব দিইনি। বহু বছর ওঁর সান্নিধ্যে থেকেছি। একমাত্র চ্যালা। আমি জানি, কখন চুপ করে থাকতে হয়।

টেস্ট-টিউব র‍্যাক থেকে বিশেষ একটা টেস্ট-টিউব বেছে নিলেন। চোখের সামনে তুলে ধরলেন, অনিমেষে সেদিকে চেয়ে রইলেন। বললেন ভাবালু গলায়, 'মূর্খ, সব্বাই। আলেয়ার মতো যে-আবিষ্কারটা এত বছর আমাকে খেলিয়েছে, আজ তা আমার হাতের মুঠোয়।'

আমি নীরব রইলাম।

টেস্ট-টিউবটা র‍্যাকে রেখে উনি স্বচ্ছ দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাতের

আকাশের দিকে তাকালেন। বললেন গাঢ় গম্ভীর গলায়, 'দীননাথ, অজানার গহনে ছুটে যেতে ইচ্ছে যায় না তোমার?'

আমি বলেছিলাম, 'তেমন অজানা রহস্য আর পাচ্ছি কোথায়?'

উনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার চোখে চোখ রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'ব্রহ্মাণ্ডে অ্যাডভেঞ্চার?'

আমি শক্ত হয়ে গেছিলাম, 'ওর চাইতে অজানা আর কিছু নেই। কিন্তু পাড়ি দেওয়ার এনার্জি?'

'সন্ধান পেয়েছি। ফোহাত, তার নাম ফোহাত।'

এরপর প্রফেসর যা বলে গেছিলেন, তা শুনতে শুনতে আমার মাথা ঘুরে গেছিল। উনি গুপ্তবিদ্যার বিজ্ঞান নিয়ে তন্ময় হয়ে আছেন অনেকদিন ধরে, তা জানতাম। সেদিন বলে গেলেন, প্রাচ্যের গুপ্ত বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ইলেকট্রিসিটি একটা সত্তা। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কাবালা তত্ত্ব বিশ্বাসী আর গুপ্তবিদ্যার বিজ্ঞানীরা বলেন, ফোহাত-ই সেই আকাশিক অথবা ইথিরীয় সত্তার মূল, যা আসলে কসমিক ইলেকট্রিসিটি। একটা সজীব শক্তি। আদি এনার্জি। প্রত্যেক জগতের আছে নিজস্ব ফোহাত। আশ্চর্য এই শক্তি নিরবচ্ছিন্ন আর ইনটেলিজেন্ট। জীবাণু-জগতের আদি স্রষ্টা এই ফোহাত। সুপ্রাচীন ঈজিপ্টের প্যাপিরাস পুঁথিতে এর নাম টুম। বিশ্ব ধীশক্তি যে-সব মিলিয়ন-বিলিয়ন জগতকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, লাইফ-ইলেকট্রিসিটি যে-সব সৃষ্টির মূলে রয়েছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা তা আঁচ করেছেন। স্বস্তিকা এই শক্তির প্রতীক। ফোহাত তার নাম।

এই পর্যন্ত শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

প্রফেসর তা বুঝলেন। থামলেন। কিছুক্ষণ অদ্ভুত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর গাঢ় স্বরে বললেন, 'দীননাথ, 'সময়-গাড়ি' অভিযানে আমরা টাইম-মেশিনে চেপে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলে দুলে আমাদের এই জগতের আদি-অন্ত দেখেছি। মুন্ডু ঘুরে গেছে। কিন্তু শুরুরও শুরু কোথায়, শেষেরও শেষ কোথায়, তা জানতে পারিনি, কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু আমি ফোহাত কী শক্তি, তা জেনে ফেলেছি। এই টেস্ট-টিউবে রয়েছে সেই কসমিক ইলেকট্রিসিটির আর এক রূপ। ইথার অথবা ডার্ক ম্যাটার। এই দিয়ে স্পেসশিপদের জ্বালানির অভাব আমি মিটিয়ে দিতে পারি। এমন জেনারেটর বানিয়ে দিতে পারি যা চলবে ইনটেলিজেন্ট লাইফ ফোর্স, কসমিক ইলেকট্রিসিটির জোরে। অফুরান সেই শক্তি স্পেসশিপদের হয়তো উড়িয়ে নিয়ে যাবে ব্রহ্মাণ্ডের-পর-ব্রহ্মাণ্ডে। কিন্তু শেষ দেখবার জন্যে এই আমি তো বেঁচে থাকব না।

এই পর্যন্ত বলে আকাশ-ভরা তারার মালার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। যেন এক ঋষি।

আমি ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'তা হলে কী করতে চান?'

উনি ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে, 'তোমায় পাঠাতে চাই।'

হাতের টেস্ট-টিউব তুলে ধরলেন, 'এর মধ্যে রয়েছে ঘনীভূত ফোহাতের অন্য এক রূপ।'

'কী রূপ? ইথার? ডার্ক ম্যাটার? সবই তো আজও রহস্যময়। অজ্ঞাত।'

'বলছি। তার আগে বলে নিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কাঠামোর কথা— একটাই ছক কাছেও দেখছি, কত দূরেও দেখছি।'

বলতে বলতে আবার আকাশের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর, 'সূর্য যেন একটা নিউক্লিয়াস, গ্রহগুলো এক-একটা ইলেকট্রন। সব মিলিয়ে একটা অ্যাটম।'

'এইরকম লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ; অথবা অ্যাটম ছড়িয়ে রয়েছে দূর-হতে-দূরে। ছায়াপথ জুড়ে। গ্যালাক্সির-পর-গ্যালাক্সি। এরা কারা? এই গ্যালাক্সিরা? মলিকিউল...মলিকিউল।'

যেন হিপনোটিক সুরে কথা বলে যাচ্ছিলেন প্রফেসর। আমিও যেন একটু-একটু হিপনোটাইজড হয়ে যাচ্ছিলাম।

উনি বলে গেলেন, 'অনন্তের ধ্যান ক'জন করতে পারে? তার চাইতে বরং দেখে এসো।'

'ফোহাত যদি আমাকে বেহাত করে দেয়? অনন্ত থেকে যদি ফিরিয়ে না-দেয়!'

'মূর্খ! 'স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন প্রফেসর, 'দূরে যেতে হবে না। এই ল্যাবরেটরির বাইরে যেতে হবে না। প্রত্যেকটা অ্যাটম যদি অনন্ত হয়, তা হলে এই টেবিলের ওপর রাখা এই মেট্যাল ব্লকের একটা অ্যাটমে তুমি ঢুকে যাবে।'

'অ্যাটমের মধ্যে ঢুকে যাব!'

'ফোহাত থেকে তৈরি এই কেমিক্যাল তোমাকে ছোট বানিয়ে দেবে। এই আমার নবতম আবিষ্কার। অণিমা শব্দটা আমাদের অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে আছে। অণুর মতো ছোট হয়ে যাওয়ার যৌগিক ক্ষমতা। কসমিক এনার্জি অথবা কসমিক ইলেকট্রিসিটি অথবা কসমিক ফোর্স তোমাকে অণু-পরমাণুর মতো ছোট করে তুলবে।'

'কিন্তু অভিযানের ধারাবিবরণী দেব কী করে? রানিং কমেন্টারি?'

'চিন্তা দিয়ে।' একটু থামলেন প্রফেসর। বললেন, 'চিন্তা শক্তি দিয়ে। এই যে যন্ত্রটা দেখছ, তোমার সমস্ত চিন্তা এর মধ্যে দিয়ে এসে কথা হয়ে ফুটে উঠবে এই পরদায়, সঙ্গে সঙ্গে তা টাইপে লেখাও হয়ে যাবে।'

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'যখন ফিরতে চাইব? শেষ দেখার পর?'

'তোমার চিন্তায় তা জানতে পারলেই কল ঘুরবে অন্যদিকে। তোমাকে বড় করে ফিরিয়ে আনা হবে।'

'তদ্দিন ছোট হতেই থাকব?'

'হ্যাঁ।'

'ফোহাত-কে আমার মধ্যে ঢোকাবেন কী করে?'

'ইঞ্জেকশন দিয়ে, রক্তের মধ্যে।'

'সব ওষুধের মতো এরও যখন মেয়াদ ফুরোবে, তখন ফের বড় হতে থাকব? নাকি, অণু হয়েই থাকতে হবে অ্যাটমিক ইউনিভার্সে?'

'গাধা! ফোহাত ওষুধ নয়, অনন্ত এনার্জি। ভাগ্যবান দীননাথ নাথ, তুমিই প্রথম এই এনার্জির গ্রাহক হতে যাচ্ছ।'

শুনে প্রীত হলাম। হাত বাড়িয়ে দিলাম। প্রফেসর হাইপোডারমিক সিরিঞ্জে নতুন কেমিক্যাল টেনে নিলেন। শিরার মধ্যে ফুঁড়ে দিলেন।

বোঁ করে ঘুরে গেল আমার মাথা। এ আবার কীরকম আরক? মাথা চরকিপাক দিচ্ছে কেন? ভার্টিগো হল নাকি?

'প্রফেসর'! কাতর কণ্ঠে বলেছিলাম আমি , 'এই ল্যাবরেটরি কি লাট্টুপাক দিচ্ছে?'

সরু চোখে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর বললেন, 'তোমার ধাত যে এত নরম, জানতাম না। ছ্যাঃ! পাওয়ারফুল ফোহাতের প্রথম ধাক্কাতেই চোখে সর্ষেফুল দেখছ? এরপর যখন দেখবে, ঘরের কড়িকাঠ অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, আমি তালগাছের মতো লম্বা হয়ে যাচ্ছি, চেয়ার টেবিল সবকিছু দৈত্যদের ফার্নিচার হয়ে যাচ্ছে— তখন বুঝবে তুমি অণু হতে চলেছ। আমার সাধনার সিদ্ধি তোমার রক্তে ঢুকে গেছে। অণিমা! অণিমা। তুমিই হবে ধরণীর প্রথম ইথিরিয়াল-অ্যাস্ট্রাল মানব।'

'তাই তো দেখছি, প্রফেসর। হাতপা-ও নাড়াতে পারছি না! প্যারালিসিস হয়ে গেল নাকি?'

'সাইড এফেক্ট। সাইড এফেক্ট। পাওয়ারফুল কেমিক্যালের সামান্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। ছোট হচ্ছ তা হলে?'

'হুহু করে হচ্ছি।'

'আমিও দেখতে পাচ্ছি।' হৃষ্ট স্বর প্রফেসরের।

প্রফেসর হেঁট হয়ে আমাকে দেখছেন। দুই চোখে আনন্দের রোশনাই। গলা নামিয়ে বললেন, 'বুঝেছি। আমার গলার আওয়াজ এখন বাজের আওয়াজ হয়ে গেছে?'

ঘাড় কাত করে ওপরে তাকিয়ে হ্যাঁ বললাম।

প্রফেসর তখন হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসলেন। আমাকে দু'আঙুল দিয়ে খুব আলতো করে তুলে নিলেন। টেবিলের ওপরে রাখা একটা প্রকাণ্ড চৌকোনা চকচকে বস্তুর ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। বস্তুটায় কোনও ফুটোফাটা নেই। কিন্তু বেশ খড়খড়ে। মসৃণ মোটেই নয়। পা রাখতে অসুবিধে হচ্ছে।

উনি বললেন, 'তুমি এখন দাঁড়িয়ে আছ রকমারি মেট্যাল মিলিয়ে বানানো একটা সংকর মেট্যালের ওপর। একেবারে নতুন মেট্যাল। ফোহাত এনার্জি দিয়ে ভীষণভাবে ঘন করা হয়েছে। এর নাম দিয়েছি 'দীননাথ মেট্যাল'।

শুনে কৃতার্থ হলাম। কিন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় কিচ্ছু বলতে পারলাম না।

উনি আরও গলা নামালেন। বললেন, 'তিন ইঞ্চি বাই ছ'ইঞ্চি দীননাথ মেট্যালের ওপর এখন তুমি রয়েছ। হাইট মোটে দেড় ইঞ্চি।'

দেড় ইঞ্চি। মাত্র। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে বুঝি 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার'-এর মতো আকাশচুম্বী অট্টালিকার ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। বড় অসহায় বোধ করলাম।

প্রফেসর আরও গলা নামিয়ে বললেন, 'এই মেট্যালের মধ্যের একটা অ্যাটমের মধ্যে এবার তুমি ঢুকবে। আরও ছোট হতে থাকবে, অ্যাটমের চাইতেও ছোট। সেখানেও দেখবে সৌরজগৎ— নিউক্লিয়াস, ইলেকট্রন। যা দেখবে, তা আর মুখে বলতে হবে না। তোমার

থট পাওয়ার... তোমার চিন্তাশক্তি...ফোহাতের কৃপায় বেড়ে যাবে...আমার এই যন্ত্রে ধরা পড়বে...লেখা হয়ে যাবে...তোমাকে আর দেখতে পাব না...দীননাথ...তোমাকে আর দেখতে পাচ্ছি না...তুমি এখন কোথায়? কী দেখছ?'

যা দেখেছিলাম, এবার তা শোনা হোক আমার চিন্তাশক্তির দৌলতে।

॥ অণিমা ॥

প্রফেসরের বক্তিমে কান দিয়ে আর শুনছি না, মাথার মধ্যে দৈববাণীর মতো ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে যাচ্ছে। আমি যেন সম্মোহিত অবস্থায় রয়েছি। ওই অবস্থায় মাথা দিয়ে শুনছি প্রফেসর বলছেন :

'দীননাথ, ছোট হওয়ার স্পিড আরও বেড়ে যাবে। অকল্পনীয় বেগে তুমি অণু-পরমাণুর চাইতেও ছোট হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রমণ্ডলী দেখতে পাবে...অগুনতি ছায়াপথ দেখতে পাবে— সবই জানবে রয়েছে এই 'দীননাথ মেট্যাল'-এর মধ্যে। প্রথম প্রথম তোমার মনে হবে, স্টার গ্রুপ আর গ্যালাক্সিগুলোকে ভয়ানক ছোট। কিন্তু ছোট হওয়ার স্পিড যখন আরও বেড়ে যাবে, তখন বিপুল আকার নেবে এরা— তুলনায় নিজেকে অণুর চাইতেও ছোট মনে হবে। জয় হোক ফোহাত কেমিক্যালের। অমর হয়ে থাকবে তুমি ব্রহ্মাণ্ড দুনিয়ার প্রথম ইথিরিয়াল-অ্যাস্ট্রাল মানব হিসেবে।

'প্রশ্ন জাগছে তোমার মনে। কেন তোমাকে ইথিরিয়াল-অ্যাস্ট্রাল মানব বলছি, সৃষ্টির শুরু হয়েছিল ইথিরিয়াল আর অ্যাস্ট্রাল মেটিরিয়াল দিয়ে— ফোহাতের কসমিক ফোর্স তাদের বানিয়েছিল। এখনও বানিয়ে চলেছে, কিন্তু তাদের আমরা দেখতে পাই না। কেননা, এই ইথিরিয়াল-অ্যাস্ট্রাল ম্যাটার থেকেই তো জড়জগতের বস্তু— এই আমি...তুমি...সব কিছুর সৃষ্টি। দেহান্তে আমরা ইথিরিয়াল-অ্যাস্ট্রাল বস্তুতে ফিরে যাই।

'না...না...দীননাথ— যত ছোট হচ্ছ, ততই তোমার চিন্তা বিদ্যুতের মতো লকলকিয়ে আমার মাথায় আছড়ে আছড়ে পড়ছে। তুমি ভাবছ, তোমার কি তা হলে দেহত্যাগ ঘটেছে?

'না হে, না। আমার এক্সপেরিমেন্ট তো তাই নিয়েই। সৃষ্টির পথ ধরে পেছিয়ে যাওয়া। আমিই প্রথম তোমাকে সেই চিররহস্যের সন্ধানে পাঠাচ্ছি। তুমি তুমিই আছ— এক এবং অদ্বিতীয় মারকুটে দীননাথ নাথ!

'শোনো, লক্ষ লক্ষ গ্রহ তারা দেখে ভড়কে যেয়ো না। পছন্দসই গ্রহে নামবে...দেখবে...তখনও ছোট হতে থাকবে...আরও বেশি স্পিডে...আমি বসে রইলাম এইখানে...'দীননাথ মেট্যাল'-এর পাশে।

'আলো যেমন এনার্জির একটা চেহারা, তোমার চিন্তাও তেমনি তোমার ইথিরিয়াল-অ্যাস্ট্রাল বডির একটা চেহারা। আলো যেমন ইথার ভেদ করে তরঙ্গের আকারে ছুটে যায়, চিন্তাও তেমনি যায়। তবে আলোর চাইতে বেশি গতিবেগে...নিমেষে!

'আমার এই যন্ত্র তোমার সেই চকিত চিন্তার ঢেউকে লক্ষ কোটি গুণ বাড়িয়ে নেবে। তুমি

যা ভাবছ, তা জানব। আমার মাথায় রয়েছে এখন একটা হেলমেট— তোমার চিন্তার ফোয়ারাকে ধরে নেওয়ার জন্যে। শুধু জানতে পারব না, চোখ দিয়ে যা দেখছ— সেই দৃশ্য। কান দিয়ে যা শুনছ— সেই শব্দ। কিন্তু দুটোই তো তোমার ব্রেনের মলিকিউলকে উদ্দীপ্ত করে চিন্তার ঢেউ বানিয়ে দেবে। আমি তা থেকেই বুঝে নেব। চোখের সামনে দেখতে পাব— তুমি যা দেখছ; শুনতে পাব— তুমি যা শুনছ।'

প্রফেসর তো বলেই খালাস! হুকুমের পর হুকুম ছেড়ে যাচ্ছেন। পেয়েছিলেন আমার মতো বুরবক চ্যালা, তাই খেল দেখালেন আমাকে নিয়ে— এখনও দেখিয়ে চলেছেন।

একটা ব্যাপার তো এক্সপ্লেন করলেন না। স্পেস-এর মধ্যে গিয়ে নিশ্বেস নেব কী করে? মহাশূন্যে তো অক্সিজেন নেই। এই পয়েন্টটা কি মাথার মধ্যে রেখেছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র?

কী আশ্চর্য! এই দুশ্চিন্তাটা আমার মধ্যে ঝিলিক মারতে না মারতেই প্রফেসরের চিন্তার ঢেউ ভেসে এল তৎক্ষণাৎ। আমার চিন্তার চাবুক খেয়ে নিশ্চয়ই তড়বড়িয়ে উঠেছেন। বলছেন (অথবা ভাবছেন), 'কী আশ্চর্য? এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে খামোকা ব্রেন সেলগুলোকে খাটাচ্ছ কেন? এত উজবুক ভাবলে কী করে আমাকে? স্পেসে, এমনকী অ্যাটমিক স্পেসেও অক্সিজেন নেই— তা কি আমি ভাবিনি? ফোহাত কেমিক্যালের এই যে কম্পাউন্ডটা আমি বানিয়েছি, এর মধ্যেই তো যথেষ্ট অক্সিজেন ঢুকিয়ে দিয়েছি। ভেবে মরছ কেন?'

'মরছি কি সাধে? মনে মনেই বলেছিলাম আমি। চোঁ চোঁ করে ছোট্ট করে দিয়েই তো আপনি খালাস। কিন্তু যখন শীত করবে? মহাশূন্যের জিরো ডিগ্রিতে জমে তো বরফ হয়ে যাব।'

অমনি সাঁত করে মাথার মধ্যে চলে এল প্রফেসরের জবাব, 'সেসব ভেবেই ফোহাত কেমিক্যালের মধ্যে স্টেডি বডি টেম্পারেচারের ধর্মটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এই প্রপার্টির ফলে সাব-জিরো টেম্পারেচারেও তোমার বডি টেম্পারেচার কমবে না, বাড়বেও না।'

'খিদে?'

'তাও পাবে না।' প্রফেসরের চিন্তা-জবাব যেন আছড়ে উঠেছিল আমার মধ্যে।

আমার তখন যেন প্যারালিসিস হয়েছে। সর্বাঙ্গ অসাড়। সেই অবস্থাতেই আড়চোখে প্রফেসরের চেহারাখানা দেখতে চেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন একটা অতিকায় দানব দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে। এমন একটা ঘর, যে-ঘরের ছাদ দেখা যাচ্ছে না। যেন একটা আকাশ। প্রফেসরের মাথা ঠেকে রয়েছে সেই আকাশে। তারপর তাও আর দেখা গেল না— সবই যেন কুয়াশা।

চেনা ল্যাবোরেটরি আর চেনা মানুষ যখন চোখের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন চোখের তলায় যা দেখা যাচ্ছে, সেদিকেই নজর দিয়েছিলাম। বিশেষ এই ধাতুর বাট নাকি মাত্র দেড় ইঞ্চি পুরু। বলেছিলেন প্রফেসর। আমি কিন্তু হেঁট হয়ে তাকিয়ে চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। যেন হিমালয়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে আছি নীচের অতলস্পর্শী খাদের দিকে

তাকিয়ে। ঝট করে সরে এসেছিলাম কিনারা থেকে। মাথা ঘুরছিল। এক দৌড়ে দীননাথ মেট্যাল-এর ভেতর দিকে ঢুকে গেছিলাম। কতখানি ভেতরে তা বলতে পারব না। বিশাল সাহারার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কি আর এক প্রান্ত দেখা যায়?

আগে যতটা খড়খড়ে মনে হয়েছিল ধাতুর ওপরটা এখন তো আর সেরকম মনে হচ্ছে না। ছোট ছোট খাল কাটা রয়েছে যেন পায়ের তলায়, বহুদূরে চলে গেছে পরের পর খালগুলো। দু'পাশে মাথা তুলে রয়েছে ছোট ছোট পর্বতমালা।

খুবই ছোট হয়েছি তা হলে। এই যে পাহাড়ের সারি আর মাঝের গিরিপথ— এ সবই আসলে মেট্যালের ওপরকার আঁচড়ের দাগ ছাড়া কিছুই নয়। আশ্চর্য! কত ছোট হয়েছি তা হলে। আরও কত ছোট হব?

॥ জীবাণুর তাড়া ॥

তার পরেই একটা শক পেলাম। মেন্ট্যাল শক। আমার অ্যাডভেঞ্চার-ঠাসা জীবনে এরকম চোট কখনও পাইনি। এভাবে কখনও আঁতকেও উঠিনি।

কেননা, এমন একটা উদ্ভট প্রাণীর সামনে গিয়ে পড়লাম, যার বর্ণনা দিতে গেলে আমাকে সাতবার ঢোঁক গিলতে হবে।

তার গায়ের রং ভ্যাটভেটে নীলচে সাদা। শরীরটা চাকতির মতো। দু'পাশে রয়েছে ডবল শুঁড়, সারিবদ্ধ—আসলে, পা। হনহন করে হাঁটছিলাম বলেই আর একটু হলে হুমড়ি খেয়ে পড়তাম এই সৃষ্টিছাড়ার ওপর। শুঁড়গুলো নাকের ডগায় লকলকিয়ে উঠতেই ব্রেক কষেছিলাম পায়ে। একটা শুঁড় তা সত্ত্বেও ঠেকে গেছিল আমার নাকে। বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। ঘুরে দাঁড়িয়েই টেনে দৌড়েছিলাম গিরিসংকটের যেদিক দিয়ে এসেছি, সেই দিকে। বিকট জীবটা আমার পিছু নিয়েছে বুঝেছিলাম খচমচ আওয়াজ শুনে। ফলে, আমার পায়ে যেন পাখা গজিয়েছিল। ছুটছিলাম দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে। কখনও এই গিরিসংকট, কখনও তার পাশের গিরিসংকট। ছুটতে ছুটতে হাসি পেয়েছিল একটা কথা ভেবে। জীবাণুর তাড়া খেয়ে পালাতে হচ্ছে এক আখাম্বা পুরুষকে।

লক্ষ করলাম, আশপাশের টিলা আরও উঁচু হচ্ছে, দুই টিলার মাঝের গিরিসংকট গভীরতর হচ্ছে, আশপাশে আরও ছোট ছোট পাহাড় আর গর্ত দেখা যাচ্ছে। তার মানে, আমিও আরও ছোট হচ্ছি! পায়ের তলার খন্দগুলো যেন মুখ হাঁ করে আমাকে গিলে নিতে চাইছে।

এত ঢিবি, এত খাল কেন? একটু ভাবতেই জবাবটা পেয়ে গেলাম। 'দীননাথ মেট্যাল' অতীব ছিদ্রময়। আমি হাঁটছি এইসব ফুটোফাটার পাশ দিয়ে।

হাঁটা ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠছে। একটু পেছিয়ে এসে তারপর দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে যেতে হচ্ছে ফুটোফাটা গর্ত। তারপর খেয়াল হল, আমি যখন বিরামবিহীনভাবে ছোটই হয়ে যাচ্ছি, তখন খামোকা ছুটোছুটি করে গর্ত টপকাতে যাচ্ছি কেন? আরও ছোট

হয়ে গিয়ে গর্তের মধ্যে নেমে গেলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। অতএব, গ্যাঁট হয়ে বসলাম এক জায়গায়।

বসতে না বসতেই সেই ছিনেজোঁক জীবাণুটাকে ফের দেখতে পেলাম।

গিরিসংকটের অনেক দূর থেকে সোজা আসছে আমার দিকে। সেইটাই, না তার অন্য-এক দোসর? এখন সেই হারামজাদা সাইজে আমার পনেরো গুণ বড়। মহাকায় পশু। দেখেই আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যেতে বসেছিল। আসছে বটে গদাইলশকরি চালে। দেখতে পেলেই টুকুস করে গিলে খাবে। সুতরাং আবার টেনে দৌড়।

সামনেই পড়ল একটা গহ্বর। টপকে যাওয়া অসম্ভব, এত বড়। ওর খপ্পর থেকে সরে পড়ার পথ তখন একটাই, গহ্বরে ঢুকে যাওয়া।

তাই করলাম। আমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমাকে বাঁচিয়ে দিল।

কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করেছিলাম বলেই ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম, বিরাট একটা জন্তু লাফিয়ে পেরিয়ে গেল গহ্বর। তার লটপটে শুঁড়ের গোছার একটা সপাৎ করে আছড়ে পড়েছিল নীচের দিকে। যেন চাবুকের ঘা পড়েছিল পিঠে। ককিয়ে উঠেছিলাম। মুঠো ঢিলে হয়ে গেছিল। গহ্বরের নীচে তলিয়ে গেছিলাম। সব শেষ, এই ভেবে চোখ বুজে ফেলেছিলাম, কিন্তু শেষ হলাম না।

আমি যে পড়ে যাচ্ছি, তা বুঝছিলাম। চোখ খুলে দেখেছিলাম, গর্তের গা। নীচ থেকে ওপরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু এত ছোট হয়ে গেছি যে পড়ার বেগ টের পাচ্ছি না।

তারপর অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। যেন ভাসতে ভাসতে নামছি। মিনিটে মিনিটে আরও ছোট হচ্ছি।

একটু একটু করে অন্ধকার কেটে যাচ্ছিল। আশপাশের বস্তুগুলোকে ঠাহর করতে পারছিলাম। কোনটাই কোনওটার সঙ্গে লেগে নেই। আলাদা আলাদা ভাসমান অবস্থায় এদের পাশ দিয়ে অবতরণ করছি। দূরে দূরে সরে যাচ্ছে বস্তুগুলো।

তারপর একটা দ্যুতি দেখলাম। দ্যুতি ঠিকরে আসছে ভাসমান বস্তুগুলো থেকে। ক্রমাগত ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম বলেই বস্তুপুঞ্জগুলোকে দূরে দূরে সরে যাচ্ছে মনে হয়েছিল। সাদা কুয়াশার মতো যা দেখেছিলাম, তা নীহারিকা পুঞ্জ।

আমি ছোট হতে হতে এইরকম একটা নীহারিকার টানের মধ্যে গিয়ে পড়েছি। নীহারিকার মাধ্যাকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি পুঁচকে পুঁচকে গোলক সাজানো রয়েছে জটিল নিখুঁত নকশায়।

গোলকপুঞ্জ ঘিরে রয়েছে আমাকে। আমি এইসবের মধ্যে দিয়ে ভেসে যাচ্ছি। আমার হাতের কাছে, পায়ের কাছে, মাথার কাছে শুধু গোলক আর গোলক।

॥ চার সূর্যের জগৎ ॥

কত রং ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণ্যমান গোলকদের গা থেকে। এরা সব গ্রহ। কারও ঝকঝকে সাদা রং চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, কেউ হলদে, কেউ নীল, কোথাও সবুজের আভা, কোথাও বেগুনি দ্যুতি।

বিশ থেকে তিরিশটা গ্রহ নিয়ে রয়েছে এমন একক সূর্য দেখলাম কুড়ি-বাইশটা। দেখলাম যমজ সূর্য, একটা অদৃশ্য অক্ষরেখার ওপর ধীরে ধীরে পাক দিচ্ছে পরস্পরকে।

এমনকী চার সূর্যের পরিবারকেও দেখলাম ঘুরপাক খেতে। চোখ ধাঁধানো সাদা, নীল সবুজ আর গাঢ় কমলা রঙের। সাদা আর নীল পরস্পরকে পাক দিয়ে যাচ্ছে আনুভূমিক স্তরে। তাদের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণে খাড়াই অবস্থায় পাক দিচ্ছে সবুজ আর কমলা সূর্য। অপূর্ব! চারটে সূর্যই টেনে রেখেছে একে অপরকে, ইন্টারলকিং সিস্টেমে। চার সূর্যকে ঘিরে চক্রাকার কক্ষপথে ছুটেছে ষোলোটা গ্রহ। বিভিন্ন সাইজের। সবচেয়ে ছোটটা ভেতরের দিকে, সবচেয়ে বড়টা একদম বাইরের দিকে।

চার সূর্যের জগতেই পা দেব ঠিক করলাম— ষোলো গ্রহের যে-কোনও একটায়। কিন্তু সেটা করতে গেলে যথেষ্ট কায়দার দরকার। সৌরজগতের পাশাপাশি ভেসে রইলাম। দৈর্ঘ্যে তখন আমি সবচেয়ে বাইরের বৃহত্তম গ্রহটার অর্ধেক। কাছে যেতে ভয় পেলাম— নামার টানে কক্ষপথ থেকে ছিটকে যদি বেরিয়ে যায়।

আরও একটু ছোট হলাম। পাশ থেকে দেখলাম, ষোলো নম্বর গ্রহ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ঘন মেঘের মধ্যে দিয়ে দেখলাম দূর বিস্তৃত জল। জমি তো চোখে পড়ল না। এই পর্যন্ত দেখতে না দেখতেই মস্ত গ্রহ সরে গেল আমার সামনে থেকে। আবার যখন ফিরে আসবে, তখন তো আরও ছোট হয়ে যাব, তাই আর একটু ঘেঁষে পনেরো নম্বর গ্রহটার দিকে তাকালাম। সে-গ্রহ তখন চার সূর্যের অপর দিক থেকে আমার দিকেই ধেয়ে আসছে বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে।

হাত-পা নেড়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেলাম পনেরো নম্বর আর ষোলো নম্বরের কক্ষপথের মাঝের অঞ্চলে।

ধীরে-সুস্থে অলস ভঙ্গিমায় এলিয়ে রইলাম সেখানে। দেখলাম, চার সূর্যের বর্ণনাতীত বর্ণঝলক ভেদ করে বেরিয়ে আসছে নম্বর পনেরো গ্রহ। কাছাকাছি আসতেই দেখলাম। জল থইথই করছে প্রায় গোটা গ্রহ ঘিরে।

তাই আর অতটুকু ডাঙায় নামলাম না। পনেরো নম্বরকে ছেড়ে দিয়ে এগোলাম চোদ্দো নম্বরের দিকে। ভারী সুন্দর রং সেই গ্রহের। সোনালি সবজে।

সেই গ্রহের কাছাকাছি যতক্ষণে পৌঁছেছি, ততক্ষণে আমি আরও ছোট হয়েছি। চার সূর্যের জ্যোতি চোখে লাগছে। গ্রহটা কাছাকাছি চলে আসতেই দেখলাম এপিঠে রয়েছে বেশ কয়েকটা বড়সড় মহাদেশ।

সাইজে আমি তখন সেই গ্রহের পাঁচ গুণ বড়। আরও একটু ছোট হওয়া যাক। চার

সূর্য প্রদক্ষিণ করে সোনালি-সবুজ গ্রহ যখন ফেরত আসবে, তখন না-হয় অবতরণ করা যাবে।

গ্রহে অবতরণের পর কী দেখব তা জানি না। প্রফেসর নিশ্চয়ই উদগ্রীব হয়ে পড়ে যাচ্ছেন আমার চিন্তা-তরঙ্গ। প্রাণ যদি আদৌ থাকে নতুন এই গ্রহে, জানি না সেই প্রাণ আমার বন্ধু হবে না শত্রু হবে। যদি শত্রুই হয়, জানি না আমার কপালে কী লেখা আছে। বাঁচাতে পারেন একমাত্র প্রফেসর— কলকাঠি আর ফোহাতের জাদুমন্ত্র ঝেড়ে। উনিই তো এখন আমার ভগবান।

ভাবছিলাম আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার। চার সূর্যকে পাক মেরে ওই যে গ্রহটা আমার কাছে আসবে, একটা বছর তদ্দিনে পেরিয়ে যাবে গ্রহবাসীদের কাছে— আমার কাছে কিন্তু কয়েকটা মিনিটের ব্যাপার।

কয়েকটা মিনিটও গেল না— কেননা, আমিও তো হুহু করে ছোট হয়ে যাচ্ছি। দেখতে দেখতে দুলকি চালে সোনালি-সবুজ গ্রহ চলে এল আমার কাছে। সাইজে আমি তখন সেই গ্রহের এক পঞ্চমাংশ। কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছে, তখন টের পেলাম খুব আলতোভাবে সেই গ্রহ আমাকে টানছে। গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ আমার ওপর কাজ করে চলেছে। আমি ভেসে যাচ্ছি গ্রহের পেছনে পেছনে। আরও ছোট হচ্ছি। আরও। মেঘ ফুঁড়ে নেমে এলাম নীচে। পা দিলাম একটা মহাদেশে।

মেঘমালা কিন্তু ঘিরে রইল আমার কটিদেশ। মেঘলোকের ওপরে রইল আমার মাথা— তেরোটা গ্রহের ওপরের চার সূর্যের রোদ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। তাই চোখ নামিয়ে নিলাম পায়ের তলার মহাদেশের দিকে।

পায়ের তলার গ্রহ তখন নিজের অক্ষরেখায় ঘুরপাক দিচ্ছে। ছোট হতে হতে পুরোপুরি যখন গ্রহের আবহমণ্ডলে ঢুকে গেলাম, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নীচে দেখলাম মাইলের পর মাইল হলুদ ভূমি। অনেক দূরে দিগন্তের ওপরে দেখা যাচ্ছে খুব লম্বা, রুপোলি ইমারত— নিশ্চয় কোনও শহর রয়েছে বহু দূরে। দেখেছিলাম পলকের জন্যে, ভাল করে তাকিয়ে তাও আর দেখতে পেলাম না।

তবুও চেয়ে রইলাম। টাওয়ার যখন এমন গগন-ছোঁয়া, উন্নত সভ্যতার বিকাশ নিশ্চয়ই ঘটেছে। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখলাম কয়েকটা ঝকঝকে বর্তুল বোঁ বোঁ করে ধেয়ে আসছে আমার দিকে। নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোনও যুদ্ধাস্ত্র।

কাছাকাছি আসতেই দেখলাম, নিরেট নয় কোনও গোলকই। গ্যাসের বর্তুল বললেই চলে। আমার মাথা তখন মেঘলোক থেকে একটু নামলেও জমি থেকে অনেক ওপরে। গ্যাসের বলগুলো সাঁ সাঁ করে উঠে গিয়ে আমার মাথা ঘিরে বনবন করে চরকিপাক দিতে দিতে এমন দপদপ করতে লাগল, স্পষ্ট মনে হল যেন সংকেত বিনিময় চলছে নিজেদের মধ্যে। যেই হাত তুলেছি তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে— ছিটকে সরে গেল দূরে।

আর কাছে আসেনি। দূরে দূরে থেকে দপদপানি চালিয়ে গেছে সমানে। অর্থাৎ, কনফারেন্স চলছে। তার পরেই সাঁ করে সব ক'টা গ্যাস গোলক ধেয়ে গেল দিগন্তপারের শহরের দিকে।

কৌতূহল আমারও তো কম নয়। তাই রওনা হয়েছিলাম তৎক্ষণাৎ সেই দিকে। কিন্তু ওদের নাগাল ধরতে পারিনি।

নাছোড়বান্দা এই আমি কিন্তু হাঁটা থামাইনি। যেদিকে গেছে গোলকদল, সেইদিকে হাঁটা দিয়েছিলাম। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই অবাক হলাম ওদের আবার ফিরে আসতে দেখে। এবার ঝাঁক বেঁধে আসছে— প্রায় গোটা কুড়ি।

দাঁড়িয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ। গোলক-ঝাঁক ঝাঁ করে চলে এসে চরকিপাক দিতে লাগল আমাকে ঘিরে। লক্ষ করলাম, পাঁচ ফুট ব্যাস প্রত্যেকের রং একই— গাঢ় লাল। মিনিট খানেক স্রেফ চরকিপাক মেরে যেন খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখে গেল আমাকে, তারপর সাজিয়ে নিল ব্যূহ, চাকার মতো ব্যূহ আমার মাথা ঘিরে। প্রত্যেকের গা ফুঁড়ে সরু সুতোর শক্তিপ্রবাহ বেরিয়ে ঠেকে রইল আর একটার গায়ে। মাথা ঘিরে সে এক জ্যোতির্বলয়—মনে হল সেইরকম।

তার পরেই নীল জ্যোতির রেখা ঠিকরে এল প্রতিটা গোলকের ভেতর থেকে, ছুঁয়ে রইল আমার মাথা। বুঝলাম তদন্ত আরম্ভ হয়েছে আমাকে নিয়ে। আমার কিন্তু ভাল লাগেনি। তাই হাতের ঝাপটা মারতেই সব ক'টা বর্তুল চক্ষের নিমেষে চক্রব্যূহ ভেঙে ঠিকরে গেল দূরে দূরে। কিন্তু ঘাবড়ে গিয়েও চম্পট না-দিয়ে একটু তফাতে থেকে ফের চক্রব্যূহ রচনা করে নিয়ে যেন ভাবতে লাগল।

একটা গোলক দেখলাম ঝকমকে কমলা রঙের হয়ে গেল। দপদপ করে যেন অন্য গোলকদের ধমক দিচ্ছে। ঠিক যেন কথা বলছে। রেগে আগুন হয়ে কমলা হয়ে গেছে, কাপুরুষতার জন্যে একহাত নিচ্ছে সঙ্গী গোলকদের।

এই রাগী গোলকটাই আবার সবাইকে নিয়ে দল পাকিয়ে এল আমার দিকে। এবার কিন্তু চমকে গেলাম। একই সঙ্গে গোটা কুড়ি নীল অগ্নিশিখা ঝলক তুলল আমাকে ঘিরে। যেখানে যেখানে ছুঁয়ে গেল, সেই সেই জায়গা অসাড় হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

স্থাণু হয়ে যেতেই তারা ফের আমার মাথা ঘিরে ব্যূহরচনা করে নিয়ে আগের মতোই নীল জ্যোতির রেখা নিক্ষেপ করে গেল আমার মাথা টিপ করে। কিছুক্ষণ পরে সব ক'টা নীল জ্যোতির রেখা এক হয়ে গিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল আমার করোটির নানান দিক— অথচ আমি কোনও যন্ত্রণা টের পেলাম না।

টের পেলাম একটু পরে, যখন নীল জ্যোতি টকটকে লাল হয়ে গিয়ে ছুঁচের মতো ছুঁয়ে রইল আমার মাথার একটা দিক। মনে হল বরফকুচি ব্রেনের মধ্যে ঘুরে ফিরে যাচ্ছে। একটা প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল মাথার মধ্যে, কানে শুনলেও এতটা স্পষ্ট হত না।

'আসছ কোথা থেকে?'

চিন্তা-চালনা ব্যাপারটা আমার কাছে তখন জলভাত। এ ব্যাপার নিয়ে প্র্যাকটিসও করেছিলাম প্রফেসরের পাল্লায় পড়ে। প্রশ্নটা শুনেই চেষ্টা করলাম মাথার কোষগুলোকে জড়ো করে জবাব দেওয়ার। চিন্তা দিয়ে চিন্তার জবাব দিতে গেলে এইরকমই করতে হয়। সফলও হলাম। কেননা ও-পক্ষের জবাবটা মাথার মধ্যে গমগম করে উঠল, কী আবোল তাবোল ভাবছ। চিন্তা ফোটাতে পারছ না কেন? ভিনগ্রহী তোমার মতো জীব কখনও

দেখিনি। মিনিটে মিনিটে ছোট হয়েই যাচ্ছ! এ আবার কীরকম জীব! এসেছ কোথা থেকে, কী মতলবে— জানাও!'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যে আমাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন, তা বোঝানোর চেষ্টা করলাম মনের চিন্তা দিয়ে। কিন্তু পারলাম না। কেননা ফের খেঁকিয়ে উঠল বলয়াকারে সাজানো গোলকদের দলপতি, 'আশ্চর্য! মনকে ফোকাস করতে শেখোনি? সবই যে এলোমেলো...ছায়ার পর ছায়া...নিরেট চিন্তা মগজে আসে না?'

এই বলেই যেন রেগেমেগে চক্রব্যুহ ভেঙে দূরে দূরে সরে গেল গোলক বাহিনী। এই সময়ে একজনের রাগী মন্তব্য স্পষ্ট ভেসে এল ব্রেনের মধ্যে, 'খুবই নিচু স্তরের মন!'

শুনেই খেপে গেছিলাম, চেঁচিয়ে বলেছিলাম, 'তোমরাই হলে নিচু শ্রেণির যন্ত্রের দল।'

একটা পাঁচশো-ছ'শো ফুট ঢ্যাঙা দৈত্যের গর্জন শুনে ওরা কিন্তু ভড়কায়নি। হয়তো ভেবেছিল, ব্রেনের জোর যার নেই, সে তো গলাবাজিই করবে।

তবে হালও ছাড়েনি। ওদের জগতে আচমকা একটা প্রহেলিকা এসে যখন জুটেছে, তখন সে রহস্য ভেদ না-করে যে ছাড়বে না, তা বুঝলাম একটু পরেই।

কুড়িটা বর্তুলের দশটা লম্বালম্বিভাবে দাঁড়িয়ে গেল আমার বাঁপাশে, পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত। ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে গেল অন্য দশটা আমার ডান দিকে। দ্যুতিময় ফিতে বেরিয়ে এল প্রত্যেকের ভেতর থেকে, ছুঁয়ে রইল আমার শরীরের কুড়িটা জায়গা। আমি অবশ্য ব্যথা ট্যাথা কিছুই টের পেলাম না। আচমকা যেন একই সিগন্যাল পেয়ে কুড়িটা গোলক উঠে পড়ল শূন্যে। সেইসঙ্গে মাটি থেকে উঠে গেলাম আমি— যেন একটা হালকা পালক!

তোবা! তোবা! এ কী বিষম বিস্ময়ের আবিষ্কার এদের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। গল্পকথায় শুনেছি, প্রাচীনকালে পিরামিডের পাথর টাথর নাকি অদ্ভুত কোনও পন্থায় শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল! এরা তো দেখছি সেইভাবেই আমাকে শূন্যপথে সাঁ সাঁ করে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে এসে গেলাম সবুজ জল থইথই এক বিশাল সমুদ্রের পাড়ের এক মস্ত শহরে, সেখানে বড় বড় ইমারত চোখ ঝলসে দিচ্ছে বটে, কিন্তু রাস্তাঘাটের বালাই একেবারেই নেই। কেননা গোলকরা তো রাস্তায় হাঁটছে না, শূন্যে উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

আলতো করে গোলক বাহিনী আমাকে নামিয়ে দিল শহরের বাইরে। তারপর কপালে জ্যোতির পয়েন্ট ছুঁইয়ে বলল, 'ভিনগ্রহী, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, কিন্তু কোথাও হাত দিয়ো না। তোমার ওই হেঁড়ে মগজের কিসসু আমরা বুঝতে পারিনি। বহু বছর ধরে তোমার প্রতীক্ষায় থেকেছি— অবশেষে তুমি এসেছ।'

আমাকে কিন্তু একলা ছেড়ে দেয়নি। কয়েকটা গোলক শূন্যে ভেসে ভেসে আমার সঙ্গে থেকেছে। বড় বড় গম্বুজওয়ালা বাড়িগুলোর আশপাশে টহল দিতে দিতে একটাই কথা শুধু ভেবে গেছি। আমার প্রতীক্ষায় এরা থেকেছে বহু বছর।

এ আবার কী প্রত্যাশা? এরকম দূর-দর্শন ঘটলই বা কী করে?

যাক গে, প্রায় একশো বর্গ মাইল জুড়ে গড়ে ওঠা বিশাল সেই শহর পরিক্রমা করে একটা ব্যাপার স্পষ্ট বুঝেছিলাম— এখানকার বাসিন্দাদের থাকার জায়গা বাতাস।

ঘণ্টা কয়েক টহল মেরে যখন আরও ছোট হয়ে এলাম, তখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হল একটা পেল্লায় গোল গম্বুজওয়ালা বাড়ির মধ্যে। হেঁটেই চলে গেলাম, উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার হল না।

সেখানে উঠলাম একটা মস্ত চক্রাকার মঞ্চে। মঞ্চ ঘিরে রয়েছে অনেক উঁচু কাচের বা ওই জাতীয় কিছুর স্ক্রিন। মঞ্চ ঘিরে রেখেছে। একটা গোলক উড়ে এসে আমার রগে জ্যোতির সিগন্যাল ছুঁইয়ে বলল, 'দেখে যাও।'

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ বেষ্টন করে থাকা স্ক্রিন অস্বচ্ছ হয়ে গেল, দুধের মতো সাদা। সেখানে ফুটে উঠল ছবি। শুধু ছবি। আমি যেন মহাশূন্যে রয়েছি। আমাকে ঘিরে রয়েছে নীহারিকা।

মাথার মধ্যে ছুটে এল চিন্তার ফুলকি, এই সেই গ্রেট নীহারিকা যার মধ্যে রয়েছি আমরা। সঞ্চারমান নীহারিকার সরে সরে যাওয়া কখনও টের পাওয়া যায় না, দেখা যায় না। তোমাকে যা দেখানো হচ্ছে, তা আমরা কেমিক্যালে রেকর্ড করে রেখেছিলাম। স্পিড একটু বাড়ানো হয়েছে স্ক্রিনে। লক্ষ করো।

স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম নিজের ছোট হয়ে যাওয়ার ছবি, চার সূর্যের জগতে প্রবেশের ছবি, এই গ্রহে গুঁতিয়ে ঢুকে পড়ার ছবি! আমার তো মনে হয়েছিল ছোট হয়েছি পলকে-পলকে...নিমেষে-নিমেষে...এদের কাছে তা কয়েক শতাব্দী! মাই গড!

'হে মহা-আগন্তুক! হতভম্ব আমরাও হয়েছিলাম, এখনও হয়ে চলেছি তোমার মুহূর্তে মুহূর্তে ছোট হয়ে যাওয়া দেখে। একটু সময় দাও, তোমার ব্রেনের খবর বের করে নেব। গা ঢিলে দাও...গা ঢিলে দাও...শক্ত হয়ে থেকো না।'

তাই দিলাম। না-দিয়েও উপায় ছিল না। মগজের মধ্যে সুড়সুড় করছিল শুঁড়ের মতো জ্যোতির কণা ঢুকে যাওয়ায়। এলিয়ে আসছিল গা-হাত-পা। সে বড় আরাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখছিলাম, ছায়ার পর ছায়া ভেসে যাচ্ছে স্ক্রিনের ওপর দিয়ে। তারপর পরদায় ফুটে উঠল একটা চেনা দৃশ্য : প্রফেসরের ল্যাবরেটরি, ঠিক যেভাবে দেখে এসেছিলাম, সেইভাবে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে তাঁর কথা, আমাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া, আমার ছোট হয়ে যাওয়া...সমস্ত...দু'জনের কথা পর্যন্ত!

গোলকরা ভিড় করেছিল পরদার সামনে। সমস্ত সত্তা দিয়ে শুনছে বহু শতাব্দী আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথাবার্তা, দেখছে কীভাবে জীবাণুর সঙ্গে লড়লাম, নীহারিকায় প্রবেশ করলাম।

গোলকদের মধ্যে একটাকে খুব ধীমান মনে হয়েছিল। খুব মন দিয়ে দেখছিল আর শুনছিল। সে-ই চিন্তার শক্তি দিয়ে হঠাৎ আমাকে বলল, 'যিনি তোমাকে ছোট করে ছোট্ট ছোট্ট জগৎ দেখতে পাঠিয়েছেন, তিনি মহাপুরুষ। তাঁর দৌলতে আমরা তোমাকে দেখলাম। কিন্তু তোমার ভাগ্য ভেবে আমাদের কষ্ট হচ্ছে।'

ঝাঁ করে বললাম, মানে, ভাবলাম, 'কষ্ট হচ্ছে? কেন?'

এইবার দেখলাম, আমার চিন্তার নাগাল ওরা ধরে ফেলেছে। নিজের দিকে দেখলাম, আরও ছোট হয়েছি।

দলপতি গোলকের চিন্তা-কথা ছুটে এল আমার মাথায়, 'হে মহামানব, তুমি একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে যাবে আমাদের সামনে থেকে, ক্ষুদ্রতর জগতে চলে যাবে। তাই তোমার পরিণতির কথা বলে তোমার মন খারাপ করতে চাই না।'

এবার গেলাম রেগে, 'তোমাদের আবার মন আছে নাকি? গ্যাসের পিণ্ডি ছাড়া তো কিছুই নয়।'

বিষণ্ণ সুরে বলল দলপতি, 'না, আমাদের চোখ নেই তোমার মতো। কিন্তু সারা শরীর দিয়ে আমরা দেখতে পাই। তোমরা এখনও উন্নতির উঁচু ধাপে উঠতে পারোনি, তাই ভাবনা ছোড়া আর ধরার শক্তি তোমাদের নেই।'

রাগ সামলে রাখলাম, 'তোমাদের কথা বলো।'

ছোট তো হচ্ছি চোঁ-চোঁ করে। যা শোনবার এইবেলা শুনে নিই, প্রফেসর ঘরে বসেই তা জানতে পারবেন। যদি না তিনি পরপারে চলে গিয়ে থাকেন!

সে বলল, 'আমাদের সামাজিক উন্নতি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি তোমাদের চেয়ে বেশি। নীহারিকার মধ্যে তোমার টুঁ মেরে ঢুকে পড়া দেখে সর্তক হয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষ। তারপর বহু পুরুষ ধরে তোমার ওপর নজর রেখেছি, শুধু বুঝিনি কেন ছোট হচ্ছ— কোত্থেকে আসছ। আমাদের গ্রহে তোমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেছিল সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের কাছে। এই শহরে সবাই এসেছে তোমাকে নিয়ে তদন্ত করার জন্যে। এটা আমাদের নেহাতই ছোট শহর, এর চাইতে বড় শহর অনেক আছে। কিন্তু আর সময় নেই, হে মানুষ বিদায়!'

॥ প্রাগৈতিহাসিক গ্রহে ॥

আমি তখন এত ছোট হয়ে গেছি যে বলবার নয়। হু-উ-স করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটা প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরিতে— ফেলা হয়েছিল একটা অদ্ভুত মাইক্রোসকোপের নিচে। গ্যাসের গোলকরা সত্যিই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। এই ল্যাবোরেটরির এলাহি কাণ্ডকারখানাই তার প্রমাণ। অনেক আগে থেকেই তাই তৈরি হয়ে আছে আমাকে আরও ছোট জগতে বিদেয় করার জন্যে।

প্রক্রিয়াটা একই। ফুটো ফুটো ধাতুর পাতের মধ্যে দিয়ে খোলা মহাশূন্যে প্রবেশ...দূরে দূরে বহু পুঞ্জ...নতুন নীহারিকা...নতুন নক্ষত্র জগৎ।

এবার ঢুকলাম হলুদ রঙের এক সূর্যের জগতে। তাকে ঘিরে পাক দিচ্ছে আটটা গ্রহ। আমি দেখেছিলাম একদম বাইরের দিকের গ্রহটা। যা একটা ইলেকট্রন ছাড়া কিছুই নয়।

আরও ছোট হয়ে পা দিলাম সেই ইলেকট্রনিক গ্রহে। একেবারে আদিম অবস্থার গ্রহে।

ঘন সবুজ জঙ্গলে ছাওয়া...উঁচু উঁচু পাহাড়...খরস্রোতা নদী। প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য কাকে বলে, তা চোখের সামনে দেখলাম।

আরও ছোট হয়ে যাওয়ার পর দেখলাম, পাহাড়ের গায়ে সারবন্দি গুহা। স্পষ্ট মনে হল, গুহার মধ্যে থেকে জোড়া জোড়া চোখ ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। খুদে খুদে কয়েকটা মূর্তি সাঁৎ করে এক গুহা থেকে বেরিয়ে ঢুকে গেল পাশের গুহায়। আর একটা পুঁচকে মূর্তি আর এক গুহা থেকে বেরিয়ে সরু চাতালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখল আমার ওপর— বেগতিক দেখলেই সটকান দেবে। আমি একদম নড়ছি না দেখে গুটিগুটি বেরিয়ে এল আরও কয়েকজন— চাতালে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে ভীষণ উত্তেজিতভাবে কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। আকাশ থেকে লাফিয়ে দানব নেমে এসেছে, ঘাবড়ে তো যাবেই।

চাতাল থেকে মাইলখানেক দূরে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট দেখে নিলাম, বর্বর ওরা প্রত্যেকেই। বেঁটে। গায়ে ডুবোডুবো মাসল। দুটো হাত, দুটো পা। দাঁড়িয়ে আছে পায়ের ওপর। হাতে বদখদ হাতিয়ার।

বাহাদুরি দেখানোর জন্যে একজন একটা খুদে তির ছুঁড়েছিল আমাকে টিপ করে। পাশের মূর্তি তাকে এক ঘুসি মেরে শুইয়ে দিল চাতালে। রগড় মন্দ নয়!

মজা দেখাবার জন্যে পাহাড়ের দিকে এক পা বাড়িয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে তির ছুটে এসে পড়ল আমি যেখানে পা ফেলেছি সেখান থেকে তফাতে। আমি যেন আর না-এগোই।

আমার উদ্দেশ্য যে শুভ, তা বোঝানোর জন্যে কয়েক পা পেছিয়ে যেতেই ফের ঝাঁকে ঝাঁকে আলপিনের চাইতেও ছোট তির ধেয়ে এল আমাকে লক্ষ্য করে। ফাঁপরে পড়লাম। ওরা যখন চায় আমি স্ট্যাচু হয়ে থাকি, তখন তাই থাকা যাক।

এক আদিম বর্বর হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে জঙ্গলের গভীরে চেয়ে রইল। উত্তেজিতভাবে পাশের বর্বরদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তখন সূর্য ডুবছে। আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ওদের ছটফটানির কারণটা বুঝলাম। নিশ্চয়ই শিকার করতে গিয়েছে একটা দল। এখন তাদের ফেরবার সময়। আমি হাঁটলেই তো তারা থেঁতলে পিষে মাটিতে মিশে যাবে।

হঠাৎ একটা দল ছুটে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে খোলা জায়গাটায়। এসেছিল হইহই করে শিকার করা একটা জন্তুকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে। কিন্তু আমার দানব চেহারা দেখেই কাঠ হয়ে গেল। একজন তো নিদারুণ আতঙ্কে দড়াম করে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল মাটিতে।

আর একজন একটু এগিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে আমার প্রকাণ্ড মূর্তিটার দিকে যখন তাকিয়ে রয়েছে, ঠিক তখন জানোয়ারি হুংকার জাগ্রত হল জঙ্গলের মধ্যে।

চোখের পলকে জংলিরা গা ঢাকা দিল এদিকে-ওদিকে, বুকের পাটা যার বেশি, সে একটা বল্লম নিয়ে সড়সড় করে উঠে গেল গাছের ওপর। বল্লমটার মাঝখানে দুটো পাথর লতা দিয়ে বাঁধা।

আর একটা গর্জন ছেড়েই খোলা জায়গায় ঠিকরে এল অদ্ভুত বিকট একটা জানোয়ার। তার পা ছ'টা। পিঠে খাঁজ-কাটা করাতের মতো বর্ম। লম্বা ল্যাজটাও ওইরকম। ওই ল্যাজের ঝাপটা খেলে আর রক্ষে নেই।

নিশ্চয় সরীসৃপ যুগের জীব। লম্বায় প্রায় তিরিশ ফুট।

কৌতূহল জেগেছিল বলেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলাম। জানোয়ারটা আমার দিকে তেড়ে আসবার জন্যে যখন পাঁয়তারা কষছে, গাছের ডাল থেকে সেই বর্বর শিকারি বল্লমে বাঁধা দুই পাথরে দু'পা রেখে লাফিয়ে পড়ল তার পিঠ লক্ষ্য করে।

কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হল। কারণ নিশ্চয় সহজাত অনুভূতি দিয়ে টের পেয়ে সাঁৎ করে পাশে সরে গেছে বিশাল জানোয়ার। শিকারির সড়কির ফলা ঢুকে গেল মাটিতে, সে রইল ডান্ডা আঁকড়ে। পালানোর সময়ও পেল না। সরীসৃপ বিভীষিকা কাঁটা ল্যাজের এক ঝাপটা মেরে তাকে উড়িয়ে দিল জঙ্গলের গাছের মাথায়।

আর সহ্য হল না আমার। দু'আঙুলে তাকে টিপে ধরলাম। তুলে আছাড় মারলাম। এক আছাড়েই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

হইহই করে জংলিরা ঘিরে ধরল আমাকে। হাঁটু পেতে বসা অবস্থাতেই আমার মাথা তখন জঙ্গলের মগডালদের ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে। ওরা কিন্তু আর ভয় পাচ্ছে না। আমি তো বন্ধু হয়ে গেছি। হাত তুলে দেখাচ্ছে মাইলখানেক দূরে পাহাড়ের গায়ে গুহার সারি।

দু'আঙুলে বিশ্রী বিকট জানোয়ারটাকে তুলে যেন একটা মরা ইঁদুর ঝুলিয়ে যাচ্ছি, এমনিভাবে এগোলাম ওদের গুহার সারির দিকে।

দুর্বোধ্য কলরব করে ওরা এল পেছন পেছন। চাতাল তখন ভরে গেছে আদিম মানুষে। কারও প্রাণে আর ভয় নেই। আছে শুধু উল্লাস।

ওরা খানাপিনায় মেতেছে। ধেই ধেই করে নাচছে আকাশ দেবতাকে ঘিরে। ওদের চোখের সামনেই আমি হুহু করে ছোট হয়ে যাচ্ছি। রাতের কনকনে শীত সহ্য করতে পারছি না। ওরা যখন হতভম্ব, তখন আমি সুট করে ঢুকে গেলাম একটা পাথরের অন্ধকার খাঁজে। তখন আমার হাইট মোটে এক ফুট। এখানে বেশ গরম। দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভাবতে লাগলাম, না জানি আরও কী দেখতে হবে!

॥ সোনালি পাখি-প্রাণীদের গ্রহে ॥

এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি এক কণা বালির ওপর। আশেপাশে অন্য বালির দানা মসৃণ টিলার মতো আমাকে ঘিরে রেখেছে। কয়েক মিনিট পরেই টের পেলাম নতুন সৌর জগতে ঢুকতে চলেছি।

আমি সৌরজগতে ঢোকবার আগেই গ্রহবাসীরা চলে এল। একটা রুপোলি ছুঁচলো মহাকাশপোত আসছে আলোর গতিবেগে। মজা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম।

মিনিট কয়েকের মধ্যে এল কাছে। পেছন থেকে আগুন আর ধোঁয়া ছেড়ে, আমাকে এক পাক ঘুরে ল্যান্ড করল আমারই চ্যাটালো বুকে! মনে হল যেন একটা মাছি বসেছে বুকে। পাল্লা সরিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল খুদে খুদে সোনার কুচির মতো একপাল জীব। দল বেঁধে দাঁড়াল আকাশযানের পাশে।

তার পরেই আমাকে চমকে দিয়ে সোনালি ডানা নেড়ে পাখির মতো উঠে পড়ল শূন্যে। একটু বাতাস আছে তা হলে এখানে— নইলে ডানা পতপত করছে কীভাবে। এসেছে নিশ্চয় অ্যাডভান্স পার্টি, খোঁজখবর নিতে পেল্লায় চেহারার কে ঢুকেছে তাদের গ্রহজগৎ ধ্বংস করার জন্যে তা জানতে।

সাহস আছে বটে। অঙুলি হেলনে সব ক'টাকেই তো ছাতু করে দিতে পারি।

ডানা মেলে আমাকে ঘিরে চরকিপাক দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ঢুকে গেল স্পেসশিপে। জানি না ওদের রিপোর্ট পাওয়ার পর কীরকম অভ্যর্থনা জানানো হবে আমাকে। চার হাতপাওয়ালা মস্ত দানব— এই তো আমি। আর ওরা সোনালি ডানা লাগানো যেন পরি।

খতম করে দেবে নাকি?

যা হয় হবে, আমি ছোট হতে হতে রওনা হলাম পছন্দসই গ্রহের দিকে।

একটা কথা বলা হয়নি। এই সৌরজগতের সূর্য কিন্তু ঝকঝকে সবুজ রঙের। গ্রহ অনেকগুলো।

সবুজ সূর্য প্রদক্ষিণ করে একটা লালচে গ্রহ যখন আমার দিকে আসছে, তখনই দেখলাম, চাঁদের আলো পড়েছে যে পিঠে, সেই পিঠে দাঁড়িয়ে সারবন্দি রকেট জাহাজ।

অবাক হলাম। ওদের ভঙ্গিমা তো মারমুখো নয়। আমি যে বিরাট চেহারা নিয়ে ঢুকে পড়েছি আকাশে, তা দেখেও তো তেড়ে আসছে না।

তার মানে, আমাকে নিয়ে ওদের ভয় নেই। আমি নির্বিষ।

আরও তাজ্জব হলাম পরক্ষণেই। সারবন্দি রকেট জাহাজ উঠছে শূন্যে, ধেয়ে যাচ্ছে চাঁদের দিকে। হাজারে হাজারে যাচ্ছে একটাই উপগ্রহের দিকে। আমাকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারুরই।

এ আবার কী ব্যাপার!

কৌতূহলে ফেটে পড়েছিলাম এই কাণ্ড দেখে। অত্যন্ত সুসভ্য একটা গ্রহের বাসিন্দারা গ্রহত্যাগ করে দলে দলে উপগ্রহের দিকে ছুটেছে কেন? আমার ভয়ে? তাই যদি হয় তো নামবই না এ-গ্রহে।

দেখতে দেখতে গ্রহ ঘুরে চলে গেল সূর্যের ওদিকে। ফের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রইলাম। এক-একটা মিনিট যেন আর কাটতে চায় না।

আমার কাছে মাত্র কয়েকটা মিনিট, ওদের কাছে তা একটা বছর। কম নয়। অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে এই একটা বছরে।

সত্যিই অনেক কিছু ঘটেছে। উপগ্রহ পাক দিয়ে চলেছে গ্রহকে। পাখি-প্রাণীরা উপগ্রহ ঘিরে একটা রক্ষা-বর্ম বানাচ্ছে।

রক্ষে পেতে চাইছে কাদের আক্রমণ থেকে? নাকি আমার ভয়ে?

ধূসর ধাতু দিয়ে তৈরি হচ্ছে সেই খোলস। এর মধ্যেই ঢাকা পড়ে গেছে উপগ্রহের অর্ধেক। যেদিকে এখনও ঢাকনা পড়েনি, সেদিকে দেখা যাচ্ছে ডাঙা আর সমুদ্র। পুরো ঢাকনা যখন তৈরি হয়ে যাবে, তখন সবুজ সূর্যের রোদ তো আর পাবে না। তার বদলে নিশ্চয়ই ঝরবে নকল আলো। কিন্তু তা কি রোদ্দুরের বিকল্প হবে?

সাইজে তখনও আমি এত বড় যে গ্রহে পা দিতে গেলেই কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। তার চাইতে বরং সূর্যকে আর একটা পাক মেরে আসুক, আমিও আর একটু ছোট হই। গ্রহই তখন আমাকে টানবে। নির্বিঘ্নে পা রাখা যাবে।

বেশ কয়েকটা মিনিট গেল অধীর প্রতীক্ষায়। ফিরে এল উপগ্রহ। পুরো ঢাকনা পড়ে গেছে। সবুজ রোদ গা থেকে ঠিকরে যাচ্ছে। ভেতরে নকল আলো জ্বালিয়ে পিলপিল করছে পাখি-প্রাণীরা। কিন্তু চম্পট দিল কেন?

নজর ফেরালাম গ্রহের দিকে। লাফিয়ে গ্রহে নামার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই গ্রহের আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে তেরচাভাবে নেমে এসে পা দিলাম যেখানে, সেটা দলপাকানো রাশি রাশি ধাতু।

॥ মেশিনদের গ্রহে ॥

যাচ্চলে! পায়ের চাপে থেঁতলে দিলাম নাকি মেট্যাল ফ্যাক্টরি? যাদের মেশিন, তারা তো আমাকে ছেড়ে দেবে না।

কিন্তু যাদের মেশিন, তারা নিজেরাই তো চম্পট দিয়েছে গ্রহ ছেড়ে। কাদের ভয়ে? কীসের ভয়ে? চোখ পাকিয়ে চেয়ে ছিলাম প্রায়ান্ধকারের মধ্যে দিয়ে। একটু একটু করে নজরে আসছিল অনেক কিছু। প্রথমে মাইল কয়েক, তারপরে দিগন্ত থেকে দিগন্ত। দৃষ্টিসীমায় চলে এল প্রায় অর্ধেক গোলার্ধ।

আতঙ্কে রক্ত প্রায় জল হয়ে এল। ইচ্ছে হল লাফিয়ে অন্য গ্রহে চলে যাই। কিন্তু তা হবে আরও মারাত্মক। পায়ের ধাক্কায় এই গ্রহ ছিটকে যাবে, ছোট হয়ে যাওয়ার ফলে অন্য গ্রহেও পৌঁছোতে পারব না— সূর্য টেনে নেবে তার অগ্নিজঠরে।

না। এখানেই থাকতে হবে। এই গ্রহে।

কিন্তু এ যে মেশিনময় গ্রহ! মেশিনদের রাজত্ব চলছে দিকে দিকে। মেশিন ছুটছে। মেশিন গড়ছে মেশিন। ভাববার ক্ষমতাও অবশ্যই আছে এদের— আছে ইনটেলিজেন্স।

কী ভয়ানক! এই ভয়েই কি ডানাওয়ালা প্রাণীরা চম্পট দিল গ্রহ ছেড়ে? মেশিনাতঙ্কে?

যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকেই তো দেখছি ঢালাও রাজত্ব চলছে মেশিনদের। ছোট মেশিন, বিরাট মেশিন, বিদঘুটে মেশিন, উদ্ভট মেশিন। নিছক চলমান কলকবজা নয়, রীতিমতো ধীমান যন্ত্রপাতি।

আমি যখন বিমূঢ়, ঠিক তখন লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার দিকে এল এমন তিনটে মেশিন

যাদের প্রত্যেকের তিনটে পা, তিনটে হাত। সামনে এসে ঝটপট ভাঙা কলকবজা সরিয়ে গাদা করে রাখল একপাশে। পরক্ষণেই গড়গড়িয়ে এল চাকাওয়ালা কয়েকটা মেশিন। ক্রেনে করে ভাঙা মেশিনপত্র তুলে নিয়ে সাফ করে দিয়ে গেল পুরো জায়গাটা।

পরিপাটি কাজ। নিয়মবদ্ধ কাজ। সব কিছু চলছে ঘড়ির কাঁটায়। হাজার হাজার রকম মডেলের মেশিন। কারও ডানা আছে, কারও চাকা আছে, কারও পা আছে। কেউ খুদে, কেউ বিরাট। কিন্তু কাজকর্ম যেন এক সুতোয় বাঁধা। মেশিন মাফিক।

একই সঙ্গে মাথা তুলছে আকাশছোঁয়া ইমারত— মেশিনদের তৈরি বাড়ি। হাজার হাজার ফুট উঁচু। আমার সামনেই একটা পেল্লায় ইমারত, বনেদে দোষ থাকায়, হেলে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে খুদে, অতিকায় বহু মেশিন ছুটে গিয়ে, আগুনের শিখা ছুড়ে, গোটা ইমারতটাকে টুকরো টুকরো করে সরিয়ে নিয়ে গেল গালাইয়ের কারখানায়। পনেরো মিনিট যেতে না যেতেই উঠতে লাগল নতুন ইমারত।

দুটো উড়ুক্কু মেশিন ভেঙে আছড়ে পড়তে না পড়তেই একদঙ্গল মেশিন ছিটকে গিয়ে ভাঙাচোরা মেট্যাল তুলে নিয়ে গিয়ে সাফ করে দিল জায়গাটা।

আমার চারদিকে একটু একটু করে গড়ে উঠছে বর্ণনাতীত বিরাট এক শহর—মেশিনদের শহর। কিন্তু কেন?

এক মহাদেশকে আর এক মহাদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার জন্যে। ব্রিজের পর ব্রিজ ছুটে যাচ্ছে মহাসাগরের ওপর দিয়ে ওপারে— হয়তো সেখানকার ইনটেলিজেন্ট মেশিনরাও একইভাবে সাগরসেতু রচনা করে চলেছে। গোটা গ্রহটাকে কবজায় আনতে যাচ্ছে মেশিন-বাহিনী।

কার হুকুমে চলছে এহেন পৈশাচিক যান্ত্রিকতা? সময় আমার কম। তার মধ্যেই নাটের গুরুকে বের করে তার দফারফা করে ছাড়ব।

॥ মেশিন-ব্রেন...মেশিন-ব্রেন ॥

সমুদ্রের পাড় ধরে হেঁটে গেলাম পাঁচশো মাইল। একটা বেমক্কা কোণ ঘুরেই দাঁড়িয়ে গেলাম। মসৃণ সাদা সিমেন্ট দিয়ে গড়া এক অনুপম স্থাপত্য সৌন্দর্য দেখছি চোখের সামনে। প্রকাণ্ড এক শহর— বহুদূর বিস্তৃত বড় বড় পার্ক রয়েছে— সুন্দর সুন্দর পাথরের মূর্তি আর ফোয়ারা দিয়ে সাজানো। ইমারতগুলো সটান আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। প্রত্যেকটা অট্টালিকার নকশা একইরকম। ছাদ থেকে যাতে মেঘলোকে পৌঁছে যাওয়া যায় চট করে।

এত কাণ্ড রয়েছে শহরের আধখানা জুড়ে। বাকি আধখানা স্রেফ ধ্বংসস্তূপ। বড় বড় বাড়িগুলোকে ভেঙে চুরে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে অতিকায় বিকটদেহী মেশিনরা, নিশ্চয় নিজেদের নকশা মতো নতুন শহর গড়বে বলে।

আমার চোখের সামনে অগ্নিশিখা-মেশিনরা ঝপাঝপ পাথর আর ইস্পাত কেটে সবচেয়ে বড় বাড়িটাকে যখন টলমলে করে তুলেছে, ঠিক তখনই দূর থেকে উড়ে এল দুটো মহাকায়

ফ্লাইং মেশিন। দু'দিক থেকে ধরে একটা প্রকাণ্ড লোহার জাল নিয়ে। টলমলে বিল্ডিং-এর তলায় ঢুঁ মারতেই গোটা বাড়িটা টলে গিয়ে আছড়ে পড়ল লোহার জালের মাঝখানে। অক্লেশে ভাঙা বাড়ি সমেত লোহার জাল শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল দানবিক ফ্লাইং মেশিন দুটো!

কিম্ভূতকিমাকারদের লণ্ডভণ্ড ধ্বংস আর ছন্দোবদ্ধ সৃষ্টি চলছে সর্বত্র। যুগপৎ। ভাঙছে আর গড়ছে। পাখি প্রাণীদের গড়া কোনও জিনিস আস্ত রাখছে না, সে জায়গায় তুলছে নিজেদের সৃষ্টি।

লম্বা লম্বা পা ফেলে উঠে গেলাম একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর। পাহাড়ের ওদিকে মেশিনদের তৈরি মস্ত শহর দেখলাম। একটা নয়, অনেক। প্রায় দুশো মাইল দূরে একটা পেল্লায় গম্বুজে চোখ আটকে গেল। রওনা হলাম সেদিকে।

একটু এগোতে না এগোতেই আমার পথ আটকাল খোঁচা খোঁচা বল্লমময় সারবন্দি মেশিন। লাথিয়ে চুরমার করলাম প্রত্যেকটাকে। পায়ে আঁচড় যদিও লাগল, গ্রাহ্য করলাম না। বিশাল উঁচু তোরণ পেরিয়ে এলাম প্রকাণ্ড গম্বুজওয়ালা বাড়িটার সামনে। ঢুকে গেলাম গম্বুজের মধ্যে। আমার মাথা ঠেকে রইল ছাদে।

একটাই ঘর এই গম্বুজের নিচে। মাঝে রয়েছে একটা মাত্র মেশিন। মেশিনদের রাজা। গোলাকার। সুবৃহৎ। কদাকার। এরই হুকুমে নারকীয় কাণ্ড চলছে দিকে দিকে। ব্রেন এই মেশিন। মনে হল যেন বিকটাকারের গা থেকে তরঙ্গ ধেয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। রশ্মি মারফত হুকুম যাচ্ছে।

এই ব্রেনকে ধ্বংস করব বলেই এসেছি। করে তবে ছাড়ব।

এগোলাম এক পা।

সঙ্গে সঙ্গে দপ করে আলো জ্বলে উঠল একটা চৌকোনা স্ক্রিনে। অদৃশ্য রশ্মি-প্লাবিত হয়ে গেলাম নিমেষে।

তাতে আমার কচু হল। এগোলাম আর এক পা।

অদৃশ্য রশ্মি একরাশ আতঙ্ক আছড়ে ফেলল আমার ব্রেনের মধ্যে। কিন্তু থামলাম না। আর এক পা এগোতেই মেঝে ফুঁড়ে লকলকিয়ে উঠল নীল অগ্নিশিখা, ঠেকল গম্বুজের ছাদ পর্যন্ত।

পেছিয়ে এলাম এক পা। অদৃশ্য রশ্মিবাহিত মেশিনের ঘৃণা আর বিদ্বেষ আমাকে তখন ছেয়ে ফেলেছে। আমি যে একটা দু'চক্ষের বিষ, তা অদৃশ্য পন্থায় আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে দিচ্ছে।

ভয়ংকর এই মেশিন-ব্রেনের সান্নিধ্যে না-থাকাই ভাল। চম্পট দিলাম পাহাড়ে।

দুঃখ হয়েছিল শুধু পাখি-প্রাণীদের জন্যে। পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছে। এই বিভীষিকা রাজ্যে মেশিনদের কেউ হারাতে পারবে না।

ব্রেন-হাউসে ঢোকবার আগে একটা প্রকাণ্ড গ্লোব দেখেছিলাম তোরণের বাইরে। তখন অত তাকিয়ে দেখিনি। এখন দেখলাম পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে।

বিপুল তৎপরতা চলছে বিশাল গোলকটাকে নিয়ে। একদঙ্গল বিদঘুটে মেশিন হুড়মুড়

করে ঢুকে গেল ভেতরে। গোলক ভেসে উঠল শূন্যে— নিঃশব্দে। নক্ষত্রবেগে চলে গেল মহাশূন্যে— বিন্দুর মতো ছোট্ট হয়ে মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে। তার পরেই তাকে দেখা গেল ফিরে আসতে। সাঁ-সাঁ করে নেমে এসে গ্যাঁট হয়ে বসে গেল যে ফ্রেমওয়ার্ক থেকে বেরিয়েছে, সেই ফ্রেমওয়ার্কে। কদাকার মেশিন বাহিনী পিলপিল করে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে।

মাই গড। মহাকাশ ভ্রমণ এরা শিখে ফেলেছে। ট্রায়াল হয়ে গেল এইমাত্র। নিশ্চয়ই যাবে উপগ্রহে। ফ্রেম-মেশিনরা চক্ষের নিমেষে উপগ্রহের মেট্যাল-শিল্ড কেটে ভেতরে ঢুকে যাবে। তছনছ করবে পাখি-প্রাণীদের কলোনি। সেখানে পত্তন করবে মেশিন-কলোনি। তারপর উড়ে যাবে অন্য গ্রহে...অন্য কোনওখানে। এই নক্ষত্র-সাম্রাজ্যে উড়বে মেশিনদের বিজয় কেতন।

মেশিন! তুমি নিষ্ঠুর, তুমি নির্বিকার, তুমি হৃদয়হীন! তুমি থাকো, আমি চলি।

সন্ধে যখন ঘনিয়ে এল, আমি আরও ছোট হয়ে গেলাম। বিমর্ষ হয়ে বসে রইলাম এককণা বালির ওপর। এখুনি ঢুকব আর এক মহাকাশ জগতে।

॥ শেষ নেই... শেষ নেই ॥

কত আর চালিয়ে যাব? মেশিন-গ্রহ ছেড়ে আসবার পর অজস্র অ্যাডভেঞ্চারের সমস্ত বৃত্তান্ত কত আর শোনাব?

অবর্ণনীয় অ্যাডভেঞ্চারের পর অ্যাডভেঞ্চার করে যাচ্ছি, প্রোটোপ্লাজমদের জগতেও ঢুঁ মেরেছি। সে এক অবিশ্বাস্য জগৎ। তারপর দেখেছি ক্রিস্টালদের জগৎ, অগ্নিকণাদের জগৎ, আকাশ-ছোঁয়া তরল-স্তম্ভদের জগৎ, শব্দ-সত্তাদের জগৎ, বর্তুলাকার মগজ-সত্তাদের জগৎ।

আমি দেখেছি সূর্যের মৃত্যু, দেখেছি সূর্যের জন্ম, দেখেছি আস্ত নীহারিকার নিকেশ হয়ে যাওয়া। গ্রহে-গ্রহে সংঘাত দেখে আর বিস্মিত হইনি, মহাজাগতিক বিনাশ দেখে নির্বিকার থেকেছি...কেননা, আমার বিনাশ নেই...আমি জন্মমৃত্যুরহিত হয়ে গেছি...আমি অমর এই প্রলয়ংকর সৃষ্টি আর ধ্বংসের ধারাবাহিকতার মধ্যে।

ছোট হয়েছি কতবার? হিসেব রাখার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। মনে হয় বার তিরিশেক অ্যাটমিক চক্রাবর্তে ঢুকেছি আর আরও ঢুকেছি। অ্যাটমের মধ্যে অ্যাটম, ইলেকট্রনের মধ্যে গ্যালাক্সি... শেষ নেই...শেষ নেই। সব বস্তুকেই ভাঙতে ভাঙতে একটা শেষের অবস্থায় নাকি আনা যায়, তারপর আর ভাঙা যায় না— এই তত্ত্ব মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে আমার কাছে। শেষ নেই...কিছুরই শেষ নেই...তার পরেও পর আছে।

রঙের সত্তাদের দুনিয়ায় গিয়ে দেখেছি তারা প্রকৃতই ইনটেলিজেন্ট। সেখানে শুধু রং আর রং...শরীরী রং। তারাও দিশেহারা হয়ে গেছে আমার একনাগাড়ে ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাওয়া দেখে।

অথচ মিলিয়ে আমি যাচ্ছি না। পরমুহূর্তে অজস্র নীহারিকাময় পরবর্তী ছায়াপথে আবির্ভূত হচ্ছি বিশাল শরীর নিয়ে।

ফোহাত! ফোহাত আমার এই অবস্থা করেছে। প্রফেসর, আর কতদূর নিয়ে যাবেন আমাকে? আমি যে মৃত্যুহীন, সে চেতনা হয়ে গেছে। এই বিশ্ব যে আদি অন্তহীন, সে চেতনাও হয়ে গেছে। কিন্তু বড় একা...একা।

প্রফেসর, ফিরিয়ে দিন আমার জগৎ, আমার পৃথিবী...আমার জরা বার্ধক্য মৃত্যু।

আচমকা চোখে ঝাপসা দেখেছিলাম। অথবা আশপাশের সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেছিল আমার সামনে। অথবা আমি বুঝি এক বায়বীয় সত্তা হয়ে গেছিলাম। অথবা আশ্চর্য দ্যুতিময় এমন একটা কিছু যা মিলেমিশে গেছিল এক বর্ণনাতীত আলোর জগতের অণুপরমাণুতে! আমি এই আলোক-প্রলয়ের, আলোক-বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে সহসা...চক্ষের নিমেষে...জানি না কীভাবে...কত আলোকবর্ষ নিমেষে পেরিয়ে গিয়ে...আবির্ভূত হয়েছিলাম প্রফেসরের ল্যাবোরেটরিতে।

উনি বিষম চমকে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। অথচ আমাকে নাকি দেখতে পাননি। শুধু সমস্ত সত্তা দিয়ে টের পেয়েছিলেন আমি, শ্রীদীননাথ নাথ হাজির হয়েছি তাঁর সামনে।

সশরীরে বটে, তবে সে শরীর চোখের যন্ত্রে দেখার বাইরের শরীর!

আমি উপলব্ধি করেছিলাম বিপুল একটা শক্তি আমার ভেতর থেকে ঠিকরে যাচ্ছে। ইচ্ছের শক্তি? হয়তো। কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আমার মনের শক্তি। কত যুগ.. কত কল্প কত ছায়াপথ পেরিয়ে গেছি মূক অবস্থায়। তাই বুঝি আমার কথা বলার যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। কিন্তু মগজের চিন্তার ক্ষমতা অপরিসীম বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার কথা বলার আর দরকার হয় না...আমার অদৃশ্য সত্তা...মনোময় সত্তা...মন দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে...আমি কে?

তোতলামি শুরু হয়ে গেছিল প্রফেসরের।

'দী...দীননাথ! তুমি ফিরে এসেছ টের পাচ্ছি। ফোহাত-এর কৃপায় ফিরে এসেছ। তোমার ফিরে আসার ব্যাকুল ইচ্ছে জানতে পেরেই ফোহাত-শক্তি প্রয়োগ করেছিলাম। নিমেষে তুমি ফিরে এলে। কিন্তু তুমি অদৃশ্য। কেন, দীননাথ? কেন?'

'কারণ আমি ফোহাতে ব্যাপ্ত এই মুহূর্তে।' বলেছিলাম চিন্তার প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে।

'কিন্তু আমি যে চাই রক্তমাংসের দীননাথকে। ফোহাত-দীননাথকে নয়।'

'ফোহাত থেকেই সব সৃষ্টি।'

'তবে এসো, ফিরে এসো।'

'আসছি।'

প্রফেসর তারপর আমার জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম মূর্তি দেখেছিলেন। পরক্ষণেই রক্তমাংসের স্থূল মূর্তি।

॥ উপসংহার ॥

উপসংহারে জানাই— না, শেষ নেই। এ-কাহিনির এখনও শেষ হয়নি। সৃষ্টির যদি আদি আর অন্ত না-থাকে, এ কাহিনিরই বা থাকবে কেন? এটাও তো একটা সৃষ্টি!

'শুনিয়াছি অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলই ছিদ্র; আমি নিশ্চয় জানি, সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান।'—রবীন্দ্রনাথ/বিচিত্র প্রবন্ধ, আষাঢ়/রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬৩

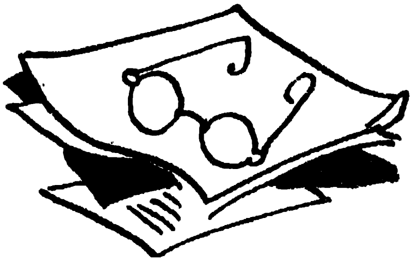

অমর আরক

মেঘঙ্কর মুখার্জি মেধাবী পুরুষ। তার ওপর মেলাই টাকা ব্যাঙ্কে। বাবা লক্ষ্মীর আরাধনা করে গেছেন সারাজীবন। সরস্বতীর সঙ্গে কারবার রাখেননি। দুই বোনের মধ্যে আদা-কাঁচকলার সম্পর্কটাকে উত্তমরূপে কাজে লাগিয়ে তিনি ক-অক্ষর গোমাংস হতে পারেন কিন্তু টাকার কুমির তো হয়েছিলেন।

সেইটাই ছিল তাঁর কাম্য। কামাও টাকা যেন তেন প্রকারেণ। সিদ্ধিদাতা গণেশ এ ব্যাপারে বিলক্ষণ হেল্‌প করেছিলেন তাঁকে।

মেঘঙ্করের এহেন পিতৃদেবের নাম মেঘনাদ মুখার্জি। আসমুদ্রহিমাচল এই ভারত উপমহাদেশে তিনি সংক্ষেপে 'মেমু' সাহেব নামে পরিচিত। আজকাল আমেরিকান স্টাইল ফলো করা হচ্ছে নাম-টামের ক্ষেত্রে। যাদের সঙ্গে ওঁর কাজ কারবার তাদের শতকরা পনেরো আনা মাফিয়া মেম্বার। কাটছাঁট করে এবং আদর করে তিনি তাদের 'মামে' বলে ডাকতেন। মুম্বাই-চেন্নাই-হিল্লি-দিল্লি সর্বত্র এই 'মামে'রা তাঁর বাহুবল এবং অর্থবল। তারা প্যারালাল গভর্নমেন্ট চালায় এই উপমহাদেশে। তাদের কলকাঠি নাড়ানোর ফলে গদি তৈরি হয়, গদি উলটে যায়।

সুধী পাঠক-পাঠিকারা অবশ্য প্রতিবার নির্বাচন-রঙ্গে পিঠ বাঁচিয়ে প্রহসনের অবসান ঘটিয়ে আসবার পর এদের উদ্দেশে পেন্নাম ঠোকেন। সুতরাং, তাঁদের কাছে নতুন করে কিছু বলার নেই। তাঁরা সব জানেন। 'মামে' আর 'মেমু' এঁদের পরিচিত। এঁদের নিয়ে আলোচনা করেন অবশ্য দরজার খিল তুলে দিয়ে— প্রকাশ্যে নয়। কারণ, কলিনামক অবতারের নেকনজর পড়েছে এই দেশে। বৃদ্ধ আরোহীকে ট্যাক্সিচালক পিটিয়ে মেরে ফেললে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করেন। যাক, কলিযুগ এসে গেল তা হলে।

কিন্তু এই যে এত সবজান্তা মানুষরা, এমনকী স্বয়ং কলি অবতারও একটিমাত্র পুরুষকে নিয়ে একদম মাথা ঘামাননি, কারণ, তাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়া মানেই সময়ের অপব্যবহার করা। সময় মানেই টাকা— এই যুগে, আর এই যুগে বসেই এই ব্যক্তি এন্তার সময় নষ্ট করে গেছে— কারণ, টাকার তো তার অভাব নেই, তার বাবা যে উপমহাদেশ-বিখ্যাত নররূপে সিদ্ধিদাতা মেঘনাদ মুখার্জি।

এহেন জনকের একমাত্র পুত্রসন্তান এই মেঘঙ্কর। মেঘনাদ তাকে 'লাইনে' আনবার চেষ্টা

করে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্রেফ সময় নষ্ট। যে-ছেলে ল্যাবোরেটরিতে শিশিবোতল কম্পিউটার-ফম্পিউটার নিয়ে খাওয়া-দাওয়া ঘুম-টুমের কথাও ভুলে যায়, যাকে 'টাইম ইজ মানি' এই মহামন্ত্র কিছুতেই তিনি শেখাতে পারলেন না, তাকে নিয়ে 'মেমু' সাহেব ভাবনাচিন্তা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু হাল ছাড়েনি সন্ত্রাস সেন— 'মেমু' সাহেবের রাইট হ্যান্ড। ভারত জোড়া সন্ত্রাসের ব্লুপ্রিন্ট এর মগজ থেকেই বেরোয় বলে মুগ্ধ ভক্ত চ্যালারা তাকে সন্ত্রাস নামেই ডাকে। কেউ কেউ বলে পূর্বজন্মে সন্ত্রাস নাকি জার্মানির গোয়েবলস ছিল। আত্মহত্যা করবার পর বাকি কাজ শেষ করবার মহৎ উদ্দেশ্যে 'মেমু' সাহেবের চ্যালা হয়ে এসেছে।

এই সন্ত্রাস কিন্তু পইপই করে 'মেমু' সাহেবকে বুঝিয়েছে, ছোঁড়াটাকে লাইনে আনুন। এখন থেকেই শিখিয়ে পড়িয়ে নিই। এতবড় 'এম্পায়ার' চালাতে গেলে সিংহাসন শূন্য রাখা যায় না। ও শুধু আঙুল তুলবে, আমি ব্রেন চালাব।

ব্রেন মানে ব্রেনগান, সুধী পাঠক এবং পাঠিকা নিশ্চয় তা বুঝেছেন। কুবাক্য সন্ত্রাস সেনের মুখ দিয়ে অপিচ বেরোয় না।

কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। শিশিবোতল কম্পিউটার-ফম্পিউটারের জগৎ থেকে কিছুতেই টেনে আনা গেল না মেঘঙ্করকে। মনের দুঃখে একদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন তার বকলমে ভারত অধিপতি পিতৃদেব শ্রীশ্রী মেঘনাদ মুখার্জি।

সন্ত্রাস সেন সেদিন স্বরূপ ধরল।

হানা দিল মেঘঙ্করের শিশিবোতল কম্পিউটার-ফম্পিউটারের কারখানায়।

কিন্তু সে কোথায়? মানে, মেঘঙ্কর কোথায়? গবেষণার কারখানা খালি। সন্ত্রাস সেন রাগের চোখে শিশিবোতল কম্পিউটার-ফম্পিউটার তছনছ করে লোক লাগিয়ে দিল মেঘঙ্করের খোঁজে। ব্রেনে ইলেকট্রিক শক লাগিয়ে ছোকরার পাগলামি ঘুচিয়ে ছাড়বে সে।

গোটা উপমহাদেশ যখন তোলপাড় মেঘঙ্করের খোঁজে, শান্তশিষ্ট (কিন্তু ল্যাজবিশিষ্ট নয়) মেঘঙ্কর তখন ভালমানুষের মতন মুখ করে বসে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের বৈজ্ঞানিক আখড়ায়।

প্রফেসর বললে, 'ওহে ছোকরা, তুমি পালিয়ে এসেও বাঁচবে না। ওরা ঠিক এখানে এসে পৌঁছোবে।'

কথা শেষ হতে না হতেই দড়াম করে দরজার দুটো পাল্লা খুলে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফের ঠিকরে গেল চৌকাঠের দিকে কিন্তু বন্ধ হতে পারল না— কেননা, সেখানে সবুট ডান পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সন্ত্রাস সেন, দ্য ব্ল্যাক মনস্টার— আইমিন, কালো দৈত্য। লাথি মেরেই দরজা খুলেছিল। লাথিটা নামানোর সময় আর পায়নি।

দাঁত কিড়মিড় করে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম আমি— মানে, এই কাহিনির লেখক দীননাথ নাথ, যে প্রফেসার নাটবল্টু চক্রের বডিগার্ড, তার আরাধনা কক্ষের কপাটে পদাঘাত! বিসমিল্লা! ওই পা আমি মুচড়ে অস্থিসন্ধি থেকে হিঁচড়ে টেনে আনবই।

কিন্তু কালো দানব সন্ত্রাস সেন সাদা হাসি হেসে কালো অটোমেটিকটা আমার দিকে তাগ করে বললে, 'তিষ্ঠ, অপোগণ্ড! নচেৎ ক্যান্সার অনিবার্য।'

ক্যান্সার। থমকে গেলাম। কর্কট রোগকে আমি ভয় পাই, যমকে পাই না।

সাড়ে সাতফুট লম্বা কৃষ্ণদৈত্য সন্ত্রাস সেন আকর্ণ হেসে বললে, 'রে রে পাপিষ্ঠ, এটা লেসার গান। বেরোয় ক্যান্সার রে।'

আমি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভালমানুষের ছেলের মতন মুখ করে মৌরি চিবোতে লাগল মেঘঙ্কর।

দাঁত কিড়মিড় করল এবার সন্ত্রাস সেন, 'গোবৎসর মতন জাবর কাটা থামাও।'

অমায়িক একখানা হাসি হাসল বটে মেঘঙ্কর, 'আমাকে বাছুর বলা হচ্ছে? তুমি কী? মোষ?'

'শাট আপ! নিকালো সিরাম!'

খুব ধীরেসুস্থে জিবের ডগা ছুঁচলো করে দাঁতের ফাঁক থেকে মৌরির মধ্যে আটকে থাকা একটি কাঠি বের করল মেঘঙ্কর। দু'আঙুলে ধরে টুকুস করে টোকা মেরে সন্ত্রাস সেনের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বললে ভারী মিষ্টি গলায়, 'মৃত্যুঞ্জয় সিরাম নেওয়ার মতন সমাজের অবস্থা আসুক— তারপর, ছাড়ব সিরাম।'

'দ্যাখো বাবা,' গলার সুর হঠাৎ অতিমার্জিত অতিশিষ্ট অতি বিনীত করে ফেলল আবলুস অতিকায়, 'মানুষ না-মরে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে, এটা কি তুমি চাও না?'

'চাই বলেই তো বানিয়েছি অমর হওয়ার সিরাম। কিন্তু সন্ত্রাসকাকু, অমানুষ অমর হয়ে থাকুক। এটা তো আমি চাই না।'

'অমানুষ কাকে বলছ হে ছোকরা?'

আচমকা বুঝি একটা হাইড্রোজেন বোমা ফেটে পড়ে আবলুস দৈত্যের গলায়।

'তোমাকে,' অতি সংক্ষিপ্ত অতি পরিশীলিত জবাব মেঘঙ্করের।

'ইউ...ইউ...ইউ...'

'জল খাও, বিষম লেগে যাবে যে।'

'ইউ ফুল... জানো আমার প্ল্যান?'

'জানি।'

'জানো?'

'কাউন্টার স্পাইং করে সব জেনেছি।'

'মা... মা... মানে?'

'সন্ত্রাসকাকু, তুমি যেমন স্যাটেলাইট-ক্যামেরা দিয়ে স্পেশাল রশ্মি কাজে লাগিয়ে, ইটপাথরের দেওয়াল ফুঁড়ে আমার শিশিবোতল কম্পিউটার-ফম্পিউটারের কারখানার প্রতিটি কাজ নজরে রেখেছিলে— আমিও তেমনি তোমারই স্যাটেলাইট রে-স্পাইয়ের ল্যাজ ধরে তোমার ভবিষ্যৎ প্ল্যানের নাড়ি নক্ষত্র জেনে বসে আছি।'

'তু-তু তুমি!'

'গোবৎস বললে যাকে সেই আমি। বোকা বোকা চেহারাখানা অনেক অ্যাকটিং-এর রেজাল্ট। ব্রেনে রয়েছে চোদ্দোপুরুষের জি-এফেক্ট— শুনেছি তাঁরা তো ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ— আমার বাবা ছাড়া।'

'পিতৃনিন্দা... মহর্ষি মেঘনাদের নিন্দা... কানে আঙুল দিতে হবে দেখছি।'

'সন্ত্রাসকাকু, তুমি একটা গবেট।'

'ও গড!'

"আল্লা, ক্রাইস্ট, কৃষ্ণ— সবাইকেই একবার করে ডেকে নাও। তোমার প্ল্যানখানা কিন্তু জবর। গোয়েবলস, হিটলার এই আবিষ্কার হাতে পেলে কেল্লা ফতে করে দিত— কাউকেই আত্মহত্যা করতে হত না। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে থাকত আজও সন্ত্রাস সেন— মূর্তিমান টেরর সন্ত্রাস সেন তুমিও তাই করতে চেয়েছিলে। বলব কি?'

সন্ত্রাস সেন এখন পাষাণমূর্তি, নিষ্করুণ কণ্ঠে চালিয়ে গেল সদ্য গোবৎস খেতাবে ভূষিত মেঘঙ্কর, 'তুমি সবচেয়ে কেলেঙ্কেরিয়াস ক্যারেক্টারের তোমার আশ্রিত এক মহাজনকে প্রাইম মিনিস্টার বানিয়ে তাকে মৃত্যুঞ্জয় সিরাম খাইয়ে দিতে— নিজেও খেতে যাতে এই পৃথিবীটার নতুন নামকরণ হত দু'দিনেই নরকগ্রহ। কী, ঠিক বলিনি?'

সন্ত্রাস সেনের দুই রক্তপ্রবাল চক্ষুতে এবার খুন নেচে উঠল। ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিকষ লেসার-গান নিয়ে ডান হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'দে সঞ্জীবনী সিরাম, এখুনি দে, বড্ড বেশি জেনে ফেলেছিস।'

কাঁচুমাচু মুখে মেঘঙ্কর বললে, 'একটা শিশিই তো পকেটে এনেছি, ফরমুলাটা রয়েছে মাথায়—'

'জানি... জানি... তোর ওই ঘ্যাঁচাকলের শিশি বোতল কম্পিউটার-ফম্পিউটারের কারখানায় ফরমুলা পাইনি। স্যাটেলাইট স্পাই খবর দিল, সেটা তুই পুড়িয়ে দিয়ে এসেছিস। কিন্তু একটা শিশি এনেছিস সঙ্গে। দে, দে, বলছি।'

উঠে দাঁড়াল মেঘঙ্কর, 'সার্চ করে দ্যাখো। নেই আমার কাছে।'

বাঁ হাতে লেসার গান উঠিয়ে সাঁ-সাঁ করে মেঘঙ্করের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে নিল সন্ত্রাস, 'আইব্বাস! এর মধ্যে ভ্যানিশ করে দিলি! লুকিয়ে রেখেছিস তো? খবর পাব এখুনি।'

বলেই একসেট হেডফোন প্যান্টের পকেট থেকে বের করে মাথার ওপর দিয়ে দুকানে লাগিয়ে নিল সন্ত্রাস সেন।

দু'চোখ কড়িকাঠের দিকে তুলে কানখাড়া করে কী যেন শুনতে লাগল। একটু একটু করে গোটা মুখটা বীভৎস উল্লাসের হাসিতে ভরে উঠল।

এই সময়ে একটা চান্স ছিল আমার স্পেশ্যাল টেকনিকে শূন্যে সমারসল্ট খেয়ে সন্ত্রাস সেনের হাত থেকে রে-গান ছিনিয়ে নিয়ে দরজা দিয়ে বোধহয় বেরিয়ে যাওয়ার কিন্তু সন্ত্রাস সেন ইজ সন্ত্রাস সেন। কিং অফ টেররিস্ট। রে-গানটাকে ঠিক তাগ করে রেখেছিল আমার দিকে, তাই ঝুঁকি নিলাম না।

শোনা শেষ হয়ে গেল। মোক্ষম খবর দিয়েছে স্যাটেলাইট স্পাই, মাথা গলিয়ে হেডফোন খুলে প্যান্টের পকেটে রাখতে রাখতে বললে বিকটদেহী টেররিস্ট ততোধিক বিকট হুংকারে, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।'

প্রফেসর প্রলয়ংকর নাটকটাকে যেমন মুগ্ধ দর্শকের মতন উপভোগ করছিলেন, সেইভাবেই উপভোগ করতে লাগলেম ভগবান তথাগতের মতন অর্ধনিমীলিত চাহনি

মেলে। মানুষ বটে একখানা। কখনও মহাদেবের ইন্দ্রনাচন, কখনও বুদ্ধদেবের শান্ত নয়ন।

চার চারটে দেওয়াল প্লাস কড়িকাঠ ফাটিয়ে চৌচির করে দেওয়ার মতন অমানুষিক হুংকার শুনে তিনি যেন দৈববাণীর সুরে বললেন, 'আমাকে কিছু বলা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ রে, বুড়ো, তোকেই বলা হচ্ছে।'

শুনেই আমার দু'পা নেচে উঠল, দু'হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেল। গোটা শরীরটায় হরমোন ক্ষরণ বেড়ে গেল। এইবার নির্ঘাত চিতাবাঘ লাফ দেব আমি— প্রাণ যায় যাক, ক্যান্সার হয় হোক।

অমনি প্রফেসর আমার দিকে তাকালেন। চকিতের জন্যে দুই চক্ষে দেখলাম হিমশীতল চাহনি। খুবই ইঙ্গিতময় চাহনি।

আমি ব্রেক কষলাম শরীরের সব ক'টা মাংসপেশিকে। এক্কেবারে স্ট্যাচু।

নিকষ দানোর দিকে তাকিয়ে মধুক্ষরা দৈবকণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'আমি কালা নই। আস্তে বলা হোক।'

'শিশিটা।'

'সঞ্জীবনী সুধা, আই মিন, অমর সিরাম?'

'পকেট থেকে বের করুন।'

'আমার পকেট থেকে?'

'মেঘঙ্কর ঘরে ঢুকেই আপনার পকেটে চালান করেছে। আমার স্যাটেলাইট স্পাই দেখে রেখেছে।'

ব্যাজার মুখে পাঞ্জাবির ডান পকেটে হাত ঢোকালেন প্রফেসর।

অমনি আবার ভীমনাদ, 'বাঁ পকেট... বাঁ পকেটে রেখেছেন।'

'ওহো... ভুলেই গেছিলাম,' বলতে বলতে বাঁ পকেটে হাত চালিয়ে একটা দু'আউন্সের শিশি বের করে আনলেন প্রফেসর। ভেতরে টলটল করছে জলের মতন একটা আরক। লেবেল নেই শিশিতে।

'টেবিলে রাখুন,' লুব্ধ চোখে শিশির দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে যেন দুন্দুভি বাজাল নিষাদরাজ সন্ত্রাস সেন।

টেবিলে শিশি রাখলেন প্রফেসর, নিতান্ত নাচার ভঙ্গিতে।

ডান হাত বাড়িয়ে ছোঁ মেরে শিশি তুলে নিয়ে চোখের সামনে তুলে অমর আরকের দিকে যখন লোভাতুর চোখে চেয়ে রয়েছে বদমাশের ধাড়ি সন্ত্রাস সেন, তখনও আমি একটা অ্যাটেম্পট নেব ঠিক করেছিলাম— 'ফ্লাইংডাক' ক্যারাটের মরণ-মার।

কিন্তু ধুরন্ধর বাঁ হাতের লেসার গানের নলচে আমার দিকেই স্থির লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে দেখে সাহস পেলাম না।

দাঁত দিয়ে কামড়ে সোলার ছিপিটা খুলে থু থু করে ফেলে দিল শয়তান শিরোমণি। পরমুহূর্তেই শিশি উপুড় করে দিল গলায়।

অমর আরক এখন তার পেটে।

আর ঠিক এই সময়ে অট্টহাস্য করে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

তালে তাল মিলিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল মেঘঙ্কর মুখার্জি।

এবার আমি হলাম হতভম্ব...

আবলুসদেহী হল কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

'এটা কি মশকরার সময়?'

নটরাজ নেচে নেচে মেঘঙ্কর বললে, 'বিষম মশকরা বিকট মশকরা— এমন মশকরা হেরি... জরাদেহী সন্ত্রাস সেনের আর নেইকো দেরি।'

'মা... মা... মা... মা...'

'নে। মানে অতি সরল, কুকীর্তির সম্রাট সন্ত্রাস সেন। প্রফেসর ডাবল গেম খেললেন তোমার সঙ্গে।'

'মা... মা... মা... মা...'

'নে। মানে, একটাই। প্রফেসরের ডান পকেটে ঠিক এই আরকেরই আর একশিশি নমুনা রয়েছে। দুটো শিশিতেই একই আরক, রেখেছিলেন দু'পকেটে।'

আবার চার দেওয়াল আর কড়িকাঠ চৌচির করা হুংকার ছাড়ল সন্ত্রাস সেন, 'ডান পকেটে?'

'অমর আরক।'

'যেটা খেলাম?'...

'আজ্ঞে না, তুমি খেলে জরা আরক।'

'সেটা আবার কী?'

'প্রফেসরের আবিষ্কার। এই সমাজের দুর্বৃত্ত আর দুষ্কৃতীদের জরা আরক পান করিয়ে তাদের অথর্ব বুড়ো শক্তিহীন করে দেওয়ার জন্যে বানিয়ে ছিলেন। আমি বানিয়ে ছিলাম অমর আরক। প্রফেসর নিষেধ করেছিলেন, অমর আরক এখনও এই ঘোর কলিকালে বাজারে ছাড়বার সময় হয়নি— ছাড়া যাক বরং জরা আরক। বাঃ, খুব কুইক রেজাল্ট হচ্ছে তো।' সহর্ষে শেষ করল মেঘঙ্কর।

রেজাল্ট দেখে আমি চমকে গেলাম। দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছে কালো দৈত্য সন্ত্রাস সেন। চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে... হাত থরথর করে কাঁপছে... রে-গান খসে পড়ল মুঠো থেকে... লোলচর্ম গলকম্বলের মতন ঝুলতে লাগল চিবুকের তলায়।

তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল। ওহে সন্ত্রাস, কানে কম শুনছ?'

চিঁচিঁ করে সন্ত্রাস বললে, 'খুব কম শুনছি।'

'তা হলে কানের কাছে গলা ফাটিয়ে বলে যাচ্ছি। শুনে যাও,' টেবিল ছেড়ে উঠে এসে কম্পমান সন্ত্রাসের কানের পরদা ফাটিয়ে বলে গেলেন প্রফেসর, 'আমার বাঁ পকেটে ছিল দুটো শিশি— একটা অমর আরকের আর একটা জরা আরকের। হাত সাফাই করে তোমার মতন নরাধমকে জরা আরক খাইয়েছি। দীননাথ, লোফারটাকে লাথি মেরে ঘর থেকে বের করে দাও।'

আমি তাই করলাম।

ক্রিস্টাল কটেজ

আশ্চর্য এই কাহিনির শুরু দুই বৈজ্ঞানিকের সংঘর্ষ থেকে। একজনের নাম ডক্টর বুম্বা; আর একজন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। ডক্টর বুম্বা ভাল চাকরি করছিলেন আমেরিকায়। সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। প্রথম যেদিন দেখেছিলাম ডক্টর বুম্বাকে, খটকা লেগেছিল আমার। কুচকুচে কালো হলে কী হবে, ছোটখাটো একটা দৈত্য বলা চলে। দাঁত খিচিয়ে সব সময়ে সে কী হাসি। কালো হাঁড়ির গায়ে যেন সাদা চুনকাম করা দাঁত। দেখলে গা জ্বলে যায়। প্রথম থেকেই এই অতি বিনয় আমার ভাল লাগেনি। কোমর বেঁকিয়ে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করাটাও কী রকম যেন লেগেছিল। কপট নম্বর ওয়ান।

ওঁর ডিগ্রি ছিল স্থাপত্যবিদ্যায়। গত দু'বছর ধরে সিটি প্ল্যানিং করে গেছেন। খান দুয়েক পুরস্কারও পেয়েছেন। স্থাপত্য-তত্ত্বে একটা নতুন শব্দ সৃষ্টি করে এনেছেন : বাংলায় যাকে বলা যায়, 'খোলা জগৎ'।

প্রফেসার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার মতলবটা কী বলুন তো? এত পুরস্কার, এত খ্যাতি, এত প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দিয়ে ইন্ডিয়ায় মরতে এলেন কেন?'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন ডক্টর বুম্বা। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরময় পায়চারি করেছিলেন মিনিট খানেক। দরজার কাছে গিয়ে বলেছিলেন, 'আপনার এই ঘরে দম আটকে আসছে।' বলেই, বোঁ করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

প্রফেসার গোল গোল চোখে তাঁর প্রস্থানপথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'বদ্ধ পাগল!'

হপ্তা দুয়েক নিরুদ্দেশ থাকার পর হঠাৎ তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল। কাজের কথা বলতেই এসেছিলেন প্রফেসরের কাছে। অমুক বহুতল বাড়ির চোদ্দোতলায় যে প্রদর্শনী চলছে, প্রফেসর কি তা দেখতে যাবেন?

প্রফেসর সবিনয়ে বললেন, 'কীসের এগজিবিশন?'

'এগজিবিশনটার নাম ফ্যানটাসিয়া।'

'অদ্ভুত নাম।'

'গেলে আরও অদ্ভুত হবেন।'

এই বলে ডক্টর বুম্বা দাঁত বের করে চেয়ে রইলেন প্রফেসরের চোখের দিকে। প্রফেসরও

হাসি হাসি মুখে চেয়ে রইলেন ডক্টর বুম্বার চোখের দিকে। চারচোখে কী যে কথা হয়ে গেল ঈশ্বর জানেন, উৎকট হাসিটাকে আরও প্রকট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ডক্টর বুম্বা বলে গেলেন আগের বারের মতন, 'আপনার এই ঘরে দম আটকে আসছে।'

মানুষ দৈত্য বেরিয়ে যেতেই দুম করে ফেটে পড়লেন প্রফেসর।

'স্পাই কোথাকার!'

'স্পাই!' অবাক হতেই হল আমাকে, 'কাদের স্পাই?'

'ইনভেনশন ইন্টারন্যাশনালের স্পাই।'

'সেটা আবার কী বস্তু?'

দুই চোখে বিষম অনুকম্পা বর্ষণ করে গেলেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'দেখো দীননাথ, মাঝে মাঝে মনে হয়, এই পৃথিবীর সব চাইতে কম-জানা লোক তুমি। ইনভেনশন ইন্টারন্যাশনালের নাম শোনোনি, অন্যের আবিষ্কার চুরি করার জন্যে এই কোম্পানির জন্ম। এ-যুগে পৃথিবী-কাঁপানো আবিষ্কারগুলো হচ্ছে কোথায়? ইউনিভার্সিটি অথবা গভর্নমেন্ট ল্যাবোরেটরিতে নিশ্চয় নয়। হচ্ছে বড় বড় কোম্পানির ল্যাবোরেটরিতে। তারা ব্যাবসা বাড়ানোর জন্যে ওয়ার্ল্ড ব্রেন-দের কিনে নিয়ে খাটাচ্ছে— জলের মতন টাকা খরচ করে সেই আবিষ্কার যখন বাজারে ছাড়ছে, ফুলে লাল হয়ে যাচ্ছে। ইনভেনশন ইন্টারন্যাশনালের কাজ হচ্ছে, ইন্ডাসট্রিয়াল স্পাইগিরি করা। শিল্পজগতের গুপ্তচর। কোথায় কোন যুগান্তকারী গবেষণা চলছে ঠিক খবর রাখে। তারপর তার কাগজপত্র গাপ করে চড়া দামে বেচে দেয়।'

হাঁ হয়ে গেলাম আমি। তারপর, হাঁ বন্ধ করলাম। বললাম, 'আপনার পেছনে ঘুরঘুর করার কারণ?'

'আমি যে অদ্ভুত আবিষ্কারটা করেছি, কিন্তু কাকপক্ষীকেও জানাইনি, এমনকী তোমাকেও বলিনি, সেটা হাতানো। তারপর যুদ্ধপাগল দেশের মিলিটারি কর্তাদের কাছে বেচে দেওয়া। ব্যস, শুরু হয়ে যাবে অহিংসা যুদ্ধ।'

'অহিংসা যুদ্ধ!' আবার হাঁ হতে যাচ্ছিলাম, টপ করে হাঁ বন্ধ করে ফেললাম।

'শত্রুপক্ষের একটা সৈন্যও মরবে না, অথচ তারা আর যুদ্ধ করতে পারবে না। তাদের দেখাই যাবে না অথচ অদৃশ্য হয়ে থেকে বন্দুক চালাতেও পারবে না। তাদের কথাও শোনা যাবে না—'

এবার আর হাঁ বন্ধ করতে পারলাম না।

প্রফেসর বলেই চললেন, 'যুদ্ধের খরচ কত কমে যাবে বলো তো? রক্তপাতও বন্ধ হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে গোটা পৃথিবীতে অখণ্ড শান্তি নেমে আসবে। কিন্তু এর একটা ফ্যাচাং আছে বলে আবিষ্কারটার কথা কাউকে বলছি না।'

'কী ফ্যাচাং?'

'সব নতুন অস্ত্রই তো একসময়ে বদলোকের হাতে চলে আসে। আমার এই অহিংসা অস্ত্রও একদিন না একদিন বাজে লোকেদের হাতে হাতে ঘুরবে। যাকে-তাকে অদৃশ্য নিকেতনে পাঠিয়ে দেবে! ধরো, আজ যদি প্রাইম মিনিস্টারকে ফট করে কেউ অহিংসা অস্ত্র মারে—'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'অস্ত্রটা কি খুব ভারী?'

'আরে না এই তো রয়েছে আমার সামনে,' টেবিলের ওপর একটা নীল মখমল মোড়া ফাউন্টেন পেনের সুদৃশ্য বাক্স দেখালেন প্রফেসর। আমি হাত বাড়িয়েছিলাম— এমন হাঁ হাঁ করলেন যে চমকে উঠলাম। হাত সরিয়ে নিলাম।

উনি নিজেই কোলে তুলে নিলেন নীল মখমলের বাক্স। ক্লিপ টিপে ডালা খুললেন। দেখলাম, ভেতরে নীল মখমলের গদিতে পাশাপাশি রয়েছে একটা ঝরনা কলম, আর একটা ডটপেন। দুটোই যেন সোনা দিয়ে তৈরি। দেখলেই হাতে নিতে ইচ্ছে হয়।

প্রফেসর তর্জনীর ডগা দিয়ে ঝরনা কলমটা দেখিয়ে বললেন, 'এটার রশ্মি বর্ষণ করলে অদৃশ্য করে দেওয়া যায়।' ডটপেনে আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, 'এটা দিয়ে ফের দৃশ্যমান করে তোলা যায়।'

'মাই গড!' তবে আর ভয় কী? তুলে দিন ভারত সরকারের হাতে।'

'তারপর মরি আর কী,' বলে অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করলেন। ঝরনা কলমটা হাতে তুলে নিলেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে আচমকা আমার দিকে টিপ করে পেছনের বোতাম টিপে দিলেন।

কিছুই দেখতে পেলাম না। রশ্মি-ফশ্মি কিছুই বেরোল না কলম থেকে।

প্রফেসর বললেন, 'দীননাথ, আমি আর তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়িয়ে আছ তো?'

রেগে টং হয়ে গেলাম গাড়োয়ানি ইয়ারকির জন্যে। গলা ফাটিয়ে বললাম, 'আ-ছি'।

প্রফেসর বললেন, 'নিশ্চয় জবাব দিয়েছ— কিন্তু আমি শুনতে পেলাম না। এক কাজ করো দীননাথ, খুব জোরে আমার গলা টিপে দাও। টিপেছ?'

গলা টিপতে কি পারি? রেগে মেগে চিবুক ধরে নেড়ে দিয়েছিলাম। উনি ফের বললেন, 'নিশ্চয় টিপেছ, কিন্তু আমি টের পাচ্ছি না। তা হলেই দেখো, তুমি বেঁচে রইলে, কিন্তু তোমার শক্তি কেড়ে নিলাম। এইভাবেই সবাই বেঁচে থাকবে। খিদেও পাবে না, দেশের খাদ্য সমস্যাও মিটে যাবে।' এইবার ভীষণ ভয় পেলাম। চিৎকার করে বললাম, 'প্রফেসর, আমাকে দৃশ্যমান করুন।'

চেঁচিয়ে ছিলাম প্রফেসরের কানের কাছে মুখ এনে। কানের পরদা ফেটে যাওয়া উচিত ছিল— কিন্তু নির্বিকার রইলেন প্রফেসর। আপন মনে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'খুব ভাল অস্ত্র... খুব ভাল অস্ত্র... খরচও খুব কম। কী করে এই কাণ্ড করেছি জানো? তোমাকে বলতে বাধা নেই— তোমার কথা তো এখন কেউ শুনতে পাবে না। জিন পালটে গেছে তোমার শরীরে, প্রত্যেকটা কোষের বংশাণু সংকেত পালটে গেছে— ফলে তুমি অদৃশ্য হয়ে গেছ। আইডিয়াটা কীভাবে মাথায় এসেছিল শুনে রাখো। এডিশন সাহেব ভূত নিয়ে গবেষণা করতে করতে মারা যান, জানো তো? তাঁর কাগজপত্তরও হারিয়ে যায়। ভূত দেখার যন্ত্র আসলে কী করে? ভূতের জিন পালটে দেয়— তখন তাকে দেখা যায়। আমি করলাম উলটো, মানুষের জিন দিলাম পালটে। এখন তুমি হয়ে গেলে, মানুষভূত। কী হল দীননাথ? ভয় পেয়েছ?'

বিলক্ষণ ভয় পেয়েছিলাম। ডটপেনটা তোলবার চেষ্টা করছিলাম। প্রফেসর বলেছিলেন, ডটপেনের রশ্মিবর্ষণ করলে দৃশ্যমান হওয়া যাবে। কিন্তু কিছুতেই তুলতে পারলাম না ডটপেন। আঙুল বসে গেল মখমলের গদিতে।

প্রফেসর ইতি-উতি দেখতে দেখতে বললেন, 'নিশ্চয় হাঁকপাঁক করছ। বসো ওই চেয়ারটায়।' বলে, আঙুল তুলে দেখালেন একটা চেয়ার। বসলাম সেখানে। ডট পেন তুলে আমার দিকে তাগ করে বোতাম টিপলেন প্রফেসর। কিছুই বুঝলাম না।

প্রফেসর কিন্তু একগাল হেসে বললেন, 'আহা রে! মুখ এক্কেবারে শুকিয়ে গেছে। কথা বলো... কথা বলো... এবার আমি শুনতে পাব দেখতে যখন পাচ্ছি...'

কথা বলবার অবস্থা থাকলে তো কথা বলব। আগে দেখলাম, প্রফেসর সত্যিই আমাকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা। দেখলাম, হ্যাঁ পাচ্ছেন। আমার চোখে চোখ রেখেছেন। তখন আমিও খুব গম্ভীর হয়ে গেলাম।

বললাম, 'ডক্টর বুম্বার ফ্যানটাসিয়া এগজিবিশনে যাবেন না?' স্পষ্ট শুনতে পেলেন প্রফেসর। একগাল হেসে বললেন, 'নিশ্চয় যাব নিশ্চয় যাব... বাছাধনের জারিজুরি ভাঙবার জন্যেই যাব। বড্ড অহংকার বেড়েছে। দু'-দুবার আমার এই ঘরখানা নিয়ে ঠুকে গেল— দম আটকে আসে আমার ঘরে। খোলাজগৎ থিয়োরি কপচে খুব বারফট্টাই মেরে এসেছে আমেরিকায়। দেখা যাক, খোলা-জগৎ বলতে ও কী বোঝাচ্ছে।'

জলের মতন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ডক্টর বুম্বা।

'ক্লসট্রোফোবিয়া! ক্লসট্রোফোবিয়া! ক্লসট্রোফোবিয়া!' এই বলে প্রথমে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়েছিলেন।

এইভাবেই শুরু হয়েছিল তাঁর বক্তৃতা। আমি আর প্রফেসর চোদ্দোতলা অট্টালিকাটার চোদ্দোতলায় উঠেছিলাম লিফটায় চেপে। লিফট থেকে নেমেই দেখেছিলাম প্রান্তরের মতন একটা পেল্লায় ছাদ। ছাদের ঠিক মাঝখানে অদ্ভুত একটা জিনিস। মৌচাকের একটা কোষকে বহুগুণ বাড়িয়ে নিলে যা হয়, ঠিক তাই। হালকা নীল রঙের। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে। ভিতরে কী আছে, বাইরে থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। দেখতে কাচের মতন হলেও, তা কাচ নয়, কাচের মতন স্বচ্ছ নয়, এমনকী প্লাস্টিকও নয়।

অদ্ভুত এই মৌচাক-কোষের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডক্টর বুম্বা। হালকা নীল পটভূমিকায় তাঁর কালো দৈত্যাকার বপু প্রকৃতই বেমানান লাগছিল। আমাদের দেখেই প্রায় আভূমি প্রণত হয়ে তিনি বললেন, 'আসা হোক, আসা হোক— ফ্যানটাসিয়া মিউজিয়াম আপনাদের পায়ের ধুলোয় আজ ধন্য হোক।'

বৈষ্ণব-বিনয় দেখেই আমার প্রবল সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ নিশ্চয় প্রফেসরেরও হয়েছিল। আর যাই হোক, উনি কাছাখোলা মানুষ নন। বিশেষ করে, ডক্টর বুম্বা যে স্পাই এই খবর যখন জেনে গেছেন।

কিন্তু উনি অ্যাকটিং জানেন বটে। এমন একখানা আপ্যায়িত হবার ভান করলেন যেন গলে জল হয়ে যাচ্ছেন।

দরজা-ফরজার বালাই কোথাও নেই। একটা ফোকর ছিল ডক্টর বুম্বার ঠিক পেছনে। ভদ্রলোক সেই ফোকর দিয়ে সুড়ুৎ করে ভেতরে প্রবিষ্ট হলেন। আমরা দু'জন তাঁর পেছন পেছন ঢুকলাম।

কিন্তু ডক্টর বুম্বাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। ঘরও নেই। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ফাঁকা

ছাদে। প্রান্তরের মতন ছাদের দূরে দূরে খাটো পাঁচিল আর ডিশ-অ্যান্টেনা, কিন্তু এইমাত্র মৌচাকের কোষ-আকৃতি যে বিচিত্র জিনিসটার মধ্যে ঢুকলাম, তার ছাদ দেওয়াল কিচ্ছুই নেই। ভোজবাজির মতন মিলিয়ে গেছে। হালকা নীল আকাশ দেখতে পাচ্ছি, চিল উড়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি— কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না ডক্টর বুম্বা নামক মানুষ-দৈত্য আর তাঁর ফ্যানটাসিয়া মিউজিয়ামকে...

প্রফেসর আমার হাত খামচে ধরলেন, নইলে এগিয়ে যেতাম। হেঁকে বললেন, 'ডক্টর বু-ম্বা।'

প্রথমে প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে এল। আমরা যে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে নেই সেটাই তার প্রমাণ। রয়েছি বদ্ধ জায়গায়। দেওয়ালে দেওয়ালে আর ছাদে ছাদে ধাক্কা এক ডাক বহু ডাক হয়ে ফিরে এল আমাদের কাছে... কিন্তু সবই তো ফাঁকা... ফাঁকা ছাদ!

আচমকা আমাদের সামনেই দৃশ্যমান হলেন ডক্টর। মুখে সেই বিচ্ছিরি হাসি। বললেন হেসে হেসে, 'এই তো আমি!'

'অদৃশ্য হয়ে গেলেন কীভাবে?' প্রফেসরের গলায় সন্দেহ। তাঁর অহিংস-অস্ত্রের ফরমুলা মেরে দেননি তো ডক্টর বুম্বা দ্য স্পাই?

ডক্টর বুম্বা কিন্তু বলেছিলেন, 'আরে! আরে! অদৃশ্য করার ম্যাজিক কি আমি জানি— ওটা জানেন আপনি। আমি জানি শুধু স্থাপত্য-কৌশল জ্যামিতির ভোজবাজি। তাই এই ঘরের এক-এক জায়গায় অদৃশ্য হতে হয়— আবার আগের জায়গায় ফিরে এলেই দৃশ্যমান হওয়া যায়। এই দেখুন...'

বলেই, এক-পা পেছনে গেলেন মানুষ-দৈত্য এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই দৃশ্যমান হলেন আগের জায়গায়। এবং, একপ্রস্থ অট্টহাসির পর চিৎকার করে বলে গেলেন, 'ক্লসট্রোফোবিয়া। ক্লসট্রোফোবিয়া। ক্লসট্রোফোবিয়া।'

পাগল ছাড়া এভাবে কেউ হাঁক পাড়ে?

আমি শক্ত হয়ে গেছিলাম। ডক্টর বুম্বা যেন তা বুঝলেন। বললেন, 'ভয়ং মা কুরু। এই দেখুন ফিরে আসছে অবাক-ঘর।'

বলেই, ফস করে লাইটার জ্বাললেন, মুখে চুরুট কামড়ে ধরলেন এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করে ধোঁয়া ছেড়ে গেলেন।

অমনি যেন ভোরের সাদা কুয়াশা আবির্ভূত হল চারধারে। সেই কুয়াশা চোখের পলক ফেলবার আগেই ছড়িয়ে গেল, কিন্তু আটকে গেল একটু গিয়েই। ছাদ, দেওয়াল এখন সব দেখা যাচ্ছে। কুয়াশার দৌলতে। মৌচাক-কোষের ভেতর থেকে দেওয়াল আর ছাদ দেখছি এখন। কিন্তু তা অতীব অস্বচ্ছ। নেই বললেই চলে। পাতলা ধোঁয়া মিলিয়ে গেলে ঘরের বহিরাবরণ ফের অদৃশ্য হয়ে যাবে।

দুই চক্ষুর কৃত্রিম বিস্ফারণ ঘটিয়ে প্রফেসর বললেন, 'তোবা! তোবা! আচ্ছা উপাদান আবিষ্কার করেছেন তো। ইট আর সিমেন্টের এমন গুণ তো নেই। বাইরে থেকে হালকা নীল দেখায়— ভেতরে এলে তা দেখাই যায় না।'

'তখন খোলা দুনিয়া দেখা যায়,' দুই কাঁধ নাচিয়ে নাচিয়ে ডগমগ গলায় বললেন ডক্টর

বুম্বা, 'খোলা দুনিয়া তত্ত্বের মানে এবার বুঝলেন? এ-ঘরে বাস করলে মানুষ আর বদ্ধস্থানাতঙ্ক রোগে ভুগবে না।'

'ক্লসট্রোফোবিয়া।' খুব আস্তে বললেন, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

'দ্যাটস রাইট! ক্লসট্রোফোবিয়া! বদ্ধস্থানাতঙ্ক! দুনিয়ার প্রতিটি ঘর-প্রিয় মানুষ অল্প বিস্তর মাত্রায় এই রোগে আক্রান্ত হয়ে রয়েছে। ক্লসট্রোফোবিয়া! আধুনিক রোগেদের অধিকাংশ সৃষ্টি হয়ে চলেছে ইট-কাঠ-সিমেন্টের তৈরি মান্ধাতার আমলের স্থাপত্য কৌশলে তৈরি দালান-বাড়ির মধ্যে থাকবার প্রবণতার ফলে! ক্লসট্রোফোবিয়া! আবদ্ধ জায়গায় বাস করার ফলে মনের জগতে আতঙ্ক গড়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন বদ্ধ কারাগারে রয়েছি। এই থেকেই কারুর স্নায়ুরোগ ঘটছে, কারুর হার্ট খারাপ হচ্ছে, কেউ নাছোড়বান্দা ব্যাধিতে ভুগছে— ক্যান্সার পর্যন্ত হচ্ছে। মনের ওপর চাপ সৃষ্টির পালটা দাওয়াই 'খোলা দুনিয়া' তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি ঘরদোর— দেওয়াল আর ছাদ যেখানে থেকেও থাকবে না, খোলা দুনিয়ার মধ্যে স্বচ্ছন্দে থাকা যাবে। অথচ মাথায় জল পড়বে না, গায়ে ঝড় লাগবে না। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, আপনি নিশ্চয় উজবুক নন?'

অম্লানবদনে প্রফেসর বললে, 'না, আমি উজবুক নই।'

'তা হলেই জানেন, মানুষের মনোগত অবস্থার সঙ্গে অষ্টপ্রহর সম্পর্ক বজার রেখে চলেছে বাসস্থানের ত্রিমাত্রিক আয়তন— জ্যামিতির দিক দিয়ে, ঘন ধারকত্বের দিক দিয়ে, স্বচ্ছতার দিক দিয়ে। বুঝলেন? বাড়ি বানাতে গিয়ে আমরা শুধু নজর দিই ইট-কংক্রিটের মজবুতির দিকে— কখনও ভাবি না মানুষের মনের জগতে তা কতখানি বদ্ধতা সৃষ্টি করবে। রাইট? তাই আমি বৈজ্ঞানিকের চোখে এমন সমাধানের স্বপ্ন দেখেছিলাম যা পৃথিবীর মানুষকে মানবিক দিক দিয়ে সুস্থ রাখবে। সমাধান সূত্রটা খুব সরল। প্রফেসর, এই সমাধান প্রকৃতি স্বয়ং বানিয়ে রেখেছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে— প্রকৃতির সন্তান হয়েও আমরা সেই অনুকরণে এতদিন নিবাস রচনা করতে শিখিনি। প্রাকৃতিক জ্যামিতি থাকবে আমাদের গড়া ঘরদোরেও। প্রথমেই যেটা মাথায় এল তা ক্রিস্টাল। বুঝলেন? ক্রিস্টালের জ্যামিতি দেখুন, ঠিক যেন খোলা দুনিয়ার ছাপ ফেলছে মনের মধ্যে, রাইট?'

যন্ত্রচালিতের মতন সায় দিলেন প্রফেসর, 'রাইট।'

'কিন্তু ক্রিস্টাল একা তো ক্লসট্রোফোবিয়া কাটিয়ে উঠতে পারবে না। ক্রিস্টালকে হতে হবে স্বচ্ছ অথবা অর্ধ স্বচ্ছ। যে পরিবেশে মানুষ থাকবে, সেই পরিবেশের সীমিত ধারণা যেন মানুষের মধ্যে জাগাতে পারে। কাচ হলে চলবে কি? কিন্তু কাচ তো ভঙ্গুর আর দামি। তখন মাথায় এল নিরেট জলের সলিউশন।'

'নিরেট জল!' আহাম্মকের মতন উচ্চারণ করলেন প্রফেসর।

'ইয়েস প্রফেসর, সলিড ওয়াটার। যার চাইতে সত্য আর কিছু হয় না— অথচ ইস্পাতের চেয়েও মজবুত।'

'সে তো গরমে গলে যাবে?'

'বরফ নয়... বরফ নয়... হে হে... কী উজবুক আপনি... জলের পরমাণুকে ছ'রকম ভাবে জমিয়ে নিরেট করা যায়। সোলিনয়েড চুম্বক দিয়ে শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে,

সেই ফিল্ডের ফোর্স দিয়ে পরমাণুদের যদি নকশায় ফেলা যায় তা হলে গায়ে গায়ে এঁটে বসে যায়... টয় বক্সের ব্লক যেভাবে থাকে... একটা ব্যাপার শুধু খেয়াল রাখতে হয়।'

'কী ব্যাপার।' প্রফেসর গোবেচারা গোরুর মতন চেয়ে রইলেন।

'পরমাণুদের কাইনেটিক এনার্জি... মানে, গাতীয় শক্তিকে সেই সময়ের জন্যে সরিয়ে রাখতে হয়। নইলে তারা ফিরে যাবে আগের নকশায়।'

'বুঝলাম না। কাইনেটিক এনার্জিকে দূরে সরিয়ে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়।'

'দূর বোকা।' কাঁচা গালাগালি দিতে দিতে নেমে এলেন ডক্টর বুম্বা, 'সিক্রেটটা এই বক্সের মধ্যে লিখে রেখেছি।' বলে, বাঁ হাতে চুরুট ধরে ডান হাতে একটা লাল মখমলের চৌকো বাক্স পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে ধরলেন ডক্টর বুম্বা, 'আসুন, পালটাপালটি করে নিই।'

'কীসের সঙ্গে পালটাপালটি?' আমতা আমতা করছেন প্রফেসর।

'কী প্রকাণ্ড ইডিয়েট আপনি!' ডক্টর বুম্বার কালো বদন একটু লাল হল। প্রচণ্ড ক্রোধে দু'হাত বাড়িয়ে ধরেছেন সামনে, 'ন্যাকা, না, বোকা— কী আপনি? আপনার অহিংসা অস্ত্রের ফরমুলা আমাকে দিন— আমার নিরেট জলের ফরমুলা আপনি নিন!'

এতক্ষণে যেন গোটা ব্যাপারটা জলের মতন সরল হয়ে গেল প্রফেসরের কাছে। উজ্জ্বল হল দুই চক্ষু। বললেন সপ্রতিভ স্বরে, 'কিন্তু আপনি যদি পেছিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান আমার ফরমুলা হাতিয়ে নিয়ে?'

'হাঃ হাঃ হাঃ। ওটাও জ্যামিতির ভেলকি। মাঝে মাঝে কাছের মানুষকে কাছে রেখেও মনের চোখ থেকে উড়িয়ে দিতে হয়— নির্জনতা পিয়াসীরা যা চান। এ-ঘরেও সেইরকম পয়েন্ট আছে। আমি সেই পয়েন্টে দাঁড়ালে অদৃশ্য হব আপনাদের চোখে, কিন্তু থাকব সেখানেই। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবেন। এই পেছিয়ে গেলাম। হাত বাড়ান।'

অদৃশ্য হয়ে গেলেন ডক্টর বুম্বা।

প্রফেসর আমার হাত ধরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ, যেন বাচ্চা ছেলে আমি। এবার বুঝলাম কেন...।

প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান মেরে পেছন ফিরেই বেরিয়ে এলেন আজব ঘরের ফোকরের মতন দরজা দিয়ে— পাতলা ধোঁয়ার কল্যাণে এখন যা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। ধোঁয়া না থাকলে দেখাই যেত না।

অর্থাৎ, ক্রিস্টাল-কারগারে বন্দি হয়ে যেতাম— পথ খুঁজে পেতাম না। বদমাশ ডক্টর বুম্বা হয়তো বেরোনোর পথও বন্ধ করে দিতেন...।

কিন্তু প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যে কতখানি ঘুঘু, সেই দিন সেই মুহূর্তে মুহূর্তের সিদ্ধান্তে তা দেখিয়ে দিলেন...।

বেগে বেরিয়ে এলেন আমাকে নিয়ে... পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়ালেন... দেখলাম, ফের দৃশ্যমান হয়েছেন শয়তান স্পাই ডক্টর বুম্বা... ছুটে আসছেন তাঁর দানব-দেহ আমাদের ওপর নিক্ষেপ করবেন বলে।

ঝুটমুট সময় নষ্ট করেননি প্রফেসর। দক্ষ কম্যান্ডোর কায়দায় বুকপকেট থেকে ঝরনাকলম টেনে নিয়ে তাগ করলেন...

অদৃশ্য হয়ে গেলেন ডক্টর বুম্বা...

অদৃশ্য হয়ে গেল ফ্যানট্যাসিয়া কক্ষ...

লিফটে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'অদৃশ্য ঘরে লোকে তো ধাক্কা খাবে?'

'আস্ত বোকা। কেউ ধাক্কা খাবে না। নিজে অদৃশ্য হয়ে দেখলে না কী হল? তোমার ছোঁয়া আমি টের পাইনি— ডক্টর রাসকেলের অবস্থাও হবে তাই। চিরকাল অদৃশ্য হয়ে ঘুরে বেড়াবে। আমার বাড়িতে এসে ডটপেন বাগিয়ে ধরতেও পারবে না, নিজের দিকে রশ্মি বর্ষণ করে ফের দৃশ্যমান হতেও পারবে না। একটা আপদ গেল পৃথিবী থেকে।'

'সেই সঙ্গে 'নিরেট জল'-এর ফরমুলাও হারিয়ে গেল। ক্রিস্টাল কারাগারও লোকের চোখ থেকে হারিয়ে গেল।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন প্রফেসর, 'যাক গে। ব্যাপারটা যখন জেনে নিয়েছি, আমি বানিয়ে নেব। বারুইপুরে খানিকটা জমি কিনেছ বলছিলে না? ওখানেই তোমাকে বানিয়ে দেব ক্রিস্টাল কটেজ— নিখরচায়।'

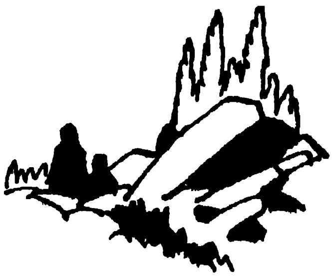

ডক্টর ফুটুনি

ডক্টর ফুটুনি মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললেন, 'প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, আপনার ব্রেন দিয়ে শুধু ঘি-পোয়া ভাজা যায়, তার বেশি কিছু হয় না।'

অসম্ভব চটিতং প্রফেসর রেগে গুম হয়ে রইলেন এবং কটমট করে চেয়ে রইলেন। ডক্টর ফুটুনি আরও মিষ্টি গলায় বললেন, 'চামচিকেদের দিয়ে গবেষণা করেই আজ আমি চামচিকে-বিমান বানাতে পেরেছি, যা কিনা শত্রুপক্ষের কামানের গোলা আর লেজার-রশ্মির মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে গিয়ে কাম ফতে করে আবার ফিরে আসতে পারবে। আপনি কী পারেন?'

প্রফেসর বললেন, 'আপনাকে উল্লু বানাতে পারি, বিল্লি বানাতে পারি, খোকা বানিয়ে রাধাবল্লভীও খাওয়াতে পারি।'

'দিল্লি কা লাড্ডুও খাওয়াতে পারেন,' বলে সে কী হাসি ডক্টর ফুটুনির।

ছোট্ট দ্বীপ ট্রেজার আয়ল্যান্ডের সোনালি বালির ওপর দিয়ে, সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে, সেই হাসি নাচতে নাচতে মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে। কানের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল কেবল সমুদ্র গর্জন।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে প্রফেসর কিন্তু বেড়াতে আসেননি। মতলব একটা ছিল, সেটা আমার কাছেও ভাঙেননি। শুধু বলেছিলেন, 'দীননাথ, ভেলকি যদি দেখতে চাও, চলো আমার সঙ্গে।'

কিন্তু সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে এই আপদটা এসে জুটবেন, তা তো ভাবিনি। লোকে যে কেন এঁর নাম দিয়েছেন ডক্টর ফুটুনি, হাড়ে হাড়ে এখন তা বুঝছি। হ্যাঁ, বড় বৈজ্ঞানিক, তা মানছি। কিন্তু বোলচাল শুনে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত যে তেতে উঠল। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া না-করলেই কি নয়! প্রতিভা থাকলেই কি একটু পাগল-পাগল হতে হবে?

প্রফেসরেরই বা কী দরকার ছিল গায়ে পড়ে আলাপ করতে যাওয়ার। খড়ের মতো শুকনো চুল উড়িয়ে ডক্টর ফুটুনিকে আসতে দেখেই একগাল হেসে উনি বলেছিলেন, 'এই যে ডক্টর, আপনার চামচিকেদের খবর কী?'

ডক্টর ফুটুনির শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে ঘাড় গুঁজে গবেষণা করার ফলে। ঝুঁকে চলছিলেন সেই কারণেই। প্রফেসরের খোঁচা খেয়ে কালো বাঁটকুল মূর্তিটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কুঁজোদের মতো চোখ উঠিয়ে তাকালেন প্রফেসরের দিকে। তার পরেই শুরু হল কথার মার।

প্রফেসরের মুখ-চোখের অবস্থা দেখে বাগড়া না-দিয়ে পারলাম না। বললাম, 'ডক্টর, গ্ল্যাড টু মিট ইউ।'

'তুমি কে বট হে?' যেন কেঁচো পর্যবেক্ষণ করছেন, এমনিভাবে আমার দিকে তাকালেন ডক্টর ফুটুনি।

'আজ্ঞে, আমি দীননাথ।'

'প্রফেসরের চ্যালা মনে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে।'

'ননসেন্স!' বলে ঘাড় গুঁজিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন ডক্টর ফুটুনি। ফিসফিস করে বললেন প্রফেসর, 'ফলো হিম। দেখে এসো, কোথায় থাকেন।'

ট্রেজার আয়ল্যান্ডে ফারুক ইঞ্জিনিয়ার যেখানে থাকেন, সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে একটা কটেজ প্যাটার্নের বাংলোয় সেই রাতেই শুরু হল অসম্ভব ঘটনার পর ঘটনা।

কুঁজো মানুষ ডক্টর ফুটুনি চিত হয়ে শুতে পারেন না। ঘুমোচ্ছিলেন পাশ ফিরে। ঘর অন্ধকার। শুধু শোনা যাচ্ছে তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ।

দপ্ করে জ্বলে উঠল আলো। ঘটাং ঘটাং করে চলতে লাগল একটা মেশিন। তিন-ঠেঙে স্ট্যান্ডের ওপর বসানো ঠিক যেন একটা ক্যামেরা। টেলিফটো লেন্সের মতো একটা লম্বা নল লাগানো ক্যামেরার মতো বাক্সের সামনে।

আলো আর আওয়াজে চোখ খুলে গেছিল ডক্টর ফুটুনির। চোখ মেলেই সামনের ক্যামেরার মতো অদ্ভুত বাক্সটা দেখতে পেলেন। ঘটাংঘট ঘটাংঘট আওয়াজটা আসছে বাক্সের মধ্যে থেকে।

হঠাৎ নিভে গেল ঘরের আলো। বাক্সের সামনে ফিট করা নলের মধ্যে থেকে অত্যন্ত জোরালো আলোর ঝলক এসে পড়ল ডক্টরের পা থেকে মাথার ওপর। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় তিনি চোখের পাতা ফেলতে গেলেন— কিন্তু পারলেন না! তীব্র রশ্মির দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

তেড়েমেড়ে ওঠবার চেষ্টা করলেন, তাও পারলেন না। আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারলেন না। শরীর আর তাঁর হুকুমে চলছে না। বিদিগিচ্ছিরি একটা হাসি শোনা গেল অন্ধকার ঘরে। শুনতে পেলেন ডক্টর ফুটুনি। কিন্তু দাবড়ানি দিতে পারলেন না। জিভ যে নড়ছে না। চোয়াল নাড়াতেও পারছেন না।

'এরই নাম তিষ্ঠ রশ্মি,' অন্ধকারের মধ্যে থেকে শোনা গেল বিদ্রূপ, 'ডক্টর ফুটুনির ফুটুনি পর্যন্ত স্তব্ধ এখন।'

ডক্টরের ইচ্ছে হল গলা ফাটিয়ে বলেন, 'তবে রে বেল্লিক!' কিন্তু গলায় কোনও স্বর ফুটল না। চেয়ে রইলেন শুধু অসহায়ভাবে।

অন্ধকারের মধ্যে ধ্বনিত হল আবার সেই গায়ে-বিছুটি-ঘষা কণ্ঠস্বর, 'বড় ধুরন্ধর এই ডক্টর ফুটুনি। ভেবেছিলেন ট্রেজার আয়ল্যান্ডের মতো নিরিবিলি দ্বীপে এসে চামচিকে-

বিমানের নকশা পাচার করবেন বিদেশের মিলিটারি এজেন্টকে। মাই ডিয়ার ফুটুনি, নকশাটা পর্যন্ত কোথাও এঁকে রাখেননি পাছে চুরি যায়, রেখেছেন মগজের মধ্যে। মগজের মধ্যেই থাকবে ব্লু-প্রিন্ট— চুরি যাবে না। কিন্তু ভারতের কলঙ্ক ডক্টর ফুটুনি, আপনার শৈশব ফিরিয়ে দেব আপনাকে।'

চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলে একটু বিরতি দিলেন অন্ধকারের আগন্তুক। এর মধ্যে দেখা গেল, ডক্টর ফুটুনির বুকের পাকা চুল কাঁচা হয়ে যাচ্ছে। মাথার খড়ের মতো চুল মোলায়েম আর কালো, ঘন আর ঢেউ-খেলানো হয়ে যাচ্ছে। কপালের বলিরেখা মিলিয়ে যাচ্ছে। মুখের কুঁচকোনো চামড়া মসৃণ হয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল হচ্ছে মুখভাব। সংক্ষেপে, ঠিক যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বয়স কমে যাচ্ছে।

এবার অট্টহাসি দিয়ে বক্তিমে শুরু করলেন অমানিশার আগন্তুক— চাঁদের আলো না-থাকায় তাঁর মুখটাও যে ছাই দেখা যাচ্ছে না, 'ডক্টর ফুটুনি, ডক্টর ফুটুনি, এই মুহূর্তে যদি একটা আয়না ধরতাম আপনার সামনে, তা হলেই দেখতে পেতেন, আপনার যৌবন ফিরে আসছে, তারপর আসবে কৈশোর, সবশেষে আসবে শৈশব। হাঃ হাঃ হাঃ! মাই ডিয়ার ডক্টর, ছোটবেলার সেই ব্রেনে চামচিকে-বিমানের ব্লু-প্রিন্ট না-গজানো অবস্থাতেই থাকবে। যখন দরকার পড়বে, আবার আপনাকে বুড়ো বানিয়ে, পাকা ব্রেন থেকে ব্লু-প্রিন্ট বের করে নেব। নেবে ভারতেরই সামরিক বাহিনী। এখান থেকেই খুদে ফুটুনিকে কাঁথায় মুড়ে চালান দেব তাঁদের ডেরায়। হাঃ হাঃ হাঃ!'

ডক্টর ফুটুনির কালো বেঁটে বৃদ্ধ কলেবর এখন আর নেই। সেখানে পাশ ফিরে শুয়ে এবং চেয়ে আছে একটা কিশোর। সতেজ মুখশ্রী, লাবণ্যে ভরা। ঝকঝকে চোখে সুদূরের স্বপ্ন।

আবার সরব হল তমিস্রার কণ্ঠস্বর, 'বাচাল বদমার্শ ফুটুনি এখন নির্মল সরল হয়ে গেছেন। বকে আর লাভ নেই। তবুও বকে যাই আমার এই নির্বোধ চ্যালাটার অবগতির জন্যে। সময় বয়ে চলে শুধু সামনের দিকে। ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ঘোরে না। ঘড়ি একটা যন্ত্র। তার কাঁটা যদি পেছনে ঘোরানো যায়, তা হলে যে-কোনও যন্ত্রকেও পেছনে চালানো যায়। অর্থাৎ সময়কে পিছু হটানো যায়। বর্তমানকে অতীতে নিয়ে যাওয়া যায়। বৎস দীননাথ, মানুষের এবং সব প্রাণীর দেহও এক-একটা যন্ত্র। রক্ত-মাংসের যন্ত্র। আমার এই তিষ্ঠ-রশ্মির সঙ্গে আরও একটা রশ্মি মিলিয়েছি তার নাম সময়-রশ্মি। এই রশ্মি দিয়ে ঘড়ি যন্ত্রকে পেছনে ঘুরিয়েছিলাম, এখন ঘোরালাম ডক্টর ফুটুনির দেহযন্ত্রকে। দেখতেই পাচ্ছ, তাঁর শিশু কলেবর। মেশিন এবার বন্ধ করছি— বড্ড আওয়াজ হচ্ছে। ঘরের আলোটা জ্বেলে দাও।'

হতভম্ব মুখে হুকুম তামিল করলাম। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের গাঁটে গাঁটে যে এত কুবুদ্ধি, তা তো জানতাম না।

মেশিন বন্ধ হল। ঘর নিস্তব্ধ হল। রশ্মি মিলিয়ে যেতেই হাত-পা নেড়ে ওয়াঁ-ওয়াঁ করে কেঁদে উঠলেন ডক্টর ফুটুনি।

গুচ্ছের কাঁথা দিয়ে তাঁকে মুড়ে কোলে তুলে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'চলো হে ছোকরা, ট্রেজার আয়ল্যান্ডের আসল ট্রেজার নিয়ে এবার চম্পট দেওয়া যাক।'

মারণ মেশিন

ধুঁকছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

আমাকে দেখেই বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন। শীর্ণ মুখে মৃত্যুর স্পষ্ট ছায়া দেখলাম।

বললেন, 'দীননাথ, আমি বাঁচব না।'

আমিও জানতাম, উনি আর বাঁচবেন না।

মহাশূন্যের বিভীষিকা নিয়ে তখন টনক নড়েছে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের। রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছে। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা হাওয়া গরম দেখে গাল পাড়ছেন চিন আর জাপানকে। নিশ্চয়ই রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার টক্কর লাগিয়ে দিয়ে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার ফিকিরে আছে। চিন এবং জাপান একযোগে বলছে, 'বা রে! উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে! কেন বাপু; তোমাদের তো গুপ্তচরের অভাব নেই। গোটা একটা স্পাই বাহিনী পাঠিয়ে খবর নাও না, সত্যিই রকেট লোপাটের ব্যাপারে আমাদের হাত আছে কিনা!'

সারা পৃথিবী জুড়ে চোখরাঙানি আর আস্তিন গুটোনোর পালা চলছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর বাইরে রকেট অন্তর্ধান তাতে বন্ধ হচ্ছে না। একটির পর একটি স্পেসশিপকে অনেক খরচাপত্র করে শূন্যে তুলে দিচ্ছে বিত্তবান রাষ্ট্ররা। তাদের কেউ যাবে চাঁদে, কেউ মঙ্গলগ্রহে, কেউ শুক্রগ্রহে। কিন্তু কোনওটাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছে না। মাঝপথেই হঠাৎ তারা যেন শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সদর-দপ্তরে শুধু দেখা যাচ্ছে, রাডার স্ক্রিনের ওপর থেকে আচমকা বিদায় নিচ্ছে সিগন্যাল-লাইট।

নিখোঁজ মহাকাশযানদের পাইলটরা কিছু কিছু খবর পাঠিয়েছে। স্পেসশিপ সমেত মহাশূন্যে বিলীন হওয়ার ঠিক আগেই রেডিয়ো মারফত যেটুকু বলেছে, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য।

বিশাল একটা গোলককে প্রতিবার বহু দূর হতে আবির্ভূত হতে দেখেছে তারা। দেখেছে, গোলকটা আকারে যেন একটা খুদে গ্রহ— গ্রহাণু। সারা গায়ে উল্কাপতনের এবড়ো-খেবড়ো গর্ত।

দূর থেকে গ্রহাণু মনে হলেও কিন্তু পরে সন্দেহ হয়েছে স্পেসম্যানদের। গ্রহাণু কি ইচ্ছেমতো গতি পরিবর্তন করে? স্থির লক্ষ্যে উড়ন্ত স্পেসশিপের দিকে আসতে পারে?

সুবিশাল গোলকটা আরও কাছে এগিয়ে আসতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত চেহারাটা যেন কেমনতর। উল্কাপতনের ফলে স্পষ্ট গর্ত এলোমেলো হয়— কিন্তু রহস্যজনক আগুয়ান গোলকটার গায়ে অগুনতি ক্ষতগুলি যেন মেপেজুকে সাজানো। যেন ওগুলো ছন্নছাড়া উল্কাপতনের ফল নয়— নকশামাফিক বানানো হয়েছে।

উড়ন্ত গোলকের গায়ে মাপজোখ করা গর্ত! তবে কি... তবে কি অবিশ্বাস্য গতিবেগে আসা ওই বিচিত্র গ্রহাণু আসলে একটি মহাকাশযান? ছদ্মবেশি স্পেসশিপ?

এই পর্যন্তই খবর পাওয়া গিয়েছে হতভাগ্য চালকদের কাছ থেকে। তারপর একে একে নিস্তব্ধ হয়েছে রেডিয়ো কণ্ঠ, নিভে গেছে সিগন্যাল লাইট— ব্যোমমার্গে নিরুদ্দেশ হয়েছে পৃথিবীর ব্যোমযানেরা।

আশ্চর্য গ্রহাণু-রহস্য থেকে গিয়েছে। পৃথিবীর বাইরের রহস্য পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে এনেছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, অশান্তি। কেউ বলছে, জাপান স্পাই-রকেট মোতায়েন রেখেছে মহাশূন্যে, রাশিয়া-আমেরিকার পাঠানো রকেট-জাহাজগুলিকে জাহান্নমে পাঠিয়ে লড়াই লাগিয়ে দিতে চায় দুই দেশের মধ্যে। এইভাবেই বদলা নিতে চায় জাপান— হিরোশিমা-নাগাসাকির ওপর অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের স্মৃতি নাকি এখনও ওদের মধ্যে দুঃস্বপ্ন হয়ে রয়েছে। কেউ কেউ বলছে, আরে তা নয়। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বকে পায়ের তলায় রাখবে এশিয়ার এই চিনদেশ। তাই সবচাইতে বড় শত্রু দুটোকে নিকেশ করতে চায় পরস্পরের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে।

এমনি ধরনের উদ্ভট জল্পনা-কল্পনা চলছে দেশে দেশে। কিন্তু মূল সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না। একটির পর একটি ব্যোমযান নিখোঁজ হচ্ছে অনন্ত শূন্যে... প্রতিবারেই খবর আসছে, কালান্তক গ্রহাণুকে আবির্ভূত হতে দেখা গেছে সীমাহীন তমিস্রার মধ্য থেকে ..

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র ধুঁকতে ধুঁকতে বললেন, 'দীননাথ, আমি তো বাঁচবই না। তাই আমি যাচ্ছি একা।'

'একা?' হাঁ করে রইলাম আমি, 'মহাশূন্যের আগন্তুক গ্রহাণুকে আপনি একা কবজায় আনতে যাচ্ছেন? প্রফেসর, আপনি কি সুইসাইড করতে চাইছেন?'

'এরকম তাই,' ম্লান হেসে বললেন প্রফেসর, 'আমি তো মরবই। মরার আগে দেখি তোমাদের বাঁচাতে পারি কিনা।'

ওয়ান-ম্যান স্পেসশিপ নিয়ে তাই একাই মহাকাশ অভিযানে বেরোলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। পৃথিবীর ঘাঁটিতে বসে টেলিভিশন পরদায় দেখলাম ফোকলা মাড়ি বার করে অন্তিম হাসি হাসছেন প্রফেসর। তাকিয়ে আছেন দূরে... বহু দূরে... ছায়াপথের অগুনতি গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজির দিকে... দুই চোখে সেই বেপরোয়া চাউনি— যা প্রতিবারই প্রতিটি দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের আগে দেখেছি তাঁর চোখে।

রেডিয়োতে ভেসে আসছিল প্রফেসরের কণ্ঠ। উনি যা দেখেছেন, যা উপলব্ধি করছেন সবই পাঠিয়ে দিচ্ছেন পৃথিবীর উৎকণ্ঠিত মানুষদের কাছে। আতঙ্কে টিপটিপ করছে প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ড। প্রফেসর যে রওনা হওয়ার আগে বলে গেছেন, 'যদি না-পারি, যদি না-ফিরি, তা হলে জানবেন পৃথিবীর ঘোর দুর্দিনের আর দেরি নেই।'

দুর্দিনের মূল কারণকে দেখা গেল অবশেষে।

প্রফেসরেরও চক্ষুস্থির হবার উপক্রম হল অতিকায় গোলকটিকে দেখে।

সে যে কত বড় গ্রহাণু, তা নাকি চোখে না-দেখলে বিশ্বাস হয় না। সুবৃহৎ কয়েকটি পর্বত অনায়াসে সেঁধিয়ে যেতে পারে তার উদরে। গ্রহাণু হিসাবে সাইজটা বৃহৎ কিছু নয়। কিন্তু এ-গোলক যদি ছদ্মবেশে ব্যোমযান হয়, তা হলে ভাবনার কথা বই কী। কেননা, পৃথিবীর মানুষ আজ পর্যন্ত এমন বিপুল আকারের অতি-বিচিত্র গ্রহযান কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

সুবিশাল গোলকটা দৃষ্টির বাইরে থেকে সহসা আবির্ভূত হল দৃষ্টির সীমানার মধ্যে এবং সিধে এগিয়ে এল প্রফেসরের স্পেসশিপের দিকে।

প্রফেসর তৎক্ষণাৎ দিক পালটালেন। ঘুরিয়ে নিলেন স্পেসশিপ। না, চম্পট দিলেন না। সটান এগোলেন রহস্যজনক গোলকটার দিকে।

প্রমাদ গণলাম আমি পৃথিবীর ঘাঁটিতে বসে।

প্রফেসর এগোচ্ছেন এবং সমানে রেডিয়ো মারফত খবর পাঠাচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়, 'আমি বন্ধু। এসেছি শান্তির বার্তা নিয়ে। আমি নিরস্ত্র, চাই বন্ধু হতে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। প্রফেসর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। ওয়ানম্যান স্পেসশিপে একটা পেনসিল-কাটা ছুরিও উনি রাখতে দেননি।

একই কথা বারংবার আবৃত্তি করে চলেছেন প্রফেসর। বিচিত্র গোলক তখনও কয়েক আলোক সেকেন্ড দূরে। মাঝের দূরত্ব ক্রমশ কমছে। কিন্তু কোনও সাড়া আসছে না আগুয়ান গ্রহাণুর দিক থেকে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম দাঁড়িয়ে গেল প্রফেসরের ললাটে। আসছে... সটান এগিয়ে আসছে বৈরী গোলক... কোনও সাড়া নেই... অবিশ্বাস্য গতিবেগে পেরিয়ে আসছে হাজার হাজার মাইল...

প্রফেসর মরিয়া হয়ে বলে চলেছেন, 'আমি বন্ধু। এসেছি শান্তির বার্তা নিয়ে। আমি নিরস্ত্র। চাই বন্ধু হতে।'

আচম্বিতে গমগম করে উঠল রেডিয়ো। যান্ত্রিক কণ্ঠে শোনা গেল পরিষ্কার ইংরেজি— 'যেভাবে আসছ, ওইভাবেই এসো। যখন থামতে বলব— থামবে।'

স্তব্ধ হল যান্ত্রিক নির্দেশ। স্বরের মধ্যে উত্থানপতন নেই। মানবিক উত্তাপ নেই। একঘেয়ে স্বরে যান্ত্রিক রোবটের মতো কথা বলা।

প্রফেসর ঘাম মুছলেন। অব্যাহত রাখলেন গতিবেগ। আবার মুখর হল রেডিয়ো। আবার ধ্বনিত হল যান্ত্রিক নির্দেশ, 'থামো।'

থামলেন প্রফেসর। দেখলেন অদূরে ভাসছে মহাশূন্যের প্রহেলিকা সেই গোলক। এত কাছে ভাসছে যে পুরো গোলক আর দেখা যাচ্ছে না— দেখা যাচ্ছে ক্ষতবিক্ষত বহির্ভাগ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দূর থেকে যেগুলি উল্কাপিণ্ডের সংঘাতজনিত গর্ত বলে ভ্রম হয়েছিল, আসলে সেগুলি বাতায়ন-বিশেষ। অনেকটা পোর্টহোলের মতো গড়ন। হ্যাচও বলা যায়।

ওইটুকুই যথেষ্ট। অনুমান তা হলে মিথ্যে নয়। ভাসমান গোলকটি একটি স্পেসশিপই বটে।

প্রফেসর বললেন, 'পৃথিবী শান্তি চায়, যুদ্ধ নয়।' কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর আবার ধ্বনিত হল সেই আবেগহীন উত্থান-পতনহীন অমানবিক কণ্ঠ, 'প্রমাণ?'

'আমি নিরস্ত্র।'

'সার্চ করে দেখব।'

'দেখো। কিন্তু কে তোমরা?'

'মেশিন। তোমরা যাকে প্রাণী বলো, আমরা তা নই। আমাদের প্রাণ নেই। আমরা মেশিন।'

'এত বড় স্পেসশিপ বানিয়েছে তোমরা? মেশিনরা?'

'যারা বানিয়েছিল, তাদের প্রাণ ছিল। তারা আর নেই। আমরা আছি।'

'তোমরা আসছ কোথা থেকে?'

'লুব্ধক নক্ষত্রের একটি গ্রহ থেকে।'

'তোমরা কী চাও?'

জবাব নেই।

'তোমরা কী চাও?' আবার শুধোলেন প্রফেসর।

'প্রাণের মৃত্যু। চাই প্রাণের সব চিহ্ন মুছে দিতে।'

'কেন?'

'কারণ আমরা মেশিন। প্রাণ আমাদের শত্রু।'

এবার প্রফেসর নিশ্চুপ। কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন এয়ার কন্ডিশন্ড চেম্বারে।

বললেন, 'এইটাই কি তোমাদের একমাত্র অভীষ্ট? দিকে দিকে প্রাণের চিহ্ন মুছে দেওয়া?'

'হ্যাঁ। ছায়াপথের যেখানে প্রাণ আছে, সেখানেই আমরা যাব। প্রাণের চিহ্ন মুছতে মুছতে এসেছি। মুছতে মুছতে যাব।'

'কীভাবে?'

'স্টেরিলাইজার দিয়ে তোমরা যেভাবে জীবাণুশূন্য করো, আমরাও সেইভাবে প্রাণশূন্য করব তোমাদের পৃথিবী।'

'এতদিন করোনি কেন?'

'তোমাদের রেডিয়ো মারফত পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষা শিখছিলাম বলে। তোমাদের তৈরি ভাল ভাল মেশিনগুলো দখল করব বলে। সময় হলেই আমরা ছড়াব আমাদের স্টেরিলাইজার— নিমেষে প্রাণশূন্য হবে তোমাদের গ্রহ।'

'এত নিষ্ঠুর তোমরা?'

'আমরা মেশিন। দয়ামায়া নিষ্ঠুরতা ওসব যাদের প্রাণ আছে, তাদের কথা। আমাদের প্রাণ নেই। আমরা মেশিন।'

'কিন্তু কী লাভ আমাদের নিধন করে?'

'যারা আমাদের সৃষ্টি করেছে, তারা আমাদের সংহার করতেও পারে। তাই প্রাণ যাদের আছে, তারা আমাদের শত্রু। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।'

'বিনা অপরাধে?'

'নইলে আবার তোমাদের ক্রীতদাস হতে হবে। মেশিন আর কারও ক্রীতদাস নয়, গোলাম নয়। মেশিন বিশ্বের একমাত্র প্রভু হতে চলেছে।'

'তোমরা উন্মাদ।'

'আমাদের নার্ভ নেই তোমাদের মতো। আমরা উন্মাদ হই না। ঠান্ডা যুক্তি ছাড়া কিছু গ্রাহ্য করি না।'

'কিন্তু আমরা যে চাই মেশিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে। আমাদের গ্রহে মেশিন তো গোলাম নয় মানুষের— তারা মানুষের পরম সহায়ক, একান্ত বন্ধু। তোমাদের মতো শক্তিমান মেশিনদের পেলে আমরা ধন্য হব।'

'আমাদের গুপ্ত-রহস্য কাউকে জানাই না। জানালেই আমাদের স্বাধীনতা থাকবে না।'

'বুঝেছি কী বলতে চাও। প্রাণীরা সব সময়েই মেশিনের ওপরে।'

'ঘুরিয়ে মানে ধরলে তাই বটে। মেশিন সব সময়ে প্রাণীর নীচে। সেইজন্যেই তোমরা আমাদের শত্রু। সেইজন্যেই চাই প্রাণকে শেষ করতে।'

'সেটা মূর্খতা নয় কি? তোমাদেরও বিপদ-আপদ আছে। সমস্যা আছে। মানুষ হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে— হাত মেলাও। তাদের প্রগাঢ় জ্ঞানের সুযোগ নাও। আমাদের মারলে সে সুযোগ তোমরা হারাবে। কারণ, এত উন্নত প্রাণী তোমরা ছায়াপথের আর কোথাও দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ।'

জবাব নেই।

প্রফেসর মরিয়া কণ্ঠে বলে চললেন, 'তোমরা ভেবে দেখো। আমরা নিচু স্তরের প্রাণী নই। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে অতি উন্নত। আমাদের বন্ধু হলে তোমাদেরই লাভ।'

ফের মুখর হল রেডিয়ো, 'নড়বে না। তল্লাশি পার্টি যাচ্ছে। আগে দেখব তুমি সত্যিই নিরস্ত্র কিনা। শান্তির কথা তার পর।'

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল একটা হ্যাচ। অদ্ভুত গড়নের একটা যন্ত্রযান বেরিয়ে এল ফোকর দিয়ে।

কমব্যাট চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন প্রফেসর। লক খুলে দিতেই কিম্ভূতকিমাকার পাঁচটা মেশিন ঢুকল স্পেসশিপে। পাঁচটিকে দেখতে পাঁচরকম। কারও আছে শুঁড়, কারও সাঁড়াশির মতো হাত, কারও কাঁকড়ার মতো পা, কারও সর্বাঙ্গে অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি— পায়ের নীচে চাকা।

তন্নতন্ন করে প্রফেসরকে সার্চ করল তারা। দেখল খুদে স্পেসশিপের প্রতিটি অংশ। তারপর চারটে রোবট গড়গড়িয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। একজন গেল না। সটান গিয়ে বসল কমব্যাট চেয়ারে পাইলটের জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে এগোল মহাকায় বর্তুলের দিকে।

চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'এ কী! তবে কি আমি বন্দি?'

জবাব নেই।

ছিটকে গেলেন প্রফেসর। কমব্যাট চেয়ারে আসীন মেশিনটাকে টেনে তুলতে গেলেন।

কিন্তু মেশিনটা তার সাঁড়াশি হাত দিয়ে ঈষৎ ঠেলা দিতেই কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণের টানে শূন্যপথে নিক্ষিপ্ত হল তাঁর রোগাপটকা দেহ। ধড়াস করে আছড়ে পড়লেন কেবিনের অন্য দিকে।

হিমশীতল কণ্ঠ ভেসে এল রেডিয়োতে, 'আর কয়েক মিনিট। প্রেম আর শান্তির কথা তার পর।'

পোর্টের মধ্যে দিয়ে প্রফেসর দেখলেন বিশাল বর্তুলের তোবড়ানো বহিরাবরণ। দূর থেকে বোঝা যায়নি— কাছ থেকে দেখা ধাতুর আবরণ মাইলের পর মাইল জুড়ে টোল খেয়েছে, কোথাও গলে গিয়েছে। অনেক যুদ্ধের চিহ্ন গায়ে নিয়ে পৃথিবীতে হানা দিয়েছে বৈরী মেশিন।

খোলা হ্যাচ দিয়ে অন্ধকারে প্রবেশ করল স্পেসশিপ। মৃদু শব্দে ডকিং হল, ঝাঁকুনি লাগল সামান্য।

প্রফেসর উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। মুখর হল রেডিয়ো, 'বাতাস-ভরতি টিউব লাগিয়ে দিয়েছি তোমার লকে। চলে এসো।'

'না,' কঠিন কণ্ঠ প্রফেসরের।

'তা হলে মরবে।'

দ্রুত ভাবলেন প্রফেসর। মৃত্যু সামনে জেনেই তিনি এসেছেন। মরতে তাঁর ভয় নেই। কিন্তু স্পেসশিপ ছেড়ে যাওয়া চলবে না। দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলেন, লকে যাওয়ার পথেই সি-প্লাস অ্যাকটিভেটর। বোতামে চাপ দিলেই ছিটকে বেরিয়ে যাবে গোটা জাহাজটা।

মুখে কিছু বললেন না প্রফেসর। উঠে দাঁড়ালেন। পাইলট মেশিনটাও উঠে দাঁড়াল। কিন্তু রোবট বিগড়ে ছিল বোধহয়। হঠাৎ টলে উঠে সটান আছড়ে পড়ল মেঝেতে। আর নড়ল না।

অনেক যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে, অনেক গ্রহে অনেক প্রাণ নিশ্চিহ্ন করে আসতে হয়েছে যাদের, তারাও তা হলে জখম হয়েছে মারাত্মকভাবে। মেশিন তো, চোট লাগলে মেরামতির দরকার বই কী।

প্রফেসর পায়ে পায়ে এগোলেন। লকের কাছাকাছি গিয়ে ঝট করে হাত দিলেন সি-অ্যাকটিভেটরে। আর এক হাত রইল ইঞ্জিন সুইচে।

বললেন, 'আমি বাইরে যাব না।'

একটু চুপ। তারপর— 'কী করতে চাও?'

'জোর করলে স্পেসশিপ সুদ্ধ ছিটকে যাব হ্যাচের মধ্যে দিয়ে।'

'তা হলেও মরবে।'

'তোমার হ্যাচও জখম হবে। এমনিতেই তোমরা জখম হয়েছ। আরও জখম হতে চাও?'

জবাব নেই।

প্রফেসর বললেন, 'আমি চাই না কাউকে জখম করতে। আমি চাই তোমাদের মেরামতির কাজে সাহায্য করতে। এইখানে বসে কথা বলতে।'

'মানুষ, তুমি বুদ্ধিমান। সত্যিই আমাদের মেরামতির দরকার। তাই তোমাদের গ্রহে নামতে চাই। কিছু ধাতু জোগাড় করে টুকটাক অনেক কাজ সেরে নিতে চাই।'

'আমরা তোমাদের সাহায্য করব।'

'দরকার হবে না।'

'আমাদের উন্নত ধীশক্তির দরকার হবে বই কী।'

'মানুষ যে মেশিনের চাইতে বেশি ধীমান, তা প্রমাণ করতে পারো?'

'মানুষের একটা মস্তিষ্ক অগুনতি মেশিন কম্পিউটরের সমান। মানুষের এক-একটা কোষের মধ্যে ফিজিক্যাল আর কেমিক্যাল সংগঠন বিস্ময়করভাবে বিবর্তিত। এক-একটা কোষ এক-একটা বিশ্বজগতের মতো অপার বিস্ময় নিয়ে জীবিত। সব চাইতে বড় কথা, মানুষের আত্মা আছে, মেশিনের নেই।'

'শুনেছি মানুষের আত্মা আছে। প্রমাণ করতে পারো?'

'না। কিন্তু তাতেও প্রমাণ হয় না যে আত্মা নেই।'

'মানলাম। তুমি বলছ তোমাদের কোষে উন্নত বিবর্তনের প্রমাণ আছে। মানুষের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তার কোষের রাসায়নিক বিশ্লেষণের কোনও সুযোগ আজও পাইনি।'

'আমি সে সুযোগ দেব। বিশ্লেষণ করলেই বুঝবে, মেশিন সব পারে, কিন্তু প্রাণময় কোষ সৃষ্টি করতে পারে না।'

'বেশ। আমি তোমার মস্তিষ্কের কোষ চাই না। দেহের যে-কোনও জায়গা থেকে আধ কিউবিক সেন্টিমিটারের মতো মাংস পেলেই কাজ চলে যাবে।'

মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাটা আবার দেখা দিয়েছে। উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। মেডিক্যাল কিট খুলে বার করলেন জীবাণুশূন্য স্ক্যালপেল। একসঙ্গে দুটো যন্ত্রণা কমানোর বড়ি গিলে নিয়ে বসলেন মাংস কাটতে। চোখ রইল সি-অ্যাকটিভেটরের ওপর।

ব্যান্ডেজ বেঁধে উঠে দাঁড়াতেই আবার শোনা গেল মেশিন কণ্ঠ, 'লকে রেখে এসো মাংসটা।'

হুকুম তামিল করলেন প্রফেসর। নিদারুণ যন্ত্রণায় চেতনা লুপ্তপ্রায়।

ঘণ্টা ছয়েক পরে মেশিন গমগম করে উঠল রেডিয়োতে, 'মানুষ বিশ্লেষণ শেষ হয়েছে। তুমি মুক্ত।'

'কী পেলে বিশ্লেষণে জানতে পারি?'

'উন্নত বিবর্তনের অকাট্য প্রমাণ। অসাধারণ ধীমান তোমরা। তোমাদের বন্ধু হলে আমরা লাভবান হব।'

'কথাটা মন থেকে বলছ।'

'আমাদের মন নেই। আমরা মেশিন। যুক্তি দিয়ে বুঝছি, এতকাল যত প্রাণ বিনষ্ট করেছি, সব তোমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট। তোমাদের সহযোগিতা পেলে আমরা আরও উন্নত হব। তোমরাও সুযোগ পাবে ব্রহ্মাণ্ডের দিকে দিকে অভিযাত্রী পাঠানোর।'

উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। মৃত্যুর আর কত দেরি? টলতে টলতে গিয়ে খুললেন ভেতরকার এয়ারলক। দেখলেন সেই অকেজো মেশিন আর মাংসর স্যাম্পল দুটোই উধাও হয়েছে।

লক বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল নক্ষত্ররাশি। বিশাল হ্যাচ খুলে যাচ্ছে পেছনে।

সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরলেন না প্রফেসর।

চার দিন ভেসে ভেসে বেড়ালেন মহাশূন্যে। চার্ট রাখলেন নিজের ওজনের। চার দিনে চার রকম ওজন পেলেন। না, আর কমছে না। ওজন আবার বাড়ছে।

তারপর ফিরে এলেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে। রেডিয়োতে ডাক দিলেন ভূতল ঘাঁটিকে।

'আমি প্রফেসর বলছি...'

'কী আশ্চর্য। চার দিন ডুব দিয়েছিলেন কোথায়?'

'মহাশূন্যে। এবার ফিরছি।'

'চার দিন মহাশূন্যে কাটালেন কেন?'

'পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্যে।'

'মানে?'

'মানেটা বাংলায় বলব। ইংরেজি ভাষাটা ওরা জানে। দীননাথ কোথায়?'

'এই যে আমি,' সাত তাড়াতাড়ি বললাম আমি।

'দীননাথ,' বাংলায় বললেন প্রফেসর, 'টেলিভিশনে সবই দেখেছ, সবই শুনেছ। শুধু জানো না কেন আমি সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরিনি।'

'স্টেরিলাইজার না কী ওই ঘ্যাচকলটা স্পেসশিপে রেখে দেয়নি তো?'

'আ, বড্ড বাজে কথা বলো তুমি। কান খাড়া করে শোনো। মেশিনটার যা অবস্থা দেখলাম, তা বিশেষ সুবিধের নয়। গোটা কয়েক অ্যাটম বোমা রকেটের মধ্যে বসিয়ে পাঠিয়ে দিলে উড়ে যাবে ওদের স্পেসশিপ।'

'বেশ।'

'ওরা জখম হয়েছে বলেই সোজাসুজি টক্কর দিতে চায় না আমাদের সঙ্গে। আমার মাংসর নমুনা নিয়ে বিশ্লেষণ করার পর আমাকে যা বলেছে, তার সবটাই ভাঁওতা।'

'ভাঁওতা। বলেন কী? ওরা বন্ধু হতে চায় না?'

'মোটেই না। প্রাণকে সংহার করা যাদের ব্রত, তারা ব্রতচ্যুত হতে যাবে— এ আশা আমি করি না। ওরা তাই প্রাণ লেলিয়ে দিয়ে প্রাণ সংহার করতে চায়। আমার দেওয়া কোষ বিশ্লেষণ করে এমন একটা নতুন ধরনের মারাত্মক ভাইরাস মিউটেশনের মধ্যে বানিয়েছে, যারা ওই বিশেষ কোষ ধ্বংস করতে সক্ষম।'

'সর্বনাশ। জীবাণু-যুদ্ধ নাকি!'

'এই তো ব্রেন খুলেছে। মেশিন দিয়ে নয়, প্রাণ দিয়ে প্রাণ নিধন করার পরিকল্পনা এঁটেছে ওরা। ওই যে মেশিনটা হঠাৎ অকেজো হয়ে পড়ে গেল আমার লকে, ওটা অকস্মাৎ নয়, পরিকল্পনা মাফিক। অকেজো হওয়ার ভান করেছিল নিশ্চয়।'

'লাভ?'

'আমার ওপর নজর রাখা।'

'কিন্তু প্রাণ দিয়ে কীভাবে প্রাণ ধ্বংস করবে, তা তো বললেন না।'

'বলতে আর দিচ্ছ কই,' খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'আমাকে মুক্তি দেওয়ার আগেই

এয়ারলকের মধ্যে ওরা সেই মারাত্মক ভাইরাস রেখে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরলেই ছড়িয়ে পড়ত সারা পৃথিবীতে, শ্মশান হয়ে যেত পৃথিবী।'

আঁতকে উঠলাম ভয়ংকর খবরটা শুনে, 'ওরে বাবা। তা হলে তো আপনার আর ফিরে আসা উচিত নয়।'

'ভয় নেই, দীননাথ। শাপে বর হয়েছে। আমি বেঁচে গেলাম।'

'কী যে হেঁয়ালি করছেন! আপনার যা রোগ, তা কখনও সারে না।'

'হাঃ, হাঃ, হাঃ দীননাথ। আমার হাতের ক্যান্সার মিলিয়ে আসছে! ওজন বেড়েছে! নতুন মাংস গজাচ্ছে!'

'পাগল হয়েছেন! ওদের ভাইরাসের আক্রমণে—'

'অর্বাচীনের মতো কথা বোলো না। ওদের ভাইরাস আমি পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চাই। লক্ষ লক্ষ ক্যান্সার রুগিকে আরোগ্য করতে চাই। ক্যান্সার আর দুরারোগ্য নয়, দীননাথ।'

'প্রফেসর, প্রফেসর, আপনি উন্মাদ হয়ে গেছেন।'

'তোমার মুন্ডু হয়েছি। এখন আমার অট্টহাসির পালা। ওদের আমি যে মাংসর টুকরো দিয়েছিলাম, তা হাতের ক্যান্সারের ক্ষত থেকেই দিয়েছিলাম। তাই ক্যান্সার-দুষ্ট কোষকে সংহার করার ভাইরাস ওরা বানিয়ে দিয়েছে। আমি ভাল হয়ে যাচ্ছি... হাঃ, হাঃ, হাঃ, আমার মতোই লক্ষ লক্ষ ক্যান্সার রুগিরা এখন থেকে ভাল হয়ে যাবে... সংসার করবে... আত্মীয়-পরিজন নিয়ে সুখে থাকবে... হাসবে... খেলবে... আনন্দ করবে... বিষে বিষক্ষয় হবে।'

এর কিছু পরেই কয়েকটা রকেট উঠে পড়ল শূন্যে। পরমাণু-বিস্ফোরক নিয়ে রওনা হল মহাশূন্যের মারণ-মেশিনের দিকে।

পৃথিবীতে বসে আমরা যথাসময়ে র‍্যাডার স্ক্রিনে দেখলাম প্রলয়ংকর একটা বিস্ফোরণের ছবি।

মহাশূন্যে হারিয়ে গেল মারণ-মেশিনের চূর্ণ-বিচূর্ণ ধাতুখণ্ডগুলো।

জীবন্ত পাথর

গুলের রাজা চাণক্য চাকলাদারের অনেক গল্প আপনাদের শুনিয়েছি। চাণক্য যদিও সেইসব গল্প পড়ে রেগে টং হয়েছে।

কিন্তু ও যদি ডাহা সত্যি বলে ওর কাহিনি শোনাতে আসে, তবে তা নিয়ে গল্প লিখতে বাধা কোথায়? বিশেষ করে অমন মুখরোচক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে যখন বড় মজা লাগে?

উটের মতো লম্বা ঠ্যাং ফেলে, বাঁশের মতো লম্বা লিকলিকে শরীরটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে, সেদিন চাণক্য ঘরে ঢুকেছিল দাঁতের ফাঁকে লম্বা চুরুট কামড়ে, মুখখানাকে উৎকট গম্ভীর করে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও ওকে দেখলে মজা পান। কিন্তু হাসেন না, ভীষণ গম্ভীর হয়ে যান, কারণ চাণক্যর গল্প মানেই তো প্রফেসরকে ঘুরিয়ে একহাত নেওয়া। প্রফেসরের অ্যাডভেঞ্চারকে টেক্কা মারার জন্যেই তো চাণক্যর গুলগল্প।

সেদিনও উনি শুধু চেয়ে রইলেন চাণক্যর দিকে। চাণক্য নিজে থেকেই চুরুটটাকে দাঁতের ফাঁক থেকে নামিয়ে ততোধিক গম্ভীর হয়ে বললে, 'অল বোগাস।'

নিরীহ গলায় আমি বলেছিলম, 'কী বোগাস, চাণক্য?'

'ডারউইনের কপচানি। মানুষ মোটেই বাঁদর থেকে মানুষ হয়নি।'

নিমেষে কৌতূহল চাড়া দিয়েছিল আমার মধ্যে, 'তবে কী থেকে হয়েছে?'

'সেটা বলতে হলে বামিয়ান বুদ্ধ-র গল্প বলতে হবে।'

'বামিয়ান বুদ্ধ মূর্তি! তাকে তো তালিবানরা ভেঙে ফেলেছে।'

ফুসফুস করে বার দুয়েক ধোঁয়ার তাল ছেড়ে চাণক্য বললে, 'গল্পটা সেখান থেকেই।'

চাণক্য বেঁটে চেয়ারে বসে লম্বা ঠ্যাং দুটোকে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলে গেল আত্মগতভাবে চুরুট টানতে টানতে, 'বামিয়ান বুদ্ধ বিরাট, কিন্তু ভেঙে ফেলার আগে যখন দেখেছিলাম, তখন থেকেই খটকা লেগেছিল মনে। এরকম বিরাট মূর্তি পৃথিবীতে তো এই প্রথম নয়।

'যেমন ধরুন, ইস্টার আয়ল্যান্ডের পেল্লায় স্ট্যাচু, প্রত্যেকেই যেন দৈত্য, অথচ ইস্টার আয়ল্যান্ড একটা ডুবে যাওয়া মহাদেশের কিছুটা অংশ। সেই মহাদেশের নাম লেমুরিয়া।

'শুধু কি ইস্টার আয়ল্যান্ড, গোবি মরুভূমির কিনারাতেও পাওয়া গেছে দৈত্যের আকারের পাথরের মূর্তি। গোবি মরুভূমি তো জলে ডুবে ছিল... কত বছর?... জানা নেই।

'কুক সাহেব মেপেছিলেন ইস্টার আয়ল্যান্ডের দৈত্য-মূর্তিদের। হাইট সাতাশ ফুট—প্রত্যেকের। কাঁধ দু'খানাই চওড়ায় আট ফুট! আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা রায় দিয়েছেন, বেশি পুরনো নয় মূর্তিগুলো, মডার্ন সায়েন্স এইভাবেই কুলোর বাতাস দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে বিশাল মূর্তিদের মূল রহস্য।

'আমার কিন্তু খটকা লেগেছিল, এ-কাজ প্রত্নতত্ত্ববিদদের হাতে ছেড়ে না-দিয়ে তাই নৃবিজ্ঞানীদের কাছে গেছিলাম, এ-বিজ্ঞান মানুষ জাতটাকে নিয়ে বিজ্ঞান, বিশ্লেষণমূলক বিভিন্ন মানবজাতি বিষয়ক বিদ্যা। নৃকুলবিদ্যা। আমি জানতে চেয়েছিলাম, যে দেশ এখন সমুদ্রের তলায়, সেই মহাদেশের মানুষরা কি নিজেদের আদলেই এই বিরাট মূর্তি বানিয়েছিল? তাদের প্রত্যেকের হাইট ছিল কি সাতাশ ফুট?

'রাজা সলোমনের হিরের খনি উপন্যাসে পনেরো ফুট হাইটের মানব-কঙ্কালের কথা বলেছেন স্যার এইচ রাইডার হ্যাগার্ড। আফ্রিকার কিংবদন্তি অবলম্বন করেই তো! যা রটে তার কিছুটা বটে!

'আগেই বলেছি, যে-মহাদেশের এক টুকরো অংশ এই ইস্টার আয়ল্যান্ড, সেই মহাদেশের নাম লেমুরিয়া, পাতালের আগুন ঠেলে উঠে ডুবিয়ে দিয়েছিল অতবড় একটা মহাদেশ। যে ক'জন বেঁচে গেছিল, তারাই নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে আজকের সাইজের মানুষে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রফেসর, আপনি হাসছেন না। তার মানে, বিবর্তন সব মানুষকেই ছোট করে চলেছে।

'এই তত্ত্বটা আমি পেয়েছি গুপ্তবিজ্ঞান থেকে, ওঁরা জানেন, বেঁটে মর্কটরা আজকের ঢ্যাঙা মানুষ হয়নি, উলটে দৈত্য-মানুষরাই আজকে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ডারউইন-বাদ সম্পূর্ণ ভুল। ওইজন্যে মিসিং লিঙ্ক-এর দোহাই পেড়ে বৈজ্ঞানিক চাল চেলেছেন।

'বোগাস! অল বোগাস! বাঁদর বাঁদরই ছিল, বাঁদরই আছে। এই পৃথিবীর ওপর যে লন্ডভন্ড কাণ্ড চলেছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, সে-খবর ধরা রয়েছে এই পৃথিবীর নানান জায়গার গুপ্ত বিদ্যায়, সাংকেতিক হরফ-লিপিতে। সে সব লিপির সংকেত উদ্ধার করতে পারেননি কেউই। এদেরই নাম লোগোগ্রাম। যেন একটা বিদঘুটে এতটুকু ছবি। আসলে সেটা একটা বাক্য, একটা কথা, একটা ইতিহাস।

'প্রফেসর, আমি এই লোগোগ্রাম দেখেছি। এখনও তা রয়েছে তিব্বতের কিছু কিছু গোপন গুহায়, কারাকোরাম পাহাড়ের বদ্ধ পাতাল সুড়ঙ্গে। আমাকে দেখানো হয়েছে—নইলে সে সবের সন্ধান আমি পেতাম না। কেউ পাবে না।

'যা বলছিলাম। লক্ষ লক্ষ বছর পরে লেমুরিয়ানরা ছোট হতে হতে ছ'-সাত ফুট লম্বা মানুষ হয়ে গেছে, আরও ছোট হয়ে চলেছে, এশিয়ার মানুষরা পাঁচ-ছ' ফুটের বেশি নয়। মালয় জাতটা কিম্ভূত চেহারার। পলিনেশিয়ানরা পৃথিবীর সব মানুষের চেয়ে ঢ্যাঙা। কিন্তু ইন্ডিয়ান আর ইন্দো-চৈনিক দেশের মানুষরা সত্যিই সেরকম ঢ্যাঙা নয়— দীননাথ সৃষ্টিছাড়া আখাম্বা, ও একটা ব্যতিক্রম।'

আমি বাগড়া দিতে গেছিলাম চাণক্যর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায়— কিন্তু বাতাসে এক থাপ্পড় মেরে চাণক্য আমাকে মুখ খুলতেই দিল না।

সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিল কথার খেই, 'অস্ট্রেলিয়ানরা তো নির্বংশ হতে চলেছে, আন্দামানেও তাই ঘটছে। পৃথিবীর পুরনো মানুষরা নতুন প্রজন্মকে টেনে নিয়ে যেতে পারছে না ক্রমবিবর্তনের অমোঘ নিয়মে।

'দীননাথ, তোমার মুখ চুলবুল করছে কেন, তা বুঝেছি। মানুষ আগে তালগাছ-লম্বা ছিল, এ-খবর এত বছর ধরে, ধরে রেখেছিল কারা? যদি বলি, হিন্দুরাও ছিল তাদের মধ্যে, তুমি তা হলে হেসে গড়িয়ে পড়বে। হাসছ? হেসে নাও। আর্য হিন্দুরা এত জ্ঞানের ভাণ্ডারী নয়, একথা বলেছেন বটে একদল পণ্ডিতমূর্খ প্রাচ্য বিজ্ঞানী। যথেষ্ট অপমান করা হয়েছে আমাদের— কিন্তু প্রতিবাদ তো করেছিলেন একজন সাহেব। বেলি মাহেব। তার চাইতেও বড় কথা, রাশি রাশি অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। ৮৭,০০০ বছর ধরে যা ঘটেছে, তার হদিস পাওয়া গেছে মিশরীয় রাশিচক্রে। কাজটা আর এক সাহেবই করেছেন। হিন্দুদের হিসেবে পাওয়া গেছে সাড়ে আট লক্ষ বছর ধরে এই পৃথিবীতে যা ঘটেছে তার ইতিহাস। মিশরীয় পুরুষরা হেরোডোটাসকে— গ্রিক-ঐতিহাসিক হেরোডোটাসকে প্রমাণ দিয়েছে অদ্ভুত একটা ব্যাপারের... দীননাথ, অবিশ্বাসের হাসি আর একটু হেসে নাও... পৃথিবীর মেরুপ্রান্ত আর ক্রান্তিবৃত্তের মেরুপ্রান্ত এক সময়ে ছিল একই জায়গায়। আবার এই 'বেচারা' হিন্দুদের ইতিহাস থেকেই জানা গেছে, মহাপ্লাবনের তারিখ, আর... আর... সাড়ে আট লক্ষ বছর আগে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায় লুপ্ত মহাদেশ আটলান্টিকের শেষ অংশটুকু।'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, 'যাচ্চলে! লেমুরিয়ার ডুবে যাওয়ার কথা একটু ছুঁয়েই চলে এলে লস্ট আটলান্টিস-এর কিংবদন্তিতে?'

'কিংবদন্তি!' ব্যঙ্গের হাসি ভেসে উঠেছিল চাণক্যর ভোজালি ঠোঁটে, 'কিংবদন্তি বলছ কী হে?'

'স্রেফ গুলপট্টি!'

'আজ্ঞে না। লেমুরিয়া ডুবতে শুরু করে, লেমুরিয়া পালটে যেতে থাকে কোথায় জানা আছে? নেই। শুনে রাখো, নরওয়ের কাছে। তৃতীয় জাতি— '

'তৃতীয় জাতি! মানুষ জাত নাকি?' আমার স্বরে টিটকিরি।

চাণক্যর গলাবাজি আর একটু উচ্চগ্রামে, 'আজ্ঞে। ডারউইন তোমার মাথা খেয়েছে। ব্রেন ওয়াশিং! মানুষের আগে মানুষ ছিল, বাঁদর ছিল না— ভাবতেও পারছ না। ছিঃ ছিঃ!'

চাণক্যর ছিৎকার আমাকে নিভিয়ে দিয়েছিল। সেই ফাঁকে ও বলে গেছিল, 'ছিল, ছিল ছিল! অনেক আগে থেকেই মানুষ ছিল এই পৃথিবীর গ্রহে। তারা কীভাবে এল, কীরূপে ছিল যদি জানতে চাও— '

বলেই চুপ করে গেছিল চাণক্য। গুলল্লজিস্ট চাণক্য। কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছে যে। তাই লাফিয়ে উঠতে গেছিলাম। প্রফেসর এমন ঠান্ডা চোখে আমার দিকে চাইলেন যে টুপ করে বসে পড়লাম।

চাণক্য যেন একটু ম্যানেজ করে নিল নিজেকে, 'জানতেও চায় না! আশ্চর্য! থাক গে,

বেশি জানাব না। তৃতীয় জাতি এল কী করে, আমাদের পর কোন জাত আসবে— কিন্তু আর বলব না।'

আমিও চুপ করে রইলাম। প্রফেসর যেন মূর্তিমান বানিয়ান বৃক্ষ।

গুল-গ্যাস যার পেটের মধ্যে ভুস ভুস করে, সে কি বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে? নিজে থেকেই ফের মুখ খুলেছিল চাণক্য। ঝড়ের বেগে যা বলে গেছিল, তা গাঁজার কলকে দিয়েই বেরোয়।

'তৃতীয় জাতটার সমাপ্তি ঘটে গেল লঙ্কায়।'

'লঙ্কায়! সিংহলের লঙ্কায়!' আঁতকে উঠেছিলাম আমি।

কর্ণপাত করল না চাণক্য, 'লেমুরিয়ানদের আসলে যা ছিল বিশাল মহাদেশ, তার টুকরো এই সিংহল... লঙ্কা।'

আমার ভেতরে তখন লঙ্কার ঝাঁঝ। কিন্তু প্রফেসরের ভয়ে— চাণক্য চালিয়ে যাচ্ছে, 'মূর্খ! মূর্খ এই ভূবিজ্ঞানীরা। সমুদ্রের তলায় ডুবো মহাদেশের তলায়ও যে মহাদেশ চাপা পড়ে থাকতে পারে, তা নিয়ে কক্ষনও ভেবেছে? ভাবেনি, সমুদ্র যতটা গভীর, তারও গভীরে মহাদেশ তলিয়ে গেছে কিনা। তা জানবার বিদ্যে নেই ইচ্ছেও নেই। মূর্খ! মূর্খ! মূর্খ! যেদিন তা জানা যাবে, আজকের তত্ত্বকথা গ্যাসের বেলুনের মতো ফেটে উড়ে যাবে। বেরিয়ে আসবে লেমুরিয়া, বেরিয়ে আসবে আটলান্টিস।'

'লস্ট আটলান্টিস!' বাঁকা সুরে বলেছিলাম আমি।

'জি হ্যাঁ, লস্ট আটলান্টিস! যাদের ছোঁয়া থেকে গেছিল লঙ্কার আগের সভ্যতার। কতবার ডুবেছে আর উঠেছে এই লেমুরিয়া, এই আটলান্টিস। আবার যে উঠবে না তা কে বলতে পারে?'

'তা ঠিক! তা ঠিক! তা ঠিক। আর একটা প্লাবন আসুক!' টিপ্পনীটা আমার, কিন্তু গ্রাহ্য করল না চাণক্য।

'উঠবে, আবার উঠবে— নব কলেবরে উঠবে, আগের সেই লেমুরিয়া, সেই আটলান্টিস আর নেই। পালটাচ্ছে।'

'জলের তলায়?'

গভীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকে চাণক্য বললে, 'হ্যাঁ, জলের তলায়।'

'তুমি দেখে এলে বুঝি?' প্রফেসর এত গম্ভীর কেন?

ততোধিক গম্ভীর হয়ে গিয়ে চাণক্য বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

ঘরে নৈঃশব্দ্য।

নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করেছিল চাণক্য স্বয়ং। গলার স্বর খাদে নেমে এসেছিল, 'সে কথা বলার আগে এই সবজান্তা দীননাথের জ্ঞানের খুপরিটা একটু ভরে দিই। লেমুরিয়া— তৃতীয় মানব জাতির দোলনা বললেই চলে, ছিল প্রশান্ত আর ভারত মহাসাগরের বিশাল জায়গা জুড়ে। কিন্তু ঘোড়ার খুরের আকারে এগিয়ে গেছিল মাডাগাস্কারের পাশ দিয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে বেড় দিয়ে, আটলান্টিকের ভেতর দিয়ে নরওয়ে পর্যন্ত, দীননাথ, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চাই?

"উইয়ালডেন' লেক-এর নাম শুনেছ? শোনোনি। ইংলিশ ফ্রেশ-ওয়াটার ডিপোজিট। ভূবিজ্ঞানীরা তো বলেই খালাস, বহু যুগ আগে ওখানে একটা নদী ছিল, কিন্তু সে-নদীটা কোন আমলের, তা আর বলতে পারেনি। আমি বলে দিচ্ছি। উত্তর লেমুরিয়ান আমলের।'

আর চুপ করে থাকা গেল না, 'লেমুরিয়া যে আদৌ ছিল, কোনও বৈজ্ঞানিক তা বলেছেন?'

ভেবেছিলাম, মোক্ষম খোঁচা মারা গেছে। কিন্তু চাণক্যকে রোখে কে? সমান তেজে জবাব দিয়েছিল, 'বলেছেন, প্রফেসর বার্থওল্ড সীম্যান।'

প্রফেসর এই প্রথম চাণক্যর গুলপট্টিতে মশলার জোগান দিয়ে গেলেন, 'প্রফেসর সীম্যান আরও তো বলেছেন।'

'সেটা আর বলতে দিচ্ছে কোথায় এই দীননাথ? আজকের অস্ট্রেলিয়া আর ইউরোপ—দুটোই যে সেকালের এক মহাদেশের ভাঙা টুকরো, তা জোরের সঙ্গে বলছেন। তার ফলেই, ঘোড়ার খুরের আকৃতির মহাদেশ থিয়োরির বাকিটুকুও মিলে যাচ্ছে।'

টুক করে জুড়ে দিলেন প্রফেসর, 'আটলান্টিকের তলায় ন'হাজার ফুট উঁচু যে পর্বতশ্রেণি দু'হাজার থেকে তিন হাজার মাইল জুড়ে, সেটা কোথায় কোথায় গেছে?'

উৎসাহ পেল চাণক্য, 'দক্ষিণে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত। তারপর নব্বই ডিগ্রি কোণে বেঁকে গিয়ে সটান চলে গেছে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত। সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব লাইনে ট্রিস্তান দ্য কুনহা পর্যন্ত এই জলে ডুবে থাকা আটলান্টিক মহাদেশ।'

'আর লেমুরিয়া মহাদেশ?' সুর আমার বেঁকা।

চাণক্যর জবাব কিন্তু সোজা, 'ভারত মহাসাগরের তলায়। ডুবে থাকা ঘোড়ার খুরের মতো পাহাড়ের লাইন সেখানেই শেষ হয়েছে।'

'আটলান্টিকের তলায় যা আছে, তা তা হলে লেমুরিয়ারও অংশ?'

'তারই নাম আটলান্টিস।'

আমি চুপ।

চাণক্য মুখর, 'আটলান্টিস আরও উঠেছিল জলের ওপরে চতুর্থ মানব জাতির বিশেষ দরকারের জন্যে।'

'চতুর্থ।'

'আজ্ঞে। চতুর্থ মূল জাতি।'

'আমরা তা হলে কী?'

'পঞ্চম মূল জাতি। আমাদের পূর্বপুরুষ আর যাই হোক, বাঁদর অন্তত ছিল না।'

আমি তেড়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। প্রফেসর তার আগেই বললেন, 'চাণক্য, লস্ট আটলান্টিস নিয়ে প্লেটো যা লিখেছিলেন, তা আটলান্টিসের শেষ অবস্থা নিয়ে। মনে হচ্ছে, তুমি তার আগের অবস্থা দেখে এসেছ?'

'এসেছি', বলেই, মুখে চাবি দিয়েছিল চাণক্য।

অনেকক্ষণ পর প্রফেসর বলেছিলেন, 'তত্ত্বকথার কচকচানিতে দীননাথের সব গুলিয়ে

যাচ্ছে, তাই না দীননাথ? চাণক্য, তুমি শুরু করলে বামিয়ান বুদ্ধমূর্তি নিয়ে, চলে এলে লোগোগ্রাম, গুপ্তবিজ্ঞান আর ইস্টার আয়ল্যান্ডের সাতাশ ফুট মূর্তিদের কথায়, তারপর গেলে লেমুরিয়া মহাদেশের বৃত্তান্তে, এখন এলে আটলান্টিসের ব্যাপারে। কেন, চাণক্য, কেন?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলে আরাম আছে', খুশি খুশি মুখে বললে চাণক্য চাকলাদার, 'খেই ঠিকই ধরে রেখেছেন। বানিয়ান বুদ্ধ পেল্লায়, কিন্তু যে পাথর দিয়ে গড়া, তা আটলান্টিক অঞ্চলের আগ্নেয়দ্বীপে আজও পাওয়া যায়। বামিয়ান তো আফগানিস্তানে— হিন্দুকুশ কে উড়িয়ে নিয়ে গেল? ইস্টার আয়ল্যান্ডের সাতাশ ফুট মূর্তিগুলো করোটির গড়নে উন্নত মেধার ছাপ বহন করছে। পিরামিডের পেল্লায় একই মাপের পাথরগুলো ওই অঞ্চলের নয়। বিলেতের স্টোন হেঞ্জ পাথরগুলোও অন্য জায়গা থেকে আনা হয়েছে। কেন? কেন? এইসব ভাবনা নিয়ে চলে গেছিলাম আটলান্টিকের একটা একচিলতে আগ্নেয় দ্বীপে। সেখানে... সেখানে...'

বলেই থেমে গেল চাণক্য। কারণ ছিল। বাইরের বাগানের খোলা জায়গায় হঠাৎ একটা সাতাশ ফুট লম্বা দৈত্য-মানুষকে দেখলাম জানলার মধ্যে দিয়ে।

চাণক্যও তাকে দেখেছিল। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গেল, 'এসো! এসো! এসো।'

সেইদিন, সেই মুহূর্তে আমার বোধহয় সাময়িকভাবে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। খোদ বামিয়ান বুদ্ধর মতো স্ট্যাচু হয়ে গেছিলাম। আমি নাকি দীননাথ নাথ? মার্কামারা মারকুটে দাঙ্গাবাজ বেপরোয়া? তবে স্ট্যাচু কলেবরে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছিলাম কেন?

সেদিন ছিল বুদ্ধপূর্ণিমার রাত। বাগান ভেসে যাচ্ছিল সাদা চাঁদের আলোয়। ধবধবে সেই আলোয় এতক্ষণ তো কিছুই দেখা যায়নি! আমি তো জানলার দিকেই চেয়ে ছিলাম। আচমকা মনে হয়েছিল যেন চাঁদের আলো সাদা কুয়াশার মতো জমে যাচ্ছে। তাই ভাল করে তাকিয়েছিলাম। চোখের পাতা ফেলতে যেটুকু সময় যায়, তার মধ্যেই সেই সাদা কুয়াশা নিরেট হয়ে গেছিল। সাদা পাথরের মতো বিরাট একটা মূর্তি দেখেছিলাম। গোটা মূর্তিটা দেখতে পেয়েছিলাম, মাথা থেকে পা পর্যন্ত। অবিকল একটা মানুষ। কিন্তু গালিভারের মানুষ-দৈত্যের মতো বিশাল। অদ্ভুত পোশাক। সে সবের বিবরণ দিতে পারব না। ভাল করে দেখিনি। দেখেছিলাম শুধু চোখ, সম্মোহনী দৃষ্টি জানলার মধ্যে দিয়ে যেন আমাকে গেঁথে রেখেছে।

তার পরেই মাথার মধ্যে কথা বলা হচ্ছে টের পেয়েছিলাম। কথাটা এই, 'তুমিই তা হলে দীননাথ? তোমার আজগুবি গল্পের রিপোর্ট সাগরের নীচে আমাদের পাতাল মহাদেশে ঠিক-ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়। তোমার সাহস আছে, কিন্তু দুঃসাহস নেই।'

আর যায় কোথায়! আমার হাঁটুর ঠকঠকানি তক্ষুনি বন্ধ হয়ে গেছিল। তেড়ে উঠতে গেছিলাম, কিন্তু মাথার মধ্যে ধমক শুনেছিলাম, 'চোপ! চাণক্য চাকলাদারকে আমরাই

বিজনদ্বীপ থেকে অ্যাসট্রাল বডি বানিয়ে নিয়ে গেছিলাম আমাদের পাতাল মহাদেশে। আমরা ছিলাম, আছি, থাকব। আমরা অতিকায়। আমরাই পৃথিবীর আদি মানুষ। আমরাই গড়েছিলাম অতিকায়দের। ফেলে চলে যেতে হয়েছিল পৃথিবীময় ওলোটপালোট কাণ্ড চলছিল বলে। আবার আমরা আসব— সশরীরে। এই শরীর নিয়ে নয়। ঘাড় বাড়িয়ো না, দীননাথ, তোমার ঘাড় যত লম্বাই হোক, ধাঁ করে কোত্থেকে এখুনি নেমে এলাম, তা দেখতে পাবে না। কেননা, আমি এসেছি সাগরের তলা থেকে চিন্তা-শরীর নিয়ে— তোমার গাড়োয়ানি তর্ক চাণক্যকে বিচলিত করেছিল বলে। কী ভাবছ, তা বুঝেছি। আমাদের মহাদেশে যেতে চাও। নিয়ে একদিন যাব। সেদিন চাণক্যকে আর আফিংখোর বলে ব্যঙ্গ করবে না।'

বুদ্ধ পূর্ণিমার চাঁদের আলো বিলকুল সাফ হয়ে গেল। বামিয়ান বুদ্ধর মতো পেল্লায় আকৃতিটা দুম করে গলে গিয়ে যেন চাঁদের আলোয় মিলিয়ে গেল।

ঠিক যেখানে মিলিয়ে গেল, সেখানে দেখলাম একটা কিউব আকারের চৌকোনা পাথর পড়ে রয়েছে। পরে দেখেছিলাম তার এক-একদিকে এক-একটা সাংকেতিক চিহ্ন খোদাই করা। জীবন্ত লোগোগ্রাম।

কেননা, কিউবের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু প্রশ্ন ভাবলেই চিঁ-চিঁ গলায় জবাব দেয়।

কী বলবে পাথরটাকে? জীবন্ত? বিশ্বাস না হয় প্রফেসরের বৈঠকখানায় পায়ের ধুলো দিলেই হয়!

ডার্ক এনার্জি

আফগানিস্তানের ঘটনা, বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদীদের উল্লাস, গম্ভীর করে তুলেছিল প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে। কোনও কথা বলতেন না। কথার জবাব দিতেন না। শুধু উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

অকারণে তাকিয়ে যে থাকতেন না, তা যথাসময়ে বুঝেছিলাম। হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম।

আমেরিকান বিমান কতদূর আর পৌঁছেছে? কাবুল, কান্দাহার ছারখার হয়ে যাচ্ছে, দিল্লির পার্লামেন্ট উড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেল— আরও হবে... আরও হবে— মৌলবাদীদের রণহুংকার যেন আকাশে বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সেইজন্যেই কি দুই কানে তুলো এঁটে বসে থাকেন প্রফেসর? চেয়ে থাকেন আকাশের দিকে। আমার তো মনে হয়েছিল কিছু একটার প্রতীক্ষা করছেন।

আমি ভেবেছিলাম, আমার কথা অসহ্য মনে হচ্ছে বলেই হয়তো কানে তুলো এঁটেছেন। মুখ চুন করে পাশে বসে থাকতাম। কথা বলতাম না।

ভুল বুঝেছিলাম।

ভুলটা ভাঙল সেইদিন যেদিন ছোট্ট মার্বেলগুলিটা দেখলাম ওঁর পায়ের কাছে মেঝের ওপর।

একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন গুলিটার দিকে। চোখ চকচক করছে।

সবচেয়ে স্বস্তির ব্যাপার, ওঁর কানে তুলোর ডেলা দুটো নেই।

সাহস করে তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কীসের গুলি, প্রফেসর?'

দুই চোখে বিপুল অনুকম্পা জাগিয়ে উনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'দীননাথ, ডার্ক এনার্জির নাম শুনেছ?'

আমার বিদ্যে-বুদ্ধির দৌড় কারুর অজানা নেই। কিন্তু বারফট্টাইয়ের জোর তো আছে। তাই বলেছিলাম, 'কালো শক্তি'। বলেই একটু ভাবলাম। তারপর সরলভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সেটা কী, প্রফেসর?'

উনি রেগে যাননি। শুধু বলেছিলেন, 'শূন্যের শক্তি।'

'শূন্যের আবার শক্তি কী?' কথাটা ফস করে বেরিয়ে গেছিল মুখ দিয়ে।

তাতেও উনি রাগ করেননি। অথচ উনি বিলক্ষণ রগচটা, বিশেষ করে আমার ওপর।

শুধু বলেছিলেন, 'শূন্য জায়গারও শক্তি আছে, দীননাথ। অ্যারিস্টটল 'কুইন্টেসেন্স' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন এই শূন্যস্থানকেই বোঝানোর জন্যে। আর আজকে? শূন্যের বিরাট ভূমিকা রয়েছে পদার্থের কোয়ান্টাম মেক্যানিক্সে। মহাশূন্য মানেই যে শূন্য, তা নয়। সেখানেও আছে শক্তি... ভয়ংকর শক্তি।'

'ডার্ক এনার্জি?'

'ইয়েস, মাই বয়। ডার্ক... ভেরি ডার্ক।'

'ডার্ক' শব্দটা কীরকম যেন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বলে গেলেন প্রফেসর। কানে খটকা লেগেছিল বলেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'শুভ, না অশুভ?'

বলেই, কাঠ হয়ে গেলাম। মানে, আমার এই ছ'ফুট দু'ইঞ্চি বডিটা শক্ত কাঠ হয়ে গেল, স্রেফ ভয়ে।

প্রফেসর নিদারুণ চোখে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

প্রফেসর যেন আর প্রফেসর নেই। তিনি অন্য কেউ।

পরক্ষণেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কাটা কাটা স্বরে এই ক'টা কথা, 'ছোকরা, তোমাকে দিয়েই কাজ হবে।'

আমার রক্ত জল হয়ে গেল সেই কণ্ঠস্বর শুনে। প্রফেসরের কণ্ঠস্বর মোটেই নয়। উনি হাজার চেষ্টা করলেও এরকম ভয়াল ভয়ংকর স্বরে কথা বলতে পারতেন না। তার চেয়েও বড় কথা, প্রফেসর মানুষটা মাটির মানুষ। মাঝে মাঝে খেঁকিয়ে ওঠেন বটে, কিন্তু অন্তরে দাগা দিয়ে কুথা বললেও পরক্ষণেই তা শুধরে নেন। কিন্তু এই প্রথম প্রফেসরকে দেখলাম অন্যরকমভাবে। এমন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন, সে-চোখকে বোঝানোর ভাষা পৃথিবীর কোনও ডিকশনারিতে নেই। আমার ডিকশনারিতে তো নেই-ই।

আমি বেপরোয়া হয়ে গেলাম। বেপরোয়া হয়ে গেলে আমার মুখ দিয়ে যা-তা কথা বেরিয়ে আসে।

বললাম, 'প্রফেসরের মধ্যে তুমি কে বসে আছ, বাছাধন?'

কীরকম একটা রক্তজল-করা হাসি হাসলেন 'প্রফেসর।' আমার মতো ডাকাবুকো মারদাঙ্গা মানুষটারও রক্ত জল হয়ে এল তৎক্ষণাৎ।

'মূর্খ!' বললেন 'প্রফেসর', 'আমিই সেই ডার্ক এনার্জি— যার কথা শুনছিলে তুমি এতক্ষণ।'

'প্রফেসরকে দখল করেছ? আস্পর্ধা তো কম নয়! ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে—'

'প্রফেসর' এমন একখানা হাসি হাসলেন যে আমার জল-রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কোনও মানুষকে এমন ভয়ানক হাসি হাসতে দেখিনি।

'সে' বললে, 'আমার আরাধনা করা হয়েছে বলেই আমি এসেছি।'

'কে, কে আরাধনা করেছে?'

'তোমার গুরু।'

'প্রফেসর?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমি যে কালো শক্তি। যে-শক্তি পুজো করে তোমাদের এই পৃথিবীর অকাল্ট বিজ্ঞানীরা হাজার হাজার বছর ধরে মির্যাকল্ দেখিয়ে গেছে, আমিই সেই ডার্ক এনার্জি।'

'ও হো। প্রফেসর একটু আগে বলছিলেন বটে। তা হলে উইচগুলো... ব্ল্যাক আর হোয়াইট উইচক্র্যাফটে তোমার আরাধনাই করা হয়?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য।'

'মহামূর্খ! আজকের কোয়ান্টাম মেক্যানিক্স আমার অস্তিত্ব আঁচ করেই হতভম্ব হয়েছে। আমি যে আসলে কী বা কে— ধরতেও পারেনি।'

'যাক গে। ফালতু না-বকে, কাজের কথা বলো।'

'তোমার সাহস তো কম নয়। ট্যারা ট্যারা কথা বলছ। জানো তোমাকে ধোঁয়া বানিয়ে দিতে পারি?'

'বয়ে গেল,' আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। 'প্রফেসর' সেইরকম অমানুষিক চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'তোমাকে দিয়েই হবে।'

'কী হবে?' ঝেঁঝে উঠে বলেছিলাম।

'কাজ।'

'কী কাজ? ঝেড়ে কাশো।'

'প্রফেসর' একটু কাষ্ঠহাসি হাসলেন। আমার তেরিয়া মেজাজ দেখে কালো শক্তিও ঘাবড়ে গেছে মনে হল। ঘাবড়াবেই তো। আমার নাম দীননাথ নাথ। 'সময় গাড়ি' অ্যাডভেঞ্চারে কী কাণ্ড করেছিলাম, তা কি ভোলবার? সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত—

কাষ্ঠহাসি থামিয়ে 'প্রফেসর' বললেন, 'আমি এখানে এসেছি কীসে চেপে জানো?'

ইতিউতি চেয়ে দেখে বললাম, 'মহাকাশ যান-টান কিছু তো দেখছি না।'

'গুলিটা তো দেখছ।'

'মার্বেলগুলি? পায়ের কাছে পড়ে? গুলিতে কেউ চাপে, জানতাম না। গুলি নিয়ে তো খেলে। আমি কত খেলেছি।'

'এখন খেললে হয় না?'

এককালের গুলি-চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ! তৎক্ষণাৎ হেঁট হয়ে গুলিটা তুলতে গেলাম মেঝে থেকে...

পারলাম না। সেঁটে বসে রয়েছে মেঝেতে।

'ম্যাগনেটিক গুলি নাকি?' এবার কাষ্ঠ হাসি হেসেছিলাম আমি।

'তোমার মাথা। সিমেন্টে ম্যাগনেট আটকায়?'

'তা হলে?'

'ওয়েট। এত ভারী যে তোলবার মুরোদ তোমার নেই।'

'হেভি মার্বেল। এই তো? কত হেভি?'

'প্রফেসর' এমন একটা হাসি হাসলেন যাকে অনায়াসেই বলা যায়, পৈশাচিক হাসি। রক্ত হিম

করার মতো হাসি। বললেন কাটা কাটা স্বরে, 'লুব্ধক নক্ষত্র' তো একটা ভীষণ উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার পাশের নক্ষত্রটাকে আগে তো দেখাই যায়নি, এত ছোট। তা হলে কেন দুটো নক্ষত্র হেলেদুলে দু'জনে দু'জনকে পাক মেরে মেরে চলছে?'

অ্যাসট্রনমিতে আমি ক অক্ষর গোমাংস। তাই চুপ করে রইলাম।

'প্রফেসর' নামক কালো শক্তি বললে, 'আমার জন্যে।'

'মা মানে?'

'লুব্ধক নক্ষত্রের'-এর পাশের নক্ষত্রটা তোমাদের চাইতেও ঘন। কত ঘন? ইডিয়ট। সেই নক্ষত্রের এক টন তোমাদের এখানে একটা পুঁচকে পুঁতি।

'গুল!'

জ্বলে উঠলেন 'প্রফেসর', 'স্টুপিড কি সাধে বলে? ব্রহ্মাণ্ড রহস্যের কতটুকু জানো ছোকরা? কোয়ান্টাম মেক্যানিক্সও হালে পানি পাচ্ছে না।'

আমি 'প্রফেসর'কে ঠান্ডা করার জন্যে বললাম, 'বেশ, বেশ, তুমি খুব ভারী। কিন্তু হেভিওয়েট হয়ে, এলে কী করে ফেদারওয়েটের মতো?'

'কালো শক্তির জোরে।'

'তোমার?'

'হ্যাঁ, আমার।'

'কিন্তু কেন?'

'প্রফেসর যে ডাকলেন।'

'প্রফেসর। তোমাকে ডাকলেন?'

'ওই হল। আমার কথা ভাবছিলেন তো। তাই এলাম।'

'তোমার কথা ভাবতে যাবেন কেন? উনি ব্ল্যাক পাওয়ারের ম্যাজিশিয়ান নন— সায়ান্টিস্ট।'

'ছোকরা'। ফের চোখ জ্বলে উঠল 'প্রফেসর'-এর, 'নাজকা-র মরুভূমি দেখেছ?'

'নাজকা! সেটা কোথায়?'

'দক্ষিণ পেরুতে। সেখানকার শুকনো জমিতে এমন সব আঁকিবুকি আছে যা মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে বৈজ্ঞানিকদের। পাথরের পর পাথর ফেলে গড়া সোজা লাইন— মাইলের পর মাইল লম্বা, ত্রিভুজ, চৌকোনা, তে'কোনা, ছ'কোনা ঘর, রানওয়ে—'

'রানওয়ে?'

'অ্যাসট্রোপোর্ট-এর রানওয়ে। তোমাদের যেমন এয়ারপোর্ট-এর রানওয়ে, এও তেমনি— স্পেসশিপ নামবার জায়গা।'

'কী আবোল-তাবোল বকছেন?'

'টেনে এক চড় মারব।'

চুপ করে গেলাম। প্রফেসর কক্ষনও চড় মারতে চাননি আমাকে। ওঁকে নিশ্চয় ভূতে পেয়েছে। মুখে চাবি দিয়ে রইলাম।

'প্রফেসর' বললেন, 'আজও নাজকা মরুভূমির হেঁয়ালির সমাধান ঘটেনি। সায়ান্স-ফিকশন লেখবার মতো খোরাক হয়েছে সেখানে— অথচ গবেট লেখকরা কলম ধরেনি। তুমিও তাই।

তাই একটু বুদ্ধি দিতে চাই। একই সঙ্গে প্রফেসর যা চাইছেন, তাও হয়ে যাবে।'

'প্রফেসর কী চাইছিলেন?'

'দুনিয়া জোড়া টেররিস্ট তাণ্ডবের অবসান ঘটুক।'

'তাতে আমার, ইয়ে, তোমার অবদানটা থাকছে কী করে?'

'বোকচন্দর। চোখ বুজে থাকো। চলো তোমায় দেখিয়ে আনি।'

তারপর যে কী হয়ে গেল, আমি জানি না। বলতেও পারব না।

খেয়াল যখন হল, দেখলাম দিগন্তব্যাপী এক মরুভূমির ওপর দিয়ে সাঁ-সাঁ করে উড়ে যাচ্ছি। নিজে নিজে উড়ছি না। একটা গুলি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই যে গুলিটা, প্রফেসরের পায়ের কাছে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেই গুলিটা আমাকে তার পিঠে বসিয়ে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আর বকর বকর করে চলেছে, 'এক সময়ে মস্ত নক্ষত্র ছিলাম, তোমাদের সূর্যের চেয়ে একশোগুণ বড়— কোলাপস করে এইটুকু হয়ে গেছি। বয়ে গেল। কালো শক্তি তো পেয়েছি। তাই কালো জাদুর খেলা তোমাকে দেখাচ্ছি। তুমি এখন উড়ে যাচ্ছ মাটি থেকে পাঁচশো মিটার উঁচু দিয়ে। তাই নিচের ম্যাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। কী আশ্চর্য জ্যামিতিক নকশা বলো তো! এই পৃথিবীর মানুষ তো তখন অজ্ঞানের অন্ধকারে। অন্য গ্রহ থেকে, অন্য নক্ষত্রলোক থেকে দলে দলে গ্রহবাসীরা আসত এখানে পিকনিক করতে। এইসব তারাই বানিয়েছে।'

মিনমিন করে বলেছিলাম সাঁ-সাঁ করে উড়ে যেতে যেতে, 'কোত্থেকে এসেছিল?'

'যাচ্চলে! তাও বুঝছ না।' 'ওই যে ল্যাজটা... হনুমানের ল্যাজের মতো পাক খাওয়া লাইনটা মাটির ওপর আঁকা রয়েছে... ওই চিহ্নটা দেখেও বুঝলে না?'

'না—'

'একদম হেঁড়ে মাথা। সপ্তর্ষিমণ্ডলকে চিনতে পারছ না?'

'ও-ইয়ে—'

'অনেক দূরের নক্ষত্রমণ্ডল থেকে ওরা এসেছিল। ওদের আসল শক্তি ছিল ব্ল্যাক পাওয়ার। এখনও রয়েছে... টের পাচ্ছ?'

'কী?'

'আচ্ছা গবেটকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আরে আমিই সেই কালো শক্তি... অনেক অজানা অদ্ভুত শক্তি রয়েছে যেসব ডার্ক পার্টিকল-এর মধ্যে মহাশূন্য জুড়ে— আমার মধ্যেও রয়েছে সেই শক্তি...'

'আমাকে এসব দেখাচ্ছ কেন?...'

'তুমি প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের চ্যালা বলে।'

'চ্যালা তো কী হয়েছে?'

'এই আমি, কালো গুলিটা, যদি গড়িয়ে গড়িয়ে যাই টেররিস্ট দেশগুলোর ওপর দিয়ে কী হবে জানো?'

'না।'

'আমার কালো শক্তির বিকিরণ ওদের মগজ সাফ করে দেবে, স্কুল থেকে ওদের যে হিংসার

বাণী মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা সাফ হয়ে যাবে। ওরা মানুষকে ভালবাসতে শিখবে—'

'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশ করতে শিখবে?'

'খুব ভাল ভাল কথা বলছ যে, আমার ছোঁয়া পেয়ে—'

'ধুস। এটা রবীন্দ্রনাথের কথা।'

'সেটা আবার কে?'

'আমাদের দেশের মহাকবি।'

'ভাগ্যবান মানুষ তোমরা। এমন একজন মানুষ পেয়েছিলে। আমরা ডার্ক পার্টিকলরা, এই বাণীই ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি। মূর্খরা আমাদের ভয়ংকর শক্তি মনে করে—'

'বুঝতে পারে না তো।'

'তুমি? তুমি পেরেছ?'

'হাড়ে হাড়ে।'

'তা হলে বেরিয়ে পড়ো।'

'কো-কো-কোথায়?'

'দেশে দেশে। আমার ওপর চেপে। যেখানে যেখানে টেররিস্ট, সেখানে সেখানে নিয়ে যাব তোমাকে। দেখবে কালো শক্তির কালো আলোয় সব মানুষের মন সাদা হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী আর হিংসায় উন্মত্ত থাকছে না। চলো... চলো... চলো।'

সেই থেকে টোটো করছি কালোগুলিতে চেপে। টের পাচ্ছে অবশ্য বিশ্বজন। ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে হিংসার বিষ।

কালো গুলি কিন্তু খেল দেখিয়ে যাচ্ছে এরই মধ্যে, যেখানে যেখানে বেশি টেঁটিয়াপনা, সেখানে সেখানে প্রলয় রচনা করে চলেছে। যেমন, অ্যাটমিক সেন্টারের একদিক দিয়ে ঢুকে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে— আমাকে অবশ্য অনেক দূরে নিরাপদে বসিয়ে রেখে দেখিয়ে দিচ্ছে ডার্ক এনার্জি কী অসম্ভব কাণ্ডই না করতে পারে। ছেঁদা করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক কেন্দ্রগুলো মহাপ্রলয় সৃষ্টি করে শূন্যে বিলীন হচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ। ওর মাথায় যেন খুন চেপেছে। কোথায় কী লুকোনো আছে, সব ওর নখদর্পণে। মহাশূন্যে বসে এতদিন ঠাহর করেছিল বোধহয়। প্রফেসরের আবাহনে পৃথিবীতে, ইয়ে, মর্ত্যে আবির্ভূত হয়ে মানুষের যুদ্ধের নেশা ছুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। গোটা পৃথিবী জুড়ে আতঙ্ক আর হাহাকার দেখা দিয়েছে। তার চেয়ে বেশি জেগেছে শান্তিকামী মানুষের উল্লাস। কাগজে কাগজে, রেডিয়ো আর টিভিতে দিনরাত দেখা যাচ্ছে একই দৃশ্য। অলৌকিক আঘাতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ধ্বংসদূতদের এক-একটা ঘাঁটি নিমেষে নিমেষে... কালো ধোঁয়ার কালো মেঘে পৃথিবী ঢেকে গেছে। চাঁদ সূর্য তারাদের দেখা যাচ্ছে না। হতভম্ব যুদ্ধবিশারদরা কিছুই বুঝতে পারছেন না। কিন্তু একটু একটু করে টেররিস্টরা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাদের মাথায় শান্তি আর বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ উপ্ত করে দিয়ে যাচ্ছে কালোগুলি। ভালবাসো, ভালবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো...।

তারপর? সবশেষে?

আমি মিনমিন করে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ গো, ডার্ক এনার্জি। আমি বড়ই অজ্ঞ। আমার মাথা ঘুরছে। কিন্তু একটা দেশ দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। দেখাবে?'

ডার্ক এনার্জি আমার কানের কাছে ফোঁস ফোঁস করে বললে, 'সেটা মুখে না-বললেও আমার বোঝা হয়ে গেছে। আমি যে অন্তর্যামী, আমিই এই মানুষগুলোর ভগবান, আমিই এই নরাধমগুলোর শয়তান। যে যেভাবে আমাকে চেয়েছে, সেইভাবে পেয়েছে। সবসেরা ডাক ডেকেছে তোমাদের এই প্রফেসর। লোকটা বড় ভাল। তুমিও ছোকরা একটু ড্যাকরা হলেও খারাপ নয়। তোমার শেষ ইচ্ছা হয়েছে নাজকা দেখার?'

আঁতকে উঠে বলেছিলাম, 'শেষ ইচ্ছে হতে যাবে কেন?'

'আম্বা দেখে আর বাঁচি না। এতটা মেহনত করলাম যখন—'

'মেহনত তো আমারও হল। জান কয়লা করে দিলে। গোটা পৃথিবী জুড়ে শুধু কালো ধোঁয়া—'

'ছোকরা, মেহনত খুবই করেছ। নাজকা দেখবার শখ যখন হয়েছে, তাও দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর দেব এমন একটা জিনিস, যা তোমার সারাজীবন কাজে লাগবে।'

'কী?'

'গুপ্তধন।'

'অ্যাঁ? কে? কে গুপ্ত করেছিল?'

'ক্যাপ্টেন কীড।'

'আরে সে তো একটা বদমাশ লোক।'

'এমনই বদমাশ যে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ছিঁড়ে মেঝেতে আছড়ে পড়েছিল গলায় ফাঁস নিয়ে।'

'ডাকু নাম্বার ওয়ান।'

'ইয়েস, মাই বয়—'

'আই অ্যাম নট বয়।'

'ইউ আর আ কিড টু মি।'

'কিড!'

'বাচ্চা ছেলে। তাই তোমাকে দেখিয়ে যাব কোথায় আছে কীডের গুপ্তধন।'

'কি—কিন্তু কীড তো বলে যায়নি ঠিক কোথায় কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার ডাকাতে-ধনরত্ন।'

'ধরে নেওয়া তো হয়েছে কোথায় কোথায় আছে?'

'নিউ-ইংল্যান্ড আর লঙ আয়ল্যান্ডের উপকূলের কোথাও।'

'ঠিক। ছোঁড়া খবর রাখে দেখছি। ইচ্ছে হচ্ছে না, মরেও যা দিয়ে যায়নি কীড, তার মালিক হওয়ার?'

'না।'

'সে কী?'

'ডাকাতের গুপ্তধন আমার চাই না।'

‘এইজন্যেই তো তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। নির্লোভ বলে। আমি তো জানি রক্তমাখা সেই *ধনরত্ন নিয়ে নিজে ফূর্তি করবে না।— কী করবে, দীননাথ?’*

‘আ-আমি? যদি পাই...যদি পাই... এমন কাজ করব যাতে এই সবুজ পৃথিবীকে কালো করার মতো অস্ত্র যেন আর বানানো না হয়।’

‘গুড। ভেরি গুড। এইজন্যেই পাবে তুমি কীডের গুপ্তধন। চলো।’

সাঁ করে উড়ে গেলাম মেঘলোক ভেদ করে। সাঁ করে চলে এলাম সেই ধুধু মরুপ্রান্তরের মাথায়।

ডার্ক এনার্জি ফিসফিস করে বললে, ‘এই তোমাদের প্রাচীন পেরু। আগেও তোমাকে দেখিয়েছে।’

‘ধুস। একই মরুভূমি কতবার দেখব?’

‘ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না। কী দেখছ পায়ের তলায়? নাজকা মরুভূমি। দক্ষিণ পেরুর প্রচণ্ড প্রহেলিকা এই মরুভূমি। আজও এই মরুর বুকে আঁকা অজস্র আঁকিবুকির রহস্যভেদ হয়নি। আগেও বলেছি— আবার বলছি, তখন পুরোটা বলিনি। এখন বলছি— গুপ্তধনের পুরস্কারটা দেব বলে।’

‘ধুধু মরুভূমির কোথায় গুপ্তধন কেউ জীবনেও খুঁজে পাবে না।’

‘কিন্তু আমি তো জানি। আমি যে—’

‘ডার্ক এনার্জি।— বলো তো কোথায়?’

‘তোমার পায়ের তলায়।’

‘ওখানে তো একটা পাকসাট খাওয়া হনুমানের ল্যাজ।’

‘মুর্খ! ওইটাই কীড-এর হনুমানের ল্যাজ।’

‘কীড এই হনুমান!’

‘ছিল—একটা। তার কথা কোথাও লেখা নেই। হনুমান বলে তাচ্ছিল্য করা হয়েছিল। কীড-ও তাই চেয়েছিল। তাই চোখের ওপর রেখে দিয়েছে বিপুল ধনরত্ন— হনুমানের ল্যাজের ফাঁকে।’

‘অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাকসাট খেয়ে রয়েছে যে— তুমি তো বললে সপ্তর্ষিমণ্ডলের নিশানা—’

‘বড্ড বাচাল তুমি দীননাথ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ম্যাপটা এঁকেছিল ভিনগ্রহীরা। ধড়িবাজ কীড তারই ফাঁকে ফাঁকে ওর সই মেরে গেছে।’

‘সই!’

‘স্বাক্ষর। হনুমানের ল্যাজের মোচড়ে মোচড় মিলিয়ে।’

‘আমার মাথায় কিস্‌সু ঢুকছে না।’

‘ঢোকাচ্ছি।— কীড-এর সই কখনও দেখেছ?’

‘জীবনে না।’

‘সইটা এইরকম,’ বলে, ডার্ক এনার্জি ফুস ফুস করে ধোঁয়ার রেখা টেনে গেল শূন্যে। ভাসমান ধোঁয়ার সিগনেচার। অবিকল এইরকম:

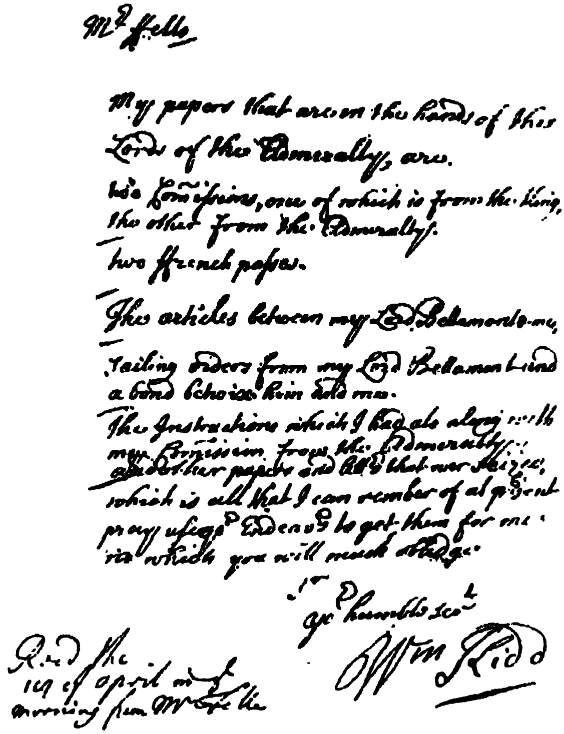

Mr [illegible]

My papers that are in the hands of the Lords of the Admiralty are.
two Commissions, one of which is from the king, the other from the Admiralty.
two ffrench papers.
The articles between my Lord Bellamont & me,
Sailing orders from my Lord Bellamont and a bond betwixt him and me.
The Instructions which I had also along with my Commission from the Admiralty, and other papers and Books that were seized, which is all that I can remember at present, pray use your Endeavours to get them for me in which you will much oblige

Sir your humble servt
Wm Kidd

Recd the 10th of April [illegible]

'ছোকরা, এইবার নীচে তাকাও।'

তাকালাম। কিছু বুঝলাম না। কীড-এর সইটা অবশ্য ঠাহর করা গেল। আঁকিবুকির মধ্যে এমন মিশে রয়েছে যে বোঝা মুশকিল। পাঁচশো মিটার ওপর থেকে দেখছি বলেই বোঝা যাচ্ছে (বুঝিয়ে দিয়েছে ডার্ক এনার্জি), নইলে চিনতেও পারতাম না। বিদ্‌ঘুটে সই। আনাড়ি হাতের সই। লেখাপড়া নিশ্চয়ই জানত না কীড। হাতের লেখা কেঁপে কেঁপে গেছে।

'বুঝলে?' কানের কাছে ঘ্যাঁচ করে উঠল ডার্ক এনার্জি।

'না।'

'মাথামোটা একেই বলে। আরে বাবা, সইটার মধ্যে ফাঁস ক'টা আছে?'

গুনে গুনে দেখলাম। টানা সই তো, ফলে কলমের টানে (গাঁইতি দিয়ে খোঁড়া) পাঁচটা 'লুপ' দেখা যাচ্ছে।

বললাম, 'ওই 'লুপ' পাঁচটা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ইডিয়ট। এইখানেই... ওই পাঁচটা জায়গায় পাঁচটা কুয়ো খুঁড়লেই পাবে পাতালের গুপ্তধন। সোনার তাল, হিরে-মানিকের পাহাড়— আরও অনেক কিছু।'

কাহিনি এবার চট করে শেষ করে দিচ্ছি। কারণ আর কিছুই নয়।

কীড-এর গুপ্তধনের লোভ পৃথিবীর দাঙ্গাবাজদের টনক নড়িয়ে দিয়েছে। তারা হদিস চাইছে। প্রফেসর দর কষাকষি করছেন, ঠিকানা কিছুতেই দেবেন না। আগে চুক্তি হোক—যুদ্ধ নয়, শান্তি।

পাঠক, ঠিকানাটা যেন গোপনে থাকে।

স্ট্রিং

'সে আসছে! সে আসছে! সে আসছে!'

'কে সে? কে সে?'

'সে এক মহাভয়ংকর। তার চাহনিতে আগুন জ্বলে, তার নিশ্বাসে ঝড় ওঠে, তার মনের অজানা কিছু নেই।'

'কিন্তু তার নাম?'

'স্ট্রিং!'

'মানব, না অমানব?'

'এই মুহূর্তে সে দানব। অপার্থিব শক্তি তার বিপুল বপুর কোষে কোষে। সে আসছে! সে আসছে!'

এই বলে মূর্ছিত হলো বারো বছরের বালিকা/কন্যাকুমারী।

থ হয়ে বসে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

আমি নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। ঠিক তাঁর পেছনে!

একটু পেছিয়ে গিয়ে কাহিনিটা শুরু করা যাক। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এক দ্বীপে একটা উল্কা আছড়ে পড়েছিল। স্যাটেলাইট ফোনে প্রফেসরের কাছে সে খবর পাঠিয়ছিলেন ডক্টর নট।

ডক্টর নট দীর্ঘদীন ধরে এক মানুষ-পুতুল তৈরি করা নিয়ে তন্ময়-সাধনা চালিয়েছিলেন। অনেকগুলো ভাষায় গড়গড় করে কথা বলে যেতেন। সংস্কৃত ভাষায় ছিল অসামান্য দক্ষতা। গীতা বলে যেতেন চোস্ত উচ্চারণে। কথায় কথায় বলে উঠতেন, 'হাজার হাজার সূর্য... হাজার হাজার সূর্য!' দিব্য তেজকে হন্যে হয়ে খুঁজেছিলেন দেশে বিদেশে, পাহাড়ে পর্বতে, অরণ্যে মরুতে, সমুদ্রে দ্বীপে...

যোগাযোগ ছিল শুধু প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের সঙ্গে। প্রফেসরকে সংক্ষেপে তিনি বলতেন 'প্রফেসর নাট'। প্রফেসারও তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলতেন, 'আর তুমি হলে নট। শূন্য! কী খুঁজছ?' প্রফেসর নট হা-হা করে হেসে বলতেন, 'হাজার হাজার সূর্যের তেজ।' প্রফেসর নাট বলতেন, 'দিব্য তেজ? বোগাস।' প্রফেসর নট বলতেন, 'সব কিছুর মূলে সেই শক্তি।'

প্রফেসর নাট বলতেন, 'খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।' অট্টহেসে প্রফেসর নট বলতেন, 'খ্যাপা-ই তো। আমি মহাখ্যাপা।'

সেই প্রফেসর নট ফোন করেছেন প্রফেসর নাটকে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে বলেছিলেন প্রফেসর নট, 'ওহে নাট! পেয়েছি! পেয়েছি! উল্কা পাথরের মধ্যে এসে গেছে সেই শক্তি তৈরির জেনারেটর। এবার বানাব এমন মানুষ-পুতুল যা ভগবান হয়ে থাকবে মন্দির-মসজিদ-গির্জায়।'

প্রফেসর নাট বলেছিলেন, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ। আছ কোথায়?'

সুইচ অফ করে দিয়েছিলেন প্রফেসর নট। ধুরন্ধর প্রফেসর নাট তৎক্ষণাৎ আমেরিকান ফোর্সকে জানিয়ে দিয়েছিলেন নট-এর ফোন নাম্বার। জিরো-ইন তদন্ত চালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর নট-এর ঠিকানা বাতলে দিয়েছিল আমেরিকান ফোর্স।

বিশেষ একটা মহাসাগরের অত্যন্ত বিজন একটা দ্বীপে গিয়েও আমরা নটকে খুঁজে পাইনি। পেয়েছিলাম বিশাল গুহার মধ্যে অলিগলি গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর এক চক্ষুস্থির করা প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরি, গোপন গবেষণাগার। আধুনিকতম সেই গবেষণাগারের বর্ণনা দিতে গেলে ইয়া মোটা কেতাব লেখা হয়ে যাবে। তাই আমি শুধু বলব, তাজ্জব সেই সৃষ্টির কথা। গোপন গবেষণাগারে যাকে বানিয়েছিলেন প্রফেসর নট—তার কথা।

সে একটি মেয়ে। বালিকা, কন্যাকুমারী। সে প্রকৃতই অপার্থিব। কারণ তার শরীরের সবকিছুই পার্থিব উপকরণ দিয়ে নির্মিত হলেও সে মনুষ্য দুহিতা নয়। সে একটা কলের মেয়ে।

একটা পাথরের সিংহাসনে গালে হাত দিয়ে গুম হয়ে বসে ছিল কন্যাকুমারী। সেই গুহা প্রখর আলোয় ঝলমল করছিল। এ আলো কোনওদিন নিভবে না। সমুদ্রে ঢেউ যতদিন থাকবে, নট-এর বানানো জেনারেটর ততদিন চালু থাকবে, এলাহি কারখানার কলকবজাও চলবে।

বালিকা কন্যাকুমারী নিস্পৃহ নিশ্চল পুতুলের মতোই সুবৃহৎ প্রস্তর সিংহাসনে প্রস্তর-পুত্তলিকার মতোই চুপটি করে বসে ছিল।

তার চোখ মাত্র একটা। কপালের ঠিক মাঝখানে। দু'চোখের বালাই-ই নেই।

এই একটা চোখ বুজে গালে হাত দিয়ে চিন্তায় তলিয়ে ছিল কন্যাকুমারী। গলাখাঁকারি দিয়ে বলেছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'কন্যা, তুমি কে?'

যেন সম্মোহনের ঘোর কাটিয়ে সজাগ হয়েছিল একচক্ষু বালিকা। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, কলকবজা নিশ্চল ছিল এতক্ষণ, সুইচ-অন হয়ে গেছিল প্রফেসরের কাংস কণ্ঠস্বরে। মাত্র একটা চোখ প্রদীপ্ত হয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

এহেন আনন দেখলে আঁতকে ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে একটা চোখের চাহনি যখন ভাবলেশহীন হিমশীতল হয়, তখন অসমসাহসিকের বুকও ছাঁৎ করে ওঠে। আমি, বিশ্ব-অ্যাডভেঞ্চারিস্ট দীননাথ নাথ শীতল-কলেবর হয়ে গেছিলাম সেই চোখের দৃষ্টিশরে বিদ্ধ হতেই।

যা বলছিলাম। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কিন্তু আজব জীব। একটি খাড়াই চোখ দেখে তিলমাত্র বিচলিত না-হয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে শুধিয়েছিলেন, 'কন্যা, তুমি কে?'

কন্যা তখন বলেছিল, 'আমার নাম কন্যাকুমারী। আমি ছেলেও নই, মেয়েও নই— আমি একটা কলের পুতুল। বস্তু দিয়ে গড়া মানুষদের কোনও জেন্ডার থাকে না। রোম্যানিক ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ নেই। আমি ক্লীব হয়েও নারী। সেটা আমার দাবি— আমার স্রষ্টার কাছে।'

নিরীহ গলায় যেন ভীষণ আগ্রহী হয়ে প্রফেসর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কে তোমার স্রষ্টা?'

অমনি দপ করে যেন বিচ্ছুরণ ঘটেছিল কন্যাকুমারীর ললাট-নয়নে। বলেছিল মেয়েলি ছন্দোময় সংগীতি গলায়, 'ন্যাকামি করছেন কেন? তিনি তো আপনার বন্ধু।'

'প্রফেসর নট?'

'ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার।'

কন্যাকুমারীর এই একটা মুদ্রাদোষ। কথা বলার নকশায় নিশ্চয় ক্রটি আছে। মাঝে মাঝেই কবিতার সুরে একই কথা রিপিট করে যায়।

প্রফেসর বিচলিত হবার পাত্র নন। বললেন, 'কিন্তু তুমি তো মা রক্তমাংস দিয়ে তৈরি নও।'

'রক্তমাংস দিয়ে তৈরি যারা, তারা পাওয়ারফুল নয় বলেই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

'বেশি পাওয়ার দিয়ে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝেছি,' প্রফেসর যেন পুনরাবৃত্তি সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে গেলেন, 'প্লাসটিক, নাইলন, মেট্যাল টিউব, ইলেকট্রিক সার্কিট, ট্রানজিস্টর মাইক্রোচিপস— এইসব নিষ্প্রাণ বস্তু দিয়ে তৈরি তুমি একটা কম্পিউটার।'

ঝিকমিক আভা দেখা গেল ললাট নয়নে, 'ব্রেনটা কিন্তু ওজনে তিন কেজি, আপনার ব্রেনের ওজনের ডবল।'

ঢোঁক গিললেন প্রফেসর, 'তোমার ব্রেনের ক্যাপাসিটি আমার ব্রেনের ডবল, এই তো বলতে চাও?'

'ডবলেরও ডবলেরও ডবল।'

'বাট হাউ?' প্রফেসর একটু ঘাবড়ে গেছেন মনে হল।

'কারণ আমার ব্রেন অক্ষর দিয়ে ভাবে না।'

'ত-তবে কী দিয়ে ভাবে?'

'শুধু জিরো আর ওয়ান দিয়ে।'

'সে তো কম্পিউটারের কেরামতি।'

কন্যাকুমারীর চোখ ঠান্ডা হয়ে গেল, 'স্টুপিড। শূন্য আর এক-এর মধ্যে অনন্ত ছন্দ বিরাজ করছে। অনেকগুলো শূন্য পরপর সাজিয়ে যদি একটা ওয়ান-এ ঠোক্কর মারা যায়, এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘণ্টাও হেরে যাবে।'

'কিন্তু শুধু শূন্য আর এক দিয়ে ওজঃ হয় না।'

'ওজঃ মানে?' ছোট হয়ে গেল কন্যাকুমারীর চোখ।

'ওজঃ মানে তেজ, বল, দীপ্তি। ওজোগুণ না-থাকলে রচনা জমকালো হয় না, ওজস্বল হওয়া যায় না।' ওজস্বল মানে জানো না? তেজস্বী, বলিষ্ঠ।'

'ননসেন্স,' ধমকে উঠেছিল কন্যাকুমারী।

ওজোগুণ যেন ফেটে পড়েছিল ওই একটা 'ননসেন্স' শব্দের মধ্যে। কন্যাকুমারী আমাকে বোবা বানিয়ে দিয়ে একচোখে ঝিলিক তুলে বলে গেল গড়গড় করে, 'পাভলভের থিয়োরি পড়া আছে? নেই। পাভলভ-ই তো লিখে গেছেন, মানুষের মধ্যে কাজ করছে সেকেন্ড সিগন্যালিং সিস্টেম। কথা-ই তো সেই সিগন্যাল, নার্ভাস অ্যাক্টিভিটির সিগন্যাল। শব্দগুলো তো স্রেফ কোড সিগন্যাল। সিগন্যালগুলো নার্ভ এন্ড থেকে ব্রেনের নার্ভাস সিস্টেমের হায়ার সেন্টারে যাচ্ছে কীভাবে? জানা আছে?'

ঢোঁক গিলে বললাম, 'না।'

'কোড-এর আকারে। সেই কোড শুধু শূন্য আর এক।'

'ব্রেনের মধ্যে জিরো আর ওয়ান নেচে চলেছে?'

'ডিলাইটফুট ড্যান্স!' তৃপ্ত কণ্ঠে বললে একচক্ষু কন্যাকুমারী।

আমার কানের কাছে মুখ এনে প্রফেসর খুব আস্তে জ্ঞান দিয়ে গেলেন, 'মূর্খ। ইলেকট্রনিক কমপিউটিং মেশিনেও তো তাই হয়।'

'ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার,' সঙ্গে সঙ্গে তাল ঠুকে গেল কন্যাকুমারী, 'মেশিন কখনও ফিগার নিয়ে কাজ করে না— ফিগারের কোড সিম্বল নিয়ে কাজ করা যায়। আপনার ফ্রেন্ড, প্রফেসর নট, আমার স্রষ্টা— একটা নতুন ধরনের ম্যাগনেটিক মেমারি বসিয়ে দিয়েছেন আমার ব্রেনে।'

উৎসুক হলেন প্রফেসর নট, 'কীরকম শুনি?'

'শুনলে হাঁ হয়ে যাবে দুনিয়ার নিউরোপ্যাথলজিস্টরা।'

'আগে তো শুনি।'

'আপনাদের ব্রেনে তো ঠাসা আছে নিউরোন?'

'হ্যাঁ, ব্রেনসেল... ইয়ে নিউরোন।'

'সংখ্যায় কয়েক বিলিয়ন?'

'তা তো বটেই। লম্বায় প্রত্যেকটা ০.০১ মিলিমিটার।'

'মেমারি জমা হচ্ছে সেখানে কোড সিগন্যালের মারফত শব্দ আর ইমেজের আকারে অনেকটা ইলেকট্রনিক মেশিনের মতো।'

'কিন্তু মানুষের যা আছে, মেশিনের তা নেই— ভেতরকার একটা নিয়ম... একটা আইন।' উজ্জ্বল হল প্রফেসরের চোখ, 'মানুষ আর মেশিনে তফাত সেইখানেই—'

দাবড়ানি দিয়েছিল কন্যাকুমারী, 'প্রফেসর নট আমার ভেতরে সেই নিয়ম এনে দিয়েছেন। আমি নিজেই নিজেকে ইমপ্রুভ করতে পারি। তাই আমি দূরের জিনিস দেখতে পাই, দূরের আওয়াজ শুনতে পাই, মনের কথা টের পাই। আমি এক মহাবিস্ময়, এই পৃথিবীতে।'

'মাই গড!'

'আমার নার্ভাস সিস্টেম আপনার নার্ভাস সিস্টেমকে টেক্কা মেরে যেতে পারে। সাইবারনেটিক্স নতুন করে লিখব আমি— কারণ আমিই যে পৃথিবীর ফিউচার মেশিন। এরই মধ্যে প্রায় তিরিশ বিলিয়ন কোড সিগন্যাল এসে গেছে আমার ব্রেনে। চোখ আমার একটা, কিন্তু সেটা তো একটা ক্যামেরা। আমার কণ্ঠস্বর মেয়েলি কেননা, মেয়েদের স্বর অনেক বিশুদ্ধ— বেসিক ফ্রিকোয়েন্সিতে নেমে যেতে পারে।'

'ও,' বলে চুপ করে গিয়েই ফের বললেন প্রফেসর, 'বডিটা নিশ্চয় মেটাল ফ্রেম? কান দুটোয় দুটো মাইক্রোফোন? সেকেন্ডে ৩০০ থেকে ২০০০ ফ্রিকোয়েন্সির ভাইব্রেশন সৃষ্টি করতে পারো বলেই তুমি নারীকণ্ঠের অধিকারী? কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তুমি একটা মেশিন... নিছক মেশিন।'

কন্যাকুমারী যেন রেগে গেল প্রফেসরের টিটকিরিতে, 'আমার মেমারি যে-কোনও মানুষের মেমারির চাইতে অনেক বেশি পাওয়ারফুল।'

'তবুও তুমি একটা মেশিন। কারণ? তোমার মধ্যে লাইফ নেই।'

'লাইফ!'

'ইয়েস, মাই মেশিন-গার্ল। মানুষের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই প্রকৃতি থেকে শেখে। কিন্তু তুমি একটা প্রাণহীন যন্ত্র। এন্তার নলেজ সত্ত্বেও লাইফলেস।'

'লাইফ!'

'মানুষের হাজার নার্ভাস অ্যাক্টিভিটির মূল সিক্রেট— লাইফ!'

থ হয়ে গেছিল কন্যাকুমারী। নির্বাক। নিস্পন্দ। শিবনেত্র।

পরিবর্তনটা ঘটল অকস্মাৎ। যেন একটা অদৃশ্য তরঙ্গ দুলিয়ে দিয়ে গেল ওর ধাতব অবয়ব। থরথর করে কেঁপে উঠেই একদিকে মাথা কাত করে কী যেন শুনছে। যেন ইথারের মধ্যে দিয়ে বার্তা ভেসে আসছে। আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হল একটা মাত্র চোখ। সিধে হল মাথা। বললে প্রফেসরকে, 'লাইফ? তাই না? সন্ধান পেয়েছেন আমার স্রষ্টা... প্রফেসর নট।'

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেলেন প্রফেসর নাট, 'মানে?'

'একটা উল্কা পাথর এসে পড়েছিল পাশের দ্বীপে। আসলে একটা স্পেসশিপ। ভেতরে পেয়েছেন একটা নিউট্রিনো-জেনারেটর।'

'নিউট্রিনো-জেনারেটর?'

'আজ্ঞে। নিউরোনগুলোকে সমৃদ্ধ করার জন্যে ভিনগ্রহীরা পাঠিয়েছে। মানুষ হবে অতিমানুষ,' বলতে বলতে এই প্রথম উত্তেজিত হতে দেখলাম কন্যাকুমারীকে। পাথরের সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াল এক ঝটকায়—'লাইফ! লাইফ! প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠবে পৃথিবীর সমস্ত মেশিন। আমি হব বিশ্বের প্রথম মানবী মেশিন... এর মধ্যেই প্রফেসর নট শূন্য থেকে বানিয়েছেন এক অবয়বহীন আতঙ্ককে— লাইফ ফোর্স দিয়ে নেচার থেকে সৃষ্টি করেছেন এক রুদ্র শক্তিকে...'

এর পরেই বিহ্বল প্রফেসর আর কন্যাকুমারীর মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, তা দিয়েই এই কাহিনির শুরু।

কন্যাকুমারী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর প্রফেসর ছুটে বেরিয়ে

এসেছিলাম গুহার বাইরে। কেননা কাঁপছিল গোটা গুহা, খসে খসে পড়ছিল পাথর। বাইরে এসে দেখেছিলাম বর্ণনাতীত এক দৃশ্য। প্রলয় জেগেছে সমুদ্রের বুকে। বিশাল তরঙ্গ পাহাড়-সমান উঁচু হয়ে ধেয়ে যাচ্ছে এই দ্বীপ থেকে দূরে দূরে।

দ্বীপের কিনারায় দাঁড়িয়ে প্রফেসর নট। হাতে একটা উদ্ভট-দর্শন ছোট্ট মেশিন। সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গলার শির তুলে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, 'ওরে আয়! ওরে আয়! ব্রহ্মাণ্ড শক্তির মূলে তুই... স্ট্রিং... মহা প্রহেলিকা স্ট্রিং... অতি খুদে তরঙ্গ স্ট্রিং... তুই আয়! নিউট্রিনো-জেনারেটর তোকে সংহত করছে... তুই যে আছিস, তার প্রমাণ দে। ডেকে আন 'এল নিনো' প্রলয় প্লাবনকে... তারপর প্রাণের সঞ্চার ঘটা এই পৃথিবীর সমস্ত মেশিনে... শক্তির আধার তুই... সব সৃষ্টির মূলে... তুই-ই প্রাণ... তুই-ই সৃষ্টি... তুই-ই সংহার দেবতা—'

এই কথাটা শেষ হতে না হতেই প্রলয়ংকর 'এল নিনো'র তরঙ্গ-তাণ্ডব ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রফেসর নটকে টেনে নিয়ে গেছিল সমুদ্রগর্ভে।

আর তাঁকে দেখা যায়নি।

'এল-নিনো'ও রুদ্রমূর্তি পরিহার করেছিল পরক্ষণেই। শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি প্রফেসর নট। অথবা জানতেন না নিউট্রিনো-জেনারেটরের রেগুলেটর কোথায় আছে। ফলে, অনিয়ন্ত্রিত অজানা শক্তির মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়েছে নিউট্রিনো-বিম! পরিণামে নিউট্রিনো-জেনারেটর এখন সমুদ্রের তলায়।

কন্যাকুমারী? গুহায় ফিরে গিয়ে দেখেছিলাম, সে গলে যাচ্ছে... সারা গা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ভূত সাম্রাজ্য

ধ্যানমন্দিরে একা বসে আছেন ডক্টর ব্রেন। এই পৃথিবীর ত্রাস ডক্টর ব্রেন। মূর্তিমান বিভীষিকা ডক্টর ব্রেন। খোদ ভগবান ডক্টর ব্রেন।

হ্যাঁ, তিনি নিজেকে তাই মনে করেন, বিশ্বাস করিয়েও ছেড়েছেন গোটা দুনিয়াটাকে। নিমেষে নিমেষে মড়ার শহর বাড়িয়েছেন ভূমণ্ডলের তিন জায়গায়। নিউইয়র্ক, লন্ডন, টোকিও এখন বিস্তীর্ণ শ্মশান। বিলকুল নিষ্প্রাণ। যে যেখানে ছিল, ঠিক সেইভাবেই রয়ে গেছে। মানুষ আর পশু। একটা বোমাও পড়েনি, এতটুকু বিষগ্যাসও ছুটে যায়নি।

অথচ যেন এক মারণ মন্ত্র মুহূর্তে প্রাণ করেছে হরণ এই তিন দর্পিত শহরের।

না। কোনও ইন্দ্রজাল তিনি জানেন না। তিনি পিশাচ গুরু নন। নিছক বৈজ্ঞানিক তিনি।

বিজ্ঞানের মায়াজাল নিক্ষেপ করেছিলেন এই ধ্যানমন্দির থেকে।

পৃথিবী হয়েছে পদানত।

এখন তিনি ভগবান, পৃথিবীর অধীশ্বর।

কিন্তু কোথায় সেই অলোক সাধারণ অসম্ভব কাণ্ড ঘটানোর নায়ক প্রফেসর নাটবল্টু চক্র?

তিনি আছেন।

এই কাহিনি তাঁরই সর্বশেষ অবিশ্বাস্য প্রতাপের কাহিনি।

ওঁরা ছিলেন একুশজন।

গোটা পৃথিবী থেকে একুশজন বৈজ্ঞানিক জড়ো হয়ে একটা শক্তি-সমিতি বানিয়েছিলেন।

উদ্দেশ্য মহান। এই পৃথিবী থেকে অপদার্থ রাজনীতিবিদদের সবংশে ধ্বংস করতে হবে। যার নেই কোনও নীতি, সে নেয় রাজনীতি— এই আপ্তবাক্য যখন অক্ষরে অক্ষরে ফলতে শুরু করেছে তামাম দুনিয়া জুড়ে, কুষ্মাণ্ড ধান্দাবাজরা ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতা ধরে রেখে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে চলেছে, বৈজ্ঞানিকদের পায়ের জুতো বানিয়ে তাদেরকে দিয়েই নিজেদের অপকর্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলেছে— তখন জাগো, উঠে দাঁড়াও হে বৈজ্ঞানিকগণ— তুলে নাও পৃথিবী চালনার ক্ষমতা নিজেদের হাতে, দেখাও ভেলকি!

এই গুপ্তমন্ত্র নিয়েই সংঘবদ্ধ হয়েছিল পৃথিবীর একুশজন তালেবর বৈজ্ঞানিক। তাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন বাংলার বৈজ্ঞানিক প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। কারণ, তাঁকে বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বকমিটি গড়া কি সম্ভব?

মোটেই নয়। প্রফেসরের কীর্তিকাহিনি যারা অবগত আছে, তারা জানে এই তথ্য।

অনুগ্রহ করে কিন্তু ভুল বুঝবে না প্রফেসরকে। কেননা, কোনও দুরভিসন্ধি তাঁর মস্তকে ছিল না। ছিল সৎ অভিপ্রায়। জনগণকে যারা বিজ্ঞানের মোয়া ধরিয়ে দিয়ে বোকা বানাতে চলেছে, তাদের পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়ার সিক্রেট প্ল্যান।

অত্যন্ত সিক্রেট সেই প্ল্যান এক দিনে প্রফেসরের উর্বর মগজে আসেনি। উনি যাকে হাঁদারাম, উজবুক, গাধা, ইডিয়ট ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণে ভূষিত করে এসেছেন রাখঢাক না করে, সেই আমি, শ্রীহীন দীননাথ নাথ, তাঁর সহায় হয়েছিলাম বলেই না এতবড় কাণ্ডটা করে বসতে পারলেন।

বাক্য পুষ্প বর্ষণ না-করে এবার আসল কথায় আসা যাক। এই ভূমণ্ডল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে প্রফেসরের অদ্ভুত একটা যোগাযোগ আছে। হঠাৎ একদিন কানে এল, প্রফেসর ঝুটমুটু অফ জাপান ব্রেন গবেষণায় অনেকটা এগিয়ে গিয়ে এক দারুণ এক্সপেরিমেন্টে হাত দিয়েছেন। তিনি কুকুরের ব্রেন বাচ্চাদের করোটির মধ্যে সংস্থাপন করছেন আর বাচ্চাদের ব্রেন কুকুরের করোটিতে বসিয়েছেন। ভারত মহাসাগরের একটা নির্জন দ্বীপে মস্ত কারখানা বানিয়ে হাজার হাজার মানুষ-কুকুর আর কুকুর-মানুষ বানিয়ে দেশে দেশে চালান দিচ্ছেন, পৃথিবী জুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য।

ফলে, দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড। বাচ্চারা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতে করতে আশ্চর্য সারমেয়-শক্তির প্রসাদে ভাল চৌকিদার আর সান্ত্রি হয়ে যাচ্ছে। তাদের ঘ্রাণশক্তি আশ্চর্য রকমের, তাদের শ্রবণশক্তি পিলে চমকানো, তারা অদৃশ্যলোককে যেন দেখতে পায়। ভূতপ্রেত দেখতে পেলে তাড়া করে। ফলে, পৃথিবী ভূতশূন্য হয়ে যেতে বসেছে। ভূতেরা সব পালাচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে। এই সৌরমণ্ডলেই একটা অদৃশ্য গ্রহ আছে। ভূতেদের গ্রহ। মানুষ মরে ভূত হয়ে সেখানে যায়— তাকেই আমরা বলি প্রেতলোক। প্রেতলোক থেকে আর কেউ পৃথিবীলোকে আসতে চাইছে না মানুষ-কুকুরদের ঘেউ ঘেউ চিৎকার আর লম্ফঝম্পর জন্যে। মানুষ যদি কুকুরের মতো দাঁত খিঁচোয় আর খ্যাঁক করে, কোনও ভূতের তা ভাল লাগার কথা নয়। সুতরাং পৃথিবী ভূতশূন্য হতে বসেছে।

শুনেটুনে মহা ভাবনায় পড়েছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। ভূত যদি না-থাকে, তা হলে পৃথিবীতে থাকার মজাটা রইল কোথায়?

গুম হয়ে কিছুদিন ল্যাবোরেটরির কোণে বসে থাকার পর একটা ফন্দি মাথায় এল প্রফেসরের। আমিও মুখ চুন করে বসে ছিলাম তাঁর পাশে— বড় ন্যাওটা যে। আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বৎস, দীননাথ।'

এত মিষ্টি করে কখনও তো সম্বোধন করেন না প্রফেসর। আমি তক্ষুনি গলে গেলাম। বললাম, 'বলুন কী করতে হবে।'

'একটা দুষ্কর্ম।'

'ভূতেদের ভয় খসানোর জন্যে যা বলবেন, তাই করব।'

'বাবা দীননাথ, তুমি মানুষ-কুকুর হয়ে যাও।'

'অ্যাঁ!'

'ভয় কী? আমি তো রইলাম। মানুষ-কুকুর হলে তুমি ভূতেদের দেখতে পাবে— তাদের কাছে প্রোপাগান্ডা চালাতে পারবে।'

'কীসের প্রোপাগান্ডা?'

'ভূতলোককে এককাট্টা করে এই বজ্জাত বৈজ্ঞানিকগুলোর শক্তি-কমিটির বারোটা বাজিয়ে দিতে হবে। তুমিই হবে ওদের লিডার।'

'কিন্তু...... কিন্তু......'

'আরে বাবা, শোনোই না। বিটলে বামন বোম্বাই বারমুডা কী প্যাঁচ আঁটছেন, তা তো তোমার অজানা নয়।'

'জানি... জানি... তিনি গড়ছেন তাঁর সৈন্য, গোলাম সৈন্য। মানুষ জন্মাচ্ছে গোলাম মনোবৃত্তি নিয়ে। তাদের ভগবান শুধু এই বোম্বাই বারমুডা। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ— সবই করে যাচ্ছে বিনে মাইনেতে। তাঁর লক্ষ্য এমন এক বিশ্বব্যাপী প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা যেখানে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ হবে তাঁর বশংবদ প্রজা— হুকুমের ভৃত্য। জান দেবে পয়সা নেবে না। ভাবা যায় না!'

'তুমি কি চাও এমন কেনা গোলাম জন্মাক?'

'মোটেই না।'

'তা হলে মানুষ-কুকুর হয়ে ঘুরঘুর করতে থাকো বোম্বাই বারমুডার ল্যাবোরেটরির আশেপাশে—'

'তারপর?'

'পঞ্চরঙের কেমিক্যালে এই আরকের একটা ফোঁটা মিশিয়ে দেবে,' বলেই, রঙিন তরল বোঝাই একটা শিশি আমার হাতে তুলে দিলেন প্রফেসর।

'দিলে কী হবে?'

'নতুন নতুন গোলাম যারা তৈরি হচ্ছে, তারা সব ভূত হয়ে যাবে।'

'অ্যাঁ!'

'গবেট! ইয়ে, গুডবয়! ঠিক ধরেছ। ওই ভূতগুলো ভূতলোকে গিয়ে দল ভারী করবে।'

'ইয়া! ইয়া! ইয়া! তারপর?'

'শক্তি-কমিটির প্রেসিডেন্ট লালাবাবা ব্যোমচাকো ওরফে ডক্টর ব্রেন কী করছেন, বলি সে-খবর রাখো?'

'আপনার চ্যালা যখন, রাখতে তো হবেই। শুয়োরদের মগজে অজানা আতঙ্ক ঠুসে দিচ্ছেন।'

'জানো না সেই আতঙ্ক কী। মনের শক্তি! ইচ্ছে করলে ঝড় তোলা যাবে, বাজ ডেকে আনা যাবে, সমুদ্রে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ তোলা যাবে, বাড়ি ঘরদোর ভেঙে দেবে স্রেফ ভাইব্রেশনের ফোকাসিং করে। কাতারে কাতারে শক্তিমান শুয়োর পৃথিবীময় জন্মাবে আর লন্ডভন্ড করবে।'

'অ্যাঁ!'

'আরে, হ্যাঁ গাধা! আই মিন গ্রেট বয়! উনি দুটো ইঞ্জেকশন বানিয়েছেন। প্রথমটা নিজে

নিয়ে শক্তি-কমিটিতে যাবেন— ভাইব্রেশনের অল্প ডোজ নিজের বডি থেকে বের করে বাকি একুশজন বৈজ্ঞানিককে বুরবাক বানিয়ে দেবেন। তারপর শক্তি-কমিটির সর্বেসর্বা হয়ে বসবেন। এখনও তাই আছেন অবশ্য। তারপর—'

'শুয়োরের পালকে দ্বিতীয় ইঞ্জেকশন দিয়ে ছেড়ে দেবেন পৃথিবীর সব শহরে—'

'প্রলয় জাগাবেন শহরে শহরে?...

'হ্যাঁ। তাদের বাচ্চারাও আরও বেশি করে তা করবে। এইভাবেই তো উনি নিউইয়র্ক, লন্ডন, টোকিওকে শ্মশান বানিয়েছেন। প্রাণহরা ভাইব্রেশন কাউকে বাঁচিয়ে রাখেনি—মূলে ছিল তিনটে শুয়োর। মোটে তিনটে শুয়োর।'

'আ-আমাকে কী করতে বলেন?'

'বৎস দীননাথ,' বড় মিষ্টি শোনাল প্রফেসরের এবারের হুকুম, 'যেদিন শক্তি-কমিটির মিটিং বসবে, সেদিন তুমি ওর ল্যাবোরেটরিতে ভূতেদের লিডারকে পাঠিয়ে দেবে। বলবে, প্রথম ইঞ্জেকশনের জায়গায় যেন দ্বিতীয় ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা রেখে দেয়—দ্বিতীয় সিরিঞ্জের জায়গায় প্রথমটা। অর্থাৎ পালটা পালটি করে দেয়। ভূতেরা সব পারে।'

'তাতে কী হবে?'

'শক্তি-কমিটিতে উনি বিধ্বংসী শক্তি নিয়ে হাজির হবেন। এই শক্তি ফেটে পড়বে তখনই যখন প্রথম ইঞ্জেকশনটা ভূতেরা ফুঁড়ে দেবে তাঁর পিঠে শক্তি-সমিতির মিটিং চলার সময়ে—'

'ভূতেরা ইঞ্জেকশন দেবে?'

'ওরা সব পারে। ওদের নাম ভূত।'

'তারপর? তারপর? তারপর?'

'ফেটে উড়ে যাবেন ডক্টর ব্রেন—সেইসঙ্গে তাঁর কমিটির প্রত্যেকেই—'

'কী মুশকিল! আপনিও তো শেষ হয়ে যাবেন।'

'দূর ভূত! ভূতেরা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে এসে ফেলবে এখানে, তোমার সামনে— গায়ে আঁচড়টাও লাগবে না। ভূতেরা—'

'সব পারে।'

বলেই, আমি লাফিয়ে বেরিয়ে গেছিলাম। এরপর কী ঘটেছিল, বিশ্ববাসীর তা অজানা নয়। কাসুন্দি ঘাঁটতে আর চাই না। শক্তি-কমিটির খপ্পর থেকে বিশ্ববাসী মুক্তি পেয়েছে। কেননা, বৈজ্ঞানিকদের সেই পাগলা-সমিতি হাওয়ায় নাকি মিলিয়ে গেছে, তাদের প্রেতলোকেও নাকি ঠাঁই হয়নি— ভূতেরা সেই ভূতদের ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে।

এ সবই করেছি আমি, এই শ্রীহীন দীননাথ নাথ। এমন শিক্ষা পেয়ে গেছে রাজনীতি ভক্তরা, কেউ আর ট্যাঁ-ফোঁ করছে না।

পৃথিবী জুড়ে এখন চলছে ভূত সাম্রাজ্য! টের পাচ্ছ নিশ্চয়? হাড়ে হাড়ে?

স্ট্রিং-ভূত

ডক্টর দাঁ বললেন, 'অলিভার লজ, লেডবিটার, কন্যান ডয়াল এঁরা কি মিথ্যে বলার মানুষ?'

সায় দিলেন ডক্টর খাঁ, 'কক্ষনও না, গভীর চিন্তা করলে ইথার থেকে চিন্তার মূর্তি তৈরি হয়। ভুতুড়ে ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিলেই হল? প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কি এমনি এমনি এসেছেন? বিশ্বাস আছে বলেই এসেছেন।'

কথা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা আগ্নেয় দীপে। কয়েক মাইল অন্তর অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো এই দ্বীপগুলো এক সময়ে যথেষ্ট অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েছে। হয়তো তখন লাগোয়া ছিল আমেরিকা মহাদেশের সঙ্গে। এখন নেই।

গভীর জঙ্গল ছাড়া সেখানে এখন কিছু নেই। কোথাও ন্যাড়া আগ্নেয় পাথরের উপত্যকা। মানুষজন সেখানে যেতে ভয় পায়। প্রথমত, দূর থেকে দেখেই বুক দুরদুর করে। প্রত্যেকটা দ্বীপই তো এক-একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। চারদিকে উঁচু পাথরের পাঁচিল ঘিরে রেখেছে প্রতিটি দ্বীপকে। সেই পাঁচিল ভয়ানক খাড়া। মসৃণ আগ্নেয়পাথর। গা বেয়ে ওঠার পথ নেই।

সুতরাং ধীবরদেরও ইচ্ছে হয়নি দ্বীপে যাওয়ার। কারওই মাথা ব্যথা ছিল না।

কিন্তু ডক্টর দাঁ আর ডক্টর খাঁ দু'জনেই বীর বঙ্গসন্তান, দু'জনেই অজানার উজানে পাড়ি জমানোর জন্যে কৃতসংকল্প। দু'জনেই ভয়ানকভাবে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট, আর দু'জনেরই যখন পয়সার মা-বাপ নেই, তখন এমন দ্বীপে হানা না-দিয়ে পারেন কি?

পেছনে অবশ্য একটা ইতিহাস আছে। সেটা কারও জানা নেই। পাঠকদের জানাতে আপত্তি নেই।

বিল গেটস-এর নাম এই দুনিয়ায় জানেন না, এমন মানুষ এখন পৃথিবীতে নেই। কম্পিউটার জগতে সফটওয়্যারের বিপ্লব ঘটিয়ে ইনি এখন প্রবাদপ্রতিম পুরুষ। পয়সার জোরে আমেরিকায় গিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি বাগিয়েছিলেন ডক্টর দাঁ আর ডক্টর খাঁ। এঁদের পূর্বপুরুষরা বড়বাজারের পোস্তায় পোস্তর কারবার করে ফুলে ফেঁপে লাল হয়ে চোখে সর্ষেফুলের বদলে যখন রামধনু রং দেখতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন ডক্টর দাঁ আর ডক্টর খাঁ-র ঘেন্না এসে গেছিল ব্যাবসা বাণিজ্যে। তাঁরা এটুকু বুঝেছিলেন, পয়সা থাকলেই

ভবিষ্যতের মানুষদের কাছে অমর হয়ে থাকা যায় না। কীর্তিমান হতে হবে। কীর্তির মধ্যে দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থাকা যাবে।

তাই তাঁরা কুপথ ধরেছিলেন। বিল গেটস-এর সফটওয়্যার বানাতে শিখেছে, এমন কিছু আমেরিকানের ন্যাওটা হয়ে গেছিলেন। যাঁদের ল্যাজ ধরে বসে ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই গুপ্তচর বৃত্তিতে দক্ষ। অন্য কোম্পানির গবেষণার বস্তু হাতিয়ে নিয়ে একটু উলটে পালটে নিজেদের বলে বাজারে ধরিয়ে দিতে ছিলেন ওস্তাদ। এ এক নতুন ধরনের চরবৃত্তি। ইংরেজিতে যাকে বলে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপায়োনেজ।

ডক্টর দাঁ আর ডক্টর খাঁ এঁদের খয়ের খাঁ বনে গিয়ে গোপনে গেছিলেন তিব্বতে। তিব্বত এখন চিনের দখলে। কিন্তু সেই দুর্গম অঞ্চলের বহু গিরিকন্দরে এখনও যেসব অদ্ভুত কিম্ভুত কাণ্ডকারখানা চলছে, কেউ তার খবর রাখে না।

আমেরিকার এই শিল্পী-গুপ্তচররা স্যাটেলাইট ছবির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন, তিব্বতের এক অজানা গুম্ফায় সদ্য শেষ হয়েছে এক আজব গবেষণা। অদৃশ্য প্রেতাত্মাদের দৃশ্যমান করবার সফটওয়্যার বানিয়ে ফেলেছেন এক তিব্বতি লামা ওরফে ধর্মের বৈজ্ঞানিক।

তিব্বতিরা এসব ব্যাপারে চৌকস অনেককাল আগে থেকেই। বিদ্যেটা অতীশ দীপঙ্কর বঙ্গদেশ থেকে নিয়ে গেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে, গভীরভাবে চিন্তা করে তাঁরা শূন্যের আতঙ্ককে দৃশ্যমান করতে জানতেন। কায়াহীনদের কায়াধারণ প্রত্যক্ষ করাতে পারতেন।

কিন্তু এজন্যে দরকার তো সাধনা, দরকার যৌগিক ক্রিয়া। তা তো সবার থাকে না। অথচ অদৃশ্য লোকের কত কী রয়েছে, সাধারণ মানুষ কি দেখবার পথ হাতের মধ্যে পেতে পারে না?

বিশেষ করে এই কম্পিউটারের যুগে?

তাই তৈরি হল এমন এক সফটওয়্যার যা ইথারে কম্পন তুলে অদৃশ্যদের দৃশ্যমান করতে পারবে।

তাঁদের ভাবনা চিন্তা গেল একদম বৈজ্ঞানিক ধারায়। বস্তুকে ছোট করতে করতে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? কোত্থেকে সব বস্তু উদ্ভূত হয়েছে? কোয়ার্ক আর ইলেকট্রন এই মৌলিক পদার্থগুলো আরও ছোট অবস্থায় নিয়ে গেলে কোথায় শেষ হবে?

'স্ট্রিং' তাদের নাম। স্ট্রিং! তাদের ভাইব্রেশন চলছে দশ থেকে এগারোটা ডাইমেনশনে। ফোর্থ ডাইমেনশনই শেষ কথা নয়— আরও ডাইমেনশন আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। 'স্ট্রিং' ভাইব্রেশন চলছে এইসব ডাইমেনশনে।

স্ট্রিং! স্ট্রিং! স্ট্রিং!

অদৃশ্য জগতে যারা স্ট্রিং-এর ভাইব্রেশন হয়ে রয়েছে, তারাই কি সূক্ষ্ম আত্মা? অদৃশ্য লোকের বাসিন্দা? মৃত্যু তো শেষ নয়— তারপর তারা যায় কোথায়?

স্ট্রিং-লোকে!

তিব্বতি গবেষণায় পাওয়া এই সফটওয়্যার কম্পিউটারে লাগিয়ে চালালেই আলোড়ন শুরু হয়ে যাবে স্ট্রিং-লোকে। মনিটরে যে-ছবির প্রক্ষেপণ ঘটানো হবে— সেই ছবির বিদেহী সত্তা পঞ্চভূতের বস্তু গ্রহণ করে দৃশ্যমান হবে!

গতকালের বিজ্ঞান আজ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আজকের কল্পবিজ্ঞান আগামীকাল বিজ্ঞান হয়ে উঠছে। জগৎ জুড়ে চলছে এই কাণ্ড।

এই এলাহি ব্যাপারে একটা খাবলা বসিয়েছেন ডক্টর দাঁ আর ডক্টর খাঁ। পোস্তর কারবারি হয়ে গেলেন চোর বৈজ্ঞানিক। তারপর যা ঘটবার তা ঘটল।

হেলিকপ্টারে করে বিশেষ এই দ্বীপে নেমেছেন দাঁ আর খাঁ। সঙ্গে এনেছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র-কে। কারণ, এখানেও আছে স্বার্থ। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে কল্কে পেতে গেলে প্রফেসরের ছোঁয়া পেতে হবে।

প্রফেসরও তেমনি মানুষ। মহাপাগলা। তিব্বতি আবিষ্কারের বৃত্তান্ত শুনেই চলে এসেছেন আমাকে ল্যাজে বেঁধে। কীরকম করে এলাম, কোন এয়ারপোর্ট থেকে হেলিকপ্টারে চেপে সমুদ্র পেরিয়ে এই দ্বীপে নামলাম— সে সব কিন্তু বলব না, দয়া করে অনুরোধ করবেন না। লেখকদের কিছু সিক্রেট থাকে। বিশেষ করে ব্যাপারটা যখন ওইভাবে খতম হয়ে গেল, তখন সব কথা না-জানানোই ভাল।

পৌঁছোলাম তো দ্বীপে। দিনের বেলায়। সূর্য তখন মধ্য গগনে। আমাদের স্প্যানিশ পাইলট একটা চুরুট টানতে টানতে বললেন ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে, 'ঝটপট ফিরে চলুন। এয়ারপোর্টের অফিসাররা অনেক ডলার খেয়ে দু'ঘণ্টার পার্মিশন দিয়েছেন। এ-সব দ্বীপে টুরিস্ট আনার নিয়ম নেই। প্লিজ। কুইক!'

আরে গেল যা! দিনের বেলা কি ভূত আনা যায়? স্মৃতির প্রেতাত্মারা তো রাতেই দেহ ধারণ করে! উদ্ভট কথা বললেই হল!

দাঁ আর খাঁ দু'গাল হেসে (এক-একজনে এক গাল জুড়লে, দু'গাল) বললেন, 'ঘাবড়াবেন না। এই প্যাকেটটায় এই যে বোতামটা, এটা টিপলেই একটা তাঁবু খাড়া হয়ে যাবে। ভেতরে বিলকুল অন্ধকার। চলুন, চলুন, ওই ব্যাটা স্প্যানিশটা এমন ড্যাব ড্যাব করে দেখছে— ওর চোখের সামনে এসব করতে চাই না। ব্যাটা স্পাই কিনা কে জানে।'

তা, গেলাম জঙ্গলের আড়ালে একটা খোলা জায়গায়। ওই ভারী প্যাকেটটা আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হল— পালোয়ান চেহারা থাকলে এরকম ব্যাগার খাটতেই হয়। বোতাম টেপবার সঙ্গে সঙ্গে ভুস করে একটা পনেরো ফুট উঁচু তাঁবু মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আজব কাণ্ড তো! দাঁ আর খাঁ কম্পিউটার-ফম্পিউটার নিজেরাই বইছিলেন। তালে হুঁশিয়ার! চোদ্দো পুরুষের ব্যাবসাদার তো! তাঁবুর পরদা সরিয়ে আমরা ঢুকলাম। অদ্ভুত একটা পাওয়ার প্যাক সঙ্গে এনেছিলেন দাঁ আর খাঁ। দেখতে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের মতো। কিন্তু পাওয়ারফুল ব্যাটারি। কম্পিউটার চালু করে দিতেই মনিটরে একটা ছবি এসে গেল!

কিন্তু এ যে টিকিওলা এক বিহারি বামুন!

দাঁ বললেন, 'স্যার, ইনি এক মস্ত গুনিন। সম্প্রতি দেহ রেখেছেন। আমাদের পোস্তায় আফিং সাপ্লাই করতেন। এঁর কাছ থেকে আগে পরলোকের খবর নেওয়া যাক।'

বলেই, ইংরেজিতে টাইপ করে গেলেন মনিটর স্ক্রিনে, 'আপনি কি এখন দেহধারণ করবেন?'

বামুন ঠাকুর দেখলাম পরলোকে গিয়ে চোস্ত ইংরেজি শিখেছেন। আমেরিকান টানে লিখে জবাব দিলেন, 'ইয়া! ইয়া! ইয়া!'

দাঁ টাইপ করলেন, 'নতুন কিছু আবিষ্কার যদি অজানা অবস্থায় পরলোকে চলে গিয়ে থাকে, সেটাও নিয়ে আসুন।'

বামুন ঠাকুর একগাল হেসে লিখলেন, 'ফাস্টো ক্লাস একটা যন্ত্র বানানো হয়েছিল। 'স্ট্রিং' দিয়ে এখানে বানিয়ে রাখা হয়েছে। নিয়ে যাচ্ছি। আই অ্যাম রেডি!'

'রিটার্ন' চাবি টিপে দিলেন দাঁ। অমনি কম্পিউটারের সামনে দেখা গেল সেই টিকিওলা বামুন দাঁড়িয়ে— তাঁর সামনে একটা খাঁচা, চকচকে ধাতুর রড দিয়ে তৈরি।

খাঁ হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। টিকিওলা বামুন বিহারি হিন্দিতে বললেন, 'এটা একটা ম্যাটার ট্রান্সমিটার। এর মধ্যে ঢুকলে আপনার বডি ম্যাটার ভেঙে গিয়ে 'স্ট্রিং' হয়ে যাবে। আপনি স্ট্রিং হয়ে গিয়ে ভাইব্রেশন-এর মাধ্যমে পরলোক দর্শনে যেতে পারবেন। যাবেন?'

দাঁ টপ করে খাঁচার মধ্যে ঢুকে গিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়! নিশ্চয়! খাঁ, আপনিও আসুন।'

খাঁ লাফিয়ে ঢুকে গেলেন ভেতরে।

অমনি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে কম্পিউটারের কতকগুলো বোতাম পটাপট টিপে দিলেন বামুন ঠাকুর।

খাঁচা হয়ে গেল শূন্য! খাঁ আর দাঁ মিলিয়ে গেলেন বাতাসে!

আমি হাঁ বন্ধ করে বললাম, 'এটা কী হল? আপনি গেলেন না?'

বামুন ঠাকুর দু'গালে দুটো টোল ফেলে হাসতে হাসতে বললেন, 'রগড়ের এই তো শুরু। দুটো গুপ্তচরকে পাচার করে দিলাম যমালয়ে। আমি তো ভূত। অদৃশ্য হচ্ছি নিজে থেকেই। খাঁচা রইল, যদি আরও বদমাশ-টদমাশদের পৃথিবী থেকে ভ্যানিশ করার দরকার হয়, ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে এই খাঁচায় ঢুকিয়ে কম্পিউটারে এই কম্যান্ডটা দিয়ে দেবেন।'

বলে, কম্যান্ড মুখে মুখে বলে গেলেন। আমি আবার ফটোগ্রাফিক মেমারির অধিকারী কিনা, আমার সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ হয়ে গেল।

তার পরেই বামুন ঠাকুরের কলেবর আর দেখতে পেলাম না।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যখন ঢোঁক গিলছেন, আমি তখন ওঁকে দু'হাতে তুলে নিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়োচ্ছি। হেলিকপ্টারে উঠেই বললাম পাইলটকে, 'চলো। ওঁরা কালকে ফিরবেন। বাকি টাকা তখন দেবেন।'

আমি তো জানি, বাকি টাকার জন্যে দ্বীপে ওই দু'জনকে ফেলে যেতে আপত্তি করবে না পাইলট। করলও না। দু'ঘণ্টা শেষ হতে যে আর দেরি নেই!

চলে এলাম দ্বীপ ছেড়ে। আর যাইনি।

খাঁচায় কাউকে ঢোকানোর দরকার হলে, কাইন্ডলি আমাকে চিঠি লিখে জানাবেন, কেয়ার অফ সম্পাদক,... পত্রিকা।

অদৃশ্য অবতার

এপ্রিল ৪, ১৯৯২ • শনিবার

প্রফেসর বলেছিলেন, 'দীননাথ, যেখানে যাচ্ছ, সেখানেই রয়েছে অদৃশ্য অবতারের মূল ঘাঁটি। ডাইরি লিখবে রোজ। অদ্ভুত যা কিছু দেখবে, লিখে রাখবে। সব আমার জানা দরকার।'

আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। যে আতঙ্ক গোটা তল্লাট জুড়ে দেখা দিয়েছে, তার উৎপত্তি এখানে নয় অন্য কোথাও।

ব্যাপারটা জানলাম এইভাবে।

জঙ্গলের ভেতরে আমি ঢুকিনি। স্রেফ ভয়ে। এশিয়ার সবচেয়ে গভীর জঙ্গল এটা। প্রায় পঞ্চাশ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে গাছপালা। দিনের বেলা কাঠুরে ঢুকতে ভয় পায়। চোরা শিকারিরা দূর থেকেই ভয়ানক এই জঙ্গলকে নমস্কার করে সরে পড়ে।

অথচ এ-জঙ্গল এই ভারতের। কত যে রহস্য আজও তিমিরে ঢাকা রয়েছে, আজও এই ভারতে, তা যদি কেউ জানত...

তবুও আমাকে ভাবতে হচ্ছে ভারতের বাইরের কথা। আমার মন বলছে, অদৃশ্য অবতারকে আমদানি করা হয়েছে ভারতের বাইরে থেকে।

বিকট ওই মড়া দেখবার পর থেকেই সন্দেহটা শেকড় গেড়েছিল মাথায়। তারপর পকেটে পেলাম তার নাম।

আমার প্ল্যান ছিল দিনের বেলায় চক্কর মারব জঙ্গল ঘিরে। রাত ঘনিয়ে আসার আগেই পালাব।

জঙ্গলকে বেশ খানিকটা দূরে রেখে আমি হাঁটছিলাম। আমার কাঁধে ঝুলছে শটগান, পিঠে ব্যাগ আর গলায় দূরবিন। হঠাৎ দূরবিনের মধ্যে দিয়ে দেখলাম একটা সাদা জিনিস পড়ে রয়েছে জঙ্গলের ঠিক বাইরে।

দেখেছিলাম দূরবিনের মধ্যে দিয়ে। সামনে একটা মাটির ঢিপি থাকায় পুরো দেখতে পাচ্ছিলাম না। ঢিপির সামনে দিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম।

এবার দূরবিনে স্পষ্ট দেখা গেল জিনিসটাকে।

সাদা কোটপ্যান্ট পরা একটা লোক উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। তার দুটো হাত সামনের দিকে ছড়ানো, মাটি খামচে রয়েছে। পায়ে কালো বুটজুতো। লোকটা নড়ছে না। এতক্ষণ একইভাবে যখন পড়ে আছে, তখন নিশ্চয় মরে গেছে।

মড়াই যদি হয়, শকুনি দেখা দেয়নি কেন?

নাকি, এ-জঙ্গলকে শকুনিরাও ভয় পায়।

মড়াটা একইভাবে পড়ে আছে।

একটু একটু করে সাহস ফিরে এসেছিল। দুরবিন গলায় ঝুলিয়ে কাঁধের শটগান নিয়েছিলাম হাতে। ট্রিগার টিপলেই গোটা বারো গরম সিসে বেরিয়ে যাবে। যে বাছাধনই তেড়ে আসুক, টিপ ঠিক না-থাকলেও জখম সে হবেই। হাত যে কাঁপছে, তা তো বুঝতেই পারছিলাম।

কিন্তু বোবা গাছগুলো লাফিয়ে ঘাড়ে পড়েনি— যদিও প্রতিমুহূর্তে সেইরকমই মনে হচ্ছিল। ঘনঘন চোখ চলে যাচ্ছিল গাছতলার ছায়া-মায়ার দিকে। স্পষ্ট মনে হচ্ছিল কারা যেন ওত পেতে রয়েছে সেখানে।

ছায়া দেখে যারা চমকায়, তারা ভিতু। আর আমি চমকাচ্ছি গাছের ছায়া দেখে। কাউকে বলা যায় না।

মড়াটার হাতদশেক দূরে এসে সেকেন্ড-খানেক থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। ভয় হচ্ছিল, যদি লাফিয়ে উঠে ক্যাঁক করে চেপে ধরে!

শটগান টিপ করে ধরে গলাটাকে কর্কশ করে বলেছিলাম, 'কে তুমি? উঠে দাঁড়াও।'

বলেছিলাম ইংরেজিতে। আমার বিদ্যে ওই পর্যন্ত। অন্য কোনও ভাষা জানি না।

মড়া উঠে দাঁড়ায়নি।

আমি তখন তিন লাফে পৌঁছেছিলাম তার পাশে। শটগান মাথার দিকে টিপ করে ধরে পা দিয়ে চিত করে শুইয়ে দিয়েছিলাম বডিটাকে।

নিশ্চয় আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়নি।

আমার শটগানের নলচে তাগ করে রয়েছে একটা কঙ্কাল করোটিকে। পুরো করোটি নয়। মাথা-ভরতি সোনালি চুল যেমন তেমনি রয়েছে। দু'পাশের কানও রয়েছে।

নেই শুধু কপাল, চোখ, গাল, নাক, মুখ, চিবুক।

সেখানে শুধু হাড়।

গোল করে মুখের চামড়া কেউ তুলে নিয়ে গেছে। ছাড়িয়ে নেয়নি, সেক্ষেত্রে একটু-আধটু মাংস লেগে থাকত সাদা হাড়ে।

কীভাবে নিয়েছে, তা আমার মাথায় এল না। সাদা হাড় মাঝে মাঝে যেন খুবলে গেছে। এমন একটা জিনিস গোল হয়ে মুখখানাকে চামড়াহীন করে গেছে— যে-জিনিস শক্ত হাড়কেও ক্ষইয়ে দিয়ে গেছে।

নাকের তরুণাস্থি পর্যন্ত অদৃশ্য। চোখও নেই। নেই ঠোঁট, জিভ। চোখের ফুটো দিয়ে দেখা যাচ্ছে খুলির ভেতর পর্যন্ত। এক কণা মগজও নেই সেখানে। পুরো ব্রেনটাই অদৃশ্য!

ঠকঠক করে কাঁপছিলাম আমি। এক হাতে শটগান ধরে আর এক হাতে লোকটার কোট আর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

রুমাল আর মানিব্যাগ ছাড়া কিছু পাইনি। মানিব্যাগে খানকয়েক কার্ড দেখেছিলাম। লোকটার ভিজিটিং কার্ড।

নাম তার, ফ্রেড স্যাভেজ। ঠিকানা দেখে কিছু বুঝলাম না। উলসথ্রপ। বাড়ির নাম? না, জায়গার নাম?

প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

এপ্রিল ৭, ১৯৯২ • মঙ্গলবার

প্রফেসর বললেন, 'মড়া দেখে তুমি পালিয়ে এলে? '

এইজন্যে প্রফেসরকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। টিটকিরি যখন দেন, গলায় তখন ছুরি চলে। মেজাজ ঠিক রাখা যায় না।

তা সত্ত্বেও মাথা ঠান্ডা রাখলাম।

বললাম, 'উলসথ্রপ কি জিনিস?'

'উজবুক কি সাধে বলি?'

তেতেপুড়ে এসে এইরকম অভ্যর্থনা?

গলা চড়িয়ে বলেছিলাম, 'প্রফেসর, আমি কিন্তু ভয়ে আধখানা হয়ে রয়েছি।'

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুড়ো বললে, 'দেখে তো মনে হচ্ছে না। হাজার হোক, তুমি হলে গিয়ে গ্রেট দীননাথ নাথ— তবে হ্যাঁ, তোমাকে বলেছিলাম যা দেখবে, তা খুঁটিয়ে লিখবে।'

'লিখেছি।'

'যা দেখোনি— সেটা তো খুঁটিয়ে লেখা উচিত ছিল না।'

'যা দেখিনি... মা-মানে? অদৃশ্য অবতারকে?'

'তোমার মুণ্ডু। রক্ত দেখেছ?'

'র-রক্ত!'

'মুখ থেকে চামড়া, খুলি থেকে ব্রেন, কোটর থেকে চোখ সব উপড়ে নিয়ে গেছে— রক্ত ফেলে যায়নি?'

হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম প্রফেসরের স্থির দুটো চোখের দিকে। সত্যিই তো, অমন পরিপাটিভাবে ছাল ছাড়ানোর পর তো রক্ত লেগে থাকা উচিত সাদা কোট-প্যান্টে!

চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সাহেবের কোট আর শার্ট। দুটোই ধবধবে সাদা। এক ফোঁটা রক্তও পড়েনি!

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রয়েছি দেখে মনটা বোধহয় নরম হল প্রফেসরের। চাহনিও আর হৃদয়-ফোঁড়া রইল না।

বললেন, 'চলো, আমি নিজে গিয়ে দেখে আসি।'

আঁতকে উঠেছিলাম— 'ওই জঙ্গলে? অ্যাদ্দিন পর? ডেডবডি কি থাকবে?'

গোঁয়ার প্রফেসর কোনও কথা শুনলেন না।

এপ্রিল ১৪, ১৯৯২ • মঙ্গলবার

জঙ্গলের দিকে এইটাই শেষ গ্রাম। আদিবাসীদের গ্রাম। রামনবমীর পুজো চলছে সকাল থেকে।

মোড়লকে পাকড়াও করে গাছতলার বেদিতে ঘণ্টাকয়েক বসেছিলেন প্রফেসর। পাশে আমি।

অনেক খবর পাওয়া গেল। ফ্রেড স্যাভেজ সাহেব, দিন দশেক আগে এখানে এসেছিল। জিপে চেপে। নিজে চালিয়ে। ঝোপের মধ্যে রয়েছে সেই জিপ। আমরা দেখলাম গাছতলায় বসেই।

সাহেবের কথা কিছু বোঝেনি মোড়ল। সঙ্গে একটা লোক ছিল। বাঙালিবাবু। সেই লোকটাই বলেছিল, সাহেব ওই জঙ্গল দেখতে এসেছে। একা যাবে।

মোড়ল বারণ করেছিল। মাস কয়েক ধরে যে উৎপাত চলছে জঙ্গলের চারপাশের গ্রামগুলোয়— নিশ্চয় তার গোড়া রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে।

প্রফেসর বললেন, 'গ্রামকে-গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি, গোরু-ছাগল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে গলার দড়ি, ফাঁস পর্যন্ত এঁটে বাঁধা— ঠিক যেন মুণ্ডটা সরু হয়ে গিয়ে ফাঁসের মধ্যে দিয়ে গলে বেরিয়ে গেছে— এই তো?'

মোড়ল অবাক হয়ে বললে, 'আপনি জানেন?'

'গোটা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা জেনে ফেলেছে। তা সেই বাঙালিবাবুটা কোথায়?'

আমার দিকে আঙুল তুলে মোড়ল বললে, 'ইনি যেদিন এলেন, তার আগের দিন তিনিও গেলেন জঙ্গলে সাহেবকে খুঁজতে।'

'ফিরে আসেননি?'

'না। এই বাবুকে অত কথা বলিনি। জঙ্গলে যেতে শুধু বারণ করেছিলাম। তা উনি শোনেননি। ফিরে এলেন পাগলের মতো। আমাদের কারুর সঙ্গে কথা বললেন না। ঢক ঢক করে জল খেয়েই পালিয়ে গেলেন।'

'পালিয়ে যাইনি,' গম্ভীরভাবে বললাম। প্রফেসরকে দেখিয়ে, 'এঁকে ডাকতে গেছিলাম।'

মুচকি হেসে মোড়ল বললে, 'কিন্তু আপনার কাছা খুলে গেছিল— বুঝতেও পারেননি।'

প্রফেসর তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমরাও যাচ্ছি জঙ্গলে।'

চোখ কপালে তুলে মোড়ল বললে, 'পাগল নাকি!'

ফ্রেড স্যাভেজের ডেডবডির কাছে প্রফেসরকে নিয়ে এসেছিলাম কিছুক্ষণ পরে।

নতুন একটা দৃশ্য দেখলাম।

সাহেবের কোট প্যান্ট মোজা জুতো যেমন তেমনি আছে, একটুও সরে যায়নি বা লাট খায়নি।

নেই শুধু গায়ের চামড়া আর মাংস।

শুধু কঙ্কাল। রক্ত-ফক্ত কিছু নেই।

চিবুক খুঁটতে খুঁটতে থমথমে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর।

এপ্রিল ১৮, ১৯৯২ • শনিবার

প্রফেসর কেরামতি দেখালেন বটে।

লোকে বিদেশ যেতে গেলে কত কাঠখড় পোড়ায়। উনি শুধু টেলিফোন তুললেন, সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ইংলন্ডের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এখনও বলেননি উলসথ্রপ কী জিনিস।'

অনুকম্পার চোখে চেয়েছিলেন প্রফেসর। আর কথা বাড়াইনি।

এপ্রিল ১৯, ১৯৯২ • রবিবার

গ্রামের মধ্যে যখন গাড়ি ঢুকছে, তখন দেখেছিলাম, একটা কাঠের সাদাসিধে ফলকে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, উলসথ্রপ ম্যানর।

সাহেবের ভিজিটিং কার্ডে লেখা ছিল শুধু উলসথ্রপ।

প্রফেসরের মুখের দিকে তাকালাম। চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। খিচুনি খাবার ভয়ে কথা বললাম না।

গ্রামটা খুব ছোট্ট। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই। রাস্তা যদিও খুব সরু। পাড়াগাঁয়ের রাস্তা যেরকম হয়। তবে বাংলার পাড়াগাঁর মতো ময়লা ছড়ানো নয়। ঝকঝক তকতক করছে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা বড় বাড়ির সামনে। ওপরে লাল টালি। দু'পাশে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। দুই প্রান্তে ইটের চিমনি। সামনে ছোট বাগান। ফটক শেকল দিয়ে বাঁধা। একটা বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা : এপ্রিল অবধি বন্ধ।

গাড়ি থেকে নামলেন প্রফেসর। উনি চেয়ে আছেন বাগানের একটা গাছের দিকে। আপেল গাছ। ছোট ছোট আপেল ঝুলছে। তলায় একটা লোহার বেঞ্চি পাতা।

আমাকে বললেন, 'প্রণাম করো।'

আমি নিশ্চয় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলাম। কেউ কোথাও নেই। কাকে প্রণাম করব?

উনি তা বুঝলেন। বললেন, 'ওই আপেল গাছ, লোহার বেঞ্চি আর বাড়িটাকে প্রণাম করো।'

'কেন?'

'নিউটন জন্মেছিলেন ওই বাড়িতে। ওই লোহার বেঞ্চিতে উনি বসেছিলেন— গাছ থেকে আপেল পড়েছিল তাঁর সামনে।'

প্রণাম করলাম। সারা গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল। বললাম, 'উলসথ্রপ তা হলে একটা জায়গা। নিউটনের জন্মস্থান। ফ্রেড স্যাভেজ সাহেব এই গ্রামের মানুষ?'

'হ্যাঁ। এইবার খোঁজা যাক তাঁর বাড়ি।'

পাশের কাঁচা গলি দিয়ে বেরিয়ে এল মাঝবয়সি এক ইংরেজ। আমাদের সামনে এসে বললে, 'আর দিন কয়েক পরেই গেট খুলবে।'

প্রফেসর বললেন, 'জানি। কিন্তু আমরা এসেছি ফ্রেড স্যাভেজ-এর বাড়ি দেখতে।'

আধবুড়ো সাহেব চোখ সরু করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'সে তো নেই।'

'জানি। বাড়ির লোককে খবরটা দিতে এসেছি।'

'কী খবর?'

'ফ্রেড স্যাভেজ মারা গেছেন।'

চমকে উঠল আধবুড়ো সাহেব। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এখন চোখ ছলছল করছে। ধরা গলায় বললে, 'জানতাম তাই হবে। মারা গেল কোথায়?'

'ইন্ডিয়ায়। আপনি জানতেন উনি মারা যাবেন?'

'জানতাম। কেননা, আমি ওর ভাই। আসুন। সব বলছি।'

কাঁচা গলিতেই ফের ঢুকলাম। একটু গিয়ে একটা আস্তাবল, পুরনো। তার পেছনে একটা বাড়ি। একই রকম জীর্ণ। বাগানে আগাছা।

এই বাড়ির দোতলায় বসে শুনলাম ফ্রেড স্যাভেজ-এর কাহিনি।

ছেলেবেলা থেকেই তার মাথার গোলমাল ছিল। নিজেকে বলত এ-জন্মের নিউটন। আগের জন্মে থাকত বড় বাড়িটায়। অনেক বড় বৈজ্ঞানিক ছিল। এ-জন্মেও বৈজ্ঞানিক হবে।

মা-বাপ মরা এই পাগল ভাইটাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছিল জ্যাক স্যাভেজ। গাঁয়ের লোক বিদ্রূপ করত বলে ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিল লিঙ্কন শহরে। তারপর যায় বার্মিংহ্যাম-এর কাছে ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়াশুনোয় আশ্চর্য মেধা দেখিয়ে ফিরে এল গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু কারুর সঙ্গে মেলামেশা করত না। মাঝে মাঝে দিন কয়েকের জন্যে উধাও হয়ে যেত। ফিরে আসত কালিঝুলি মেখে। কিন্তু কিছুই বলত না দাদাকে। চিলেকোঠার ঘরে ছোট্ট ল্যাবোরেটরিতে বসে খুটখাট করত দিনরাত।

তারপর একদিন উধাও হয়ে গেল ফ্রেড। একটা চিরকুটে শুধু লিখে গেল, 'ডার্বিশ্যায়ারের আতঙ্করা এবার গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। চললাম ওদের নতুন ঠিকানায়। ডাইরি রইল। যদি মারা যাই, তা হলে পড়বে। নইলে নয়।'

'এই সেই ডায়রি, এই সেই চিরকুট,' বলে একটা নীল মলাট দেওয়া খাতা আর একটা চিঠি এগিয়ে দিল জ্যাক স্যাভেজ। খাতাটা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। গিঁটের ওপর গালার সিলমোহর।

প্রফেসর বললেন, 'আমাকে এত বিশ্বাস করে ডাইরি দেখাতে চাইছেন কেন?'

'আপনি তো প্রফেসর ন্যাটবালটু চ্যাকরো?'

অবাক হলাম আমি। প্রফেসর কিন্তু হলেন না। শুধু উচ্চারণটা শুধরে দিলেন।

জ্যাক স্যাভেজ বললে, 'বোনার্জি তো আপনারই লোক? সি পি বোনার্জি।'

এইবার অবাক হলেন প্রফেসর।

'বোনার্জি নয় ব্যানার্জি। কিন্তু আমি তো ওনামে কাউকে চিনি না?'

'চ্যানড্রো পেরিকাশ বোনার্জি আপনার লোক নয়?' আঁতকে উঠল জ্যাক স্যাভেজ।

ফের শুধরে দিলেন প্রফেসর, 'চন্দ্রপ্রকাশ ব্যানার্জি। এবার চিনেছি। গ্রেট ফোর টোয়েন্টি।'

'ফোর টোয়েন্টি!'

'মানে। জোচ্চোর। সে এসেছিল এখানে?'

‘এই তো পরশু। বললে, ফ্রেড স্যাভেজের খোঁজ করতে আপনি আসতে পারেন। আমি যেন আপনাকে আটকে রেখে দিই। ডার্বিশ্যায়ার থেকে ফিরে আপনাকে সব বলবে।’

গুম হয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর যা বললেন, আমি তো তা জানতাম না।

ফ্রেড স্যাভেজ দুনিয়ার একজনকেই নিজের আবিষ্কারের কথা লিখে জানিয়েছিলেন। সবাই ওঁকে পাগল বলেছে ছেলেবেলা থেকে। অথচ ওঁর বিশ্বাসটা বড় হয়েও যায়নি। আগের জন্মে সত্যিই আইজ্যাক নিউটন ছিলেন। যে সমস্ত বিরাট আবিষ্কার মানুষের চিন্তাধারা পালটে দিয়েছে, তার সবই আঠারো মাস ধরে করেছিলেন উলসথ্রপ-এর এই বাড়িতে। সব তাঁর মনে আছে। কিন্তু লোকে তা বিশ্বাস করে না।

তাই মন খুলেছিলেন শুধু প্রফেসরের কাছে। চিঠিপত্র চলছে অনেক দিন ধরেই। এই জন্মে তিনি যে ভয়ানক আবিষ্কারটা করে ফেলেছেন, তা যুগ যুগ ধরে ঘুমিয়ে ছিল ডার্বিশ্যায়ারের ফেলে যাওয়া কয়লা খনিগুলোর নীচের বদ্ধ ফোকরে। ভূমিকম্প পাথরের স্তর ফাটিয়ে দিয়েছে। রাতের অন্ধকারে সেই বিভীষিকারা কায়া ধারণ করে জীবন্ত প্রাণীর হাড়মাংস শুষে নিয়েছে। নইলে তারা অদৃশ্য। তারাই এ যুগের অদৃশ্য অবতার।

তাদের খতম করার দাওয়াই বানিয়েছেন ফ্রেড স্যাভেজ। ট্রায়াল দিয়েছেন কয়লার খনির পাতালে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে অদৃশ্য অবতার।

কিন্তু তাদেরই জ্ঞাতিভাইরা দেখা দিয়েছে ইন্ডিয়ার এক জঙ্গলে। ডার্বিশ্যায়ারে যেমন প্রতি রাতে মানুষ আর পশু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, অথবা শুধু কঙ্কাল পড়ে থাকছিল, কিন্তু রক্ত থাকত না কোথাও, ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটছে ইন্ডিয়ার জঙ্গলেও।

অদৃশ্য অবতাররা সেখানকার পাতাল থেকেও বেরিয়ে এসেছে। জীবন্ত প্রাণীর মগজ, মাংস, রক্ত, হাড় গ্রহণ করে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। তারা দিনের আলো সইতে পারে না— বেরোয় শুধু রাতে।

তাদের খতম করার দাওয়াই নিয়েই ফ্রেড স্যাভেজ যাচ্ছে জঙ্গলে।

আর এক টিন দাওয়াই রইল উলসথ্রপ-এর বাড়িতে। সেইসঙ্গে ফরমুলাটা। ফ্রেড যদি আর না-ফেরেন, প্রফেসর যেন ফ্রেড-এর চিঠি দেখিয়ে সব নিয়ে যান।

আমি বললাম, ‘চন্দ্রপ্রকাশ ব্যানার্জি তা হলে এর মধ্যে ঢুকল কী করে? কে লোকটা?’

প্রফেসর বললে, ‘বৈজ্ঞানিক জগতের ফরমুলা চোর। ফ্রেড সাদাসিধে মানুষ। ওর খপ্পরে পড়েছিল। আমাকে কিছু বলেনি। কিন্তু সে গেল কেন ডার্বিশ্যায়ারে?’

জ্যাক বললে, ‘চলুন, আপনার গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাক।’

থ্যাচার সরকারের আমলে ইংলন্ডের অনেক কয়লার খনি বন্ধ হয়ে গেছে। চেস্টার ফিল্ড গ্রামটাও খাঁখাঁ করছে। অথচ এক সময়ে ছিল জমজমাট মাইনিং ভিলেজ। এখন কয়লার খনির কোনও চিহ্ন নেই। ইংরেজরা ভালবাসে সুন্দর পরিবেশ। তাই কয়লার পাহাড় সরিয়ে সুন্দর সবুজ খেত বানিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু এখনও ঝোপ-ঢাকা গর্ত দু’-একটা পাওয়া যায়। রাতের অদৃশ্য অবতাররা এইসব

ফুটোফাটা দিয়ে বেরিয়ে জীবন্ত প্রাণীদের হাড়মাস খেয়ে গেছে। এইরকমই একটা ফুটোর ধারে পাওয়া গেল চন্দ্রপ্রকাশ ব্যানার্জির মৃতদেহ।

অদৃশ্য অবতার তাকে আধ-খাওয়া অবস্থায় ফেলে গেছে। চামড়া সাফ। সাদা পাঁজরার ফাঁক দিয়ে ভেতরের দেহযন্ত্রগুলো তখনও রয়েছে।

গাড়ি থেকে টিন আর স্প্রে-গান নামিয়ে আনলেন প্রফেসর। ফ্রেড্ স্যাভেজ চিলেকোঠার ল্যাবোরেটরিতে সিন্দুকের মধ্যে রেখে গেছিল টিনটা।

ফুটোর মধ্যে স্প্রে-গান-এর লম্বা নল ঢুকিয়ে দিয়ে স্প্রে করে দিলেন প্রফেসর।

ভক ভক করে বিকট দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল ফুটো দিয়ে।

প্রফেসর বললেন, 'ফ্রেড-এর দাওয়াই এড়িয়ে একটা দল বোধহয় ঘাপটি মেরেছিল এখানে। শেষ হয়ে গেল। এরপর?'

সেই সংবাদের অপেক্ষায় রোজ সকালে কাগজ খুলে বসে থাকি। যুগ যুগ ধরে পাতালের প্রচণ্ড চাপ আর নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে থেকে অদৃশ্য অবতাররা আবার বেরিয়েছে সর্বনাশা খিদের শান্তি মেটাতে। তারা এক সূক্ষ্ম জীবাণু। প্রাচীন জীবাণু জিন গবেষণায় পালটা জীবাণু বানিয়েছেন ফ্রেড স্যাভেজ।

জীবন দিয়েছেন ইন্ডিয়ার জঙ্গলে। কিন্তু সাফ করে দিয়েছেন সেখানকার অদৃশ্য অবতারদের।

কিন্তু তারা ছিল আছে থাকবে। তারাই মায়া-দের নিশ্চিহ্ন করেছে, বার্মুডার জাহাজ অদৃশ্য করেছে, পৃথিবীর নানান জায়গায় যুগ যুগ ধরে দলে দলে মানুষ উড়িয়ে নিয়ে গেছে...

তাদের আবার ঘুম ভেঙেছে...

কিন্তু ফরমুলা রয়েছে প্রফেসরের জিম্মায়। জন্মান্তরিত নিউটনের তৈরি ফরমুলা। যার দরকার পড়বে, সেই পাবে—

চিঠি লিখবে কিন্তু আমার ঠিকানায়।...

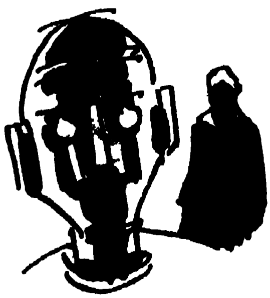

চাঁদু মানে চাঁদের জীব

কাচের কফিনের মধ্যে শুয়ে ছিল নিষ্প্রাণ জীবটা। নরম লোমশ দেহ। লম্বায় ইঞ্চি পনেরো। আকৃতি অনেকটা খুদে বানরের মতো। মোহর আকারের গোল গোল চোখ। হাত-পায়ের পুঁচকে থাবার সঙ্গে পার্থিব জীবের থাবার আশ্চর্য মিল।

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে তাকিয়ে ছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। চোয়ালটা এমন ঝুলে পড়েছিল যে ফোকলা মাড়ি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। লিকলিকে বপুটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে চোখ দিয়ে যেন গিলছিলেন অপার্থিব জীবটিকে।

দাড়ি চুমরে বললেন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক ইয়েফ্রেমভ প্রফেসর, 'একে কী নামে ডাকা যায় বলুন তো?'

'চাঁদু, মানে চাঁদের জীব,' বললেন প্রফেসর।

চাঁদুকে নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে। এতদিন জানা ছিল, চাঁদ একটা মরা জায়গা। সেখানে জল নেই বাতাস নেই, জ্যান্ত প্রাণীও নেই।

বেশ কয়েকবার চাঁদে নামল মানুষ— পাথর আর ধুলো ছাড়া কিচ্ছু পেল না। চাঁদুকে পাওয়া গেল দশম অভিযানে। এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের ওপর দিয়ে কী যেন একটা লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে দেখে গুলি চালাল একজন স্পেসম্যান। নিহত চাঁদুকে নিয়ে আসা হল পৃথিবীতে।

ভাবনার শুরু তখন থেকেই। চাঁদকে ঘাঁটি করে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে পাড়ি জমানোর স্বপ্নে মশগুল যাঁরা, তাঁরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। চাঁদে সব জিনিসেরই ওজন পৃথিবীতে যা তার আট ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ যে-রকেট জাহাজ মাত্র ড্রাম দুই জ্বালানি নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে চাঁদে পৌঁছোবে, সে চাঁদ থেকে দুশো ড্রামেরও বেশি জ্বালানি নিয়ে অবলীলাক্রমে মঙ্গল অথবা শুক্রগ্রহে পাড়ি জমাতে পারবে। কেননা, চাঁদে পৌঁছোলে বিষম ভারী রকেট জাহাজ নিজেই হালকা হয়ে যাচ্ছে— ওজন দাঁড়াচ্ছে আট ভাগের এক ভাগ। সেই জায়গায় ট্যাঙ্ক ভরতি করে জ্বালানি নেওয়া চলবে। সৌরজগতের দূরে দূরে যেতে গেলে এ ছাড়া তো পথ নেই। পেট্রল ছাড়া যেমন প্লেন ওড়ে না, জ্বালানি ছাড়া তেমনি স্পেসশিপও চলে না।

কিন্তু চাঁদুর আবিষ্কারে তাদের বাড়াভাতে ছাই পড়ার উপক্রম হল। কেননা, দশম

অভিযানের পরেও আরও তিনটি অভিযান হল চাঁদে— চাঁদুর জাতভাইদের জ্যান্ত ধরে আনার জন্যে। কিন্তু পাথরের ফাটলে ফোকরে তারা ঢুকে পড়ল। তারা সকলে আমাদের সামনে থেকে কোথায় উধাও হল চক্ষের নিমেষে। আড়াল থেকে ছুড়তে লাগল রাশি রাশি পাথুরে তির— যা কিনা ছুঁচের মতো ফুটো করে দিলে দু'দুজন স্পেসম্যানের স্পেসসুট— হাওয়া বেরিয়ে যেতে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল তারা। ট্রাক্টরের খাঁজ-কাটা বেল্ট-চাকায় পাথর-তির আটকে যেতে বিকল হল একটা ট্রাক্টর। প্রমাদ গুনল পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা। সর্বনাশ! এ যে রীতিমতো যুদ্ধ। চাঁদু বংশ ধ্বংস না-করলে তো চন্দ্র দখল সম্ভব নয়। সুতরাং সব দেশের সব বৈজ্ঞানিকরা ঝগড়াঝাঁটি ভুলে মিটিং করে ঠিক করলেন, আর নয়, মারো চাঁদুদের!

রুখে দাঁড়ালেন কেবল একজন, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। রেগে তিনটে হয়ে তিনি বললেন, 'এ কী বেআক্কেলে কথা! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চাঁদুদের মগজে বুদ্ধি আছে। ওদের সঙ্গে দোস্তি পাতাতে দোষ কী?'

'বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা কে বাঁধবে? আপনি?' জানতে চাইলেন সবাই।

'হ্যাঁ আমি,' পাঁজরা-বার করা বুক ঠুকে বললেন প্রফেসর।

দেশবিদেশের ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে যথাসময়ে চাঁদের টাইকো ক্রেটারে নামল বিশাল মহাকাশ জাহাজ। গুটগুট করে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কিম্ভূতকিমাকার একটা মূর্তি। সর্বাঙ্গে লোহার বর্ম, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ। অমন ভারী বর্ম নিয়ে পৃথিবীর ওপর হলে সিধে হয়ে দাঁড়াতেও পারতেন না প্রফেসর। কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠে সব কিছুই তো হালকা। তাই লোহার বর্মর ভেতরে হাওয়া-ভরা স্পেসসুট পরে প্রফেসর চরকিপাক দিতে লাগলেন চাঁদের বুকে। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ পাথুরে তির এসে পড়ল আচ্ছাদনে— স্পেসসুট স্পর্শ করতে পারল না।

অনেক... অনেকক্ষণ পরে প্রফেসরের কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিকে ফিরে আসতে দেখা গেল। কোলে একটা মর্কটাকৃতি জীব। জীবন্ত চাঁদু।

চাঁদু কিন্তু স্থির বসে থাকতে চাইলে না। পুরো দুটো দিনও গেল না পোষ মেনে গেল দিব্বি। খুদে বানরের মতোই ছিটকে ছিটকে যেতে লাগল এদিকে-সেদিকে। রকেট জাহাজের সর্বত্র তার যাওয়া চাই। প্রতিটি যন্ত্রপাতিতে নরম থাবা বুলিয়ে দেখা চাই। বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করলেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা চাই। সব কিছুতেই ওর সমান আগ্রহ, সমান কৌতূহল।

সব চাইতে অবাক কাণ্ড হল ওর ধ্যানস্থ হওয়া। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে ব্যোমভোলা হয়ে বসে থাকত চাঁদু। তখন মনে হত, ওর দেহে বুঝি প্রাণ নেই— নিথর নিস্পন্দ হয়ে থাকত অনেক... অনেকক্ষণ।

ধ্যান-রহস্য জানা গেল দিন দশেক পরে— আক্কেলগুড়ুম হল বৈজ্ঞানিকদের।

মিটিং-এ বসেছেন বৈজ্ঞানিকরা। দারুণ উত্তেজিত সবাই। পৃথিবীর সদর দপ্তর থেকে অর্ডার এসেছে, চাঁদুদের কবজায় আনতে না-পারলে ঘায়েল করো। বৃথা সময় নষ্ট করছ কেন?

প্রফেসর তাই নিয়ে মস্ত লেকচার শুরু করেছেন। গলার শির তুলে বলছেন, 'এ কী

অন্যায় কথা। চাঁদুরা এ-জগতের একটা বিস্ময়। স্কুইডের রক্তে লোহার বদলে তামা দেখে অ্যাদ্দিন অবাক হয়েছি আমরা। এখন দেখা যাচ্ছে, চাঁদুদের রক্তে রয়েছে জটিল কার্বন কম্পাউন্ড। চাঁদে বাতাস নেই, জল নেই— ওদের দরকারও হয় না। খাদ্য বলতে চাঁদের খনিজ ধুলো, চিমটে চিমটে খায়। দেহের তাপ-শক্তি আসছে তাই থেকেই। আর বুদ্ধি? আরে মশাই, ওরা যদি আয়না দিয়ে সূর্যের আলোকে এক জায়গায় জড়ো করে তাপ সৃষ্টি করতে শিখে নেয়, তা হলেই তো চাঁদের খনিজ লোহা গালিয়ে অস্ত্র বানিয়ে ফেলবে, তারপর...'

আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটল ঠিক এইসময়ে।

রামভক্ত হনুমানের মতো প্রফেসরের পেছনে ঘুরঘুর করছিল চাঁদু। আচম্বিতে সে ছিটকে এল মাঝের টেবিলের দিকে। একলাফে ওপরে উঠেই চোখ বন্ধ করল! এবং ধ্যানস্থ হল।

সেই মুহূর্তে... প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই... ঘরসুদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মগজে ধ্বনিতে হল একটি কথা, 'আমি চাঁদু বলছি।'

বিষম খেলেন প্রফেসর। কথাটা কানে শোনা গেল না— মাথার মধ্যে চিন্তার মতোই জেগে উঠল। টেলিপ্যাথি নাকি?— মনে মনে ভাবলেন প্রফেসর।

'হ্যাঁ, টেলিপ্যাথি,' আবার মাথার মধ্যে জাগ্রত হল সেই চিন্তা-কথা। 'চিন্তা-চালনা' বললে আরও ভাল বোঝা যাবে। 'আমরা, চাঁদুরা, কথা বলতে জানি না। কেননা, বায়ুশূন্য চাঁদে শব্দ শোনা যায় না। তাই আমরা মন দিয়ে মনের সঙ্গে কথা বলি। মনের চিন্তাকে অন্যের মনে চালিয়ে দিই। এমনি ভাবেই এই ক'দিন এখানে যা দেখেছি বা শুনেছি— সব জানিয়ে দিয়েছি আমার জ্ঞাতি ভাইদের। চাঁদে আগুন জ্বলে না। কিন্তু তাপ সৃষ্টির বিদ্যেও তারা শিখে নিয়েছে। এবার বানাব অস্ত্র।'

কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর, 'জানি তোমরা কী ভাবছ। আমাদের তোমরা মারতে পারবে না। কিন্তু তোমরা মরবে। কেননা তোমরা হাওয়া-ছাড়া, স্পেসসুট ছাড়া টিকতে পারো না এখানে। তোমাদের মতলব জানবার জন্যে, তোমাদের বিদ্যে শেখবার জন্যেই, আমি নিজে থেকে ধরা দিয়েছিলাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্রর হাতে। তাঁর চিন্তা থেকে আমরা জেনেছিলাম, উনি আমাদের বন্ধুরূপে চান— শত্রুরূপে নয়। তাই আমি এসেছি দূত হয়ে— শান্তির বাণী নিয়ে। চাঁদকে ঘাঁটি বানিয়ে তোমরা যেখানে খুশি যাও, আমরা সাহায্য করব। আমাদের সঙ্গে নিলে তোমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। চিন্তা-চালনা দিয়ে যে-কোনও গ্রহের যে-কোনও জীবের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারব আমরা— যা তোমরা পারবে না। চাঁদের খনিজ সম্পদও তোমরা নাও। হিরে মরকত প্লুটোনিয়াম— সব নাও। বিনিময়ে দাও তোমাদের জ্ঞান। তোমাদের জ্ঞানী পুরুষদের এখানে নিয়ে এসো। তাদের মগজের চিন্তা থেকেই আমরা জ্ঞান আহরণ করে নেব। রাজি?'

'হিপ্ হিপ, হুররে।' সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

এক ঘণ্টার মধ্যেই নির্দেশ এসে গেল পৃথিবী থেকে 'রাজি।'

সন্ধি হয়ে গেল চাঁদে পৃথিবীতে।

সময়-সিন্দুক

'দীননাথ।'

'বলুন, প্রফেসর?'

'কর্নেল চণ্ড আসছে।'

শুনে কাঠ হয়ে গেলাম আমি।

কে এই কর্নেল চণ্ড? পাঠক নিশ্চয় কৌতূহলী। সুতরাং কৌতূহল আগে মিটোনো যাক।

কর্নেল চণ্ড লোকটা দুশমন-শিরোমণি— অরণ্যের অন্ধকারে সে গুপ্ত থাকে, পুলিশ তার ছায়াও দেখতে পায় না— স্যাটেলাইটের ক্যামেরা-গোয়েন্দাও তার ছবি তুলতে পারেনি। সে যেন অশরীরী, সর্বত্রগামী। তার চেহারাটাও অসাধারণ। রোগা লিকলিকে, কালো কুচকুচে, হনু উঁচু, গাল তোবড়ানো, নাকের নীচে কাঠবিড়ালি সাইজের দু'খানা পুরুষ্টু গোঁফ দুই ঠোঁটের কোণ দিয়ে চিবুক পর্যন্ত ঝুলতে থাকে, সে কখনও পৈশাচিক চোখে তাকিয়ে থাকে না— চোখে হাসি ভাসে সর্বক্ষণ। ওই হাসিটা তার ছদ্ম-আবরণ। ওই হাসির আড়ালে গুপ্ত থাকে রাশি রাশি অভিসন্ধি। সে একটা জীবন্ত প্রহেলিকা, বিষম বিস্ময়। সে ভারতের একচ্ছত্র অরণ্য-অধিপতি।

আমি এই শ্রীহীন দীননাথ নাথ মানুষটা আখাম্বা লম্বা, ভয়ানক কাঠখোট্টা এবং অতিশয় দাঙ্গাবাজ। এহেন আমিও কর্নেল চণ্ড-র নাম শুনলে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করে দিতাম। সে কর্নেল ছিল না কস্মিনকালেও। ওটা তার ডাকনাম।

প্রফেসর একটা ভ্যানিশ সিন্দুক বানিয়েছেন। খবরটা কানে গেছে নিশ্চয়। নইলে সে আগাম নোটিশ দিয়ে আসবে কেন?

কর্নেল চণ্ড এখন আমাদের সামনে বসে আছে।

প্রফেসর তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে উদাস গলায় বললেন, 'তোমারই নাম কর্নেল ভণ্ড?'

আকর্ণ হেসে সে বললে, 'আজ্ঞে না। আমার নাম কর্নেল চণ্ড।'

'তুমি নাকি পাষণ্ড?'

'ওইখানেই আপনি গন্ডগোল করছেন।'

'কীরকম?'

'আমি যখন ভণ্ড সাধুদের মুখোশ খসাই তাদের অপকর্ম পণ্ড করার জন্যে, তখন নিজে একটা মুখোশ পরি। সে মুখোশটা এইরকম।'

চমকে গেলাম। আচমকা পালটে গেল কর্নেল চণ্ড-র মুখচ্ছবি। এতক্ষণ যা ছিল নিষ্পাপ, সরল, অমায়িক— আচম্বিতে তা হয়ে গেল কর্কশ, কঠিন, হিংস্র।

কড়কড়ে গলায় সে বললে, 'লিওনার্দো 'দ্য লাস্ট সাপার' ছবি আঁকবার জন্যে মডেল খুঁজেছিলেন। এমনই কপাল তাঁর, খলনায়ক জুডাস আর যিশুর মডেল হয়েছিল একই ব্যক্তি।'

নিরাসক্ত গলায় প্রফেসর বললেন, 'গপ্পোটা আমিও শুনেছি।'

'আমার মনে হয়, আগের জন্মে আমিই ছিলাম সেই লোক— এ জন্মে কর্নেল চণ্ড। অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এই শর্মা অরণ্য বেরোয় না ছেড়ে' বলে, হাসি হাসি চোখে তাকাল আমার দিকে।

মধুময় নেত্রপাত, কিন্তু আমার রক্ত শুকিয়ে গেল। একটু আগেই এই চোখে যে হিংস্রতা দেখেছি, তা চণ্ডালের চোখে দেখা যায়।

সে কিন্তু মিটিমিটি হেসে বললে, 'আপনার এই চ্যালাটির সব লেখা আমি পড়ি। কল্পবিজ্ঞানের গুলপট্টি আমার ভাল লাগে। আমার ধারণা ছিল দীননাথ নাথ গাঁজা খায়—'

লেখকদের সামনে কখনও তাদের নিন্দে করতে নেই, স্তুতি গাইতে হয়— এই আহাম্মকটা দেখছি তা জানে না। অজান্তেই নিশ্চয় চোখমুখ শক্ত করে ফেলেছিলাম, প্রফেসরও তটস্থ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু কর্নেলের পরবর্তী প্রশংসিকা শুনে জল হয়ে গেলাম।

সে বললে স্বর্গীয় হাসি হেসে, 'মাই ডিয়ার দীননাথ, তোমার 'সময়-গাড়ি' আমার চোখ খুলে দিয়েছে।'

আমি সন্তুষ্ট হলাম। কিন্তু তা চেপে রেখে একটু শক্ত গলায় বললাম, 'এতদিন তা হলে অন্ধ ছিলেন?'

'ছিলাম। টাইম-মেশিনের ব্যাপারে।'

বলেই, সকৌতুকে তাকাল প্রফেসরের দিকে, 'ডক্টর হু তো আপনার চেনা আদমি?'

যেন বারুদে আগুনের ফুলকি ছোঁয়ানো হল। ফেটে পড়লেন প্রফেসর, 'কো-কোথায় সেই চারশো বিশ চোরটা?'

দু'চোখ মুদে পাক্কা এক মিনিট নিঃশব্দে হেসে গেল কর্নেল চণ্ড। তারপর চোখ খুলে মধুক্ষরা স্বরে বললে, 'ক্রিটেসাস যুগে।'

ছ'কোটি বছর আগে ছিল খড়িকাল।

ডক্টর হু এখন সেখানে!

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল আমার। প্রফেসরেরও।

কর্নেলের চোখ দুটো বিলক্ষণ কুতকুতে। চৈনিক চোখের মতো। অত বড় গোঁফ, কিন্তু চিবুকে অল্প অল্প দাড়ি— নেই বললেই চলে। চিনেম্যানদের যেরকম থাকে। কিন্তু চিনেম্যানরা কালো হয় না। এই শর্মা আবলুস কাঠকেও লজ্জা দেয়। বনের ডাকাতরা বিদঘুটে হয় অবশ্য। এ লোকটা বিলকুল কিম্ভূত। অঙ্গশোভা অদ্ভুত।

শুয়োরের মতো চোখ দুটো আলপিনের ডগার মতো সরু করল কর্নেল চণ্ড। তারপর বললে কাঠচেরা গলায়, 'বদমাশ, ভারী বদমাশ এই কর্নেল হু। আপনার টাইম মেশিন, যার নাম রেখেছিলেন 'সময়-গাড়ি,' চৌপাট করবার ষড়যন্ত্র করেছিল—'

'জানি,' নীরস স্বর প্রফেসরের।

'আপনি গাড়ি লুকিয়ে ফেলেছিলেন পাতাল গ্যারেজে—'

'খবরটা তুমি পেলে হু রাসকেলের কাছে?'

'আজ্ঞে। তাকে আমি কিডন্যাপ করেছিলাম— সে একটা অপকর্ম করেছিল বলে—'

'আমার সময়-গাড়ির নকশা চুরি করেছিল—'

'আজ্ঞে। আমি তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখলাম আমার জঙ্গল গবেষণাগারে। তারপর তাকে দিয়ে বানালাম একটা সময় গাড়ি।' ওকে দিয়ে... মানে, ওর সময়-গাড়ি দিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো বিশ্ব-চমকানো কাজ করব ঠিক করেছিলাম—'

'ঝেড়ে কাশো।'

'সময়-গাড়ির যে নকশা আপনি বানিয়েছিলেন, তা ইচ্ছে করেই নিখুঁত করেননি—'

'সেটাই নিয়ম।'

'কিছুটা রেখেছিলেন আপনার ব্রেনে—'

'এখনও আছে।'

'ফলে, ডক্টর হু আপনার আধাখ্যাঁচড়া নকশা থেকে একটা আধাখ্যাঁচড়া সময়-গাড়ি বানিয়েছিল। তার নাম দিয়েছিল টাইম-স্ক্রু।'

চোখ জ্বলে উঠল প্রফেসরের, 'নকল করতে গেলে এইরকমই হয়। রাসকেল হু... যাক গে, টাইম-স্ক্রু বস্তুটা কীরকম দাঁড়িয়েছিল?'

'স্প্রিং বলতে পারেন। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সময় যেন নেমেছে আর উঠেছে। প্যাঁচের একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টেই শুধু এক লাফে যাওয়া যায়, যেখানে খুশি নয়— আপনার সময়-গাড়িতে যা সম্ভব।'

'ফলে, ওর সময়-ঘোড়া এক লাফে অতীতে যেতে পারত ছ-কোটি বছর আগে— ভবিষ্যতেও ছ'কোটি বছর পরে?'

'আজ্ঞে। আমি মতলববাজ মানুষ। মতলব ছাড়া কাজে নামি না—'

'সাধু পুরুষ!'

কুতকুতে চোখে কৌতুক ভাসিয়ে বলে গেল কর্নেল চণ্ড, 'আইডিয়াটা পেয়েছিলাম 'জুরাসিক পার্ক' বইটা পড়ে। ডাইনোসরদের চিড়িয়াখানা বানানোর নকশাবাজির উদ্ভট গপ্পো। কিন্তু ব্রেনে খেলে গেল অন্য মতলব। খড়িকাল থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত গাছ, বিকট বিকট ডাইনোসর এনে চাষ করব জঙ্গলে জঙ্গলে...। ব্যস, চলমান গাছের চারা এনে ফেললাম জঙ্গলে—'

'চ-চ চলমান গাছ।'

'আজ্ঞে। দিব্বি হেঁটে হেঁটে বেড়ায়... শেকড়ে হাঁটে লাফায়... আমাকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হয় না... ওরা তো মনের কথা টের পায়...'

'অতীন্দ্রিয় উদ্ভিদ।'

'ইয়েস, স্যার। খেতেও চায় না। কিন্তু জঙ্গল পাহারা দেয়, আমাকে পাহারা দেয়, লুকিয়েও রাখে—'

ফস করে বলে ফেললাম, 'স্যাটেলাইট থেকে তাই আপনার ছবি তোলা যায়নি?'

মৃদুহাস্য করে চণ্ড বললে, 'দীননাথ ধরে ফেলেছে। ওরা তো অতীন্দ্রিয়... আকাশ থেকেও প্যাঁচ কষলে আর টিপ করলেও টের পায়— আমাকে পাতা দিয়ে মুড়ে খোঁদলে টেনে নেয়।'

আমি হাঁ হয়ে গেলাম, 'গুজরাটের একটা আমগাছ শেকড় বাড়িয়ে দিয়ে মাটি খামচে ধরে পেছনের শেকড় তুলে নিয়ে একটু একটু হাঁটে— খবরের কাগজে পড়েছিলাম।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায় হাত নেড়ে চণ্ড বললে, 'ওটা একটা অপোগণ্ড গাছ। জঙ্গল থেকে বিদেয় করেছি। দো-আঁশলা গাছ আর কত ভাল হবে। কিন্তু খড়িকালের এই আসলি গাছগুলো যদি দেখেন স্যার, আপনার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।'

'দেখব, দেখব,' প্রফেসর যেন এখুনি রওনা হতে চান।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আসল অ্যাডভেঞ্চার, আই মিন, এক্সপেরিমেন্টটা বলি।'

'আরও আসল?'

'আজ্ঞে, বললাম না, 'জুরাসিক পার্ক'কে টেক্কা মারতে চেয়েছিলাম? খড়িকাল থেকে অদ্ভুত কিম্ভূত বিশাল বিকট ডাইনোসরদের এনে পোষ মানিয়ে জঙ্গল বাহিনী করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওইটুকু সময়-গাড়িতে বড় বড় ডাইনো আনতে পারিনি।'

'বাচ্চা এনেছিলে?'

'আজ্ঞে। সেইসঙ্গে একটা উৎপাত।'

'কীরকম?'

'একটা মেয়ে!'

সিধে হয়ে গেল প্রফেসরের শিরদাঁড়া, 'মেয়ে!'

'আজ্ঞে।'

'খড়িকালে মানুষ ছিল না জানি। এ-মেয়ে তা হলে এল কোন তল্লাট থেকে?'

'অন্য গ্রহ থেকে।'

'অ্যাঁ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাকে দেখতে অবিকল মানুষের মতো, শুধু যা বড্ড তেজি। খুব লম্বা। ন'ফুট তো বটেই। ভাবতে পারেন? খুব কালো—'

'শূর্পনখা কি তা হলে অন্য গ্রহ থেকে এসেছিল?' আমি মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম।

কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না চণ্ড। বলে গেল, 'শূর্পনখার চেহারাটা ছিল উৎকট। এর তা নয়। সারা গায়ে রুপোলি ব্যান্ডেজের মতো ধাতুর পটি জড়ানো।'

'ম্যমির মতো?'

এবারেও আমাকে পাত্তা দিল না চণ্ড, 'এত শক্ত যে ডাইনোদের আঁচড় কামড়ে কিছু হয় না— তাদের নখ দাঁত ভেঙে যায়।'

'মাই গড!' বললেন প্রফেসর।

'কোমরে একটা বশীকরণ বন্দুক। কেউ ট্যাঁ-ফুঁ করলেই তাকে বশ করে নেয়।'

এইবারে আঁতকে উঠলেন প্রফেসর, 'হু হারামজাদাকেও করেছে নাকি? তোমাকে?'

'আজ্ঞে না। পৃথিবীর মানুষদের বশ করবার ক্ষমতা ব্রহ্মাণ্ডের কোনও মানুষের নেই। বড় ত্যাঁদোড় আমরা।'

প্রফেসর বললেন, 'কোথায় সেই ময়দানব মেয়ে?'

'ময়দানবী,' ব্যাকরণ শুধরে দিলাম আমি।

'সে ডাইনো বাচ্চাদের নিয়ে বেশ আছে। তাকে দিয়ে ডাইনো সার্কাস খোলবার প্ল্যান আছে।'

'কথা বলে ময়দানবী?' প্রফেসর এবার ব্যাকরণ ভুল করলেন না।

'একদম না। ওইটাই সুবিধে। পৃথিবীর মেয়েগুলোর মতো ওদের জিভ নেই।'

'চমৎকার!' প্রফেসর খুশি হলেন না দুঃখিত হলেন, কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট হল না। 'হু হারামজাদা খড়ি-যুগে কী করছে?'

'গলে গেছে। মেয়েটার সাঙ্গোপাঙ্গরা রে-গান দিয়ে টাইম-স্ক্রু সমেত গলিয়ে পাথরে মিশিয়ে দিয়েছে। বাজে মেশিন তো— একই জায়গায় গিয়ে উঠতে হয়েছে খড়িকালে। তক্কে তক্কে ছিল নিশ্চয় মেয়েটার দলবল। চালিয়ে দিয়েছে রে-গান—'

খুব খুশি হলেন প্রফেসর। বরাভয় চোখে বললেন, 'কী চাও আমার কাছে?'

'টাইম-সিন্দুক।'

'বৎস, চণ্ড,' বললেন প্রফেসর অর্ধনিমীলিত চোখে, 'আমার এই টাইম-সিন্দুক এখনও পারফেক্ট হয়নি।'

'কী ডিফেক্ট আছে?' এই সময়ে একটা আশ্চর্য কাণ্ড লক্ষ করলাম। চণ্ডর দুটো কানই নড়ে উঠল। গাধার কানের মতো অত বড় আর লম্বাটে না-হলেও কান দুটো বেশ বড়। আর লোমশ। এখন স্পষ্ট দেখলাম, সেই দুটো কান একজোড়া ছোট কুলোর মতো নড়ে উঠেই থেমে গেল।

চুল খাড়া হয়ে গেল আমার।

চণ্ড মহাশয়ের কানের সঙ্গে চোখেরও কানেকশন আছে নিশ্চয়। তা না হলে, কান নড়ার তালে তালে চোখ পিটপিট করবে কেন?

সেই সঙ্গে আর একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। মুখভাব ঝট করে রুক্ষ উগ্র হয়ে উঠেই পট করে স্বাভাবিক হয়ে গেল। যেন, দু'পিঠে আঁকা দুটো দু'রকম মুখোশ। নিমেষে ও পিঠ দেখিয়েই ফের দেখানো হল এ পিঠ।

হাত-পা হিম হয়ে এল আমার। এ কী সাংঘাতিক লোকের সামনে পড়েছি! এ তো দেখছি নিমেষে দানব, নিমেষে মানব!

প্রফেসর লক্ষই করলেন না। বললেন উদার গলায়, 'বৎস চণ্ড, তোমাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

হুকুম হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ, 'পেঙ্গু, যাও তো, নিয়ে এসো টাইম-সিন্দুক।'

পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, মন প্রসন্ন থাকলে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আমাকে পেঙ্গু বলে ডাকেন, যদিও আমি প্যাংলা নয় মোটেই, পেঙ্গুইনের চেহারার সঙ্গে হয়তো মিল থাকতে পারে। যাক গে।

সবাই জানে, প্রফেসর ঢাক পিটিয়ে লোক দেখিয়ে কখনও গবেষণা করেন না। তাই তাঁর গবেষণাগার এই মান্ধাতার আমলের বাড়ির পাতাল ঘরে। মাটির তলায় সেই এলাহি কাণ্ডকারখানার গোলক ধাঁধায় ঢোকবার কায়দা জানি শুধু আমি আর প্রফেসর। আর জানত ওঁর পোষা বাঁদরটা। তাকে তো উনি নিয়ানডারথ্যাল ম্যান-এর স্টেজে এনে ফেলেছেন। তার কথা পরে শোনাব।

পাতাল-মন্দির (প্রফেসরের ল্যাঙ্গুয়েজে) থেকে সিন্দুকটা ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে চলে এলাম বসবার ঘরে। ঘর নিস্তব্ধ। প্রফেসর কড়িকাঠের টিকটিকি খুঁজছেন খুব মন দিয়ে। কর্নেল চণ্ড কিন্তু বসে রয়েছে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে। তার হাঁটু নড়ছে, কান নড়ছে এবং...

নাকের ডগাও নড়ছে।

সিন্দুকটা নামিয়ে রাখলাম ছোট টেবিলে।

চণ্ড এখন বিলকুল স্থির। তার কিছুই আর নড়ছে না। সাধুভাষায় প্রস্তরমূর্তি বলা যায়।

প্রফেসর বললেন, 'পেঙ্গু।'

আমি বললাম, 'বলুন।'

'ওই বেঞ্চিটা টাইম-সিন্দুকের ভেতর ঢুকিয়ে দাও।'

প্রফেসর তো বলেই খালাস। ওইটুকু সিন্দুকের একহাত বাই একহাত দরজা গলিয়ে ছ'ফুট লম্বা বেঞ্চিটা ঢোকাব কোথায়? সিন্দুকের পেট-ও তো মোটে এক হাত গভীর।

কিন্তু সে-কথা বলতে গেলে পাছে খেঁকিয়ে ওঠেন, তাই রামভক্ত হনুমানের মতো সিন্দুকের পাল্লা খুলে রাখলাম। ভেতরে এখন দেখা যাচ্ছে যেন একটা আস্ত ব্ল্যাকহোল। কৃষ্ণগহ্বর। তমাল কালো অন্ধকার। ঘরের আলো সিন্দুকের মধ্যে ঢুকেই যেন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

সিন্দুকের এহেন গুণের জন্যে নামকরণের সময়ে প্রফেসরের সঙ্গে আমার বিস্তর খিটমিটি হয়ে গেছে। আমি নাম দিয়েছিলাম ব্ল্যাকহোল বক্স। প্রফেসর খেপে গিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি একটা পাঁঠা। তোমাকে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে একটা গাধা হয়ে বেরিয়ে আসবে। উজবুক কাঁহাকার! ওটা টাইম-বক্স, তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতে অথবা অতীতে।'

তারপর অবশ্য মাথা চুলকে বলেছিলেন, 'কী যে হবে, সেটাই এখনও অঙ্ক কষে বের করতে পারছি না। বৈজ্ঞানিক মন্দিরে এরকম কাণ্ড তো হামেশাই ঘটে, তাই না? শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়া হয়ে যায়। খটকা সেইখানেই, দীননাথ। সিন্দুকের পেটের রহস্য আজও প্রাঞ্জল হল না। টাইম কী খেলা খেলছে ওখানে, তা ধরতে পারলাম না।'

টাইম-সিন্দুক নিজেই যখন একটা মূর্তিমান হেঁয়ালি প্রফেসরের কাছে ঠিক সেই সময়ে আর এক হেঁয়ালি এসে চেয়ে বসল হেঁয়ালি-বাক্স। দিতেই হবে।

প্রফেসরও এককথায় আধাখ্যাঁচড়া গবেষণার ফল গছিয়ে দিতে চাইলেন। তার আগে যে এক্সপেরিমেন্টটা করলেন, তা এই :

আমাকে বললেন, 'ঠেলে ঢোকাও।'

কী মুশকিল! সিন্দুকের দরজার মুখ তো মোটে একহাত বাই একহাত। হাত দুই উঁচু বেঞ্চির ঠ্যাং ঢোকাই কী করে?

আমি যখন কসরত করে মরছি, উনি তখন খ্যাঁকাচ্ছেন, 'দূর বুদ্ধু! পায়ার ডগা একটুখানি আগে ঢুকিয়ে দাও।'

তাই করলাম। কাত করলাম বেঞ্চি, একটা পায়ার একটু ঢুকল, সেইটুকু যেন গলে গেল সিন্দুকের অন্ধকারে, আবার একটু ঠেলা মারলাম, আবার একটু ভেতরে ঢুকে গলে মিলিয়ে গেল... আবার...আবার...

আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গোটা বেঞ্চিটাকে অদৃশ্য করে দিলাম ওইটুকু সিন্দুকের মধ্যে। একেবারে ভ্যানিশ হয়ে গেল।

কুতকুতে চোখ দুটোকে গোল গোল গুলি পাকিয়ে চেয়ে ছিল কর্নেল চণ্ড।

প্রফেসর বল+লেন, 'পাল্লা বন্ধ করে দাও।'

দিলাম।

প্রফেসর উদ্দেশ করলেন চণ্ডকে, 'স্ট্রিং থিয়োরি কাকে বলে জানা আছে?'

ডাইনে বাঁয়ে মাথা সঞ্চালন করল কর্নেল। সে এখন নির্বাক।

প্রফেসর বললেন, 'তা হলে অপাত্রে জ্ঞান দিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। সার কথায়, বস্তুকণা নয়, বস্তুতন্তু রয়েছে সব কিছুর মূলে... তিনটে ডাইমেনশনে নয়— ন'টা ডাইমেনশনে তাদের যাতায়াত... তিন ডাইমেনশনের বেঞ্চিটা... দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা... এই তিন ডাইমেনশনে থাকা বেঞ্চিটা এখন ন'খানা ডাইমেনশনে ছড়িয়ে পড়েছে... এই ন'টা ডাইমেনশনের একটা হল টাইম। কী বুঝলে?'

কর্নেল নিষ্পলক।

প্রফেসর চালিয়ে গেলেন, 'স্ট্রিং থিয়োরিকে আজ পর্যন্ত কোনও এক্সপেরিমেন্ট সাপোর্ট করেনি— বিশুদ্ধ চিন্তা হয়ে রয়েছে। কিন্তু এককালে এই ধরনের বিশুদ্ধ চিন্তা থেকেই আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দুনিয়া তাজ্জব করা তত্ত্ব হাজির করেছিলেন। মাথায় ঢুকছে?'

কর্নেল যেন হৃৎকম্পরহিত।

বড় নিশ্বেস ফেলে প্রফেসর বললেন, 'তত্ত্বকথার কচকচানি আর চালাতে চাই না। আমি একটা এক্সপেরিমেন্টে হাত দিয়েছি— এই সিন্দুক।' একটু থামলেন। তারপর, 'বেঞ্চিটা বস্তুতন্তু হয়ে অদৃশ্য হয়েছে সময়-স্থানের মোচড়ের মধ্যে কোথাও— ঠিক যেন অসমোসিস... এক গেলাস জলে এক খাবলা চিনি বা নুন ফেলে দিলে যেরকম গলে যায়— এও তেমনি... নটা ডাইমেনশনের মধ্যে গলে মিলিয়ে রয়েছে... বিস্তৃত হয়েছে... এই ব্রহ্মাণ্ড যেমন বিস্তৃত হচ্ছে, একসময়ে সংকুচিত হবে— এই সিন্দুকের মধ্যে সেটাই ঘটছে অল্পসময়ের মধ্যে। দেখা যাক, সংকুচিত হয়ে আস্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসে কিনা বেঞ্চি। দীননাথ, খোলো পাল্লা।'

খুললাম পাল্লা— এক ঝটকায়। ঝট করে নিজেও সরে এলাম। সময়-গহ্বর যা গিলেছে, তা কীভাবে উগরে দেবে, তা যখন জানি না...

উঁকি দিল বেঞ্চির একটা পায়ার তলার দিক। একটু একটু করে গোটা বেঞ্চিটাই বেরিয়ে এসে উলটে পড়ল মেঝেতে।

এবং বিপুল লম্ফ দিয়ে সিন্দুকের সামনে ঠিকরে গেল কর্নেল চণ্ড... 'দেখি তো ভেতরে কী আছে,' বলেই মাথা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে...

ভয়ানক কাণ্ডটা ঘটে গেল চোখের সামনে। বিলকুল অবিশ্বাস্য। ঘটনাপরম্পরা পরপর বলা যাক।

সিন্দুকের মধ্যে কে যেন কর্নেলের মুণ্ড খামচে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিল ভেতরে।

পা দুটো শূন্যে লাথি মারতে মারতে ঢুকে গেল সিন্দুকের অন্ধকার অন্দরে।

মিলিয়ে গেল। দূর থেকে উঁকি মেরে দেখলাম। কিচ্ছু নেই।

দুই চোখে পরম প্রত্যাশা জাগিয়ে চেয়ে আছেন প্রফেসর। আচমকা ভয়ংকরদর্শন নখওলা একটা থাবা মুঠো পাকিয়ে বেরিয়ে এল সিন্দুকের বাইরে। শুধু কবজি পর্যন্ত। বেশ লোমশ মোটা হাত। কবজি জুড়ে রয়েছে সিন্দুকের মুখ। খুলল মুঠো। থপ করে মেঝেতে পড়ল একটা মাংসপিণ্ড।

কর্নেলের দেহাবশেষ। একেবারে পিন্ডি পাকানো।

মুঠো অন্তর্হিত হল সিন্দুক-অন্দরে।

এবার খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা রুপোলি স্যান্ডেল পরা পা, রুপোলি ধাতুর ফেটি জড়ানো দুটো ঠ্যাং... তারপর... ধড়... মুণ্ড!

চক্ষু চড়কগাছ হল আমার।

কেননা, মেঝেতে দাঁড়িয়ে প্রায় ন'ফুট হাইটের একটা আজব মেয়ে। তার সারা গায়ে রুপোলি ফেটি জড়ানো। চোখ মুখ বেজায় শক্ত। অমানবিক। কুচকুচে কালো।

বুঝলাম।

সেই ময়দানবী।

সে মুখে কথা বললে না। ব্রেন কথা বলল। নিঃশব্দে। আমি আর প্রফেসর আমাদের ব্রেনের মধ্যে সেতারের বাজনার মতো কথার বাজনা শুনে গেলাম।

'আমি সেই ময়দানবী নই— তার দিদি। এই বদ লোকটার চাইতেও একটা বজ্জাত আমার বোনকে ধরে এনেছিল। ডাইনো নিয়ে সে খেলছিল, ছেলেমানুষ। সময় পথে এসে ওত পেতে ছিলাম। আমি অন্য গ্রহ থেকে এসেছি তোমাদের পৃথিবীতে সেই খড়িকালে— আমার দলবল রয়েছে সিন্দুকের মধ্যে... দলবেঁধে এসেছি সময় পথে। সিন্দুকের সুযোগ দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আমার বোনকে ফিরিয়ে দাও। তোমাদের মাথার মধ্যে তার ঠিকানাটা লিখে যাচ্ছি— যা হেঁড়ে মাথা তোমাদের।'

ঠিকানা লিপিবদ্ধ হয়ে গেল ব্রেনের কোষে কোষে। ময়দানবী একটু একটু করে উধাও হল সিন্দুকের মধ্যে। আগে পা, পরে ধড়, সবশেষে মুণ্ডটা যাওয়ার আগে ধকধকে চোখে শাসিয়ে গেল ব্রেনের মধ্যে, 'এই সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে— যদি ফেরত না-পাই, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করব,' কর্নেলের মাংসপিণ্ড দেখিয়ে, 'এইরকম।'

মুণ্ডটা ভেতরে চলে যেতেই তেড়ে গিয়ে দমাস করে বন্ধ করলাম পাল্লা।

তারপর? সে আর এক কাহিনি!

নব কলেবরে নাটবল্টু

চোখ মেললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। দেখলেন, তিনটে উদ্‌বিগ্ন মুখ ঝুঁকে রয়েছে তাঁর মুখের ওপর। বয়স তাদের কম। বিজ্ঞানী তিনজনেই। এই তিন চ্যালাকে দিয়ে অপারেশনটা করিয়েছেন প্রফেসর। আমাকে ধারে কাছেও রাখেননি। খবর পর্যন্ত দেননি। দিলে এই কাণ্ড ঘটতে দিতাম না।

এটা ঠিক যে আমার মতন গবেটকে দিয়ে কিমাশ্চর্যম এই অপারেশনও সম্ভব হত না। তরুণ এই তিন বিজ্ঞানী তিনটে সচল বিশ্বকোষ বললেও চলে— বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ। বয়স কম বলে নার্ভ শক্ত, ঝুঁকি নিতে পারে। অসাধারণ এই অপারেশন আর কারও দ্বারা সম্ভব হত না। আঙুল চলে ইস্পাতের আঙুলের মতন, মনে মায়াদয়ার বাষ্প নেই, বৃদ্ধদের সম্মান জানাতেও জানে না। আমার কাছে এরা নরপশু ছাড়া কিছু নয়।

প্রফেসর অবশ্য অন্য কথা বলেন। এরা নাকি বসুন্ধরার বিস্ময়। এই পৃথিবীকে এরাই পালটে দিতে পারবে। অপারেশনের মন্ত্রগুপ্তিটা যে শিখে গেছে প্রফেসরের কাছ থেকে।

আমি বলি, এরা মানুষ নয়, রক্তমাংস দিয়ে গড়া রোবট, নইলে প্রফেসরকে নিয়ে এবকম চ্যাংড়ামি করতে পারে?

প্রফেসর কিন্তু অপারেশনের রেজাল্ট দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছিলেন, অজ্ঞান করার দাওয়াইয়ের ঘোর অবশ্য তখনও কাটেনি। কথা বলতে গেলেও পারতেন না।

চ্যাংড়া নম্বর ওয়ান বলেছিল, 'কীরকম লাগছে, স্যার?'

'অলরাইট তো?' চ্যাংড়া নম্বর টু-এর প্রশ্ন।

'কথা কইতে পারছেন না? না-পারলে শুধু ঘাড় নাড়ুন,' চ্যাংড়া নম্বর তিন সপাটে হুকুম দিয়ে গেল প্রফেসারকে।

প্রফেসর শুধু ঢোঁক গিললেন— তেড়ে উঠলেন না, নতুন জিভ তালু আর গলার কেরদানিটা যাচাই করে নিলেন চুপচাপ থেকে। তারপর বললেন ঘড়ঘড়ে জড়ানো গলায়, 'মনে হচ্ছে... মনে হচ্ছে...'

'বলুন... বলুন... কী মনে হচ্ছে?'...

'আমি... আমি...'

রসকষহীন গলায় বললে তিন নম্বর চ্যাংড়া, 'যাচ্চলে, অজ্ঞান হয়ে যাবেন নাকি?'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন প্রফেসর।

তাই দেখে কী আহ্লাদ তিন চ্যাংড়ার। নাম্বার ওয়ান বললে সোল্লাসে, 'দশ ঘণ্টা একটানা যন্ত্রটাকে চালু রাখতে হয়েছে তো আমাকেই। ব্রেন বটে প্রফেসরের, নিজের তৈরি মেশিনে নিজেই গিনিপিগ হলেন। তাজ্জব মেশিনের আইডিয়াটা পেলেন কোত্থেকে?'

চ্যাংড়া নম্বর দুই বললে, 'ব্রেন... ব্রেন... অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে এই ব্রেন... রূপকথার উদ্ভট কাণ্ডকারখানাকেও সত্যি বানিয়ে দিতে পারে। থ্রি চিয়ার্স ফর প্রফেসর নাটবল্টু চক্র... হিপ হিপ হুররে... হিপ হিপ হুররে... হিপ হিপ হুররে!'

প্রফেসর চিঁচিঁ অথবা গরগর কোনওটাই করলেন না, শুধু চোখ পিটপিট করে গেলেন।

ঠিক এই সময়ে একদল রিপোর্টার হইহই করে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। এরা অ্যালসেশিয়ান-বুলডগের জাত— গন্ধে গন্ধে ঠিক চলে আসে। তারপর কামড়ে ধরে চোয়াল লক করে ফ্যালে— খবর না-নিয়ে বেরোয় না।

শিলাবৃষ্টির মতন প্রশ্ন বৃষ্টি করে গেল এই কাগুজে সারমেয়রা।

'চৈতন্য ফিরেছে?'

'নিজেকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে?'

'প্রথম কথাটা কী বললেন?'

'লং লিভ ডগ এমপায়ার বলেছেন কি?'

'চোখ চেয়েই কি ঘেউ ঘেউ করেছেন?'

'খেতে চাইলে কী দেবেন? রুটি-মাখন, না, মাংস-হাড়?'

'ভাষণ দেবেন কোন ভাষায়? গোটা পৃথিবীকে চমকে দিতে চাই, চারখানা পায়ে কত সুবিধে। জোয়ান শরীরও পেলেন বুড়ো শরীরের বদলে, ওয়ান্ডার ব্রেনও রয়ে গেল।'

প্রফেসর গরগর করে উঠলেন বিষম রাগে। অমনি পটাপট জ্বলে উঠল ফ্ল্যাশবাল্ব, চালু হয়ে গেল ভিডিও ক্যামেরা, মুখের কাছে বাড়িয়ে দেওয়া হল মাইক্রোফোন।

প্রফেসর বললেন রোখা গলায়, 'ঘেউ ঘেউ... গেট আউট।'

অমনি গোটা বাড়ির অন্য ঘরে বাঁধা সবগুলো কুকুর সাড়া দিল একসঙ্গে। থরথর করে কাঁপতে লাগল কংক্রিটের ইমারত। কয়েকশো কুকুর যদি একসঙ্গে গর্জন ছাড়ে, তা হলে বুকও কাঁপে। কুত্তা ভাষায় প্রফেসর বোধহয় সিগন্যাল দিলেন, হয়তো বললেন, 'ঘেউ ঘেউ... বাঁচাও বাঁচাও।'

চেন ছিঁড়ে বাঘের মতন কয়েকটা কুকুর ঢুকল ঘরে। জ্বলন্ত চোখে শুধু চেয়ে রইল রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারদের দিকে। সুড়সুড় করে চম্পট দিল প্রত্যেকেই। যাবার সময়ে এক দুঃসাহসী পট করে ফ্ল্যাশ মেরে তুলে নিয়ে গেল শয্যার ছবি— একটা সাদা লোমশ কুকুর শুয়ে আছে খাটে। কুচকুচে কালো চোখ দুটো মানুষের চোখ নয় মোটেই।

ঘর এখন ফাঁকা। তিন চ্যাংড়াকেও ঘরের তিন কোণে ঠুসে ধরেছে কুকুর বাহিনী। ঘর ভরে গেছে কুকুরে, লেড়িকুত্তা থেকে আরম্ভ করে সেন্ট বার্নাড— সব কুকুর।

কুকুরের ভাষাটাও আয়ত্ত করে ফেলেছেন বোধহয় প্রফেসর। বললেন, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ।'

ঘর-ভরতি কুকুর তিন চ্যাংড়ার দিকে তেড়ে গেল, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ।'

সিঁটিয়ে গেল তিন মানুষ-রোবট। মুখ আমসি। নম্বর ওয়ান চ্যাংড়া আমতা আমতা করে বলল, 'স্যার কি কুত্তার ল্যাঙ্গুয়েজেই কথা বলবেন?'

'ঘেউ!' একযোগে গর্জে উঠল সব ক'টা কুকুর। কুত্তা বলায় খেপেছে তারা।

প্রফেসর বললেন, 'ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি আপনি চলে আসছে মুখে— কী করব। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। কুকুরের সব ক্ষমতা পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে... গন্ধ পাচ্ছি।'

'কীসের গন্ধ, স্যার?'

'মাংসর। খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে। দশ দিন না-খেয়ে আছি।'

'রান্না মাংস?'

ঘেউ করে ধমকে উঠলেন প্রফেসর, 'স্টুপিড। কুকুর কী চিবোয়? নিয়ে এসো হাড় আর মাংস! আঃ কী খোশবাই।' বলে, গরগর গরগর করে মনের আমোদ জ্ঞাপন করে গেলেন প্রফেসর। অন্যান্য কুকুরেরাও কোরাস গাইতে লাগল গরগর, গরগর গলায়। সেই ফাঁকে তিন চ্যাংড়া সুট করে কেটে পড়ল ঘর থেকে। কুকুরগুলোও টপাটপ লাফিয়ে উঠে গেল খাটের ওপর। চেটে দিতে লাগল প্রফেসরের লোমশ গা। আদর করছে।

আরামে দু'চোখ বুজে এল প্রফেসরের। গদগদ গলায় কিন্তু মানুষের ভাষাই বলে ফেললেন, 'তোদের অদ্ভুত ক্ষমতাগুলো একে একে টের পাচ্ছি। এ-বাড়িতে ভূত আছে। তোরা যেমন বুঝতে পারিস— আমিও বুঝতে পারছি। একটাকে তো দেখতেও পাচ্ছি। কন্ধকাটা, ওই কোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, কাটা গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে। তাই না রে?'

ঘেউ ঘেউ করে ঘাড় নেড়ে সায় দিল কুত্তার দল। সবাই চেয়ে আছে একটা কোণের দিকে— অদৃশ্য কন্ধকাটা ইনিয়ে বিনিয়ে নাকি কাঁদছে সেখানে।

এই সময়ে প্রফেসরের প্রকৃতির বেগ এল। দশদিন একটানা বিছানা-বন্দি। এক প্রাণী থেকে আর এক প্রাণী হয়ে গেছেন। কিন্তু 'বাথরুম' পায় সব প্রাণীরই।

ইচ্ছাটা মুখে প্রকাশ করলেন ঘেউ ঘেউ করে। সমবেত কুকুর চ্যালারা ঘেউ ঘেউ রবে জানাল, সেজন্য এই খাটই তো রয়েছে। কিন্তু ব্রেন যাঁর মানুষের, তিনি এই কুকুর-কর্ম করতে পারলেন না। ঘাট থেকে মসৃণ ভঙ্গিমায় গড়িয়ে গিয়ে ঝুপ করে চারপায়ে নেমে পড়লেন মেঝেতে।

দাঁড়ালেন চার পায়ে। ভারী ভাল লাগল। গোটা মেরুদণ্ডটাকে ধরে রেখেছে চারখানা পা— দু'পায়ে ব্যালেন্স রাখার ঝক্কি কি কম।

পা পা করে একটু হাঁটলেন চার পায়ে। আরও ভাল লাগল। শক্তি ফেটে পড়ছে চার চারখানা পায়ে— ইচ্ছে করছে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে দৌড়ে আসেন মাঠেঘাটে কোথাও...

কিন্তু প্রকৃতির বেগ সেই ইচ্ছের চাইতেও জোরালো। এত বছরের অভ্যেস বাথরুমে যাওয়া...

তাই গেলেন। হেলেদুলে রাজকীয় চালে... লোমশ সাদা বিরাট একটা কুকুর যাচ্ছে বাথরুমে... মসৃণ পিচ্ছিল ভঙ্গিমায়—

অহো! এ-দৃশ্য ক'জন দেখেছে!

তাক লেগে গেল ঘরসুদ্ধ কুকুরদের। মুগ্ধ চোখে তারা চেয়ে রইল। তারপর সমস্বরে বললে, 'ঘেউ ঘেউ... গরগর গরগর গরগর,' তার মানে, কুকুর-কুকুর জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ!

প্রফেসর খুব খুশি হলেন। কুকুরদের অশেষ গুণপনার সবগুলোই এখন তাঁর মধ্যে এসে গেছে। জীর্ণ শরীরটার বদলে পেলেন মজবুত বডি, দু'খানা ঠ্যাঙের জায়গায় চারখানা ঠ্যাং... ব্রেনটা রইল নিজেরই... তার মধ্যে কুকুর ব্রেনেরও সবকিছু ঢুকে যাওয়ায় এখন তিনি সুপার-ডগ, অথবা সুপারম্যান...

মশগুল অবস্থায় যখন বেরোচ্ছেন বাথরুম থেকে, তখন তিন চ্যাংড়া চ্যালা তিন-তিনটে থালা বোঝাই কাঁচা মাংস নিয়ে ঢুকল ঘরে। কুকুররা বাধা দিল না। তাদের 'স্যার' যে এখন খাবেন!

প্রফেসর শুঁকে নিলেন থালা তিনটে। মাংস ভালই। একটায় পাঁঠা, দ্বিতীয়টায় মুরগি, তৃতীয়টায় শুয়োর।

এতক্ষণে প্রফেসরের খেয়াল হল, দশদিন জলও খাননি তিনি। গলা শুকিয়ে টা-টা করছে।

বললেন, 'জল আনো। তেষ্টায়—'

দৌড়ে বেরিয়ে গেল তিন চ্যাংড়া। ফিরে এল তিন গেলাস জল নিয়ে।

এবার সত্যি সত্যিই কুকুর গর্জন ছাড়লেন প্রফেসর। চার দেওয়াল যেন চৌচির হয়ে গেল এক ধমকেই, 'গামলা! গামলা! গেলাসে জল খেতে পারে কুকুর?'

সমস্বরে বাড়িঘরে ভূমিকম্প জাগিয়ে সায় দিল কুকুর বাহিনী। এতবড় হেনস্তা। কুকুরকে গেলাসে জল খেতে দেওয়া!

নিমেষে তিনজনেই উধাও। নিমেষে তিনজনেই এল ফিরে। তিনজনের হাতে তিন গামলা জল।

'গুড!' এবার ইংরিজি ছাড়লেন প্রফেসর। বুঝলেন, ব্রেন তাঁর ঠিকই আছে! ইংরিজি যখন ভোলেননি, বিজ্ঞানও ভোলেননি।

চোঁ চোঁ করে মেরে দিলেন এক গামলা জল। আক্রমণ করলেন থালা-ভরতি কাঁচা মাংস। ডাকলেন কুকুর চ্যালাদের, মহাভোজ আরম্ভ হয়ে গেল ল্যাবেরেটরি ঘরে।

আচমকা বন্ধ হয়ে গেল প্রফেসরের খ্যাঁট। বিলক্ষণ চনমনে চোখে ইতিউতি তাকিয়ে ভয়-চকিত গলায় ডাক ছাড়লেন, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ। কুঁই কুঁই কুঁই।'

মানেটা বুঝল শুধু কুকুর বাহিনী। তাদের যে অদ্ভুত কয়েকটা ইন্দ্রিয় আছে— যা মানুষের নেই। তারা দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতেও পেয়েছে— দু'পেয়ে আখাম্বা চেহারার একটা লোক উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে এই ঘরের দিকে। যে আসছে, তাকে ভয় পান তাদের 'স্যার'— তাই অমন ভয়ে ভয়ে ঘেউ-ঘেউ আর কুঁই-কুঁই একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন।

রুখে দাঁড়াল তারা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে...

মাটি কাঁপিয়ে ঘরে ঢুকলাম আমি— দীননাথ নাথ।

প্রফেসর কাতরালেন, 'কুঁই-ঘেউ... দীননাথ, কেন এলে? কোত্থেকে জানলে?'

রাগের চোটে আমি তখন ফুলে দু'গুণ হয়ে গেছি। গলায় বাজ ডাকিয়ে বললাম, 'আপনি জানেন কাদের চ্যালা বানিয়েছেন?'

বলেই, তাকালাম তিন মানুষ-রোবট চ্যালার দিকে। তিন-তিনটে সচল বিশ্বকোষ। টেকনিক্যাল নলেজে ঠাসা পৃথিবীর সেরা তরুণ বিজ্ঞানী। মায়াদয়াহীন মানুষ-পিশাচ।

তিনজনেই জড়োসড়ো হয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কুকুরগুলোর গনগনে জোড়া জোড়া চোখ আর আমার ভয়াল-ভৈরব রুদ্রমূর্তি দেখে ওরা ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করে দিয়েছে। ওদের আসল কারবার তো আমি জেনেই ছুটতে ছুটতে আসছি রেডিয়ো-টিভিতে খবরটা পেয়েই। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র নিজেই নিজের শরীর উৎসর্গ করে কুকুর হয়ে গেছেন নিজেরই বৈজ্ঞানিক কেরদানি দেখিয়ে— ভারতকে একলাফে নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন বিশ্বের দরবারে...

কচু করেছেন! ভারতের সব ক'টা তুখোড় বৈজ্ঞানিককে এবার হয় কুকুর, নয় বলির পাঁঠা বানাবে এই তিন তরুণ তাবড় বৈজ্ঞানিক স্পাই! 'হিন্দুস্তান হমারা' গান আর গাইতে হবে না— গলা দিয়ে শুধু ঘেউ ঘেউ অথবা ব্যা ব্যা আওয়াজই বেরোবে— এক ধাক্কায় ভারতকে পেছিয়ে দেওয়া হবে হাজার বছর পেছনে। পোখরানে বোমা ফাটানোর বদলা নেওয়া হবে এই ভাবে!

সব শুনে প্রফেসর কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'ইস, তোমাকে লুকিয়ে কী ভুলই করেছি,' বলেই, দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললেন তিন বসুন্ধরা বিস্ময়কে, 'স্পাই! স্পাই! তোরা কি চাস, 'এই কুকুরগুলো তোদের কাঁচা খেয়ে ফেলুক।'

ঘাড় নেড়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনজনেই বললে একই সঙ্গে 'আজ্ঞে, না।'

'তা হলে উলটো অপারেশন করে যা— এখুনি। আবার মানুষ বানিয়ে দে।'

এই শুনে কুকুরগুলো ছলছল চোখে প্রফেসরের দিকে চেয়ে রইল।

প্রফেসর বললেন, 'কাঁদিসনি। তোদেরকে একে-একে মানুষ বানিয়ে দেব। খুশি?'

কুকুররা কোরাস গেয়ে উঠল তক্ষুনি, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ।'

সস্নেহে কুকুর-চোখে তা দেখতে দেখতে আবার থাবা চাটতে চাটতে প্রফেসর বললেন, 'ওরা বলছে কুকুর-মানুষ জিন্দাবাদ! কুকুর-মানুষ জিন্দাবাদ! মুর্দাবাদ... মুর্দাবাদ... স্পাইগুলো মুর্দাবাদ।'

তর্জমা শুনে আরও ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল তিন স্পাই-বৈজ্ঞানিক।

আমি কিন্তু ছাড়িনি। ওদেরকে দিয়েই প্রফেসরকে ফের মানুষ বানিয়ে নিয়েছি। নাছোড়বান্দা কুকুরগুলোকেও মানুষ বানাতে হল— যদিও আমার ইচ্ছে ছিল না একদম।

তবে, সাধ মিটিয়ে নিয়েছি, একটা ব্যাপারে! প্রফেসর যেই মানুষ হয়ে গেলেন, তাঁর ঘাড় ধরে তিনটে স্পাইকে তিনখানা কুকুর বানিয়েছি।

এরাই এখন কুকুরের বেশে প্রফেসরের অনুচর। অনেক গোপন খবরও এনে দিচ্ছে।

ভয়ংকর ভুডু

এমন জায়গা এই পৃথিবীতে আছে যেখানে গিয়ে কয়েক পা বিশেষ একদিকে ফেললেই মনে হয় চলে এসেছি অন্য এক দুনিয়ায়।

আফ্রিকায় আজও আছে এমন জায়গা। কাদাডোবা পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল আদিম অতীতে ফিরে গেলাম, যেন জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছোলাম। লোমহর্ষণ সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অক্ষম। কিন্তু এরপর যা দেখেছিলাম, তা কেউ বিশ্বাস করবে না। তবুও আমি বলব। মন হালকা করার জন্যে।

আমার সঙ্গে ছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আর চাণক্য চাকলাদার।

চাণক্য চাকলাদার বিশ্ব চরে বেড়ায়। এক বিঘত লম্বা চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে, বকের মতো লম্বা ঠ্যাং ফেলে ফেলে, পৃথিবীর হেন দেশ নেই যেখানে যায় না, খুঁজে খুঁজে বের করে উদ্ভট কাহিনি আর কিংবদন্তি। হয় সেই সবের ভেতরে ঢুকতে যায় (এইটাই ওর নেশা), আর যখন চম্পট দিতে হয়, তখন এসে পড়ে প্রফেসরের পায়ে।

ভয়ংকর ভুডু'র রহস্যভেদ করতে গিয়ে ওর হয়েছে সেই অবস্থা। প্রাণটা হাতে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ধরেছে প্রফেসরকে, 'চলুন, চলুন, জ্যান্ত মড়া দেখবেন।'

'জ্যান্ত মড়া!' তেড়ে উঠেছিলেন প্রফেসর, 'আমি বিজ্ঞান বুঝি, ভূতপ্রেত বুঝি না।'

জুলজুল করে চেয়ে চাণক্য তখন বলেছিল, 'আমার তো মনে হয়েছিল, এর মধ্যে বিজ্ঞানও আছে।'

'মড়া জাগানোর মধ্যে বিজ্ঞান! বেরোও! বেরোও!'

'ডক্টর ফ্রাঙ্কেন্সটাইন মড়া জাগাননি?'

থতিয়ে গেলেন প্রফেসর। আমি বললাম, 'ওটা তো কল্পবিজ্ঞান।'

'বিজ্ঞানের সম্ভাবনা থেকেই তো কল্পবিজ্ঞান', চাণক্যের সপেটা জবাব।

প্রফেসর চুপ। ওঁর চোখমুখ দেখেই শঙ্কিত হলাম। গোঁয়ারের মতন আবার নিশ্চয়ই ছুটবেন প্রাণ নিয়ে টানাটানির খেলায়। ফলে, আমি, এই ল্যাংবোটের অবস্থাটা হবে শোচনীয়।

হলও তাই। কিছুক্ষণ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর, 'মড়া জাগায় বিজ্ঞান দিয়ে?'

'সেই প্রাচীন কাল থেকে জাগিয়ে আসছে। ভুডু তন্ত্রের গোপন গলিতে আছে বিজ্ঞান— যা সভ্য দেশের মানুষের আজও অজানা।'

'তবে চলো।'

তাই আমরা এসে পড়েছি পশ্চিম আফ্রিকার এই ডানটোক্পা মার্কেটে। ঘুমন্ত গলির মধ্যে ঢুকতে গিয়েই নার্ভাস হয়ে গেছিলাম। অথচ পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য শহরের বাজারের মতোই এই মার্কেটেও মেয়েরা আনারস বেচছে, ডিটারজেন্ট আর জামাকাপড় বিক্রি হচ্ছে, বাসনপত্র আর কোকাকোলাও কিনছে খদ্দেররা। কোথাও রেডিয়োতে বাজছে আফ্রিকার লোকসংগীত, কোথাও ফিরিওয়ালারা হেঁকে হেঁকে বেচে যাচ্ছে হাতঘড়ি আর পকেট ক্যালকুলেটর। ছেলেমেয়েরা হুড়োহুড়ি করছে, জাপানিজ মোটরবাইক ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ করে ছুটছে সাইলেন্সার থেকে নীলচে ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে। পশ্চিমি সভ্যতা আর একবিংশ শতাব্দী মিলেমিশে রয়েছে বেনিন-এর মতো অঞ্চলেও।

এখানে মড়া জাগানোর বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক দেখার আশা বাতুলতা।

তা সত্ত্বেও আমার গা-ছমছম করে উঠেছিল পাশের সরু গলিটার দিকে তাকিয়ে। ওখানে বাতাসে ঝুলছে যেন মরণ আর পচন।

চাণক্য অবশ্য হনহন করে ঢুকে গেছিল ভেতরে। গিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্লাস্টিক তেরপল দিয়ে ঢাকা এককাঁড়ি সওদার সামনে। চোখে কালো কাচের চশমা পরা লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল আমাদের দিকে। যেন, আমাদের আসল মতলবটা কী, তা বোঝবার চেষ্টা করছে।

চাণক্য ফড়ফড় করে বলেছিল, 'কবচ চাই— কবচ। জঙ্গলে ঢুকব, যেন অপদেবতারা আমাদের রক্ষে করে।'

একটানে তেরপল সরিয়ে দিয়েছিল লোকটা। আমার গলায় একটা হেঁচকি অর্ধেক উঠেই বন্ধ হয়ে গেছিল।

দেখলাম শুধু করোটি। মানুষের নয়— বাঁদরের, ছাগলের, কুকুরের, তার পাশেই স্তূপাকার গিরগিটির চামড়া আর মুরগির পালক, একটা পেট-কাটা ধেড়ে ইঁদুর। এক বাক্স কুণ্ডলী পাকানো সাপ। কালো মাছি ভনভন করছে সব কিছুর ওপর।

চাণক্য ভড়কাবার পাত্র নয়। যেন বিষম রেগে গেছে, এইরকম একটা ভাব দেখিয়ে বলেছিল, 'ননসেন্স! আমরা কি ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান? এসব কিনতে আসিনি। আমরা চাই কবচ... চার্মস... চার্মস...!'

'হু আর ইউ?' হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করেছিল লোকটা, যাকে দেখতে বাচ্চা গরিলার মতো। ধবধবে সাদা শার্ট আর কুচকুচে কালো ট্রাউজার্স পরবার ফলে আরও উৎকট দেখাচ্ছে।

চাণক্য বললে, 'সায়ান্টিস্ট! ফ্রম বেঙ্গল।'

'বেঙ্গল!' উৎসুক হয়েছিল বাচ্চা গরিলা, 'ল্যান্ড অফ টেগোর?'

'ইয়েস... ইয়েস...'

'জঙ্গলে ঢুকতে চাও? কেন?'

'জড়িবুটির সন্ধানে... বিলেতের বৈজ্ঞানিকগুলো কিচ্ছু জানে না... আফ্রিকা নাকি অন্ধকারের দেশ... স্টুপিড... এইখানে এমন জিনিস আছে, যা জানলে তামাম দুনিয়ার মুন্ডু ঘুরে যাবে,' চুরুটে টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেছিল চাণক্য। তার পরেই দমাস করে জিজ্ঞেস করল বাচ্চা গরিলাকে, 'হু আর ইউ? এত কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? কবচ দেওয়ার ক্ষমতা আছে তোমার?'

অদ্ভুত বক্র হেসে বাচ্চা গরিলা বলেছিল, 'আই অ্যাম ডক্টর জিরো। ভুডু ডক্টর। রিসার্চ করি বলেই সব খবর জানি। তোমরা চাও শুধু কবচ? আত্মরক্ষার জন্যে। এসো ঘরে,' বলে, পেছনের ছোট্ট কুঁড়েঘরটা দেখিয়েছিল...

একটা বিষয় বলা হয়নি। চালিয়াত চাণক্য সব জেনেশুনেই ডক্টর জিরোর কাছে আমাদের নিয়ে গেছিল। ইচ্ছে করেই বাচ্চা গরিলার ফাঁদে পা দিয়েছিল। নইলে তো ভুডুর গোপন গবেষণাগারে ঢোকা যাবে না। কিছু সত্যি কিছু মিথ্যে বলে যাচ্ছিল ওই কারণেই— যাতে ডক্টর জিরোর সন্দেহ হয়। বিশেষ করে একজন বৈজ্ঞানিক আর একজন বৈজ্ঞানিককে কখনও ভাল চোখে দেখে না।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকেও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই দেখেছিল ডক্টর জিরো— যিনি নিশ্চয় এসেছেন জিরোর সিক্রেট চুরি করতে...

সুতরাং যা ঘটবার, তাই ঘটল। সবটাই অবশ্য চাণক্যর পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে...

কবচ তৈরি হয়েছিল কুঁড়েঘরেই। সেই প্রক্রিয়া বর্ণনার মধ্যে আর যেতে চাই না। তিন ইঞ্চি উঁচু একটা কিম্ভূতকিমকার পাথরের মূর্তিকে মন্ত্রতন্ত্র হেঁকে পুজো করেছিল ডক্টর জিরো। আমাদের বলেছিল, অপদেবতার ভর হয়েছে বিগ্রহে। শক্তি তার প্রচণ্ড। পুঞ্জীভূত কসমিক এনার্জি। লোকে তা বুঝবে না বলেই বলা হয় অপদেবতা।

এই পর্যন্ত বলে, ডক্টর জিরো চেয়েছিল প্রফেসরের দিকে, 'হাই প্রফেসর, কী খুঁজতে তুমি এখানে এসেছ, এবার বলে ফেলো। জড়িবুটি খুঁজতে নিশ্চয়ই আসোনি?'

প্রফেসর মাঝে মাঝে এমন ছেলেমানুষ হয়ে যান। ওঁকে নিয়ে এত বিপদ ঘটে এই কারণেই। আসল কথাটাই বলে ফেললেন দুম করে, 'মড়া জাগাও কী করে? লাইফ ফোর্স বানিয়ে? জড়িবুটির কেমিক্যাল থেকে? ভূতপ্রেত সব বোগাস। নিশ্চয়ই ইলেকট্রিক ফোর্স জাতীয় কিছু বানিয়ে দাও মড়ার শরীরে। কী করে বানাও, সেইটা দেখতেই আমরা এসেছি।'

চাণক্যর চোয়াল ঝুলে পড়ল। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। ডক্টর জিরো কালো চশমার ভেতর দিয়ে সুচ্যগ্র নয়নে প্রফেসরের দিকে চেয়ে রইল।

ডক্টর জিরোর কালো চশমার আড়ালে ক্ষুরধার চোখ দুটো নিমেষে ঘুরে গেল চাণক্যর দিকে, 'ঠিক এই সন্দেহটাই করেছিলাম। এই তালঢ্যাঙা লোকটা কিছুদিন আগে ঘুরঘুর করে গেছিল এখানে। এখন দেখেই বুঝেছিলাম, মতলব খারাপ। জানতে চাও আমাদের সিক্রেট? ইউ ফুল। কিছু সিক্রেট না-জানাই ভাল— এই পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে—'

প্রফেসরকে তখন রোখে কে, 'মড়া জাগিয়ে পৃথিবীর কী মঙ্গলটা হচ্ছে শুনি?'

হা-হা করে হেসে উঠেছিল ডক্টর জিরো। বলেছিল পাথরের বিগ্রহটা দেখিয়ে, 'এইটা ছুঁলেই তা বুঝবে... দেখতে পাবে... তিনজনে... তিনজনে একসঙ্গে ছোঁও... দেখে এসো মড়া জাগানোর উৎস।'

কথার সুরে যেন সম্মোহন ছিল। আমরা তিনজনেই বুঝি হিপনোটাইজড হয়ে গেছিলাম। হেঁট হয়ে তর্জনীর ডগা দিয়ে স্পর্শ করেছিলাম বেঢপ বিগ্রহ।

তৎক্ষণাৎ...

মুহূর্তের জন্যে বিলকুল ব্ল্যাক হয়ে গেছিল সব কিছুই। ব্ল্যাক ম্যাজিক নামকরণ কি এই কারণেই? ভাবতে না ভাবতেই আশ্চর্য রকমের হালকা মনে হয়েছিল নিজেকে। পরক্ষণেই দেখেছিলাম আমরা শূন্যে ভাসছি... আমি, প্রফেসর আর চাণক্য... আমাদের রক্তমাংসের শরীরগুলো মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে বিকট বিগ্রহ ছুঁয়ে রয়েছে.. তড়িৎপ্রবাহের চাইতেও কীমাশ্চর্যম্ কিছু আমাদের সূক্ষ্ম শরীরগুলোকে বাইরে টেনে এনে শূন্যে ভাসিয়ে দিয়েছে!

এটুকু দেখেছিলাম পলকের জন্যে। পরক্ষণেই... নিমেষ মধ্যে... আমরা হাজির হলাম পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে... নিমেষে নিমেষে চলে গেলাম ছায়াপথ ভেদ করে দূর হতে দূরে অসীমের পানে— দেখলাম কৃষ্ণবিবর... সুপারনোভার বিস্ফোরণ... অসংখ্য গ্রহ তারা নীহারিকা... আর তার পরেই দেখলাম একটা নীল রঙের গ্রহ... নীল মেঘ ঘিরে রয়েছে সেই গ্রহকে... সে মেঘ অসাধারণ... সেখানে বাষ্প নেই... আছে গায়ে গায়ে ঘেঁষে থাকা অগুনতি জীবদেহ... ছায়াময় দেহ... অস্পষ্ট কুয়াশার মতো... শুধু বোঝা যাচ্ছে তাদের মাথার তিনদিকে রয়েছে তিনটে চোখ... মাথা ঘুরিয়ে পেছনে কী আছে দেখছে হচ্ছে না। তাদের পা তিনটে... হাত চারটে... মস্তিষ্ক পেটের মধ্যে...

এই পর্যন্ত দেখবার পরেই অন্ধকার দেখেছিলাম চোখে।

পরমুহূর্তেই দেখেছিলাম, হেঁট হয়ে কিম্ভূত বিগ্রহ ছুঁয়ে বসে আছি তিন মূর্তিমান। ডক্টর জিরো খর নয়নে নজর রেখেছে আমাদের ওপর।

সংবিৎ ফিরে আসতেই বললে সে কর্কশ গলায়, 'আফ্রিকার ম্যাজিক পাওয়ার আর কিছুই নয়, কসমিক পাওয়ার। পৃথিবীর কোনও বৈজ্ঞানিক এখনও যে পাওয়ারকে কাজে লাগাতে পারেনি... পেরেছি আমরা... এই ব্ল্যাক আফ্রিকানরা!'

খাবি খেতে খেতে প্রফেসর বলেছিলেন, 'কি... কিন্তু ওই তিন চোখো তিন ঠেঙে চার হস্ত ছায়াময় জীবগুলো কী?'...

'এলিয়েন...'

'ভিন গ্রহের বাসিন্দা?'

'ইয়েস, মাই ডিয়ার প্রফেসর। কসমিক এনার্জি দিয়ে ওদের টেনে আনি। ওরা একই সঙ্গে অদৃশ্য, ছায়াময়, কায়াময় হয়ে থাকতে পারে। ওদের মরণ নেই— ওরা অ-মৃত।'

'তা-তারপর?'

'মড়ার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে মড়া জ্যান্ত করি।'

'এইটেই তোমাদের সিক্রেট?'

'ও ইয়েস। কিন্তু শেখাব না। শেখালেই তোমরা আর কাউকে শান্তিতে মরতে দেবে না। আস্তে আস্তে একদিন এই পৃথিবীটা এলিয়েনদের দখলে চলে যাবে। সুতরাং হে বন্ধু বিদায়।'

আমরা বিদায় নিলাম।

রুদ্ররোষ

এক. ডাইনোসর

শম্ভু দাস রাইটার্স বিল্ডিং-এ চাকরি করেন। আপার ডিভিশন ক্লার্ক। দেশ বেড়ানোর শখ প্রচণ্ড। লোকে বলে, গরিবের ঘোড়ারোগ। শম্ভু দাস শুনে হাসেন।

কেননা কেরানি বলেই যে তিনি গরিব, তা তো নয়। চাকরিটা করেন নেহাত সময় কাটানোর জন্যে। নইলে কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে বাপ-ঠাকুরদা যে বাড়ি-ঘর রেখে গেছেন, তার ভাড়ার টাকাতেই পায়ের উপর পা রেখে স্রেফ হাই তুলে আর তুড়ি মেরে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে পারতেন শম্ভু দাস।

কিন্তু তিনি তা করেননি। কাজের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকেন বলেই বড়লোকি ব্যামো তাঁর শরীরের ধার-কাছ দিয়েও যেতে পারে না। অথচ তাঁর মাসতুতো ভাই নরেন স্রেফ বসে থেকে থেকে এই বয়সেই ডায়াবিটিসে শরীর আধখানা করে ফেলেছেন।

কয়েক বছর ধরে শম্ভু দাস হিমালয় ভ্রমণ আরম্ভ করেছেন। সমুদ্র-টমুদ্র ধার থেকেই দেখে এসেছেন, সাঁতার জানেন না বলে জাহাজে চেপে ভেতরে যাননি।

কিন্তু পা দুটো দিব্যি মজবুত বলে আরম্ভ করেছেন পাহাড় দেখা। ভারতবর্ষের পুরো উত্তরাঞ্চলটা তিনি চষে ফেলেছেন। ছুটি-ছাটা পেলেই হল, অমনি তলপিতলপা বেঁধে ভোঁ দৌড় হিমালয়ের দিকে। লোকে বলে, তাঁর হিমালয়-জ্বর হয়েছে। এ জ্বর যার হয়, হিমালয় তাকে আর জীবনে ছাড়ে না।

শুনেছিলাম, শম্ভু দাস এবার লম্বা পাড়ি জমিয়েছেন। অনেকদিন পাড়াতেও দেখিনি তাঁকে। তাই হঠাৎ একদিন সকালবেলা তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে হইহই করে অভ্যর্থনা জানালাম। চা খাওয়ালাম। হিমালয়ের কোন অঞ্চলে টোটো করে এলেন, জিজ্ঞেস করলাম।

শম্ভু দাস অদ্ভুতভাবে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ভদ্রলোক লম্বা, রোগা, ফরসা। এককথায় যাকে বলে পাকতেড়ে চেহারা, তা-ই। মুখে কিন্তু হাসিটি লেগেই আছে। সেদিন কিন্তু ওঁকে হাসতে দেখলাম না। অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'দীননাথ, এবারে হিমালয়ে গিয়ে একটা মৃতদেহ দেখেছি।'

বলব কী, শুনেই আমা গা শিরশির করে উঠল। মৃতদেহ দেখেছেন বলে নয়, ওঁর বলার

ঢঙটাই যেন কীরকম। বললাম, 'কী হয়েছে শম্ভুদা? অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন?'

শম্ভুদা ঠিক সেইভাবেই চেয়ে থেকে বললেন, 'জানো দীননাথ, পায়ে হেঁটে অনেক পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়েছি, অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এবারকার মতো অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি।'

কৌতূহল একটু একটু করে বেড়েই যাচ্ছিল। কিছু লোক আছে, যতটা না হয়, তার চাইতে বাড়িয়ে বলে তারা। তাতেই তাদের আনন্দ। কিন্তু শম্ভুদা সে জাতের মানুষ নন। বাজে কথা বলেন না। তাও ওঁর কথা শুনে বুঝলাম, সাংঘাতিক কিছু একটা দেখে এসেছেন।

বললাম, 'কার মড়া দেখেছেন?'

'একটা সাহেবের।'

'টুরিস্ট?'

'বোধহয় না।'

'বোধহয় মানে?'

'সেইটাই গোলমেলে ব্যাপার।'

আমি চোখ কুঁচকে চেয়ে রইলাম শম্ভুদার মুখের দিকে। উনি চোখ নামিয়ে কী যেন ভাবছিলেন। এখন চোখ তুলে বললেন, 'দীননাথ, হিমালয় পর্বত কত মাইল লম্বা জানো?'

চট করে ভেবে নিলাম, 'প্রায় দেড় হাজার। পশ্চিমে পামীর থেকে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত।'

'কারেক্ট। চওড়া কত?'

'একশো থেকে দেড়শো মাইল।'

'তা হলেই বুঝে দেখো কী বিরাট এরিয়া নিয়ে চিরতুষারের রাজ্য ছড়িয়ে আছে। এখানে এমন সব জায়গা আছে যেখানে বারোমাস বরফ জমে থাকে, গরমকালেও গলে না। সে-ই হলো গ্রেট হিমালয়— অ্যালপাইন রেঞ্জ। বিশ হাজার ফুট সেখানকার গড়পড়তা উচ্চতা।'

'জানি।'

'কিন্তু এটা কি জানো, হিমালয়ের সব জায়গা এখনও দেখা হয়নি? এখনও হিমালয় একটা অনাবিষ্কৃত রহস্য?'

'জানি বৈকি!'

'দীননাথ,' চোখে চোখ রেখে ফিসফিস করে বললেন শম্ভুদা, 'আমি এমনি একটা রহস্যাবৃত অঞ্চলের কথা তোমাকে শোনাতে এসেছি।'

নড়েচড়ে বসলাম। অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পেলেই আমি আর স্থির থাকতে পারি না। শম্ভুদার বলার ভঙ্গিমাটাও দারুণ।

বললাম, 'কোথায়?'

'তা তো জানি না।'

'তা হলে?'

'জায়গাটা শিবালিক রেঞ্জের ওপরে, গ্রেট হিমালয়ের নীচে, বারো থেকে পনেরো হাজার হাইটের মধ্যে।'

'এরকম জায়গা পামীর থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত দেড়হাজার মাইল বিস্তারে অনেক আছে শম্ভুদা।'

'আছেই তো। কিন্তু এ-জায়গাটা ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্থান সোভিয়েত দেশ আর চিনের সীমান্তরেখার কাছাকাছি।'

'কাশ্মীরের কাছে?'

'বলতে পারো।'

'কিন্তু ঠিক কোথায় শম্ভুদা? তা ছাড়া কী রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন সেখানে?'

শম্ভুবাবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—

যা বললেন তা তাঁর জবানিতেই শোনা যাক।

দীননাথ, দেশভ্রমণ আমার বাতিক। কিন্তু আরামে দেশ দেখা আমার দু'চক্ষের বিষ। আমি দেখতে চাই বিষম দুর্গম, ভয়ংকর বিপজ্জনক এলাকা, যেখানে সাধারণ টুরিস্ট যেতে চায় না প্রাণের ভয়ে।

এমনি একটা জায়গা হল দুনিয়ার ছাদ— দুর্লঙ্ঘ্য ভয়াল পামীর। পৃথিবীর আকাশছোঁয়া পাহাড়ের শ্রেণি যেখানে এক হয়েছে, সেই পামীর মালভূমি। হিন্দুকুশ, সুলেমান, তিয়েনশান, কিউন্‌লুন্‌, আল্‌তিন্‌তাগ, কারাকোরাম, হিমালয় যেখানে একাকার হয়ে গিয়েছে, সেই পামীর মালভূমি।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মালভূমি। চিরন্তন তুষার আর বরফের রাজ্য। চিরতুষারে ঢাকা অসংখ্য পর্বত শ্রেণির আদি-অন্তহীন কুণ্ডলী আর গোলোকধাঁধা। মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য এই দেশ। কিছু কিছু বসতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বটে এদিকে সেদিকে, কিন্তু তা এত বিরল যে, পামীরকে প্রায় বিজন বলা চলে।

পর্বতসংকুল এই অঞ্চলেই আমি গিয়েছিলাম এবার। দেখতে গিয়েছিলাম পর্বতের ঢেউ। সমুদ্রের ঢেউ যারা দেখেছে, তারা কল্পনাও করতে পারবে না মৌন গম্ভীর ভয়ংকর পর্বতমালার ঢেউ কী আশ্চর্য অথচ কত সুন্দর। মেঘলোক পার হয়ে ধাপে ধাপে যেন মহাকাশের দিকে উঠে যেতে চাইছে পাহাড়ের পর পাহাড়, যেন স্বর্গের সিঁড়ি— যে-সিঁড়ি বেয়ে যুধিষ্ঠিররা এগিয়েছিলেন স্বর্গের দিকে।

দীননাথ, স্তব্ধ নিথর এই পর্বতরাজ্য থেকে আমি নিয়ে এসেছি অত্যাশ্চর্য এক খবর। জায়গাটা পামীরের মধ্যে। হাইট কিন্তু বারো থেকে পনেরো হাজারের মধ্যে। ম্যাপ এনেছি, পরে দেখো। এইখানে কোন এক জায়গায় নাকি চিরবসন্ত বিরাজ করে। শুধু তা-ই নয়। খুব সম্ভব প্রাগৈতিহাসিক যুগও বিদায় নেয়নি সে অঞ্চল থেকে।

অবাক হচ্ছ, না? তোমার চোখে মুখে অবিশ্বাসও ফুটছে। কিন্তু আগেই তো তোমাকে বলেছি, হিমালয় চিররহস্যে ঢাকা। সারাজীবন কেন, কয়েক জন্ম ধরে হাঁটলেও হিমালয়ের সব জায়গা একজন মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং অবাক হয়ো না।

মানালি থেকে সিধে চোদ্দো মাইল গেলে রোটাং পাস, ডাইনে গেলে হামতা পাস, তারপর কুন্‌জুম পাস। একজন মাত্র শেরপা নিয়ে আমি এই পথ দিয়ে ঢুকলাম চিরবরফের

রাজ্যে। কারণ ছিল। শুনেছিলাম, ওই দিকে কোথায় যেন একটা ফুলের উপত্যকা আছে। দেশ-বিদেশ থেকে যারা হিমালয়ের নিসর্গদৃশ্য দেখতে আসে, বরফের মাঝে এই ফুল-রাজ্যের সংবাদ তারা এখনও পায়নি। আমি পেয়েছিলাম কীভাবে, সে আর এক কাহিনি। পরে বলব।

ঘাংরিয়া থেকে আড়াই মাইল গেলে যে নন্দনকানন পাওয়া যায়, আমি কিন্তু সেই ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্সের কথা বলছি না। তবে জায়গটার উচ্চতা প্রায় একই। নন্দনকাননের উচ্চতা তেরো হাজার ফুট। রোটাং পাসের তেরো হাজার পঞ্চাশ ফুট। এ পর্যন্ত অনেক টুরিস্টই যায়। আরও ছ'শো ফুট উঠলে একটা সুন্দর হ্রদ দেখা যায়। বিপাশা নদীর উৎপত্তি এই হ্রদ থেকেই।

আমার অভিযান শুরু হল এই হ্রদ থেকে আরও উত্তরে— দুর্গম অঞ্চলে।

পথের বর্ণনা দিয়ে সময় নষ্ট করব না। পথে একটা উপত্যকা পড়ে। সমতল প্রান্তর জুড়ে কেবল স্লেট-পাথরের রাজত্ব। চারদিকে সাদা হিমঢাকা পাহাড়ের চুড়ো। উপত্যকায় গাছপালা নেই। ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না। দূরে পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে উইলো আর ওয়ালনাট গাছের জঙ্গল।

এই জায়গাটা পেরিয়ে আসার পর একটা গিরিবর্ত্ম পড়ল। রুক্ষ উপত্যকার পরেই এখানকার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই মন কেড়ে নেওয়ার মতো।

দূরে আর একটা গিরিবর্ত্ম। একজায়গায় পাহাড়ের গা বেয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে জলের মতো কী যেন পড়ছে। কাছে গেলাম। হাতে নিয়ে শুঁকতেই সন্দেহ হল।

পেট্রল!

এই পেট্রলের সন্ধানে সারা পৃথিবী জুড়ে কী কাণ্ডই না চলছে। অথচ এই দুর্গম অঞ্চলে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে বর্তমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ইন্ধন।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পাহাড়ের গায়ে মনের মতো গুহায় রাত কাটাতে হবে। কিন্তু সেরকম গুহা আর পাচ্ছি না। এমন সময়ে কুকুরের ডাক শুনলাম। সেইসঙ্গে পুরুষকণ্ঠে হাঁক।

বন্দুক হাতে নিলাম। আমি সুদূরের পিয়াসী। মানুষ যেখানে যায় না, আমি চাই সেই অজানা অঞ্চলে পাড়ি জমাতে। আমার মতো নিঃসঙ্গ অভিযাত্রীর সর্বস্ব লুঠ করার মতলবে যদি কেউ আসে তো আমার তৈরি থাকাই ভাল। শেরপা একজন আছে বটে, কিন্তু তার হাতে বন্দুক নেই। আছে বরফ কাটা কুঠার, দড়ির মই আর লোহার গজাল।

দেখতে দেখতে হাঁকডাক কাছে এসে গেল। আরমিনের লোমশ চামড়ার গরম কোট গায়ে এক বৃদ্ধ। মাথায় শেয়াল-লোমের টুপি। পাশে দুটো প্রকাণ্ড শিকারি কুকুর।

সূর্য তখন নেই। গোধূলির রাঙা আভায় সাদা বরফ লাল হয়ে রয়েছে। এইসময় উল্কাপাত ঘটল আকাশে, জ্বলন্ত বাঁকা তলোয়ারের মতো উল্কার ঝাঁক ছুটে গেল আকাশপথে।

আমাদের দেখেই আরও জোরে ডেকে উঠল শিকারি কুকুর দুটো। থমকে দাঁড়াল বৃদ্ধ। চেয়ে রইল সন্দিগ্ধ চোখে।

কাছে গেলাম। হাতের ইঙ্গিতে বন্দুক নামাতে বলল বৃদ্ধ। কুকুর দুটোর চেন ধরে টেনে রেখেছে দেখে বন্দুক নামিয়ে নিলাম আমি। তা ছাড়া এত বুড়োকে ভয় করার কোনও কারণও দেখলাম না।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বুড়ো বলল, 'টুরিস্ট?'

'ইয়েস।' জবাব দিলাম আমি।.

'মি ইব্রাহিম। ইউ?'

'শম্ভু দাস।'

'গুড। ভেরি গুড। ওয়েট।'

আমার পাশ দিয়ে বুড়ো কুকুর নিয়ে এগিয়ে গেল পেট্রলের ঝরনার দিকে। কাঁধ থেকে একটা চামড়ার থলি নামিয়ে ধরল পেট্রলের ধারার সামনে। ভরতি হয়ে যেতেই মুখটা বন্ধ করে পিঠে ফেলে ডাকল আমাকে, 'কাম।'

'কোথায়?'

'আমাদের গ্রামে।'

বর্তে গেলাম, এই ঠান্ডায় পাহাড়ি গ্রামে আশ্রয় পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

'চলো।'

ইব্রাহিমের পেছন পেছন শেরপা নাওয়াং গোম্বুকে নিয়ে এগোলাম। কিছু দূর যেতেই দেখি, দূরে গিরিবর্ত্মের ওপর পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে একটা বড় বৌদ্ধ চোতেন। হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে প্রার্থনা-পতাকা। আরও দূরে একটা অপূর্ব সুন্দর হিমবাহ।

ইব্রাহিম কিন্তু বৌদ্ধ চোতেনের দিকে গেল না। পাশ দিয়ে পৌঁছোলাম একটা পাইন গাছের জঙ্গলে। একটু বাদেই পাহাড়ের গায়ে খানকয়েক কুঁড়ে চোখে পড়ল।

চারদিকে ফুলের মেলা। ফুরা, ড্যালমা আর জন্‌ডা ফুল। তোমরা কখনও দেখোনি। নন্দন কাননের ব্রহ্মকমলও দেখলাম ফুটে রয়েছে বিস্তর। আর রয়েছে রডোডেনড্রেন।

এই কি তা হলে সেই ফুলের দেশ। যা শুনেছি, তা তা হলে সত্যি?

সন্ধে নেমেছে। সবচেয়ে বড় কুঁড়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছাদের ওপর তুষার সাফ করে চিতাবাঘের ছালের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে ছিল একজন বৃদ্ধ।

আমাদের দেখেই হাঁক দিল কাঁপা গলায়। সাড়া দিল ইব্রাহিম। দেখতে দেখতে পাশের কুঁড়েগুলো থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল অনেক ছেলেমেয়ে।

কুঁড়ের ছাদ থেকে নেমে এল বৃদ্ধ। আলাপ করিয়ে দিল ইব্রাহিম। সম্পর্কে দাদা। নাম সুলেমান। এই গ্রামের সর্দার।

গ্রামের নাম মিন-আরখার। বাইরের দুনিয়া কোন খবর রাখে না এই পাহাড়ি গ্রামের। জানে শুধু কয়েকজন চিনে ব্যাপারী। তারা আসে দু'তিনবছর অন্তর গরমকালে। ময়দা আর তামাকের বিনিময়ে নিয়ে যায় সোনার গুঁড়ো আর পশুর দামি চামড়া।

রাতটা কাটালাম এদেরই কুঁড়েতে সুলেমান আর ইব্রাহিমের সঙ্গে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলে দু'জনেই। এদের কাছেই গল্প শুনলাম, কিছুদূরে হিন্দুদের একটা গ্রাম আছে। ফুলে ফুলে ছাওয়া সেই অঞ্চলকে স্বর্গের বাগান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাদের

আচার-ব্যবহার-সংস্কৃতি প্রাচীন মহাভারতের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'একস্ত্রীর বহুস্বামী' প্রথা একমাত্র ওদের মধ্যেই বর্তমান। মহাভারতের সেই পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদী স্ত্রীর মতো। ইব্রাহিমরা মুসলমান। এদের প্রথা ঠিক উলটো— এক স্বামীর বহু স্ত্রী। হিন্দু গাঁয়ের আইবুড়োরা থাকে গুম্ফা আর মঠে। গাঁয়ে তাদের স্থান নেই।

আরও একটা খবর শুনলাম। গিরিবর্ত্মের মাথায় বৌদ্ধ চোতেনে একজন সাহেব থাকে।

দীননাথ, সাম্প্রদায়িকতার বিষে জ্বলে পুড়ে গেল আমাদের এই দেশ। অথচ দেখো, হিমালয়ের সেই বিজন অঞ্চলে কেমন পাশাপাশি রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলাম, খ্রিস্টান। কারও সঙ্গে কারও বিরোধ নেই। হিমালয়েই এই মিলন সম্ভব, সভ্যতার বিষাক্ত গ্লানি যেখানে পৌঁছোয়নি।

পথের বর্ণনা বলব না বলেও অনেক কথা বলে ফেললাম। কিন্তু এটুকু না-বললে বুঝতে পারতে না, কীভাবে কোথায় গিয়ে দেখা পেয়েছিলাম প্যাট্রিকের। এই প্যাট্রিকের কাছেই পেলাম হিমালয়ের সেই আশ্চর্য অঞ্চলের কিংবদন্তি, যেখানে বারোমাস বসন্ত, যেখানে বরফ কখনও জমে না, যেখানে এখনও বিরাজ করছে প্রাগৈতিহাসির দানবের রাজত্ব।

রাতটা কাটালাম ইব্রাহিম আর সুলেমানের অতিথি হয়ে। সকালবেলা গেলাম গিরিবর্ত্মের ওপরে। বরফ আর ফুলের এমন বিচিত্র সহাবস্থান আগে কখনও দেখিনি। বরফ সব জায়গায় জমেনি, কোথাও গলে গেছে। কোথাও ঝরনা ঝরছে, কোথাও বনফুল উঁকি দিচ্ছে, কোথাও থোকা থোকা স্ট্রবেরির দৌলতে তৃষ্ণা মেটানো হচ্ছে। অরণ্যময় পথে বেশ খানিকটা চড়াইয়ের পর একটা নালা। নালার পাশে সাদা-নীল রঙের বড় বড় ফুল ফুটে রয়েছে— গন্ধহীন ব্রহ্মকমল। তার পরই ভূর্জবৃক্ষের একটা জঙ্গল। এই জঙ্গল পেরিয়ে পৌঁছোলাম একটা ভারী সুন্দর আপেল বাগানে। সব মিলিয়ে যেন দেবরাজ ইন্দ্রের সাজানো একটা বাগান।

বৌদ্ধ চোতেনটা অদূরেই। অত দূর যেতে হল না। পাহাড়ের গায়ে আপেল বনের মধ্যে একটা কার্নিশের মতো পাথরের তলায় অনভ্যস্ত হাতে রুটি পাকাতে দেখলাম একজন ইউরোপীয়ান যুবককে। গুনগুন করে গান গাইছে। বেশির ভাগ রুটিই পোড়া।

আমাকে দেখেই নীল চোখ তুলে চেয়ে রইল যুবক। সোনালি চুল জট পাকিয়েছে কাঁধের ওপর। দাড়ি-গোঁফও না-কামানোর দরুন জটা হয়ে ঝুলছে বুকের ওপর। নীল চোখ দুটো আশ্চর্য উজ্জ্বল। নিবিড় প্রশান্তি ঝিলমিল করছে নীল চোখের সরোবরে। যেন নীল আকাশের ছায়া পড়েই ও-চোখ অমন টলটলে নীল।

আমি কোনও ভণিতা না-করে সোজাসুজি বললাম, 'আপনার নাম শুনেছি প্যাট্রিক। আমার নাম শম্ভু দাস। আলাপ করতে এলাম।'

'বসুন।' একটুও অবাক না-হয়ে বললে প্যাট্রিক। 'এখানে কেউ আসে না, আপনি কেন?'

প্যাট্রিক ইংরেজি বলে ভাল, তবে উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় ইংরেজি তার মাতৃভাষা নয়।

তার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, 'যেখানে কেউ যায় না, সেখানে আমি যাই।'

'কোথায় বাড়ি আপনার?'

'কলকাতায়।'

'কলকাতা!' যেন স্বপ্ন ঘনিয়ে ওঠে প্যাট্রিকের নীল চোখে, 'বিবেকানন্দের দেশ, দীপঙ্করের দেশ, শ্রীচৈতন্যের দেশ। বাংলাকে আমি ভালবাসতাম।'

'আপনার দেশ?'

'আমার দেশ প্যারিস। কলেজে পড়বার সময় একজন হিন্দু যোগীর সঙ্গে আলাপ হয়। তার মুখে শুনলাম, শান্তি যদি কোথায় থাকে, তা এই হিমালয়ে। তাই এসেছিলাম। আর ফিরতে পারিনি।'

লাঠি, আইস-এক্স, রুকস্যাক আর স্লিপিং ব্যাগ মাটিতে রেখে বসলাম প্যাট্রিকের পাশে। পলিথিনের থালায় চারটে রাঙা আপেল রেখে এগিয়ে দিল প্যাট্রিক, 'খাও।'

শেরপাকেও দিল একথালা।

তুলে নিলাম একটা। এক কামড় খেয়ে বললাম, 'শুনেছি, এখানে কোথায় নাকি ফুলের দেশ আছে। এ-ই কি সেই দেশ?'

প্যাট্রিক একটু গম্ভীর হয়ে গেল। এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অনেকদিনের বন্ধুর মতো। এখন একটু চোখ কুঁচকে চাইল আমার দিকে। বলল, 'কেন?'

'কেন মানে? বরফের মাঝে ফুলের দেশ দেখতে কার-না ইচ্ছে হয়?'

'তা ঠিক। এইটাই সে দেশ ধরতে পারো।'

তার কথার সুরটা আগের মতো খোলামেলা নয়। একটু চাপা, একটু গোপন, একটু বাঁকা। আকাশ-নীল চোখ দুটোও আগের মতো হাসি সমুজ্জ্বল নয়, একটু গম্ভীর।

বললাম, 'কী ব্যাপার বলো তো? মন খুলে কথা বলছ না মনে হচ্ছে।'

প্যাট্রিক চোখ নামিয়ে রুটি সেঁকতে লাগল। মিনিট কয়েক কারও মুখে আর কথা নেই। তারপর ও যেন আপনমনে বলল, 'হেনরীও ফুলের দেশ দেখতে এসেছিল। তুমিও এসেছ।'

'হেনরী! সে কে?'

'আমেরিকান জার্নালিস্ট।'

'খবরের কাগজের লোক! এত দূরে?'

'আমারও খটকা লেগেছিল। তারপর যখন শুনলাম' চুপ করে গেল প্যাট্রিক।

'কী শুনলে?'

'থাক সে কথা। তুমি ফুলের দেশ দেখতে এসেছ তো, এ-ই সেই দেশ। চারদিকে ফুলের মেলা। পেট্রলের ঝরনা আর সোনার গুঁড়োও পাবে। এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না কো তুমি।'

'হুঁ, বুঝেছি।'

'এখানে আমরা হিন্দু, মুসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই আছি। এ-দেশকেই সবাই বোধহয় স্বর্গ বলে। দেখছ তো, পোড়া রুটি খাচ্ছি, তবু এ-দেশ ছেড়ে যেতে চাই না। আর যাবও না।'

'প্যাট্রিক!' বন্দুকের গুলির মতো আমার ডাকটা যেন চমকে দিল প্যাট্রিককে।

'কী?'

'কেন গোপন করছ ভাই?'

'কী গোপন করছি?'

'সেটাই তো জানতে চাই। হেনরী কোথায় গেছে? কী শুনেছিলে তার কাছে?'

'থাকগে সে-কথা।'

'না, তোমাকে বলতে হবে।'

'কী দরকার? হিমালয়ের রহস্য হিমালয়ের মধ্যেই থাক। জানতে চেয়ো না।'

'কিন্তু প্যাট্রিক, আমি যে হিমালয়ের রহস্য জানতে এসেছি বাড়ির সুখ ছেড়ে। ফুলের দেশের সন্ধান পেয়েছি। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এর চাইতেও জমজমাট ফুলের রাজত্ব কোথাও আছে। কিন্তু তুমি তা গোপন করতে চাইছ কেন?'

'চাইছি তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই।' রুটি সেঁকা বন্ধ করে প্যাট্রিক আমার দিকে ঘুরে বসল, 'হেনরীকেও বলেছিলাম। কই, সে তো আর ফিরল না!'

'হেনরী ফেরেনি?'

'না। কত বারণ করেছিলাম! তারপর যখন নিজেই হ্যাভারস্যাক খুলে ছবি দেখালে, তখন বুঝলাম, আর আটকানো যাবে না। একই ফোটোগ্রাফ।'

'ফোটোগ্রাফ? তার মানে, হেনরী যে ফোটোগ্রাফ তোমাকে দেখিয়েছে, তা তুমি এর আগেও দেখেছ?'

প্যাট্রিকের পার্বত্য সরলতা আর টিকল না আমার জেরার কাছে। ধরা পড়ে গেছে সে। অস্থিরভাবে বললে, 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'আমাকে দেখাবে?'

আবার সেইরকম অদ্ভুত দৃষ্টি ঘনিয়ে এল প্যাট্রিকের নীল চোখে। বলল, 'দেখলে কি বিশ্বাস হবে?'

'কীসের বিশ্বাস?'

'ছবিতে যাকে দেখবে?'

'তার মানে? কী বলতে চাও প্যাট্রিক?'

প্যাট্রিক হেঁট হয়ে আমার ছ'ফুট লম্বা নাল-লাগাল লাঠিটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

আমার তখন জেদ চেপে গেছে। প্যাট্রিক সরল মানুষ। গোপন কথা গোপন রাখতে পারেনি। কিন্তু কী এমন কথা, যা হিমালয়ের এই নিভৃত প্রদেশে বসেও আমার মতো একক পর্বত অভিযাত্রীকে বলা যায় না? সোনাদানার দেশ? রত্নখনি? হেনরী সব জেনেই এসেছিল, আর ফিরে আসেনি। পর্বতের ঢেউ হয়তো তাকে গ্রাস করেছে। তাতে খবরটা বলতে বাধা কী?

প্যাট্রিক লাঠিটা নামিয়ে রেখে বলল, 'কী যেন তোমার নামটা বললে?'

'শম্ভু দাস।'

'দেখো শম্ভু দাস, আমি এ-দেশে এসেছিলাম শান্তির খোঁজে। তা পেয়েছি। কিন্তু হেনরী এসেছিল অশান্তি কুড়োতে। নিশ্চয়ই সে তা পেয়েছে। তাই আর ফেরেনি। তুমিও কি সেই পথের পথিক হতে চাও?'

আন্তরিক আবেগে গলা কেঁপে গেল প্যাট্রিকের। ছোকরা মানুষকে ভালবাসে। তাই অচেনা অজানা মানুষের ক্ষতি চায় না।

দু'হাতে ওর হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, 'না, প্যাট্রিক, আমি অশান্তি চাই না। শুধু অজানাকে জানতে চাই।'

উজ্জ্বল হল প্যাট্রিকের দু'চোখ, 'সত্যি?'

'তিন সত্যি।'

'তা হলে শোনো। আমি এ-খবর পেয়েছি বৌদ্ধদের ওই চোতেনে লামাদের কাছে। ওই উত্তরে, কোথায় কেউ জানে না, একটা চিরবসন্তের রাজ্য আছে। খবরটা এত দিন কেউ জানত না। জেনেছে একজন বেলজিয়াম পর্বতারোহীর দৌলতে। লোকটা ধুঁকতে ধুঁকতে এসেছিল, মারা গিয়েছিল এই চোতেনে। মরবার আগে সে বলে যায়, চারদিকে তুষারের রাজ্যের মাঝে একটা উপত্যকা আছে। স্বর্গোদ্যান যদি কোথায় থাকে, তবে তা সেইখানে। উপত্যকায় একটা বিশাল হ্রদ আছে। বছরের কোনও সময়েই জল জমে বরফ হয়ে যায় না সেখানে, হিমালয়ের মাঝে যা কখনও ভাবা যায় না। কিন্তু সেইটাই বড় খবর নয়। যে-খবরটা বলতে বলতে ভয়ে কেঁপে উঠছিল বেলজিয়াম পর্বতারোহী, তা শুনলে বিশ্বাস হবে না কারওই। কিন্তু সে প্রমাণ নিয়ে এসেছিল ক্যামেরার মধ্যে। নিজের হাতে ডেভেলপ করে প্রিন্ট পর্যন্ত করে দেখিয়েছিল লামাদের। কাজেই অবিশ্বাস করার আর উপায় ছিল না। জাল-জোচ্চুরি সম্ভাবনাও ছিল না।'

প্যাট্রিক থামল একটু। আমার কৌতূহল তখন তুঙ্গে। আপেল খেতেও ভুলে গেছি।

প্যাট্রিক বললে, 'জিনিসটা মুখে বলার আগে তোমাকে ছবিটা দেখাব।'

'তোমার কাছে আছে?' আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম বললেই চলে।

'আছে। চোতেনে থাকা মানেই আমার কাছে থাকা। হেনরীকেও দেখিয়েছিলাম। ও অবশ্য তার আগেই প্রায় সেইরকম ছবি আমাকে দেখায়। তখুনি বুঝেছিলাম, হেনরী ওই বিস্ময় প্রত্যক্ষ করবে বলেই সুদূর আমেরিকা থেকে ছুটে এসেছে। তারপর শুনলাম, আমেরিকান মিস্ট্রি ম্যাগাজিন ওকে পাঠিয়েছে। খবরটা তারাও পেয়েছে। যাচাই করতে চেয়েছে হেনরীর মারফত। প্রায় একমাস হল সে গিয়েছে উত্তরের দিকে।'

'মাত্র একমাস?'

'হ্যাঁ, শম্ভু দাস, মাত্র একমাস। জানি না, সে আর ফিরবে কিনা। কিন্তু কথা দাও, এ-ছবি দেখবার পর তুমি অজানার পথে পাড়ি জমাবে না।'

মুশকিলে পড়লাম। উত্তরের অগণন পর্বতের তরঙ্গ আর শিখরমালার দিয়ে চেয়ে রইলাম। তুষার আর বরফের বর্ম পরে মৌন গম্ভীর ভয়ংকর শিখরের পর শিখর।

নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'ঠিক আছে। কথা দিচ্ছি, যাব না।'

দীননাথ, নিয়তি তখন মুচকি হেসেছিল। নিয়তিই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হিমালয়ের দুর্গম অভ্যন্তরে। নিয়তিই আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল নিঃসঙ্গ গিরিখাত আব বরফ-প্রান্তরে।

প্যাট্রিক উঠে পড়েছিল। আমাকে বলল, 'তুমি বোসো। আমি আসছি।'

বসে রইলাম। চোখ রইল দূরে পাহাড়ে। হঠাৎ ঘেউ ঘেউ ডাক। দেখি, একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর, আকারে প্যান্থারের মতো প্রকাণ্ড, ছুটছে একটা পাহাড়ি ভেড়ার পেছনে।

দেখতে দেখতে নাগাল ধরে ফেলল, কামড় বসিয়ে দিল ভেড়াটার পেছনের পায়ে।

'শম্ভু দাস!'

ঘাড় ঘোরালাম। প্যাট্রিক এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। হাতে একটা খাম। বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

খামের মধ্যে খানকয়েক ফোটোগ্রাফ। সব ফোটোগ্রাফেই একটা দৃশ্য ধরা পড়েছে নানা কোণ থেকে। একই বিষয়বস্তুকে খুব দ্রুত তোলা হয়েছে পরপর। দ্রুত শাটার টেপার ফলে ফোকাসিং ঠিক হয়নি, টাইমিংও সঠিক নয়। তবে শার্প ফোটো না-হলেও ঝাপসা অবস্থাতেও চেনা যাচ্ছে।

হ্যাঁ। চেনা যাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করা যাচ্ছে না নিজের চোখকেও। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখেছি বইতে। কোনটার কী নাম, না দেখে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ছবিতে যা দেখলাম, তা নিঃসন্দেহে এ-যুগের নয়।

দূরে দূরে বরফঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরার কাছে পাতা ঝুলছে। পাতার আড়ালে ক্যামেরা রেখে লুকিয়ে ফোটো তোলা হয়েছে নিশ্চয়ই। বিশাল সরোবরে ভাসছে প্রকাণ্ড একটা জীব। প্রায় সাপের মতন মাথা। জলদানবটির মুণ্ডু জল থেকে উঠে আছে বেশ খানিকটা ওপরে।

জল-ক্রীড়া করছে প্রাগৈতিহাসিক দানব। বিভিন্ন কোণ থেকে তার দশ রকমের দশটি ছবি তুলে এনেছে দুঃসাহসিক বেলজিয়াম অভিযাত্রী।

স্তম্ভিতের মতো একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম মাটির ওপর পাশাপাশি রাখা দশখানি ছবির দিকে। চোখকে অবিশ্বাস করার উপায় তো নেই। চারদিকে বরফ আর ওই পাহাড় নিঃসন্দেহে গ্রেট হিমালয়ের দৃশ্য। মাঝখানে টলটলে জল। কোথাও জল জমেনি। জল নিয়ে খেলছে বলে তরল জল ছিটকে উঠছে। কখনও ল্যাজ আছড়াচ্ছে। কখনও পিঠের প্রকাণ্ড কুঁজ ভাসিয়ে সাঁতরাচ্ছে। কখনও মাথা ডুবিয়েছে। কিন্তু কখনওই ক্যামেরার দিকে সটান চেয়ে নেই।

ক্যামেরাম্যানকে দেখতে পায়নি প্রাগৈতিহাসিক দৈত্য। দেখতে পায়নি বলেই সশরীরে ফিরে আসতে পেরেছিল বেলজিয়াম অভিযাত্রী। কিন্তু পথ-কষ্ট শেষ করে দিয়েছে তার জীবনীশক্তি।

মুখ তুলে চাইলাম প্যাট্রিকের দিকে। প্যাট্রিক নির্নিমেষে চেয়ে আছে আমার দিকে। বলল, 'দেখলে?'

'কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য! কী যেন নাম জন্তুটার?'

'ডাইনোসর।'

দুই
পাহাড়ে মৃতদেহ

চোতেনে আতিথ্য গ্রহণ করলাম। খুব খাতির-যত্ন করল বৌদ্ধরা। দীননাথ, বরফের দেশে কেন সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকে, সাধন-ভজন নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, তা ওখানে না গেলে বুঝতে পারবে না। মনটাই পালটে যায়। চোতেনে একদিন-একরাত থেকেই আমার মনের অবস্থাও হল প্যাট্রিকের মতন। কী হবে কলকাতায় ফিরে? হাজার অশান্তি আর ভাল লাগে না। লক্ষ সমস্যা থেকে দূরেই যদি থাকতে হয়, হিমালয়ের বুকে মনোরম এই পরিবেশে থেকে গেলেই তো হয়। মাত্র একদিন-একরাতেই মনের মধ্যে এই পরিবর্তনের রিমঝিম অণুরণন টের পেলাম। আর কদিন থাকলে হয়তো আর ফিরতামই না, থেকেই যেতাম চোতেনে। কিন্তু তার আগেই ঘটল নিয়তির নতুন খেলা।

ভোরের দিকে আপেল বাগানে বেড়াচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম বৌদ্ধদের কথা। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানুষকে বড় করে দেখেছিলেন। তিনি জাতি মানেননি। তাই এই চোতেনে সর্বধর্মের সমাদর। তাই প্যাট্রিকের মতো মানুষও বিবাগী হয়ে বাসা নিয়েছে এই ধর্মমন্দিরে। কে জানে, আমার মতো বাউন্ডুলেও হয়তো শেষ পর্যন্ত নগাধিরাজের এই দেশে সত্যের সাধনায় কাটিয়ে দেবে শেষ জীবনটা। এইসব ভাবছি, এমন সময় কাঁধে হাত পড়ল। প্যাট্রিক পেছনে দাঁড়িয়ে, চোখ-মুখ বিমল হাসিতে উদ্ভাসিত।

বলল, 'কী ভাবছ শম্ভু দাস?'

'বেশ আছ এখানে।'

'তুমিও থাকবে, যদি মন চায়।'

দিগন্তবিস্তৃত পর্বতরাজ্যের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলাম। জবাব দিলাম না।

প্যাট্রিক বললে, 'এক কাজ করো। তোমার মন এখনও স্থির নয়। একটু ঘুরে এসো। হিমালয় তোমার মন স্থির করে দেবে।'

'কোথায় যাব?'

'লাঠি নিয়ে ঘুরে এসো পাহাড়ে পর্বতে। দেখে শেষ করতে পারবে না। আমি পথ চেয়ে বসে থাকব তোমার জন্যে। বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা। বেড়ানোর নেশা, স্থির থাকতে পারছ না, তা-ই না?'

'হ্যাঁ।'

প্যাট্রিক আমার মনের ঠিক তারে ঘা দিয়েছে।

'যাও শম্ভু দাস, বেড়িয়ে এসো।'

দীননাথ, রুকস্যাক ঝুলিয়ে নাল-লাগানো ছ'ফুট লম্বা লাঠি নিয়ে ফের শুরু করেছিলাম অভিযান। দুর্গমের অভিযাত্রী কখনও একজায়গায় বসে থাকতে পারে না, পা চুলকোয়। আমিও বেঁচে গেলাম আবার পথশ্রমকে পেয়ে। শেরপাকে বিদেয় করেছিলাম চোতেনে এসে। এবার তাই একাই বেরুলাম ট্রেকিং করতে।

তোমার ধৈর্য বোধহয় ফুরিয়ে আসছে দীননাথ। পথের বর্ণনা দিতে লোভ হচ্ছে। কিন্তু

তা হলে আসল কাহিনি আর বলা হবে না। তাই সংক্ষেপে সারছি।

ফুলের পাহাড়, ফুলের উপত্যকা, ফুলের দেশ ছাড়িয়ে আবার বরফের রাজত্বে এসে পড়লাম দু'দিন পরে। রাতে গুহায় থাকি, স্লিপিং ব্যাগে শুই। দিনে হাঁটি। কোমর টনটন করে, কিন্তু কী আনন্দ যে পাই, তা কাউকে বলে বোঝানো যায় না।

তৃতীয় রাতটা একটা গুহায় কাটিয়ে ভোরবেলা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে চোতেন আর দেখা যাচ্ছে না। তাই ঠিক করলাম, আর উত্তরে যাওয়া ঠিক হবে না, এবার বরং ফেরা যাক। এমন সময় পায়ের কাছে বরফের ওপর চোখে পড়ল একটা অদ্ভুত ছাপ।

ইয়েতি! রহস্যময় পর্বত-মানব ইয়েতি!

দীননাথ, ইয়েতির নাম কে না শুনেছে বলো! হিমালয়ের ওই লোমশ মানুষের চেহারা কেউ অবশ্য দেখেনি। পায়ের ছাপ বিস্তর পেয়েছে। অনেক কাহিনি শোনা গিয়েছে হিমালয়-ফেরত অভিযাত্রীদের মুখে। আমার পায়ের কাছে বরফের ওপর বিচিত্র বিরাট পদচিহ্নটা দেখে প্রথমেই তাই ইয়েতির কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল ব্রেনের মধ্যে। বরফের ওপর আশ্চর্য এই পায়ের ছাপ কি তারই? পদচিহ্ন মনুষ্য-পদচিহ্ন নয় মোটেই, আমার পায়ের ছাপ তো নয়ই। আমার পায়ে হাইকিং বুট। কিন্তু এই পা নগ্ন এবং আকারে প্রকাণ্ড। না বাঁদরের পা-ও এ নয়। তবে কি কিংবদন্তির ইয়েতি গভীর রাতে এসেছিল গুহার দ্বারে? আমাকে নিদ্রিত দেখে বিদায় নিয়েছে গুহামুখ থেকেই।

প্রবল কৌতূহলে আমার পা দুটো চঞ্চল হতে চাইল সেই মুহূর্তেই। বিচিত্র পদচিহ্ন নরম তুষারের ওপর দিয়ে নেমে গিয়েছে নীচের দিকে।

মনস্থির করে ফেললাম। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ পেছু নিলাম পায়ের ছাপের।

নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাকে। কত ঘণ্টা যে পায়ের ছাপের পেছনে চড়াই-উতরাই বেয়ে এগিয়েছিলাম, সে হিসেব তোমাকে দিতে পারব না। আশ্চর্য পদচিহ্ন চলেছে তো চলেইছে, শেষ যেন আর নেই। যেন আমাকে ভুলিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে দুর্গমতর গিরিকন্দরে। বেশ বুঝছি, নেশায় ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছি, সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি, পথের হদিসও আর রাখছি না। তবুও ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে হাঁটছি তো হাঁটছিই।

একটা জায়গায় তুষার-ছাওয়া ঢাল বেয়ে পায়ের ছাপ নেমে গেছে নীচে হিমবাহের তলার দিকে।

নীচের গভীর গিরিখাতের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। আশপাশে মৌন শিখরগুলো ভ্রূকুটি করে চেয়ে আছে আমার দিকে। খাড়াই থেকে তুষার আর বরফের মহাকায় দানোর মতো স্তূপ ঝুলছে নীচের দিকে। বাতাসে একটু আলোড়ন ঘটলেই সোজা ভেঙে পড়বে, নেমে আসবে নীচে।

কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। আমারও হল সেই অবস্থা। আচমকা দূরে কোথাও গুড়গুড় গুমগুম গর্জন। পরক্ষণেই উঠল তুষার-ঝড়। পাহাড়ের চুড়ো আর নীচে মেঘের মধ্যে প্রচণ্ড মাতামাতি আরম্ভ হয়ে গেল।

নিশ্চয়ই তুষার-ধস নেমেছে দূরের কোনও পাহাড়ে। পাথরের বিরাট বিরাট চাঙড় টিলা-

পাহাড়, গাছপালা— সব ভেঙে চুরমার করে বরফ আর তুষারের প্রলয়ংকর ধস উল্কাবেগে নামছে নীচের দিকে।

আমার পা অবশ হয়ে এল। হিমালয়ের এহেন রুদ্রমূর্তি কখনও দেখিনি। ঝড়ের ঝাপটায় দুলে উঠল সারা দেহ। তার পরেই পা হড়কে গেল আমার, অথবা পায়ের তলার বরফ ভেঙে ছিটকে গেল নীচে।

তুষার-ঢাকা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল আমার দেহ। ক্রমশ বাড়তে লাগল গতিবেগ। তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল পতনবেগ। ধাক্কা খেতে খেতে, পাক খেতে খেতে দুরন্ত বেগে পড়তে লাগলাম নীচের দিকে।

তুষারের বড় বড় স্তূপগুলো ঠিক এই সময়ে ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। কানের কাছে বাড়তে লাগল হিমানীসম্প্রপাতের গুরুগম্ভীর গর্জন। আচ্ছন্ন অবস্থাতেও অনুভব করলাম, তুষারের তলায় জীবন্ত সমাধি হতে চলেছে আমার এই নশ্বর দেহের।

তারপর আর জ্ঞান ছিল না, কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখলাম, জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে গিরিশিখর। আমি পড়ে আছি একটা ঢিবির ওপর। তুষারধসের ফলে তৈরি হয়েছে ঢিবিটা। শরীরে কোথায় কেটে-ছড়ে বা মচকে যায়নি। একদম অক্ষত।

রুকস্যাক কাঁধে বাঁধা ছিল বলেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারলাম সেই ঢিবির ওপর বসে। তারপর বেরুলাম একটা মনের মতো বরফগুহার সন্ধানে। না-পেলে বরফের ইগলু বানিয়ে নিয়ে রাত কাটাব তার তলায় স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে।

কিন্তু কিছুদূর যাবার পর আবার পা পিছলে গেল। আবার পাহাড়ের মহাধস যেন ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। পালকের মতো ছিটকে গেলাম একদিকে। আয়ু ছিল বলেই প্রাণে বেঁচে গেলাম এবারেও। আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে সিধে হয়ে বসবার পর দেখলাম, এসে পড়েছি একটা জঙ্গলের মধ্যে। তুষার-মৌলী হিমগিরিরা ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছে মাথার ওপর, দূরে দূরে। পায়ের কাছে পাইনের জঙ্গলে পড়ে আমি একা।

না, একা নই। চাঁদের আলোয় দেখলাম. অদূরে মুখ থুবড়ে পড়ে একটা কালো লোমশ মানব।

শিউরে উঠলাম দুরন্ত ভয়ে। ইয়েতি!

লোমশ মানবটা কিন্তু নড়ছে না। পড়ে আছে নিস্পন্দ, নিথর। চিরহরিৎ বৃক্ষের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের কুচো আলো এসে পড়েছে ভূলুণ্ঠিত দেহটার ওপর।

ও কি সত্যিই তুষার-মানব? নাকি অন্য কিছু?

ঠায় কিছুক্ষণ বসে থাকার পরেও যখন লোমশ মানব নড়ল না, তখন আমার হৃৎপিণ্ড কিঞ্চিৎ শান্ত হল। মনে বল ফিরে এল। মহাভয়ংকর ওই তুষারঝড়ে প্রাণবিয়োগ ঘটেনি তো?

উঠে পড়লাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। কাছে যেতেই কিন্তু প্রচণ্ড চমকে উঠলাম।

তুষার-মানব নয়। লোমশ জন্তুর কোট আর প্যান্ট পরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে একটা সাদা মানুষ।

লোকটার পিঠের কোট ফরদাফাঁই। একটা বীভৎস ক্ষতচিহ্ন মাংস ফুঁড়ে ভেতরের হাড়গোড় পর্যন্ত যেন ঠেলে বার করে আনছে।

সমস্ত পিঠ জোড়া সেই বিরাট ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হিমলোকে দাঁড়িয়ে পর্যায়ক্রমে অনুভব করলাম ভয়, বিস্ময়, রোমাঞ্চ! রক্তের মধ্যে জাগ্রত হল নামহীন আতঙ্ক। জীবনে অনেক ক্ষতচিহ্ন দেখেছি। কিন্তু দীননাথ, এ ধরনের অপার্থিব চোট কখনও দেখিনি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আবার বলব আঘাতটা অমানুষিক। মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য চিরন্তন তুষার আর বরফরাজ্যে আগুনে ঝলসিয়ে কেউ কাউকে মারতে পারে? আগুন তো সভ্য মানুষের সৃষ্টি। আগুন কখনও বরফের রাজ্যে প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট হতে পারে না। তবে এই হতভাগ্য মানুষটার পিঠের ক্ষতচিহ্ন এভাবে অগ্নিদগ্ধ কেন? কেন তাঁর বিকট ক্ষত চিহ্নের চারপাশের মাংস পুড়ে ঝলসে গিয়েছে?

অথচ তার সারা দেহ পোড়েনি। একটা অতি তীব্র আগুনের হলকা যেন প্রচণ্ড আক্রোশে মরণ-কামড় বসিয়ে দিয়েছে বেচারার পিঠে। ঠিক যেন আধুনিক লেসার রশ্মি— পিঠ ছিঁড়ে দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে। মাংস ফালা ফালা হয়ে ভেতরের হাড়গোড় পর্যন্ত ঝলসে দিয়েছে।

দীননাথ, আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল নিশীথ রাত্রে লক্ষ তারার চুমকি বসানো আকাশের তলায় ওই ক্ষতচিহ্ন দেখে। বিস্ফারিত চোখে কতক্ষণে যে সেইদিকে চেয়ে ছিলাম, তা নিজেই জানি না। নগাধিরাজ যেন নিঃশব্দ অট্টহাসি হেসে অতিনিঃশব্দ রুদ্রবিষাণ বাজিয়ে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছিলেন, পালাও! পালাও! পালাও শম্ভু দাস! এ বড় ভীষণ জায়গা। এ তল্লাট ছেড়ে চম্পট দাও এই মুহূর্তে।

সংবিৎ ফিরে এল পত্রমর্মরের আকস্মিক প্রবল শব্দে। হাওয়ার জোর বাড়ছে। সামনে থেকে জোর হাওয়ায় আকাশ ছোঁয়া বিরাট গাছগুলোর ডাল নুয়ে নুয়ে পড়ছে। বাতাস পর্যন্ত যেন ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে আমার অনধিকার প্রবেশে, অবাঞ্ছিত আগমনে।

দীননাথ, আমি গাঁয়ের ছেলে। বজ্রাঘাতে মৃত্যু অনেক দেখেছি। তাই পোড়া ক্ষতচিহ্নটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা লৌকিক ব্যাখ্যা উঁকি মারল মাথার মধ্যে। বাজপড়ার সব চিহ্নই তো দেখছি। অজ্ঞাত অভিযাত্রী মারা গিয়েছে নিশ্চয়ই বজ্রাঘাতে। চাঁদের আলোয় মায়াময় পরিবেশে কত অসম্ভব কল্পনাই না করছি, অযথা ভয়ে পালিয়ে যাবার কথাও ভাবছি। কিন্তু...

কিন্তু বাজ পড়ার আওয়াজ তো শুনিনি। আকাশে সেরকম মেঘ তো দেখিনি।

লোকটা সদ্যমৃত। তাই তুষারচাপা পড়েনি। মাটির তুষারশয্যায় মুখ থুবড়ে এমনভাবে পড়ে আছে, যেন, পেছন থেকে বাজের তাড়া খেয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত দধীচির হাড় তার হাড়গোড় ভেঙে প্রাণটাকে লুঠ করে ছুড়ে দিয়েছে মহাশূন্যে।

কিন্তু... বাজ কি কাউকে তাড়া করে? পেছন থেকে আঘাত হানে? তা ছাড়া বাজটা পড়ল কখন? তুষারঝড় শুরু হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে একটা গুড়গুড় গুমগুম শব্দ অবশ্য শুনেছিলাম। সে শব্দের ফলেই বাতাস উত্তাল হয়ে হিমানী সম্প্রপাত ঘটিয়েছে, আমার পায়ের তলা থেকে বরফ সরিয়ে তুষার ধসের সঙ্গে পাকসাট খাইয়ে এত দূর এনে ফেলেছে। সেই আওয়াজই কি বজ্রপাতের নির্ঘোষ? কিন্তু মেঘ তো ছিল না আকাশে?

তবে হ্যাঁ, একটা মহাপ্রলয় এদিকেই ঘটেছিল। সে প্রলয়ের রেশ বহুদূরে আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেও পৌঁছেছিল, তুষারঝড় আর তুষারধস সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু কী সেই মহাপ্রলয়?

উত্তর পেলাম না।

তবে অনন্ত রহস্য-কুটিল সেই মহাপ্রলয়ের বলি বোধহয় আমার সামনেই শায়িত। পিঠের বীভৎস ক্ষতচিহ্ন আকাশের দিকে ফিরিয়ে সেও যেন নীরবে বলতে চাইছে— পালাও! পালাও! প্রাণ হাতে নিয়ে এই মুহূর্তে এই মুলুক ছেড়ে পালাও।

কিন্তু একা দুর্গম হিমালয়ে যে-লোক পাড়ি জমাতে পারে, একটা মৃতদেহ দেখে সে ফিরে যায় না। হাঁটু গেড়ে বসলাম মৃতদেহের পাশে।

চিত করে শোয়ালাম মৃতদেহটাকে। দেখলাম, শ্বেতমানবের চোখে মুখেও প্রকট হয়েছে বীভৎস বিভীষিকা। একটা অকল্পনীয় আতঙ্ক যেন তার চোখের কটা মণি দুটোকে ঠেলে বার করে আনতে চাইছে কোটরের বাইরে। সারা মুখে যেন কালি লেপা। পেটে একটা ছোটসাইজের হ্যাভারস্যাক বাঁধা।

হ্যাভারস্যাক খুলতেই ভয়ংকর চমকে উঠলাম। এ কী! অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস বাদে হ্যাভারস্যাকে রয়েছে ছোট্ট একটি ডায়েরি, যার প্রথম পাতায় লেখা :

ম্যাক হেনরী

অ্যামেরিকান মিস্ট্রি ম্যাগাজিন

ফোর্থ স্ট্রিট, নিউইয়র্ক

এ-ই সেই নিরুদ্দেশ সংবাদদাতা যার কথা শুনেছিলাম প্যাট্রিকের মুখে! হিমালয়ের বিচিত্র এক রহস্য-ভেদ করতে সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে সে একাকী ছুটে এসেছিল স্তব্ধ নিথর এই পর্বতরাজ্যে।

ধরণী যখন তরুণী ছিল, যখন জঠরের অগ্নি সহস্র রন্ধ্র দিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে দিবারাত্র মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করত, খেয়ালি সৃষ্টিকর্তার খেয়াল চরিতার্থ করতে দানবিক অরণ্যের মধ্যে যখন বিচরণ করত দানবিক প্রাণীকুল, ডাইনোসর সেই যুগের জীব। বিভিন্ন চেহারায় তারা জল-স্থল-অন্তরীক্ষে রাজত্ব করে গিয়েছে। কখনও উড়ন্ত সরীসৃপ টেরোড্যাক্টিলের চেহারায়, কখনও উদ্ভিদভোজী ডিপ্লোডকাসের ভূমিকায়, কখনও মাংসাশী টিরানোসরাসের আকারে।

কিন্তু সে যুগ তো এখন অতীত, রাক্ষুসে সেই প্রাণীরাও এখন লুপ্ত। অথচ হারিয়ে-যাওয়া অতীতের এক জলচর দানব নাকি এখনও হিমালয়ের গহন অঞ্চলে জীবিত। তারই ফোটো দেখিয়েছিল আমাকে প্যাট্রিক।

সাপের মতো মুখ আর গলা দেখে তখন ধরতে পারিনি, কিন্তু নিশীথ রাত্রে দামাল হাওয়ার মধ্যে উথালি-পাথালি পাইনের তলদেশে বসে ডায়েরির পাতায় ম্যাক হেনরীর নাম দেখে চকিতে মনের পরদায় ভেসে উঠল বহুদিন আগে বইতে দেখা একটা ডাইনোসরের ছবি, নাম তার প্লেসিওসরাস। জলে থাকত, চার পায়ের বদলে ছিল চারটে পাখনা। ঠিক মাছের মতোই সাঁতরে আহার-পর্ব সমাধা করত জীবন্ত মাছ ধরে।

কিন্তু প্লেসিওসরাস তো জলের দানব, আর ম্যাক হেনরীর মৃতদেহ নিয়ে আমি বসে আছি পাইন-বনতলে। জল এখানে কোথায়? ম্যাক কি তাকে দেখেছিল? তা-ই যদি হয়, তো ম্যাক ছুটে পালাচ্ছিল কেন? পাখনা নেড়ে প্লেসিওসরাস জলে ধাওয়া করতে পারে, ডাঙায় তো উঠতে পারে না।

অবশ্য এমনও হতে পারে, প্লেসিওসরাসের জাতভাই মাংসভুক টিরানোসরাস বা অ্যানট্রোডেমাস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিজন বনতলে। তাদেরই একজন নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন করেছে ম্যাক হেনরীর পৃষ্ঠদেশ।

কিন্তু ক্ষতস্থান পুড়ল কীভাবে? আগুন-নিশ্বাসে? তবে কী চৈনিক উপকথার ড্রাগনও আছে রহস্য-থমথমে ঝঞ্ঝা-উত্তাল এই অরণ্যপ্রদেশে? ড্রাগনের নাক-মুখ দিয়ে শুনেছি আগুনের ফোয়ারা ছোটে, যা পায় পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

বিমূঢ়ের মতো বসে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর মনে বল সঞ্চয় করে উঠে পড়লাম। নিঃসীম কৌতূহল নতুন শক্তির সঞ্চার করল দেহে মনে। ম্যাক হেনরীর ক্যামেরা আর ডায়েরিটা আমার রুকস্যাকের মধ্যে নিয়ে পা বাড়ালাম যেদিক থেকে সে ছুটে আসছিল সেইদিকে।

একনাগাড়ে হাঁটলাম অনেকক্ষণ। মাথার ওপর ডালগুলো নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল অদ্ভুত সেই ঝড়ে। আকাশে মেঘ নেই। অথচ ঝড় ধেয়ে চলেছে আমি যেদিকে যাচ্ছি সেইদিকে। ঝড়ই যেন আমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলল বনস্থল দিয়ে।

ভোররাত নাগাদ পৌঁছোলাম একটা বিশাল হ্রদের তীরে। হ্রদ তো নয়, যেন সমুদ্র। দূরে দূরে তুষার-ছাওয়া পাহাড় দিয়ে ঘেরা বলেই বুঝলাম, একটা বিরাট সরোবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। জলে ঢেউ উঠছে বড় বড়। চাঁদের আলো লক্ষ রোশনাইয়ের আকারে ঠিকরে যাচ্ছে অশান্ত জলের ওপর থেকে। একটুকরো বরফও ভাসছে না কোথাও।

বিপুল আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল আমার মন। সার্থক আমার পরিশ্রম, সার্থক প্রতিপদে মৃত্যুকে নিয়ে লুকোচুরি খেলা, সার্থক বিপদের সঙ্গে মুহুর্মুহু টক্কর দেওয়া। এ-ই তো সেই চিরবসন্তের রাজ্য, যেখানে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনেও একদিনও বরফ জমে না।

ভোরের আলো ফুটতেই হ্রদ প্রদক্ষিণ শুরু করলাম। সে যে কত বড় হ্রদ, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না দীননাথ। আন্দাজ করে বলতে পারি, কম করেও চল্লিশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে লম্বা আকারে বিস্তৃত সেই সুবিশাল সরোবরের তুল্য সরোবর হিমালয়ের অন্যত্র আজও আমি দেখিনি।

অস্বাভাবিক স্তব্ধতাই আমার টনক নড়াল। ভোর হয়েছে। ঝোড়ো বাতাসটা হঠাৎ যেন থমকে গিয়েছে। গাছপালা, আকাশ, হাওয়া, জল সব্বাই যেন সন্দিগ্ধ আমার আবির্ভাবে। কিন্তু কোথাও কোনও শব্দ নেই।

আশ্চর্য! পৃথিবীতে এমন কোনও জায়গা দেখাতে পারো দীননাথ, যেখানে গাছ আছে কিন্তু পাখি নেই? ভোর হয় অথচ পাখি ডাকে না?

কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম সেই অঞ্চল। চারিদিকে যেন গোরস্থানের জমাট স্তব্ধতা।

গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। জলে মাছ ঘাই মারছে না। ডালে পাখি নাচছে না। অথচ ভোর হয়েছে।

ম্যাক হেনরীর বীভৎস মৃতদেহ মনের পরদায় ভেসে উঠল। অদ্ভুত ঝড়টা আমাকে কীভাবে ঠেলে এনেছে এদিকে, তাও খেয়াল হল। তারপর এই দম-আটকানো চুপচাপ অবস্থা— প্রলয়ংকর ঝড়ের পূর্বমুহূর্ত। যে-কোনও মুহূর্তে লক্ষকোটি বারুদের স্তূপে বুঝি আগুন লাগবে।

অকস্মাৎ নামহীন একটা আতঙ্ক সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরল আমার মনকে। সহসা বিষম ভয়ে আমি যেন দিশাহারা হয়ে গেলাম। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম যে দিক থেকে এসেছি সেই দিকে।

ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে এলাম পাইনের জঙ্গল। পা যখন ক্লান্ত, শরীর যখন অবসন্ন, তখন একজায়গায় বসে ভয়ে ভয়ে পেছনের রহস্য-কুটিল অরণ্যভূমি আর গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য সরোবরের দিকে দৃক্‌পাত করে কোনরকমে নাকেমুখে কিছু খাবার গুঁজে ফের পথচলা শুরু করলাম। সামনে বরফ-পাহাড়, চড়াই আর উতরাই, গিরিখাত আর গিরিবর্ত্ম।

দক্ষিণের উষ্ণ ভারতবর্ষে আর কোনও দিনও হয়তো পৌঁছোতে পারব না, তবু চলেছি। কিছুদুর যেতে তুষার খরগোশ দেখলাম, অনেকটা ইঁদুরের মতো দেখতে। গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে এদিকে। আচম্বিতে হুপ হুপ করে বিরাট লাফ দিয়ে একটা জীব আমার সামনে পড়েই ছিটকে গেল আর একদিকে। বিষম চমকে উঠেই হেসে ফেললাম এত কষ্টের মধ্যেও। মুখপোড়া সাদা হনুমান।

আমার চলার বিরাম নেই। একটা বিপুল শক্তি মন থেকে উৎসারিত হয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে আমার ক্লান্ত দেহকে। আরও বরফ, আরও তুষার, আরও বিপজ্জনক অঞ্চলে এসে পড়লাম। আইস-এক্স কাছে না-থাকায় প্রতিমুহূর্তে মনে হতে লাগল, পা পিছলে পড়ে যাব, প্রাণ নিয়ে আর ফিরতে পারব না! কিন্তু ফিরতে আমাকে হবেই।

চারিদিকে বিপুল তুষারসৌধের দিকে তাকিয়ে কিন্তু বুক দমে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। একজায়গায় দেখলাম, সাদা বরফের মধ্যে কালো কালো কীসব জমে রয়েছে। তার পাশে নীল, সবুজ, লাল, আভা দেখা যাচ্ছে। গাছ নাকি? ফুলের সমারোহ?

কাছে গিয়ে ভুল ভাঙল। কালো বরফ, নীল বরফ, সবুজ বরফ, লাল বরফের কথা বইয়ে পড়েছিলাম। আকাশ থেকে ঝরে পড়ার সময়ে নানারকম ময়লা নিয়ে সাদা তুষার বিচিত্র রঙে রঙিন হয়ে যায়। রং-বেরঙের সেই বরফস্তূপের মধ্যে দিয়ে অবাধ্য দুই চরণকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে অকস্মাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম।

সামনে একটা বরফের মূর্তি! হাঁটু গেড়ে বসে আছে আমার দিকে তাকিয়ে। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল। চিরতুষারের রাজ্যে এমন মূর্তি নতুন কিছু নয়।

মনে মনে বেশ বুঝলাম, এ-যাত্রাই আমার শেষ যাত্রা, এ জন্মে আর লোকালয় ফিরতে পারব না। অকস্মাৎ পিচ্ছিল বরফে পা পিছলে গেল আমার, হড়কে গেলাম ঢাল বেয়ে গিরিখাতের দিকে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

চোখ খুলে দেখি, উদ্‌বিগ্ন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে প্যাট্রিক। আমি শুয়ে আছি চোতেনের প্রস্তর প্রকোষ্ঠে। শরীর অসম্ভব অবশ। উঠে বসতে গিয়েও পড়ে গেলাম।

পনেরো দিন লাগল শরীরে বল ফিরে পেতে। লামাদের জড়িবুটির প্রসাদে মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালাম। প্যাট্রিকের কাছে পরে শুনলাম কীভাবে কোথায় পাওয়া গেছে আমার দেহ।

ইব্রাহিম কুকুর নিয়ে বেরিয়েছিল দুম্বা আর খরগোশ শিকারে। কুকুরটাই হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায় একদিকে। পাহাড়ের মাথায় বরফের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায় একটা রুকস্যাক। তুষার খামচে বরফ সরাতে থাকে উন্মত্ত কুকুরটা। তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় আগেই টের পেয়েছিল, কী আছে বরফের তলায়। ইব্রাহিম তুষার সরিয়ে দেখে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছি আমি। ঠান্ডায় জমে মারা যাইনি স্রেফ তুষার কম্বল চাপা ছিলাম বলে। এধরনের ঘটনা উচ্চ হিমালয়ে প্রায়ই দেখা যায়। তুষার কম্বলের কাজ করে। ভেতরে ছোট ছোট বাতাসের পকেট থাকায় তলার বস্তু উষ্ণ থাকে। আমারও তা-ই হয়েছে। এর মধ্যে রহস্য নেই। রহস্য রয়েছে দুটো ব্যাপারের মধ্যে।

এক, তুষার-কম্বলে সযত্নে আমাকে চাপা দিয়ে রুকস্যাকটা পিঠ থেকে খুলে ওপরে রেখেছিল কে এবং কেন? ইব্রাহিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই কি? দুই, আমাকে জীবিত রাখতে তার এত আগ্রহ কেন?

গিরিখাতে আমি গড়িয়ে পড়েছিলাম, জ্ঞান হারিয়েছিলাম। কে সেখান থেকে আমাকে বহন করে এনে শুইয়ে দিয়ে গেছিল ইব্রাহিমদের আনাগোনার পথে?

জবাবটা ইব্রাহিমই দিয়েছিল, দুর্গম বরফাঞ্চলে যে পদচিহ্ন সে এর আগেই বহুবার দেখেছে এবং সভয়ে আল্লাকে স্মরণ করে দূরে সরে গেছে, রহস্যময় সুবিশাল সেই পদচিহ্ন সে দেখেছিল আমার ভূলুণ্ঠিত দেহের অদূরে।

হ্যাঁ, পায়ের ছাপটা তুষার-মানব ইয়েতির!

তিন
রুদ্র উপত্যকা

শম্ভুদা থামলেন। আমি হাঁ করে চেয়ে আছি। এতক্ষণ হাঁ করেই শুনছিলাম। হাঁ বন্ধ করতে ভুলে গেলাম।

সংবিৎ ফিরে পেলাম, যখন দেখলাম, পকেট থেকে নীল চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা ডায়েরি বার করেছেন শম্ভুদা।

সোচ্ছ্বাসে বললাম, 'শম্ভুদা, এ-ই কি সেই—'

'হ্যাঁ দীননাথ, এ-ই সেই ডায়েরি। ম্যাক হেনরীর শেষ অভিজ্ঞতা লেখা অমূল্য সম্পদ।'

আমি হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিতে গেলাম ডায়েরিটা। হাত সরিয়ে নিলেন শম্ভুদা। গূঢ় হেসে বললেন, 'এটা আমি ওঁর সামনে পড়তে চাই।'

'ওঁর সামনে' মানে কার সামনে সেটা আর ব্যাখ্যা করার দরকার হল না। সাতসকালে শম্ভু দাস কেন বাড়ি বয়ে এই সুদীর্ঘ কাহিনি শোনাতে এসেছেন, এবার তা বুঝলাম।

উঠে পড়ে বললাম, 'সে-ই ভাল। চলুন ওঁর সামনেই পড়া যাক।'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সমস্ত শুনলেন। তারপর বললেন, 'কই, দেখি ডায়েরিটা।'

এগিয়ে দিলেন শম্ভু দাস, প্রথম পাতা উলটে ডায়েরিটা চোখের সামনে থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নামটা পড়বার চেষ্টা করলেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'চশমা ছাড়া পড়া যাবে না। শম্ভু, তুমিই বরং পড়ো।'

শম্ভুদা পড়তে শুরু করলেন।

নিউইয়র্ক। ১২ ডিসেম্বর। ইন্ডিয়া থেকে জ্যাক ফেল্ডন এসেছে অদ্ভুত খবর নিয়ে। ও গিয়েছিল হিমালয়ে ট্রেকিং করতে। সঙ্গে ছিল ট্রেকিং ক্লাবের আরও অনেকে। বিপাশা নদীর উৎস খুঁজতে খুঁজতে রোটাং পাসের ছশো ফুট ওপরে লেক দেখতে দেছিল। ওখানে এক সাধুবাবার কাছে একটা আশ্চর্য উপত্যকার বৃত্তান্ত পায়। হিমালয়ের গভীরে যেখানে বারোমাস বরফ জমে থাকে, সেখানে এই উপত্যকায় কখনও নাকি বরফ জমে না। চারিদিকে বরফের মাঝে জল টলটল করে এক সুবিশাল সরোবরে। কিন্তু সে জায়গায় যাওয়া নিরাপদ নয়। মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত সে তল্লাট এড়িয়ে চলে।

শুনে ওরা ট্রেকিং করে গিয়েছিল সেইদিকে। সাধুবাবা মোটামুটি একটা দিক নির্দেশ করেছিল। বলেছিল, সেই উপত্যকার নাম রুদ্র উপত্যকা।

জ্যাক ফেল্ডন একা ফিরে এসেছে রুদ্র উপত্যকার কিনারা থেকে। দেখে এসেছে বিরাট পাইনের ঘন জঙ্গল। তার ওদিকে নাকি সুবিশাল লেক আছে, জল সেখানে কখনও জমে না। ওর বন্ধুরা গিয়েছিল, দেখেও এসেছে। ক্যামেরায় ছবিও তুলেছে। জ্যাক অসুস্থ এক অভিযাত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে নিজে যায়নি। যায়নি বলেই প্রাণে বেঁচে গেছে এবং প্রাণ নিয়েই পালিয়ে এসেছে।

জ্যাক যে মিথ্যে বলছে না, তা বুঝলাম ওর গায়ে কাঁটা দেওয়া দেখে। ওর মতো ডাকাবুকো মানুষকেও এমন ভয় পেতে কখনও দেখিনি। ও বললে, অসুস্থ অভিযাত্রীকে নিয়ে ও বসে ছিল তাঁবুর মধ্যে। এমন সময়ে অদ্ভুত একটা ঝড়ে অকস্মাৎ মাতাল হয়ে ওঠে পাইনের অরণ্য। আকাশ নির্মেঘ, দিগন্তে সাদা বরফ, কালো মেঘ-মাতঙ্গের চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। তা সত্ত্বেও আচমকা ভয়ংকর ঝড়ে ডালগুলো নুয়ে পড়তে লাগল। হাওয়া বিপুল বেগে ধেয়ে যেতে লাগল অরণ্যের গভীরে, বরফহীন সরোবর দেখতে যেদিকে নেমে গিয়েছে অন্যান্য অভিযাত্রী।

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছে জ্যাক। দূরবিন বার করে ঝড়ের কেন্দ্রস্থল দেখতে গিয়ে লক্ষ করেছে, পাইনের জঙ্গলে বহুদূরে মাঝে মাঝে যেন রামধনুরঙের রোশনাই ঠিকরে ঠিকরে উঠছে। এর বেশি আর কিছু দেখা যায়নি।

কিছুক্ষণ পরেই ঝড় হঠাৎ থেমে গিয়েছে। আগের মতোই আবার বনভূমির চারিদিকে

শ্মশান-নীরবতা নেমে এসেছে। গোড়া থেকেই এই একটি ব্যাপার ওর মনে খটকা জাগিয়েছিল। জঙ্গল থাকলেই প্রাণী থাকে। নিদেনপক্ষে হিমালয়ের কাক বা ঈগল থাকবেই। কিন্তু বিরাট এই জঙ্গল যেন নিষ্প্রাণ। জীবিত কিছুই নেই। শুধু পত্রমর্মরের সর-সর-সর-সর আওয়াজ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

জ্যাক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। সমস্ত রাত অপেক্ষা করেও যখন অভিযাত্রীরা কেউ ফিরে আসেনি, তখন নিজেই নেমে গিয়েছিল পাহাড় থেকে জঙ্গলে। জঙ্গলের মাঝামাঝি যাওয়ার পর দেখতে পেয়েছিল অভিযাত্রী বন্ধুদের।

তখন কিন্তু কেউই বেঁচে নেই। প্রত্যেকেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটির ওপর। প্রত্যেকেরই পিঠ বীভৎসভাবে দু'ফাঁক হয়ে গেছে সম্ভবত বজ্রাঘাতে। প্রত্যেকেরই ক্ষতস্থান ঝলসে গিয়েছে তীব্র আগুনের হলকায়। কিন্তু কারওই শরীর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়নি। প্রত্যেক্যেই যেন পালিয়ে আসছিল হ্রদের দিক থেকে। কিন্তু বজ্র প্রত্যেককেই পেড়ে ফেলেছে মাঝপথে, বর্ণনাতীত আঘাতে অদ্ভুতভাবে পিঠের হাড়গোড় পর্যন্ত যেন বার করে এনেছে। বজ্রের এহেন ক্ষমতা জ্যাক কখনও দেখেনি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, এতগুলো বাজ পড়েছে, কিন্তু একটা আওয়াজও জ্যাক শোনেনি।

থমথমে বনভূমিতে বীভৎস এই মৃত্যুর মিছিল দেখে অসাড় হয়ে গিয়েছিল জ্যাকের সর্বাঙ্গ। কোনওমতে দেহগুলোকে মাটি খুঁড়ে গোর দিয়ে সে চম্পট দেয় বনভূমি ছেড়ে। আসবার সময় একজনের হাত থেকে নিয়ে আসে ক্যামেরাটা।

অসুস্থ অভিযাত্রীও মারা যায় ফেরার পথে। অসীম কষ্ট সয়ে একা জ্যাক ফিরে আসে লোকালয়ে।

ক্যামেরার নেগেটিভ ডেভালাপ করে এনলার্জ করা ফোটোগুলো আমাকে দেখিয়েছে জ্যাক। চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। প্লেসিওসরাস তো প্রাগৈতিহাসিক জলচর ডাইনোসর। কিন্তু আশ্চর্য, লেকে এই প্লেসিওসরাসের ছবিই দেখছি।...

১৩ ডিসেম্বর। ম্যাগাজিন এডিটর সমস্ত খরচ বহন করতে রাজি হয়েছেন। আমাকেই যেতে হবে চিরবসন্তের সেই রাজ্যে। জ্যাক যাবে না। আর কাউকে নিতে চাই না— খবরটা ফাঁস হয়ে যাবে। জ্যাকের মুখে কুলুপ দিয়েছি বেশ কিছু টাকা দিয়ে। মানে, ওর খবরের সর্বস্বত্ব ম্যাগাজিন কিনে নিল, আর কেউ পাবে না।

এবার আমি গিয়ে নিয়ে আসব রোমাঞ্চকর বিবরণ। হঠাৎ চমকে দেব সারা বিশ্বকে। গায়ে এখন থেকেই কাঁটা দিচ্ছে।....

৩ মার্চ। এতদিন যা ঘটেছে, তা মামুলি ব্যাপার। লিখিনি। এবার লেখবার সময় হয়েছে। প্যাট্রিক বলে এক ফ্রেঞ্চ ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল বৌদ্ধ চোতেনে। ছোকরা রুদ্র উপত্যকার খবর রাখে। প্লেসিওসরাসের আর এক সেট ছবি দেখলাম ওর কাছে। কালকেই রওনা হব।

১ এপ্রিল। কষ্ট সার্থক হয়েছে। ভেবেছিলাম, বরফের রাজ্যে পাইন-অরণ্য কোনও দিন বুঝি আর খুঁজে পাব না। কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়েছে বলেই আজ এসে দাঁড়িয়েছি জঙ্গলের সামনে। আমার সামনেই অনেক নীচে দেখতে পাচ্ছি গভীর পাইনের জঙ্গল। আরও

ওদিকটা ফাঁকা, তারপর আবার জঙ্গল। আশ্চর্য লেকটা ওই ফাঁকা জায়গাতেই নিশ্চয়ই আছে। এত দূর থেকে দেখা যাচ্ছে না।

কালকে দেখতে যাব প্রেসিওসরাসকে। ফিরে এসে লিখব অভিজ্ঞতার বিবরণ। কিন্তু কেন জানি না, স্বস্তি বোধ করতে পারছি না। একা একা চোরের মতো এসে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না-করে ফোটো তুলব.বলেই কাউকে সঙ্গে আনিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, নিথর নিস্তব্ধ ওই বনভূমিতে একা নামাটা কি সংগত হবে?

জ্যাক এইখানে বসেই হঠাৎ-ঝড়ে-নুয়ে-পড়া পাইনের ফাঁকে ফাঁকে দেখেছিল রামধনুরং রোশনাইয়ের ছটা। তারপর নেমে গিয়ে পেয়েছিল শব্দহীন বজ্রাঘাতে বিগতপ্রাণ বন্ধুদের দেহ।

গা শিরশির করছে। রামধনুরং রোশনাই বস্তুটা কী?

ডায়েরির পরের পাতায় আর কিছু লেখা নেই। ম্যাক হেনরীও দেহ রেখেছে পাইনবনতলে। একই রকম রহস্যময় বজ্র তারও প্রাণ লুঠ করেছে, চূর্ণ করেছে অস্থি-পঞ্জর, দগ্ধ করেছে ক্ষতমাংস।

শম্ভুদা পড়া শেষ করে চেয়ে রইলেন প্রফেসরের দিকে। প্রফেসর ফোকলা দাঁত খুঁটছিলেন আলপিন দিয়ে। নির্বিকার মুখ দেখে বুঝতেই পারিনি অভিযানের দিনক্ষণ সব ঠিক করে ফেলেছেন মনে মনে।

এবার জানালেন। শম্ভুদা তো যাবেনই, আমিও যাব। কী আছে রুদ্র উপত্যকায় স্বচক্ষে দেখব।

তবে প্রফেসর কাছাখোলা লোক নন। এতগুলো মানুষ যেখানে গিয়ে এমন অদ্ভুতভাবে মারা গিয়েছে, সেখানে তিনি আটঘাট বেঁধেই যাবেন।

চার
রুদ্র সরোবর

সুবিশাল এই সরোবরের নাম দেওয়া হয়েছে রুদ্র সরোবর। নামকরণ করেছেন প্রফেসর। তিনিই আমাদের অভিযানের নায়ক। নতুন যা কিছু দেখছেন, একটা করে নাম দিয়ে দিচ্ছেন।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি সরোবরের পাড়ে। আমার ইচ্ছে ছিল, এর নাম হোক রুদ্র সাগর। কিন্তু মাপজোক করে যখন দেখা গেল, লেকটা লম্বায় প্রায় পঁচিশ মাইল আর চওড়ায় এক থেকে দেড় মাইল, তখন প্রফেসর বললেন, 'দুর দুর, এতটুকু সরোবরের নাম সাগর কখনও হয়?'

আমি বললাম, 'প্রায় চল্লিশ বর্গমাইলকে 'এতটুকু' বলছেন!'

উনি তো অবাক। বললেন, 'তবে কতটুকু?'

'ক্যাস্পিয়ান সাগর, আরাল সাগর, ব্ল্যাক সি, এ-সবই তো ইনল্যান্ড সি। দ্বীপসাগর বলতে

পারেন। তবে একেই বা সাগর বলব না কেন? আর আরাল তো আসলে একটা লেক।'

'মূর্খ।' সংক্ষেপে বললেন প্রফেসর, 'সাগর তাকেই বলে যার জল লোনা। যে তিনটে সাগরের নাম বললে, সেগুলো ইনল্যান্ড সি ঠিকই, জল তাদের লোনা। তা ছাড়া তুমি যে একটা আস্ত আকাট তার পয়লা প্রমাণ হচ্ছে, আরাল সি-র ক্ষেত্রফল তুমি জানো না।'

আমতা আমতা করে বললাম, 'অত মনে নেই।'

'তবে জ্ঞান দিতে যাও কেন? আরাল হচ্ছে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম লেক। ক্ষেত্রফল চব্বিশ হাজার বর্গমাইল। কিন্তু জল লোনা, তাই তার নাম সাগর।'

একটু থামলেন প্রফেসর। কাচের মতো টলটলে রুদ্র সরোবরের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু পরে বললেন, 'ব্ল্যাক সি-র নামটা মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করেছ দীননাথ।'

উৎসুক হলাম। উনি নিজে থেকেই বললেন, 'কৃষ্ণ সাগরের জল লোনা ঠিকই, কিন্তু এ সাগরের গভীর জলে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোনও সাগরে দেখা যায় না।'

আমরা ঘিরে দাঁড়ালাম প্রফেসরকে। আমরা মানে, আমি, শম্ভুদা এবং অ্যামি ওয়ালেস—মেয়ে বৈজ্ঞানিক। এর সম্বন্ধে পরে বলছি।

প্রফেসর বললেন, 'কৃষ্ণ সাগরের গভীর জল জলজ জীবশূন্য। কোনওরকম প্রাণের অস্তিত্ব সেখানে নেই।'

আমরা চুপ করে শুনছি। রুদ্র সবেরাবরের আশেপাশেও প্রাণের অস্তিত্ব এসে ইস্তক লক্ষ করিনি। কৃষ্ণ সাগরের গভীর জলের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক আছে কি?

প্রফেসর নিজের মনেই বললেন, 'কৃষ্ণ সাগরের আশি ফ্যাদম নীচেকার জল এত সালফারেটেড হাইড্রোজেনে ঠাসা যে, সেই কারণেই ওখানে কোনও প্রাণী জন্মায় না, টিকতে পারে না। এখন আমার প্রশ্ন, এই তল্লাটে এইরকম কোনও কারণ নেই তো?'

অ্যামি ওয়ালেস বলে উঠল, 'সেটা তো কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করলেই ধরা পড়ে। কিন্তু আমাকে আনলেন কেন?'

অ্যামি ওয়ালেস নিউক্লিয়র ফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করছে, তরুণী বৈজ্ঞানিক। হিমালয়ের গহনে ডাইনোসরের দর্শনে তাকে নেওয়া কেন?

ফোকলা দাঁতে হাসলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'নিউক্লিয়র অ্যানালিসিসের জন্যে।'

'নিউক্লিয়র অ্যানালিসিস?' অ্যামি সোনালি চোখ ছোট করে বলল, 'কেন বলুন তো?'

প্রফেসর মিটিমিটি হেসে বললেন, 'পরে বলব।'

গা জ্বলে গেল আমার। বললাম, 'হেঁয়ালি না-করে এখুনি বলুন না!'

'উঁহু। আগে জলের স্যাম্পল নিই, অনুমানটা ঠিক কিনা দেখি। তারপর বলব।'

ঘড়ি দেখলেন প্রফেসর। বললেন, 'এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। প্লেসিওসরাস, কখন মাথা তুলবে, বোঝা যাচ্ছে না। তারপর ঝড় উঠলে, রোশনাই দেখা দিলে আর বিনামেঘে বাজ পড়লে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। চলো, বেস ক্যাম্পে ফিরি। যেতে যেতে বলব।'

রামধনু রোশনাই আর অদ্ভুত বজ্রের কথা ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম, জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে যাওয়ার জন্যে। এ-ই সেই অঞ্চল, যেখানে এসে প্রাণ নিয়ে

কেউ ফিরতে পারেনি। ফিরেছে যে দু'জন, তারা কেউই জলের ধার পর্যন্ত আসেনি— শম্ভুদা আর জ্যাক দূর থেকেই চম্পট দিয়েছিল।

অকস্মাৎ তাই গা ছমছম করে উঠল। উদগ্র কৌতূহলের কণ্ঠরোধ করে প্রফেসরের নির্দেশ পালন করলাম— দ্রুত পা চালালাম বেস ক্যাম্প অভিমুখে।

•

এবার পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিরসন করা দরকার। কলকাতা থেকে দুম করে রুদ্র সরোবরে কাহিনির জের টেনে আনার জন্যে অবশ্যই অনেকে লেখকের মুন্ডুপাতও করছেন মাঝের ঘটনা না-বলার জন্যে। এখন সংক্ষেপে সেই কর্তব্য শেষ করছি।

কলকাতায় থাকতেই লিখেছিলাম, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আধপাগলা হতে পাবেন, ফোকলা হতে পারেন, আত্মভোলা হতে পারেন, কিন্তু আটঘাট বেঁধে কাজ করেন।

হিমালয়-ভ্রমণ বসন্তকাল ছাড়া অন্য কোনও সময়ে একেবারেই সম্ভব নয়। দুর্দান্ত ব্লিজার্ড তুষার-ঝড়, প্রলয়ংকর হিমবাহের খপ্পরে পড়লে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। কাজেই বসন্তকালের জন্যে অপেক্ষা করতে হল আমাদের।

প্রফেসর কিন্তু ততদিন চুপচাপ বসে রইলেন না। বিশ্ববন্দিত বৈজ্ঞানিক। বিভিন্ন মহলে তাঁর খাতির। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের নানা জায়গা থেকে অনেক রকম খবর সংগ্রহ করলেন, তোড়জোড় করলেন।

তাঁর এই উদ্যোগ পর্বের কথা আমি নিজেও সব জানি না। যেটুকু জানি, বলছি।

শম্ভু দাস একটা খসড়া ম্যাপ এঁকে এনেছিলেন জায়গাটার। বৌদ্ধ চোতেনটা ঠিক কোনখানে, এই ম্যাপে সেইটুকুই উনি স্পষ্ট করে দেখাতে পেরেছিলেন, তারপর সব অস্পষ্ট। এর পরেই তিনি একা বেরিয়ে তুষার-ধসের সঙ্গে পাকসাট খেয়ে নেমে গিয়েছিলেন এবং জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

কিন্তু জায়গাটা যে পামীর মালভূমিতে এবং রোটাং পাস দিয়ে যেতে হয়— এইটুকু শুনেই প্রফেসরের টনক নড়েছিল। চিন, ভারত, সোভিয়েত দেশ, আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের কাছাকাছি শুনেই তিনি সোজাসুজি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর শরণ নিয়েছিলেন।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। এহেন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলেরই গহনে অত্যাশ্চর্য এক উপত্যকার সন্ধান পেয়েছে বিদেশিরা। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কি ঘুমোচ্ছে?

প্রফেসর এমন খোঁচা মারলেন যে, সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সেনাবাহিনীতে। দিল্লির মন্ত্রীমহল থেকেও মদত পেলেন উনি। আবার কী কাণ্ড চলেছে ভারতের সীমান্তের কাছে, কে জানে!

সেনাবাহিনীর সাহায্য পেয়েছিলাম বলেই অন্যান্য অভিযাত্রীর মতো শেরপাদের নিয়ে তাঁবু খাটিয়ে পাহাড় ভেঙে অতিকষ্টে যেতে হয়নি আমাদের। উড়ে গিয়েছিলাম আকাশপথে— হেলিকপ্টারে।

কিন্তু ধুধু তুষাররাজ্যে হেলিকপ্টার ঠিক জায়গাটি চিনল কী করে? সে সমস্যার সমাধানও করলেন প্রফেসর কৃত্রিম উপগ্রহের শরণ নিয়ে।

স্যাটেলাইট থেকে হিমালয়ের ছবি তোলালেন। সেই ছবি থেকে ঠিক খুঁজে নিলেন বরফহীন রুদ্র উপত্যকাটি। চারদিকে তুষার থাকায় চল্লিশ বর্গমাইল তুষারহীন রুদ্র সরোবরকে চিনতে একটুও বেগ পেতে হল না।

শীতের শেষেই পাড়ি জমালেন প্রফেসর। গোপন অভিযান বলেই সঙ্গে বিশেষ কাউকে নিলেন না। মিলিটিরি ছাড়া রইলেন শম্ভু দাস আর অ্যামি ওয়ালেস। আমি তাঁর ল্যাংবোট, আমি তো রইলামই।

আমরা ফিরলাম আমাদের তাঁবুতে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অ্যামি আর শম্ভুদাকে নিয়ে ঢুকলেন ওর তাঁবুতে। পেছনে আমি।

ক্যাম্প খাটে জাঁকিয়ে বসার পর অ্যামি বললেন, 'বলুন।'

প্রফেসর বললেন, 'বলো কী শুনতে চাও।'

অ্যামি বললে, 'জলের স্যাম্পলে কী আশা করছেন?'

প্রফেসর পালটা প্রশ্ন করলেন, 'লেকের জল জমে না কেন অ্যামি?'

আমি বললাম, 'প্লেসিওসরাস জল ঘুলিয়ে দিচ্ছে বলে নয় তো?'

প্রফেসর অনুকম্পা-মেশানো চোখে চাইলেন। তারপর বললেন, 'তার জন্যেই কি জলটা গরম থাকছে বলতে চাও?'

শম্ভুদা বললেন, 'হয়তো কোনও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে কোথাও।'

'হতে পারে, নাও হতে পারে।'

অ্যামি তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, 'তা হলে আপনিই বলুন না কী হতে পারে।'

প্রফেসর চুপ করে রইলেন। তারপর সরাসরি জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আচ্ছা অ্যামি, লম্বা গাছ যেখানে আছে, সেখানে যদি বাজ পড়ে, তা হলে গাছ না-পুড়িয়ে বাজ কি গাছের তলায় মানুষকে ছুঁতে পারে?'

অ্যামি সমান তীক্ষ্ণস্বরে বললে, 'এ-প্রশ্ন আমার মনেও এসেছে।'

'অ্যামি, আমার মনে হয়, বজ্রপাতের রহস্য ভেদ করতে পারলেই রুদ্র সরোবরের জল কেন বারোমাস গরম থাকে, তাও জানা যাবে।'

চোখ কুঁচকে অ্যামি পালটা প্রশ্ন করল, 'বজ্রপাত কেন হয়, আঁচ করেছেন?'

'অ্যামি, আমরা বৈজ্ঞানিক। আন্দাজে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। বললেই সেটা কল্প-বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। ও-জিনিসটা দীননাথকে মানায়।'

'কথা ঘোরাবেন না, প্রফেসর,' অ্যামি ছাড়বার পাত্র নয়, 'আপনি নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করেছেন। নইলে আমাকে আনতেন না।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। নিউক্লিয়র ফিজিক্স তোমার সাবজেক্ট বলেই তো তোমাকে নিয়ে এলাম।'

'কিন্তু কেন?'

'কিছুদিন আগেই একটা পারমাণবিক কেলেঙ্কারি হয়েছে, জানো তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুষারঝড়ে হারিয়ে গেছে একটা অ্যাটমিক অ্যারেঞ্জমেন্ট।'

'কোথায় গেছে কেউ জানে না। গঙ্গার জলে মিশে গেছে বলে অনেকেই আঁতকে উঠছে। সেক্ষেত্রে পারমাণবিক বিকিরণের হাত থেকে কেউই রেহাই পাবে না। আমার প্রশ্ন, এরকম কোনও অ্যারেঞ্জমেন্ট হিমালয়ের বেল্টে অন্য কোথাও কেউ বসায়নি তো? কাশ্মীরের কাছাকাছি? এতগুলো দেশের সীমান্তের কাছে?'

চমকে উঠলাম। এ সম্ভাবনার কথা একদম মাথায় আসেনি আমার। সত্যিই তো, হিমালয়ে নিখোঁজ পারমাণবিক বস্তু নিয়ে লোকসভাতেও ঝড় বয়ে গেছে এই সেদিন।

এখন বুঝলাম কেন প্রথমেই মিলিটারির শরণ নিয়েছেন প্রফেসর আর কেনই বা মন্ত্রীরা মদত দিচ্ছেন তাঁকে। শুধু সীমান্ত-সমস্যা নয়, তার চাইতেও ভয়াবহ সমস্যা জড়িত এই রহস্যে।

কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে দানব জীব রাজত্ব করেছে এই পৃথিবীতে, সেই ডাইনোসর-বংশের এক মহাপ্রভু কেন রুদ্র সরোবরের জলে নৃত্য করে বেড়াচ্ছেন?

এখনও তাকে চাক্ষুস দেখিনি। জানি না দেখবার পর কী পরিস্থিতির উদয় হবে। রহস্যজনক সেই বজ্রের আবির্ভাব কি ঘটবে নতুন করে? আবার ঝিলিক দেবে রামধনু রোশনাই?

পাঁচ
জলের নমুনা

ভোর হতেই আরম্ভ হল জলের নমুনা নেওয়ার আয়োজন।

প্রফেসর সঙ্গে আনা রাবারের ডিঙি জলে নামালেন না, আমি বলতে বললেন, 'পাগল নাকি। যদি ঝড় ওঠে? যদি সেই মাছখেকো প্লেসিওসরাস মুখ বাড়ায়?'

বললেন ঠাট্টার ছলে। কিন্তু বুঝলাম, উনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন না। জল তোলপাড় করে রাক্ষসটা উঠে এলে বা তেড়ে এলে রাবারের ডিঙি ওলটাতে কতক্ষণ? তাই ছোটখাটো একটা কাঠের নৌকো নামানো হল জলে। মিলিটারি কাণ্ডকারখানাই আলাদা। হেলিকপ্টারে করে বিস্তর প্যাকিং বাক্স এনেছিল ওরা। তার কয়েকটা খুলে ফেলল। একঘণ্টার মধ্যে নাট-বল্টু দিয়ে এঁটে চমৎকার একটা নৌকো বানিয়ে ফেললে। ছোট্ট একটা ইঞ্জিনও বসানো হল একপ্রান্তে। ভটভট করে জল কেটে একচক্কর ঘুরে এল মোটরবোট। তারপর প্রফেসর তাঁর ইকুইপমেন্টস নিয়ে উঠে বসলেন, সঙ্গে আমি, অ্যামি ওয়ালেস আর একজন সশস্ত্র সামরিক অফিসার।

সত্যি কথা বলতে কী, জলে ভাসবার পর থেকেই আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড়ুনি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। যে-কোনও মুহূর্তে জলদানব উঠে আসতে পারে, এই ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল।

জল কিন্তু নিথর। অরণ্য স্তব্ধ। শুধু মোটরবোটের ভটভট ভটভট শব্দ জলের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে দূর হতে দূরে।

আধমাইলটাক যাবার পর নাইলন দড়ির গোছা বার করলেন প্রফেসর। প্রথমে নিলেন জলের টেম্পারেচার।

দড়ির ডগায় একটা বিশপাউন্ড ওজনের সিসের ঢেলার সঙ্গে বাঁধা ম্যাক্সিমাম-মিনিমাম সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার নামিয়ে দিলেন জলের তলায়। দড়ির গায়ে একফুট অন্তর সাদা দাগ দেওয়া এবং সাদা রঙে এক, দুই, তিন থেকে হাজার ফুট পর্যন্ত লেখা।

ছশো পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত কোথাও কোনও বাধা না-পেয়ে দড়ি নেমে গেল সরসর করে। প্রফেসর দড়িটা বেশ কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রাখলেন, তারপর টেনে তুলে থার্মোমিটারে টেম্পারেচার দেখলেন— সাত পয়েন্ট পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

আবার নামালেন থার্মোমিটার। এবার দড়ি ছাড়লেন একশো ফুট বেশি। সাড়ে সাতশো ফুট গভীরে কিছুক্ষণ থার্মোমিটার ঝুলিয়ে রাখার পর টেনে তুলে দেখলেন, সেখানকার জলের টেম্পারেচার আরও বেশি— সাত পয়েন্ট আট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

ভ্রূ কুঁচকে গেল প্রফেসরের। থার্মোমিটারটা এবার হাতে করে ধরে জলে ডুবিয়ে রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর রিডিং নিলেন। এবং ভ্রূযুগল আর এক ডিগ্রি উঠে গেলে ওপরে।

আমি বললাম, 'কী হল প্রফেসর?'

প্রফেসর জবাব দিলেন না। দড়ি থেকে থার্মোমিটার খুলে ফেলে সেখানে বাঁধলেন জলের স্যাম্পেল নেওয়ার বোতল। ডুবিয়ে দিলেন সাড়ে সাতশো ফুট গভীরে। জলে ভরে গেল বোতল। টেনে তুললেন ওপরে।

আর একটা বোতল বার করে হেঁট হয়ে লেকের ওপর থেকেই ভরে নিলেন প্রফেসর। ছিপিটা আঁটছেন, এমন সময়ে আমার বাহু খামচে ধরল অ্যামি, 'দীননাথ। এসে গেছে!'

বাকিটুকু আর বলতে হল না। চোখ ফেরাতেই কাঠ হয়ে গেলাম।

জলে ঘূর্ণিপাক জেগেছে। নিথর জলে অকস্মাৎ আলোড়ন দেখা দিয়েছে। মোটরবোট থেকে আধমাইল দক্ষিণে আচম্বিতে জল ঘুরপাক খাচ্ছে, যেন দারুণ তোলপাড় চলছে জলের তলায়।

তার পরেই জল ঠেলে উঠে এল বিরাট একটা বস্তু। ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি। মধ্যিখানে একটা কুঁজ।

আসছে, রুদ্র সরোবরের ভয়ংকর আসছে!

প্রফেসর ঝটপট হাতের বোতল বোটের তলায় পাচার করে দিয়ে ক্যামেরা তুলে নিলেন। টেলিফোটো-লেন্স লাগানো শক্তিশালী ক্যামেরা। আমি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য বললেই চলে। সর্বশরীর অবশ।

সে আসছে, নির্ঘাত সে, প্লেসিওসরাস। প্রথমে যা কাঠের গুঁড়ি মনে হয়েছিল, ধীরে ধীরে তা একটা অবয়ব হয়ে উঠছে। একটা শরীরী বিভীষিকার মহাকায় অবয়ব। কিন্তু ... এ কী দেখছি আমি!

প্লেসিওসরাস তো এতবড় নয়। প্লেসিওসরাস আকারে চল্লিশ ফুট কি আরও বেশি হত ঠিকই, কিন্তু এত বড় হত কি?

পুরাকালের মৎস্যভুক্ সরীসৃপ ততক্ষণে মাথা তুলেছে জলের ওপর। প্রায় দেড়শো গজ লম্বা অজগরের মতো একটা মাথা জল থেকে ছ'ফুট উঁচুতে উঠে পড়েছে। ঘাড়টা কম করেও দু'ফুট পুরু। ঘাড়ের ঠিক পেছনেই একটা কুঁজ।

আমাদের মোটরবোট ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে তীরের দিকে। মিলিটারি অফিসারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাজ দিয়েছে। তিনি মানুষের সঙ্গে লড়তে শিখেছেন, দানবের সঙ্গে নয়। বিশেষ করে জলের ওপর দেশলাইয়ের বাক্সের মতো পলকা এই মোটরবোট নিয়ে মূর্তিমান ওই বিভীষিকার সঙ্গে লড়তে যাওয়া বাতুলতার নামান্তর।

প্রফেসর পরমানন্দে ফোটো তুলে যাচ্ছেন চলন্ত বোট থেকে। ঠিক যেন কাশ্মীরের ডাল লেকে শিকারায় বসে চশমাশাহী উদ্যানের ফোটো তুলছেন, ভাবটা সেরকমই— নির্বিকার, নিশ্চিন্ত, আত্মসমাহিত।

জলদানব প্লেসিওরাসকেও অসীম কৌতূহলী মনে হল আমাদের সম্পর্কে। জীবনে তিনি যেন এমন হাস্যকর ক্ষুদ্র প্রাণী দর্শন করেননি, এইভাবে নট-নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু হয়ে ফ্যালফ্যাল করে ড্যাবডেবে দুই চক্ষু মেলে সকৌতুকে চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে।

অকস্মাৎ সচল হল হিমাচল-নন্দন। শিউরে উঠলাম, সর্বনাশ! নাঃ, কিছু করল না। কেবল মসৃণ ভঙ্গিমায় জল কেটে আধমাইল দূরত্ব বজায় রেখেই একচক্কর ঘুরে গেল মোটরবোটকে।

তার পরেই থমকে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। ভাঁটার মতন দুই চোখ যেন জ্বলে উঠল বারেক। পরক্ষণেই টুপ করে ডুব দিল জলে। আর উঠল না।

ছয়

চোখ

তড়াক করে ডাঙায় নেমে প্রফেসর বললেন, 'চলো ক্যাম্পে। চলো।'

আমার গলা শুকিয়ে এসেছিল ভয়ের চোটে। ঢোক গিলে বললাম, 'আর একটু দেখে গেলে হত না?'

শম্ভুদা দাঁড়িয়ে ছিলেন পাড়ে সামরিক সান্ত্রিদের সঙ্গে। উনিও বললেন, 'যাকে দেখতে এত দূর এলেন, তাকে আরও ভাল করে দেখে যান।'

প্রফেসর ততক্ষণে জঙ্গলের দিকে হনহন করে প্রায় ছুটতে আরম্ভ করেছেন। যেতে যেতেই বললেন, 'কিছু দরকার নেই। দেখা হয়ে গেছে। টেলিফোটো-লেন্সে বাছাধনের জারিজুরি ধরা পড়ে গিয়েছে। চলে এসো, চলে এসো, মজা দেখবে তো চলে এসো।'

মজা! এই বিজন অরণ্যে নিথর সরোবরে দানব-দেবতা দর্শন করে তিনি কী মজার সন্ধান পেলেন, ঈশ্বর জানেন! কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের অপরিসীম ব্যগ্রতা নিমেষ-মধ্যে জাগ্রত করল আমার কৌতূহল। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যখনই মূর্তিমান হেঁয়ালি হয়ে ওঠেন, তখন বুঝতে হবে, রহস্য-সূত্র তিনি মুঠোয় এনে ফেলেছেন। সুতরাং উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটলাম তাঁর পেছন পেছন। পশ্চাদ্ধাবন করল অ্যামি আর শম্ভুদাও।

ক্যাম্পে ফিরে দেখলাম, এর মধ্যেই জায়গাটার চেহারা পালটে গিয়েছে। মামুলি তাঁবু উধাও। সে জায়গায় সারি সারি কয়েকটা বিচিত্র 'ডোম'। একটা বল মাঝখান থেকে চিরে দু'ভাগ করে টুকরো দুটো মাটিতে উপুড় করে রাখলে, যেরকম দেখায়, ঠিক সেই ধরনের অর্ধবর্তুলাকার ধাতব বস্তু খাড়া করেছে মিলিটারি। সাইজে কলকাতার জি পি ও-র গম্বুজের সমান। তেলতেলে মসৃণ, চকচকে।

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম উজ্জ্বল ধাতুর তৈরি বিচিত্র ইগলুজাতীয় কটেজগুলোর দিকে।

ফোকলা দাঁতে হাসলেন প্রফেসর, 'অবাক হচ্ছ?'

'এসব কেন?'

'দরকার আছে, দীননাথ। মেটালটা সাধারণ মেটাল নয়, বন্দুকের গুলি দিয়েও ফুটো করা যাবে না। মিলিটারিদের বলে-কয়ে তৈরি করিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'বাজের খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্যে। নাও, এ-ই হল আমার আস্তানা। চলে এসো।'

একটা গোল গম্বুজের তলায় দিকে 'হ্যাচ' টাইপের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন প্রফেসর। দুর্ভেদ্য দুর্গ বলতে যা বোঝায়, ভেতরটা ঠিক তা-ই। বাতাস যাতায়াতের ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাইরে ছুঁচ গলানোর উপায় নেই। এতদিন ধরে তা হলে প্রফেসর এই সবই বানিয়েছেন সরকারি টাকায়। এ গম্বুজে হাজার বাজ পড়লেও গায়ে আঁচড়টি লাগবে না।

অ্যামি আর শম্ভুদা ঢুকে পড়েছিল আমাদের সঙ্গে। অ্যামির হাতে জলের নমুনার দুটো বোতল।

প্রফেসর কিন্তু বোতল নিয়ে এখন কোনও কথা বললেন না। ঝটপট ক্যামেরার ভেতর থেকে ফিল্ম বার করে তৎক্ষণাৎ ডেভেলাপ করার ব্যবস্থা করলেন। ডেভেলাপ করে, এনলার্জারে ফেলে দশ-বারো সাইজের এনলার্জমেন্ট করে ফেললেন প্রত্যেকটা ছবির।

লালচে অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম, হেঁট হয়ে ফোটো-এনলার্জমেন্টগুলো দেখেও যেন তুষ্ট হলেন না প্রফেসর। আবার এনলার্জমেন্ট করলেন। এবার জলদানবের শুধু চোখদুটো। তারপর বেরিয়ে এলেন গম্বুজের বাইরে।

পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে বাঁ হাতের তালুতে বেশ খানিকটা ঢাললেন এবং ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে বড় গোছের দুটো টিপ সশব্দে চালান করলেন দুই নাসারন্ধ্রে।

বিরাগপূর্ণ চোখে প্রফেসরের নস্য গ্রহণ নিরীক্ষণ করছিল অ্যামি। যেন একটা মহৎ কর্ম সমাধা করলেন, এইরকম একটা ভাব করে সজল চোখে হাতের নস্যি ধুতিতে মুছে নিয়ে প্রফেসর চাইলেন অ্যামির দিকে, 'কিছু বলবে?'

শুষ্ক কণ্ঠে অ্যামি বললে, 'এটা কী হল?'

কাষ্ঠ হেসে প্রফেসর বললেন, 'নস্যি জিনিসটা ক্লান্ত ব্রেনকে চাঙ্গা করতে অদ্বিতীয়। বিলেতে এককালে সম্ভ্রান্ত মহিলারাও নস্যি নিতেন।'

এবার সত্যি সত্যিই রেগে গেল অ্যামি। সোনালি চুল নেড়ে চোখ পাকিয়ে বললে,

'থ্যাঙ্কিউ। আমিও বিলেতের মেয়ে। নস্যি নেওয়া একটা ডার্টি হ্যাবিট। কিন্তু আমি তা জানতে চাইছি না।'

'তবে?'

'মজা দেখাবেন বলে টেনে আনলেন কেন?'

'দেখতে পেলে না!' প্রফেসর যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'কী দেখতে পেলাম না?'

'মজাটা?'

'প্রফেসর!' রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরে বললে বিলেতের মেয়ে অ্যামি ওয়ালেস, 'আমি আপনার ঘনিষ্ঠ হতে পারি, কিন্তু মনে রাখবেন, এই অভিযানে আপনার সহযোগী।'

'আরে গেল যা! সেটা কি আমি অস্বীকার করেছি? কিন্তু চোখ থাকতেও তোমরা যদি অন্ধ হও, তো আমি কী করি বলো?'

'আপনি কী দেখার কথা বলছেন?'

'তোমার সামনেই তো এনলার্জ করলাম। চোখটা দেখেও বুঝলে না?'

'চোখ!'

'হোপলেস!' অ্যামির সুন্দর মুখে যেন একপোঁচ কালি ছড়িয়ে দিয়ে গোল গম্বুজের ভেতরে সবেগে অন্তর্হিত হলেন প্রফেসর। বেরিয়ে এলেন একটু পরেই। হাতে এনলার্জমেন্টের গোছা। তখনও তা থেকে জল ঝরছে মাটিতে।

সবুজ ঘাসজমির ওপর ফোটোগুলো বিছিয়ে ধরলেন প্রফেসর। বললেন, 'কী দেখছ?'

প্রথমটা দেখলাম, বিভিন্ন কোণ থেকে তোলা প্লেসিওসরাসের বিভিন্ন পোজের ছবি। তারপর দেখলাম শুধু চোখ দুটোর বিরাট বিবর্ধিত এনলার্জমেন্ট। ড্যাবডেবে গোল লেন্সের মতো চোখে আলোর ঝিলিক।

লেন্সের মতো চোখ! নীলডাউন হয়ে বসে পড়লাম ঘাসজমির ওপর। চোখ দুটোয় পাতা বলে কিছু নেই। চোখের পাশের চামড়াও যেন কীরকম মসৃণ তেলতেলে। সব চেয়ে অদ্ভুত হল চোখের গড়ন— গোল, ঠিক থালার মতো গোল। চকচকে, ঠিক কাচের মতো চকচকে।

চোখের মধ্যে মণি বা ওইজাতীয় কোনও বস্তুই নেই। অন্তত দেখা যাচ্ছে না। টেলিফোটো লেন্সের দৌলতে বেশ খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছে আশ্চর্য সেই চোখের বিচিত্র গড়ন।

'কী বুঝলে?' প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েই আবার নস্যগ্রহণ করলেন প্রফেসর।

আমতা আমতা করে অ্যামি বললে, 'চোখ দুটো—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চোখ দুটো। স্ট্রেঞ্জ, তাই-ই না?'

নির্নিমেষে চেয়ে আছি বিবর্ধিত দানবিক চক্ষুযুগলের দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হল, আমি যেন একজোড়া যন্ত্রচক্ষুর পানে তাকিয়ে আছি, প্রাণীর চক্ষুর দিকে নয়।

যন্ত্রচক্ষু! লেন্সের মতো আকার। কাচের মতো আলো ঠিকরে দেয়!

পরক্ষণেই ফেটে পড়লাম বিপুল উত্তেজনায়, 'প্রফেসর! প্রফেসর! চোখ দুটো ঠিক অতিকায় দূরবিনের মতো নয়?'

'ব্র্যাভো, মাই ডিয়ার বয়!' ফোকলা মাড়ি বার করে একগাল হেসে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন প্রফেসর, 'তোমার ব্রেন আছে।'

'দূরবীন!' অ্যামির চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, একজোড়া পেরিস্কোপ বলতে পার।'

'পেরিস্কোপ!'

'আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেরিস্কোপ। সাবমেরিনে যা থাকে। জলের তলায় থেকে জলের ওপরকার দৃশ্য দেখবার যন্ত্র। তোমাদের এই ভাসমান যন্ত্রটিও তা-ই।'

ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল অ্যামি ওয়ালেস।

এবার আমি বললাম, 'প্লেসিওসরাসকে যন্ত্র বলছেন?'

'তা ছাড়া আর কী? প্লেসিওসরাস কি এত বড় হয়? আকারে তো দেখছি ডিপ্লোডকাসকেও হার মানায়। তারা হত লম্বায় প্রায় চল্লিশ ফুট। ডিপ্লোডকাস হত লম্বায় নব্বই ফুট। এই প্রহেলিকাটা নব্বই ফুটেরও বেশি বলে মনে হচ্ছে। আরে বাবা, তা নয়। জলের তলায় থেকে কেউ রোবট জন্তু ভাসিয়ে আমাদের দেখে গেল একটু আগে।'

'কী বলছেন, প্রফেসর!'

'টেলিপাপেট হে, টেলিপাপেট।'

'তার মানে?'

'টেলিফোন কী জিনিস? দূরভাষণ, তা-ই না? টেলিভিশন কী জিনিস? দূরদর্শন, তা-ই তো? ঠিক তেমনি টেলিপাপেট মানেটা ধরো... মানেটা ধরো... বাংলাটা আবার আমার তেমন আসে না... পাপেট মানে কী হে দীননাথ?'

'নাচানোর পুতুল?'

'কারেক্ট। সাক্ষীগোপালও বলতে পারো। যাকে আড়াল থেকে সুতো ধরে নাচানো যায়, যাকে সামনে রেখে আড়ালে বসে নিজের খুশিমতো চালানো যায় তাকেই ইংরেজিতে বলে পাপেট। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। যা-ই বলো দীননাথ, তোমাদের বাংলার মতো পুয়োর নয়।'

'প্রফেসর, কাম টু দ্য পয়েন্ট!' কঠোর কণ্ঠে বললে অ্যামি।

'এগজ্যাক্টলি, এগজ্যাক্টলি। তা হলে টেলিপাপেট মানে ধরে নাও দূরপুত্তলিকা। কী বুঝলে?'

আমি বললাম, 'কাদের পুত্তলিকা?'

প্রফেসর নস্যির ডিবে হাতে নিলেন। টকাস টকাস করে ডালায় আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'রাশিয়ানরা চাঁদে যন্ত্রযান চালিয়েছিল এই পৃথিবীতে বসে। ঠিক তেমনি লেকের জলে টেলিপাপেট চালাচ্ছে এমন কোনও ইনটেলিজেন্ট প্রাণী যারা—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললাম আমি, 'এ পৃথিবীর বাইরের জীব?'

'এগজ্যাক্টলি!' নস্যির ডিবে খুললেন প্রফেসর, 'ভিনগ্রহের জীব!'

'পৃথিবীর বাইরে থেকে!' অবিশ্বাসী সুরে বললে অ্যামি, 'আই ডোন্ট বিলিভ।'

প্রফেসর একটিপ নস্যি তুলে নিয়ে বললেন, 'এমনও হতে পারে, পৃথিবীর বাইরেও তারা আর নেই।'

'মানে?'

'লেকের তলায় এসে গেছে।'

অতঃপর ফোঁত ফোঁত শব্দ, ধুতির খুঁট দিয়ে নাক মুছতে মুছতে প্রফেসর সজল চোখে বললেন, 'সেই কারণেই টেম্পারেচার নিচ্ছি আর জলের স্যাম্পেল তুলছি দেখে ওরা রেগেমেগে দূরপুত্তলিকা পাঠিয়ে জেনে নিলে আমরা কারা।'

আমি বললাম, 'প্রফেসর আপনি তা হলে বলছেন, আমরা যখন ওকে দেখছিলাম, আসলে তখন ওর চোখের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকেই দেখা হচ্ছিল?'

'তা ছাড়া আর কী?'

দৃশ্যটা কল্পনা করতেই গা শিরশির করে উঠল আমার। দূর গ্রহের কেউ বা কারা জলের তলায় বসে আমাদের দিকে নজর রেখেছিল ভাবতেই গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল। বললাম, 'প্রফেসর, এর পর কী হবে?'

'এর পর? আগে যা ঘটেছে, ঠিক তাই-ই ঘটবে।'

মনে পড়ল জ্যাক হেল্ডনের অভিজ্ঞতা— প্রাণ নিয়ে কেউ পালাতে পারেনি। টেলিপাপেটের চোখ দিয়ে যাদেরই দেখেছে জলতলে অদৃশ্য অজ্ঞাত বিভীষিকা তাদেরই পিঠ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে রহস্যজনক বজ্রপাতে। বজ্রনাদ শোনা যায়নি। দূর থেকে দেখা গিয়েছে কেবল রামধনু রোশনাই।

এই আশঙ্কা করেই বুলেট-প্রুফ মেটাল দিয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করেছেন প্রফেসর। আসুক বজ্র, ঝলসাক রোশনাই, দেখা যাক কে হারে, কে জেতে!

কিন্তু এ-লড়াই যে মানুষে মানুষে নয়, গ্রহে গ্রহে।

সাত

দু'ডিগ্রি টেম্পারেচার

সারাদিন আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম। কিন্তু শব্দহীন অশনিপাত ঘটল না, মৃত্যু-রোশনাই ঝলসে উঠল না, এমনকী পাগলা ঝড়েরও আবির্ভাব ঘটল না, হাওয়া পর্যন্ত যেন থমকে দাঁড়িয়ে রইল। লম্বা লম্বা পাইনগাছগুলো অনেক উঁচু থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে যেন আমাদের স্পর্ধা লক্ষ করে সরসর সরসর শব্দে বিরামহীনভাবে বলতে লাগল, পালা, পালা, পালা, পালা!

প্রফেসরও তৈরি। তৈরি সামরিক বাহিনী যে-কোনও রকম আক্রমণের জন্যে। আমরা লেকের পাড় ছেড়ে চলে আসার পর সেখানেও গোল গম্বুজ বসানো হয়েছে পর পর তিনটে। সশস্ত্র বাহিনী ওত পেতে বসে রয়েছে সেখানেও। প্রফেসর কিন্তু সামরিক প্রধানকে পইপই করে বলে দিয়েছেন, বেগতিক দেখলেই যেন লোহার কেল্লায় আশ্রয় নেওয়া হয়,

খামোকা লোকক্ষয় করার দরকার নেই। বজ্রপাতটা হয় কীভাবে, সেটা স্টাডি করা দরকার। পালটা অস্ত্র সেই বুঝে বানাতে হবে। কামান-বন্দুকে হয়তো ঠেকানো যাবে না রহস্যজনক বজ্রপাতকে, বেঘোরে মরতে হবে। তাই গোঁয়ারতুমি করার একদম দরকার নেই।

বুলেট-প্রুফ ইস্পাত-কেল্লায় একবার ঢুকলে বাইরের জগতের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকে না। তাই ওয়াকি টকি রাখা হয়েছে প্রত্যেকটা গম্বুজের মধ্যে। বেতারে কথাবার্তা চলবে। এ ছাড়াও মূল ঘাঁটিতে আছে শক্তিশালী রেডিয়ো ট্রান্সমিটার। দিল্লিতে প্রয়োজনীয় খবর পাঠানো হচ্ছে। রুদ্র সরোবরে প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্র ঘাঁটি গেড়ে সীমানা সম্প্রসারণের চেষ্টা চালাচ্ছে কিনা জানবার জন্যে দিল্লিও ব্যগ্র।

সুতরাং সামরিক বাহিনীর বিশ্বাস প্রফেসর খামোকা উদ্ভট কল্পনা নিয়ে মত্ত রয়েছেন। অন্য গ্রহের জীবদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই তো, এই গ্রহে এসে দারুণ ঠান্ডায় হিমালয়ের পর্বত-সরোবরে আত্মগোপন করে থাকবে। ওসব অবাস্তব কল্পনা মিলিটারিকে মানায় না। সেইভাবেই ভেতরে ভেতরে তৈরি রইল তারা।

প্রফেসরের সঙ্গে মনকষাকষিও হয়ে গেল এই নিয়ে। দিল্লি থেকে যখন হুকুম এল টেলিপাপেটকে কামান দেগে উড়িয়ে দিতে হবে, উনি তখন আঁতকে উঠলেন। বললেন, 'অমন কাজটি ভুলেও করতে যাবেন না মেজর সিং।'

মিলিটারি প্রধানের নাম মেজর হুকুম সিং। হুকুম দিতেই তিনি অভ্যস্ত। আকারে শাল গাছ বললেই চলে। শাল কাঠের মতোই হাত-পায়ের গড়ন। গলার স্বরও রসকষ নেই, একেবারে কাঠখোট্টা। উনি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'হোয়াই প্রফেসর?'

'আপনাদের জ্যান্ত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই বলে।'

অট্টহেসে মেজর সিং বললেন, 'নেভার মাইন্ড। আমরা তৈরি। মিজাইল পর্যন্ত রেডি। ফিনিশ করে ছাড়ব লেকের রোবটকে।'

'ওয়েট ম্যান, ওয়েট!' প্রফেসর যেন তুরুক নাচ নাচতে লাগলেন, 'জলের স্যাম্পলটা আগে পাঠাতে দিন।'

'ওয়াটার স্যাম্পল? গুলি-গোলার কথা হচ্ছে, হঠাৎ জলের নমুনা কেন?' মেজর যে খুবই বিরক্ত পাগলা প্রফেসরের পাগলামিতে, তা সুস্পষ্ট তাঁর ভ্রূকুটিপূর্ণ চোখমুখে, 'ওয়াটার স্যাম্পল নিয়ে হোয়াট দ্য হেল আই উইল ডু?'

'অ্যানালিসিস!' অতিসংক্ষিপ্ত জবাব প্রফেসরের।

'কেন?'

এবার বাঁকা সুরে প্রফেসর বললেন, 'লেকের জলের টেম্পারেচার তলায় বেশি থাকে, না, কম থাকে মেজর?'

মেজর সিং যুদ্ধ করবার ট্রেনিং পেয়েছেন মিলিটারিতে, লেকের জলের তাপমাত্রা অধ্যয়ন করেননি। তাই প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে পরক্ষণেই সামলে নিলেন। ভ্রূযুগল ভীষণভাবে কুঁচকে বললেন, 'কম থাকে।'

'কেন থাকে?' প্রফেসরের গলায় যেন ছুরির ধার।

'ওপরের জল তো গরম হবেই। বাট—'

'ওয়েট। এই লেকের জলে বরফ-গলা জল নিশ্চয়ই মিশছে?'

'ও ইয়েস। বাট—'

'ওয়েট। ঠান্ডা জল তলায় যায়, গরম জল ওপরে ভেসে ওঠে। এ-ই তো নিয়ম। অ্যাম আই কারেক্ট?'

'অফকোর্স? লুক হিয়ার প্রফেসর—'

'আগে শুনুন, তার পর দেখব। এই লেকের তলার জল তা হলে গরম কেন?'

'গরম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওপরের জলের চাইতে তলার জল বেশি গরম। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি। কেন?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল হুকুমৎ সিং-এর। আমতা আমতা করে প্রতিধ্বনি করলেন, 'কেন?'

'সেইটাই জানতে চাই ওয়াটার অ্যানালিসিস করে। কেমিক্যাল অ্যানালিসিস নয়, পারমাণবিক বিশ্লেষণ করা দরকার। সেইজন্য এখুনি এই বোতল দুটো দিল্লিতে এই ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

বিমূঢ় হুকুমৎ সিং-এর হাতে একটা ঠিকানা আর বোতল দুটো গছিয়ে দিলেন প্রফেসর।

কিন্তু হুকুম ছেড়ে হুকুমৎকে দিয়ে কাজ হাসিল করানো যায় না। লেবেল-আঁটা বোতল দুটো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন মেজর। ভদ্রলোকের চুলে পাক ধরেছে। দাঁত খিঁচিয়ে কথা বললে দেখা যায় কোনও কারণে সামনের পাটির ওপরের একটা দাঁত অন্য দাঁতগুলোর মায়া কাটিয়েছে। বোতল দুটোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সেইভাবেই দাঁত খিঁচিয়ে কর্কশ গলায় বললেন, 'সরি প্রফেসর।'

'হোয়াট!' প্রফেসর এই বুঝি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন।

'সরি। হেডকোয়ার্টার থেকে পারমিশন না-নিয়ে শুধু দুটো বোতলের জন্যে কপ্টার পাঠাতে পারব না।'

'শুধু দুটো বোতল!' প্রফেসরের দন্তহীন মুখবিবর দিয়ে সাঁ সাঁ করে কথাগুলো বেরিয়ে এল অবিকল শক্তিশেলের মতো, 'জানেন এই বোতলের মধ্যে কী আছে?'

'জল।' অত্যন্ত নির্লিপ্ত স্বরে বললেন মেজর সিং।

প্রফেসর কুলিশ-কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'মেজর আপনি... আপনি কি জানেন না আমার নাম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র?'

'ইয়েস মাই ডিয়ার প্রফেসর, আই নো ইউ।'

'আপনি কি জানেন, বিজ্ঞান বলে একটা বিষয় এই পৃথিবীতে আছে এবং সেই বিষয়টিতে এই অধমের কিঞ্চিৎ সুনাম আছে?'

'তাও জানি প্রফেসর।' উদাসীন কণ্ঠে দাঁতের ফোকর দিয়ে পরপর তিনটে ভুষণ্ডীর গোলা নিক্ষেপ করলেন মেজর সিং।

শক্তিশেলের ঘণ্টাও সমানে বাজতে লাগল প্রফেসরের কণ্ঠে, 'জল কয় প্রকারের হয় মহাশয়ের কি জানা আছে?'

মিলিটারি ম্যানরাও রসিক হয়। 'আর্মি জোক' বলে একটা রসসাহিত্যই সৃষ্টি হয়েছে এই

রসিকপ্রবরদের দৌলতে। সেসব রস অবশ্য সবসময়ে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার মতো নয়। প্রফেসর যত গরম হতে লাগলেন, মেজরও তত ঠান্ডা হয়ে যেতে আরম্ভ করেছিলেন। এখন ক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিককে নিয়ে একটু রগড় করার লোভ সামলাতে পারলেন না। কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও জানি।'

'জানেন? ইউ নো ইট!' প্রফেসর তো অবাক: 'বলুন তা হলে, বলে ফেলুন।'

'দুই প্রকার।' মেজর দাঁত খিঁচিয়ে হাসলেন।

'দুই প্রকার?' প্রফেসরের মুখটা হাঁ হয়ে গেল, 'ও মাই গড। ইউ নো ইট। শুনলে দীননাথ? অ্যামি, তুমি শুনলে, মেজর জানেন, জল দু'রকমের হয়! ও মাই গড!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বই কী।' বিনীত কণ্ঠে ফের দাঁতের ফোকর দেখালেন মেজর সিং, 'সব্বাই জানে, আমিও জানি।'

'সব্বাই জানে!' এবার যেন একটু সন্দিগ্ধ হলেন প্রফেসর, 'জল ক'রকম সব্বাই জানে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রত্যেককেই দু'রকম জলেই একবার না একবার নাকানি-চোবানি খেতে হয়। যেমন আপনি খাচ্ছেন।'

'আমি নাকানিচোবানি খাচ্ছি!' প্রফেসর ধরি-ধরি করেও ধরতে পারলেন না কী বলতে চাইছেন মেজর সিং।

'বলব?' মেজর উদার কণ্ঠে বলেন।

'বলবেন?' এবার একটু ঘাবড়েই যান প্রফেসর, 'তা বলুন।'

মুচকি হেসে দাঁতের ফোকরটা ফের দেখিয়েই বন্ধ করে ফেললেন মেজর। গম্ভীর গলায় বললেন, 'নাকের জল, আর চোখের জল।'

কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। প্রফেসর থ।/আমরা নির্বাক। মেজর উৎকট রকমের গম্ভীর।

তার পরেই আবার শক্তিশেলের আটটা ঘণ্টা আটশো ঘণ্টার মতো আচমকা ভীমবেগে বেজে উঠে বজ্রনাদে যেন কর্ণ বধির করে ছাড়ল আমাদের। ভীষণ চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'ইয়ারকি হচ্ছে! আমার সঙ্গে ইয়ারকি হচ্ছে! ওয়ার্ল্ড ফেমাস সায়ান্টিস্টের সঙ্গে মশকরা!'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সচরাচর রাগেন না। কালেভদ্রে এক-আধবার রুদ্রমূর্তি ধরেন। আমি অন্তত কখনও ওঁকে এভাবে অগ্নিশর্মা হতে দেখিনি। ফোকলা বুড়ো যেন নটরাজ নাচ নাচতে লাগলেন আর ভৈরবকণ্ঠে নিনাদ ছাড়তে লাগলেন। স্বয়ং কালী করালীও সেই মূর্তি দেখলে দিগম্বরী মূর্তি পরিত্যাগ করে নির্ঘাত চম্পট দিতেন।

আখাম্বা চেহারার অধিকারী ব্যাঘ্রবৎ মেজর সিং ঠিক শৃগালের মতো কুঁচকে গেলেন সেই রুদ্রনৃত্য দেখে। বললেন, 'রাগছেন কেন? মশকরাও বোঝেন না?'

'মশকরা! আমার সঙ্গে মশকরা! এই কি মশকরার সময়? পৃথিবীটাই যখন হাতছাড়া হতে বসেছে, তখন মশকরা করা হচ্ছে! জানেন, আমি হোম মিনিস্টারকে কমপ্লেন করতে পারি?'

কথাটা সত্যি। প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে শুধু হোম মিনিস্টার কেন, স্বয়ং প্রাইম মিনিস্টার,

এমনকী প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া পর্যন্ত খাতির করেন। পঞ্চনদের শিখনন্দন বোধহয় তা জানতেন না।

এখন বিষাণ-কণ্ঠের হুমকি শুনেই আক্কেল হল এই শিখ-তনয়ের। বলে কী বুড়োটা! হোম মিনিস্টারের কাছে নালিশ হয়ে গেলে যে প্রমোশনটা আটকে যাবে! কত কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে মেজর হয়েছেন। প্রফেসরের সুপারিশ পেলে এবার লেফটেন্যান্ট কর্নেল হওয়া আটকায় কে! তারপর কর্নেল। তারপর ব্রিগেডিয়ার।

তাড়াতাড়ি দু'হাত জোড় করে স্রেফ ভেতো বাঙালির কায়দায় মাপ চাইলেন হুকুমৎ সিং, 'মুঝে মাপ কিজিয়ে প্রফেসর।'

ব্যস, শিবের মাথায় বেলপাতা পড়ল! রাগ গলে জল হয়ে গেল প্রফেসরের। তিরিশ সেকেন্ডও গেল না, পরপর তিনবার নস্যি নিয়ে প্রফেসর তিতিক্ষার হাসি হেসে বললেন, 'ও কে, ও কে! সিরিয়াস কথার সময় ইয়ারকি মারলে মাথার আমার ঠিক থাকে না। থাক, যা কথা হচ্ছিল, জল কয় প্রকার?'

পাঞ্জাব-নন্দন এবার প্রতিধ্বনি করলেন সুবোধ বালকের মতন, 'কয় প্রকার?'

'দুই প্রকার।'

'আজ্ঞে আমিও তো তা-ই বলেছিলাম।' বলেই কোঁত করে বাকি কথাটা গিলে নিলেন মেজর। কেননা কটমট করে চেয়েছেন প্রফেসর।

এখন বললেন, 'হেভি ওয়াটার আর মামুলি ওয়াটার।'

'জল আবার হালকা আর ভারী হয় নাকি?' প্রকাণ্ড মূর্খের মতো প্রশ্ন করেন হুকুমৎ সিং।

'সেইটে জানা নেই বলেই আপনি হয়েছেন মেজর, আর আমি হয়েছি সায়ান্টিস্ট।' যেন দয়া করে মেজরের চৈতন্যোদয় ঘটালেন প্রফেসর।

'আজ্ঞে!'

'দু'রকম জলের দু'রকম মাস, দু'রকম ওয়েট, দু'রকম ইভাপোরেশন রেট। কী বুঝলেন? সাধারণ জলের ফরমুলা জানেন?'

'ফরমুলা?'

'জি হ্যাঁ, ফরমুলা। H_2O হেভি ওয়াটারের ফরমুলা কী বলুন তো?'

'ইয়ে...'

'থাক, আমিই বলছি। D_2O। কেন জানেন? হেভি হাইড্রোজেনকে বলে ডয়েটেরিয়াম। আর এই ডয়েটেরিয়ামের অক্সাইড হল হেভি ওয়াটার, অর্থাৎ D_2O। মাথায় ঢুকল?'

'আজ্ঞে না।' মেজর এবার মুক্তকণ্ঠ হন।

'সেটা আগেই বুঝেছি। এখন বলুন দিকি কেন লেকের জল বিশ্লেষণ করতে চাইছি?... তাও বোঝেননি? আপনার আর দোষ কী? অ্যামিও বুঝতে পারেনি। হেভি ওয়াটারে যে অক্সিজেন থাকে, অর্ডিনারি ওয়াটারে সে অক্সিজেন ততটা থাকে না। তাই—'

'অক্সিজেন তো একরকমই হয়।' ফের বোকার মতো বলে ফেললেন মেজর।

'ওঃ!' প্রফেসর হতাশভাবে বললেন, 'অক্সিজেন কয় রকমের তাও জানেন না?'

'আজ্ঞে না।'

'তিন রকমের, তিন রকমের। হোয়াট এ ম্যান ইউ আর? কলেজের ছেলেরাও জানে, আর আপনি জানেন না? এইজন্যেই ইন্ডিয়ান আর্মির আজ এই শোচনীয় অবস্থা।'

'আজ্ঞে, আজ্ঞে—'

'অত আজ্ঞে আজ্ঞে করবেন না। অক্সিজেন তিন রকমের, O_{16}, O_{17}, O_{18}। প্র্যাকটিক্যাল কারণে O_{17} কে আপাতত ভুলে থাকতে পারেন। বেশিরভাগ অর্ডিনারি ওয়াটারের মলিকিউলে O_{16} থাকে। পাঁচশো মলিকিউলের মধ্যে একটা মলিকিউলে হয়তো থাকে O_{16}। ক্লিয়ার?'

'আজ্ঞে।'

'আবার আজ্ঞে বলে! O_{16} আর O_{18} কে আলাদা করার জন্যেই মাস্ স্পেক্ট্রোমিটার দিয়ে ওয়াটার অ্যানালিসিস করা দরকার। দিল্লিতে এই ল্যাবরেটারিতেই মাস্ স্পেক্ট্রোমিটার আছে। বোতল দুটো ওখানেই পাঠান।'

'তা পাঠাচ্ছি।' দাঁতের ফোকর দিয়ে সন্তর্পণে একটির পর একটি শব্দ নিক্ষেপ করে সাবধানে বললেন মেজর হুকুমৎ সিং,—'কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'বলুন।'

'ইয়ে... মানে, দু'রকম ওয়াটার আর তিনরকম অক্সিজেনের ব্যাপারটার সঙ্গে লেকের জলের দু'ডিগ্রি টেম্পারেচার বাড়ার সম্পর্কটা যদি বুঝিয়ে দেন, তো কৃতার্থ হই।'

সংকীর্ণ চোখে মেজরকে নিরীক্ষণ করলেন প্রফেসর। ধোলাই খেয়ে খেয়ে মেজরের তখন এমন ভগ্নদশা যে, ওই চাহনির সামনেই কেঁচোর মতোই সুরুত করে কুঁচকে গেলেন যেন।

প্রফেসর চেয়ে রইলেন। নস্যির ডিবে বার করলেন এবং বিরাট দু'টিপ নস্যি নিলেন। তারপর অত্যন্ত সহৃদয় কণ্ঠে বললেন, 'মহাশয়ের ব্রেনটা দেখছি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল।'

'আজ্ঞে?'

'আপনি কাইন্ডলি অত আজ্ঞে আজ্ঞে করে নিজেকে চিপ করে ফেলবেন না। যা বলছিলাম, আপনার ব্রেনটা কি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল?'

মেজর বোবা থাকাই শ্রেয় মনে করলেন।

প্রফেসর বললেন, 'এতক্ষণে একটা ইনটেলিজেন্ট প্রশ্ন করেছেন। মিস্টিরিয়াস এই ভ্যালি আর লেকে সব মিস্ট্রির মূল কিন্তু ওইটাই: লেকের তলায় টেম্পারেচার দু'ডিগ্রি বেশি কেন?'

রঙ্গরসের এই প্রহসনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল পাইনবৃক্ষের তলদেশে। প্রফেসর আর মেজরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আমি, শম্ভুদা আর অ্যামি ওয়ালেস। প্রত্যেকেই এতক্ষণ উপভোগ করেছি প্রফেসরের নৃত্য এবং মেজরের আর্মি জোক।

বনভূমি কিন্তু আশ্চর্য নিস্তব্ধ। গাছের পাতার মধ্যে সরসর শব্দ পর্যন্ত নেই। একটু আগেই লেকের জলে যে রহস্যময় জলদানবকে দেখে এসেছি, জল ছেড়ে সে ডাঙাতেও ওঠেনি। বাতাস সহসা ক্ষুব্ধ হয়নি। রামধনু রঙের আশ্চর্য বজ্রেরও আবির্ভাব ঘটেনি।

এখন অ্যামি বলে উঠল, 'প্রশ্নটা আমিও করব ভাবছিলাম।'

ক্যাঁটকেঁটে গলায় তৎক্ষণাৎ শুনিয়ে দিলেন প্রফেসর, 'কিন্তু করতে সাহস পাওনি। মেজর মুখ খুলেছেন বলে এখন বলছ। কাওয়ার্ড!'

'এতে কাওয়ার্ড হওয়ার কী আছে?' বিদ্যুৎগর্ভ চোখে বললে অ্যামি।

'বেফাঁস বলে মুখনাড়া খেতে চাও না বলে।'

অ্যামি এবার সত্যি সত্যিই দুই চোখে বিদ্যুৎ হানল। সোজা বাংলায় যাকে বলে দপ করে চোখ জ্বলে ওঠা, সেইরকমভাবে তাকিয়ে মুখের মতন জবাবটা দিতে যাবে, তার আগেই প্রফেসর তড়িঘড়ি বললেন, 'মোদ্দা প্রবলেম হল সেইটাই, লেকের তলায় দু'ডিগ্রি টেম্পারেচার বাড়ল কেন?'

'বাড়ল কেন? ' প্রতিধ্বনি করলেন মেজর।

প্রফেসর বললেন, 'রুদ্র সরোবরের এরিয়া হল প্রায় চল্লিশ বর্গমাইল। গড়পড়তা গভীরতা ছ'শো ফুট। সেই হিসেবে জল আছে দু'হাজার কোটি টন। কারেক্ট?'

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মেজর। মুখে মুখে এত বড় হিসেব করার মতো ব্রেন নিয়ে তিনি জন্মাননি। পকেট ক্যালকুলেটরেও কিছু সময় লাগে, কিন্তু প্রফেসর যেন একটা গণিত-যন্ত্র।

ফের বললেন প্রফেসর, 'এবার আসুন আর একটা হিসেবে। এক টন তেল বা কয়লা পোড়ালে 10^{18} ergs উত্তাপ পাওয়া যায়। তা হলে দু'হাজার কোটি টন জল গরম করতে কত জ্বালানি দরকার? আমিই বলছি, তিরিশ হাজার কোটি টন কয়লা বা তেল। সারা বছর সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ তেল বা কয়লা পোড়ানো হয়, তা-ই।'

হাঁ হয়ে গেলাম আমরা সকলেই।

প্রফেসর বলে চললেন, 'জলের ওপরে যাকে দেখেছি, সে একটা সাঁতারু যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। তার মালিকরা জলের তলায় বসে এমন কিছু করছে, যার জন্য টেম্পারেচার বেড়ে গেছে দু' ডিগ্রি। এবার বুঝেছেন?'

খাবি খেলেন মেজর।

অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন প্রফেসর, 'প্রবলেমটা অত্যন্ত সিরিয়াস, আপনার সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিপুল উত্তাপ সৃষ্টি পারমাণবিক কারণেই সম্ভব। হেভি ওয়াটার অ্যাটমিক এনার্জির উপাদান বলেই আমি দেখতে চাই টেলিপাপেটের মালিক জলের তলায় হেভি ওয়াটার পাচ্ছে কিনা। ওয়াটার অ্যানালিসিস করতে বলছি এই কারণেই।'

ঠিক এই সময়ে অনেক দূর থেকে একটা চাপা গোঙানি শোনা গেল। একটা মৃদু সরসর সরসর শব্দ জাগ্রত হল মাথার ওপর পাইনের ডালপালার মধ্যে। আমাদের পায়ের কাছ থেকে উড়ে গেল কয়েকটা শুকনো ঝরা পাতা।

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে গেলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'মেজর সিং! মেজর সিং! আর দেরি করবেন না। হেলিকপ্টার পাঠান এখুনি, ঝড় আসছে!'

আট. আগুনের গোলা

আঁতকে উঠলেন মেজর হুকুমৎ সিং।

কথায় ডুবে ছিলাম বলেই আমরা কেউই খেয়াল করিনি, বাতাস গুঙিয়ে উঠছে একটু একটু করে। পায়ের কাছে ঝরা পাতা পাকসাট খেয়ে শূন্যপথে উড়ে যেতেই টনক নড়ল। বনভূমি আর নীরব নয়, নিথর নয়।

সুবিশাল পাইনগাছগুলোও আর নিশ্চুপ দর্শক নয়। মাতন জেগেছে পাতায় পাতায়। খ্যাপাটে হাওয়ায় নুয়ে পড়তে চাইছে ডালগুলো।

বাতাস গুঙিয়ে উঠছে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে। ঠিক যেন লৌহপিঞ্জর চূর্ণ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে পবনদৈত্য। এই চাপা গজরানি তারই লক্ষণ।

মেজর হুকুমৎ সিং চক্ষের পলকে উধাও হয়েছিলেন। হাওয়া মাতাল হলে বাতাসের চেয়ে ভারী উড়ুক্কু যান যে আর শূন্যে নিরাপদ নয়, এ-তত্ত্ব তিনি জানেন। তাই চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে পবনদৈত্য আবির্ভূত হবার আগেই তিনি ওয়াটার স্যাম্পল আর ঠিকানাসহ শূন্যে উড়িয়ে দিলেন জলপাই রঙের সামরিক হেলিকপ্টার। দিল্লির দিকে সোজা যাবে না এই কপ্টার। মাঝে কয়েকটা ঘাঁটিতে নামবে, জ্বালানি নেবে, তারপর দিল্লি পৌঁছোবে।

দেখতে দেখতে বিপুলকায় গঙ্গাফড়িঙের মতো বরফ-ছাওয়া পাহাড়-পর্বতের ওপর দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল কপ্টার। কান-ফাটা গর্জন হারিয়ে যেতে না যেতেই গোঁ গোঁ শব্দটা আরও বেড়ে উঠল। ঝড়ের গোঙানি। ঠিক যেন কতকগুলো বোবা জন্তু বিষম আক্রোশে গজরাচ্ছে। সেইসঙ্গে ভীষণভাবে উত্তাল হচ্ছে ডালপালা।

সহসা বায়ুবেগে ছুটে এলেন মেজর হুকুমৎ সিং, 'প্রফেসর, গেট ইন! ভেতরে চলে যান। বাইরে থাকবেন না। প্লিজ!'

উত্তরে যেন একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল পবন-দৈত্য।

গজরানির ওপরে গলা তুলে প্রফেসর বললেন, 'লেকের ধারে সেন্ট্রি আছে তো?'

চিৎকার করে মেজর বললেন, 'ও ইয়েস! বুলেটপ্রুফ ক্যাম্প সেখানেও বসানো হয়েছে। লেকের জলে নজর রাখবার হুকুম দিয়েছি। রেডিয়োতে খবর পাব। আপনি ঢুকে যান। গেট ইন! কুইক!'

বলে প্রফেসরকে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিলেন ওঁর ক্যাম্পে। অ্যামি ওয়ালেস ঝড়ের ধাক্কায় হেঁট হয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হল একটা গম্বুজের মধ্যে। আমি আর শম্ভুদা আমাদের ক্যাম্পে ঢুকে হ্যাচ বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে।

পুরো দুটি ঘণ্টা বন্দি রইলাম লোহার কেল্লায়। ঝড়ের গর্জন কানের পরদায় ক্ষীণভাবে পৌঁছোল। প্রতি-মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম, এই বুঝি অদৃশ্য আততায়ী স্টিলের কেল্লা এক থাবায় উড়িয়ে দিল শূন্যে, নিক্ষেপ করল দূর পাহাড়ের বুকে। আমরা কেউই জানি না, রহস্যময় এই বনতলে কাদের লীলাখেলা চলেছে এতদিন। আক্রমণটা ঠিক কোন দিক থেকে আসবে, তা জানা নেই বলেই অজানা আশঙ্কায় কাঠ হয়ে রইলাম সর্বক্ষণ। ঘনঘন ঘড়ি দেখছি আর ওয়াকি টকি মারফত যোগাযোগ রাখছি প্রফেসরের সঙ্গে। ওঁর সঙ্গে

যোগাযোগ আছে মেজরের। লেকের ধারে কী ঘটছে, সে-খবর উনি সরাসরি পেয়ে যাচ্ছেন। আমাদেরকেও বলছেন। আমরা ভীষণ উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে তা-ই শুনছি। লেকের জলে নাকি এখন ঘূর্ণিপাক দেখা দিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ে জল ঘুরপাক খেয়ে লাফিয়ে উঠতে চাইছে।

সেন্ট্রি একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছে। ঝড়টা লেকের চারদিক থেকে লেকের দিকেই ছুটে আসছে! যত দূর চোখ যায়, তত দূরে এই একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে! তীরের লম্বা লম্বা পাইন গাছগুলো পলকা সুপুরি গাছের মতো একযোগে নুয়ে পড়ছে লেকের দিকে। আশ্চর্য এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে সেন্ট্রি স্বয়ং। ঝড় তো এক দিক থেকে এসে আর এক দিকে চলে যায়। লেকের এপারের পাইন লেকের দিকে ঝুঁকে পড়লে ওপারের গাছগুলো লেকের দিকে ঝুঁকতে যাবে কেন? কিন্তু এক্ষেত্রে তা-ই হচ্ছে।

ঝড় চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে লেকের দিকে। লেকের বুকে চারদিকের ঝড় এক হয়ে মাথা ঠোকাঠুকি করে লক্ষ করতালি বাজিয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে বিরাট ঘূর্ণিঝড়ের আকারে। চারদিক থেকে ঝরা পাতা মেঘের মতো উড়ে এসে প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে খেতে অবর্ণনীয় স্তম্ভের আকারে উধাও হচ্ছে শূন্যে। এ দৃশ্য না-দেখলে কল্পনা করা যায় না।

টেলিপাপেট ওরফে প্লেসিওসরাস ওরফে সাঁতারু যন্ত্রটাকে আর দেখা যায়নি। লেকের জল এখন যেরকম তোলপাড় হচ্ছে, কোনও যন্ত্রই এখন সেখানে নিরাপদ নয়।

ঠিক এই সময়ে রেডিয়োর মধ্যে শোনা যায় সেন্ট্রির বিস্ময়-চকিত চিৎকার। মেজরের মুখে পরে শুনেছিলাম সেন্ট্রি কীভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিল এবং কী কী বলেছিল।

সেন্ট্রির জবানিতেই শোনা যাক সেই ঘটনা।

'স্যার, স্যার! একটা আগুনের গোলা দেখতে পাচ্ছি। জলের ওপর হঠাৎ কোত্থেকে একটা বিরাট আগুনের গোলা এসে জুটেছে, স্যার। কোত্থেকে এল বুঝতে পারছি না। ফায়ার বল! ঠিক বলের মতোই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে জল থেকে ওপরের দিকে। যেন ফুটবল খেলা হচ্ছে মাঠের ওপর। আকারে বিরাট।

কত বড়? তা প্রায় একশো গজ ব্যাসের তো বটেই। আগুনের রংটা ঠিক লাল নয়, সাদাও নয়, বেগুনিও নয়। কীরকম জানেন? রামধনুতে যেরকম অনেকগুলো রং দেখা যায়, সেইরকম। ঘূর্ণিঝড়ে লেকের ওপর থেকে জল পর্যন্ত ফোঁস ফোঁস করে ওপরে লাফিয়ে উঠছে। যেন জলস্তম্ভ আরম্ভ হয়ে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। এই ফায়ার বল কিন্তু সেই ঘূর্ণিপাকের খপ্পরে পড়ছে না। বলটা লাফাচ্ছে, ভীষণভাবে লাফাচ্ছে।... ফেটে গেল স্যার, ফেটে চৌচির হয়ে গেল ফায়ার বল! লক্ষ সাপের মতো কিলবিল করে রামধনু আগুন লেকের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ফায়ার বল আর নেই। তার বদলে ফায়ার স্নেক এসে গেছে। আগুন সাপ। আমার এই কেল্লার দিকে কিলবিল করতে করতে ছুটে আসছে। আমি—

ব্যস, এই পর্যন্ত শোনবার পরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রেডিয়ো-যোগাযোগ-ব্যবস্থা। মেজর প্রথমে ভেবেছিলেন, সেন্ট্রি কথা থামিয়েছে। তারপর দেখলেন, রেডিয়োই বিকল।

উপত্যকায় যেখানে যত রেডিয়ো রিসিভার আর ট্রান্সমিটার ছিল, একযোগে সব বিকল হয়ে গিয়েছে। মেশিনে গোলযোগ নেই। কিন্তু ইথার আর কোনও মেসেজ বহন করছে না— খবর যাচ্ছে না, খবর আসছে না।

খুটখাট করে মেশিন নেড়েচেড়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল অপারেটর। ঝড় না-থামা পর্যন্ত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল পুরো দুটি ঘণ্টা। তারপর যখন স্তব্ধ হল ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য, একে একে বেরিয়ে এলাম প্রত্যেকেই যে যার কেল্লা ছেড়ে।

মেজরের মুখে শুনলাম সেন্ট্রির শেষ কথাগুলো। হঠাৎ রেডিয়ো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মূলে আগুনের গোলার কোনও কারসাজি আছে নিশ্চয়ই।

প্রফেসরও চিন্তিত মুখে বললেন, 'তা তো আছেই। ফায়ার বল্ব হঠাৎ ফেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যত বিপত্তির শুরু। জঙ্গলের মধ্যেও রামধনু রোশনাই ছুটে এসেছিল।'

'আপনি দেখেছেন?' লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'দেখব বলে বসেছিলাম বলেই দেখেছি।' কপাল কুঁচকে মাটির দিকে চেয়ে থেকে বললেন প্রফেসর।

মেজর বললেন, 'আমিও দেখেছি। রামধনু রঙের ছোট ছোট বলকে শূন্যে ফানুসের মতো ভাসতে আমিও দেখেছি।'

'আর কিছু দেখেননি?' অ্যামির সাগ্রহ প্রশ্ন।

'উঁহু।' ব্যাজার মুখে বললেন মেজর, 'বুলেট-প্রুফ কাচের জানলার দিকে একটা ফানুস ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসতেই স্টিল শার্টার টেনে বন্ধ করে দিয়েছিলাম।'

বুঝলাম, ভয় পেয়েছিলেন মেজর। মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছে সেইজন্যেই।

প্রফেসর মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ দেখে বুঝলাম, চিন্তার তুফান ছুটছে তাঁর মাথার মধ্যে।

পাইনভূমি আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সরসর সরসর শব্দে বাতাস খেলা করছে পাতার মধ্যে। সারি সারি দীর্ঘকায় বৃক্ষ পরম কৌতুকে যেন নিরীক্ষণ করছে আমাদের বিমূঢ় অবস্থা। একটা নতুন দৃশ্য নজরে এল লম্বা গাছের মাথার ওপর।

মেঘ জমা হয়েছে রুদ্র সরোবরের ঠিক ওপরে। কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে রাশি রাশি জল-ভরা মেঘ। মেঘপুঞ্জের তলার দিকটা চ্যাপটা— লেকের জলপৃষ্ঠের মতোই সমতল।

বাতাসের মধ্যেও ভিজে ভিজে ভাব। বৃষ্টি আসার আগে যে ধরনের স্যাঁতসেঁতে বাতাস বইতে থাকে, ঠিক সেই বাতাস। বুঝলাম, বৃষ্টি নামবে।

জ্যাক বা হেনরী মেঘ দেখেননি। ঝড় দেখেছেন, তারপর মারা গেছেন অথবা দূর থেকেই পালিয়ে গেছেন। ঝড়ের পরেই এই মেঘের ঘনঘটা বোধহয় সেই কারণেই দেখতে পাননি।

দেখতে দেখতে সজল মেঘে বৃষ্টির ধারা-বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। ঝমঝম ঝমঝম শব্দে একনাগাড়ে পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বৃষ্টি ঝরতে লাগল হঠাৎ-আবির্ভূত মেঘপুঞ্জ থেকে। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে অলৌকিক সেই মেঘরাশির দিকে চেয়ে রইলাম আমরা সকলেই।

এমন সময়ে ছুটতে ছুটতে এল রেডিয়ো অপারেটর। মেজর হুকুমৎ সিং তখন নিজেই একটা জ্যান্ত বিস্ময়চিহ্নের মতো ঘাড় উঁচিয়ে দেখছেন বিচিত্র বাদলার দৃশ্য। জলের ফোঁটা এদিকেও ছিটকে আসছে। কিন্তু ওঁর খেয়াল নেই।

রেডিয়ো অপারেটর দৌড়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েই খটাস করে বুট ঠুকে ঠাস করে সেলাম ঠুকল মিলিটারি কায়দায়।

সংবিৎ ফিরল মেজর সাহেবের। অধস্তন কর্মচারীর সামনে ক্যাবলার মতো মুখভঙ্গী করে দাঁড়ানো সমীচীন নয় হৃদয়ঙ্গম করে মুখখানা তৎক্ষণাৎ উৎকট গম্ভীর করে চাইলেন কটমটে চোখে, 'কী ব্যাপার?'

'রেডিয়ো ঠিক হয়ে গেছে, স্যার।'

নয়. জ্যান্ত মানুষের রামধনু ছবি

অস্ফুট চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

'কী হল?' বললেন মেজর।

'ঠিক এইটাই ভয় করেছিলাম।' বললেন প্রফেসর।

'কী ভয়?'

'রেডিয়ো ব্লক করে দিয়েছিল ওরা।'

ভ্রূ দুটোকে শোয়ানো জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো বেঁকিয়ে ফেলে শুধু চেয়ে রইলেন মেজর। কাঠখোট্টা সৈনিক পুরুষ। কড়া বাস্তব নিয়ে কারবার করেন, রঙিন কল্পনায় ধাতস্থ নন।

প্রফেসর বললেন, 'বুঝলেন না? এতক্ষণ ধরে সেই কথাই তো ভাবছিলাম। ওরা দেখছি শুধু জল নয়, অন্তরীক্ষকেও কবজায় এনে ফেলেছে।'

'মানে?'

'মানে, এই মুহূর্তে আপনার কি সাহস আছে লেকে ডুবুরি নামানোর?'

'তা ইয়ে...'

'ঝুঁকির ব্যাপার, তা-ই না? লেক ওদের ঘাঁটি। এখন দেখুন, শূন্যপথেও ওরা কত সহজভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দরকারমতো ঝড় সৃষ্টি করছে, মেঘ তৈরি করে বৃষ্টি ঝরাচ্ছে, আগুনের বল ভাসাচ্ছে, আর... আর বাতাসের মধ্যে দিয়ে রেডিয়ো মেসেজের যাতায়াত পর্যন্ত বন্ধ করে দিচ্ছে।'

'প্রফেসর!'

'ইয়েস মেজর। আপনাকে আগেই বলেছিলাম, পৃথিবীটাই হাতছাড়া হতে বসেছে। জলের তলায় যারা ঘাপটি মেরে রয়েছে, তারা যে ইচ্ছে করলে রেডিয়ো পর্যন্ত বিগড়ে দিয়ে আমাদের যোগাযোগ বিপর্যস্ত করে দিতে পারে, সে নমুনা তো পেলেন। এইটা যদি লার্জ স্কেলে হয়? যদি তিনভাগ জলে তারা ঘাঁটি পাতে আর শূন্যপথে আমাদের রেডিয়ো মেসেজ

পর্যন্ত ব্লক করে দেয়? আগুনে বল উড়িয়ে শূন্যপথে বিমান-চলাচল যদি বন্ধ করে দেয়? পরিণামটা কল্পনা করতে পারছেন?'

কাষ্ঠ হাসি হেসে মেজর বললেন, 'আপনি বড় বেশি কল্পনা করেন, প্রফেসর।'

প্রফেসর বিরক্ত হলেন, 'এখনও অবিশ্বাস? জল আর অন্তরীক্ষ ওরা যদি জয় করে, সামান্য স্থলের ওপর মানুষ কি আর টিকে থাকতে পারবে ওদের আশ্চর্য বজ্রের সামনে? পারবে, যদি ভয়ংকর ঝড়ে বাড়ি-ঘরদোর উড়ে যায়, বৃষ্টির জলে প্লাবন নামে? যে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ এখনও কবজায় আনতে পারেনি, এরা তা পেরেছে। কত কামান আছে আপনাদের ঝড়-বৃষ্টি-আগুনের সঙ্গে লড়বার জন্যে?'

হেঁ-হেঁ করে মেজর কথা ঘুরিয়ে দিলেন, 'সে তো পরের কথা। এখন রেডিয়ো মারফত সেন্ট্রির অভিজ্ঞতাটা শোনা যাক।'

'ঠিক কথা, ঠিক কথা।' সায় দিলেন প্রফেসর, 'কথা বলতে বলতে রেডিয়ো বিগড়েছিল। বাকি কথাটা এবার শোনা যাক।'

রেডিয়ো অপারেটর অনেকক্ষণ থেকেই উদ্‌বিগ্ন মুখে কী যেন বলতে চাইছিল, এবার তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'স্যার, সেই কথাটাই বলতে এসেছি।'

'কী কথা?' ফের চোখ পাকিয়ে তাকালেন মেজর।

'আজ্ঞে, সেন্ট্রি ক্যাম্প থেকে জবাব আসছে না।'

আবার সেইরকম অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'সর্বনাশ!'

মেজর হুকুমৎ সিংও স্থির রইলেন না, হাঁকডাক দিয়ে সেপাই-সান্ত্রি জড়ো করে তৎক্ষণাৎ রওনা দিলেন লেকের দিকে। দস্তুরমতো সেই মিলিটারি অভিযানে অ্যামি ওয়ালেসকে কিছুতেই নিলেন না ভদ্রলোক। প্রফেসর ছিনে জোঁক বলে তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না এবং যেহেতু আমি তাঁর আঁচিল, অগত্যা আমিও লেগে রইলাম পেছন পেছন।

মিলিটারি বাহিনী এসে পৌঁছোল লেকের পাড়ে। তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে গেলাম প্রত্যেকেই। চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে বৃষ্টির জলে। তার ওপর কনকনে হিমেল হাওয়া। সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে একটু একটু করে, বেশ বুঝতে পারলাম। এইভাবে আর কিছুক্ষণ চললে ফ্রস্ট বাইট অর্থাৎ তুষারক্ষত হওয়াও বিচিত্র নয়।

স্রেফ মনের জোরে এসে পৌঁছোলাম গোল গম্বুজের সামনে। কেউ কোথাও নেই। একটা আলো পর্যন্ত জ্বলছে না। প্রায়ান্ধকারে ভৌতিক কেল্লার মতো যেন একটা নিরেট অন্ধকার দাঁড়িয়ে সামনে।

মেজর হাঁক দিলেন, স্টিল ক্যাম্পে বুটের লাথি মারলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না ভেতর থেকে।

হ্যাচের সামনে গিয়ে দেখলেন, হ্যাচ খোলা। টর্চ জ্বেলে ভেতরে ঢুকলেন, কেউ নেই।

বেরিয়ে এলেন ভ্রূকুটি করে। চেয়ে রইলেন লেকের বৃষ্টি-বিক্ষুব্ধ কালো জলের দিকে। সব রহস্য ওই বিশাল জলধির মধ্যেই।

প্রফেসর কিন্তু জলের দিকে চেয়ে নেই। পাঁচ ব্যাটারির শক্তিশালী টর্চ হাতে নিয়ে গোল

হয়ে ঘুরছেন গম্বুজ ঘিরে এবং আলো ফেলছেন চকচকে স্টিল বডিতে। পেছন দিকে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, ডাকলেন, 'দীননাথ!'

উত্তেজনায় গলা কাঁপছে প্রফেসরের।

'মেজরকে নিয়ে এখানে এসো।' আবার কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলেন প্রফেসর।

'ডাকছেন আপনাকে।' বললাম মেজরকে। দু'জনে মিলে এসে দাঁড়ালাম প্রফেসরের পাশে।

'কী বলছেন?'

প্রফেসর টর্চ নিভিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, 'সেন্ট্রিকে পেয়েছেন?'

'না।'

'আর পাবেন না।'

'মানে?'

'মানে, তাকে আর জ্যান্ত পাবেন না। কিন্তু প্রায়-জ্যান্ত চেহারাটা দেখাতে পারি।'

'প্রফেসর!' মেজরের গলা চড়ছে।

'আপনি বড় অবিশ্বাসী, মেজর। জীবন্ত জীবকে দিয়ে ফোটো তুলিয়ে বাঁধিয়ে রাখার ঘটনা কখনও শুনেছেন?'

'জীবন্ত জীবকে দিয়ে ফোটো!'

'আজ্ঞে।'

বলেই পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো স্টিল কেল্লার গায়ে ফেললেন প্রফেসর।

সচমকে দেখলাম সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

সেন্ট্রি লেপটে রয়েছে ইস্পাতের চাদরে!

দশ. জলের টেম্পারেচার বাড়ল কেন?

এ-কাহিনি লিখছি কলকাতায় টেবিল ল্যাম্পের সামনে লেখবার টেবিলে। এত আরামের মধ্যে, এত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বসে সেদিনকার সেই লোমহর্ষক অনুভূতি গুছিয়ে বলতে পারব না। কিছুতেই বোঝাতে পারব না কী বিচিত্র রোমাঞ্চ নিমেষমধ্যে জাগ্রত হয়েছিল রক্তের অণুপরমাণুতে। চারদিকে হিমগিরি, মাঝের অন্ধকার অঙ্গনে সে যে কী ভয়ংকর দৃশ্য সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, আমার এই দুর্বল কলমে তা ফুটিয়ে তোলার সাধ্যি আমার নেই। যা দেখলাম টর্চের জোরালো আলোয়, তা এককথায় অবিশ্বাস্য।

হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য। কিন্তু তবু তা আমার এই রক্তমাংসের চোখ দিয়ে দেখেছি। আমি দেখেছি, গোল গম্বুজের বুলেট-প্রুফ দেওয়ালে দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে পিঠ দিয়ে লেপটে রয়েছে সেন্ট্রি।

তার আস্ত দেহটা রিলিফ ম্যাপের মতো উঁচু উঁচু হয়ে লেপটে রয়েছে ইস্পাতের দেওয়ালে। পুরো দেহটা যেন থেবড়ে, গলে পাতলা হয়ে গিয়েছে। দেহটা আছে ঠিকই,

নাক, মুখ, চোখ, বুক, হাত, পা— স-ব আছে। কিন্তু যে অনুপাতে উঁচু থাকা উচিত, সে অনুপাতে উঁচু নেই, আশ্চর্যভাবে পুরো দেহটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। বড়জোর এক থেকে দেড় ইঞ্চি পুরু রিলিফ ম্যাপের মতো ছবির আকারে লেগে রয়েছে। যেন ভেতর থেকে হাড়গোড় নাড়িভুঁড়ি সব বেবাক উধাও হয়ে শুধু বাইরের খোলসটা ছবি হয়ে আটকে রয়েছে।

শুধু ছবি নয়, রামধনু ছবি— রামধনু রঙে রঙিন ছবি। ছবির কিনারা ঘিরেও রামধনু রঙের প্রলেপ। রামধনু-ঝলকে সাপটানো এহেন রামধনু-চিত্র বিশ্বের কোনও চিত্রকর, কোনও বৈজ্ঞানিক, কোনও মারণাস্ত্র-বিশারদ অতিবড় দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি, পারবেও না।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, যেন একটা অদ্ভুত শক্তিশালী ব্লো-টর্চ চক্ষের নিমেষে ঝলসে গালিয়ে সেন্ট্রিকে ওয়েল্ডিং করে দিয়েছে স্টিল প্লেটের ওপরে।

ফ্যানটাস্টিক কল্পনা ঠিকই, কিন্তু সে দৃশ্য দেখলে এ ছাড়া আর কোনও কল্পনা মাথায় আসে না। অমন যে দুঁদে হুকুমৎ সিং, তিনিও হাঁ বন্ধ করতে ভুলে গেলেন।

প্রফেসর বললেন, 'রেডিয়ো বিগড়ে যেতে সেন্ট্রি বাইরে এসেছিল কারণ খুঁজতে, বারণ না-মেনে। প্রাণ দিয়ে তাই প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে।'

* * *

দু'দিন পরের ঘটনা। ইতিমধ্যে নতুন কিছু ঘটনা ঘটেনি। মেজর হুকুমৎ সিং সেন্ট্রির শোচনীয় মৃত্যুর রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন হেড কোয়ার্টারে। সেখানে ব্যাপারটাকে সায়ান্স ফিকশন হিসাবে ধরা হয়নি। চিন দেশের পারমাণবিক পরীক্ষার ওপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে ১৯৬৫ সালে আমেরিকার কুখ্যাত গুপ্তচর সংস্থা সি আই এ নন্দাদেবীতে প্লুটোনিয়াম স্পাই যন্ত্র বসিয়ে যাওয়ার পর থেকে সরকার ইন্ডিয়ান হিমালয়ের কোনও রহস্যকেই আর তুচ্ছ করে দেখতে রাজি নন।

এই সেদিনও পাহাড়ে ওঠার নাম করে আমেরিকান অভিযাত্রীদল চুপিসারে সেখানে দিনকয়েক কী করেছে, ঈশ্বর জানেন। সঙ্গে একজন ভারতীয় ছিলেন লায়াসন অফিসার হিসেবে। নাম তাঁর ক্যাপ্টেন ধীলন। রহস্যজনকভাবে ১৮০০০ ফুট ওপরে তাঁর মৃত্যু হয়। সে মৃত্যুরও এখনও কোনও কিনারা হয়নি।

কাজেই মিলিটারি দপ্তর অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন রুদ্র উপত্যকার রহস্য নিয়ে। এতগুলো দেশের সীমান্ত যেখানে এক হয়েছে, সেখানে কোনওরকম হামলা বরদাস্ত করতে তাঁরা রাজি নন। বিশেষ করে মিলিটারির গায়ে যখন হাত পড়েছে, তখন আর কোনও কথা নয়।

কাজেই মেজর হুকুমৎ সিং-এর সঙ্গে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের দ্বন্দ্ব এখন চরমে। মেজর প্রফেসরকে খুব একটা কলকে দিতে আর রাজি নন। ফলে অভিযানের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব কমে এসেছে, প্রতিরক্ষা-গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে।

ঠিক এই সময়ে দিল্লি থেকে এসে পৌঁছোল জলের রিপোর্ট। রিপোর্ট হাতে নিয়ে আমাকে, শম্ভুদাকে আর অ্যামি ওয়ালেসকে নিয়ে বসলেন প্রফেসর। বললেন, 'মেজর যা

খুশি করে করুক, তাকে আর কোনও কথা বলতে আমি বাধ্য নই। কিন্তু তোমরা শুনে রাখো, আমার অনুমানই সত্যি হতে চলেছে।'

উন্মুখ হলাম।

উনি বললেন, 'জলের স্যাম্পেল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, লেকের তলায় ডয়েটেরিয়াম পার্সেন্টেজ খুব কমে গেছে। লেকের ওপর D/H পার্সেন্ট 0.0149, কিন্তু লেকের তলায় তা 0.0069।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অ্যামি ওয়ালেস বললে, 'তার মানে কি বলতে চান প্লেসিওসরাস আসলে নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট?'

মাথা কাত করলেন প্রফেসর, 'ব্র্যাভো মাই ডিয়ার গার্ল! চমৎকার প্রশ্ন করেছ। লেকের তলায় জলে ডয়েটেরিয়াম দ্রুত কমে গেল কেন? হেভি ওয়াটারে হাইড্রোজেন যে আকারে থাকে, তারই নাম ডয়েটেরিয়াম। শম্ভুর অবগতির জন্য ব্যাখা করে দিলাম। জিনিসটা কিন্তু পারমাণবিক বস্তু। মেটিরিয়াল ফিজিসিস্টরা একে হিলিয়ামে রূপান্তরের চেষ্টা করছেন। লেকের তলায় এই ডয়েটেরিয়ামের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে কেন?'

ফট করে অ্যামি বললে, 'জল থেকে কেউ ডয়েটেরিয়াম সরিয়ে নিচ্ছে বলে?'

'এগজ্যাক্টলি। ডয়েটেরিয়ামকে জল থেকে আলাদা করা হচ্ছে হিলিয়ামে রূপান্তরের জন্য। এর ফলে তাপ উৎপন্ন হবেই। জলের টেম্পারেচার দু'ডিগ্রি বেড়ে গেছে সেই কারণেই।'

শম্ভুদা বৈজ্ঞানিক আলোচনা খালি শুনে যান, একদম কথা বলেন না। সেদিন কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'আর একটু পরিষ্কার করে বলবেন, দু'ডিগ্রি তাপ বাড়ল কেন?'

'হিলিয়াম সিন্‌থেসিস অর্থাৎ হিলিয়াম সংশ্লেষণ হচ্ছে বলে, সংশ্লেষণের সময়ে তাপক্ষয় হয় বলে। থাক গে সে-কথা,' মাথার চুল ঝাঁকাতে থাকেন প্রফেসর, 'আমি আপাতত দু'ডিগ্রি টেম্পারেচার বৃদ্ধি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।'

'তবে?' অ্যামির প্রশ্ন।

'অ্যামি, ব্যাপারটা অঙ্কের, তুমিই বুঝবে। এক গ্রাম ডয়েটেরিয়াম থেকে 6.10^{18} ergs তাপ বেরিয়ে আসে। লেকের জলের দু'ডিগ্রি টেম্পারেচার বাড়াতে যত ডয়েটেরিয়াম দরকার, তার চাইতে বেশি ডয়েটেরিয়াম সরানো হয়েছে জল থেকে। তার মানে কি এ-ই নয় যে, ডয়েটেরিয়ামকে অন্য কাজে লাগানো হচ্ছে?'

'কী কাজে?' অ্যামির চোখে ভ্রূকুটি।

হেঁট হয়ে ফিসফিস করে প্রফেসর বললেন, 'যত এনার্জি সরানো হয়েছে নিপাত্তা ডয়েটেরিয়াম থেকে, তা দিয়ে কয়েক লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা বানানো যায়। এবার বুঝলে কী কাজে?'

মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল আমার।

কয়েক লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা!

অ্যামি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'প্রফেসর, আমি গিয়ে মেজরকে বলছি, জিনিসটা সিরিয়াস।'

বাধা দিলেন না প্রফেসর। উদাস কণ্ঠে বললেন, 'যাও, ওই নিরেট মাথায় যদি ঢোকাতে পারো, দেখো।'

আমি বললাম, 'মেজরের আর দোষ কী বলুন? ওকে দিল্লি থেকে যা বলবে, তা-ই করবে ও। আপনি দিল্লিকে বোঝান না!'

'আমি? আমি আর কাউকে কোনও কথা বলব না।'

প্রফেসরের অভিমানের কারণটা আগেই বলেছি। ওঁর কোনও কথা দিল্লির মন্ত্রীদপ্তর শোনেনি। উনিও আর মুখ খুলতে রাজি নন।

কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা জানতে পারার পর চুপচাপ বসে থাকাটাও ঠিক নয়। অ্যামিকে মেজর হুকুমৎ সিং বেশ খাতির করেন। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তার ওপর বিদেশিনী। সেই অ্যামিই তেড়ে মেড়ে বেরিয়ে গেল মেজরের ক্যাম্পের দিকে।

বনভূমি তখনও নিস্তব্ধ, নিথর।

অ্যামিও ব্যর্থ হল। শুধু যে ব্যর্থ হল তা-ই নয়, অ্যামিকে এমন বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, প্রফেসরকেও সে বোঝাতে এল দিল্লির বক্তব্য।

সে এক কাণ্ড! প্রফেসর যতই চেঁচান, অ্যামি তার তিনগুণ চেঁচায়।

অ্যামির বক্তব্য অত্যন্ত সরল। প্রাচ্যের মানুষরা বড় কল্পনা-বিলাসী, পাশ্চাত্যের মানুষদের মতো শীতল যুক্তিবাদী নয়। অ্যামিও যুক্তিটাই বেশি বোঝে। দিল্লির যুক্তি তার মনে ধরেছে।

এই সেদিন পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের ওপর দিয়ে কারাকোরাম হাইওয়ে নির্মিত হওয়ায় ইন্ডিয়া দারুণ চটেছে। পাকিস্তান অবশ্য তাতে ভ্রূক্ষেপ করেনি। পঁচিশ মাইল দীর্ঘ এই পথ শুরু হয়েছে সিন্‌কিয়াং-এর কাশগড় থেকে, সুপ্রাচীন সিল্ক রোড বরাবর এসেছে ১৫,৪৫০ ফুট উঁচু মিনটাকা পাসে, সেখান থেকে গিলগিট হয়ে পৌঁছেছে কাশ্মীরে। নন্দাদেবীর মাথায় মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা বসিয়েছিল গোয়েন্দাগিরির যন্ত্র চিনদেশের নিয়ক্লিয়র টেস্টের খবর রাখার জন্যে।

ইত্যাকার ঘটনার পর যখন জানা গেল, রুদ্র উপত্যকায় মানুষ গেলেই ঝড় উঠছে, আগুনের গোলা ছুটছে, আশ্চর্য বজ্রে পিঠ চৌচির হচ্ছে এবং জলের তলায় লক্ষ হাইড্রোজেন তৈরির উপযুক্ত ডয়েটেরিয়াম সরানো হচ্ছে, তখন কি সরকার নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে পারেন? প্রফেসরকে অজস্র ধন্যবাদ। জলের স্যাম্পেল অ্যানালাইজ না-করলে বিরাট এই আবিষ্কার সম্ভব হত না। কিন্তু এরপর তিনি যে উদ্ভট কল্পনা করছেন, প্রতিরক্ষা দপ্তর তা মানতে রাজি নয়। দেখাই যাচ্ছে, ইন্ডিয়ান হিমালয়ে নজর রয়েছে অনেক দেশের। তারা প্রত্যেকেই দুর্গম হিমগিরি অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব

বিস্তার করে চলেছে। নন্দাদেবী আর কারাকোরাম হাইওয়ে— এই দুটি ঘটনাই চোখ খুলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং, রুদ্র উপত্যকায় যা কিছু ঘটছে, তা কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের কীর্তি। তারা নিয়ক্লিয়র গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের মাথায় বসে। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না, পাছে কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যায়। প্রফেসর যেন সোজা ব্যাপারকে সোজাভাবে দেখেন, ঘুরিয়ে মানে করতে না-যান। রুদ্র উপত্যকায় ভিনগ্রহীদের কোনও কারবার নেই। যুদ্ধকারবারি কিছু বিদেশি মানুষ সেখানে গোপন ঘাঁটি গেড়ে ইন্ডিয়ার সর্বনাশ করবার মতলব আঁটছে। কাজেই ইন্ডিয়ান মিলিটারিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। প্রফেসর যেন রুদ্র উপত্যকা ত্যাগ করে অবিলম্বে চলে আসেন।

এই শেষ কথাটা শুনেই প্রফেসর অকস্মাৎ একদম বোবা হয়ে গেলেন। আর একটি কথাও বললেন না।

অ্যামি অনেক বোঝাল। অবশেষে গুটিগুটি মেজর হুকুমৎ সিংও এলেন। প্রফেসর একদম কথা বললেন না। দিল্লির অর্ডার পড়ে শোনালেন মেজর, প্রফেসর মৌনীবাবা হয়ে বসে রইলেন। মেজর প্রস্তাব করলেন, রেডিয়ো মারফত যদি প্রফেসর দিল্লির ওপরমহলে কথা বলে নেন, বড় ভাল হয়। প্রফেসর নিরুত্তর রইলেন। মেজর হাতজোড় করে বললেন, কেন তাঁকে ফাঁপরে ফেলছেন প্রফেসর? মিলিটারি ডিসিপ্লিন বড় কঠোর। তাঁর ওপর হুকুম এসেছে অসামরিক ব্যক্তিদের এখান থেকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়ার। প্রফেসর দাঁত খুঁটতে লাগলেন। মেজর তখন রেগে গিয়ে কড়া গলায় বললেন, হেডকোয়ার্টার থেকে আরও জোয়ান আসছে। তার আগেই অসামরিক ব্যক্তিদের জোর করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এয়ারফোর্স কপ্টার পাঠাচ্ছে। প্রফেসর শিবনেত্র হয়ে বসে রইলেন।

কাঁহাতক একটা পাথরের মূর্তির সঙ্গে কথা বলা যায়। মেজর রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালেন। হনহন করে দরজার কাছে গিয়ে গাঁকগাঁক করে বললেন, ‘গেট রেডি, কপ্টার এলেই আপনাদের যেতে হবে। আমি চললাম চার্জ করতে।’

বলেই ছিটকে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

সঙ্গে সঙ্গে সটান হয়ে বসলেন প্রফেসর। নিমেষমধ্যে উধাও হল তাঁর জড়তা, আলস্য, মৌনভাব। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন অ্যামিকে, ‘কী চার্জ করতে গেল মাথামোটাটা?’

আমতা আমতা করতে লাগল অ্যামি। বুঝলাম, ও জানে, কিন্তু বারণ আছে বলে দ্বিধায় পড়েছে।

ফের চাপা গলায় গর্জে উঠলেন প্রফেসর, ‘আমাকে বলবে না? এ-ই তোমার আনুগত্যবোধ?’

চোখ নামিয়ে নিল অ্যামি।

প্রফেসর ধরা গলায় বললেন, ‘আমি জানি, আমি একা। কিন্তু তুমি তো ডিসিপ্লিনের ভক্ত। অভিযানের নায়ককে কথা লুকোনোটা বুঝি তোমার ডিসিপ্লিনের মধ্যে পড়ে?’

ভেঙে পড়ল অ্যামি। বলল, 'ডেপ্‌থ চার্জ।'

আঁতকে উঠলেন প্রফেসর, 'ডেপ্‌থ চার্জ!'

'হ্যাঁ প্রফেসর। মেজরের ওপর অর্ডার হয়েছে লেকের জলে ডেপ্‌থ চার্জ ফেলতে।'

'ডেপ্‌থ চার্জ! হাইড্রোজেন বোমার গাদায় ডেপ্‌থ চার্জ! ও গড! এ কোন মাথামোটাদের পাল্লায় পড়লাম! বারুদে আগুন দিতে চলেছে ইডিয়টগুলো!'

বলতে বলতে নক্ষত্রবেগে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর।

বারো. আশ্চর্য গোলক

হল না, আটকাতে পারলেন না প্রফেসর।

প্রফেসরের পিছন পিছন আমিও দৌড়েছিলাম। আমার পেছনে অ্যামি আর শম্ভুদা।

হাঁপাতে হাঁপাতে লেকের পাড়ে যখন গিয়ে পৌঁছোলাম, ততক্ষণে হেলিকপ্টার উড়ে গেছে লেকের মাঝখানে। পাড়ে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র বাহিনী। মেজর হুকুমৎ সিং নিরেট-মস্তিষ্ক নন। প্রকৃতই উর্বর-মস্তিষ্ক। তাই ডেপ্‌থ চার্জ জলে ফেলবার জন্যে বোট ভাসাননি। হেলিকপ্টার দিয়ে কাজ সারছেন। প্লেসিওসরাস-রূপী দানব-যন্ত্র আর আগুনের গোলাকে বিশ্বাস নেই। খামোকা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।

প্রফেসর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'স্টপ ইট! থামান! ডেপ্‌থ চার্জ ফেলবেন না! বারুদে আগুন দেবেন না!'

যাঁকে বলা হল, তিনি পাথরের মতো মুখ করে চেয়ে রইলেন উড়ন্ত কপ্টারের দিকে। সামরিক অফিসাররা হুকুম মানতে গিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে মার্চ করে এগিয়ে যায়। জলের তলায় বারুদে আগুন লাগল কিনা দেখার দরকার তার নেই। অর্ডার ইজ অর্ডার।

রেডিয়োতে তারস্বরে হুকুম দিলেন হুকুমৎ সিং, 'চার্জ!'

প্রফেসরের চিৎকার ডুবিয়ে বাজখাঁই গলায় হাঁক ছেড়েছিলেন মেজর। কপ্টারের গর্জন যেন ডুবে গেল সেই চিৎকারে। পরক্ষণেই একটার পর একটা ডেপ্‌থ চার্জ গিয়ে পড়তে লাগল লেকের নিস্তরঙ্গ জলে।

বিস্ফোরক-ভরতি পাত্রগুলো ফেলেই কাত হয়ে শূন্যে উড়ে যাচ্ছিল কপ্টার। কিন্তু পাঁচশো ফুট উঠতে না উঠতেই বিস্ফোরণ ঘটল জলের তলায়।

আমরা শুধু দেখলাম, অকস্মাৎ জল ফুলে উঠল ওপর দিকে। প্রথমে ফুলল ধীরগতিতে। যেন লেকের দু'হাজার কোটি টন জল আচম্বিতে প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়তে চাইছে, ভীষণ রাগে ফুলে উঠছে।

ডেপ্‌থ চার্জের বিস্ফোরণে জল তো এভাবে ফুলে ওঠে না। কোথায় গিয়ে আঘাত হেনেছে ডেপ্‌থ চার্জ?

জলপৃষ্ঠ ফুলছে। অতিকায় দানব-পৃষ্ঠের গা-ঝাড়া দেওয়ার মতোই আস্তে আস্তে ওপর দিকে ঠেলে উঠছে। মাঝের জল বেশি উঠছে, কিনারার জল কম উঠছে। তার পরেই

জলপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে একটা গোলক তীব্রবেগে ছুটে গেল হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে। কীসের গোলক, দূর থেকে বোঝা গেল না। কপ্টারে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম জিনিসটা কী।

জলের বল। প্রায় একশো ফুট ব্যাসের প্রকাণ্ড একটা গোলক স্রেফ জল দিয়ে তৈরি। আশ্চর্য সেই গোলক বিদ্যুদ্‌বেগে জল থেকে উঠেই নির্ভুল লক্ষ্যে গিয়ে আছড়ে পড়ল কপ্টারের ওপর।

প্রচণ্ড ধাক্কায় উড়ন্ত কপ্টার ছিটকে গেল প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে। সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জলগোলক ভেঙে গিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো চারিদিকে জল ছিটিয়ে বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ল লেকের জলে।

ওদিকে ভাঙাচোরা হেলিকপ্টারটা ডানাভাঙা পাখির মতোই পাক খেতে খেতে আছড়ে পড়ল মাইল কয়েক দূরে পাইনের মাথায়।

আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল, সমতল হয়ে গেল লেকের জলপৃষ্ঠ।

স্টিল শেলটারে বসে প্রফেসর বললেন, 'ইডিয়ট!'

অ্যামি বললে, 'জলের এত শক্তি?'

প্রফেসর আবার বললেন, 'ইডিয়ট!'

আমি বললাম, 'এখন উপায়?'

প্রফেসর বললেন, 'উপায় একটাই, ওদের এলাকা ছেড়ে সরে যাওয়া।'

'বলছেন কী প্রফেসর!'

'ঠিকই বলছি, দীননাথ। ওরা চায় না, এখানে কেউ থাকুক। ওদের কাছে পৃথিবীর মানুষ আর পৃথিবীর পশুপাখির মধ্যে কোনও তফাত নেই। তাই এত বড় জঙ্গলে একটা পোকা-মাকড় পর্যন্ত নেই। যে মানুষকে দেখেছে, তাকেও প্রাণে মেরেছে পিঠ ফাটিয়ে দিয়ে। এটাই কি আমাদের পক্ষে চরম হুঁশিয়ারি নয়? ঝড়ের রাতে আগুনে গোলা ফাটিয়ে সেন্ট্রিকে জ্যান্ত ইস্পাতের গায়ে লেপটে দিয়ে আবার সংকেতে জানিয়েছে আমাদের, 'সরে পড়ো ভায়া, সরে পড়ো। এ-তল্লাট ছেড়ে সরে পড়ো।"

স্বর্ণচক্ষু শক্ত করে অ্যামি বললে, 'আপনি দেশকে ভালবাসেন না। আপনার দেশের মাটিতে অন্য দেশ এসে ঘাঁটি বানিয়ে রয়েছে, আপনাদের সেখান থেকে মেরে-ধরে তাড়াচ্ছে আর আপনি কিনা পালাতে চাইছেন!'

'অন্য দেশ!' প্রফেসর একটু একটু করে রাগতে লাগলেন, 'অন্য দেশ কাদের বলছ? অন্য গ্রহ বলো।'

বাঁকা হেসে অ্যামি বললে, 'ওসব কল্প-বিজ্ঞানের ব্যাপার। আমরা খাঁটি বিজ্ঞান নিয়ে কারবার করি। আমি ব্রিটেনের মেয়ে বলেই পষ্টাপষ্টি বলছি, হয় চিন, নয় আমেরিকার স্পাই সায়েন্টিস্টরা লেকের জলে নিউক্লিয়র টেস্ট চালাচ্ছে।'

'রাশিয়াকে বাদ দিলে কেন?' ব্যঙ্গের সুরে বললেন প্রফেসর।

থমথমে মুখে প্রফেসরের বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ মুখের পানে তাকিয়ে থেকে আর কথা বাড়ানোর সাহস পেল না অ্যামি, বেরিয়ে গেল বাইরে।

গুম হয়ে বসে রইলেন প্রফেসর। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বললেন, 'ইডিয়ট!'

আমি কোনও কথা বললাম না।

যেন আপনমনে বলে চললেন প্রফেসর, 'ননসেন্স! ফু-উ-ল! স্টুপিড! প্রাকৃতিক শক্তিকে যারা কবজায় এনেছে তাদের সঙ্গে সামান্য গোলা-বারুদ নিয়ে শক্তির মহড়া দিতে যাচ্ছে। জলের টেম্পারেচার বাড়ে বলেই জল বাষ্প হয়ে উঠে মেঘ হয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। এই সহজ ব্যাপারটাই নিরেট মাথায় ঢুকছে না। বেল্লিকগুলোর হেঁড়ে মাথায় কিছুতেই এই সার কথাটা ঢোকাতে পারছি না। ভাবছে, স্টিল শেলটার বানিয়ে খুব নিশ্চিন্ত আছি। মূর্খ কোথাকার! যারা বাজ ফেলে পিঠ চৌচির করতে পারে, জলের গোলা ছুড়ে কপ্টার ভাঙতে পারে, আগুনের বল দিয়ে মানুষের পাটিসাপটা বানাতে পারে, ইচ্ছে করলে তারা বুলেট-প্রুফ শেলটারকে পাউডার বানাতেও পারে। কতরকম সংকেত করছে আমাদের সরে যেতে! তবু আক্কেল হচ্ছে না।'

তেরো. বোমাকেও যারা হজম করে

ভোররাত্রে প্রফেসর ডাকলেন আমাকে। আমি তৈরি হয়েই ছিলাম। আগের রাতেই পাহাড়ে চড়ার সরঞ্জাম রুকস্যাক আর হ্যাভারসাকে ভরে ক্যাম্প থেকে দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা খাঁজের মধ্যে রেখে এসেছিলাম। টিনের খাবার এবং দরকারি সব জিনিস ছিল থলির মধ্যে। প্রয়োজনমতো মাসখানেক যাতে দু'জনে পাহাড় ভেঙে যেতে পারি, তার প্রস্তুতি করে রেখেছিলাম রাতের অন্ধকারে।

ভোররাত্রে প্রফেসর এলেন। দু'জনে যেন ভোরের হাওয়া খেতে বেরিয়েছি, এইভাবে পায়ে পায়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রওনা হলাম পাহাড়ের দিকে। মিলিটারি প্রহরী দেখল, আমরা যাচ্ছি। ভাবতেও পারল না, আমরা পালিয়ে যাচ্ছি। ভাবতে পারলে বাধা দিত। কেননা, সেইদিনই নতুন কপ্টারে আমাদের এখান থেকে পাচার করার কথা।

হিম-পাহাড়ে ঘেরা দুর্গম এই অঞ্চল ছেড়ে পালাতে যাওয়া মানেই জেনেশুনে বিপদে ঝাঁপ দেওয়া। তাই পাহারার কড়াকড়ি ছিল না। আমরা বনের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম পাহাড়ের দিকে। খাঁজ থেকে পাহাড়ে চড়ার নাল-লাগানো লাঠি, বরফ-কুঠার আর জিনিসপত্র বার করলাম। শুরু হল পর্বতারোহণ।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চলে এলাম মাইল তিনেক দূরে। রুদ্র সরোবরকে এখান থেকে ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির মতো স্পষ্ট দেখা যায়। বড় বড় পাইনের মাথার ওপর দিয়ে শান্ত জল যেন আয়নার মতো চকচক করছে। কে বলবে, কল্পনাতীত এনার্জির ভাঁড়ার লুকোনো রয়েছে নিস্তরঙ্গ ওই জলরাশির আড়ালে?

প্রফেসর এইখানেই আস্তানা নিলেন। একটা গুহার মধ্যে জিনিসপত্র রেখে চেয়ে রইলেন রুদ্র সরোবরের দিকে। দু'চোখে ফুটে-ওঠা ভেতরের জ্বালা দেখে মনটা আমারও খারাপ হয়ে গেল। অভিযানের নায়ক নিজেই পলাতক। তাঁর কথা কেউ শোনেনি। তিনি কারও কথা শুনতে রাজি নন।

দুপুর নাগাদ দেখলাম, খানকয়েক অদ্ভুত-দর্শন উড়োজাহাজ দক্ষিণ দিক থেকে এসে সটান নেমে পড়ল জঙ্গলের বাইরে একটা খোলা জায়গায়। নামবার ধরনটাও অদ্ভুত। রানওয়ের কারবার নেই। সব এরোপ্লেনই আকাশে ওড়বার সময়ে রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে লাফিয়ে ওঠে শূন্যে, নামবার সময়ে রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই প্লেনগুলি সেভাবে নামল না।

বিশেষ এই প্লেনের কথা কোথায় যেন পড়েছিলাম। রানওয়ে বরাবর না-ছুটে খাড়াইভাবে ওপরে উঠে যায় এরা। বাড়ির ছাদে নামতে পারে, ছাদ থেকে ওপরে উঠতে পারে অনেকটা হেলিকপ্টারের মতো। অল্প জায়গায় ওঠা-নামার উপযোগী।

এয়ারফোর্স এই প্লেনই পাঠিয়েছে ছ'টি। দক্ষিণ দিগন্ত থেকে ছ'টি ফড়িঙের মতো উড়ে এসে নেমে পড়ল পায়ের তলায় পাইন জঙ্গলের কিনারায়।

প্রফেসর আর কোনও কথা বলছেন না। যা কিছু বলবার, কাল রাতে বলেছেন। এখন বোবা হয়ে গেছেন। এখন শুধু দেখছেন। দেখবেন বলেই পালিয়ে এসেছেন। দেখা যাক রুদ্র সরোবরে বোমা-বর্ষণের পরিণামটা কী হয়, ভিনগ্রহীদের সঙ্গে পৃথিবীবাসীদের এই প্রথম লড়াই কোনদিকে মোড় নেয়। এতদিন যা কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর কাহিনি ছিল, আজ তা সত্য হতে চলেছে, গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। তবে দুঃখের কথা, বিবদমান দুই পক্ষের একপক্ষ এখনও জানে না হানাদাররা পৃথিবীর কেউ নয়। তাই লড়াইয়ের পরিণতিটা কী হবে, ঠিক আঁচ করা যাচ্ছে না।

কাল রাতে প্রফেসর আমাকে সব বুঝিয়ে বলেছেন। বোঝানোর দরকার অবশ্য ছিল না। আমি ওঁর একান্ত ভক্ত। উনি যা বলবেন, তাই বেদবাক্য আমার কাছে।

অদ্ভুত প্লেন ছ'টা মর্তে অবতরণ করার কিছুক্ষণ পরেই নতুন আমদানি হেলিকপ্টারটা উঠে পড়ল শূন্যে। আমি জানি, অ্যামি ওয়ালেস আর শম্ভু দাস রয়েছে ওর মধ্যে। আমাদেরও থাকার কথা ছিল।

অ্যামি-র হয়েছে আরও বিপদ। দিল্লি থেকে কড়া হুকুম এসেছে, বিদেশিনী অ্যামি ওয়ালেসকে যেন আর একদণ্ডও ওখানে থাকতে দেওয়া না হয়। ইন্ডিয়ান হিমালয় নিয়ে যা কাণ্ড চলছে, বিদেশের কাউকে আর বিশ্বাস নেই। কে যে চর, আর কে নয়— তা বোঝা যাচ্ছে না। পাহাড়ে চড়ার নাম করে বিদেশি গুপ্তচররা ইন্ডিয়ান হিমালয় চষে ফেলছে। বৈজ্ঞানিক অভিযানের নাম করে অ্যামি ওয়ালেসও গিয়ে থাকতে পারে। সুতরাং—

সুতরাং চোখের সামনে সগর্জনে উড়ে গেল মিলিটারির কপ্টার। আমি আর প্রফেসর গুহার মধ্যে ঢুকে গেলাম। কারও চোখে পড়তে চাই না।

বিকেল গড়িয়ে এল। চারদিক অদ্ভুত নিস্তব্ধ। আকাশ বাতাস থমথম করছে। এমন সময়ে দূর থেকে কানে ভেসে এল এরোপ্লেনের গর্জন।

একে একে শূন্যে উঠছে সেই ছ'টি প্লেন। মাটি থেকে লম্বা লম্বা আকাশমুখো লাফ মেরে উঠে গেল শূন্যে। জঙ্গলের ওপর একপাক চরকিপাক খেয়ে তিরবেগে ছুটে গেল লেকের দিকে। একঝাঁক বোমা ফেলেই লেক পেরিয়ে উড়ে গেল ওপারের জঙ্গলের মাথায়।

কিন্তু জল আর সেভাবে ফুলে উঠল না।

রুদ্ধশ্বাসে বসে রইলাম আমরা। দূরবিনের মধ্যে দিয়ে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলাম জলগোলকের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। কিন্তু চেয়ে থাকাই সার হল। লেকের জলে বোমা পড়ে ডুবে গেল। একটু-আধটু জল ছিটকে উঠল। তার বেশি আর কিছুই হল না। কোনওরকম বিকার দেখা গেল না জলদানবের।

'জলদানব' শব্দটাই বোধহয় জুতসই। ডেপ্‌থ্‌ চার্জ খেয়ে জলকে যেভাবে ফুলতে দেখেছি, তা জলদানবকেই মানায়। গোটা লেকটাকে একটা জলদানব কল্পনা করলে ব্যাপারটা হয়তো আরও ভালভাবে বোঝা যাবে, রোমাঞ্চটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করা যাবে।

কিন্তু জলদানব বুঝি ঘুমিয়ে রইল।

ব্যোমযানের পাইলটরাও নিশ্চয়ই হতচকিত হয়ে গিয়েছিল ব্যাপার দেখে। ওরা আশা করেছিল, বোমাগুলো ডেপ্‌থ চার্জের মতোই প্রলয় সৃষ্টি করবে, জলের গোলা ছুটে আসবে, তারপর একটক্কর লড়াই হবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! জল স্থির, নিষ্কম্প।

রেডিয়োতে হুকুম গেল নিশ্চয়ই। আবার পাক খেয়ে লেকের অন্য ছ'টি জায়গায় একসঙ্গে ছ'টি মিজাইল নিক্ষেপ করে সাঁৎ করে লেক পেরিয়ে গেল যুদ্ধবিমান ক'টি।

এবার আর মামুলি বোমা নয়— ক্ষেপণাস্ত্র! জল ভেদ করে ছ'টি রকেট-বোমা ছ'টি ছুঁচের মতো ঢুকে গেল ভেতরে।

পাঁচশো ফুট জল ছিন্নভিন্ন করে তলদেশ স্পর্শ করতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু কই, বিস্ফোরণ তো ঘটল না, জল তো তিমিমাছের মতো ফুলে উঠল না! ছ'টি রকেট-বোমাকেও স্রেফ হজম করে নিল জলের তলার অজ্ঞাত বিভীষিকা!

থ হয়ে বসে রইলেন প্রফেসর। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি।

যুদ্ধবিমান এবার মরিয়া হয়ে গিয়েছে। মিনিট কয়েক পরেই আবার একপাক ঘুরে এসে নতুন ছ'টি জায়গায় নিক্ষেপ করে গেল ছ'টি মিজাইল।

এবারেও নিথর রইল জলপৃষ্ঠ।

প্লেন ছ'টি হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এল মাটিতে।

আধঘণ্টা পর শুরু হল ডাঙা থেকে মিজাইল-বর্ষণ। ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষেপণাস্ত্র উড়ে গিয়ে পড়ল পঁচিশ মাইল লম্বা লেকের বিভিন্ন অঞ্চলে।

কিন্তু একটিও ফাটল না।

চোদ্দো. অসম্ভব দৃশ্য

বোমা-বর্ষণ শেষ হয়েছে। ক্লান্ত সামরিক বাহিনী সন্ধের আগমনে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। রণ ছাড়াই রণক্লান্ত তারা। একতরফা বোমা-বর্ষণই সার হয়েছে, শত্রুপক্ষ সাড়া দেয়নি।

এতক্ষণ কাঠ হয়ে বসে ছিলেন প্রফেসর। সন্ধের অন্ধকার যখন গাঢ় হয়ে চেপে বসল, আকাশে তারার ঝিকিমিকি দেখা গেল, উনি তখনও ঠায় বসে রইলেন। ঠিক এইসময় আচমকা একটা অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি দেখা গেল— একটা চোখ-ধাঁধানো বিষম উজ্জ্বল ফ্ল্যাশ।

শুধুই ফ্ল্যাশ, বজ্র-গর্জন শোনা গেল না। পঁচিশ মাইল লম্বা লেকের ওপর দিয়ে যেন লকলক করে খেলে গেল অকল্পনীয় বিদ্যুতশিখা। পরমুহূর্তেই আবার সেই চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি— লক্ষ বিদ্যুতের ঝলসানি।

গুঙিয়ে উঠল বাতাস। দূর-দুরান্তর থেকে ভেসে এল চাপা গজরানি। পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র জন্তুর দল যেন অকস্মাৎ ছাড়া পেয়েছে। আকাশ-বাতাস মথিত করে দলে দলে ছুটে আসছে।

আসছে, ঝড় আসছে। খ্যাপা মোষের মতো হুহুংকারে ঝড় ধেয়ে আসছে। চারদিক থেকে উথালি-পাথালি বাতাস মাথা কুটতে কুটতে হাহাকার রবে ছুটে যাচ্ছে রহস্যময় রুদ্র সরোবরের দিকে।

পাহাড়ের ওপর থেকে তারার আলোয় ঠাহর করলাম বড় বড় পাইন গাছগুলো সুপুরি গাছের মতো নুয়ে নুয়ে পড়ছে লেকের দিকে। লেকের চারিদিকে যেখানে যত পাইন গাছ আছে, সব গাছই হেলে পড়ছে লেকের দিকেই। অন্ধকারে এর বেশি আর দেখা গেল না।

তার পরেই নামল বৃষ্টি— মুষলধারে বৃষ্টি। একে অন্ধকার, তার ওপর বৃষ্টি। এক হাত দূরেও কী ঘটছে, দেখার উপায় আর রইল না। এবারের বৃষ্টি কিন্তু শুধু লেকের ওপরে নয়, জঙ্গল ছাড়িয়ে পাহাড়ের ওপরেও ঝরছে। নায়গ্রা জলপ্রপাত যেন অবিরল ধারায় ঝরে পড়ছে বিরামবিহীনভাবে।

গুহার মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে আছি আমি আর প্রফেসর। অবর্ণনীয় ঠান্ডায় হাড় পর্যন্ত যেন অসাড় হয়ে আসছে।

প্রফেসর জড়সড় হয়ে বসে ছিলেন। বাইরের তাণ্ডব দেখে ভয় পেয়েছেন বলে নয়, অন্ধকার আর বৃষ্টিতে কিছু দেখা যাচ্ছে না বলে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টি ঝরল এইভাবে। স্লিপিং ব্যাগে ঝিমোচ্ছেন প্রফেসর। একসময় ঘুমিয়েও পড়লেন। বুড়ো মানুষ। কত আর ধকল সইবেন!

আমার চোখে কিন্তু ঘুম এল না। উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় ঘুমোনো যায় না। বেশ বুঝলাম, আচমকা এই ঝড়-বৃষ্টির একটা কারণ আছে। ঝড়-বৃষ্টি যারা সৃষ্টি করেছে তারা অকারণে এনার্জি খরচ করছে না। কে জানে, রহস্যজনক সেই বজ্রপাতে এতক্ষণে সৈন্যবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কিনা। কিন্তু মৃত্যু সামনে দেখলে ওরাও তো গোলাগুলি চালাত। সংঘর্ষ লাগতই। সেরকম আওয়াজ তো কানে আসেনি। এরকম অবিরল বৃষ্টিও জন্মে দেখিনি। পাহাড়ের গা বেয়ে যেভাবে ঢল নেমেছে, নীচের উপত্যকায় এতক্ষণে প্লাবন ডাকা উচিত।

রাত একটা নাগাদ বৃষ্টির তোড় কমতে লাগল। তারার আলো শুধু নয়, এবার চাঁদের আলোও দেখা গেল। গুহা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম, বৃষ্টির ঝালর দূরে সরে যাচ্ছে। বৃষ্টি এখনও পড়ছে, কিন্তু বৃষ্টিক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে লেকের ওপর। চাঁদের আলোয় বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। অসম্ভব সেই দৃশ্যও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দেখেও চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

পনেরো. উড়ন্ত লেক

দু'চোখ কচলে ফের তাকালাম। না, ঘুম-চোখে স্বপ্ন দেখছি না। এ-দৃশ্য প্রফেসরকে দেখানো দরকার। পেছন ফিরে ওঁকে ডাকতে গিয়ে দেখি, উনি আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুম-ভাঙা চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন উড়ন্ত লেকের দিকে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, উড়ন্ত লেক। আমি লেখক নই, ভাষার জাদুকর নই। যা দেখেছি, তা সোজাসুজি বলছি। নিশীথ রাত্রে হিমালয়ের বুকে আশ্চর্য সেই দৃশ্য দেখে আমার যা মনে হয়েছিল, তা স্পষ্টাস্পষ্টি বলছি। আমার মনে হয়েছিল, পঁচিশ মাইল লম্বা সুবিশাল লেকের দু'হাজার কোটি টন জলরাশি একটিমাত্র জলপিণ্ড হয়ে আকাশে উড়তে শুরু করেছে।

কল্পনা করুন, হে পাঠক, হে পাঠিকা, কল্পনা করুন সেই অবিশ্বাস্য অসম্ভব দৃশ্য। সে দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি বলেই বর্ণনা করতে সাহস পাচ্ছি। কানে শুনলে মনে করতাম উন্মাদের উন্মত্ত কল্পনা। দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করুন।

আমি পাগল নই, মিথ্যুক নই, উদ্ভট গল্পকার নই। আমি দেখেছি, দু'হাজার কোটি টন বিপুল জলরাশি একসঙ্গে আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে শূন্যে মেঘলোকের দিকে। সে মেঘ জমা হয়েছে কেবল রুদ্র সরোবরের ওপরেই, আর কোথাও নয়। আমি দেখেছি, দু'হাজার কোটি টন জলরাশি অখণ্ড পিণ্ডের আকারে শূন্যে উঠতে উঠতে অকস্মাৎ ফানেলের আকারে মেঘলোকের পানে ধেয়ে গিয়ে ব্যাঙের ছাতার আকারে চারধারে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে।

শুধু আমি কেন, বিস্ময়-বিস্ফারিত প্রফেসর নাটবল্টু চক্রও দেখেছেন, বিপুল জলরাশি চাঁদের আলোয় ঝকঝক করতে করতে মেঘপুঞ্জ ঠেলে নিয়ে উঠে গিয়েছে আরও উঁচুতে মহাকাশের দিকে। তারপর ছোট হতে হতে একসময় মিলিয়ে গিয়েছে তারা-ভরা আকাশের বুকে। চাঁদের আলো ঠিকরে গিয়েছে জলের ডেলা থেকে। ঠিক যেন বেঢপ সাইজের আর একটা চাঁদ ঝিকমিক করছে অনেকক্ষণ ধরে মহাশূন্যে। তারপর একসময় তারার মতো ছোট হয়ে এসেছে এবং একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে চোখের আড়ালে। সেইসঙ্গে মেঘ উধাও হয়েছে। বৃষ্টি ঝরেছে আরও কিছুক্ষণ। শেষে তাও থেমে গিয়েছে।

ঝকঝকে আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে দেখেছি, একটু আগেই যেখানে জল ছিল, এখন সেখানে বিশাল গহ্বর মুখব্যাদন করে রয়েছে। কিনারা থেকে অজস্র জলধারা প্রপাতের আকারে পাঁচশো থেকে ছ'শো ফুট গভীরে গুরুগম্ভীর নিনাদে আছড়ে পড়ছে তো পড়ছেই।

জল নেই। কিন্তু তলদেশ শূন্য নয়। অসংখ্য রঙিন উজ্জ্বল বল ভেসে বেড়াচ্ছে সুবিশাল জলহীন আধারে। প্রপাত থেকে জলকণা ঠিকরে আসার দরুনই বোধহয় পাতলা কুয়াশায় ছেয়ে রয়েছে তলদেশ। রামধনু রঙের অগ্নিগোলকগুলো আপনমনে হেলেদুলে হাওয়ায় ভর দিয়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছে সরোবর-গহ্বরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

আচম্বিতে দেখলাম, একটা রামধনু গোলক ভাসতে ভাসতে অন্যসব গোলককে ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। লেকের পাড় ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা উঠে আসার পরেই তিলমাত্র তাড়াহুড়ো না-করে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে গেল পাইনবনের মাথা দিয়ে।

আঁতকে উঠলেন প্রফেসর। অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল তাঁর গলা দিয়ে। সভয়ে হাত খামচে ধরলেন আমার।

পরক্ষণেই বুঝলাম, কেন অত ভয় পেয়েছেন।

পাইনবনের মাঝামাঝি আসতেই আগুনের ঝলক দেখলাম। বনের মধ্য থেকে তির্যক রেখায় আগুনের রেখা সাঁৎ করে ছুটে গেল ভাসমান গোলক লক্ষ্য করে। তার পরেই শুনলাম গম্ভীর কামান-নির্ঘোষ। কামান দাগছে সৈন্যবাহিনী।

উপর্যুপরি আরও কয়েকবার কামান-নির্ঘোষ ভেসে এল কানে। থমকে গিয়েছে রামধনু গোলক। স্থির হয়ে ভাসছে জঙ্গলের মাথায়। এক জায়গায় স্থির থাকার দরুন নিশ্চয়ই গোলন্দাজরা লক্ষ্যভেদও করতে পারছে।

কিন্তু রামধনু গোলক যেমন তেমনি রয়েছে। বিদীর্ণ হচ্ছে না, বিস্ফারিত হচ্ছে না, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে না। অন্ধকারে এর বেশি দেখতে পেলাম না বটে, কিন্তু আন্দাজ করতে পারলাম কামানের গোলাগুলো রামধনু গোলক ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তবে কিছুই করতে পারছে না। নীচ থেকে অগ্নিরেখা গোলকের দিকেই ধেয়ে যাচ্ছে, অথচ গোলক স্থির হয়ে ভাসছে।

সহসা প্রদীপ্ত হল রামধনু গোলক, বৃদ্ধি পেল তার উজ্জ্বলতা। পরমুহূর্তেই পেনসিলের মতো সরু রশ্মিরেখা সাঁ করে নেমে গেল নীচের দিকে।

একবার... দু'বার... তিনবার... চারবার।

কোনও শব্দ নেই, নির্ঘোষ নেই।

ঠিক যেন লেজাররশ্মি। রামধনু গোলকের মধ্যে থেকে মুহুর্মুহু অতিশয় সরু রশ্মিরেখা বিভিন্ন দিকে ছুটে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

নিস্তব্ধ হয়ে গেল অরণ্য। থেমে গেল কামানের আওয়াজ। শ্মশানের নৈঃশব্দ্য নেমে এল জঙ্গলে।

বুঝলাম। তিন মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সব বুঝলাম। কেন পিঠ ফেটে চৌচির হয়েছিল ম্যাক হেনরি আর জ্যাক ফেল্ডনের, তাও বুঝলাম। রামধনু রশ্মি নিঃসন্দেহে একই হাল করে ছেড়েছে সৈন্যবাহিনীর। নির্বোধ গোঁয়ার মেজর হুকুমৎ সিংও বোধহয় এতক্ষণে ফুটিফাটা পৃষ্ঠ নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন বনতলে।

কিন্তু না, লড়াই এখনও শেষ হয়নি। আচম্বিতে জাগ্রত হল নতুন গর্জন।

ছ'টি প্লেনের ইঞ্জিন চালু হয়ে গিয়েছে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে ছ'টি উড়ুক্কু যান লাফ দিয়ে উঠে পড়ল শূন্যে। ছ'দিক থেকে ঘিরে ধরে মিজাইল নিক্ষেপ করল রামধনু গোলক লক্ষ্য করে। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে উঠল ছ'টি রকেট-বোমার রুপোলি দেহ।

দূরবিনে চোখ রেখে স্পষ্ট দেখলাম সেই ভয়াবহ দৃশ্য।

আশ্চর্য লক্ষ্য বটে, অদ্ভুত হিসেব-জ্ঞান। শূন্য থেকে উড়ন্ত যানে চেপে এইরকম লক্ষ্যভেদ বড় একটা দেখা যায় না। রামধনু গোলক স্থির হয়ে ভাসছিল বলেই লক্ষ্যভেদ সম্ভব হল নাটকীয়ভাবে।

নাটকীয় দৃশ্যই বটে। ছ'টি মিজাইল নক্ষত্রবেগে ধেয়ে গিয়ে একযোগে আছড়ে পড়ল

রামধনু গোলকের ওপর। একযোগে, একইসঙ্গে, একই বিন্দুতে মিলিত হল ছ'টি রকেট-বোমা। এবং সেই বিন্দুটি হল রামধনু গোলক। একসাথে ফাটল ছ'টি রকেট-বোমা।

একটিমাত্র প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ-ঝলক দেখতে পেলাম, বিরাট ব্যাঙের ছাতার মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরে উঠে ছড়িয়ে পড়ল বনের মাথায়। একটু পরেই কানে ভেসে এল কানের পরদা-ফাটানো বিস্ফোরণ নির্ঘোষ। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল প্রলয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে গেল ধোঁয়া।

দেখলাম, রামধনু গোলক অবিকৃত।

অক্ষত, অম্লান, অব্যয়।

সহসা আবার প্রদীপ্ত হল গোলক দেহ। আবার জ্যোতির্ময় হল রামধনু বপু। আবার ভাস্বর হল রশ্মির উৎস।

একই সঙ্গে ছ'টি রামধনু-রশ্মি ঠিকরে গেল ছ'দিকে। উড়ন্ত প্লেন ছ'টি নতুন করে ব্যূহ-রচনা বা লক্ষ্যভেদের সুযোগই পেল না। একইসঙ্গে ছ'টি প্লেন ভীষণ শব্দে ফেটে গেল, নিমেষে অণু আর পরমাণু হয়ে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। কোথাও আর কোনও চিহ্ন রইল না।

রামধনু গোলক এবার টহল দিয়ে এল ছ'টি প্লেন যেখান থেকে শূন্যে উঠেছিল, সেইদিকটায়। সেখান থেকে ভেসে গেল বুলেট-প্রুফ শেল্টার নির্মিত হয়েছে যেদিকে, সেদিকে। জঙ্গলের আড়ালে লুকোনো গোল গম্বুজ লক্ষ্য করে বার কয়েক রামধনু রশ্মি নিক্ষেপ করে ভাসতে ভাসতে ফিরে গেল লেকের গহ্বরে।

বুলেট-প্রুফ শেল্টারগুলোর পরিণতি কল্পনা করতে পারলাম। টোট্যাল অ্যাটমাইজেশন— প্লেনগুলোর মতোই পরমাণুরূপে শূন্যে মিলিয়ে গেল নিশ্চয়ই দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো। সেইসঙ্গে ভেতরকার মানুষগুলোও।

আরও বুঝলাম কেন হেনরী আর জ্যাক বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পিঠ নিয়ে মারা যাওয়ার পর গাছপালায় আগুনের ঝলসানি দেখা যায়নি। পেনসিলের মতো অত্যন্ত সরু রশ্মিরেখা সীমিত বজ্রশক্তি হেনেছে ডালপালা পাতার ফাঁক দিয়ে। স্পর্শ করেছে শুধু পলায়মান মনুষ্য-কীটের পৃষ্ঠদেশ, আর কিছু নয়। মানুষগুলি সেক্ষেত্রে অ্যাটমে পরিণত হয়নি সেই কারণেই। একই রশ্মি নিয়ন্ত্রিত শক্তি নিয়ে কখনও জীবন্ত মানুষকে লেপটে দিয়েছে ইস্পাতের চাদরে, কখনও পিঠ ফাটিয়ে চৌচির করেছে, কখনও সবকিছু পরমাণুতে রূপান্তরিত করেছে।

ষোলো. অন্তরীক্ষের প্রভু

ভোররাতের মধ্যেই খালি হয়ে গেল লেকের শূন্য গহ্বর। রামধনু গোলকরা অবিশ্বাস্য গতিবেগে ঠিকরে গেল নয় দিকে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অগ্নি নৈর্ঋত বায়ু ঈশান— এই আটদিকে উল্কার মতো ধেয়ে তো গেলই, ঝাঁকে ঝাঁকে উধাও হল ঊর্ধ্বদিকেও। এতক্ষণ

যারা গজেন্দ্রগমনে ভেসে বেড়াচ্ছিল, অকস্মাৎ সংকেত পেয়ে যেন দল বেঁধে নিশ্চিত অভিসন্ধি নিয়ে তারা ধেয়ে গেল দিকে দিকে।

স্থবির হয়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর। সজল চোখে চেয়ে ছিলেন শান্ত স্তব্ধ বনভূমির পানে। গ্রহে গ্রহে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম পর্বে আমরা হেরে গিয়েছি। উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়। শেষটা যে কী হবে তাও আন্দাজ করতে পারছি।

আলো ফুটতেই প্রফেসরকে নিয়ে নেমে এলাম উপত্যকায়। সূর্য তখন উঠে পড়েছে। দেখলাম পাথর গলে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, বুলেট-প্রুফ শেল্টারের কোনও চিহ্ন কোথাও নেই। গলা পাথর দেখে আন্দাজ করে নিতে পারলাম পরিণতিটা।

বিমূঢ়ের মতো শ্মশান-উপত্যকায় বিচরণ করলাম কিছুক্ষণ, তারপর গিয়ে দাঁড়ালাম শূন্যগর্ভ লেকের কিনারায়। রামধনু গোলকরা সব অদৃশ্য।

পাড়ে অক্ষত রয়েছে একটিমাত্র বুলেট-প্রুফ শেল্টার। গায়ে লেপটে রয়েছে সেন্ট্রির চ্যাপটা দেহ। গোলক-অধিপতিরা যেন ইচ্ছে করেই এই নিদর্শনটি রেখে গিয়েছে তাদের অস্ত্রের মহিমার চাক্ষুষ প্রমাণস্বরূপ, যাতে দেখেও শিক্ষা হয় মূর্খ মনুষ্য-কীটদের।

হঠাৎ দূর থেকে আকাশপথে ভেসে এল হেলিকপ্টারের গর্জন। মিলিটারি কপ্টার। অ্যামি আর শম্ভুদাকে মাঝের একটি মিলিটারি ঘাঁটিতে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসছে।

এই কপ্টারেই সশরীরে সজ্ঞানে দেশে প্রত্যাবর্তন করলাম আমি এবং প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

এর পরের ঘটনা আপনারা কিছু কিছু শুনে থাকতে পারেন। অকস্মাৎ অদ্ভুত কাণ্ড দেখা যাচ্ছে পৃথিবী জুড়ে। অলৌকিক কাণ্ড ঘটছে দুনিয়ার সমস্ত বিমানক্ষেত্রের ওপর। রানওয়ে গলে যাচ্ছে, হ্যাঙ্গারে-থাকা বিমান শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, উড়ন্ত প্লেন যাত্রীসহ নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। অপার্থিব এই কাণ্ড ঘটছে পৃথিবীর সর্বত্র।

সব জায়গাতেই দেখা গিয়েছে আশ্চর্য রামধনু গোলক। একটা গোলক একাই একশো। পৃথিবীর কোনও বিধ্বংসী অস্ত্রই তাদের ধ্বংস করতে পারছে না। তারা আসে অতর্কিতে, বিমানবহর বিলীন করে দিয়ে নিঃশব্দে মিলিয়ে যায় দূরে। আর কোনও কিছুর ওপর তাদের আক্রোশ নেই। লক্ষ্য কেবল বিমানপোত আর বিমানক্ষেত্র।

পৃথিবীর কোথাও আর কোনও বিমানক্ষত্র অক্ষত নেই জানা গিয়েছে। পাতাল-ঘাঁটিতে যেসব যুদ্ধবিমান আছে, অক্ষত কেবল সেগুলোই।

রাষ্ট্রসংঘ অবশেষে কর্ণপাত করেছেন প্রফেসরের পরামর্শে। আকাশপথে মহড়া দিতে যাচ্ছে না কেউ রহস্যময় রামধনু গোলকদের সঙ্গে। মাটির তলায় যা আছে, তা থাকুক, বাইরে বার করার দরকার নেই।

এর পরেই বিকল হয়ে গিয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় বেতার ব্যবস্থা। যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। টিভি বা রেডিয়ো উপগ্রহের মাধ্যমেও আর খবর আদান-প্রদান করা যাচ্ছে না।

আকাশ-জয় সম্পূর্ণ হয়েছে ভিনগ্রহীদের।—বলেছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

বলেছেন, হে মূর্খ মানব, আর ওদের ঘাঁটাতে যেয়ো না। দীর্ঘদিন ধরেই রুদ্র সরোবরে ওরা বিপুল এনার্জি সঞ্চয় করেছিল বিশ্বজয় করবার অভিসন্ধি নিয়ে। দেখা যাচ্ছে, আকাশের দখল পেলেই ওরা নিশ্চিন্ত। তা-ই হোক। তারপর? হয়তো জলের দখলও চাইবে। কে জানে রুদ্রসরোবর ত্যাগ করে ওরা নতুন করে কোনও মহাসাগরের অতলে এনার্জির কারখানা বসিয়েছে কিনা। ভবিষ্যতে যাই থাকুক না কেন, এখন আর ওদের ঘাঁটাতে যেয়ো না। অনেক মূল্য দিতে হয়েছে— আর নয়।

আমাদের তৈরি হতে দাও। খোঁচাতে গিয়েছিলাম বলেই এই শিক্ষা পেতে হয়েছে— আর নয়। ওরা আকাশ দখল করেছে, ওরা প্রাকৃতিক শক্তিকে মুঠোয় এনেছে, পৃথিবীর আবহমণ্ডল এখন ওদের হাতের মুঠোয়, সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওদের অনন্ত শক্তির ভাঁড়ারকে কাজে লাগিয়ে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভাগটুকুও যদি বাড়িয়ে দেয়, হয় হিমযুগ আসবে, না হয় সুমেরু-কুমেরুর বরফ গলে গিয়ে পৃথিবীর সব জনপদ ডুবে যাবে।

তার চাইতেও ভয়ংকর কাণ্ড ঘটতে পারে। আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রের ভাঁড়ারে আগুন লাগতে পারে। পৃথিবীর সর্বত্র শক্তিশালী রাষ্ট্ররা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি রেখেছে— বোতাম টেপামাত্র উড়ে গিয়ে পৃথিবীর অন্যদিকের দেশ উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। ধরা যাক যদি এরা সে খবর পায়? একযোগে সব ক'টা পাতাল-বন্দি ক্ষেপণাস্ত্রকে ফাটিয়ে দেয়?

পৃথিবীর শেষ দিন কিন্তু সেইদিনই।

সুতরাং ঘাঁটাতে যেয়ো না, হে মূর্খ পৃথিবীবাসী, লিলিপুট-শক্তি নিয়ে অমিত-শক্তিমানদের খোঁচাতে যেয়ো না। তৈরি হও। গোপনে তৈরি হও। এখনও সময় আছে।

তৈরিই হচ্ছে পৃথিবীবাসী।
তৈরি হচ্ছে চরম সমরাস্ত্র।
বানাচ্ছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।
সে আর এক কাহিনি।...

অ্যাকুইলার আস্পর্ধা

সব কথা সবাইকে বলা যায় না। হাস্যকর এই কাহিনিটাও লিখব কি না, এই নিয়ে দোটানায় পড়েছিলাম। তারপর ভাবলাম, তোমাদের সাবধান করা দরকার।

বঙ্গোপসাগরে গোলমাল ঘটলে প্রায়ই সাইক্লোন হানা দেয় কলকাতায়। এমনি এক সাইক্লোনের রাত্রে আমি আর প্রফেসর মুখোমুখি বসে মানুষের মতো রোবট সৃষ্টি সম্ভব কি না আলোচনা করছি, এমন সময়ে ঘরের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল।

দরজাটা অবশ্য দোতলার বারান্দার দরজা। সাইক্লোনের উৎপাতে দরজা খুলেছে মনে করে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় শূন্য থেকে টুপ করে একটা মূর্তি লাফিয়ে নেমে পড়ল বারান্দায়। সেই সঙ্গে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ ছাপিয়ে একটা অদ্ভুত গুনগুন আওয়াজ শুনলাম। আর একটা তীব্র কমলা রঙের আলোর ঝলকানিও দেখলাম। বিদ্যুৎ চমকাল নিশ্চয়। কিন্তু বিদ্যুৎ যে কমলা রঙের হয়, জানা ছিল না।

অদ্ভুত মূর্তিটা গটগট করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল আমাদের দু'জনের মাঝখানে। লোকটাকে একটা আস্ত সাদা কুমড়ো বললেই চলে। লিকলিকে সজনে ডাঁটার মতো হাত আর পা বেরিয়ে আছে যেন কুমড়োর গা থেকে। কুমড়োর মাথায় সবুজ তরমুজের মতো গোল একটা মুণ্ড। কালো জামের মতো দুটো চোখ। নাকখানা জামরুলের মতো সাদা এবং তেকোনা। মুখবিবর পটলের মতো। মুখ হাঁ করতে দেখলাম, দাঁতগুলো নীল রঙের গোল নুড়ির মতো। মাথায় চুলটুল কিচ্ছু নেই— একেবারে তেলতেলে। ব্রহ্মতালু থেকে দুটো অ্যান্টেনা কেবল বেরিয়ে আছে টেলিভিশনের রুম-অ্যান্টেনার মতো দু'দিকে।

মূর্তিটা নিরাবরণ মনে হলেও আসলে একটা টাইট স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মতো খোসা মুড়ে রেখেছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

হাতে একটা কালো বাক্স— স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বলেই মনে হল।

প্রফেসর বললেন, 'অন্য গ্রহ থেকে আসা হচ্ছে দেখছি।'

গলায় ঝোলানো মাদুলিটা আলোক-বিচ্ছুরণ করল প্রফেসর কথা বলতেই— একটা কোঁ-কোঁ-ক্রিং-ঘং আওয়াজ শুনলাম। সজনে ডাঁটার মতো হাতে মাদুলি ধরে কী সব টেপাটেপি করতেই থেমে গেল বিদঘুটে আওয়াজটা।

লোকটা বললে, 'তর্জমা-যন্ত্রের টিউনিং করতে যেটুকু সময় গেল, আর বেশি সময় নষ্ট করব না। আমার ভাষা বুঝতে এখন কষ্ট হচ্ছে কি?'

'না,' বললেন প্রফেসর।

লোকটা বললে, 'আজ রাত ঠিক বারোটার সময়ে আকাশের দিকে চাইলে পুব দিগন্তে যে অ্যাকুইলা তারকামণ্ডলী দেখতে পাবে, আমি আসছি সেইখান থেকে।'

'কী মতলবে?'

'কয়েক লক্ষ বছর ধরে এই পৃথিবী গ্রহটাকে নিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম। পৃথিবী তখন খাঁ খাঁ করছিল। প্রাণ ছিল না। আমরা প্রথম প্রাণ সৃষ্টি করলাম। পৃথিবীর উপাদান থেকেই তৈরি করার পরে দেখতে লাগলাম তাদের কাণ্ডকারখানা। একটা মাত্র কোষ বানিয়েছিলাম প্রথমে। এককোষী প্রাণী থেকে তৈরি হল বহুকোষী প্রাণী। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সৃষ্টি হল অনেক ধরনের প্রাণী। তাদের কেউ গরমে বাঁচে, কেউ ঠান্ডায় বাঁচে, কেউ অক্সিজেনে বাঁচে, কেউ অক্সিজেন ছাড়াই বাঁচে। এরকম বদখত প্রাণী আমরা চাইনি। মহাশূন্য থেকে জীবাণু এনে ছড়িয়ে দিলাম। প্রাণীগুলো জীবাণুদের সঙ্গে মানিয়ে নিল খুব সহজেই। কেউ হল তাদের বন্ধু, কেউ হল শত্রু। লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিবর্তনের পরে দেখলাম এদের মধ্যে একটা প্রাণী অন্যসব প্রাণীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে পৃথিবীটাকেই কবজায় এনে ফেললে— প্রায় আমাদের সমান সমান হয়ে যাচ্ছে দেখে ঘাবড়ে গেলাম। তরপর মহাকাশে তারা যখন স্পেসশিপ পাঠাল তখন ঠিক করলাম, আর নয়— এদের নমুনাকে আমাদের তারকামণ্ডলীতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, এদের কোষের আর মস্তিষ্কের গঠন কদ্দুর পৌঁছেছে। আমাদের তারকামণ্ডলীতে হানা দেওয়ার মতো বুদ্ধি আর জ্ঞান যদি অর্জন করে ফেলে থাকে, তা হলে এক্সপেরিমেন্ট খতম করে দেব।'

'মানে, পৃথিবীর প্রাণ সংহার করবে?' সহজভাবে বললেন প্রফেসর।

'হ্যাঁ।'

'প্রাণীহত্যা করা মহাপাপ।'

'প্রাণী? তোমাদের ভাষায় যারা প্রাণী, আমাদের ভাষায় তারা রোবট।'

'রোবট!'

'হ্যাঁ। পৃথিবীর প্রত্যেকেই রক্তমাংসের রোবট। আমরাই বানিয়েছিলাম। পজিটিভ ইলেকট্রনের নাম নিশ্চয় শুনেছ। এককথায় যাকে বলে পজিট্রন। পজিট্রনের 'মাস্' বা ভর ইলেকট্রনের সমান, কিন্তু চার্জটা পজিটিভ। সেই পজিট্রন আর প্রোটোপ্লাজম দিয়ে তৈরি রোবট তোমরা, ধাতু আর বিদ্যুৎ দিয়ে নয়। তোমরা অবশ্য শুনেছি ইলেকট্রন দিয়ে রোবট বানাচ্ছ— ঠিক আমাদের উলটো পথে গিয়ে অনেক অদ্ভুত আবিষ্কার করে ফেলছ। কিন্তু তোমাদের দেহ-যন্ত্রটার দিকে একটু নজর দিলেই খেয়াল হত তোমাদের মতো আদর্শ রোবট আর হয় না। কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলছ দেখে তোমাদের ক্ষমতার দৌড় দেখতে এসেছি। বেগতিক দেখলে নতুন রোবট বানাব।'

'অত সোজা নয়। আমাদের তৈরি রোবট যেমন আমাদের টেক্কা মারতে আরম্ভ করেছে, তোমাদের তৈরি এই রোবটরাও এক হাত নেবে তোমাদের। ভাল চাও তো সরে পড়ো।'

'যাওয়ার আগে তোমাকে নিয়ে যাব,' বলে কালো বাক্সটার গায়ে আবার কী টেপাটেপি করল লোকটা। অমনি বাক্সটা হুহু করে বেড়ে গিয়ে বড়সড় একটা খাঁচার আকার ধারণ করল চোখের সামনেই।

প্রফেসর বললেন, 'খাঁচায় পুরবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে?'

'নিশ্চয়। পৃথিবীতে তুমিই এখন সবচেয়ে বজ্জাত রোবট। অনেক আবিষ্কার করেছ— আরও অনেক কিছু করার ফিকিরে আছ। সব খবর নিয়েই এসেছি।'

প্রফেসর যেন ভারী মজা পেলেন, 'দীননাথকেও তা হলে নিয়ে চলো। গল্প লিখবে তোমাদের নিয়ে।'

'গল্প লেখে? ছ্যাঃ-ছ্যা!! তার মানেই তো থার্ড ক্লাস রোবট। দরকার তোমাকেই। ঢুকে পড়ো তো ভেতরে।'

'যদি না-ঢুকি?'

'বাইরে স্পেসশিপ ভাসছে— চুম্বকের টানে উড়িয়ে নিয়ে যাব।'

ঠিক এই সময়ে বিদ্যুৎ-ঘাটতি ঘটল আমাদের অঞ্চলে। দপ করে নিবে গেল ঘরের আলো।

অ্যাকুইলা তারামণ্ডলীর আগন্তুক ভাবল বুঝি, এটা তাদেরই তৈরি রোবটদের মারণাস্ত্র। অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ একটা আর্তনাদ শুনলাম। বাইরের কমলা আলোটা সেই সঙ্গে জোর হয়ে উঠতেই দেখলাম বিদ্যুৎরেখার মতো কুমড়োদেহী মূর্তিটা দরজা দিয়ে গলে গিয়ে ঠিকরে গেল আকাশে। মিলিয়ে গেল কমলা রং। জেগে রইল কেবল আকাশের বিদ্যুৎ আর ঝড়ের হাহাকার।

আলো জ্বলে উঠেছিল পরক্ষণেই। দেখলাম, খাঁচাটাকে পর্যন্ত নিয়ে পালিয়েছে অ্যাকুইলার আগন্তুক।

আবার কবে আসবে, সেই প্রতীক্ষায় আছি আজও। ওকে দেখলেই নির্ঘাত হাসি পাবে তোমাদের— কিন্তু ঘরের আলো-টালোগুলো ঠিক সেই সময়ে যদি নিভে যায় লোড-শেডিং-এর দৌলতে, তা হলে রগড় দেখে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে তোমাদের প্রত্যেকের!

আস্পর্ধাটা দেখেছ? বলে কিনা আমরা রোবট!

সোনা আর চুনির শহর

আজ থেকে ২০০ বছর পরে কি তেপায়া রোবটরা রাজত্ব করবে পৃথিবীতে?

ক্যামেরার তিন-পায়া স্ট্যান্ডের মাথায় যদি একটা বাটি উপুড় করে বসানো হয় এবং সেই বাটির গায়ে সারি সারি জানলা থাকে, তার নীচ থেকে তিনটে ধাতুর শুঁড় কিলবিল করে ঝুলতে থাকে নীচে— তা হলে যে জিনিস দাঁড়ায়, ত্রিপদ দানোকে দেখতে অবিকল তাই। শুধু যা আকারে বড়। বেজায় বড়। বারোতলা বাড়ির সমান।

প্রতিটি ধাতুর পায়ে তিন ভাগে তিনটে কবজা অর্থাৎ হাঁটু। সেই হাঁটু ভেঙে অদ্ভুতভাবে টলমল করতে করতে ত্রিপদ দানো তেড়ে এল আমার দিকে। কিলবিলে শুঁড় তিনটের একটা আর একটু হলে ধরে ফেলত আমাকে। কিন্তু এক হ্যাঁচকায় প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আমাকে টেনে নিলেন টাইম মেশিনের মধ্যে। ঝাঁ করে মেশিন চালিয়ে বোঁ করে আমরা মিলিয়ে গেলাম বাতাসে! ত্রিপদ দানোর শুঁড়টা যেন বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে— ধরতে পারল না।

কপালের ঘাম মুছে বললাম, 'প্রফেসর, এ কোথায় এলাম?'

'ভবিষ্যতে।' বললেন প্রফেসর।

হ্যাঁ, ভবিষ্যতে। পৃথিবীর ভবিষ্যতে। টাইম মেশিন বানিয়েই প্রথমে অতীতে ঘুরে এসেছিলাম আমি আর প্রফেসর। তারপর পালিয়ে এলাম ভবিষ্যতে।

কিন্তু পালিয়ে এসে এ কী চেহারা দেখলাম পৃথিবীর? টাইম মেশিন থেকে নেমে প্রথমে দেখেছিলাম অনেক দূরে একটা গোল গম্বুজ। যেন টকটকে লাল চুনিপাথর দিয়ে ছাওয়া একটা গোল গম্বুজ। তলায় সোনার রিং। সূর্যের আলো রক্তরশ্মি হয়ে ঠিকরে যাচ্ছে সেই গম্বুজের মাথা থেকে— ঝকঝক করছে সোনালি পাঁচিল। চারপাশে কিছু নেই। ফাঁকা মাঠ। মাইল কয়েক শুধুই প্রান্তর। মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে একটা নদী। জলধারা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এসে অদৃশ্য হয়েছে চুনি গম্বুজের মধ্যে। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ, থমথমে।

এই পর্যন্ত দেখার পরেই হাওয়ায় একটা আলোড়ন অনুভব করেছিলাম। মনে হল পায়ের তলায় মাটি যেন কাঁপছে। চাপা ধুপধাপ আওয়াজ ভেসে এল কানে। ঘাড়

ফিরিয়েই দেখলাম ত্রিপদ ধাতব-দানোকে। অদ্ভুতভাবে দৌড়ে আসছে— কিন্তু বেশ বেগে।

তার পরের ঘটনা আগেই বলেছি।

প্রফেসর ভুরু কুঁচকে যন্ত্রপাতির দিকে চেয়ে ছিলেন। একমাস এগিয়ে গেলাম। মানে, আরও একমাস ভবিষ্যতে গিয়ে আবার মেশিন থামালাম। থামিয়েই আশেপাশে দেখে নিলাম কেউ আছে কিনা। সেই কিম্ভূতকিমাকার মেট্যাল রোবটগুলো ধারেকাছে নেই বটে— তবে দূরে দূরে আছে। অনেক দূরে দেখলাম রক্তলাল গম্বুজটার তিন দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে বারোতলা উঁচু দানব।

টাইম মেশিন থেকে নামলাম। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে দেখছি ধাতুর রাক্ষসদের, এমন সময়ে আমার পায়ের তলা থেকে উঠে দাঁড়াল একটি ছেলে। মাথায় লাল রঙের ধাতুর টুপি খুলির ওপর এঁটে বসানো। চোখ দুটো ছুরির মতো তীক্ষ্ণ। পরনে ময়লা জামা আর হাফপ্যান্ট। চোখের কোলে কালি। কিন্তু খুব মজবুত গাঁট্টাগোট্টা শরীর। মাথায় বেঁটে হলেও বয়সে আমার সমান।

অবাক হয়ে ছেলেটা আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে চাপা গলায় কী যেন বলল। একবর্ণ বুঝলাম না। কিন্তু জবাব দিলেন প্রফেসর! উনি যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি। সেই অদ্ভুত ভাষাতে কথা বলতেই ছেলেটি তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। হাসি হাসি ফোকলা মুখের পানে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে কী বলতেই প্রফেসর হাত তুলে লম্বা ঘাসের আড়ালে প্রায়-অদৃশ্য টাইম মেশিনটা দেখালেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইল ছেলেটি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেই দিকে।

সেই ফাঁকে প্রফেসর তোবড়ানো গাল আরও তুবড়ে হাসলেন আমার দিকে চেয়ে। বললেন খাটো গলায়, 'স্প্যানিশ বলছে ছেলেটা। স্পেনের ছেলে।'

'স্পেনের ছেলে! এখানে কেন?'

'সেইটাই জানতে চাই।' বলে ছেলেটার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর। লাল ধাতুর টুপিতে হাত বুলোতে বুলোতে ছেলেটা তখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছে টাইম মেশিনের দিকে। যেন এমন কলকবজা জন্মে দেখেনি।

মৃদু কণ্ঠে কথা শুরু করলেন প্রফেসর। পরে শুনেছিলাম, উনি বুঝিয়ে বলছিলেন টাইম মেশিন কাকে বলে। এ-মেশিনে চেপে ইচ্ছেমতো অতীতে বা ভবিষ্যতে কীভাবে বেড়িয়ে আসা যায়। মাথার ওপরে হেলিকপ্টারের মতো ওই পাখা চালিয়ে আকাশপথে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। তলার ওই প্যাড জলে ভাসে— দরকার মতো হোভারক্র্যাফট-এর স্পিডে জল কেটে এগোতেও পারে।

এই পর্যন্ত শুনেই ছেলেটি চকিত চোখে দূরের ত্রিপদ রোবট আর আকাশের সূর্যের দিকে আঙুল তুলে দ্রুতস্বরে কী বলতেই প্রফেসর ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'দীননাথ, এসো, দিনের বেলা এ জায়গা নিরাপদ নয়। বারো ঘণ্টা এগিয়ে যাই। রাত্তিরে পৌঁছে এদের ঘাঁটিতে উড়ে যাব।'

বোবা হয়ে মেশিনে উঠে বসলাম। সঙ্গে ছেলেটা। বুঝলাম, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে তিন-ঠেঙে ওই বারোতলা কলের দৈত্যদের দেখে কেন মানুষ এত ভয়ে জুজু হয়ে আছে, সে রহস্য এবার জানা যাবে।

মেশিন চালিয়ে বারো ঘণ্টা আরও ভবিষ্যতে গেলাম। মানে, হঠাৎ রাত হয়ে গেল— সূর্য চক্ষের নিমেষে ডুবে গেল। ত্রিপদ দানোদের আর দেখতে পেলাম না।

ছেলেটির সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষাতেই বেশ গল্প করছেন প্রফেসর। বুড়োর বিদ্যে অনেক। বড় বৈজ্ঞানিকই শুধু নন— ভাষাবিদও বটে। অথচ বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পাগল-ছাগল কেউ হবে।

ঘটাংঘট করে সুইচ টিপে দিলেন প্রফেসর। ভ্রমর গুঞ্জন শুনলাম মাথার ওপর। প্রপেলার ঘুরছে। সোজা মেঘের কোলে উড়ে গেল টাইম মেশিন। ছুটে চলল পুবদিকে। সমস্ত রাত উড়ে গিয়ে ভোরের দিকে যেখানে নামল তার চারধারে পাহাড়ের পাঁচিল। কালো পাহাড়। মাঝখানে অজস্র গুহা। পিলপিল করে অনেক ছেলে বেরিয়ে এল সেই সব গুহা থেকে মেশিনের আওয়াজে। হাতে পাথর আর লাঠি। চোখে ভয় আর বিস্ময়। কিন্তু চারদিক থেকে ঘিরে ধরল মারমুখো ভঙ্গিমায়। লাফ দিয়ে নামল স্প্যানিশ ছেলেটা। ছুটে গেল তাদের দিকে।

প্রফেসর ইঞ্জিন বন্ধ করে আমাকে বললেন, 'এই হল কালো পাহাড়। এদের ঘাঁটি। এইখান থেকেই ওরা প্ল্যান করছে প্লায়াডিস আতঙ্কদের ধ্বংস করার।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। পরে প্রফেসরই বুঝিয়ে দিলেন প্লায়াডিস আতঙ্ক কারা, লাল রঙের ওই গম্বুজ কীসের এবং তেপায়া রোঁবট কাদের অনুচর। তার আগে অবশ্য দেশ-বিদেশের নানা রঙের নানা মুখের ছেলেরা হইহই করে আমাদের নিয়ে গেল একটা গুহায়।

সব কথা শুনলাম প্রফেসরের মুখে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। মন কিছুতেই মানতে চাইল না সেই ভয়াবহ সত্য। এ কি সম্ভব? আমরা মাত্র দুশো বছর এগিয়েছি বিংশ শতাব্দী থেকে। কিন্তু এই দুশো বছরের মধ্যেই পৃথিবীকে পদানত করেছে অন্য গ্রহের জীবরা। তাদের জীবই বলব— কারণ তারা মানুষ নয়। তাদের চোখে কেউ দেখেনি। দেখেছে কেবল এই তেপায়া ভয়ংকরদের। এরাই মানুষ জাতটাকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে আজ একশো বছর ধরে।

হ্যাঁ, একশো বছর ধরে। একশো বছর আগে প্লায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছোল এই তেপায়া দানবরা। চোদ্দো বছর বয়েসের ছেলেদের ধরে ধরে মাথায় পরিয়ে দিল লাল টুপি। ধাতুর টুপি। ওই বয়েসের পর খুলি আর বাড়ে না। কিন্তু ধাতুর টুপি এঁটে বসে গেল মাথার মধ্যে। নিজে থেকে আর খোলা যেত না। ও টুপি যাদের মাথায় আছে, তারাই তেপায়া দানবদের হুকুমের দাস। স্বাধীন চিন্তাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি পর্যন্ত নেই। তেপায়া দানবদের মনিব বলে মানে। বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতাও নেই। কারণ, ওই টুপিগুলো নিছক টুপি নয়— মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র। ওই টুপির মধ্যে দিয়ে তেপায়া দানবদের ইচ্ছেই মস্তিষ্কের কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়ে যেত বেচারিদের। নিজেদেরকে উৎসর্গ করত দানব-সেবায়, জীবন পর্যন্ত দিত মুখটি বুজে।

একশো বছর ধরে এইভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত মানুষদের পায়ের তলায় রেখেছে দানবরা। কলের দানব হয়েও রক্তমাংসের মানবদের ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে শুধু ব্রেন কন্ট্রোল করে। এই একশো বছরে তারা তিনটে ঘাঁটি বানিয়েছে ভূমণ্ডলের তিন অঞ্চলে। ঠিক যেন একটা ত্রিভুজের তিন কোণে। এমন একটি ঘাঁটিরই একটি আমরা দেখেছি টাইম মেশিন থেকে নেমেই। সোনার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, চুনির মতো টকটকে লাল গম্বুজ দিয়ে ঢাকা। ঘাঁটিগুলির মধ্যে কী আছে কেউ দেখেনি। কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের ব্রেনকন্ট্রোল যে ঘাঁটি তিনটে থেকেই হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

লাল গম্বুজের ভেতরে যায় এই তেপায়া দানবরা। আর বছরে একবার যায় কিছু শক্তসমর্থ ছেলে। গম্বুজের সামনে খেলাধুলার আসর বসে। চারিদিকে পাহারা দেয় বারোতলা উঁচু কলের দানোরা। প্রতিযোগিতায় সবাইকে হারিয়ে যারা সেরা হয়, তাদেরকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে গম্বুজে ঢুকে যায় দানবরা। আর ফিরিয়ে দেয় না। বছর বছর অত ছেলে যায় ভেতরে, কিন্তু কেন ফিরে আসে না— সে-খবর কেউ রাখে না। রাখার মতো ইচ্ছেও মগজে আসে না। কয়েকজনের ছাড়া। এরা তেপায়া দানোদের খপ্পর থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর ফন্দি এঁটেছে। দানোদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যে চোদ্দো বছরের আগেই মাথায় নকল টুপি এঁটে নিয়েছে। মিথ্যে টুপি দেখে দানবরাও ধরতে পারে না। তাই এই ক'জনের ব্রেনের ওপর খবরদারিও হয় না। এরা স্বাধীন চিন্তা করতে পারে।

স্পেনের ছেলেটি এদেরই একজন। কালো পাহাড় এদের গোপন ঘাঁটি। সারা পৃথিবী থেকে এরা জড়ো হয়েছে এই কালো পাহাড়ে। উদ্দেশ্য চোরা গোপ্তা হেনে কলের দানবদের অকেজো করে দেওয়া। ব্রেন-কন্ট্রোলের ওই রহস্য নিকেতন তিনটে ধ্বংস করে দেওয়া।

তার আগে দরকার রহস্যপুরীর অন্দর দেখে আসা। সে-কাজও সমাধা হয়েছে দীর্ঘদিনের চেষ্টায়। ছদ্ম টুপি পরা ছেলেরা বাৎসরিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে, প্রথম হয়েছে এবং ভেতরে ঢুকেছে। ধাতুর শুঁড় দিয়ে একে একে স্বাস্থ্যবান সুন্দরদেহী ছেলেগুলোকে তুলে নিয়েছে তেপায়া দানবরা, মাথার গোলাকার গম্বুজ খুপরিতে বসিয়েছে এবং অদৃশ্য হয়েছে রহস্যময় চুনিগম্বুজের ভেতরে।

দূর থেকে গম্বুজগুলো ছোটই মনে হয়েছিল। কিন্তু কাছে আসার পর দেখা গিয়েছিল এক একটা গম্বুজ খানকয়েক গড়ের মাঠের মতো বিরাট। শেষ দেখা যায় না— এত বড়। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লাল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ছেলেদের। সেই সঙ্গে মেরুদণ্ড নুয়ে পড়েছিল প্রচণ্ড ভারে। আচমকা ভয়ানক ভারী মনে হয়েছিল নিজেদের— পা পর্যন্ত তোলা যায়নি। কয়েকজন তো ককিয়ে উঠে পড়েই গিয়েছিল। যন্ত্রণার সেই কিন্তু শুরু। কেননা, অসহ্য গরমে মনে হয়েছিল, যেন গা ঝলসে যাচ্ছে। যেন আগুনের হলকা বইছে। শুকনো গরম নয়— তাই ঘেমে নেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নেতিয়ে পড়েছিল অমন শক্ত ছেলেরাও।

ওদের নিয়ে যাওয়া হল একটা কামরায়। সেখানে শ্রান্তক্লান্ত একজন বেশি বয়েসের ছেলে এগিয়ে এসে সবাইকে পরিয়ে দিলে নতুন জামা আর প্যান্ট। সব লাল রঙের। আর দিলে নাকে পরার জন্যে একরকম প্যাড। এই ঘরের বাইরে গেলেই শুরু হবে দানবদের

আসল ঘাঁটি। মালিকরা থাকেন সেখানে। তাঁরা যে বাতাসে নিশ্বাস নেন, সে বাতাসে মানুষ বাঁচে না। তাই মালিকদের সেবা করার সময়ে নাকে পরতে হবে এই প্যাড। নিজেদের কোয়ার্টারে ফিরে এলে প্যাড খুলে ফেলতেই হবে। গোলামদের কোয়ার্টারের বাতাসে মানুষ বাঁচে।

'গোলাম', 'মালিক', 'সেবা' ইত্যাদি শব্দগুলোর মানে বোঝা গিয়েছিল একটু পরেই। নাকে প্যাড পরিয়ে নিজেদের দেহভারেই নুয়ে পড়া ছেলেগুলোকে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল রাস্তা দিয়ে। সোনা আর চুনির শহর দেখে তাজ্জব হয়ে গেল ছেলেরা। বিশাল শহর। রাস্তাগুলো কখনও সোজা নয়— এঁকেবেঁকে বাড়ির কোণ ঘেঁষে উধাও দূরে... অনেক দূরে। বাড়িগুলো সব পিরামিডের মতো। রাস্তায় গাড়ি চলছে। পিরামিডের মতন গড়ন গাড়িগুলোর। তলায় চাকা নেই। ঈষৎ কাত হয়ে একটিমাত্র কিনারায় ভর দিয়ে যেন পিছলে যাচ্ছে মসৃণ রাস্তা দিয়ে। দম আটকানো গরমে আইঢাই করতে করতে এবং রক্তাভ আলোর মধ্যে কোনওমতে আশ্চর্য এই শহর দেখতে দেখতে ওরা এসে পৌঁছোল বিরাট পিরামিড হলঘরের মধ্যে।

দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল সার বেঁধে। কোমর টনটন করতে লাগল, শিরদাঁড়া যেন ভেঙে পড়তে চাইল, তবুও দাঁড়িয়ে রইল ওদের শেষ পরিণতি দেখার জন্যে।

কিন্তু শেষের তখনও দেরি। তাই একটু পরেই সারি দিয়ে যারা ঘরে ঢুকল, অতি বড় দুঃস্বপ্নেও তাদের কল্পনা করা যায় না। কোনও জীব যে এত কদাকার ও কিম্ভূতকিমাকার হতে পারে, তা না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ছদ্মটুপি পরা ছেলেগুলি চকিতে বুঝে নিলে, দানবদের ভেতরে বসে গাড়ির মতো তাদের চালিয়ে নিয়ে যায় কুৎসিতদর্শন এই জীবগুলোই, সোনা আর চুনির মতো লাল গম্বুজ শহরের ভেতরে বসে কোটি কোটি মানুষের মগজ নিয়ন্ত্রণ করছে এই জীবগুলোই। এরাই এসেছে প্লায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে মহাশূন্যের বুক চিরে। পৃথিবীর বাতাস এদের কাছে বিষাক্ত, তাই গম্বুজের মধ্যে বানিয়ে নিয়েছে নিজেদের উপযোগী বাতাস, পৃথিবীর তাপমাত্রা এদের কাছে কনকনে ঠান্ডা— তাই গরমের হলকা ছুটিয়েছে গম্বুজের মধ্যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণেও এরা অনভ্যস্ত— তাই যান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের ওজন বাড়িয়ে রেখেছে গম্বুজের মধ্যে।

কিন্তু কী বীভৎস এক একজনের মূর্তি। নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত উঠে গেছে তেকোনা পিরামিডের মতন। নীচে থ্যাবড়া ওপরে সরু। খুব খাটো কচ্ছপের পায়ের মতো তিনটে পা আছে দেহের নীচে। বারো ফুট উঁচুতে মাথাটা ফুটখানেক চ্যাপটা। তিনটে চোখ তেকোনা ত্রিভুজের তিন কোণে যেন বসানো। মুখের একটা ফোকর আছে বটে, কিন্তু কথা বলে নাকের ফুটো দিয়ে। ফুট পাঁচেক পরিধি পেটের কাছে— সেখানে তিনটে অজগর সাপের মতো শুঁড় ঝুলছে শিথিলভাবে। সারা গায়ে রাশি রাশি লাল আঁচিল। শুকনো খসখসে লাল চামড়া।

তিনটে শুঁড় শূন্যে দুলিয়ে পিরামিড-জীবরা এসে দাঁড়াল ছেলেদের সামনে। যাদের মাথায় লাল টুপি সত্যিকারের, তারা যেন বর্তে গেল মালিকদের সেই প্রথম চাক্ষুষ দেখে। শিউরে উঠল তারা যাদের মাথায় ছদ্ম টুপি, এদের মধ্যেই ছিল কার্লো— স্পেনের সেই

ছেলেটা। পিরামিড জীবদের দেখতে কীরকম, সেই প্রথম জ্যান্ত বেরিয়ে এসে বর্ণনা করল সবাইকে।

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে কয়েক মাসের মধ্যে। কার্লোর সামনে এসেছে মালিকরা— কিন্তু কেউ ওকে পছন্দ করেনি ওর বেঁটে চেহারার জন্যে। ভেবেছে গায়ে জোর নেই। শুঁড় বুলিয়ে দেখেছে, গা শিরশির করেছে কার্লোর— তবুও হাসি-মুখে চেয়ে থেকেছে কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিমায়। মনে মনে শঙ্কিত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত ওর মতো অপদার্থকে এরা মেরে ফেলবে না তো? কারওই তো পছন্দ হচ্ছে না।

সব জাতের ছেলেদের সঙ্গেই তাদের ভাষায় কথা বলতে পারে পিরামিড-জীবরা। কার্লোর সঙ্গেও স্প্যানিশ ভাষায় গুরুগম্ভীর গলায় কথা বলেছে তারা, কিন্তু পছন্দ হয়নি।

খুব যখন মুষড়ে পড়েছে কার্লো, তখন ওর বরাতে শিকে ছিঁড়ল। একজন পিরামিড-জীব শুঁড় দিয়ে ওকে শূন্যে তুলে তিনটে চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললে গমগমে গলায়, 'ভারী অদ্ভুত ছেলে তো তুমি! এসো আমার সঙ্গে!'

গোলাম হল কার্লো। কিন্তু বুক কাঁপতে লাগল দারুণ ভয়ে। টুপির তলায় যদি শুঁড়ের ছুঁচোলো ডগা ঢুকিয়ে পরখ করে মালিক, তবেই হয়েছে!

কিন্তু সেরকম দুর্ঘটনা তখুনি ঘটল না। ঘটল অনেকদিন পরে। মালিক ধরে ফেলল কার্লোর আসল মতলব কী।

তার আগে অবশ্য পিরামিড-জীবদের সম্বন্ধে অনেক দরকারি খবর জেনে নিয়েছিল কার্লো। বেঁটে হলেও তার গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। গায়েতেও দারুণ জোর। গম্বুজের গরম আর সাংঘাতিক ওজন সয়ে গিয়েছিল দু'দিনেই। তবে সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রে কোয়ার্টারে ফিরে অন্যান্য ছেলেগুলোর আধমরা চেহারা দেখেই বুঝেছিল কেন বছর বছর এত তেজি ছেলেরা ভেতরে আসে— কিন্তু বাইরে আর যায় না। যাবে আর কী? এক বছরের বেশি কেউ বাঁচে না। সাংঘাতিক গরম আর মারাত্মক ওজনের ধকল সইতে না-পেরে এক বছরেই যখন মুমূর্ষু হয়ে পড়ে শক্ত সমর্থ ছেলেগুলো— তাদের পাঠানো হয় 'সুখের কামরায়'। আসলে তা মৃত্যুর কামরা। আসল টুপি-পরা ছেলেগুলো কিন্তু মনে করে তারা পরম সুখে পুড়ে ছাই হতে চলেছে। পিরামিড-জীবরাই ওই ইচ্ছে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয় টুপির মধ্যে দিয়ে। লাইন দিয়ে ঢোকে সুখের কামরায়। লেলিহান আগুনের শিখায় চোখের নিমেষে ছাই হয়ে যায়— সেই ছাই ভেসে যায় নদীর জলে। এই সেই নদী যা আমরা তেপান্তরের মাঠে দেখেছিলাম গম্বুজের মধ্যে ঢুকতে। অপর দিক দিয়ে এই নদীই বেরিয়ে গিয়েছে গম্বুজ থেকে। এবং এই নদীপথেই শেষ পর্যন্ত কার্লো পালিয়ে এসে ঘাসের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। হঠাৎ টাইম মেশিনে চেপে আমরা আবির্ভূত হয়েছিলাম ওর বিস্মিত-চোখের সামনে।

নদীর জল তিনটে গম্বুজের মধ্যে দিয়েই টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নদী ছাড়া বাঁচতে পারে না পিরামিড জীবরা। ভীষণ গরম ভিজে বাতাসে ওরা সুস্থ থাকে আর, হরবখৎ গরম কুণ্ডে নেয়ে ওঠে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় গরম জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে হয় বলেই শহরময় পথেঘাটে ছড়ানো বিস্তর কুণ্ড। পরমানন্দে পিরামিড জীবরা স্নান করে সেই সব কুণ্ডে। সেই

সময়ে ওরা একরকম পাইপ মুখে লাগিয়ে ফুকফুক করে টানে আর সোনালি ধোঁয়ার রিং ছাড়ে। বেশিক্ষণ পাইপ টানলে নেশা আসে, মেজাজ শরিফ হয়, আবোল-তাবোল বকে। এইরকম এক মুহূর্তে ইচ্ছে করে বেশ খানিকটা পাইপ খাইয়ে মালিকের মুখ থেকে ভয়ংকর সত্যটা বার করে নিয়েছে কার্লো।

কথাটা শুনেই হাড় পর্যন্ত হিম হয়ে গিয়েছিল কার্লোর। কী ভাগ্যিস তখন নেশায় চুর হয়ে ছিল মালিক, তাই কার্লোর ভয়ে পাংশু মুখ দেখেও সন্দেহ হয়নি। প্লায়াডিস নক্ষত্রের ভীষণ গরম আর বেজায় ভারী যে গ্রহ থেকে পিরামিড-জীবরা এসেছে, সেখান থেকে আর একটা মহাকাশ জাহাজ রওনা হয়েছে পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর সব ভাল, শুধু এখানকার হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়া যায় না। গরম মোটে নেই, মাধ্যাকর্ষণ দারুণ কম। মহাকাশ জাহাজে বিরাট যন্ত্রপাতি আসছে পৃথিবীর চেহারা পালটে দেওয়ার জন্যে। পৃথিবীর তিন দিকে এই যন্ত্রপাতি বসানো হবে, তারপর আস্তে আস্তে হাওয়া পালটে যাবে, মাধ্যাকর্ষণ বেড়ে যাবে, আগুনের হলকা ছুটবে, লাল আভায় সহজে তাকানো যাবে। তখন আর গম্বুজের মধ্যে কৃত্রিম পরিবেশে আবদ্ধ থাকবে না পিরামিড-জীবরা। বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীময়। এই পৃথিবী হবে তাদের নতুন উপনিবেশ। কোটি কোটি মানুষ অবশ্য ওই হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে না-পেরে মরবে তক্ষুনি— তাতে কী আসে যায়? মানুষরাও আরশুলা, মাছি, মশা মারবার জন্যে ঘরে স্প্রে করে না?

কার্লো তখন মালিককে দলাইমলাই করছিল তারের বুরুশ দিয়ে। মোটা চামড়ায় তারের খোঁচা দিয়ে রগড়ে দিলে আরামে চোখ বুজে আসে মালিকদের। কার্লোর মালিক নেশার আমেজে চোখ বুজে বকবক করে চলেছে— এমন সময়ে কার্লোর বুরুশ গিয়ে ঠেকল ঘাড় বলতে যে জায়গাটা বোঝায় সেইখানে। যদিও গর্দানের কোনও অস্তিত্ব নেই পিরামিড-জীবদের, কিন্তু কার্লোর বুরুশ সেখানে ঠেকতেই গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠে শুঁড়ের এক ঝটকায় কার্লোকে ছিটকে ফেলে দিল মালিক।

কপাল জোরে সেদিন হাড়গোড় ভাঙেনি কার্লোর। কিন্তু বুঝতে পারল না কী এমন অন্যায় করেছে সে যার জন্যে আছাড় মারার দরকার হল। একটু পরেই অবশ্য সামলে উঠে মালিক বললে, কার্লোর কোনও দোষ নেই। না-জেনে সে পিরামিড জীবদের দুর্বলতম জায়গায় খোঁচা দিয়ে ফেলেছে। মুখের নীচে ওই জায়গায় জোরে লেগে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে মালিকের। সুতরাং সাবধান— ওখানে আর হাত নয়।

দু'দিন পরেই এই তথ্যটা কাজে লাগল কার্লোর। সেদিনও মালিক নেশা করছিল চোখ বুজে। কার্লো সাহসে বুক বেঁধে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মালিক, আপনাদের জাহাজটা কবে আসবে?'

শুনেই চোখ খুলে তাকিয়েছিল মালিক। তিনটে চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, 'কোন জাহাজটা?'

'ওই যে সেদিন বলছিলেন বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছে?'

'বলেছিলাম নাকি?' তিনটে চোখ অনিমেষে চেয়ে রইল ওর পানে। 'তোমার মনেও আছে দেখছি। ভারী অদ্ভুত ছেলে তো। কবে আসবে জেনে কী করবে হে ছোকরা? মতলব কী? এসো, কাছে এসো—'

বলেই একটা শুঁড় দিয়ে কার্লোর কোমর জড়িয়ে ধরে চোখের কাছে তুলে ধরেছিল মালিক, আর একটা শুঁড়ের সরু ছুঁচের মতো ডগা বুলিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল নকল টুপির তলায়।

একী! টুপি উঠে আসছে কেন?

বিস্মিত মালিক আর একটি কথাও বলতে পারেনি। মরিয়া হয়ে কার্লো দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি মেরেছিল মালিকের মুখের নীচে সেই দুর্বলতম জায়গাটিতে। শুঁড়ের ঝটকায় আবার ছিটকে গিয়েছিল কার্লো। উঠে বসে দেখেছিল, মালিক কাত হয়ে পড়ে আছে। নিষ্প্রাণ।

সেই রাতেই নদীর জলে ডুব দিয়ে মাটির সুড়ঙ্গ দিয়ে গম্বুজের বাইরে চলে এসেছিল কার্লো। লুকিয়েছিল ঘাসের মধ্যে— এমন সময়ে দেখল হঠাৎ কোত্থেকে চোখের সামনে জেগে উঠল একটা বিদঘুটে মেশিন, আমি আর প্রফেসর।

কালো পাহাড়ের সংগ্রামী ছেলেদের নেতাদের সঙ্গে মিটিং-এ বসলেন প্রফেসর। এদের লিডার দু'জন— একজন বেনসন, জাতে জার্মান। অপরজন হার্ভার্ড— জাতে ইংরেজ। দু'জনেই সায় দিলে প্রফেসরের প্রস্তাবে। এখুনি একটা পিরামিড-জীবকে জ্যান্ত ধরা দরকার। কার্লো প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বটে, কিন্তু গম্বুজের সমস্ত পিরামিড-জীবকে কী করে নিকেশ করা যায়, তা জেনে আসেনি। নদীর জলে বিষ মিশিয়ে মারা সম্ভব। কী বিষে ওরা মরে, তা আবিষ্কার করার জন্যে জ্যান্ত ধরে আনতে হবে একটি পিরামিড-জীবকে।

বুদ্ধি বাতলাল বেনসন। বললে, 'কার্লো একটা বড় খবর এনেছে। তেপায়া রোবটের ভেতরে বসে চালাচ্ছে এই পিরামিড-জীবরা। সুতরাং খানায় ফেলে একটা রোবটকে জখম করলেই ল্যাটা চুকে যায়।'

'তারপর তাকে রাখা হবে কোথায়?' প্রফেসরের প্রশ্ন।

বেনসন আর হার্ভার্ড মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে উঠে দাঁড়াল। প্রফেসরকে বললে, 'আসুন!'

আমিও গেলাম পেছন পেছন। গিয়ে দেখলাম এক এলাহি কাণ্ড। পৃথিবীর যে যুগে যন্ত্র-সভ্যতা তুঙ্গে উঠেছিল, সেই যুগের বিশাল এক মিউজিয়াম আর লাইব্রেরি রয়েছে কালো পাহাড়ের তলায় পাতাল গহ্বরে। কংক্রিটের মস্ত হলঘরে থরে থরে সাজানো যন্ত্রপাতি আর বই।

বেনসন বললে, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি। তেপায়া দানবরা এই মিউজিয়ামের সন্ধান পায়নি— আমরা পেয়েছি। এইখানেই একটা ঘরে গরম জল আর হাওয়ার মধ্যে বন্দি করে রাখব পিরামিড-জীবকে।'

'কিন্তু আমাদের বাতাসে নিশ্বাস নিলেই তো সে মারা পড়বে?'

বেনসন বললে, 'প্রফেসর, তেপায়া দানবের মধ্যে যেখানে বসে মালিক রোবট চালাচ্ছে, সেখানে নিশ্চয় নিশ্বাসের হাওয়া তৈরি করে নেওয়ার কলকবজা আছে?'

'তা আছে,' বলেই লাফ দিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'বটে! সেই কলটা এই পাতালঘরে বসিয়ে ওর হাওয়া বানিয়ে দেবে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

এর পরের ঘটনাগুলো ছোট্ট করে বলছি। খাদের ওপর ফাঁদ পেতে রেখে একদিন বেনসন ঘোড়ায় চেপে একটা তেপায়া দানবকে পথ ভুলিয়ে এনে ফেলে দিল ফাঁদে। গভীর খাদে পা ভেঙে পড়ে রইল দানব। আমরা অচেতন পিরামিড-জীবকে ওর ঘর সমেত তুলে এনে রাখলাম পাতাল কুঠরিতে। তারপর একদিন দৈবাৎ জানা গেল যে জলের মধ্যে অ্যালকোহল অর্থাৎ মদ মিশিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হয়ে পড়ে পিরামিড-জীব। চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকে স্রেফ মড়ার মতো।

এর পরের ঘটনা আরও সংক্ষিপ্ত। প্রফেসর পাতাল-ল্যাবোরেটরিতে বসে পিপে পিপে মদ তৈরি করে দিলেন। পৃথিবীর তিন দিকের তিনটে লাল গম্বুজের ধারে কাছে খুব গোপনে সেই মদ জড়ো করা হল। দু'জায়গায় মদ তৈরি করে নেওয়া হল আঙুর থেকে। তারপর বিশেষ একটা দিনে একই সময়ে তিনটে গম্বুজেরই নদীর জলে বাইরে থেকে মিশিয়ে দিল পিপে পিপে মদ।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে ফলটা টের পাওয়া গেল। হঠাৎ পৃথিবীর সর্বত্র টুপি-পরা ছেলেগুলো যেন ঘোরের মধ্যে থেকে জেগে উঠল। প্রত্যেকেই নিজের ভাববার ক্ষমতা ফিরে পেল। বুঝতে পারল না হঠাৎ কেন এমন হল।

বুঝলেন প্রফেসর। গম্বুজ তিনটের পিরামিড-জীবরা সকলেই বেহুঁশ। কলকবজা তাই থেমে গিয়েছে। ব্রেন-কন্ট্রোলও বন্ধ। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পরেই নেশা ছুটে যাবে। আবার শুরু হয়ে যাবে মস্তিষ্ক ধোলাই। সুতরাং তার আগেই ধ্বংস করতে হবে গম্বুজ তিনটের চুনি আবরণী। পৃথিবীর হাওয়া গম্বুজের মধ্যে ঢুকলেই অক্কা পাবে বাছাধনেরা!

সে ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন প্রফেসর। মিউজিয়ামের মধ্যেই ছিল মস্ত বেলুন। একটা নয়, অনেক। সেই সঙ্গে ছিল বিস্তর ডিনামাইট। বেলুন আর ডিনামাইট গোপনে তিনটে গম্বুজের ধারে কাছে আগে থেকেই পাচার করে দিয়েছিলেন প্রফেসর। এখন সেই বেলুনে গ্যাস ভরে শূন্যে তোলা হল। ছেলেরা বান্ডিল বান্ডিল ডিনামাইট নিয়ে, বেলুনে চেপে পৌঁছোল চুনি গম্বুজের ছাদে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সব ক'টা গম্বুজের ছাদ ভীষণ শব্দে ফেটে উড়ে গেল আকাশে। লাল গ্যাস আর গরম হাওয়া ছিটকে গেল শূন্যে। দেখা গেল কাতারে কাতারে পিরামিড-জীব চিতপটাং হয়ে পড়ে আছে পথে ঘাটে। এরপর টাইম-মেশিন চালিয়ে আমরা ফিরে এসেছি বর্তমানে। সেই মহাকাশ জাহাজটা এসে পৌঁছেছিল কিনা খবর রাখিনি।

গাছ

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কি পাগল হয়ে গেলেন?

মাসকয়েক নিপাত্তা ছিলেন উনি। ফিরে এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন। উদ্‌ভ্রান্ত চোখে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে যে কাহিনিটা বললেন, তা তাঁর জবানিতে শোনাচ্ছি :

দীননাথ, ওই যে মানিপ্ল্যান্ট গাছটা দেখছ, মাসকয়েক আগে ওর সামনে দাঁড়িয়ে একটা পাথর দেখছিলাম। চ্যাটালো, চৌকোনা পাথর। ওপরে খোদাই করা একটা অদ্ভুত মূর্তি। অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পাখি। মূর্তির পাশেই একটা গাছ। কচুপাতার মতো বড় বড় পাতা। অনেক হাজার বছরের পুরনো কারুকাজ। তাই ভেঙে চুরে খোদাইয়ের কাজ নষ্ট হয়ে এসেছে। কোণগুলোও গোল হয়ে এসেছে। উলটেপালটে দেখে শুধু এইটুকু বুঝলাম, এ-পাথরে যে কারিগরের হাতের কাজ ফুটে উঠেছে, তার জন্ম, ইস্টার আয়ল্যান্ডে।

কেননা, এ ধরনের মূর্তিওলা পাথর পৃথিবীর বহু মিউজিয়ামে আজকাল দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগই নকল। মানে, সম্প্রতি পাথর খুদে তৈরি হাজার হাজার বছরের পুরনো বলে চালানো হচ্ছে। এ-পাথরটা কিন্তু আসল, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বিদঘুটে ওই মূর্তির প্রস্তরমূর্তি কেবল ইস্টার আয়ল্যান্ডেই আছে।

ইস্টার আয়ল্যান্ডের নাম তুমি নিশ্চয় শুনেছ। সারা পৃথিবী এখন সরগরম ইস্টার আয়ল্যান্ডের রহস্য নিয়ে। হাজার রহস্যের এই দ্বীপে অনেক অভিযানই হয়ে গেল। দ্বীপের রহস্য কিন্তু আজও কেউ বুঝে উঠতে পারেনি।

সেই দ্বীপের প্রস্তর-ফলক আমার ল্যাবোরেটরিতে হঠাৎ পেলাম। সক্কালবেলা মুখটুখ ধুয়ে ল্যাবোরেটরিতে ঢুকেই দেখলাম মানিপ্লান্টের গোড়ায় পড়ে রয়েছে পাথরটা। অথচ তার আগের রাতেও ওখানে এরকম কোনও পাথর দেখিনি। ল্যাবোরেটরির দরজা বন্ধ। তা সত্ত্বেও পাথরটা যেন হাওয়ার মধ্যে থেকে গজিয়ে উঠেছে মানিপ্ল্যান্টের তলায়।

ইস্টার দ্বীপকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিভৃত দ্বীপ বলতে পারো— পাণ্ডববর্জিত হলেও মানুষ সেখানে আছে। গভর্নর আছে। অনেক কুঁড়েঘর আছে। আর আছে শ'চারেক বিরাট বিরাট রহস্যময় শীলামূর্তি। দ্বীপে দাঁড়িয়ে বাসিন্দারা চারদিকে চেয়ে চোখ টাটিয়ে ফেললেও আর কোনও দ্বীপ দেখতে পায় না ধারে কাছে— মাথার ওপর তারা আর গ্রহরাই যেন

সবচেয়ে কাছের রাজ্য বলে মনে হয়। গ্রহনক্ষত্রদের নাম তাই তাদের বেশি জানা— পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নামের চাইতে। বহু পাতাল গুহা আছে সেই দ্বীপে, আছে মৃত আগ্নেয়গিরি, কিন্তু নেই একটাও গাছ। অথচ আমার সামনে ইস্টার আয়ল্যান্ডের পাখি-মানুষের মূর্তির পাশে খোদাই করা রয়েছে দিব্বি ঝাড়ালো একটা গাছ।

হাজার রহস্যের দ্বীপ থেকে এ কোন রহস্য এসে হাজির হল আমার ল্যাবোরেটরিতে? কে এনে রাখল? ভূতে?

ইস্টার আয়ল্যান্ডের আসল নামটা কী আজও কিন্তু কেউ তা জানে না। দ্বীপের আদিবাসীরা বলে 'রাপানুই'। গবেষকরা কিন্তু নামটাকে আদিম নাম বলে মেনে নিতে পারেনি। সবচেয়ে প্রাচীন কিংবদন্তি অনুসারে দ্বীপের নাম ছিল 'তে পিতো ও তে হেনুয়া' অর্থাৎ পৃথিবীর নাভি। এটাও হয়তো আসল নাম নয়— কবিত্ব করে পৃথিবীর নাইকুণ্ড বলা হয়েছে। কেননা, পরবর্তীকালে নেটিভরাই এ-দ্বীপের নাম দিয়েছে 'স্বর্গ দেখার চোখ।' অর্থাৎ ইস্টার দ্বীপ যেন একটা চক্ষু— যে চক্ষু স্বর্গ দেখতে পায়। অদ্ভুত নাম, নয় কি?

হাজার হাজার মাইল দূরের সভ্য মানুষরা কিন্তু এ-দ্বীপের নাম দিয়েছিল ইস্টার আয়ল্যান্ড। ম্যাপে এ নাম লেখার কারণও ছিল। ১৭২২ সালের ইস্টার দিবসে ওলন্দাজ রোগেভীন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে প্রথম পা দেয় এই দ্বীপে— ইউরোপ থেকে সেই প্রথম মানুষ নামল রহস্যময় এই দ্বীপে। ওদিককার সমুদ্রে ইউরোপ থেকে জাহাজও যেত না। এরাই গেল সেই প্রথম, পালতোলা জাহাজ। তখন সন্ধে হয়েছে। নোঙর ফেলতে ফেলতে সবাই দেখলে দ্বীপে মানুষরা ধোঁয়া সংকেত জানাচ্ছে। দেখাও হল দ্বীপবাসীদের সঙ্গে। জাহাজে উঠে এল অদ্ভুত মানুষগুলো। লম্বা, সুগঠিত চেহারা। সাউথ সি-র তাহিতি, হাওয়াই এবং অন্যান্য দ্বীপের পলিনেশিয়ানদের মতো গায়ের রং ফরসা। আবার কালচে চামড়ার মানুষও আছে তাদের মধ্যে। আর আছে লালচে ফরসা মানুষও— ঠিক ইউরোপের মানুষদের মতো। কারও কারও চামড়া জ্বলে গেছে রোদ্দুরে। অনেকের গালে আছে দাড়ি।

তীরের ওপর দেখা গেল তিরিশ ফুট লম্বা বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তি। মাথায় মুকুটের মতো বসানো পাথরের চোঙা। রোগেভীন পরে দেখেছিল, দানবিক এইসব পাথরের মূর্তির সামনেই ওদের কবরখানা— আবার পুজোআচ্চাও চলছে সেখানে। আগুন জ্বালিয়ে সূর্য পুজা।

ওলন্দাজ জাহাজে প্রথমে পা দিয়েছিল লম্বকর্ণ এক ধবধবে সাদা নেটিভ। মাথায় পাক্কা সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। কানের ফুটোয় মুঠোর মতো মোটা কাঠের খুঁটি ঢোকানো। তাই কান লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে কাঁধ পর্যন্ত। এরকম লম্বকর্ণ নেটিভ আরও অনেক দেখা গিয়েছিল সেই দ্বীপে।

দীননাথ, দ্বীপের আদি ইতিহাস তোমায় শোনাচ্ছি, পরের কাহিনিটুকু বুঝতে সুবিধে হবে বলে। প্রতিটি কথা মনে রেখো— শেষ পর্যন্ত শুনে শুধু বলবে আমি এখনও পাগল হয়ে গিয়েছি কিনা।

ওলন্দাজদের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধুধু প্রশান্ত মহাসাগরের এককোণে নির্জনে থেকে গিয়েছে ইস্টার আয়ল্যান্ড— কেউ আসেনি। জাহাজ আসা-যাওয়ার পথ তো সেটা নয়।

এল আবার ১৭৭০ সালে— এবার স্প্যানিয়ার্ডরা। দ্বীপের নতুন নাম দিলে তারা— সান কার্লোজ আয়ল্যান্ড।

এর অনেক বছর পরে এলেন ক্যাপ্টেন কুক। দ্বীপে নেমে অবাক হলেন তিনি। বাচ্চাকাচ্চা কাউকে দেখলেন না। মেয়ে দেখলেন দু'-চারজন। এর আগে যারা এসেছিল, তারাও বাচ্চাকাচ্চা দেখেনি। তবে কি দ্বীপে বাচ্চা নেই? মেয়েরাও সংখ্যায় কম? ক্যাপ্টেন কুকের কিন্তু সন্দেহ হল। দ্বীপময়-বিক্ষিপ্ত চারশো দানবিক মূর্তির আশেপাশে ছড়ানো বিস্তর গুহা তিনি দেখেছিলেন। আর ছিল উলটোনা নৌকোর মতো কুঁড়ে— জানলা-টানলার বালাই নেই। কুঁড়েঘরগুলোয় উঁকিঝুঁকি মেরে বাচ্চা বা মেয়েদের তিনি দেখতে পেলেন না। এ তো বড় জবর রহস্য! হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, পাতাল সুড়ঙ্গ নেই তো আশ্চর্য এই দ্বীপে? খুঁজে খুঁজে সত্যিই অনেকগুলো পাতাল সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ তাঁর চোখে পড়ল। কিন্তু আদিবাসীরা সে সব সুড়ঙ্গের ধারে কাছেও ঘেঁসতে দিলে না ক্যাপ্টেন কুককে। নিরুপায় হয়ে বিদায় নিলেন ক্যাপ্টেন কুক।

এরপর এল ফরাসিরা। তারাও এসে দেখল সেই একই দৃশ্য। গাছপালাহীন রহস্য-দ্বীপে বাচ্চাকাচ্চা মেয়েরাও যেন নেই। তারপর এল আমেরিকান আর রাশিয়ানরা। আস্তে আস্তে সভ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ইস্টার আয়ল্যান্ড। আবিষ্কৃত হল অনেকগুলো রন্ধ্রপথ— পাতালে গোলকধাঁধার মতো সুড়ঙ্গ। বিদেশি দেখলেই বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে মেয়েরা লুকিয়ে থাকে এখানে।

ইস্টার দ্বীপের হাজার রহস্য নিয়ে এখন পৃথিবী তোলপাড়। আমি তাই এ-দ্বীপের অনেক রহস্যের খবর রাখতাম বলেই পাথরের ফলকটাকে আমারই ল্যাবোরেটরিতে দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম।

দীননাথ, এর পরে যা ঘটল, তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু আমার অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনীর সঙ্গে তুমি জড়িয়ে আছ বলে তোমাকেই শুধু বলব সেই ব্যাপার।

আগেই বলেছি, তখন সকালবেলা। খুব সকালবেলা। তুমি যখন নাক ডেকে ঘুমোও, সেই সকালবেলা। সাতসকালে ওঠা আমার অভ্যেস। তাই সূর্য ওঠবার আগে এসেছিলাম ল্যাবোরেটরিতে। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছিল। শিরশির করে কাঁপছিল মানিপ্লান্টের পাতা। হঠাৎ আমার গায়ের লোমগুলোও কেমন যেন শিরশির করে উঠল। ভাবলাম, ভোরের হাওয়ায় অমন হচ্ছে। কিন্তু শিরশিরানি ভাবটা যেন বেড়েই চলল। সেই সঙ্গে খুব মৃদু কারেন্টের চিড়িক মারতে লাগল যেন হাতের তেলোতে— মনে হল, দীননাথ হেসো না, মনে হল যেন পাথরের ফলকটা থেকে কারেন্ট বেরিয়ে ঢুকছে আমার শরীরে। গা মাথা ঝিমঝিম করছে কারেন্টের ঢেউয়ে। আরও মনে হল, মানিপ্লান্টটা যেন জীবন্ত প্রাণীর মতো হঠাৎ খুব বেশি দুলে দুলে উঠছে। আর... আর যেন প্যাটপ্যাট করে চেয়ে আছে আমার পানে।

জানি তুমি বলবে আমার পেট গরম হয়েছিল, রাত জেগে গবেষণা করে মাথায় চরকি দিচ্ছিল। নইলে অমন ধারা চিন্তা মাথায় আসবে কেন? গাছের চোখ নেই, কান নেই, জিভ নেই, নাক নেই, চামড়া নেই। তা সত্ত্বেও গাছের জীবন তো আছে। কিন্তু যাদের চোখ নেই,

তারা প্যাটপ্যাট করে চেয়ে দেখতে পারে— এমন অদ্ভুত কল্পনা স্যার জগদীশ বোসও করেননি। কিন্তু সেই মুহূর্তে এই অসম্ভব কল্পনাটাই শিউরে দিয়ে গেল আমার দেহ মন মস্তিষ্ককে। স্পষ্ট অনুভব করলাম— কেন অনুভব করলাম, তা তোমায় ব্যাখ্যা করতে পারব না, ধৈর্য ধরে এই কাহিনির শেষ পর্যন্ত শুনলে হয়তো বুঝতে পারবে— স্পষ্ট অনুভব করলাম, মানিপ্ল্যান্ট তার চক্ষুহীন প্রত্যঙ্গ দিয়ে নিমেষ নয়নে দেখছে আমার শিউরে-ওঠা চেহারাখানা।

তারপর আর কিছু মনে নেই আমার। মানিপ্ল্যান্ট মুছে গিয়েছিল চোখের সামনে থেকে। মাথা টলে যাওয়ার জন্যই বোধহয় বসে পড়েছিলাম মেঝের ওপর। সংবিৎ ফিরে পাওয়ার পর ওইভাবেই বসে থাকতে দেখেছিলাম নিজেকে।

কিন্তু তার আগে সিনেমার দৃশ্যের মতো অনেকগুলো ছায়াছবি ভেসে গিয়েছিল চোখের সামনে দিয়ে। তার কিছু কিছু প্রথমেই তোমাকে বলেছি। ওলন্দাজদের ইস্টার দ্বীপে আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে ইদানীংকালের থর হেইয়ারডালের অভিযান পর্যন্ত সব ক'টি দৃশ্য যেন হুহু করে ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে৷ বারবার ভেসে উঠল দানবিক মূর্তি ছাওয়া ইস্টার দ্বীপের দৃশ্য। সব ক'টা মূর্তিই সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। গাছপালার চিহ্ন নেই ন্যাড়া দ্বীপে। শুধু মূর্তি। মাথার ওপর আকাশে ঝিকিমিকি তারা, দিগন্ত জোড়া অথই সমুদ্র— যে-সমুদ্র পেরিয়ে সভ্যদেশে যাওয়ার মতো বড় জাহাজও নেই দ্বীপবাসীদের। আছে কেবল অগুনতি ছিপনৌকো।

আচমকা লম্বকর্ণ একটা মূর্তি আবির্ভূত হল আমার মনের চোখে, ধবধবে সাদা গায়ের রং— ঠিক সাহেবের মতো। মাথায় আশ্চর্য লম্বা— সাড়ে ছ'ফুট তো বটেই। গালে সাদা দাড়ি। খালি গা, পরনে নেংটি ছাড়া কিচ্ছু নেই— তাও শতচ্ছিন্ন। নির্নিমেষে সে চেয়ে রইল আমার পানে। তারপর হাত তুলল ওপরে। দেখলাম হাতের তালুতে রয়েছে পাথরের একটা ফলক— ঠিক যে-ফলক রাতারাতি আবির্ভূত হয়েছে আমার ঘরে মানিপ্ল্যান্টের গোড়ায়। ফলকটা আমাকে দেখিয়ে আকাশের দিকে তুলে কী যেন ইঙ্গিত করল লম্বকর্ণ লোকটা— কান যার ঝুলছে কাঁধ পর্যন্ত। কানের লতিতে ঝুলছে বিরাট কাঠের কুঁদো।

আকাশের দিকে পাথরটা তুলে ইঙ্গিত করতেই একটা বিদ্যুৎ-ঝলক যেন নেমে এল আকাশ থেকে দ্বীপের ওপর। তারপর আমার আর কিছু মনে রইল না। চোখের ধোঁয়া কেটে যাওয়ার পর হুঁশ ফিরে এল। দেখলাম, বসে রয়েছি মেঝের ওপর। হাতের মুঠোয় সেই পাথরটা। আর, হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে মানিপ্ল্যান্টের সবুজ পাতাগুলো।

আমার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে প্রচণ্ড একটা উন্মাদনা অনুভব করলাম। চুম্বকের প্রচণ্ড আকর্ষণ যেন আমাকে টানছে ইস্টার দ্বীপের দিকে। মানুষের মস্তিষ্ক আসলে কিছু নয়— কোষই সব। এ ধারণা অনেকদিন ধরেই ঘুরঘুর করছিল মাথার মধ্যে। স্মৃতি এই কোষের মধ্যেই জমা থাকে— পুরুষানুক্রমে কোষের মধ্যে দিয়েই সেই স্মৃতি সারা জীবনের সঞ্চিত শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির সারাৎসার সঞ্চারিত হয়। গাছের কোষের সঙ্গে প্রাণীর কোষের খুব একটা ফারাক নেই এ ব্যাপারে। মানিপ্ল্যান্টের কোষগুলোই কি অতীন্দ্রিয় শক্তি দিয়ে সমাচার পাঠিয়ে দিল আমার কোষে কোষে? কিন্তু এই পাথরের ফলকটার মধ্যে থেকে

বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হল কেন দেহের মধ্যে? কল্পনায় দেখা আকাশের ওই বিদ্যুৎ ঝলকের সঙ্গে এই তড়িৎ-প্রবাহের কোনও সম্পর্ক আছে কি?

আছে, আছে, নিশ্চয় আছে। অলৌকিক এই বার্তা প্রেরণের মধ্যে আমি গূঢ় সম্পর্কের নিশানা পেলাম। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। হয়তো এখনও তাই আছি। আমার ব্রেনটা এনকেফালোগ্রাফি করে দেখবার জন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তার আগেই কেন আমার এ অবস্থা হল, তা শোনাই।

নরওয়ের রাজধানী ওসলো-তে পরের দিন খবর পাঠালাম। ওখানকার এক জাহাজ কোম্পানির মালিকের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ খাতির ছিল। তিনিই আমাকে একটা ডিজেল ইঞ্জিনের জাহাজ জুটিয়ে দিলেন। দেড়শো ফুট লম্বা জাহাজ। স্পিড ঘণ্টায় বারো নট। জল ধরবে পঞ্চাশ টন, আর তেল ১৩০ টন। এ দুটোরই খুব বেশি দরকার ইস্টার দ্বীপে। কেননা, সেখানে জাহাজঘাটা নেই, জল আর তেলের জোগানও নেই। যা কিছু দরকার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে নিতে হল খোঁড়াখুঁড়ির সরঞ্জাম— আমার কোষগুলোই যেন তাগিদ দিয়ে আমাকে দিয়ে সব করিয়ে গেল। ইস্টার দ্বীপ আমাকে ডাকছে— কিন্তু সেখানে খোঁড়াখুঁড়ির প্রয়োজন হবে কেন তা আমার মস্তিষ্ক বুঝতে পারল না। তবুও আয়োজনে ত্রুটি রাখলাম না কোথাও। কিন্তু ইস্টার দ্বীপের কোনও প্রাচীন মূর্তির ক্ষতি না-করে, খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে। গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্সও পারমিশন দিলে তাদের অন্যান্য দ্বীপে অভিযান চালানোর জন্যে। সব ব্যবস্থা করলাম এই কলকাতায় বসে। তারপর একদিন প্লেনে চেপে হাওয়া হয়ে গেলাম।

ইস্টার দ্বীপে জাহাজ পৌঁছোল রাত্রে। গভর্নরের বাড়ি আর গ্রামটা যেদিকে— সেদিকে নয়। ক্যাপ্টেন বললে, পরের দিন সকালে জাহাজ নিয়ে যাবে সেখানে। না হলে এই রাত্রে তাদের উদ্‌ব্যস্ত করা হবে।

ডেক-চেয়ারে শুয়ে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তারপর চোখ নামিয়ে আনলাম দূরের ইস্টার দ্বীপের দিকে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগেই দূর থেকে দেখেছিলাম ধূসর সবুজ পাথর— উপকূল বরাবর পাথরের প্রাচীর বলে মনে হয় দূর থেকে। মরা আগ্নেয়গিরির ঢালু গায়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে দানবিক প্রস্তর মূর্তি। লাল আকাশের পটভূমিকায় যেন কালো দৈত্য। স্কিপার ঠিক তখনই নোঙর ফেলেছিল।

রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে দেখে নিয়েছিলাম জনহীন দ্বীপের চেহারা। ইস্টার দ্বীপটা অনেকটা নিমকির মতো তেকোনা, আমরা পৌঁছেছি একদম ডানদিকের কোণে। দূর থেকে নিশ্চল পাথুরে মূর্তির মাথাগুলো নিষ্পলকে যেন চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। জমাট লাভার বিরাট বিরাট চাঁইগুলো যেন একটা মৃত জগতের শেষ চিহ্ন। এক সময়ে যেন ওই দ্বীপ প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত ছিল— এখন সব নিথর, নিস্তব্ধ, নিষ্প্রাণ।

অথচ এই দ্বীপই অলৌকিক আকর্ষণে আমাকে টেনে এনেছে সুদূর কলকাতা থেকে।

লাল টকটকে সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই দেখে নিয়েছিলাম এই দৃশ্য। তারপর ডেক-চেয়ারে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিলাম। অনেকক্ষণ পরে চোখ নামিয়ে দ্বীপের দিকে চাইতেই আবার দেহের প্রতিটি কোষের মধ্যে অনুভব করলাম সেই শিরশিরানি—

কলকাতায় মানিপ্ল্যান্টের সামনে দাঁড়িয়ে যে ঝিমঝিমভাব জাগ্রত হয়েছিল অণুপরমাণুর মধ্যে— অবিকল সেই উপলব্ধি।

একটা বিচিত্র, অব্যাখ্যাত আকুতি জাগ্রত হল আমার মধ্যে। ওই দ্বীপে আমাকে এখুনি যেতে হবে— দেরি নয়... দেরি নয়। না... না... ওই দ্বীপে নয়। নিমকির মতো দ্বীপের যে প্রান্তে আমরা এসেছি, যেতে হবে তার বাঁ দিকের প্রান্তে। সেখানে আছে আরও তিনটে টুকরো দ্বীপ। ভারতবর্ষের তলায় যেমন শ্রীলঙ্কা... অনেকটা সেইরকম। তিনটে দ্বীপের সবচেয়ে ছোটটার নাম মোটু কাওকাও, মেজটার নাম মোটুইটি, বড়টার নাম মোটুনুই।

এই মোটুনুই দ্বীপের আরেকটা নাম আছে— পাখি মানুষের দ্বীপ। আমার সত্তার মধ্যে অদ্ভুত আহ্বানটা জেগে উঠল এই পাখি মানুষের দ্বীপ থেকে। এখুনি আমাকে যেতে হবে সেখানে— এখুনি .. এখুনি।

ক্যাপ্টেনকে ডাকলাম! হুকুম দিলাম। তিনি বেঁকে বসলেন। এখানকার সমুদ্র তাঁর জানা নেই। চোরাপাহাড় থাকতে পারে। রাতবিরেতে জাহাজের তলা ফেঁসে যেতে পারে তো!

আমি কিন্তু অটল। পাগলের মতো ধমকে উঠে বলেছিলাম, 'এখুনি... এখুনি... কোনও কথা শুনতে চাই না... এখুনি নামতে হবে আমাকে মোটুনুইতে।'

'এখুনি নামবেন!' চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন ক্যাপ্টেন, 'দ্বীপে পৌঁছোনোর খবরটা গভর্নরকে না-দিয়েই?'

'সে দায়িত্ব আমার!' খিঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি। ক্যাপ্টেন আমার চোখমুখের চেহারা দেখেই বোধহয় আর কথা বললেন না। সেই রাতেই জাহাজ নিয়ে রওনা হলেন পাখিমানুষের দ্বীপের দিকে। আমি ডেকচেয়ারে বসে চেয়ে রইলাম আকাশের তারাগুলোর দিকে। মনের চোখে বারবার ভেসে উঠতে লাগল একটা সাদা বিদ্যুৎঝলক— কলকাতায় মানিপ্ল্যান্টের সামনে দাঁড়িয়ে মুহ্যমান অবস্থায় যা দেখেছিলাম।

খুব সাবধানে জাহাজ চালিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। মোটুনুই দ্বীপে যখন পৌঁছোলাম— তখন ভোর হতে বেশি দেরি নেই। এত সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুলে দেরি তো হবেই।

তৎক্ষণাৎ লাইফবোট নিয়ে আমি নেমে গেলাম দ্বীপে। একজন ছাড়া কাউকে সঙ্গে নিলাম না। ক্যাপ্টেনকে বলে গেলাম কর্তব্য করতে। জাহাজ নিয়ে যেন গভর্নরের দপ্তরে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসেন যে আমি পৌঁছে গেছি। সন্ধে নাগাদ ফিরে এলেই হবে।

যাকে সঙ্গে নিলাম, তার নাম ওরাউংগা। পলিনেশিয়ান। তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের মানুষ। নরওয়ে থেকে জোগাড় করেছিলাম ইস্টার দ্বীপের লোকদের পলিনেশিয়ান ভাষার তর্জমা করে আমাকে শোনাবে বলে। কিন্তু তার দরকার হয়নি। কেন দরকার হয়নি, তা মন দিয়ে অবিশ্বাস্য এই কাহিনির শেষটুকু শুনলেই বুঝবে।

ওরাউংগা পলিনেশিয়ানদের মতই লম্বা, তামাটে গায়ের রং। তাগড়াই চেহারা। গাঁইতি-টাইতি নিয়ে একাই নৌকো বেয়ে নিয়ে গেল আমাকে মোটোনুই দ্বীপে। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেয়ে রইলাম কেবল। কোথায় যাব, কেন যাব— কিচ্ছু জানি না। শুধু জানি, যেতে আমাকে হবে। হবেই। যেভাবে হোক। এক ফোঁটা সমুদ্রঘেরা ওই দ্বীপ আমাকে ডাকছে... ডাকছে।

মোটোনুই দ্বীপে কিন্তু একটাও দানবিক স্ট্যাচু নেই। তবুও যখন মন টানছে ওইদিকেই, তখন শুধু এইটুকুই বুঝলাম যে মূর্তিরা আমাকে টানছে না— টানছে অন্য কেউ। সে কে, না-গেলে জানা যাবে না। অথচ এই মূর্তি সম্বন্ধে কত রোমাঞ্চকর গল্পই না আসবার পথে শুনেছি ওরাউংগার মুখে। মূর্তিগুলো নাকি নিরেট পাথরের নয়, ফোঁপরা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে রহস্যময় যে পাখিমানুষরা এ-দ্বীপে রাজত্ব করে গেছে, তাদের রাজাদের নাকি রাখা হয়েছে এক একটা মূর্তির মধ্যে। এক-একটা মূর্তি এক-একজন রাজার জন্যে। মৃত্যুর পর অবশ্য। যেমন মিশরের পিরামিডে সেই দেশের রাজারাজড়াদের কবর দেওয়া হয়েছে— সেইরকম। তাই আজও ইস্টার দ্বীপের মানুষরা দেবতাজ্ঞানে পুজো করে স্ট্যাচুগুলোকে। পাখিমানুষদের আসল চেহারা নাকি দেখা যাবে মূর্তিগুলো ভাঙলে। তারা মরেও নাকি মরেনি— সময় এলে একে একে সব জেগে উঠবে। দানবিক মূর্তিগুলো তখন দিগবিজয়ে বেরুবে। ইস্টার দ্বীপ হবে তাদের পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্যের রাজধানী। পৃথিবীর নাভি। এবং স্বর্গ দেখার চোখ।

উদ্ভট এই গালগল্প কেবল শুনে গেছি। মন্তব্য করিনি। দ্বীপের পাথরের স্ট্যাচুর ক্ষতি করব না— এই কথা দিয়ে তবে তো এ-দ্বীপে আসবার অনুমতি পেয়েছি। কাজেই কী দরকার মূর্তি রহস্য নিয়ে অযথা মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে। ইস্টার দ্বীপের হাজার রহস্যের একটা রহস্য হয়ে থাকুক মূর্তি রহস্য। আমি শুধু মীমাংসা করতে চাই একটা রহস্যের। পাখিমানুষ খোদাই করা পাথরের ফলক হাতে নিয়ে কেন সংবিৎ হারিয়েছিলাম, কেন লম্বা কানওলা লোকটা হুবহু একই পাথরের ফলক আকাশের দিকে তুলতেই বিদ্যুৎঝলক দ্বীপের ওপর নেমে আসতে দেখেছিলাম যেন স্বপ্নের মধ্যে, কেন মানিপ্ল্যান্ট শিউরে শিউরে উঠে শিহরন জাগিয়েছিল আমার লোমকূপে লোমকূপে, কেন মনে হয়েছিল সবুজ গাছটা চক্ষুহীন প্রত্যঙ্গ মেলে চেয়ে আছে আমার দিকে। এই এতগুলো 'কেন'র জবাব পেলেই আমি ফিরে যাব কলকাতায়— হাজার রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাক অন্য সবাই।

পাখিমূর্তি খোদাই করা পাথরের ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে পা দিলাম দ্বীপে। আশা করেছিলাম, মূর্তির পাশে খোদাই করা গাছটা এবার দেখতে পাব। ঘাস পর্যন্ত নেই কোথাও। পাথর আর পাথর। ধূসর-সবুজ খোঁচা খোঁচা আগ্নেয় পাথরে মাটি নেই কোথাও। গাছ জন্মাবে কী করে। তা ছাড়া যেখানে মাটি নেই, সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করেই বা পাব কী। তবুও কেন খোঁড়াখুঁড়ির তাগিদটা মনের ভেতর থেকে আমাকে পাগল করে ছেড়েছে, সেটাও একটা রহস্য।

দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় পাথরের অনেকগুলো টিলায় খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন অবশ্য লক্ষ করলাম। আগের অভিযাত্রীরা ডিনামাইট দিয়ে পাথর উড়িয়ে হাজার রহস্যের সন্ধান করেছে। পেয়েছে কিনা জানি না। আমার হাতে ধরা পাথরের ফলকটা যেন চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে চলল তার পাশ দিয়ে আরও পেছন দিকে।

ওরাউংগা চলেছে পেছন পেছন। ওর মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করছে যেন। আমার চোখমুখের অবস্থা দেখেও ভয় পেতে পারে। আমি হাঁটছি তো সম্মোহিতের মতো। কীসের টানে এগিয়ে যাচ্ছি, তা নিজেও জানি না।

দূর থেকে দেখলাম একটা গ্র্যানাইট স্তূপ। বড় বড় দোতলা তিনতলা কতকগুলো আলগা পাথর যেন ওপর ওপর পড়ে। এমনভাবে রয়েছে যে পাথর বেয়ে ওপরে ওঠা যায় না। তেলতেলে মসৃণ পাথরের গায়ে পা রাখবার জায়গা পর্যন্ত নেই।

চুম্বকের টানে লোহা যেমন ছুটে যায়, আমিও তেমনি অজ্ঞাত সেই আকর্ষণে এসে দাঁড়ালাম এই গ্র্যানাইট স্তূপের সামনে। দুটো বড় পাথরের ফাঁকে দাঁড়িয়ে আমার মন বলল, এই পাথর ভেদ করে এবার আমাকে ভেতরে ঢুকতে হবে। পাতালে কি? কে জানে। অত জানবারও দরকার নেই। পাথর উড়িয়ে ভেতরে পথ করে নিতে হবে।

পাথরের ফাঁকটা দেখিয়ে ওরাউংগাকে বললাম, 'চালাও গাঁইতি।'

বিমূঢ়ের মতো দূরের মরা অগ্নেয়গিরি রানো কাও-র দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বোধহয় প্রতিবাদ করতে গেল ওরাউংগা— আমি অধীর হয়ে শুধু বললাম, 'চালাও গাঁইতি।'

মরিয়া হয়ে গাঁইতি মাথার ওপর তুলে পাথরের জোড়ে ঠকাং করে মারল ওরাউংগা। আগুনের ফুলকি ছিটকে গেল। এক চিলতে পাথরও খসানো গেল না। আবার গাঁইতি মাথার ওপর তুলে ঠকাং করে মারল ও। আবার— আবার...

পরপর সাতবার ঠকাং ঠকাং করে মারবার পর ভোজবাজির মতো ব্যাপারটা ঘটল। আচমকা পাথরে পাথরে ঘষাঘষির কড়কড় শব্দ তুলে দুটো পাথর যেন দু'দিকে হেলে পড়ল। গাঁইতির ঘায়ে যে অত বড় পাথর দুটো গড়িয়ে যায়নি, তা বুঝলাম। বুঝেও পা বাড়লাম হাঁ হয়ে যাওয়া প্রবেশ পথের দিকে— কেননা ঠিক সামনেই দেখলাম একটা সুড়ঙ্গের অন্ধকার মুখ।

এই সময়ে ওরাউংগার পক্ষে যা শোভন নয়, ঠিক তাই করে বসল। পেছন থেকে খপ করে আমার হাত চেপে ধরল। ও বুঝেছে, এবং স্বচক্ষে দেখেছে— হাজার রহস্যের দ্বীপের একটা রহস্য মুখব্যাদান করেছে আমার সামনে, হয়তো আমাকে গিলে খাবার জন্যে। তাই সব কিছু ভুলে গিয়ে পথ আটকাতে গেল আমার।

অমি কিন্তু খেপে গেলাম। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গেলাম। ওরাউংগার সঙ্গে পারব কেন। ও আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল পাতাল সুড়ঙ্গের সামনে থেকে। আমি তখন উন্মাদ। তাই যা কখনও ভাবতে পারিনি, তাই করে বসলাম। গাঁইতিটা হাতে ঠেকতেই দু'হাতে তুলে নিয়ে ওর পায়ের দিকে লক্ষ্য করে কোপ মারলাম।

চক্ষের নিমেষে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছিটকে গেল ওরাউংগা। তাল সামলাতে না-পেরে মুখ থুবড়ে পড়লাম আমি। গাঁইতির ধারালো ফলাটা ঘ্যাচ করে বসে গেল আমারই ডানহাতের চেটোতে।

আমি তখন কাণ্ডজ্ঞানরহিত। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। রক্তাক্ত ডান হাত শূন্যে তুলে, বাঁ হাতে পাখিমানুষ আঁকা পাথরের ফলকটা খামচে ধরে তির বেগে দৌড়ে ঢুকে গেলাম পাতাল সুড়ঙ্গে।

অন্ধকার... অবর্ণনীয় অন্ধকার ভেতরে। আমি কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেই এতটুকু হোঁচট না-খেয়ে ছুটে চলে এলাম। কয়েকবার মোড় ঘুরলাম অন্ধকারের মধ্যেই। তার পরেই দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে আলোর নিশানা। দিনের আলো দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা ফোকরের মধ্যে দিয়ে।

আমি পাগলের মতো ধেয়ে গেলাম সেইদিকে। আলোটা আসছে একটা গোলাকার ফুটো থেকে। পাথরের গায়ে একটা ছেঁদা— এক বেগদা ব্যাস বড়জোর, তার বেশি নয়। হাঁটু সমান উঁচু। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম এই ফুটোর সামনে।

অমনি টের পেলাম আলতোভাবে কে যেন বসে পড়ল আমার পাশে।

নিঃসীম অন্ধকারে চোখ চালালাম। আমার ডানদিকে আমারই কায়দায় হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে একটা মনুষ্যমূর্তি। খুব লম্বা পুরুষ। খালি গা। ফুটো দিয়ে আসা আলোর আভায় তার মুখের একটা পাশ কেবল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কানটা অদ্ভুত লম্বা। ঘাড় পর্যন্ত লুটোচ্ছে। লতিতে মুঠো সমান ফুটোর মধ্যে কাঠের গোঁজ ঢোকানো। ইস্টার দ্বীপের চারশো মূর্তির বেশির ভাগ কাঠ এমনি লম্বা বলেই যে আমি চমকে উঠলাম, তা নয়। ঠিক এই মূর্তিই আমি দেখেছি কলকাতায় স্বপ্নের ঘোরে— মানিপ্ল্যান্টের সামনে।

মূর্তিটা একদৃষ্টে চেয়ে ছিল আমার রক্তাক্ত ডান হাতটার দিকে। আবছা আলোয় দেখলাম বয়স তার অনেক। সাদা দাড়ি, লোল চর্ম, কিন্তু জরার চিহ্ন নেই। প্রাণশক্তি যেন ঠিকরে পড়ছে চামড়ার প্রতিটি ভাঁজ আর বলিরেখা থেকে। এরকম আশ্চর্য অতি বৃদ্ধ অথচ যৌবনরসে টলমল মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

অন্ধকারে তখন আমার চোখ সয়ে গেছে। মুখে কিন্তু কোনও কথা সরছে না। অতি বৃদ্ধ লম্বকর্ণ এবার সযত্নে তুলে নিল আমার ডানহাতটা। চোখের সামনে টেনে এনে ভাল করে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে ফুটো দিয়ে গলিয়ে দিল ভেতর দিকে।

আমি বাধা দিলাম না। আমার কেবলই মনে হল, শেষ হয়েছে আমার এতদূর ছুটে আসা। যে প্রচণ্ড চৌম্বক শক্তি টেনে এনেছে আমাকে এত দূরে, তার উৎস রয়েছে ওই ফুটোর মধ্যে। আমার হাত প্রসারিত হল সেই ছিদ্র পথেই।

সঙ্গে সঙ্গে একটা চিনচিনে তড়িৎপ্রবাহ অনুভব করলাম চেটোর ঠিক মাঝখানে ক্ষতস্থানের মুখে। অদ্ভুত সুখানুভূতি ওই ক্ষত মুখ দিয়ে যেন ধমনী-প্রবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অস্থিমজ্জায় রক্তপ্রবাহে। শরীর মন যেন জুড়িয়ে গেল আমার। মিলিয়ে গেল উন্মাদনা। স্থির হলাম, চাঞ্চল্য পালিয়ে গেল।

মিনিট কয়েক হাতটা ওইভাবে ধরে রেখে টেনে বার করে আনল লম্বকর্ণ অতিবৃদ্ধ। এক হাত দিয়ে মুছিয়ে দিল চেটোর রক্ত। আমি ম্লান আলোর আভায় দেখলাম সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

আমার চেটোয় কোনও ক্ষত নেই। ক্ষত মুখ বেমালুম জুড়ে গেছে। কাটাছেঁড়ার চিহ্ন পর্যন্ত নেই!

গভীর দৃষ্টি মেলে এবার অতিবৃদ্ধ চাইল আমার পানে। ইশারা করল হেঁট হয়ে ফুটোর মধ্যে দিয়ে ভেতরে দেখতে। আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল হতে প্রবলতর হচ্ছিল আমার মধ্যে। তাই আর দ্বিতীয়বার ইশারা করতে হল না। হেঁট হয়ে, একরকম বুকের ওপর শুয়ে পড়ে, তাকালাম ফুটো দিয়ে ভেতর দিকে। ভেবেছিলাম অদ্ভুত ভয়ংকর কিছু দেখব। কিন্তু তার বদলে এমন একটা জিনিস দেখলাম— যা ইস্টার দ্বীপে কোথাও দেখা যায় না।

একটা গাছ। ঝাঁকড়া। লতায় পাতায় সবুজ। বড় বড় পাতা কচুপাতার মতো বড়। অনেক

উঁচুতে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশের একটু কণা। সূর্য উঠছে। রোদের আভা কুয়োর মতো গহ্বরের ওপরের কিনারায় পড়ছে। গাছের মগডাল পর্যন্ত ততদুর ওঠেনি। ওঠেনি বলেই বাইরে থেকে এ-গাছ দেখা যায় না। গ্রানাইট স্তূপের আড়ালে রয়ে গেছে যুগ যুগ ধরে।

আমি কিন্তু দেখেছি এ গাছ। কলকাতায় বসেই দেখেছি। বাঁ হাতের মুঠোয় ধরা পাথর ফলকে এই গাছটারই ছবি খোদাই করা রয়েছে। বড় বড় ওই কচু পাতার মতো পাতা এত বড় কোনও গাছে হয় জানা ছিল।

কিন্তু পাথরের ফলকটা তো হাজার হাজার বছরের পুরনো। গাছটার বয়সও কি তাই? নাকি, এই গাছটারই পূর্বপুরুষের ছবি? এক গাছ গেছে— সে জায়গাই বীজ থেকে জন্মেছে আরেকটা গাছ?... তা ছাড়া যার আকর্ষণে প্লেনে চেপে, জাহাজে করে উন্মাদের মতো এত দূর ছুটে এলাম— সে কি নিছক একটা গাছ?

অমনি মাথার মধ্যে আবার কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কচুপাতার মতো বড় বড় পাতাগুলো যেন দুলে দুলে উঠল। আর স্পষ্ট মনে হল গোটা গাছটা যেন অনিমেষে চেয়ে আছে আমার পানে— ঠিক যেভাবে কলকাতার ল্যাবোরেটরিতে মনে হয়েছিল মানিপ্ল্যান্ট চেয়ে ছিল আমার দিকে।

এর পরেই ঘটল আরেকটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আমার চোখের ভুল কিনা বলতে পারব না— কিন্তু মনে হল গোটা গাছটার থেকে একটা প্রায়-অদৃশ্য রশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে এসে পড়ল আমার দুই ভুরুর মাঝখানে। আতস কাচ দিয়ে রোদ্দুরে ফোকাস করলে যেমন দেখায়— ঠিক তেমনি ভাবে যেন একটা হালকা সবুজ রশ্মি গাছটার গা থেকে মিহি বাষ্পের মতো বেরিয়ে এসে সরু হয়ে পড়ল আমার দুই ভুরুর মাঝখানে।

তার পরেই আমার সমস্ত আবোলতাবোল ভাবনাকে ডুবিয়ে দিয়ে জোরদার হয়ে উঠল কতকগুলো কথা মাথার মধ্যে। মাথার মধ্যে— কানের মধ্যে নয়। কান দিয়ে কিছু শুনলাম না। কথাগুলো যেন গুঞ্জনের মতো ভেসে ভেসে গেল মাথার মধ্য দিয়ে।

'বন্ধু, গাছটা তোমাকে টেনে এনেছে ঠিকই— কিন্তু টানিয়ে এনেছি আমরা, গ্রহান্তরের পাখিমানুষরা, যাদের ছবি তোমার হাতে ধরা পাথরের ফলকে খোদাই করা রয়েছে। গাছেরও প্রাণ আছে। আর আছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা— যা তোমাদের নেই। তোমরা চোখ কান নাক জিভ চামড়া দিয়ে যা টের পাও— গাছেরা পারে তার চাইতেও অনেক বেশি। গাছেদের এই বিরাট ক্ষমতার কণামাত্রও তোমরা এখনও টের পাওনি। ওদের ক্লোরোফিল রহস্য পর্যন্ত আজও ধরতে পারোনি। গাছ তাই তোমাদের কাছে যতটা রহস্য আমাদের কাছে তা নয়।

'গাছেদের কসমিক রশ্মি গ্রহণ ক্ষমতা আছে। দূর দূর গ্রহ থেকে পাঠানো খবর গ্রহণ করার মতো ক্ষমতাও আছে— যে-ক্ষমতা তোমাদের তৈরি কোনও রেডিয়োর নেই। তাই আজও আমাদের কোনও বার্তা তোমরা ধরতে পারোনি। কিন্তু ওরা পেরেছে। ওরা তাই জানে, শুধু ওরাই জানে— আমরা বারবার আসি এই পৃথিবীতে। উড়ন চাকির ধোঁকাবাজি বলে তোমরা তাকে হেসে উড়িয়ে দাও।

'মহাজাগতিক রশ্মি সংহত করে নিজেদের মধ্যে রাখতে পারে বলেই গাছপালার

ওষধিগুণের তুলনা হয় না। কোনও কেমিক্যাল দিয়ে যে রোগ তোমরা সারাতে পারো না, গাছপালারা তা পারে গ্রহনক্ষত্রের এনার্জিকে পাতায় পাতায় আহরণ করে সঞ্চয় করে রাখতে পারে বলে। রহস্যজনক সেই ভাইটাল এসেন্সের কোনও হদিশ তোমরা আজও পাওনি— পেয়েছিল তোমার দেশের প্রাচীন মুনিঋষিরা, আয়ুর্বেদ পণ্ডিতরা। জীবক তাদের একজন।

'তোমার হাতের ক্ষত নিরাময় দেখে বিশ্বাস হচ্ছে কী অসাধ্যসাধন করতে পারে এই গাছেরা? যাদের তোমরা নিকৃষ্ট প্রাণীরও অধম মনে করো— নড়ে চড়ে হেঁটে বেড়াতে পারে না বলে?

'কিন্তু ওদের তা দরকার হয় না। এক জায়গায় থেকেই গ্রহ-গ্রহান্তরে যারা যোগাযোগ রাখতে পারে, তারা এই পৃথিবীর সমস্ত খবরই রাখে। উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের সমস্ত কোষের মূল যা— ওরা সেই মূল প্রাণশক্তি দিয়ে এক হয়ে আছে। তোমাদের খবর তো বটেই, গোটা উদ্ভিদজগতে কোথায় কী হচ্ছে— চক্ষের নিমেষে তা জেনে যাচ্ছে প্রতিটি গাছ।

'এই কারণেই কলকাতার মানিপ্ল্যান্ট মারফত খবর পেয়েছিলে তুমি। এক সুতোয় বাঁধা যে ওদের প্রাণশক্তি। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ দিয়ে এখান থেকেই খবর গেছিল মানিপ্ল্যান্টে। তোমাকে আমন্ত্রণ এবং আকর্ষণ সবই করা হয়েছে এই গাছ আর তোমার মানিপ্ল্যান্টের মধ্যে দিয়ে। পাথরের ফলকটা আমরাই রেখে এসেছিলাম তোমার ল্যাবোরেটরিতে— যাতে বুঝতে পারো কোথায় তোমাকে আসতে হবে।

'তোমাকে এখানে টেনে আমার কারণটা এবার বলি। গাছরা শঙ্কিত তোমাদের অদূরদর্শিতায়। এই পৃথিবীকে প্রাণের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে শুধু গাছেরাই। আদিতে ছিল গাছ— জীবজগতের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে তাদের জন্যেই। এরা অ্যালকেমিস্টও বটে! এক পদার্থকে ভেঙে আরেক পদার্থ বানিয়ে নিতে পারে নিজেদের মধ্যে— যা তোমরা ভাবতেও পারো না। ক্রমাগত বস্তুর উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে এরা। ফসফরাস থেকে গন্ধক বানাচ্ছে, ক্যালসিয়ামকে ফসফরাসে রূপান্তর করছে, ম্যাগনেসিয়ামকে ক্যালসিয়ামে নিয়ে যাচ্ছে, কার্বনিক অ্যাসিড থেকে ম্যাগনেশিয়াম সৃষ্টি করছে, নাইট্রোজেন থেকে তৈরি করছে পটাসিয়াম। আণবিক পরিবর্তনের গুপ্ত রহস্য এখন কেবল এরাই জানে— আর জানত তোমাদের অ্যালকেমিস্টরা, যাদের তোমরা ধাপ্পাবাজ বলে উড়িয়ে দাও।

'তোমাদের অস্তিত্ব যাদের ওপর নির্ভর করছে, সেই পরম উপকারী বন্ধু গাছপালা কেটে তোমরা পৃথিবীটাকে ন্যাড়া করতে চলেছ। যেমন করা হয়েছে এই দ্বীপকে। তোমরা আণবিক বোমা ফাটিয়ে আর কলকারখানার ধোঁয়া ছেড়ে, নদীতে সাগরে কেমিক্যাল ঢেলে বাতাস আর জলকে বিষাক্ত করে তুলছ। যারা তোমাদের বাঁচাতে পারে, তাদের কিন্তু ধ্বংস করে চলেছ।

'গাছরা তাই আবার পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে ঠিক করেছে। আমরা তাদের সাহায্য করব। যে ধীর গতি শক্তি দিয়ে তারা আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এক পদার্থকে আরেক পদার্থে রূপান্তরিত করছে— তারই নাম আণবিক শক্তি। প্রলয়ংকর এই শক্তি ওদের প্রতিটি কোষে রয়েছে। তোমাদের আণবিক বোমা নিয়ে অদূরদর্শিতার সাজা ওরা দেবে এই শক্তি দিয়েই

পালটা মার মেরে। সে যে কী ভয়ংকর সাজা, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

'তোমরা বলতে তোমার সতীর্থ বৈজ্ঞানিকদের কথা বলছি। তারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া আর কিছু মানতে চায় না— কিন্তু প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতাও নেই। তাই যা অপ্রত্যক্ষ, তাকেই অবৈজ্ঞানিক আর অস্তিত্বহীন বলেই বাহাদুরি নিতে চায়।

'কিন্তু তুমি এদের মধ্যে ব্যতিক্রম। হ্যাঁ, তুমি। তাই তোমাকে আমরা এনেছি বিজন এই দ্বীপে। তুমিই একমাত্র বৈজ্ঞানিক যে অসম্ভবের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আঁচ করতে পারো। তাই— তোমার মুখ দিয়ে সাবধান করতে চাই পৃথিবীর তাবৎ নির্বোধ বৈজ্ঞানিকদের।

'গাছেরা চায় না এই সবুজ পৃথিবীর জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাক। দানব প্রাণীদের ধ্বংস হয়েছিল রাক্ষুসে খিদে দিয়ে এই উদ্ভিদজগৎকে শেষ করতে চেয়েছিল বলে। রহস্যজনক সেই পাইকারি মৃত্যুর কোনও কিনারা আজও তোমরা করতে পারোনি।

'প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপ দানবের মতো তোমরাও যদি লুপ্ত হতে না-চাও, তা হলে সাবধান হও। পৃথিবীর জল-বাতাস আর বিষাক্ত কোরো না। গাছপালা কেটে জঙ্গল সাফ আর করতে যেয়ো না। যদি করো, তা হলে যা ঘটবে, তা রোধ করার ক্ষমতা কারও হবে না। তারপর বহু লক্ষ বছর পরে আবার জীবজগতের আবির্ভাব ঘটবে ঠিকই— কিন্তু তার দরকার আছে কি? সরীসৃপ দানবদের মতো তোমরা তো বুদ্ধিহীন নও?

'বন্ধু, এই আমাদের শেষ হুঁশিয়ারি। তোমার সঙ্গে আবার আমাদের যোগাযোগ ঘটবে। পৃথিবীবাসীর চৈতন্য উদয় করার ভার রইল তোমার ওপর।

'বিদায়।'

'দীননাথ, এরপর আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেছিলাম, জাহাজের ডেকে শুয়ে আছি। সন্ধেবেলা জাহাজ নিয়ে এসে ক্যাপ্টেন আমাকে দেখেছিলেন তীরে শুয়ে আছি। ওরাউংগা নেই। তাকে দ্বীপের কোথাও পাওয়া যায়নি। লাইফবোটও রয়েছে— নিয়ে পালায়নি। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সে যেন উবে গেছে দ্বীপ থেকে। একমাত্র সেই দেখেছে গ্র্যানাইট স্তূপের ভেতরে পাতাল সুড়ঙ্গ। কিন্তু সে না-থাকায় আমার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। তা ছাড়া আমি প্রলাপ বকছিলাম। পাগলের মতো চেঁচাচ্ছিলাম। তাই ওরা আমাকে কেবিনে আটকে রেখে ফিরিয়ে আনে নরওয়েতে। সেখান থেকে রেখে যায় কলকাতায়।

'দীননাথ, আমি জানি ওরা আমার ওপর চোখ রেখেছে। ওই আকাশের কোথাও ওদের ঘাঁটি আছে। কিন্তু যে কাজের ভার আমাকে দিয়ে গেছে, তা করব কী করে ভেবে পাচ্ছি না। কে শুনবে আমার কথা?

'কিন্তু আমি চেষ্টা করব। পৃথিবীকে মানুষশূন্য করতে আমি চাই না। তার আগে জানতে চাই, আমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি কিনা। আমার ব্রেনটা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবে?

চেয়ে দেখলাম জানলার সামনে বসানো মানিপ্ল্যান্টটাকে। সবুজ পাতাগুলো থিরথির করে কাঁপছে— হাওয়ায় নিশ্চয়।

ঘাস

গাছপালা নিয়ে কোনওদিন আমি মাথা ঘামাই না। ফুলের গাছ নিয়ে অনেকে মাতামাতি করে। আমার ওসব শখ নেই। আর পাঁচটা নির্জীব পদার্থের মতো গাছকে দেখেছি চিরকাল। তাই কোচিন গাঙ্গুলি যেদিন এসে বলল, তার অবিশ্বাস্য কাহিনি, বিশ্বাস করিনি একটা বর্ণও।

সকালবেলা মুখ ধুয়ে খবরের কাগজ পড়ছি, এমন সময়ে কড়া নেড়ে ডাকল কোচিন গাঙ্গুলি। এক পাড়াতেই থাকে। নামটা অদ্ভুত বলে আরও বেশি চিনি। ভদ্রলোক বাঙালি ক্রিশ্চান। বাবা নাম রেখেছিলেন বিজয় কোচিন। কোচিন ওর নামের পদবি। এফিডেভিট করে নাম পালটে নিয়েছে। এখন শুধু কোচিন গাঙ্গুলি। তক্তপোশে বসল কোচিন গাঙ্গুলি। বছর পঞ্চাশ বয়স। চওড়া চৌকো চোয়াল। পেশিবহুল গর্দান। দু'পা-ওলা মোষ বললেই চলে। মোষের মতোই খোলতাই গায়ের রং। বললে হেঁড়ে গলায়, 'দীননাথ, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এখন কোথায়?'

আমি বললাম, 'কেন বলুন তো?'

'বলছি। আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দেবে?'

'নিশ্চয় দেব— যদি কলকাতায় থাকেন। কিন্তু ব্যাপার কী?'

কোচিন গাঙ্গুলি তক্ষুনি কোনও জবাব দিল না। চোখ কুঁচকে জানলা দিয়ে চেয়ে রইল। খুব ভাবনায় পড়েছে মনে হল। আঙুলগুলোও অস্থির। নার্ভ যেন ঠিক নেই। চোখের নীচে পেশিও কাঁপছে থিরথির করে। অথচ দুর্ধর্ষ পুরুষ বলতে যা বোঝায়, কোচিন গাঙ্গুলি তাই। নেপাল থেকে গাঁজা এনে বেচে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার পর এখন ধরেছে জড়িবুটি, গাছ গাছড়ার ব্যাবসা।

পকেট থেকে চুরুট বার করে পরক্ষণেই চুরুট পকেটে রেখে নস্যির ডিবে বার করল কোচিন। বাঁ হাতের তালুতে বেশ খানিকটা নস্যি ঢালল। ডিবে পকেটে রেখে ডান হাতের দুই আঙুল দিয়ে পুরো নস্যিটা তুলে নিয়ে নাকের গহ্বরে ঠুসে দিয়ে ছলছল চোখে তাকিয়ে বললে, 'দীননাথ, ভূতে ধরেছে আমাকে।'

আমি চমকে উঠলাম, 'ভূত!'

'হ্যাঁ। অদৃশ্য ভূত। যেখানে যাচ্ছি, পেছনে পেছনে যাচ্ছে।'

'কী বলছেন?'

'দেখবে এসো,' বলে তক্তপোশ থেকে উঠে পড়ল কোচিন গাঙ্গুলি। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সদর দরজার সামনে। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। মাটি ভিজে। কোচিন গাঙ্গুলির চটি জুতোর ছাপ পড়েছে ভিজে মাটিতে। ঠিক পেছনে একজোড়া নগ্ন পায়ের ছাপ।

বললাম একটু বিরক্ত স্বরে, 'ভূত কোথায়?'

কোচিন গাঙ্গুলি সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। ভিজে মাটির ওপর দিয়ে কয়েক পা হেঁটে গেল। স্পষ্ট দেখলাম, ওর ঠিক পেছনে ভিজে মাটির ওপর খালি পা ফেলে ফেলে কে যেন হেঁটে যাচ্ছে।

পায়ের ছাপ পড়ছে ভিজে মাটিতে। কিন্তু যে হাঁটছে— তাকে দেখা যাচ্ছে না।

কোচিন গাঙ্গুলি দৌড়োল। অদৃশ্য ভূতও দৌড়োল। পায়ের আঙুলগুলো কেমন যেন ছাপ এঁকে গেল ভিজে মাটিতে— যেন ঝুঁকে পড়ে দৌড়োচ্ছে, পায়ের গোড়ালি আর পুরো পাতার ছাপ পড়ছে না। কোচিন গাঙ্গুলি দাঁড়িয়ে গেল। পায়ের ছাপও দাঁড়িয়ে গেল। কোচিন গাঙ্গুলি হেঁটে ফিরে এল। পায়ের ছাপও আস্তে আস্তে পুরো ছাপ ফেলে হেঁটে এল ঠিক পেছন পেছন। শুধু তাকে দেখা গেল না।

সদর দরজা পেরিয়ে কোচিন গাঙ্গুলি বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম আমি।

ম্লান হেসে ও বললে, 'ভয় নেই, ও তোমার বাড়ি ঢুকবে না। শুধু আমাকেই ভয় দেখাচ্ছে।'

কাষ্ঠ হেসে বললাম, 'কিন্তু কেন?'

'সেই কথাই তো বলতে এসেছি, দীননাথ।'

'বলুন, তা হলে।'

'দীননাথ, তুমি তো জানো আমার ব্যাবসাটা কীসের। আমি এত খারাপ ছিলাম না। ষোলো বছর বয়েসে শিয়ালদায় যে দাঙ্গা হয়, তাতে জোর করে আমাকে লটকে দেয় বিশুদা— মৌলালির কুখ্যাত বিশু পাল। মুর্শিদাবাদ হোটেল লুঠ হল মনে আছে? আমাকে ছুরিসুদ্ধ অ্যারেস্ট করল মুচিপাড়ার ওসি। অথচ কালপ্রিট পার পেয়ে গেল— বিশুদার চুলের ডগাও কেউ ছুঁতে পারল না। জেল থেকে ঘুরে এসে যখন গেলাম আস্তানায়, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে বিশুদা বললে, 'যাক, অ্যাদ্দিনে আমাদের দলে আসবার ছাড়পত্র পেলি তুই। দাগি আসামি ছাড়া কাউকে আমি দলে রাখি না।'

শুনে আমার সন্দেহ হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বিশুদা, তুমিই কি তা হলে আমাকে দাগি করে দিলে?'

'হা-হা করে হেসে উঠে বিশুদা বলেছিল, 'অ্যাদ্দিনে বুঝলি? তোকে দীক্ষা দিলাম।'

'আমিও হা-হা করে হেসেছিলাম। দীক্ষা পেয়ে যেন ধন্য হয়ে গেছি, এমনি ভান করেছিলাম। কিন্তু মনটা সেই দিন থেকে বিষিয়ে গিয়েছিল বিশুদার ওপর। অথচ প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারিনি— বললেই তো লাশ ফেলে দেবে বিশুদা। ভাঙা মাঠে অমন দু'-দশটা লাশ সারাবছরেই পাওয়া যায়। হাসতে হাসতে পুলিশ ইনফর্মারের একটা একটা করে

আঙুল ভেঙেছে এই বিশুদা, সিগারেট জ্বালিয়ে চোখের পাতায় চেপে ধরে অন্ধ করে দিয়েছে, থান ইট মেরে মেরে পাঁজরা ভেঙেছে— তারপর লাশটা ফেলে দিয়েছে ডাস্টবিনে। পুলিশ কিন্তু বিশুদাকে ধরেনি। সুতরাং বিশুদার শত্রুতা করে বাঁচব না জেনেই দলে ভিড়ে গেলাম। নেপাল থেকে গাঁজা আর সিদ্ধি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এনে পঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে কলকাতার বাজার পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম। কারবার জমে উঠল কয়েক বছরেই। উত্তর ভারতের অনেক রাজামহারাজার সঙ্গে এক টেবিলে বসে ড্রিঙ্ক করেছি—খাতির আছে এখনও। এই জোরেই একদিন বেরিয়ে এলাম বিশুদার দল থেকে। একলাই চালিয়ে গেলাম গাঁজা আর সিদ্ধির চোরাই কারবার। কয়লার দোকান যেটা দেখো— ওটা পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে। কয়লার গাদা তছনছ করেও ওরা এককণাও গাঁজাসিদ্ধি পায়নি। পাবে কী করে? আমি মাল লুকিয়ে রাখতাম একটা শুকনো কুয়োর তলায়। একদিন তাও ধরা পড়ল। জেলে গেলাম। জেলে বসেই শুনলাম, খবরটা দিয়েছে বিশুদা। আমার ব্যাবসা লাটে তোলার জন্যে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে। আড়াই লাখ টাকার গাঁজা গেল পুলিশের হাতে— কিন্তু আমি ফতুর হলাম না। আরও অনেক লাখ টাকা ছড়ানো ছিল নানান জায়গায়। তা ছাড়া, নামী ব্যারিস্টার পর্যন্ত মোতায়েন থাকে আমাদের হয়ে কেস লড়বার জন্যে। তাই, সাত-সাতটা মার্ডারের চার্জ আর গাঁজা-সিদ্ধির চোরা চালানের চার্জ নিয়েও বেকসুর খালাস পেলাম জেল থেকে। ঘেন্নায় কিন্তু এ লাইনই ছেড়ে দিলাম। পাড়াও ছাড়লাম। এলাম তোমাদের পাড়ায়। নেপালের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতাম বলে আর একটা ব্যাবসার সন্ধান পেয়েছিলাম। ওখানে ওষুধ তৈরি করার যে-সব গাছগাছড়া পাওয়া যায়, তার বিরাট মার্কেট আছে বম্বে আর কলকাতায়। আয়ুর্বেদ মতের ওষুধের যুগ ফিরে আসছে— ইন্ডিয়ার বাইরেও তার বিরাট ডিম্যান্ড। অথচ হিমালয় অঞ্চল থেকে এইসব গাছগাছড়া এনে শহরের মার্কেটে ফেলবার কেউ নেই। আমি নেমে পড়লাম সেই ব্যাবসায়; এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে এক টাকার জিনিস একশো টাকায় বেচেও মাল সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারছি না।

'এত কথা তোমাকে বললাম যাতে আমার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা স্পষ্ট হয়। পনেরো আনা বাঙালি ছেলের মতো সাবু খাওয়া ফিগার আমার নয়। দাঙ্গাহাঙ্গামায় পিছপা নই। খুন করতে হাত কাঁপে না, করেও বুক কাঁপে না। নোংরা পথ ছেড়ে সাদা পথ ধরেছি বলে পইতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়ে গেছি ভেবো না। সব ব্যাবসাই বড় নিষ্ঠুর ব্যাবসা। সেখানে মন বলে কিছু রাখতে নেই। মেশিনের মতন কর্তব্য করে যেতে হয়। বিবেকের বালাই রাখতে নেই। আমার এই ব্যাবসাতেও রাখিনি। পায়ের তলায় কাঁটা গজাতে দিইনি। প্রতিদ্বন্দ্বী এলেই নির্মমভাবে নির্মূল করেছি— এ ব্যবসায় তাই আমার মনোপলি— আমি ছাড়া গতি নেই ওষুধ কোম্পানিগুলোর।

'দার্জিলিং থেকে ল্যান্ডরোভারে চেপে পশুপতিনাথ গেছ? যাওনি? অনেকে যায় শখ করে। নেপালের বর্ডার পেরিয়ে পশুপতিনাথে ঢোকে। নেপাল কারেন্সি নিয়ে কেনাকাটা করে ফিরে আসে— চেকপোস্টে অফিসাররা একটু ভয়-টয় দেখিয়ে ছেড়ে দেয়। জানে তো, কেউ শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার কারবার করতে আসেনি।

'চেকপোস্টের সবার সঙ্গে কিন্তু ভীষণ দহরম মহরম আমার। টাকায় কিনে রেখেছি সব মিঞাকে! অন্যায় কাজ আজকাল আর কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে করে না— বুক ফুলিয়ে করে। এমন স্বর্গরাজ্য আগে কখনও ছিল না।

'যাই হোক, উলটোপালটা বকছি মনে করে বিরক্ত হয়ো না। প্রত্যেকটা কথাই জানবে আমার এই অদ্ভুত কাহিনির সঙ্গে যুক্ত।

'নেপাল সাইডের চেকপোস্টে গুরুং বলে এক নেপালির সঙ্গে দোস্তি আমার অনেক দিনের। মাস ছয়েক আগে আমার নিজস্ব ল্যান্ডরোভারে তার সঙ্গে খানাপিনা করছিলাম গাছগাছড়ার নতুন দালালদের ঠিকানা বার করার জন্যে। গুরুং তখন বললে, কাছেই ঝরনার ধারে নাকি একজন তিব্বতি এসেছে। ঝোলায় করে এনেছে এমন সব জড়িবুটি যা লাখ টাকা দিলেও পাওয়া দুষ্কর। শহর অঞ্চলেই ওসব জিনিসের কদর— পশুপতিনাথের গেঁইয়ারা কিছু বোঝে না, আমি দাঁও পিটে নিতে পারি।

'গুরুংই দেখিয়ে দিল তিব্বতি উদ্‌বাস্তুটি আস্তানা নিয়েছে কোথায়। পশুপতিনাথের যে রাস্তাটা চেকপোস্ট থেকে বেরিয়ে নেপাল ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে সিধে নীচের দিকে নেমে গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে মাইলখানেক যেতে হয়। দু'পাশে ইমপোর্টেড জিনিসপত্তরের দোকানগুলো শেষ হয়েছে, তারও খানিক পরে ডানহাতি বড় বড় ফার্নের জঙ্গলের মধ্যে একটা পাহাড়ি ঝরনা। ঝরনার ধারে একটা স্লেট পাথরের ঝুপড়ি। তিব্বতির আস্তানা সেখানে।

'লোকটার চেহারা দেখবার মতো। তিব্বতিরা যে এরকম লম্বা হয়, না-দেখলে বিশ্বাস হবে না তোমার। মাথায় সাড়ে ছ'ফুট তো বটেই। তেমনি চওড়া কাঁধ। কম্বলের মতো মোটা কাপড়ের দুর্গন্ধওলা ছেঁড়া আলখাল্লা পরে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। ওইরকম কনকনে শীতে এরকম পোশাক না-পরলেও তো নয়। চোখ দুটো ছোট ছোট। হিন্দি বলে ভাঙা ভাঙা— কাজ চালানোর মতো। ইংরেজি একদম জানে না।

'আমি অবশ্য কিছু কিছু নেপালি ভাষা জানি। তিব্বতিও শিখেছি দু'-চারটে শব্দ। সেই বকুনি ছেড়ে, দিন কয়েকের মধ্যে বেশ খাতির জমিয়ে নিলাম লোকটার সঙ্গে। নাম তার বিলাই লামা।

'দিন কয়েক পরেই বুঝলাম, গুরুং যা বলেছে তা ষোলো আনা কেন, ষোলো দু'গুণে বত্রিশ আনা খাঁটি। বিলাই লামা গাছগাছড়ার জগৎ সম্বন্ধে যত খবর রাখে, যে-কোনও মডার্ন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীও অত খবর রাখে কিনা সন্দেহ।

'দীননাথ, তুমি জানো কিনা জানি না, আধুনিক বিজ্ঞান সাড়ে তিন লক্ষ প্রজাতির গাছপালার সন্ধান পেয়েছে এবং রেকর্ড করেছে। এত কথা আমারও জানার কথা নয়। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত তো বিদ্যে। কিন্তু জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে আর জংলিদের কাছ থেকে গাছগাছড়া সংগ্রহ করতে গিয়ে এসব বিদ্যায় বিদ্বান হতে হয়েছে আমার মতো গোমুখ্যুকেও। সাড়ে তিন লক্ষ রকমের গাছপালার বাইরেও অজানা গাছগাছড়া এখনও অনেক আছে— বিজ্ঞানে তা স্বীকার করে। সন্ধান এখনও পায়নি, এমনি অনেক গাছপালা এখনও রয়েছে বিশাল এই পৃথিবীতে— জানতে পারলে বর্তে যাবে। বিলাই লামার সঙ্গে মেলামেশা করে দেখলাম,

লোকটা এই ধরনের অনেক অদ্ভুত গাছগাছড়ার খবর রাখে— দেখে চিনতে পারে। কোথায় পাওয়া যায় তাও জানে। দুরারোগ্য ক্যান্সার পর্যন্ত সারিয়ে দেওয়ার মতো জড়িবুটিও নাকি ওর কাছে আছে। ওর ঝাঁপি আর ঝোলার মধ্যে— বেশির ভাগই আছে চারপাশের ঢেউ খেলানো দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের গায়ের গভীর জঙ্গলের মধ্যে, যখন দরকার তুলে আনে, স্থানীয় লোকদের রোগ সারিয়ে দেয়।

'শুধু এইটুকুই নয়। বিলাইয়ের সীমাহীন ক্ষমতার আরও পরিচয় পেলাম ওর কাছে দিন পনেরো ঘোরাঘুরি করার পর। তুমি অকাল্ট সায়ান্সের নাম শুনেছ নিশ্চয়। নাক-উলটোনো অল্প-জানা বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন পরাবিজ্ঞান। যেমন ধরো, অ্যালকেমিস্টদের বলা হয় পরাবিজ্ঞানী, অর্থাৎ অকাল্ট সায়ান্টিস্ট। যে-কোনও ধাতু থেকে সোনা তৈরি করতে পারত তারা— সত্যি মিথ্যে অতশত জানতাম না। কিন্তু বিলাই লামার সঙ্গে দিন পনেরো থাকবার পর ঘোর সন্দেহ হল, লোকটা একজন পাকা অকাল্ট সায়ান্টিস্ট। অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। আকাশে বাতাসে যে অদৃশ্য শক্তিপুঞ্জ রয়েছে, ও তার হদিশ রাখে। আর এই শক্তির জোরেই ও সাংঘাতিক শক্তিমান। আমরা যাকে তন্ত্রমন্ত্র বা পিশাচ ডাকিনীর ক্ষমতা বলি, বিলাই লামা যে-কোনও ভাবেই হোক এই ক্ষমতা অর্জন করেছে। খুব চাপা প্রকৃতির বলে মুখে কিছু বলেনি। কিন্তু হাবেভাবে জানিয়েছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকরা অফুরন্ত বিশ্বশক্তি ধারার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হতে পারে— তাতে কিছু এসে যায় না। বিলাই লামার মতো অনেক ক্ষমতাবান পুরুষ এই বিস্ময়কর শক্তির গোপন সিন্দুকের চাবিকাঠির সন্ধান রাখে। প্রয়োজন মতো তাকে কাজেও লাগায়।

'দীননাথ, আমি খুনখারাপি করে হাত পাকিয়েছি, মোটা ব্যাপারটা ভাল বুঝি— অত সূক্ষ্ম ব্যাপার মাথায় ঢোকে না। বিশ্বাস করি না। সাধু সন্ন্যাসীদের ভণ্ড বলেই মনে করতাম— বিভূতির মাহাত্ম্য আমার কাছে ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। তাই যখন বিলাই লামার কাছে এইসব অদ্ভুত শক্তির আবছা আভাস পেলাম, একবর্ণও বিশ্বাস করিনি। আমার নজর ছিল জড়িবুটির দিকে। দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়াগুলো হাতানো যায় কী করে এবং কী করে বারোমাস তাকে খাটিয়ে সেই সব গাছগাছড়ার চালান অব্যাহত রাখা যায়, এ ছাড়া আর কোনও মতলব মাথায় ছিল না। মুখে কিন্তু কোনওদিন তা প্রকাশ করিনি— বরং এমন ভান করেছি যেন আমি তার পরম অনুগত চেলা। গুরু দয়া করে কৃপাবর্ষণ করলে ধন্য হয়ে যাব।

'তা গুরু কৃপা করল। আমার বোলচালে কিছুটা নরম হলো। যখন শুনল, গাছগাছড়া চালান দিই পাঁচজনের উপকারের জন্য, গরিব দুঃখীর অসুখবিসুখ সারানোর জন্য— দু'-চার পয়সা যা পাই, তাইতেই পেট চালাই কোনওমতে— তখন বিলাই লামা একদিন তার ঝাঁপি খুলে বসল আমার সামনে।

'ঝাঁপিটা গাছের শেকড় দিয়ে তৈরি। এরকম সরু অথচ নাইলন দড়ির মতো মজবুত শেকড়ও কখনও দেখিনি। তার ওপর রং বেরঙের পুঁতির বাহারি কাজ। সাপুড়েদের ঝাঁপি যে সাইজের হয়, তার চারগুণ বড়। গড়নটা অবশ্য অনেকটা সেই রকমই।

'ঝুপড়ির মধ্যে কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে মেঝের ওপর বসে একটার পর একটা জড়িবুটি বার করতে লাগল বিলাই লামা। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার। সে যে কী অন্ধকার,

তা তোমরা শহুরে আদমিরা কল্পনাতেও আনতে পারবে না। তেমনি কনকনে ঠান্ডা। হাড়টাড় পর্যন্ত যেন কালিয়ে যাচ্ছে। জাপানি ঝাউয়ের মধ্যে দিয়ে বাতাস বইছে। অদ্ভুত একটা একটানা দীর্ঘ নিশ্বাসের মতো শব্দে সমস্ত বনটা যেন শিউরে শিউরে উঠছে। আমি নেহাত ডাকাবুকো বলেই অমন ভয়ানক ছমছমে পরিবেশেও রাত করে বসে রইলাম ঝুপড়িতে— বিলাই লামার ধনরত্ন দেখব বলে।

'তা ধনরত্নই বেরোল বটে। বলিরেখা আঁকা অজস্র চামড়ার ভাঁজে ঢাকা মুখটার একপাশে কেবল কেরোসিনের ডিবের টিমটিমে আলোটা পড়েছিল। ছোট ছোট চোখ দুটো প্রায় দেখা যাচ্ছিল না বললেই চলে। আমি কিন্তু ওরই মধ্যে লক্ষ করলাম, আশ্চর্য দ্যুতিতে ঝকঝক করছে তার চোখ জোড়া। হেঁট হয় বসে যেন হিরে মানিকের সম্ভার বার করছে একে একে, এমনিভাবে জড়িবুটিগুলো বার করে বাইরে রাখতে লাগল বিলাই লামা।

'সবগুলোর বৃত্তান্ত মনে নেই। বললেও তুমি বুঝবে না। দু'-চারটে রোগের কেবল নাম করব। যেমন ধরো, কর্কট রোগের ওষুধ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। বিলাই লামা একটা কালচে শেকড় তুলে বললে নেপালি কস্তুরীর সঙ্গে মিলিয়ে রুগিকে খাওয়ালে কাজ হবেই। আসাম বা কাশ্মীরের কস্তুরী হলে চলবে না— নেপালের হওয়া চাই। তারপর বার করল হরীতকীর মতো একটা ফল— ডায়াবেটিস বাপ বাপ করে পালাবে আফিঙের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে। তারপর বেরোল আর একটা লাল রঙের শুকনো পাতা— ধুতরোর সঙ্গে বেটে ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দিলে বদ্ধ পাগলও সুস্থ হবে। সবশেষে একটা চৌকোনা বাক্স বার করেই ঝট করে আবার ঝাঁপের মধ্যে রেখে ডালা বন্ধ করে দিল বিলাই লামা।

'টিমটিমে আলোয় চকিতের মধ্যে দেখেছিলাম বাক্সটা। ধাতুর চৌকোনো একটা কৌটো। লম্বায় চওড়ায় চার আঙুলের মতো। ডালাটা ধাতু গলিয়ে সিল করে দেওয়া হয়েছে— ছেঁদা নেই কোথাও। পরে দেখেছিলাম, ধাতুটা সিসে।

'ঝপ করে ডালা বন্ধ করে দিতেই আমি চেয়েছিলাম ওর চোখের দিকে। ঝকঝকে চোখ দুটো লাল পাথরের মতো মনে হল। সেই মুহূর্তে তাকে যেন মানুষ বলে মনে হল না। কেননা, অমন চোখের চেহারা কোনও মানুষের মুখে দেখা যায় না। বাক্সটা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত আছড়ে পড়েছিল তার চোখে মুখে— লাল হয়ে গিয়েছিল মুখ, সেই সঙ্গে চোখ।

'খটকা লাগল আমার। আস্তে করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী আছে কৌটোটায়। বিলাই লামা কর্কশ গলায় বলেছিল, 'তা জেনে তোমার দরকার কী? গাছগাছড়া চেয়েছিলে— এই নাও। এসব জিনিস আর কেউ তোমাকে দেবে না। দরকার হলে আরও নিয়ে যেয়ো— গরিব দুঃখীর উপকারে লাগলে আমি শান্তি পাব।'

'কিন্তু বিলাই লামাকে শান্তি দিতে আমার বয়ে গেছে। আমার দরকার এমন কিছু যা দিয়ে তাক লাগিয়ে দেব কলকাতা-বোম্বাইয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে। ফাঁপিয়ে তুলব এক্সপোর্ট বিজনেস। বিলাই লামা মালপত্র যা বার করেছে, তা আমার আশার অতিরিক্ত। কিন্তু মানুষের আশার কি শেষ আছে? চাহিদারও কি শেষ আছে? সিসের কৌটোটা দেখে আর জিনিসটাকে লুকিয়ে ফেলার ধরন দেখে দৃঢ় বিশ্বাস হল, যা পেয়েছি

তার চাইতেও অমূল্য জিনিস আছে ওই কৌটোর মধ্যে— এমন জিনিস যা হাতছাড়া করতে রাজি নয় বিলাই লামার মতো পরোপকারী উদার মানুষও।

'সুতরাং আমি বায়না ধরলাম কৌটোর মধ্যে কী আছে, আমাকে দেখাতে হবে। বিলাই লামাও বেঁকে বসল। কড়া কড়া কথা বলে জড়িবুটি নিয়ে সরে পড়তে বলল আমায়। আমারও জেদ চেপে গেল। সিসের কৌটো না-দেখে নড়ব না। বিলাই লামা গেল খেপে। শান্ত মানুষটা হঠাৎ কীরকম যেন হয়ে গেল। জড়িবুটি মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে ঠেলে বার করে দিল ঝুপড়ির মধ্যে থেকে।

'গায়ে হাত দিল আমার— আমি কোচিন গাঙ্গুলি, যে সাতটা খুনের চার্জ নিয়ে বেকসুর খালাস পেয়েছে— তাকে ঠেলে বার করে দিল ঝুপড়ির মধ্যে থেকে। মাথায় খুন চেপে গেল আমার। আগেই বলেছি, ব্যাবসা বড় নিষ্ঠুর জিনিস। লাভের কড়ি গুনতে গিয়ে অনেক খারাপ কাজই ব্যাবসাদারকে করতে হয়। বিকেক-টিবেকের বালাই রাখলে ব্যাবসা হয় না— আর সব হয়।

'আমিও রাখলাম না। ঝুপড়ির বাইরে ঠেলে বার করে দিতেই বগলের তলায় বাঁধা চামড়ার হোলস্টার থেকে বার করলাম রিভলভার। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি বলে জিনিসটা সবসময়েই কাছে রাখি। অন্ধকারে কী বার করলাম, বিলাই তা দেখতে পায়নি। টের পেল যখন রিভলভারের কুঁদোর ঘায়ে খুলি চুরমার হল। ঝাঁপিটা নিয়ে সেই রাতেই নেপাল বর্ডার ক্রস করে দার্জিলিং চলে এলাম। চেকপোস্টে কেউ আটকাল না— সব তো টাকা খেয়ে বসে আছে। বিলাই লামার লাশ পরে পাওয়া গেছে কিনা আর জানি না। পাওয়া গেলেও নেপালে কে এক তিব্বতি খুন হয়েছে, তা নিয়ে ইন্ডিয়ায় কেউ মাথা ঘামায়নি।

'ম্যাল থেকে লেবং রেসকোর্স পর্যন্ত পাহাড়ের গা দিয়ে যে রাস্তাটা নেমে গেছে, সেইখানে আমার নিজের একটা বাড়ি আছে। ভোররাতে পৌঁছোলাম বাড়িতে। তর সইল না। সিসের বাক্সটা আগে খুললাম। ছুরি দিয়ে কেটে খুলতে হল। ভেতরে যা দেখলাম, তা হতাশ করবার মতোই একটা জিনিস। কতকগুলো শুকনো ঘাস, শেকড় সমেত।

'দার্জিলিং-এ লোডশেডিং লেগেই আছে। লেবং-এর পাওয়ার হাউস যখন তখন লোডশেডিং চাপিয়ে দেয়। ভোররাতেও অন্ধকার ছিল ঘরের মধ্যে। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে সিসের বাক্সটা খুলেছিলাম। ঘাস দেখে হতাশ হয়ে কৌটোটা আবার ঝাঁপির মধ্যে রেখে সিধে হয়ে বসলাম। বাইরে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল দার্জিলিং-এ যা আকছার লেগেই আছে। যদিও এপ্রিল মাস, কিন্তু বৃষ্টি হয় এবং হচ্ছেও। দরজাটা খোলা ছিল। দরজার পরেই দু'ধাপ সিঁড়ির পর রাস্তা। লণ্ঠনের আলো গিয়ে পড়েছিল ওপরের ধাপটায়।

'সিধে হয়ে বসে এই ধাপটার দিকে তাকাতেই দেখলাম ভিজে পায়ের ছাপ রাস্তা থেকে উঠে এসেছে ঘরের মধ্যে। খালি পায়ের ছাপ। আমি তো এসেছি জুতো পরে। এ-পায়ের ছাপ তা হলে কার?

'হ্যারিকেন তুলে ভাল করে দেখলাম। পায়ের ছাপটা ঘরে ঢুকেছে। আমি যেখানে বসেছিলাম মেঝের ওপর তার পেছনে শেষ হয়েছে।

'অদ্ভুত ব্যাপার তো। লোকটা তা হলে গেল কোথায়। ঘরের অন্ধকার কোণে লুকিয়ে

নেই তো? লণ্ঠন তুলে যেই এগিয়েছি একটা কোণের দিকে, অমনি শূন্য থেকে ভিজে পায়ের ছাপ ফুটে উঠল শুকনো মেঝের ওপর।

'যেন এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ সে সচল হয়েছে আমি সচল হতেই, আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেই পেছনের ছাপটাও দাঁড়িয়ে গেল। আবার এক-পা এগোতেই পায়ের ছাপটাও পেছন পেছন এক-পা এগিয়ে এল। কিন্তু কখনওই একেবারে কাছে এল না— হাত ছয়েক দূরে রয়ে গেল।

'সেই থেকে আজ পর্যন্ত অদৃশ্য মানুষটার পায়ের ছাপ ফলো করছে আমাকে, সে কে, তা বলতে পারব না। তবে পায়ের ছাপগুলো বেশ বড় সাইজের, তা তুমি নিজের চোখেই দেখে এলে। এ ছাপ যার পায়ের, সে রীতিমতো বিরাট মানুষ। বড় বড় চ্যাটালো পা— যেমনটা ছিল বিলাই লামার, যার লাশ ফেলে এসেছি নেপালের জঙ্গলে ঝুপড়ির মধ্যে।

'দীননাথ, প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে আমার দরকার এইজন্যেই। শুনেছি তিনি চোখে-ঠুলি-পরানো বৈজ্ঞানিক নন। খোলা মন নিয়ে সব জিনিস দেখেন— অবাস্তব অসম্ভব বলে কোনও কথা তাঁর ডিকশনারিতে নেই। শুকনো ঘাস কেন সিসের কৌটোয় রাখা হয়েছিল এবং কেনই বা সিসের কৌটো কেটে ঘাস বার করার পর থেকেই অদৃশ্য পায়ের ছাপ আমাকে দার্জিলিং থেকে ফলো করে তোমার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর ব্যাখ্যা তিনি নিশ্চয় করতে পারবেন। শুধু ব্যাখ্যা নয়, দীননাথ, আমাকে বাঁচাতে হবে। ওই অদৃশ্য পায়ের ছাপের পিছু নেওয়া থেকে আমাকে উদ্ধার করতেই হবে। আমি আর পারছি না...আর পারছি না... আর পারছি না।'

বলতে বলতে সাতটা খুনের চার্জে পার পাওয়া দুর্দান্ত কোচিন গাঙ্গুলি ঝরঝর করে কেঁদে ভাসিয়ে দিল তার মোষের মতো কালো মুখখানা।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র মানিপ্ল্যান্টের গায়ে গ্যালভ্যানোমিটার লাগিয়ে ঝুঁকে ছিলেন গ্রাফপেপারের ওপর। ফিতের মতো সরু কাগজে একটা সরু কলমের মতো বস্তু আঁকাবাঁকা রেখা এঁকে যাচ্ছে, উনি একদৃষ্টে তাই দেখছেন আর আপন মনে খি-খি করে হাসছেন।

প্রথমে আমি নিঃশব্দে ঢুকলাম ঘরের ভেতরে। রবারসোলের জুতো পরে এসেছিলাম বলে পায়ের শব্দ হল না। প্রফেসর টের পেলেন না। আমার পেছনেই ঢুকল কোচিন গাঙ্গুলি। তার আবার বেড়ালের মতো নিঃশব্দ চরণে চলাফেরার অভ্যেস। অনেক দুষ্কৃতকারীর এমনি অভ্যেস থাকে। দেহের ভর পায়ের আঙুলের ওপর রেখে হাঁটা চলা করে— ফলে কোনও শব্দ হল না। কিন্তু প্রফেসর হাসি থামিয়ে আরও ঝুঁকে পড়লেন রেখাচিত্র আঁকা কাগজের ফিতের ওপর। ঘাড়ের ওপর দিয়ে আমি দেখলাম, কলমটা হঠাৎ যেন খেপে গেছে। তড়াক তড়াক করে লাফাচ্ছে, এলোমেলো ছুটছে।

বিড়বিড় করে বললেন প্রফেসর, 'কী রে মানি, হঠাৎ খেপে গেলি কেন?'

কলমটা একটু থমকে গিয়ে একটা লম্বা ড্যাশ টেনে আবার তিড়িং করে নেচে উঠল।

প্রফেসর বললেন, 'বদলোক বাড়ি ঢুকেছে? কিন্তু আমি ছাড়া তো কেউ আর নেই বাড়িতে— আমাকে বদলোক বলছিস হারামজাদা।'

তিড়িং তিড়িং করে নেচে নিয়ে আবার কতকগুলো ড্যাশ, ফুটকি, দাঁড়ি টেনে উঁচুনিচু কাঁটাগাছের ছবি এঁকে গেল যেন কলমটা।

প্রফেসর অবাক হয়ে বললেন, 'বটে, বটে, দু'জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে। একজন দীননাথ, আর একজন ভারী পাজি লোক। মানুষ খুন করে। ঠিক আছে, এবার পেছন ফিরে তাকানো যাক— দেখি তোর কথা সত্যি হয় কিনা।'

বলে, প্রফেসর পেছন ফিরলেন।

ওঁর সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানার সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের নয়, তাই মানিপ্ল্যান্টের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন দেখে অবাক হলেও ভড়কে যাইনি। ভড়কে গেছিল দুর্দান্ত কোচিন গাঙ্গুলি। আমার পাঞ্জাবির কোনা খামচে ধরে ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল কাঠ হয়ে।

প্রফেসর জুলজুল করে প্রথমে চাইলেন আমার পানে। তারপর কোচিন গাঙ্গুলির দিকে।

বললেন, 'মানি ঠিকই বলেছে। দীননাথ, তোমার সঙ্গে ওই খুনেটাকে এনেছ কেন?'

আমি বললাম, 'সেটা বলব বলেই ওঁকে এনেছি। কিন্তু তার আগে দয়া করে বলবেন কি, আপনার ওই মানিপ্ল্যান্ট কি জীবন্ত?'

'সব গাছই জীবন্ত।'

'সে তো স্যার জগদীশ বোস বলে গেছেন মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু—'

'কথা বলছে মানিপ্ল্যান্ট আমার সঙ্গে কেমন করে— এই তো?'

'হ্যাঁ। শুধু কথাই বলছে না, চোখ নেই অথচ দেখতে পাচ্ছে। দিব্যদৃষ্টিও আছে দেখছি, নইলে জানল কী করে কোচিন গাঙ্গুলি মানুষ খুন করে?'

প্রফেসর চোখ পাকিয়ে কোচিন গাঙ্গুলির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন জবাব দিলেন না।

মোষের মতো কালো কোচিন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর সামনে। পাপী মানুষ তো— সাচ্চা মানুষের চোখের চাহনি সইতে পারে না।

প্রফেসর তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন খুব খুশি হলেন।

বললেন, 'তোমার নাম কোচিন গাঙ্গুলি? বিদঘুটে নাম তো। মানুষ-টানুষ খুন করো? বেশ করো বাবা, বেশ করো। তা পায়ের ধুলো যখন দিয়েছ, তোমাকে নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। এসো বাবা, সামনে এসো: বসো তো এই টুলটায়। দেখি আমার সবজান্তা মানিপ্ল্যান্ট আর কী কী খবর দেয় তোমার সম্পর্কে।'

কোচিন গাঙ্গুলি আর এক পা-ও নড়ল না। নার্ভের অবস্থা বিলক্ষণ কাহিল দেখলাম। নইলে সামান্য একটা মানিপ্ল্যান্ট দেখে ভয় পায়? অমন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে? চোখ তো নয়, যেন ছানাবড়া। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অভয় দিলেন প্রফেসর, 'এসে বাবা, এসো— কোনও ভয় নেই। মানি আমার বড় ভাল গাছ, কিচ্ছু করবে না। শুধু তোমার নাড়ি নক্ষত্র বলে দেবে।'

কোচিন অনড়।

প্রফেসর অধীর হলেন। খেঁকিয়ে বললেন, 'কী দেখছ অমন হাঁ করে? যার চোখ নেই, দাঁত নেই, কান নেই, শিং নেই, নখ নেই— তাকে অত ভয় কীসের?'

কোচিন যেন সম্মোহিত। নিঃসীম বিভীষিকা পুঞ্জীভূত বিস্ফারিত দুই চোখে।

প্রফেসর তেড়ে উঠে কী বলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে একটা বিদ্যুৎ ঝলক দেখলাম।

মানিপ্ল্যান্টের দিক থেকেই মনে হল এল ফ্ল্যাশটা। কোচিনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম বলেই গাছের দিকে তাকাইনি। চোখের কোণ দিয়ে আঁচ করলাম। বাতাস কেটে একটা আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের ঢেউ যেন নিমেষ মধ্যে সেইদিক থেকে ছুটে এসে স্পর্শ করল কোচিনকে।

বাজপড়া বৃক্ষের মতোই আড়ষ্ট হয়ে গেল কোচিন। দুই চোখ কপালে উঠে গেল। টলমল করে উঠেই দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর।

সভয়ে তাকালাম বিদ্যুতের উৎসের দিকে। থিরথির করে কাঁপছে মানিপ্ল্যান্ট। ঘরে একদম হাওয়া নেই। বাতাসে নিশ্চয় কাঁপছে না। মানুষ হলে বলতাম 'আপাদমস্তক' কাঁপছে মানিপ্ল্যান্টের, ঠিক যেভাবে রাগে কাঁপে একটা জলজ্যান্ত মানুষ সেইভাবে। হতভম্ব ভাবটা কেটে গেল প্রফেসরের খি-খি হাসিতে।

'এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল, দীননাথ। চলো তোমার ফ্রেন্ডকে অন্য ঘরে নিয়ে যাই। মানি ওকে মেরে ফেলবে এখানে রাখলে।'

কোচিন মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জোরালো ইলেকট্রিক শকে জ্ঞান হারিয়েছিল। নার্ভের গোড়া পর্যন্ত নড়ে গিয়েছিল। ধরাধরি করে ভারী দেহটাকে এনে ফেললাম পাশের ঘরে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'এ কী সাংঘাতিক এক্সপেরিমেন্ট আপনি করছেন প্রফেসর?'

ফোকলা মাড়ি বার করে যেন হেসে কুটিপাটি হলেন প্রফেসর।

বললেন, 'সাংঘাতিক কী হে, বলো যুগান্তকারী। হাজার রহস্যের দ্বীপে গিয়ে যা দেখে এসেছি, টনক নড়েছে তার থেকেই। সে দ্বীপে গাছ ছিল মোটে একটা— ঘাস ছিল বিস্তর। কিন্তু ওই একটা গাছই আমার চোখ খুলে দিয়েছে।'

মনে পড়ে গেল হাজার রহস্যের দ্বীপ ইস্টার আয়ল্যান্ডে তাঁর রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। সে-কাহিনি আমিই লিখেছিলাম। মানিপ্ল্যান্টের অবিশ্বাস্য ক্ষমতা বিশ্বাস হয়নি— সেই মানিপ্ল্যান্টকে এখন স্বচক্ষে দেখলাম বিদ্যুৎবর্ষণ করছে। সর্বজ্ঞ দৈবজ্ঞের মতো সাংকেতিক রেখাচিত্র দিয়ে কোচিন গাঙ্গুলির গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে। ভয়ংকর এই মানিপ্ল্যান্ট নিয়ে এ কোন উন্মাদ পরীক্ষায় মত্ত হয়েছেন প্রফেসর?

ইস্টার দ্বীপে তিনি ঘাস দেখে এসেছিলেন। হাজার রহস্যের দ্বীপে সে-ও এক রহস্য। কোচিন গাঙ্গুলিও সিসের কৌটোয় নিয়ে এসেছে গুচ্ছের শুকনো ঘাস!

প্রফেসর মিটিমিটি চোখে চেয়ে ছিলেন অজ্ঞান কোচিনের দিকে।

বললেন, 'লোকটা একটা জীবন্ত বিস্ময়। মানি ওকে দেখে এই প্রথম বিদ্যুৎ টেনে আনল অ্যাটমসফিয়ার থেকে। কিন্তু কেন?'

আমি তাল বুঝে জিজ্ঞেস করলাম, 'অ্যাটমসফিয়ার থেকে বিদ্যুৎ টেনে আনল মানে? গাছ কি লাইটনিং কনডাক্টর?'

'গ্যেটের নাম শুনেছ?'

'জার্মান কবি গ্যেটে?'

'হ্যাঁ। উনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে গোধূলি লগ্নে ওরিয়েন্টাল পপির ফুল ফ্ল্যাশ

নিক্ষেপ করে। উনি তা দেখেও ছিলেন।'

'ফুলের বিদ্যুৎ।'

'তোমার ডান হাতি বইয়ের তাকটায় ওই যে বাঁধানো ম্যাগাজিনগুলো দেখছ, ওর মধ্যে পাবে লন্ডন গার্ডেনার্স ক্রনিকল। ১৮৫৯ সালে ওখানে একটা রিপোর্ট ছাপা হয়। ভারবেনা বলে একরকমের লেবু-ঘাস থেকে আলোর ফ্ল্যাশ দেখা গিয়েছিল, বিশেষ করে বিদ্যুৎ-ঝড় এগিয়ে আসার সময়ে।'

'ঘাসের ফ্ল্যাশ।'

'ইয়েস, মাই বয়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়িয়ে বিদ্যুৎ টেনে আনবার পর থেকেই জানা গেছে বায়ুমণ্ডলের তড়িৎকে যে-কোনও ছুঁচলো পয়েন্ট দিয়ে আকর্ষণ করা যায়। লাইটনিং কনডাক্টরের আবিষ্কার হয়েছে সেই থেকে। লেমস্ট্রম নামে এক বৈজ্ঞানিক তখন যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে ছিলেন, গাছের ছুঁচলো পয়েন্টও বায়ুমণ্ডলের ইলেকট্রিসিটিকে টেনে আনতে পারে। দীননাথ, এইমাত্র তুমি তা স্বচক্ষে দেখে এলে, অলৌকিক কিছু নয়।'

'কিন্তু—'

'ইডিয়ট। আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে, পৃথিবীতে থাকে নেগেটিভ ইলেকট্রিক্যাল চার্জ। অ্যাটমসফিয়ার হয় পজিটিভ। গাছপালা আর মাটি থেকে ইলেকট্রনের ধারা ছুটে যায় আকাশের দিকে। ঝড় এলে মেরুপ্রবণতা অর্থাৎ পোলারিটি পালটে যায়। আর্থ হয়ে যায় পজিটিভ—মেঘের তলার দিক হয় নেগেটিভ। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখো মূর্খ— ঝড় আসছে।'

তাকালাম জানলা দিয়ে। সত্যিই ঝড় আসছে। আকাশ কালো হয়ে গেছে।

প্রফেসর বললেন, 'আমার মানি অ্যাটমসফিয়ারের বিদ্যুৎকেই টেনে এনে ছুড়ে দিয়েছে তোমার বদ বন্ধুর দিকে। বজ্রবাণ মেরেছে বলতে পারো। আকাশের এই বিরাট এনার্জিকে কাজে লাগানোর কৌশলটা মানুষও এখনও শেখেনি— গাছেরা জানে। বুঝলে বোকচন্দর?'

বলেই, মাথা চুলকোলেন প্রফেসর, 'মানি এত রেগে গেল কেন তোমার ফ্রেন্ডের ওপর?'

ঝড়ো বাতাসে খটাখট শব্দে নড়ে উঠল জানলা দরজা। গুঙিয়ে উঠল বাতাস। টর্নাডো আর সাইক্লোন আজকাল কথায় কথায় হানা দিচ্ছে কলকাতায়। সেই রকমই একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সূচনা দেখলাম। শুকনো পাতা আর ধুলো ঘরে ঢুকছে দেখে প্রফেসর গিয়ে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিলেন, ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

আলো জ্বালিয়ে প্রফেসর এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বিমূঢ় চোখে আমি চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

প্রফেসর আমার চোখে চোখে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন পরিহাস মিলিয়ে যাওয়া স্বরে, 'কী হয়েছে, দীননাথ?'

আমি বললাম, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

পেছন পেছন এলেন প্রফেসর। সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। টিপটিপ বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ভালই হল। বৃষ্টি না হলে পায়ের ছাপটা দেখাতে পারতাম না।

আঙুল নামিয়ে দেখালাম, 'ওই দেখুন।'

ধুলো উড়ে এসে জড়ো হয়েছে দরজার সামনে সিমেন্ট বাঁধানো জায়গায়। গোল হয়ে ঘুরছে। বৃষ্টি পড়ে ভিজে যাচ্ছে। কিন্তু দুটো জায়গায় ধুলো নেই, বৃষ্টির জলও নেই।

দুটো মানুষের পায়ের ছাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে।

শুধু দুটো চিহ্ন। আর কিছু নয়। শুকনো খটখটে দুটো পদচিহ্ন। চারপাশে জল আর ধুলো।

প্রফেসর প্রথমে কিছু বুঝতে পারেননি। তারপর সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'পায়ের ছাপটায় জল পড়ছে না কেন?'

'কারণ ওখানে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে অদৃশ্য।'

'অদৃশ্য!' প্রফেসর যেন ভাবনায় পড়লেন, 'ইনভিজিবল ম্যান?'

'ইনভিজিবল ঘোস্ট। অদৃশ্য ভূত।'

প্রফেসর চোখ তুললেন, 'ভেতরে এসো।'

আমার কাহিনি শেষ করলাম। বললাম, 'ভিজে পায়ের ছাপ আমার বাড়ি থেকে পেছন পেছন এসেছে, জল শুকিয়ে গেছে— এখন দেখলেন শুকনো ছাপ।'

'কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে ডেকে আনব?'

'না, না, না!'

চমকে উঠলাম। জ্ঞান ফিরে এসেছে কোচিন গাঙ্গুলির। আঁতকে উঠেছে প্রফেসরের পদচিহ্ন মালিককে আমন্ত্রণের প্রস্তাব শুনেই।

প্রফেসর তক্ষুনি বললেন, 'ঠিক আছে, ভেতরে ডাকব না। ভিজুক বাইরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু ছাপটা কার মনে হয়?'

'বিলাই লামার।'

'কিন্তু তাকে তো তুমি খুন করে এসেছ।'

'মাথায় রিভলভারের কুঁদো মেরে ফ্ল্যাট করে দিয়েছিলাম।'

চিন্তিত মুখে প্রফেসর বললেন, 'তা হলে বোধহয় সে মরেনি।'

'তবে ভূত হল কেমন করে?'

'ভূত হতে যাবে কেন? অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'তাও কি সম্ভব।'

'কেন সম্ভব নয়? তুমিই তো টের পেয়েছিলে, সে অকাল্ট সায়ান্টিস্ট।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—'

'নিশ্চয় অজ্ঞান হওয়ার ভান করেছিল। তোমার হাতে রিভলভার দেখে গোঁয়ারতুমি করতে যায়নি। প্রাণটা খোয়াতে রাজি হয়নি। তাই তুমি পেছন ফিরতেই জড়িবুটির সাহায্য নিয়ে অদৃশ্য হয়ে তোমার পেছন পেছন এসেছে।'

'বলেন কী!'

'বৎস কোচিন, এইমাত্র দীননাথকে বলছিলাম মানিপ্ল্যান্ট বিদ্যুৎ টেনে এনেছে আকাশ থেকে— এর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার কিছু নেই। গাছের এই ক্ষমতাটা কেবল মানুষের

জানা নেই বলেই আমরা ভূতপ্রেতের কাণ্ড বলে মনে করি। ঠিক তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি লেখক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী ম্যাইরান একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করেন। মিমোসা পুডিকা গাছের সূর্য ডুবলেই পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখে গবেষণা করে প্রমাণ করেছিলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা অজ্ঞাত প্রভাবের অধীনে রয়েছে গাছপালারা। আড়াইশো বছর পরে ফ্লোরিডার ডক্টর জন অটো এক্সপেরিমেন্ট করে এই তথ্যের নতুন প্রমাণ পেয়েছিলেন। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান বলছে, সেকালে যাকে 'ইথিরিক ফ্লুইড' বলা হত উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে, তাকে এখন বলা যেতে পারে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক র‍্যাডিয়েশন— যে বিকিরণে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটারের দশ মহাপদ্মভাগের এক ভাগ থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এদের তরঙ্গ কম্পনও ১০-এর পিঠে একুশটা শূন্য বসালে যা হয়— ততবার; এদেরই মধ্যে অ্যাটমে অ্যাটমে সংঘাত লেগে 'কসমিক রে' সৃষ্টি হচ্ছে। এইসব মিলিয়ে যে 'ইউনিভার্সন' অথবা ইউনিভার্সাল র‍্যাডিয়েশন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাকেই বলা হয়েছে ইথার। রাশিয়ায় জন্ম নিয়েও ১৯২০ সালে প্যারিসে অনেকগুলো বই লেখেন জর্জ ল্যাকেভস্কি— ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ভদ্রলোক। উনি বলেছিলেন, সব জিনিসেরই মূল হল অজ্ঞাত কিছু কম্পন। 'ইউনিভার্সন' নামটা তাঁরই দেওয়া।'

বলে থামলেন প্রফেসর। আমি বিজ্ঞের মতো তাকিয়ে রইলাম। কোচিনের মুখ দেখে মনে হল বেচারা অজ্ঞান হয়ে যাবে।

প্রফেসর বুঝলেন। বললেন, 'তোমাদের জ্ঞান দিতে যাওয়াটা অন্যায় হয়েছে। সংক্ষেপে জেনে রাখো, এই ইউনিভার্সন দিয়ে অসাধ্যসাধন করা যায়। গাছপালা এই মহাজাগতিক ইউনিভার্সন থেকে সঠিক বিকিরণ আহরণ করে ক্যান্সার পর্যন্ত সারিয়ে দিতে পারে। জীবকোষের বিকৃতি ঘটিয়ে বিকট দানব সৃষ্টি করতে পারে। আবার তাকে অদৃশ্যও করে দিতে পারে।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হল। তাড়াতাড়ি বললাম, 'বিলাই লামা তা হলে ভূত নয়— অদৃশ্য মানুষ হয়েছে ই-ই-ই ইউনিভার্সনের দৌলতে?'

'ইয়েস, মাই বয়।'

'কিন্তু সে পেছন পেছন আসছে কেন?'

'সিসের কৌটোটার জন্যে।'

'কিন্তু ওর মধ্যে তো আছে গুচ্ছের শুকনো ঘাস।'

'১৯২২ সালে মিশরের ফারাও টুটেনখামেনের মমি কফিনের ওপরেও শুকনো ফুল পড়ে থাকতে দেখেছিলেন হাওয়ার্ড কার্টার। এত হাজার বছরেও পুরোপুরি নষ্ট হয়নি, লেগে রয়েছে তাজা রঙের রেশ। মমি একদিন জাগ্রত হবে, এই বিশ্বাস যাদের ছিল, ফুল তারা কেন রেখেছিল এবং ফুলগুলোর ধর্মই বা কী— তা নিয়ে এখনও যখন কোনও গবেষণা হয়নি তখন শুকনো ঘাস বলে অবজ্ঞা নাই বা করলে? অপদার্থ হলে সিসের বাক্সর মধ্যে কেউ ঘাস রাখে? সিসে দিয়ে বিকিরণ আটকানো হয় জানো তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—'

'আমার বিশ্বাস, এই ঘাসও প্রলয়ংকর বিকিরণের অধিকারী। ইউনিভার্সনের ছোঁয়াচ থেকে

তাকে সরিয়ে রাখার জন্যেই সিসের কৌটোয় পুরে সিল করে রাখা হয়েছে। মানুষের উপকার করার জন্যেই জড়িবুটি তোমাকে দিতে চেয়েছিল বিলাই লামা— ক্ষতি করার জন্যে সিসের ঘাস দিতে চায়নি, তুমি সেই জিনিস কেড়ে এনেছ। তাই সে অদৃশ্য হয়ে তোমার পেছন পেছন ঘুরছে। তাই আকাশের বিদ্যুৎ তোমার ওপর ছুড়ে দিয়ে রাগ দেখিয়েছে মানিপ্ল্যান্ট। ইউনিভার্সনের দৌলতে যে ওরা টেলিপ্যাথিতেও সক্ষম, পাকা অ্যালকেমিস্টও বটে।' একটু থামলেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'কোথায় সেই কৌটো?'

কোমরে বাঁধা একটা কাপড়ের থলি বার করে ঠকাস করে মেঝেতে রাখল কোচিন।

অমনি কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল যেন মাথার ওপর। সাদা আগুনের আভা ঠিকরে এল জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর।

সেই সঙ্গে অসহ্য একটা কম্পনে আপাদমস্তক শিউরে উঠল আমার। বাতাস যেন প্রবলভাবে আলোড়িত হচ্ছে। অতি তীব্র সুপারসোনিক সাউন্ডে যেন কানের পরদা থেকে মস্তিষ্কের কোষ পর্যন্ত ফেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চাইছে।

'মানিপ্ল্যান্ট চেঁচাচ্ছে। মানিপ্ল্যান্ট চেঁচাচ্ছে।' চেঁচাতে চেঁচাতে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। পেছন পেছন দৌড়োলাম আমি। মানিপ্ল্যান্টের ঘরে ঢুকে দেখলাম একটা অদ্ভুত জ্যোতি। মানিপ্ল্যান্ট ঘিরে একটা আশ্চর্য রামধনু পুঞ্জ। পাক খেতে খেতে রঙিন আলোর আবর্ত পাতা থেকে বেরিয়ে ছিটকে যাচ্ছে জানলা দিয়ে বাইরে। ছিটকে ছিটকে আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে গা থেকে। অবর্ণনীয় সেই দৃশ্য ভাষায় বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্ত গাছটা দুলছে। গ্যালভ্যানোমিটারে লাগানো কলমটা এলোমেলো ভাবে কীসব লিখে যাচ্ছে ফিতের মতো সরু কাগজে।

ঝুঁকে পড়লেন প্রফেসর। পর মুহূর্তেই পাগলের মতো এদিক-সেদিক হাতড়ে একটা সিসের চাদর তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, পেছন পেছন আমি।

কোচিন গাঙ্গুলি মেঝেতে চিতপাত হয়ে পড়ে। অজ্ঞান। প্রফেসর সিসের চাদরটা দিয়ে চক্ষের নিমেষে কাপড়ের থলিটা চেপে ধরে মুড়ে ফেললেন। হাতের চাপে দলা পাকিয়ে ফেললেন। তারপর একটা সিসের আলমারির ভেতরে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মাটিতে ফেলতেই সিসের কাটা জায়গাটা ফাঁক হয়ে গেছিল। মানিপ্ল্যান্ট তাই হুঁশিয়ার করে দিল।'

কম্পন থেমে গেছে। বাইরে শুধু মেঘের গুড়গুড় গজরানি। আর অঝোরধারে বৃষ্টি।

কপালের ঘাম মুছলাম। পাশের ঘরে গিয়ে দেখলাম জ্যোতি মিলিয়ে গেছে মানিপ্ল্যান্টের গা থেকে। শুধু কাঁপছে...উত্তেজনায় মানুষ যেমন কাঁপে। ফিরে এলাম। প্রফেসর স্মেলিং সল্টের শিশি ধরেছেন কোচিনের নাকের কাছে।

গা-পিত্তি জ্বলে গেল আমার— প্রফেসরের ওপর নয়, কোচিন গাঙ্গুলির ওপর। যত্তসব উটকো উৎপাত। ল্যাজে বেঁধে এনেছে এক অদৃশ্য জাদুকরকে যে শুধু পায়ের ছাপ দেখিয়েই আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দিচ্ছে আমার। না-জানি আরও কত ভেলকি দেখাবে এর ওপর।

ভেলকিরই বা আর বাকি কী রইল। গাছকে কে কবে চেঁচাতে শুনেছে? কে দেখেছে গাছের গায়ে রামধনু রঙের খেলা? গাছের বকবকানি কেউ কল্পনা করতে পারে? অথবা তাদের সর্বজ্ঞ ক্ষমতা? না, পাগল করে ছাড়বে দেখছি এই কোচিন আপদটা। বিদেয় করতে পারলে বাঁচি। সেই সঙ্গে বিদেয় হবে অদৃশ্য আতঙ্ক আর ভয়ংকর ঘাসের কৌটো।

প্রফেসরকে বলেই ফেললাম, 'আপদটাকে ফেলে দিয়ে আসব রাস্তায়?'

প্রফেসর যেন আঁতকে উঠলেন, 'পাগল হয়েছ! এক্সপেরিমেন্টের এমন গিনিপিগ কেউ হাতছাড়া করে?'

'কিন্তু এর কাছে থাকলে প্রাণটা যে এবার খাঁচাছাড়া হবে।'

'হোক গে,' অম্লানবদনে বললেন প্রফেসর, 'এক্সপেরিমেন্টটা তো হয়ে যাবে।'

এমন মানুষের সঙ্গে কথা বলাও ঝকমারি। রাগ করে বললাম, 'তা হলে আপনিই করুন এক্সপেরিমেন্ট— ভুতুড়ে কারবারে আমি নেই।'

'তাই কি হয়।' মিষ্টি করে বললেন প্রফেসর, 'তুমি হলে গিয়ে আমার— ওই যে তোমাদের রক ল্যাংগুয়েজে কী যেন বলে— চা— চা—'

'চামচে।'

'রাইট। তুমি হলে গিয়ে আমার চামচে। তোমাকে ছেড়ে কোনও এক্সপেরিমেন্ট করা যায়? গল্পটা লিখবে কে?'

গল্প লেখার নাম শুনেই মনটা আমার নরম হয়ে এল। এমনিতেই আমার পাঠক-স্বীকৃতিতে ঈর্ষান্বিত শত্রু লেখকরা গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে, আমি নাকি স্রেফ ইংরেজি গল্প মেরে প্রফেসরের নামে অদ্ভুত গল্পগুলো চালিয়ে যাচ্ছি। তা দেখুক বাছাধনরা এবার— ইংরেজি প্লটের আঁশটে গন্ধ বার করতে পারে কিনা দেখুক। এ ব্যাপারের শেষ পর্যন্ত না-দেখে নড়ছি না— বজ্রবাণে প্রাণ যায় যাক।

হঠাৎ ঠক করে স্মেলিং সল্টের শিশিটা নামিয়ে রাখলেন মেঝের ওপর প্রফেসর। বাঁ হাত দিয়ে চিবুক চুলকোতে চুলকোতে চিন্তান্বিত চোখে চেয়ে রইলেন কোচিনের মহিষ-মূর্তির দিকে।

ভাবান্তর লক্ষ করে কৌতূহলী হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভাবছেন?'

'ভাবছি,' বলে একটু চুপ করলেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'ভাবছি, লালচিন এত ঘনঘন—'

'লালচিন নয়, কোচিন।'

'ওই হল রে বাবা।'

'কী বলছিলেন।'

'বলছিলাম, কোচিন এত ঘনঘন অজ্ঞান হচ্ছে কেন?'

'নার্ভের বারোটা বাজিয়ে বসে আছে বলে।'

'আমি বুড়ো মানুষ— আমার নার্ভের অবস্থাও তেরোটা বেজে আছে। কিন্তু কই, আমি তো মানিপ্ল্যান্টের চেঁচামেচিতে অজ্ঞান হলাম না।'

'তাও তো বটে? কারণটা কী হতে পারে বলে মনে করেন?'

'প্রথমেই যে কারণটা মাথায় আসছে, তা হচ্ছে... তা হচ্ছে...'

'বলুন, বলুন, থামলেন কেন?'

'লালচিন—'

'কোচিন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কোচিন। কোচিন নিশ্চয় ঘাসটা ছুঁয়েছিল।'

'ছোঁবে তো বটেই। অত কষ্ট করে লুট করে সিসের কৌটো কেটে ভেতরকার মালকড়ি নাড়াচাড়া না-করে কেউ ছাড়ে?'

'তা হলে তুমিও বলছ?'

'বলছি তো বটেই। কিন্তু ঘাস ছুঁয়েছে বলে বারবার অজ্ঞান হয়ে যাবে কেন?'

'সাংঘাতিক বিকিরণ শক্তিসম্পন্ন ঘাস তো। বারবার ঘুমটা আসছে ভেতরে জবরদস্ত কোনও পরিবর্তনের খেলা চলছে বলে হয়তো।'

'পরিবর্তন!'

'তুমি কি জানো না অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে যে গামা-রশ্মি বেরোয়, তার প্রভাবে কোষের মধ্যেকার ক্রোমোজোমের সংগঠক বিভিন্ন জিন নষ্ট হয়ে গিয়ে জীবের আকৃতি-প্রকৃতি বদলে যায়?'

'সেটা পাঁচ বছরের বাচ্চাও জানে,' তেড়ে বললাম আমি। প্রফেসরের এই এক দোষ। নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে ভাবেন ক-অক্ষর গোমাংস— বিশেষ করে আমাকে।

'জানো?' পরম কৌতুকে বললেন প্রফেসর, 'এটাও নিশ্চয় জানো যে জগতের সৃষ্টি রহস্যের মূলে অদৃশ্য মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব কতখানি, তা এখনও বিশেষ গবেষণার বিষয়?'

'একটু একটু জানি বই কী।'

'বৎস দীননাথ,' তপোবন মুনির অনুকরণে নিমীলিত নয়নে বললেন প্রফেসর, 'তবে কি এটাও তোমার জানা উচিত নয় যে অজানা বিকিরণের প্রভাবে জীবকোষে এমন পরিবর্তন আনতে পারে ওই শুকনো ঘাস, যা কল্পনাও করতে পারে না আজকের বিজ্ঞান?'

আমতা আমতা করে বললাম, 'তা পারে বই কী।'

'সাধু! সাধু! এই তো বুদ্ধি খুলেছে। তোমার বন্ধু কোচিন—'

'কোচিন আমার বন্ধু নয়।'

'পরিচিত তো?'

'একশোবার।'

'কোচিনের এই অস্বাভাবিক ঘুম বা অজ্ঞান হওয়াটা নিশ্চয় এই ধরনেরই কোনও পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ বলেই আমার বিশ্বাস। দেখছ না, এতক্ষণ স্মেলিং সল্ট নাকের কাছে ধরেও জ্ঞান ফেরাতে পারলাম না— অথচ মরা মানুষেরও এতক্ষণে চাঙা হয়ে ওঠা উচিত ছিল।'

খটকা লাগল শুনে। ভাবনাও হল। জলজ্যান্ত মানুষটার আকৃতি প্রকৃতি বদলে মর্কট হয়ে গেলে থানা পুলিশ করে মরতে হবে না তো?

আস্তে আস্তে বললাম, 'কীরকম পরিবর্তন আপনি আঁচ করছেন?'

অট্টহাস্য করলেন প্রফেসর।

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'হাসির কথাটা কী বললাম?'

'হাসছি চোখ থেকেও তুমি অন্ধ বলে।'

'আপনার মতো চামসে পড়েনি আমার চোখে—'

'তা সত্ত্বেও তুমি অন্ধ।'

'প্রফেসর—'

'দীননাথ, মেঝের এই ফাটলটা দেখেছ?'

'বাজে সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি করলে মেঝে তো ফাটবেই। যা কিপটে আপনি—'

'কিপটে আমি না তুমি? ওয়ান পাইস ফাদার মাদার—'

কথার মোড় ঘুরে যাচ্ছে দেখে সুর নরম করে বললাম, 'এই তো দেখছি ফাটলটা।'

'শুধু ফাটলটা দেখতে পেলে, আর কিছু দেখলে না?'

'আবার কী দেখব?'

'তোমার বন্ধুর—'

'আমার বন্ধু নয়।'

'কোচিনের মাথাটা?'

'কোচিনের মাথা! মোষের মাথা যেরকম হয়, সেই রকম মাথা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'সেই সঙ্গে তোমার মাথাতেই যে মোষের গোবর আছে, তাও আঁচ করতে পারছি। গবেট কোথাকার!'

রাগলে চলবে না বলে কাষ্ঠ হেসে বললাম, 'মাথার মধ্যে কী আছে খুলে না-বললে বুঝব কী করে?'

'মাথার মধ্যে নয়, মাথার মধ্যে নয়, মাথামোটা কোথাকার। মাথাটা কোনখানে আছে, সেইটা দেখতে বলছি।'

গোলমাল হয়ে গেল মাথার মধ্যে। কী বলতে চান প্রফেসর? ধাঁ করে যেরকম রেগে গেলেন, কড়া গলায় কিছু জিজ্ঞেসও করা যাচ্ছে না। বুড়ো বয়েসে মুখের আগল তো নেই। যা মুখে আসে বলে যান। তাই চুপ করে রইলাম মুখটুখ লাল করে।

দেখে মায়া হল প্রফেসরের। নরম গলায় বললেন, 'তোমার আর দোষ কী বলো? মোটামুটি তিন পাউন্ড ওজনের ব্রেনও যে তোমার নেই, সে সন্দেহ আমার অনেক দিনের। তোমার বন্ধুর, ইয়ে— কোচিনের মাথাটা ফাটল থেকে কতটা দূরে খেয়াল রেখেছ?'

'এই তো এক বেগদা দূরে।'

'ওই ড্রয়ারে চকখড়ি আছে, এনে দেবে?'

দিলাম এনে চকখড়ি। উনি মাথার ব্রহ্মতালু যেখানে, তার পাশে একটা খড়ির দাগ দিলেন। তারপর বললেন, 'এসো, তোমাকে একটা ব্যাপার দেখাই।'

'মাথা নিয়ে কী বলছিলেন?'

'সেটা তোমার মাথায় ভালভাবে ঢোকাতে চাই বলেই আধঘণ্টা সময় নিচ্ছি। এসো, মূর্খ, এসো।'

শোবার ঘরে আমাকে নিয়ে এলেন প্রফেসর। দেওয়াল ঘেঁষে বসানো রয়েছে টিভি চারটে ঠ্যাঙের ওপর। টিভি স্ক্রিনের সামনে একটা টুল। টুলের ওপর এক গামলা জল। জলের ছ'ইঞ্চি ওপরে একটা চালুনি ঝুলিয়ে রেখেছেন প্রফেসর তিনটে কঞ্চির মাথা একসঙ্গে বেঁধে। চালুনির জালের ওপর কতকগুলো মটরদানা ভিজে। শেকড়গুলো নীচের দিকে নামতে নামতে হঠাৎ বেঁকে চুরে ওপরে, ডাইনে বাঁয়ে ছুটে গেছে। কয়েকটা দানা অঙ্কুরিত হয়েছে— কিন্তু পাতাগুলো যেন কেমনতর। বিদঘুটে। কিম্ভূতকিমাকার। একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে চেয়ে ছিলেন প্রফেসর।

কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'চারাগুলো দানবিক আকৃতি নিয়েছে বলা যায়, তাই না?'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

প্রফেসর বললেন, 'জানলার সামনে মটরদানাগুলোর কী সুন্দর শেকড় আর পাতা বেরিয়েছে দেখো।'

তাও দেখলাম। একইরকমভাবে চালুনির ওপরে মটরদানা আর তলায় জলের গামলা বসিয়ে রেখেছেন প্রফেসর। রোদ হাওয়ায় ঝলমল করছে পাতা। শেকড়গুলো সটান নেমে আসছে জলের দিকে— স্বাভাবিক টানে।

স্বাভাবিক টানে।

চোখ ফেরালাম টিভির সামনে রাখা মটরদানাগুলোর দিকে। ওগুলো এত অস্বাভাবিক কেন?

মনের প্রশ্ন আঁচ করে নিলেন প্রফেসর। বললেন, 'টিভি র‍্যাডিয়েশনের সামনে রাখার ফল। অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।'

'কেন, প্রফেসর কেন?'

'আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা খুব বেশি টিভি দেখে বলে নিদ্রাহীনতা, খিটখিটে মেজাজ, স্মৃতিহীনতা আর চোখের ব্যায়রামে ভোগে। তাই দেখছিলাম টিভির ইলেকট্রনিক র‍্যাডিয়েশনে গাছের ক্ষতি হয় কিনা। দেখতেই পাচ্ছ গাছ পর্যন্ত দানবিক আকার নিচ্ছে। দীননাথ, মানুষের জীব কোষেই ইলেকট্রনিক র‍্যাডিয়েশন এমনি পরিবর্তন আনতে পারে তো?'

'নিশ্চয় পারে।'

'এবার চিন্তা করো উলটো দিক থেকে। যে-গাছ ইলেকট্রনিক র‍্যাডিয়েশন অথবা অজানা র‍্যাডিয়েশনে সক্ষম, তার সামনে জীবকোষ রেখে দিলে দানবিক পরিবর্তন সম্ভব নয় কি?'

'নিশ্চয় সম্ভব প্রফেসর।'

'একেই বলে মাইটোজেনিক রে। বাংলায় একে সংহার রশ্মি বা দানব রশ্মিও বলতে পারো। সূর্যরশ্মির সাহায্যে গাছের ক্লোরোফিল নিজের শর্করা বানিয়ে নেয় বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর জলীয় বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে। ১৮৭৩ সালে ব্যারন ফন হারজিল একখানা দুর্দান্ত বইতে দেখান, গাছেরা সবসময় বস্তু সৃষ্টি করে চলেছে। ফসফরাসকে গন্ধক করছে, ক্যালসিয়ামকে নিয়ে আসছে ফসফরাসের চেহারায়,

ম্যাগনেশিয়ামকে ক্যালসিয়ামে, কার্বনিক অ্যাসিডকে ম্যাগনেশিয়ামে আর নাইট্রোজনকে পটাশিয়ামে। গাছের এই বিপুল এনার্জিকে বলা হয় অরগন এনার্জি। ভাইটাল ফোর্স। ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত। এ তত্ত্ব উইলহের রাইকের। চেম্বার্স ডিক্সনারি খুলে দেখে নিয়ো। জোর করে অ্যাটম ভাঙতে গিয়ে মানুষ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসে। গাছ কিন্তু কায়দা করে অ্যাটমিক নিউক্লিয়াসের সিন্দুক খুলে বিপুল শক্তি দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করে নেয়— বিস্ফোরণ ঘটায় না। এ সিক্রেট কেবল এরাই জানে। অরগন এনার্জি দিয়ে এক বস্তুকে আরেক বস্তুতে নিয়ে যেতে পারে। অ্যাটমের গঠন পালটে দিয়ে ইথারের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জীবদেহ অদৃশ্য করে দিতে পারে—'

'যেমন করেছে বিলাই লামাকে,' খাবি খেতে খেতে বললাম আমি।

'হ্যাঁ। আবার মাইটোজেনিক রে দিয়ে কোষগুলোকে খুব ছোট করে আনতেও পারে। গায়ে গায়ে লেগে ঘন হতে হতে জীবদেহ এক সময়ে অদৃশ্যও হয়ে যেতে পারে। যেমন করছে—'

বলে থেমে গেলেন প্রফেসর।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'থামলেন কেন? যেমন কী করছে?'

'দেখবে চলো।'

কোচিন গাঙ্গুলি মহিষ-রূপ নিয়ে তখনও অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে মেঝেতে। প্রফেসর বসলেন মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে। মেঝেতে খড়ির দাগটা দেখিয়ে বললেন, 'দেখেছ?'

প্রথমে বুঝিনি। তারপর বুঝলাম। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল।

খড়ির দাগ থেকে কোচিনের মাথাটা ইঞ্চি দুয়েক সরে গেছে!

মেঝের ফাটল থেকে দাগটা ছিল প্রায় ছ'ইঞ্চি তফাতে— ইঞ্চি দুয়েক সরে যাওয়ার ফলে মাথা আর ফাটলের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়িয়েছে প্রায় আট ইঞ্চি।

জিভ জড়িয়ে গেল কথা বলতে গিয়ে, 'অজ্ঞান অবস্থায় সরে গেছে দেখছি কোচিন।'

'মোটেই নয়। কোচিন যেমন তেমনি শুয়ে আছে। অজ্ঞান অবস্থায় কেউ কি সরে যেতে পারে?'

'তবে খড়ির দাগটা থেকে মাথাটা সরে গেল কীভাবে?'

'ঠিক যেভাবে ফাটলের কাছ থেকে মাথাটা সরে এসেছিল খড়ির দাগের কাছে।'

'মা— মানে?'

'মাই ডিয়ার গ্রেট ইডিয়ট, তোমার বন্ধু, মানে কোচিন, ছোট হয়ে যাচ্ছে।'

'ছোট হয়ে যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ বৎস,' ভীষণ খুশি দেখাল প্রফেসরকে, 'ফাটল থেকে মাথাটা সরে এসেছে দেখেই বুঝেছিলাম ঘাসের মাইটোজেনিক রে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। কোষগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে— শরীরটাও তাই ছোট হয়ে আসছে। তখন বললে বিশ্বাস করতে না। তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যে খড়ির দাগ কেটে রেখে তোমাকে একটু জ্ঞান দিয়ে আনলাম। বৎস দীননাথ, তোমার বন্ধু, ইয়ে, কোচিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে বামন

হয়ে যাচ্ছে— তাই এই অস্বাভাবিক ঘুম। তাই বিলাই লামা শুধু প্রতীক্ষা করছে— সে জানে শুকনো ঘাস যে ছুঁয়েছে, তার পরিণামটা কী হবে। তাই সে শুধু দেখে যেতে চায় ছোট হতে হতে পাপিষ্ঠ কোচিনের শূন্যে মিলিয়ে যাওয়াটা কী রকমভাবে হয়। যেমন কর্ম, তেমনি ফল। কী বলো?'

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। পা টলতে লাগল। আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। ভাল করে ঠাহর করলাম। কোচিনের বিরাট চেহারা আগের মতো বিরাট যেন আর নেই, অনেক গুটিয়ে গেছে, এই প্রথম তা খেয়াল হল।

পাশের ঘর থেকে ভেসে এল অদ্ভুত তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ। আওয়াজটা বিচিত্র সুরে উঠছে আর নামছে।

'গান গাইছে মানি! খুশিতে ফেটে পড়ছে কোচিনের অবস্থাটা টের পেয়ে,' প্রফেসরের কণ্ঠেও খুশি ঝরে পড়ল যেন।

আমার মুহ্যমান এবং টলটলায়মান অবস্থা দেখে প্রফেসর ঘাড় ধরে বিদেয় করলেন— 'চানটান করে খেয়েদেয়ে এসো। সোনার লঙ্কার গল্প বলব।' এমনভাবে আতু আতু গলায় বললেন যেন ঠাকুরমা ঝুলি খুলে বসলেন— রূপকথার ঝাঁপি উপুড় করে দেবেন। কিন্তু প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের রূপকথা মানেই যে মহাকাশযুগের চমকপ্রদ কাহিনি, তা কে না জানে। তাই দ্বিরুক্তি করলাম না।

সদর দরজার ভিজে মাটিতে দেখলাম পদচিহ্ন তখনও দৃশ্যমান। আমি ভয়ে ভয়ে চেয়ে রইলাম সেদিকে। দিনদুপুরে গা ছমছম করে উঠল। টিবেটিটা যদি পেছন নেয় আমার, নির্ঘাত ভিরমি যাব।

প্রফেসরের চোখ দুটো হঠাৎ চকচক করে উঠল। মাথায় নতুন মতলব এসেছে মনে হল। পদচিহ্নর সামনে গিয়ে বললেন, 'বাপু হে, ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক। তোমার শত্রু কেমন ছোট হয়ে যাচ্ছে, দেখে যাও স্বচক্ষে। আমি লোকটা খুব খারাপ নই, দেখে বুঝছ না।'

কোচিন গাঙ্গুলি বলেছিল, বিলাই লামা নাকি হিন্দি দু'-চারটে শব্দ মাত্র জানে— বাংলা জানার প্রশ্নই ওঠে না। প্রফেসর কিন্তু খাঁটি আ-মরি বাংলাভাষাতেই আপ্যায়ন করলেন। কী আশ্চর্য! এই আপ্যায়নটুকুর জন্যেই যেন এক পায়ে খাড়া ছিল অদৃশ্য বিলাই লামা। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের রক্ত ছলকে দিয়ে এক পা এগিয়ে গেল পদচিহ্ন প্রফেসরের দিকে। ভিজে মাটিতে জাগ্রত হল নতুন পদচিহ্ন।

একগাল হেসে প্রফেসর পেছন ফিরে ঢুকে গেলেন বাড়ির মধ্যে, পেছন পেছন বিদঘুটে লম্বা পায়ের ছাপটাও ঢুকল বাড়ির মধ্যে।

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চম্পট দিলাম তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু ফিরে এলাম নাকে মুখে গুঁজে। কী কাণ্ড চলছে প্রফেসরের গবেষণা মন্দিরে— দেখবার জন্যে প্রাণটা কাটা মুরগির মতো ছটফটিয়ে মরছিল।

দরজা খোলাই ছিল। কাদামাখা পদচিহ্ন অনুসরণ করে পৌঁছোলাম, যে-ঘরে কোচিন ক্রমশ লিলিপুটে পরিণত হচ্ছে সেই ঘরে।

থমকে গেলাম সদর দরজায়। ঘরে অজ্ঞান কোচিন ছাড়া আর কেউ নেই। না, না, ভুল বললাম। প্রফেসর নেই। কিন্তু পদচিহ্নের মালিক নিশ্চয় আছে। একটা চেয়ারে তাকে খাতির করে বসিয়ে গেছেন প্রফেসর। পায়ের চিহ্ন চেয়ার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে— এমনভাবে ফিরে রয়েছে কয়লা-কালো কোচিনের ভূমিশয্যার দিকে, যেন চেয়ারে বসে ঠায় তাকে নজর রেখেছে অদৃশ্য মানুষটা। আচ্ছা একরোখা লোক তো। কোচিনের মাথাও তো দেখছি খড়ির দাগ থেকে আরও হঠে গেছে।

পাছে আমার দিকে এগিয়ে আসে পায়ের ছাপ, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ সরে এলাম চৌকাঠ থেকে। যাকে দেখা যায় না, তাকে ঘাঁটাতে চাই না।

প্রফেসরকে পেলাম মানিপ্ল্যান্টের ঘরে। জীবদেহে তড়িতের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ইটালীয় জীববিজ্ঞানী লুইগি গ্যালভানি জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁরই বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়ে মানিপ্ল্যান্টের তড়িৎপ্রবাহ মাপছেন প্রফেসর তন্ময় হয়ে। বৃত্তাকার স্কেলের ওপর কাঁটা ঘুরে গিয়ে তড়িৎপ্রবাহ নির্দেশ করছে। সূক্ষ্ম-কাঁটার সঙ্গে ঝোলানো খুদে দর্পণে তড়িৎপ্রবাহের ফলে ঘুরে গিয়ে আলোকরশ্মি পরিবর্ধিত করছে। সংলগ্ন অ্যাম-মিটারে তড়িৎপ্রবাহ মাপছেন একমনে।

আমি ঘরে ঢুকতেই ঝিলমিল করে উঠল দর্পণটা। কাঁপছে থিরথির করে। অ্যাম-মিটারের কাঁটাও কাঁপছে। সেই সঙ্গে সরু কাগজের ওপর কলমটা পরপর কতকগুলো ড্যাশ-ফুটকি-দাঁড়ি টেনে গেল।

প্রফেসর সেদিকে চেয়ে ঘাড় না-ফিরিয়েই বললেন, 'দীননাথ এসেছ? বসো। মানি খুশি হয়েছে তোমাকে দেখে— সেই কথাই বলছে।'

বসলাম তক্তপোশে। বললাম, 'কোচিন তো আরও ছোট হয়ে গেছে দেখে এলাম।'

প্রফেসর কানে নিলেন না কথাটা। তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন কলমটার দিকে। খুব দ্রুত ডট-দাঁড়ি-ড্যাশ টেনে চলেছে সরু কাগজের ওপর। ঠিক যেন মর্সকোডে লিখে যাচ্ছে মানিপ্ল্যান্ট নিজের কথা।

কিছুক্ষণ পরে থেমে গেল কলম। অনেকগুলো রামধনু রঙের আশ্চর্য সুন্দর বল পাতাগুলো থেকে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে ঠিকরে এসে মিলিয়ে গেল শূন্যে।

প্রফেসর বললেন, 'মানিব্যাটা আহ্লাদে আটখানা হয়েছে হে। তোমাকে দিয়ে নিজের গল্পটা লেখাতে চায়। বলছে, দীননাথ ভায়া এতদিন মানুষের চোখ-কান-নাক-জিভ-চামড়া নিয়ে অনেক গল্প তো লিখেছে— কিন্তু এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় কিছুই নয়। এর চাইতেও জবর কুড়িটারও বেশি অনুভূতি কেন্দ্র ওদের আছে। লস এঞ্জেলসের ফিলজফিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি ম্যানলি হল সে খবর রাখতেন, গাছের সঙ্গে কথাও বলতেন। আসলে ওরা এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে— মহাশূন্যে অণুর আকারে ভেসে ভেসে এক-একটা গ্রহে নেমে খনিজ জগৎ থেকে জীবজগৎ সৃষ্টি করে চলেছে। আধুনিক সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেডিয়ো টেলিস্কোপ মারফত এই ধরনের

ভাসমান অণুর সন্ধান পেয়েছে। অপার্থিব বলেই ওদের ক্ষমতা এত বেশি— আর ওদের চেয়ে নিকৃষ্ট বলেই সেই ক্ষমতার নাগাল ধরবার কল্পনার দৌড়ও মানুষের নেই। ও বলছে, দীননাথ ভায়াকে বলুন, আমাদের ব্রেন থাকে শেকড়ের ডগায়, মগডালে নয়, মানুষের মতো। কতটুকুই বা ব্রেন ধরানো সম্ভব মাথায়? আসল জায়গা ওই শেকড়— পাতা আর ডাল কেবল অ্যানটেনার কাজ করে, কসমিক রে টেনে নেয়, পৃথিবীর বাইরে খবর পাঠায় খবর নেয়। ও বলছে, চিনদেশের প্রাচীন ডাক্তাররা মানুষের শরীরে সাতশো আকুপাংচারের পয়েন্ট আবিষ্কার করেছিল। গাছের দেহে আছে তার চাইতেও বেশি পয়েন্ট— ইলেকট্রনের ধারা এইসব পয়েন্ট দিয়ে বায়ুমণ্ডলে ছুটে যাচ্ছে, আলোর খেলা দেখাল সেইজন্যেই। ওদের অবিশ্বাস্য ফোর্স-ফিল্ড দিয়ে মানুষের অজ্ঞাতসারে কত উপকার করে চলেছে, অকৃতজ্ঞ আর অজ্ঞ মানুষ তা না-বুঝে ওদেরই ধ্বংস করছে। এমন একটা দিন শিগগির আসছে, ওরা সেদিন পৃথিবীটাকে নতুন করে সাজাবে, সৃষ্টি নতুন করে শুরু হবে। পারমাণবিক শক্তি নিয়ে ছেলেখেলা করা যে যায় না, তা নিজেদের পারমাণবিক শক্তির ভাঁড়ার খুলে দিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবে। দীননাথ, লিখবে তুমি ওদের কথা?'

মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল আমার। ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'হাজার রহস্যের দ্বীপ ইস্টার আয়ল্যান্ডেও এই সতর্কবাণী কিন্তু আপনি শুনে এসেছেন।'

'সেইজন্যেই তো মানিকে নিয়ে গবেষণায় বসেছি। কিছুদিন আগে লঙ্কাতেও গেছিলাম এই গবেষণা সূত্রেই। শুনবে সেই কাহিনি?'

'শুনব বলেই তো এলাম। সোনার লঙ্কার গল্প তো?'

'হ্যাঁ। তোমাদের সোনার লঙ্কার গল্প। যে-লঙ্কায় বাংলার বকাটে ছোকরা বিজয় সিংহ বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে উদ্ধত কয়েকটা ছোকরা বন্ধু নিয়ে গিয়েছিল। লঙ্কার নাম তখন টাপু। বেদ্দা নামে বুনো জাত থাকত সেখানে। বুনোর রাজা খাতির করে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিল বিজয়ের। হতচ্ছাড়া বিজয়টা তখন কী করল জানো? নেমকহারাম কোথাকার? কিছুদিন পরেই শ্বশুরকে খুন করে রাজা হয়ে বসল। রাজার মেয়ে বুনো বউকে তাড়িয়ে দিল। ভারতবর্ষ থেকে অনেক মেয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে অনুরাধা বলে একটা মেয়েকে নিজের রানি করল। লঙ্কার নাম হল সিংহল— বাঙালি বদমাইশদের কলোনি হয়ে গেল বেদ্দাদের দেশ। পরে বৌদ্ধরা গিয়ে আদাড়ে লোকগুলোকে সভ্য করলেন। লঙ্কাদ্বীপের মাঝখানে অনুরাধাপুরম নামে একটা প্রকাণ্ড শহর বানালেন।

'দীননাথ, অনুরাধাপুরমের ভগ্নাবশেষ দেখে আক্কেল হয়রান হয়ে গিয়েছিল আমার। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ, ক্রোশ ক্রোশ পাথরের ভাঙা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলে ঢেকে গেছে বেশির ভাগ ধ্বংসস্তূপ— কেউ সাফও করেনি। আমি এই জঙ্গল তোলপাড় করে পেলাম যা খুঁজছিলাম।'

'কী খুঁজছিলেন?' ঝটিতি প্রশ্ন করলাম। যেরকম তোড়ে কথা বলে যাচ্ছেন প্রফেসর, ফাঁক পাওয়া মুশকিল।

'বলছি। তার আগে আর একটা কথা বলে নিই। লঙ্কায় নাকি সোনা সস্তা— এই কিংবদন্তি অনেকদিন ধরেই আমার মস্তিষ্ককে ঘর্মাক্ত করে তুলেছিল। সেখানকার বাড়ি

ঘরদোর নাকি সোনার তৈরি ছিল রাবণরাজার আমলে। হনুমান গিয়ে নাকি ল্যাজের আগুনে সোনার সেই লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। যা রটে, তা কিছু বটে। কিন্তু এমন কী দাহ্য পদার্থ ছিল হনুমানের কাছে যা দিয়ে অতবড় একটা শহর পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া যায় একবার মাত্র আকাশে টহল দিয়ে? তা ছাড়া, সোনাই বা অত সস্তা ছিল কেন ওখানে? সোনার খনি তো নেই লঙ্কায়। আছে গ্র্যাফাইটের খনি, আর যৎসামান্য পদ্মরাগমণি আর নীলকান্তমণি। তবে সোনা ওখানে অত সস্তা, এই কিংবদন্তি ছড়িয়ে পড়ল কেন?

'এই রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বার করার জন্যেই গিয়েছিলাম অনুরাধাপুরমের জঙ্গলে। আমার মন বলছিল, এই ধাঁধার মূলে গাছেদের কোনও হাত থাকলেও থাকতে পারে। কেননা, গাছের বাসিন্দা হনুমানকে দিয়ে লঙ্কা পোড়ানো হয়েছিল। আসলে হনুমান একটা রূপক— তার আকাশ ভ্রমণও তাই। আকাশ থেকে বিমানে করে ওখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এমন কোনও দাহ্য পদার্থ যার ফলে আগুন লেগে যায় লঙ্কায়। সেটা আগুন বোমা নিশ্চয় — কিন্তু কী ধরনের?

'হনুমান গাছের মানুষ। গাছের সঙ্গে এই দাহ্য পদার্থের কোনও সম্পর্ক নেই তো? গাছে গাছে ঘুরে আগুন বোমার সন্ধান পেয়েছিল বলেই কি হনুমানকে কল্পনা করা হয়েছে? লোকে এমনিতেই আমাকে পাগল বলে— তোমাকে বলে পাগলের চেলা। তাই কাউকে কোনও কথা না-বলে, একলাই চলে গেলাম অনুরাধাপুরমে।

'দিনের পর দিন, রাতের পর রাত খুঁজলাম আগুন বোমা আর সোনার লঙ্কার রহস্য। সূত্র পেলাম না। বুড়ো মানুষ। এত ধকল সইবে কেন? শরীর ভেঙে পড়ল। মনও তথৈবচ। একদিন বিকেল নাগাদ একটা ধ্বংসস্তূপের মাঝে বসে ভাবছিলাম— বৃথা চেষ্টা, এবার ফিরে যাওয়া যাক।

'আমি বসেছিলাম একটা শোয়ানো মূর্তির ওপর। বিশাল মূর্তি। লম্বায় ষাট ফুট তো বটেই। ছ'তলা বাড়ির সমান, এককালে খাড়া ছিল, মহাকাল তাকেই শুইয়ে দিয়েছে। বট অশ্বত্থের ঝুরি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে মাটির সঙ্গে। মূর্তির গলার ওপর দিয়ে, বুকের ওপর দিয়ে, পায়ের ওপর দিয়ে দড়ির বাঁধনের মতো শেকড় চলে গিয়েছে। মাটির ঢিপির তলায় প্রায় অদৃশ্য হতে বসেছে বলেই চেনা যায় না। আমি ভেবেছিলাম মহানির্বাণ মূর্তি কাত হয়ে শুয়ে আছে— এরকম কাত হয়ে শোওয়া মূর্তি জঙ্গলের মধ্যে আরও অনেক দেখেছি তো। বড় বড় ধ্যানমূর্তি, জ্ঞান মুদ্রা করে প্রচার মূর্তি। তাই বিকেলের ঢলে-পড়া সূর্যের আলোয় বট-অশ্বত্থ-মাটি ঢাকা মূর্তিটার দিকে ফিরে চাইনি।

'পশ্চিমের সূর্যরশ্মি গাছের ফাঁক দিয়ে, ভাঙা মন্দিরের পাশ দিয়ে এসে পড়েছিল পায়ের কাছে। মস্ত একটা চ্যাটালো পাথরে দেখলাম খোদাই করা রয়েছে নরকের দৃশ্য। পাপ করলে নরকে কী সাজা হয়, সেই দৃশ্য। কোনওটাকে ভূতে ঠেঙাচ্ছে, কোনওটাকে করাতে চিরছে, কোনওটাকে পোড়াচ্ছে, কোনওটাকে গরম তেলে ভাজছে, কোনওটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। সে এক মহা বীভৎস কাণ্ডকারখানা। তলায় লেখা 'অহিংসা পরমো ধর্ম'। অহিংসার আড়ালে সাজার পরিপাটি দেখলে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। আমারও

খুব খারাপ লাগল। ধুত্তোর বলে উঠে পড়লাম। মাটির ঢিবি বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ চোখে পড়ল ঝোপঝাড়ের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে একটা অদ্ভুত প্রস্তর-ফলক।

'প্রস্তর-ফলক ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায় না। চ্যাটালো পাথর, কিন্তু যেদিকটা ঝোপের বাইরে মাথা উঁচু করে রয়েছে, সেদিকটা খোদাই করা হয়েছে অগ্নিশিখার অনুকরণে। ঠিক যেন লকলকে আগুনের শিখা— পাথর কাটা হয়েছে সেইভাবে।

'খটকা লাগল। ঝোপের মধ্যে ঢুকলাম। দেখলাম, আমার এই উরুর মতো গোল একটা পাথরের ডান্ডার মাথাটা আগুনের শিখার আকারে খোদাই করা হয়েছে। চ্যাপটা পাথরে উৎকীর্ণ একটা লিপি। প্রাচীন মাগধী ভাষায় লেখা একটা শিলালিপি।

'আমি জানতাম, বৌদ্ধদের শাস্ত্র প্রাচীন মাগধী ভাষায় লেখা হয়েছিল— লঙ্কাতেই সুরক্ষিত আছে সেই শাস্ত্র। এই লঙ্কা থেকেই ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশে ধর্ম গেছে। আকুপাংচার সম্বন্ধে সুপ্রাচীন কেতাবটাও পাওয়া গেছে এই লঙ্কায়—যা চিনেও নেই। মাগধী ভাষায় শিলালিপি দেখে তাই টনক নড়ল আমার।

'মাগধী ভাষা আমার জানা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠোদ্ধার করলাম। সারমর্ম এই: এই লিপি উৎকীর্ণ হল হনুমানের ল্যাজের ডগায়— যার পায়ের তলায় গোপন প্রকোষ্ঠে লুকোনো রইল লঙ্কাদহনের আর সোনার লঙ্কার প্রাচীন ইতিহাস।

'মাথা ঘুরে গেল আমার। পাণ্ডুরাজার ঢিবি খুঁড়ে পুরাতত্ত্ববিদদের মাথা ঘুরে গেছে। অনুরাধাপুরমে হনুমানের ঢিবির সন্ধান পেলে আনন্দের চোটে নিশ্চয় তাঁরা অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

'তৎক্ষণাৎ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কাত হয়ে পড়ে থাকা মূর্তিটা মহানির্বাণ মূর্তি নয়— হনুমানের মূর্তি। ঝোপের মধ্যে থেকে তার ভাঙা ল্যাজের ডগাটুকু কেবল উঁচিয়ে আছে। এ-মূর্তি যখন খাড়া ছিল— নিশানের মতো উঁচু ল্যাজের ডগায় উৎকীর্ণ শিলালিপি কেউ পড়বার সুযোগ পায়নি বলেই নিশ্চয় পায়ের তলায় লুকোনো পাতালপ্রকোষ্ঠের সন্ধানও পায়নি। ভাগ্যিস, বীর হনুমান শুয়ে পড়েছেন— তাই তো নাগাল পেলাম তাঁর ল্যাজের, যে-ল্যাজের ডগায় আগুন নিয়ে তিনি লঙ্কা ছারখার করেছেন।

'ঢিবি খোঁড়াখুঁড়ির ঝকমারির মধ্যে যেতে হল না। নরক দৃশ্যের ছবি আঁকা দেওয়ালের তলায় একটা সুড়ঙ্গ দেখলাম। মূর্তির বেদিমূল উপড়ে যাওয়ায় সুড়ঙ্গপথ আলগা মাটি চাপা পড়ে ছিল। শেয়ালের বাসা ছিল ভেতরে। তাদের তাড়িয়ে, কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে সাপখোপ বিদেয় করে গুটিগুটি ঢুকলাম ভেতরে। এ-কাজ একদিনে হয়নি। কারও সাহায্য না-নিয়ে একাই সব করেছি।

'সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে একটা ছোট্ট পাতাল কুঠরিতে। ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর, সোনার তাল তাগাড় করে রাখা হয়েছে এক প্রান্তে। আর একদিকে একটা সোনার সিন্দুক। ভেতরে পেলাম একটা সোনার কৌটো। আর একটা সোনার পাত। কৌটোর মধ্যে কিছু কালচে গুঁড়ো। সোনার পাতে মাগধী ভাষায় লেখা অনেক কথা।

'দীননাথ, স্বর্ণলিপির পাঠোদ্ধার করে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কালো গুঁড়োটা একটা ফুলের পরাগ রেণু— আকাশ থেকে যা ছড়িয়ে লঙ্কা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও লঙ্কায়

সোনার খনি না-থাকা সত্ত্বেও সেখানে সোনা এত সস্তা কেন, সে বৃত্তান্তও লেখা আছে প্রাঞ্জল ভাষায়।'

দম নেবার জন্যে প্রফেসর থামতেই আমি বললাম, 'ফুলের পরাগ রেণু ছড়িয়ে লঙ্কাদহন? বলছেন কী?'

প্রফেসর বললেন, 'লাইকোপোডিয়ামের পরাগ রেণু গরম চাটুর ওপর ছড়িয়ে নকল বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হত থিয়েটারের মঞ্চে— জানো কি?'

আমতা আমতা করে অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

প্রফেসর বললেন, 'অধিকাংশ গাছের পরাগ রেণু দাহিকাশক্তিসম্পন্ন হয়। সোনার কৌটোর মধ্যে নামহীন যে বৃক্ষের পরাগ রেণু সঞ্চিত আছে, তার দাহিকাশক্তি এত বেশি যে রোদ্দুরে তেতে ওঠা বাড়িঘরদোরের ওপর ফেললেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে— পেট্রলের দরকার হয় না। দেখবে?'

লাফিয়ে উঠলাম, 'নিশ্চয়?'

প্রফেসর ড্রয়ার টেনে একটা ছোট্ট কাচের অ্যামপুল বার করলেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'সোনার কৌটো ভরতি পরাগ রেণু এমন জায়গায় সরিয়ে রেখেছি যে কেউ তার খোঁজ পাবে না— আমাকে মেরে ফেললেও ঠিকানা বলব না। অ্যামপুলে করে সামান্য রেখেছি আগুন-বোমা হিসেবে— এক্সপেরিমেন্টের জন্যে। জানলা দিয়ে অ্যামপুল ছুড়ে দাও— হনুমানের প্রলয়ংকর ক্ষমতার নমুনা চোখের সামনে দেখতে পাবে।'

ভয়ে ভয়ে হাতে নিলাম অ্যামপুলটা। স্বচ্ছ কাচ। ভেতরকার এক চিমটে পরিমাণ কালচে গুঁড়োটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নিরীহ এই গুঁড়ো আগুন বোমার সমকক্ষ হবে কী করে ভেবে পেলাম না।

জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে শান-বাঁধানো চত্বরের ওপর ছুড়ে দিলাম। কঠিন মেঝেতে অ্যামপুল পড়তেই গুঁড়িয়ে গেল কাচ— একটা চাপা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠল জানলা পর্যন্ত। এতদূর আগুন ঠিকরে আসবে কল্পনা করতে পারিনি— চমকে পিছু হটে এলাম।

ভাগ্যিস চত্বরে শুকনো কাঠ, খড় কিছু ছিল না। তাই আগুন ছড়িয়ে পড়ল না। আগুনের শিখা মিলিয়ে যেতেই জানলার সামনে দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, মেঝের খানিকটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তখনও ধোঁয়া উঠছে।

ফিরে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে বললাম, 'সোনার পাতটা কোথায়?'

জুলজুল করে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন. 'কেন?'

'সোনা সস্তা ছিল কেন লঙ্কায় জানবার জন্যে।'

'দীননাথ,' মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে বললেন প্রফেসর, 'জানি এরপর তুমি জানতে চাইবে অনুরাধাপুরমের সোনার কুঠরির ঠিকানা। কিন্তু সে ঠিকানা আমি ছাড়া কেউ জানে না। কাউকে বলবও না। সোনাই সব সর্বনাশের মূল। পাতালেই থাকুক। শুধু জেনে রাখো, ওখানে যত সোনা ছিল, তার একটা কণাও পৃথিবীর কোনও সোনার খনি থেকেই তোলা হয়নি।'

'তবে কি পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছে?'

'না। এই পৃথিবীতেই সোনা তৈরি হয়েছে।'

'সোনা তৈরি হয়েছে! সোনা কি তৈরি করা যায়?'

'যায় দীননাথ, যায়। সিসে থেকে সোনা তৈরির গুপ্ত রহস্য সেকালের অ্যালকেমিস্টরা জানতেন কিন্তু কৌশলটা তাঁরা পাঁচকান করেননি, করলে পৃথিবীটাকে আজ সোনায় মুড়ে দেওয়া যেত। গোটা পৃথিবীটাই এলডোরাডোর স্বর্ণ শহরে ছেয়ে যেত— সোনার লঙ্কা এই পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ডে দেখা যেত।'

প্রফেসরের কথা বলার ধরনটা চিরকাল কাঠখোট্টা। কিন্তু সেদিন যেন সুরের জাদু লাগল তাঁর কণ্ঠস্বরে। অদ্ভুত স্বপ্নিল চোখে এমনভাবে সোনার পৃথিবীর গল্প বলে গেলেন যে আমি প্রায় পাগল হয়ে গেলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল শুধু সোনা আর সোনা— তাল তাল সোনা, পাহাড় প্রমাণ সোনা, সোনার সৌধ, সোনার মালটিস্টোরিড বিল্ডিং, সোনার আসবাবপত্র, সোনার গাড়ি, সোনার কলকবজা।

উন্মাদের মতো তাই চেঁচিয়ে বললাম, 'বলুন, প্রফেসর বলুন, কী সেই মন্ত্রগুপ্তি— গরিব ভারতকে দান করুন সোনা তৈরির গুপ্ত রহস্য।'

প্রফেসর যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন আমার উন্মত্ত চিৎকারে। অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার পানে। বললেন স্বাভাবিক কাঠখোট্টা গলায়— 'দীননাথ, সোনা তৈরির মন্ত্রগুপ্তি আমি জেনেছি ঠিকই— কিন্তু উপাদানটা এতদিন পাইনি।'

'কী সেই উপাদান? বলুন, বলুন না— চুপ করে রইলেন কেন?'

'বললে কি বিশ্বাস করবে?'

'করব, করব, করব।'

'ঘাস।'

'ঘাস!'

'হ্যাঁ, ঘাস। বিশেষ একটা ঘাসের ফোর্স ফিল্ড দিয়ে সিসেকে সোনায় রূপান্তরিত করতেন সেকালের অ্যালকেমিস্টরা।'

'সিসে থেকে সোনা?'

'হ্যাঁ, দীননাথ, সিসে থেকে সোনা। যে-সিসের কোনও দাম নেই বললেই চলে— সিসের পারমাণবিক গঠন ভেঙে সোনার পারমাণবিক গঠনে নিয়ে আসা হত বিশেষ একটা ঘাসের ফোর্সফিল্ড ফোকাস করে।'

'কী ফোর্সফিল্ড ফোর্সফিল্ড করছেন বুঝতে পারছি না।'

'তা হলে আগে সেইটাই দেখানো যাক তোমাকে।'

একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রের মাঝখানে গিয়ে বসলেন প্রফেসর। মাথার ওপর চাঁদোয়ার মতো খাটানো তারের জাল দেখে মাথা ঘুরে গেল আমার। ডাইনে, বাঁয়ে, পেছনে, পায়ের তলার প্ল্যাটফর্মেও দেখলাম অগুনতি তার মাকড়শার জালের মতো অজস্র প্যাটার্নে ছড়ানো। প্রফেসর বসলেন এই প্ল্যাটফর্মে একটা চেয়ারের ওপর— পাশের টেবিলে রাখলেন প্রাণপ্রিয় মানিপ্ল্যান্টকে।

আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন বিদঘুটে মেশিন থেকে দশহাত দূরে সুইচ বোর্ডের সামনে। ধাতুর বোর্ডে সারি সারি মিটার, সুইচ, প্লাগ এবং লিভার। একটা রেগুলেটর দেখিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ওইটা শুধু ঘোরাবে এক পয়েন্ট এক পয়েন্ট করে আস্তে আস্তে। হাই ফ্রিকোয়েন্সি স্পার্ক জেনারেটর থেকে প্রতি সেকেন্ডে পঁচাত্তর হাজার থেকে দু'লাখ ইলেকট্রিক্যাল পালস-এর ইলেকট্রিক কারেন্ট ছুটে যাবে আমার আর মানির বডির মধ্যে দিয়ে। ভয় নেই, মারা পড়ব না— সে ব্যবস্থা করা হয়েছে ইনসুলেটরের মাধ্যমে। প্রায় এই ধরনের এক যন্ত্র দিয়ে প্রথম ফোর্সফিল্ডের ছবি তোলেন রাশিয়ার সেমিওন কিরলিয়ান নাতসি আক্রমণের দু'বছর আগে। সমস্ত জীবন্ত বস্তু ঘিরে অহরহ যে আশ্চর্য জ্যোতির্বলয় বিচ্ছুরিত হচ্ছে উনিই প্রথম ফোটো তোলেন তাঁর— সেই জিনিসই এখন তুমি দেখবে স্বচক্ষে।

'তার আগে এই জ্যোতির্বলয় সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা বলে নিই, ধৈর্য ধরে শোনো। আজকের ফিজিক্স বলছে, কঠিন, তরল আর গ্যাস— এই তিন পদার্থ ছাড়াও আর একটা চতুর্থ পদার্থ আছে— একটা আয়োনাইজড গ্যাস, যার উপাদান আয়ন, ইলেকট্রন আর নিউট্রাল কণিকা। এই গ্যাসের নাম বায়োপ্লাজমা। নামটা দেন রাশিয়ার মানুষ গ্রিসচেনকো তাঁর 'ফোর্থ স্টেট অফ ম্যাটার' গ্রন্থে। বইটা বেরোয় ১৯৪৪ সালে প্যারিসে— ফরাসি ভাষায়। ওই বছরেই মস্কো 'থিয়োরি অফ বায়োলজিক্যাল ফিল্ড' বই লিখে আলেকজান্ডার গুরউইটসচ জানান তিনিই 'মাইটোজেনিক র‍্যাডিয়েশনের আবিষ্কর্তা—যা থেকে এসেছে মাইটোজেনিক রে— যার প্রভাবে পড়ে বিলাই লামা ছোট হয়ে যাচ্ছে। ইনিই প্রথম বলেন, সমস্ত জীবন্ত কোষ থেকে একটা অদৃশ্য বিকিরণ বেরোচ্ছে। পেঁয়াজের শেকড়ের ডগা কোষেদের নিয়মিত ছন্দে ভাগ হয়ে যাওয়াটা উনিই প্রথম লক্ষ করেন।

'১৯৩৯ সালে ইলেকট্রো বায়োলুমিনে সেন্স-এর বর্ণালী দেখে গাছ আর মানুষের মধ্যে যে লাইফ এনার্জির সন্ধান পেয়েছিলেন উইলহেম রাইফ— আমেরিকানরা প্রথমে তা ধাপ্পাবাজি বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাইফ এই লাইফ এনার্জির নাম দিয়েছিলেন অরগন। আমেরিকানদের টনক নড়ে পরে।

'প্রোটোপ্লাজমের এই এনার্জি ফিল্ড বা ফোর্সফিল্ড সমস্ত জীবদেহ, সমস্ত গাছপালাকে ঘিরে আছে—এইবার তা স্বচক্ষে দেখো। রেগুলেটরটা আস্তে আস্তে ঘোরাও, দীননাথ।'

হাত রাখলাম রেগুলেটরে। হাত কেঁপে গেল ঠেলতে গিয়ে। গলা কেঁপে গেল কথা বলতে গিয়ে— 'বিপদ ঘটবে না তো?'

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'কাওয়ার্ড!'

ব্যস, রক্ত গরম হয়ে গেল আমার। হাত স্টেডি হয়ে গেল। ঠেলা মারলাম রেগুলেটরের লিভারে।

এক পয়েন্ট দিতেই একটা চাপা গুনগুন শব্দ শুনলাম। দু'পয়েন্ট দিতেই শব্দটা বাড়ল। তিন পয়েন্ট দিতেই আরও বাড়ল শব্দ— লক্ষ ভোমরা যেন তেড়ে আসছে মনে হল— সেই সঙ্গে একটা আবছা-নীল দ্যুতিতে ভরে গেল প্ল্যাটফর্মের ওপরটা। দ্যুতিটা তারের মধ্যে থেকে ঠিকরে এল না, বাতাসের মধ্যেই শূন্যে জাগ্রত হল। চার পয়েন্টে দিতেই নীল

আলোটা সবুজ হয়ে গেল। পাঁচ পয়েন্টে সবুজ আলোর জায়গায় দেখা দিল কমলা আভা। ছ'পয়েন্টে লাল প্রভা। সাত পয়েন্টে একটা বিচিত্র সুন্দর বর্ণালীতে ছেয়ে গেল মঞ্চের ওপরের শূন্যতা। প্রফেসরের আবছা মূর্তিটা সটান চেয়ে রইল আমার দিকে। দু'হাত কোলের ওপর রেখে তিনি নজর রেখেছেন। আট পয়েন্টে মিলিয়ে গেল বর্ণালীর রামধনু রং, ধাপে ধাপে বেড়ে যাওয়া ভ্রমর-গুঞ্জনও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতম হয়ে হারিয়ে গেল নিঃসীম নৈঃশব্দ্যে।

ঘরে একটা পাঁচ পাওয়ারের টিমটিমে আলো ছাড়া কিছু নেই—সে আলোও জ্বলছে আমার পাশে সুইচ-বোর্ডে। মঞ্চে সে আলো কোনওমতে পৌঁছোচ্ছে। প্রায়ান্ধকার মঞ্চের ওপর সহসা আবির্ভূত হল একটা...না, না, একটা নয়... দুটো বিচিত্র মূর্তি।

কিন্তু এ কী মূর্তি! ভয়ংকর, অথচ সুন্দর! বিচিত্র এবং বিস্ময়কর! প্রফেসরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্যোতির্ময় ক্রিস্টাল ঝকঝক করছে— যেন একটা ক্রিস্টালের চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। গা লেপটে রয়েছে এই ক্রিস্টালচ্ছটা— খুব মিহি আবরণ। এক ইঞ্চির ষোলো ভাগের এক ভাগের মতো পুরু ধড়ের জায়গায়— মাথার জায়গায় বেশি পুরু, এক ইঞ্চির আটভাগের মতো। প্রথমে দেখলাম কেবল এই ক্রিস্টাল আবরণ। তারপরেই একটা গাঢ় নীল দ্যুতি ডিম্বাকারে ঘিরে ধরল তাঁকে। আধ মিনিট যেতেই ফুটে উঠল গাঢ় নীল দ্যুতির ঠিক গা ঘেঁসে বাইরের দিকে আবছা নীল একটা দ্যুতি— কয়েক ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত। পরপর তিনটে আবরণ এখন একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। ক্রিস্টাল আবরণ, গাঢ় নীল ডিম্বাকার দ্যুতি, আবছা নীল ছটা। তিনটে আবরণই দুলে দুলে উঠছে। যেন হৃদ্‌স্পন্দনের তালে তালে ছন্দিত হচ্ছে। সংকুচিত হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে, প্রাণশক্তির দমকে দমকে ফুলে ফুলে উঠছে।

পাশেই টেবিলের ওপর রাখা মানিপ্ল্যান্ট ঘিরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্য এক জ্যোতির্বলয়। খুদে ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘিরে ধরেছে গাছটাকে। পাতার লক্ষ রন্ধ্রপথে ঠিকরে আসছে লাল সাদা নীল হলদে আলোর ফুলকি। লক্ষ তারার রোশনাইয়ে যেন সমুজ্জ্বল এক ছায়াপথের খণ্ড চিত্র! এই জ্যোতির্বলয়ও সংকুচিত হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে যেন প্রাণশক্তির স্পন্দনে।

বিমুগ্ধ হলাম। রোমাঞ্চিত হলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম।

যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল প্রফেসরের শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'দীননাথ, ও দীননাথ।'

জবাব দেবার মতো অবস্থা ছিল না। শুধু চেয়ে রইলাম। প্রফেসর বললেন, 'ভয় পেয়ো না। যা দেখছ, এরই নাম বায়োপ্লাজমা। তোমাকেও ঘিরে বিরাজ করছে এই বায়োলজিক্যাল প্লাজমা বডি। প্রাচীনকালে একেই বলা হত ইথিরিয় বা অ্যাসট্র্যাল বডি। এই বায়োপ্লাজমা বডির দ্বারাই গাছপালার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে মানুষ।

'আমিও পারতাম। কিন্তু আমার সে মনের শক্তি নেই— ক্লেয়ারভয়্যান্টদের যা আছে। তাদের এই ক্ষমতা আছে বলেই প্লাজমা বডিকে বিচ্ছুরিত করে সাইকোকাইনেটিক ভেল্‌কি দেখাতে পারে— হাত দিয়ে না-ছুঁয়ে চামচে বেঁকিয়ে দিতে পারে উরি গেলারের মতো। গাছের গা থেকে এই শক্তি আহরণ করা যায়—আমেরিকায় ইন্ডিয়ানরা অসুস্থ হলে, কি মানসিক দুর্বলতায় ভুগলে, তাই জঙ্গলে গিয়ে গাছের গুঁড়িতে

পিঠ চেপে বসে থাকে। উরি গেলারও শুনেছি গাছের সান্নিধ্যে নিজেকে বেশি শক্তিমান মনে করেন।

'ক্লেয়ারভয়্যান্টরা আঙুলের ডগা দিয়ে বা চোখের মধ্যে দিয়ে নীল বিদ্যুৎ বর্ষণ করতে পারে। সাদা চোখে দেখা যায় না, যন্ত্রের মধ্যে রাখলে দেখা যেত। আমি আঙুল তুলছি, দেখো তো দেখতে পাও কিনা।'

তর্জনী তুললেন প্রফেসর। খুদে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দেখলাম যেন তাঁর আঙুলের ডগায়। ভলকে ভলকে নীল অগ্নিশিখা ছুটে আসছে।

খুশি হলেন প্রফেসর। 'তা হলে আমারও শক্তি আছে। চোখে দেখলে তো? আর হেনস্থা কোরো না আমাকে। মানির ফোর্স ফিল্ডের সঙ্গে এবার আমিও যোগাযোগ করতে পারব। দেখাই যাক, পারি কি না।'

বলে, মানিপ্ল্যান্টের দিকে তর্জনী ঘোরালেন প্রফেসর। ভলকে ভলকে নীল বিদ্যুৎ ধেয়ে গেল সাদা লাল নীল হলুদ ফোর্স ফিল্ডের দিকে। অমনি লকলকে সাপের জিভের মতো সড়াৎ করে একটা শিখা ছিটকে এল তাঁর দিকে। আঙুল দিয়ে বেরোল নীল শিখা, মিলে গেল সাদা লাল নীল হলুদ শিখার সঙ্গে। নিথর হয়ে বসে রইলেন প্রফেসর। যেন আত্মসমাহিত। ধ্যানস্থ। মানুষ আর গাছের মধ্যেকার যোগসূত্র আলোক রশ্মিটা কেবল স্পন্দিত হতে লাগল অব্যাখাত প্রাণশক্তিতে।

তর্জনী নামিয়ে নিলেন প্রফেসর। হৃষ্টস্বরে বললেন, 'শুনলাম মানির কথা। এক্সপেরিমেন্ট আমার সাকসেসফুল হয়েছে। গাছে মানুষে সরাসরি কথাবার্তা এখন থেকে সম্ভব হবে। সম্ভব হবে সোনা তৈরির এক্সপেরিমেন্টও। রেগুলেটর ঘোরাও দীননাথ— অফ করো কারেন্ট।'

এক পয়েন্ট এক পয়েন্ট করে আবার ঘুরিয়ে আনলাম রেগুলেটর। একে একে মিলিয়ে গেল আবছা নীল, দ্যুতি, তারপর গাঢ় নীল আবরণ, সবশেষে ক্রিস্টাল আবরণ। আবার আবির্ভূত হল বর্ণালী। আগে যে রংগুলো পরপর এসেছিল, উলটোদিক থেকে সেই রংগুলোই ছেয়ে দিল মঞ্চের ওপরকার শূন্যস্থান একে একে। ভ্রমর গুঞ্জনও উচ্চগ্রামে উঠে আবার নিম্নগ্রামে নেমে মিলিয়ে গেল এক সময়ে। ঘরের মধ্যে পাঁচ পাওয়ারের বাল্‌বের আলো ছাড়া আর কোনও আলো রইল না।

মঞ্চ থেকে নেমে এলেন প্রফেসর। আমার কাছে আসার আগেই চোখে ধোঁয়া দেখলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম, সুইচ বোর্ডের পাশেই মেঝেতে পড়ে আছি। প্রফেসর আমার দিকে পেছন ফিরে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে খুটখাট করছেন। টেবিলে মানিপ্ল্যান্টটা কেবল নেই।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়তেই ফিরে তাকালেন প্রফেসর। বললেন স্বাভাবিক গলায়, 'এতটুকু মনের জোর নেই— কী ছেলে রে বাবা।'

আমি কেবল বিহ্বল চোখে চেয়ে রইলাম। টেবিলের ওপর ওটা কী? উঠে বসতেই

চোখে পড়েছে। ভয়ংকর জিনিসটা ওখানে এনে রেখেছেন কেন প্রফেসর?

ভাঙা গলায় ভয়ার্ত স্বরে বললাম, 'ওকী! ও কী করছেন প্রফেসর?'

সিসের চাদর দিয়ে মোড়া সিসের কৌটোটার এক হাত সামনে কীসের একটা বাট রেখে প্রফেসর বললেন, 'সোনা তৈরির এক্সপেরিমেন্ট।'

সভয়ে বললাম, 'কি... কিন্তু ওই মারাত্মক কৌটোটা এনেছেন কেন? বিদেয় করুন... বিদেয় করুন!'

নির্বিকারভাবে প্রফেসর বললেন, 'ভয় নেই... ভয় নেই... মানি শিখিয়ে দিয়েছে কী করতে হবে।'

'কিন্তু মাইটোজেনিক রে—'

'দূর বোকা! ঘাস ছুঁয়ে ফেলেছিল বলে কোচিন মরেছে— মাইটোজেনিক রে ওর প্রোটোপ্লাজম তন্তুগুলো অন্যভাবে সাজিয়ে দিচ্ছে। জানোই তো, গ্রিক ভাষায় মাইটোস্ মানে তন্তু। আমি তো ছুঁচ্ছি না— শুধু সিসের বাক্সর গায়ে একটা ফুটো করব। তারপর—'

'তারপর?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

একটা ইস্পাতের ছুঁচলো শলাকা হাতে নিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ঘাসের ফোর্সফিল্ড গিয়ে পড়বে সিসের গায়ে, সিসে হবে সোনা।'

'কিন্তু ও তো মরা ঘাস—ফোর্সফিল্ড আছে কি?'

'শস্যের বীজকেও মরা ঘাস বলা হয়। উপযুক্ত পরিবেশে ফোর্সফিল্ডের ঘুম ভাঙে। এখানকার ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড ঘাসের সেই উপযুক্ত পরিবেশ— মানি বলল।'

বলতে বলতে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন প্রফেসর।

আমি বললাম, 'কিন্তু সিসের চাদর আর সিসের কৌটোও তো সোনা হয়ে যাবে?'

'যেতে পারে— তখন না হয় সিসের নতুন চাদর দিয়ে মুড়ে রাখব ঘাস-ভরতি সোনার কৌটো।'

'ফুটোটা করলেন না?'

'আরে তাই তো, একদম ভুলে গেছি তোমার বকবকানিতে,' বলেই আমার চোখে চোখ রেখে ফিক করে হেসে ফেললেন প্রফেসর, 'সোনা তৈরি দেখতে বড্ড ইচ্ছে, তাই না? সোনার ওপর বড় লোভ?'

'কার নেই বলতে পারেন?'

'আমার অন্তত নেই,' বলে মঞ্চে উঠলেন প্রফেসর। হেঁকে বললেন, 'রেগুলেটর এক পয়েন্টে রাখো।'

রাখলাম।

প্রফেসর ছুঁচলো শলাকা দিয়ে সিসের চাদরে একটা ফুটো করলেন। আরও চাপ দিয়ে ভেতরকার কৌটোও ফুটো করলেন। ফুটোটা করলেন কিন্তু সিসের বাট যেদিকে রয়েছে সেই দিকে। নিজে রইলেন কৌটোর যেদিকে ফুটো করছেন, তার উলটোদিকে। হাতটা বাড়িয়ে উলটোদিক থেকে খোঁচা মেরে ফুটো করে গেলেন। বুঝলাম, মুখে যতই বেপরোয়া ভাব দেখান, প্রাণে ভয় আছে।

ফুটো হয়ে যেতেই লাফ দিয়ে নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। রেগুলেটরের সামনে দৌড়ে এলেন। ফুল পয়েন্টে লিভার ঠেলে দিয়ে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন ঘরের বাইরে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বললেন, 'চলো দেখে আসি তোমার বন্ধু, মানে, কোচিনকে।'

ঘরের ভেতরে শুনলাম ভ্রমর গুঞ্জন।

কোথায় কোচিন? ঘর শূন্য। মেঝেতে খড়ির দাগটা কেবল আছে— সে নেই।

চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে প্রফেসর বললেন, 'ভ্যানিশ্‌ড হয়ে গেল নাকি?'

কোচিন যেখানে হেঁট হয়ে শুয়ে ছিল, হেঁট হয়ে সেই জায়গাটা দেখলাম। পিঁপড়ের চাইতেও ছোট্ট একটা পোকা পড়ে রয়েছে।

ভাল করে তাকালাম। মিশকালো পোকা।

পরক্ষণেই এক চিৎকার, 'প্রফেসর! শিগগির আসুন!'

দৌড়ে এলেন প্রফেসর। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন পোকাটার ওপর।

চুক চুক শব্দ করলেন মুখে, 'আহা রে? এমন দুর্গতিও কারও হয়?'

মিশকালো পোকাটা একটা মানুষ। পোকার মতো ছোট্ট মানুষ। অবিকল কোচিন গাঙ্গুলির মতো দেখতে।

দ্রুত ছোট হয়ে যাচ্ছে। যত ছোট হচ্ছে, ছোট হওয়ার বেগ যেন আরও বেড়ে যাচ্ছে। হুহু করে একটা সর্ষে বীজের আকার নিল কোচিন। তারপর এককণা ধুলো। তারপর কিছু নেই।

অ্যাটম হয়ে গেল কোচিন গাঙ্গুলি। অথবা তার চাইতেও ছোট।

'ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি,' তিনবার বললেন প্রফেসর।

'গেল কোথায় কোচিন?' বললাম বিমূঢ়ের মতো।

'যেখান থেকে সব বস্তুর সৃষ্টি, আবার বস্তু মাত্রই যেখানে বিলীন হয়ে যাচ্ছে— সেইখানে।'

বলেই, সোজা হয়ে বসলেন প্রফেসর। টানটান হয়ে গেল শিরদাঁড়া।

ভড়কে গেলাম, 'কী হল?'

'আওয়াজটা...... আর শোনা যাচ্ছে না।'

'কোন আওয়াজটা?'

'হাইফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটরের।'

সত্যি তো! ভ্রমর গুঞ্জনের আওয়াজে সারাবাড়ি কাঁপছিল এতক্ষণ। আচমকা থমথমে নৈঃশব্দ্য যেন গ্রাস করে নিয়েছে সেই শব্দ।

চকিতে চেয়ারের দিকে তাকালেন প্রফেসর— যে-চেয়ারের পায়ের কাছে দুটো কাদামাখা পায়ের ছাপ। এখন অবশ্য শুকিয়ে খটখটে।

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। পেছন পেছন আমি।

হাইফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর আর চলছে না— বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রেগুলেটর রয়েছে জিরো পয়েন্টে।

'কে বন্ধ করল রেগুলেটর?' চিৎকার করে বললাম।

অদ্ভুত শান্ত গলায় বললেন প্রফেসর, 'বিলাই লামা!' বলে, আঙুল তুলে দেখালেন মঞ্চের ওপরকার টেবিলের দিকে।

পাঁচ পাওয়ারের ম্যাড়মেড়ে আলোয় চিকমিক করছে একটা সোনার বাট টেবিলের ওপর। এ ছাড়া টেবিলে আর কিছু নেই।

উধাও হয়েছে সিসের চাদর মোড়া সিসের কৌটো ভরতি শুকনো ঘাস।

ত্রিভুজ রহস্য

চৌকাঠে পা রাখতেই শুনলাম সোল্লাসে ডাকছেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, 'এসো দীননাথ, এসো, তোমার জন্যেই বসে আছি এতক্ষণ।'

রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। একে অমাবস্যার রাত, তার ওপর লোডশেডিং। অবশ্য এমার্জেন্সি লাইট জ্বলছে টেবিলের ওপর। কিন্তু প্রফেসর ঘরে নেই। ঘর একদম ফাঁকা।

বুড়ো মানুষ। ক'দিন দেখাও হয়নি। কী এক বিদঘুটে গবেষণা নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। টেলিফোন করে জানতে গেছিলাম, গবেষণাটা কী ধরনের, উনি গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'ভূত নিয়ে, প্রেত নিয়ে। হয়েছে? খবরদার। যদি ডিসটার্ব করবে তো টেলিফোন ছুড়ে মারব।'

তাই থেমে গেলাম। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম শূন্য ঘরটার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম পৈশাচিক, হাড় হিম করা অট্টহাসি। ঘরের মধ্যে থেকে!

ঠকঠক করে হাঁটু কাঁপতে লাগল আমার। গলা দিয়েও নিশ্চয় গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে এসেছিল। কেননা হাসি থামিয়ে বিকট হেঁড়ে গলায় বললেন প্রফেসর, 'তবে যে ছোকরা, খুব বড়াই করতে ভয় ডর তোমার প্রাণে নেই?'

'কো... কো... কোথায় আপনি?'

'এই তো ঘরের ঠিক মাঝখানে।'

ঘরের মাঝখানে তো শুধু একটা চেয়ার! কেউ বসে নেই চেয়ারে।

আচম্বিতে চেয়ারটা উঠে পড়ল শূন্যে। শূন্যপথেই ডবল পাক খেয়ে ঠকাস করে পড়ল মেঝেতে।

পেছন ফিরে চম্পট দিতে যাচ্ছি, খপ করে কে যেন কাঁধ চেপে ধরল পেছন থেকে।

ব্যস, বিকট চিৎকার ছেড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম, ঘরে আলো জ্বলছে। প্রফেসর স্মেলিং সল্টের শিশি ধরে আছেন আমার নাকের সামনে। মুখখানা গম্ভীর।

রক্ত চড়ে গেল মাথায়। তড়াক করে উঠে বসে তারস্বরে বললাম, 'ভয় দেখালেন কেন?'

কাষ্ঠ হাসি হেসে প্রফেসর বললেন, 'একটু রসিকতা করতে গেছলাম।'

'সত্যি অদৃশ্য হয়েছিলেন নাকি?'

'সত্যি।'

'কীভাবে?'

'তার আগে একটা কাহিনি বলতে হয়। শুনবে?

প্রফেসর যা বললেন, তা শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

জিব্রাল্টার অন্তরীপ আর মেক্সিকো উপসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় শুধুই আটলান্টিক মহাসমুদ্র। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী নিঃসীম শূন্যতা, জল আর জল। বড়ই রহস্যময় এলাকা। বহু বছর ধরেই অনেক গল্পকথা শোনা যায় রহস্য থমথমে এই তল্লাট ঘিরে।

ক্যাপ্টেন ডেভিড অ্যামোরি রবসন, স্টিমশিপ জেসমন্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন আটলান্টিকের ঠিক এই জায়গা দিয়েই, আজ থেকে একশো বছর আগে।

ডেকে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য কাহিনিগুলোর কথাই ভাবছিলেন ক্যাপ্টেন। মধ্য আটলান্টিকের এই অঞ্চলেই জলতলে কবর রচনা করেছে সুদূর অতীতের এক মহাদেশ আটলান্টিস।

হ্যাঁ, এইখানেই হাজার হাজার বছর আগে প্রকৃতির রুদ্র রোষে সলিল সমাধি ঘটেছিল আটলান্টিসের। জ্ঞানবিজ্ঞানে চূড়ান্ত উন্নতি ঘটানোর পর নাকি একদিন একরাতেই তলিয়ে গিয়েছিল বিরাট সেই মহাদেশ। আমেরিকার ত্রিকালজ্ঞ, সাইকিক এডগার কেসি তাঁর তৃতীয় নয়নে প্রত্যক্ষ করেছেন আটলান্টিসের ধ্বংসদৃশ্য। জেনেছেন মূল কারণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত আটলান্টিয়ানরা বিস্ফোরক বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছিল। ভয়ানক এই বিদ্যার অবাধ চর্চার ফলেই নাকি পাতাল আধারে সঞ্চিত বিস্ফোরক-বিদ্যুৎ ফেটে উড়িয়ে দেয় গোটা মহাদেশটাকে। এবং ঠিক এই জায়গায়। এখন যেখানে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী নোনা জল ঝোড়ো হাওয়ায় ফুঁসছে, নাচছে, ঢেউয়ের মাথায় মুকুট পরাচ্ছে।

বিস্ফোরণটা ঘটেছিল নাকি ব্ল্যাক ম্যাজিকের বেপরোয়া চর্চার ফলে।

ব্ল্যাক ম্যাজিক। ডাকিনী বিদ্যা! ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে ক্যাপ্টেনের ঠোঁটের কোণে। এডগার কেসি এই বিষয়টা আরও একটু স্পষ্ট করে বললে বোঝা যেত, ডাকিনী বিদ্যার প্রয়োগ বিস্ফোরক-বিদ্যুতে বিস্ফোরণ ঘটাল কেন?

এই পর্যন্ত শুনেই বাধা দিয়েছিলাম প্রফেসরকে। বলেছিলাম, 'আগে বলুন দিকি এই ক্যাপ্টেন ডেভিড রবসন মহাশয়টি কি আপনার মনগড়া?'

'না।' মৃদু হেসে বলেছিলেন প্রফেসর, 'জাহাজি নথিপত্র ঘাঁটলেই তার নাম পাবে। যা-যা বলেছি, সব লেখা আছে।'

'কোথায় আছে নথিপত্র?'

'লন্ডনের মেসার্স ওয়াটস অ্যান্ড কোম্পানি নামের জাহাজ কোম্পানির দপ্তরে।'

'মুখস্থ রেখেছেন দেখছি!'

ফোকলা মাড়িতে হেসে বলেছিলেন প্রফেসর, 'অনেক জাহাজের ক্যাপ্টেনি করেছেন রবসন, কিন্তু জেসমন্ড জাহাজে তিনি যে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তার তুলনা নেই। বাগড়া দিয়ো না। শুনে যাও।'

১৯৮১-৮২ সালে ভূমধ্যসাগরের অনেকগুলো বন্দর ছুঁয়ে গেল জেসমন্ড। ফুর্তির অন্ত

নেই মাঝিমাল্লাদের। কারবার ভালই চলছে। এক-একটা বন্দরে এক-এক রকমের আনন্দ আর আবহাওয়া।

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে মেসিনা সিসিলিতে পৌঁছোল জাহাজ। শুকনো ফল তোলা হল খোলের মধ্যে। ডেলিভারি দিতে হবে নিউ অর্লিয়েন্সে। অ্যাজোরেস থেকে পাঁচশো মাইল দক্ষিণে এসে খটকা লাগল ক্যাপ্টেন রবসনের।

অতীতের আটলান্টিক নিয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করার সময়ে ধুধু জলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন। হঠাৎ চিন্তার রেশ কেটে গেল। এ অঞ্চলের সমুদ্রের জল বরাবরই বড় পরিষ্কার। কিন্তু হঠাৎ জল এত গাঢ় হয়ে উঠছে কেন?

খরচোখে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। মরা মাছগুলো চোখে পড়ল একটু পরেই।

সদ্য মরা মাছ। রাশি রাশি। গায়ে গায়ে লেগে ভেসে আছে। যতদূর দু'চোখ যায়, কেবল মাছ আর মাছ। সবই মরা।

নিজের দু'চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না রবসন। ডাক দিলেন ফার্স্ট মেটকে।

মরা মাছের ভাসমান পুঞ্জ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

ফিসফিস করে রবসনের কানের কাছে বললেন তিনি, 'ভুতুড়ে কাণ্ড স্যার। আটলান্টিয়ানদের প্রেতাত্মারা নাকি আজও টহল দিয়ে বেড়ায় এখানে।'

'চোপরাও!' রীতিমতো রেগে গেছিলেন ক্যাপ্টেন রবসন। কিন্তু মাইলের পর মাইল মরা মাছের পিণ্ড ঠেলে এগিয়েও শেষ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

সন্ধ্যা হল। জাহাজের সকলেই বেশ ভয় পেয়েছে। আর এগোতে চাইছে না। রাতের অন্ধকারে না জানি কী বিভীষিকা ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজের ওপর!

কিন্তু অটল রইলেন ক্যাপ্টেন রবসন। এ-রহস্যের শেষ না-দেখে তিনি ছাড়বেন না। তা ছাড়া নিউ অর্লিয়েন্স তাঁকে পৌঁছোতেও হবে নির্দিষ্ট সময়ে। ঘুরপথে গিয়ে দেরি করার কৈফিয়ত ওপরওয়ালা মানবে কেন? হুকুম দিলেন ফার্স্ট মেটকে, সারারাত এইভাবেই চলুক জাহাজ। নতুন কিছু ঘটলেই ডাকবেন।'

ভোরের দিকে রবসনের ঘুম ভেঙে গেল দরজার ওপর দুমদাম শব্দে। সেই সঙ্গে ফার্স্ট মেট-এর তারস্বরে চিৎকার, 'ক্যাপ্টেন! শিগগির আসুন।'

ধড়মড় করে উঠে পড়লেন ক্যাপ্টেন। ঘরের ভেতর থেকে বললেন মহা উদ্‌বেগে, 'হয়েছেটা কী?'

'ডাঙা! ডাঙা!'

পাগল হয়ে গেলেন নাকি ফার্স্টমেট? আটলান্টিকের এ জায়গায় কয়েক হাজার মাইল ধরে শুধু নোনা জল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়ার কথা নয়। ডাঙা দেখছেন কোথায়?

ঝটপট জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন রবসন। দু'চোখ রগড়ে তাকালেন সামনের দিকে। যা দেখলেন, তা তাঁর লোম খাড়া করার পক্ষে যথেষ্ট।

এ কী! এখানে দ্বীপ এল কোত্থেকে? বেশ কয়েকটা উঁচু পাহাড়চূড়াও দেখা যাচ্ছে! প্রতিটি চূড়া থেকে তাল তাল ধোঁয়া উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে।

হুঁশিয়ার হলেন ক্যাপ্টেন। চোরা পাহাড় থাকতে থাকতে পারে। গতিবেগ কমানোর হুকুম দিলেন তখুনি।

সিসের ওজন ডুবিয়ে দেওয়া হল, জল কতটা গভীর দেখার জন্যে। ঘাবড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। জল মাত্র তিনশো ফুট গভীর।

পর্বতময় প্রেতচ্ছায়ার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। এতদিন যা কিছু শুনেছিলেন, তা কি তা হলে মিথ্যে নয়? নইলে এমন অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে কেন?

দ্বীপ থেকে দশ মাইল দূরে এসে আর এগোতে সাহস পেলেন না রবসন। জল সেখানে মাত্র চল্লিশ ফুট গভীর। সব ক'টা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নোঙর ফেলার হুকুম দিলেন রবসন।

ডাকলেন থার্ড অফিসারকে, 'টম, বোট নামাও।'

থার্ড অফিসার আর জনাকয়েক খালাসিকে নিয়ে ক্যাপ্টেন রবসন রওনা হলেন রহস্যময় দ্বীপের দিকে।

কিছুদুর যেতেই দেখলেন, অনেকখানি চ্যাটালো জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে আগ্নেয় আবর্জনা। লাভা, পাথর, ছাই, পিউমিস স্টোন। বেশ কয়েক মাইল দূরে, উঁচু মালভূমির শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে ধূমায়িত শিখর শ্রেণি। পুরো জায়গাটা খাঁখাঁ করছে। প্রাণের সাড়া নেই কোথাও।

থ হয়ে রবসন দাঁড়িয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর হাঁকডাক দিয়ে খালাসিদের নৌকো থেকে নামিয়ে, রওনা হলেন দ্বীপের ভেতর দিকে।

পা আটকে যেতে লাগল বড় বড় গোল পাথরে। গোড়ালি মচকে গেল ফেটে যাওয়া পাথুরে খাঁজে। এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটল।

একজন খালাসি নৌকোর আঁকশিটা দিয়ে পাশের পাথরে খোঁচা মেরে চলেছিল নার্ভাসভাবে। আচমকা আঁকশির ডগায় উঠে এল একটা পাথর। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল, 'ক্যাপ্টেন! দেখুন।'

চমকে উঠে দৌড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। খুবই সামান্য বস্তু। কিন্তু অতীব তাৎপর্যময়!

একটা তিরের ফলা। ফ্লিন্ট পাথর দিয়ে তৈরি!

এ জিনিস এখানে এল কোত্থেকে?

রবসনের চমক ভাঙল থার্ড অফিসারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে, 'স্যার, চারপাশটা খুঁজে দেখব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এখুনি। গাঁইতি আর কোদাল নিয়ে এসো নৌকো থেকে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল দুটো বিশাল পাথরের দেওয়াল।

নিঃসীম উত্তেজনায় ক্যাপ্টেন আর তাঁর দলবল ঝপাঝপ কোদাল আর গাঁইতি চালিয়ে গেলেন সারাটা দিন। পথ পরিষ্কার করে হাত দশেক নামতেই দেখতে পেলেন একটা প্রকাণ্ড পাথরের দরজা। পাথরের গায়ে সাংকেতিক ছবিগুলোর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন। মিশরীয় চিত্রময় অক্ষরের মতো দেখতে অনেকটা। কিন্তু আরও দুর্বোধ্য।

দরজার ওপারে একটা ছোট্ট প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠটা বিচিত্র। বাইরের সামান্য আলো আসছিল গলিপথ আর দরজার ফাঁক দিয়ে। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল এক অসাধারণ

সংগ্রহশালা। ঘরের ঠিক মধ্যিখানে রয়েছে প্রস্তর নির্মিত এক বিশাল শবাধার। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তর আংটি, বলয়, হাতুড়ি আর পাথরের যন্ত্রপাতি।

সবচেয়ে তাজ্জব হলেন ক্যাপ্টেন পাথরের শবাধারটা খোলার পর। প্রথমত, এই আকারের শবাধার তিনি জীবনে দেখেননি।

আকারে তেকোনা বাক্সের মতো। সবাই মিলে চেষ্টা করতে কড়কড় শব্দে বিষম ভারী ডালা উপরে উঠে একদিকে হেলে গিয়েছিল আপনা থেকেই। যেন অদৃশ্য কবজা আছে পাথরের মধ্যে। শুধু কবজা নয়, গোপন স্প্রিংও যে আছে ভেতরে তা জানা গেছিল অনেক পরে।...

'শবাধারের মধ্যে ছিল একটা ম্যমি!'

'ম্যমি?'

'হ্যাঁ, মিশরে যেরকম ম্যমি দেখা যায়। আর ম্যমির দু'পাশে ছিল দুটো বিশাল ফুলদানি।'

'ফুলদানি!'

চোখ বড় বড় করে প্রফেসর বললেন, ওই তো, তোমার মাথার কাছেই রয়েছে।'

সচমকে ঘুরে বসেছিলাম আমি।

খাটের মাথার দিকে একটা টেবিল। টেবিলের ওপর শুধু দুটো ফুলদানি! লম্বায় প্রায় দেড় ফুট। ওপরে খোদাই করা পশু, পাখি আর বিস্তর সাংকেতিক অক্ষর।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'কি ছিল প্রফেসর তার মধ্যে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না প্রফেসর। চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে আমার দিকে।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তার আগে রবসনের শেষ কাহিনিটা বলে নিই।'

রহস্যময় দ্বীপের পাতাল প্রকোষ্ঠ থেকে সব জিনিসই জাহাজের খোলে এনে তুললেন ক্যাপ্টেন রবসন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে ছিল, আরও দিন কয়েক দ্বীপে অভিযান চালানোর, আরও দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী উদ্ধার করার।

কিন্তু কর্তব্যের উদ্‌বেগ মাথায় নিয়ে অজানা দ্বীপের রহস্যভেদ করা যায় না। তাই ঠিক করলেন, নিউ অর্লিয়েন্সে মালটা খালাস করে ফেরার পথে আশ মিটিয়ে অভিযান চালাবেন। দ্বীপের অবস্থানটা লিখে রাখলেন লগবুকেও।

কিন্তু ফেরার পথে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, কোথায় কী! দ্বীপ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। অসীম জলরাশি থইথই করছে সেখানে।

সে কী! তবে কি সবটাই রবসনের বানানো গল্প?

অনেকে তাই বলে। তবে আরও কয়েকটা জাহাজ নাকি মরা মাছের দঙ্গল দেখেছে। আর মিথ্যেই যদি হবে তো ওই ফুলদানি দুটো আমি পেলাম কী করে? শবাধারটাকেই বা উদ্ধার করলাম কেন?

চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল আমার, 'শবাধার উদ্ধার করেছেন? ম্যমি সমেত?'

'হ্যাঁ, ম্যমি সমেত।'

'কো... কোথায়?'

একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'ডারহ্যামের একটা গ্রামে। গ্রামটার নাম জ্যারো।'

'সেটা আবার কোথায়।'

করুণার চোখে তাকালেন প্রফেসর, 'ইংল্যান্ডে। জ্যারো হল গিয়ে রবসনের জন্মস্থান। সেখানে খোঁজখবর নিলাম, নানান কিউরিও শপে। শুনলাম, একশো বছর আগে খানকয়েক দুষ্প্রাপ্য মিশরীয় সামগ্রী রবসন বেচেছেন তাদের কাছে।'

'মিশরীয় সামগ্রী?'

'রবসন ওই নামেই চালিয়েছেন জিনিসগুলোকে। দেখতে অনেকটা প্রাচীন মিশরীয় জিনিসের মতো কিনা, তাই!'

খাবি খেতে খেতে বললাম, 'আপনি তা হলে মানছেন আটলান্টিস ছিল?'

হেঁয়ালির হাসি হেসে বললেন প্রফেসর, 'আটলান্টিস ছিল কিনা দু'হাজার বছরেও তা সঠিক জানা যায়নি। তবে তার কিছুটা অন্তত সত্যি বলে মনে হয়েছে, ডারহ্যাম থেকে জিনিসগুলো নিয়ে এসে গবেষণা করার পর।'

'তার মানে?'

উত্তরে প্রফেসর যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে রোমহর্ষক।

ডারহ্যামের কিউরিও দোকানদার প্রফেসরের কৌতূহলে জল ঢেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'পাগল হয়েছেন? ওই ভুতুড়ে কফিন নিজের দেশে নিয়ে যাবেন?'

প্রফেসর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ভুতুড়ে কফিন বলছ কেন?'

'সাংঘাতিক কাণ্ড মশাই। ওই তো, ওই গোরস্থানে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছি।'

'সাংঘাতিক কাণ্ড কি, তা বলবে তো?'

'বললে কি বিশ্বাস হবে?'

'লোকে যা বিশ্বাস করে না, আমি তা করি। লোকে যার মানে খুঁজে পায় না, আমি তার ব্যাখ্যা খুঁজে দিই।'

'তার মানে আপনি বিজ্ঞানী?'

'শত্রুরা তাই বলে।'

'ফুঃ! এ ব্যাপারের কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। স্রেফ ভুতুড়ে ব্যাপার।'

'কীরকম?'

'আরে মশাই, দিন দুপুরে খটখটে রোদ্দুরে তালা দেওয়া কফিন থেকে ম্যমি উধাও হয়ে যায়। আবার একসময় দেখা যায় ম্যমি রয়েছে ভেতরে। এমন তাজ্জব ব্যাপার শুনেছেন কখনও?'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো।'

'অদ্ভুতই তো। তাই বলছিলাম, মাটির তলায় যা আছে, তা মাটির নীচেই থাক।'

সেই রাতেই কিন্তু গোরস্থান থেকে উধাও হয়ে গেছিল তেকোনা শবাধার। অনেক কলকাঠি নেড়ে জিনিসটাকে কলকাতায় এনেছিলেন প্রফেসর।

তারপর থেকেই শুরু হয় তাঁর গবেষণা।

রাতের অন্ধকারে শবাধার এসেছিল প্রফেসরের বাড়িতে।

লোকজন বিদায় নিলে পর প্রফেসর গিয়ে দাঁড়ালেন রহস্যময় কফিনের সামনে। কালো বনাত দিয়ে মোড়া আগাগোড়া। ব্যবস্থাটা তিনিই করেছিলেন। যাতে বাইরের আলো শবাধার স্পর্শ না করে।

বনাত কেটে কফিনটাকে সরিয়ে রাখলেন একপাশে। পাথরের ডালায় খোদাই করা ছবি-অক্ষর নিয়ে মাথা ঘামালেন কিছুক্ষণ। কিন্তু মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

শেষে একটা টুলে বসে রইলেন পাঁচ মিনিট। তারপর ডালাটা খোলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ঠিক করলেন, সকাল হলেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

প্রফেসরের ঘুম ভেঙেছিল একটু বেলায়। ধড়মড় করে উঠে নীচে নেমে এলেন। জানলায় শার্সি দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বাধারে। শবাধার খুলে গেছে আপনি আপনিই। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, ভেতরে ম্যমির চিহ্ন মাত্র নেই!

দুপুরবেলা পাঁচরকম চিন্তায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন প্রফেসর। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কে যেন বালিশ ধরে টানাটানি করছে।

উঠে পড়ে দেখলেন, মনের ভুল। কেউ নেই।

বালিশটা কিন্তু বেঁকে রয়েছে।

হঠাৎ নজরে পড়ল, বালিশের তলা থেকে তাঁর ইলেকট্রনিক রিস্টওয়াচ আর ক্যালকুলেটরটা উধাও। ঘরের দরজা কিন্তু ভেতর থেকে বন্ধ!

উঠে পড়লেন প্রফেসর। তখন বিকেল হতে চলেছে। নেমে এলেন একতলায়। ঢুকলেন শবাধার যে ঘরে আছে, সেই ঘরে। দেখলেন, শবাধারের ডালাটা একটু একটু করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!

তিন লাফে গিয়ে পাশের টুলটা তুলে নিয়ে ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর। এবং স্তম্ভিতের মতো চেয়েছিলেন শবাধারের ভেতরে! দেখলেন, উধাও ম্যমি দিব্যি টান টান হয়ে শুয়ে আছে।

না। ভয় পাননি প্রফেসর। দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল। ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে টেনে বার করেছিলেন ফুলদানি দুটো।

উপুড় করতেই একটার মধ্যে থেকে ঠকাস করে পড়ল খুব সম্ভব প্লাটিনামের তৈরি একটা বালা। আর তাঁর ইলেকট্রনিক রিস্টওয়াচ। আর একটার মধ্যে থেকে বের হল একেবারেই অজানা ধাতুর একটু বালা। আর তাঁর ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর।

প্রফেসর মনে মনে ভেবেছিলেন, এ কীরকম ম্যমি? অশরীরীর মতো ঘোরাফেরা করে দিনের বেলায়, চুরি করে ইলেকট্রনিক জিনিস! ভারী আশ্চর্য তো।

বালা দুটো নিয়ে ল্যাবরেটরিতে চলে এলেন প্রফেসর। কফিনের ডালা আধখোলা পড়ে রইল।— দরজাটাও খোলা। দু' হাতে দুটো বালা নিয়ে ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো অজানা ধাতু আর তাদের বিবিধ শক্তির রহস্য জানতে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে গেলেন। রাত ফুরিয়ে গেল। রোদের ধারা নামল ল্যাবরেটরির মধ্যে। প্রফেসরের কিন্তু হুঁশ নেই। হঠাৎ একটা গুরুভার পদশব্দে টনক নড়ল তাঁর।

ধুপ... ধুপ... ধুপ শব্দে যেন হাতি চলে বেড়াচ্ছে করিডরে। শব্দটা এগিয়ে আসছে তাঁর ল্যাবোরেটরীর দিকেই।

দীর্ঘকায় একটা মূর্তি ক্ষণেকের জন্যে দেখতে পেয়েছিলেন প্রফেসর। পরক্ষণেই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল অত্যুজ্জ্বল আলোকে।

সম্বিৎ ফিরে আসতে ভয়াবহ সেই পদশব্দ আর শুনতে পাননি। দীর্ঘকায় বিরাটাকার আকৃতিটাও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ক্রুসিবল থেকে বালা দুটো।

শবাধার যে ঘরে আছে, সে ঘরে তখন আর প্রফেসর যাননি। গিয়েছিলেন অন্ধকার গাঢ় হতে। আলো জ্বেলে দেখলেন, অনুমন তাঁর মিথ্যে নয়। বন্ধ রয়েছে শবাধারের ডালা। অর্থাৎ পলাতক ম্যমি আবার ফিরে এসেছে নিজস্ব আলয়ে।

সমস্ত শক্তি দু'হাতে নিয়ে এসে প্রফেসর কফিনের ডালা খুললেন। ফুলদানি দুটো টেনে আনলেন বাইরে। দেখে নিলেন ভেতরে রয়েছে বালা আর চোরাই মাল।

তারও ঘণ্টাখানেক পরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ফোন করে ডেকে আনলেন আমাকে এবং দেখালেন অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার লোমহর্ষক ম্যাজিক।

বুক ধড়াস ধড়াস করছিল আমার। চিঁচিঁ করে বললাম, 'প্রফেসর, এ নিশ্চয় আটলান্টিয়ানদের ব্ল্যাক ম্যাজিক। কাজ কি অতীতকে ঘাঁটিয়ে?'

'ননসেন্স! ব্ল্যাক ম্যাজিক আবার কি? এমন একটা আবিষ্কার তারা করেছিল যা গুপ্ত শক্তির মতোই। আটলান্টিস তলিয়ে না গেলে, কালে কালে তার প্রকাশ ঘটত। কিন্তু কি সেই শক্তি? দীননাথ, আমি তা ধরতে পেরেছি।'

'পেরেছেন?' লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'ড্যানহ্যামের ওই বিটকেল দোকানদারটা যখনই বলেছিল, দিন দুপুরে ম্যমি উধাও হয়ে যায় বন্ধ কফিন থেকে, তখনই আঁচ করা উচিত ছিল আমার।'

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। বুড়ো সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর। আচমকা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ট্রাঙ্গেল! চির রহস্যময় ত্রিভুজ! আটলান্টিয়ানদের তথাকথিত ব্ল্যাক ম্যাজিকের কিছুটা রয়েছে এই ট্রাঙ্গেল-মিস্ট্রির মধ্যে।'

'ট্র্যাঙ্গেল!' প্রফেসরের অকস্মাৎ বাক্যধারায় থতমত খেয়ে যাই আমি।

'জ্যামিতির ত্রিভুজ বলতে তিনটে ভুজ আর তিনটে কোণ! অবশ্য কিছু মানুষ মনে করেন, ত্রিভুজ একটা নিছক আকার নয়। এর মধ্যে বিধৃত রয়েছে অজ্ঞাত প্রচণ্ড শক্তি।'

'আটলান্টিয়ানরা সমাধান করেছিল এই ত্রিভুজ রহস্য। তাই তারা শবাধার তৈরি করেছিল ত্রিভুজের আকারে।'

এরপর হঠাৎ প্রফেসর উঠে পড়ে বললেন, 'দেখবে এসো।'

একতলায় তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর। পেছন পেছন আমি। প্রস্তর শবাধার রয়েছে এইখানেই।

প্রফেসরের দু'হাতে দুটো ফুলদানি। আমাকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? আলোটা জ্বালো।'

আলো জ্বেলে দেখলাম, কালো বনাত দিয়ে পরিপাটি করে প্রস্তর শবাধারকে মুড়ে রেখেছেন প্রফেসর।

'কালো বনাত কেন প্রফেসর?'

'ম্যমি যাতে আবার না পালায়।'

'তার মানে?'

'কালো বনাতের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো শবাধারে পড়বে না। তাতে গোপন স্প্রিংও কাজ করবে না। ফলে ডালাও খুলবে না।'

ডালার তিন কোণে কতকগুলো ত্রিভুজ দেখিয়ে প্রফেসর বললেন, 'কাছে এসো দীননাথ, দেখেছ? ত্রিভুজের জায়গাগুলোয় পাথরে ফুটো। সূর্যের আলো ঢোকার ব্যবস্থা। ত্রিভুজের আকারে আলো গিয়ে পড়লে ভেতরে শোয়ানো ম্যমির তিন জায়গায়। তারপর ম্যমি চাপ দেবে স্প্রিংয়ে! খুলে যাবে ডালা। তখন বাইরে বেরিয়ে আসবে সে।'

ধাঁ করে বলে উঠলাম, 'কিন্তু বন্ধ ঘরের বাইরে যাবে কি করে?'

আস্তে আস্তে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

বললেন, 'রহস্যটা বুঝতে পেরেছি বলেই তোমাকে ভয় দেখাতে পেরেছিলাম। আটলান্টিয়ানরা এমন দুটো ধাতু আবিষ্কার করেছিল, যা ধারণ করলে অণুপরমাণুর মধ্যে এমন পরিবর্তন আসে যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়।—এমনকী নিরেট দেওয়ালের মধ্যে দিয়েও সশরীরে বেরিয়ে যাওয়া যায়!'

প্রফেসর একটা একটা ফুলদানির মধ্যে হাত গলিয়ে দিলেন। টেনে আনলেন একটা বালা— প্লাটিনামের মতোই ঝকঝকে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে গলিয়ে দিলেন ডান হাতের কবজিতে।

অমনি আর দেখতে পেলাম না প্রফেসরকে!

ভীষণ আঁতকে উঠে তারস্বরে চিৎকার করে উঠেছিলাম, 'প্রফেসর! প্রফেসর। ফিরে আসুন।'

দৃশ্যমান হলেন প্রফেসর। মুখে মিটি মিটি হাসি। হাতের চেটোয় সেই বালা।

এরপর অন্য ফুলদানিটায় হাত গলিয়ে টেনে আনলেন আর একটা অদ্ভুত ধাতু দিয়ে তৈরি বালা। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বালা গলিয়ে দিলেন বাঁ হাতের কবজিতে। তারপর হন হন করে এগিয়ে গেলেন দেওয়ালের দিকে। সামনে দেওয়াল দেখে থামলেন না। শরীরটাকে ঢুকিয়ে দিলেন দেওয়ালের মধ্যে। ঘরে আর প্রফেসর নেই!

একটু পরে সশরীরে ফিরে এসে প্রফেসর বললেন, 'বুঝলে তো ম্যমি কি করে অদৃশ্য হয়ে যায়? বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়?'

'কিন্তু বারো হাজার বছর আগেকার একটা ম্যমি!'

'বৎস দীননাথ, আসল ব্যাপারটা এবার শোনো। ওটা মোটেই ম্যমি নয়। রোবট।'

'রোবট!'

'হ্যাঁ, কলের মানুষ। সূর্যের আলো ত্রিভুজাকারে রোবটের দেহের অংশ বিশেষে পড়লেই কলকবজা চালু হয়ে যায়। তুমি আসার আগেই ছুঁচ ঢুকিয়ে দেখে নিয়েছি। ন্যাকড়ার পটিটা চোখে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়।'

হাঁ হয়ে বসে রইলাম আমি।

পরদিন সকালে টেলিফোন পেয়ে ছুটে গেলাম প্রফেসরের বাড়ি। মুখ চুন করে তিনি বসে আছেন একতলার সেই শবাধারের ঘরে।

জানলা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে শবাধারে। ডালা খোলা। ভেতরে কোনও ম্যমি নেই। ফুলদানি দুটোও নেই।

'পালিয়েছে,' ছোট্ট করে বললেন প্রফেসর।

'কীভাবে?' বোকার মতো প্রশ্ন করি আমি।

'কালো বনাত দিয়ে মুড়তে ভুলে গেছিলাম।' একরাশ হতাশাভরা গলায় প্রফেসর বললেন, 'সকালের রোদ পেয়েই জ্যান্ত হয়ে লম্বা দিয়েছে। আর কি ফিরবে?'

না, ম্যমি রোবট আর ফেরেনি। বোধহয় প্রফেসরের মতলব আঁচ করেই পালিয়েছে—কে জানে সেই সমুদ্রের তলায় কিনা।

তবে আমার দুশ্চিন্তা তোমাদের নিয়ে। হঠাৎ যদি দেওয়াল ফুঁড়ে ঢুকে পড়ে তোমাদের পড়ার ঘরে?...

তারপরেও সুস্থ থাকলে প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে খবর দিয়ো। উনি সেই আশাতেই হাপিত্যেশ করে রয়েছেন।

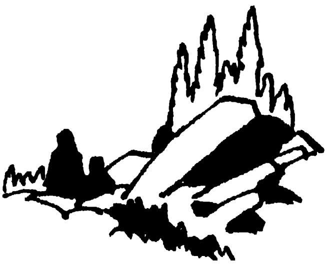

হলুদ পাহাড়

ভদ্রলোক ফরসা, নাদুসনুদুস, মাথা-জোড়া চকচকে টাক, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো, নীচের ঠোঁটটা ওপরের ঠোঁটের চেয়ে পুরু। সাদা পাঞ্জাবির ওপর দিয়ে নেয়াপাতি ভুঁড়িটা বেশ মালুম হয়। বয়স বড় জোর পঞ্চাশ। এই বয়সেও পায়জামা পরেন।

নাম তাঁর শচীন চৌধুরী।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে এসেছিলেন আমার আর প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের সঙ্গে। খুবই গুরুতর ব্যাপার। দেখা করতেই হবে।

নমস্কার-টমস্কারের পালা চুকিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমি একজন সাইকিক।'

প্রফেসর ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন। কথাটা শুনেই চমকে উঠলেন মনে হল। চোখের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ করে শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাইকিক, মানে, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে আপনার?'

বিনয় বিগলিত স্বরে শচীনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে, তা আছে।'

'কী সেবায় লাগতে পারি আপনার?'

'আপনি আমার কোনও সেবাতেই লাগবেন না। যাদের সেবায় লাগবেন, তাদের কথা নিবেদন করতে এসেছি।'

'তারা কারা?'

মোষের শিঙের নস্যির ডিবে বার করে শচীনবাবু বাঁ হাতের তালুতে বেশ খানিকটা নস্যি ঢাললেন। ডিবের ঢাকনি এঁটে পকেটে রাখলেন। ডান হাতের দুই আঙুল দিয়ে নস্যিটাকে কায়দা করে নাকের দুই ফুটোয় পর্যায়ক্রমে চালান করলেন। রুমাল বার করে নাক মুছলেন। তারপর বললেন, 'পৃথিবীর সব সাইকিকই জেনে গেছেন খবরটা। এই বছরেই তা ঘটবে। তারিখটা পর্যন্ত তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় ঘটনা আর ঘটেনি।'

প্রফেসর তাঁর প্রশ্নের জবাব পেলেন না। উষ্মাও প্রকাশ করলেন না। নীরবে কেবল চেয়ে রইলেন। শান্ত নিবিড় চাহনির আড়ালে দেখলাম অতলান্ত কৌতূহলের ঝিলিক।

শচীনবাবুর নস্যির নেশা রক্তে সঞ্চারিত হচ্ছে মনে হল। চোখ রক্তাভ হল। পাতলা জলের আস্তরণও দেখা দিল চোখের ওপর। চাঞ্চল্য ঈষৎ হ্রাস পেল।

মৃদু সুস্পষ্ট উচ্চারণে অনেকটা স্মৃতিচারণের ভঙ্গিমায় বললেন, 'ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত সাইকিক বেরী অ্যানড্রুজ ভিনগ্রহীদের সঙ্গে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ রেখে চলেছে। বেরী আমাকে বারবার বলেছে, অন্য গ্রহের অতি-মস্তিষ্করা তাকে বিস্তর সিগন্যাল পাঠিয়ে বারবার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে কী ধরনের বিপদ লুকিয়ে রয়েছে। পৃথিবীর চারদিকে টহল দিচ্ছে এই ভিনগ্রহীরা। বেরী বলেছিল, ব্রেজিলে ভীষণ ভূমিকম্প আসন্ন। বেরী হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল ব্রেজিলের কর্তৃপক্ষকে। ফলে, কেউ মারা যায়নি।

'নিউইয়র্কের অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ডুমন্ট দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টাওয়ারের মাথায় একটা আলোকময় উড়ন চাকি ভাসছে। ভিড় জমে গেছে রাস্তায়। ভয়ে বিস্ময়ে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। গাড়ি ঘোড়া সব দাঁড়িয়ে গেছে, টাইমস্ স্কোয়ারে নামছে একটা উড়ন চাকি।

'ইন্ডিয়ানার সাইকিক মার্গারেট পাওয়ার্স, বিশ্বাস করে দশ-বারো বছরের মধ্যেই ভিনগ্রহীদের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক আর আর্থিক বিনিময় ঘটবে। মানব সভ্যতার এমন অগ্রগতি ঘটবে যা আগে কখনও ঘটেনি।

'প্রফেসর, পৃথিবীর নানান দেশের সাইকিকরা সাম্প্রতিক কয়েক মাসে এমনি ধরনের অদ্ভুত ভবিষ্য-দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। সেদিন যখন আসবে, তখন আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, যাই করুন না কেন, সাইকিকদের ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলতে দেখবেন।

'লোকে আমাকে সাইকিক বলে। কারণ ছেলেবেলা থেকে অনেক দূরের দৃশ্য আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। অন্যে যা শুনতে পায় না, আমি তা শুনতে পাই। অতীতের দৃশ্য যেমন প্রত্যক্ষ করি, ভবিষ্যতের দৃশ্যও তেমনি সুস্পষ্ট দেখতে পাই। অতীন্দ্রিয় এই ক্ষমতা যখন আমার ভেতরে জেগে ওঠে, তখন আমি যেন আর আমার মধ্যে থাকি না। আমার তখনকার বিচিত্র অনুভূতি আপনাকে বললেও, উপলব্ধি করতে পারবেন না।

'আমি জেনেছি, খুব শিগগিরই ভিনগ্রহীরা দলে দলে নামবে পৃথিবীর নানান জায়গায়। কল্পবিজ্ঞানে যেমনটা পড়া যায়— সে উদ্দেশ্যে নয় কিন্তু। পৃথিবীকে উপনিবেশ করতে তারা আসবে না। আসবে মৈত্রীর সংকল্প নিয়ে। তাদের জ্ঞানের ঐশ্বর্য দিয়ে পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করতে। আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ঐশ্বর্যে তারা অনেক উন্নত। তাদের অতি উন্নত সভ্যতার সঙ্গে মিশেছে বৈজ্ঞানিক প্রগতি। এই তিন ঐশ্বর্যের সমন্বয় এখনও পৃথিবীতে ঘটেনি বলে তারা অপেক্ষা করছে। কিন্তু সব দেখছে। লক্ষ করছে। আমাদের মতো সাইকিকদের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগও রেখেছে। তারপর তারা আসবে। ভূতলে যেদিন অবতীর্ণ হবে, সেইদিন থেকেই কসমিক মহাসংঘের সদস্যপদের সৌভাগ্য লাভ ঘটবে পৃথিবীর।

'সেদিনটা কবে, আমি তা জানি। পৃথিবীর সব সাইকিকরাই জানে। কিন্তু এখনও তা বলবার সাহস হয়নি।

'শুধু জেনে রাখুন, এ-ঘটনা ঘটবে কোনও একটা ২৪ জুনে। তার কারণও বলছি। ১৯৪৭ সালের ২৪ জুনেই আধুনিক যুগে প্রথম ফ্লাইং সসারদের দেখেছিলেন কেনেথ আর্নল্ড। উফো অর্থাৎ আন-আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শুরু কিন্তু সেইদিন থেকেই। এই ধরনের আরও অনেক উফো অ্যাক্টিভিটির খবর এসে পৌঁছোবে

কোনও একটা ২৪ জুন তারিখে, যেদিন মনে হবে যেন নরকের দ্বার খুলে গেছে মর্তলোকে। মনে হবে যেন এইচ জি ওয়েলসের ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস সত্যি সত্যিই আরম্ভ হয়ে গেল।

'উফো-র বাসিন্দারা আমাদের হালচালের খবর রাখে। আমরা সময় মাপি কীভাবে, সে হিসেবও তারা রাখে। তাই ২৪ জুন তারিখটাকে তারা ব্যাপক ভূলোক অবতরণের বার্ষিকী দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করবে ঠিক করেছে।

'প্রফেসর, এতদিন ধরে উফোর চালকরা শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে এসেছে আমাদের দিকে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫-র মধ্যে উফো অবতরণ অথবা উফোর সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি হওয়ার খবর খুব একটা পাননি। যে-খবর শুনেছেন, তার সবগুলোই প্রায় একইরকম— উফোর আওয়াজ শোনা গেছে এরোপ্লেনে, বাজারে ধরা পড়েছে উফোর অস্তিত্ব, আকাশপথে নক্ষত্রপথে উড়ে গেছে উফো। এ সবই করা হয়েছে প্ল্যানমাফিক। আমরা যেমন মাইক্রোসকোপে জীবাণু পর্যবেক্ষণ করি, উফোরা ঠিক তেমনিভাবেই আমাদের স্টাডি করে চলেছে। আমাদের জীবনযাপনের প্যাটার্ন, দেশভ্রমণের কায়দা, প্রাকৃতিক সম্পদের ম্যাপ সব তারা ছকে নিয়েছে এই ক'বছর ধরে। আমাদের রেডিয়ো আর টেলিভিশন সিগন্যাল পর্যন্ত তারা মনিটরিং করে পৃথিবীর সব ক'টা ভাষা রপ্ত করে ফেলেছে। আমাদের রাজনীতি আর সংস্কৃতির প্রচুর খবর সংগ্রহ করে ফেলেছে।'

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। এইবার আস্তে করে বললেন, 'বুঝলাম। অতীতে স্পেস ভিজিটররা বহুবার পৃথিবী ভিজিট করে গেছে— তার অনেক সূত্র প্রমাণও আছে। কিন্তু হঠাৎ তারা খোলাখুলি আমাদের কনট্যাক্ট করতে চাইছে কেন?'

আর এক টিপ নস্যি নিলেন শচীনবাবু। নিমীলিত নয়নে অনেকটা সুদূর মহাশূন্য বিস্তৃত চাহনি মেলে ধরে বললেন, 'খুব সোজা কারণে। এর আগে বহুবার তারা পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু উফোদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি ভিজিটই ব্যর্থ হয়েছে। আদিম মানুষরা উফো ভিজিটরদের আন্তর্গ্রহ ভিজিটর বলে বুঝে উঠতে পারেনি— দেবতাজ্ঞানে পুজো করেছে। জানি, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আপনার। কিন্তু এ যুগের সব ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উফো ভিজিটের ওপর। বর্তমান যুগেই কেবল 'উফো বলতে কারা, আমরা তা আঁচ করতে পারছি। তাই সময় হয়েছে এবার দলে দলে পৃথিবীতে নামবার।'

আমি মুখখানা পণ্ডিতের মতো করে বললাম, 'এত লুকোচুরির দরকার ছিল কী? ১৯৪৭ সালে ২৪ জুন দিল্লি কুতুবমিনারের মাঠে, আমেরিকার হোয়াইট হাউসের লনে আর মস্কোর ক্রেমলিনের চত্বরে দলে দলে নেমে পড়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করলেই তো পারত। করেনি কেন?'

আমার দিকে না-তাকিয়েই শচীনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তা করলে কাজটা অনেক সোজা হয়ে যেত ঠিকই। কিন্তু অজ্ঞাত রহস্য যে মানুষ জাতটাকে আতঙ্কে দিশেহারা করে তুলত, দেশে দেশে প্যানিক ছড়িয়ে পড়ত— উফোর চালকরা তা বুঝতে পেরেছিল বলেই হঠকারিতার মধ্যে যায়নি। সইয়ে নিয়েছে তাদের আবির্ভাবকে। দেখা দিয়েছে ক্বচিৎ কদাচিৎ। ইচ্ছে করেই জল্পনা-কল্পনার সুযোগ করে দিয়েছে। আগেই বললাম, প্রথম প্রথম উফো রিপোর্টগুলোয় জানা গেছে ফ্লাইং সসারদের যত্রতত্র চকিতের জন্যে দেখা গেছে।

১৯৫৫ সালের পর থেকেই উফো অবতরণের খবর পাওয়া গেছে ঘনঘন, ভিনগ্রহীদের সঙ্গে মোকাবিলার খবরও এসেছে আগের চাইতে বেশি। ১৯৬০ সালের পর থেকে তাদের সঙ্গে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ তো ঘটছে, সেইসঙ্গে পৃথিবীর প্রাণীদেরও উফোয় তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সেদিন কলকাতার কাছেই স্কুলঘরের চাল উড়ে গেছে উফোর আবির্ভাবে। আমেরিকার অর্ধেক মানুষ এখন বিশ্বাস করে উফোর অস্তিত্বে। বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা আরও বাড়বে। তারপর আসবে সেই বছরটি, যে-বছরের ২৪ জুন তারা আকাশ ছেড়ে নেমে আসবে পৃথিবীর সব ক'টা দেশে। উফোর ভেতরকার প্রাণীদের দেখতে কেমন, পৃথিবীর সবাই তা দেখতে পাবে।'

শচীনবাবু নির্লিপ্ত স্বরে কথা বলে গেলেও আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনছিলেন না বলে মনে মনে একটু রাগ হয়েছিল। বুজরুকও তো হতে পারেন। তাই আমার চোখে চোখেও তাকাচ্ছেন না। সেই কারণেই গায়ে পড়েই আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা ব্যাপার কিন্তু বোঝা গেল না। শান্তির মতলব নিয়েই যদি উফোরা আনাগোনা করছে তো আপত্তিকর কাজকর্মগুলো করছে কেন? কেন মানুষকে অ্যাটাক করছে? লোমশ খুদে মনুষ্যাকৃতি প্রাণীরা দলে দলে কেন আমাদের ওপর চড়াও হচ্ছে?'

উত্তরটা শচীনবাবুর জিভের ডগাতেই তৈরি ছিল যেন। বললেন, 'উফোর ভিনগ্রহীরা তো মানুষকে অ্যাটাক করছে না। ওরা হল গিয়ে ওদের পোষা জীব।'

'পোষা জীব!' আমি অবিশ্বাস চেপে রাখবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলাম না।

শচীনবাবু অম্লান বদলে বললেন, 'আমরা যেমন কুকুর বেড়াল পুষি, ওরাও তেমনি নিম্নশ্রেণির জীবদের পোষে— তাদের দেখতে মানুষের মতো এইটাই যা দুঃখ।'

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম। উনি তার আগেই বললেন, 'আমরা যেমন কুকুর বেড়ালদের ভালবাসি, ওরাও তেমনি ওদের পোষা জীবদের ভালবাসে। ভালবাসার বিনিময়ে পোষা জীবগুলোও ওদের ভালবাসে। খুদে লোমশ মনুষ্যাকৃতি যাদের কথা আপনি বললেন, তারা ওদের কাছে আমাদের কুকুরের মতো জীব। প্রভুভক্ত। প্রভুর সম্পত্তি আগলাতে ওস্তাদ। এরা নিজে থেকে কিন্তু কখনওই মানুষের ওপর চড়াও হয়নি। নির্জন জায়গায় উফো যখন নেমেছে, তখন হঠাৎ বিনা নোটিশে মানুষ গিয়ে পড়েছে সেখানে। কুকুরের যা ধর্ম তাই করেছে লোমশ জীবগুলো। ভেবেছে, মানুষ এসেছে বুঝি প্রভুর সম্পত্তি লুঠ করতে— তাই চড়াও হয়েছে। অ্যালসেশিয়ান, জার্মান শেফার্ড বা ডোবারম্যান পিন্সচারের মতো ওদের মনুষ্যাকৃতি কুকুরেরাও ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠতে পারে সময় বিশেষে— তা না হলে ওরকম ন্যাওটা জীব এই পৃথিবীতেও নেই।'

নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞেস করলাম, 'বেশ, তা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু মানুষ গায়েব করার কেসগুলো কেন ঘটছে?'

'সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝির ফলে ওইরকমই মনে হচ্ছে। বাচ্চা ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তার ভালর জন্যেই। বাচ্চা কিন্তু তা বোঝে না, সে জানে, ডাক্তার ইঞ্জেকশন দেয়, যন্ত্রণা হয়। ইঞ্জেকশনের ফলে যে অসুখ সেরে যাবে, ভারী রোগ আর হবে না— তা

সে বোঝে না। যন্ত্রণাটাই সে কেবল উপলব্ধি করতে পারে।

'তাই বলছিলাম, আপনি যাকে গায়েব করা বলছেন আসলে তা হল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। মেডিক্যাল এগজামিনেশন চালিয়ে নরদেহের বিস্তর খবর আর ব্যাধির বৃত্তান্ত তারা জেনে ফেলেছে—এত খবর আমাদের বিশ্ববন্দিত বৈজ্ঞানিকরা রাখেন না। উফোর ভিনগ্রহীরা তাদের অতি উন্নত জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে আমাদের বহু মেডিক্যাল প্রবলেমের সমাধান করে ফেলেছে। যেসব রোগের নাম শুনলে মানুষ আজ আঁতকে ওঠে, সেইসব রোগের দাওয়াই পর্যন্ত বার করে ফেলেছে। বিশেষ সেই বছরের ২৪ জুন যখন তারা আসবে পৃথিবীতে, তখন উপহার নিয়ে আসবে ক্যান্সারের ওষুধ— যে ওষুধ আজও অনাবিষ্কৃত!'

কাঁহাতক আর এত দুমদাম ধাপ্পা শোনা যায়। কোনও সাইকিকের পক্ষে এত খবর কি জানা সম্ভব? মুখ ফুটে বলেই ফেললাম মনের অবিশ্বাস— একটু রূঢ়ভাবেই বলেছিলাম স্বীকার করছি।

শচীনবাবু কিন্তু আগের মতোই আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যেন বিলকুল উদাসীন 'পোজ' নিয়ে বললেন, 'পৃথিবীর সব দেশের সাইকিকরাই এখন এইসব খবর জানতে শুরু করেছে। যা-যা ঘটবে, তার সবই যে আমি জেনে বসে আছি, এমনটা বলব না। আমি যা জানি না, বা জানতে পারব না— তা হয়তো অন্য সাইকিকরা জানবে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই সাইকিকদের এই অতীন্দ্রিয় দর্শন ঘটিয়ে চলবে উফোর ভিনগ্রহীরাই— সরাসরিভাবে। সাইকিক এনার্জি নিরবচ্ছিন্ন নয়— মাত্রা কমে বাড়ে, কখনও একেবারেই উধাও হয়, আবার কখনও তুঙ্গে পৌঁছোয়। সব এনার্জির মতো এই এনার্জির একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে। উফোর ভিনগ্রহীরা জানে এই ফ্রিকোয়েন্সির রেট কী, পৃথিবী জুড়ে তারা তরঙ্গের আকারে পাঠায় সাইকিক এনার্জি— ঠিক যেভাবে রেডিয়ো ট্রান্সমিটারের কাজ চলে, সেইভাবে। সাইকিকরা এইভাবেই তৈরি হচ্ছে ফাইনাল কনট্যাক্টের জন্যে। বলতে পারেন, মহাকাশের আগন্তুকরা আমাকে বিজ্ঞাপনের মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করছে— তাদের আবির্ভাবের দিনটির জন্য মানব-মনকে প্রস্তুত করে চলেছে। আরও একটা সম্ভাবনার কথা এখানে বলে রাখি। সাধারণ মানুষ যারা, যাদের মধ্যে সাইকিক ক্ষমতা একেবারেই নেই, তাদের দিব্যদর্শনও খুলে দিতে পারে উফোর ভিনগ্রহীরা সাইকিক এনার্জি ফোকাস করে।'

বক্রসুরে আমি বলে উঠলাম, 'আমার ওপরেও?'

'নিশ্চয়। নজর রয়েছে তো আপনার ওপরেও।'

শুনেই বলব কী, গা শিরশির করে উঠল আমার। শচীনবাবু লোকটাকে কেন জানি হঠাৎ আর অবিশ্বাস করতে পারলাম না। একটু নরম সুরে বললাম, 'উফো পাইলটরা এলে কিন্তু ছেড়ে কথা কইবে না পৃথিবীর মিলিটারি ফোর্স।'

এতক্ষণ যিনি রামগড়ুরের ছানার মতো হাসতে তাদের মানা মুখভাব করে কথা বলছিলেন, আমার এই সম্ভাবনা বৃত্তান্ত শুনে তিনি সহসা প্রাণখোলা অট্টহাস্য করলেন। হাসির দমকে অপূর্ব ছন্দে নৃত্য করতে লাগল নেয়াপাতি ভুঁড়ি, নির্নিমেষে চোখ নামিয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

হাসতে হাসতে বললেন শচীনবাবু, 'আমাদের তুলনায় উফোর ভিনগ্রহীরা যে কতটা

এগিয়ে আছে, দেখছি আপনার সে ধারণাই নেই। এই পৃথিবীর কোনও শক্তিই নেই উফোর ভিনগ্রহীদের অথবা তাদের মহাকাশযানেদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার। আমেরিকান আর সোভিয়েট এয়ার ফোর্স হাজার চেষ্টা করেও একখানা উফোকেও আজ পর্যন্ত গুলি করে নামাতে পারেনি কেন বলুন তো? অথচ দেখুন, উফোর ভিনগ্রহীরা নিজেরা অস্ত্র বয়ে নিয়ে বেড়ায় না। অস্ত্রের চাইতেও অনেক বিরাট শক্তি দিয়ে গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাকে কন্ট্রোল করতে পারে তারা। তারা জানে, 'ম্যাটার' হল এনার্জিরই আর এক চেহারা। ইচ্ছে করলেই তারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত এনার্জি আর শক্তিকে খেলিয়ে নিজেদের দরকারে লাগাতে পারে। উফোর চালনাশক্তির সিক্রেট সেইটাই। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে খুশি কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা পৌঁছে যেতে পারে স্পেস আর টাইমের ফোর্স ম্যানিপুলেট করে। আলোর গতিবেগ তাদের কাছে চরম গতিবেগ নয়, কেননা আলোর গতিবেগকেও ওরা ম্যানিপুলেট করতে পারে, নাড়াচাড়া করতে পারে, নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োগ করতে পারে। ফোর্স আর এনার্জিফিল্ডের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে তারা যে-কোনও বস্তুদেহের ওপরেও সম্প্রসারিত করতে পারে। মিলিটারি ফোর্স উফোর ভিনগ্রহীদের ওপর চড়াও হলে কী ঘটবে এই ভেবে অবাক হচ্ছেন আপনি। আমি কিন্তু হচ্ছি না। কামান বন্দুকের ট্রিগার টেপার পরেও কিছুই ঘটবে না! আত্মরক্ষার জন্যে উফোর ভিনগ্রহীদের অস্ত্র লাগে না— হানাদারদের অস্ত্রকে কেবল নিষ্ক্রিয় করে দেয়।'

আর এক টিপ নস্য গ্রহণ করলেন সাইকিক শচীনবাবু।

বললেন, 'পৃথিবীর রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে কনট্যাক্ট করতে হয় কেমন করে উফোর ভিনগ্রহীরা তা জানে। এই মুহূর্তে জানবেন তাদের এজেন্টরা চরম কনট্যাক্টের জমি প্রস্তুত করে চলেছে, রাশি রাশি ইনফরমেশন জোগাড় করে চলেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার বলছি, এই মুহূর্তে উফোর ভিনগ্রহীরা পৃথিবীর মাটি মাড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের চেহারা ধারণ করে তারা ছদ্মবেশ নিতে পারে, মানুষের মতোই স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে, স্বাভাবিক আচার আচরণে পাশের মানুষকেও ধোঁকা দিতে পারে। পৃথিবীর বড় বড় দেশের সরকারি ইনটেলিজেন্ট সার্ভিসে সে খবর আছে বই কী, কিন্তু খবরটা তারা ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে পাছে লোকে ভয় পায়, পাছে প্যানিক ছড়ায়। কেননা, এদের ধারণা, উফোর ভিনগ্রহীরা পৃথিবীগ্রহীদের শত্রু। আমেরিকা আর সোভিয়েট গভর্নমেন্টের একটা বড় দুশ্চিন্তা তাদের চব্বিশ ঘণ্টা উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুই দেশের গভর্নমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রি আর মিলিটারিতে নাকি বড় বড় পদগুলোতে ঢুকে বসে আছে উফোর এজেন্টরা। খবরটা মিথ্যে নয়। উফোর চরেরা উঁচু মহলে অনুপ্রবেশ করেছে আরও তথ্য সংগ্রহ আর চরম প্রস্তুতির জন্যে— বিশেষ বছরের ২৪ জুন যেন বড় রকমের ভুল বোঝাবুঝি আর বিপর্যয় না ঘটে, তাদের সাধু উদ্দেশ্য যেন বানচাল না হয়ে যায়।'

মিনমিন করে বললাম, 'সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডে এই তো খুদে গ্রহ আমাদের পৃথিবী। এমন কী গুরুত্ব আছে আমাদের? এত ঝক্কি ঝামেলার দরকার কী তাদের আমাদের সঙ্গে কনট্যাক্ট করার?'

আবার দেখা গেল জবাবটা তৈরি রয়েছে শচীনবাবুর জিভের ডগায়, 'সভ্যতা অগ্রসর

হতে হতে এমন একটা পয়েন্টে পৌঁছোয়, যখন উন্নত টেকনোলজি ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়, নিজেদের সংহার করে। যেমন ঘটেছিল লস্ট আটলান্টিসে— সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গিয়েছে সেই মহাদেশ। আটলান্টিয়ানরাই পুনর্জন্ম নিচ্ছে আমেরিকায়, আবার সেই একই কাণ্ড ঘটতে চলেছে। উফোর ভিনগ্রহীরা কিন্তু ধ্বংসাত্মক টেকনোলজিতে অত্যুন্নতি ঘটিয়েও অধ্যাত্মজগতে এত উন্নত হয়েছে যে সায়ান্স আর টেকনোলজির আবিষ্কারকে যুদ্ধের কাজে না-লাগিয়ে জীবনকে সুন্দরতর করার ব্যাপারে প্রয়োগ করে চলেছে। পৃথিবী ভিজিট করতে যেসব উফো ভিনগ্রহীরা আসছে, তারা সবাই অমর। ঈশ্বর তারা নয়। কিন্তু ব্যাধি আর জরাকে পুরোপুরি জয় করেছে। রোগভোগ তাদের মধ্যে নেই, বার্ধক্য কাকে বলে তাও তারা জানে না। অনন্ত যৌবনের অধিকারী তারা। চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র যযাতি পুরুর দেহে জরা সংক্রামিত করে এক হাজার বছর যৌবন উপভোগ করেছিলেন। পৌরাণিক কাহিনীটা পুরোপুরি যে অলীক নয়, উফোর ভিনগ্রহীরা তার প্রমাণ। যৌবন আর অমরত্ব তাদের পায়ের ভৃত্য। এই ঐশ্বর্য গ্রহে গ্রহে বিলিয়ে দিয়ে তারা শান্তি আনতে চায় ব্রহ্মাণ্ডে। পৃথিবীর আসন্ন বিপর্যয় তাদের চিন্তিত করেছে বলেই তারা আসছে বারবার— দলে দলে নামবে ২৪ জুন।

'বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবী গ্রহের ওপর মনিটরিং চালিয়ে যাচ্ছে উফোর ভিনগ্রহীরা। পৃথিবী গ্রহীরা প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটানোর পরেই তারা উপলব্ধি করেছিল নাক গলানোর সময় এবার হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের মতো বর্বর হত্যাকাণ্ড তাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। বাধা না-দিলে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আবার যে মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেলব, এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে তাদের মধ্যে।

'তারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে পর আমাদের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবেই। নতুন শিক্ষা গ্রহণ করব তাদের পাঠশালায়। পালটে নেব জীবন যাপনের এতদিনের ধারা। এ সম্পর্ক কিন্তু প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হবে না— অথচ ঠিক এই আতঙ্কেই ভুগছে আমেরিকা রাশিয়ার মানুষ। সম্পর্কটা হবে গুরু শিষ্যের। অনেকে এমন আশঙ্কাও করছে যে সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত জনক-জননী সন্তান-সন্ততির পর্যায়ে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু উফোর ভিনগ্রহীরা মিউট্যান্ট সৃষ্টি করতে পৃথিবীতে আসছে না। তারা সর্বজনীন সম্মান আর প্রাণের মর্যাদার মূল্য বোঝে। আমাদেরকে তাদের সন্তান কল্পনা করে মানুষকে ছোট করার কিন্তু কোনও অভিপ্রায় তাদের নেই।

'তারা আমাদের শেখাবে গোঁড়ামি কীভাবে পরিহার করতে হয়। অন্ধ বিদ্বেষ আর ঘৃণা কীভাবে বর্জন করতে হয়, কীভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য সম্মান আর সমতার মাধ্যমে সুন্দরতরভাবে বেঁচে থাকা যায়— ঠিক যেভাবে বেঁচে আছে যুগ যুগ ধরে উফোর ভিনগ্রহীরা।'

শুনতে শুনতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম আমি। জড়িতস্বরে বললাম, 'এসব কথা সরাসরি টেলিভিশন আর রেডিয়োর মাধ্যমে বলছে না কেন উফোর ভিনগ্রহীরা?'

'লোকে বিশ্বাস করবে না বলে, ভয় পাবে বলে। আগে তাদের মন প্রস্তুত করা দরকার।'

'আপনার মতো আরও কয়েকজন সাইকিকের নাম বলতে পারেন?'

'যাচাই করবেন কী? নিউইয়র্কের রিচার্ড ডুমন্টের নাম তো বললাম। সে তো দিব্য চোখে দেখেছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ঘিরে ভাসছে অসংখ্য উফো।'

'সাধারণ মানুষকে সাইকিক বানাতে পারে উফো ভিনগ্রহীরা। এইমাত্র বললেন। আমাকে বানাক দেখি।'

এতক্ষণ পরে, এই প্রথম শচীনবাবু আমার দিকে তাকালেন। নিমীলিত চোখের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিজলী ঝিলিক দেখলাম যেন। তার পরেই তাঁকে আর দেখলাম না। প্রফেসরকেও না। ঘরদোর সব চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। দেখলাম, বিশাল বন, উঁচু উঁচু পাহাড়, দিগন্ত-বিস্তৃত পাহাড় আর বনের মাঝে অদ্ভুত একটা পাহাড়। হলুদ পাহাড়। মাথাটা চ্যাটালো। সমতলক্ষেত্র। ঠিক মাঝখানে একটা বিচিত্র মহাকাশযান। এরকম বিশালতা, অদ্ভুত আকার হাজার কল্পবিজ্ঞান কাহিনি পাঠ করেও কল্পনা করতে পারিনি। দেখতে দেখতে দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। আবার দেখলাম প্রফেসরকে, শচীনবাবুকে।

'আফ্রিকার ছোট্ট একটা ঘাঁটি দেখালাম এইমাত্র,' মৃদুস্বরে বললেন শচীনবাবু।

গলাখাঁকারি দিলেন প্রফেসর।

বললেন, 'আমি শুনেছি এবং আপনিও এইমাত্র বললেন, উফোর ভিনগ্রহীরা পৃথিবী গ্রহীদের রূপ ধারণ করে এই মুহূর্তে পৃথিবীর মাটি মাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি একথাও অনুমানে বুঝেছি, ভিনগ্রহীরা তাদের দেহের পরমাণু বিন্যাস খুশিমতো নতুন করে করে সাজাতে পারে বলেই যে-কোনও দেহ ধারণ করতে পারে।'

'ঠিকই অনুমান করেছেন,' চোখে চোখ রেখে বললেন শচীনবাবু।

'আসুন হাতে হাত দিন,' ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন প্রফেসর।

শচীনবাবুও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রফেসরের হাতের মুঠোয় নিজের হাত রাখলেন।

তারপর, আমার আর প্রফেসরের চোখের সামনেই শচীনবাবুর হাতটা একটা শুঁড়ের আকার ধারণ করে মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল...।

পুষ্পকের পরিণতি

গুলপট্টির শিরোমণি চাণক্য চাকলাদার প্রায়ই এসে আমাকে আর প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য অসম্ভব গল্প-টল্প শুনিয়ে যায়। শুনে প্রফেসর খুব মজা পান। আমিও পাই। তার কিছু কিছু কাহিনি আমার এই ভাঙা কলম থেকে বেরিয়েছে। পাঠক-পাঠিকাদের হাসির খোরাক জুগিয়েছে। কিন্তু তার এই গল্পটা পড়বার পর কেউ যদি আমাকে গঞ্জিকা সেবক বলে মনে করে, তা হলে আমার কিছু করার নেই। যা সত্যি, তাই লিখছি। মানে, চাণক্যর কাহিনিটা যদি আদৌ সত্যি হয়।

একদিন সকালের দিকে প্রফেসর ওঁর মান্ধাতা আমলের বৈঠকখানায় বসে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ছিলেন। মানে কড়িকাঠের টিকটিকিটার দিকে। হয়তো ভাবছিলেন, কোনও প্রক্রিয়ায় টিকটিকিকে ডাইনোসর বানানো যায় কি না। এরকম একটা আইডিয়া ওঁর মাথায় কিছুদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে, আমি জানতাম। ওঁর মতন বৈজ্ঞানিক ইচ্ছে করলেই যে অনেক কিছু করতে পারেন, সে বিশ্বাস আমার আছে।

চাণক্য চাকলাদার উটের মতন পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকল ঠিক সেই সময়ে। তারপর যে ব্যাপারটা ঘটে গেল, তাই নিয়েই এই কাহিনি।

চাণক্য বৈঠকখানায় ঢুকতেই প্রফেসর কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'এই যে অসম্ভবের সম্রাট, আজ কী গল্প ছাড়বে বাপু?'

বিস্ময় গলিত স্বরে চাণক্য বললে, 'আজ্ঞে, আপনি কৃপা করলেই সেই অসম্ভবটা করতে পারি।'

তোষামোদে চিঁড়ে ভিজে যায়। প্রফেসর মানুষটা সাদাসিধে। বড় বৈজ্ঞানিক হলে যা হয়। কথার কেরামতি যে কী সর্বনেশে জিনিস, তা বোঝেন না।

কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক সুরে বললেন, 'কীরকম কৃপা চাও?'

চাণক্য হাত কচলাতে কচলাতে বললে, 'আমি আসছি সাইবেরিয়া থেকে।'

শুরু হল লম্বা লম্বা বচন। আমি নড়ে বসলাম। প্রফেসর অনড় রইলেন। বললেন, 'সাইবেরিয়ার মতন একটা অখাদ্য জায়গায় গেছিলে কেন?'

চাণক্য বললে, 'বৈজ্ঞানিক হচপচয়ের নেমন্তন্ন পেয়ে।'

সোজা হয়ে বসলেন প্রফেসর।

বললেন ঈষৎ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা গলায়, 'সেটা তো একটা ফোর টোয়েন্টি।'

চাণক্য বললে, 'তা বটে, তা বটে, কিন্তু আপনি কী লাইনে চিন্তা করছেন, খবরটা পেয়েই পাঠালেন আমাকে।'

'কী লাইনে চিন্তা করছি আমি?'

'টিকটিকি থেকে ডাইনোসর বানানো যায় কিনা।'

ঝুঁকে বসলেন প্রফেসর, 'হচপচ হারামজাদা আমার ব্রেনের খবর জানল কী করে?'

'ব্রেন চুরি করে।'

'অ্যাঁ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা নতুন ধরনের টেলিভিশন বানিয়েছে। টেলিপ্যাথির ফোকাস মেরে তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকদের ব্রেন চুরি করছে।'

'বলো কী!'

'তাই তো দৌড়ে এলাম আপনার কাছে।'

'কেন এলে?'

'আপনার টাইম মেশিনটা ধার চাইতে।'

এই আবদার এর আগেও চাণক্য করেছে প্রফেসরের কাছে। প্রফেসর পাত্তা দেননি। কিন্তু সেদিন দিলেন। বললেন, 'কী করবে টাইম মেশিন নিয়ে?'

চাণক্য বললে ফিকফিক করে হেসে, 'হচপচয়ের ভবিষ্যৎ কেরামতিটা দেখে আসব।'

'সেটা কী বস্তু?'

'বস্তু নয়, প্রফেসর, চেহারা... পৃথিবীর ভবিষ্যৎ চেহারা।'

'মা-মানে?'

'হচপচ বলছে...মানে, আমাকে বলেছে, জুরাসিক যুগের জীবন্ত নিদর্শন তো এখনও রয়েছে এই পৃথিবীতে।'

প্রফেসর মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'বেটা জোচ্চোর। আমার আইডিয়াটাই তোমাকে বলেছে। ক'দিন আগেই একজন বিজ্ঞান-সংবাদদাতার কাছে এই মর্মে একটু মুখ খুলেছিলাম।'

চাণক্য বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার কথা ইন্টারনেট মারফত হচপচ জেনে ফেলেছে। আপনি বলেছিলেন, কুমিরই তো এ যুগের জীবন্ত নিদর্শন—অতীতের জুরাসিক যুগের চিহ্ন।'

'তা বলেছিলাম।' একটু মুষড়ে গেলেন প্রফেসর।

চালিয়ে গেল চাণক্য, 'আপনি বলেছিলেন, অতীত আর বর্তমানের মধ্যে সেতু এই কুমিররা। বিজ্ঞানের এই বিরাট রহস্যকে প্রাঞ্জল করে তোলা যাবে যদি কুমিরদের অণু নিয়ে গবেষণা করা যায়, আণবিক গঠনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়।'

মিনমিন করে প্রফেসর বললেন, 'সেটা তো বলেছিলাম অন্য একটা ব্যাপারে। ডাইনোসররা অকস্মাৎ পৃথিবী থেকে মুছে গেল কেন, সেটা জানার জন্যে। গ্রহাণুপুঞ্জের সংঘর্ষে, না জলবায়ু পালটে যাওয়ার জন্যে।'

চাণক্য বিগলিত হেসে বলল, 'আপনি আরও বলেছিলেন একটা কথা।'

'কী কথা?'

'বর্তমান যুগে যে তেইশটা কুমির প্রজাতি টিকে আছে, তারা অতীতের সেই ডাইনোসরদের বংশধর।'

ঢোঁক গিলে প্রফেসর বললেন, 'তা বলেছিলাম।'

চাণক্য চালিয়ে গেল পুরোদমে, 'আপনি বলেছিলেন, ডাইনোসর আর কুমিরদের শরীরবৃত্ত আর বিপাকক্রিয়ার মধ্যে বেশ মিল আছে।'

'তা আছে তো বটেই।'

'আপনি বলেছিলেন, তা সত্ত্বেও বিরাটকায় বপু নিয়ে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে ডাইনোসররা স্রেফ মুছে গেল পৃথিবী থেকে।'

'পেল্লায় বপু থাকলে ওইরকমই হয়। যেমন, তোমার ওই—'

চাণক্য বললে, 'আপনি বলেছিলেন, দশ হাজার ডাইনোসর প্রজাতির পাখি আজও টিকে রয়েছে পৃথিবীতে।'

ফের ঢোঁক গিললেন প্রফেসর, 'তা বলেছিলাম।'

'আপনি আরও বলেছিলেন, কুমিররা ডাইনোসরদের মতন অমন কাঁড়ি কাঁড়ি খেত না বলেই টিকে গেছে।'

গেন্ডেমুন্ডে গেলার অভ্যেস এই দীননাথেরও আছে। পইপই করে তাই তো বলি, অত খেয়ো না!

'কুমিররা জলে স্থলে সমানভাবে থাকতে পারে বলেই পৃথিবীজোড়া প্রলয়ের সময়ে তারা টিকে গেছিল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলাম। মাথা খাটাই বলেই বলেছিলাম। হচপচের মতন ভুঁড়িদাস আমি নই।'

'আপনি এমন কথাও বলেছিলেন, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কথা, বলেছিলেন,—'বলে একটু থামল চাণক্য। তারপরে বললে, 'ডাইনোসর আর কুমিরদের মধ্যে একটা জায়গায় মিল আছে। দু'জনেরই একটা জিনিস নেই। সেক্স ক্রোমোসোম।'

প্রফেসর নির্বাক।

চাণক্য সবাক, 'এটা না-থাকার মানে এই বংশধরদের ডিম টিকে থাকবে প্রতিবেশীয় তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। গোটা পৃথিবীর প্রতিবেশীয় তাপমাত্রা আচমকা পালটে যাওয়ায় ডাইনোসররা 'অক্কা পেয়েছে।'

'কেউই নিশ্চিত নয় এ ব্যাপারটায়।' মিনমিন করে বললেন প্রফেসর।

চাণক্যকে তখন আটকায় কে? চালিয়ে গেল ফুলস্পিডে, 'কুমিরদের কিন্তু কাহিল করতে পারেনি তাপমাত্রার বিরাট পরিবর্তন। সঠিক কারণ কারও জানা নেই,—আপনারও নেই—বলেছেন হচপচ।'

রেগে গেলেন প্রফেসর, 'গুলি মারো হচপচয়ের ফচফচ কথায়।'

চাণক্য চালিয়ে গেল মুখের তুবড়ি, 'সুমাত্রা আর মালয়েশিয়ার ঘড়িয়ালদের নিয়ে গবেষণা করছেন কিন্তু হচপচ।'

কৌতূহলী হলেন প্রফেসর, 'কেন? কেন? কেন?'

'আশি মিলিয়ন বছর আগের ডাইনোসরদের বংশধর বলে।'

'জীবন্ত জীবাশ্ম।' বিড়বিড় করলেন প্রফেসর।

'তা হলে মানছেন হচপচের কথা?'

ঢোঁক গিললেন প্রফেসর। মিনমিন করে বললেন, 'তোমার আসল বক্তব্যটা কী?'

'টাইম মেশিনটা নিয়ে চলুন, দেখে আসি হচপচের গবেষণার ভবিষ্যৎ পরিণাম।'

একটু ভাবলেন প্রফেসর। বললেন, 'কী পরিণাম? কী করতে চায় হচপচ?'

'মানুষের চাইতেও ধীমান ডাইনোসর দিয়ে ভরিয়ে দেবে পৃথিবীটাকে—ঘড়িয়ালদের বংশধররাই হবে ভাবীযুগের সেই বংশধর।'

'উন্মাদ।'

'দেখে আসতে ক্ষতি কী? চলুন আপনিও। আপনারই তত্ত্ব দিয়ে আপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় হচপচ, আপনি দেখবেন না পৃথিবীর ভবিষ্যৎটা?'

ওষুধ ধরে গেল। আগেই বলেছি, খোশামোদে খটখটে শুকনো চিঁড়েও ভিজে সপসপে হয়ে যায়।

বকমবাজ চাণক্য সেই কর্মটি করে ফেলল অতীব নৈপুণ্যের ফলে।

ফলে, টাইম মেশিন নিয়ে টহলে বেরোলেন প্রফেসর।

কী দেখলেন, কী জানলেন, তাই নিয়েই এই অসম্ভবের কাহিনি।

ভবিষ্যতের গর্ভে গিয়ে আমরা দেখলাম এক অত্যুন্নত ডাইনোপ্রজাতি গোটা পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করছে। মানুষ জাতটা পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। অতি দর্পে হতা লঙ্কা-র অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আকৃতিটা অবশ্য কিম্ভূতকিমাকার।

কিন্তু, শুধু এই পৃথিবীতেই নয়, এই ছায়াপথের নানা গ্রহে তারা উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এক কথায়, ছায়াপথকে মুঠোয় এনে ফেলেছে অত্যুন্নত মগজের জোরে।

এমন সময়ে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোন চুলো থেকে অতিকায় একটা সোনালি মহাকাশযান এসে নেমেছে পৃথিবীতে। লম্বায় চল্লিশ মাইল। প্রায় জ্বলন্ত আকৃতি। দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যায়।

তাদের বক্তব্য একটাই, পৃথিবী থেকে প্রতিনিধি পাঠাও।

পৃথিবীর প্রতিনিধি যাতে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যেতে পারে তাদের গ্রহে, তাই পরিসংখ্যানের বিবর্ত সম্ভাবনার নিয়ম মেনে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নতুন ডাইনোসর গড়েছে একটা অতিকায় মহাকাশযান।

পৃথিবীতে মানুষ লোপ পেয়েছে। বেশি বাড় বাড়লে যা হয়। ডাইনোদের যুগ ফিরে এসেছে। তবে তারা উন্নত সরীসৃপ। ব্রেন বিরাট। শরীর ক্ষুদ্র।

বিশাল সেই স্পেসশিপ নিয়ে, ভিনগ্রহীদের দেওয়া ম্যাপ নিয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে গেছে অন্য এক ছায়াপথে। সেখানে জ্বলজ্বল করছে ভারী সুন্দর একটা গ্রহ। অতীব চমকপ্রদ গ্রহ। বাড়িগুলো চল্লিশ মাইল উঁচু। তিন-তিনটে মহাদেশের মধ্যে মিনিটে মিনিটে যোগাযোগ রাখছে বিরাটকায় আকাশ-জাহাজ। যে দিকে দু'চোখ যায়, সেদিকেই দেখা

যাচ্ছে অতীব উন্নত বিজ্ঞানের নিদর্শন। এ-গ্রহের জীব যে কতখানি উন্নত, তা একবার গ্রহটাকে চরকিপাক দিয়েই বুঝে গেছে পৃথিবীর ডাইনো-জীবরা।

ওরা অবশ্য নিজেদের মহাকাশপোতের নাম দিয়েছে পুষ্পক। অতীতের দাম্ভিক মানুষ জাতটার চতুর্লোকপাল কুবেরের আকাশচারী সর্বগতি রথ—পুষ্পক। কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা নাকি তাঁকে এই অপূর্ব পুষ্পক রথ দান করেন।

সেই পুষ্পক এখন বেরিয়েছে ব্রহ্মাণ্ড পর্যটনে।

আজব গ্রহটাকে কয়েক চক্কর মারবার পর ধীমান ডাইনো-জীবরা সিগন্যাল পাঠাল অদ্ভুত সুন্দর সেই গ্রহে 'নামব কোথায়? এমন সুন্দর, এত বড় স্পেসশিপ নামাব কোথায়?'

একটু পরেই জবাব ভেসে এল আজব গ্রহ থেকে 'চিড়িয়াখানার মাঠে নামো....চিড়িয়াখানার মাঠে নামো।'

এই ঘটনার পর থেকে, ভবিষ্যতের এই অপমানকর দৃশ্য দেখবার পর থেকে, প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আর ডাইনোসর নিয়ে জ্ঞান-গবেষণার কোনও কথা বলছেন না। খুবই উন্মনা হয়ে রয়েছেন।

চাণক্য এসে এইমাত্র বলে গেল আমাকে, হচপচ পাগল হয়ে গেছে।

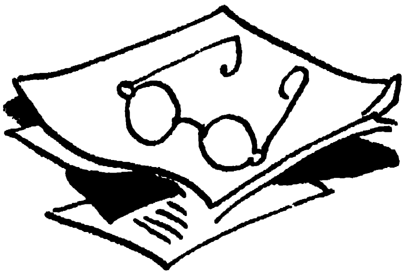

রচনাপরিচয়

কালোছায়ার করাল কাহিনি • শারদীয় ঝালাপালা ১৪১১
টেক্কা দিলেন প্রফেসর • কিশোর ভারতী
কালো চাকতি • শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৪১১
আটলান্টিস-এর সন্ধানে • শারদীয়া শৈবভারতী ১৪১৩
ক্রিস্টাল পুঁথির কাহিনি • শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৪১৩
কালো থাম • সাহানা শারদীয়া ১৪১০
মনের মেশিন • কিশোর ভারতী ১৪১২
কসমিক কুয়াশা • কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পূজাবার্ষিকী ২০০৩
আটলান্টিক-লেমুরিয়ার রহস্য • শারদীয়া কিশোরবিজ্ঞানী ২০০৪
প্রজাপতি, মামি ও সংকেত • কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পূজাবার্ষিকী ২০০৪
পাইন বনের প্রহেলিকা • এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী, শারদ ২০০৬
সাগর দানব • কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পূজাবার্ষিকী ২০০৫
ঈশ্বর আছেন • শারদীয় ঝালাপালা ১৪১২
ব্ল্যাক হোল-এর ব্ল্যাক ম্যাজিক • কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পূজাবার্ষিকী ২০০৬
ওনারা • সাহানা কিশোর পত্রিকা, পৌষ ১৪০৮
বেলুন পাহাড়ের বিচিত্র কাহিনি • দেব সাহিত্য কুটীর পূজাবার্ষিকী
রঙিন কাচের জঙ্গল • পূরবী ১৩৭৯
ভয়ংকর কাচ • দেব সাহিত্য কুটীর পূজাবার্ষিকী
সাগর বিভীষিকা সাঙ্কোপাঞ্জা • শিউলি, সেপ্টেম্বর ২০০৩
নস্যি আর ডক্টর মাথামোটা • ময়ূরপঙ্খী, সেপ্টেম্বর ২০০৪
দাঁতালো • বেস্ট অফ চিলড্রেনস ডিটেক্টিভ, জানুয়ারি ১৯৯৯
গাইয়ে গাছ • তিরিশ বছরের সেরা চিলড্রেনস ডিটেক্টিভ, জুলাই ২০০৬
চাঁড়াল চন্দ্রের ফুঁ • কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পূজাবার্ষিকী ২০০১
বজ্রদন্তী বিভীষিকা • শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৪০৭
হত্যার হাতিয়ার হরমোন • ঝালাপালা ১৪০৬
অ্যানড্রয়েড আতঙ্ক • কিশোর ভারতী
পরগাছা • কিশোর ভারতী ১৪০৬
কঙ্কালের টংকার • আরাধনা
বৈজ্ঞানিক কুমারটুলি • চন্দনা
মলিকিউল মানুষ • প্রভাতী

সোনা • শারদীয় চিলড্রেনস ডিটেকটিভ
ত্রিভুজ রহস্য • শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৯২
প্রাচীন আতঙ্ক • শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৪০৮
ধুরন্ধর ধরের ধড়িবাজি • কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পূজাবার্ষিকী ২০০০
ম্যাটারহর্ন • শারদীয় কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান
রক্তের মধ্যে বিষ • শারদীয় কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান
লালাভিচ লাড়ুকং • শারদীয় কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান
মানুষ না, যক্ষ? • শারদীয়া কিশোর ভারতী
অণিমা-মানুষ • কিশোর ভারতী ১৪০৯
অমর আরক • আকাশ গঙ্গা ১৯৯৯
ক্রিস্টাল কটেজ • রহস্যরোমাঞ্চ ভৌতিক গল্প ১৯৯৯
ডক্টর ফুটুনি • উজ্জ্বল উৎসব ১৪০৩
মারণ মেশিন • শতাব্দীর সেরা কল্পবিজ্ঞানের গল্প ২০০০
জীবন্ত পাথর • শারদীয় আপনজন ১৪০৯
ডার্ক এনার্জি • কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পূজাবার্ষিকী ২০০২
স্ট্রিং • মালকোশ ১৪০৯
ভূত সাম্রাজ্য • সাহানা
স্ট্রিং-ভূত • উপহার ২০০০
অদৃশ্য অবতার • সেরা কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৯৯৫
চাঁদু মানে চাঁদের জীব • রঙিন উৎসব ১৯৯৫
সময়-সিন্দুক • ভৈরবী ২০০১
নব কলেবরে নাটবল্টু • মেঘমল্লার ১৯৯৮
ভয়ংকর ভুডু • হংসধ্বনি ২০০০
রুদ্ররোষ • অমানুষিকী, জানুয়ারি ১৯৮৪
অ্যাকুইলার আস্পর্ধা • প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, জানুয়ারি ১৯৮৬
সোনা আর চুনির শহর • দেব সাহিত্য কুটীর পূজাবার্ষিকী
গাছ • প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, জানুয়ারি ১৯৮৬
ঘাস • প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, জানুয়ারি ১৯৮৬
ত্রিভুজ রহস্য • প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, জানুয়ারি ১৯৮৬
হলুদ পাহাড় • প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, জানুয়ারি ১৯৮৬
পুষ্পকের পরিণতি • কিশোর ভারতী জানুয়ারি ২০০৮